প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

৪২শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক—চৈত্র

১৩৪৯

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র



শকুন্তলা ও তাঁহার সখীদ্বয়
শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪২শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৪৯

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিলাতী সরকারী সত্যবাদিতার নমুনা

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর রয়টার লণ্ডন থেকে যে তারের খবর পাঠিয়েছেন, ভারত-সচিব মিঃ এমারি এক যুদ্ধ-ভাষ্য ("war commentary") প্রসঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা তাতে বিবৃত হয়েছে। তার এক অংশে আছে :—

"ভারতীয় লোকসমষ্টির অঙ্গীভূত কোন একটা দল যদি কোন একটা রাষ্ট্রশাসনবিধি ("constitution") দেশের উপর চাপিয়ে দেয়, তা হলে সেটা টিক্‌তে পারে না; কিন্তু গান্ধী ও তাঁর যে মুষ্টিমেয় কয়েক-জন সহচর কংগ্রেস যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরা ঠিক্ ঐ রকম লক্ষ্যই নিজেদের সামনে রেখেছেন। সেই মতলব বলপূর্ব্বক হাসিল করবার জন্মেই তাঁরা সম্প্রতি একটা ধ্বংসমূলক ব্যাপক অভিযান চালাবার সিদ্ধান্ত করেন যার উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনা অসম্ভব ক'রে গবন্মেণ্টকে নতজানু করা। তা শুধু যে ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সদ্য সদ্য সর্ব্বনাশের সমার্থক হ'ত তা নয়, ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা ও ঐক্যের ভিত্তি স্থাপনের পক্ষেও তা বিনষ্টিসূচক হ'ত। একটা দল-বিশেষের স্বার্থসিদ্ধি কল্পে ভারতবর্ষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অধিকার করবার উপস্থিত যে চেষ্টা হয়েছে তাকে ব্যর্থ করা ভারতীয় সমস্যা সমাধান চেষ্টার একান্ত আবশ্যক উপাদান। আমার কোন সন্দেহ নাই যে, সমস্যাটার সমাধান হবে।"

এতে ভারত-সচিব যা বলেছেন সংক্ষেপে তার মানে এই যে, কংগ্রেসের স্বাধীনতা-দাবীর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেরা সর্ব্বেসর্ব্বা হওয়া। অথচ যে নির্দ্ধারণটির জন্মে মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি ধৃত হয়েছেন তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে জাতীয় গবন্মেণ্ট সব দলের লোক নিয়ে গঠিত হওয়া আবশ্যক এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রশাসনবিধি রচনার জন্মে যে গণপরিষদ আহ্বান করতে হবে, তাতেও সব দলের লোক থাকবেন। কংগ্রেসের প্রধান প্রধান নেতারাও ভিন্ন ভিন্ন বিবৃতি ও বক্তৃতায় এই মর্ম্মের কথা বলেছেন। সকলের উপর লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, মহাত্মা গান্ধী ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলেছিলেন, গবন্মেণ্ট যদি ভারতীয়দের হাতে সব ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেবার জন্মে জাতীয় গবন্মেণ্ট গড়বার ভার মুসলিম লীগের উপর দেন, তাতেও তাঁদের কোন আপত্তি হবে না।

এই সব সত্ত্বেও এমারি সাহেব বলছেন, একাধিপত্য করবার জন্মে কংগ্রেস স্বাধীনতা-দাবী ইত্যাদি করেছে! এইটি বিলাতী সরকারী সত্যবাদিতার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

তার পর, ধ্বংসমূলক ব্যাপক গণপ্রচেষ্টার কথা। কংগ্রেসের নির্দ্ধারণে ছিল যে, স্বাধীনতা-দাবী গবন্মেণ্ট অগ্রাহ্য করলে অহিংস ভাবে ব্যাপক আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা শুরু করা হবে, এবং এও প্রকাশ করা হ'য়েছিল যে, কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ হয়ে যাবার পর গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখবেন, অনুমতি পেলে দেখা ক'রে কংগ্রেসের দাবী আলোচনা করবেন, এবং আলোচনার ফল সন্তোষজনক না হলে তবে অহিংস গণপ্রচেষ্টা আরম্ভ হবে। বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর পত্র ব্যবহার, দেখাসাক্ষাৎ বা আলোচনার কোন সুযোগই দেওয়া হয় নি। গান্ধীজী প্রভৃতির গ্রেপ্তারের পর যা-কিছু উপদ্রব রক্তপাত আদি হচ্ছে, সরকার পক্ষের লোকেরা সে-সবগুলার দোষ ও দায়িত্ব গান্ধীজী ও কংগ্রেসের উপর চাপাচ্ছেন। কিন্তু তা বিশ্বাসজনকরূপে করতে হলে যে-রকম সন্তোষকর প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক তা এদেশে বা বিলাতে কোনো রাজপুরুষ আগে দিতে পারেন নি,

কেন্দ্রীয় আইন-সভার দুই কক্ষের যে অধিবেশন হয়ে গেল তাতেও দিতে পারেন নি। সুতরাং এমারি সাহেব ও অন্যান্য রাজপুরুষেরা যে কংগ্রেসের উপর সত্যমূলক দোষারোপ করছেন, তা কেমন ক'রে বিশ্বাস করা যায়?

অবশ্য, তাঁরা বলতে পারেন আমরা যে-প্রমাণের উপর নির্ভর ক'রে কংগ্রেসকে দোষ দিচ্ছি, তা আমাদের বিবেচনায় সন্তোষজনক; সুতরাং তোমরা আমাদের সত্যবাদিতায় যে সন্দেহ প্রকাশ করছ তা অমূলক। আমাদের বিশ্বাস তা না হ'লেও আমরা বলছি, "তথাস্তু! আপনাদের সত্যবাদিতার আর একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন।"

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সাহেব গত ১০ই সেপ্টেম্বর পার্লেমেণ্টের হৌস অব কমন্সে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে বিবৃতি দেন, তাতে বলেন:

"India is a continent almost as large and actually more populous than Europe..."

ভারতবর্ষ আয়তনে প্রায় ইয়োরোপের মত বড় এবং বাস্তবিক ইয়োরোপের চেয়ে জনাকীর্ণ একটা মহাদেশ।

অনেক সংখ্যাতাত্ত্বিক বার্ষিক পুস্তকে (Statistical year-booksএ) আজকাল ইয়োরোপের যে আয়তন ও লোকসংখ্যা দেওয়া হয়, তা সোভিয়েট রাশিয়াকে বাদ দিয়ে; সোভিয়েট রাশিয়ার সংখ্যাগুলি আলাদা দেখান হয়; কারণ এই রাষ্ট্র ইয়োরোপ ও এশিয়া উভয় মহাদেশে বিস্তৃত। সোভিয়েট রাশিয়ার যে-অংশ ইয়োরোপের অন্তর্গত তা বাদে ইয়োরোপের আয়তন ২০,৮৫,০০০ বর্গমাইল, এবং সোভিয়েট রাশিয়ার আয়তন ৮১,৭৬,০০০ বর্গমাইল। ভারতবর্ষের আয়তন ১৮,০৮,৬৭৯ বর্গমাইল। রাশিয়া বাদ দিলেও ইয়োরোপ ভারতবর্ষের চেয়ে বড়। সোভিয়েট রাশিয়ার যে অংশ ইয়োরোপের মধ্যে, তাকে ইয়োরোপের মধ্যে ধরলে—ধরাই উচিত—ইয়োরোপ ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক বড়। আমরা এখন কল্‌কাতার বাইরে, নিজের লাইব্রেরীর সাহায্য ব্যতিরেকে এসব কথা লিখছি। এখন যে ২।১খানা বই হাতের কাছে রয়েছে, তার মধ্যে ১৯৪০-৪১ সালের লীগ অব নেশ্যন্সের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়্যার-বুক (সংখ্যাতাত্ত্বিক বর্ষপুস্তক) খুব প্রামাণিক। তাতে দেখছি, ১৯৪১ সালের সেন্সস অনুসারে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ছিল ৩৮ কোটি ৮৮ লক্ষ; এবং সোভিয়েট রাশিয়া বাদে ইয়োরোপের লোকসংখ্যা ১৯৩৮ সালে ছিল ৪০ কোটি ২৮ লক্ষ। ১৯৪১ সালে এই ৪০ কোটি ২৮ লক্ষ বেড়ে আরো বেশি হয়েছিল। সেই বৃদ্ধি না ধরলেও এবং সোভিয়েট রাশিয়া বাদ দিলেও ইয়োরোপের লোকসংখ্যা ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি—কম কোন মতেই নয়। অথচ চার্চিল সাহেব বলেন কম। আর, যদি ইউরোপীয় সোভিয়েট রাশিয়াকে ইয়োরোপের মধ্যে ধরা যায়—যা ধরা খুবই উচিত—তা হ'লে ত ইয়োরোপের লোকসংখ্যা ভারতবর্ষের চেয়ে খুবই বেশি হয়। লীগ অব্ নেশ্যন্সের ১৯৪০-৪১ সালের সংখ্যাতাত্ত্বিক বর্ষপুস্তক অনুসারে ১৯৩৮ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার লোকসংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ৪ লক্ষ ৬৭০০০। এর বেশির ভাগ অধিবাসীই ইউরোপীয় রাশিয়ার বাসিন্দা। সুতরাং সমগ্র ইয়োরোপের লোকসংখ্যা ৫০ কোটির অনেক বেশি তাতে কোনই সন্দেহ নাই।

সুতরাং এ বিষয়ে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর কথার মূল্য একটা কানাকড়িও নয়।

—

ভারতবর্ষের প্রভূত লোকসংখ্যা ও বলহীনতা

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ভারতবর্ষকে ইয়োরোপের চেয়ে বেশি জনবহুল ব'লে যে ভ্রম করেছেন, তা দেখিয়ে দিয়ে বিশেষ স্ফূর্তি বোধ করছি না। রাশিয়া বাদ দিলে সমগ্র ইয়োরোপের লোকসংখ্যা ভারতবর্ষের চেয়ে মোটামুটি দুকোটি মাত্র বেশি দাঁড়ায়;—রাশিয়াকে ইয়োরোপের মধ্যে ধরলে—ধরাই উচিত—অবশ্য আরও অনেক বেশি হয়। সে কথা এখন থাক। রাশিয়া বাদে ইয়োরোপ আয়তনে ও লোকসংখ্যায় ভারতবর্ষের চেয়ে কিছু বড়—খুব বড় নয়। কিন্তু তার ঐশ্বর্য্য, তার শক্তি, তার লৌকিক জ্ঞানসম্ভার ভারতবর্ষের চেয়ে কত বেশি! তাই ভেবে ম্রিয়মাণ হ'তে হয়। আমাদের পরাধীনতা এই প্রভেদের একটা কারণ বটে, কিন্তু আমরা পরাধীনই বা হলাম কেন ও আছি কেন? তাতে কি আমাদের কোন দোষ ছিল না ও নাই? নিশ্চয়ই ছিল ও আছে। অতএব, যে-সব দোষে আমরা পরাধীন হয়েছি, ও আছি ইয়োরোপ ও ভারতবর্ষের শক্তিসামর্থ্য, ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানবত্তার প্রভেদের প্রকৃত কারণ সেই সব দোষ। সেই সব দোষ থেকে আমাদের মুক্ত হওয়া আবশ্যক; হ'লে পরে তবে আমরা শক্তিসামর্থ্যের ঐশ্বর্য্যে ও লৌকিক জ্ঞানে ইয়োরোপের সমকক্ষতা করতে পারব।

—

ভারত কতদিনে আত্মরক্ষাসমর্থ হবে?

রয়টার মিঃ এমারির যুদ্ধভাষ্যের যে অংশের চুম্বক দিয়েছেন, তার শেষের দিকে আছে:—

ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার ব্যবস্থাই হবে প্রথম সমস্যা। ভারতবর্ষে আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে সে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সম্বলিত একটি বিরাট শক্তিতে পরিণত হতে পারবে। কিন্তু এইরূপ ভাবে শক্তিশালী হতে হলে তার অনেক দিন লাগবে। এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ যদি শান্তিতে উন্নতি লাভ করতে চায় তবে তাকে এমন সমস্ত শক্তির সহযোগিতা করতে হবে যাদের স্বার্থ তার নিজের স্বার্থের অনুকূল।

এর পর মিঃ এমারি বলেন যে, যিনি ভারত মহাসাগর এবং তার প্রবেশপথের উপর আধিপত্য রক্ষা করবেন তাঁর বন্ধুত্ব লাভ করাই হবে ভারতবর্ষের আসল সমস্যা। এই সময়ের মধ্যে ভারতের পক্ষে স্বাধীন অংশীদার হিসাবে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকাই সমীচীন।

ব্রিটিশ ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী মিঃ য়্যাটলির মতে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীন থেকে এক শ বৎসর আভ্যন্তরীণ শান্তি ভোগ ক'রেছে। দেখা যাচ্ছে, ভারত-সচিবের মতে ভারতবর্ষ এখনও আত্মরক্ষায় সমর্থ হয় নি, এবং কথাটা সত্যও বটে। তা হ'লে এই দেশটাকে আত্মরক্ষায় সমর্থ হ'তে হ'লে অন্ততঃ আরও এক শ বৎসর লাগবে কি ? জাপান যখন পাঁচ বৎসর আগে চীনকে আক্রমণ করে তখন চীন মোটেই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সেই জন্যে চীনের কিছু অংশ জাপান দখল করতে পেরেছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু চীন যুদ্ধ করে আসছে এবং আত্মরক্ষার সামর্থ্যও বাড়িয়ে আসছে। সে স্বাধীন ব'লেই এটি করতে পেরেছে ও পারছে, অন্য কোন দেশের অধীন হ'লে পারত না।

জার্মেনী যখন রাশিয়াকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক আক্রমণ করে, তখন রাশিয়াও এই আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সেই জন্য নাৎসীরা রাশিয়ার কোন কোন অংশ দখল করতে পেরেছে। কিন্তু রাশিয়া পরাস্ত হয় নি। সে স্বাধীন ছিল ব'লে ক্রমে অধিকতর আত্মরক্ষাসমর্থ হচ্ছে।

এমারি সাহেব এমন ধরণের কথা বলছেন যেন আধুনিক কালে খুব শক্তিশালী কোন জা'তও একা একা আত্মরক্ষা করতে পারে, যেন কেবল ভারতবর্ষই পারে না। বাস্তবিক কিন্তু কোন জা'তই আধুনিক অবস্থায় একা একা আত্মরক্ষা করতে পারে না। নিউ ইয়র্কের "এশিয়া" মাসিক পত্রের গত জুন সংখ্যায় ইংরেজ মনীষী বের্ট্রাণ্ড রাসেল ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তাতে আছে :—

Nominal complete independence is an isolationist ideal, and is no longer possible for any country. Denmark and Norway, Holland and Belgium, Rumania, Greece and Yugoslavia, each in turn insisted on complete independence until they found themselves conquered by the Nazis. Every country, not excepting the United States, if it insists on isolated independence, will expose itself to foreign conquest."

তাৎপর্য্য। নামে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা একটা নিঃসঙ্গ একাকীত্বের আদর্শ এবং এখন আর কোন দেশের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। ডেন্মার্ক নরওয়ে হল্যাণ্ড বেলজিয়ম রুমানিয়া গ্রীস যুগোস্লাবিয়া প্রত্যেকেই পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষার জেদ ধরে ছিল যত দিন পর্য্যন্ত না তারা নাৎসীদের দ্বারা পরাজিত ও পদানত হ'ল। প্রত্যেক দেশ—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও—নিঃসঙ্গ স্বাধীনতার জেদ ধ'রে থাকলে নিজেকে বিদেশীর দ্বারা পরাভূত হবার আশঙ্কায় ফেলবে।

মিঃ এমারি বল্‌তে চান যে ব্রিটেনের স্বার্থ ভারতবর্ষের স্বার্থের অনুকূল। তার বিচার এখানে করব না। এ বিষয়ে বের্ট্রানড্‌ রাসেল তাঁর পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বলেছেন :—

"If India wishes to remain free, it will be necessary to join a defensive alliance of countries that wish neither to conquer others nor to be conquered themselves. Indian Nationalists object to partnership in the British Commonwealth of self-governing nations, but would probably not object to partnerships in an international alliance not specially British, particularly if the alliance were divided into regional groups, and India belong to an oriental group."

তাৎপর্য্য। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন থাকতে চায়, তা হলে তাকে এমন কতকগুলি দেশের সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক সন্ধিতে যোগ দিতে হবে যারা অন্যদের দ্বারা বিজিত হতে চায় না কিম্বা অন্য কাউকেও পরাজিত ও অধীন করতে চায় না। স্বাজাতিক ভারতীয়েরা ব্রিটিশ ডোমীনিয়নগুলির অন্যতম হতে আপত্তি করে, কিন্তু সম্ভবতঃ তারা একটি আন্তর্জাতিক বা সার্বজাতিক সন্ধিতে যোগ দিতে আপত্তি করবে না, বিশেষতঃ যদি সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ দেশগুলি প্রাচ্যপ্রতীচ্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হয়, এবং ভারতবর্ষ প্রাচ্য বিভাগের অন্তর্গত হয়।

আমাদের মনে হয় ভারতবর্ষ চীন, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতির সঙ্গে এ রকম সন্ধি করতে ইচ্ছুক হবে।

এমারি সাহেব সর্ব্বশেষে বলছেন যে ভারত মহাসাগর আর তার প্রবেশপথের উপর যিনি আধিপত্য করবেন, তার বন্ধুত্ব লাভ করাই ভারতবর্ষের আসল সমস্যা হবে। কিন্তু ভারতবর্ষ নিজেই ত ভারতমহাসাগরের নিকটতম, এবং এই মহাসাগরের নিকট ভারতের চেয়ে বড় কোন দেশ নাই। অথচ ভারতবর্ষ যে তার উপরে আধিপত্য করবে এটা বোধ হয় এমারি সাহেব কল্পনা করতেও পারেন না!

—

গো-শকট যুগ ভারতে কত দিন চলবে ?

গত ৬ই সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী য়্যাট্‌লি সাহেব তাঁর এবারডিনের বক্তৃতাতে বলেন যে, ভারতীয় স্বায়ত্ত-শাসনের প্রগতি যে আটকে রয়েছে তার একটা কারণ ভারতবর্ষের বিস্তর লোক এখনও সভ্যতার গোরুর

গাড়ীর স্তরে অবস্থিত ব'লে ভারতবর্ষের গণতন্ত্র প্রবর্তনে নানা বাধাবিঘ্ন রয়েছে। ইংরেজরা প্রথম যখন ভারতবর্ষের কোন কোন অংশ দখল করেন তখনও বিস্তর ভারতীয় গোরুর গাড়ীর স্তরে ছিল। ম্যাট্‌লি সাহেবের মতে ভারতবর্ষ এক-শ বৎসর আভ্যন্তরীণ শান্তি ভোগ করেছে। তার চেয়ে অনেক কম সময়ে সোভিয়েট রাশিয়ার ও চীনের অনেক জা'ত গোরুর গাড়ীর যুগ অতিক্রম করে মোটর গাড়ীর যুগে উপস্থিত হ'তে পেরেছে। যে কারণেই হোক ভারতবর্ষের অনগ্রসর লোকগুলির এক-শ' বৎসরেও এই সৌভাগ্য হয় নি। ব্রিটিশ শাসনের অধীন থেকে আরও এক-শ বৎসরে তাদের সে সৌভাগ্য হবে কি না কে বলতে পারে? যাই হোক, এটা নিশ্চিত যে বর্তমান যুদ্ধটা শেষ হ'য়ে গেলেই আমরা মোটর গাড়ীর যুগে উপস্থিত হব, এ রকম কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট বলছেন যুদ্ধ শেষ হবার পরেই তাঁরা ভারতবর্ষে গণতন্ত্র প্রবর্তন করবেন। কিন্তু আমরা গোরুর গাড়ীর স্তরে আছি ব'লে এখনও যখন গণতন্ত্র পাই নি, যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলেও ঠিক সেই কারণেই আমরা গণতন্ত্রের অযোগ্য বিবেচিত হব না কি?

ভারতবর্ষকে স্ব-শাসন অধিকার না দেবার একটা নূতন অজুহাত শুনিয়ে দিয়ে ম্যাট্‌লি সাহেব ভালই করেছেন। যুদ্ধের শেষে অনায়াসে স্ব-শাসন পাবার আশায় যদি কোন ভারতীয় বসে থাকেন, তবে তিনি এই অজুহাতটার কথা ভেবে দেখবেন। কারণ ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে কায়েম থাকলে এই অজুহাতটা অনির্দিষ্ট দীর্ঘকাল ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষের স্ব-শাসন পাবার অযোগ্যতার একটা প্রমাণ বলে সভ্য জগতের সম্মুখে উপস্থিত করতে পারবেন।

—

বোমার পুনরাবির্ভাব

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষ্যে বাংলা দেশে সন্ত্রাসনবাদ, বোমা, রিভলভার ইত্যাদির আবির্ভাব হয়। এগুলো আমরা বরাবর গর্হিত মনে ক'রে ও ব'লে এসেছি, এখনও তাই মনে করি। এগুলো খুব গর্হিত ও নিন্দনীয় এবং দেশের পক্ষে খুব অনিষ্টকর হ'লেও এ গুলোর আবির্ভাব স্বাভাবিক কারণে হ'য়েছিল। কোন রাজনৈতিক কারণে যদি দেশের লোকদের মনে প্রবল অসন্তোষ জন্মে এবং যদি এক দিকে সেই অসন্তোষ দূরীভূত না হয় এবং অন্য দিকে বক্তৃতায় ও খবরের কাগজে তার যথেষ্ট প্রকাশ ও দমন-নীতির প্রয়োগ বন্ধ করে দেওয়া হয়, মানুষ কোন দিকে আশার আলোক দেখতে পায় না, তখন গুপ্ত ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাসনবাদ, বোমা প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। আগে যে রকম কারণ-সমবায়ে বঙ্গে সন্ত্রাসন ও বোমা প্রভৃতির আবির্ভাব হয়েছিল, বর্তমান সময়েও তারই সদৃশ কারণসমবায়ে বোমার আবির্ভাব হয়েছে। এতে সন্ত্রাসনবাদীদের উদ্দেশ্য মোটেই সিদ্ধ হয় না, হতে পারে না। অন্য দিকে দমন-নীতি খুব জোরে চালিয়েও যে সন্ত্রাসনবাদের মূল উচ্ছেদ করা যায় না, বাংলা দেশে তা প্রমাণ হ'য়ে গেছে। বাংলা দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্য কোন কোন প্রদেশে যে সন্ত্রাসনবাদ লোপ পেয়েছিল, তা মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাবাদ প্রচারে এবং তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রভাবে। এটি সরকারী রিপোর্টেও স্বীকৃত হয়েছে।

বর্তমানে সন্ত্রাসনবাদ ও বোমার পুনরাবির্ভাব অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। গবর্ন্মেণ্ট সকল রকম উপদ্রব বন্ধ করবার জন্যে যে দমন-নীতি প্রয়োগ করছেন তা আইনের সীমার মধ্যে থাকলে আপত্তিকর নয়, বরং বৈধ ও আবশ্যক। তাতে কিছু ফল হবে। কিন্তু বিলাতের 'টাইমস্' পর্য্যন্ত লিখেছেন শুধু দমন-নীতি যথেষ্ট নয়, আরও কিছু চাই।

আগে বলেছি যে বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষের অন্য কোন কোন প্রদেশে সন্ত্রাসনবাদ লুপ্ত হওয়ার একটি প্রধান কারণ মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও প্রভাব। বর্ত্তমান যুদ্ধ উপলক্ষ্যে লোকের মনে যুদ্ধ স্পৃহা জাগাবার জন্যে সরকারী ও বে-সরকারী অনেক লোক গান্ধীজীর অহিংসাবাদকে উপহাস, বিদ্রূপ করেছে। তার উপর, এখন তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা না থাকায়, তিনি সাধারণ কথাবার্ত্তা বক্তৃতা বা লেখার দ্বারা নিজের আদর্শ প্রচার করতে পাচ্ছেন না।

এই সব কারণে বর্ত্তমান সময়ে বোমার পুনরাবির্ভাব বিশেষ আশঙ্কার কারণ হ'য়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এখনই ঘোষণা ক'রে জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট গঠন করতে দিলে এবং মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতিকে খালাস দিলে গবর্ন্মেণ্ট এই আশঙ্কা দূর করতে পারেন।

—

সন্ত্রাসন ও যুদ্ধ

যারা অজ্ঞ এবং যাদিগকে প্রায় বাতুল বললেই চলে, তারাই মনে করতে পারে যে, কতকগুলা বন্দুক রিভলভার এবং কতকগুলা ঘরগড়া বোমা আধুনিক যুদ্ধায়োজনের সমতুল্য। আমেরিকা ও ব্রিটেন উভয়েই খুব শক্তিশালী ও ধনী, তারা উভয়েই বিশ্বাস করে যে, রাশিয়াকে এই সঙ্কটের

সময় সাহায্য করবার জন্যে পশ্চিম ইয়োরোপের কোথাও জার্মেনীকে আক্রমণ ক'রে তাকে ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা আবশ্যক; তা হলে নাৎসীরা ইয়োরোপে তাদের সমস্ত শক্তি এখনকার মত রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারবে না। (২রা অক্টোবর, ১৯৪২।) কিন্তু ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গনে নাৎসীদিগকে নামাতে হ'লে অতিরিক্ত যত লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য এবং বিস্তর এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক, কামান, রাইফেল, গোলাগুলি বারুদ দরকার, ব্রিটেন ও আমেরিকা এখনও তা ঐ রণাঙ্গনের জন্যে মজুদ করতে পারে নি, সেই জন্যে তারা অনেক তাগিদ ও প্রতিকূল সমালোচনা সত্ত্বেও এখনও স্বয়ং দ্বিতীয় রণাঙ্গনে নামে নি।

কেবলমাত্র এই বিষয়টি বিবেচনা করলেও বুঝা যায়, বর্তমান সময়ে যুদ্ধের আয়োজন কি রকম বিরাট ব্যাপার।

সন্ত্রাসনবাদীদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত আয়োজন তার তুলনায় অতি তুচ্ছ ও নগণ্য, এবং অতি তুচ্ছ ও নগণ্যের চেয়ে বেশী কখনও হতেই পারে না।

—

খাকসারদের পক্ষে সুপারিশ

কেন্দ্রীয় কৌন্সিল অব ষ্টেটে গৃহীত একটি প্রস্তাবে বড়লাটের কাছে এই সুপারিশ করা হয়েছে যে খাকসার-প্রচেষ্টা বে-আইনী ব'লে যে নিষিদ্ধ হয়েছিল সেই নিষেধ প্রত্যাহার করা হোক, খাকসারদের নেতা আল্লামা মাশরিকিকে খালাস দেওয়া হোক ও তার উপর প্রযুক্ত সমুদয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হোক এবং যত খাকসার এখন বন্দী আছে তাদিগকেও মুক্তি দেওয়া হোক। বড়লাট এই সুপারিশ অনুসারে কাজ করবেন কি না এবং যদি খাকসার নেতা ও অন্য খাকসারদের খালাস দেওয়া হয় তা বিনাসর্ত্তে দেওয়া হবে কি না বলা যায় না। তবে এ কথা নিশ্চিত যে তাদের মুক্তি হলে অন্য সব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির কথা গবর্মেণ্টকে নূতন করে বিবেচনা করতে হবে।

—

খাঁ বাহাদুর আল্লা বখ্‌শের উপাধিত্যাগ

খাঁ বাহাদুর আল্লা বখ্‌শ্ সিন্ধু প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী। চর্চিল সাহেব ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর সাম্প্রতিক বক্তৃতিতে যে পাঁচটি প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলী কাজ করছে বলেছিলেন, সিন্ধুর মন্ত্রিমণ্ডল তার অন্যতম এবং মৌলবী আল্লা বখ্‌শ্ তার নেতা। চার্চিল সাহেব এই মন্ত্রীদের উল্লেখ ক'রে সভ্য জগৎকে জানাতে চেয়েছিলেন যে, পাঁচ পাঁচটা প্রদেশে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের নীতি সমর্থিত হচ্ছে। কিন্তু তিনি যখন বক্তৃতা ক'রেছিলেন তার আগেই বাংলার প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা কংগ্রেসের অনুরূপ দাবীই ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে এবং সম্মিলিত জাতিসমূহকে জানিয়েছিলেন এবং প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক্ সাহেব ভারতবর্ষের নানা দলের নেতাদের সেই বিবৃতিতে দস্তখত করেছিলেন যার দাবী কংগ্রেসেরই অনুরূপ। এখন আবার সিন্ধুদেশের প্রধান মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আল্লা বখ্‌শ সরকার-প্রদত্ত তাঁর উপাধি খাঁ বাহাদুর এবং "অর্ডার অব্ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার" ব্রিটিশ পলিসির প্রতিবাদ স্বরূপ পরিত্যাগ করলেন। তাঁর এই উপাধি পরিত্যাগের কথা তিনি গত ২৬শে সেপ্টেম্বর করাচীতে একটি প্রেস কন্‌ফারেন্সে প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বলেন, ব্রিটিশ পলিসি হচ্ছে

"to continue their hold on India and persist in keeping her under subjection, to use her political and communal differences for propaganda purposes, and to crush the national forces and serve their own intentions."

"ভারতের উপর প্রভুত্ব-অধিকার বজায় রাখা, ভারতবর্ষ আপনাদের অধীন রেখে চলা, ভারতীয় নানা দল ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদগুলাকে ব্রিটেনের অনুকূল ও ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্যে লাগান, ভারতবর্ষের মহাজাতিক শক্তিকে পিষে ফেলা এবং নিজেদের অভিপ্রায়সমূহ সিদ্ধ করা।"

আল্লা বখ্‌শ সাহেব এই কন্‌ফারেন্সে অনেক মনে রাখবার মত কথা বলেন। তার মধ্যে একটি এই :—

"I believe in two things: defeating British Imperialism, at the same time, resisting Nazism and Fascism It is my birth-right to fight both."

'আমি দুটি জিনিষে বিশ্বাস করি—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পরাভূত করা, সঙ্গে সঙ্গে নাৎসিবাদ ও ফাসিস্তবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। উভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার জন্মগত অধিকার।"

আল্লা বখ্‌শ্ সাহেব তাঁর উপাধিত্যাগ বিষয়ে বড়লাটকে একটি চিঠি লিখেছেন।

—

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষে একজন অগ্রণীস্থানীয় মনীষী, বিদ্বান ও সাহিত্যিকের তিরোভাব ঘটল। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা ও তার উচ্চতম পুরস্কার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় পরীক্ষাই তিনি অসামান্য কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বি-এ পরীক্ষায়

তিনি সংস্কৃত, দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যে সম্মান ("অনার্স") লাভ করেন এবং এম্-এতে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর স্বদেশবাসী পণ্ডিতেরা তাঁকে বেদান্তরত্ন উপাধি দিয়েছিলেন; কারণ বেদান্ত-আদি দর্শনে তাঁর বহু অধ্যয়ন ও ব্যুৎপত্তি ছিল। নানাভাবে বেদান্ত মত প্রচার তিনি ক'রে গেছেন। প্রধানতঃ দর্শন ও ধর্ম বিষয়ে তিনি একাধিক বাংলা বই লিখেছেন। তা ছাড়া অনেক মাসিক ও ত্রৈমাসিক কাগজে তাঁর নানাবিধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ অনেক বৎসর ধরে বেরিয়ে আসছিল। তিনি বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই সুবক্তা ছিলেন। তাঁর বক্তৃতার বেগ ঝড়ের মত ছিল না। তিনি ধীরে ধীরে বলতেন, কিন্তু তা চিন্তা বা ভাষা যোগাত না ব'লে নয়। তিনি ধীরে ধীরে বলায় শ্রোতাদের বুঝবার অধিকতর সুবিধা হ'ত। তাঁর সাধারণ কথাবার্তা ও বক্তৃতার সঙ্গে তাঁর হাতের লেখার একটি সাদৃশ্য ছিল—লেখা বেশ ফাঁক ফাঁক ও গোটা গোটা ছিল।

তিনি ধীরবুদ্ধি, শান্ত ও স্থিতপ্রজ্ঞ ছিলেন। তাঁর ধর্মমত উদার ছিল। তিনি বঙ্গীয় হিন্দুসভার এক সময়ে সভাপতি ছিলেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন কতিপয় কর্মীর ও নেতার মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ও তার প্রতিষ্ঠান যাদবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ইতিহাসেও তাঁর স্থান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তাঁর স্থানের সমতুল্য।

তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য ছিলেন।

থিয়সফিতে তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী ও শ্রীমতী এনী বেসান্তের মতাবলম্বী ছিলেন। থিয়সফিক্যাল সোসাইটির তিনি অন্যতম ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে "কমলা বক্তৃতা" দিতে আহ্বান ক'রে তাঁর মননশীলতা ও বিদ্যাবত্তার প্রতি সম্মান দেখিয়েছিলেন এবং তাঁকে জগত্তারিণী পদক দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্ব স্বীকার করেছিলেন। তাঁর পেশা ছিল এটর্নীগিরি এবং এতে তিনি খুব কৃতী হয়েছিলেন।

বঙ্গের স্বদেশী যুগে তিনি অন্যতম কর্মিষ্ঠ ও মননশীল নেতা ছিলেন। সেকালের কংগ্রেসের সহিত তাঁর যোগ ছিল। অসহযোগী কংগ্রেসের সহিত তাঁর ঐকমত্য ছিল না।

বঙ্গের শিক্ষাবিষয়ক ও অন্য নানাবিধ সঙ্কট সময়ে তাঁর ডাক পড়লে তিনি সর্বদাই সাড়া দিতেন।

হরদয়াল নাগ

নব্বই বৎসর বয়সে চাঁদপুরের হরদয়াল নাগ মহাশয়ের মৃত্যু হয়েছে। তিনি পরম শ্রদ্ধেয় ও বঙ্গের প্রাচীনতম কংগ্রেস কর্মী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর মতে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং গান্ধীজীও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময় নিজের পেশা ওকালতী ছেড়ে দিয়েছিলেন; পরে আর গ্রহণ করেন নি। চাঁদপুরের জাতীয় বিদ্যালয় তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং তাতে তিনি তাঁর সর্বস্ব দান করেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি শেষ বয়সে কংগ্রেসের নানা কর্মে যোগ দিতে পারতেন না; কিন্তু যখনই কোন একটা প্রশ্ন বা সমস্যা দেশের সম্মুখে উপস্থিত হ'ত, তিনি সে বিষয়ে নিজের মত বিবৃতির আকারে সংবাদপত্রে প্রকাশ করতেন।

—

হীরালাল হালদার

ভারতবর্ষে যাঁরা দার্শনিক বিষয়ে স্বাধীন মৌলিক চিন্তার জন্য সম্মানার্হ, অধ্যাপক ডক্টর হীরালাল হালদার তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি তাঁর সমগ্র কর্ম-জীবনে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতেই রত ছিলেন। রাষ্ট্রনৈতিক বা অন্যবিধ কোন আন্দোলনে তিনি কখনও যোগ দেন নি বলে তিনি নামজাদা লোক হ'তে পারেন নি। তিনি কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ উপাধিধারী ছিলেন; নব-হেগেলীয় মতবাদ সম্বন্ধে মৌলিক প্রবন্ধ লিখে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ্‌ডি উপাধি লাভ করেন। তিনি প্রথমে বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে কিছুকাল কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপকতা করেন। তখন আমরা তাঁর অন্যতম সহকর্মী ছিলাম। তখন তিনি ইংরেজী সাহিত্যের কিছু বই এবং লজিক্‌ও পড়াতেন এই রকম মনে পড়ছে। পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে অবসর নেবার সময় তিনি তার "রাজা পঞ্চম জর্জ দর্শনাধ্যাপক" ছিলেন—যে পদ একদা আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অলঙ্কৃত ক'রেছিলেন। তিনি অনেক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগের কৌন্সিলের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি সুশিক্ষক ছিলেন। তাঁর চরিত্র শিক্ষাব্রতীর যোগ্য উচ্চ ও নির্মল ছিল। পারিবারিক জীবনে তিনি মাতৃভক্ত পুত্র, প্রেমিক পতি এবং সন্তানবৎসল কর্তব্যনিষ্ঠ পিতা ছিলেন। তিনি

গ্রন্থ অধিক রচনা করেন নি। যেগুলি করেছিলেন—যথা *Neo-Hegelianism, Two Essays on General Philosophy and Ethics* এবং *Survival of Human Personality After Death*—সব কটি উৎকৃষ্ট। প্রথমটি তাঁকে ভারতবর্ষের বাইরেও দার্শনিকদের মধ্যে যশস্বী করে। শেষোক্তটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ রূপে "মডার্ন রিভিয়ু"তে বেরিয়েছিল। তিনি পাশ্চাত্য "ফিলসফিক্যাল রিভিয়ু"তে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সাপ্তাহিক মুখপত্র ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারেরও তিনি এক সময়ে নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য দর্শনেই বিশেষ পণ্ডিত ও মননশীল ব'লে বিদিত থাকলেও ভারতীয় দর্শনসমূহেও তাঁর অধিকার ছিল এবং ভগবদ্গীতা ও বহু উপনিষদ তিনি অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি সদালাপী ও সুরসিক ছিলেন।

রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি কার্লাইলের এমন কোন মত মানতেন যা আজকাল এদেশে লোকপ্রিয় হবে না।

—

সংবাদ প্রকাশে বাধা কম্‌ল না

বর্তমান সঙ্কট সময়ে সমুদয় সংবাদ সম্পূর্ণ অবাধে প্রকাশ করবার স্বাধীনতা খবরের কাগজের সম্পাদকদের থাকবে, এ তাঁরা দাবী করেন না, আশাও করেন না। কিন্তু গবর্মেণ্ট এ বিষয়ে যত কড়াকড়ি করেছেন, ততটা করা আবশ্যক, তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁরা একমত হ'য়ে যতটা নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে রাজী গবর্মেণ্টেরও তাতে রাজী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ রাজী হলেন না। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় কৌন্সিল অব্ স্টেটে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু কড়াকড়ি কমাবার জন্যে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলেন, কিন্তু অধিকাংশের ভোটে সেটি নামঞ্জুর হয়ে গেছে।

কতকগুলি সংবাদ যে কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করতে দেন না, তার কারণ তাঁরা বলেন সেগুলি শত্রুপক্ষের কাজে লাগতে পারে। কোন সংবাদ প্রকাশিত হলে যদি তাতে শত্রুপক্ষের সুবিধা হয়, তা প্রকাশ করা যে উচিত নয়, ভারতীয় সম্পাদকেরা তা খুব ভাল ক'রেই বুঝেন। সেরকম সংবাদ প্রকাশে যদি শত্রুর ভারতবর্ষ দখল করবার বা আক্রমণ করারও সুবিধা হয়, তাতে ক্ষতি ইংরেজের চেয়ে ভারতীয়দেরই বেশী। এমন এক সময় ছিল, যখন ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সম্পত্তি ছিল না, কিন্তু তখনও ইংলণ্ড ইংলণ্ডই ছিল এবং সেদেশে তখন সেক্সপিয়র, বেকন, মিল্টন, ক্রমওয়েল প্রভৃতির জন্ম হয়েছিল। যদি ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হাতছাড়া হয়, তখনও ইংলণ্ড ইংলণ্ডই থাকবে, কিন্তু ভারতবর্ষ যদি ইংরেজের হাত থেকে জাপানের হাতে যায়, তা হলে ভারতবর্ষকে নূতন ক'রে বিজিত দেশের সব দুর্গতি পুনর্বার সহ্য করতে হবে, এবং তার স্বাধীন হবার আশা সুদূরপরাহত হবে। সুতরাং জাপানের যাতে সুবিধা না হয়, তা দেখাতে ইংরেজদের চেয়ে আমাদের স্বার্থ বেশী। অতএব সংবাদ প্রকাশে যতটুকু বাধা ভারতীয় সম্পাদকেরা মেনে নিতে রাজী, তার বেশী কঠোর নিয়ন্ত্রণ অযৌক্তিক ও অনাবশ্যক।

এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে মনে হয়, যে, আমরা ভারতীয় সম্পাদকেরা কি সংবাদ বা মন্তব্য ছাপি বা না ছাপি, যেন প্রধানত বা অনেকটা তার উপরই যুদ্ধে জয়পরাজয় নির্ভর ক'রে আসছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। কিন্তু তাঁরা দেখান দেখি, যে, ভারতবর্ষের সমুদয় ভারতীয় কাগজে বা কোন্ কোন্ কাগজে কোন্ কোন্ সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ায় জাভা প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, মালয়ে, সিঙ্গাপুরে, ব্রহ্মদেশে জাপানের জিত ও ব্রিটেনের পরাজয় হয়েছে? আমরা যত দূর জানি ও বুঝি এই সব স্থানে ব্রিটেনের পরাজয় ও জাপানের জয়ের কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে কিছু প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে তার সুদূর পরোক্ষ সম্পর্কও নাই।

—

সব ঠাণ্ডা কিন্তু…!

ব্রিটিশ ভারতের নানা প্রদেশে এবং অনেক দেশী রাজ্যেও এখনও (২রা অক্টোবর) নানা রকম উপদ্রব চলছে এবং মানুষও কোন কোন জায়গায় দুই-দশ জন খুন হচ্ছে। এগুলি সবই দুঃসংবাদ। এতে কোন পক্ষেরই লাভ নাই, সুবিধা নাই। অশান্তি ও উপদ্রব কমলেই মঙ্গল।

কিন্তু সংবাদ প্রকাশ অতিরিক্ত রকমে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় বুঝতে পারা যাচ্ছে না অবস্থার বাস্তবিক উন্নতি হচ্ছে কিনা। প্রায় দেখতে পাই, অনেক জায়গার এই বিষয়ের সংবাদ এই ব'লে আরম্ভ করা হয় যে, অবস্থা বেশ ভাল বা অবস্থার উন্নতি হয়েছে; কিন্তু তার পরেই এমন এমন অনেক সংবাদ থাকে যাতে এই অনুমান অনিবার্য্য হয় যে, বাস্তবিক অবস্থাটা এখনও খারাপই আছে—এমন কি, আশঙ্কা হয় যে, হয়ত ক্রমশই অবস্থা অধিক খারাপ হচ্ছে।

—

মিঃ এমারি বলেন, সব ভারতীয়ই স্বাধীনতা চায় !

ভারত-সচিব মিঃ এমারি জল্-জিয়ন্ত আছেন, ম'রে ভূত হন নি, সুতরাং তিনি যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব'লে ফেলেছেন যে, সব ভারতীয়ই স্বাধীনতা চায়—শুধু কংগ্রেসীরা নয়, তাকে ভূতের মুখে রামনাম ব'লে পরিহাস করা চলে না। রয়টার তাঁর বক্তৃতার যে রিপোর্ট টেলিগ্রাফ করেছেন, তার মর্ম্মানুবাদ নীচে দেওয়া গেল।

লণ্ডন, ৩০শে সেপ্টেম্বর

ক্যাক্সটন হলে গত ২৯শে সেপ্টেম্বর মিঃ এমারি "ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাতে তিনি বলেন—

ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্য ভারতের উপর ইংলণ্ড জোর ক'রে সম্প্রতি চাপিয়ে দেয় নি। এই শাসনব্যবস্থা দেড়শত হতে দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যখন অরাজকতা চলছিল এবং মাঝে মাঝে ফরাসী আক্রমণের বিপদ দেখা দিচ্ছিল, সেই সময় এক ব্রিটিশ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় এজেণ্টগণ কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করতে বাধ্য হন। পরিশেষে যখন ঐ কর্ত্তৃত্ব সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়, তখন পার্লামেণ্ট তার নিরাপত্তা ও শাসনকার্য্যের দায়িত্ব নিতে বাধ্য হন।

তথাপি ভারতে যাকে ব্রিটিশ শাসন বলা হয়, তা ভারতেরই নিজস্ব ব্যবস্থা। ব্রিটিশ নেতৃত্বে যে বিরাট কাঠামো গড়ে ওঠে তার প্রত্যেক অধ্যায়ে ভারতীয়রা শাসনকার্য্যে ও সৈন্যবাহিনীতে অংশ গ্রহণ করেছে। বর্ত্তমানে বড়লাটের শাসন পরিষদে ১৫ জনের মধ্যে ১১ জন সদস্য ভারতীয়। মোট প্রায় ১১ কোটি লোক অধ্যুষিত পাঁচটি বড় প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডলী ভারতীয় এবং তাহারা নির্ব্বাচিত ভারতীয় আইন-সভার নিকট দায়ী। মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেস দলের তথাকথিত হাইকম্যাণ্ড কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত করবার সিদ্ধান্ত না করলে অন্য ছয়টি প্রদেশেও ঐরূপ মন্ত্রিমণ্ডলী থাকত। শাসন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের অর্দ্ধেক এবং নিম্নতম কর্ম্মচারীদের অধিকাংশ ভারতীয়। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ এবং আয়তনের অর্দ্ধাংশ বরাবর ভারতীয় নৃপতিদের হাতে রয়েছে।

সমস্ত সম্প্রদায় ও শ্রেণীর ভারতীয়গণ, ব্রিটিশ ভারতের দলনেতাগণ ও দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ—সকল ভারতীয়ই চান যে, ভারতবর্ষ সমস্ত বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত হ'য়ে নিজেই নিজের শাসনকার্য্য চালাক।

অসুবিধা হচ্ছে এমন এক শাসনব্যবস্থা বের করা, যার দ্বারা ভারতের বহু বিচ্ছিন্ন ও পৃথক্ সম্প্রদায় একত্রে শাসনকার্য্য চালাতে পারবে, অথচ কোন এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারে অক্ষম হবে। প্রধানতঃ ভারতীয়গণকেই এই সমস্যা সমাধান করতে হবে। কোন শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দিলে, বিশেষতঃ ভারতের কোন একটি দল যদি বাকী ভারতবর্ষের উপর কোন শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেয়, তা হলে তা টিকতে পারে না।

অথচ মূলতঃ তাই মিঃ গান্ধী এবং তাঁর যে মুষ্টিমেয় সহযোগী কংগ্রেস দলের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন তাঁদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য তাঁরা ব্যাপক ধ্বংসাত্মক আন্দোলন আরম্ভ করবার সিদ্ধান্ত করেন। তাঁর উদ্দেশ্য অভ্যন্তরিক শাসনকার্য্য ও ভারত রক্ষার ব্যবস্থাকে পঙ্গু ক'রে গবর্ণমেণ্টকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। ঐ দাবীতে আত্মসমর্পণ করলে ভারতবর্ষের আশু সমর প্রচেষ্টাই শুধু ধ্বংস হবে না, ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা ও ঐক্যের সর্ব্বসম্মত ভিত্তি প্রতিষ্ঠার আশাও বিলুপ্ত হবে। দলগত ডিক্টেটরীর জন্য ভারতের কর্ত্তৃত্ব হস্তগত করবার বর্ত্তমান চেষ্টাকে পরাভূত করা যে কোন প্রকৃত শাসনতান্ত্রিক সমাধানের অপরিহার্য্য সর্ত্ত। সমাধান যে হবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। স্বদেশে অবাধ কর্ত্তৃত্বের অধিকারী ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট বহির্জ্জগৎ সম্পর্কে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হবেন, তাই এখন বিবেচনা করা যাক।

প্রথম সমস্যা হচ্ছে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষা। যুদ্ধের পর আমাদের পরাজিত শত্রুদের আক্রমণের মনোভাব ও সুসংগঠিত শক্তি নানা আকারে পুনরুজ্জীবিত হতে পারে; অস্ত্রবলের প্রস্তুতি ছাড়া আন্তর্জ্জাতিক শান্তি বজায় রাখা যাবে না। সে প্রস্তুতি মূলতঃ যান্ত্রিক হবে। সুতরাং তার ভিত্তি হবে অতি উন্নত শ্রমশিল্প। এজন্য প্রচুর অর্থনৈতিক সঙ্গতি ও রাজস্ব প্রয়োজন। এ যুদ্ধ প্রমাণ করেছে যে, ছোট দরিদ্র দেশগুলি বড় বড় শক্তির বিমান, ট্যাঙ্ক ও নৌবহরের সম্মুখে অসহায় এবং তাদের নিরপেক্ষতা অবলম্বনও মূর্খতা। তাদিগকে কোন সংঘ বা দলে থেকে ভবিষ্যতে বাঁচতে হবে। ভারতবর্ষের যে সঙ্গতি ও জনবল আছে, তাতে সে আভ্যন্তরিক শান্তি পেলে উপযুক্ত নেতৃত্বে একটা বড় শক্তির অনুরূপ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে তার সে অবস্থা মোটেই নাই। বহুকাল তাকে দেশ ও বাণিজ্য রক্ষার জন্য সমস্বার্থ অন্য কারও সহিত মৈত্রী বা সহযোগিতা রাখা দরকার। সেই সময়ে সে শ্রমশিল্প ও যন্ত্রবিদ্ গড়ে তুলবে। জীবনযাত্রা ও শিক্ষার মান উন্নত করাও দরকার। এ ক্ষেত্রেও ভারতের সঙ্গতি অনেক এবং কালক্রমে সে একাকী তার অর্থনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু তাও খুব সময়-সাপেক্ষ। বহির্ব্বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মূলধন উপযুক্তভাবে নিয়োজিত করার উৎসাহ দিয়ে সে দ্রুত ঐ কাজ নিষ্পন্ন করতে পারে।

এ বিষয়ে ভারতের নীতি কি হবে তা নির্ভর করবে বহির্জ্জগতের সাধারণ অর্থনৈতিক নীতির উপর। অনেকে মনে করেন যে, যুদ্ধের পর ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক আন্তর্জ্জাতিকতা পুনরুজ্জীবিত হবে। আমি তা মনে করি না। বহির্ব্বাণিজ্য জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত হবে; দেশরক্ষা ও সমাজমঙ্গল প্রধান বিবেচনার বিষয় হবে। ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অর্থনৈতিক সহযোগিতার পরিবর্ত্তে জাতিতে জাতিতে সহযোগিতা স্থাপিত হবে। আমরা জার্ম্মাণীকে এবং আমেরিকানরা জাপানকে সমরোপকরণ সরবরাহ করেছি ও করেছে। সম্ভাব্য বা প্রায় নিশ্চিত শত্রু জেনেও তার সঙ্গে ব্যবসা করে যারা জিনিষ সরবরাহ করবে, ভবিষ্যতে জাতি তাদিগকে সহ্য করবে না। জাতিতে জাতিতে আত্মরক্ষার জন্য যেমন পারস্পরিক সহযোগিতা হবে, তেমনি সাধারণ মঙ্গলের জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা হবে। সুতরাং ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিকগণও ঐ নীতি অবলম্বন করতে চাইবেন।

এ কোথায় পাওয়া যেতে পারে? এই প্রশ্নের জবাব দিতে হ'লে ভারতের আত্মরক্ষা ও বাণিজ্যের দিক হতে তার ভৌগোলিক অবস্থানের কথা বিচার করলেই চলবে না, জাতির সংস্কৃতিগত ধারা ও ঐতিহাসিক পরিবেশও জানতে হবে।

ভৌগোলিক বিচারে যে বিরাট [ইউরেশিয়া] মহাদেশের পশ্চিমভাগ ইউরোপ নামে অভিহিত, তারই দক্ষিণভাগ ভারতবর্ষ। আরও বড় কথা এই যে, ভারতমহাসাগর অর্দ্ধাবৃত্তাকারে যে দেশগুলি ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাদের মধ্য অংশটি এই ভারতবর্ষ। এশিয়ার অভিমুখে তার পশ্চাদ্ভাগ, তার সম্মুখভাগ দক্ষিণমুখী। সমুদ্রপথ সৃষ্টির পর কি বাণিজ্য কি দেশরক্ষার ব্যাপারে এশিয়ার সহিত সংযোগ রক্ষা অপেক্ষা সমুদ্রপথে

যোগাযোগ রক্ষাই বড় কথা হয়ে দাঁড়ায়। বাণিজ্য ও সামরিক অভিযানের পক্ষেও ভারতের পর্ব্বতসীমান্ত মহা অসুবিধার কারণ হয়ে পড়ে। তার দীর্ঘ উপকূল উভয় বিষয়ের পক্ষেই অনুকূল।

দেশরক্ষা ও বাণিজ্যের দিক হতে ভারতমহাসাগর ও তার প্রবেশদ্বার কেপটাউন, সুয়েজ, সিঙ্গাপুর ও ডারুইনে যার বা যাদের কর্তৃত্ব থাকবে, তার বা তাদের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষাই ভারতের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

প্রাচীন কালে ভূমধ্যসাগর তার আশপাশের দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ রক্ষা করত। বাণিজ্য ও দেশরক্ষার দিক হতে ভারতমহাসাগরও সেরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জাগতে পারে।

হাঁ, কেউ বলতে পারেন, ইউরোপ, দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক কি? ভারতবর্ষ এশিয়ার অংশবিশেষ এবং ইহার একমাত্র ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হচ্ছে—এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য; সুতরাং চীন ও জাপানের দিকেই ভারতবর্ষের স্বাভাবিক ঝোঁক দেখা দিবে।

আমার মনে হয়, এরূপ মনে করলে প্রচণ্ড ভুল হবে। "এশিয়াবাসী" ব'লে প্রকৃত পক্ষে কিছুই নাই; এবং প্রাচীন পৃথিবীর জাতি ও সংস্কৃতিগত ভাগ-বিভাগের দিক হতে ভারতের জাতিগত মূলোৎপত্তি, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ এবং ভাবধারা আলেকজান্দারের আমল হতে বহু শতাব্দীব্যাপী ইসলাম সম্প্রদায়ের ক্রমপ্রবেশ ও পরবর্ত্তী দুই শতাব্দীর ব্রিটিশ প্রভাবের মধ্য দিয়ে সুদূর প্রাচ্যের মোগল জাতির ইতিহাস ও দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য অপেক্ষা ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

সর্ব্বোপরি, ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের দ্বারা ইংরেজীকে সাধারণ বাহনরূপে ব্যবহার করার কথা তো আছেই, তা ছাড়া ভারতের আইন ও রাজনৈতিক চিন্তার উপর ব্রিটিশ প্রভাবের জন্য ব্রিটিশভাবাপন্ন দেশের সহিত ভারতীয়দের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা অনেক সহজ ও স্বাভাবিক। এ ছাড়া বর্ত্তমান দেশরক্ষা ও শাসন ব্যবস্থায় যে যোগাযোগ রয়েছে, তা বিচ্ছিন্ন করার অসুবিধাটাও ভাবতে হবে। কাজের সুবিধার দিক হতেও ভারতবর্ষের পক্ষে নিজের পায়ে দাঁড়াবার পূর্ব্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হবে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সহিত সংস্রব রক্ষা করা।

আমাদের দ্বীপ রক্ষার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি হতে ভাবতে গেলেও দেখা যায়, ভারতবর্ষের বিপদের সময় সাহায্য করতে গেলে আমাদের দেশরক্ষা ব্যবস্থা ও পররাষ্ট্র নীতির উপর যে চাপ পড়বে, ভারতবর্ষের সামরিক বা ভারতবর্ষে আমাদের বাণিজ্যের সুবিধা দ্বারাও তার ক্ষতিপূরণ হবে না। সেদিক হতেও ভারতের সহিত আমাদের সংযোগ রক্ষা ভারস্বরূপ হবে। সুতরাং কাজের দিক হতেও বলা চলে যে, আমরা তার হাত হতে নিষ্কৃতি পেতে চাই।

পক্ষান্তরে দক্ষিণাংশে ব্রিটিশ ভূখণ্ড ও মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতির বৃহত্তর স্বার্থের দিক হতে বলা চলে, ভারতবর্ষ কমনওয়েলথের অন্যতম অংশীদারস্বরূপে সাম্য রক্ষা করবে এবং পরিণামে প্রাপ্তির অনুপাতে তার দেয় চুকাইয়া দিবে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠে এরূপ কমনওয়েলথের প্রতিষ্ঠা ও পরিপুষ্টির সত্যই কি কোন মূল্য আছে? প্রত্যুত্তরে বলা যায়, কোন প্রভু-রাষ্ট্রের আওতায় এরূপ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত নয়; ফেডারশনের মত অপরিবর্ত্তনীয় গঠন ও কোন দেশের স্বার্থত্যাগের কথাও এতে নাই। সাধারণ লক্ষ্য ও পারস্পরিক সৌহার্দ্দ্যের দিক হতেই এরূপ চেষ্টার নিশ্চয়ই মূল্য আছে। এই দিকে, একমতাবলম্বী স্বাধীন জাতিসমূহের লীগ প্রতিষ্ঠায়ই না ভবিষ্যৎ "নববিধানের" সন্ধান মিলবে? রয়টার

এমারি সাহেবের এই দীর্ঘ বক্তৃতায় অনেক সত্য ও ভাল কথার সঙ্গে অনেক অর্ধসত্য অর্ধমিথ্যা কথা আছে, এবং কোন কোন ভ্রান্ত ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক মতের আভাস ও অবতারণা আছে। বিবিধ প্রসঙ্গে সেই সমুদয় বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা হ'তে পারে না। তাঁর প্রধান প্রধান কয়েকটা কথার আলোচনা ও জবাব বর্তমান সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গেই অন্যত্র আছে এবং আগেকার অনেক সংখ্যাতেও আছে। পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপনের ইতিহাস ও কারণ তিনি যেমন বলেছেন, ঠিক তেমন নয়। সেই সময়ে ভারতের সর্বত্র অরাজকতা ছিল, এ কথা সত্য নয়।

"এসিয়াবাসী ব'লে প্রকৃতপক্ষে কিছু নাই।" এ বড় অদ্ভুত কথা। ভৌগোলিক দিক্ থেকে এশিয়ার লোকরা ইয়োরোপের লোকদের থেকে আলাদা ত বটেই—সে কথা বলছি না; বলছি এই যে, এশিয়াবাসীদের কিছু প্রকৃতিগত ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যও আছে। অবশ্য, সমগ্র মানবজাতির প্রকৃতিগত ও সংস্কৃতগত সাদৃশ্য ও ঐক্য যা আছে, এই উক্তির দ্বারা তা অস্বীকার করা হচ্ছে না।

এমারি সাহেব বলতে চান এবং সেই রকম ইঙ্গিত করেছেন যে ভারতবর্ষের লোকদের সহিত ইংরেজ ও অন্য কোন কোন ইয়োরোপীয়দের উৎপত্তিগত সংস্কৃতিগত প্রকৃতিগত ঐক্য বা সাদৃশ্য তাদের সহিত অন্যান্য এশিয়াবাসীদের সহিত তদ্রূপ ঐক্য ও সাদৃশ্যের চেয়ে বেশী। ইয়োরোপের লোকদের সঙ্গে আমাদের উৎপত্তিগত সংস্কৃতিগত ও প্রকৃতিগত আংশিক সাদৃশ্য ও ঐক্য আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু ভারতবর্ষের বিস্তর লোকের যে মোঙ্গোলীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, তাও অস্বীকার্য্য নয়। এবং এটাও কোন জ্ঞানী ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদ্ অস্বীকার করতে পারেন না, যে, ভারতবর্ষ পুরাকালে ও পুরাকাল থেকে এ পর্য্যন্ত এশিয়া ভূখণ্ডকে—বিশেষতঃ তার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশকে—খুব প্রভাবিত করেছে এবং নিজেও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সেই সব কারণে আমাদের মনে হয় যে, ভারতবর্ষের সঙ্গে চীন প্রভৃতির সন্ধি পাশ্চাত্য দেশ সকলের সহিত সন্ধির চেয়ে বেশী স্বাভাবিক হবে। বের্ট্রাণ্ড রাসেলও তা স্বীকার করেন। অবশ্য, তার মানে পাশ্চাত্য দেশসমূহের সহিত শত্রুতা নয়।

চীন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউগিনি প্রভৃতি যে-সব দেশ, মহাদ্বীপ ও দ্বীপের উপকূল প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বারা ধৌত, ভারতবর্ষ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে তাদের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে, তা জানতে হ'লে ডাঃ

কালিদাস নাগ-বিরচিত ইণ্ডিয়া এণ্ড দি প্যাসিফিক ওয়ার্লড্ ("India and the Pacific World") গ্রন্থ পঠনীয়।

—

লণ্ডনে ইণ্ডিয়া লীগের সভায় ভারতের স্বাধীনতা দাবী

লণ্ডন, ১লা অক্টোবর

বুধবার রাত্রে লণ্ডনে ইণ্ডিয়া লীগের এক সভায় এই দাবী করা হয় যে ভারতের স্বাধীনতা ও জাতীয় গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী স্বীকার ক'রে অবিলম্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সেই ভিত্তিতে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করা হোক। পার্লামেণ্টের শ্রমিক দলের সদস্য মিঃ আর ডবলিউ সোরেনসেন কর্তৃক উত্থাপিত এক প্রস্তাবে এই ব'লে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে যে, গত আট সপ্তাহে ভারতে গোলযোগ দমন করতে গিয়ে জনসাধারণের উপর ২৩৪ বার গুলীবর্ষণ করা হয়েছে এবং বিমান হ'তে লোকের উপর মেসিনগান চলেছে। ইণ্ডিয়া লীগের সেক্রেটারী মিঃ ভি কে কৃষ্ণ মেনন বলেন যে ভারতের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার ক'রে যদি তাহাকে স্বাধীন জাতির গবর্মেণ্ট দেওয়া যায় তবে এখনও নিষ্পত্তি হ'তে পারে। পার্লামেণ্টে মিঃ চার্চিল যে বক্তৃতা দিয়েছেন প্রস্তাবে তার নিন্দা করা হয়। মিঃ মেনন আরও বলেন যে বড়লাটের শাসন পরিষদকে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট বলা যায় না, কেন-না তা জনসাধারণের কাছে দায়ী নয়।—রয়টার

—

পার্লেমেণ্টে নূতন ভারতীয় আইন

লণ্ডন, ২০শে সেপ্টেম্বর

অদ্য কমন্স সভায় ভারত ও ব্রহ্ম (সাময়িক ও বিবিধ বিষয়ক) বিল পেশ করা হয়। বিলের প্রথম পাঠ গৃহীত হয়। এই বিলে ভারতের ৭টি "কংগ্রেসী" প্রদেশে বর্ত্তমানের অস্থায়ী ব্যবস্থা যুদ্ধের পরেও ১২ মাসকাল কায়েম করবার বিধান আছে। তবে পার্লামেণ্ট মধ্যে মধ্যে এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন। এতে জরুরী অবস্থায় আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কোন ব্যক্তির প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করবার ক্ষমতাও সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে ঐ মৃত্যুদণ্ডাদেশ কোন হাইকোর্ট বা হাইকোর্টের কোন জজের দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই। ব্রহ্ম গবর্মেণ্ট ভারতে স্থাপিত হওয়ায় তজ্জন্যও কয়েকটি বিধান রচনা করিয়া এই বিলে সংযোজিত করা হয়েছে।

বিলের ভারত সংক্রান্ত অধ্যায়ে সরকারী কর্ম্মচারীদের কেন্দ্রীয় আইন-সভার সদস্য হবার বাধা অপসারণের জন্য কেন্দ্রীয় আইন সভাকে ঘোষণা করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা না থাকায় যুদ্ধকালীন নিয়োগাদির ব্যাপারে গবর্মেণ্টের অসুবিধা হচ্ছিল।—রয়টার

এখন যুদ্ধকালে নূতন আইন হ'তে পারে না ব'লে গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষকে স্ব-শাসন অধিকার এখন দিতে অস্বীকৃত ; কিন্তু তাঁদের নিজের গরজ থাকলে আগেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আইন ও আইনের সংশোধন এই যুদ্ধকালেই হয়েছে এবং এখনও হ'চ্ছে !

—

পার্লেমেণ্টে কয়েকটা প্রশ্নের এমারি সাহেবের উত্তর

লণ্ডন, ১লা অক্টোবর

বন্দী কংগ্রেসসেবীদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য আইনসঙ্গত সুবিধা চেয়ে ভারতে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানসমূহ মিঃ আমেরীর নিকট কোন আবেদন জানিয়েছেন কি না—এ প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব আজ কমন্স সভায় বলেন যে, তাঁর নিকট কেউ আবেদন করেন নি। (১) পণ্ডিত নেহরু কোথায় কি ভাবে আছেন এবং তাঁকে বাইরের চিঠিপত্রাদি দেওয়া হয় কি না—এ প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আমেরী আরও বলেন—"পণ্ডিত নেহরুকে পারিবারিক ব্যাপার সম্পর্কে তাঁর পরিবারের লোকজনদের চিঠিপত্রাদির আদানপ্রদান করতে দেওয়া হয়। সম্প্রতি তিনি কোথায় আছেন আমি সেকথা প্রকাশ করতে প্রস্তুত নই।"

পণ্ডিত নেহরু পূর্ব্ব-আফ্রিকায় কি না এবং ভারতের বহু বিশিষ্ট অকংগ্রেসী রাজনীতিবিদ্ যে কোন আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে ইচ্ছুক মিঃ আমেরী একথা অবগত আছেন কি না—মিঃ সোরেনসেনের (শ্রমিক) এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আমেরী বলেন যে, বর্তমান মুহূর্তে কংগ্রেসের নেতাদের যোগাযোগ স্থাপিত হ'লে কোন মীমাংসা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন না। (২) মিঃ আমেরী আরও বলেন যে, পণ্ডিত নেহরু ভারতেই আছেন। (২)

ভারতে উচ্ছৃঙ্খল জনতার উপর বিমান থেকে মেশিনগানের গুলী-বর্ষণ সম্পর্কে তথ্যাদি জিজ্ঞাসিত হয়ে এবং এরূপ পন্থা যাতে ভবিষ্যতে আর অবলম্বন করা না হয় তার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়ে মিঃ আমেরী বলেন,—"সাম্প্রতিক গোলযোগে পাঁচ জায়গায় জনতার উপর বিমান থেকে মেশিন-গানের গুলীবর্ষণ করা হয়েছে এবং গত ১৮ই সেপ্টেম্বর বিহারে একটা বিমান-দুর্ঘটনায় বিমানচালক মারা গেলে বিমানের অন্যান্য আরোহিগণ এক জনতা কর্তৃক নিহত হওয়ার পর পুনরায় এ ভাবে গুলীবর্ষণ করা হয়েছে বলে গত সপ্তাহে ভারতীয় আইন-সভায় যে সরকারী বিবৃতি দেওয়া হয়েছে এবং যে খবর এদেশেও প্রচারিত হয়েছে তদতিরিক্ত আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। রেলওয়ের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হওয়ায় অথবা বন্যার জন্যে যে সকল অঞ্চলে স্থলপথে সৈন্য প্রেরণ করা সম্ভব হয় নি, সে সকল অঞ্চলে ধ্বংসমূলক কার্য্যকলাপ বন্ধ করার জন্যে বিমান ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়েছিল। ভারতের অবস্থার গুরুত্ব এখনও এদেশে সম্পূর্ণরূপ সকলে উপলব্ধি করতে পারেন নি। (৩) ভারত গবর্ণমেণ্ট এ অবস্থায় শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। এ বিষয়ে বড়লাটের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমি হস্তক্ষেপ করতে প্রস্তুত নই।"

ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উহার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবেন না, সর্ সুলতান আমেদ যে বিবৃতি দিয়েছেন তৎসম্পর্কে মিঃ আমেরী বলেন যে, সর্ সুলতান আমেদ যে অবস্থার কথা বলেছেন দুর্ভাগ্যবশতঃ অদূরভবিষ্যতে সেরূপ অবস্থা দেখা দেবে বলে মনে হয় না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বারংবার যে নীতি ঘোষণা করেছেন সর্ সুলতান আমেদ সর্ব্বভারতীয় জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্যে সেই নীতি অনুসারেই কয়েকটি অবশ্যপালনীয় সর্ত্তের উল্লেখ করছেন। (৪)

মিঃ আমেরী আরও বলেন,—"ভারতের জন্যে সর্ব্বসম্মত কোন গঠনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠিত হলেও বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে চূড়ান্ত দায়িত্ব পার্লেমেণ্টেরই থাকবে।" (৫)

—রয়টার

(১) ভারতবর্ষটা তা হ'লে একটা বৃহৎ অরণ্য এবং ভারতের "প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ" এই

মহারণ্যে রোদন করছেন—তাঁদের ক্রন্দন ভারতের মা-বাপ ভারত-সচিবের কাছে পৌঁছচ্ছে না।

(২) কোন মীমাংসা কেন সম্ভব হবে না? নিশ্চয়ই সম্ভব। সোজা কথায় বলুন না, "আমরা কোন মীমাংসা চাই না, ভারতের প্রভু সর্বেসর্বাই থাকতে চাই।"

(২) কর্তা একবার বললেন পণ্ডিত নেহরু কোথায় আছেন বলতে প্রস্তুত নই, পরে বললেন ভারতেই আছেন। ঠিক জায়গাটা বললে কেউ কি তাঁর উদ্ধার সাধন করতে যাবে? না, তিনি পালাতে চান এবং তাতে কেউ সাহায্য করতে যেতে চায়? যত অনাসৃষ্টি সন্দেহ ও আশঙ্কা!

(৩) "ভারতের অবস্থার গুরুত্ব এখনও এদেশে সম্পূর্ণ রূপে সকলে উপলব্ধি করতে পারেন নি।" স্বয়ং কর্তা এখন পেরেছেন ত? আগে ত অবস্থার গুরুত্ব মানতেই চান নি।

(৪) বাঁচা গেল! আমরা ভাবছিলাম, এত বড় একটা আশার কথা বলবার ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকার সব্ সুলতান আহমদকে এমন অসাধারণ মহানুভবতা পূর্বক কেমন ক'রে দিয়ে ফেললেন!

(৫) বিলাতী কর্তারা "ভারতের জাতীয় গবর্মেণ্ট" কথাগুলা কি অর্থে ব্যবহার করেন, বোঝা গেল!

—

চৈনিক মুসলমান নেতার স্বাজাতিকতা ও স্বদেশপ্রেম

গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে চীনের ইস্‌লামিক ফেডারেশনের প্রতিনিধি চৈনিক মুসলমান মিঃ ওসমান উ লাহোরে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নিকট বলেন:—

"চীনের পাঁচ কোটি মুসলমান ভারতের স্বাধীনতা দাবীর প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন। যখন চীন সামগ্রিক যুদ্ধ চাইছে, তখন ভারতের জনগণ ও ভারত-সরকারের মধ্যে সংঘর্ষ বড়ই দুঃখের বলে তারা মনে করে। আমি পাকিস্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে মোটেই চাই না; কেন-না তা ভারতীয় মুসলমানদের ব্যাপার। কিন্তু চীনের মুসলমানেরা তাদের দেশের ব্যবচ্ছেদের কথা চিন্তা করতেই পারে না এবং তারা সম্প্রদায়গত লাভলোকসান না খতিয়ে সমগ্র দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত মৃত্যুবরণ করছে। চীনে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান একেবারেই নাই। মুসলমানের কল্যাণের জন্য সমগ্র দেশে মসজিদ রয়েছে, আর অন্যেরাও ধর্ম্ম সম্পর্কিত দাবীদাওয়া সম্পর্কে মাথা ঘামায় না। জাতীয়তাই সকলের জীবনের মূলমন্ত্র এবং জেনারেল চিয়াং কাই-শেকই তাদের একমাত্র নেতা ও পথপ্রদর্শক।"

—

ছাত্রছাত্রীদের ধর্ম্মঘট

আমরা কোন কালেই ছাত্রছাত্রীদের ধর্মঘট সমর্থন করি নি—বিশেষতঃ তাঁদের রাজনৈতিক ধর্মঘট। তাঁরা আমাদের কথায় কান না দিতে পারেন; কিন্তু গান্ধীজীর কথা শোনা উচিত। যে-সব ছাত্রছাত্রী ধর্মঘট করছেন, তাঁরা সবাই ইংরেজী জানেন। তাঁরা গান্ধীজীর নিম্নোদ্ধৃত ইংরেজী কথাগুলি পড়বেন।

1. Students must not take part in party politics. They are students, searchers, not politicians.

2. They may not resort to political strikes. They must have their heroes, but their devotion to them is to be shown by copying the best in their heroes, not by going on strikes if the heroes are imprisoned or die or are even sent to the gallows. If their grief is unbearable and if all the students feel equally, with the consent of their Principals, schools or colleges may be closed on such occasions. If the Principals will not listen, it is open to the students to leave their institutions in a becoming manner till the managers repent and recall them. On no account may they use coercion against co-operators or against the authorities. They must have the confidence that, if they are united and dignified in their conduct, they are sure to win.—*Constructive Programme—Its Meaning and Place.*

—

"আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ"

আজ ১৬ই আশ্বিন সকাল বেলাকার ডাকে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে বিশ্বভারতী কার্যালয় থেকে কি একখানি বই এসেছে, তখন খুলে দেখি নি। পরে খুলে দেখি, শ্রীমতী রাণী চন্দর লেখা "আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ"। আগামী কালই বিবিধ প্রসঙ্গ লেখা শেষ করতে হবে। কাজেই মনের উপর জোর করে বইটি পড়া বন্ধ রাখলাম। তবু আন্দাজ এক পৃষ্ঠা পড়ে ফেললাম।

দেখছি, গত কয়েক বৎসর আলাপ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে সব কথাবার্তা আলোচনাদি ক'রেছিলেন এই বইটিতে শ্রীমতী রাণী চন্দ তারই কিছু সাধারণের গোচর করেছেন। বইটি পড়ে আবার এর বিষয় কিছু লিখব। এখন এর বিষয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীমতী রাণীকে যা লিখেছিলেন এবং যা বইটির গোড়ার একটি পাতায় মুদ্রিত হয়েছে, তাই উদ্ধৃত ক'রে আপাততঃ বক্তব্য শেষ করি।

"রবিকাকার সঙ্গে তোমার আলাপচারীগুলি পড়তে পড়তে যেন রবিকাকারই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেম, তাঁকে দেখতেও পেলেম সুস্পষ্ট। এই বই তো ছাপা হবেই—আমাকে দিতে ভুলো না। তুমি কি মন্ত্রে লেখা দিয়ে এই অঘটন ঘটাও—ফিরে এনে দাও হারানো মানুষকে ভাবতে আমি অবাক হই। তোমার ছবি আঁকার চেয়ে এ যে কম জিনিষ নয় তা বুঝবে কবে। এই তোমার লেখা যিনি লিখিয়ে গেছেন তাঁর নামে এই বই চলবে কোনো ভাবনা নেই।"

—

"স্বরবিতান"

বাংলা দেশে ও বংলার বাইরে যেখানেই বাঙালীর

বাস সেইখানেই রবীন্দ্রনাথের গানের আদর। কিন্তু অনেক জায়গায় তাঁর গান বিকৃত সুরে গীত হ'তে শুনে কান ঝালাপালা হয়েছে। তাঁর গানগুলির আসল সুর যা তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া আবশ্যক। এই জন্য "স্বরবিতান" পঞ্চম খণ্ড হাতে আসায় খুশি হয়েছি। অন্যান্য খণ্ডের মত এটিরও খুব প্রচার হবে আশা করি। এতে চুয়ান্নটি গানের স্বরলিপি আছে। অধিকাংশ গানের স্বরলিপি স্বর্গত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত। সম্পাদন করেছেন শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

—

"বৈকুণ্ঠের খাতা"

"রবীন্দ্র-রচনাবলী" যেমন বেরচ্ছে, তেমনি দরকার মত কবির বইগুলিও, যখন যেটির একটি সংস্করণ ফুরিয়ে যাবে, আলাদা আলাদা মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক, অনেক আগে একথা লিখেছিলাম মনে পড়ছে তাঁর একখানি বইয়ের নূতন সংস্করণ দেখে খুশি হয়ে। "বৈকুণ্ঠের খাতা"র নূতন পুনর্মুদ্রণ দেখে সে কথা আবার মনে পড়ে গেল। আর মনে পড়ল এর এক বারকার অভিনয় জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ভবনে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেজেছিলেন বৈকুণ্ঠ। কি চমৎকার তাঁর অভিনয়! অজিতকুমার চক্রবর্তী সেজেছিলেন অবিনাশ। উভয়েই এখন পরলোকে, চিত্রশিল্পী অসিতকুমার হালদার সেজেছিলেন তিনকড়ি, এবং দেখিয়েছিলেন ছবি আঁকতে তাঁর যেমন দক্ষতা আছে, অভিনয়েও সেই রকম নৈপুণ্য আছে। আর, ঈশান সেজেছিলেন একটা হাতকাটা ফতুয়া প'রে: শিশিরকুমার দত্ত। খাসা মানিয়েছিল, এবং কথাবার্তাও যেমনটি হওয়া চাই সেই রকম হয়েছিল।

—

লজ্জাবতী বসু

পরমভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা ও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের ছোট মাসী শ্রীযুক্তা লজ্জাবতী বসু গত ৪ঠা ভাদ্র পরলোকগমন ক'রেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স কম বেশি ৭০ বৎসর হ'য়ে থাকবে। তিনি চিরকুমারী ছিলেন। অনেক বৎসর পূর্বে তাঁর মনোজ্ঞ ছোট ছোট কবিতা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হ'ত। তিনি তাঁর পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট ইংরেজী ভাষাও বেশ শিখেছিলেন। তিনি শেষ বয়স পর্য্যন্ত বিশেষ বিদ্যানুরাগিণী ছিলেন। অনেক সময়ই পাঠে নিমগ্ন থাকতেন। বার্দ্ধক্যে জীর্ণদেহ হলেও তিনি স্বাবলম্বিনী ছিলেন। দেওঘরে তাঁর পিতৃভবনটিতে এক সময় বঙ্গের কত সুধী মনীষী ভক্তের সমাগম হ'ত। সেটি ঋণে পরহস্তগত ও প্রায় ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছিল।

—

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সপ্ততিপূর্তি

গত আগষ্ট মাসে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষে সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে তাঁর সম্বর্দ্ধনা হবার কথা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে, এবং তাঁর পারিবারিক নিদারুণ শোকের জন্যও, সে সম্বর্ধনা হ'তে পারে নি। তবু যে পূর্ণিমা-সম্মিলনীর মত কোন কোন সমিতি জাতির এই কর্তব্যটি করেছেন, এ খুব আনন্দের বিষয়। শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ শুধু যে ইয়োরোপ থেকে ভারতীয়দের চোখ ফিরিয়ে স্বদেশের দিকে আকৃষ্ট করেছেন, তা নয়; তিনি যে কোন প্রাচীন ভারতীয় চিত্রাঙ্কন রীতি নকল ক'রে তার পুনঃপ্রবর্তন করেছেন, তাও নয়। তিনি নিজের প্রতিভাবলে নিজের রীতি উদ্ভাবন করেছেন এবং তাকে প্রাণবান্ করেছেন। তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যগণকে তিনি তাঁর রীতির অনুকরণ করতে উৎসাহ ত দেনই নাই, বরং প্রত্যেককে নিজ নিজ পথে চলতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। তাতে ভারতীয় চিত্রাঙ্কন-জগতে বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতা উপস্থিত হয় নি। সকল মানুষের মনের একটি মৌলিক ঐক্য আছে। তার প্রভাবে নূতন ভারতীয় চিত্রাঙ্কন-রীতিতেও, ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর রীতিতে অবান্তর প্রভেদ সত্ত্বেও, একটি সাধারণ সাদৃশ্য গড়ে উঠেছে।

অবনীন্দ্রনাথ যদি চিত্রাঙ্কন-জগতে যুগান্তর উপস্থিত না করতেন, তা হ'লে সাহিত্যিক ব'লে তাঁর খ্যাতি আরো বেশি হ'ত; কারণ তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা এবং কৃতিত্বও কম নয়। কিন্তু শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতিকে ঢেকে ফেলেছে।

সর্বোপরি মানুষ অবনীন্দ্রনাথকে ভুললে চলবে না। সরল, আমায়িক, স্বাধীনচিত্ত অথচ নম্র, অ-যশঃপ্রার্থী এই মানুষটি বাঙালী জাতির অন্যতম গৌরব।

—

ভবসিন্ধু দত্ত

"তত্ত্বকৌমুদীতে দেখিলাম,

"বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর দিল্লী নগরীতে ব্রহ্মসমাজের কর্ম্মী ও সেবক ভবসিন্ধু দত্ত হঠাৎ ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি এক সময় অভিষিক্ত প্রচারক, কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর অন্যতম

আচার্য্য, ও কর্ম নির্বাহক সভার সভ্য ছিলেন। তাহা ব্যতীত সংগীত সংকীর্ত্তন দ্বারাও তিনি দীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন।"

তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি জীবনচরিত রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন। কর্ম্মজীবনের প্রথম অংশে তিনি শিক্ষক ছিলেন। তিনি সুবক্তা ও সুগায়ক ছিলেন।

—

অখিল-বঙ্গ কায়স্থ সম্মেলনে সভাপতির বক্তৃতা

সম্প্রতি অখিল-বঙ্গ কায়স্থ সম্মেলনের যে অধিবেশন হ'য়ে গেছে তার সভাপতি কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন :—

আমাদের জন্মগত অধিকারের কথা কোন সময়েই ভুললে চলবে না। জাতীয় স্বাধীনতার কথা ভুললে আমরা প্রত্যবায়ভাগী হব। আমার ভরসা আছে, যুব-সম্প্রদায় বর্তমান সঙ্কটের পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হবেন। কিন্তু তার জন্যে সদাচারের প্রয়োজন। ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ, অন্তর্গণিক বিবাহ প্রভৃতি যে যে উপায়ে আমাদের বল ও সংহতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা আজ সেগুলিকে সাগ্রহে গ্রহণ করতে হবে। প্রথমতঃ, রাউ কমীটি হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধে যে বিল এনেছেন তাঁর দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধ বিস্মৃত না হলে বৃহত্তর স্বার্থ বজায় থাকবে না। বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে যা প্রয়োজন এই সঙ্কট মুহূর্তে তার কোনটাই ভুললে চলবে না।

সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে বর্তমানে যে প্রার্থনা নিয়ত উচ্চারিত হচ্ছে, সে প্রার্থনা বিশ্বমানবের মঙ্গল খোঁজে না, সে খোঁজে নিজের মঙ্গল, পরিজনের মঙ্গল বা দলের মঙ্গল। এই হীনতার ফলে আমাদের বর্তমান দুর্দ্দশা। যদি আমাদের কোন সুন্দরতম জগৎ গড়বার স্বপ্ন থাকে, তা হ'লে স্বার্থের নির্লজ্জ সংঘাতকে নির্ব্বাসিত ক'রে বিশ্বপ্রীতির মন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটাই বর্তমান মনীষিগণের অনুমোদিত জগৎ—আদর্শ। ভারতবর্ষ তার ব্যতিক্রম নয়। বরং এই নীতির পরাকাষ্ঠা এককালে ভারতবর্ষেই দেখা গিয়েছিল। যদি জগতে কোন শুভ যুগের উদয় হয় এবং সেই সময় এ নীতির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার জন্যে ভারতের ডাক পড়ে আমরা যেন তখন আত্মবিস্মৃত না থাকি। আমাদের সমাজের সম্মুখে একটা মহৎ পরীক্ষার দিন আসছে। সেদিন পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হতে হ'লে এখন থেকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনাগত যুগের জন্যে আমাদিকে প্রস্তুত হ'তে হবে। এর জন্যে প্রয়োজন শিক্ষা ও প্রচার কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন এমন একটি আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন মনের, যে-মন কখনও অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না, সমাজের আবর্জ্জনা দূরীকরণের জন্যে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হবে না।

বাংলা দেশের কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী ক'রে উপবীত গ্রহণাদি করবার অনেক আগে আগ্রা-অযোধ্যার কায়স্থেরা তা ক'রেছিলেন। বাহ্য ক্রিয়াকলাপে তাঁরা দ্বিজের মত আচরণ তখন থেকে ক'রে আসছেন। কিন্তু "ক্ষত্রিয়াচার" গ্রহণ করলেও ক্ষাত্রধর্ম অবলম্বন ক'রে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য করার দিকে তাঁদের দৃষ্টি কতটা আছে বলতে পারি না। বাংলা দেশের মত বিহার ও আগ্রা-অযোধ্যার কায়স্থরাও খুব প্রভাবশালী সম্প্রদায়। এই জন্য ক্ষাত্রধর্ম ও ক্ষাত্র কর্তব্যের কথা বললাম। আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলি। অনেকে বলেন, এবং ক্ষত্রিয়াচারী কোন কোন বিদ্বান্ কায়স্থও এই দাবী ক'রেছেন যে, উপনিষদের ব্রহ্মবাদের স্রষ্টা ও উপদেষ্টা রাজর্ষি জনকের মত ক্ষত্রিয়েরা, ব্রাহ্মণেরা নহেন। কায়স্থদের মধ্যে যাঁরা এই মতাবলম্বী, তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মবাদের চর্চা ক'রে ব্রহ্মবাদী ক'জন হ'য়েছেন জানি না। কায়স্থদের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ব্রহ্মবাদের অনুশীলন করতেন ও ব্রহ্মবাদী ছিলেন, জানি; অন্য কারো কথা অবগত নই। যাগযজ্ঞ হোম করা সহজ—পয়সা থাকলেই করা যায়, করান যায়; কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মবাদ উপলব্ধি ক'রে ব্রহ্মবাদী হওয়া কঠিন।

কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ তাঁর অভিভাষণে রাউ কমীটি কর্তৃক উপস্থাপিত হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধীয় বিলের প্রতি সম্মেলনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তারই ফলে বোধ হয় সম্মেলন নিম্নমুদ্রিত প্রস্তাব ধার্য করেছেন :—

৬। ডাঃ দেশমুখ কর্তৃক উপস্থাপিত সগোত্র বিবাহ বিল, পিতৃবংশের ও শ্বশ্রূবংশের সম্পত্তি প্রভৃতিতে 'হিন্দু' নারীগণের বিশেষ অধিকার সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত এবং হিন্দুর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যে সকল নূতন নূতন বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আনীত হইয়াছে এই সম্মেলন তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন।

সগোত্র বিবাহ বিল সম্বন্ধে এখানে কোন আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু "পিতৃবংশের ও শ্বশ্রূবংশের সম্পত্তি প্রভৃতিতে হিন্দু নারীগণের" যে অধিকার এখন বাংলা দেশে স্বীকৃত হয়, তার চেয়ে বেশী কিছু অধিকার হিন্দু নারীগণকে দেওয়া উচিত নয় ব'লে কি অখিল-বঙ্গ কায়স্থ সম্মেলন স্থির ক'রেছেন? ডাঃ দেশমুখের বিলে অনেক খুঁৎ থাকতে পারে। কিন্তু শুধু তার প্রতিবাদ করাই কি যথেষ্ট? আর কিছু করণীয় নাই?

বিশ্বপ্রীতির মন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বমঙ্গল প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ যা বলেছেন তাতে তাঁর সঙ্গে আমরা একমত।

—

"আমেরিকা ও ভারতবর্ষ"

লণ্ডন ২রা অক্টোবর

আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ শীর্ষক এক প্রবন্ধে "ইকনমিষ্ট" পত্রিকায় লেখা হয়েছে—"বর্তমান অবস্থা এই যে, ভারতে রাজনৈতিক মতানৈক্যের অবসানের নিমিত্ত ব্রিটিশের তরফ হতে কোন চেষ্টা হয় নাই ব'লে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে এবং সুকৌশলে কংগ্রেসের

তরফ হতে প্রচারকার্য্য চলতে থাকায় আমেরিকার জনগণের মনে বিরুদ্ধ সমালোচনার মনোভাব ক্রমশঃ গুরুতর হয়ে উঠছে। স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্ যে সময় ভারতের দলগুলির নিকট তাঁর প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন, ঐ সময় যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা হয়েছিল যে, ভারতের দলসমূহ নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে না পারার জন্যই মীমাংসা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু তার পর এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের আরও অনেক কিছু করা উচিত ছিল বলে যে দাবী উঠছে তা সঙ্গত ব'লে মনে হচ্ছে। চীনের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রেরও স্বার্থ রয়েছে এবং তারও এই সম্পর্কে দায়িত্ব রয়েছে। সত্য কথা এই যে, সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক কারণে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ স্বভাবতঃই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কিত এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় গভীর সন্দেহের চক্ষে দেখে থাকে। আমেরিকার জনগণের এবংবিধ মনোভাবের দরুণ এবং কংগ্রেসের সুকৌশল প্রচারকার্য্যের দরুণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের এক বিরাট অংশ সত্যসত্যই ব্রিটিশ পক্ষের বক্তব্য বুঝতে চায় না।"—রয়টার

বিলাতী "ইকনমিস্ট" ঠিক্ উল্টো কথা বলছেন। ব্যাপক ভাবে ও সুকৌশলে প্রচারকার্য্য ভারতীয় কংগ্রেস ত যুক্তরাষ্ট্রে করছেন না, ব্রিটিশ পক্ষ থেকেই তা বরাবর হ'য়ে আসছে। তার সম্পূর্ণ সুযোগ উপায় অর্থবল জনবল, সমস্তই, ব্রিটেনেরই আছে; আমাদের দেশের কংগ্রেসের নাই। আসল কথা এই যে, আমেরিকার লোকেরা এখন বুঝতে পেরেছে যে, ব্রিটিশ প্রচার মিথ্যা ও আধা-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; তাই এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কাগজগুলা কংগ্রেসের উপর ঝাল ঝাড়ছে।

—

পার্লেমেণ্টে সাম্প্রতিক ভারত-শাসন সংস্কার বিল

পার্লেমেণ্টের কমন্স সভায় ভারতীয় ও ব্রহ্মদেশীয় শাসনবিধি সংশোধনের জন্যে একটি বিল উপস্থিত করা হয়েছে। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করাতে ভারতের যে কয়েকটি প্রদেশে শাসনতন্ত্রগত অধিকার প্রত্যাহার করা হয়েছে, সেই কয়েকটি প্রদেশে সাময়িক হিসাবে বর্ত্তমান ব্যবস্থা যুদ্ধ শেষ হবার দিন হতে আরও এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত বলবৎ রাখাই হচ্ছে এই সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য। এ ছাড়া অপ্রধান উদ্দেশ্য আরও কয়েকটি থাকবে। তার মধ্যে একটি হ'ল এই যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় পরিষদদ্বয়ের কোন সদস্য যদি সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন, তবে তাঁকে সদস্যপদে ইস্তফা দিতে হয়, কিন্তু অতঃপর সরকারী চাকরী গ্রহণ করলেও তাঁরা পরিষদের সদস্যপদে বহাল থেকে সদস্য হিসাবেও সরকারের সেবা করবার সুযোগ লাভ করবেন।

এর ফলে গবন্মেণ্ট জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্বাচিত সদস্যগণকে সরকারী চাকরীর লোভ দেখিয়ে টোপ গেলাতে এখনকার চে'য় আরও ভাল ক'রে পারবেন। অবশ্য এখনও সরকার যে তা না পারেন তা নয়। অসহযোগী কংগ্রেসের আগেকার আমলের কংগ্রেসে কোন ভারতীয় খুব মাথা উঁচু ক'রে গবর্ন্মেণ্টের সমালোচক হয়ে উঠলে সরকার তাঁকে জজ-টজ কিছু একটা ক'রে দিয়ে তাঁকে হস্তগত করতেন। তেমনি এখনও আইন-সভার কোন কোন সদস্যকে চাকরীর লোভে প্রলুব্ধ করতে পারেন। কিন্তু এখন কোন সদস্য চাকরী নিলে তাঁকে সদস্যপদ ছেড়ে দিতে হয়। পার্লেমেণ্টে যে সংশোধক বিল পেশ করা হয়েছে, সেটি পাস হয়ে গেলে সরকারী চাকরীগ্রাহী সদস্যকে সদস্যপদে ইস্তফা দিতে হবে না; তিনি সরকারী নোকর আবার জনপ্রতিনিধি দুই থাকতে পারবেন। অর্থাৎ কিনা বরের ঘরের পিসী ও ক'নের ঘরের মাসী তিনি থাকবেন, আইন-সভায় ভোট দেওয়া বক্তৃতা করা প্রভৃতি বিষয়ে এ রকম সদস্যের টান কোন্ পক্ষে থাকবে, তা সহজবোধ্য।

আগেই এক প্রসঙ্গে ব'লেছি, ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা বা ভারতীয়গণের স্বশাসন অধিকার বৃদ্ধির কথা উঠলেই কর্তৃপক্ষ ওজর ক'রে বলেন, তা করতে হ'লে পার্লেমেণ্টে নূতন আইনের বিল বা বর্ত্তমান আইনের সংশোধক বিল পাস করা দরকার, কিন্তু যুদ্ধকালীন সঙ্কট অবস্থায় তা করা যেতে পারে না। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের নিজের গরজের বেলায় তা বেশ করা চলে!

—

ভারতবর্ষের যুদ্ধব্যয়

ভারতবর্ষের যুদ্ধব্যয় ক্রমেই খুব বেড়ে চলছে। বর্ত্তমান যুদ্ধটা আরম্ভ হবার আগে ভারতের দেশরক্ষা-ব্যবস্থায় ব্যয় ছিল বার্ষিক ৩৮ কোটি টাকা। ১৯৪০-৪১ সালে তা বেড়ে মোটামুটি ৯১ কোটি হয়। চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে ভারত-সরকারের অর্থসচিব অনুমান ক'রে যুদ্ধব্যয়ের বরাদ্দ ধরেন ১৩৩ কোটি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মাসে ২০ কোটি টাকা ক'রে ব্যয় হচ্ছে। তার মানে বৎসরে ২৪০ কোটি। হয়ত ইতিমধ্যেই ব্যয় মাসে ৪০-৪৫ কোটি দাঁড়িয়েছে এবং পরে বৎসরে হাজার কোটি দাঁড়াবে।

আধুনিক যুদ্ধ—বিশেষ ক'রে বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধটা—অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সেই কথাটি বুঝে স্বাধীন দেশ-সকলকে যুদ্ধে নাম্‌তে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় যুদ্ধে নামে নি, ব্রিটেন তার মত জিজ্ঞাসা না ক'রেই তাকে যুদ্ধে নামিয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকলেও সম্ভবতঃ তাকে

যুদ্ধে নামতে হ'ত, কিন্তু তখন টাকা যোগানর দায়িত্বটা ন্যায়সংগত ভাবে তারই উপর পড়ত। কিন্তু বর্তমান অবস্থাটা এই যে, ভারতবর্ষকে যুদ্ধে নামিয়েছে ব্রিটেন, যুদ্ধ চালাচ্ছেন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ, যুদ্ধের ব্যয়বরাদ্দ ও নিয়ন্ত্রণ করছেন ঐ কর্তৃপক্ষই, অথচ টাকাটা যোগাতে হবে ভারতবর্ষকে। ব্রিটেন হয়ত কিছু দিতে পারেন। কিন্তু সমস্ত ব্যয়টা, ন্যূনকল্পে তার প্রধান অংশটা, ব্রিটেন দিলে তবে সেই ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত হয়।

—

পার্লেমেণ্টে ভারত সম্পর্কে আলোচনা

লণ্ডন, ১লা অক্টোবর

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, কমন্স সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে ভারত সম্পর্কে আলোচনা হবে। এতে বলা হয়েছে, "আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, ভারতের অবস্থার উন্নতির ইচ্ছা পোষণ ক'রে কমন্স সভা এই আলোচনা চালাবেন। 'ভারতের অবস্থা' আমাদের সকলেরই বেদনাকর। আমরা আপোষ-আলোচনা চালাতে অক্ষম,' সরকারী ভাবে এই বলে বসে থাকলেই এই বিরাট সমস্যার সমাধান হবে—এ কথা বলা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। ক্রিপস্ প্রস্তাবের মারফতে আমরা ভারতকে যুদ্ধের পর পূর্ণ স্বাধীনতা এবং এক্ষণে কার্যাতঃ স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমরা এখন আর একটি কাজ করতে পারি! যে সমস্ত ভারতীয় কংগ্রেসের বাইরে রয়েছেন, তাঁরা যাতে নিজেদের মধ্যে একটা বুঝাপড়া করতে পারেন এবং পরে ভারতীয় হিসাবে কংগ্রেসের সহিত আলোচনা চালাতে পারেন আমরা সেই ব্যাপারে তাঁদিগকে সাহায্য করতে পারি।"

রয়টারের রাজনৈতিক সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, ভারতের ঘটনাবলী সম্পর্কে শীঘ্রই কমন্স সভায় পূর্ণ আলোচনা হবে। নূতন ভারত ও ব্রহ্ম বিল আজ কমন্স সভায় উত্থাপন করা হয়। এই বিলের দ্বিতীয় শুনানীর সময়ই ভারত সম্পর্কে বিশদরূপে আলোচনা হবে। এই বিলের উদ্দেশ্য হ'ল, ১৯৩৯ সালে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগের পর যে ক্ষমতা হাতে নেওয়া হয়েছিল, তার মেয়াদ বৃদ্ধি করা।—রয়টার

"ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানে"র পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট তা শুনবেন এমন আশা করা যায় না।

কমন্স সভায় পূর্ণ আলোচনা হবে এ সংবাদে আমরা আশান্বিত হই নি। আলোচনায় চার্চিল-এমারি কোম্পানিরই জিৎ হবে আমাদের ধারণা এইরূপ।

—

মৌলবী ফজলল হকের কন্‌ফারেন্স আহ্বান

বর্তমান সঙ্কট অবস্থায় কি করা উচিত, সেই বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করবার নিমিত্ত বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ফজলল হক সাহেব ভারতবর্ষের নানা সম্প্রদায়ের, শ্রেণীর ও রাজনৈতিক মতের অনেক নেতার একটি কন্‌ফারেন্স আহ্বান করেছেন। দেশীরাজ্যের প্রজাদের কোন কোন নেতাকেও আহ্বান করা হ'য়েছে। আমরা এই কন্‌ফারেন্সের সাফল্য অবশ্যই চাই। কিন্তু কোন কন্‌ফারেন্সই কি ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের উপর এরূপ চাপ দিতে পারবেন যা উক্ত গবর্ন্মেণ্ট অগ্রাহ্য করতে পারবেন না? সেই রকম চাপ ভিন্ন বাঞ্ছিত ফল লাভের আশা খুবই কম—নাই বললেও চলে।

—

মিঃ রুজভেল্টকে গান্ধীজীর অনুরোধ

কাগজে খবর বেরিয়েছে গান্ধীজী মিঃ ফিশার নামক একজন আমেরিকান গ্রন্থকারের মারফৎ রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে মধ্যস্থতা ক'রে ভারতের দাবী সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করবার অনুরোধ জানিয়েছেন। এই খবর সত্য হ'লে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি অনুরোধ রক্ষা করবেন কি না, তাতে সন্দেহ করা যেতে পারে। আর, যদি তিনি অনুরোধ রক্ষা করেনই, তা হ'লেও তাঁর মীমাংসা ভারতের আশানুরূপ হবেই নিঃসন্দেহে এ কথা বলতে পারি না।

—

মহাত্মা গান্ধীর ত্রিসপ্ততিপূর্তি

গত ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর মহৎ জীবনের ৭৩ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের, ও ভারতবর্ষের বাইরেরও, অগণিত লোক তাঁর কাছে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পৌছিয়ে দেবার সুযোগ পায় নি বটে, কিন্তু মনে মনে শ্রদ্ধা নিবেদন অনেকেই করেছে। শুধু রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে নয়, মানবজীবনের অন্য নানাক্ষেত্রেও, যাঁরা তাঁর কোন কোন মত মানেন না, তাঁরাও তাঁর জীবনের ও ব্যক্তিত্বের মূল্য বোঝেন।

—

কল্‌কাতার বেসরকারী শিক্ষাদাতাদিগকে সরকারী সাহায্য

কলকাতা, ১লা অক্টোবর

কলকাতার বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি লাঘবের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তদনুসারে অদ্য ১১টি কলেজ ও ১৩৫টি স্কুলের পাচশত অধ্যাপক এবং প্রায় এক সহস্র শিক্ষক গবর্ণমেণ্টের নিকট হতে তাঁদের নির্দ্দিষ্ট সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এই ব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্টের দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যাপক ১৫০৲ টাকা এবং প্রত্যেক শিক্ষক ৭৫৲ টাকা পেয়েছেন।—এ, পি

এ বিষয়ে গবর্ন্মেণ্ট ভাল কাজই করেছেন। অধ্যাপিকা এবং শিক্ষয়িত্রীরাও এই সাহায্য পেয়েছেন কি?

—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে লজ্জাকর আচরণ

"যুগান্তর" বলেন :—

গত বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কয়েকজন সদস্যের আচরণ এমন

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যে, উহাতে স্বাভাবিকভাবে পরিষদের কার্য্য পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। তখন ডেপুটি স্পীকারকে বাধ্য হইয়া পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিতে হয়। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরোধী মুস্লিম লীগ দলের কয়েকজন সদস্য এই গোলমালের সূত্রপাত করেন। তাঁহারা ক্রমাগত চীৎকার করিয়া ডেস্ক চাপড়াইয়া ও অন্য নানা প্রকারে পরিষদের কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে থাকেন। অবস্থা চরমে পৌঁছিলে ডেপুটি স্পীকার দুইজন সদস্যকে তাঁহাদের বিশৃঙ্খল আচরণের জন্য পরিষদ কক্ষ হইতে বাহিরে যাইতে নির্দ্দেশ প্রদান করেন, কিন্তু তাঁহারা সে নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া তাঁহাদের আসনে বসিয়াই থাকেন। ডেপুটি স্পীকার বর্ত্তমান পরিস্থিতি সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব যখন ভোটে দিতে উদ্যত হন, তখন বিরোধী লীগদলের আসন হইতে এক ডজনের বেশী সদস্য একযোগে নানা প্রকার চীৎকার ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া কেহ কেহ ঊর্দ্ধে মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সভাপতির আসনের দিকে ছুটিয়া যান এবং স্পীকারের ডেস্ক চাপড়াইয়া গোলমাল করিতে থাকেন। বিশৃঙ্খল আচরণেরও একটা সীমা আছে, কিন্তু গত বুধবারের অধিবেশনে উহার সকল সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ইতিহাসে উহা অভূতপূর্ব্ব। পশ্চাতে ক্ষমতাবান কাহারও উস্কানি বা উত্তেজনা না থাকিলে এরূপ সাহস আসে কোথা হইতে? এই সকল বিশৃঙ্খলা যদি অবিলম্বে কঠোরভাবে দমনের ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে এক দিন গবর্ন্মেণ্টই বিপদে পড়িবেন। সভাপতির নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিতে যাঁহারা ভ্রূক্ষেপ করেন না, তাঁহাদের প্রতি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, দেখিবার জন্য দেশবাসী উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিবে।

—

বাঙালী মুসলমানদের রাষ্ট্রনৈতিক দাবী

বাংলা দেশে যে-সব মুসলমান জনাব জিন্নার তাঁবেদারি করেন, তাঁরা অ-বাঙালী কিম্বা প্রভাবশালী অ-বাঙালী মুসলমানদের প্রভাবাধীন; বাঙালী মুসলমানরা বাঙালী হিন্দুদের মতই দেশের স্বাধীনতা চান। এই সত্য সম্প্রতি নূতন ক'রে বাঙালী মুসলমানদের কোন কোন সভার অধিবেশনে এবং একাধিক জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতার বক্তৃতা ও বিবৃতিতে স্পষ্টীকৃত হয়েছে।

—

সস্তা ধাতুর টাকা আধুলি

কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে, আগামী ১৯৪৩ সালের ১লা মে হতে সম্রাট পঞ্চম ও ষষ্ঠ জর্জ্জের মার্কা-বিশিষ্ট টাকা ও আধুলির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে—তার পর ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই টাকা ও আধুলি সরকারী ট্রেজারী, ডাকঘর ও রেল আপিসে গৃহীত হবেএবং তার পর বাতিল মুদ্রার দলে পড়বে। তার পর এবং পুনর্বিজ্ঞপ্তি পর্য্যন্ত এই মুদ্রাগুলি কোন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের কলকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ আপিসে গৃহীত হবে। প্রচলিত টাকা হতে রূপার পরিমাণ হ্রাস করা ও মুদ্রা জালের সম্ভাবনা রহিত করার উদ্দেশ্যেই নাকি এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হচ্ছে। উদ্দেশ্য যাই হোক, এই ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় মুদ্রার ধাতুগত নিজস্ব মূল্য যে কমবে তাতে সন্দেহ নাই। তা কমলে ভারতীয় মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্যও কমবে। তা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

—

বাংলার বস্ত্রসঙ্কট

বাংলার বস্ত্রসঙ্কট সম্বন্ধে 'প্রবাসী'তে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে। বঙ্গে সুতার ও কাপড়ের কল যথেষ্ট নাই। যেগুলি আছে, তাদের দ্বারা এই প্রদেশের চাহিদা মেটে না, বাইরের মাল এলে তবে চাহিদা মেটে। অন্য প্রদেশের কলগুলি যুদ্ধের অর্ডার সরবরাহ করতে ব্যস্ত। অনেক বার স্টাণ্ডার্ড ক্লথের কথা শোনা গেছে, কিন্তু পূজা খুব নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তার ত দেখা বঙ্গের কোথাও পাওয়া যায় নি। গান্ধীজীর উপদেশ অনুসারে যদি বিস্তর লোক চরকায় সুতা কাটত এবং হাতের তাঁতে তার থেকে কাপড় বোনা হ'ত, তা হ'লে বস্ত্রসঙ্কট এমন দারুণ হয়ে উঠত না। কিন্তু লোকেরা আত্মনির্ভরশীল হয় নি।

—

গণতন্ত্র ও গোরুর গাড়ীর যুগ

ব্রিটিশ ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী য়্যাটলি সাহেবের মতে ভারতবর্ষের বিস্তর লোক এখনও গোরুর গাড়ীর যুগে থাকায় এদেশে গণতন্ত্র প্রবর্তন করা কঠিন হয়েছে—গণতন্ত্র না কি মোটর গাড়ীর সঙ্গেই মানায় ভাল। কিন্তু প্রাচীন ভারতে যদিও মোটর গাড়ী ছিল না, তথাপি অনেক অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রকমের সাধারণতন্ত্র ছিল। সামাজিক বিষয়ে ভারতবর্ষের সর্বত্রই বরাবর গণতান্ত্রিক পঞ্চায়তি প্রথা চ'লে আসছে। ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে কোন কোন প্রদেশে—যেমন বঙ্গে—এই প্রথা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেলেও আগ্রা-অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশে খটিক পাসি চামার প্রভৃতিদের মধ্যেও এই গণতান্ত্রিক প্রথা এখনও খুব কার্যকর আছে। সুতরাং গোরুর গাড়ীর দেশে ও যুগেও গণতন্ত্র খুব চালান যায়।

ইয়োরোপেও ত প্রাচীন গ্রীস রোম প্রভৃতিতে মোটর গাড়ী ছিল না, কিন্তু গণতন্ত্র ছিল, মোটর গাড়ী ক'দিনেরই বা? ফ্রান্সে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, স্বয়ং মিঃ য়্যাট্‌লির দেশ ব্রিটেনে মোটর গাড়ীর আবির্ভাবের অনেক আগে গণতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে।

—

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় ২৭এ আশ্বিন ১৪ই অক্টোবর থেকে ১০ই কার্ত্তিক ২৭এ অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্য্যালয় খোলবার পর করা হবে।

কাশ্মীর-ভ্রমণ

শ্রীশান্তা দেবী

(২)

৩রা জুন প্রতাপসিং কলেজে অধ্যাপক নাগের বক্তৃতা ছিল না ব'লে আমরা সেদিন একটু বাইরে বেড়াতে যাব ঠিক হ'ল। শুধু শ্রীনগরে বসে থাকলে কাশ্মীরের অনেক জিনিষই দেখা হয় না। পহলগাম কাশ্মীরের একটি বিখ্যাত দ্রষ্টব্য স্থান। এটি শ্রীনগর থেকে ষাট মাইল দূরে। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৭০০০ ফুট উঁচুতে লিডার উপত্যকার অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে অবস্থিত এই গ্রীষ্মাবাসে প্রত্যেক গ্রীষ্মে বহু দর্শকের আগমন হয়। এটি শুধু সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত নয়, এখান দিয়েই অমরনাথ তীর্থে যাবার পথ; শ্রীঅমরনাথের গুহা এখান থেকে ২৭ মাইল। তা ছাড়া স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে এ জায়গাটির খুব সুনাম আছে। আমরা পহলগামের পথে আরও কিছু কিছু দ্রষ্টব্য স্থান দেখে যাব কথা ছিল। অনেক কষ্টে একটা ট্যাক্সি যোগাড় করা হ'ল। ব্যবসাদারেরা কেউ বলে ৪০৲ ভাড়া, কেউ বলে ৩৮৲। নিয়োগী মহাশয় ১৯ টাকায় একটা গাড়ী ঠিক ক'রে দিলেন। গাড়ীটা বেশ ভাল, চলেও তাড়াতাড়ি। তবে ড্রাইভারটা ভীষণ বদ্‌রাগী, কাউকে দেখ্‌লেই গালাগালি দেয় ও মারতে যায়। কাশ্মীরী ছোট ছেলেরা বিদেশী লোক দেখ্‌লেই খানিকটা কৌতূহলের জন্যে এবং খানিকটা কিছু পয়সা পাবার আশায় ছুটে আসে। গাড়ীর কাছে তাদের আস্‌তে দেখ্‌লেই লোকটা গাল দিয়ে জুতো ছুড়ে মহা হাঙ্গাম লাগিয়ে দিচ্ছিল। অথচ সুন্দর সুন্দর ছেলেগুলোকে দেখতে আমাদের ভালই লাগছিল।

আমাদের বেরোবার সময়টা ব্রেকফাষ্ট আর লঞ্চের মাঝামাঝি সময়। আমাদের তখনও কিছুই খাওয়া হয় নি। ঠিক সেই সময় কিছু পাওয়া শক্ত। তবু খাবার চাওয়া গেল। ম্যানেজার বললেন, "হুড়োহুড়ি ক'রে কেন খাবে? খাবার সঙ্গে নাও।" তাঁরাই একটা ঝুড়িতে ক'রে রুটি মাখন, বিস্কুট, চীজ, মাংস, চেরিফল ইত্যাদি অনেক খাবার সাজিয়ে দিলেন।

আমরা যে পথে শ্রীনগরে ঢুকেছি, এটা তার উল্টা পথ। শ্রীনগর থেকে এই দিক দিয়ে বেরিয়ে জম্মু হয়ে আমাদের ফেরবার কথা। কাশ্মীর প্রকাণ্ড সমতল উপত্যকা, খানিকদূর এগোলেই দেখা যায় বহু দূরে চারধার দিয়ে পাহাড় একে গোল ক'রে ঘিরে রেখেছে। এই গিরি-প্রাচীরগুলির চূড়া সবই তুষারাবৃত কিম্বা তুষার-রেখাঙ্কিত।



মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ

পথটি ভারি সুন্দর, শ্রীনগর থেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত পথটির ধারে ধারে পপির ক্ষেত, রাঙা ফুলে আলো হয়ে আছে। তারপর আবার অন্যান্য শস্যক্ষেত্র। পথের সঙ্গে সঙ্গে ঝিলম নদী বয়ে চলেছে। জল হ্রদের মত স্থির, ঢেউয়ের উন্মত্ত নৃত্য ত নেইই, সামান্য ঝিরঝিরে স্রোতও দেখা যায় না। নদীতে ঢাকা-দেওয়া ছোট ছোট নৌকা, সুন্দরী মেয়েরা বাইছে। কোথাও সারি দিয়ে অসংখ্য নৌকা দাঁড়িয়ে আছে। ছাউনির তলাতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর-সংসার। এতেই বোধ হয় চাষীরা ও জেলেরা বসবাস করে। নৌকাগুলির চেহারা সাদাসিধে, শ্রীনগরের হাউস-

বোটের মত জমকালো নয়। তবে এদেরই অনুকরণে বোধ হয় পরে মোগল বাদশাহরা এবং আরও পরে সাহেবেরা বিশালকায় হাউস-বোটগুলি বানিয়েছিলেন। এটা জলের দেশ, মানুষের নানা সখের মধ্যে জলে বাস করার সখ এদেশে বেশী হবারই কথা। তবে বড় হাউস-বোটের চেয়ে এই ছোট নৌকাগুলি এক দিক দিয়ে ভাল। জলে থেকে নদীর গতির সঙ্গে যদি না চলা যায়, তাহলে জলে বাসের অর্দ্ধেক আনন্দ চলে যায়। এই নৌকাগুলিতে নদীর ও নালার যে কোন বাঁকে বেশ ঘুরে ফিরে বেড়ানো যায়, কিন্তু বেশী বড় নৌকা অধিকাংশ সময় এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে, অথবা ১৪।১৫ জনে মিলে গুণ টেনে চওড়া পথ দিয়ে তাকে খানিকটা টেনে নিয়ে যেতে পারে।



শালিমার বাগ। শ্রীনগর

এদিকেও পথ সুদীর্ঘ তরুবীথির ভিতর দিয়ে চলে গেছে। কোথাও সফেদা বীথি, কোথাও ব্যাঁদ। সফেদার রূপ অতুলনীয়, তারা দীর্ঘ উন্নত গর্ব্বিত মাথা আকাশের দিকে তুলে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, অন্য কোনও দিকে দৃষ্টি নেই। বর্শার ফলার মত সফেদার মাথা সরু হয়ে গিয়েছে, গুঁড়িতে নীচের দিকে ডালপালার হাঙ্গাম নেই, বেশ পরিষ্কার সুচিক্কণ। ব্যাঁদের গুঁড়ি সাধারণ গাছের মত, কিন্তু তলার গুঁড়িটুকু না দেখলে মনে হয় বাঁশ গাচ, পাতা আর সরু ডালগুলি অবিকল বাঁশপাতা ও কচি বাঁশের মত।

মাঝে মাঝে গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। গ্রামগুলি অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত, দারিদ্র্যে ও শিক্ষার অভাবে যতটা দুর্গতি হবার তা হয়েছে। এমন সুন্দর দেশ তাই মানুষ কোন মতে বেঁচে আছে। অবশ্য এখানে রোগের অভাব নেই। কাশ্মীরে এমন কলেরা হয় যে কলেরার টিকে না নিয়ে এদেশে কারুর ঢোকা বারণ। গ্রামগুলিতে গায়ে গায়ে অসংখ্য বাড়ী, দেয়ালে মাটি লেপার চিহ্ন আছে, কিন্তু অধিকাংশতেই পাথর বেরিয়ে এসেছে। ঘরগুলি ভাঙা-চোরা, রেলিং ও কার্ণিশে কাশ্মীরের সুবিখ্যাত কাঠের কাজের কিছু নমুনা আছে ভেঙেচুরে ধূলায় নোংরায় তার যা অবস্থা হয়েছে, তাতে সৌন্দর্য্য খুঁজে বার করা শক্ত।

এই সব গ্রামে বাস্তবিক সৌন্দর্য্য আছে শিশুর মুখে আর বন্য কুসুমে। ছেলেমেয়েগুলির রং গোলাপ ফুলের মত, গাড়ী দেখলেই ময়লা ঝোল্লা পোষাক দুলিয়ে ছুটে আসে। কারুর ঘন কালো চোখ, কারুর ইউরোপীয় ধরণের হাল্কা নীল চোখ, টুকটুকে পাতলা ঠোঁট, টিকলো নাক, যেন দেবশিশু। বড় বয়সে এদের অনেকেরই মুখের ভাব বোকার মত এবং নাকগুলো একটু মোটা হয়ে যায় দেখলাম, কিন্তু ছোট শিশুদের এত রূপ আর কোথাও দেখি নি। ভাল ক'রে খেতে পরতে পায় না বলে শরীরে মাংসের অভাব একটু বেশী, না হলে এরা আরও না জানি কত সুন্দর হ'ত।

শ্রীনগর থেকে প্রায় ৩২ মাইল দূরে অনন্ত নাগ বা ইসলামা-বাদ বলে একটি জায়গা আছে। এখানে ২০,০০০ লেকের বাস, তারা অনেক রকম শিল্প কাজ করে। "গব্বা" নামক কাঁথাজাতীয় সেলাই এখানের প্রধান শিল্প। রাস্তা দিয়ে গাড়ী যাবার সময় দু-ধারের অনেক বাড়ীর শিল্পীরা তাদের সেলাই ইত্যাদি বিক্রি করতে নিয়ে আসে। এত দর করে যে জিনিষ কিন্‌তে গেলে বেড়ানর আশা ছেড়ে দিতে হয়। এর কাছাকাছি দুটি প্রাচীন মন্দির আছে। একটি মন্দিরে আমরা নেমে দেখেছিলাম। তার নাম অবন্তীস্বামী মন্দির। এর বেশীর ভাগ আগে মাটির তলায় ছিল, পরে খুঁড়ে বার করা হয়েছে। মন্দিরটির ছাদ পড়ে গিয়েছে, পাথরের কারুকার্য্যকরা দেয়ালগুলি দাঁড়িয়ে আছে। রাজা অবন্তীবর্ম্মণ খ্রীষ্টীয় নবম শতকে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, শ্রীকৃষ্ণের (বিষ্ণু) নামে। মন্দিরের মাঝখানের

উঠানটি প্রায় সমচতুষ্কোণ, এক দিকে ২৭৪ ফুট, আর এক দিকে ১৪৮´-৬´´। দেয়ালের গায়ে পাথরে উৎকীর্ণ চিত্রে মকর ও কূর্ম্মবাহিনী গঙ্গা যমুনা, রাজারাণী প্রভৃতির চিত্র। প্রত্যেকটি পাথরে নানা চিত্র খোদিত। উঠানের চার দিকে চারটি ছোট মন্দির। ঘরগুলি ও চার পাশের দালান সবই সুন্দর রয়েছে, কিন্তু প্রাচীর-চিত্রগুলি কোদাল কুড়োল দিয়ে নির্ম্মম ভাবে কাটা ও ভাঙা। হিন্দু রাজা কলস এই মন্দিরগুলি ধ্বংস করতে সুরু করেন, তার পর সিকন্দর বুৎসি খাঁ এগুলিকে একেবারে নষ্ট ক'রে ফেলেন। তবে এখনও নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি, হাতীর সারি, হাঁসের সারি, ফলফুল, খেজুর গাছ ইত্যাদি খোদাই বোঝা যায়।

অবন্তীস্বামী মন্দির থেকে যাবার পথে আমরা একটা গ্রাম্য মেলায় এসে পড়লাম। সেখানে যেমন মানুষের ভীড় তেমনি মাছির ভীড। মানুষে গাড়ীর বাইরেটা ছেঁকে ধরল এবং মাছিগুলি ভিতরে ঢুকে গাড়ীর ছাদ ছেয়ে বসল। গ্রামটির নাম বিশবিহার। গ্রাম্য পুরুষের দল আমাকে এমন ক'রে ঘিরে ধরল যে হাঁটাই যায় না প্রায়। মেয়েরা কিন্তু অত্যন্ত ভীরু, তাদের কাছে যেতেই তারা পালাতে সুরু করল। মেলায় যতগুলি দোকানে যত জিনিষ ছিল সবই দোকানদারেরা একলা আমাকে বিক্রী করতে উৎসুক। বোধ হয় মস্ত একটা রাণীটানী ভেবেছিল। ছুটো-একটা জিনিষ কেনবার জন্যে হাতব্যাগটা খুলতেই চার পাশের সবাই তার ভিতর উঁকি মারতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বিক্রী হচ্ছে জরির কাজ-করা রঙীন টুপি, চুল বাঁধবার থোপনা-দেওয়া দড়ি, রূপোর গহনা ও নানা রকম খাবার।

মেয়েরা দুইকানে দুসের রূপোর সার-মাকড়ি ও মাথায় রূপোর ঝাপটা সিঁথি ইত্যাদি পরে মেলা দেখতে এসেছে। কিন্তু পোষাকগুলি সব কালো কম্বলের মত এবং তাও বছরখানিক কি দুয়েক বোধ হয় সেগুলি পরিষ্কার করবার কোন চেষ্টা করা হয় নি। মেলায় লোক জমেছে হাজার পাঁচ-ছয়। টাঙ্গায় ক'রে কত লোক যাওয়া-আসা করছে, অনেক দূরের গ্রাম থেকে, অথচ কেনবার জিনিষ অতি তুচ্ছ। আমাদের দেখতে এত লোক জমল যেন আমরা পৃথিবীর বাইরে থেকে এসেছি। মেলার পর গেলাম



চশমা সাহী। শ্রীনগর

বাদশাহী আমলের পুরানো উদ্যান আচ্ছাবলে। এটি শ্রীনগর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। লোকে বলে এর খানিকটা আকবর বাদশা এবং খানিকটা জাহাঙ্গীর বাদশা তৈরি করেছিলেন। কাশ্মীর রাজ্যের রিপোর্টে আছে—ইহা জাহাঙ্গীরের উদ্যান। এখানে কত যে ফুল তার সংখ্যা নেই। সাদা গোলাপ, লাল গোলাপ, বুনো গোলাপ, লতা গোলাপ, প্যান্সি, ভায়োলেট আরও কত রকম মৌসুমী ফুল, মনে হচ্ছিল সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁর রঙের পুঁজি এখানে উজাড় ক'রে ঢেলেছেন। বাগানের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা চেনার গাছ শত শত বৎসরের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার গুঁড়িটা বেষ্টন ক'রে ধরতে বেশ আট-নয় জন লোক লাগে। গাছটির বয়স নাকি ৫০০ বৎসর। কিন্তু তার দেহে বার্দ্ধক্যের চেয়ে নব যৌবনের চিহ্নই বেশী। আমরা সেই চেনার বৃক্ষের তলায় কম্বল পেতে খেতে বসলাম। চৌকিদারটা বলল—"হিঁয়া বৈঠিয়ে জনাব, হিঁয়া বাদশা বৈঠ্‌তে থে। উধর ত সব কাশ্মিরী আদমী, উধর মত জানা।" কাশ্মীরীদের প্রতি তার দারুণ অবজ্ঞা দেখলাম।

গাছলতায় বসে চারদিক দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। বাগানটি বিশেষ কিছু সযত্নে রক্ষিত নয়, প্রকৃতির মুক্ত হস্তের দানেই তার সৌন্দর্য্য উছলে উঠছে। ঘননীল আকাশে সুশুভ্র মেঘ, দূরে তুষাররেখাঙ্কিত নীললোহিতাভ পাহাড়ের গায়ে ঋজু দীর্ঘ সফেদা সারি সারি দাঁড়িয়ে। কাছের পাহাড় দানবপুরীর প্রাচীরের মত খাড়া উঠে গিয়েছে, তার গায়ে সবুজ ফার-জাতীয় গাছ। পায়ের



পহলগাম

কাশ্মীরের সব উদ্যানের মং আচ্ছাবলের উদ্যানেও জলের প্রাচুর্য খুব। উদ্যানের দক্ষিণ দিকের পাহাড়ের দুই-তিনটি প্রকাণ্ড জলধারাকে বন্দী করে ফোয়ারায় পুরে সারি সারি ঊর্দ্ধমুখী ঝরণা হয়েছে। বাদশাহদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হামামের (স্নানাগারের) প্রাচীর ভেঙে পড়েছে, কিন্তু এই স্বচ্ছ জলের স্রোত তার ভিতর ছল ছল করছে। পাহাড়ের দুটি স্তরে দুটি হামাম, একটি বোধ হয় আকবর শাহের নামে চলে, এবং নীচেরটি জাহাঙ্গীরের। গোটা তিরিশ চৌবাচ্চা

কাছে সমতল জমিতে মণির মত অসংখ্য উজ্জ্বল রঙের ফুল। অদূরে অবিশ্রান্ত জলধারার কুলকুল শব্দ। বাগানে সরকারী লোকদের সঙ্গে প্রজাদের কিসের একটা সভা হচ্ছিল। এক পাল গ্রাম্য কাশ্মীরী মাথায় আঁটা টুপি (Skullcap) প'রে রাজকর্ম্মচারীর পায়ের কাছে বসে আছে। কর্ম্মচারীটি উচ্চাসনে বসে আলবোলায় তামাক খাচ্ছেন এবং প্রজাদের বক্তব্য শুনছেন। এক দিকে রাজকার্য্য চলছে, আর এক দিকে দেখলাম একজন সন্ন্যাসী যোগাসনে বসে ধ্যান করছেন। খাবারের লোভে এক পাল কুকুর আমাদের চার দিকে জুটে গেল। তারা ভিক্ষান্নভোজী বটে, কিন্তু চেহারাগুলি ভারি সুন্দর; মোটা-সোটা শরীরে ঘন লোম ঠাসা। আমাদের দেশের সাহেব বাড়ীর কুকুরের চেয়ে তারা ভালই দেখতে।

শ্রীনগরের পথে ভদ্রশ্রেণীর কাশ্মীরী মেয়ে ইতিপূর্ব্বে দেখি নি। আজ দেখলাম আচ্ছাবলের উদ্যানে অনেকগুলি ভদ্রশ্রেণীর সুন্দরী মেয়ে লালনীল সবুজ পোষাক প'রে দলে দলে বেড়াতে এসেছে। এদের পোষাক ঠিক সাধারণ মেয়েদের মত নয়, ঘাঘরার মত পা পর্য্যন্ত পোষাক লুটিয়ে পড়েছে, মাথায় সাদা ওড়না, কোমরে একটা কাপড় বাঁধা এবং পিঠে ঝোলানো সুদীর্ঘ বেণীতে একটি শুভ্র কাপড় জড়ানো। এরা উচ্চ শ্রেণীর মেয়ে দেখলেই বোঝা যায়। এদের রং, নাক মুখ চোখ, হাঁটা চলা এবং পরিচ্ছন্নতা সবই সাধারণ মেয়েদের তুলনায় এদের আভিজাত্য সহজে বুঝিয়ে দেয়। পরে শুনেছি এরা এদেশের হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ-বংশীয়া মহিলা। কাশ্মীরে নিম্ন শ্রেণীর প্রায় সব লোকই মুসলমান এবং হিন্দুরা অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। এখানে লোকসংখ্যার শতকরা ৭৭ জন মুসলমান ও শতকরা ২০ জন হিন্দু।

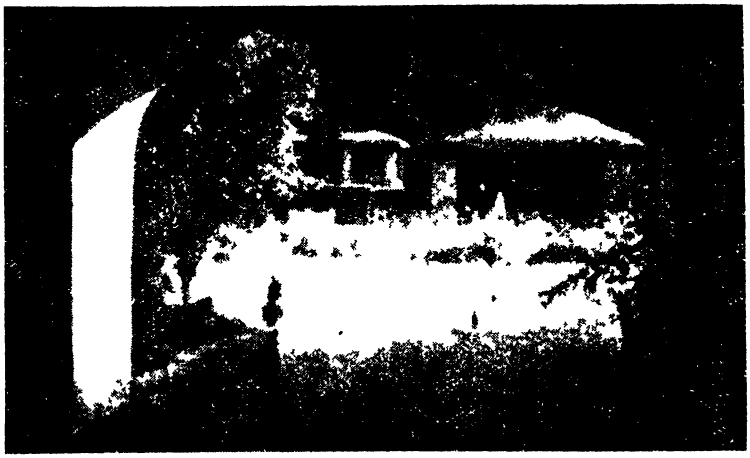
জুড়লে এত বড় হামাম হয়। সম্প্রতি এই জলের স্রোতকে ট্রাউট মৎস্য পালন ক্ষেত্রের কাজে লাগান হয়েছে। যেখানে এককালে সুন্দরী বেগমরা জলবিহার করতেন, সেখানে এখন মৎস্য-কন্যাদের খেলা। মাছের ক্ষেত ভারি সুন্দর দেখতে। তিন মাস থেকে সাত-আট বৎসর বয়সের মাছ, ভিন্ন ভিন্ন ভাগে জলস্রোতের মধ্যে ঝলমল করছে। ওই বন্দী জলধারাকেই নানা ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। মাছ-গুলির পেট লাল, ও গায়ে চিতা বাঘের মত বুটি। জলে বুটিগুলি ঝকঝক করে। বড় মাছগুলি ওজনে চার-পাঁচ সের। মহারাজা বিলাত থেকে এনে এখানে ঐ মাছের চাষ করছেন।

আচ্ছাবল দেখে ফিরবার পথে কিছু জিনিস কেনা গেল। জিনিসগুলি অনন্তনাগের গব্বা জাতীয় সেলাই। খুব দরাদরি করতে হয়। তার পর পথে পড়ল একটি শিখ মন্দির ও জলের ঝরণা। জলের কুণ্ড বাঁধানো, নীচে মুসলমানরা নমাজ করছে, উপরে শিখদের পরব চলেছে।

তার পর সুরু হ'ল পহলগামের পথ। সমস্ত পথটিই নদীর ধার দিয়ে চলেছে। পথ সরু ভাঙাচোরা উপল-বহুল, কিন্তু সারা পথের সঙ্গিনী এই নৃত্যরতা পার্ব্বত্য নদীটিকে দেখলে পথের কষ্ট মনে থাকে না। প্রাণ-প্রাচুর্য্যে পূর্ণ সদাহাস্যময়ী নৃত্যশীলা সুন্দরী গিরিদুহিতা। সমস্ত পথ সাদা সাদা ফেনার ঢেউ তুলে চূর্ণ জলকণা ছড়িয়ে নেচে নেচে চলেছে। অনেক জায়গায় চার-পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে, যেখানে জলধারাকে দেখা যায় না, সেস্থানগুলি সাদা সাদা ছোট বড় গোল গোল পাথরে যেন ঢালাই করা, মধ্যে মধ্যে সবুজ ঝোপ তলায় অন্তঃসলিলার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। অনেক উঁচু পাহাড় থেকে মোটা

মোটা গাছের গুঁড়ি কেটে কাশ্মীরী মজুররা এই জলের মধ্যে ফেলছে। জলস্রোত গুঁড়িগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। তখনও বর্ষা নামে নি, তাই অনেক গাছ কম জলে জমা হয়ে আছে। বর্ষাকালে সব ভেসে পঞ্জাবে চলে যায়।

পহলগামে যখন পৌছলাম তখন সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে। প্রথমটা বাজারের মত একটা জায়গায় গাড়ী দাঁড়াল। দেখলাম টুরিষ্টদের মেয়েরা চুল বব্ করে, লম্বা প্যাণ্টালুন পরে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে, কেউ স্বদেশী কেউ বিদেশী। শাড়ী-প'রে দুই-এক জন হেঁটে যাচ্ছে। এই জায়গাটা খুব ঠাণ্ডা নয়, কিন্তু চারি ধারে মালার মত যে সব পাহাড় ঘিরে রয়েছে, তাদের মাথায় মাথায় বরফ। মনে হয় বরফ এত কাছে যে আধ ঘণ্টা হাঁটলেই বরফের উপর গিয়ে পড়া যাবে। জুন মাসেও এত কাছে এমন বরফ জমে থাকতে দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়।

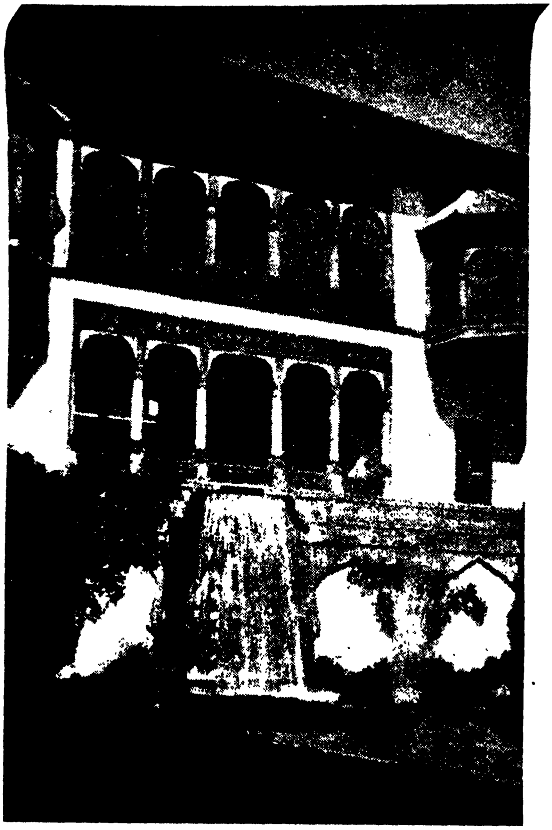


আচ্ছাবল

বাজারের পিছন দিয়ে আমরা একটু নীচের দিকে নেমে গেলাম। সেখানে খানিকটা খোলা জায়গা। মাঠ নয়, ভারি সুন্দর একটি উপত্যকা। কত যে ছোট ছোট শুভ্র জলস্রোত পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে নানা দিক থেকে আসছে তার ঠিক নেই। যেন আসন্ন সন্ধ্যায় এক দল শুভ্র-বসনা ক্ষীণাঙ্গী দেববালা আকাশ থেকে পার্ব্বত্য পথে ধরণীতে বিচরণ করতে নেমেছেন। তাদের উপর দিয়ে পার হবার জন্যে ছোট ছোট বাঁশের সেতু খিলানের মত ক'রে বাঁধা। এক দিকে অমরনাথ যাবার পথ। এই ছোট ছোট জলস্রোতগুলি যে নদীতে গিয়ে পড়েছে তার নাম বোধ হয় অমরগঙ্গা। চারধারে ঘন ফর প্রভৃতি গাছে ঢাকা পাহাড়, তার পিছনে শুভ্র তুষারমণ্ডিত পাহাড়ের শৃঙ্গ। অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে এই সৌন্দর্য্য ভাল ক'রে বুঝতে কিম্বা উপভোগ করতে পারা যায় না। আমরা ২৫।৩০ মিনিট পরেই ফিরলাম। পরে দুঃখ হ'ত ভূস্বর্গের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে-সব জায়গায় সেগুলিকে তেমন সময় দিয়ে দেখতে পারি নি ব'লে।

পহলগামে যাবার পথে মার্ত্তণ্ড গুম্ফা নামে একটি অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত মন্দির পড়ে। সেটি পাহাড়ের পাথর কেটে তৈয়ারী। মোটরের রাস্তা থেকে হেঁটে অনেক উপরে উঠলে তবে সেটি দেখা যায়। কাশ্মীরের কালা-পাহাড়ের দল সেটিকে ভেঙে পুড়িয়ে একেবারে নষ্ট ক'রে দিয়েছে। দেখ্‌লে কষ্ট হয়। মন্দিরটি ৬৩ ফুট লম্বা, পাথরের কারুকার্য্য সুন্দর। মন্দিরের ছাদ ভেঙে পড়ে গিয়েছে।

শ্রীনগর-প্রবাসী নিয়োগী মহাশয়ের চেষ্টায় এবং যত্নে আমরা শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী বিখ্যাত মোগল উদ্যান-গুলি দেখেছিলাম। ৪টা তিনি আমাদের বেড়াতে নিয়ে গেলেন তাঁর গাড়ীতে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও তিন কন্যা ছিলেন। হরওয়ানের জল-সরবরাহের কারখানা শ্রীনগর থেকে অনেক দূরে একটি দ্রষ্টব্য জিনিষ, তাকে উদ্যানও বলা চলে, কারখানাও বলা চলে। সেইখানে আমরা প্রথম গেলাম। পাহাড়ে-ঘেরা প্রকাণ্ড একটি ঝিল, নির্ম্মল জলে টলটল করছে, সেই স্থির স্বচ্ছ জলের বুকে পাহাড়ের সবুজ বনানীর ছায়া। তারই মাঝখানে একটি ছোট ঘরে কারখানার কাজ চলে, নানা দিকে জল পাঠানোর ব্যবস্থাও এইখান থেকে। নির্ঝরিণীপুষ্ট ঝিলের বাড়্‌তি জল একটি প্রকাণ্ড খাল দিয়ে বাইরে চলে যায়। তার চেহারা দেখ্‌লে মনে হয় মস্ত একটি নদী। এই প্রকাণ্ড জলস্রোতের গা থেকে ছোট ছোট নালা কেটে লোকে ক্ষেতে জল নিয়ে যায়। স্রোতটি প্রথম বাগান থেকে বেরিয়েই যে কুণ্ডের মত জায়গায় পড়ছে, সেখানটি হয়ে উঠেছে মস্ত একটি স্নানাগার। কাশ্মীরীরা ও এদেশী পঞ্জাবীরাও বোধ হয় স্নানে নেমেছে। গ্রীষ্মকালেই বোধ হয় কাশ্মীরীদের স্নানের সময়। তাদের উন্মুক্ত সুগৌর দেহ দেখলে মনে হয় ইউরোপের মানুষ।



নিশাতবাগ। শ্রীনগর

হারওয়ানের স্থির গম্ভীর দেববাঞ্ছিত সৌন্দর্য্য মানুষকে মুগ্ধ করে। ঝিলের পিছনের ঘনবনাকীর্ণ পাহাড় শুদ্ধ আকাশের বুক চিরে উঠেছে। চূড়ায় শুভ্র বরফ মহাতপস্বীর শুভ্র জটার মত ঝকমক করছে। জলস্রোত কুল কুল ক'রে পথের ধার দিয়ে সজোরে ছুটে চলেছে। উদ্যানের দিকে পিছন ক'রে দাঁড়ালে দূরে ডাল হ্রদের শান্ত জলরাশি চোখে পড়ে। উইলো ও ব্যাঁদ গাছের ঝাড় পথের ধারে ধারেই চলেছে। থেকে থেকে চেনার মহীরুহ মহা স্থবিরের মত তার সুবিশাল মূর্ত্তি নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফলের যে কত রকম গাছ তার ঠিক নেই। পথের ধারের ভাঙা প্রাচীর, জীর্ণ বেড়া সব বন্য গোলাপের কুঞ্জে ছেয়ে গেছে। প্রকৃতি যেন সর্ব্বত্র মানুষের অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও অবহেলার লজ্জা ঢাকা দেবার জন্য সহস্র শিল্পীকে কাজে নামিয়েছেন। যে-কোন বাগানই দেখতে যাই না কেন দেখি একদল ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়ে সেখানে ফল ফুল তরী-তরকারি পাতায় ক'রে নিয়ে সব বিক্রী করছে। ফুলের মত অজস্রধারে ফুল দেশে ঢেলে দিয়েছেন। বেচারীরা বড় গরীব। এই সময় ফুলের সময়, তাই সবাই এক একটা ছোট তোড়া বেঁধে গায়ের উপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। সবাই বলে :—'আমারটা নাও, আমারটা নাও।' কেনাবার জন্যে ঝুলোঝুলি। এত বিক্রেতা যে ভয়ে কারুরটাই নেওয়া শক্ত হ'ত। অনেকে পাতায় ক'রে চেরি, ষ্ট্রবেরি, তুঁতে প্রভৃতি পাকা ফল বিক্রী করছে। জল আর বাগান দেখতে দলে দলে লোক বাগানে ঢুকছে। বাগান দেখতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অনেক রকম মানুষও দেখা যায়। এক কাশ্মীরীদের মেয়েদেরই কত রকম পোষাক। হিন্দু সধবা মেয়েরা কানে জরি-জড়ানো সুতোয় দুটো সোনার মাদুলির মত ঝোলায়, গরীব হ'লে রূপোর পরে। জম্মুর মেয়েরা চুড়িদার পায়জামার উপর লম্বা পাঞ্জাবী কুর্ত্তা পরেছে। খুব উচ্চ বংশের মুসলমান মেয়েরা মাথায় উঁচু টুপি পরে, তার উপর বোরখা পরেছে, মনে হচ্ছে দোতলা মাথা।

শালিমার বাগের নাম শিশুকাল থেকে শুনেছি, ছবিতে তার সূক্ষ্মশীর্ষ সফেদা গাছগুলি ছেলেবেলা থেকে আমাকে আকর্ষণ করত। এত দিন পরে চোখে দেখা হ'ল। এত সুন্দর আর এত বড় বাগান কোথাও ইতিপূর্ব্বে দেখি নি। সমস্ত বাগানটির প্ল্যান একসঙ্গে করা, সবটা জড়িয়ে যেন একটা মস্ত ছবি। জ্যামিতির নিয়মে মাপজোখ ক'রে সব সাজানো। পার্ব্বত্য জলের একটি প্রকাণ্ড স্রোত বাগানের মাঝখান দিয়ে চওড়া বাঁধানো পথে চলেছে, জলপথটি তাজমহলের সম্মুখের জলপথের মত দেখতে, কিন্তু ধাপে ধাপে চওড়া সিঁড়ির মত নেমে গিয়েছে। প্রতি রবিবার জলপথের মুখ খুলে দেওয়া হয়, তখন ধাপে ধাপে লাফিয়ে লাফিয়ে নদীস্রোতের মত জল চলে। মাঝে মাঝে চৌকো কুণ্ড এবং তুবড়ির মত জল ওঠবার জন্যে অনেক ঝাঁঝরির ফোয়ারা। জলের দেশ, তাই বাদশারা এত রকম ক'রে জলের খেলা দেখাতে পেরেছিলেন। বাইরে উচ্ছল জলের খেলা, ভিতরে ভিতরে তারই ফল্গুধারা সোনালী রূপালী সবুজে সুনীলে সমস্ত উদ্যানটিকে সাজিয়ে তুলেছে। ফল ফুল পাতার রূপে বাগান যেন নুয়ে পড়েছে। তার উপর এই অশ্রান্ত কলনাদিনী জলধারা যেন প্রাণময়ী জলবালাদের সহস্র নূপুরের ছন্দোবদ্ধ নিক্কণ। শালিমার বাগের শেষের দিকে কালো মার্ব্বেল পাথরের সুন্দর থাম আর কার্ণিশ-করা বাদশাহী ধরণের একটি খোলা হল আছে। স্থাপত্য আগ্রা দিল্লীর দেওয়ানী আম ধরণের। থামের উপর হিন্দু স্থাপত্যের ধরণের পদ্মকাটা। জাহাঙ্গীর

তাঁর প্রেয়সী নূরজাহানের জন্য শালিমার বাগ তৈরি করেছিলেন। এখানে তাঁরা কয়েক বার গ্রীষ্মকালে বাস করেছিলেন।

এই বাগানে কত যে মানুষ রবিবারে বেড়াতে আসে তা দেখলেও বিশ্বাস হয় না। মনে হয় যেন দেশব্যাপী বিশেষ কি একটা উৎসব হচ্ছে। প্রকাণ্ড জলস্রোতের দুই পাশে হাজার রকম ফুলের স্রোত চলেছে, তার পাশে পাশে দু-দিকে সবুজ গালিচার মত 'লন'। এই লনে একেবারে জংলী কাশ্মীরী থেকে আরম্ভ ক'রে সাহেব মেম, শিখ, পঞ্জাবী, বাঙালী, হিন্দুস্থানী, সন্ন্যাসী, সাধু, রাজারাজড়া ছোট বড় সবাই এসে জুটেছে। কেউ সতরঞ্চি পেতে টিফিন বাস্কেট নিয়ে দল বেঁধে পিকনিক করছে, কেউবা ক্যামেরা নিয়ে ফুলের ছবি তুলছে, কেউ মুগ্ধ হয়ে ফুল দেখছে, কেউ বেড়াচ্ছে, কেউবা জরিজড়োয়া প'রে সাজ-পোষাকে পুষ্পোদ্যানের সঙ্গে পাল্লা দিতে চেষ্টা করছে। বাগানের বাইরে লোক নামছে কেউ নৌকা থেকে, কেউ টাঙ্গা থেকে, কেউবা মোটর থেকে। স্থলপথ জলপথ দুই পথেই আসা যায়। কাশ্মীরে শিক্ষিতের চেয়ে অশিক্ষিতদের ভীড়ই বেশী।

শালিমার বাগের পিছনে প্রকাণ্ড পাহাড় খাড়া হয়ে আছে, মাঝখান দিয়ে থাকের পর থাক জল নেমে চলেছে অঝোরে অফুরন্ত স্রোতে, তার দুই পাশে ফুলের স্রোত, কত যে ফুল তার লেখাজোখা নেই, প্যান্সি, ভায়োলেট, হনিসকল, গোলাপ, বন্য গোলাপ, সবই শীতের দেশের ফুল। ফুল পাতা ও জলের অনন্ত ঐশ্বর্য্য এমন কোথাও দেখি নি।

প্রকৃতির এই ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারে মানিয়েছে সন্ন্যাসীদের আর কাশ্মীরী পণ্ডিতানীদের। তাদের মাটিতে লুটানো পোষাক ও হাঁটাচলা সবই পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেকার বাদশাহী আমলের মত। মনে হয় যেন সেই যুগের উদ্যানের সঙ্গে তারাও আজ পর্য্যন্ত চলে আস্‌ছে। তাদের মধ্যে সাহেবমেমরা লম্বা লম্বা পা ফেলে যখন চলে কিম্ভূতকিমাকার দেখায়, সত্যিই হংসমধ্যে বকো যথা, বকের মতই হাঁটা। আধুনিক মানুষরা আবার আসেও মোটর চড়ে, আর সাবেকী লোকেরা আসে নৌকায় চড়ে। কত রঙের নক্সা-কাটা সাজসজ্জা তাদের নৌকার! কোনটি বা দরিদ্রের জীর্ণ ভাঙা নৌকা। সুন্দরী পসারিণীরা তাতে তরীতরকারির বেসাতি নিয়ে চলেছে।

নিশাত বাগ বাদশাহী আমলের আর একটি উদ্যান। বাদশাহ সাহজাহান এই উদ্যান রচনা করেন ব'লে কাশ্মীর-রাজের রিপোর্টে লেখে। এটি শালিমারের চেয়েও বড়। বাগানের জল নামবার পাথর বাঁধানো পথটি ঢালু। এ বাগানে চেনার প্রভৃতি গাছগুলি এত বড় এবং ডালপালা ঝুঁকিয়ে এমন ক'রে বাগান জুড়ে আছে যে জলস্রোত অর্দ্ধেক আড়াল হয়ে যায়। বাগানের পিছনে পাহাড়গুলি সবুজ নয়, খাড়া খাড়া কালো পাথর; মনে হয় বাগান আগলাবার জন্য কে বিরাট্ চৈনিক প্রাচীর গেঁথে গিয়েছে। বাগানের উঁচু দিক থেকে ডাল হ্রদ, তার গেট, হাউস-বোট, শিকারা প্রভৃতি ও বিচিত্র নৌকার সারি ছবির মত দেখায়। বাগানে অনেক জায়গায় মাটির তলা দিয়ে সিঁড়ি কেটে সুড়ঙ্গের মত রাস্তা ক'রে দিয়েছে উপরে উঠবার জন্য। জলস্রোতের দুধারে এখানে খুব লকেট ফলের গাছ। কাশ্মীরের বাগান যখন তখন ফুলেরও অভাব নেই। এই উদ্যানটি সাহজাহানের শ্বশুর আসফ খাঁর ছিল ব'লেও শোনা যায়।

এখান থেকে যখন বেরোলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। চশমাসাহী বাগ তখনও দেখা হয় নি। বাগান বন্ধ ক'রে দেবার সময় হয়ে আসছিল। নিয়োগী-মহাশয়ের ছোট ছোট মেয়েরা সিঁড়ি বেয়ে ছুটে উঠে আমাদের জন্যে পথ ক'রে দিল। বাগানটি অনেক উঁচুতে। দেখলাম সূর্য্যাস্তের রাঙা আলো ডাল হ্রদে ঝলমল করছে। ভ্রমণকারীরা ডাল হ্রদের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখবার জন্যেই অনেকে চশমাসাহীতে আসে। ছোট একটি বাড়ী লতায় লতায় ঘিরে রেখেছে। ইট পাথর প্রায় দেখা যায় না। এখানকার জল খুব সুস্বাদু ও উপকারী ব'লে অনেকে জল নিয়ে যাচ্ছে। চশমাসাহী কথাটির মানে "বাদশাহী ঝরণা"। সন্ধ্যার অন্ধকারেও বড় বড় প্যান্সি ফুলগুলি মণির মত ঝলমল করছে।

এই সব বাগানে রবিবার ছাড়া জলের স্রোত চলে না; অন্য সব দিনে এই জলস্রোত কাশ্মীরের যত ক্ষেত-খামারে চলে যায়। রবিবার বাগানের দিকে জলস্রোত ঘুরিয়ে দেয় ব'লে জল, ফোয়ারা ও তার ভিতর রঙীন আলোর খেলা দেখবার জন্য শালিমার প্রভৃতিতে এত লোক আসে। জল ও আলোর খেলা দেখার প্রতি গ্রাম্য লোকদের টান সবচেয়ে বেশী। Skullcap ও নোংরা কাপড় পরা লোক দলে দলে রবিবার বাগান ঘিরে ফেলে। কাশ্মীরী গরীব ছেলেরা বিদেশীদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করতে এত ব্যস্ত যে লোক দেখলেই যা হোক একটা কিছু নিয়ে তাদের পিছনে ছোটে। নিশাত বাগে একটি ছেলে একটা আলবোলা নিয়ে আমাদের পিছনে ছুটতে সুরু করল; যদিই আমরা একটু তামাক খেয়ে তাকে কিছু পয়সা দি। দুঃখের বিষয় আমাদের দলে পাঁচ জন ছিলেন মহিলা আর দু-জন মাত্র পুরুষ। তাঁরাও আবার আলবোলার ভক্ত নন।

ক্রমশঃ

[বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত]

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার সঙ্গে এক যাত্রায় য়ুরোপে যাবার সম্ভাবনা আছে শুনে আনন্দিত হলুম। অপেক্ষা করে আছি কবে জাহাজের খবর পাব। আজও পাই নি। টুচি বলেন ইটালীয়ানরা আমাদেরই মতো—সময় মতো খবর দেওয়া বা কোনো কাজ করা ওদের ধাতে নেই। আশা তো আর দুই এক দিনের মধ্যে জানতে পাবো—এবং সম্ভবত ১৫ই মে মাসেই রওনা হতে পারব। ২৫শে বৈশাখের উপলক্ষ্যে একটা নাট্য অভিনয়ের উদ্যোগে ব্যস্ত হয়ে আছি।

কলকাতা এখন ঠাণ্ডা হয়েছে। তিন চার দিন আগে বোলপুরে বহুসংখ্যক মুসলমান গুণ্ডার আমদানী হয়েছিল—সময় মতো সশস্ত্র পুলিসের সমাগমে তারা তামাসা বন্ধ করেই আবার কলকাতায় ফিরেছে। ইতি ১৯শে বৈশাখ, ১৩৩৩

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

১০ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় যাব, ১৩ই কনভোকেশন। আমার বক্তৃতা বাংলা ভাষায় লেখা। ইতিমধ্যে আপনি এলে দেখা হবে।

বোষ্টমী স্নান করে যখন সিক্ত বস্ত্রে চলে আসছে তার গুরু বললে, তোমার দেহখানি সুন্দর। সে সময়ে তার কণ্ঠস্বরে ও মুখভাবে যে চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছিল সেটাতে বোষ্টমীর নিজের মনের প্রচ্ছন্ন আবেগকে জাগিয়ে দিয়েছিল। তাই সে পালিয়ে গিয়ে আপনাকে বাঁচায়। আমার বিশ্বাস গল্পের মধ্যে এই ইঙ্গিতটি বুঝতে বাধা ঘটে না। ইংরেজি তর্জ্জমায় কথাটা স্পষ্ট হয়েছে কি না জানি নে। ইতি ১৩ই মাঘ [১৩৪৭]

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অরবিন্দের তিনটে তর্জ্জমার মধ্যে একটা প্রকাশযোগ্য। সেটা অনিল কাল আপনার কাছে রওনা করে দিয়েছে। Suggestion শব্দের তর্জ্জমা নিয়ে একদা তখনকার শান্তিনিকেতন পত্রে আলোচনা করেছিলুম। "সঙ্কেত" "ইঙ্গিত" জাতীয় শব্দের আভাস তাতে ছিল। সুধীর কর কলকাতা থেকে ফিরলে খুঁজে বের করব। ইতি ১৭।৩।৩৭

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

রবিরশ্মি বইটা সম্বন্ধে চারুকে যে চিঠি লিখেছিলুম সেটাতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন মনে করেছেন তাঁকে নিন্দাই করেছি। ওটা ছাপাবেন না। আমার কৈফিয়তে চারুকে যে চিঠি লিখেছি—তার নকল পাঠাই। তাঁর বইটা ক্লাস বইয়েরই মতো হয়েছে, ছাত্রাবস্থা ছাড়িয়েছে যারা এটা তাদের উপযোগী নয়, অথচ সেই রকম বইয়ের দরকার আছে। অতিশয় বেশি দিতে গেলে কম দেওয়া হয়। বোধ হয় চারু ক্লাস পড়াবার উপলক্ষ্যেই এটা লিখেছেন সে কথার স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও থাকলে ভাল হত। যদি থাকত তা হলে বইটা প্রশংসারই যোগ্য হত।

ঠাণ্ডায় আছি, লোক কম গরমও নেই। ইতি ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

আপনার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Gouripur Lodge,
Kalimpong.
Phone, Kal-19.

ওঁ

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ

শরীরে মনে শক্তির উদ্বৃত্ত দিনে দিনেই ক্ষয় হয়ে আসচে—এই জন্যে দিনকৃত্যের বাইরে এমন কোনো কাজ

করতে উৎসাহ পাইনে যা আমার অভ্যস্ত পথের বাইরে পড়ে। আমার মনে ইংরেজি ভাষার শিকড় শিথিল হয়ে গেছে, বাংলা রচনার রাস্তাতেও রথের চাকা বার বার বেধে যায়। ক্লান্ত মনকে তাড়া লাগালে হয়তো কাজ চালাবার মত খানিকটা পথ এগোতে পারে কিন্তু অত্যন্ত বেশি আপত্তি করে—কোন্‌দিন ধর্ম্মঘট করে বসে এ আশঙ্কা করি। কিছুদিন পূর্বেও আমি জরাকে বিশ্বাস করতুম না, অপটুতার একটু আভাস পেলে অসহিষ্ণু হয়ে উঠতুম। এখন শেষ বয়সের ডিক্টেটরের শাসন মানতে বাধ্য হয়েছি—হাতখরচের মত সামান্য কিছু রেখে আমার তহবিলে সে শিলমোহর এঁটে দিচ্চে—অত্যাচারটা স্বীকার করতে লজ্জা হয় বলেই কলম চালাতে যাই কিন্তু স্প্রিংহীন চাকার মত তার আর্তনাদ উঠতে থাকে।

এখানে শরীর কিছু ভালো হয়েছে কিন্তু প্রাণের উদ্যম এখনো অজয় নদের মত তটের তলায় তলিয়ে আছে—বর্ষায় ধারায় কিছু স্রোত বাড়ে কিন্তু পণ্য চালাবার মত নয়। উপস্থিত কিছু কাজ শেষ করে ছুটির চর্চাতে লাগব ভাবচি অর্থাৎ ছবি আঁকতে বসব—সেখানে আমার খ্যাতির জোয়ার ভাঁটা খেলে না—তাই আরাম পাই। ইতি ১৮।৬।৩৮

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

গল্প প্রকাশ করা নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রবাসীর দ্বন্দ্ব ঘটেছিল সেই জনশ্রুতির উল্লেখ এই প্রথম আপনার পত্রে জানতে পারলুম। ব্যাপারটা যে সময়কার তখন শরতের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। অনেক অমূলক খবরের মূল উৎপত্তি আমাকে নিয়ে, এও তার মধ্যে একটি। এই জন্যে মরতে আমার সঙ্কোচ হয় তখন বাঁধভাঙা বন্যার মত ঘোলা গুজবের স্রোত প্রবেশ করবে আমার জীবনীতে—আটকাবে কে? ৯।৭।৩৯

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার চিঠি ছাপতে পারেন, আপত্তি নেই। জানাতে পারেন শরৎ কখনো কোনো বিষয়েই আমার পরামর্শ চান নি, আমিও তাঁকে উপদেশ দিই নি। ইতি ১১।৭।৩৯

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শরতের সম্বন্ধে আপনাকে যে চিঠি লিখেছিলুম সেটা পড়ে অনিল বললেন, যখন এই ঘটনা-প্রসঙ্গে কোনো তারিখের উল্লেখ নেই তখন সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল না এ কথা কী করে বলা চলে। আন্দাজে বলেছি বটে কিন্তু এ কথা সত্য যে শরতের খ্যাতি যখন চারিদিকে ব্যাপ্ত তার পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। যে ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা চলচে সে যদি তাঁর যশোবিস্তারের পূর্বকার হয় তাহলে এ নিয়ে সন্দেহ করবার দরকার নেই। ইতি ১৭।৭।৩৯

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমাদের এখানে হিন্দিভাষী ছেলেমেয়েরা হিন্দি শিক্ষার সুযোগ পায় কিন্তু নিয়ম করেছি তাদের পরীক্ষা দিতে হবে বাংলা ভাষায়। তাতে ওদের হিন্দি শিক্ষায় শৈথিল্য হচ্চে না অথচ তারা বাংলা শিক্ষাকে উপেক্ষা করতে পারে না। উত্তর-পশ্চিমে বাঙালী ছেলেদের জন্যে যদি এই নিয়ম চালানো হয় তাহলে আমার তরফ থেকে আপত্তি শোভা পাবে না। আশা করি এই বাধাটুকুতে বাঙালি ছেলেদের পরাভব হবে না। ইতি ১।৮।৩৯

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যাঁদের কাছ থেকে খবর নিতে গিয়েছিলুম তাঁরা আমাকে অসম্পূর্ণ সংবাদ দিয়েছিলেন, অন্তত তাঁদের কথা থেকে আমি এই বুঝেছিলুম যে উত্তর-পশ্চিমের বিদ্যালয়ে বাঙালী ছেলেদের জন্য বাংলা শিক্ষার সুযোগ আছে কেবল মাত্র সেখানকার পরীক্ষার ভাষা হিন্দি বা উর্দু। আপনার পত্রে জানা গেল কথাটা বিশুদ্ধ সত্য নয়। অতএব এ

সম্বন্ধে মহাত্মাজি বা জহরলালকে কিছু লেখবার দায়িত্ব আমার আছে সে কথা স্বীকার করি। অবসর পেলেই চেষ্টা করে দেখব। ইতি ৪।৮।৩৯

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন।

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার অনুরোধ পালন না করা আমার পক্ষে কঠিন সেই জন্যই আপনার প্রস্তাবে রাজি হইলাম, নহিলে ভিড় করিবার ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না। অজিত প্রভৃতি দুই একজন এখানকার দলের লোক ইচ্ছা করেন বক্তৃতার দিনটা বৃহস্পতিবার না হইয়া বুধবারে পড়ে, তাহা হইলে তাঁহারা উপস্থিত থাকিতে পারেন।

আমি সেই সভায় উপাসনার কাজ করিব না, কেবল আমার যাহা বলিবার তাহা বলিব। কি বিষয় বলিব তাহা আগে থাকিতে জানাইয়া দেওয়া কঠিন কারণ, আমি যখন মুখে কিছু বলি তখন কি যে বলিব তাহা পূর্ব্বাহ্লে জানিবার কোনো উপায় আমার হাতে নাই। কিন্তু লিখিয়া পাঠ করি সে সময় এবং শাস্তি নাই। ইতি রবিবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

পূর্ণিমা অন্তর্হিত হইতেই অমাবস্যা আসিল। অর্থাৎ কালিতারা দেখা দিল। আসিয়া বলিল, যাবার আগের দিন সন্ধ্যের পর তোমাদের পূন্নিমে সুন্দুরী হঠাৎ আমাদের বাসায় গিয়ে উপস্থিত। বললেন, বউদি, চললাম। তোমায় আমাবস্যে সুন্দুরী বলে ক্ষেপিয়েছি কত দিন, কিছু মনে ক'রো না ভাই। লোককে রাগানো আমার একটা স্বভাব। তুমি কালো আর আমি সোন্দর বলে যে তোমায় আমাবস্যে বলে ডাকতাম, তা নয়। তোমায় দিদির মত মনে ক'রেই বলতাম ও-কথা। আমি যেন ওর ইয়ার! খয়ের খাবার যুগ্যি!

যোগমায়া বলিল, আমায়ও বললেন, তুলসী তলার মাটি মাথায় নিতে ইচ্ছে করে।

কালিতারা বলিল, ওই রকম! নিজেদের সংসারে ওদের কিসের অভাব, ভাই। তবু আমাদের মত গরিবদের বাড়ি পড়ে থাকতেই ওর ভাল লাগত। একটা ছেলে যদি আরেকটা ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে খাবার খায় ত—যে ছেলেটা খাবার পায় নি—তার যেমন চোখের ভাব—আমাদের পূন্নিমে সুন্দুরীরও সেই রকম চোখ আমি কত বার দেখেছি। এমন হ্যাংলা!

যোগমায়া মনে মনে বলিল, ঠিক। আমিও সেদিন দুয়োরের ফাঁক দিয়ে ওঁর দিকে ঠিক ওই রকম চোখেই ওকে চাইতে দেখেছি। হ্যাংলাই ত! প্রকাশ্যে বলিল, শুনছি নাকি ওঁর আবার বিয়ে হবে?

—বিয়ে? মেয়েমানুষের ক'বার বিয়ে হয়? মরণ!

দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল।

খানিক পরে কালিতারা বলিল, আপদ যে বিদেয় হ'ল—তোমার ভাগ্যি ভাল, ভাই। ওঁতে আমাতে কত দিন বলাবলি করেছি—একটা কেলেঙ্কারি না হয়।

যোগমায়া কথা কহিল না। কালিতারার এই কথাগুলি তার ভাল লাগে না। মন যাহাতে ভাল থাকে—তেমন কথা যেন কালিতারা বলিতেই পারে না আজকাল।

কহিল, মরুক গে ভাই, যে দোষ করবে—সে তার ফল ভোগ করবে। বিয়ে করে যদি ভাল থাকে—

—পোড়া কপাল! ভাল থাকবার মেয়েই কি না ও! দেখো, ও যদি না—

যোগমায়া তাড়াতাড়ি ওঘরে উঠিয়া গেল। ফিরিয়া আসিল সূচ-সুতা হাতে করিয়া। বলিল, কাঁথার ওপর একটা হাতী তুলছি, দিদি। ভাবছি নীল সুতো দেব। উনি বললেন, সবুজ দেও। মানাবে সবুজ?

—দূর, হাতীর গায়ে বরঞ্চ মেটে রং মানাতে পারে, সবুজ মানায় কখনও? ফিকে নীল রং মানাবে ভাল।

হ'তী নয়, পায়ের তলায় পদ্মর পাতা আর ফুল যো।

যোগমায়া বলিল, ঠিক বলেছ দিদি, যেন পদ্মবন ঙছে।

কালিতারা বলিল, হাতী নয়, হস্তিনী। পদ্মবন ভাঙতে র পারলে কই, যে পাকা মাহুত!

আবার সেই কদর্য্য ইঙ্গিত! কাঁথা রাখিতে গিয়া গমায়া ওঘরে একটু বিলম্বই করিল।

কালিতারা বলিল, উঠি, ভাদুরে বেলা আদুরে যায়। কটা কথা বলি ভাই, একটা টাকা ধার দিতে পার? পরশু ইনে পেলেই দিয়ে যাব?

—আমার কাছে ত টাকাকড়ি থাকে না।

—থাকে না! তবে যে চাবি ঝুলছে আঁচলে? কথাটা ন বিশ্বাসযোগ্য নহে।

যোগমায়া বলিল, ওগুলো বাহারে চাবি। উলুই চণ্ডীর ত দেখতে গিয়ে শাশুড়ী কিনে এনেছিলেন।

—ও হরি বল! চাবিই যদি হাত করতে না পারলে কিসের গিন্নিপনা করছ শুনি? না ভাই, একটা টাকা হয়—আট আনাই দাও। সত্যি বলছি খোকার বার্লি ই—

যোগমায়ার নিজের একটি আধুলি ও একটি সিকি পুঁজি ল—কালিতারার আগ্রহাতিশয্যে আধুলিটি সে বাহির রিয়া দিল।

কালিতারা সেটি আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, পরশু তরশু ঢুকুরে এসে দিয়ে যাব। দুয়োরটা দাও, আমি লাম।

সন্ধ্যার পর কালিতারা ছেলেকে ছড়া কাটিয়া ঘুম ড়াইতেছে শোনা গেল:

> ঘুম পাড়ানী মাসী পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো,
> বাটা ভরে কাটা গুয়ো গাল পুরে খেয়ো।
>
> * * *
>
> ওরে—খোকার আমার বিয়ে দেব হটমালার দেশে।
> তারা গাই বলদে চষে, হীরের দাঁত ঘষে,
> রুই মাছ পটলের শাক ভারে ভারে আসে।

রামচন্দ্র সেদিন রাত্রি দশটায় মিত্র-বাড়ির আখ্ড়া তে ফিরিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, ওদের ক'লকাতায় যাওয়া না। গিন্নিমা অমত করলেন। বললেন, ব্রাহ্মই হও—ব খ্রীষ্টানই হও ভাদ্দর মাসে বাড়ি থেকে বেরুতে দেব বাছা।

যোগমায়া বলিল, তা পূর্ণিমা ঠাকুর-ঝি একদিন ত এক ও এলেন না।

রামচন্দ্র বলিল, আমি চেষ্টা করছি যাতে এখান থেকে শীগ্‌গির বদলি হ'তে পারি।

—কেন, এ জায়গা ত মন্দ নয়?

ম্লান হাসিয়া রামচন্দ্র বলিল, না, মন্দ নয়—তবে আমার ভালও লাগছে না।

—কেন, বেশ ত গান-বাজনা নিয়ে আছ, আমারই বরঞ্চ ভাল না লাগবার কথা!

—তোমার আর ভাবনা কি, মায়া। সংসার আছে, তুলসী গাছ আছে, কত ছোটখাটো কাজ আছে।

—কি করি, তোমাদের মত আপিস করবার বরাত ত দেন নি ভগবান। যোগমায়া হাসিল।

—করবে আপিস? কর ত দেখ—রমেশবাবু ছুটি চাইছেন এক মাস, তোমায় একটিনি দিই।

—যাও, খালি ঠাট্টা! কেন ভাল লাগছে না—বললে না ত?

—এমনই, সব কথার কি মানে থাকে!

হয়ত থাকে না। থাকিলেও সে কথা লইয়া পীড়াপীড়ি করিতে পারে না যোগমায়া।

কিন্তু তাহার পরদিনই সন্ধ্যার পর রামচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া হাসিমুখে বলিল, আজই ওরা কলকাতায় যাচ্ছে।

—ভাদ্দর মাস ব'লে কেউ আপত্তি করলেন না?

—আপত্তি মানবে কে, পূর্ণিমার যা জিদ! সে ধনুকভাঙা পণ ক'রে বসেছে—কলকাতায় যাওয়া না হ'লে জলস্পর্শ করবে না।

—মেয়েমানুষের অত জেদ ভাল নয়। একটা লক্ষণের কাজ আছে ত।

রামচন্দ্র প্রত্যুত্তর করিল না। আজ সে বহু দিন পরে রান্নাঘরে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া যোগমায়ার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল, রান্না লইয়া রহস্যও করিল কত। আজ রাত্রিতেও রামচন্দ্রের বাহুবন্ধনে বন্দিনী হইয়া যোগমায়া নিজেকে পরম সুখী মনে করিল। পরম স্নেহভরে রামচন্দ্রের মাথার চুলে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে কহিল, ঘুমোও।

সহসা রামচন্দ্র আবেগকম্পিত স্বরে বলিল, সবাই যদি আমায় ত্যাগ করে—তুমি করবে না ত, মায়া?

যোগমায়া অঙ্গুলি সঞ্চালন থামাইয়া বলিল, স্ত্রী বুঝি আবার স্বামীকে ত্যাগ করে? কি যে বল!

রামচন্দ্র যোগমায়ার স্কন্ধদেশে মুখ গুঁজিয়া কহিল, কি জানি, আমার খালি ভয় হয়—কেউ বুঝি আমায় ছেড়ে গেল। যাকে আঁকড়ে ধরতে চাই—সে চলে যায় দূরে।

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, আমি ত কাছেই আছি।

রামচন্দ্র বাহুবন্ধন নিবিড় করিয়া গদ্‌গদ্ স্বরে বলিল, তাই থাক।

শীত শেষ হইয়া ফাল্গুন আসিল। প্রবাসে একটি বৎসর কাটিল যোগমায়ার। এবার ফাল্গুন অফুরন্ত আলস্য আনিয়াছে যোগমায়ার জন্য। এমন মিষ্ট হাওয়া, খালি আঁচল পাতিয়া মেঝেয় শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। সুরকীর মাজা মেঝে, বেশ লাগে শুইতে।

কালিতারা ত এক দিন রহস্য করিয়া বলিল, আজ কি বার ভাই? বুধ? তা হ'লে বলি—কিছু মনে করো না। এখানে এসে তোমার রূপ যেন খুলেছে, ভাই। বেশ একটু মোটাও হ'য়েছ।

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, তাই নাকি?

কালিতারা বলিল, তা ছাড়া রঙও তোমার ফরসা হ'য়েছে। যে সস্তা ইলিশ মাছ—খেলে নাকি সালসার কাজ করে।

তুমিও ত অনেক দিন ধরে মাছ খাচ্ছ, তবে মোটা হ'চ্ছ না কেন, দিদি?

পোড়া কপাল! অম্বলে অম্বলে শরীল পাত হ'য়ে গেল। যেমন ওনার, তেমনি আমার। ইলিশ মাছ কি বাড়ি ঢুকতে পায়, সিঙ্গি চুনো-চানা খেয়ে কাটাচ্ছি।

গতর লাগলে কি হবে, দিদি। যা শরীর টিস্ টিস্ করে আজকাল। রোগটোগ হ'ল নাকি, কে জানে!

শরীল টিস্ টিস্ করে। সত্যি?

হাঁ দিদি, গা বমি বমি—

হাসিতে হাসিতে কালিতারার দম আটকাইবার জো।

যোগমায়া মুখ শুকাইয়া বলিল, হাসছ কেন, দিদি?

হাসছি কি আর সাধে–সন্দেশ খাওয়াবার পালা আসছে কিনা, তাই। বলিয়া তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিতেই—লজ্জায় যোগমায়ার মুখ সিন্দুর বর্ণ ধারণ করিল। কালিতারা চলিয়া গেলেও সে তেমনই ভাবে বসিয়া রহিল। মনে পড়িল, রাধারাণীর কথা। আজ কতকাল হইল সই তাহার চিঠি দেয় নাই। যোগমায়ারই বা তাহাকে মনে পড়িয়াছে কই? নূতন জায়গায় নূতন সংসার লইয়া এমন মাতিয়া উঠিয়াছে যোগমায়া—পুরানো সঙ্গী-সাথীদের মনেই পড়ে না আর! কে জানে, সই এতদিনে শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়াছে কি না। যে পত্নীগতপ্রাণ সয়া—সইকে এত দীর্ঘ দিন বাপের বাড়িতে নিশ্চয়ই ফেলিয়া রাখে নাই। আবার সইয়ের শরীর সারিয়া উঠিয়াছে, আবার হয়ত—

কণ্টকিত দেহে যোগমায়া সইয়ের সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করিল। কে আসিতেছে আজ যোগমায়ার বুক পূর্ণ করিতে? যদি কালিদির অনুমানই সত্য হয়, স্বামীকে তার এ-কথা বলা উচিত। একলাটি বাসায় থাকিতে সে সাহস করে না। কিন্তু এ-কথা সে বলিবে কি করিয়া? লজ্জায় কোনরকমে চোখ কান বুজিয়া? না, যোগমায়া তা পারিবে না। উনি হয়ত না জানি কত ঠাট্টাই করিবেন।

বলি কি বলিব না এই চিন্তাই মনে অনবরত তোলা-পাড়া করিতে লাগিল। আনন্দ ও লজ্জার মধ্যে রীতিমত ঝগড়া বাধিয়া গেল, এবং শেষ পর্য্যন্ত লজ্জাকে পরাজয় মানিতে হইল।

সেই দিন রাত্রিতে যোগমায়া তন্দ্রামগ্ন রামচন্দ্রকে ঠেলিয়া বলিল, শুনছ?

অ্যাঁ! তন্দ্রার ঘোরে রামচন্দ্র উত্তর দিল।

আজকাল আমার শরীর বড় খারাপ যাচ্ছে।

শরীর খারাপ? মুহূর্ত্তে রামচন্দ্রের তন্দ্রা টুটিয়া গেল। চোখ কচলাইতে কচলাইতে সে বলিল, এ কথা বল নি কেন আমায়? অ্যাঁ! কালই ডাক্তার—

—ডাক্তার ডাকতে হবে না, সে সব কিছু নয়।

—তবে?

এইবার রাজ্যের লজ্জা যোগমায়ার ঘাড়ে চাপিল। তবু সে বালিসে মুখ গুঁজিয়া বলিয়া ফেলিল, কালিদি বললে—সবাইর ও রকম হয়। তা ছাড়া প্রথম বার—

আনন্দে রামচন্দ্র গায়ের চাদর ফেলিয়া দিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল; উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, সত্যি? সত্যি? তা হলে তোমায় ত মোটা রকম একটা বকশিশ দিতে হয়। এবং পরমুহূর্ত্তে নিবিড় চুম্বনের দ্বারা যোগমায়াকে পুরস্কৃত করিতেও সে ভুলিল না।

কেষ্টর মা ঘুঁটে দিতে আসিলে যোগমায়া বলিল, আমাদের বাড়িতে দু-একখানা কাজ ক'রে দিতে পারবে কেষ্টর মা?

—কেন পারব না বৌমা, আপনারা যদি অনুগ্রহ করে দেন, বসেই ত আছি।

যোগমায়া বলিল, উনি বলেছেন—আট আনা ক'রে মাইনে দেবেন। দু বেলা উঠোনটা ধুয়ে—বাসন ক'খানা মেজে—রান্নাঘরটা নিকিয়ে দেবে, পারবে ত?

একগাল হাসিয়া কেষ্টর মা বলিল, খুব পারব বৌ-ঠাকরোণ। যদি বলেন জলও তুলে দিতে পারি।

—না, লক্ষ্মণ জল তুলে দেয় রোজ। তা ছাড়া তুমি বুড়ো মানুষ—

—আর বৌমা, বুড়ো মানুষ বলে কি পোড়া পেট বোঝে? গরিব-দুঃখীর শরীল-অশরীল দেখ্‌তে গেলে চলে না। যদি বল, আর দু-আনা দিও—বাটনাটাও বেটে দেব।

—আচ্ছা, ওঁকে জিজ্ঞেস ক'রে বলব। উনি ত দুপুর বেলায় খেতে আসবেন।

—তা হ'লে আজ থেকেই নাগি? বৈকেলে আসব'খুন।

এখানে আসিবার মাসখানেক পর হইতে বেলা ১টার সময় রামচন্দ্র আহার করে। ঘণ্টাখানেক বিশ্রামান্তে পুনরায় আপিস যায়। আপিস আর বাড়ি যখন পিঠাপিঠি—তখন দশটায় নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া ওখানে গিয়া বসিবার কি প্রয়োজন?

একখানা পোষ্টকার্ডের চিঠি যোগমায়ার হাতে দিয়া রামচন্দ্র বলিল, মা লিখেছেন, পড়।

রামচন্দ্র স্নান করিতে গেলে যোগমায়া পড়িল:

শুভাশীর্ব্বাদঞ্চাগে,

পরে তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলাম। বধূমাতাকে এখন কাজকর্ম্ম বিশেষ কিছু করিতে দিবে না, একজন কাজ করিবার লোক রাখিবে। জল-আচরণীয় যেন হয়। আর সাত মাস পড়িলেই—বৈশাখের মাঝামাঝি আমি বধূমাতাকে আনিতে ওখানে যাইব। ছুটি পাইলে তুমিও রাখিয়া যাইতে পার। অধিক কি লিখিব, ভগবানের আশীর্ব্বাদে এ বাটীর প্রাণগতিক সব মঙ্গল। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে ও বধূমাতাকে জানাইবে। সদাসর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে ও পত্রপাঠ উত্তর দিবে। ইতি

মাথা মুছিতে মুছিতে রামচন্দ্র বলিল, সবখানি যে পড়ে ফেললে? তুমি বোশেখ মাসে বাড়ি চল, আমিও ছুটির দরখাস্ত ক'রে দিই। কেমন?

—বেশ ত। যোগমায়া ভাত বাড়িতে গেল।

আহার ও বিশ্রাম সারিয়া রামচন্দ্র আপিস চলিয়া গেলে যোগমায়া আর একবার পত্রখানি পড়িল। পড়িয়া যত্ন করিয়া কুলুঙ্গিতে রাখিয়া দিল। তারপর সূচ সূতা ও কাঁথা লইয়া বসিয়া সেই দিনের সদ্যসমাপ্ত হাতীটার পায়ের নীচেয় পদ্মপাতা ও পদ্মফুলের নক্‌সার উপর সূচ চালাইতে লাগিল।

সেলাই করিবার কালে আজকাল যোগমায়া প্রায়ই নাকিসুরে গুন্ গুন্ করিয়া গান গায়। গান নয়—ছড়া। কালিতারার অনুকরণ করিয়া সে কখনো লঘুচ্ছন্দে—কখনও বা টানিয়া টানিয়া আবৃত্তি করে:

> ধন, ধন, ধন—বাড়িতে ফুলের বন
> এ ধন যার ঘরে নেই তার বৃথাই জীবন।
> তারা কিসের গরব করে,
> কেন আগুনে পুড়ে না মরে।

কখনো বলে:—

> ধান ভানলে কুঁড়ো দেব—মাছ কুটলে মুড়ো দেব
> গাই বিয়োলে বাছুর দেব—চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।

টী শব্দটি দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া আপন মনেই সে হাসিতে থাকে।

অবশেষে বৈশাখ আসিল। বিদায়ের দিনও নিকট-বর্ত্তী হইল। রামচন্দ্রের ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে। মঞ্জুরী ইংরেজী লেখাটা যোগমায়ার সামনে ফেলিয়া ধরিয়া বলিল, এই দেখ, হুকুম হ'য়েছে ছুটির। কালই ভাল দিন আছে, যাত্রা করব। আজ মাকে চিঠি লিখে দিলাম।

যোগমায়া বলিল, কালই? বলিয়া পশ্চিম দিকের বাবুই-বাসা-অলঙ্কৃত তাল গাছটার পানে একবার চাহিল। তার মুখের আনন্দটা ঠিকমত পরিস্ফুট হইল না।

ছোট্ট উঠানে যেখানে পালং শাকের ক্ষেত ছিল—যোগমায়া রাঙা নটে বুনিয়াছে। ঘন ঠাস বুনানিতে সেখানটা লাল চেলি পাতিয়া দেওয়ার মত শোভা পাইতেছে। ওপাশের প্রাচীরের মাথা ছাড়াইয়া দু'টি পেঁপেগাছ উঠিয়াছে। ফুলে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া গিয়াছে। চালের উপর কুমড়ার লতা সতেজ হইয়াছে ও হলুদ বর্ণের ফুল ফুটিতেছে। কুয়াতলায় গেল বর্ষায় পোঁতা পাতি লেবুগাছটা জল পাইয়া অনেকগুলি নূতন শাখা বিস্তার করিয়া ঝাঁকড়া হইতেছে। রান্নাঘরের মাথা-বরাবর যে আমগাছটা উঠিয়াছে—আপিসের বড়বাবুরা আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন—ওটি নাকি কাটিয়া ফেলা দরকার। তা যোগমায়া না থাকিলে উঁহারা যাহা খুসি করুন, নিজের হাতে গাছ পুঁতিয়া নাকি কাটিয়া ফেলা যায়? কাল চলিয়া যাইবে, আবার কত মাস পরে ফিরিয়া আসিয়া ওই রাঙা নটের শোভা, পেঁপে ও কুমড়ার ফুল, চালার ওপাশের আমগাছটা বা ঝাঁকড়া লেবুগাছ সবগুলিই ঠিক এমনভাবে দেখিবে কিনা, কে জানে!

বাড়ি যাওয়ার আনন্দ ও বাসা ত্যাগের বেদনার মাঝে যোগমায়া দোল খাইতে লাগিল।

রাত্রিতে রামচন্দ্রকে বলিল, লক্ষ্মণকে ব'লো, গাছপালা যেন কিছু নষ্ট না হয়। আমি এসে—

রামচন্দ্র বলিল, আবার যে আমরা এখানে আসব—কে বললে তোমাকে ? আর আমরা আসব না।

কেন ? শুষ্ক মুখে যোগমায়া প্রশ্ন করিল। গাছগুলো তা হ'লে কি হবে ?

—যারা আসবে তারা ওর ফলভোগ করবে। বদলির বাসা এমনিই মায়া, একজন গাছ পোতে—আর একজন ফল খায়।

—না না, তুমি এখানেই বদলি হবার চেষ্টা করো।

বদলির চেষ্টা করতে পারি, হাত আমার নেই। ওপর-ওয়ালার মর্জ্জি।

কালিতারা চুল বাঁধিয়া ও সিঁথিতে সিঁদুর দিয়া যাত্রার আয়োজন সুসম্পূর্ণ করিয়া দিল। কেষ্টর মা পায়ে আলতা পরাইয়া দিল; তার পর হাঁড়ি সরা ও ফুটা বালতি ঘটি চাহিয়া লইয়া নিজের বাড়িতে রাখিয়া আসিল ও আঁচলের খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, আহা, তোমার জন্যে পেরাণডা আমার ডুকরে ডুকরে উঠছে—বৌমা। কি মনিষ্যিই ছিলে! আবার এস মা, রাঙা খোকা কোলে করে আবার এস।

কালিতারা ম্লান হাসিয়া বলিল, যে যায় সে আর আসে না, ভাই। কত বদলিই দেখলাম। তোমার জন্যে যেমন মন কেমন করছে—এমন কখনো করে নি ভাই। সেও আঁচলে চোখ মুছিতে লাগিল।

যোগমায়া তাহার খোকাটিকে কোলে করিয়া অনেকগুলি চুমা তাহার গালে দিয়া বলিল, চিঠি দেবে ত, দিদি?

কালিতারা বলিল, সবাই বলে চিঠি দিও, সবাই ভুলে যায়। প্রথম প্রথম দুই একখানা দেয়ও—কেউ কেউ, তার পর তুমিও যেমন! একটু চুপি চুপি বলিল, কুষ্ঠে থেকে বদলি হ'য়েছ ভালই হ'য়েছে, না হ'লে কর্ত্তাটিকে হারাতে, ভাই।

আজ কালিতারার কথায় যোগমায়া রাগ করিল না, হাসিমুখেই বলিল, সে ভাই গুরুজনের আশীর্ব্বাদ আর ওঁর দয়া। বলিয়া উপর পানে চাহিল।

সকলের কাছে বিদায় লইয়া ও তুলসী তলায় প্রণাম সারিয়া গরুর গাড়ি আসিলে জিনিসপত্রের স্তূপের মধ্যে উঠিয়া বসিল যোগমায়া। রামচন্দ্রের স্থান গাড়ির মধ্যে হইবে না। কতটুকুই বা পথ, সে হাঁটিয়াই যাইবে। পিছনের ঝাঁকড়া ডুমুর গাছ, পোস্টাপিসের অঙ্গনে আম কাঁঠাল বেল গাছ, হল্‌দে রঙের পোষ্টাপিস ও কোয়ার্টার, ছেলে কোলে ম্লানমুখী কালিতারা, লক্ষ্মণ ও ভুবন পিওনের অবগুণ্ঠনবতী বউ, মেয়ে ও দিগম্বর ছেলেগুলা—ক্রমে ক্রমে সব মিলাইয়া গেল। কেষ্টর মা চোখে আঁচল দিয়া বড় রাস্তার খানিক দূর পর্য্যন্ত আসিল ও বলিতে লাগিল, আবার এসো মা, রাঙা খোকা কোলে ক'রে—

বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা গেল শুধু তালগাছটা। বাবুই পাখীর বাসায় ভর্ত্তি তাল গাছটা। বৈকালের হাওয়ায় পাখীর বাসাগুলি এধার-ওধার দুলিতেছে, ঝড় উঠিলে কত বাসা যে ভাঙ্গিয়া যায়! ছইয়ের গলুই দিয়া যেটুকু আকাশ দেখা যায়—তাহার বর্ণ না নীল, না ধূসর। কিংবা অশ্রুতে ঝাপ্‌সাদৃষ্টি যোগমায়ার চোখে সে আকাশের বর্ণ নাই। পাতার সঙ্গে ধুলা উড়িতেছে, বুঝি ঝড়ই উঠিয়াছে!

ক্রমশঃ

পথ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

কবে কা'র কাছে পেয়ে কিসের ইসারা
পথখানি চলে' চলে' হ'ল দিশাহারা!
শত মুখে তাই বুঝি শত দিকে ধায়;
বাঞ্ছিত-সন্ধান আর কোথাও না পায়।

কত নদী, কত গিরি, কত-না কান্তার,
সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি সিন্ধু হয়ে পার,
শীতে-গ্রীষ্মে-বরষায়, রৌদ্রে-ঝড়ে-জলে
অন্তহীন অভিসার শুধু বেড়ে' চলে!
দিগন্তের বাঁকা ভুরু শুধু পরিহাসে
পথিকে ভুলায় তার চির-মোহপাশে!

দিনের বেড়ার শেষে অন্ধকার রাত,
তার পরে আসে ফিরে' আলোর প্রভাত;

এই যাত্রা, এই গতি—কি যে তা'র মানে,
ইঙ্গিতে চলিছে যার, সেই বুঝি জানে!

উত্তর-পশ্চিমের মুসলমান বৈষ্ণব কবি

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বাংলা দেশে অনেকগুলি মুসলমান বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে জানা যায়। নসির মামুদ, সালবেগ, সৈয়দ মর্ত্তুজা, আকবর শাহ প্রভৃতি বহু মুসলমান কবি যে বৈষ্ণব ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এ কথা বৈষ্ণব সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই জানেন। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদও কয়েকজন মুসলমান বৈষ্ণব কবির পরিচয় দিয়াছেন, যাঁহারা রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। গরিব খাঁ নামক একজন কবি শুধু বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, বৈষ্ণব রস-তত্ত্বেও ডুবিয়াছেন। রাইকানু একতনু হইয়া যে নদীয়ায় আসিয়া গৌর হইয়াছেন, এ নিগূঢ় তত্ত্বও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না :

গরিব কয় ধরমূ বলে ডুবে পেলে না
তাই ক্ষেপে' নদেয় এসেছে।

বাংলায় আর একজন মুসলমান কবি গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়াছেন। পদটি এই :

জীউ জীউ মেরে মনোচোরা গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা।
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া।
ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া॥
পদ দুই চারি চলু নট নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়া॥
ঐছন পহুঁক যাঙ বলিহারি।
সাহ আকবর তেরে প্রেমভিখারী॥
—গৌরপদতরঙ্গিণী

এই শাহ আকবর কে ছিলেন, তাহা জানা যায় না। ইনি যে আকবর বাদশাহ নহেন, তাহা না বলিলেও চলে। কারণ ঐ পদটির মধ্যে যে গৌরপ্রীতি দেখা যায়, তাহার কোনও নিদর্শন সম্রাট্ আকবরের চরিত্রে ঘুণাক্ষরেও পাওয়া যায় না।

কিন্তু ঐ একই সময়ে খানখানান আবদুর রহীম খান বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি যে প্রীতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায়। আবদুর রহীম আকবরের অভিভাবক বৈরাম খানের পুত্র ছিলেন। তিনি নিজেও একজন অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ এবং যোদ্ধা ছিলেন। মোগল সম্রাটের সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তিনি কাব্যলক্ষ্মীর সেবা করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার দান এত অধিক ছিল যে, অনেকে তাঁহাকে দাতাকর্ণের সহিত তুলনা করিত। আকবরের এক সভাকবি ছিলেন, তাঁহার নাম গঙ্গ। এই কবিকে রহীম ছত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। আবদুর রহীম একবার বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কোপে পড়িয়া সর্বস্বান্ত ও কারারুদ্ধ হন। রহীম তুলসীদাসের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। রহীমের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে দোহাবলী, সতসই, রাসপঞ্চাধ্যায়ী প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। রহীমের কৃষ্ণভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নলিখিত পদে :

অনুদিন শ্রীবৃন্দাবন ব্রজ তেঁ শ্রাবণ আবন জানি।
অব রহীম চিত তেঁ ন টরতি হায় সকল শ্যামকী বানি।
—হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস, পৃ. ১৮৫

উত্তর-পশ্চিমের আর একজন মুসলমান কবি বৈষ্ণব ভক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম কি ছিল, তাহা জানা যায় না। কবিতার ভণিতায় ইনি আপনাকে 'রসখান' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। রসখান বাদশাহ-বংশসম্ভূত ছিলেন (খানদান), এ কথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। যত দূর জানা যায়, তাহাতে রসখান দিল্লীর একজন পাঠান সরদার ছিলেন। ইঁহার রচিত 'সুজান রসখান' ও 'প্রেমবাটিকা' নামক পদ্যগ্রন্থদ্বয় পাওয়া যায়। প্রেমবাটিকা ১৬৭১ সংবৎ অর্থাৎ ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।

বিধু সাগর রস ইন্দু সুভ বরস সরস রসখানি।
প্রেমবাটিকা রচি রুচির চির হিয় হরষি বখানি।

এই সময়ে বঙ্গদেশেও বৈষ্ণব কাব্য ও সঙ্গীতের স্বর্ণ যুগ চলিতেছিল। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের, প্রভাবে বঙ্গ ও উৎকল কীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিয়াছিল। বাংলার অধিকাংশ বৈষ্ণব কবি এই যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পঞ্জাবে নানকজী হইতে যে ভক্তিবাদের ধারা প্রবাহিত হয়, মিথিলায় বিদ্যাপতির মধ্যে যে-ধারার পরিণতি দেখা যায়, উত্তর-পশ্চিমে সুরদাস, তুলসীদাস ও বল্লভাচার্যের দ্বারা সেই ধারারই পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয় সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গালী কবিরা যে উত্তর-পশ্চিমের বৈষ্ণব কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, অথবা উত্তর-পশ্চিমের কবিরা যে বাঙ্গালী কবির নিকট হইতে তাঁহাদের

প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে অবশ্য এখনও যথেষ্ট অনুসন্ধান হয় নাই। সুরদাস যখন তাঁহার 'সুর সাগর' গোকুলে বসিয়া রচনা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই বৃন্দাবনে রূপ-সনাতন, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি গোস্বামিগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইঁহাদের মধ্যে কোনও সংস্রব ছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। মীরা বাঈয়ের সম্বন্ধে প্রবাদ কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু সুরদাসের সম্বন্ধে প্রবাদও নীরব। অথচ সুরদাসের পদাবলীর সহিত বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির এমন অদ্ভুত সাজাত্য কিরূপে আসিল, তাহা বুঝা যায় না।

রসখানের পদাবলীর সহিতও বাংলা পদাবলীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। রসখান যে-রসটিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও বৈষ্ণব রসতত্ত্বের মধ্যে একটি বিশিষ্ট রস; তিনি সখ্যরসের উপাসক ছিলেন। এই রসের সাধক খুব বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার এই আবেশ ছিল যে, তিনি কৃষ্ণের সহিত নিত্য গোচারণে যাইতেন। তাঁহার কবিতায় মধুর বা শৃঙ্গার রসেরও অভাব নাই। তিনি একটি কবিতায় গোপীভাবের আবেশে বলিতেছেন:

মোর পখা সির উপর রাখিহোঁ
গুঞ্জকী মাল গরে পহিরৌংগী।
ওঢ়ি পিতম্বর লৈ লকুটী বন
গোধন গ্বারনি সঙ্গ ফিরৌংগী।
ভাবতো সোই মেরো রসখান সো
তেরে কহে সব স্বাংগ ভরৌংগী।
যা মুরলী মুরলীধর কী
অধরান ধরী অধরা ন ধরৌংগী।

আমি শিরোপরি ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিব, গলে গুঞ্জামালা পরিব। পীতাম্বর পরিয়া, লাঠি লইয়া গোধন গোয়ালিনীর সঙ্গে বেড়াইব। (রসখান বলেন) তিনি যে অভিপ্রায় করেন (অথবা তিনিই যখন আমার প্রিয় তখন) তিনি বলিলেই আমি তাহা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করিব। (কিন্তু) যে মুরলী মুরলীধর অধরে ধারণ করেন, আমি তাহা অধরে স্পর্শ করিব না। (কারণ মুরলী আমাকে বঞ্চিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পান করিতেছে।) রসখান ভাবাবেশে গরু চরাইতেন, শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণু শুনিয়া বিভোর হইতেন, আর তাঁহার রূপ-সুধারস পান করিবার জন্য পাগল হইয়া যাইতেন।

মত্ত ভয়ো মন সঙ্গ ফিরৈ
রসখানি সুরূপ-সুধারস ঘূটয়ো।

এবং নদী যেমন সাগরে মিলিতে ছুটিয়া যায়, সেইরূপ ভাবে মন কূলের বাঁধ ভাঙিয়া ফেলে—

সাগর কোঁ সরিতা জিমি ধাবতি
রোকি রহে কুল কো পুল টুট্যো।

রসখানজী শ্যামের রূপ এই ভাবে আস্বাদন করিয়াছেন,

সুন্দর স্যাম সিরোমণি মোহন
জোহন মেঁ চিত চোরতু হ্যায়।
বাঁকী বিলোকনি কী অবলোকনি
নোকনু কৈ দৃগ জোরতু হ্যায়।
রসখানি মনোহর রূপ সলোনে কো
মারগ তেঁ মন মোরতু হ্যায়।
গ্রহ-কাজ সমাজ সবৈ কুল লাজ
ললা ব্রজরাজ কো তোরতু হ্যায়।

সুন্দর শ্যাম মোহন-শিরোমণিকে অনুসন্ধান করিতেই আমার চিত্ত চুরি করিয়াছে। সুন্দর নয়নের যে অবলোকন তাহা দেখিলাম—নাসিকার উপর চক্ষু দুইটি যেন যুক্ত হইয়াছে। রসখান বলিতেছেন, সুন্দর মনোহর রূপ আমার মনের পথ ফিরাইয়া দিয়াছে, (অর্থাৎ অন্য পথে যাইতে গেলে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে) ব্রজরাজের লালা (কিশোর তনয়) গৃহকাজ, সমাজ, সমস্ত কুললাজ ভাঙিয়া দিল।

রসখানের একটি দানের পদ আছে:

দানী ভয়ে নয়ে মাঙ্গত দান
সুনৈ জু-পৈ কংস তৌ বাঁধিকৈ জৈহো।
রোকত হো বন মে রসখানি
পসারত হাথ ঘনো দুখ পৈহো॥
টুটে ছরা বছরা অরু গোধন
জো ধন হ্যায় সু সবৈ ধরি দৈহো।
জৈহৈ অভূষণ কাহু সখী কো
তো মোল ছলা কে ললা ন বিকৈহো।

দানী হইয়া নূতন দান চাহিতেছ; কংস যখন শুনিবে তখন তোমাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। রসখান বলিতেছেন, বনের মধ্যে পথ রোধ করিয়া (দানের জন্য) হাত পাতিতেছ, ইহাতে অত্যন্ত দুঃখ পাইবে। যদি হার ছিঁড়িয়া যায়, তবে তোমার গরু-বাছুর সব ধরিয়া লইয়া যাইবে। যদি কোনও সখীর অলঙ্কার যায়, তবে হে লালা তোমাকে বেচিলেও হারের দাম পরিশোধ হইবে না।

এই দানের পালা লইয়া বাংলা দেশে বেশ একটু কৌতুককর আলোচনা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে দানলীলার প্রসঙ্গ নাই। এ দানলীলার ব্যাপার কোথা হইতে আসিল, ইহাই প্রশ্ন। এতদ্দেশে দানলীলার প্রাচীনতম প্রামাণিক বর্ণনা পাওয়া যায় শ্রীরূপ গোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী'

এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'দানকেলিচিন্তামণি'তে। দানকেলিকৌমুদী নামক ভাণিকা রচিত হয় ১৪৭১ শকে—

গতে মনুশতে শাকে চন্দ্রস্বর সমন্বিতে
নন্দীশ্বরে নিবসতা ভাণিকেয়ং বিনির্মিতা।

ইহারই অল্প পরে দানকেলিচিন্তামণি রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে রূপগোস্বামীর নাম আছে। ভক্তিরত্নাকরে রঘুনাথ গোস্বামীর এই গ্রন্থ দানচরিত নামে উল্লিখিত হইয়াছে:

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়।
স্তবমালা নাম স্তবাবলী যারে কয়।
শ্রীদানচরিত মুক্তাচরিত মধুর
যাহার শ্রবণে মহা দুঃখ যায় দূর।

দাস গোস্বামীর দানচরিত বলিয়া কোনও গ্রন্থ নাই। কাজেই দানকেলিচিন্তামণিকে নরহরি চক্রবর্ত্তী দানচরিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

সুরদাস অনুমান ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কবিতায় দানলীলার উল্লেখ আছে। সুরদাসের দানলীলার পদাবলী এখনও গীত হইয়া থাকে। রসখানের দানলীলা সম্বন্ধে পদ রহিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে দানলীলা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোনও পূর্বতন সংস্কৃত কাব্য ছিল, যাহা হইতে পশ্চিম দেশীয় কবিরা এবং বঙ্গদেশীয় মহাজনেরা প্রেরণা পাইয়াছিলেন। সুরদাস এবং রূপ-গোস্বামী সমসাময়িক কবি; কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ইঁহাদের মধ্যে এক জন যে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে রসখানজীর দানের পদে যে ভাবটি রহিয়াছে, বঙ্গদেশীয় দানলীলার পদাবলীতে ঠিক সেই ভাবটি আমরা দেখিতে পাই:

গায়ের গরবে তুমি চলিতে না পার জানি
রাজপথে কর পরিহাস।
রাজ ভয় নাহি মান কংস দরবার জান
দেখি কেনে নহ এক পাশ॥—জ্ঞানদাস

অন্য একটি পদ:

সহজই তুহুঁ সে অধীর।
ধর কুলবধূগণ চীর।
রাজভয় নাহিক তোহার।
পথ মাহা এতহুঁ বেভার।—রাধাবল্লভ দাস

দানলীলার মধ্যে কাব্য-বৈচিত্র্য এই যে গোপীরা দধিদুগ্ধঘৃতের পসরা সাজাইয়া চলিয়াছেন, আর পথের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট 'দান' সাধিতেছেন অর্থাৎ শুল্ক চাহিতেছেন। গোপীরা তাঁহাকে কংস রাজার ভয় দেখাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন। ইহাদের মধ্যে যে উক্তি-প্রত্যুক্তি তাহা কাব্যরসে সরস হইয়া উঠিয়াছে। দান চাহিবার ছলে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাধার রূপবর্ণন, এবং প্রেম নিবেদন অনাবিল কাব্যসম্পদে ভূষিত। কৃষ্ণ-কীর্তনেই কেবল ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। রসখানের কবিতায়ও যে কাব্যকলা আছে, তাহাও উপভোগ্য। রাধিকা বলিতেছেন—সখীগণের কোনও ভূষণ যদি তুমি ছিঁড়িয়া দেও বা নষ্ট কর তাহা হইলে তোমাকে বেচিলেও তাহার মূল্য হইবে না। কেননা তুমি ধেনুর রাখাল!

রসখানজী যে এক জন ভক্ত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি শ্রীবৃন্দাবনের পশুপাখী হইয়া থাকিতে পারিলেও আপনাকে ধন্য মনে করেন, অন্য কিছু কামনা করেন না।

মানুষ হৌ তো বহা রসখান
বসৌ ব্রজগোকুল গাঁব কে গ্বারন।
জো পশু হোঁ তো কহা বশ মেরো
চরৌ নিত নন্দকী ধেনু মঁঝারন॥
পাহন হৌঁ, তো বহী গিরি কো
জো ধর্যো কর ছত্র পুরন্দর-ধারন।
জো খগ হৌ তো বসেরো করৌ
মিলি কালিন্দী-কূল-কদম্ব কী ডারন।

যদি মানুষ হই, তবে (রসখান বলেন) যেন ঐ ব্রজ-গোকুল গ্রামের গোয়ালা হইয়া বাস করি। যদি পশু হই, তবে নন্দের ধেনুর মধ্যে যেন চরিতে পারি। যদি পাষাণ হই, তবে যেন গিরি-গোবর্দ্ধনের পাষাণ হই—যে গোবর্দ্ধনকে শ্রীকৃষ্ণ ছত্ররূপে ধারণ করিয়াছিলেন। যদি পাখী হই, তবে যেন কালিন্দী-কূল-কদম্ব তরুর ডালে বাস করিতে পারি।

আমরা ইহাই জানি যে শ্রীবৃন্দাবন বাঙালীরই সৃষ্টি। বাঙালী কবিরাই নানা ছন্দে ইহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দী কবিদের মধ্যেও ইহার প্রভাব যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বংশী-অলি নামে একজন কবি অষ্টাদশ বিক্রমসংবতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য কিশোরী-অলির একটি প্রসিদ্ধ পদ আছে:

শ্রীবৃন্দাবন বৃন্দাবন বৃন্দাবন কহরে।
বৃন্দাবন রজ কী তু সরন বেগি গহরে॥

বৃন্দাবনের রজে গড়াগড়ি দিতে বিলম্ব করিও না।

আর একজন কবি বলিতেছেন:

প্রথম যথামতি প্রণউঁ শ্রীবৃন্দাবন অতি রম্য।
শ্রীরাধিকা কৃপা বিনু সব কে মননি অগম্য॥
হিত হরিবংশ (১৫৫৯ সংবৎ)

বাঙালী কবিও গাহিয়াছেন:

মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।—নরোত্তম দাস

শুধু বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য-প্রচারে নহে, রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধেও উত্তর-পশ্চিমের কবিদের সহিত বাঙালী মহাজনদের যথেষ্ট মিল দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে হইলে মূর্তিমতী ভক্তিরূপিণী শ্রীরাধিকার আরাধনা আবশ্যক। ভগবান্ যে ভক্তির দাস এই কথাটি বৈষ্ণব কবিরা বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন। এমন কি মুসলমান কবি রসখান তাঁহার একটি কবিতায় সেই ভাবটি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, বেদে, পুরাণে ব্রহ্মকে খুঁজিলাম, পাইলাম না; কত নরনারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই সন্ধান দিতে পারে না; দেখিলাম, তিনি নিভৃত কুঞ্জ-কুটীরে রাধিকার পদসেবা করিতেছেন!

দেখো দুরুয়ো বহ কুঞ্জ-কুটীর মেঁ
বৈঠয়ো পলোটতু রাধিকা-পায়ন।

রসখান প্রেমভক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পদাবলী লালিত্যে ও সরলতায় অপূর্ব। ইঁহার জীবনকথা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। একটি প্রবাদ আছে যে তিনি একজন রমণীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু বিল্বমঙ্গলের চিন্তামণির ন্যায় এই রমণী তাঁহার প্রেমের সমাদর করিত না। সে অত্যন্ত অভিমানিনী ও রূপগর্বিতা ছিল। রসখান এক দিন ঘটনাক্রমে শ্রীমদ্-ভাগবতের একটি উর্দু অনুবাদে দেখিলেন যে ব্রজের সহস্র সহস্র গোয়ালিনী শ্রীকৃষ্ণকে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই হইতে রসখান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং শ্রীনাথজীর একখানি চিত্র দেখিয়া মোহিত হইলেন। অতঃপর এই প্রেমিক কবি তাঁহার সমস্ত প্রেম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলেন এবং বৃন্দাবনে গিয়া সাধন-ভজনে আত্মনিয়োগ করিলেন। নিম্নলিখিত কবিতায় ইহার আভাস পাওয়া যায়:—

তোরি মানিনী তেঁ হিয়ো ফোরি মোহিনী-মান।
প্রেম দেব কী ছবি হিঁ লখি ভয়ে মিয়াঁ রসখান॥

প্রেম দেবতার ছবি দেখিয়া, তোমার মোহিনী মায়া অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়া রসখান শ্রেষ্ঠ (মিঞা) হইল।

'২৫২ বৈষ্ণবন কী বার্ত্তা' নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ দেখা যায়। রসখান প্রথমে এক বানিয়ার পুত্রের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে তাহার উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত ভোজন করিতেন। এক দিন কয়েকজন বৈষ্ণবের মধ্যে কথা হইতে হইতে একজন বলিয়া উঠিল যে ঐ বানিয়ার ছেলের প্রতি রসখানের যেরূপ ভালবাসা, ভগবানের প্রতি কাহারও যদি ঐরূপ হইত! কথাটা রসখানের কানে পৌঁছিল। তখন তিনি ভগবানের রূপ কেমন তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাঁহাকে একজন শ্রীনাথজীর চিত্র দেখাইল। সেই অবধি তিনি বণিকপুত্রের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনাথজীর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। রসখান অতঃপর বল্লভাচার্য স্বামীর পুত্র বিঠ্ঠলনাথের শরণাপন্ন হইলেন এবং বিঠ্ঠলনাথজি তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া রসখানকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন, জাতি-ধর্মের বিচার করিলেন না।

'স্বপ্নো নু মায়া নু'

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখি—কেলিকুঞ্জে মাধব-রাধিকা:
অভিসারে এলো প্রিয়া, প্রিয়তম কুসুম-শয়নে,—
বঁধুর আদর লোভী, নিদ্রা আনে কপটী নয়নে;
গোপন চুম্বন-চোর্যে ধরা পড়ে বক্ষে প্রাণাধিকা।
কোথা রাধা, কৃষ্ণ কোথা;—তুমি মোর উত্তরসাধিকা
বক্ষে এলে চন্দ্রকান্তি মিলনের আনন্দ চয়নে,
সর্ব-সমর্পণ-ব্রত পূর্ণ করি' পুণ্য প্রেমায়নে
দুই হাতে দুই স্বর্গ দিলে তুলে মৌন-আরাধিকা।

মনে হ'ল আমি আজ বাসবেরো চেয়ে ভাগ্যবান,
যে সুধায় অমরত্ব ওষ্ঠাধরে আছে সেই সুধা—
প্রেমপাত্রে পান করি' সুধাকণ্ঠ আমি মৃত্যুঞ্জয়।
কোথা মুক্তি মুমুক্ষুর? ভক্ত-আশা কোথা ভগবান্?
দুই বাহু প্রসারিয়া বাঁধিয়াছে আমারে বসুধা;
এ বন্ধন স্বপ্ন যদি—যদি মায়া—তারি হোক্ জয়।

ভারতীয় নৃত্যকলা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভারতীয় নৃত্যকলা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মতই পুরাতন। সঙ্গীত-বিদ্যা, নাট্য-শাস্ত্র ও চিত্রকলার মত ইহা প্রাচীন ভারতে শিক্ষার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। শিবের অন্য নাম নটরাজ। তিনি নৃত্য-কলার স্রষ্টা বলিয়া



নৃত্যরতা শ্রীমতী রুক্মিণী এরাণ্ডেল

শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। নৃত্য-বিদ্যা ভারতের বহু স্থলে ধর্মের অঙ্গ হইয়া আছে। দক্ষিণ-ভারতের তীর্থক্ষেত্র-গুলিতে বিভিন্ন উৎসবকালে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় ও তীর্থযাত্রীরা ইহা দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন। সেখানকার কথাকলি নৃত্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

নৃত্য-কলার সঙ্গে হিন্দুধর্মের নানা আচার-অনুষ্ঠান-



নটেশ আয়ারের নৃত্যরতা কন্যাদ্বয় শঙ্করী ও ললিতা



নটেশ আয়ারের নৃত্যরতা পুত্র-কন্যা



নটরাজ-মূর্ত্তি



নৃত্যরতা মালতী। ডাঃ টি. এস্. এস্. রাজনের কন্যা

সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ইহা ধর্ম্মের অঙ্গ হইলেও, পূর্ব্ব যুগে সামন্ত নৃপতিরা তাঁহাদের পরিবারে ও দরবারে ইহার অনুষ্ঠান করাইতেন। ইহা সে যুগে সাধারণ আমোদ-প্রমোদের একটি অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। নৃপতিবর্গ এই বিদ্যার চর্চ্চায় বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন।

মধ্যযুগে অন্যান্য বিষয়ের মত নৃত্য-কলার নিয়মিত চর্চ্চা রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার মধ্যে অনেকটা ব্যাহত হয়।



সন্ন্যাসীবেশী কুমারের ভূমিকায় এফ. জি. নটেশ আয়ার

বর্ত্তমানে কিন্তু ইহার চর্চ্চা পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। ভারতীয় নৃত্যকলার পুনরুজ্জীবনের বিষয় বলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে রবীন্দ্রনাথের এবং পরে নৃত্যবিদ্ উদয়শঙ্করের কথা উল্লেখ করিতে হয়। তিনি রীতিমত শাস্ত্রীয় পদ্ধতির সঙ্গে মিলাইয়া নৃত্যকলার চর্চ্চা করিয়াছেন, এবং ইহা যে বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ হইয়া জনসাধারণের বিশেষ আমোদ ও কল্যাণের কারণ হইতে পারে, দেশ-বিদেশে নৃত্য-বিদ্যার বিশিষ্ট ভঙ্গী ও রূপ দেখাইয়া তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

দক্ষিণ-ভারতেও ভদ্রসমাজে নৃত্যকলার বিশেষ চর্চ্চা হইতেছে ইদানীং। রাগিণী দেবী একজন মার্কিন মহিলা। তিনি মালাবারের গোপীনাথের সঙ্গে কথাকলি নৃত্য চর্চ্চা



নৃত্যরত এন্. ত্যাগরাজন্

করিয়া ইহা সাধারণের নিকট প্রিয় করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। গোপীনাথের সহধর্ম্মিণীও এই নৃত্যে বিশেষ নিপুণা। উদয়শঙ্কর দুইজন কথাকলি-নৃত্যবিদ্ সঙ্গে লইয়া ভারতের বিভিন্ন দেশে গমন করেন। তাঁহাদের দ্বারা ভারতীয় নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গী ও ধারা বিশ্ববাসীর নিকট প্রচারিত হয়। থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ডক্টর জি. এম. এরাণ্ডেলের পত্নী শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী ও কুমারী বাল সরস্বতী নৃত্যকলায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতেছেন।

দক্ষিণ-ভারতে প্রাচীন নাট্যরীতি ও মণিপুরী রীতি উভয়েরই চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। মণিপুরী নৃত্য শান্তি-নিকেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়। ঐ অঞ্চলে যাঁহারা নৃত্য-বিদ্যায় দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিচিন-পল্লীর শ্রীযুক্ত এফ. জি. নটেশ আয়ারের সন্তান-সন্ততিদের নাম উল্লেখযোগ্য। আয়ার মহাশয় নিজে একজন বিখ্যাত নাট্যকার। ইংরেজী ও তামিল নাটক অভিনয়ে তিনি খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্যাগরাজন্ নৃত্যবিদ্ রূপে ইতিমধ্যেই দক্ষিণ-ভারতে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার অন্য পুত্র-কন্যারাও এ বিদ্যা নিয়মিত রূপে চর্চ্চা করিতেছেন।*

* গত জুলাই সংখ্যা মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত এল্. এন্. গুবিলের 'The Indian Dance' প্রবন্ধ অবলম্বনে।

বার্নার্ড শ'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মৃত্যুর বিজয়-ধ্বজা ওড়ে সব খানে,
দিগন্ত মুখর আজি কামানের গানে।
সমাজের শীর্ষে ব'সে উদ্ধত কাঞ্চন!
অনাদৃত মানুষের অমূল্য জীবন!
বিজয়ী প্রাণের তুমি অদম্য সৈনিক—
দেখা দিলে বে-পরোয়া, দুর্ব্বার, নির্ভীক।
ঝলকি উঠিল করে দুর্জ্জয় লেখনী—
বাসবের হস্তে যেন প্রচণ্ড অশনি।

মৃত্যুর বিরুদ্ধে সুরু হ'ল অভিযান।
ভালোর মুখোস-পরা কালো শয়তান
গণিল প্রমাদ! ত্রাসে কাঁপিল আঁধার।
কোটরে পেচকদল লাগালো চীৎকার
চলিয়াছ অন্ধকারে অকম্পিত পায়ে
চিরজয়ী আলোকের দামামা বাজায়ে।

পিওন

শ্রীসুশীল জানা

হাটের একধারে ঝুরি-বাঁধা বটগাছটার তলে ছোট-খাটো একটি জনতা পিওনের জন্যে উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করছে—বিরক্ত হ'য়ে উঠছে।

ওদের একজন অধৈর্য্য হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো। সুদূর পথের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে ব'ললো, আসবারও তো কোন নামগন্ধ দেখি না।—সেই কখন থেকে বসে আছি—

ওদের সকলেরই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। সব আলোচনা বন্ধ ক'রে দিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকে ওরা কিছুক্ষণ। হাটের বেচাকেনা, দরকষাকষি আর এক-আধটু কলহ—সমস্তটা মিলে একটা নিরবচ্ছিন্ন কলগুঞ্জনের সৃষ্টি করেছে। বট-গাছের তলে অপেক্ষমান ছোট জনতাটিও আস্তে আস্তে আলোচনা আরম্ভ করে আবার: মহাযুদ্ধের গতি, জয়-পরাজয়, মৃত্যুর অভিনব যান্ত্রিক আয়োজন—যুদ্ধরত বীভৎস পৃথিবী। ওদের আলোচনার মুখর উত্তেজনা—আর হাটের একঘেয়ে কলগুঞ্জন হঠাৎ এক-একটা দমকা হাওয়ায় গ্রামান্তের নিঃশব্দ শূন্যতায় অস্ফুট আর্ত্তনাদের মতো ছড়িয়ে পড়ে। হাটের পাশ দিয়ে ক্যানেল চলে গিয়েছে: কয়েকটি বিদেশী মহাজনী নৌকো নোঙর করেছে সেখানে। দু-একটি অলস গ্রাম্য কুকুর সশব্দে উত্তেজিত হ'য়ে উঠছে মাঝে মাঝে বিদেশী মুখ আর নৌকোগুলি দেখে। পশ্চিম দিগন্তে অন্তিম দিন বিষণ্ণ হ'য়ে এল।

তার পর দূরে পিওনকে দেখা গেল। কাঁধে ব্যাগ—মুখ নীচু ক'রে দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছে: ক্লান্ত আর ধূলি-ধূসর। বটগাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ালো সে—সকলে ঘিরে দাঁড়ালো তাকে। নাম ডেকে ডেকে ব্যাগের একগাদা খবরের কাগজ আর চিঠি-পত্র বিলি করতে আরম্ভ করলো পিওন।

নিবারণ রায়, কল্যাণপুর—

শশধর দাস, কল্যাণপুর—

মালতী দাসী C/o দ্বিজদাস সাঁতরা, সাতগাঁ—

চিঠিপত্র নিয়ে আস্তে আস্তে ভিড় সরে গেল পিওনের চার পাশ থেকে। কারুর মুখ শুকনো, কারুর হয়ত সুখবর আছে—হাসিখুশী মুখ। আর এক-একটি খবরের কাগজ ঘিরে হাটের এখানে ওখানে উত্তেজিত, উৎকর্ণ জটলা। একটু সুখ, একটু দুঃখ, একটু শোক, আর বিরাট্ পৃথিবী—ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, রুশিয়া।

হাটের ভিড়ের মধ্যে অলসভাবে কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে বেড়ালো পিওন। চার পাশে তার মুখর জনতা আস্তে আস্তে কমে এল; হাট ভেঙে এল। হাটের এক প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে রইল সে—হাটের জনতা তার সুমুখ দিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। নিঃশব্দে সে জনতার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার পর পোষ্ট আপিসের পথ ধরে মুখ নীচু ক'রে দ্রুতপায়ে আবার ফিরে চললো।

কিছু দূর এসে থমকে দাঁড়ালো সে।

—পিওন—এই পিওন। ছোট মেয়ে একটি পাশের কেয়াবনের পথ ধরে ছুটে আসছে তার দিকে। কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, চিঠি আছে পিওন?

—কার চিঠি?

—আমার দিদির!

পিওন একটু বিব্রত বোধ করে, ভালও লাগে। হেসে বলল, তোমার দিদির চিঠি তো বুঝলুম, কিন্তু নাম না বললে কি ক'রে জানবো!

—বাঃ, দিদির নাম জান না তুমি!

পিওন সহাস্যে অক্ষমতা জানাল মাথা নেড়ে।

কিন্তু পিওনের সকলকে চেনা উচিত, পৃথিবীর সকলকে: মেয়েটি হতাশ আর অবাক হ'য়ে পিওনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার পর আস্তে আস্তে বলল, আমার দিদির নাম মুকুল।

—আর তোমার নাম? সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলো পিওন।

—বাঃ, আমার নামও জান না তুমি!

—না তো!

—বাঃ, সবাই তো জানে—আমার নাম পুতুল!

—ঠিক ঠিক—এবার মনে পড়ছে বটে। পিওন গম্ভীর-ভাবে মাথা নেড়ে নেড়ে বলল। তার পর হেসে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের বাড়ী কোন্‌টা?

—ওই তো কেয়াবনের ওপাশে।

তার পর অনেক কথা বলে মেয়েটি: শহর থেকে নতুন

এসেছে তারা গ্রামের বাড়ীতে যুদ্ধের গোলমালের জন্যে। তার দিদির বিয়ে হয়েছে এই চার-পাঁচ মাস, স্বামী থাকে শহরে—চাকরি করে। এমনিতরো অনেক কথা অনর্গল ব'লে চলে মেয়েটি। শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে পিওন। তার পর হঠাৎ মনে পড়ে যায়: পোষ্ট-আপিসের কিছু কাজ তখনও বাকী। ফিরে গিয়ে সেটুকু সেরে নিতে হবে। কাল ভোরে আবার ছুটতে হবে নদীচরের হাট—আজ ফিরে গিয়েই চিঠিপত্র গুছিয়ে নিতে হবে। তার পর রাঁধা-খাওয়া। সে একা, সব তাকে নিজেকেই ক'রে নিতে হয়।

পথের পাশের দিগন্তছোঁয়া মাঠে অন্ধকার ঘন হ'য়ে এল।

পিওন বলল, তোমার দিদির চিঠি এলে তখন দেব।

তার পর পোষ্ট-আপিস-মুখো এগিয়ে চলল সে হন্ হন্ ক'রে।

পেছন থেকে পুতুল ডেকে বলল, কাল আসবে তো পিওন?

—আচ্ছা।

তার পর ভোর থেকে আবার সেই মুখ নামিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলা, দিনের পর দিন।

একটি ছোট মেয়ে কোথায় কোন্ কেয়াবনের পাশে তার জন্যে অপেক্ষা করছে—সারা দিনের দ্রুতধাবমান মুহূর্ত্তগুলির মধ্যে একবারও মনে পড়ল না তাকে। দূর গ্রাম-গ্রামান্তরের হাট আর তার মধ্যে অপেক্ষমান উৎকণ্ঠিত জনতা। পোষ্ট আপিস আর তারই পাশ ঘেঁষে তার থাকবার ঘরটুকুতে কয়েক ঘণ্টার নিঃসঙ্গ বিশ্রাম। কোথা থেকে বদ্‌লি হ'য়ে এসেছে সে এখানে—আত্মীয়-পরিজনবিহীন প্রবাসী। তাকে চেনে সকলে—কিন্তু তার সে অবকাশ নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত শুধু তার দ্রুতধাবমান ভারবাহী দিনগুলি।

তার পর এক দিন মুকুলের চিঠি এল।

সেই কেয়াবনের পাশটিতে তার দেখা হ'ল পুতুলের সঙ্গে।

পুতুল বলল, ক'দিন কোথায় ছিলে পিওন। আমার দিদির চিঠি কোথায়!

—চিঠি,—না?—কিছু যেন মনে করবার চেষ্টা করে পিওন। তোমার দিদির নাম কি বল ত?

—বাঃ, এরই মধ্যে তুমি ভুলে গিয়েছ সব। সেদিন বললুম যে, আমার দিদির নাম মুকুল!

আবার যেন নতুন ক'রে আলাপ হয় ওদের। মেয়েটিকে ভাল লাগে পিওনের। কত রকমের অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে পুতুল: বিরাট্ পৃথিবী আর দেশ-দেশান্তর। অবাক্ বিস্ময়ে পিওনের মুখের দিকে তাকায় সে—অভিব্যক্তিহীন একটি অপরিচিত মুখ, কাঁধে চামড়ার ব্যাগ—আর অদ্ভুত পোষাক। তার কল্পনাতীত বিপুল ধরণীর আদিঅন্তহীন এক পটভূমিকায় পিওন শুধু ছুটে চলেছে অপরিচিত কত দেশ—কত দেশান্তরে।

কেয়াবনের ধারে রোজ সে দাঁড়িয়ে থাকে পিওনের জন্যে। কিন্তু প্রত্যেক দিনই মুকুলের চিঠি আসে না—পিওনও আসে না রোজ। তবু সে দাঁড়িয়ে থাকে। বেলা যখন শেষ হ'য়ে আসে, তখন পিওনকে দেখা যায়: দূর মাঠের ওপাশের পথ দিয়ে পোষ্ট আপিসের দিকে মুখ নীচু ক'রে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে।

—পি-ও ন—

চীৎকার ক'রে ডাকে পুতুল—আর হাত নাড়ে।

পিওনও হেসে হাত নাড়ে: ভাল লাগে তার এই ফুটফুটে মেয়েটিকে।

কোন কোন দিন সে কেয়াবনের পাশ দিয়েই ফেরে।

—আজ অনেক দূর থেকে তুমি এলে—না পিওন? পুতুল জিজ্ঞেস করে। কোন্ দিকে গিয়েছিলে আজ?

—ঐ দিকে।

কত দূর মাঠের পর মাঠ—আর দিগন্তের কোলে ঝাপসা বনরেখা। সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পুতুল বলে, অনেক দূর—না?

কল্পনায় পুতুলের পৃথিবী নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছে সেখানে।

—ওঃ, কত দূরে তুমি যাও পিওন। তোমার ভয় করে না? আচ্ছা, ওখানে লোক আছে?

পুতুলের সে এক গল্পের পৃথিবী। অনভিজ্ঞ ছোট্ট এই মেয়েটিকে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা—অনেক গল্প বলে সে। ভারী কৌতুক বোধ করে।

—তুমি রোজ কেন আস না পিওন। পুতুল ঠোঁট ফুলিয়ে বলে। তোমার জন্যে আমি রোজ দাঁড়িয়ে থাকি।

তার পর রোজ আসে পিওন—ফেরার পথে কেয়াবনের পাশ দিয়ে ঘুরে যায়। বিকেলে কেয়াবনের বিষণ্ণ ছায়ায় একটি নতুন জগৎ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। কর্ম্মক্লান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাস-জীবনের পরিশ্রান্ত আর বিশ্রামকাতর বিকেলগুলি পিওনের, কেয়াবনের এক প্রান্তে এসে পুতুলের অসংখ্য কল-কাকলীতে ভরে যায়।

—জান পিওন, আজ একটা শেয়াল দেখেছি—এই এক্ষুনি! আমাকে দেখে কেয়াবনের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে গেল।

—ওটা শেয়াল নয়—ভূত।

—ভূত!

—হুঁ আসতে আসতে আমিও দেখলুম কিনা। শেয়ালটা একটা ঘোড়া হ'য়ে গেল। যেমনই চড়তে যাব, অমনই সেটা একটা মাছি হ'য়ে উড়ে পালাল।

—তার পর?—

—তার পর এই চিঠিখানা তোমার দিদিকে দেওয়ার জন্যে ব'লে গেল।

মুকুলের চিঠি এসেছে।

অনেক চিঠি পায় মুকুল স্বামীর কাছ থেকে—কখনও কখনও সপ্তাহে দুখানি।

—ওঃ, দিদি কত চিঠি পায়! পুতুল হঠাৎ বললে এক দিন, আমাকে একখানা চিঠি দেবে পিওন?

—তোমার চিঠি কোথায়!

পিওনের ব্যাগটা দেখিয়ে বলল পুতুল, ওতে ত কত চিঠি আছে। দাও না আমাকে একখানা।

—ওসব অন্য লোকের চিঠি। তোমার চিঠি যখন আসবে তোমার দিদির মত—তখন দেব।

চুপ ক'রে রইল পুতুল। তার পর ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, আমাকে কেউ চিঠি লেখে না।—দিদির মত তুমিও ত অনেক চিঠি পাও—না পিওন?

পিওন চুপ ক'রে রইল। কর্ম্মচঞ্চল অনেক দিনের পরিচিত গ্রামগ্রামান্তর, ঘরগুলি, পথ-ঘাট-মাঠ এত দিন পরে হঠাৎ অপরিচিত আর সুদূর ব'লে মনে হয়। মনে হয়, ভয়ানক একা সে—আর শুধু নিরবচ্ছিন্ন ভারবাহী দিনের পর দিন।

পিওন আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, তোমার দিদির মত আমিও কোন চিঠি পাই না পুতুল।

পুতুল চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ। তার পর হঠাৎ সে ছল্‌ছল্‌ ক'রে হেসে উঠল। মাথা নেড়ে বলল, সে বেশ মজা হবে। আমি যদি তোমাকে চিঠি লিখি—তুমি উত্তর দেবে ত পিওন?

পুতুলের উল্লাস-উচ্ছল মুখের দিকে চেয়ে ম্লান হেসে পিওন বলল, দেব।

হাট-ফিরৃতি একটি লোক যাচ্ছিল পথ দিয়ে। পিওনকে দেখতে পেয়ে বলল, ওদিকে খবর-কাগজের জন্যে সবাই যে গরম হয়ে উঠছে হে পিওন—তাড়াতাড়ি যাও।

সময় নেই।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল পিওন।

পেছন থেকে পুতুল ব'লে উঠল, উঃ, কত পাখী—পিওন, দেখ দেখ—

দিনান্তের পশ্চিম দিগন্ত কালো ক'রে এক ঝাঁক পাখী উড়ে আসছে।

—ওগুলো কি পাখী পিওন!

—কাঁক। সমুদ্রের ধারে থাকে। উড়ে পালিয়ে আসছে।

—কেন?

সেখানে যুদ্ধ হবে ব'লে সৈন্যরা গিয়ে সব তোড়জোড় ক'রছে। লোকজনের গোলমালে ভয়ে উড়ে পালিয়ে আসছে। আজ ক'দিন ধ'রেই পালিয়ে আসছে ওরা।

—কোথায় যাচ্ছে!

বিব্রত হয়ে পিওন হেসে বলল, যেখানে কোন গোলমাল নেই—যুদ্ধ নেই।

—সে কোথায়?

জানে না পিওন।

—তুমি জান না পিওন! তুমি ত অনেক দূরে যাও!

পিওন নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়ল।

সময় নেই: হাটের দিকে এগোল সে।

হঠাৎ এক দিন পুতুল তার বাবার সঙ্গে পিওনের পরিচয় করিয়ে দিল। হাটে এসেছিল পুতুল তার বাবার সঙ্গে।

দূর থেকে পিওনকে দেখতে পেয়ে ডাকল পুতুল, পিওন!

পিওন হাসল। হাটের ভিড় ঠেলে কাছে এল পুতুলের।

পুতুল তার বাবার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, বাবা—পিওন।

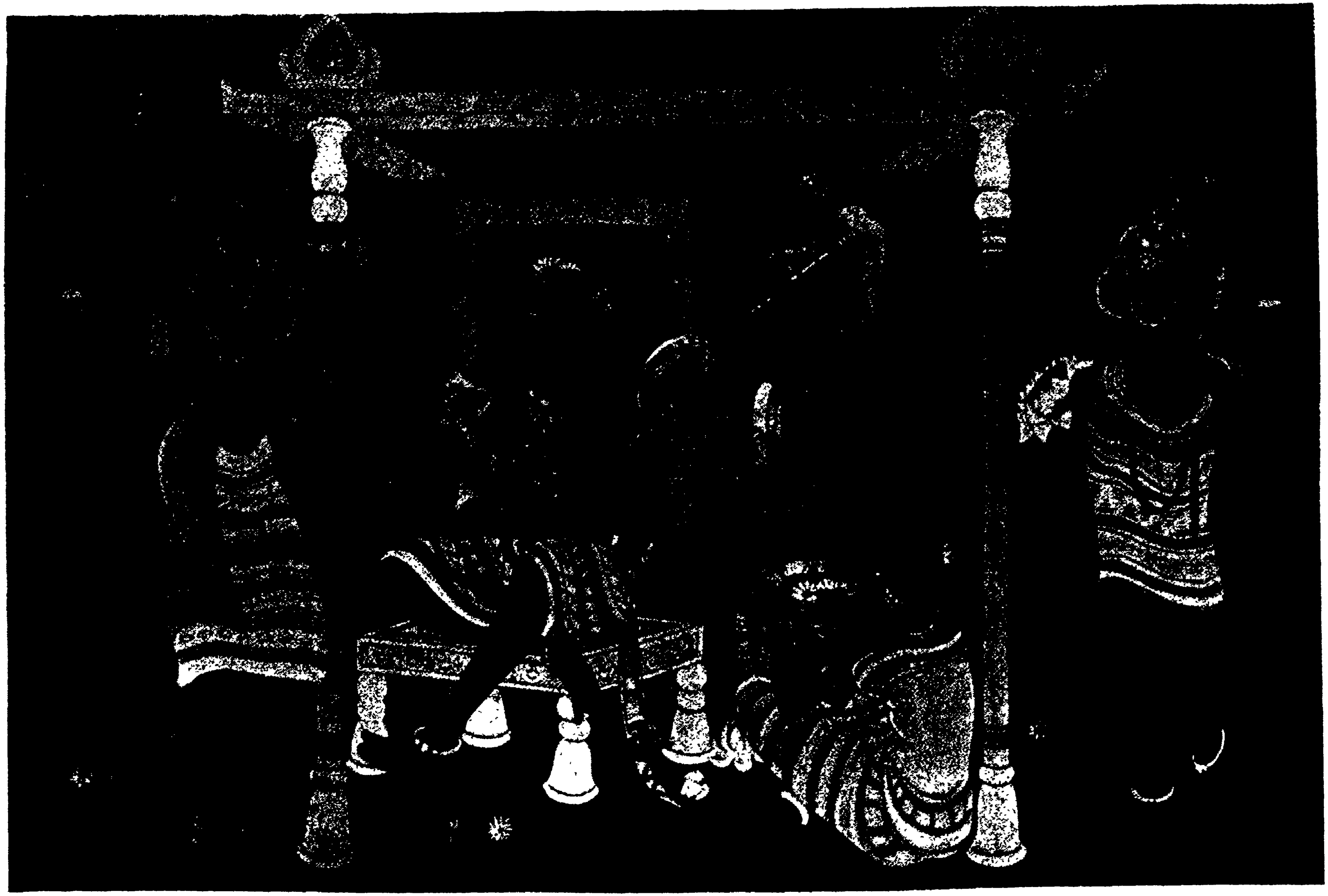
যুদ্ধের আলোচনায় উত্তেজিত মাখন গাঙ্গুলী। মেয়ের ঝাঁকুনিতে বিরক্ত হয়ে বলল, কি!

—পিওন।

—হ্যাঁ, জানি।

উত্তেজিত জটলার মাঝখানে আবার হারিয়ে গেল সে। পুতুল মুখ শুকনো ক'রে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

পিওন তার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, বাড়ী যাবে পুতুল?



রাণীর প্রসাধন
শ্রীপ্রিয়প্রসাদ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

এই হাটের চেয়ে সেই কেয়াবনের ধারটি অনেক ভাল। উল্লসিত হয়ে উঠল পুতুল। বাবার মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, বাড়ী যাব বাবা পিওনের সঙ্গে!

—যা। মাখন গাঙ্গুলী পিওনের মুখের দিকে চেয়ে বলল, যাওয়ার পথে একে বাড়ী পৌছে দিয়ে যেয়ো ত হে।—

তার পর ওরা চলে এল হাটের ভেতর থেকে বেরিয়ে।

কেয়াবনের পাশে এসে পুতুল বললে, তুমি একটু দাঁড়াও পিওন—আমি এক্ষুনি আসছি।

কেয়াবনের পথ ধরে ঘরের দিকে ছুটে চলে গেল পুতুল। তার পর ফিরে এল হাতে ভাঁজ-করা একখানা কাগজ নিয়ে। পিওনের হাতে সেটা দিয়ে হঠাৎ হাসিতে উছলে পড়ে আবার ছুটে পালাল।

কাগজটার ভাঁজ খুলে দেখল পিওন। আকাবাঁকা বড় বড় অক্ষরে পুতুলের চিঠি: পিওন তুমি বড় ভাল লোক।

পুতুলকে কোথাও দেখা গেল না। একটু হেসে কাগজখানি পকেটে রেখে দিল পিওন—তার পর পোষ্ট-আপিস-মুখো হেঁটে চলল সে।

হঠাৎ পেছন থেকে পুতুল চীৎকার ক'রে বলল, কাল আমার চিঠির জবাব দেবে পিওন।—দিদির মত সেই রকম নীল খামে!

পিওন হেসে বলল, দেব।

তার পর পিওনের চিঠি পাওয়ার আগেই পুতুল চলে গেল বাঁকুড়া। সমুদ্রতীর থেকে ষোল মাইল পর্য্যন্ত সামরিক অঞ্চল—এবং ঐ সীমানার মধ্যে ছেলেমেয়ে রাখা নিরাপদ নয়, এই রকম খবর পেয়ে ছেলেমেয়েদের একেবারে বাঁকুড়া পাঠিয়ে দিল মাখন গাঙ্গুলী।

কেয়াবনের পাশে বিকেলের বিষণ্ণ আলোটুকু নিঃশব্দে নেমে এল দিনের পর দিন ধ'রে—আর অন্ধকারে ম্লান হ'য়ে হারিয়ে গেল দিনের পর দিন ধরে।

বিকেলটা হঠাৎ কেমন ফাঁকা লাগে কয়েক দিন পিওনের—কর্ম্মহীন ভারাক্রান্ত আর নিঃসঙ্গ। তার পর দীর্ঘদিনের পরপারে এসে তার সমস্ত বেদনাবোধ ধীরে ধীরে ম্লান আর নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল।—সে যেন অনেক দিনের কথা! তার পর অনেক দিন নিঃশব্দে মুখ নীচু ক'রে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে এসেছে পিওন।

হঠাৎ এক দিন মাখন গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা হ'ল সেই কেয়াবনের পাশে।

মাখন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, আমার কোন চিঠি আছে পিওন?

না দেখেই পিওন তার অভ্যাস মত উত্তর দিল. না। তার পর যাওয়ার জন্য পা বাড়াল সে।

—তাইতো হে, দেখ দিকিন একটু খুঁজে। মেয়েটার টায়ফয়েড হ'য়েছিল।—কেমন আছে কোন খবর পাচ্ছি না!

চিঠি খুঁজতে খুঁজতে পিওন জিজ্ঞেস করল, কার অসুখ বললেন?

—পুতুলের।

—নাঃ, কোন চিঠি নেই।

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে হন্ হন্ ক'রে আবার হেঁটে চলল পিওন।

কয়েক দিন পরে পুতুলের মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে একখানি চিঠি এসে পৌছল ডাকঘরে—অসংখ্য চিঠির সঙ্গে কোথায় হারিয়ে গেল সেটা পিওনের ব্যাগের ভেতর। ব্যাগে তার অনেক চিঠি—অনেক খবর—অনেক সুখ আর দুঃখের কথা।

ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে দ্রুত পায়ে সেই কেয়াবনের পাশ দিয়ে হাটে এসে পৌছল পিয়ন—তার পর নাম ডেকে ডেকে ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিগুলি বিলি ক'রে গেল।

লালমোহন কর—চাঁদপুর—
হৃষীকেশ ভৌমিক—চাঁদপুর—
মাখনলাল গাঙ্গুলী—কেশবগ্রা
নিবারণ দাস—কদমতলা—

খাদ্যসমস্যা ও কয়েকটি সহজসাধ্য লাভজনক ফলের চাষ

রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর

কলা

আমাদের দেশে নানা জাতীয় কলা দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে চাঁপা, কাঁঠালি, মর্ত্তমান, কানাইবাঁশী, সিঙ্গাপুরী, পিনাং, কাবুলী, বোম্বাই, মধুয়া প্রভৃতি সমধিক উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ; ইহা ছাড়া ঢাকা জেলার রামপাল নামক স্থানের কলা খুবই বিখ্যাত; ইহাদের মধ্যে সবরি, অগ্নিসর, চিনিচম্পা ও অমৃতসাগর প্রধান। দুই-এক জাতীয় কলা তরকারির জন্য কাঁচা অবস্থায় ব্যবহৃত হয়; অবশিষ্ট সকল জাতির কলাই পাকা অবস্থায় খাইতে হয়; সুপক্ক কলার মত উপাদেয় ও বলকারক ফল অতি অল্পই আছে।

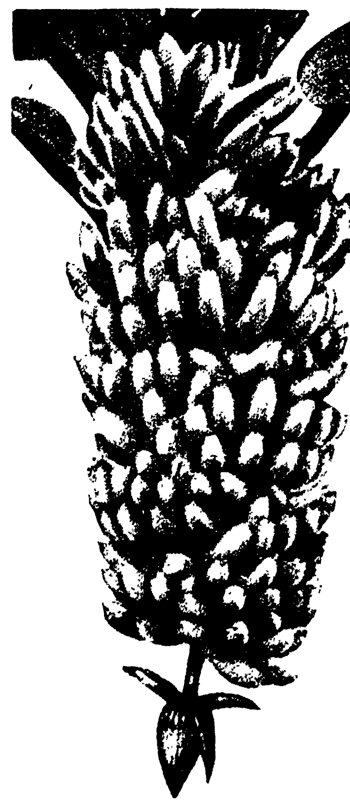
কলার ফল, মূল, পাতা ইত্যাদি ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কলার খোলা পোড়াইলে যে ছাই হয়, তাহা হইতে উত্তম ক্ষার পাওয়া যায়; পল্লীগ্রামের রজকেরা এবং সামান্য অবস্থার গৃহস্থেরা এই ক্ষার দিয়া কাপড় কাচিয়া থাকে; এই ক্ষার জমির উৎকৃষ্ট সার; কলাগাছের খোলা বা বাসনা হইতে সুন্দর ও শক্ত আঁশ পাওয়া যায়; এই আঁশের দ্বারা কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে।

নিম্নে উদ্ধৃত খনার বচন হইতে কলার চাষের আভাস ও উহার উপকারিতা অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে:

"আট হাত অন্তর এক হাত বাই
কলা পুঁতো গৃহস্থ ভাই
পুঁতো কলা না কেটো পাত
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত
তিনশ' ষাইট ঝাড় কলা ক'রে
থাক গৃহী ঘরে শুয়ে।"

কলার চাষের জন্য উঁচু দোঁয়াশ মাটিই উপযুক্ত; কলার জমিতে জল দাঁড়াইয়া থাকিলে কলাগাছের খুবই ক্ষতি হয়, এমন কি মরিয়া যায়; সুতরাং জমি হইতে জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকা চাই। কলার চাষের জন্য মাটি খুব গভীরভাবে কর্ষণ করিতে হয়; পরে আট হাত অন্তর গর্ত্ত করিয়া চারা রোপণ করিতে হয়; প্রত্যেক গর্ত্ত অন্ততঃ দেড় হাত গভীর ও দেড় হাত চওড়া হওয়া দরকার। পচা গোবর, পুকুরের পচা মাটি, ছাই এবং ঘাস-জঙ্গল প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত সার, গোয়াল ঘরের আবর্জ্জনা, হাড়ের গুঁড়া ইত্যাদি কলার পক্ষে উপযুক্ত সার; এই সকল সার সমস্ত জমিতে প্রয়োগ না করিয়া প্রত্যেক গাছের গোড়া হইতে দুই হাত পরিধির মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিলে চলে।

চারাগুলি সোজাভাবে গর্ত্তে বসাইয়া উহার চারি পাশ মাটি দিয়া ভরাট করিয়া দিতে হইবে। চারার গোড়ায় যেন কোন গর্ত্ত না থাকে, তাহা হইলে উহাতে জল দাঁড়াইয়া চারা নষ্ট হইয়া যাইবে।



কলা

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসই (অর্থাৎ বর্ষার আগে) কলার চারা (বা তেউড়) লাগাইবার প্রশস্ত সময়।

চারা লাগাইবার পর যদি অনেক দিন বৃষ্টি না হয় এবং জমিতে রস না থাকে, তাহা হইলে জমিতে জল সেচন

করা আবশ্যক; গাছ বড় হইলে মাঝে মাঝে জমি কোদলাইয়া দেওয়া উচিত; চারা লাগাইবার পাঁচ ছয় মাস পরেই উহার গোড়া হইতে অনেক নূতন চারা বাহির হয়, উহাদের মধ্যে সতেজ দুই-তিনটি চারা রাখিয়া অবশিষ্টগুলি নাড়িয়া অন্যত্র রোপণ করা বা ফেলিয়া দেওয়া দরকার; এক বৎসর বা উহার কাছাকাছি সময়ের মধ্যে কলা গাছ ফলে এবং একটি গাছে কেবল মাত্র একবার একটি কলার কাঁদি হয়; কাঁদি পাকিলে উহা কাটিয়া গাছটিও কাটিয়া ফেলিতে হয়।

কলার পাতা কাটিলে গাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং কলার আকার ছোট হইয়া যায়। একবার কলার বাগান করিলে উহা তিন বৎসর বেশ ফল দেয়—তিন বৎসরের পর নূতন জায়গায় নূতন চারা বসাইয়া নূতন বাগান করা উচিত। এই তিন বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক বৎসর অন্ততঃ ২।৩ বার জমি কোদলাইয়া দেওয়া দরকার এবং জমি পরিষ্কার রাখা উচিত, দরকার হইলে জল সেচনও করিতে হইবে। প্রত্যেক বৎসর গাছে সার দেওয়াও দরকার।

রামপালের লোকেরা শীতকালে কলার চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন; জমির চারি ধারে নালা কাটিয়া উহার মাটি জমিতে ফেলিয়া জমি উঁচু করেন এবং বসন্ত কালে ঐ জমিতে চারা রোপণ করেন, জমিটি ছোট ছোট চারিকোণা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক খণ্ডে আট হাত অন্তর চারা রোপণ করেন এবং জমিতে সারের জন্য প্রচুর পরিমাণে ছাই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কলার বাগানে আদা, হলুদ, বেগুন ইত্যাদি লাগাইবার প্রথাও সেখানে প্রচলিত আছে। বর্ষাকালে ছোট ছোট তেউড়গুলি একবার কি দুইবার কাটিয়া দেন, উহাতে গাছ খুব জোরালো হয়। তিন চার বৎসরের পর কলা বাগান ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উহার উপর আবার নূতন মাটি ফেলিয়া নূতনভাবে আবার কলার চাষ করেন।

কৃষ্ণনগর ফল পরীক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানের (যথা রামপাল, কালিমপং, যুক্তপ্রদেশের সাহারণপুর, মান্দ্রাজের কইম্বাটুর, বোম্বাই) বিভিন্ন শ্রেণীর আটচল্লিশ রকমের কলার চাষের পরীক্ষা চলিতেছে; ইতি মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হইতেছে:—

(ক) দেশীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট মর্ত্তমান কলা অপেক্ষা রামপালের সবরি এবং চিনি চম্পা এবং সাহারাণপুরের রায় কলা শ্রেষ্ঠ;

(খ) মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের কলা এদেশের পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত;

(গ) কলা গাছের পাতা, কাণ্ড প্রভৃতির ছাই এবং ঘাস জঙ্গল প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত সার কলার জমির উৎকৃষ্ট সার;

(ঘ) প্রতি তিন বৎসর অন্তর রামপাল হইতে নূতন চারা আনিয়া বপন করা উচিত, কেননা, স্থানীয় ক্ষেতের চারা রোপণ করিলে ফলন কম হয়।

পেঁপে

অনেক প্রকারের পেঁপে আমাদের দেশে দেখা যায়; ইহাও খুব সুস্বাদু ও বলকারক ফল; বিশেষতঃ অজীর্ণ রোগের পক্ষে কাঁচা ও পাকা পেঁপে খুবই উপকারী; পেঁপের আটা হইতে নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা অর্শ রোগের পক্ষেও উপকারী। পেঁপে হইতে পেপেন নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা অজীর্ণ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

যে কোন মাটিতেই পেঁপে জন্মে; তবে বেলে দোআঁশ মাটিই ইহার পক্ষে উপযুক্ত; পেঁপের জমিতে জল আবদ্ধ হইয়া থাকিলে গাছ মরিয়া যায়; সুতরাং জমি হইতে জল নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত থাকা দরকার। প্রথমে বীজতলা বা হাপরে চারা প্রস্তুত করিয়া উহা নাড়িয়া আসল জমিতে রোপণ করিতে হয়; বীজতলার মাটি খুবই গুঁড়া করিয়া প্রস্তুত করা দরকার এবং উহাতে পচা গোবর-সার দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন; আসল জমির মাটিও গভীরভাবে উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে। পচা গোবর, ঘাস-জঙ্গল ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত সার, ছাই, হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি পেঁপের জমির উপযুক্ত সার।

উপযুক্ত যত্ন লইলে বৎসরের যে কোন সময়ে পেঁপের বীজ বপন করা যায়। গ্রীষ্মকালে বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপাদন করা সহজ; হাপোরে বীজ ছিটাইয়া উহা অল্প ঝুরা মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়; দশ-বার দিনের মধ্যেই বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হয়; চারাগুলিতে যখন তিন-চারটি করিয়া পাতা গজায় তখন উহা পাতলা করিয়া দেওয়া দরকার, যেন আট-নয় ইঞ্চি অন্তর এক-একটি চারা থাকে; যে চারাগুলি তুলিয়া ফেলা হইবে তাহা নষ্ট না করিয়া অন্য একটি হাপরে রোপণ করা যাইতে পারে; চারাগুলি যখন তিন-চার ফুট লম্বা হইবে তখন উহাদিগকে নাড়িয়া আসল জমিতে পুঁতিতে হইবে। জমিতে গর্ত্ত করিয়া ও গর্ত্তে সার দিয়া চারাগুলি গর্ত্তে পুঁতিতে হয়—ছয় হইতে আট ফুট অন্তর চারা লাগানো উচিত। কৃষ্ণনগর সরকারী বাগানে পাঁচ ফুট অন্তর চারা লাগানো হয়। জমিতে রস না থাকিলে জল-সেচন দরকার।

সোয়া তোলা বীজ হইতে প্রায় এক বিঘার উপযুক্ত চারা পাওয়া যায়।

তিন রকমের পেঁপে গাছ হয়; প্রথম রকমে কেবল পুরুষ ফুল থাকে; দ্বিতীয় রকমে কেবল স্ত্রী-ফুল থাকে এবং তৃতীয় রকমের একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী-ফুল থাকে। পুরুষ-ফুলবিশিষ্ট গাছে কেবল ফুলই হয়, ফল হয় না; স্ত্রী-ফুলবিশিষ্ট গাছে ফুল ও ফল দুইই হয় এবং পুরুষ ও স্ত্রীফুলবিশিষ্ট গাছে ফল হয় বটে, কিন্তু ফলন কম হয়। গাছে ফুল না ধরা পর্য্যন্ত বোঝা যায় না কোন্‌টি কোন্‌ রকমের গাছ। জমিতে যদি পুরুষ ফুলবিশিষ্ট একটি গাছও না থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীফুলবিশিষ্ট গাছগুলিতে ফল ধরে, কিন্তু উহাতে বীজ হয় না। জমিতে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি স্ত্রী-ফুলবিশিষ্ট গাছের জন্য অন্ততঃ একটি পুরুষ-ফুলবিশিষ্ট গাছ থাকা দরকার।

চারা লাগাইবার আট-দশ মাসের মধ্যেই গাছের ফল পাকে এবং তখন হইতে প্রায় বরাবরই ফল পাওয়া যায়; বৎসরের সব সময় ফল পাওয়া যায় না; বড় আকারের ফল পাইতে হইলে ফলগুলি পাতলা করিয়া দিতে হয়; একবার রোপণ করিলে তিন বৎসর ঐ সকল গাছ হইতে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়, তাহার পর ফলের আকার ছোট হইয়া যায়; সুতরাং তিন বৎসর অন্তর পেঁপের বাগান বদলানো উচিত।

ইংরেজি ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের "মডার্ন রিভিউ" পত্রিকায় "মধুবিন্দু" নামক পেঁপের চাষের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পেঁপের ফলন খুব বেশী, ইহারা আকারে বড় ও সুস্বাদু।

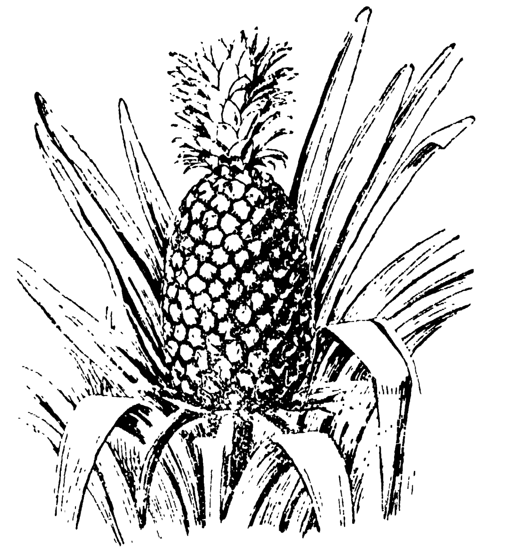
আনারস

দেশী ও বিদেশীয় অনেক জাতীয় আনারস দেখিতে পাওয়া যায়; বিদেশীয়গুলির মধ্যে সম্মুথ, কেইন, কিউ, স্প্যানিশ, কুইন, মরিশাস্‌, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি প্রধান।

আনারসও একটি সুস্বাদু এবং উপকারী ফল। বাংলা ও আসামের প্রায় সর্ব্বপ্রকার উঁচু জমিতে ইহার চাষ করা যাইতে পারে।

সরস বেলে দোঁয়াশ মাটি আনারসের পক্ষে উপযুক্ত; এঁটেল মাটিতেও ইহা মন্দ হয় না। অল্প ছায়াযুক্ত স্থানে ইহা ভাল জন্মে। খোলা জায়গাতে ইহার ফলন ভাল হয়।

আনারস গাছের গোড়ার তেউড়, ফলের নিম্নভাগ হইতে উৎপন্ন এবং ফলের মাথা হইতে যে তেউড় বাহির



আনারস

হয় সেই তেউড় রোপণ করিতে পারা যায়; তবে মাথার তেউড় ও ফলের তলদেশ হইতে যে তেউড় উৎপন্ন হয় তাহা হইতে যে গাছ হয় তাহাতে ফল খুব দেরীতে ধরে।

আনারসের জমিও উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে হয়; পচা গোবর, ঘাস-জঙ্গল ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত সার, হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি জমিতে প্রয়োগ করা দরকার; জমিতে দুই হাত অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে দেড় হাত অন্তর তেউড় লাগাইতে হয়, তেউড়গুলি শিকড় বাহির করিয়া জমিতে ভাল ভাবে বসিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত নিয়মিত ভাবে জল সেচন করিতে হয়। আনারসের জমি সকল সময়েই পরিষ্কার রাখা দরকার এবং মাঝে মাঝে জমি কোদলাইয়া বা নিড়াইয়া দেওয়া উচিত। জমির রস শুকাইয়া গেলে বিশেষতঃ গ্রীষ্ম ও শীতকালে জমিতে জলসেচন করা আবশ্যক।

জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত আনারস লাগাইতে পারা যায়। অতিরিক্ত বর্ষার পর চারা লাগান প্রশস্ত। গাছের গোড়া হইতে যে তেউড় হয় তাহা রোপণ করিলে আঠার মাসের মধ্যেই ফল পাওয়া যায়। ফলের মাথার তেউড় লাগাইলে উহা হইতে ফল পাইতে অন্ততঃ তিন-চার বৎসর সময় লাগে। গাছে ফল ধরিবার পূর্ব্বে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া মাটির সহিত পচা গোবর, ছাই ইত্যাদি সার মিশাইয়া দিয়া জল সেচন করা দরকার।

প্রধান প্রধান আনারসের বিবরণ :

দেশী—ফল মাঝারি, অধিক চক্ষুবিশিষ্ট, অম্লমধুর রস-যুক্ত;

কিউ—ফল বড়, কাঁটাশূন্য পাতা, ফল সুমিষ্ট ও রসাল, চোখ কম;

কুইন—ফল বড় ও সুমিষ্ট;

মরিসাস্—ফল বড় ও রস বেশী;

সিঙ্গাপুর—ফল বড় ও বেশ রসাল;

জলধুপি—শ্রীহট্টের জলধুপি নামক স্থানে উৎপন্ন হয়; ফল ছোট, মিষ্ট ও রসপূর্ণ।

কৃষ্ণনগর ফল-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে নানা শ্রেণীর আনারস পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সিঙ্গাপুরের কুইন আনারস বাংলা দেশের পক্ষে উপযুক্ত; ইহার ফলনও ভাল। উক্ত পরীক্ষা ক্ষেত্রে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, গাছের গোড়ার তেউড় রোপণ করিলে শীঘ্রই ফল পাওয়া যায়।

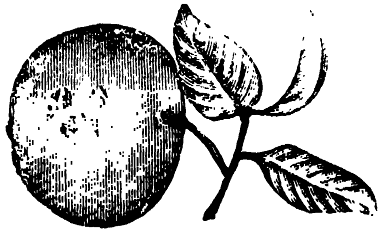
লেবু

পাতিলেবু—সাধারণতঃ দুই প্রকারের পাতিলেবু দেখা যায়; এক প্রকার লম্বা ধরণের, অন্য প্রকার গোল ধরণের।

গোয়ালের আবর্জ্জনা, ছাই, হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি লেবুর উপযুক্ত সার; পনর ফুট অন্তর লেবু গাছ লাগাইতে পারা যায়; কলমের চারা রোপণ করা উচিত—ইহা শীঘ্র শীঘ্র ফলে। বীজের চারা অনেক দেরীতে ফলে। উহা হইতে যে ফল পাওয়া যায় তাহা ভাল হয় না। প্রতি বৎসর ফলন শেষ হইলে গাছের শুষ্ক ও রোগাক্রান্ত ডাল ছাটিয়া দেওয়া উচিত।

কাগজী লেবু—সাধারণতঃ কাগজী লেবু তিন প্রকারের, দেশী, বীজশূন্য ও চীনে; দেশী অপেক্ষা চীনের ফল বড়, লম্বাকৃতি এবং সুগন্ধযুক্ত; পনর ফুট অন্তর চারা লাগাইতে হয়; কলমের গাছে খুব শীঘ্রই ফল ধরে; পাতি লেবুর সার ইহার পক্ষেও উপযুক্ত। কৃষ্ণনগর-ফল-পরীক্ষা ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে বীজশূন্য লেবুই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সরবতী লেবু—ইহার ফল দেখিতে অনেকটা মলটা লেবুর মত, কিন্তু আকারে ছোট—কমলা লেবুর কোয়ার মত ইহারও কোয়া আছে—ইহাতে যথেষ্ট রস আছে—



লেবু

ইহার রস বেশী মিষ্টও নহে, বেশী টকও নয়; এই লেবুর রসে ভাল সরবৎ প্রস্তুত হয়।

গোঁড়া লেবু—ইহা কাগজী লেবু জাতীয়; ফলের আকার গোল এবং রস খুব টক্; ইহার তত চলন নাই।

এলাচি লেবু—ইহা কাগজী ও পাতি লেবু জাতীয়; সাধারণতঃ এই লেবুতে এলাচির গন্ধ থাকে। ইহার দুইটি জাতি আছে—এক জাতির ফল বড় এবং অপর জাতির ফল ও পাতা ছোট—বড় ফলবিশিষ্ট জাতিই উৎকৃষ্ট।

বাতাবী লেবু—সাধারণতঃ দুই প্রকারের লেবু দেখা যায়; সাদা ও লাল—কিন্তু লাল লেবুর ভিতরের রং গোলাপী এবং সাদা লেবুর হলুদে সাদা।

সাংযুক্ত দোআঁশ অথবা এঁটেল মাটিতে ইহা ভাল জন্মে; বার-তের হাত অন্তর ইহাদের চারা লাগাইতে হয়; গোয়ালের আবর্জ্জনা, ছাই, হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি এই লেবুর জমির পক্ষে উপযুক্ত। যেখানে লেবুর চারা লাগানো হইবে সেখানে গর্ত্ত করিয়া গর্ত্তে এই সকল সার দিলেই চলে। কলমের গাছে তিন-চার বৎসরের মধ্যে ফল ধরিতে আরম্ভ করে—সাধারণতঃ মাঘ-ফাল্গুন মাসে গাছে ফুল ধরে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল পাকে; কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া কিছু দিন রৌদ্র ও বাতাস লাগাইয়া গোড়ায় সার প্রয়োগ করিলে ফলন বেশী পাওয়া যায়; গাছে ফুল ধরিলে জল সেচন করা উচিত, এবং ফলন শেষ হইলে গাছের শুষ্ক ও রোগাক্রান্ত ডাল ছাটিয়া দেওয়া দরকার।*

* ছবির ব্লকগুলি গ্লোব নার্শারির সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে—লেখক

প্রশ্ন

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

৭

হঠাৎ আবার অনাদিনাথের বাতের বেদনা বাড়িয়া যাওয়ায় কলিকাতায় ফিরিবার তারিখ তাঁহাদের দিন-পনর পিছাইয়া গেল। লতিকা ও নীরেনের হইতে লাগিল ইস্কুল কামাই, কাজেই অবনীকে আজকাল রীতিমত লতিকা ও নীরেন দুই জনকেই পড়াইতে হইতেছে। নিজের বেকার-জীবনের কথা মনে হইয়া মাঝে মাঝে মন তাহার খারাপ হইলেও দিন তাহার মন্দ কাটিতেছিল না।

অবনী ভাল ফুটবল খেলিতে পারিত, তাই এখানে আসিয়াই দিক্‌নগরের খেলোয়াড় মহলে সে হইয়া গেল বিশেষ পরিচিত। কয়েক দিন ধরিয়া কয়েকটি প্রতিযোগিতামূলক খেলায়ও সে যোগ দিয়াছিল। সে দিন এমনই একটি খেলায় অবনী খেলিতে নামিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ একটি দুর্ঘটনা গেল ঘটিয়া, অন্য একটি খেলোয়াড়ের সহিত ধাক্কা লাগায় সে একেবারে মাঠের মাঝে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। খেলা হইল বন্ধ।

ডাক্তার আসিল, মাথায় জল বাতাস দেওয়া হইল, কিন্তু অবনীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল না। সকলে ধরাধরি করিয়া যখন অবনীকে অনাদিনাথের বাড়ীতে লইয়া আসিল, তখন ব্যাপার দেখিয়া অনাদিনাথ একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন—লতিকা ভয়ে ফেলিল কাঁদিয়া। নিকটবর্ত্তী শহর হইতে ভাল ডাক্তার আসিল, বরফ আসিল। লতিকা বসিয়া গেল শুশ্রূষা করিতে, নীরেন করিতে লাগিল তাহার সাহায্য। ডাক্তার বলিয়া গেলেন, "ভয়ের কোন কারণ নেই। জ্ঞান এখনই ফিরে আসবে। কংকাশন অব্ দি ব্রেন—মাথায় চোট লাগার জন্যে এমনই হয়েছে।" সারা রাত্রি লতিকার জাগিয়া কাটিল। অনাদিনাথ ইজিচেয়ারে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িয়া রহিলেন অবনীর ঘরে। ভোরবেলায় অবনী চোখ মেলিয়া চাহিল। কিন্তু তখন তাহার চোখে বিস্ময়ের ঘোর কাটে নাই।

জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই অবনী উঠিয়া বসিতে চাহিল। লতিকা ছিল মাথায় "আইস্-ব্যাগ" ধ য়া, তাড়াতাড়ি মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "ও কি মাস্টার মশায়, উঠবেন না শুয়ে থাকুন।" অবনী তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "আমার কি হয়েছে?" "কিছুই হয় নি—চুপ করে ঘুমোন, আমি আপনার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি!"

অবনী লতিকার একখানি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া পরম আরামে যেন চোখ বুজিল।

দিন দুই চলিয়া গিয়াছে। অবনী ভাল হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু শরীর ও মস্তিষ্ক দুই-ই দুর্ব্বল, ডাক্তার নিষেধ করিয়াছে আরও পাঁচ-সাত দিন তাহাকে থাকিতে হইবে বিছানায় শুইয়া।

সেদিন পিওন আসিয়া একখানা পোস্টকার্ডের চিঠি দিয়া গেল, চিঠিখানি অবনীর নামে। লতিকা হাতে লইয়া দেখিল চিঠিখানি অনেকগুলি সিলের ছাপ লইয়া কলিকাতা হইতে "রিডাইরেক্ট" হইয়া এখানে আসিয়াছে। মেয়েলী হাতের লেখা—আসিয়াছে ফরিদপুর জেলার পীরপুর গ্রাম হইতে। লতিকা চিঠিখানি পড়িয়া ফেলিল—

পরম কল্যাণবরেষু—

বাবা অবনী প্রায় দেড় মাস হইল তোমার কোন পত্রাদি পাই না, আশা করি ভগবানের কৃপায় ভালই আছ। এখানে শ্রীমতী সরোজের আজ দুই মাস হইল রোজ জ্বর হইতেছে—অক্ষয় ডাক্তারকে দেখান হইয়াছিল। তাহার ঔষধ ব্যবহার করায় জ্বর এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে কিন্তু ডাক্তারকে মোটে দুইটি টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার ঔষধের দাম বাকী পড়িয়াছে আরও পাঁচ টাকা, সেই টাকা না পাইলে অক্ষয় ডাক্তার আর বাকী দিতে চাহে না এবং আরও এক মাস ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে তাহাতেও খরচ লাগিবে প্রায় পাঁচ টাকা। এবার জমির চৈত্র কিস্তির খাজনা দেওয়া হয় নাই। তোমার খুড়া মহাশয় খাজনার টাকা দিতে পারিবেন না, জমিদারের পেয়াদা রোজ আসিয়া তাগাদা করিয়া যাইতেছে, কাজেই খাজনাও দশ টাকা পাঠান বিশেষ দরকার।

আমাদের হাত-খরচের কিছুই নাই। গোটা-পাঁচেক টাকা হইলে ভাল হয়। এই সব বুঝিয়া পত্রপাঠ মাত্র

টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। সংসারের সকল দায়ই এখন তোমার তাহা বুঝিয়া কার্য্য করিবে। নিজের শরীরের উপরে বিশেষ নজর রাখিও—নিয়ম-মত স্নান-আহার করিও। সেজন্য যদি বেশী কিছু খরচ হয় তাহাতে কৃপণতা করিবা না। আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করিও না। ইতি আশীর্ব্বাদিকা—

তোমার মাতা।

দুপুর বেলা অনাদিনাথ একটু গড়াগড়ি দিতেছিলেন। লতিকা গিয়া ডাকিল—"বাবা।" অনাদিনাথ উঠিয়া বসিয়া দুই চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি মা?

—এই চিঠিখানা দেখ ত?

অনাদিনাথ চিঠিখানা হাতে লইয়া বালিশের তলা হইতে চশমা জোড়া বাহির করিয়া চোখে দিয়া কহিলেন, "কিন্তু এ যে অবনীর চিঠি?"

—তা হোক তোমার দেখতে দোষ নেই।

চিঠি পড়িয়া লতিকার দিকে মুখ তুলিয়া চিন্তিত ভাবে বলিলেন—তাই ত অবনীর অসুখ, তার মা টাকা চেয়েছে—এ চিঠি ত তাকে দাও নি?

—তাই কি দেওয়া যায়? অসুখ শরীর, হাতে টাকা আছে কি নাই চিন্তা ভাবনায় শেষে অসুখ যদি বেড়ে যায়।

—সে ত ঠিকই—বেশ করেছ—ভাল করেছ। কিন্তু এখন কি করবে?

—কেন? টাকা ত তিনি আমাদের কাছে পাবেনই—যদি তুমি মত কর তবে আমি বলি টাকাটা আমরাই না হয় পাঠিয়ে দেই তাঁর মাকে; পরে মাস্টার মশায়কে জানালেই হবে।

অনাদিবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, সেই ভাল যুক্তি—দাও—তাই-ই দাও—যতীনকে দিয়ে ওবেলায় মনি-অর্ডার ফরম্ আনিয়ে রেখ—উপরে লিখ—'মাদার অব অবনী মোহন মুখার্জ্জী।' তার পর গ্রাম আর পোস্ট-আপিসের নাম ত এই চিঠিতেই আছে।

কথা শেষ হইতে লতিকা হাসিমুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, অনাদিনাথ পুনরায় ডাকিয়া বলিলেন—আর দেখ মা অবনীর অসুখের খবরটা দিও না যেন—তাঁরা আবার কত কি না জানি ভাববেন।

"আচ্ছা তাই করব" বলিয়া লতিকা বাহির হইয়া গেল।

বিকালে যতীন গিয়া ডাকঘর হইতে মনি-অর্ডার ফরম্ লইয়া আসিল। পরের দিন অবনীর মায়ের নিকটে টাকা গেল মনি-অর্ডার হইয়া।

৮

অনেক দিনের পর আজ অবনী, নিরাপদ, পরেশ তিন বন্ধুতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। নিরাপদ কিছু দিন হইল এই বস্তির বাসায় ফিরিয়াছে। অবনী ফিরিয়াছে আজ এই মাত্র। তর্ক চলিতেছিল অবনীর ব্যাপার লইয়া। অনাদিবাবুর ইচ্ছা অবনী এই বাড়ীতেই থাকে। খাওয়া থাকা এবং সে যে মাহিনা পাইতেছিল তাহাই পাইবে। অবনী রাজী নয়। নিরাপদ আর পরেশ কষ্ট করিয়া এই বস্তির খোলার ঘরে প'ড়িয়া থাকিবে, আর সে থাকিবে পরম সুখে অনাদিবাবুর বাড়ী—ইহা হইতেই পারে না। কিন্তু নিরাপদ, পরেশ দুই জনারই ইচ্ছা অবনী অনাদিবাবুর বাড়ীতেই থাকে। অনেক কথাকাটাকাটির পর শেষে অবনীর অনাদিবাবুর বাড়ীতেই থাকা স্থির হইল।

তার পর উঠিল মালতীর কথা—মালতীর সকল ইতিহাস পরেশের মুখে শুনিয়া অবনী একেবারে লাফাইয়া উঠিল।—একেই ত বলে আদর্শ মহিলা—মেয়েদের এমনই ত হওয়া চাই ইত্যাদি। মালতীর ব্যবস্থা পূর্ব্বেই নিরাপদ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল; প্রথমে ভাবিয়াছিল মালতীকে কোন অবলা-আশ্রমে পাঠাইয়া দিবে, কিন্তু মালতী তাহাতে রাজী হয় নাই আর শেষ পর্য্যন্ত নিরাপদও তাহা ভাল মনে করে নাই। ঠিক হইল মণিয়ার-মার ঘরে রাত্রে মালতী শুইবে, বুড়ো ডালওয়ালা থাকিবে বারান্দায়।

মালতী সেকেণ্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। পরে সুবিধা মত কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে দিবে একটা টিউশনির জোগাড় করিয়া। আর ইহাতে নিরাপদদেরও হইল সুবিধা কারণ,মালতী ত আগেই হেঁসেল বুঝিয়া লইয়াছে। অবনী ছিল পাকের ওস্তাদ, তাহার অভাব পূরণ করিল মালতী।

ইহারই মাসখানেক পরে, আজ তিন দিন হইল নিরাপদ অসুখ হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। মাঝে মাঝে তাহার পেটে একটা বেদনা উঠিয়া তাহাকে একেবারে পাঁচ-সাত দিনের জন্য কাহিল করিয়া দিয়া যাইত। এবারও সেই বেদনাই হইয়াছিল—আজ ভাল আছে। বেলা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে—সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণ, নিরাপদ বিছানায় শুইয়া জানালার দিকে মুখ করিয়া রাস্তার উপরে তাকাইয়া আছে।

মাত্র এই তিন দিনের বেদনায়ই তাহার শরীর বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আজ এই কিছুক্ষণ আগে অবনী আসিয়া

তাহার খোঁজ লইয়া গিয়াছে। পরেশ এখন বাসায় নাই —তাহাকে ভাল দেখিয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। সম্ভবতঃ তাহার সেই ডাক্তার বন্ধুটির নিকটেই গিয়াছে। এই নিরালায় নিরাপদর মন-বিহঙ্গ লঘু পাখা মেলিয়া সারা আকাশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

মালতী আসিয়া ডাকিল—বড়দা।

নিরাপদ চমকিয়া ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল—কেন দিদি?

—এই পথ্যিটুকু খেয়ে নিন।

—তা নিচ্ছি, কিন্তু আমাকে তোমার বড়দা বলতে শিখিয়ে দিলে কে?

"কেউ ত শিখিয়ে দেয় নি", পরে হাসিয়া বলিল—এ আমার নিজেরই আবিষ্কার।

—বড় ভয়ানক আবিষ্কার ত—প্রায় কলম্বসেরই মত।

"নয়ত কি? আচ্ছা সে তর্ক পরে হবে, আপনি পথ্যটুকু আগে খেয়ে নিন।" নিরাপদ বার্লির বাটিতে চুমুক দিয়া মুখখানাকে নানা প্রকার থিয়েটারী ভঙ্গিতে আঁকাইয়া বাঁকাইয়া অবশেষে ঠক্ করিয়া বাটিটিকে নীচে নামাইয়া রাখিল।

—ও ছাই আর তোমরা আমাকে খেতে দিও না— কাল আমি ভাত খাব।

"কালকের কথা সে কাল হবে।" বলিয়া জলের গ্লাস নিরাপদর হাতে তুলিয়া দিল, নিরাপদ মুখ ধুইয়া আবার শুইয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিল—কিন্তু আমি বড়দা হলাম কিসে?

—কেন আপনি বড় নন এদের চেয়ে?

—বড়? তা হয়ত নাও হ'তে পারি, আমাদের কারুর বয়সের তেমন একটা ঠিক নেই।

—বয়সে বড়র কথাই ত হচ্ছে না—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ক্ষমতায় আপনিই এদের ভিতর সব চাইতে বড়।

—ওরে বাপ রে—এ তোমার বিস্ময়কর আবিষ্কারই বটে।

—তা ছাড়া আপনার অন্তঃকরণ? এ কি আপনি যে একেবারে ঘেমে উঠলেন—একটু বাতাস করি বড়দা!

—বেশ কর।

বাতাস দিতে দিতে মালতী বলিতে লাগিল— আপনার অন্তঃকরণ কত বড় আমি সব শুনেছি। আপনি কষ্ট করেন—এত দুঃখের মাঝে পড়ে আছেন শুধু এদের মুখ চেয়ে। নইলে কত বড় ঘরের ছেলে আপনি! আপনার কিসের অভাব? কাকার সঙ্গে তুচ্ছ একটা ঝগড়া, তাই নিয়ে কি কেউ এমনি ক'রে সারা জীবন দুঃখ সয়ে কাটায়?

—কিন্তু আমি ভাবছি দিদি কে তোমার কানে এত সব মন্ত্র দিলে। এ ঠিক ঐ পরেশটার কাণ্ড। আজ আসুক, তার পর ভাল ক'রে শুনবে আমার গালাগাল।

—মিথ্যে কথা—গালাগাল দিতে আপনি জানেন না— এই কয় বৎসরের মধ্যে এক দিনও আপনি কারু উপরে একটা চড়া কথা পর্য্যন্ত বলেন নি।

—তাও শুনেছ—বেশ। তুমি একেবারে গোয়েন্দা হয়ে ঢুকেছ আমাদের সংসারে দেখছি।

মালতী বাইরে বারান্দায় স্টোভে করিয়া জল সিদ্ধ করিতে দিয়া আসিয়াছিল। ডাক্তার বলিয়াছে নিরাপদর পেটে গরম জলের সেক দিতে। ইতিমধ্যে পরেশ কখন আসিয়া স্টোভ নিবাইয়া গরম জলের প্যান কাপড় দিয়া ধরিয়া ঘরের মেঝেয় আনিয়া হাজির করিল।

"এ কি আপনি কেন আনতে গেলেন, আমিই ত এখনি আনতাম। হাতে লাগে নি ত—যান সরুন আপনি, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।" পরেশ হাসিমুখে সরিয়া গেল। নিরাপদ হাসিয়া বলিল—তুমি অমন ক'রে ওদের প্রশ্রয় দিও না দিদি। হাতে একটু আধটু ফোস্কা পড়লেই বা।—তুমি ত আর চিরকাল ওদের এমনি ক'রে রান্না করে খাওয়াবে না। আজ আছ, দু-দিন বাদে কোথায় চলে যা'বে।

মালতীর মুখ বুঝি এক মুহূর্ত্তের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু সে পরমুহূর্ত্তেই মুখ তুলিয়া বলিল—যদি না যাই তাড়িয়ে দেবেন নাকি?

—সেই জোগাড়েই ত আছি বোন, কোন ভাল লোকের বাড়ী তোমার জন্য একটা টিউশনির সন্ধান করতে পারলে বেঁচে যাই।

—সে ত ঠিকই—ও বোনটোন বলা সবই মিথ্যে— ভাবছেন রোজ এ আপদটার জন্য কতটা ক'রে চাল বাজে খরচ হয়। তাই ত তাড়াতে পারলেই বাঁচেন।

নিরাপদ এবার বড় করিয়া হাসিয়া বলিল—বেশ, রাগ হ'ল ত এইবার যাও ভাত তুলে দাও গে, নইলে এই রাক্ষসটার আবার সন্ধ্যে লাগতে না লাগতেই খিদে পায়।

পরেশ হাসিয়া বলিল—কেন আজ বুঝি তোর হিংসে হচ্ছে? তুই তো বার্লির আড়ালে "হাঙ্গার ষ্ট্রাইক" কচ্ছিস —আমরাও না হয় আজ "সিমপ্যাথেটিক হাঙ্গার ষ্ট্রাইক" করি, কি বলিস?

—ওরে বাপ রে তা হলে তোকে আজ খুঁজে পাওয়া যাবে ত—পেটের নাড়ীসুদ্ধ হজম হয়ে যাবে না! কিন্তু তুই এত দিন ধরে আমার এই বোনটার কানে কানে কি সব মন্ত্র দিয়েছিস্ শুনি?

—বা রে আমি কি কলির গুরুদেব যে সবার কানে কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়াব?

মালতী এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল এবার ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, মালতী ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া বাহিরে যাইতেছিল, নিরাপদ ডাকিয়া বলিল—কোথায় চললে বোন্!

—যাই নাড়ী সুদ্ধ যাতে হজম না হয় তার ব্যবস্থা করিগে।

—এক কাজ কর, আজকের মত স্টোভটা ধরিয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে ভাত তুলে দাও—এস সব্বাই মিলে গল্প করি। পরেশ ততক্ষণ আমার পেটে সেকটা দিয়ে দিক।

"আদেশ শিরোধার্য্য—তাই যাচ্ছি" বলিয়া মালতী বাহির হইয়া গেল।

নিরাপদ পরেশের দিকে তাকাইয়া বলিল—মেয়েটি বড় ভাল।

—ঠিক বলেছিস ভাই—কথায় বার্ত্তায় সব সময় যেন সব্বাইকে মাতিয়ে রাখে। আমার এত ভাল—

—সাবধান—ঐ পর্য্যন্ত—আর না—

—তার মানে?

নিরাপদ হাসিয়া বলিল—কোন স্ত্রীলোককে বেশী ভাল লাগা ভাল কথা নয়!

পরেশ রাগিয়া বলিল—যাঃ কি যে বলিস!

নিরাপদ পুনরায় হাসিয়া বলিল—বলছি সাধু সাবধান।

ইতিমধ্যে মালতী আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

৯

সেদিন মনিঅর্ডারের একখানা ফেরত রসিদ পাইয়া অবনী একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ত্রিশ টাকার ফেরত রসিদ, টাকা পাঠাইয়াছে সে নিজে, রসিদের উল্টা পিঠে নাম সই করিয়া টাকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার মা, অথচ অবনী ইহার বিন্দুবিসর্গও জানে না। হাতের লেখা দেখিয়া মনে হইল লতিকার লেখা, কিন্তু সে কেন টাকা পাঠাইতে যাইবে, আর কেমন করিয়াই বা জানিবে তাহাদের ঠিকানা? এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটি ভাবিয়া ভাবিয়া অবনী সারা বিকাল একেবারে শেষ করিয়া দিল, কিন্তু কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। একেবারে সন্ধ্যার ক্ষণপূর্ব্বে লতিকা আসিয়া ঢুকিল তাহার ঘরে।—এ কি মাস্টার মশায় আপনি বেড়াতে যান নি। নিরাপদ বাবু এখন সেরে উঠেছেন বুঝি?—

—হাঁ নিরাপদ ভাল আছে, কিন্তু একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার।

—কি এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার বলুন ত?

—এই দেখ একখানা মনিঅর্ডারের রসিদ। এই টাকা আমার নাম করে পাঠালে কে।

—ওঃ এই এত ক'রে ভাবছেন?

—কেন? তুমি তা হ'লে জান বুঝি সব—এ লেখাও বোধ হয় তোমারই হাতের।

লতিকা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—এইবার তা হ'লে ধরে ফেলেছেন দেখছি। আপনাকে ফাঁকি দিয়ে আমরাই ত টাকা পাঠিয়েছি।

—কেন পাঠালে? কেন আমাকে জানাও নি?

—বাবার হুকুমে পাঠিয়েছি টাকা, আর আপনার অসুখ বলে জানান হয় নি।

—কিন্তু ঠিকানা পেলে কেমন ক'রে?

—ও দেখেছেন কি ভুলো মন আমার।—একটু অপেক্ষা করুন। বলিয়া লতিকা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই পুনরায় ফিরিয়া আসিল একখানা পোস্টকার্ডের চিঠি হাতে করিয়া।—এই নিন্—আপনার অসুখের মাঝে আসে এই চিঠি।

অবনী চিঠি লইয়া পড়িল—সরোজের অসুখ টাকা পাঠাইও—খাজনার টাকা পাঠাইও—হাত-খরচের টাকা পাঠাইও—নিজের শরীরের উপরে বিশেষ নজর রাখিও সে জন্য যদি কিছু বেশী খরচ হয় তাহাতে কৃপণতা করিও না, আশীর্ব্বাদ জানিও কিন্তু টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করিবা না। কিন্তু কে পাঠাইত টাকা? অনাদিনাথ অনুগ্রহ করিয়াছেন—হয়ত দারিদ্র বলিয়া পীড়িত বলিয়া—অনাথা দরিদ্র বিধবার দুঃখ স্মরণ করিয়া তাঁহার বিপুল ধনের এক কণা ভাঙিয়া দিয়াছেন—আর সেই দান তাহারই মা লইয়াছেন—সাগ্রহে—সানন্দে নিজের সন্তানের উপার্জ্জিত অর্থ মনে করিয়া।

—কিন্তু এত টাকা পাঠানর পূর্ব্বে আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা কর নি কেন?

—সে আমি জানি নে, বাবার কাছে জিজ্ঞেস করবেন।

—কিন্তু কাল যে আমি তাঁর কাছ থেকে আমার গত মাসের টাকা চেয়ে নিয়ে নিরাপদকে দিয়ে এসেছি। কি মনে করেছেন তিনি বল ত।

লতিকা হাসিয়া বলিল—তিনি কিছুই মনে করেন নি, সব ব্যাপার তিনি একেবারে ভুলে বসে আছেন। আজ যেয়ে যদি আপনি গত মাসের মাইনে চান—আবার পাবেন, এমনই ভুলো মন তাঁর।

—তা জানি—আর এ সবও তা হ'লে তোমারই কীর্ত্তি, তোমার বাবা উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু লতা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—এ সব কি দরিদ্র ব'লে—অসহায় ব'লে তোমার করুণা?

লতিকা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল—করুণা? দয়া? বেশ তাই। আপনারা পুরুষমানুষ এমনই স্বার্থপরই বটে।

—স্বার্থপর?

—নয়ত কি? টাকা ত মোটে ত্রিশটি—তা আপনি গরীবই হন আর ধনীই হন তার মূল্য তার চেয়ে বেশী নয়। কিন্তু এর আড়ালে তার চেয়েও অনেক মূল্যবান কিছু থাকতে পারে—এ কথা আপনি একবারও ভাবলেন না? বলিয়া লতিকা ঘর হইতে দ্রুত বাহির হইয়া গেল। অবনী রহিল অবাক হইয়া চাহিয়া—না বুঝিল তাহার কোন কথার মানে—না বুঝিল তাহার কোন আচরণের অর্থ।

ক্রমশঃ

মীরাটের ডাঃ রমেশচন্দ্র মিত্র

শ্রীঅবনীনাথ রায়

কুড়ি বছর আগেকার কথা। তখন আমি সবে মীরাটে এসেছি। পুণায় সরকারী ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা ক'রে মত প্রকাশ ক'রেছিলেন যে আমি যক্ষ্মা রোগের প্রাথমিক আক্রমণের কবলে আছি। মীরাটে পুনরায় ডাক্তারি পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার আগে শরীরটাকে একবার যাচাই ক'রে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। মেসের এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এখানে ভাল ডাক্তার কে আছেন বলতে পারেন?' বন্ধু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'হাঁ, নিশ্চয়ই বলতে পারি। এই ত সে-দিন পুলিনের জ্বর হয়েছিল—শহর থেকে ওষুধ এনে দেওয়া হ'ল। ঐ যে লাল নীল ওষুধের শিশি কুলুঙ্গিতে রাখা আছে, দেখুন না। ডাক্তারের নামের লেবেল ঐ শিশির গায়ে আঁটা আছে—একেবারে এ থেকে জেড পর্য্যন্ত টাইটেল (title)।'

ডাঃ রমেশচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। অপরাহ্নে যথারীতি তাঁর শহরের বাসায় গিয়ে হাজির হলুম। তিনি তখন বুধানা গেটে তেমাথা রাস্তার মোড়ের বাড়িটায় থাক্‌তেন। সযত্নে আমাকে পরীক্ষা ক'রে বললেন, 'পুণায় আপনি কেমন ছিলেন বলতে পারি নে, কিন্তু এখন যে আপনার কোন অসুখ নেই একথা জোর ক'রে বলতে পারি।' বলা বাহুল্য, তার পরের দিন সরকারী ডাক্তারের পরীক্ষায় আমি পাস হ'য়ে গেলুম। চাকরি পাকা হ'ল এবং এই বিশ বছর ধরে বহাল-তবিয়তে বেঁচে থাকার ফলে আজ নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি ডাঃ মিত্রের রোগপরীক্ষা সে দিন নির্ভুল হয়েছিল।

তার পর তাঁকে ডাক্তারি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে অনেক দিন দেখেছি। বস্তুত এই আলোচনাই তিনি ভালবাসতেন। আগ্রহশীল শ্রোতা পেলে তিনি যেন ধন্য হ'য়ে যেতেন। শরীরের কোন্ অঙ্গের সঙ্গে কোন্ অঙ্গের কি যোগ, রোগের বীজাণু কি ক'রে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, কি ক'রে বর্দ্ধিত হয়, কি তার প্রতিষেধক, আমরা যে আহার্য গ্রহণ করি কি ক'রে তা হজম হয়, তার কতটা অংশ শরীরের পুষ্টিসাধন করে, বাকিটা কি ভাবে আমাদের দেহ বর্জন করে, মূত্রাশয়ের (kidney) ক্রিয়া কি, লার্জ ইনটেস্‌টাইনের ক্রিয়া কি, প্রভৃতি সহজ এবং জটিল বিষয় একান্ত উৎসাহের সঙ্গে বুঝিয়ে বলতে আরম্ভ করতেন।



ডাঃ রমেশচন্দ্র মিত্র

আসলে তিনি ছিলেন অধ্যাপক। মীরাট কলেজে তিনি জীবতত্ত্বের (Biology) অধ্যাপকতা করেছেন। তত্ত্বের এই ব্যাখ্যানে ছিল তাঁর আনন্দ। বুঝিয়ে বলার সময় তাঁর চোখ, মুখ এবং হাত একসঙ্গে কাজ করত। এ বিষয়ে স্থান এবং কালেরও কোন হিসাব তাঁর ছিল না। রোগীর বাড়িতে রোগী দেখতে গিয়ে হয়ত এই আলোচনায় মেতে উঠলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর এই ভাবটিকে প্রকৃত পরিপ্রেক্ষণীর সাহায্যে অধিকাংশ লোকেই গ্রহণ করেন নি। কিন্তু সে কথা পরে বলব।

ডাঃ মিত্রের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরে যে বস্তু আমাকে তাঁর দিকে আকর্ষণ ক'রেছিল সে কিন্তু তাঁর ডাক্তারি শাস্ত্রে পারদর্শিতা নয়। কেন-না বিদ্যা এবং বুদ্ধি আর যাই করুক মানুষকে আপন করতে পারে না। একজন বুদ্ধিমানের চেয়ে অধিকতর বুদ্ধিমান আর একজনের সাক্ষাৎ পেলেই বুদ্ধির মোহ কেটে যায়। ডাঃ মিত্রের যে-বস্তু আমাকে মুগ্ধ করেছিল সে হচ্ছে তাঁর প্রাণবত্তা—অপরকে ভালবাসবার শক্তি। আজকের থেকে তিরিশ বছর আগে তিনি বিলাত থেকে পাস ক'রে এসে মীরাটে প্র্যাক্‌টিস্ সুরু করেন। মীরাটে তৎকালেও বিলাত-ফেরত ডাক্তারের এমন প্রাদুর্ভাব ছিল না, আজও নেই। বিশেষ বুদ্ধিমান হওয়ার প্রয়োজন ছিল না, সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি থাকলেই এই তিরিশ বছর প্র্যাক্‌টিসের ফলে তিনি আশার অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন ক'রে যেতে পারতেন। কেন-না এই যুক্তপ্রদেশে অর্থ উপার্জনের অনুকূল অনেক গুণের তিনি অধিকারী ছিলেন। তিনি চমৎকার উর্দু বলতে পারতেন এবং আপামর সাধারণ সকলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল অনির্বচনীয়। তাঁর আচরণের আন্তরিকতার জন্য সকলে তাঁর অনুগত হ'য়ে পড়ত। কিন্তু তাঁর মন ছিল আদর্শবাদী, আদর্শবাদ হচ্ছে অর্থোপার্জনের প্রবল বাধা। প্রথমেই স্থির করলেন বাঙালীর বাড়ি তিনি রোগী দেখতে গিয়ে ফি নেবেন না। শুধু তাই নয়, কোন বাঙালী অসুস্থ হ'য়ে প'ড়ে তাঁকে না ডাকলে তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। এমনও হয়েছে অযাচিত ভাবে তিনি রোগীর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি মনে করতেন বাংলা দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে এসে কোন বাঙালী অসুস্থ অবস্থায় বিদেশে নিরুপায় হ'য়ে পড়েছে—তার পাশে গিয়ে দাঁড়ান তাঁর ধর্ম। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া হ'তে দেরি হয় নি। সাধারণ লোকেরা মনে করলেন, এ আবার কি রকম ডাক্তার? ফি নেন না, উপযাচক হ'য়ে বাড়ি ব'য়ে দেখতে আসেন—সত্যিকারের ডাক্তার ত বটে? আমি আগেও বলেছি ভাল এবং মন্দ এ দুয়েরই স্তর আছে—সাধারণ ভাল অবধি মানুষ বুঝতে পারে—অতি-ভাল মানুষ কল্পনাও করতে পারে না, সহ্যও করতে পারে না। ডাঃ মিত্রের এই অতি-ভালত্ব তাঁর পরমার্থিক জীবনে কি পাথেয় জুগিয়েছে জানি নে, কিন্তু তাঁর আর্থিক জীবনের পরিপন্থী হ'য়েছিল এ কথা জানি। এক দিক দিয়ে আমাদের সংশয়, আর এক দিক দিয়ে অর্থের অপ্রাচুর্য্য তাঁর উত্তর-জীবনকে ব্যথিত এবং দীর্ণ করেছিল, কিন্তু তবু তিনি নিজের পথ ত্যাগ করেন নি।

যে প্রাণবত্তার উল্লেখ করলুম তারই প্রভাবে কবে যে ডাঃ মিত্র ফর্ম্যালিটির গণ্ডী পেরিয়ে "কাকাবাবু" হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন তা আর আজ মনে পড়ে না। "কাকাবাবু" বলতে পারার পরে লক্ষ্য করলুম শুধু আমি নয়, মীরাটের অধিকাংশ লোকই কোন-না-কোন সম্বন্ধের বাঁধনে তাঁর সঙ্গে বাঁধা। অপরেরা এই বন্ধনকে কি ভাবে স্বীকার করতেন বলতে পারব না কিন্তু নিজের দিক দিয়ে বলতে পারি ডাঃ মিত্র যে-বন্ধনে নিজেকে ইচ্ছে ক'রে বাঁধতেন তাঁর পক্ষ থেকে তার মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না।

বিলিতী শিক্ষার দু'টি বিশেষত্ব তিনি নিজের চরিত্রে গ্রহণ ক'রেছিলেন। এক সময়নিষ্ঠা আর একটি চরিত্রের ডিসিপ্লিন-বোধ বা constitution-প্রীতি। কোন সভা-সমিতিতে তাঁকে দেরিতে আসতে দেখি নি। এই নিয়ে বিলেতের অনেক গল্পও তিনি আমাদের কাছে করতেন। দ্বিতীয় কথা, কোন স্বৈরাচার তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন তিনি আজন্ম ডিমোক্র্যাট। তাঁর সঙ্গে মতদ্বৈধ হ'লে সভাসমিতিতে আমরা তাঁর সঙ্গে সমানে সমানে তর্ক করেছি, ঝগড়া করেছি, কিন্তু তার জন্যে তিনি কোন দিন ক্ষুণ্ণ হ'ন নি। যা তাঁকে সত্যসত্যই আহত করত সে হচ্ছে তাঁর প্রতি, তাঁর আদর্শের প্রতি অবজ্ঞা। তা আমরা কোনদিন করি নি।

অর্থের অসচ্ছলতা কিন্তু কোন দিন তাঁর মনের ঔদার্যকে বিন্দু মাত্র ক্লিন্ন করতে পারে নি। এ-বিষয়ে তাঁর মহানুভবতা ছিল মহাদেবের মত। পরের দুঃখ কষ্ট তিনি আদৌ সহ্য করতে পারতেন না। রোগী দেখতে গিয়ে পয়সা ত নেনই নি, অধিকন্তু পকেট থেকে পয়সা দিয়ে পথ্যের ব্যবস্থা ক'রে এসেছেন, এমন ঘটনা অনেক দিন ঘটেছে। এক দিনের কথা মনে পড়ে। আমরা সঙ্গীত-সম্মেলনের জন্য চাঁদা চাইতে গেছি। যা ছিল বাক্স ঝেড়ে ঝুড়ে আমাদের দিয়ে দিলেন। তার একটু পরেই তাঁর মেয়ের প্রবেশ। সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই, বেণু? বেণু বললেন, মাছ কেনা হয়েছে, মা পয়সা চাইছেন। তখনও আমাদের প্রসারিত করের উপর টাকা বর্তমান। কাকাবাবু অম্লানবদনে বললেন, মাছ আজ ফিরিয়ে দিতে বলগে, মা, আজ আর টাকাপয়সা নেই। আমরা গলদ্‌ঘর্ম হ'য়ে উঠলুম। লজ্জারক্ত মুখে বললুম, এই টাকা দিন্ না, কাকাবাবু। আমাদের ত আজই টাকার দরকার নেই, আমরা আর এক দিন এসে নিয়ে যাব। কাকাবাবু বাধা দিয়ে বললেন, না, ও-পয়সা দেওয়া হ'য়ে গেছে। গত মার্চ মাসে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সেক্রেটারি রায় সাহেব দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মীরাটে এসেছিলেন। তার পূর্বে কাকাবাবু প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সদস্য ছিলেন না। এক দিন শুনলুম কাকাবাবু প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের আজীবন সদস্য হ'য়ে গেছেন। জিজ্ঞাসুভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই বললেন, আশ্চর্য হচ্ছ? একটা ইন্‌সিওরেন্সের টাকা পেয়ে গেলুম—দিয়ে দিলুম।

টমাস হার্ডির একটা লাইন পড়েছিলুম, A great man is he who does himself no worldly good. সাম্প্রতিক যুগে এই বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করতে পারেন এমন লোক দুর্লভ হ'য়ে পড়েছে, কিন্তু ডাঃ মিত্র তার জলন্ত নিদর্শন।

আমাদের সাহিত্য-সভার শেষ বৈঠক কাকাবাবুর বাসায় হয়েছে। তার ঘটনাটাও মনে পড়ছে। সে রবিবারে বাসাশুদ্ধ সকলে বেগম সমরুর কবর দেখতে সার্ধানায় যাওয়ার কথা। সাহিত্য-সভার বৈঠক হবে বলতেই সঙ্গে সঙ্গে সার্ধানায় যাওয়ার প্রস্তাবটা নাকচ ক'রে দিলেন। আমি কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠলুম—বললুম, থাক না, কাকাবাবু, তাড়াতাড়ি কি? কাকীমারা এই রবিবারে সার্ধানা ঘুরে আসুন—আমাদের সাহিত্য-সভা না হয় পরের রবিবারে হবে। কাকাবাবু বললেন, না, সার্ধানা পরের হপ্তায় যাওয়া যেতে পারবে। আমার বাসায় সাহিত্যের মিটিং হবে, It is an honour, Sir, it is an honour.

বুধবারে তিনি মহাপ্রয়াণ করেছেন, তার আগের রবিবার সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে শেষ দেখা। তার পর ডাক্তারের আদেশ অনুযায়ী দেখাশুনা বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল। দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনেই ডেকে পাঠালেন। বেশী কথাবার্তা বলা বারণ ছিল কিন্তু তিনি তা মানতে চাইতেন না। মানুষকে পেলেই তিনি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতেন। দুর্গাবাড়ীর কথা, নবাগত বাঙালীদের কথা প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন। আমি বেশীর ভাগ সময় হুঁ-হাঁ দিয়ে গেলুম যাতে কথার মাত্রাটা একটু কম হয়। বিষয়ান্তরে তাঁর মনকে নিয়োজিত করবার

উদ্দেশ্যে বললুম, আপনি এখন মনকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিন, কাকাবাবু। আপনি শুধু ছেলেপুলেদের সঙ্গে গল্পগাছা ক'রে সময় কাটিয়ে দিন। তিনি প্রতিবাদ ক'রে বললেন, না, এই আমার বিশ্রাম। এতেই আমি ভাল থাকি। আর ছেলেপুলেদের কথা বলছিলে? নাঃ, তাদের কথা আর এখন ভাবি নে—তাদের জন্যে কোন provision ক'রে যেতে পারলুম না। তাদের কথা না ভাবলেই বরঞ্চ ভাল থাকি।

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে ছিলুম—তিনি এ ভাবে কথা বলবেন এটা অপ্রত্যাশিত। তার পরেই বললুম, আপনি কিছু ভাববেন না, কাকাবাবু। আপনার goodwill-ই তাদের provision.

আজ তিনি আমাদের থেকে বহু দূরে কোন্ অজানা রাজ্যে চলে গেছেন কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রীকে যে সান্ত্বনা দিয়েছিলুম সেটা আমাদের বুকে চেপে বসেছে। তাই আজ বিধাতার কাছে এই প্রার্থনাই জানাই যে, তিনি যেন আমাদের মুখ রাখেন।

পাগলা কুকুর

শ্রীজীবনময় রায়

১। ছোকরা (ফুলবাবু)
২। প্রৌঢ়—(কুকুরে কামড়াইয়াছে)
৩। উহার ধামাধরা
৪। আরো অনেকে (এক, দুই, তিন, ইত্যাদি)
৫। কলেজের ছোকরা
৬। শকুন বুড়ো
৭। হাফপ্যাণ্ট
৮। অন্য ছোকরা
৯। আপিসের ছোকরা
১০। নামাবলী
১১। আমি

[সন্ধ্যা ছয়টা চল্লিশের লোক্যাল। যেমন গরম তেমনি ভীড়। ইণ্টার ক্লাসে আবার ভীড়টা যেন একটু বেশী। চেকিং নাই লোক্যালে, আমাদের বেঞ্চিটাতে ছয় জনের যায়গায় জনা আষ্টেক ঠাসিয়া বসিয়াছি। দাঁড়াইয়া থাকার খদ্দেরেরও অভাব নাই।

নিতান্ত ভাগ্যক্রমেই একটা জানালা পাইয়াছিলাম, নহিলে ঘম ও পচা ইলিশের দুর্গন্ধে পাকযন্ত্রটাকে দুর্বিপাক হইতে রক্ষা করা দুরূহ হইত।

ট্রেন প্রায় ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া নাসিকা ও কণ্ঠতালুর যুগপৎ আবর্তে খুঃ খুঃ শব্দ করিতে করিতে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঢুকিলেন; পিছনে একটি ধামাধরা—তিনিও বয়স্ক।]

প্রৌঢ়—(একটি বাবুগোছ ছোকরাকে) এই যে বাবা, হাঁটুটা একটু—(অর্থাৎ হাঁটুটা সরাইয়া, বসিবার একটু যায়গা করিয়া দাও)

ছোকরা (ফুলবাবু)—(ঝাঁঝাইয়া উঠিয়া) হাঁটুটা! যিনিই আসবেন—হাঁটুটা! হাঁটুটা মাথায় করতে হবে! আর ত পারা যায় না। (পার্শ্বের যুবককে) ইঃ! সার্টের কফটা দুমড়ে নেতিয়ে গেল মাইরি।

ধামাধরা—দাও না হে একটু বসতে। একে এই গরম, তাতে আবার পাগলা কুকুরে কামড়েছে। এই গরমে দাঁড়িয়ে ভির্মী যাবে শেষে!

ছোকরাদ্বয়—এ্যাঁ! পাগলা? বলেন কি?

[যুবক দুইটি স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মত উঠিয়া সোজা দরজা বাহিয়া নামিয়া গেল। প্রৌঢ় ও তাঁহার সঙ্গী বেশ যুত করিয়া সেই জায়গায় চাপিয়া বসিলেন। গাড়ীর সমস্ত যাত্রীর সমবেত কৌতূহল উদগ্র হইয়া ফাটিয়া পড়িল যাইয়া প্রৌঢ়টির উপর। একপাল শকুন যেন ভাগাড়ে পড়িল]

এক—কুকুরে কামড়েছে নাকি মশায়? কই দেখি?

দুই—পাগলা কুকুর? কি ক'রে জানলেন?

কলেজের ছোকরা—(পাঁসনে চোখে, হাতে খাতাবই, পকেটে ঝরণা কলম, মুখে সিগারেট) ন্যাজটা দেখেছিলেন? খাড়া না ঝোলা? ন্যাজ?

তিন—নখ গুণেছিলেন মশায়? যদি বিশটা হয় তবে কিন্তু—

কঃ ছোঃ—হাঃ হঃ হাঃ হাঃ! পাগলা কুকুরের বিষ-নখ গুণে তবে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন ত? নইলে কিন্তু হিসেবে—হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—

তিন—(চটিয়া) থাক্ থাক্ হে ছোকরা। আর দাঁত বের করতে হবে না।

এক—যাক্ যাক্! কটা দাঁত বসিয়েছে মশায়? খুব ডীপ নাকি?

চার—(চক্ষু ছানাবড়া, গলা বাড়াইয়া) রক্ত! রক্ত! রক্ত পড়ছে?

প্রৌ—না না রক্ত কোথায়। গত রোববার কামড়েছে; আজ নিয়ে এই চার দিন হ'ল।

কঃ ছোঃ—চা—র দি—ন! এখনো কিছু করেন নি! এই নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? ডেঞ্জারাস।

প্রৌ—না, হে; অনেক কিছুই হ'য়ে গেছে। বিস্তর কাণ্ড। কথায় বলে, দেশে কাগচিলের আকাল পড়ে ত ডাক্তার-বদ্যির আকাল নেই। (খুঁঃখুঃ)

ধামাধরা—ঐ যা বলেছ দাদা! হ্যাঁ হ্যাঁ! সব বেটাই

বদ্যি। দেখুন না মশায়, এর মধ্যে চেরা ফাড়া, লোহা পোড়া, কষ্টিক, টোকো দই, ঢাকাই ভেন্নার আঠা, মায় রক্ষেকালীর পূজো অবধি মানত হ'য়ে গেছে।

কঃ ছোঃ—সিলি সুপার্স্টিশন। ইনজেক্শন দিন মশায়; ও সবে—

ধামাধরা—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা ত আজ থেকে হ'ল। হ্যাঙ্গাম কি কম? আজ প্রথম দফা দিলে কিনা। উঃ, সেই কোথায় ধ্যাধ্যাড়া গোবিন্দপুর—হাঁটতে হাঁটতে—

দুই—কেন, মেডিকেল কলেজে হয় না?

প্রৌ—আমিও ত তাই জানতুম।

পাঁচ—বালিগঞ্জে গেছে বুঝি?

ধামা—যাঙ্গে না, বালিগঞ্জে কোথায়? গেছে সেই—

আপিসের ছোঃ—জানি, গেছে লায়ন্স রেঞ্জে। আমার খুড়তুত বোন, যে এম্-এ পড়ে—

অন্য ছোঃ—হ্যাঁ, তোর সব্বঘটেই তোর ঐ খুড়তুত বোন যে এমে পড়ে, হ্যাঃ।

আঃ ছোঃ—পড়েই ত। তুই মুখ্যু তার বুঝবি কি রে? জানিস, সেবার ওর ইংরিজি কবিতা বলা শুনে লাট সায়েবের মেম—

অন্য ছোঃ—উঃ ভা—রি পণ্ডিত আমার! নিজে ত ফিপ্‌থ ক্লাসের চৌকাঠ পেরতে পায় নি। এখন খুড়তুত বোন ফলাচ্ছে! কবিতা বলে, নাচে, গান গায়—

আঃ ছোঃ - কি বললি?

[গণ্ডগোল একটা আর ঠেকানো বুঝি যায় না। হঠাৎ এক বুড়ো—লম্বা গলা, চোখ দুটা গর্ত্ত, নাকটা খাঁড়ার মত ঝোলা, যেন একটা শকুন—গলা বাড়াইয়া খেঁকাইয়া উঠিল।]

শকুন বুড়ো—আ মর, ঢেঁকির কচকচি! ঘটকালি করতে লেগেছে। ইদিকে একটা লোককে পাগলা কুকুরে কাটলে তার হুঁস নেই। হেঁঃ, বলুন ত মশায়। ওঁকে বলতে দে—হুঁঃ। (চারিদিকে নাক চোখ ঘুরাইয়া লইল)

[গাড়ীশুদ্ধ লোক সমস্বরে হ্যাঁ হ্যাঁ করিয়া উঠিতে ছোকরা দুটি ভীড়ের মধ্যে ডুব মারিল।]

প্রৌঢ়—(এতগুলি লোকের মনোযোগলাভে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া বিনীত স্বরে) বলব আর কি মশায়; সেই রোদে ঘুরে ঘুরে ত গিয়ে পৌছলুম সেই যাকে বলে স্টোর রোড—হাতে সায়েবের চিঠি। সায়েব বললে "No Babu, ও হোগা নেহি। I write you a letter to the Bara Sahib doctor of the Tropical Medicine Department of the Medical College of Bengal. You go on with my letter and give injection. I will give you leave with full pay for one month. খুঃ খুঃ

আঃ ছোঃ—কোন্ আপিস মশায়?

অন্য ছোঃ—আঃ তোর তাতে দরকার কি রে বাপু; কথাটা শুনতেই দে না!

ধামা—হিলজারস্ বেনসনের বাড়ী মশায়। উনি ওখানকার বড়বাবুর ফাষ্ট এ্যাসিস্ট্যান্ট কি না। আর আমি হলুম গে আবার ওঁরই পরে। তা দাদা আমার আবার বড় বাবুর বড় কুটুম—একেবারে ডান হাত—

প্রৌ—আঃ প্রসন্ন! একটু থাম দিনি। খুঃ

ধামা—(না দমিয়া সগর্বে) তা ছাড়া, অমন তোড়ে ইংরিজি কেউ বলতে পারে না আপিসে। সায়েব বলে—

প্রৌ—(মনে মনে খুসী হইয়া) আঃ প্রসন্ন; তোমায় নিয়ে যে কী করি! তার পর বুঝলেন মশায়—গেলুম ত। সায়েবের চিঠিখানা ঝাড়তেই একজন বাবু ছুটে এল। তার পর সে কি খাতির। একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসিয়ে পাখা খুলে দিলে। আঃ ঘর না ত, যেন দারজিলিঙের পাহাড়। তার পর মশায় টেলিফোন ক'রে দিতেই মটর হাঁকিয়ে একেবারে সায়েব ডাক্তার এসে উপুস্থিত। পরীক্ষা ক'রে বললে 'কাল থেকে ডেলি দুটো ক'রে ইন্‌জেকশন, একদিন ক'রে বাদ। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?' বললুম, 'ইয়েস সার, ভেরি মাচ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড।' ডাক্তার বললে 'টেন ও ক্লক পাংচুয়ালি।' খুঃ

কঃ ছোঃ—দিয়েছেন ইন্‌জেকশন?

ধামা—বলে কি হে! বেনেটি সায়েবের চিঠি নিয়ে শেষে—

প্রৌ—আঃ প্রসন্ন! সাইল্যান্স প্লীজ। খুঃ খুঃ (ফিরিয়া) হ্যাঁ, দশটা বাজবার পাঁচ মিনিট আগেই গিয়েছিলুম। গিয়ে দেখি সব সাজানো গোছানো ফিটফাট। ডাক্তার তোড়জোড় নিয়ে তোয়ের। গিয়ে ত বসলাম। শুনছি ঘড়ি বাজছে টং টং টং, আর আমি চোখ বুজে গুনছি এক দুই তিন চার পাঁচ। আশ্চজ্জি, বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, একেবারে যেন তোপের বাবা! পাঁচ গোণবার সঙ্গে সঙ্গেই প্যাঁড় প্যাঁড় ক'রে এক বিঘৎ এক ছুঁচ দিয়েছে ফুঁড়ে। আমি ত—

শকুন বুড়ো—(হঠাৎ গলা বাড়াইয়া) উঃ বলেন কি মশায়? ভীমি যান নি! কত লোক যে ওখানেই শেষ হ'য়ে যায়!

ধামা—ওঁর কথা? হাঁ! জানেন, উনি সেই নাইন্টিন ফোর্টিনের লড়াইয়ে যে ভলেন্টিয়র করপ্‌সে নাম—

প্রৌ—আঃ প্রসন্ন, ফের? খুঁঃ। না মশায় একেবারে সেন্সলেস হ'য়ে যাই নি বটে, তবে খুব একটা শক খেয়েছিলুম বৈকি। চোক বুজে শুনছি ডাক্তার বলছে 'ডোণ্ট এ্যাফ্রেড ম্যান; ডোণ্ট এ্যাফ্রেড। আচ্ছা হো যায়গা।' বললুম, 'নো সার হোয়াট এ্যাফ্রেড! আই ডোণ্ড কেয়ার।' বললুম বটে, কিন্তু হাত পা তখন সব ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে। খুঁঃ খুঁঃ।

শঃ বুঃ—উঃ খুব বেঁচে গেছেন মশায়। খবরদার আর ও পথে পা বাড়াবেন না। আমি হ'লে বরং দুলে কবরেজের কাছ থেকে ধুঁতরোর রসে হক্তেল গুলে খেতুম তবু ঐ—

কঃ ছোঃ—ও সব হাতুড়ে বদ্যির কথা শুনবেন না আপনি। ঠিক করেছেন মশায়—খুব ঠিক করেছেন। (জনান্তিকে—সিলি বোগাস)

শঃ বুঃ—(খিঁচাইয়া উঠিয়া) হাতুড়ে? কবিরাজ দুলাল চাঁদ গুপ্ত জে, ডি, টি, এস্, বাক্যতীর্থ হ'ল হাতুড়ে!

দুই—জে, ডি, টি, এস কি মশায়?

কঃ ছোঃ—বুঝছেন না? মানে যাকে ধরি তাকেই সাবাড়। (মুখ লুকাইল)

শঃ বুঃ—(খ্যাঁকাইয়া উঠিয়া) তোকে সাবাড় করেছে। বিদ্যে ফলাচ্ছে।

(২।৩ জন)—যাক্‌গে মশায় যাক্‌গে। ও সব ফাজিল ছেলেছোকরাদের কথায় রাগ করতে গেলে—

পাঁচ—না মশায়, দুলে কবরেজের খুব নাম শুনিছি। আমাদের কৈবত্তপাড়ার বাবুরাম—

শঃ বুঃ—শুনবেন না? ও তল্লাটে অমনটি কেউ নেই, হাঁ। এই ত সেবার শ্বশুরের পিঠে এই এত্তবড় মালসার মত একটা ফোঁড়া। কত ডাক্তার, বদ্যি, হকিম, টোটকা, কেউ কিছু করতে পারলে না। সিবিল সার্জন এসে বলে অস্তর করতে হ'বে—হাঁসপাতালে পাঠাও। শ্বশুর ত আর নেই। বাড়ীতে মড়াকান্না প'ড়ে গেল। হাঁড়ি চড়ে না। আমি গিয়ে দেখি এই ব্যাপার। শ্বশুরকে গিয়ে বললুম কিচ্ছুটি ভাব্‌বেন না, দুলে কবরেজকে ডাকান দিখি। ওসব ঠিক হয়ে যাবে'খন।

ধামা—তা তাঁর ঠিকানাটা যদি একবার—দাদাকে একটু

প্রৌঃ—আ প্রসন্ন! ইউ আর এ চ্যাটারিং বক্স। শুনতেই দাও না ব্যাপারখানা! বলুন মশায়, তার পর? খুঁঃ খুঃ

শঃ বুঃ—বললে না পেত্যয় যাবেন মশায়, কবরেজ ত এসে ঢাকাই ভেন্নার আঠা দিয়ে জল শিউলির পাতা বেটে পেল্লেব দিলে; দিতিই দম্ ক'রে সেই পেল্লায় ফোঁড়া গেল ফেটে। বাপরে সে কী পুঁজ রক্ত—গামলা গামলা। কোথায় চুপসে গেল সেই পাহাড়ের মত ফোঁড়া। (কলেজের ছোকরার প্রতি খিঁচাইয়া) আবার বলে হেতুড়ে। হুঁঃ! কত কত সায়েব ডাক্তার তল হ'য়ে গেল, আর উনি এলেন বিদ্যেদিগ্‌গজ।

পাঁচ—তা বইকি! এ সব দৈবী ওষুধের কাছে আবার ঐ সব ডাক্তার ফাক্তার। খান দিখি মশায় রোজ সকালে শিমূলের বীচি আকের রস দিয়ে মেড়ে পুব মুখে দাঁড়িয়ে! কুকুর ত কুকুর—পাগলা শেয়ালে কিছু করুক ত? (কলেজের ছোকরার প্রতি ব্যঙ্গ কটাক্ষে) আছে এসব ওষুধ ওদের?

কঃ ছোঃ—আজ্ঞে তা নেই। তা, কামড়াবার আগে খেতে হয় না পরে? মানে—

পাঁচ—যাও যাও আর ফিচলেমি করতে হবে না, ছোকরা।

কঃ ছোঃ—আজ্ঞে না, মানে, কাল থেকে তা হ'লে গোটাকত বীচি খেয়ে বেরুতাম। এই গাড়ীতেই যাতায়াত করতে হয় কি না, তাই বলছিলুম—

তিন—কি বেয়াদব। আমরা সব পাগলা কুকুর?

কঃ ছোঃ—(শান্তভাবে) আজ্ঞে না, উনি ত শেয়ালের কথা বলছিলেন।

পাঁচ ও তিন—তবে রে—

[হাঁ হাঁ করিয়া সকলে পড়িয়া ব্যাপারটা থামাইয়া দিল]

এক—যে-সব বিষয় বোঝ না—

দুই—এদের সব তাতেই ফোড়ন মারতে আসা চাই, হাঁ।

শঃ বুঃ—ওটা সেই ইছেপুরের ছোকরা না?

[ছোকরা চুপ করিতেই আবার সকলে প্রৌঢ়কে লইয়া পড়িল]

চার—মাছ মাংস খাচ্ছেন নাকি মশায়, বারণ করে নি?

প্রৌঃ—আজ্ঞে না, ডাক্তারে ত বারণ করে নি; ইদিকে মা বুড়ী মাছ মাংস ডিম প্যাঁজ গরম মসলা কিচ্ছু খেতে দেবে না। বলে, গরম হবে। আঃ, কি ফ্যাঁসাদেই পড়েছি।

এক—না, না, মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করবেন না মশাই। ও ডাক্তার ফাক্তার কিচ্ছু না ওঁদের কাছে। উঃ! পাগলা কুকুর, বড় ভয়ানক জিনিষ।

দুই—খুব ঘি খান মশায়, খাঁটি সর মারা গাওয়া ঘি। ওসব ফেরিওয়ালাদের ভেঁড়ো ঘি ফি ছোঁবেনও না।

ক: ছোঃ—কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারেন. খাঁটি সর মারা গাওয়া ঘি? ঠিকানাটা লিখে নি।

পাচ—ফড়ফড়ানি থামাও না হে ছোকরা। ডেঁপো কোথাকার!

শঃ বুঃ—খাঁটি গব্য তোমার মাথায়—বুজেচো? আচ্ছা বেহায়া যাহোক!

সকলে (একে একে)—যাক্‌গে মশায়, যাক্‌গে। ওদের কথায় কান দিলে কি চলে? এরা জানেই বা কি, বোঝেই বা কি? দুপাত ইংরিজি পড়েছে বৈ ত নয়? টোটকা ওষুধ কি সোজা নাকি?

তিন—ঠিক বলেছেন। এই সেদিন কৈবোত্তো পাড়ার পেঁচোকে কামড়ালে শ্যালে। বে-শ ছিল 'জড়ি বটী' ক'রে। বৌটা রোজ দুবেলা পানা পুকুরে চান করিয়ে টোকো দই দিয়ে পান্তা ভাত খাওয়াত। ছিল বেশ, সহজ মানুষ। ব্যাটা মরবি ত মর—কালীপুজোর দিনে বাবুদের বাড়ী গে পাঁটার ঝোল আর খাঁটা মেরে এলো। তারপর যাবি কোথায়! পর দিন হুয়া হুয়া ক'রে (অনুকরণ) শ্যাল ডাক ডেকে, হাত পা খিঁচে মারা গেল।

প্রৌ—(সভয়ে) বলেন কি মশায়! শ্যাল ডেকে? খুঃ খুঃ খুঃ।

তিন—আজ্ঞে হ্যাঁ, শ্যাল বৈ কি। শ্যালে কেটেছিল কি না। ঐ আবার কুকুরে কাটলে—। না না, ভয় পাবেন না মশায়—ভয়টাই ভা—রি খারাপ লক্ষণ।

অন্য ছোঃ—কিছু ভয় নেই মশাই। এই দেখুন না আমাকেই তিন তিনবার কুকুরে কামড়েছে। পিসিমার ওষুধ—চালবাটার ভেতর তিনগাছি ভেড়ার লোম পুরে—খাইয়ে দিন দিখি। অব্যর্থ। পিসিমা আমার বভ্যির বাপ।

চার—ও সব লোম ফোমের কম্ম নয় মশায়। যেমন বুনো ওল তেমনি বাগা তেঁতুল ত চাই। আধপো নিজ্জলা আদার রসে বভ্যিরাজের পাতা বেটে খান দিনি একদিন, দু-চার বার দাস্ত, বমি—তার পর ব্যস, সাফ্।

প্রৌঢ়—(চক্ষু বিস্ফারিত) সে কি মশায়, টেঁশে যাবো নাকি? দু'হাজার টাকার পলিসিটা এই আসচে মাসেই মেচিওর করবে যে। আমি আবার হোল লাইফ পছন্দ করি নে। কোন আবাগের ব্যাটার হাতে গিয়ে পড়বে টাকাটা। তার চেয়ে ও নিজেই—। দুগ্‌গা, দুগ্‌গা, কি দুভ্যোগ দেখুন দিখি। খুঃ খুঃ

নামাবলী (গায়ে নামাবলী, কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় তুলসীর মালা)—ভয় পাবেন না মশায়, ভয় কি? হরিনাম করুন, আহা, তাঁরি ইচ্ছেয় সব। আর তাঁরি ওপোর নির্ভর ক'রে স্থাবর অস্থাবর সব একটা বিলি ব্যবস্থা ক'রে যান। নইলে বুঝলেন কি না, আবার দুটো ভাতের জন্যে জ্ঞাত কুটুমের দোরে দোরে—গোবিন্দ, গোবিন্দ, হরিনাম সত্য (নয়ন মুদিলেন)

প্রৌ—হা ভগবান! উঃ, কি পাপ না জানি করেছি! হায় হায়। খুঃ।

[বিপরীত বেঞ্চে একটি হাফপ্যান্ট-পরা, হাফ শার্টের পকেটে কর্পোরেশনের অক্ষর মারা মজবুত গোছ আধাবুড়ো লোক। কাঁচা-পাকা পাতলা চুলে চেরা সিঁথিকাটা। হাতে নস্যের কৌটা। এক টিপ নস্য লইয়া। হঠাৎ চাঁচা গলায়]

হাফপ্যা—শুনলুম মশায় ঢের। দৈব ওষুধ হ'তে হ'লে গুণীর হাতের ছাপ চাই বুঝলেন। তবে শুনুন, বার বছর কাটিয়েছি বদরপুরের জঙ্গলে। ও পাগলা শ্যাল-কুকুরে কাটা অমন বিশ গণ্ডা আমার চোখের ওপরই ধড়ফড়িয়ে ম'লো। সায়েবের ছিল কড়া হুকুম—কাউকে কামড়ালেই তাকে ছেকল বেঁধে দে পাঠিয়ে কলকাতায় ইন্‌জেকশন্ দিতে। ব্যাটারা ত সব ইন্‌জেকশন্ দিয়ে এসে লাগে কাজে। ছ'মাস না যেতেই দেখ কুকুর ডাকছে শেয়াল ডাকছে। তারপর সব পড়ে ঘেঁটি ভেঙে। আর দ্যাখো, ভাসিয়ে দিয়েছে—একেবারে এক কলসী। আর তাতে ভাসছে এই এত্ত টুকুটুকু কুকুর—

প্রৌ—(আতঙ্কে) কুকুর কি মশায়? অ প্রসন্ন!

ধামা—দাদা! (চটিয়া) হ্যাঁ মশায়! কুকুর আবার কি? কুকুর! কুকুর না হাতী, যত্তো সব—

হাফপ্যাণ্ট—আজ্ঞে কুকুর বৈকি, আলবাৎ কুকুর। তবে হাঁ ছানা, কুকুরছানা।

প্রৌ—(কাতর ভাবে) অ প্রসন্ন!

ধামা—দাদা—এই যে আমি। (জড়াইয়া ধরিল)

প্রৌ—বুকটা যে বড় ধড়ফড় করতে লাগ্‌ল।

হাফপ্যাণ্ট—ভয় কি মশায়! ওষুধ আছে! অব্যর্থ ওষুধ। আগে শুনুন ত! ভয় পাবার আপনার কিছু হয় নি এখনও। বার বছর বদরপুরের জঙ্গলে কাটিয়েছি ও সব স্টেজ আমার খুব জানা আছে। ও ত শুধু বুক ধড়ফড়—হাত পা খিঁচবে, শ্যাল-কুকুর ডাকবে, চোখে ঘুগরো পোকা—আরে ভয় কি মশায়? ঘেঁটি ভেঙ্গে পড়লে ফেরাবার ওষুধ জানি, হাঁ।

[জনান্তিকে] প্রৌঢ়—অ প্রসন্ন আর যে এ সয় না। বড় বাড়িয়ে তুললে যে!

ধামা—চল দাদা, নেমে যাই অন্য গাড়ীতে। কি বল?

প্রৌঢ়—উঁহু! আমায় এত জ্বালিয়েছে, আর আমি

ওদের ছাড়ব? রও তুমি, গপ্পটা শুনি আগে। দেখাচ্ছি।]

হাফপ্যাণ্ট—শুনবেন তবে ব্যাপারখানা?

প্রৌ—(কাতর ভাবে) বলুন। [সকলে। বলুন মশায়, বলুন]

হাফপ্যাণ্ট—শুনুন তবে। (নস্য গ্রহণ) সর্দ্দার রামভজন তেওয়ারী। ইয়া ভোজপুরী জোয়ান। রাতে পাহারা দেয়; ভোরে মাটি মেখে কুস্তী করে, দুপুরে ঢাই সের রোটী আর রহর কি দাল খেয়ে নিদ্রা দেয়, সন্ধ্যেয় সিদ্ধি ঘোঁটে আর ভজন গায়। সে গান শুনে তল্লাটের রয়েল বেঙ্গল জঙ্গল ইভাকুয়েট করেছে। কিন্তু পাগলা কুকুর—ভারি বেয়াড়া—ও মশায় এক আলাদা জাত। কারুর খাতির করে না। এ হেন যে রামভজন, তাকেই কামড়ালে পাগলা কুকুরে। ব্যাটা কিছুতেই ইন্‌জেকশন দেবে না। অনেক ক'রে বোঝালে সায়েব; খোসামোদ করলে, শেষে এক-শ টাকা বক্‌শিশ কবুল করলে। উঁহু, জান কবুল তবু বিনা লড়াইয়ে পরের হাথিয়ারের ঘা ও সইবে না। সায়েব হাল ছেড়ে দিলে—বল্‌লে মরুক গে।

ক: ছো:—কেন মশায়, ছেকল? সায়েবের ছেকল কোথায়—

সকলে (একে একে)—আঃ শুনতে দে না রে বাপু! এ ত ভারি ব্যাদড়া! তার পর? বলুন মশায়।

হাফপ্যাণ্ট -তার পর মশায়, (নস্য গ্রহণ) তেওয়ারী ত কুত্তা কাটার বহুত ভোজপুরী দাওয়াই সুরু করলে। আরে বেটা ছাতুখোর, এ সোঁদোর বনের হেঁড়েল ও তোর টোটকায় সানাবে কেন? মাসখানেক যেতে না যেতে একদিন দুপুর রোদে ক্ষেপে গিয়ে ব্যাটা কুকুর ডাকতে ডাকতে পড়ল বেরিয়ে। বাপ্, সে ত ডাক নয়, যেন গোল-বুনে বাঘের হাঁকার।

সকলে (একে একে)—ইস্ উঃফ্, তার পর!

হাফপ্যাণ্ট—চারদিকে ত পালা-পালা রব প'ড়ে গেল। কাজ-কাম সব বন্ধ। সায়েব ত মাথায় হাত দিয়ে বসে চক্ষে অন্ধকার দেখতে লাগল। হাইড্রোফোবিয়ার ভয়ে বাংলা থেকে বেরয় না। দরজা জানালা সব বন্ধ।

(ধীরে সুস্থে একটা নস্যঝাড়া ময়লা রুমালে সশব্দে নাক ঝাড়িতে লাগিল।) (সকলে) তার পর, তার পর কি করা যায়! একে ঐ আখাম্বা জোয়ান; তার ওপোর পেল্লায় ক্ষেপেছে। দিশে-বিশে না পেয়ে শেষ-কালে সায়েব আমায় ডেকে পাঠালে। কল্লে কি জানেন? একটা পিচবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে 'বিলবাবু' লিখে একটা লম্বা বাঁশের ডগায় টাঙিয়ে ঢং-আ-ঢং এলার্ম বাজাতে লাগল। যাই হোক, গেলাম ত। গিয়ে দেখি দুর্দ্দশার একশেষ। ক'দিন চান হয় নি, ভিস্তি নেই; রান্না হয় নি, বাবুর্চি পালিয়েছে; জ্যাম আর বিস্কুট ভরসা। বাচ্চা দুটোকে দেখি একটা কাঠের সিন্ধুকে তালা দিয়ে রেখেছে, ডালা দুটো একটু ফাঁক ক'রে। আর বাচ্চা দুটো সেই ডালার ফাঁকে চোখ দিয়ে বেরালছানার মত "মামি, মামি" করছে। মেম সায়েবকে সায়েব ঢোকাতে পারে নি সিন্ধুকে। বাবা, খাস বিলিতী মেম। সায়েবের পেছনে বন্দুক হাতে একেবারে খাড়া সান্ত্রী। আমি যেতেই 'হুকুমদার' ব'লে বন্দুক তুললে। সায়েব বললে—আরে না না ডার্লিং, ও আমাদের.বিলবাবু। আরে, এস এস বাবু, এস। সে কী খাতির। সায়েব বাচ্চা ব'লেই যাহোক কেঁদে ফেলে নি। বললে, যা হয় একটা উপায় কর বাবু। বাঁচাও আমায়। থাউজ্যাণ্ড রূপীজ্ রিওয়ার্ড ক্যাশ। কোন রকমে রামভজনকে ধরে দাও।

[নস্য গ্রহণ। সকলে (একে একে)—সত্যি! দিলে। আঃ থামুন না, বলতে দিন না। বলুন মশায়। তার পর?]

যাই হোক অনেক কথাবার্ত্তার পরে আমি এক ফন্দী ঠাওরালুম। তখন কিছু বললুম না। বললুম, সায়েব হাতীর ফাঁদটা ঠিক করবার হুকুম হোক। আর যতগুলো পিচকিরি আর বালতী আছে আমাকে দাও।

ক: ছো:—রং খেললেন নাকি মশায়?

সকলে (একে একে)—আঃ, থামো না হে ছোকরা। শুন না আগে। এ'ত বড় বেয়াড়া! বলুন মশায়, বলুন। বলুন। ইত্যাদি

হাফপ্যাণ্ট—রং! রং কোথায়? রং কাবার। শোনোই আগে বাপধন! তখুনই কুলী-ধাওড়ায় গিয়ে যে কটা কুলী বাকী ছিল, দশ দশ টাকা বকশিস্ কবুল করে সব কটাকে একত্তর করলুম। তার পর একটা ক'রে পিচকিরি আর এক বালতী জল এক একটার হাতে দিয়ে ইয়া এক ওয়াটার ব্রিগেড বানালুম। সুধু পিচকিরি আর এক বালতী জল আর কোনো অস্তর নেই। তার পর লেপ্ট রাইট, কুইক মার্চ ক'রে আমরাই দূরে দূরে দাঁড়িয়ে রাম-ভজনকে ফেললুম ঘিরে।

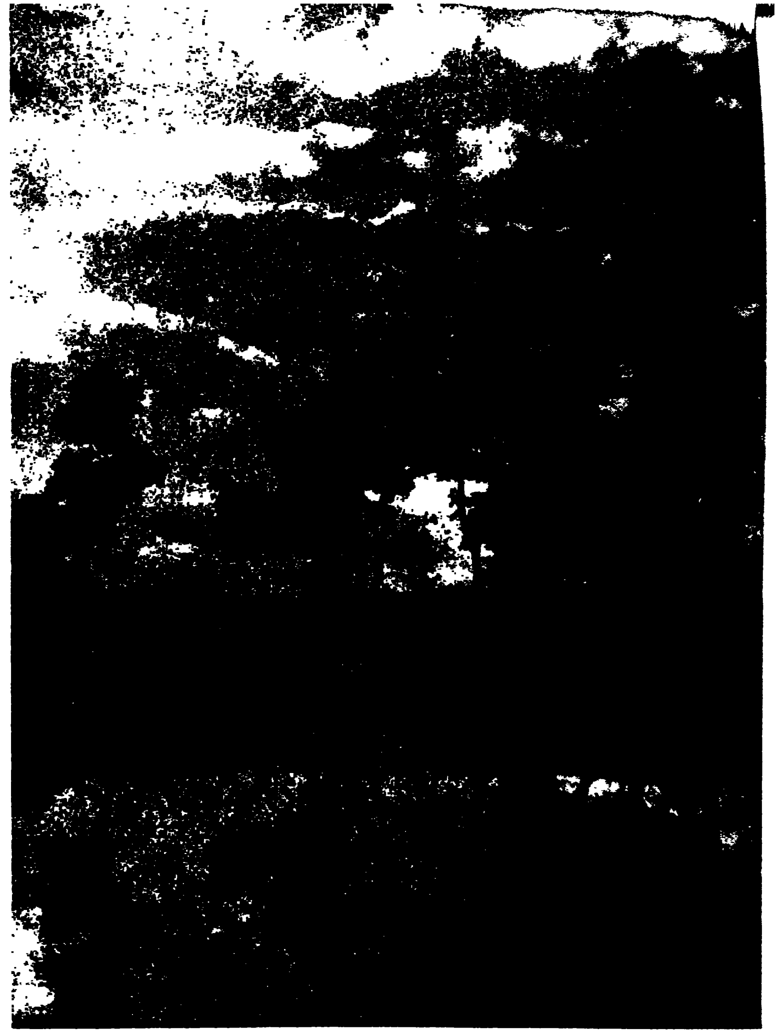
শঃ বুঃ—সব্বনাশ! বলেন কি, ক্ষেপে এসে কামড়ে দিলে না আপনাদের!

হাফপ্যাণ্ট—তবে আর বলছি কি মশায়। রামভজন



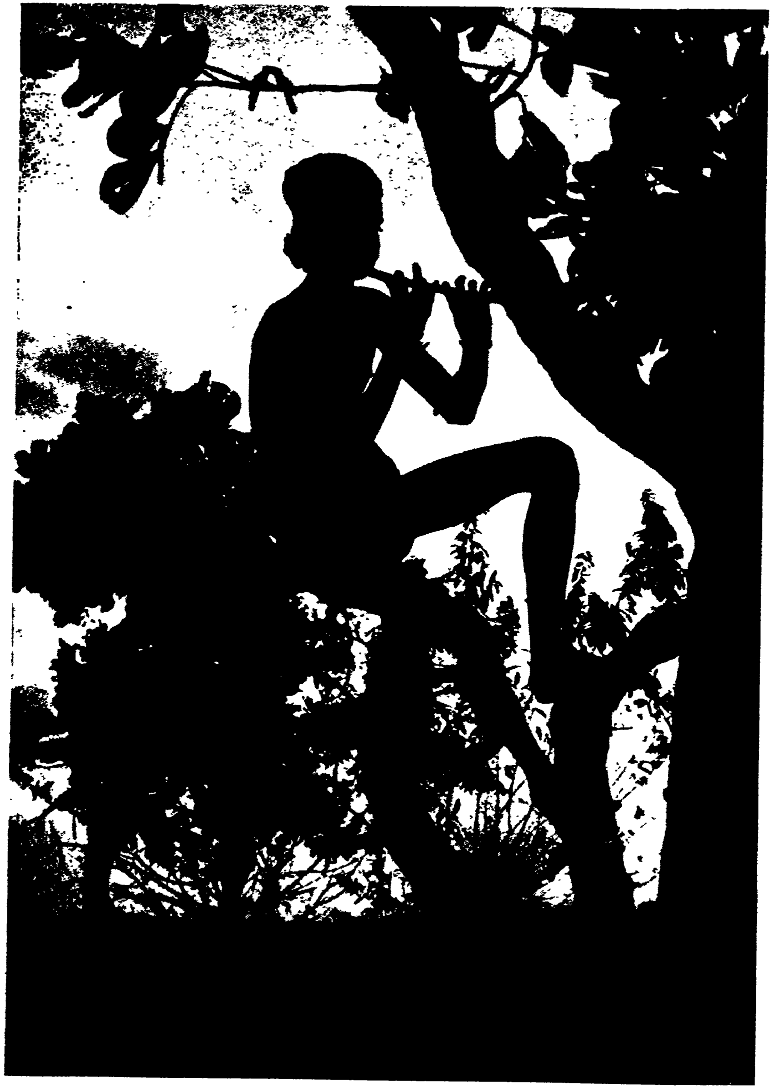
পল্লী-শ্রী

—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ



বর্ষা-প্রাতে

—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ



ভাটিয়ালী



সখী-সংলাপ

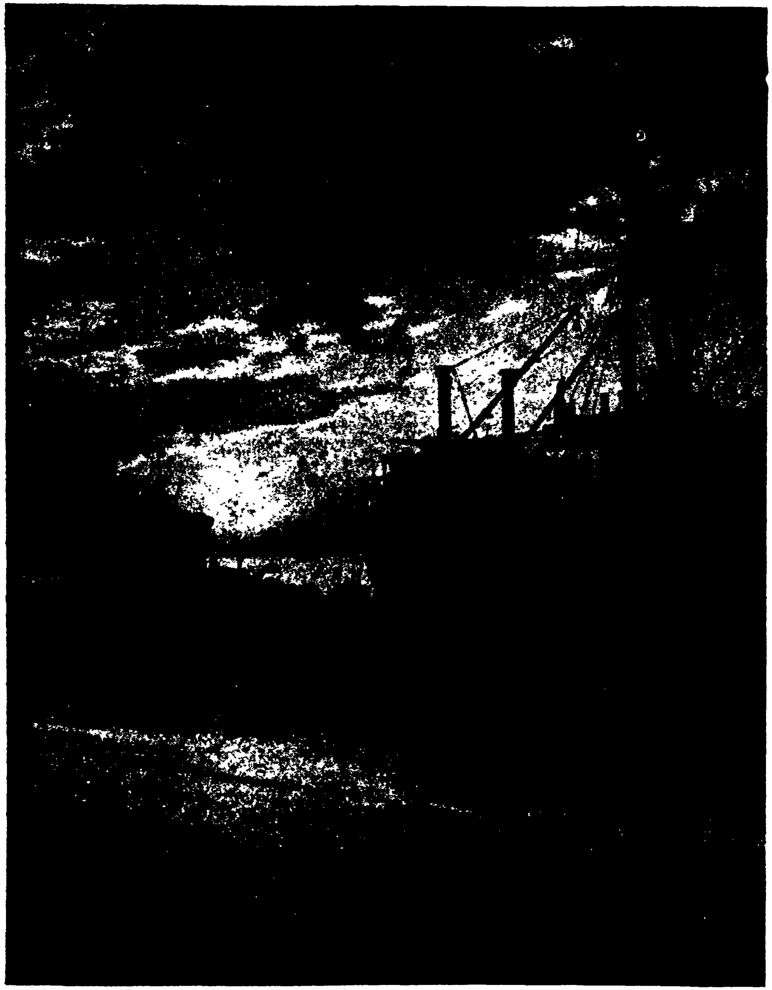
—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ



নদী হইতে নিংপো নগরীর দৃশ্য

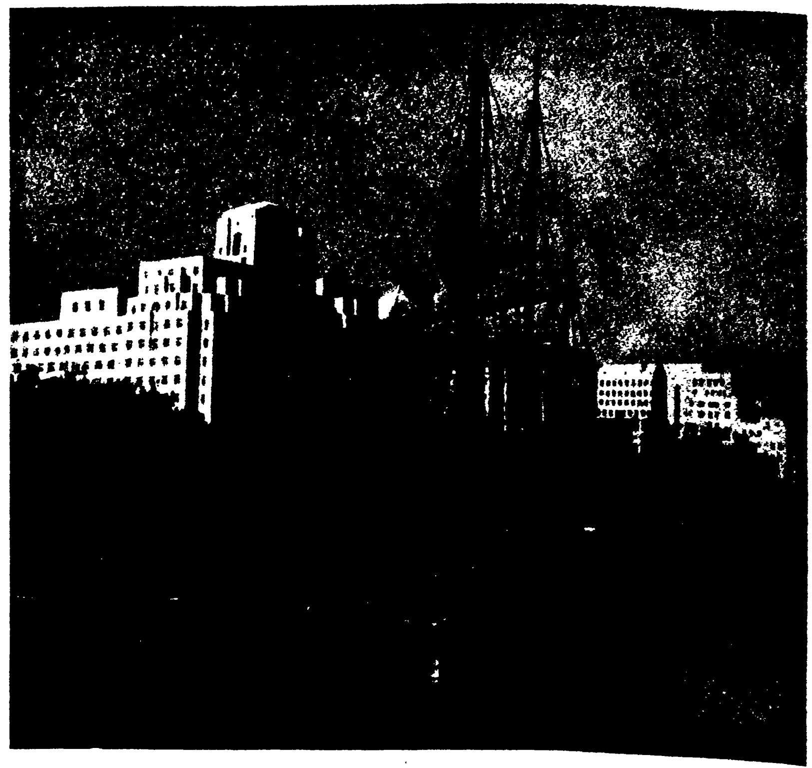


টাই-পিং শাউ কান্



কলিকাতা—গঙ্গার ঘাটে

—শ্রীসুশীলবন্ধু ভট্টাচার্য্য



লণ্ডন। টেমস্ নদীবক্ষে

যেই দাঁত খিঁচিয়ে এক এক জনকে তেড়ে আসে আর অমনি 'ফচাং' ক'রে পিচকিরি ছোড়া হয়। আর জল দেখে রামভজন 'ওঁয়াও' ক'রে আঁৎকে দশ পা পিছিয়ে যায়। এমনি ক'রে ডাইনে থিকে বাঁয়ে, ইদিক থিকে উদিক—করতে করতে, করতে করতে ফেললুম ব্যাটাকে পুরে সেই হাতীর ফাঁদে। আর যাবি কোথা বাছাধন। আগড়ের ফাঁসটুকু টেনে দিতিই— পাং ক'রে একেবারে, যাকে বলে বাগবন্দী। ব্যস লড়াই ফতে। আমার ওয়াটার ব্রিগেড, "বিল বাবুকী জয়" বলে হাঁকরে উঠল। সায়েব ত ড্যাম গ্ল্যাড। "হুরে হুরে" বলতে বলতে বাংলা থেকে বেরিয়ে এল। তার পর শেকহ্যাণ্ড করেই হাতে একখানা কাগজ গুঁজে দিলে। খুলে দেখি হাজার টাকার একখানা করকরে নোট।

সকলে (একে)—হা—জা—র টা—কা! তা দেবে না, সায়েব বাচ্চা ত হাজার হ'লেও। তা খুব ফন্দী করেছিলেন যা হোক, সাবাস বলতে হবে।

কঃ ছোঃ—কৈ মশায় আপনার দাওয়াই কই, সেই ঘেঁটি ভাঙলে যা—।

সকলে (একে একে)—আরে দুত্তোর ঘেঁটি, বলতে দাও না হে! বলুন মশায়।

হাফপ্যাণ্ট—সব আসছে মশায়; একটু সবুর করুন। তার পর সায়েব ত রামভজনকে শিকলী দিয়ে বাঁধিয়ে ফেললে—কলকাতায় পাঠায় আর কি। আমি বললুম, সায়েব প্লীজ, আমাকে দুটো দিন সময় দাও, আমি একটা দাওয়াই দি। দৈবী ওষুধ, ভা—রি দেমাক। সায়েব ত রাজী হ'ল। (নস্য গ্রহণ! সকলে উৎকণ্ঠিত।)

গিয়ে দেখি সে রামভজন আর নেই, একেবারে নেতিয়ে পড়েছে, চক্ষু শিবনেত্তর। বুঝলুম আর দেরী নেই। বাবা কম্বলরাম খাটিয়াদাসকে স্মরণ ক'রে (যুক্ত করে প্রণাম) একটা পান, একটা চিকি সুপুরির সাথে দুটো কেঁচোর ল্যাজামুড়ো বেটে কেঁচোর মাটির ভেতর না পুরে, দিলুম খাইয়ে। দেওয়া মাত্তর লাল লাল চোখ দুটো খুলে 'ওঁয়াও' ক'রে একটা ডাক পেড়েই ব্যাটা লুটিয়ে পড়ল। তার পর দেখি একেবারে, রাম, রাম, রাম—মানে, ভাসিয়ে দিয়েছে ঘরটা—। এইটি ক'রে বাছাধন সেই যে ঢলে পড়ল—আর নট্ নড়ন চড়ন নট্ কিচ্ছু। কাছে গিয়ে দেখি সেই জলে ভাসছে—এক দুই তিন করে একুশটা—চষিপিঠের মত—

সকলে (একে একে) - একুশটা! শুনলেন? লোকটা মারা গেল নাকি? তার পর? (সকলের চক্ষু কপালে উঠিল)

প্রৌ—অ প্রসন্ন, কি হবে?

ধামা—তাই ত দাদা!

প্রৌ—তলপেটটা যে কেমন কেমন করছে, অ প্রসন্ন!

ধামা—এঁ্যা, তাই ত! কি করি!

হাফপ্যাণ্ট—করছে নাকি—এঁ্যা, তবে নিশ্চয় কুকুর-ছানা। ও মশায়, শেকলটা একটু—

কঃ ছোঃ—হাইড্রোফোবিয়া, ডেঞ্জারাস।

শঃ বুঃ—একটু হাওয়া ছেড়ে দাঁড়াও না হে ছোকরা (আর একজনের পিছনে যাইবার চেষ্টা)

নামাবলী (চক্ষু মুদিয়া)—গোবিন্দ, মধুসূদন, হরে মুরারে, রাম রাম রাম রাম)

প্রৌ—ওগো, গলাটা যে কাঠ হ'য়ে এল (চোখমুখের বিকৃত ভঙ্গী করিল)

ধামা—কি হ'ল! দাদা! অ মশায়!

প্রৌ—খেউ খেউ। অ প্রসন্ন!

সকলে (একে একে)—গার্ডকে একবার—দরজাটা খুলুন না! শেকল—হাওয়াটা ছাড় না হে! রাম, রাম, রাম, রাম (সকলের দরজার দিকে যাইবার চেষ্টা)

[একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল]

প্রৌ—(চোখমুখ খিঁচাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া) খেউ খেউ খেউ,—খেউ খেউ খেউ।

[দুই দিকের দরজা খুলিয়া হুড়মুড় করিয়া সকলে নামিয়া পড়িল]

প্রৌ—উঃ—আ—ঃ। [লম্বা হইয়া শয়ন] একেবারে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল ব্যাটারা।

ধামা—হাঃ হাঃ হাঃ—হোঃ হোঃ হোঃ, সাবাস দাদা।

আমি—হাঃ হাঃ হাঃ, ব্যাপার কি মশায়? হি, হি, হিঃ।

প্রৌ—(হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া) এই যে, ভেড়ার পালে নেবে যান নি দেখছি।

ধামা—হাঃ হাঃ হাঃ—খুব করেছ দাদা; একেবারে ভেড়ার গোয়ালে আগুন! হাঃ হাঃ হাঃ।

প্রৌ—আঃ প্রসন্ন! সাইল্যান্স প্লীজ। খুঃ খুঃ (চিৎপাৎ হইয়া শয়ন) আ—ঃ!

"পরিত্রাণায়"

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

এসো লহ ভুবনের ভার,
আর দেরি করিয়ো না, ঐ ঘিরে আসে
যুগের সঞ্চয় তব জীবনের সম্পদ্-সম্ভার
লোভে লেলিহান্ কোন্ মহাসর্ব্বনাশে!
পুরুষের ব্যর্থতারে দয়া দিয়ে, দিয়ে তব ক্ষমা
বারে বারে স্পর্শ করি' হরি' তুমি নিলে নিরুপমা
যত তার গ্লানি, করি' নিলে তারে শুচি
প্রক্ষালিয়া অশ্রুজলে, নির্ম্মল অঞ্চলে তব মুছি'।
গেঁথে তুমি দিয়েছিলে সেই সব ব্যর্থতার নুড়ি,
বহু কৃচ্ছ্র সাধনায়, বহু তপোনিষ্ঠা দিয়ে জুড়ি',
অন্তরের মৃদুতাপে গলাইয়া নিজ মনে ধীরে
গৃহের প্রাচীরে তব, এই তব পূজার মন্দিরে।
ভেবেছিলে, কোনোদিন
তার মাঝে কোন্ নামহীন
দেবতার আবির্ভাব হবে।—
ঐ শোন কোলাহল, হের ঐ মানব-দানবে
সে-সৃষ্টি তোমার
বীভৎস তাণ্ডব-নৃত্যে মেতে আজি করে চুরমার!
মাটির যা ঢেলা, নাই হৃদয়ের হাটে কোনো দাম,
তাই লয়ে হানাহানি উত্তাল উদ্দাম,
ভেঙে দেব-নিকেতন ধ্বংস-শেষ লয়ে কাড়াকাড়ি
মূঢ়ের মতন। এসো নারী,
করিয়ো না দেরি,
যুগে যুগে ঐ দুটি বাহু দিয়ে ঘেরি'
রেখেছ যে ভুবনেরে, ভার তার তুলি' লহ কাঁধে,
তোমার ও মুখে চাহি' অজাত অযুত যুগ কাঁদে।

পুরুষের পাশে নহে, তাহার পশ্চাতে নহে,
ফেলে তারে এসো গো পশ্চাতে,
তার যত ব্যর্থতারে তুলি' লয়ে হাতে
মলিন ক'রো না হাত, আজি এই ধরা
হোক তব নিজ হাতে নিজের মতন করি গড়া।

যুগে যুগে দেবতার আবির্ভাব পুরুষের মাঝে
লাগিল কি কোনো কাজে
পৃথিবীর?
পড়ি' আছে করি' ভিড়
পথে পথে তাঁহাদের তপোবহ্নি-ভস্ম অবশেষ,
মন্ত্রগীতি-মূর্চ্ছনার রেশ
কানে আসে, প্রাণে নাহি আসে।

এ ধরা তোমারে ভালবাসে,
তুমি এ ধরারে ভালবাসো, ওগো নারী,
আপনার হৃদয় নিঙাড়ি'
সুধাধারা পিয়াইয়া এরে তুমি দাও দাও প্রাণ,
দাও এর মর্ম্মমূলে প্রাণের দুস্তর অভিমান
বাঁচিবার, বাঁচাবার।
তোমার সভার
মোরে যদি কর কবি, বারে বারে ক'ব,
হেরিয়া মরিতে চাহি দেবতার আবির্ভাব নব
রমণীর রূপে,
কল্যাণের গ্লানিভরা বন্ধ্যা এ যুগের অন্ধকূপে।

পুরুষেরে তুমি দেবে কাজ,
তব হাত হ'তে পাওয়া যে-কাজ তা আজ
শুধু তার কাজ হবে।

হয়ত তোমার গড়া সে-ভুবনে যুদ্ধ র'বে।
র'বে বীর্য্য, পুরুষের রহিবে পৌরুষ, ললাটিকা
কালো ভ্রূকুটির, তপোতেজোবহ্নিশিখা,
র'বে জয়-পরাজয়। তবু মনে জানি,
সে হবে তোমার যুদ্ধ রাণী!
পৌরুষ মর্য্যাদা পাবে তব হাত হ'তে,
বীর্য্যেরে করিয়া দিবে পথ তুমি বসি' তার রথে
সারথির বেশে। যদি বিজয়ের মালা
তব হাত হ'তে পাই, তব অনুরাগ-অশ্রু-ঢালা,
তোমার সুরভি মাখা, তবে নাহি ডরি,—
সে যুদ্ধ সুন্দর হবে ওগো নারী, কল্যাণী, সুন্দরী!

করিয়ো না দেরি,
কোন্ সর্ব্বনাশে ভরা তিমির-শর্ব্বরী আসে ঘেরি'।
ডাকি বারম্বার,
এসো তুমি, এসো নারী, এসো, লহ ভুবনের ভার।

পুণ্যস্মৃতি*

শ্রীঅবনীনাথ রায়

৫২৮ পৃষ্ঠার এই বইখানি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গত তিরিশ বৎসরের জীবনের ঘটনা লইয়া লিখিত। বইখানির আখ্যানভাগের সঙ্গে আমার একটু সংযোগ আছে। যে সময়ের ঘটনা লইয়া বইখানি সুরু হইয়াছে তখন আমি নিজেই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্র ছিলাম। সেই কারণে গোড়ার ঘটনার যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি। যেমন লেখিকা লিখিয়াছেন, "সন্ধ্যার পর 'রাজা' অভিনয় হইল। ... অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী রাণী সুদর্শনা ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরঙ্গমা সাজিয়াছিলেন।" (২৫—২৬ পৃ.) আমি আর একটু বলিতে পারি। অজিতবাবু অভিনয়ের দুই দিনই সুদর্শনা সাজিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর ছোট ভাই সুশীল এক দিন সুরঙ্গমা সাজিয়াছিলেন, আর এক দিন আমি সাজিয়াছিলাম। আমাদের এক মাষ্টারমশাই (আমরা তখন 'মশায়' বলিতাম) সুবর্ণ সাজিয়াছিলেন—তাঁর নামটা মনে পড়িতেছে না, তিনি দেখিতে বেশ সুপুরুষ ছিলেন। বইখানির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চাকর উমাচরণের উল্লেখ আছে। উমাচরণকে আমরা দেখিয়াছি। সে বুদ্ধিমান, দেখিতেও সুশ্রী ছিল, তার গলার স্বরও বেশ মিষ্ট ছিল। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতাম যে, সে গুরুদেবের চাকর হইবার যোগ্য ব্যক্তি।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার শিশু বিভাগের ছেলেদের গল্প বলিতেন। সেই গল্প শোনা এমনি আমাদের লোভের বস্তু ছিল যে, আমরা (আদ্য-বিভাগের ছেলেরা) লুকাইয়া উঁকিঝুঁকি মারিয়া, ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহার গল্প শুনিতাম। লেখিকার আর একটা কথার আমি প্রতিধ্বনি করিতে পারি, "এখনকার শান্তিনিকেতনের চেহারা যাঁহাদের কাছে পরিচিত তাঁহারা কল্পনাই করিতে পারিবেন না, যে, সেই ত্রিশ বৎসর আগের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম কি প্রকার ছিল। চারি দিকেই মাঠ আর খোয়াই অনেক দূরে দূরে দুই একটি সাঁওতাল-পল্লী দেখা যাইত। প্রথম যেবার গেলাম, শান্তিনিকেতনে তখন বোধ হয় দুইটির বেশী পাকা বাড়ী দেখি নাই। আর সব ছিল মাটির ঘর, খড়ের চাল। বিজলীর বাতি ছিল না, মোটরকার ছিল না, বাঙালী ছাড়া বিদেশী মানুষও দু-একটির বেশী দেখি নাই। সেই মাঠগুলির অধিকাংশের উপরেই এখন ছোট বড় নানা আকারের পাকা বাড়ী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, খোয়াইগুলিও অনেক স্থানে শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।" (১২ পৃ.)

২৯২ পৃষ্ঠায় সোমেনদার উল্লেখ আছে। লেখিকা বলিয়াছেন, "ত্রিপুরা রাজবংশের একটি যুবক নাম সোমেন্দ্র দেববর্ম্মা, তিনিই আমাদের প্রহরী হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছু পরে সন্তোষ বাবুও আসিয়া জুটিলেন।" যদিচ শান্তিনিকেতন ছাড়িবার পর সোমেনদার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই, কিন্তু বিরাটদেহ সেই ত্রিপুরা-রাজবংশের যুবককে স্পষ্ট মনে আছে। ত্রিপুরা-রাজ্যে তিনি বড় অফিসার হইয়াছিলেন। বিহারে যে ই. আই. আর. রেল-দুর্ঘটনা হয়, তাহাতে তিনি মারা যান। তিনি আমাদের এক বছরের সীনিয়র ছিলেন।

১৯১৮ সালের ১৬ই মে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা দেবীর মৃত্যু হয়। এই প্রসঙ্গে লেখিকা লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথ কন্যাকে দেখিতে গিয়া এই নিদারুণ সংবাদ শুনিতে পান, গাড়ী হইতে না নামিয়াই তখনই ফিরিয়া চলিয়া আসেন। বাড়ী আসিয়া দুপুর ১টা পর্য্যন্ত তেতলার ছাদে বসিয়াছিলেন, কেহ তাঁহাকে ডাকিতেও সাহস করে নাই।" (৩৬৩ পৃ.) গভীর শোকে নিজেকে লোক-চক্ষুর অন্তরালে বন্দী করিয়া রাখাই রবীন্দ্রনাথের অভ্যাস ছিল—বাহিরে তাঁহাকে হা-হুতাশ করিতে কেহ দেখে নাই।

'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় যখন বইখানি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হইতেছিল তখন পুলকিত চিত্তে পড়িতেছিলাম—বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম একথা অস্বীকার করিব না। এখন আগাগোড়া বইখানি পড়িতে পাইয়া উপকৃত বোধ করিয়াছি।

বইখানির মধ্যে যে বস্তু সর্বাগ্রে পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট করে সে হইল লেখিকার আন্তরিকতা এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। যাঁহারা কবীন্দ্রকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা করেন (আমার অনুমান তাঁহাদের সংখ্যাই এখন অধিক) কিন্তু পৃথক্ ভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতে পারেন নাই তাঁহারাও অনুভব করিবেন যে, এই বইখানির মধ্য দিয়া তাঁহাদের মনের শ্রদ্ধাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের চরণ স্পর্শ করিয়াছে।

আমাদের দেশের যাঁরা মনীষী তাঁদের সংস্পর্শে অনেক লোকই আসিয়া থাকেন, কিন্তু সে সম্পর্কে ডায়েরি রাখার অভ্যাস কম লোকেরই আছে। শ্রীযুক্তা সীতা দেবী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়ের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রক্ষা করিয়া এবং সে-সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সাধারণের গোচর করিয়া মানব-সমাজের মহৎ উপকার সাধন করিলেন। ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অপৌর জীবন সম্বন্ধে এমন অনেক খুঁটিনাটি সংবাদ পাওয়া যাইবে যার সাক্ষাৎকার অন্যত্র দুর্লভ বলিয়া আমাদের মনে হয়।

এই ধরণের বই লিখিবার আর একটা বিপদ আছে। লেখক বা লেখিকার হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে বা ভাবোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তার ফলে লেখার মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা লক্ষিত হয় এবং পূজ্য ব্যক্তি বড় না হইয়া পাঠক-পাঠিকার কৃপার বা সহানুভূতির পাত্র হইয়া উঠেন। বক্ষ্যমাণ পুস্তকে লেখিকার মাত্রাজ্ঞান অত্যন্ত সুসমঞ্জস দেখা গেল—কোথায় রাশ টানিয়া ধরিতে হয় তাহা তিনি ভাল রকম জানেন।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সকলেই চেনেন, কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথের সংস্রবে আসিবার সৌভাগ্য সকলের হয় নাই। যাঁহাদের সে সুযোগ ছিল না তাঁহারা কল্পনাই করিতে পারিবেন না যে একজন মানুষ কি করিয়া এরূপ পূর্ণাঙ্গ হয়—এমন একজন মানুষ হইতে পারে যে-মানুষ চিন্তায় বড়, স্নেহে বড়, শরীরে বড়, সৌন্দর্যে বড়, কর্মে বড়, শৌর্যে বড়, হাস্যপরিহাসে বড়, আবার শুদ্ধতায় বড়। এই বই পড়িয়া সকলে দেখিবেন রবীন্দ্রনাথ যেখানে থাকিতেন সেখানে আনন্দের স্রোত বহিত—সঙ্গীত, অভিনয়, কবিতাপাঠ, আর মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ মিলন। একমাত্র আনন্দ পরিবেশণ ব্যতীত এই সকলের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। শাস্ত্রে আছে, ঈশ্বর আনন্দ স্বরূপ। এই দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি বা blasphemy হইবে না। লেখিকা সেই কারণে সকাতরে বলিয়াছেন, "তিনি কোথাও নাই, ইহা বিশ্বাস ত হয় না, কিন্তু কোথায় আছেন, ব্যাকুল মন তাহার সন্ধানও পায় না।"

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একথা যেমন সত্য, রবীন্দ্রনাথ আছেন সে কথা তেমনি সত্য। যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুই হারাইয়া যায় না সেই সমষ্টি সত্তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিরাজিত আছেন—অনুকূল সাধনা এবং দৈব অনুগ্রহ থাকিলে তিনি যথাসময়ে সঞ্জীবিত হইবেন।

---

* শ্রীসীতা দেবী প্রণীত—প্রকাশক প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ২৸৹ মাত্র।

আংটি চাটুজ্জের ভাই

শ্রীমনোজ বসু

বর্ষাকাল। রাস্তাঘাটে জলকাদা; উঠানেও আসর বসান মুশকিল। নীলকান্ত এই ক'টা মাস তাই যাত্রার দল ছেড়ে কবিরাজি করে। জায়গাটা খুব ভাল; ম্যালেরিয়া ত আছেই, তা ছাড়া আজকাল আবার নূতন নূতন রোগ-পীড়া দেখা দিচ্ছে, সে-সব নাম নীলকান্ত বাপের জন্মে শোনে নি। অতএব কাজ-কারবার খাসা চলছে, এক-এক দিন নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ থাকে না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্ধ্যার পর আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ে একটুখানি আড্ডার বন্দোবস্ত চাই-ই। নয় ত তার রাতে ঘুম হয় না। জমজমাটের সময় কোন রোগী দৈবাৎ যদি এসে পড়ে, সে বেচারা গালি খেয়ে মরে।

আজও দুই-এক করে সকলে জমায়েত হচ্ছে। হরিশ বেহালাদার এসে গেছে; নটবর ভীম সাজে, সে ত সেই দুপুর থেকে তক্তাপোষে গদিয়ান হ'য়ে হুঁকো টানছে। সামনের রাস্তা দিয়ে গুড়-বোঝাই খান পাঁচ-ছয় গরুর গাড়ি যাচ্ছিল—তারই একখানা থেকে ছোকরাগোছের একটা লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে ঢুকল। লোকটা বিদেশী; পায়ে পাম্প-সু, গলায় কম্ফর্টার, গায়ে ময়লা আধ-ছেঁড়া জিনের কোট, ডান হাঁটুর নিচে বেশ বড় আকারের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সেই জায়গাটা দেখিয়ে সে বলে, পুঁজ পড়ছে, থুঃ—থুঃ—একদম ঘা হয়ে গেছে মশায়। তার উপর আবার জ্বরে ধরেছে।

নীলকান্ত ঘাড় নেড়ে গম্ভীর ভাবে বলে, ঘায়ের তাড়সে জ্বর? হুঁ, তাই—

ঘা থাকুক, জ্বরটার চিকিচ্ছে ক'রে দাও দিকি। গাড়ি চেপে বেড়াচ্ছি, পা একটু জখম থাকলে কি আর এমন ক্ষতি হবে?

ডান হাতখানা এগিয়ে দিয়ে লোকটা কবিরাজের পাশে বসে পড়ল। বলে, আগে আসছিল এক দিন অন্তর; আজ দুদিন সকাল-বিকাল দুবেলা ধরেছে। খাওয়ার তোয়াজ দেখছে, তাই আরও কষে ধরছে।

নীলকান্ত নাড়ি দেখতে দেখতে বলল, এত বড় জ্বর—তার উপরে খাওয়া?

খাওয়া বলে খাওয়া? দুপুরে গাড়ি রেখেছিল মণ্ডল-গাঁয়ের বাজারে। রান্নার জুত হ'ল না—তা মশায়, পাকি পাঁচ পোয়া চিড়ে, পাঁচ পোয়া কাঁচাগোল্লা, আর ঘন-আঁটা দুধ—তাও সের-খানেকের বেশি হবে ত কম নয়। আমার আবার এক বদ-স্বভাব—শরীর বেজুত হ'লে ক্ষিধে ভয়ানক বেড়ে যায়।

নটবর প্রশ্ন করে, কোথায় যাবে তুমি?

পিরথিমের তদারকে। ব'লে সে সুর ক'রে ছড়া কাটে—

> জীবনপুরের পথে যাই,
> কোন দেশে সাকিন নাই।

বসন্ত আমার নাম। আংটি চাটুজ্জের নাম শুনেছ—তস্য ভ্রাতা। তিনি থাকেন বাড়ি-ঘরদোর আগলে, বাকি জগৎ-সংসারের খোঁজ খবর আমাকে নিতে হয়।

রকম-সকম দেখে মনে হয় লোকটা পাগল। নীলকান্ত বলে, জামাটা তোল দিকি। পিলে আছে বলে ঠেকছে।

বসন্ত হা-হা করে হেসে উঠল। তা আছে। আরও নানা রকম চিহ্ন আছে। কোমর টিপে দেখছ কি, সে চিহ্ন আমি গাঁটে রাখি নে। এই দেখ।

ব'লে পা থেকে জুতো খুলে শুকতলার নিচে থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে দেখাল।

এই দেখ দাদা, জাল নয়—আসল রাজ-মূর্ত্তি। আরও আছে, গরজের সময় ফুসমন্তর বেরিয়ে যাবে। হেঁ-হেঁ, আর দেখাচ্ছি নে। আংটি চাটুজ্জের ভাই আমি, তাঁর দশ আঙুলে দশটা হীরের আংটি। তোমার ভিজিট আমি মারব না, কবিরাজ মশায়।

নীলকান্ত আরও খানিকক্ষণ প্রণিধান ক'রে দেখে আলমারি থেকে একটা গুঁড়ো ওষুধ বের করল। পিছন দরজার দিকে চেয়ে বলে, এক গ্লাস জল দিতে হবে যে, মা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—মানুষটি দেখা গেল না—চুড়ি-পরা একখানা হাত দরজা একটু ফাঁক ক'রে জলের গ্লাস রেখে দিল।

বসন্ত বলে, ঠিক ক'রে বল কবিরাজ, সুরকির গুড়ো দিচ্ছ না ত? বড্ড কাবু করে ফেলেছে। মাইরি বলছি। হাঁটা মুশকিল হয়েছে; নইলে পর্ব্বাগ্রাম গরুর

পাড়ি চাপে? রাত্তিরের মধ্যে অরটা নির্দ্দোষ ক'রে সেরে দাও, বুঝব ক্ষমতা। তা হলে ঘোর-ঘোর থাকতে মা-গঙ্গা পাড়ি দিয়ে চাকদামুখো বেরিয়ে পড়ি।'

নোট দেখিয়ে মন্ত্রের কাজ হয়েছে। নীলকান্ত মোলায়েম সুরে জিজ্ঞাসা করে, রাত্তির বেলা ওঠা হচ্ছে কোথায়?

উঠেছি এই তোমার এখানে। তুমি জায়গা না দাও, বটতলা রয়েছে। সে জায়গা ত কেউ কিনে রাখে নি।

নীলকান্ত প্রস্তাব করে, একটা রাতের ব্যাপার যখন, তা বেশ ত—এখানেই থাক। অসুবিধা হবে না।

উপরে নিচে চারিদিকে বার কয়েক তাকাল বসন্ত। বলে, শুতে হবে কোন্ ঘরে?

এই এখানে তক্তাপোষের উপর মাদুর পেতে দেব। তবে একটুখানি রাত হবে। এই এরা সব আসছে, এরা চলে যাবে, তার পর—

লোকটি দৃঢ় ভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, না মশায়, তাহলে চলবে না। এরই মধ্যে চোখ বুঁজে আসছে। সকাল সকাল না শুলে ভোরবেলা রওনা হব কি করে?

কেন জানি না নটবরের বড্ড ভাল লেগে গেল বসন্তকে। বলে, এক কাজ কর—খেয়ে-দেয়ে বরং আমার ওখানে গিয়ে শুয়ে থেক। এখানকার হাঙ্গামা চুকতে এক এক দিন রাত কাবার হয়ে যায়। ঐ টিনের দোতলায় থাকি আমি। একা থাকি। খুব হাওয়া—

বসন্ত আবার প্রশ্ন করে, শোওয়া ত হ'ল, খাওয়াবে কি শুনি কবিরাজ? তুমি বাবা জরো রোগীর জন্য শঠির পালো এনে হাজির করবে না ত? আগে ভাগে বলে দাও, না পোষায় সরে পড়ব।

নীলকান্ত বললে, জর পুরানো হয়ে গেছে। দুটো পুরানো চালের ভাত খেলে দোষ হবে না। তাই খেয়ো।

আর গাঁদালের ঝোল?

উঁহু, তোফা ভাজা মুগের ডাল লাগিয়ে দেব ঐ সঙ্গে।

তবে বন্দোবস্ত ক'রে ফেল। দেরি করো না, পেট জ্বলে উঠেছে। এক্ষুনি চাপাও গে। বলে তৎক্ষণাৎ বসন্ত উঠে দাঁড়াল। নটবরের হাত ধরে টেনে বলে, চল তোমার দোতলা অট্টালিকা দেখে আসি। বলি খাট-টাট আছে ত? হেঁ-হেঁ মশায়, রুই-কাতলা খাওয়াবে ত ঘিয়ে ভেজে খাওয়াও। দোতলায় গিয়ে মেজেয় পড়ে থাকতে পারব না, তা বলে দিচ্ছি।

আবার সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগে, ও কবিরাজ মশাই, ইদিকে শোন এক বার। যোগাড়-যন্তোর করছ, রাঁধাবাড়া করবে কে?

নীলকান্ত বলে, আমার মেয়ে হরিমতী। আর কেউ নেই বাড়িতে, ঘর-সংসার সেই দেখছে।

তা বেশ করছে। কিন্তু নৈকষ্য কুলীন আমরা। আংটি চাটুজ্জের ভাই। যার তার হাতে খাই নে।

মুখ কাল করে নীলকান্ত বলে, তুমিই তবে রান্না কর। অন্দরের দিকে এগিয়ে উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিল, ও খুকী, যোগনোয় করে তুই শুধু ভাতটা চড়িয়ে দে। ছোঁয়াছুঁয়ি করিস নে। খবরদার।

একগাল হেসে বসন্ত বলল—হ্যাঁ, সেই ভাল। ভাল বামুনের জাত মেরে শেষকালে মহাপাতকের ভাগী হবে, তাই সামাল করে দিলাম।

নটবরের সঙ্গে তার ঘরে ঢুকে বসন্ত সর্ব্বাগ্রে দুয়োর ভেজিয়ে দিল। জুতোর ভিতর থেকে নোট বের করে বলল—নাও দাদা, ধর। তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হোক।

ব্যাপার কি?

শনির দৃষ্টি পড়ে গেছে, কাছে রাখলে কি রক্ষে আছে? বুঝি দাদা, বুঝি। নিজের বিছানায় এনে শোয়াচ্ছ, ও দিকে ভাজামুগের বন্দোবস্ত! এত সব খাতির আমাকে নয়, পদতলে এই যিনি আছেন তাঁর। ছোট ভাইকে ছলনা কর কেন, নেবেই ত—সহজে না দিলে পেটে ছুরি বসিয়ে নেবে। তার কাজ নেই। কিন্তু মা-কালীর কিরে, একা খেয়ো না—কবিরাজের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে বাদ বাকি সমস্ত তোমার।

ধর্ম্মভীরু মানুষ নটবর। রাগ ক'রে সে নোট ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বসন্ত খানিক অবাক্ হয়ে থাকে। তার পর টিপ করে সে তার পায়ের গোড়ায় প্রণাম করে। বলে—টাকা ছুঁড়ে দেয়, সে-মানুষ পরমহংস। না নাও, না-ই নিলে। রাতের মতন রেখে দাও তোমার কাছে। ওখানকার ঐ এক ঘর মানুষ দেখে ফেলেছে। তোমাদের দেশ-ভুঁই, তোমায় কিছু বলবে না···বুঝলে না? বড্ড পাজি জিনিস এই টাকা-পয়সা। ঠেকে ঠেকে বুঝেছি।

তবে সঙ্গে নিয়ে এসেছ কেন?

আমি? বয়ে গেছে আমার সঙ্গে আনতে। ষড়যন্ত্র ক'রে পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ধাগী মেয়ে আমার বউ-ঠাকরুণ। ক্ষারে কাপড় কাচা দেখে সন্দেহ করেছে। এক প্রহর রাত থাকতে রওনা হয়েছি, কিচ্ছু জানিনে। চানের সময় জামা খুলতে গিয়ে দেখি, খসখস করছে। আংটি চাটুজ্জের বউ কি না, নজর এড়ান কঠিন। এক হিসাবে মন্দ হয় নি অবিশ্যি। শুধু দেখিয়ে দেখিয়েই কাজ হাসিল

করা যাচ্ছে। আজ পাঁচ-ছ'টা দিন ত কেবল চেহারা দেখিয়ে চলে যাচ্ছে, একটা পয়সা খরচ হয় নি।

এমন সময়ে কবিরাজের বাড়ি থেকে ডাক এল, গিয়ে ভাত নামাতে হবে।

ডাল ফুটে উঠেছে। হরিমতী চুপটি ক'রে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর মিটিমিটি হাসছে। অতি ছেলেবয়সে মা-হারা, তখন থেকেই গিন্নি। বাবাকে দেখে দেখে সে ধরে নিয়েছে, গোটা পুরুষ জাতটাই আনাড়ি। তাদের সম্পর্কে কৌতুক ও করুণার অন্ত নেই। হঠাৎ মেয়েটা হাঁ-হাঁ করে ওঠে, ও কি হচ্ছে? অত নুন দেয় নাকি? এই রকম রান্না শিখেছেন আপনি?

বসন্ত বিষম চটে যায়। ডেঁপো মেয়ে, রান্না শেখাতে এসেছ? তোমার জন্মের আগে থেকে এই কর্ম্ম করছি। এ আর কতটুকু—দৈনিক আড়াই পোয়া নুন লেগে থাকে আমার।

ব'লে কেবল হাতের নুনটুকু নয়, আর একবার তার ডবল পরিমাণ নিয়ে ডালের মধ্যে দিল।

হরিমতী রাগ ক'রে বলে, তা হ'লে আবার মশলা লাগবে, আরও জল ঢালতে হবে। ও যে পুড়ে জবক্ষার হয়ে গেছে। মানুষে কেন, গরুতেও মুখে দিতে পারবে না।

ঘটির জল হুড় হুড় ক'রে সে কড়াইতে ঢেলে দিল।

বসন্ত উঠে দাঁড়িয়ে দু হাত কোমরে দিয়ে রণ মূর্ত্তিতে বলল, জল ঢেলে দিলে যে বড়! কি জাত তুমি?

বামুন।

ওঃ, হ'লেই হ'ল? বামুন অমন সবাই কপচে থাকে। কি রকম বামুন দেখি, গায়ত্রী মুখস্থ বলতে পার?

হরিমতী বিদ্রূপ করে বলে, সর্ব্বস্ব ফেলে এসে জাতটাই শুধু সঙ্গে নিয়ে বেড়াচ্ছেন? পৈতে ছাড়লেও জাত ছাড়ে না—ও বুঝি কাঁঠালের আঠা?

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বসন্ত এইবার হেসে ফেলল। বলে, রাঁধো মাণিক, তুমিই রাঁধো। জরের উপর আজ জুত হবে না। কিন্তু রাঁধতে আমি জানি, খুব ভাল জানি। আর এক দিন রেঁধে দেখাব, তখন বুঝবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর উদ্গার তুলতে তুলতে বসন্ত এদের আড্ডায় এল। নটবরকে ডেকে বলে, ঘরের চাবিটা দাও—শুয়ে পড়ি গে।…একটা কুকর্ম্ম করে ফেললাম, দাদা। গঙ্গার পাড়ের উপর রয়েছি, গঙ্গাজলে রান্না—তেমন কিছু দোষ হবে না, কি ব'ল?

সকালবেলা বসন্ত ঘুমন্ত নটবরকে নাড়া দিচ্ছে। চারটে পয়সা দাও দিকি।

নটবর চোখ রগড়ে জিজ্ঞাসা করে, কি হবে?

পারানির পয়সা। গঙ্গা তো সাঁতরে পার হওয়া যাবে না। যাই ব'ল দাদা, মানুষের চেয়ে বানরের বুদ্ধি বেশি।

বসন্ত হঠাৎ ভাবুকের পর্য্যায়ে উঠে গেছে। মাথা দোলাতে দোলাতে বলে, বিবেচনা ক'রে দেখ, তাই কিনা। হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বত এনেছিল, কাজকর্ম্ম চুকে গেলে যেখানকার জিনিষ সেইখানে রেখে এল। আর ভগীরথের কি রকম আক্কেল—মা-গঙ্গাকে এনে শুদ্ধিশুদ্ধ বাঁচালি, তার পর শিবের মাথার জিনিস আবার সেখানে গুঁজে দিয়ে আয়—তা নয়, গরজ ফুরোলে কিছু আর মনে থাকল না। গাঙ-খাল যদি না থাকত দাদা, মনের সাধে একবার পায়ে হেঁটে বুঝতাম।

তোমার যে পায়ে ঘা। হাঁটবে কি ক'রে?

ঠিক কথা। থুঃ থুঃ—ওদিকে নজর দিও না।

নটবর নোটখানাই ফিরিয়ে দিল। বসন্ত বলে, শুধু চারটে পয়সার দরকার। নোট বন্ধক রেখেই না হয় দাও। পয়লা খেয়া—ওদের এখন ভাঁড়ে মা-ভবানী। এখন কোথায় ভাঙাতে যাই, কি করি। আবার যখন আসব, বন্ধকী জিনিষ ছাড়িয়ে নিয়ে যাব, কথা দিচ্ছি।

খুচরো পয়সা নেই। নোট ভাঙিয়ে নিয়ে যা ইচ্ছে করো গে। যাও। ব'লে নটবর আবার শুয়ে প'ড়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুঁজল।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। নটবর বেরুবে বেরুবে করছিল, কাঠের সিঁড়ি হঠাৎ মচমচ ক'রে উঠল।

দাদা, ও দাদা, ঘরে আছ?

তুমি চলে যাও নি বসন্ত?

যেতে পারলাম আর কই। ভাঙানি খুঁজতে গিয়ে গোলমালে পড়ে গেলাম।

কাঁধে বেহালা, বসন্ত ঘরে ঢুকল। হাত-মুখ নেড়ে বলতে লাগল, ঘুরতে ঘুরতে কালকের ঐ হরিশ-বেহালাদারের ওখানে গিয়ে পড়লাম। একখানা গৎ শোনাল, বলব কি দাদা, মন কেড়ে নিল যেন। দরদস্তুর ক'রে বেহালাটাই কিনে নিয়ে এলাম।

বাজাতে জান?

কিছু না, কিছু না। কোন দিন এসব ঝঞ্ঝাট ছিল না।

নতুন করে এই প্যাচে পড়ে গেলাম। কর্ম্মনাশা জিনিস। ...সাত টাকায় কিনেছি, দাঁও মারা গেছে, কি বলো?

বিপুল আত্মপ্রসাদে সে যেন ফেটে পড়ছিল। বলতে লাগল—আর নোটের দরুন বাকি তিনটে টাকাও দিলে না। তার বাবদ তিনখানা গৎ শিখিয়ে দেবে বলেছে। সে-ও সস্তা—কি বল? কাঠের ভিতর থেকে সুর বের করা, সোজা কথা?

তা হলে আর তোমার চাকদায় যাওয়া হয় কই? এখানেই থেকে যেতে হবে।

বসন্ত শুষ্ক মুখে বলে, তা ক'টা দিন থাকতে হবে বই কি! কপালই এই রকম দাদা। ভাবি এক, হয়ে যায় অন্য। ছোট একটা ঘর-টর দেখে দাও, স্বপাক শুরু ক'রে দিই সেখানে।

নটবরের নজরে পড়ল, বসন্তর গা খালি। ভিজে কাপড়-জামা পুঁটলি করে বগলে নিয়েছে!

বৃষ্টি হয় নি, ও সব ভিজল কি ক'রে?

ভিজিয়ে দিল কবিরাজের বাঁদর মেয়েটা। আগা-গোড়াই ভিজেছিল। গা মুছে ফেলে কবিরাজের একখানা শুকনো কাপড় পরে এলাম।

নটবর উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করে, কেন কেন, কি হয়েছিল বল ত—

ওদের বারান্দায় ব'সে একটু গৎ প্রাকটিশ করছিলাম। ছড়াৎ ক'রে জল ঢেলে দিল। মেরে বসতাম—তা বলল, দেখতে পাই নি।

তাই হবে।

তোমরা বুড়োমানুষ, তাই ঐ রকম ভাব। ঠোঁট চেপে হাসছিল যে! মনে মনে ওর দুষ্টুমি, যাই বল। আবার বলে, ভালই হয়েছে—মাথা ঠাণ্ডা হওয়ার দরকার ছিল। এত বড় অপমান! বেহালা আমি শিখবই। তোমার এই নিচের ঘরটা ভাড়া দেয় না দাদা? দেও না ঠিক্‌ঠাক করে—একসঙ্গে থাকা যাবে।

নটবর বলে, টাকাগুলো ছাইভস্ম করে উড়িয়ে দিয়ে এলে। খাবে কি?

আছে দাদা, আরও আছে। সাগরের জল ফুরোবে না। অঙ্গ চিরে বের ক'রে দেবো। আংটি চাটুজ্জের বউ, নজর কত মোটা! নোট দিয়েছে কি একখানা?

দরজায় খিল এঁটে অতি সন্তর্পণে সে পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলল। কিচ্ছু হয় নি সেখানে, সব ফাঁকি। ব্যাণ্ডেজের ভাঁজের মধ্যে নোটের গোছা। বলে, বিশ্বাস হ'ল ত? এবার থাকার বন্দোবস্ত ক'রে দাও। কাউকে কিছু বলো না কিন্তু। খবরদার। তুমি টাকা ছুঁড়ে ফেলে দাও, তোমায় শুধু দেখিয়ে দিলাম।

নিচের ঘরটাই সাব্যস্ত হ'ল। দেড় টাকা ভাড়া। সেইখানে থেকে সে বেহালা শেখে। ডাল-কলাই-বোঝাই দক্ষিণের বড় বড় নৌকা নদীর ঘাটে পনর দিন কুড়ি দিন এসে নোঙর ক'রে থাকে, ধীরে সুস্থে কলাই বিক্রি হয়। তারই এক মাঝির সঙ্গে বসন্তর ভাব জমে গেল। লোকটা ভাল দাবা খেলে। বেহালা বাজানো, দাবা খেলা আর কোন গতিকে দুটি চাল সিদ্ধ ক'রে নেওয়া—এই তার কাজ।

এক দিন এক কাণ্ড হয়ে গেল। শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে, বেহালার চর্চ্চা বেশিক্ষণ ভাল লাগল না। খেয়ে দেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়বে, এই মতলবে রান্নার জোগাড়ে গেল। উনানে হাঁড়ি চাপিয়ে দেখে, চাল নেই। দোকানপাট ইতিমধ্যে সব বন্ধ হয়ে গেছে। তখন দরজায় শিকলটা তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি নদীর ঘাটে তার বন্ধু সেই মাঝির কাছে এল রাত্রের মতো চারটি চাল ধার করবার আশায়। বন্ধুর তখন সঙীন অবস্থা, দাবা খেলা খুব জমে গেছে, এক সুপারিওয়ালা তাকে মাত করবার জো করেছে। এমন দুঃসময়ে কি করে ফেলে যায়, জুৎ দিতে দিতে কখন এক সময় বসন্ত নিজেই বসে পড়েছে, তার হুঁশ নেই।

খেলা ভাঙল। তখন গভীর রাত, দশমীর জ্যোৎস্না ডুবে গেছে। ভয় হ'ল, দরজায় তালা দিয়ে আসে নি, ইতিমধ্যে চোর ঢুকে যদি যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে গিয়ে থাকে! যথাসর্ব্বস্ব অবশ্য অতিরিক্ত মূল্যবান কিছু নয়,—টাকাকড়ি বসন্ত কাছছাড়া করে না,—গামছার পুঁটুলিতে বাঁধা একখানা ধুতি ও একটা উড়ানি, মাটির হাঁড়ি-কুড়ি দু-তিনটা আর ছড়িসহ বেহালাটি। ছুটোছুটি ক'রে এসে দেখে, যা ভেবেছে তাই—চোর সত্যিই ঘরে ঢুকে পড়েছে, তবে জিনিসপত্র নিয়ে পালাবার গরজ দেখা যাচ্ছে না, খিল এঁটে দিয়ে এমন দখল করে বসেছে যে বিস্তর চেঁচামেচি ও দরজা ঝাঁকাঝাঁকি করেও সাড়া মেলে না।

চেঁচামেচিতে দূরবর্ত্তী দোকানের লোকগুলা পর্য্যন্ত ঘুমচোখে সাড়া দিতে আরম্ভ করল। অবশেষে দরজা খুলল। নত নেত্রে দাঁড়িয়ে আছে হরিমতী। নিজের ভাড়া-নেওয়া ঘরে এতক্ষণ বেদখল হয়ে ছিল, তার উপর ক্ষিধেয় নাড়ি জ্বলছে, বসন্ত আগুন হয়ে উঠল।

আমার ঘরে ঢুকেছ কি জন্যে? কৈফিয়ৎ দাও বলছি।

হরিমতী কি বলতে গেল ; শব্দ বেরোয় না, ঠোঁট দুটি শুধু থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে। বসন্ত বলে,—চালাকির জায়গা পাও না? এক দিন থাপ্পড় মেরে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব। টের পাবে সেই সময়।

কাজটা আজও যে অসম্ভব ছিল, তা নয়। কিন্তু হরিমতী হঠাৎ ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল। রাতদুপুর, কোন দিকে কেউ নেই, ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে বয়স্থা মেয়ে কাঁদছে, কি জানি কি রকমটা হ'য়ে গেল বসন্তর মন। বিব্রত ভাবে সে বলতে লাগল, কেঁদ না—আর জ্বালাতন ক'রো না লক্ষ্মী। থাপ্পড়ের কথা শুনে এদ্দুর, আর ঘা-গুতো একটা কিছু খেলে কি করতে? এই বীরত্ব নিয়ে মাথায় জল ঢেলেছিলে সেদিন? মারব না, কিছু করব না—বাপের ঘরের মাণিক, এবার গুটি গুটি চলে যাও দিকি।

হরিমতী নড়ে না। মারুক, খুন ক'রে ফেলুক, সে কিছুতে যাবে না। বাড়ির নামে এখনও শিউরে উঠছে। অন্য দিনের মতই রান্নাঘরে সে ঘুমিয়েছিল আড্ডা ভাঙার অপেক্ষায়। চোরের মত চুপি চুপি গিয়ে একজনে তার হাত চেপে ধরে। জেগে উঠে চেঁচামেচি করতে করতে সে বেরিয়ে পড়ল। লোকটিও পিছু পিছু ছুটল। অবশেষে বসন্তর এই ঘর খোলা পেয়ে সে তাড়াতাড়ি দরজা দিয়েছে।

বসন্ত রুখে ওঠে। এত সব কাণ্ড ঘটল, কবিরাজ ছিল কোন্ চুলোয়?

যেখানেই থাকুক, চোখ-কান বর্ত্তমান থেকেও আজকের রাতে নীলকান্তের দেখাশোনা করবার জো নেই। কি একটা উপলক্ষে আড্ডায় আজ বিশেষ একটু আয়োজন ছিল। গান বাজনা ও গাঁজা সমানে চলেছে। যে লোকটা রান্নাঘরে ঢুকেছিল, সে নীলকান্তদেরই যাত্রার দলের লোক, হরিমতী চিনতে পেরেছে তাকে।

উনানের ধারে চেলা-বাঁশ ছিল। তারই একখানা তুলে নিয়ে বসন্ত বলে, যাও যাও এবার। রাত দুপুরে একটা বদনামের ভাগী করতে চাও আমাকে?

ভয়ে ভয়ে হরিমতী রাস্তায় নেমে পড়ে, এক-পা দু-পা ক'রে এগোয়। বসন্ত বলে, রোসো—আমিও যাচ্ছি। বাপের ধন বাপের কাছে বুঝে দিয়ে আসি।

ঔষধালয় ঘরে তখনও পাঁচ-ছ জন রয়েছে, বাঁয়া-তবলায় একজনে মাঝে মাঝে চাঁটি দিচ্ছে, অপরগুলি যেন ধ্যানস্থ। একপাশে নীলকান্ত বোধ করি ঘুমিয়েই পড়েছে, প্রবল নিশ্বাসধ্বনি উঠছে। তবলচি লোকটা বসন্তকে চিনল। বলে, বেহালা এনেছ কই? নিয়ে এস, নিয়ে এস। আর জমবে কখন?

তাদের পাশ কাটিয়ে গিয়ে নীলকান্তর পিঠে ঘা-কতক চেলা-বাঁশ বসিয়ে বসন্ত বিনাবাক্যে ফিরে চলল। তখন সে এক মহাকাণ্ড। জেগে উঠে নীলকান্ত পিঠের জ্বালায় লাফালাফি করছে, বন্ধুমণ্ডলী সমস্বরে অভয় দিচ্ছে। হরিমতী ইতিমধ্যে রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে।

অতরাত্রে রাঁধাবাড়া আর ঘটল না, মেয়েটাকে গালি পাড়তে পাড়তে বসন্ত শুয়ে পড়ল। ঘুমও এসেছিল একটু। হঠাৎ জেগে উঠে শুনতে লাগল, ঔষধালয় থেকে মুষলধারে গালিবর্ষণ হচ্ছে, নৈশ-নিস্তব্ধতায় প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, সব চেয়ে উঁচু হয়েছে নীলকান্তর গলা। সকাল হোক, দেখা যাবে কত বড় চাটুজ্জের ভাই। দেহটা দুই খণ্ড করে যদি গঙ্গার জলে ভাসিয়ে না দেয়, তবে যেন তাদের নামে কুকুর পোষা হয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই সব হাঙ্গামে বসন্তর ঘুমাতে দেরি হয়ে গেল, বেলা পর্য্যন্ত পড়ে থেকে পুষিয়ে নেবে এই ছিল মতলব। কিন্তু ভোর না হতেই দরজা ঝাঁকাঝাঁকি। নীলকান্ত ডাকছে। দেখা গেল, নেশার ঘোরে যা বলেছিল, নেশা ছুটলেও তা মনে রেখেছে। বিরক্ত হয়ে বসন্ত উঠল, গত রাতের চেলা-বাঁশখানা নিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে খিল খুলে দিল। ঢুকে পড়লেই মাথা ফাটিয়ে দেবে, তা তারা যতজনে আসুক। কিন্তু নীলকান্ত ঘরে ঢোকে না, বাইরে থেকে মিনতি করতে লাগল, কৃপা করে এস না একটু; একটা কথা নিবেদন করি।

মুখ বাড়িয়ে দেখে নীলকান্ত একাই, সঙ্গে কেউ নেই। বসন্তকে দেখেই সে নিজের গাল দু-হাতে চড়াতে লাগল।

কি, ও কি?

নীলকান্ত বলে—মহাপাতক করেছি, মশায়। ও-সমস্ত আমি একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। কালকেই শুধু দলে পড়ে—

এখন বসন্ত ভেবে পায় না, কি এমন অপরাধ নীলকান্তর—যার জন্য কাল সে অমন মারমুখী হয়ে গিয়েছিল। বেটা ছেলে, একটু-আধটু নেশাভাঙ করবে, সেটা এমন মারাত্মক কিছু নয়। বলে, নেশা ছাড় না ছাড়, দলটা ছেড়ে দাও। নিতান্ত যদি ইচ্ছা করে, একা-একা খেয়ো।

এ সব যে দলেরই ব্যাপার। একা খেয়ে জুৎ হয় কখনো?

এ কথার সত্যতা বসন্ত খুব জানে। তখন সে অন্য দিক দিয়ে গেল। বলে, তোমার দলের লোকগুলো যে

বড্ড খারাপ, কবিরাজ। ওদের মধ্য থেকেই ত করেছে!

নীলকান্ত বলে—কিন্তু তা-ও বোঝ, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরেরা কি আসবে আড্ডা দিতে?

এর উপরেও কথা চলে না। বসন্ত একটু ভেবে বলল, মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দাও। শ্বশুরবাড়ি চলে যাক, তার পর যাচ্ছে-তাই ক'রো।

নীলকান্ত এবার খপ করে তার হাত জড়িয়ে ধরল। বলে, সেই জন্যেই ত এসেছি। তুমি একটা ঠিকঠাক করে দাও। দেখ, কি রকম চেলাকাঠ মেরেছিলে; কালসিটে পড়ে আছে। তা সত্ত্বেও এসেছি।

দিনের বেলা ঠাণ্ডা মাথায় শাস্তির বহর দেখে বসন্তর করুণা হয়। সে ভরসা দিল, চেলাকাঠ মারার দরুন যেন সত্যি সত্যি একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে তার! বলে, আচ্ছা—দেখব।

ইতিমধ্যে নীলকান্ত আর এক দিন খাতির করে তাকে নিমন্ত্রণ খাওয়াল। তাগিদ রোজই চলেছে। বিরক্ত হয়ে শেষে বসন্ত বলে, বেহালায় ইস্তফা দিয়ে আমি কি পাত্র খুঁজতে বেরুব? এখানে বসে কোথায় পাই? বেশ, আমার সঙ্গেই বিয়ে দাও।

তোমার সঙ্গে?

দশ বচ্ছর তপস্যা করলেও এমন পাত্র পেতে না। আংটি চাটুজ্জের ভাই, চকমিলানো দালান-কোঠা। মেয়েটার কপাল ভাল। নেহাৎ কথা দিয়ে ফেলেছি তাই—

ইতিপূর্ব্বেও অবশ্য আরও অনেক জনকে অনেক ক্ষেত্রে কথা দিয়েছে, ভাঙতে তার তিলার্দ্ধ আটকায় নি। কিন্তু আংটি চাটুজ্জের ভাইয়ের মাথায় জল ঢেলে ঠাণ্ডা করবার আস্পর্দ্ধা যার, তাকে বিয়ে ক'রে সকাল-বিকাল দুইবেলা কানের কাছে অবিরত বেহালা শোনাতে হবে, এই তার সঙ্কল্প।

নীলকান্ত যথাসম্ভব পাত্রের খোঁজখবর নিল। বিয়ে হয়ে গেল। বসন্ত নটবরের ঘরে এসে বলে, কাজটা গর্হিত হ'ল, কি ব'ল দাদা? কেবলই জড়িয়ে পড়ছি। এরা আবার নিচু ঘর।

নটবর বলে, আজকাল ও সমস্ত দেখে না।

তা ঠিক। তা ছাড়া প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। আছি ত গঙ্গার উপর। দোষ-টোষ শুধরে গেছে। কিন্তু আমার ভাই টের পেলে খুন ক'রে ফেলবে। জাত আর ধনসম্পত্তি আগলে বাড়ি বসে থাকে। তবে টের পাবে না, বেরোয় না ত!

দু দুটো মাস যেন উড়ে চলে গেল। বিয়ের খবর শেষ পর্য্যন্ত গোপন থাকে নি, চারিদিকে খুব রাষ্ট্র হয়ে গেছে। শোনা গেল, আংটি চাটুজ্জেরও কানে গিয়েছে; নিজে এক দিন এসে ভাইয়ের কান ধরে টানতে টানতে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করবে, এই রকম সে শাসিয়ে বেড়াচ্ছে।

আবার এক রাত্রে অভ্যাস অনুযায়ী বসন্ত পিঠটান দিল। আংটির ভয়ে নয়, নূতন নেশা ইতিমধ্যে ফিকে হয়ে এসেছে। আরও কিছু দিন এদিক-সেদিক ঘুরে হাতের শেষ পয়সাটি অবধি খরচ ক'রে অবশেষে সে বাড়ি গিয়ে উঠল। আংটির সামনে যায় না। বাগদি-পাড়ায় ভাব-গানের দল করেছে, তাতে বসন্তর বড় উৎসাহ। নিরক্ষরেরা গানের পদ ভুলে যায়, বসন্ত খাতা খুলে পদগুলো ধরিয়ে দেয়। নিজে যে কয়টা গৎ শিখে এসেছে, তাও খুব কাজে লেগে গেল। দিনরাত সে এই সব নিয়ে মেতে আছে। দুপুরবেলা আংটি ঘুমিয়ে পড়লে টিপিটিপি বাড়ি ঢুকে সোজা রান্নাঘরে এসে বসে। স্নান ইত্যাদি মাঠের পুকুর থেকে সেরে আসে। আংটির স্ত্রী পটেশ্বরী রান্নাঘরে তৈরি হয়ে থাকে, স্বামীর অজ্ঞাতে দেওরকে খাইয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় করতে পারলে সে বেঁচে যায়। রাতে বসন্তর ফুরসৎ নেই—আজ এখানে, কাল সেখানে—বায়না লেগেই আছে। নেহাৎ বায়না যেদিন না থাকে, সেদিনও মহলা দিতে রাত কাবার হয়ে যায়। রাতে তাই বাগদিদের ওখানে ফলাহারের বন্দোবস্ত—চিঁড়ে, গুড়, নারকেল-কোরা। তোফা দিন কেটে যাচ্ছে।

কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ, এক দিন একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে আংটি বলল, এই যেখানে দাঁড়িয়ে আছ এটা জগন্নাথ চাটুজ্জের বাড়ি। তাঁর অতুল ঐশ্বর্য্য রাখা যায় নি, কিন্তু নামটা আছে। সে নাম তুমি ডুবিয়ে দিচ্ছ।

বসন্ত মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়েছিল। কথা শেষ হ'লে দাদার পায়ের গোড়ায় ঠক্ ক'রে প্রণাম করল।

আংটি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি করবে?

চলে যাব।

কোথায়?

চাকরি-বাকরি করব, আয়ের চেষ্টা করব, এ রকম ধারা ঘুরে বেড়াব না।

আংটি জ্বলে উঠল। অসুবিধেয় পড়ে আমি কিছু দিন কালেক্টরির গোলামি করেছি। তা ব'লে গুষ্টিসুদ্ধ উঞ্ছবৃত্তি করবে? ভাই আমার একটা, তার ভাত আমি স্বচ্ছন্দে জোটাতে পারব।

বসন্ত জবাব দেয় না, তেমনই দাঁড়িয়ে আছে।

এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থেকে আংটি পুনরায় প্রশ্ন করে, কি ঠিক করলে? যাবেই?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

শোন। বলে আংটি বসন্তর হাত ধরল। নিয়ে চলল অন্দরের শেষ দিককার গোল কুঠুরিতে, যেটায় সে আমলে জগন্নাথ চাটুজ্জে মশায় থাকতেন বলে সকলে জানে। ঘরের মাঝখানে গিয়ে বলল, দাঁড়াও। বাইরে এসে আংটি ঝনাৎ ক'রে শিকল এঁটে দিল।

বসন্ত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, ঘরে আটকাচ্ছেন কেন? পোষাচ্ছে না বলেই ত চলে যাচ্ছি।

আংটি প্রবল হাসি হেসে উঠল। বলে, তা বইকি! বেহালা কাঁধে দেশ-বিদেশে জগন্নাথের মুখ পুড়িয়ে বেড়াবে। তাই আমি হ'তে দিলাম আর কি!

বসন্ত দরজায় প্রচণ্ড লাথি মেরে বলে, আমি থাকব না; যাব, যাব—

আংটি পটেশ্বরীর দিকে চেয়ে বলে, বৌমাকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। চাবি থাকবে বৌমার কাছে, তোমাকেও বিশ্বাস করি নে।

হরিমতী এসে পৌঁছল। আংটি উচ্চকণ্ঠে বলে, উড়ো-পাখী পোষ মানাতে হবে, মা-লক্ষ্মী। এই নাও খাঁচার চাবি, সামাল করে আঁচলে বেঁধে রাখ। তুমিই পারবে মা। সাত পাকের বাঁধনে পড়েছে যখন, আস্তে আস্তে সমস্ত সয়ে যাবে।

বন্দী বসন্তর উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল, বউ ত আদর করে ঘরে তুলছেন। কোন্ জাত, কি বৃত্তান্ত, খোঁজ-খবর নিয়েছেন?

আংটি বলে, আমার মা-লক্ষ্মী কি আমার চেয়ে আলাদা কিছু হবেন? হুঁ···ভয় পেয়ে গেছে, কথা শুনে বুঝতে পারছি, আমার মন ভাঙিয়ে দিতে চায়।···মোটে এলাকাড়ি দেবে না, বুঝলে ত মা?

হরিমতীর অপরূপ বেশ। এ চেহারার সঙ্গে বসন্ত একেবারে অপরিচিত। সমস্ত সন্ধ্যা পটেশ্বরী বসে বসে তাকে সাজিয়েছে, বসন্তর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে সকল খবর দয়ে তাকে পাখী-পড়ানোর মত ক'রে পড়িয়েছে। দুরন্ত দেওরকে বাঁধবার এই একমাত্র ফাঁদ, এ ফাঁদের কোন অংশে ত্রুটি থাকলে চলবে না।

বসন্ত অবাক্ হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। দৃষ্টির সাম্‌নে হরিমতী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। নিটোল কপালে দুই বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। বসন্ত বলে, বাঃ বাঃ—বেড়ে দেখাচ্ছে। এই বন্তায় এমন বালাম চাল, টের পাই নি ত!

একটু আনাড়ি ধরণে হেসে হরিমতী বলে, এই ইয়ে··· বেহালা বাজাও না একটু—

তুমি শুনবে বেহালা?

হরিমতী বলে, হ্যাঁ, শুনব বইকি! তুমি গুণী লোক হয়েছ, গাঁয়ে গাঁয়ে তোমায় ধ'রে বায়না গাওয়ায়। আমি শুনব না?

ঠাণ্ডা জল এনেছ ত বাটি ভরে? দেখি, দেখি, হাত বের কর দিকি। ও কি···চাঁপাফুল?

হরিমতী বলে, সত্যি—খুব নামডাক হয়েছে। সকলে বলে, মিষ্টি হাত। তখন একেবারে নতুন ছিলে কিনা!

বেহালার প্রশংসায় বসন্ত গলে গেল। বলে, আজকের বক্‌শিশ তা হ'লে কনকচাঁপা? তার পর চিন্তাকুল হয়ে বলে, কিন্তু এখানে ত শোনানো যাবে না। বউকে বাজনা শোনাচ্ছি, দাদা-বউঠাকরুণ কি ভাববেন! না, সে হয় না।

আস্তে, আস্তে—

ভাব এলে জোর বেড়ে যাবে যে! তখন কি কাণ্ডজ্ঞান থাকে? বড্ড যাচ্ছে-তাই জিনিস। হঠাৎ এক মতলব মাথায় আসে। বলে, তুমি ত নৌকোয় এসেছ। নৌকো চলে গেছে নাকি?

উঁহু, ঘাটে রয়েছে। ভাঁটা না হলে গাঙে পড়বে কি ক'রে?

তবে এক কাজ কর···চল টিপিটিপি ঘাটে যাই। নৌকোয় বসে বাজনা শোনাব। খুব মজাদার হবে।

হাসতে হাসতে দু'টিতে হাত ধরাধরি ক'রে খালের ঘাটে গেল। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। জলধারা রূপার রেখার মতো মাঠের ভিতর দিয়ে দূরে—কত দূরে চলে গেছে। চেয়ে চেয়ে বসন্তর মন কি রকম ক'রে উঠল। হরিমতী লীলা-ভঙ্গিতে তার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। বসন্ত বলে, ইঃ কাদার মধ্যে নিয়ে রেখেছে। দাঁড়াও এখানে—নৌকো ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

নৌকায় উঠে বসন্ত বৈঠা ধরল। হরিমতী দাঁড়িয়ে আছে।

কই, এসো—

আসছি, আসছি—

ওপারে চল্লে যে!

উঁহু, টানের মুখটা কাটান দিয়ে ঘুরে আসছি।

হরিমতী কাতর কণ্ঠে বলে, বড্ড ভয় করছে। নৌকোয় কাজ নেই, ঘাটে বসে বেহালা শুনব। তুমি এস।

বসন্ত বলে, ছড়ের গুণ ছিঁড়ে গেছে যে! বড্ড ঠকিয়েছে হরিশ বেহালাদার। তার কাছ থেকে নতুন ছড় এনে তোমায় শুনিয়ে যাব। তুমি দাঁড়িয়ে থাক, ফিরে এসে দেখতে পাই যেন।

হা-হা-হা—মাঠের বাতাসে তার ব্যঙ্গহাসি দূর দুরান্তরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

ও দাদা, দাদা গো—

নটবর দুয়োর খুলে বেরিয়ে এসে দেখে বসন্ত।

কি রকম ঝঞ্ঝাটে যে ফেলেছিল দাদা! কবিরাজের মেয়ে হেসে হেসে কাছে আসে, আংটি চাটুজ্জে আবার ওদিকে দরজায় শিকল দিয়ে রাখল! খুব বেঁচে এসেছি এ যাত্রা। খাল পার হয়ে এক রকম ছুটতে ছুটতে এসেছি। পারানির চারটি পয়সা দাও দিকি এক্ষুনি। দিতেই হবে। নোট ভাঙাতে গিয়েই ত সেদিন থেকে এই সব গোলমাল!

পয়সা নিয়ে সেই মুহূর্ত্তে বসন্ত সরে পড়ল।

বিকালে এসে পড়ল দশ আঙুলে দশ আংটি-পরা স্বয়ং আংটি চাটুজ্জে। কালেক্টরির চাকরি ছাড়বার পর জগন্নাথের অট্টালিকা ছেড়ে এই সে প্রথম বেরিয়েছে। নীলকান্তকে সঙ্গে নিয়ে নটবরের কাছে এল।

বউমার কাছে শুনলাম, বসন্তর বড্ড ভাব তোমার সঙ্গে। সে এসেছিল?

নটবর বলে, এসেই চলে গিয়েছে।

কোথায়? কোন দিকে?

উই যে চাকদার রাস্তা—

গঙ্গার ওপারের দিকে দেখিয়ে দিল। সীমাহীন ধান-ক্ষেত, মাঝখান দিয়ে চাকদার রাস্তা চলে গিয়েছে। দুপাশে সারবন্দি পত্রবহুল শিরিষগাছ। চেয়ে চেয়ে আংটি গর্জ্জন ক'রে উঠল।

তোমার মেয়ের হয়ে নালিশ করতে হবে কবিরাজ, খোরপোষের দাবি দিয়ে। আর তুমি নটবর হবে সাক্ষী। ডিগ্রি করে দেওয়ানি জেলে আটকে রাখব। দেখি সেখান থেকে কোন্ ছুতোয় পালায়। জগন্নাথ চাটুজ্জের নাম নিয়ে দিব্যি করছি, এ আমি করবোই—

তা ক'রো। তত দিন ত বসন্ত ঘুরে বেড়াক। নিয়ম-মাফিক খাওয়া-দাওয়া আর বেহালা বাজানো—অসহ্য হয়েছিল তার। পরিচিত পথ-ঘাট, গাছপালা, ঘর-বাড়ি দেখে দেখে চোখ যেন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছিল। আর, এ কি জীবন! সকালবেলা জানা নেই, রাতে কোথায় পড়ে থাকতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে বালু উত্তীর্ণ হয়ে আসবে জাঙাল, জাঙাল ছাড়িয়ে অড়হর ক্ষেত,…কাদের কাছারি বাড়ি…একটা পচা দীঘি, কত পদ্ম ফুটে আছে… আমবন, তারই ছায়ায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখবে, দিগন্ত-বিস্তৃত বিল তোমার চোখের সামনে। সন্ধ্যায় দাওয়ায় বসে গোপীযন্ত্র বাজিয়ে কে গান গাচ্ছে, একটি মেয়ে গরুর নাম ধরে ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছে, বাঁশঝাড়ে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ। যে বাড়িতে খুশি, উঠানে গিয়ে দাঁড়াও, নূতন মানুষের সঙ্গে পরিচয় কর, ভালবাসাবাসি হোক,… এক রাত্রি বেশ কাটল, আবার ভোরবেলা বোঁচকা বগলে বেহালা কাঁধে বেরিয়ে পড়ো…

কৈলেসকাঠি কোন্ দিকে ভাই? হ্যাঁ গো হ্যাঁ—বারান্দি-কৈলেসকাঠি?

লঙ্কা-ক্ষেতে মাটি তুলতে তুলতে চাষীরা প্রশ্ন করে, মশায়ের সাকিন?

জীবনপুরের পথিক রে ভাই
কোন দেশে সাকিন নাই…



রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রকৃতি

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

রবীন্দ্র-সাহিত্যের অতি বিস্তীর্ণ পরিধির কথা স্মরণ করিয়া "কাব্যে রবীন্দ্রনাথ"* প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম, কবিকে সমগ্রভাবে একটি আলোচনার মধ্যে দেখিতে গেলে বালুকণার মধ্যে সারা সৃষ্টিকে, শিশিরবিন্দুর মধ্যে সূর্য্যকে দেখিতে হয়। তবুও ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে বৃহৎকে দেখিবার যে সার্থকতা নাই তাহা নয়। কবিপ্রতিভার উৎস-সন্ধানে বাহির হইয়া যে-সকল কাব্যগত সত্যের সাক্ষাৎ মেলে সে-প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া সেগুলি বিস্তারের অপেক্ষা রাখে। সেখানে দেখিয়াছি,—শুধু প্রকাশের মধ্যেই ভাবের সার্থকতা; যাহা স্থির মনে গতি ও বেগের সঞ্চার করিয়া আমাদিগকে প্রকাশে প্রবৃত্ত করে তাহা শক্তি; যে সুদুর্লভা শক্তি আমাদিগকে প্রেরিত করে, উদ্বুদ্ধ করে, চঞ্চল করে, সঞ্চালিত করে, কামনায় তাহার উৎপত্তি; সৃষ্টির মূলে কামনা; কবি নিস্পৃহ নয়, নিষ্কাম নয়, নিরাসক্ত নয়; সংসার সৌন্দর্য্যময়; রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের পূজারী, কামনার কবি; জীবনে মানুষ কিছু পাইতে চায়, তাই অশেষ তাহার অন্বেষণ; অন্বেষণ মানবের প্রকৃতিগত; রবীন্দ্রনাথ এষণার কবি। এই কথা কয়টি মনে রাখিয়া আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয়ে অগ্রসর হইব।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের তিনটি শ্রেষ্ঠ কবিতার উল্লেখ করিয়াছিলাম। সে তিনটি কবিতায় আমরা তাঁহাকে বিশেষভাবে চিনিতে পারি, তাঁহার কাব্য-প্রতিভার প্রকৃতি, গতি ও অভিমুখিতার বিশিষ্ট পরিচয় পাই। সে বিচারের পূর্ব্বে, কাব্যের—বিশেষতঃ রবীন্দ্র-কাব্যের—প্রকৃতি কি বুঝিবার জন্য এই কামনা, এষণা এবং এতৎসম্পর্কিত কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথার আলোচনা করিব।

১

পৃথিবীর পনর-আনা তিন-পাই লোক প্রাকৃত-মনোভাবসম্পন্ন। তাহারা আহার-বিহার লোকলৌকিকতায় সন্তুষ্ট; সংসার করে, পরিবার-পরিজন প্রতিপালন করে, সুখে দুঃখে দিন কাটায়, স্বাচ্ছন্দ্যে কৃতার্থ হয়, অর্থচিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তার বড় একটা ধার ধারে না, সামান্যে পরিতৃপ্তি লাভ করে। বাকি দু-একজন থাকে, তাহারা যাহা চায় তাহা সহজায়ত্ত নয়, অল্পে তাহাদের সুখ নাই। এই-সব স্বতন্ত্রপ্রকৃতির লোক বাঁধা পথে পা দেয় না। নিজেদের খেয়ালখুশীতে চলে। অশান্ত মন তাহাদের স্থির থাকিতে দেয় না। এমনি-সব মানুষের কথা বলিতে গিয়া শেক্সপীয়র তিন-প্রকৃতির লোককে এক দলে ফেলিয়াছেন।

"The lunatic, the lover and the poet are of imagination all compact: (they) . . . give to airy nothing a local habitation and a name."

যাহা বায়বীয়, নিরাকার, নিরালম্ব, যাহা চক্ষুর অগোচর, অবাস্তব, কিছুই-না, কবি পাগল আর প্রেমিক এমন জিনিষকে নামে অভিহিত করে, স্থানে সন্নিবেশিত করে।—কবি পাগল আর প্রেমিকের প্রকৃতি যে এক তাহা নয়, অন্য হিসাবে ধরিতে গেলে একেবারে স্বতন্ত্র, শুধু একটা বিষয়ে অভিন্ন, তাহারা একান্তভাবে কল্পনাকুতূহলী। অনামা এবং অপ্রত্যক্ষকে নাম-রূপ প্রদান করে যাহা, সেই কল্পনায় তাহাদের চিত্ত পরিপূর্ণ।

মন অন্বেষণশীল। সাধারণ মানুষ সামান্যের অন্বেষণে তৎপর। যাহারা মহৎ, শক্তিমান, প্রতিভাশালী তাহারা অসামান্যের অন্বেষণ করে। সংসারের পনর-আনা তিন-পাই লোক সামান্যের প্রয়াসী। অসামান্যের—অসাধারণের অনুসন্ধিৎসুকে সাধারণ লোকে খেয়ালী মনে করে, নিজেদের সঙ্গে অমিল আছে বলিয়া তাহারা তাঁহাকে পাগল বলে, খ্যাপা বলে, বাতুল বলে, তাহার প্রচেষ্টাকে উন্মত্ততা বলে।

"খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর।"

পরশ-পাথর অসামান্যের প্রতীক। সংসারসিন্ধুতীরে খ্যাপা সেই অসামান্যকে খুঁজিয়া বেড়ায় যাহার স্পর্শে মূল্যহীন তুচ্ছ বস্তুও অমলিন সুবর্ণে রূপান্তরিত হয়। তাহার অন্য কিছুতে আকাঙ্ক্ষা নাই, ঐশ্বর্য্যে লোভ নাই, বেশবাসে লক্ষ্য নাই, দেহের প্রতি দৃষ্টি নাই, "মাথায় বৃহৎ জটা ধূলায় কাদায় কটা।"

* প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪১।

তার এত অভিমান সোনা-রূপা তুচ্ছজ্ঞান
রাজসম্পদের লাগি নহে সে কাতর।

সংসারের খ্যাপারা কখনও কখনও পরশ-পাথর যে কুড়াইয়া না পায় এমন নয়, অভ্যাসের বশে ঠন্ করিয়া শিকলে ঠেকাইয়া নুড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

বাকি অর্দ্ধ ভগ্নপ্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর।

কবিরা এই খ্যাপার মত। বাউল মানে বাতুল। বাউলেরা কবি। কল্পনায় মশগুল কবি পাগল আর প্রেমিক সামান্যের মধ্যে অসামান্যের অনুসন্ধান করে।

রবীন্দ্রনাথ এই পরশ-পাথর খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। তাঁহার দৈবী-কল্পনাস্পর্শে সমস্ত ভাব সোনা হইয়া গেছে। কালের স্রোতে অনাগতের পানে বহিয়া-যাওয়া কনক-তরণীতে জীবন দেবতা তাঁহার সোনার ধানগুলি তুলিয়া লইয়াছেন। সেই সোনার তরীতে তাঁহারও ঠাঁই হইয়াছে।

২

মন নিরন্তর ক্রিয়াশীল। বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে, মানসিক ব্যাপারের সংঘাতে অথবা অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার প্রেরণায় মানুষের মনে সর্ব্বদা ভাবনার আনাগোনা চলে। সাধারণতঃ ভাব ও ভাবনাগুলি অস্পষ্ট, ছায়ার মত অশরীরী। হৃদয়-সাগরে বুদ্‌বুদের মত ফুটিয়া উঠে এবং লয় পায়। একাগ্রতার দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা ধারণা করিয়া কবি নিজের মনে তাহাদের স্পষ্ট করিয়া রূপায়িত করিয়া তোলেন।

"একটা কথা যেমনি গড়িয়া উঠে অমনি তাহাকে আশ্রয় করিয়া যেমন-তেমন করিয়া কত-কী কথা যে পরে পরে আকার ধারণ করিয়া চলে তাহার আর ঠিকানা নাই।" (সাহিত্য-সৃষ্টি)

চিত্তের যে-বৃত্তি আকারহীনকে সাকার, অস্পষ্টকে পরিস্ফুট করিয়া মানসরূপ প্রদান করে তাহাই কল্পনা। সাধকের ধ্যান-ধারণায় ও কবির কল্পনায় বিশেষ প্রভেদ নাই।

প্রতীক ও প্রতিমা রচনার শক্তি কল্পনা। Imagination-এর কাজ image-রচনা। অর্থাৎ অব্যক্ত, অমূর্ত্ত ভাবনা ও ভাবকে ব্যক্ত করিতে হইলে তাহাকে সাকার করিয়া লইতে হয়। "নবীন প্রতিমা নবকৌশলে গড়িলে মনের মতো।" ভাবের মানসমূর্ত্তি দেওয়ার কাজ কল্পনার। অথবা শেক্সপীয়রের কথায়, যাহা 'কিছু নয়', যাহা বায়বীয় কবি-প্রকৃতির কল্পনা তাহার নাম-রূপ প্রদান করে। কবি বলেন,

আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে? (অন্তর্যামী)

রবীন্দ্রনাথের কল্পনা বিশ্বপ্রসারী। সূক্ষ্ম ও সুকুমার, সরল ও জটিল অসংখ্য অদৃশ্যপ্রায় ছায়াময় ভাব তাঁহার কল্পনাবলে আকার পাইয়া মূর্ত্ত হইয়া অমর হইয়াছে।

পৃথিবীর সহিত অন্তর্জগতের রহস্যময় নিগূঢ় ভাবগুলির পরিচয়সাধন করাইতে করাইতে অসহিষ্ণু হইয়া একদা কবি বলিয়াছেন,

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়,
বিজন-বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে।

সকল কলা, সকল কাব্যের মূল কথা আকার দেওয়া। কল্পনা যেমন অসীমের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়, তেমনই আবার অসীমকে সীমার মধ্যে টানিয়া আনে। ধারণা করিতে গেলেই মানুষের মনে অসীম সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর,
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।

অসীমের সীমা দেওয়াই প্রতিমা-রচনা। আর সেই অঘটন-ঘটনপটীয়সী মনোবৃত্তির নাম কল্পনা।

৩

মন অক্লান্তকর্ম্মী। ঘুমে অথবা জাগরণে সে এক মুহূর্ত্ত নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া নাই। মনের কাজ রচনা। চেতনে চিন্তাজাল এবং সুপ্তিতে স্বপ্নজাল সে অশ্রান্তভাবে বুনিয়া চলে। দৈহিক বাধা এবং সামাজিক বিধান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া স্বপ্ন অদ্ভুত এবং অপরূপ হইয়া উঠে। বিস্মৃত স্মৃতি, অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া স্বপ্ন নিত্য নূতনের সৃষ্টি করে। কবিতা স্বপ্নের মতই স্মৃতি, বিস্মৃতি, অভিজ্ঞতা, কামনা ও অনুভূতি দিয়া গড়া। কবিতাগুলি আমাদের স্বপ্ন।

স্বপ্নের হাসি স্বপ্নের কান্দন নয়ানচান্দে গায়,
নিজের অন্তরের দুক্ পরকে বুঝানো দায়।

নিদ্রায় আমরা যে স্বপ্ন দেখি তাহা অনিয়ন্ত্রিত। মনের প্রহরী তখন সজাগ নাই বলিয়া আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ, আমাদের ভয় ও বিস্ময়—সতর্ক চক্ষুর বাহিরে পলাতক বালকদলের মত বিশৃঙ্খলভাবে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। কবিতার স্বপ্ন জীবনগত, জীবনের মূলদেশ হইতে উত্থিত। কবি-মানস প্রাকৃতজনের মন হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রভাবে গঠিত। সৌন্দর্য্য ও সুষমা বোধ, কলাগত

সৃষ্টিকুশলতা—সংস্কারের মত তাঁহার মনে সহজাত। কবিতার স্বপ্নগুলি কবিমনের সহজায়ত্ত সৃষ্টিনৈপুণ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আমাদের জীবন শুধু বস্তুগত নয়, তাহা মনোগত, ভাবগত, কামনাগত, স্বপ্নগত। 'এ জীবন নিশার স্বপন।' নিশার স্বপন না হইতে পারে জীবনের খানিকটা বাস্তব, খানিকটা জাগর-স্বপ্ন। কামনা হইতে স্বপ্নের উৎপত্তি। স্বপ্ন কখনও আদর্শ, কখনও উচ্চাভিলাষ, কখনও বা কাব্যে রূপ ধারণ করে। বাহ্য জগতে জীবনের প্রকাশ আংশিক, স্বপ্নজগতে সে প্রকাশ পূর্ণতা লাভ করে।

তাই জ্ঞানী যখন বিচার করিয়া বলেন, জীবন স্বপ্ন, সংসার মায়া, 'দারা পুত্র পরিবার তুমি কার, কে তোমার,' কবি সে কথায় সায় দিতে পারেন না, কেন-না স্বপ্নকে অস্বীকার করিলে জীবনকে অস্বীকার করা হয়, প্রাণের প্রেরণা, মনের প্রকৃতি, হৃদয়ের লক্ষ্যকে অস্বীকার করা হয়। রাত্রি ও দিন, স্বপ্ন ও জাগরণ লইয়া জীবন গঠিত।

দিন মোর দিনু তোরে, শেষে নিতে চাস হ'রে
আমার যামিনী

যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী হইতে চান তাঁহারা বলেন, জীবন দুঃখময়, কামনা হইতে মায়ার উদ্ভব, মায়াই দুঃখের কারণ, অতএব মুক্তি যদি চাও নিবৃত্তির সাধনা কর; মায়ায় মুগ্ধ হইও না, কামনা পরিহার কর; সংসারে বদ্ধ হইও না, বিরক্ত হও; যদিই-বা সংসারে থাকিতে হয় পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত হও; লগ্ন হইও না, লিপ্ত হইও না, আসক্তি পরিত্যাগ কর। কবি বলেন, জীবনে নিরাসক্ত হইলে রহিল কি? অনুরাগ কি এত ছোট জিনিষ, অনুরাগ ঈশ্বরমুখী হইলে কি মানুষকে ভালবাসা যায় না, প্রকৃতিকে ভালবাসা যায় না? সৃষ্টি ত তাঁহারই লীলা, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে তাঁহারই অভিব্যক্তি। প্রেম সীমাহীন, সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ দেখিয়া আনন্দ করিবার কথা, ভয়ে পলায়ন করিবার কথা নয়। হৃদয়বৃত্তিকে উপবাসী রাখিয়া, ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিয়া, জীবনকে শুষ্ক করিয়া মুক্তি যাঁহারা লাভ করিতে চান তাঁহারা করুন; ভগবানের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিলে মুক্তি সুদূর হইবে এ কথা মানি না। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।" নিষ্ঠা ও একাগ্রতা অনুরাগের লক্ষণ সন্দেহ নাই, সৃষ্টির প্রতি অনুরাগ স্রষ্টা হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া নয়, তাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়া। কবির মনোভাব এই,—যাহারা তোমাকে রিক্ত, নিঃস্ব, নির্গুণরূপে, দরিদ্র সন্ন্যাসীরূপে দেখিতে চায় তাহারা সেইরূপে দেখুক, আমি তোমাকে ঐশ্বর্য্যবান্ রূপে, ভগবান রূপে, সৌন্দর্য্যময় রূপে দেখিতে চাই। আমি জানি, সর্ব্বরিক্ত বৈরাগীর বেশ তোমার নয়, তুমি "লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছ বাহিরে।"

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্ম-রণবেশে।
তোমার বিভূতিতে আমিও যে বৈভবশালী।
আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্রদর্পে খল খল ওঠে অট্টহাসি'
দেখে মোর সাজ।

৪

এক মহাকাব্য ছাড়া সকল রকম কাব্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজের শক্তি প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সকল ক্ষেত্রেই তিনি সাফল্যলাভ করিয়াছেন। তবুও তিনি প্রধানতঃ গীতিকবি।

গীতিকাব্যের প্রধান লক্ষণ আত্মপ্রকাশ। নাট্যকাব্যে বা কথাকাব্যে কবি অনেকটা নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে পারেন, অসতর্ক মুহূর্ত্তে তাঁহার জীবনের আভাস আমরা পাই। অন্য রচনায় কবি নিজের অন্তর্জীবন খানিকটা গুপ্ত খানিকটা বা উন্মুক্ত করিয়া রাখিতে পারেন, কিন্তু গীতিকাব্যে আপনাকে ব্যক্ত করা ছাড়া তাঁহার গতি নাই। আপনাকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করার মধ্যেই গীতি-কবির সার্থকতা, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ। "আনন্দ কেন হয়?" রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,

"হয়, তাহার কারণ এই, আপনাকে আপনি দেখিবার অনেক চেষ্টা সমস্ত মানব-মনের মধ্যে কেবলই কাজ করিতেছে— এই জন্য যেখানেই সে কোন-একটা ঐক্যের মধ্যে নিজের কোন-একটা বিকাশকে দেখিতে পায় সেখানে তাহার এই নিয়তচেষ্টা সার্থক হইয়া তাহাকে আনন্দ দিতে থাকে।" (সাহিত্যসৃষ্টি)

এই প্রকাশ কবির ব্যবহারিক জীবনের প্রকাশ নয়, ইহা তাঁহার অন্তরাত্মার প্রকাশ। প্রকাশ আন্তরিক বলিয়া জীবন-সম্পর্কে কবির ধারণা তাঁহাকে যে একটি মূলতত্ত্বে উপনীত করিয়াছে সেই মূলতত্ত্বটি গীতিকাব্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবেই। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। গীতিকাব্যে যে তত্ত্বটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা কি? জীবন-সম্পর্কে তাঁহার ধারণা কি?

বলিয়াছি জীবনের খানিকটা বাস্তব, খানিকটা স্বপ্ন। কবিতাগুলি কবির জাগর-স্বপ্ন। নিশার স্বপ্ন অসংলগ্ন, অসম্বদ্ধ। কাব্যে রূপায়িত কবিতার স্বপ্ন কবির সহজাত শক্তি—কল্পনা ও কলানৈপুণ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বপ্নের

উৎস কামনা। চাওয়া হইতেই অন্বেষণ। এই কামনা ও এষণা স্বপ্নে যেমন কাব্যেও তেমনি রূপ ধরে। রবীন্দ্রনাথ বাসনা ও এষণার কবি। রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষার রূপ হইতে জীবন-সম্পর্কে তাঁহার ধারণাকে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি। কৈশোরান্তে, যৌবনে ও পরিণত-বয়সে—জীবনের তিন বিভিন্ন যুগে রচিত তিনটি অনবদ্য কবিতায় অনুপম ছন্দ, অসীম হৃদয়াবেগ এবং অতুলনীয় শব্দ-সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া জীবন এবং জীবনের ধারণা সম্পর্কিত সেই মূলতত্ত্বটি অপূর্ব্বভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই ত্রয়ী—"নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ," "উর্ব্বশী" এবং "তপোভঙ্গ"।

৫

মনের ব্যাপারের দিক দিয়া একান্তভাবে আত্মপ্রকাশ বলিয়া ধরিলে তিনটি কবিতার মধ্যে একটি সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারি। তাহা এই।—

কবির মন ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশের জন্য ব্যাকুল। কেবলই অন্তরে প্রেরণা আসিতেছে, তাগিদ আসিতেছে। যাঁহার বুদ্ধি নবনবোন্মেষশালিনী তাঁহার বিরাম-বিশ্রামের অবসর কোথায়? অথচ মাঝে মাঝে আবেগ রুদ্ধ হয়, প্রেরণাদায়িনী শক্তি কোথায় লুকাইয়া পড়ে, নব-সৃষ্টির কামনা আপনার মধ্যে গুমরিয়া মরে। আবার অন্তর্হিত শক্তির হঠাৎ আবির্ভাব হয়। কল্পনায়-বিভাসিত বিচিত্র কাব্যসৃষ্টি সম্ভব করিয়া, কবির রুদ্ধ হৃদয় মুক্ত করিয়া শক্তি সার্থক হয়। ইহা বার বার ঘটে। কবির সম্পর্কে ইহা নিতান্তই তাঁহার নিজের মানসিক ব্যাপার। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে" ইহা একটি সরল রূপকে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই হিসাবে স্পষ্ট-রূপকে "উর্ব্বশী"তে আত্মকথা ব্যক্ত হয় নাই বটে, সেখানেও কিন্তু প্রথমে কল্পনাসৃষ্টিরূপে উর্ব্বশীকে 'হৃদয়ে'র মন্থিত সাগরে উঠিতে দেখিতে পাই। কবিতার শেষাংশে ব্যাপারটি পরিষ্কার ও পরিস্ফুট হইয়াছে।

> আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর,
> অতল অকূল হ'তে সিক্ত কেশে উঠিবে আবার?

হয়ত সে আর আসিবে না।

> ফিরিবে না ফিরিবে না—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী
> অস্তাচলবাসিনী উর্ব্বশী।

ইহা কি "চিরবিরহ"? সে মহিমা কি চিরতরে চলিয়া গিয়াছে?

> তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
> অয়ি অবন্ধনে।

কবির আপনার নিকট অগোচর হৃদয়ের নিভৃত কথার দিক দিয়া ইহার অর্থ এই—যে প্রেরণায় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল, কি-জানি সেই প্রেরণা হয়ত চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে। "তপোভঙ্গে" কবি স্পষ্ট করিয়া মহাকালকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। "যৌবন-বেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি" আজ কোথায়?

> আশ্বিনের বৃষ্টিহারা শীর্ণ-শুভ্র মেঘের ভেলায়
> গেল কি বিস্মৃতিঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
> নির্ম্মম হেলায়?

ইহা নিতান্তই মনোগত ব্যাপার—মূলের কথা। যাহা বলিবার জন্য পূর্ব্বে নানা কথার অবতারণা করিয়াছি তাহা এই।—কবির একটি জীবন-দর্শন আছে। তাঁহার অনেক রচনায়, অনেক আলোচনায় কবি এই দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য এই জীবন-দর্শনে প্রতিষ্ঠিত। সে দর্শনের গোড়াকার কথা এই।—সন্ন্যাসী চান সমস্ত ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া ব্রহ্মে উপনীত হইতে, কবির অভিলাষ—সৃষ্টির সমস্তই গ্রহণ করিয়া উপভোগ করিয়া ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে, তিনি যে রসস্বরূপ। যাহা কিছু অমূর্ত্ত, বস্তুনিরপেক্ষ তাহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া তোলাই কবির কাজ। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ লইয়া কবির কারবার। অতএব ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অস্বীকার করিলে কবির স্বধর্ম্ম-বিচ্যুতি ঘটে। কবি ও বৈরাগ্য-বিলাসী বিপরীতপন্থী।

৬

কবির ব্যক্তিমানসের অভিব্যক্তি গীতিকাব্যের লক্ষণ সন্দেহ নাই, সেই সঙ্গে বিশ্বমানবমনের প্রকাশ দেখিতে পাই বলিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতাগুলি চিরন্তন হইয়া আছে। তাঁহার কাব্যপ্রকৃতিনির্দ্দেশক বলিয়া রবীন্দ্রনাথের বহুতর অপূর্ব্ব কবিতার মধ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত ত্রয়ীকে পৃথক্ করিয়া লইয়াছি। কবির কামনা যে অনির্ব্বচনীয় কাব্যরূপ ধারণ করে কবিতা তিনটি তাহার উদাহরণ।

"নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" নিদ্রিত জীবনের জাগরণী গীতি। অন্ধকারগুহানির্ম্মুক্ত নির্ঝর কবির উদ্বুদ্ধ হৃদয়। জীবনের স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করিয়া সংস্কার, শাসন, বিধি, বিধান, নিয়ম, নিষেধ, রীতি, প্রথা, অভ্যাস ও আচার চারি দিকে পাষাণ-প্রাচীরের সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্বের জীবনধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে মন বদ্ধ হইয়া থাকতে চায় না। "তমসো মা জ্যোতির্গময়।" স্বাধীনতার সূর্য্যালোকে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠে। সে প্রবাহিত হইতে চায়, দেশে দেশে দিকে দিকে ছড়াইয়া

পড়িতে চায়, বিশ্বজীবনের সহিত একীভূত হইয়া সার্থক হইতে চায়। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে"র রূপকটি সরল। মুক্তি-প্রয়াসী নিরুদ্ধ-নির্ঝরের প্রাণের বাসনা যে কবির অজ্ঞাত মনের ইচ্ছা, "বসুন্ধরা" কবিতাটি তাহা স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

যে-ইচ্ছা গোপন মনে
উৎস-সম উঠিতেছে অজ্ঞাতে আমার
বহুকাল ধ'রে—হৃদয়ের চারিধার
ক্রমে পরিপূর্ণ করি বাহিরিতে চাহে
উদ্বেল উদ্দাম মুক্ত উদার প্রবাহে
সিঞ্চিতে তোমায়—ব্যথিত সে বাসনারে
বন্ধমুক্ত করি দিয়া শতলক্ষ ধারে
দেশে দেশে দিকে দিকে পাঠাব কেমনে
অন্তর ভেদিয়া।

নবজাগরিত নির্ঝর জগতে সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিতে চায়।

ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোকসনে
দেশ-দেশান্তরে। (বসুন্ধরা)

মহাসাগরের গান শুনিতে পাইয়া নির্ঝর অধীর হইয়া উঠে, 'ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে ডাকে যেন।'

ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বান-রবে শতবার ক'রে
সমস্ত ভুবন। (বসুন্ধরা)

শুধু আত্মপ্রকাশই কি আত্মচরিতার্থতা? বিশ্বজীবনের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে না পারিলে নিজের সম্পূর্ণ প্রকাশ নাই। নিখিল-মানব সৌন্দর্য্যকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। পুরাণে শুনি সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের আধার করিয়া স্রষ্টা উর্ব্বশীকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অতএব বস্তুনিরপেক্ষ নিখিল-সৌন্দর্য্য উর্ব্বশীরূপে ফুটিয়া উঠুক, উর্ব্বশী নামে অভিহিত হোক। এদিকে পুরুষ নারীকে চায়। কবি পুরুষ। তাই পুরুষের কামনার ধন উর্ব্বশী নারী। তাই 'পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা'।

মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল।

নিখিল-মানবের চিরদিনের সৌন্দর্য্যকামনা কবির কল্পনার মায়াদণ্ডস্পর্শে 'অপূর্ব্বশোভনা' 'অনন্তযৌবনা' উর্ব্বশী হইয়া উঠিয়াছে।

এই যে সৃষ্টি ইহা সম্ভব হইল কেন? ইহাতে কবির শুধু আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি নাই, যাহা কেবল আত্মগত ছিল তাহা বিষয়গত হইয়াছে, সৃষ্টিরূপে বিকশিত হইয়াছে। শুধু ইহাতেও তৃপ্তি নাই। সৌন্দর্য্যস্পৃহা একটি মানসিক সত্য। ইহাকে অসৎ বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। কিন্তু এই সত্য ও সৌন্দর্য্যের সহিত কল্যাণের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা মঙ্গলনিরপেক্ষ নিছক সৌন্দর্য্য। এইখানে রবীন্দ্রনাথের কথায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে আমরা চিনিতে চেষ্টা করিব।—

"আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের প্রথমাবস্থায় সৌন্দর্য্যের একান্ত স্বাতন্ত্র্য আমাদিগকে যেন ঘা মারিয়া জাগাইতে চায়। এই জন্য বৈপরীত্য তাহার প্রথম অস্ত্র।…এইরূপে সৌন্দর্য্যকে প্রথমে চারিদিক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া সৌন্দর্য্যকে চিনিবার চর্চ্চা করি, তাহার পর সৌন্দর্য্যকে চারিদিকের সহিত মিলাইয়া লইয়া চারি দিককেই সুন্দর বলিয়া চিনিতে পারি।" (সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য)

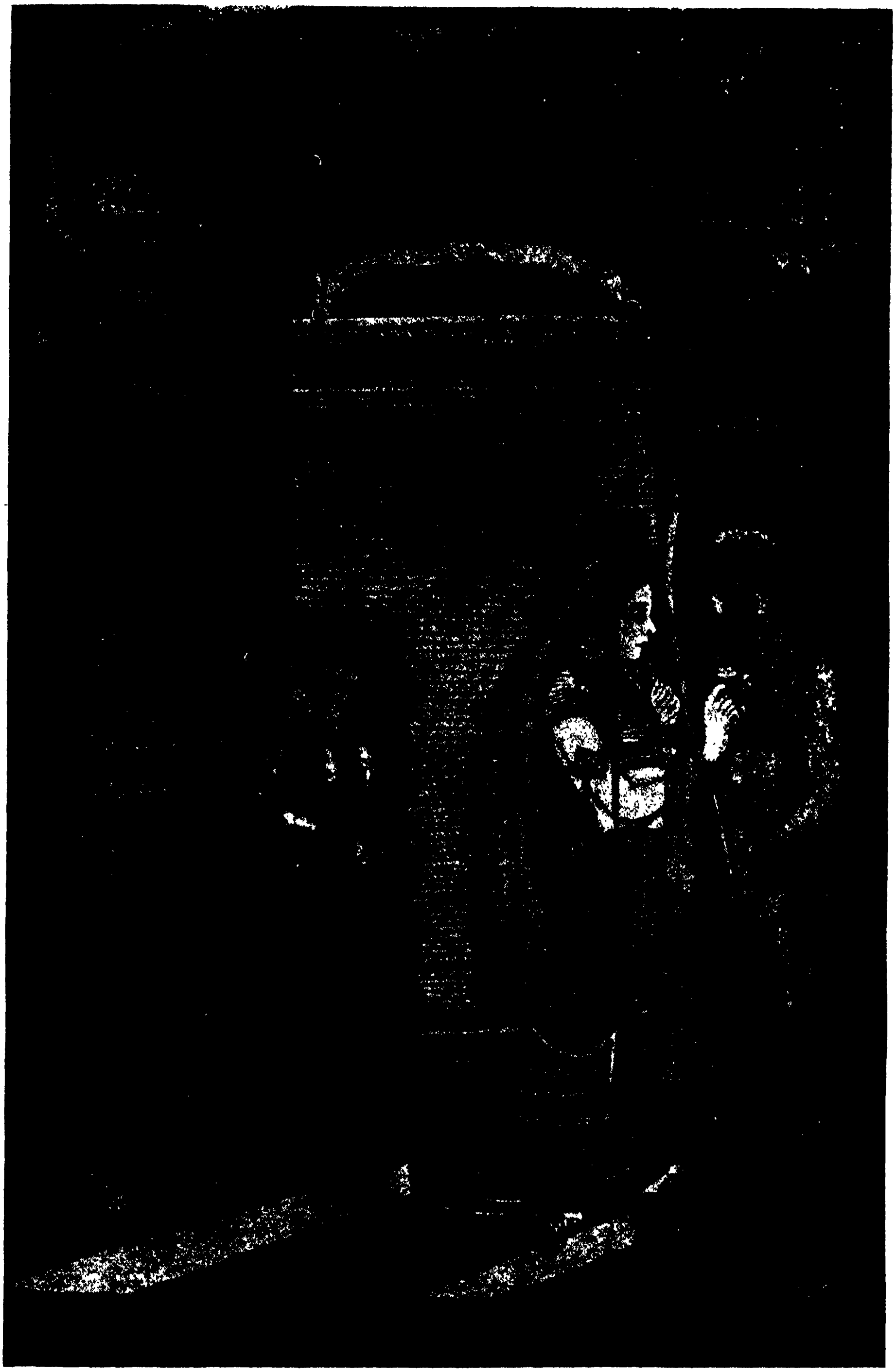
জীবনের সমগ্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সৌন্দর্য্যকে দেখাইবার চেষ্টা আমরা সাহিত্যে মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। একখানি ফরাসী গ্রন্থের আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,

"গ্রন্থের মূলভাবটা হচ্ছে একজন যুবক হৃদয়কে দূরে রেখে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেশদেশান্তরের সৌন্দর্য্য সন্ধান করে ফিরছে।…এই জন্য এই গ্রন্থের মধ্যে হৃদয় অধিকক্ষণ বাস করতে পারে না।"

অর্থাৎ হৃদয়ের যোগ না থাকিলে বাহ্য সৌন্দর্য্য আমাদের তৃপ্তি দিতে পারে না। "চিত্রাঙ্গদা"তেও এই কথাটিই অপরূপ নাট্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কল্যাণের দেবতা যিনি—প্রলয়ের কর্ত্তা এবং কালের অধীশ্বর হইলেও তিনি শিব। তিনিই মঙ্গলময়। যখন তিনি তপোমগ্ন তখন তিনি সৃষ্টিকে আপনার মধ্যে সংহরণ করিয়া লইয়াছেন। সৃষ্টি নাই এমন নয়—আছে মহাকালের মধ্যে বিলীন হইয়া। তাঁহার সেই যোগ ভাঙিবে কে? পঞ্চশর না হইলে তাঁহার কামনা জাগাইবে কে? স্রষ্টার মধ্যে বিলীন হইয়া নয়, পৃথক্ হইয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়া সৃষ্টি যখন স্রষ্টাকে আপনার করিতে চায়, নিকটে চায়, তখনই লীলা। সেই লীলা দেখিতে, শিবের ধ্যান ভাঙিতে, তাঁহার মনে কামনা জাগাইতে, তাঁহাকে সুন্দরের রূপে সাজাইতে চান বলিয়া কবি পঞ্চশরের সহিত নিজেকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন। জগৎকে যখন শিব আপনার মধ্যে সংহরণ করিয়া লইয়াছেন তখন সৃষ্টি অব্যক্ত। অব্যক্তকে ব্যক্ত করাই কবির কাজ, তাহাতেই কবির আনন্দ।

কল্যাণ সৌন্দর্য্যের বিরোধী নয়। মঙ্গলের মধ্যেই সৌন্দর্য্য সার্থক হয়। "উর্ব্বশী"তে কবি নিছক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। অপূর্ব্বশোভনা উর্ব্বশী 'অকুণ্ঠিতা—অনবগুণ্ঠিতা'। "তপোভঙ্গে" কবি সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মঙ্গলের মিলন ঘটাইয়াছেন। উমা সৌন্দর্য্যময়ী। সে সৌন্দর্য্য স্নিগ্ধ, তাঁহার কপোলে 'স্মিতহাস্যবিকশিত লাজ'। শিব



প্রণয়ীর প্রতিমূর্ত্তি

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত

কল্যাণের দেবতা। এই মিলন ঘটাইয়াছেন পুষ্পধনু। "তপোভঙ্গদূত" বলিয়া পরিচয় দিয়া নিখিল-কবির প্রতিনিধিরূপে কামনার দেবতার সহিত রবীন্দ্রনাথ নিজেকে একীভূত করিয়াছেন।

সত্য ও সৌন্দর্য্য অভিন্ন। "Truth is beauty, beauty truth"। কামনার মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্যের এবং কল্যাণের মিলনেই মানব-জীবনের সার্থকতা। তাহাই জীবনের পরম সত্য।

"মঙ্গল মাত্রেরই সমস্ত জগতের সঙ্গে একটা গভীরতম সামঞ্জস্য আছে, সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহার নিগূঢ় মিল আছে।...সৌন্দর্য্যমূর্ত্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্ত্তি এবং মঙ্গলমূর্ত্তিই সৌন্দর্য্যের পূর্ণস্বরূপ।"(সৌন্দর্য্যবোধ)

"তপোভঙ্গ" শুধু 'সুন্দরের জয়ধ্বনি গান' নহে, 'স্বর্গের চক্রান্ত নহে', 'তপোবনে' পুষ্পধনুর আবির্ভাব নহে,—মঙ্গল ও সৌন্দর্য্যের 'মিলনের বিচিত্র সে ছবি'।

সত্যই সৌন্দর্য্য, সৌন্দর্য্যই সত্য, উভয়ে অভেদ। সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের আনন্দময় মিলনে জীবনের পরিপূর্ণতা। কবির জীবন-দর্শন চিরন্তন সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের মিলনভূমিতে প্রতিষ্ঠিত।

লোকশিক্ষার উপায়

শ্রীজীবনময় রায়

ভূমিকার আবশ্যক নাই।

সংবাদপত্র-পরিচালক ও পুস্তকপ্রণেতাগণকে মনে রাখিতে হইবে যে সাহিত্য ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ই (ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং নানা সংবাদ প্রভৃতি এমন ভাষায় লেখা চাই যাহাতে (১) ছাত্রের (সুধু স্কুলের নয়—যে কেহ শিখিতে চাহে) শিখিবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা ভাষার অর্থগ্রহণপ্রয়াসে কিছুমাত্র ব্যাহত না হয়। (২) কেহ (এমন কি পড়িতে মাত্র সক্ষম এমন শিশুও) সুধু সংবাদপত্র বা বইখানি পড়িতে থাকিলেই সাধারণ নিরক্ষর লোকে অনায়াসে তাহার মর্ম ও তত্ত্ব গ্রহণে সমর্থ হয়।

লোক-শিক্ষার বাহন যেন লোক-শিক্ষাকে তথা জনসাধারণকে কৃত্রিম ভাষার বাধায় দূরে ঠেকাইয়া না রাখে। তাহা হইলেই সাধারণ নিরক্ষর লোক এবং তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্র লোকের মধ্যের কৃত্রিম ব্যবধান ঘুচিয়া যাইবে এবং জাতি সহজেই শিক্ষিত, ঘননিবিষ্ট ও বলশালী হইয়া উঠিবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা যদি যথাসম্ভব লোকায়ত্ত হয় তাহা হইলে একটি পড়িতে-সক্ষম শিশুও উহা পড়িয়া দিলে সাধারণ নিরক্ষর লোক তাহা সহজে বুঝিতে পারিবে এবং তাহা হইলে নিরক্ষর দেশেও জ্ঞান-বিস্তারের বিশেষ বাধা হইবে না; এবং স্কুল কলেজ ব্যতিরেকেও শিক্ষা ও জ্ঞান সমাজের সর্ব্বস্তরে অতি অনায়াসে চুয়িয়া-প্রবেশ করিতে পারিবে।

যাঁহারা আমাদের দেশের জনসাধারণের (আমি গ্রামের নিতান্ত দরিদ্র নিরক্ষর ও বঞ্চিত স্তরের লোকদের বাদ দিয়া বলিতেছি না) সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা স্বীকার করিবেন যে, আমাদের দেশের সাধারণ লোকের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, মনন শক্তি, স্মরণ শক্তি, বিচার শক্তি, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং বুদ্ধিপ্রয়োগ পটুতা তথাকথিত শিক্ষিত লোকের অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহার কারণ অতি সহজ। কারণ এই যে, ইহাদিগকে যুগপৎ তাহাদের স্বদেশী সমাজ, বিদেশী শাসন এবং নিজেদের দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সমানে লড়াই করিয়া টিঁকিয়া থাকিতে হয়। (পূজ্যপাদ ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায়) "সত্তা রক্ষার জন্য ধ্বস্তাধস্তি" (struggle for existence)র বাজারে একমাত্র এই জনসাধারণই যে আপনাদিগের বৈশিষ্ট্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা, তথাকথিত ভদ্রসমাজ অপেক্ষা, অধিক বজায় রাখিয়া হাজার বৎসর ধরিয়া টিঁকিয়া আছে ইহা ত জানা কথা।

অতএব ক্ষেত্র যেখানে উর্ব্বর এবং শিক্ষিত সমাজের পাপ ও স্বার্থপরতার দ্বারা "মুক্তধারা"র যে কৃত্রিম বাঁধ বাঁধা হইয়াছে তাহা ভাঙ্গিয়া দিলেই সেই ক্ষেত্র যখন সহজেই জাতির প্রাণসম্পদে পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে এবং জাতির সেই প্রাণসম্পদের অভাবে আমাদের ধ্বংস যখন অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে তখন আর দ্বিধা করিবার, পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবার কোনো কারণ নাই—অবসর ত নাইই।

এখন হইতেই, পুস্তকপ্রণেতা ও সংবাদপত্র-পরিচালকগণকে, বিনা আয়োজনে সহজে গণশিক্ষা বিস্তারের এই পন্থায় অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

জ্ঞানের রাজ্যকে যদি ভাষার অচলায়তন গাঁথিয়া তথাকথিত ভদ্র সমাজের গুদামঘরে আবদ্ধ করিয়া না রাখিয়া জনায়ত্ত ভাষার স্রোতে সাধারণের মধ্যে চারাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে অতি অল্পসময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের এই পুরাতন বুদ্ধিমান ও গ্রহণপটু জাতিগুলির মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার লাভ করিবে।

এইরূপে জ্ঞানের সাম্যলাভে সামাজিক স্তরভেদ যতই ঘুচিয়া যাইবে ততই এই বিরাট দেশ একটি সংহত আত্ম-মর্য্যাদাসম্পন্ন দুর্জ্জয় বলশালী জাতিতে পরিণত হইয়া উঠিবে।

এ'ত গেল কতকটা ধীরে-সুস্থে করিবার কাজ। কিন্তু যুদ্ধ যখন আমাদের খিড়কীর দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং দেশের শাসকবর্গ দেশের শিক্ষাদানের যে সামান্য দোকানসাজানগোছ আয়োজন ছিল তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে প্রায় সমূলে উচ্ছিন্ন করিতে বসিয়াছেন, তখন আমাদিগকেই এখনই প্রাণপণে সেই ক্ষতিপূরণ এবং তদুত্তর প্রকৃত জনশিক্ষা সমস্যার সমাধানে আমাদের দেশের **গঠনশক্তিকে** নিয়োগ করিতে হইবে।

বেকার শিক্ষকবর্গ এবং দেশের বেকার যুবকবৃন্দ দলে দলে ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকরূপে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া ফিরিতে পারেন এমন পরিকল্পনা করিয়া কার্য আরম্ভ করা যায় কি না প্রধান মন্ত্রী মহাশয়, শ্যামাপ্রসাদবাবু ও অন্যান্য দেশনায়কগণ বা যে-কেহ এ বিষয়ে যোগ্য—তৎপর হইয়া সে চিন্তা করুন এবং **এখনই অগৌণে সেই চিন্তা অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিন।**

ইহা বহু ব্যয়সাপেক্ষ নয়। আমাদের ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকগণ দেশ এবং তথা নিজের ভবিষ্যৎ হিতের জন্য যদি কেবল "খাওয়া-পরা" এবং সামান্য হাতখরচে জ্ঞান ও সংবাদ-বহনের এই পবিত্র কার্যে রত হন, তবে আমাদের গ্রাম-সমূহের অতিথিবৎসল হিন্দু-মুসলমান গৃহস্থবৃন্দ আনন্দে তাঁহাদের পুত্র-কন্যার শিক্ষাগুরুগণের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিবেন—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেরি করিবার সময় আর নাই, ইহা নিশ্চয়।

কলঙ্ক-ভঞ্জন

শ্রীহেমলতা দেবী (ঠাকুর)

এ জগৎ তৃষ্ণায় আকুল—
রাত্রি দিন হানাহানি লয়ে ঝরা ফুল,
বৃন্তমূলে নবীনের না রাখে সংবাদ
ছিন্ন বৃন্তে শুষ্ক শাখে বাদ-বিসম্বাদ।
চিরদিন রবে না যা তাই লয়ে দ্বন্দ্ব
ঝরিতে পড়িতে দেখি লাগে মনে ধন্দ।
ঝরিল যা, পড়িল যা, মরিল যা—ধন্য
নূতনের আগমন জানালো আসন্ন।
মৃত্তিকার কোলে ঝরি পড়িল যে প্রাণ
মৃত্তিকা করিল তারে নবজন্ম দান।

অঙ্কুর জাগিল নব থরে থরে থরে
কখন ফুটিল ফুল দৃষ্টি-অগোচরে!
অগোচরে নন্দনের সুঘ্রাণ মিলিল,
সুন্দরের দ্বারে দৃষ্টি আপনি পৌঁছিল।

হে সুন্দর! অন্তরের বিনিদ্র বাসর
তোমার মিলন-ছন্দে সৌন্দর্য্যমুখর
রহে রাত্রিদিন, জাগে প্রেম অহরহঃ
তৃষ্ণানাশা জলে স্নান করায় প্রত্যহ।
উষার শুভ্রতা পার' প্রেমের অঞ্জন
নিত্য করে জগতের কলঙ্ক-ভঞ্জন।

উন্মেষের উন্নতি

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত



দিনের শেষে যে বহুসংখ্যক কাজের উমেদার হতাশ হইয়া ঘরে ফিরিল, যুবক উন্মেষ তাহাদের এক জন। উন্মেষ গরিব, কয়েক মাস হইল কাজের চেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়াছে। বুদ্ধিমান লোকেরা প্রায়ই স্বল্পবিদ্য হয়, উন্মেষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে। তাই তাহার বিদ্যালাভ বিশেষ ঘটে নাই। বুদ্ধিবলে সে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবে এই বিশ্বাসে বুক ফুলাইয়া কলিকাতা আসিল। ব্যবসা করিয়াই লোকে বড় হয়, বুদ্ধি খেলাইবার অবকাশও তাহাতে বেশী, তাই উন্মেষ প্রথম কিছু দিন পাঁচ সিকা মূলধন করিয়া লক্ষপতি হইবার চেষ্টা করিল। বুদ্ধি অনেক খরচ হইল, মূলধন কয়েক পাঁচ সিকা খরচ হইয়া গেল কিন্তু লক্ষপতি হইবার লক্ষণ কিছুই দেখা গেল না। অবশেষে ব্যবসার বাসনা চাপা দিয়া চাকুরির চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু চাকুরির মূলধন যে বিদ্যা তাহা যে তাহার নাই বলিলেই চলে! অনেক বড়বাবু আর বড়সাহেবের মন্দির-দরজায় ধরনা দিল কিন্তু প্রত্যাদেশ কিছুই মিলিল না। এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা উন্মেষ অত্যন্ত হতাশভাবেই মেসে ফিরিল। নীচের তলার একটা ঘরের তালা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিল। ঘর খুবই ছোট, জানালার অভাবহেতু স্বভাবতঃই অন্ধকার—সন্ধ্যাগমে সে অন্ধকার আরও ঘনীভূত হইয়াছে, ভিতরের কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু কাহারও যদি দিব্য-চক্ষু থাকিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত সে ঘর অন্ধকার নয়, এক অপূর্ব্ব আলোয় উদ্ভাসিত। এত দিন ধরিয়া দিবারাত্র উন্মেষ শুইয়া বসিয়া যত কল্পনা করিয়া আসিয়াছে, তাহারই জ্যোতিতে ঘরখানি ঠাসা। কোণে কোণে কত বিচিত্র জিনিস আবর্জনার মত জমা হইয়া আছে। একটা বিরাট্ লোহার কারখানা খাটের নীচে গড়াগড়ি যাইতেছে, এক কোণে রং-চটা টিনের স্যুটকেসের পাশে একটা স্কাইস্ক্রেপার, আর এক কোণে কয়েকটা আধ-পোড়া বিড়ি, দুই-তিনখানি বড় বড় হীরক, একখানা রাজা-বাহাদুরের সনদ পড়িয়া আছে, গোটাকয়েক প্রেমের স্বপ্ন রঙীন ফানুসের মত মাকড়সার জালে আটকাইয়া আছে; অপরিসর মেঝেতে কতিপয় মোটরকার বেগে ঘুরপাক খাইতেছে ও শূন্যে একখানা এরোপ্লেন মশার মত গুঞ্জন করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু আমাদের দিব্যদৃষ্টি নাই, তাই কেবল দেখিলাম অন্ধকার আর শুনিলাম মশার ডাক।

উন্মেষ সেই অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া মাদুর বিছান খাটের উপর নির্জ্জীবের মত শুইয়া পড়িল। এই কয়েক মাস ধরিয়া কত ফন্দিই সে করিল, টাকা ধরিবার কত ফাঁদই পাতিল, কিন্তু টাকা ধরা পড়িল না। ব্যবসার কথা আর ভাবে না, কারণ পাঁচ সিকা মূলধন সংগ্রহ করাও তাহার পক্ষে এখন অসম্ভব, সামান্য মাহিনার একটা চাকুরিও ত এত চেষ্টায় জুটিল না। উন্মেষ চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিল—এখন উপায়! কত উৎসাহ আর বুকভরা বিশ্বাস লইয়া কলিকাতা আসিয়াছিল, এখন সে উৎসাহ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে—বিশ্বাস আর কণামাত্র অবশিষ্ট নাই। এই স্বার্থপর কলিকাতা শহরে সে কি শেষটায় না খাইয়া পথে পড়িয়া মরিবে! উন্মেষের বুক খালি করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল, মনে মনে বলিল—হে ভগবান, এ গরিবের প্রতি তুমি মুখ তুলিয়া চাহিবে না? ভগবানের কানে উন্মেষের কাতরোক্তি পৌঁছিল, তার

দীর্ঘনিঃশ্বাসে করুণাময়ের করুণা হইল। তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

পর-দিন উন্মেষের আর পথে বাহির হইবার ইচ্ছামাত্র ছিল না, কিন্তু চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিতেও যে পারে না—তাই ছেঁড়া জুতা জোড়া আর এক বার ঘষিয়া লইল এবং ময়লা কাপড়-জামা আর এক বার ঝাড়িয়া লাল-দীঘির দিকে অগ্রসর হইল। পাটের কারবারি এক সাহেব কোম্পানীর আপিসের সামনে আসিয়া অভ্যাস মত সে দাঁড়াইল। তার পরে কি যে হইল কেহ জানে না, উন্মেষ সোজা আপিসের ভিতর ঢুকিয়া গেল—চাকুরি খালি আছে কি নাই, পাইবে কি পাইবে না ইত্যাদি এক বার ভাবিলও না। পথে দরোয়ান তাহাকে বাধা দিল না, বড়বাবুর দরজায় বেয়ারা ঘুষ চাহিল না, বড়বাবু তাহাকে দেখিয়া ভ্রূকুটি করিলেন না বরং মধুর ভাবে একটু হাসিলেন। কোন উমেদারের ভাগ্যে আজ পর্য্যন্ত যা ঘটে নাই, ভবিষ্যতে কোন দিন ঘটিবে না, উন্মেষের ভাগ্যে আজ তাহাই ঘটিল—বড়বাবু তাহাকে বসিতে বলিলেন। উন্মেষ অবশ্য বসিল না—ভয়ে ভয়ে চাকুরীর আবেদন জানাইল। শুনিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না, বড়বাবু সংক্ষেপে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বারা তাহাকে দরজা না দেখাইয়া বিদ্যার পরিচয় চাহিলেন এবং উন্মেষ যখন সসঙ্কোচে জানাইল উহা তাহার সামান্যই আছে তখন তিনি বড়বাবু-জনোচিত সংজ্ঞাহরণ ধমক না দিয়া বলিলেন 'Smart young man.' বলা বাহুল্য উন্মেষের একটা অল্প মাহিনার চাকুরী তখনই মিলিয়া গেল।

মেসের নীচের তলাকার সেই ছোট অন্ধকার ঘরটা আজকাল খালি পড়িয়া আছে, উন্মেষ দোতলার একটা ভাল ঘরে উঠিয়া গিয়াছে। দেশে মা আছেন, তাঁহাকে নিয়মিত ভাবে কিছু কিছু সাহায্য করে। উন্মেষের দেহের ও পরিচ্ছদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ভাগ্য তাহার খুবই ভাল, তাই এই সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে খাইতে হঠাৎ একটা ছোটগোছের ডিঙ্গি জুটিয়া গিয়াছে—এখন অনুকূল বাতাস বহিলে ধীরে ধীরে কিনারায় গিয়া ঠেকিবার আশা রাখে। কলিকাতার প্রতি বিদ্বেষভাবটা আর নাই।

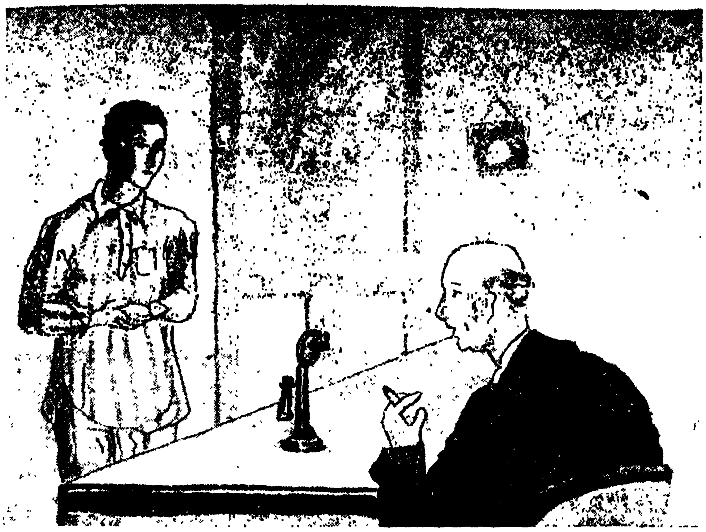
এই ভাবে দিন যায়। মা মাসে মাসে চিঠি লেখেন—বাবা বিবাহ করিয়া সংসারী হও। বিবাহের প্রস্তাব উন্মেষের মনের বেহালায় দুই-এক বার ছড় টানিয়া থামিয়া যায়। সামান্য মাহিনার চাকুরী করে তাহাতে মাতা-পুত্রেরই ত চলে না—বিবাহ করিবে কি! মাকে বুঝাইয়া লেখে—বিয়ে গরিবের জন্য নয়, তাহার ছোট ডিঙিখানায় আর বোঝা চাপাইয়া ভারী করা উচিত হইবে না। এই সব চিঠি লিখিতে তাহাকে খুব মুন্সীয়ানা করিতে হয়, কারণ সোজাসুজি না বলিয়া সে মায়ের মনে কষ্ট দিতে চায় না।

মা হাল ছাড়েন না, লেখেন ছোট্ট একটি বউ ঘরে আনিলে এমন কি বোঝা বাড়িবে। ছোট্ট বউ যে ভারী কম উন্মেষ তাহা অস্বীকার করিতে পারে না, মনের বেহালায় ছড়টানা যেন থামিতে চায় না—একটা পুরা রাগিণী না বাজিলেও আধখানা একটানে বাজিয়া যায়।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে উন্মেষ আজকাল কেমন উন্মনা হইয়া যায়। অনেক কথা ভাবে—সংসারের অনিত্যতা, মিরনালয়ের অভিনয়, হিন্দু মুসলমানের একতা, চায়ের দোকানের দেনা, এবং ছোট্ট একটি বউ। শেষের চিন্তাটাই তাহাকে বিশেষ করিয়া কাবু করে।

মায়ের চিঠি আসিয়াছে, উন্মেষের চিন্তা সেদিন বিবাহমুখী। টিফিনের সময় বাহিরে গেল না, চেয়ারে কাত হইয়া পড়িয়া জানালার ফাঁক দিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল। ভিতরে একটা হালছাড়া ভাব। সে কি করিবে! বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে কিন্তু সামর্থ্য নাই—এ কি বিড়ম্বনা! ভিতরটা কেমন করুণ হইয়া আসে, মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া উন্মেষ কহে—তুমি নাকি দরিদ্রের বন্ধু তবে কেন তুমি আমার এ সমস্যার সমাধান করিবে না! কেহ জানিল না—উন্মেষের এ নিবেদন ভগবান শুনিতে পাইলেন, সমস্যার সমাধান অলক্ষিতে হইয়া গেল।

আফিসের ঘড়িতে পাচটা বাজে, বাবুরা কাজ গুছাইতেছে এমন সময় বড়বাবুর ঘরে উন্মেষের তলব পড়িল। বড়বাবু চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া একটা ফাইল পড়িতেছিলেন, ফাইলের আড়াল হইতে সিগারেটের ধোঁয়া পাক খাইয়া উপরে উঠিতেছিল। উন্মেষের পায়ের আওয়াজ পাইয়া অন্তরাল হইতেই তিনি কহিলেন, "দেখ হে বাপু, চাকরিটি তোমার গেল বড়সাহেব বিগরেছেন



যার উপর আপিল নাই।" উন্মেষের হৃৎপিণ্ড যেন হঠাৎ থামিয়া গেল, তার পরে কি দ্রুতবেগেই না চলিতে লাগিল। মনের মধ্যে এক মুহূর্তে নানা ভাব পাক খাইয়া একটা কিম্ভূত ভাবের সৃষ্টি করিল ও মুখ দিয়া সেই ভাবের উপযোগী খানিকটা অবোধ্য দ্রাবিড় ভাষা বাহির হইয়া গেল। বড়বাবু চমকিয়া উঠিলেন, হাত হইতে ফাইল খসিয়া পড়িল—পর মুহূর্তে হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি উন্মেষ, বল সে কথা! আমি ভাবছি উপেন বুঝি। You are a lucky chap উন্মেষ, সাহেব তোমার উপর বেজায় খুশী; শুনেছ বোধ হয় উপেনের চাকরি গেছে, তুমি তার জায়গায় কাজ করবে একশ-পঁচিশ টাকা মাইনে —not bad." উন্মেষের হৃৎপিণ্ড আবার স্বাভাবিক চলন প্রাপ্ত হইল, ভাবের জট উল্টা পাক খাইয়া খুলিয়া গেল—মুখ দিয়া বাংলা ভাষা বাহির হইল। বড়বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া সে বাহিরে আসিল।

কিছু দিন হইল উন্মেষ বিবাহ করিয়াছে। ছোট একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া মা ও স্ত্রীকে লইয়া বাস করিতেছে। ইতিমধ্যে তাহার দেহের ও মনের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, দেহের দিক দিয়া কিছু মোটা হইয়াছে, মনের দিক দিয়া একটু শৌখিন হইয়াছে—সুন্দর জিনিসটি দেখিতেও ইচ্ছা করে, পাইতেও ইচ্ছা করে। এত দিন উন্মেষ কিছুই যেন পরিষ্কার দেখিতে পায় নাই, দারিদ্র্যের ধোঁয়ায় পৃথিবীটা তাহার কাছে অস্পষ্ট ছিল। আজকাল সে এমন একটা উচ্চতর স্থানে উঠিতে পারিয়াছে যেখানে দারিদ্র্যের ধোঁয়া পৌঁছায় না, যেখান পৃথিবীর হইতে আর এক রূপ দেখিতে পায়।

আপিস-ফেরতা কোন কোন দিন চৌরঙ্গীর মাথায় আসিয়া বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়ায়। সামনে দিয়া মোটরের পর মোটর চলিয়াছে—রঙের পরে রং, রূপের পরে রূপ, বিরাম নাই। তাহার মনে যেন এক এক পোঁচ রং মাখাইয়া দিয়া যায়, খানিকক্ষণ বাদে সমস্ত মন রঙীন হইয়া উঠে। উন্মেষ এই রূপের ও রসের স্রোতকে ছুঁইতে চায়। হঠাৎ নেশা ছুটিয়া যায়, দেখে যদিও তাহার ও এই স্রোতের মাঝখানে দূরত্ব কয়েক ইঞ্চিমাত্র, তবুও তাহার ১৮ ইঞ্চি হাত কিছুতেই সে পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। দূরত্বের মামুলি ধারণা গোলমাল হইয়া যায়, একটা নূতন আপেক্ষিক বাদ আবিষ্কৃত না হইলে ইহার রহস্য যেন ভেদ হয় না।

এক-আধ দিন বউয়ের জন্যে ছোটখাট জিনিস কিনিতে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে যায়। এক সময় ছিল যখন জিনিসের দামের দিকটাই সে বিবেচনা করিয়া দেখিত, রূপের দিকটা আদবেই দেখিত না—আজকাল দামের চেয়ে রূপের দিকটা বেশী দেখে। কিন্তু তাই কি মনের মত জিনিস কিনিতে পারে! যেটি তাহার পছন্দ সেইটিই তাহার জন্য নয়, এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মার্কেটের অলিগলি ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার এক উদ্ভট খেয়াল চাপে, দোকানে দোকানে সবচেয়ে সেরা জিনিসগুলি পছন্দ করিয়া চলে—যেন এক দিন আসিয়া সে সব কিনিয়া লইয়া যাইবে। মাঝে মাঝে মার্কেটে আসিয়া ঘুরপাক দিয়া জিনিসগুলি যথাস্থানে আছে কি না দেখিয়া যায়। কোন একটা বিক্রি হইয়া গেলে মনের মধ্যে কেমন যেন ধাক্কা লাগে, রাগ হয়।

সেদিন তাহার সামনে তাহারই পছন্দ-করা হীরের আংটিটা বিক্রি হইয়া গেল। ছোকরা আসিয়াছে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া, এত গহনার মধ্যে ঐ আংটিটাই সে পছন্দ করিয়া ফেলিল! দরদস্তুর করিল না, ইতস্ততঃ করিল না, পকেট হইতে নির্বিকার চিত্তে এক গোছা নোট বাহির

করিল এবং অত্যন্ত অনাসক্তভাবে ফেলিয়া দিল। আংটি যে বিক্রি হইয়া গেল তাহাতে তাহার হৃদয় যথেষ্ট পীড়িত হইল বটে, কিন্তু ঐ আড়ম্বরহীন অনাসক্তভাবে অতগুলি নোট দিয়া দেওয়াটা তাহার বড় ভাল লাগিল। বাড়ী ফিরিবার মুখে স্ত্রীর জন্য উন্মেষ একটা সুগন্ধি তেল কিনিল, দরদস্তুর করিল না, ইতস্ততঃ করিল না, পকেট হইতে নির্বিকার চিত্তে আড়াইটা টাকা বাহির করিয়া অত্যন্ত অনাসক্তভাবে ফেলিয়া দিল।

সে রাত্রে উন্মেষের ঘুম আসিতেছিল না। পাশে স্ত্রী ঘুমাইয়া পড়িল, সে তখনও জাগিয়া আছে। মনে তার শান্তি নাই। সে ভাবিতেছে জীবনকে সুন্দর করিবার, আনন্দময় করিবার এই যে আয়োজন, এই যে উপকরণ-সম্ভার ইহা যদি সে দেখিল তবে পাইবে না কেন? সে যদি বরাবর গরিবই থাকিয়া যাইত তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না, কিন্তু আজ সে এতটা উঁচুতে উঠিয়াছে যেখান হইতে এই আনন্দলোকের বর্ণগন্ধ বারে বারে তাহার ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিতেছে। ইহার জন্য দায়ী ভগবান। কেন তিনি দারিদ্র্যের পেষণে তাহাকে বিনষ্ট করিলেন না—এমন একটা মাঝামাঝি জায়গায় তুলিয়া দাঁড় করাইয়া দিলেন যেখান হইতে সে দেখিতে পায় অথচ ছুঁইতে পায় না, গন্ধ পায় অথচ স্বাদ পায় না। হে ভগবান, সে বেশী কিছু চায় না—মাসে হাজারখানেক টাকা আয়, দক্ষিণ-কলিকাতায় একখানা বাড়ী, মোটর একখানা, আর—না, আর কিছু না হইলেও চলে। ভাবিতে ভাবিতে উন্মেষ উত্তেজিত হইয়া উঠে—বারে বারে মনে মনে বলিতে থাকে—হে ভগবান, আমার প্রতি তুমি অবিচার করিয়াছ, হয় আমাকে আরও উপরে তোল, না হয় আবার নীচে নামাইয়া দাও।

এখন ব্যাপার হইল এই যে, কেন জানি না ভগবান উন্মেষকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন। উন্মেষের এই উত্তেজনাপূর্ণ উক্তিতে তিনি বিচলিত হইলেন এবং তাহার পেশ-করা ফর্দ কাটকুট না করিয়া সবটাই মঞ্জুর করিয়া দিলেন।

ইহার পর দিন-কয়েকের মধ্যেই উন্মেষদের আপিসে মস্তবড় ওলটপালট হইয়া গেল। ছোটসাহেব বিলাত গেলেন, যাইবার আগে উন্মেষকে তাঁহার স্থানে বাহাল করিয়া গেলেন। কেরানীকুল অবাক হইয়া গেল—তাহারা জানিল না যে ইহার পশ্চাতে ভগবানের মঙ্গলময় হস্ত কাজ করিতেছে।

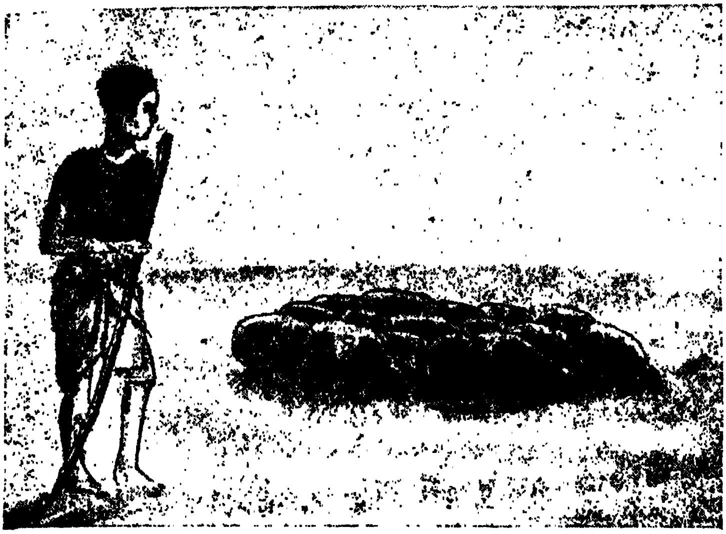
সে উন্মেষকে আর চেনা যায় না, বাহন শেভ্রোলে, পরিচ্ছদ সুট, নয়নে প্যাশনে, অধরে হাভানা। দেখিয়া শুনিয়া ভগবান ভাবিলেন উন্মেষ সুখী হইয়াছে।

কিন্তু হঠাৎ এক দিন উন্মেষের মনে হইল সে যথেষ্ট বড়লোক নহে। এমন মনে হইবার কারণও আছে। উন্মেষের এ পাশের প্রতিবেশী শম্ভুবাবুর পরিবারের প্রত্যেকের একখানা করিয়া মোটরকার, তাহাও আবার বছর-অন্তর বদল হইয়া নতুন আসে; ওপাশের প্রতিবেশী বিলাসবাবু একটা বাথরুম করিতেই প্রায় পনর হাজার টাকা খরচ করিলেন, সামনের রায়বাহাদুর জমীদার—তাঁহার উর্ধ্বতন চৌদ্দ পুরুষ কাজ করিয়া যায় নাই, অধস্তন চৌদ্দ পুরুষ কাজ করিয়া খাইবে না। ইহারাই ত বড়-মানুষ। উন্মেষ সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ মাত্র, বড়মানুষ নহে।

ভগবানের প্রতি ইদানীং উন্মেষের ভক্তি বাড়িয়াছে, সকাল সন্ধ্যায় তাঁহাকে একান্তে স্মরণ করে। সেদিন সকালে বুকের কাছে হাতজোড় করিয়া কহিল—প্রভু, যদি দিলেই, তবে প্রাণ খুলিয়া দাও। ভগবান দৈববাণী করিলেন—'তথাস্তু'। শুনিয়া উন্মেষ আশ্বস্ত হইল।

দেখিতে দেখিতে চুরি না করিয়াও উন্মেষ বহু লক্ষ টাকার মালিক হইয়া গেল।

উন্মেষ আর চাকুরি করে না, ব্যবসায়ে মাথা খেলায়। সে শেয়ার-মার্কেটের কর্ণধার, তুলার বাজারের রাজা। কি ব্যবসার কি বিলাসিতার প্রতিযোগিতায় সহজে কেহই তাহাকে হটাইতে পারে না। ব্যাঙ্কার মহাদেও প্রসাদের সহিত তাহার আড়াআড়ি লাগিয়াই আছে, ঝাম্মু ঝম্মুমল মম্মুমলের সহিত তাহার পাল্লা চলে, বনেদী বসু-মহাশয়কে সে গণনার মধ্যেই আনে না। এমনি ভাবে ধনের ও মানের মদ্য বেসামাল পান করিয়া বেহুঁশ ভাবে উন্মেষের দিন কাটে। মাঝে মাঝে যে হুঁশ ফিরিয়া না-আসে এমন নয়—যেদিন বাগান-পার্টিতে বনেদী বসু-মহাশয় গবর্ণরের সঙ্গে আগে শেকহ্যাণ্ড করেন বা ঝাম্মু ঝম্মুমল তুলার বাজার একচেটিয়া করিতে চায়, সেদিন উন্মেষের হুঁশ ফিরিয়া আসে।



বড় হইয়া গেলে যে আমি হার্টফেল করিয়া মরিব প্রভু!

দৈববাণী হইল—আমি তোমাকে স্নেহ করি, তাই তোমার খাতিরে একটা কাজ করিতে পারি, তোমাকে আর আমি বড় করিতে পারি না, তবে পৃথিবীতে তোমার চেয়ে যারা বড় আছে তাহাদের ছোট করিয়া তোমার সমান করিয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহা হইলে তোমার চেয়ে যাহারা ছোট আছে তাহাদেরও তোমার সমান করিয়া তুলিতে হইবে। ভাবিয়া দেখ, ইহাতে তুমি রাজী আছ কি না, যদি রাজী থাক আমাকে জানাইও আমি সন্তুষ্টচিত্তে এইরূপ করিয়া দিব।

এমনি এক দিন ঝন্নুমলের কৃপায় তাহার হুঁশ ফিরিয়া আসিয়াছে। আপিস-ঘরের কৌচে চিৎ হইয়া পড়িয়া সে ভাবে একটা ঝন্নুমলকেই কাবু করিতে পারিল না, কতটুকু সামর্থ্য তাহার! টাকা তাহার যথেষ্ট আছে, কিন্তু যাহা আছে তাহার চেয়ে আর দশগুণ বেশী ত আনিতে পারিত। ধর এই কলিকাতা শহরেই তাহার চেয়ে ধনী অনেক আছে, গোটা ভারতবর্ষের বা পৃথিবীর কথা না-ই তুলিলাম। দুনিয়ার ধনীর তালিকায় তার নাম থাকিবে কি? হয়ত শেষের পৃষ্ঠার শেষ নামটি তাহার হইবে, ঝন্নুমলের নাম হয়ত তাহার উপরেই থাকিবে। ইহা যে অসহ্য! চিরকালই উন্মেষ বিপদে বিপদভঞ্জন ভগবানকে স্মরণ করে, আজিও করিল, ভক্তিভরে কহিল—হে দয়াল, কোন প্রকারে ঝন্নুমলের উপরে আমার নামটি চড়াইয়া দিও। আর একটা কথা, ঐশ্বর্য্যের সমুদ্র আমার সামনে পড়িয়া আছে, আমি ত বেলাভূমে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র—কৃপা করিয়া ঐ সমুদ্রে আমাকে হাবুডুবু খাইতে দাও। উন্মেষ দৈববাণী শুনিল—বৎস, অনেক ত ঐশ্বর্য্য হইয়াছে, এখন উহাতেই সন্তুষ্ট থাক।

উন্মেষ কহিল—প্রভু, অনেক হইয়াছে এ কথা ঠিক, কিন্তু অনেক ত আশেপাশে গড়াগড়ি যাইতেছে, একটু দয়া করিলেই তাহা আমি পাইতে পারি। দৈববাণী হইল—বাছা, তোমাকে আমি এ যাবৎ ঢের দিয়াছি, আর দিতে পারিব না। আমাকে অনেককে দেখিতে হয়, একা তোমাকে লইয়া থাকিলেই ত চলিবে না।

ব্যথিত হইয়া উন্মেষ কহিল—কিন্তু ঝন্নুমল! ঝন্নুমল

উন্মেষ দৈববাণীর যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিল না। অনেক পাইয়াছে বলিয়া আর পাইতে পারে না এ কথা অর্থহীন, বরং অনেক পাইয়াছে বলিয়াই সে আরও পাইতে পারে, যে-গাধা অনেক বোঝা বহিতে পারে সে-ই আরও অনেক বহিতে পারে ইহা কে না জানে! আসল কথা ভগবান তাহার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, উন্মেষ অভিমান করিয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় টেলিফোন-বেল বাজিয়া উঠিল, উন্মেষ ফোন ধরিল—তাহার কর্ম্মচারী কথা কহিতেছে, ঝন্নুমল বাজার একচেটিয়া করিয়া লইল। উন্মেষ সোজা হইয়া বসিল, না, এ হইতেই পারে না—ঝন্নুমল তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না, হে প্রভু, হে ভগবান, তুমি তাই কর, রথচাইল্ড, রকফেলার, ফোর্ড, বাটা, টাটা, উন্মেষ, ঝন্নুমল, রামবাবু, শ্যামবাবু, ফেরিওয়ালা, বিড়িওয়ালা সব সমান করিয়া দাও। মন্দ কি, সকলে তাহার সমান হইবে, কেহ ত তাহার উপরে হইবে না, ঝন্নুমলের স্পর্দ্ধা সে যে আর সহ্য করিতে পারে না।

আবার দৈববাণী হইল 'তথাস্তু'।

সেই রাত্রে উন্মেষ অনেক কাল পরে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইল। পরদিন খুব সকালেই ঘুম ভাঙিল, গা মোড়ামুড়ি দিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল, দেখিল বালিগঞ্জ লোপ পাইয়াছে, চৌরঙ্গী লোপ পাইয়াছে, কলিকাতা লোপ পাইয়াছে, বাংলা দেশ লোপ পাইয়াছে, বোধ হয় সমগ্র

পৃথিবী লোপ পাইয়াছে, রহিয়াছে এক দিগন্তবিস্তৃত তৃণ-শ্যামল মাঠ; সেই মাঠে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি তাহারা রহিয়াছে—দেহ এক প্রকার, মন এক প্রকার, ক্ষুধা এক প্রকার, তৃষ্ণা এক প্রকার, বুদ্ধি এক প্রকার, আকাঙ্ক্ষা এক প্রকার, আনন্দ এক প্রকার, কেহ বড় নয়, কেহ ছোটও নয়। পোষাকে তারতম্য নাই, কেননা পোষাক নাই, খাদ্যে তারতম্য নাই—খাদ্য কচি ঘাস। উন্মেষ অবাক হইয়া গেল। রূপ সম্বন্ধে বরাবরই তাহার একটা দুঃখ ছিল, কেননা সে রূপবান ছিল না। দেখিল সে আজ কাহারও চেয়ে সুন্দর না হইলেও কাহারও চেয়ে কুৎসিত নয়—সে খুশী হইল।

প্রকাণ্ড এক যষ্টি হাতে অদূরে এক পুরুষ দাঁড়াইয়া, কেহ আগাইয়া গেলে তাহাকে তাড়াইয়া দলে ভিড়াইয়া দিতেছেন, আবার কেহ পিছাইয়া পড়িলে খেদাইয়া আনিতেছেন—কাহারও আগে যাইবার উপায় নাই, পিছাইয়া পড়িবারও উপায় নাই। উন্মেষ চিনিল ভগবান।

অবশেষে মেষ হইয়া উন্মেষ শান্তিলাভ করিল।

রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র

ওঁ

খড়দহ

সবিনয় নমস্কার নিবেদন

আপনি যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন সংক্ষেপে তাহার উত্তর দেওয়া দুঃসাধ্য, অথচ আমার অবকাশের বাহুল্য নাই, শরীরও অসুস্থ। মূর্ত্তি যদি যথার্থ ভাবসূচক হয় তবে তাহা অবলম্বন করিয়া পূজা নিরর্থক হয় না। কিন্তু সাধারণত প্রাকৃতজনে মূর্ত্তিতে বিশেষ ফলদায়ক বস্তুগুণ আরোপ করে, এবং সেই সকল মূর্ত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট নানা কাহিনীর দ্বারা তাহার ভাবব্যঞ্জনাকে নষ্ট করিয়া দেয়। কষ্টকল্পনার দ্বারাও সেই সকল কাহিনীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অসম্ভব হইয়া উঠে। এই সকল পূজার অনেক অংশই অবৈদিক অনার্য্য জাতিদের নিকট হইতে আগত, এই কারণে তাহাতে তামসিকতা প্রবল, এই কারণে তাহা অন্তরের বিষয়কে স্থূল ভৌতিক রূপ দিয়া সমস্ত দেশের চিত্তকে নানাবিধ অর্থহীন মূঢ়তায় ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। ধর্ম্মের নামে যে জাতি বুদ্ধিকে শৃঙ্খলিত করে তাহার দুর্গতির সীমা থাকে না। ইতি ১০ই মাঘ ১৩৩৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



ভারত ও পৃথিবী

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ.

বাল্যকালে স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে পড়িয়াছি, বিশাল সমুদ্র এবং অভ্রংভেদী পর্ব্বতমালা ভারতবর্ষকে বহির্জ্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত পরিচয় স্পষ্টতর হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে বা অধ্যাপকের বক্তৃতায় ঐ উক্তির প্রতিবাদ পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ভারতীয় সভ্যতা পর্ব্বতান্তরালে ধ্যানমগ্ন যোগীর মত আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, এইরূপ ধারণা ছাত্র-জীবনে আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়। এই ধারণার একটা অপূর্ব্ব মাদকতা আছে, কারণ ইহা ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে এবং বিদেশীর নিকট ঋণ স্বীকারের অগৌরব হইতে আমাদিগকে মুক্তি দেয়। সুতরাং ইতিহাসের অচলায়তনে এই মিথ্যা ধারণা আপনার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে।

আর্য্যজাতির আগমনের পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল, ইহা আজকাল সকলেই স্বীকার করেন। সম্ভবতঃ দ্রাবিড় জাতিই সেই প্রাচীনতম ভারতীয় সভ্যতার স্রষ্টা। সেই সভ্যতা সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক এবং বহির্জ্জগতের সহিত সংস্পর্শবিহীন ছিল কিনা তাহা বলা কঠিন, কারণ দ্রাবিড় জাতির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। তবে কোন কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বলিয়াছেন যে, দ্রাবিড় জাতি অন্য কোন দেশ হইতে বেলুচিস্থানের পথে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিল। অদ্যাপি বেলুচিস্থানের অধিবাসী ব্রাহুই জাতি দ্রাবিড় জাতীয় ভাষা ব্যবহার করে। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে বোধ হয় ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে ভারতীয় দ্রাবিড়গণ তাহাদের আদিম মাতৃভূমির সহিত সম্বন্ধবিচ্ছেদ করে নাই।

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সিন্ধু-প্রদেশের অন্তর্গত মহেঞ্জোদড়োতে এবং পঞ্জাবের অন্তর্গত হরপ্পায়। কেহ কেহ মনে করেন যে সিন্ধু-সভ্যতাও দ্রাবিড় জাতিরই কীর্ত্তি, কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সিন্ধু-সভ্যতা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যতটুকু আলোচনা হইয়াছে তাহাতে পশ্চিম-এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় যে সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছিল তাহা সিন্ধু উপত্যকার পৌর সভ্যতার সহিত একই সূত্রে গ্রথিত ছিল। উর, ব্যাবিলন প্রভৃতি নগরের সহিত মহেঞ্জোদড়োর ভাব ও পণ্যের আদান-প্রদান না থাকিলে প্রাচীন সভ্যতার এই দুইটি কেন্দ্রে সমজাতীয় অস্ত্র, মৃৎপাত্র ও অলঙ্কারাদি পাওয়া যাইত না। সেকালেও বিশাল সমুদ্র এবং অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা ভারতবর্ষের প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান ছিল, কিন্তু আদিম মানুষের সুস্থ দেহ ও সবল মন এই প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করিয়াছিল।

আর্য্যজাতির ভারতবর্ষে উপস্থিতির ইতিহাস সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কোন্ দেশ হইতে তাহারা আসিয়াছিল, কবে আসিয়াছিল, কোন্ পথে আসিয়াছিল, কেন আসিয়াছিল, কিছুই নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু তাহাদের আগমনের ফলে ভারতীয় সভ্যতা যে নূতন রূপ ধারণ করিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতার সহিত তাহাদের সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল কিনা বলা যায় না, ঘটিয়া থাকিলেও সেই সংস্পর্শের ফলে আর্য্যসভ্যতা কতখানি প্রভাবিত হইয়াছিল তাহা আমরা জানি না। কিন্তু দ্রাবিড় সভ্যতার সহিত আর্য্যদের দীর্ঘকালব্যাপী সংযোগ ঘটিয়াছিল এবং প্রধানতঃ এই সংযোগের ফলেই হিন্দু সভ্যতা জন্মলাভ করিয়াছিল। আর্য্য-অনার্য্য সংযোগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক; শুধু একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ভারতবর্ষ বহির্জ্জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিলে এই সংযোগ ঘটিত না।

প্রাচীন পারসিক জাতি আর্য্যজাতিরই এক শাখা, সুতরাং ভারতীয় আর্য্যজাতির নিকট-কুটুম্ব। ভারতীয় আর্য্যগণ পারসিক আর্য্যগণের সহিত কুটুম্বিতা বজায় রাখিয়াছিলেন কিনা তাহা বলা কঠিন, কিন্তু কুটুম্বিতাই থাকুক বা শত্রুতাই থাকুক, ভাবের আদান-প্রদান একেবারে বন্ধ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সেকালে আফগানিস্থান আর্য্য ভারতের অংশরূপেই গণ্য হইত। আফগানিস্থান-বাসী আর্য্যেরা যে প্রতিবেশী পারসিকদের সংস্পর্শ বিষবৎ পরিহার করিতেন, এমন কোন প্রমাণ নাই।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে দিগ্বিজয়ী পারস্যসম্রাট্গণ সিন্ধু-বিধৌত প্রদেশ অধিকার করিলেন। আর্য্যজাতির ভারতে আগমনের পর বৈদেশিক আক্রমণের ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত। পঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশের কিয়দংশ আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকাল অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত পারসিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রীসের প্রথম ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বলিয়াছেন যে, পারস্য সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলির মধ্যে 'ভারতবর্ষ' হইতেই প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ সম্রাটের কোষাগারে প্রেরিত হইয়াছিল। পারস্য সম্রাট্ জারাক্সেস্ (Xerxes) খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এক বিরাট্ বাহিনী লইয়া গ্রীসে অভিযান করিয়াছিলেন; এই উপলক্ষেই ম্যারাথন, থার্ম্মপলী এবং স্যালামিসের ইতিহাস প্রসিদ্ধ যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হইয়াছিল। বহু ভারতীয় সৈনিক পারস্য-বাহিনীতে যোগদান করিয়া গ্রীসে যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের বীরত্বের কাহিনী আমাদের অজ্ঞাত; এমন কি, তাহাদের মধ্যে কেহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল কিনা তাহাও আমরা জানি না।

পারস্যের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী রাজনৈতিক সম্বন্ধের প্রভাব সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, মৌর্য্য-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ অনেকটা পারসিক শিল্পরীতির অনুসরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মৌর্য্য রাজসভায় নাকি কয়েকটি পারসিক প্রথাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই অনুমান সত্য হইলে ভারতবর্ষে পারস্য প্রভাবের গুরুত্বই সূচিত হয়, কারণ পারস্যের রাজনৈতিক অধিকার ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সীমাবদ্ধ থাকিলেও পারস্য-সভ্যতা এদেশের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী মৌর্য্যরাজধানীতে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিল। পারসিক রীতি অনুসরণ করিয়াই অশোক অনুশাসনসমূহে নিজের মতামত প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ভারতীয় রাজা অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করেন নাই। অশোকের শিলালিপিতে পারসিক ভাষা হইতে উৎপন্ন অথবা ঐ ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভবিষ্যতে কোন ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে সম্ভবতঃ বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আলেকজাণ্ডার গ্রীক-সভ্যতার সহিত ভারতীয় সভ্যতার যোগসূত্র স্থাপন করিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে আলেকজাণ্ডারের উল্লেখ নাই, কোন শিলালিপিতে গ্রীক-আক্রমণের ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না, তথাপি ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে এই ঘটনার গুরুত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আলেকজাণ্ডারের অন্যতম উত্তরাধিকারী সেলুকস মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগাস্থিনিস নামক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহা স্কুলপাঠ্য ইতিহাসেও পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের সহিত সেলুকসের বিবাহজাত আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছিল, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য।* চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার গ্রীস দেশ হইতে দার্শনিক (sophist) আনাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং মেগাস্থিনিসের ন্যায় অপর একজন গ্রীকদূত তাঁহার সভায় কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। অশোক পশ্চিম-এশিয়া, গ্রীস এবং মিশরের গ্রীকরাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। অশোকের মৃত্যুর পর সিরিয়ার গ্রীক রাজা অ্যান্টিওকাস উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ করেন। অতঃপর আফগানিস্থানে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে ব্যাক্ট্রিয়ার গ্রীকগণের অধিকার স্থাপিত হয়। গ্রীকরাজ মিনান্দার বা মিলিন্দ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেনের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। হেলিওডোরস নামক জনৈক গ্রীকদূত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মধ্যভারতের অন্তর্গত বেসনগরে প্রসিদ্ধ গরুড়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক সম্বন্ধের অন্তরালে গ্রীক ও হিন্দুর মধ্যে সংস্কৃতিগত আদান-প্রদানের যে সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ কৌতূহলী পাঠক গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের Hellenism in Ancient India নামক গ্রন্থে পাঠ করিতে পারেন।

মৌর্য্যোত্তর যুগে ভারতবর্ষ কেবল যে গ্রীসের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছিল তাহা নহে। পার্থিয়ানরাজ গণ্ডোফারনিস যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন তখন যীশুখৃষ্টের অন্যতম প্রধান শিষ্য সেণ্ট টমাস নাকি ভারতে আসিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের সময়ে পশ্চিম-এশিয়ার সহিত ভারতের যে পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেও তাহা বিচ্ছিন্ন হয় নাই। পার্থিয়ান রাজত্বের পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ক্রমান্বয়ে শক ও কুষাণ রাজত্ব স্থাপিত হইল। মধ্য-এশিয়ার এই সকল যাযাবর জাতি সভ্যতার কোন্ স্তরে উপনীত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই, ভারতীয় সভ্যতা তাহাদের নিকট কোন্ বিষয়ে কতখানি ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাও আমরা জানি না। তবে তাহারা যে এক দিকে চীন সাম্রাজ্য

---

* প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, সেলুকস-তনয়া হেলেনের সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহের যে চিত্র স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। গ্রীক-লেখকগণ বলিয়াছেন যে, দুই রাজ-পরিবারের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। কে বর, কে কন্যা, তাহা তাঁহারা বলেন নাই।

এবং অন্য দিকে রোমান সাম্রাজ্যের সহিত ভারতীয়দিগকে পরিচিত করিয়াছিল তাহাতে সংশয় নাই। কুষাণ-আমলেই মধ্য-এশিয়ায় ও চীন দেশে হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। মধ্য-এশিয়ার বালুকারাশির অন্তরাল হইতে স্যর অরেল ষ্টাইন বিস্মৃতপ্রায় যে সভ্যতার কঙ্কাল উদ্ধার করিয়াছেন তাহার জন্মের ইতিহাস কুষাণ-যুগের ইতিহাসের একটি শাখা মাত্র। কিন্তু সেকালে ভারতবর্ষ চীনে বাণী প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই, চীনের বাণী গ্রহণ করিবার মত উদারতাও ভারতের ছিল। চীনের সম্রাটগণের অনুকরণে কুষাণ-সম্রাটগণও 'দেবপুত্র' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতেও আমরা পাই 'দৈবপুত্রষাহিষাহানুষাহি'। কুষাণ-রাজগণ জাতিতে ইউচি, ধর্ম্মে ভারতীয় (হিন্দু বা বৌদ্ধ), রাজসভার আদবকায়দায় কতকটা চৈনিকভাবাপন্ন—তথাপি ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধেরা তাঁহাদের অনুরক্ত হইয়াছিল। রোমান প্রভাবের ফলে মথুরায় কুষাণগণের 'দেবকুল' স্থাপিত হইয়াছিল ভারতীয় প্রজাদের ভক্তি আকর্ষণের জন্য। কুষাণ-যুগেই মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভব হয়। কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিকের মতে বৈদেশিক প্রভাব ধর্ম্মজগতে এই বিপ্লবের অন্যতম কারণ।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতন এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ভব প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দুইটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই দুইটি ঘটনার মধ্যবর্ত্তী যুগে ভারতবর্ষে গ্রীক, পার্থিয়ান, শক, কুষাণ, চৈনিক ও রোমান প্রভাবের অপূর্ব্ব মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। ফলে ভারতীয় সভ্যতা কতখানি সমৃদ্ধ অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুরূহ, কিন্তু এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, সে যুগে ভারতের জীবনধারা এশিয়ার বৃহত্তর জীবনধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। গুপ্ত-সাম্রাজ্য ভারতকে বিদেশীর রাজনৈতিক প্রভুত্ব হইতে মুক্ত করিয়া জাতীয় জীবনে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। এই প্রেরণা মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে এলাহাবাদ-প্রশস্তির বলিষ্ঠ আত্মোপলব্ধিতে, কালিদাসের উদ্দাম অথচ ভাবগম্ভীর কাব্যে, অজন্তার প্রাণময় চিত্রে। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন যে বৈদেশিক ভাবধারার সহিত সংস্পর্শের ফলেই গুপ্ত-সভ্যতা স্ফুলিঙ্গরূপে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই মত বোধ হয় সম্পূর্ণ বিচারসহ নহে। কালিদাসের লোকোত্তর প্রতিভা বোধ হয় বাহিরের প্রেরণা না পাইলেও আত্মবিকাশে অক্ষম হইত না। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে বিক্রমাদিত্যের যুগেও বহির্জ্জগতের সহিত ভারতের যোগসূত্র ছিন্ন হয় নাই। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। আরও হয়ত এমন অনেকে আসিয়াছিলেন যাঁহাদের নাম ও কীর্ত্তি কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। ফাহিয়ানের বিবরণ যে সত্যান্বেষীর নিঃসঙ্গ যাত্রার কাহিনী মাত্র নহে তাহার প্রমাণ আছে।

গুপ্ত-যুগে ভারতের দৃষ্টি কিয়ৎপরিমাণে দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছিল। অশোক সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য স্বীয় পুত্র বা ভ্রাতা মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে ঐ দ্বীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কোন কোন ইংরেজ-লেখক এই প্রবাদের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। বাঙালী বীর বিজয় সিংহের সিংহল-বিজয় কাহিনী আরও অবিশ্বাস্য। মোটের উপর আমরা বলিতে পারি যে, সিংহলের সহিত ভারতের সম্বন্ধ স্থাপনের ইতিহাস এখনও অস্পষ্ট রহিয়াছে। ভারতের পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত ভারত-মহাসাগরে ভারতীয় নৌবাহিনী কবে প্রথম জয়যাত্রা করিয়াছিল, কবে ভারত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু গুপ্ত-যুগের ইতিহাসে দেখা যায়, সিংহলরাজ মেঘবর্ণ সমুদ্রগুপ্তের সহিত অনুগত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন। গুপ্ত-যুগের কোন কোন মুদ্রায় সমুদ্রের উপর আধিপত্য স্থাপনের ইঙ্গিত আছে। পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় প্রভাব বিস্তারের কাহিনী গুপ্ত-যুগের ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ।

আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হইল, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার রসপ্রস্রবণ ধীরে ধীরে শুষ্ক হইতে লাগিল। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমাদের লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই দুর্যোগ আংশিক-ভাবে বহির্জ্জগৎ হইতে আগত সংঘাতের ফল। সমুদ্রগুপ্ত এবং চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তিসৌধ ধ্বংস হইল মধ্য-এশিয়ার প্রবল ঝঞ্ঝাঘাতে। ক্ষুধিত হূণ জাতি গুপ্তসাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিল, হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ মঠ সমভাবে ধ্বংস করিল, 'হূণ-হরিণ-কেশরী' হিন্দু রাজগণ অসহায় ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। কিন্তু বহির্জ্জগৎ ভারতকে কেবল ধ্বংস করে নাই, বার বার ভারতের ক্ষীণ ও জীর্ণ ধমনীতে উত্তপ্ত নব রক্তস্রোত জোগাইয়াছে। বিজয়ী শক জাতির ন্যায় বিজয়ী হূণ জাতিও হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে স্থায়িভাবে বাস করিতে লাগিল, শকরাজ রুদ্রদামের মত হূণ বংশোদ্ভূত রাজপুতরাজ ভোজও হিন্দুশাস্ত্র ও সংস্কৃত সাহিত্যের পূজারী হইলেন।

পদ্মিনীর উপাখ্যান, প্রতাপসিংহের বীরত্বকাহিনী, রাজসিংহের রোমাঞ্চকর ইতিহাস, দুর্গাদাসের অদ্ভুত প্রভুভক্তি বাঙালীর চিত্তে রাজপুতের আসন বোধ হয় নিত্যকালের জন্যই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী টডের গ্রন্থে দেশপ্রেমের যে উন্মাদনার সন্ধান পাইয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর বিচিত্র অভিজ্ঞতাও তাহার প্রাণশক্তি ক্ষীণ করিতে পারে নাই। তাই পদ্মিনীর কাহিনী মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলে অথবা চঞ্চলকুমারীর প্রেম কবির কল্পনা বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলে অদ্যাপি শিক্ষিত বাঙালী শিহরিয়া উঠেন। এমনিই হয়—তিলে তিলে প্রবাহিত অন্তরের রস মনের অজ্ঞাতে দানা বাঁধিয়া যে বিগ্রহ গঠন করে, সমালোচনার খড়্গাঘাতে কেহ অকস্মাৎ তাহা চূর্ণ করিলে সহ্য হইবে কেন? কিন্তু ইতিহাস কালচক্রের ঘর্ঘরধ্বনির প্রতিধ্বনি মাত্র, মহাকালের রথচক্রের মতই নিষ্পেষিত মানব-হৃদয়ের শোণিতে রক্তিম তাহার গতি। তাই ঐতিহাসিক বলিবেন, রাজপুতের বীরত্ব-কাহিনী এক হিসাবে প্রাচীন ভারতীয় মহাজাতির অধঃপতনের প্রমাণ মাত্র। দুর্দ্ধর্ষ হূণ জাতি ভারতের রাজনৈতিক একতা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিল, তার পর ধীরে ধীরে ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি আত্মসাৎ করিয়া রাজদণ্ড পর্য্যন্ত হস্তগত করিল। যেন অকস্মাৎ প্রাচীন ভারতীয় রাজবংশসমূহ প্রাণহীন শবস্তূপে পরিণত হইল, সেই মহাশ্মশানে বৈদেশিকের প্রচণ্ড নৃত্য আরম্ভ হইল। কালক্রমে বৈদেশিক ভারতীয় রূপ ধারণ করিয়া ভারতীয় ধর্ম্মের এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিল। অর্থগৃধ্নু সভাকবি চন্দ্রবংশ ও সূর্য্য-বংশের সহিত বৈদেশিকের কাল্পনিক সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া তাঁহার সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্মান বৃদ্ধি করিলেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা বৈদেশিকের অস্বাভাবিক নেতৃত্বে আর বেশী দিন বাঁচিতে পারিল না। মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিয়া মরুবাসী রাজপুত বহুদিন নিজের স্বাধীনতা বাঁচাইয়া রাখিল, মুঘল হারেমে কন্যা পাঠাইয়াও শিবপূজা পরিত্যাগ করিল না—কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হারাইল। তখন ভারতের প্রয়োজন ছিল এমন নেতার যিনি মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের মত শরীরে ও মনে সম্পূর্ণ ভারতীয়, ভারতবর্ষ বিনা দ্বিধায় অসীম বিশ্বাসে যাঁহার হস্তে আপন ভাগ্যলক্ষ্মী সমর্পণ করিতে পারে। মধ্য-এশিয়ার যাযাবর রক্ত পৌরাণিক মন্ত্রে শুদ্ধীকৃত হইলেও এমন সম্পূর্ণ ভারতীয়ত্ব লাভ করিতে পারে নাই।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহাপণ্ডিত আল-বেরুনী সুলতান মামুদের সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিলেন। মুসলমান হইয়াও তিনি সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন এবং হিন্দুর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। তিনি হিন্দুদের কূপমণ্ডুকতার নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার সাক্ষ্যে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে হিন্দুরা পরস্ব গ্রহণ করিবার শক্তি হারাইয়াছিল। পরকে শিক্ষাদান এবং পরের নিকট শিক্ষাগ্রহণ জীবন্ত জাতির পক্ষে অপরিহার্য্য। হিন্দুদের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়াছিল বলিয়াই আলবেরুনীর যুগে তাহারা মিথ্যা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছিল। এই ক্ষীয়মান জীবনীশক্তির পরিচয় পাই শিল্প ও সাহিত্যের আকস্মিক অবনতিতে, শিলালিপিসমূহের মিথ্যা বাগাড়ম্বরে, ধর্ম্মের দুর্গতিতে। কালিদাস, বাণভট্ট ও ভবভূতির মত কবি নবম, দশম বা একাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সভ্যতার গাম্ভীর্য্য কাব্যে রূপায়িত করেন নাই। সভ্যতার সে গাম্ভীর্য্য আর ছিল না, কবির লেখনীও রাজদণ্ডের মত দিগ্বিজয়ের শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল। রাজপুত রাজ-গণের ধর্ম্মনিষ্ঠা মুসলমান আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিশাল কারুকার্য্যবহুল মন্দির নির্ম্মাণে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু কোথায় অশোকস্তম্ভের সেই অবাস্তব মসৃণতা, কোথায় অজন্তার সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবধারার বিচিত্র স্ফূর্ত্তি? সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে দিগ্বিজয়ের বর্ণনা মহাভারতের বলিষ্ঠ অথচ সংযত কাব্যময় শব্দলহরী স্মরণ করাইয়া দেয়, আর রাজপুত রাজগণের শিলা-লিপিতে পাই বহুকষ্টে-সঙ্কলিত ভাবহীন শব্দের একঘেয়ে ঝঙ্কার। ধর্ম্মজগতে পাই নিত্য নূতন দেবদেবীর উদ্ভব, তান্ত্রিকের বীভৎস সাধনা, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নিদারুণ বিকৃতি, হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে ধর্ম্মের নামে হানাহানি। বহির্জ্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন, কূর্ম্মবৎ আত্ম-সমাহিত ভারতবর্ষ মুসলমানের পদানত হইল।

মংপুতে তৃতীয় পর্ব

(ছিন্ন অংশ)

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

"……তেমন করে আমি সংসারে থাকি নি। যদিও বৃহৎ সংসারে বাস করেছি প্রিয়জনের অন্ত নেই আর আজ ত আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়ে তোমরা যারা পর তারাই আমার বেশী আপনার হয়ে উঠেছ। কিন্তু একথা ঠিক বন্ধুবান্ধব সংসার স্ত্রী পুত্র কোনো কিছুই কোনো দিন আমি আঁকড়ে ধরি নি। যাকে তোমরা ভালবাসা বল তেমন ক'রে কোনো কিছুই কোনো দিন ভালবাসি নি। সবই আমার ভাল লাগে, গ্রহণ করি সব, কিন্তু শিথিল মুষ্টিতে, আঁকড়ে ধরে নয়। ভিতরে একটা জায়গায় আমি নির্মম, তাই আজ যে জায়গায় এসেছি এখানে আসা আমার সম্ভব হয়েছে। তা যদি না হ'ত যদি জড়িয়ে পড়তুম আমার সব নষ্ট হয়ে যেত, ভেঙে পড়ে যেত ধূলোয়। কোনো বন্ধনই শিকল হয়ে আমায় বাঁধে নি—চিরদিন মনে মনে আমি উদাসী, ছোটবেলা,—ছোটবেলা কেন শিশুকাল থেকেই। যখন দুপুরবেলা একা একা ছাদে বসে থাকতুম, ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠত রোদ, পথ দিয়ে ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত তাদের উচ্চ সুর, আর মাঝে মাঝে উড়ে-যাওয়া চিলের ডাক আমার মনকে উধাও করে নিয়ে যেত। নির্জ্জন দুপুরে সেই চিলের ডাক - উ-উ-হুঁ—সে যেন সুদূরের ডাক। একা একা তেতলার ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতুম—সেই থেকেই সুরু হয়েছে। চির দিন আমি সংসারে শত সহস্র রকম কাজের মধ্যে রয়েছি কিন্তু আমার মন নৌকো যেমন তীরের বন্ধনের মধ্যে পথ ক'রে নিয়ে ভেসে যায় তেমনি ভেসে চলেছে। ঘাটের বন্ধন আমার জন্য নয়—যদি তা হ'ত, যদি সংসারের অসংখ্য ছোট বড় বন্ধনের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে জড়িয়ে পড়তুম তা হলে আমার সব নষ্ট হয়ে যেত,—না আমার ভাগ্য-দেবতা তা হ'তে দেবে না, আমার জীবন-দেবতা তা হ'তে দেবে না। তাই এক দিন লিখেছিলুম, আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী—এ একটা কবিত্বের কথামাত্র নয়। লোকে মনে করে এ কবির একটা মুড মাত্র কিন্তু তা ঠিক নয়, এ আমার জীবনের একটা গভীরতম সত্য যে আমি সুদূরের পিয়াসী।"……

"কেন বাজাও কাঁকন কন কন কন কত ছলভরে ওগো ঘরে ফিরে চল কনক কলসে জল ভরে, কেন বাজাও, কেন বাজাও কাঁকন, কন কন কন—কি মিনতি, আহা! কি বোকাই ছিলুম নৈলে আর এমন কথা লিখি! এখন হলে লিখতুম চল ত ভালই নৈলে তোমার 'কনক কলস' রেখে যাও বিশ্বভারতীর কাজে লাগবে। যাবে ত যাও না তুমি গেলে এমন বিশেষ কিছু ক্ষতি নেই কিন্তু তোমার ঐ কনক কলসটা বিশেষ দরকারী। সেই যে ক্ষণিকায় একটা কবিতা আছে না?" "ভাগ্যে যদি একটি কেহ নষ্টে যায় সান্ত্বনার্থে হয়ত পাব চারজনা!" "হ্যাগো বড় খাঁটি কবিতা!! ক্ষণিকার কবিতাগুলো কিন্তু লোকের তেমন নজরে পড়ে নি। এ বইটা আমার খুব প্রিয়। তখনকার যুগে এ কবিতাগুলো সম্পূর্ণ নূতন ছিল। আমাদের দেশের লোকের রসবোধের standard কি আশ্চর্য্যরকম নীচু ছিল ভাবতে পারবে না। এ সব কবিতা উপভোগ ক'রবার মত মনই তৈরি ছিল না তখন। চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে সাধু বুদ্ধি বহির্গতা আজকে আমি কোনোমতেই বলব নাকো সত্য কথা—এসব কবিতা তখনকার দিনে এমন সহজে উপভোগ্য হওয়া সম্ভব ছিল না গো—অনেক দিন লেগেছে মন তৈরি হতে। আমাদের সময়টা ছিল যেন শুচিবায়ুগ্রস্ত, সে এক রোগে-পাওয়া যুগ। এই যেমন তুমি অনায়াসে সেদিন ঐ গানটা করতে বললে "যামিনী না যেতে জাগালে না কেন"—আমিও গাইলুম, আমাদের সময়ে এ হত কি? কেউ গাইতেই পারত না এ গান এ যে ঘোরতর অশ্লীলতা!" "কেন এর মধ্যে অশ্লীলতা কি আছে?" "ওরে বাবা অশ্লীল নয়—? পাখী ডাকি বলে গেল বিভাবরী, বধূ চলে জলে লইয়া গাগরী" এ যে ঘোরতর দুর্নীতি! তুমি বিশ্বাস করবে 'কথা ও কাহিনী'র সেই যে ভিক্ষুর কবিতাটায় আছে না ভিখারিণী তার একমাত্র বাস ফেলে দিল—" "দীন নারী এক ভূতল শয়ন না ছিল তাহার অশন ভূষণ, সে আসি নমিল সাধুর চরণ কমলে। অরণ্য-আড়ালে রহি কোনোমতে একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে। বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে ভূতলে।" "হাঁ, এই কবিতাটা যখন

বেরুল তখন—মহাশয় আমাকে বললেন রবিবাবু এটা লেখা কি ঠিক হ'ল? ছেলেরা পড়বে আপনার কবিতা এর মধ্যে এ কথাটা, একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে, ঠিক হবে কি? এতটা অশ্লীল রচনা! কি আর বলব বল? অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলুম। কাদের জন্য লিখছি!—মহাশয় তিনি ত একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁকেও যদি বুঝিয়ে দিতে হয় ওখানে 'একমাত্র বাস কথা'র তাৎপর্য্য কি তাহলে আর এ লেখার বিড়ম্বনা কেন? যাক দিন কাল বদলেছে, বুদ্ধি সহজ সুস্থ হয়েছে লোকের। আজ যে এমন সহজে মনকে সাহিত্যের রসে আনন্দে সিক্ত করতে পারছ সেজন্য আমাকেও একটু ধন্যবাদ দিও কষ্টে আমারও কিছু পাওনা আছে।" ...

"আলুর কাছে মাসীর অশ্বারোহণ পর্ব্ব শুনছিলুম। আর একটু হলেই খদে পড়েছিল আর কি—তার পর তার জামাই তাকে অনেক তোশামোদ করে ঠাণ্ডা করেছে···আলুর যা বর্ণনা একেবারে রোমাঞ্চকর, শুনে কবিতার প্রেরণা আসছে।

তড়বড়ি ছুটে মাসী উঠে পড়ে ঘোড়াতে,
নেমে এসে তারপরে শুধু থাকে খোঁড়াতে
জামাতা বাবাজী তার ডাক্তার স্থান যে
সযতনে মাসীমার পা টিপিয়া দ্যান যে।"

মুখে মুখে একটা প্রকাণ্ড ছড়া বলে গেলেন আমার তা লিখে নেওয়া হয় নি, তাই সবটাই হারিয়ে গেছে। "কিন্তু তোমাদের এই পাহাড়ে ঘোড়া ঘোড়া নামের যোগ্য নয়। আরব ঘোড়ায় চড়েছ কখনো? সে হচ্ছে ঘোড়ার মত ঘোড়া। নতুন বৌঠান সেই ঘোড়ায় চ'ড়ে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে বেড়াতে যেতেন দাদার সঙ্গে। সে যে কী রকম অসমসাহসিকতা কল্পনা করতে পার? একে ত ঐ প্রকাণ্ড ঘোড়া, তার চেয়েও অনেক প্রকাণ্ড ব্যাপার সে যুগের ঘরের বৌ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে চলেছে। তিনি কিছু গ্রাহ্য করতেন না, এটা কম কাণ্ড নয়। ছিল তাঁর মধ্যে অনন্যসাধারণতা ছিল,—এই যে মাতৃবনা শরীরের অবস্থা কেমন? আমি এতক্ষণ অশ্বারোহণ পর্ব্ব বলে এক মহাকাব্য সুরু করেছিলাম। বাল্মীকির হৃদয়ের কেন্দ্র থেকে যেমন ছন্দ বেরিয়ে এসেছিল তেমনি আলুর মুখে তোমার ঘোড়ায় চড়ার বর্ণনা শুনতে শুনতে রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব উৎসারিত হয়েছিল, যেমন করে বয়ে আসে অমর-লোকের সুরধুনী, যেমন করে ছুটে আসে ঊর্মিমুখর সমুদ্র, যেমন করে প্রবাহিত হয়—" "কৈ কি কবিতা শুনব।" "সে কি এখনও আর মনে আছে? ঠিক inspiration-এর সময় এলে না কেন? তোমার ভাগ্নীকে জিজ্ঞাসা কর, সে সব লিখে নেয় এইটি ভুলে গেছে। কি আর করব বল আমার অমর সাহিত্যলোক থেকে খসে পড়ল একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, আমার কাব্য-জগতের—" মাসী রেগে গেল, "ওর কথা আর বলবেন না, ভীষণ হিংসুক, স্বার্থপর—আমার বিষয় কবিতা কিনা তাই দিব্যি ভুলে গেল নিজের হলে এতক্ষণ পাঠিয়ে দিত 'প্রবাসী'তে।" "দেখ মাসী, তুমি যে-সব বিশেষণ ব্যবহার করলে আমার মত ও কতকটা ওরই কাছ ঘেঁসে যাচ্ছে। তবে কি না ভয়ে বলি নে, কথাটি বলি নে। তোমার মত এত দুর্জ্জয় সাহস কোথায় পাব তা হলে ত তোমার সঙ্গেই ঘোড়ায় উঠে পড়তুম।"

"আচ্ছা লোকে যে বলে 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপ আপনি—কে লক্ষ্য করে লিখেছেন সে কথা সত্যি?" "বলে নাকি লোকে? কেন,—কি সন্দীপের মত ভাল দেখতে? বাবাঃ যখন সবুজ পত্রে 'ঘরে বাইরে' বেরুচ্ছে তখন সে কি বিদ্রোহ! এক ভদ্রমহিলা আমায় জানালেন যে এ একেবারে অসম্ভব, হতেই পারে না।" "কি হতেই পারে না?" "বাঙ্গালীর মেয়ের এ রকম চাঞ্চল্য হতেই পারে না! তা হলে যে সমস্ত দেশ বিশুদ্ধ সতীত্বের উচ্চলোক থেকে একেবারে হুদ করে পাতালে প'ড়ে যাবে। বঙ্গ ললনা আর হিন্দু ললনা, সব ললনাই যে সবার আগে ললনা মাত্র সে যে মানুষ, তার মধ্যে মোহ বিকার ভালমন্দ সব কিছুই থাকা সম্ভব তা এরা মানবে না। সতীর দেশ যে তাই সত্যের দেশ নয়। এখন কত স্বাভাবিক হয়েছে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী তাই ভাবি। যে যুগে আমরা সুরু করেছিলাম কাউকে কিছু বোঝান দায়! পায়রা কবির বকবকানি নগদ মূল্য এক টাকা! ·····এক সময়ে আমার সম্বন্ধে কত নিন্দের বিষ উদ্গারিত হয়েছিল তা তোমরা জান না,······ এ অহেতুক বিদ্বেষ কেন? একটা কথা শুনেছ বোধ হয় যে আমি একজন অত্যাচারী জমিদার? অথচ এত বড় মিথ্যে খুব কম আছে। আমার সঙ্গে আমার প্রজাদের সম্বন্ধ কোনো দিন স্নেহশূন্য ছিল না। প্রথম জমিদারির কাজে গিয়েই এক সঙ্গে এক লক্ষ টাকা মাপ করেছিলুম। সেটা সহজে হয় নি। লাল মিঞা আমার এক মুসলমান প্রজা, প্রকাণ্ড চেহারা, এক সময়ে ছিল ডাকাতের সর্দ্দার, সে আমায় কী ভালই বাসত, ভারি মজা লাগত তার গল্প শুনতে। এক একদিন পাশের জমিদারের প্রজাদের ধরে নিয়ে আসত। আমার সামনে এনে সারি সারি দাঁড় করিয়ে দিয়ে একগাল হেসে বলত, নিয়ে এলুম ওদের, আমাদের কর্ত্তাকে একবার দেখে

যাক্, এমন চাঁদমুখ তোরা দেখেছিস্? আমাদের ওখানে ত মুসলমান প্রজা কম ছিল না, কিন্তু একথা বলতেই হবে তাদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছি তাতে বিন্দুমাত্র অভিযোগের কারণ কখনো ঘটে নি। আজকাল এই ঘোর কমিউন্যাল বিদ্বেষের দিনে সে-সব কথা মনে পড়ে। যখন প্রথম গেলুম, দেখলুম বসবার বন্দোবস্ত অ'তি বিশ্রী। ফরাস পাতা রয়েছে উচ্চজাতের হিন্দুদের জন্য, ব্রাহ্মণদের জন্য, আর মুসলমানেরা ভদ্রলোক হ'লেও দাঁড়িয়ে থাকবে, নয় ত ফরাস তুলে বসবে। আমি বললুম সে কখনো হবে না। সবাই ফরাসে-বসবে। ঘোর আপত্তি উঠল, ব্রাহ্মণেরা তাহলে বসবে না। আমি বললুম বেশ তা হলে বসবে না কিন্তু এ ব্যবস্থা চলবে না, তাতে যাঁদের জাত যাবে তাঁরা না হয় নিজের শুচিতা নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আজ এই ঘোর রেষারেষির দিনে সে-সব কথা মনে পড়ে। আমাদের অপরাধও কম নয় তা মনে রেখো। মনে রাখতে চাও না তোমরা জানি, কিন্তু তারও প্রয়োজন আছে—সবার আগে নিজেকে জানা দরকার। আত্মানং বিদ্ধি। অক্ষম অপমান সহ্য করে যায় বাধ্য হয়ে, কিন্তু বেদনার ক্ষত ভিতরে ভিতরে মূল প্রসার ক'রে চলে, গভীর হয়ে ওঠে গহ্বর। তারপর একদিন যখন হঠাৎ ধ্বংস নামে তখন হায় হায় ক'রে লাভ নেই।...আর একটা ঘটনা আমার খুব মনে পড়ে একবার মাঠের মাঝখান দিয়ে পাল্কিতে চলেছি। প্রচণ্ড দুপুরের রোদ, চাষীরা ক্ষেতে কাজ করছে। পাল্কীতে ব'সে ব'সে বোধ হয় ক্ষণিকার কবিতা লিখছি। একটা লোক মাঠের মাঝখানে কাজ করছিল হঠাৎ হৈ হৈ ক'রে ছুটে এসে পাল্কী থামাল। বললে, দাঁড়া। আমি বললুম কী চাস্? দাঁড়াব কি আমার গাড়ীর সময় হয়ে যাবে—সে কী শোনে, বলে একটুখানি দাঁড়া না। রইলুম পাল্কী থামিয়ে। সে ক্ষেতের মধ্যে আলের পথ ধরে দৌড়ে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে একটা টাকা আমার পায়ের কাছে রাখলে—আমি বললুম এর কি দরকার ছিল। কেন শুধু শুধু এ জন্য আমায় দাঁড় করালি, আর তুই বা দৌড়লি। সে বললে তা দেব না, আমরা না দিলে তোরা খাবি কি? আমার ভারি মিষ্টি লাগল তার এমন সহজ ক'রে সত্যি কথা বলা। মনে আছে আজ পর্য্যন্ত তাই, আমরা না দিলে তোরা খাবি কি?

"আমাকে একটা কোন কাজ দিন।" "দেব, তোমার যেখানে কর্ম্মের ক্ষেত্র সে আমার পরিধি থেকে এত দূর—নইলে প্রচুর তোমাদের অবসর কষ্টকর অবসর। আমার কোন কাজে যদি লাগতে পারতে ভাল হত। আমার মৃত্যুর পরে যখন সুবিধে হবে এসো শান্তিনিকেতনে কোন কাজে নিযুক্ত হয়ো। আমাদের দেশের মেয়েরা তেমন ক'রে কাজে লাগতে জানেন না, আজকাল অধিকাংশ মেয়েরই সংসারের কাজে যথেষ্ট ফাঁক রয়েছে তাঁদের শিক্ষাও মোটামুটি হয় কিন্তু মন কি নিষ্ক্রিয়? দেশের অর্দ্ধেক শক্তি যদি এ রকম আবদ্ধ হয়ে না থাকত ভাল হত কত! অবশ্য একথাও বলতে পার তারা কর্ম্মের ক্ষেত্র পায় না। যে যার নিজের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। নিজের কর্ম্মক্ষেত্র নিজেই সৃষ্টি ক'রে আপনাকে বিকাশ ক'রে তোলা সহজ নয় এবং সম্ভবও নয় অধিকাংশ মানুষের পক্ষে। কিন্তু তাও বলি যেখানে সে সুবিধা আছে সেখানেও ত তাঁদের এগিয়ে আসতে দেখি নে? এই শান্তিনিকেতনে যত মেয়ে আছেন তার মধ্যে ক'জনই বা কাজে নেমেছেন! অথচ অত বড় কর্ম্মক্ষেত্র আমি ত এনে দিয়েছি তাঁদের সামনে! এতখানি সুযোগ, কাজ করবার সুযোগ পাওয়া কি কম কথা! তবে বৌমা এসেছেন আমার কাছে, তাঁর দুর্ব্বল অসুস্থ শরীর নিয়েও দূরে থাকেন নি, কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে সার্থক করছেন এ আমার খুব আনন্দের কথা। আর এটা তাঁর নিজের পক্ষেও কম লাভ নয়। জীবনের একটা বিস্তৃত পরিধি—কর্ম্মের একটা বৃহত্তর ক্ষেত্র নিজেকে নিজের কাছেও শ্রদ্ধনীয় করে তোলে, নইলে সারাদিন, দিনের পরে দিন কেবল হাঁ ভাই ও ভাই ক'রে সময় কাটানো তার গ্লানি কি মেয়েরা অনুভব করেন না?" আমি বলি তুমি এই মহাভারতটা নিয়ে পড়। ও এক সমুদ্র, ওর মধ্যে যে কত কি আছে তার অন্ত নেই, এক দিকে যেমন চিন্তা সুদূর প্রসারী গভীর, অন্য দিকে তেমনই অগাধ ছেলেমানুষী। ছেলেমানুষীর শেষ নেই, পাশাপাশি রয়েছে গীতা আর ঠাকুমার ঝুলি। এখন যেমন সত্য না হলে বা সম্ভবপর না হলে মানুষের মন খুসী হয় না তাই গল্পকেও সত্যের মুখোস পরতে হয়। তখনকার দিনে মানুষের মন এত খুঁত খুঁতে ছিল না। গল্প তা সে গল্পই। সেখানে সম্ভব অসম্ভব একাকার হয়ে গেছে, তা নইলে 'ভুজঙ্গমে'রাও দিব্যি শাস্ত্রালোচনা সুরু করে! এর মধ্যে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সম্পূর্ণ গল্পটা রূপক। এর একটা বলবার কথা আছে এবং সে কথা কৃষ্ণকে অবলম্বন ক'রে। কৃষ্ণই এর নায়ক। পঞ্চ পাণ্ডব গ্রহণ করেছিল কৃষ্ণাকে অর্থাৎ কৃষ্ণের cult কে। তা না হলে পঞ্চ ভ্রাতা এক কন্যাকে গ্রহণ করলে এ কখনও

সম্ভব! কৃষ্ণাকে যারা বরণ করলে কৃষ্ণের তারাই আশ্রিত। লড়াইটা জমির জন্য নয় লড়াই মতের। তা যদি না হত তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে এক শ গজ লম্বা গীতা আওড়ান কখনও সম্ভব হত না। আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে, মহাভারতের সব চেয়ে গভীর যে মর্ম্ম কথা যে উপদেশ সে মুনিঋষিদের বড় বড় কথার মধ্যে উপদেশের মধ্যে বা যুধিষ্ঠিরের আদর্শবাদিতার মধ্যে নেই, সে মহাপ্রস্থানে। এত বড় যুদ্ধ এত মারামারি হানাহানি সে লোভের জন্য নয়, স্বার্থের ঘৃণ্যতার মধ্যে তার সমাপ্তি নয়। ত্যাগের জন্যেই যে আকাঙ্ক্ষা, বর্জ্জনের জন্যই যে গ্রহণ, সেই নির্দ্দেশই এই মহাকাব্যের প্রধান কথা।" এই প্রসঙ্গে ১৩৪১ সালের ৭ই পৌষ উৎসবের অভিভাষণ থেকে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করছি। বর্ত্তমান কালের রক্তকলুষ হিংস্র যুদ্ধের পটভূমিকার উপর মহাভারতের যুদ্ধকে তিনি কি ভাবে দেখেছিলেন তা জানা যাবে। "পাশ্চাত্য অলঙ্কার মতে মহাকাব্য যুদ্ধমূলক। মহাভারতের আখ্যান-ভাগও অধিকাংশ যুদ্ধবর্ণনা দ্বারা অধিকৃত—কিন্তু যুদ্ধেই তার পরিণাম নয়। নষ্ট ঐশ্বর্য্যকে রক্ত সমুদ্র থেকে উদ্ধার ক'রে পাণ্ডবের হিংস্র উল্লাস চরমরূপে এতে বর্ণিত হয় নি। এতে দেখা যায় জিত সম্পদকে কুরুক্ষেত্রের চিতাভস্মের কাছ পরিত্যাগ করে বিজয়ী পাণ্ডব বিপুল বৈরাগ্যের পথে শান্তিলোকের অভিমুখে প্রয়াণ করলেন, এ কাব্যের এই চরম নির্দ্দেশ। এই নির্দ্দেশ সকল কালে সকল মানবের প্রতি, যে ভোগ একান্ত স্বার্থগত ত্যাগের দ্বারা তাকে ক্ষালন করতে হবে।" মনে পড়ে প্রত্যেক দিন রেডিওতে যুদ্ধের খবর শুনে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে মানুষের এই হিংস্রতার কলঙ্কে কি বেদনা তিনি পেতেন। সমস্ত জীবন ধরে সাধনা করেছেন মানুষকে মানুষের নিকটে আনতে—বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির আদর্শকে তিনি ভারতবর্ষের প্রাঙ্গণে এক করতে চেয়েছেন—নিত্য-উৎসারিত প্রেমের আনন্দের বাণী তিনি শুনিয়েছেন সমস্ত জগৎকে কিন্তু কোথায় প্রেম, কোথায় আনন্দ, কোথায় মানুষের মনুষ্যত্ব, সমস্ত জগৎ যখন এমন পাগল হ'য়ে বিকৃত বুদ্ধিতে একে আর একের গলা টিপে ধরল তখন দেখেছি তাঁর বেদনা। আমাদের কাছে দূর দেশের যুদ্ধ অনেকটা পরিমাণেই যুদ্ধের গল্প মাত্র ছিল কিন্তু সকল দেশ সকল মানুষ যাঁর আপন তাঁর কাছে আর্ত্ত মানবের দুঃখ প্রতিদিন অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে পৌঁছত। এত কষ্ট পেতেন যে ইচ্ছে করত না তাঁকে খবর শোনাই, কিন্তু উপায় ছিল না। তাই কি গভীর বেদনা নিয়েই লিখেছিলেন "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী"—আহ্বান করেছিলেন অনন্ত পুণ্যের আবির্ভাব।

"শান্ত হে মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য
করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য!"

শরতের শোক

শ্রীমহাদেব রায়, এম-এ

বরষে বরষে হেরি মনোরম রূপের মাধুরী তব,
নয়ন ভুলানো স্নিগ্ধ-শ্যামল অপরূপ অভিনব;
বরষ কাটিল সন্তান-শোকে আজিও বেদনা বুকে—
আসিয়াছ দেখি শোক-জর্জ্জর বিষাদ-মলিন মুখে।
প্রভাত-কমলে সন্ধ্যা-কুমুদে কোথা সে তোমার হাসি?
আগমনে আজ কোথা সেই তব ক্ষুধাহরা সুধারাশি?
আকাশ হয়েছে তেমনি সুনীল বাংলা-মায়ের বুকে,
জলহারা মেঘও ভাসিছে আকাশে, তবু তুমি ম্লানমুখে।
এ দিনে তোমার ধরে না হর্ষ—ঘরে ঘরে যার মেয়ে
অপরূপ বেশে মধু হাসি হেসে আসে আনন্দে ধেয়ে।
এসেছে দুলালী স্নেহ হর শেফালি, কমল, কুমুদ সবই
পরবে আদর করিবে তাদের নাই স্নেহময় কবি।
আলোক, শিশির, কুসুম, ধান্য—সকলি তো আছে মা'র
সোনার লাবণি পরশে যাহার, সে যে কোলে নাই আর।
বঙ্গে শরৎ এসেছে হারায়ে শরতের কবি রবি,
আগমনী গানে বিরহের সুর—"কোথা বঙ্গের কবি?"

শিল্পাচার্য্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীবাণী গুপ্তা

শিল্পী যদি লেখক হ'ন তবে তার তুলনা বুঝি কমই মেলে। প্রকৃত সাহিত্যিকের সবচেয়ে বড় গুণ নিপুণ ভাবে আঁকতে পারা—তুলিতে না হোক কালিতে। যে সাহিত্যিকের এই অঙ্কন-ক্ষমতা নেই তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি যে ব্যর্থ একথা বলা যেতে পারে। তাই যে-সাহিত্যে আমরা মানব-জীবনের বিচিত্র কাহিনীর উজ্জ্বল চিত্র দেখতে পাই নিঃসন্দেহে তার রচয়িতাকে শ্রেষ্ঠ লেখকের সম্মান দিয়ে থাকি। বড়দের সাহিত্যে একথা যতখানি প্রযোজ্য, শিশুসাহিত্যে তার চেয়ে একটুও কম নয় বরং একদিক দিয়ে সে কথা এখানে আরও বেশী প্রযোজ্য। শিশুমন যা ভালবাসে, গল্পে বা ছড়ার কাহিনীতে সে তারই ছবি দেখতে চায়। সে চায় গল্পের মধ্যে তার পরিচিতের সুন্দর ও সহজ সমাবেশ। সেই পরিচিত জগৎকে আপন বলে মেনে নিতে তার একটুও দ্বিধাবোধ হয় না। শিশুমনের হাসিকান্নার অপরূপ ছন্দটিকে শিশু-সাহিত্যে রূপ দিতে পারাই লেখকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ সেই শিশু-মনের মায়াপুরীর নিপুণ যাদুকর। তাঁর সোনার কাঠির স্পর্শে জেগে ওঠে শিশুর ঘুমন্ত মনগুলি। এক নিমেষেই তারা চিনে নিতে ভুল করে না ইনি তাদের মনের মানুষ। প্রায় পঞ্চাশ



বছর আগে তিনি ছোটদের জন্ম যে বইগুলি লিখেছিলেন ভাষার মিষ্টতা ও ভাবের মাধুর্য্যে এখনও তারা অম্লান রয়েছে এবং অনাগত ভবিষ্যতের জন্যও রইল তাদের অক্ষয় অবদান সঞ্চিত। ইজেলের পরে রঙের খেলায়, তুলির টানে তিনি বিশ্বকে মুগ্ধ করেছেন। প্রাচ্যের শিল্পমন্দিরে তিনি নূতন আল্পনায় শিল্পদেবীকে আরতি করেছেন, আর তারই সঙ্গে সঙ্গোপনে চলেছে শিশুমনের চিত্র আঁকা অপরূপ ভাষার ঝঙ্কারে। ঠাকুমার গল্পবলার সুপরিচিত মধুর ভঙ্গীটি তাঁর লেখার প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছে। যাদুকর বলে চলেছেন—এক নিবিড় অরণ্য ছিল, তাতে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল, তমাল, পাহাড় পর্ব্বত, আর ছিল—বলতে বলতে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন। শিশুমনের ঔৎসুক্য বেড়ে উঠলো—

আর কি ছিল? আর ছিল ছোট নদী মালিনী। (শকুন্তলা) সুন্দর চিত্র! আঁকা হয়ে রইল শিশুমনের পরতে পরতে। যে কঠিন শাসনের শিকলে আমাদের দেশের শৈশব-স্বাধীনতা রুদ্ধ, সেখানে খেলা নেই, হাসি নেই, আনন্দ নেই। তাদের সেই ভারাক্রান্ত সজল মনে আনন্দের জোয়ার এনে দিলেন শিল্পী। তাদের চোখের সামনে আঁকলেন তপোবনের অপরূপ সৌন্দর্য্য, বাকলপরা ঋষিকুমার। তাদের জীবনযাত্রার সুন্দর ছবি। মুগ্ধ শ্রোতা প্রশ্ন তোলে—তারা কি ক'রত? শিশু চায় নিজের মনের কল্পনার সঙ্গে গল্পের ছবি মিলিয়ে নিতে। শিশু-প্রেমিকের দরদী দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছে বার বার। তিনি তাদেরই পরিচিত জগতের ছবি এঁকেছেন বইয়ের পাতায় পাতায় সুনিপুণভাবে।

—কি তারা ক'রত? বনে বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো গাই ধলো গাই মাঠে চরাতে যেত। সবুজ মাঠ ছিল তাতে গাই বাছুর চ'রে বেড়াত। বনে ছায়া ছিল তাতে রাখাল ঋষিরা খেলে বেড়াত।

শিশু আবার প্রশ্ন করলে—কি দিয়ে তারা খেলত?—কেন? তাদের ঘর গড়বার বালি ছিল—ময়ূর গড়বার মাটি ছিল। বেণুবাঁশের বাঁশী ছিল। বটপাতার ভেলা ছিল।

ঔৎসুক্যে অধীর প্রশ্ন জাগে—আর—আর কি ছিল? শিশুর ব্যগ্রতার সঙ্গে সমান তালে উৎসাহভরে তিনি বললেন—আর ছিল মা গোতমীর মুখে দেবদানবের যুদ্ধ-কথা, তাত কণ্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।

শিশুর চোখের সামনে খুলে গেল অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার। তার সম্রাট্ সে নিজে। সাম্রাজ্য তার সীমাহীন। একটি মুহূর্ত্তের মধ্যে সে ছুটে চলে গেল সেই সব ঋষি- কুমারদের মাঝে যারা খুব ভোরবেলায় আমলকীর বনে আমলকী, হরিতকীর বনে হরিতকী আর ইংলীর বনে ইংলী কুড়াতে যায়।

বাংলা দেশের কোমলা কিশোরীদের জন্ম তিনি আঁকলেন তপোবালা শকুন্তলা আর তার দুই প্রিয়সখী অনুসূয়া, প্রিয়ম্বদা। তাদের কত কাজ—ঘরের কাজ, অতিথি-সেবার কাজ—সকালে সন্ধ্যায় গাছে জল দেবার কাজ, সহকারে মল্লিকালতার বিয়ে দেবার কাজ। এ ছাড়া আর কি কাজ ছিল?

—হরিণশিশুর মত এ বনে সে বনে খেলা করা, ভ্রমরের মত লতাবিতানে গুন গুন গল্প করা, নয়তো মরালীর মত মালিনীর হিমজলে গা ভাসানো। আর প্রতি দিন সন্ধ্যার আঁধারে বনপথে বনদেবীর মত তিন সখীতে ঘরে ফিরে আসা—এই কাজ।

বনবালাদের এই ছবি আমাদের পল্লীগ্রামের গৃহ চত্বরই স্মরণ করিয়ে দেয় না কি? কিশোরীর সারাদিনের এমন মনোরম কর্ম্মচিত্র সাহিত্যে খুব সুলভ নয়।

শিশুমুখের হাসি যে অমূল্য সম্পদ—তার হাসিতে যে সত্যই পান্না ঝরে, ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডারীর সেকথা অজানা নয়। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর 'ভুতপত্রীর দেশ'। বইখানি শিশুসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এক নিঃশ্বাসে শেষ না ক'রে উপায় নেই। ভুতপত্রীর লাঠি পাঠকের মনকে শেষ পর্য্যন্ত তাড়া ক'রে নিয়ে যায়। কোথা থেকে কি হচ্ছে জানার উপায় নেই। পাল্কীর কালো কিচ্‌কিন্দে বেহারাগুলো যে কেমন করে সব বোগদাদের নবাব খাল্লা খাঁ জাহান্দার সা বাদশা হারুণ-আল-রসিদ কিংবা তাঁর ভৃত্য মসুরে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে সে বিস্ময়ের অবকাশ নেই এখানে যা হয়ে যাচ্ছে তাই মেনে নিতে হবে। গল্পের ছোট্ট নায়ক অবু তাই মেনে নিচ্ছে, কাজেই অবুরমত হাজারে। ছোট ছোট পাঠকেরাও তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা গল্প শুনেই খুশী। তারা নির্ব্বিবাদে সিন্ধবাদের সঙ্গে হিন্দুস্থানের বোকা লোকগুলোকে ঠকিয়ে কাঁচের বাসনের বদলে অনেক হীরা-জহরৎ নিয়ে বাণিজ্য থেকে ফিরছে। আবার কালাপানির ডাঙ্গার দিকের কাফেরদের মন্দিরের চুম্বকটা যখন সেই হীরা-জহরতে বোঝাই সিন্ধুকটাকে টেনে নিয়ে তার মাথায় আটকে রাখলে তখন সিন্ধবাদের সঙ্গে তার দুঃখকে তারা সমান-ভাবে ভাগ করে নেয়। হারুণ-আল-রসিদের উড়োসতরঞ্চি উড়ে চলেছে। তাকিয়া

ঠেস দিয়ে বসে আছেন হারুণ আল-রসিদ। পায়ের নীচে ভেসে যাচ্ছে মক্কা—কাফ্রিস্থান—মিশরের নীলনদ—সিস্তান—ইস্পাহান — কাবুল — কান্দাহার—পেশোয়ার, অবশেষে দিল্লীর কুতুবমিনার। হিন্দুস্থানের পরিষ্কার চাঁদে দিল্লীর চাঁদনী চক আলো হয়ে গেছে। আর সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে হারুণ আল-রসিদের উড়ো সতরঞ্চিতে ভীড় করে উঠে বসেছে রাস্তার ছেলেমেয়ের দল। তাদের চোখের সামনে দেশবিদেশের অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটে উঠছে।



অবু পিসিবাড়ী যাচ্ছে। ভূত বেহারা চারটে তাকে রামচণ্ডীতলায় পৌঁছে দিতে চলেছে। তাদের গানের পরিচয় দিতে গিয়ে শিল্পী ও কবির যে চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে এখানে তা' উপভোগ্য। গানকে ছবিতে এঁকে অবনীন্দ্রনাথ ছোট বড় সবাইকে খুশী করে দিয়েছেন।

শকুন্তলার কাহিনীর মাঝে মাঝেও এমনি সরস হাস্য-কৌতুক সূর্য্যের কিরণে শিশিরের মত ঝলমল করে উঠেছে। রাজা দুষ্যন্ত প্রিয় সখা মাধব্যকে বললেন—"চল বন্ধু আজ মৃগয়ায় যাই।" তার পরেই সুরু হ'ল সহজ ব্যঙ্গ—তাতে তীব্রতা নেই, আছে শুধু অবিমিশ্র কৌতুক। মৃগয়ার নামে মাধব্যের যেন জ্বর এল। গরীব ব্রাহ্মণ রাজবাড়ীতে রাজার হালে থাকে। দুবেলা থাল থাল লুচি মণ্ডা, ভাঁড় ভাঁড় ক্ষীর দই দিয়ে মোটা পেট ঠাণ্ডা করে রাখে। মৃগয়ার নামে বেচারার মুখ এতটুকু হয়ে গেল। রাজভোগ না হ'লে তার চলে না, নরম বিছানা ছাড়া ঘুম হয় না। পাল্কী ছাড়া সে এক পা চলে না। তার কি সারাদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়ানো পোষায়। মনে সর্ব্বদা ভয়, ঐ ভালুক এলো, ঐ বুঝি বাঘে ধরলে। ভয়ে ভয়ে বেচারা আধখানা হয়ে গেল।

শুনতে শুনতে শিশুমনে হাসির জোয়ার এসে যায়। ভীতত্রস্ত, অলস, কর্ম্মভীরু, ভোজনবিলাসী ব্রাহ্মণের ছবিখানি তার চোখের সামনে বাস্তব রূপ ধারণ করে। এমন লোক তারা কত দেখেছে তাদের চারিদিকে। চিনতে একটুও তো ভুল হচ্ছে না।

শিশুমন হাসতে ভালবাসে। সামান্য জিনিষে তার মুখে হাসির আলো ফোটায়। কিন্তু ক্ষিরুলগবের ষষ্ঠীতলায় সারাদিনের উপবাসী ষষ্ঠী ঠাকরুণকে যখন কলাটা মুলোটা খুঁজে বেড়াতে দেখা যায়, তখন ছেলে বুড়ো সবার চোখের সামনেই যে চমৎকার দৃশ্যের অবতারণা হয় তাতে হাসির হাত হ'তে রেহাই পায় না কেউ। হাজার গম্ভীর মুখেও হাসির বিদ্যুৎ দেখা যায়।

কিন্তু শুধুই তো হাসির পান্নায় হবে না। শিশুর চোখের জলের মুক্তোও তো কম দামী নয়। যাদুকরের মায়াকাঠির পরশে তার চোখে এল জল। দুয়োরাণীর দুঃখের ভাগ সমান করে বেঁটে নিল তারা। ক্ষীরের পুতুল কতক্ষণে সত্যকারের রাজপুত্রে পরিণত হবে তারই জন্যে সে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে। ছলে ভুলে দুয়োরাণী খেলেন বিষ, ব্যথা ও হতাশায় শিশুচিত্ত ভরে উঠলো, ঝর ঝর করে মুক্তোধারা ঝরে পড়ল তাদের স্বচ্ছ চোখের জলে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে আঁকা হচ্ছে ছবি। একটির সাহায্যে ফুটে উঠেছে অপরটি।

শিশু-ভোলানো এই অপরূপ যাদুকরকে ঘিরে কলরব তুলেছে ছেলের পাল, মেয়ের দল। তারা কেউ কালো, কেউ সুন্দর, কেউ শ্যামলা, কারো পায়ে নূপুর, কারো কাঁকালে হেলে, কারো গলায় সোনার দানা। কেউ বাঁশী বাজাচ্ছে, কেউ ঝুমঝুমি ঝম্ ঝম্ করছে। কারো পায়ে লাল জুতুয়া, কারো মাথায় রাঙা টুপি, কারো গায়ে ফুলদার লক্ষ টাকার মলমলি। তারা কেউ দস্যি, কেউ লক্ষ্মী।

যে শিশুদের সঙ্গে ক্ষীরের পুতুলের গল্প করে তিনি তাদের শৈশবকে ভরে দিলেন কল্পনার ঐশ্বর্য্যে, রূপকথার সম্পদে, তাদেরই জন্যে আবার তিনি রচনা করলেন দেশ-প্রেমের জলন্ত ইতিহাস রাজপুতানার অমর কাহিনী। সরস সুন্দর ভাষায়—যে ভাষায় কিশোর-মনে ঝঙ্কার তোলে, দেশকে আপনার বলে ভালবাসতে শেখায়—সেই ভাষায় অবনীন্দ্রনাথ রাজকাহিনীতে মূর্ত্ত করে তুললেন অতীত ভারতের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। চিত্রে চিত্রে ভরে দিলেন কিশোরের মন। প্রতিটি ছত্রে লেখকের অন্তর-বাসী চিত্রকর কলমের সাহায্যে আঁকলেন অপরূপ ছবি, সে ছবি বীরত্বে উগ্র, সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল, মাধুর্য্যে মণ্ডিত, অশ্রুতে কোমল।

মহারাজা নাগাদিত্যের রাজহস্তী শুঁড় দুলিয়ে কান কাঁপিয়ে পাহাড়ের উপর ইদরপুরের দিকে ফিরে দাঁড়ায়, তার পিঠের উপর সোনার জরির বিছানা হীরের মত জ্বলে ওঠে, তার চারিদিকে ঘোড়ায় চড়া রাজপুতের দুশো বল্লম সকালের আলোয় ঝক্ ঝক্ করতে থাকে—

আর সেই আলোর দীপ্তিতে ঝলসে যায় কিশোর দর্শকের চোখ—বিচিত্র বর্ণচ্ছটায়; অপরূপ ভাবসম্পদে রস-গ্রাহীর মনকে মুগ্ধ করে তোলে।

রাজস্থানের সোনার কমল পদ্মিনীর সৌন্দর্য্য যুগ যুগ ধরে কবির মনে, শিল্পীর চোখে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে এসেছে। তারই যে চিত্র এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ সে অপরূপ চিত্র কেবলমাত্র শিল্পাচার্য্যের তুলিতেই সম্ভব।

পিয়ারী বেগমের নতুন বাঁদী নতুন করে সারঙ্গী বেঁধে নতুন সুরে গাইতে লাগলো—

—হিন্দুস্থানে এক ফুল ফুটেছিল—তার দোসর নেই, তার জুড়ি নেই, সে কি ফুল? সে কি ফুল? আহা সে যে পদ্মফুল, সে যে পদ্মফুল। চারিদিকে নীলজল, মাঝে সেই পদ্মফুল। দেবতারা সেই ফুলের দিকে চেয়েছিল, মানুষে সে ফুলের দিকে চেয়েছিল। চারিদিকে অপার সিন্ধু তরঙ্গভঙ্গে গর্জ্জন করেছিল। কার সাধ্য সে সমুদ্র পার হয়। কার সাধ্য সে রাজার বাগিচায় সে ফুল তোলে। সে রাজার ভয়ে দেবতারাও কম্পমান। কে সে ভাগ্যবান সিন্ধু হইল পার? কে সে গুণবান তুলিল সে ফুল? মেবারের রাজপুত বীরের সন্তান রাণা ভীমসিংহ—নির্ভয় সুন্দর।

পদ্মিনী-কাহিনীর অপর একখানি ভাষাচিত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে।

"সেই দিন গভীর রাত্রে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন শেষ করে রাণা ভীমসিংহ পদ্মিনীর কাছে এসে বললেন, 'পদ্মিনী! তুমি কি সমুদ্র দেখতে চাও? যেমন অনন্ত নীল সমুদ্রের ধারে তোমাদের রাজপ্রাসাদ ছিল তেমনি সমুদ্র।' পদ্মিনী বললেন—'তামাসা রাখো, তোমাদের এ মরুভূমির দেশে আবার সমুদ্র পেলে কোথা থেকে?' ভীমসিংহ পদ্মিনীর হাত ধরে কেল্লার ছাদে উঠলেন। আকাশ অন্ধকার। চন্দ্র নেই, তারা নেই। পদ্মিনী দেখলেন সেই অন্ধকার আকাশের নীচে আর একখানা কালো অন্ধকার কেল্লার সম্মুখ থেকে মরুভূমির ওপার পর্য্যন্ত জুড়ে রয়েছে। পদ্মিনী বলে উঠলেন, 'রাণা! এখানে সমুদ্র ছিল আমি তো জানি না, মাগো, সাদা সাদা ঢেউ উঠছে দেখ।' ভীমসিংহ হেসে বললেন "পদ্মিনী এ যে-সে সমুদ্র নয়। ও পাঠান বাদশার চতুরঙ্গ সৈন্যবল। ঐ দেখ তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত শিবিরশ্রেণী। জলের কল্লোলের মত ঐ শোন সৈন্যের কোলাহল। আজ আমার মনে হচ্ছে সেই নীল সমুদ্র যার বুকের মাঝ থেকে আমি একটি সোনার পদ্মফুলের মত তোমায় ছিঁড়ে এনেছি। সেই সমুদ্র যেন আজ এই চতুরঙ্গিনীর মূর্ত্তি ধরে তোমাকে আমার কাছ হতে কেড়ে নিতে এসেছে।'"

পড়তে পড়তে চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিশীথ অন্ধকারে অবলুপ্ত চিতোর-প্রাসাদের শীর্ষে ভীমসিংহ ও পদ্মিনী। পদ্মিনীর নীলপদ্মের মত সুন্দর দুটি চোখে

শিল্পীর নিপুণ টানে যে বিস্ময় ও আশঙ্কার ছবি পাশাপাশি ফুটে উঠেছে রাত্রির নিবিড় অন্ধকারও তা' ঢাকতে পারে নি। রেখার পর রেখায় আঁকা হয়ে যায় অপরূপ সেই ছবি—সৌন্দর্য্যে বিষাদে মণ্ডিত সেই দেবী প্রতিমা।

ধীরে ধীরে এই শিল্পীর গভীরতর পরিচয় ফুটে উঠেছে সাহিত্যের বুকে। কাহিনী, ছড়া আর ইতিহাসের ঘটনাকে অবলম্বন করে যে চিত্রাবলী তিনি এঁকেছিলেন, বিশ্ব প্রকৃতির রসভাণ্ডারের সৌন্দর্য্যপ্রকাশে তাঁর চিত্রাঙ্কনশক্তি পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছে। নিশীথ রাত্রের গাঢ় তমিস্রাকে উষার নিঃশব্দ আগমন।

দ্যুলোক-দুহিতা দীপ্তিমতী উষার এই আবির্ভাব রসজ্ঞের চিত্তে যুগ যুগ ধরে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঞ্চার করে এসেছে। বৈদিক উষাস্তোত্রগুলি তার নিদর্শন। সেই উষার আগমনীর যে বন্দনা অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে তা' তাঁর গভীরতম রসবোধেরই পরিচায়ক। ভাষার মাধুর্য্য, ভাবের গাম্ভীর্য্য মনকে অভিভূত করে। এমনই এক উষার শুভ পদার্পণক্ষণে কোণার্কের সূর্য্যমন্দির শিল্পাচার্য্যের চোখের সম্মুখে প্রতিভাত হয়েছে—



"নূতন দিন জন্ম লইতেছে, অনাবৃত আলোকে, নীরবতার মাঝখানে, আনন্দময়ী উষার অঙ্কে। বিশ্বব্যাপী প্রসব-বেদনার আঘাতে মেঘ ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। সমুদ্র আলোড়িত হইতেছে। বাতাস মুহুর্মুহু শিহরিতেছে। একাকী এই জন্মরহস্যের অভিমুখে চাহিয়া দেখিতেছি। একটিমাত্র রক্তবিন্দু! পূর্ব্বসন্ধ্যার অরুণিমার উপরে বিশ্বজগতের পূর্ব্বরাগের একটিমাত্র বুদ্বুদ, অখণ্ড অম্লান, অনন্তের পাত্রে টলটল করিতেছে। জ্যোতির রথ মহাদ্যুতি এই প্রাণবিন্দুটিকে বহিয়া আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে সপ্ত সিন্ধুর জলোর্ম্মি ভেদ করিয়া জাগরণের জ্যোতিষ্মান চক্রতলে সুষুপ্তিকে নিষ্পেষিত করিয়া। পূর্ব্ব আকাশে এই শোণিতবিন্দুর আভা লাগিয়াছে। সমুদ্রতরঙ্গ বহিয়া তাহারই প্রভা গড়াইয়া আসিতেছে। পাণ্ডুর তটভূমি দেখিতে দেখিতে রক্তচন্দনের প্রলেপে প্লাবিত হইয়া গেল। রক্তবৃষ্টিতে চন্দ্রভাগার তীর্থজল রাঙিয়া উঠিল। মৈত্রবনের শিখরে কোণার্ক মন্দিরের প্রত্যেক কোণ, প্রতি শিলাখণ্ড আতপ্ত রক্তের সঞ্জীবপ্রভা নিঃশেষে পান করিয়া অনঙ্গ দেবতার কেলিকদম্বের মত প্রকাশ পাইতে লাগিল।"

বহুদিন গত অতীতের দ্বাদশ শত শিল্পীর মানস শতদল এই কোণার্ক শিল্পীর চোখের সম্মুখে কেবলমাত্র পাষাণে নির্ম্মিত মন্দিররূপে প্রতিভাত হয় নি। 'অন্তরের গভীরতম অনুভূতির সাহায্যে তিনি সেই পাষাণপুরীর প্রত্যেক খণ্ড

পাষাণে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেছেন। একদা যে প্রাণের স্পর্শে কোণার্ক শিল্পী এই মন্দিরকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদে পরিণত করেছিলেন বহুশতবর্ষ পরে আর একজন সাধক শিল্পীর প্রাণে তারই স্পর্শ স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। কোণার্কের কিছুই তাঁর কাছে নীরব নয়—নিশ্চল নয়—অনুর্ব্বর নয়। "পাথর বাজিয়া চলিয়াছে মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বনে—পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান অশ্বের মত বেগে রথ টানিয়া। উর্ব্বর পাথর ফুটিয়া উঠিতেছে নিরন্তর পুষ্পিত কুঞ্জলতার মত।"

কোণার্ক ভারতের অতীত শিল্পের নিদর্শন। যেদিন শিল্পদেবীর বেদীর চারিপাশে প্রতি দিনই নূতন করে সজ্জিত হ'ত পূজাসম্ভার, শিল্পীরা আঁকতেন নূতন ক'রে আলপনার। তার পর বহু দিন চলে গেছে। দেবীর মন্দিরের সেই পূজারতিতে বিরতি ঘটেছে বার বার। প্রাণের পরশে সঞ্জীবিত সে বেদীর শ্রী ম্লান হয়ে এসেছে। কোণার্কের তপস্বী প্রাণ উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছে সেই দিনের যেদিন আবার জাগবে নূতন প্রাণশক্তি। গভীর নির্জ্জনতায় যুগান্তরের তপস্যা অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি দেখেছেন—মরুশয্যায় অর্দ্ধনিমগ্না পড়িয়া আছে সে—পাষাণী অহল্যার মত সুন্দরী, নীরব নিস্পন্দ, মণিদর্পণে নিশ্চল দৃষ্টি রাখিয়া দিগন্তজোড়া মেঘের ম্লান আলোয় যুগযুগান্তব্যাপী প্রতীক্ষার মত, শতসহস্রের গমনাগমনের এক প্রান্তে সুদুর্লভ একটি কণা পদরেণুর প্রত্যাশী।

'বাংলার ব্রত' বইখানি বাঙ্গালীর জাতীয় কৃষ্টির প্রতীক। মেয়েলি ব্রত ও পূজাপার্ব্বণ বাঙ্গালী জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিল এক দিন, এবং সেই উৎসবের ভিতর দিয়ে সে সুন্দরের উদ্দেশে অর্ঘ্য সাজিয়ে দিয়েছে নানা ভাবে। সেই পূজা উপচারের শ্রেষ্ঠ উপাদান ছিল তার শিল্পীমন। সুন্দরকে জীবন থেকে বাদ দেওয়ার যে উপায় নেই সে কথা সে গভীরভাবে অনুভব করতো আর তারই জন্য সংসারের প্রতিটি শুভ উৎসবে সুন্দরের আসন সাজিয়ে দিত তার অন্তরের ঐশ্বর্য্যের বিচিত্র আল্পনায়। সেদিন তাই বাঙ্গালীর জীবনযাত্রায় ছিল সহজ সৌন্দর্য্য।

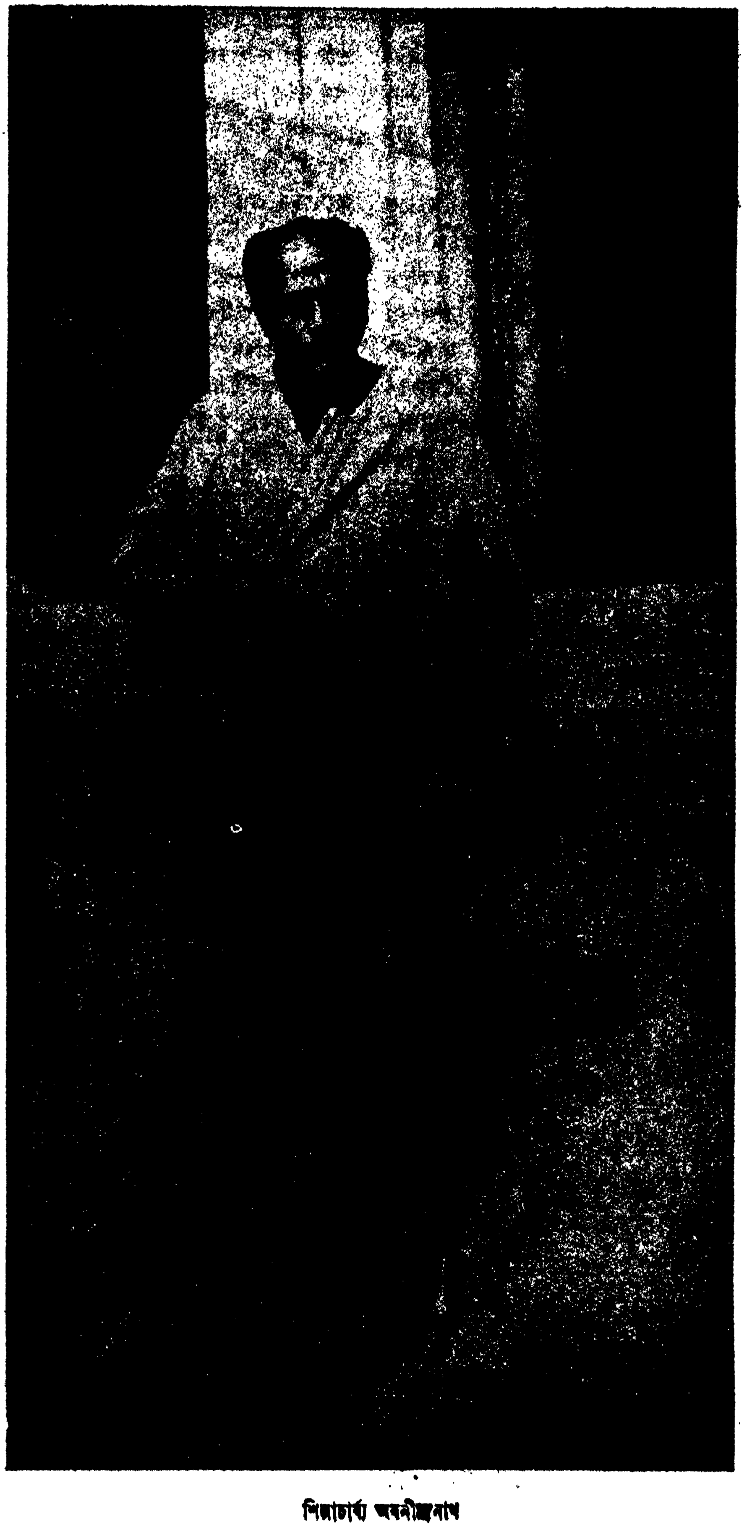
ধীরে ধীরে জাতির জীবন থেকে সে সৌন্দর্য্য-বোধ হারিয়ে গেছে। মেয়েলি ব্রত বা আল্পনার কোনও অর্থ নেই তার কাছে। জাতির গভীর অজ্ঞতার অন্ধকারে তারা আত্মলোপ করেছে। এমনি সময়ে অবনীন্দ্রনাথ তাদের পুনরুদ্ধারে আত্মনিয়োগ ক'রে যে দুঃসাধ্য ব্রত সম্পাদন করেছেন তাতে শিল্পদেবীর মুখের প্রসন্ন হাসি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—বাংলার লোকশিল্প ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পেয়েছে। এ কাজে 'কাঁচা' ও 'কচি' আঙুলের রেখাকে তিনি উপেক্ষা করেন নি—বরং সেই 'কাঁপা' ও 'বাঁকা' রেখাকেই প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন "হাতের লেখা চিঠিখানি আর ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র দু'য়ে যতটা প্রভেদ, ধ'রে চিত্র করা আর নির্ভয়ে আনন্দের সঙ্গে আল্পনা দিয়ে যাওয়ায় ততখানি ভিন্নতা।" 'বাংলার ব্রত' বইখানির জন্য সমগ্র বঙ্গনারীসমাজ শিল্পাচার্য্যের কাছে কৃতজ্ঞ।

অবনীন্দ্রনাথ সুন্দরের পূজারী। সুন্দরকে তিনি যে কি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন, সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত তাঁর "শিল্প প্রবন্ধাবলী" থেকে সে কথা বুঝতে পারা যায়। বিশ্বজোড়া যে সুন্দরের আরতি চলেছে, নিজের মনকে তারই উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

"সেখানে Individualityকে universality দিয়ে ভাঙ্গতে হ'বে। ধারা ভেঙ্গে নদী যদি চলে শতমুখী ছোট ছোট তরঙ্গের লীলা-খেলা, শোভা সৌন্দর্য্য নিয়ে তবে সে বড় নদী হয়ে উঠতে পারে না। এই জন্যে শিল্পে পূর্ব্বতন ধারার সঙ্গে নতুন ধারাকে মিলিয়ে নতুন নতুন সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মুখে অগ্রসর হ'তে হয় আর্টের জগতে। ... ... সৌন্দর্য্য-লোকের সিংহদ্বারের ভিতর দিকে চাবী। নিজের ভিতর দিক থেকে সিংহদ্বার খুললো তো বাইরের সৌন্দর্য্য এসে পৌঁছল মন্দিরে, এবং ভিতরের খবর বয়ে চললো বাইরে অবাধ স্রোতে—সুন্দর অসুন্দরকে বোঝবার উৎকৃষ্ট উপায় প্রত্যেককে নিজে খুঁজে নিতে হয়।"

প্রাচ্যশিল্পের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করা—একটি অলৌকিক রহস্যকে পরিস্ফুট করা, যে রহস্য বা সৌন্দর্য্য প্রকৃতির একান্তই নিজস্ব—যাকে খুঁজে পেতে হ'লে সত্যকারের শিল্পীমনের প্রয়োজন। অবনীন্দ্রনাথ সেই সুদুর্লভ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। তাঁর চিত্রাবলী সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে একটি বিশিষ্ট পদ্ধতিতে অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর অসংখ্য চিত্রের মাঝ হ'তে মাত্র দুইখানি চিত্রের পরিচয় এখানে দেওয়া হচ্ছে।

'শাহজাহানের শেষ শয্যা' চিত্রখানি একটি অলৌকিক সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। ভাবসম্পদে মূক চিত্র মুখর হয়ে উঠেছে। চিত্রখানির প্রতি রেখায় জীবনসংগ্রামে পর্য্যুদস্ত সম্রাটের কাহিনী লিপিবদ্ধ। শিল্পী অন্তরের যে গভীরতম রসের উৎস সৃষ্টি করেছিল বিশ্বের বিস্ময় 'তাজমহল'—পৃথিবী হ'তে চিরবিদায়ের মুহূর্ত্তেও তার সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা,



শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ

তার নিবিড় রসোপলব্ধি বিন্দুমাত্রও ব্যাহত হয় নি—চিত্রখানি দেখলে এই কথাই মনে হয়। ঐতিহাসিক ঘটনাকে এমনি করে মাধুর্য্যময় করে তিনি তাকে সাহিত্যের আসরে স্থান দিয়েছেন।

তাঁর "শেষ বোঝাটি" চিত্রখানিও সুধীজন সমাজে সমাদরের সঙ্গে আদৃত হয়েছে। পড়ন্ত বেলার আলো-ছায়ার মাঝে যে আলেখ্যটি তাঁর চোখে সহসা একদিন প্রতিভাত হয়েছিল এই ছবিখানি তারই জীবন্ত প্রকাশ। চিত্রখানির মধ্যে মানবজীবনের যে অপরূপ দার্শনিক সত্যকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, তার তুলনা কোথাও মেলে না। চিত্রের বর্ণসুষমায় ফুটে উঠেছে গোধূলিলগ্ন—যে লগ্নে সমস্ত জীবনের যাত্রাবসানে মানুষ এসে পৌছয় তার পথের শেষ প্রান্তে—পিছনে পড়ে থাকে তার জীবনের বোঝা—সমস্ত জীবন ধরে যাকে সে বহন করে এসেছে। অবশেষে সমাপ্তি আসে মুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে তার জীবনকে বিরাট্ বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেবে বলে।

এমনি করে রেখার সাহায্যে, বর্ণসুষমায় জীবনের অকথিত বাণীকে তিনি মুক্তি দিয়েছেন চিত্রের মধ্যে, প্রাণের গভীর অব্যক্ত বেদনাকে রূপ দিয়েছেন তাঁর তুলিতে। মানুষের হাসিকান্নার চিত্র নিয়ে যে সাহিত্যের সৃষ্টি, হাসি-কান্নায়-গড়া এই ছবিগুলি কি তাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়?

এই ভাবে দুই বিরাট্ প্রতিভার সমন্বয় হয়েছে প্রতিভার বরপুত্র অবনীন্দ্রনাথে। সাহিত্যের মন্দিরে তিনি দান করেছেন অনেক—সময়ের দীর্ঘতা তাকে ম্লান করতে পারে না। আবার অনাদৃত উপেক্ষিত ভারতীয় শিল্পে নূতন ক'রে প্রাণসঞ্চারও তিনিই করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে, সেকথা তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। নূতন রূপ ও ভাবের সাহায্যে তাঁরই চিত্র আবার বহুশত বর্ষ পরে বিশ্বের দরবারে ভারতীয় চিত্রের সমাদর সম্ভব করেছে।

যুগান্তনিদ্রিত এই চিত্রকলার চৈতন্য সম্পাদনে কি বিরাট তপস্যার প্রয়োজন হয়েছিল, সে কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। বর্ত্তমান ভারত তাঁর সৃষ্টিতে খুঁজে পেয়েছে নিজেকে। অনাগত ভবিষ্যতের পথের সন্ধানও রয়েছে তাঁর অবদানে। অতীত ভারতের সঙ্গে আগামীকালের ভারতের যে অপরূপ মিলন-সেতু সৃষ্টি করেছেন শিল্পাচার্য্য, আজকের দিনে আমাদের কাছে তা' পরম বিস্ময়। বিপুল শ্রদ্ধায় অভিভূত মন বার বার এই বিরাট্ কর্ম্মযোগীর উদ্দেশে নমস্কার জানাতে চায়।

লক্ষ্যবেধী জীবজন্তু

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

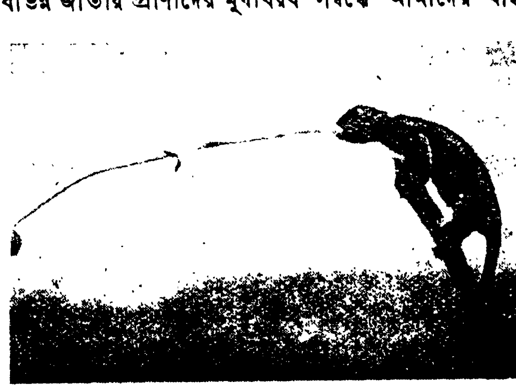
পৌনঃপুনিক অভ্যাসের ফলে মানুষ লক্ষ্যভেদে অপূর্ব্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকে। তা' ছাড়া বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত যান্ত্রিক কৌশলও এ কাজে তাহাদের সহায়তা করে প্রচুর। কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণীরা বুদ্ধিবলে মানুষের সমকক্ষ নহে;



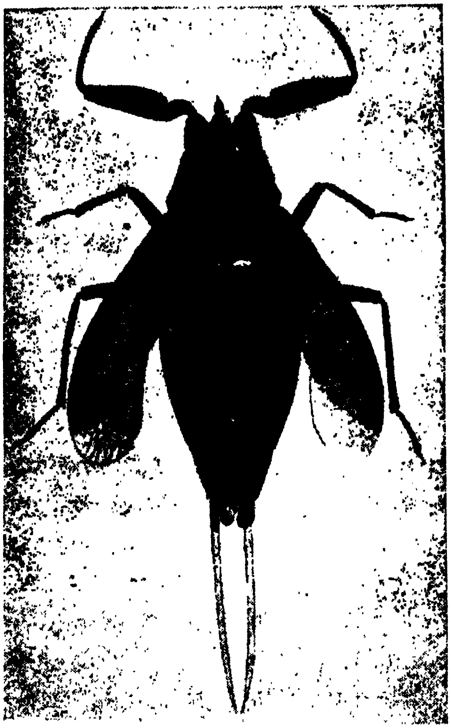
লামা থুথু নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিয়াছে

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা সংস্কারবশে পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি তাহাদিগকে যেরূপ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়াছে তাহার সাহায্যেই তাহারা জীবিকার্জ্জন অথবা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লয়, তাহাদের এই সংস্কারমূলক কার্য্য-প্রণালীর মধ্যেও সময় সময় এমন কতকগুলি ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায় যাহা স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষকেও তাক্ লাগাইয়া দেয়। এমন কি, ইহাদের সংস্কারমূলক কার্য্য-প্রণালী হইতে প্রেরণা পাইয়া অনেক ক্ষেত্রে মানুষ যে অভিনব কৌশল উদ্ভাবনেও সমর্থ হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তা ছাড়া, যে সকল কাজ স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের পক্ষেই করা সম্ভব অথবা সংস্কারাবদ্ধ জীবের মধ্যে সচরাচর যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, মনুষ্যেতর প্রাণীদের দ্বারা এরূপ কিছু ঘটিতে দেখিলে কৌতূহল উদ্রিক্ত হওয়া স্বাভাবিক। লক্ষ্যভেদ-সম্পর্কিত ব্যাপারে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এরূপ অনেক কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

মাংসাশী প্রাণীদের অনেকেই জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত বিবিধ শিকার-কৌশল আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। আণুবীক্ষণিক প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া কীট-পতঙ্গ, পশুপক্ষীর শিকার ধরিবার অদ্ভুত কৌশল ও লক্ষ্যভেদের নিপুণতা দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। রটিফেরা, ষ্টেণ্টর, ভর্টিসেলা ও বিবিধ শ্রেণীর ইনফিউসোরিয়া প্রভৃতি কীটাণু সাধারণ দৃষ্টিতে আমাদের পক্ষে অদৃশ্য। মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে এক শত হইতে দেড় শতগুণ বড় করিয়া দেখিলে ইহাদিগকে পরিষ্কাররূপে দৃষ্টিগোচর হয়। এই আণুবীক্ষণিক কীটাণুরা তাহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় প্রাণীদিগকে উদরস্থ করিয়া জীবনধারণ করে। কিন্তু এই আহার্য্য-প্রাণীরা তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতগতি-সম্পন্ন এবং সঞ্চরণশীল। কাজেই শিকার ধরিবার জন্য কীটাণুরা অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাদের মুখের চতুর্দ্দিকে 'সিলিয়া' নামে অতি সূক্ষ্ম শোঁয়ার মত কতকগুলি পদার্থ সজ্জিত থাকে। পরিদৃশ্যমান জগতে বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদের মুখাবয়ব সম্বন্ধে আমাদের যাহা



বহুরূপী জিবটাকে পোকার গায়ে ঠেকাইয়াছে



জল-বিছু

ধারণা আছে—এই অদৃশ্য কীটাণুদের মুখাবয়ব কিন্তু তাহাদের কোনটার মতই নহে। উদরগহ্বর না বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে মুখগহ্বর কথাটারই প্রাধান্য দেওয়া উচিত, এই মুখগহ্বরের চতুর্দ্দিকস্থ 'সিলিয়া'গুলিকে পর পর অতি দ্রুতগতিতে এক দিকে আন্দোলিত করিয়া জলের মধ্যে ঘূর্ণীর মত স্রোত উৎপন্ন করে। ঘূর্ণীর টানে আহার্য্য-জীবাণুগুলি তাহাদের মুখগহ্বরে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়। অবশ্য ইহাতে লক্ষ্যভেদের কৃতিত্ব না থাকিলেও শিকার-কৌশলের অভিনবত্ব আছে—এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু আমাদের দেশীয় জল-কাটি, জল-বিছু, গাছ-কাটী, গঙ্গা-ফড়িং প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় কীট-পতঙ্গেরা যেমন শিকার-প্রণালীতে, তেমনই লক্ষ্যভেদে অপূর্ব্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকেরই গতি অতি মন্থর; কিন্তু যে সকল পোকা-মাকড় শিকার করিয়া ইহারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে তাহারা অনেকেই চঞ্চল এবং দ্রুতগতি-সম্পন্ন। কাজেই শিকার ধরিবার আশায় ইহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মৃতের মত নিস্পন্দভাবে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। শিকার কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইলেই তাহাকে সাঁড়াশীর চাপে অথবা শূলবিদ্ধ করিয়া আয়ত্ত করে। পরীক্ষাগারে ইহাদিগকে প্রতিপালন করিবার সময় একবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে দেখি নাই। ইহারা একে ক্ষুদ্রকায় তার উপর অনুকরণপটু—আশপাশের লতা-পাতার সহিত বেমালুম মিশিয়া গিয়া দৃষ্টিবিভ্রম উৎপন্ন করে। কাজেই ইহাদের শিকার-কৌশল সাধারণতঃ অতি অল্প লোকেরই নজরে পড়িয়া থাকে। ধৈর্য্যসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাদের অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা দেখিয়া প্রত্যেকেই বিস্মিত হইবেন।

ফড়িং অপর ফড়িংকে ধরিয়া খায়, ইহাতে তাহাদের স্বজাতি, বিজাতির বিচার নাই। সবল, দুর্ব্বলের বিচার আছে বটে; কিন্তু তাহা প্রাণের দায়েই করিয়া থাকে। শিকার ধরিবার আশায় একস্থানে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে, চোখে দেখিয়াও কিছু বুঝিবার উপায় নাই—মনে হয় যেন নির্ব্বিকার—উদার দৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে নজর রহিয়াছে আশপাশের উড়ন্ত ফড়িংগুলির দিকে। এক বার পাল্লার মধ্যে আসিলেই হইল। চোখের পলক ফেলিতে-না-ফেলিতেই উড়ন্ত ফড়িংটাকে ঘাড় কামড়াইয়া ধরিয়া লইয়া আসে। দশ-বারো হাত দূর হইতে এই যে বুলেটের মত ছুটিয়া গিয়া উড়ন্ত শিকারের উপর পড়ে ইহাতে কদাচিৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে দেখিয়াছি। আমাদের দেশীয় কোন কোন কুমোরে-পোকাও এই ভাবে উইচিংড়ি বা মাকড়সার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে।

রাম-ফড়িং এবং গোয়ালে ফড়িঙের বাচ্চাদের শিকার-প্রণালী আরও অদ্ভুত। ফড়িং আকাশে বিচরণ করিলেও ইহাদের বাচ্চারা থাকে জলের নীচে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছ ও অন্যান্য জলজ পোকামাকড় ধরিয়া খায়। কোন দূরতর স্থানে শিকারের উপযুক্ত প্রাণী দেখিতে পাইলে ইহারা



রাম-ফড়িং

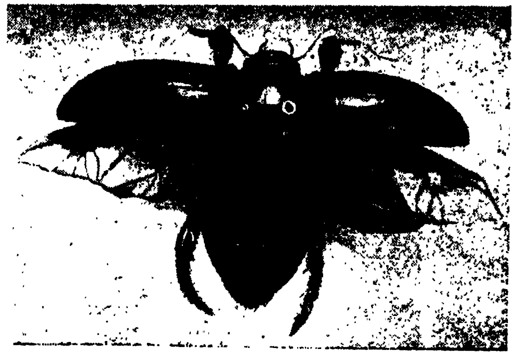
শরীরের পশ্চাদ্দেশ হইতে পিচকিরির মত জোরে জল ছুড়িয়া দেয়। এই জলের চাপে বাচ্চাটা যেন যন্ত্রনিক্ষিপ্ত পদার্থের মত দ্রুতবেগে অথচ নিঃশব্দে শিকারের নিকটবর্ত্তী হয় এবং নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। মুখ হইতে প্রলম্বিত কনুইয়ের মত দো-ভাঁজ-করা একটা অদ্ভুত যন্ত্র ইহাদের বুকের উপর লেপ্‌টিয়া থাকে। সুযোগ বুঝিবামাত্রই ঐ অদ্ভুত যন্ত্রটাকে সহসা হাতার মত প্রসারিত করিয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে শিকারটাকে ধরিয়া ফেলে।

কোলা-ব্যাঙের বাচ্চা বা বেঙাচি সাধারণ কালো রঙের বেঙাচি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। সাধারণ কালো রঙের বেঙাচিগুলিকে প্রায়ই জলের উপরিভাগে সাঁতার কাটিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। কোলা-ব্যাঙের বেঙাচি-



কাঠ-কই-এর শিকার ধরিবার কৌশল

গুলি থাকে জলের তলায়। মশার বাচ্চা ইহাদের উপাদেয় খাদ্য। বাতাস গ্রহণ করিবার জন্য মশার বাচ্চাগুলি কিছুক্ষণ পরে পরেই জলের উপরিভাগে উঠিয়া আসে। অনেক উঁচুতে উড়িতে উড়িতে কোন মৃতদেহ দেখিতে পাইলেই শকুনিরা যেমন ডানা গুটাইয়া ভারী প্রস্তরখণ্ডের মত তীরবেগে নিম্নে অবতরণ করে, এই বেঙাচিরাও তেমন মশার বাচ্চাকে কিলবিল করিয়া জলের



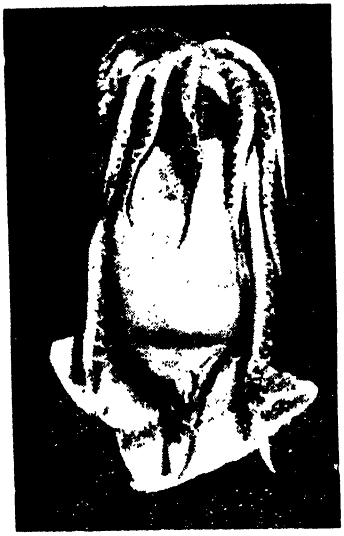
লক্ষ্যবেধী জল-পোকা

উপরে উঠিতে দেখিলেই জ্যামুক্ত তীরের মত ছুটিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে উদরস্থ করিয়া ফেলে। দুই-তিন ফুট খাড়াই প্রশস্ত কাচপাত্রে বেঙাচি রাখিয়া তাহাতে মশার বাচ্চা ছাড়িয়া দিলেই যে-কেহ এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পারেন। বারংবার পরীক্ষার ফলে একবারও ইহাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে দেখি নাই। অপরিণতবয়স্ক একটা বাচ্চার পক্ষে এরূপ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ সত্য সত্যই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার।

বিড়াল জাতীয় জানোয়ারেরা যেভাবে অব্যর্থ-লক্ষ্যে দূর হইতে শিকারের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে, কোন কোন মাছের শিকার-প্রণালীও তদনুরূপ। বোয়াল মাছের শিকার প্রণালী যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন—তাঁহারাই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। বাঁশপাতি নামক এক প্রকার চেপ্টা ভাসমান মাছকে আমাদের দেশের দীঘি, পুষ্করিণীতে দলবদ্ধভাবে বিচরণ করিতে দেখা যায়। ইহাদের স্বভাব অতিশয় চঞ্চল। সর্ব্বদাই যেন ছুটাছুটি খেলায় মত্ত। দেড়-ফুট, দুই-ফুট উপর দিয়া কোন কীট-



বহুরূপী শিকারের দিকে জিব বাড়াইতেছে


কাট্‌ল্‌ মাছ

পতঙ্গ উড়িয়া যাইতে দেখিলেই জল হইতে লাফাইয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে তাহাকে ধরিয়া উদরস্থ করে। জলের উপর ডানাওয়ালা পিঁপড়ে, উইপোকা, মশা মাছি ছাড়িয়া দেখিয়াছি—শিকার ধরিবার আশায় ইহাদের ভীড় জমিয়া যায় এবং খই ফোটার মত জলের উপর ছিটকাইয়া উঠিতে থাকে।

কই মাছেরও লক্ষ্যভেদের এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা দেখা যায়। কই মাছ আধপাকা ধান খাইতে খুবই ভালবাসে। বর্ষাকালে ধান পাকিবার সময় ফসলের ভারে ছড়াগুলি নুইয়া জলের কাছাকাছি আসিয়া পড়ে। কই মাছের তখন মহোৎসব লাগিয়া যায়। তাহারা জল হইতে লাফাইয়া উঠিয়া ছড়া হইতে ধান উদরস্থ করে। ধান গাছের উপর কীট-পতঙ্গ বসিতে দেখিলেও অব্যর্থ-লক্ষ্যে তাহাদিগকে ধরিয়া গলাধঃকরণ করে।

কিন্তু তীরন্দাজ মাছের লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। আমাদের দেশের সমুদ্রসন্নিহিত নদ-নদীতে এই মাছগুলিকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে কলিকাতার বাজারে বিক্রয়ার্থ এই মাছ প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়। এ দেশে এই মাছগুলি কাঠ-কই নামে পরিচিত। অগভীর জলে বিচরণ করিবার সময় জলের ধারে অবস্থিত ছোট ছোট গাছপালার উপর কোন পোকামাকড় দেখিতে পাইলেই ইহারা লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য পাখনার সাহায্যে কতকটা খাড়াভাবে অবস্থান করে এবং মুখখানাকে জলের উপর উঠাইয়া ঠিক পিচকিরির মত খানিকটা জল শিকারের দিকে ছুড়িয়া মারে। লক্ষ্য ইহাদের এমনই অব্যর্থ যে, পোকাটা সম্পূর্ণ সিক্ত অবস্থায় জলে পড়িয়া যায়। তখন অনায়াসেই শিকারটাকে ধরিয়া উদরস্থ করিয়া ফেলে।

মাকড়সারা সাধারণতঃ জালের সাহায্যে শিকার ধরে। কিন্তু কয়েক জাতীয় মাকড়সা দেখা যায় যাহারা শিকার ধরিবার নিমিত্ত জাল তৈয়ারী করে না। ইহারাও লক্ষ্যভেদ করিতে অপূর্ব্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকে। আমাদের দেশে ঘরের দেওয়ালে এবং মেঝের উপর ছোট ছোট একজাতীয় মাকড়সাকে দিনের বেলায় আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহারা প্রধানতঃ মাছি খাইয়াই জীবন ধারণ করে। কোথাও একটা মাছি বসিতে দেখিলে প্রায় দুই-তিন গজ দূর হইতে দ্রুত পদবিক্ষেপে তাহার নিকটবর্ত্তী হয়। মাছিটাকে তাহার দিকে মুখ করিয়া বসিতে দেখিলে আট-দশ ইঞ্চি তফাৎ হইতেই বৃত্তাকারে ঘুরিয়া তাহার পিছনে উপস্থিত হয় এবং অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া আরও নিকটে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রায় তিন চার ইঞ্চি ব্যবধান হইতে সে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত মাছিটার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়ে। ইহাদের লক্ষ্য এমনই অব্যর্থ যে, কদাচিৎ দুই-একটা মাত্র মাছিকে অব্যাহতি পাইতে দেখা যায়।


রিংহেলস্‌ কোব্রা বিষ নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিতেছে

ধাবমান বন্যপশু ধরিবার নিমিত্ত আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা 'বোলা' নামে এক প্রকার অদ্ভুত যন্ত্র ব্যবহার করে। যন্ত্রটা অতি সাধারণ। একটা লম্বা দড়ির দুই প্রান্তে দুইটি ভারী জিনিস বাঁধা। দড়িটার মধ্যস্থলে ধরিয়া এক প্রান্তের গুরুভার পদার্থটাকে দ্রুতবেগে মাথার উপর ঘুরাইতে ঘুরাইতে অকস্মাৎ তাগমাফিক এমন ভাবে ছাড়িয়া দেয় যে, সেটা তীরবেগে ছুটিয়া গিয়া ধাবমান জন্তুর পায়ে জড়াইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই জন্তুটা ভূতলশায়ী হয়। 'সুঙ্গ' নামে এক প্রকার ফাঁস-রজ্জুর সাহায্যেও ধাবমান বন্যপশু ধরা হইয়া থাকে। আমাদের দেশীয় কালো রঙের এক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় মাকড়সারাও শিকার ধরিবার জন্য কতকটা ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। দেওয়ালের গর্ত্ত বা ফাটলের মুখে এলোমেলোভাবে কতকটা সুতা ছড়াইয়া ইহারা ফাটলের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করিয়া থাকে। ছোট ছোট পোকামাকড় ইতস্তত: ঘোরা-ফেরা করিবার সময় ঐ সুতার সংস্পর্শে আসিবামাত্রই মাকড়সা শিকারের উপস্থিতি বুঝিতে পারিয়া বাহিরে আসে এবং একটু তফাতে থাকিয়া তাহার প্রতি থুথুর মত সাদা এক প্রকার পদার্থ নিক্ষেপ করিতে থাকে। এই থুথুর মত পদার্থেই শিকারের পা জড়াইয়া যায় এবং একেবারে বন্দী হইয়া পড়ে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়—থুথুর মত পদার্থটা এলোমেলোভাবে জড়িত কতকগুলি সূক্ষ্ম সূত্র ছাড়া আর কিছুই নহে।

কোন কোন সাপও শিকারের উপর অকস্মাৎ ছিটকাইয়া পড়িয়া তাহাকে স্প্রিংএর মত আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরে। তখন শিকারের আর নড়াচড়া করিবার উপায় থাকে না।

বিভিন্ন জাতীয় পাখীরাও লক্ষ্যভেদে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। চিল, বাজ, শিকরে ও ঈগল প্রভৃতি



বহুরূপীরা শিকার ধরিবার আশায় ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে



বানর গাছ হইতে নারিকেল ছুড়িয়া মারিতেছে

পাখীরা অব্যর্থ-লক্ষ্যে দূর হইতে যেভাবে সঞ্চরণশীল শিকার আয়ত্ত করে তাহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাত উপর হইতে সোজাসুজি জলের উপর পড়িয়া মাছরাঙা পাখীরা অবলীলাক্রমে শিকার ধরিয়া লইয়া যায়। মাছরাঙা অন্যান্য পাখীর মত ছোঁমারিয়া শিকার ধরে না। জলের উপর কোন মাছকে ভাসিতে দেখিলেই সে উড়িয়া উপরে উঠে এবং অতি দ্রুত গতিতে ডানা-সঞ্চালন করিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকে। লক্ষ্য স্থির হইলেই ভারী পদার্থের মত ঝুপ করিয়া শিকারের ঘাড়ের উপর পড়ে। আমাদের দেশীয় মেছেল পাখীর শিকার-প্রণালী যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা জানেন—ইহারা ১০০।১৫০ ফুট উচু হইতে অব্যর্থ-লক্ষ্যে শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। কদাচিৎ ইহাদিগকে লক্ষ্যভেদে বিফলমনোরথ হইতে দেখা যায়।

কুণো ব্যাঙের শিকার-প্রণালী যাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহারা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিবেন যে, উহাদের লক্ষ্যভেদের কৌশলও কম বিস্ময়কর নহে। কুণো-ব্যাং পিঁপড়ে খাইতে খুবই ভালবাসে। সারাদিন ইহারা গর্ত্তে বা কোন কিছুর অড়ালে আত্মগোপন করিয়া থাকে। সূর্য্যাস্তের পর অন্ধকার হইবার পূর্ব্বেই আশ্রয়-

স্থল হইতে বহির্গত হইয়া পিঁপড়ের সারের পাশে নিশ্চল-ভাবে অবস্থান করে এবং একটি একটি করিয়া বহুসংখ্যক পিঁপড়ে ধরিয়া উদরস্থ করে। সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে বহুসংখ্যক ব্যাঙকে শিকার সংগ্রহের আশায় পিঁপড়ের লাইনের পাশে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। পিঁপড়েরা কিন্তু শত্রুর অবস্থান মোটেই টের পায় না। ইহাদের শিকার ধরিবার কৌশল প্রত্যক্ষ করা সহজ নয়। কেবল খুট্ করিয়া একটু শব্দ হয় মাত্র। ব্যাংটা একেবারে নিশ্চল। মুখ বা মস্তকের কোন অংশকেই একটুও নড়িতে দেখা যায় না। কেবল এটুকুই সহজে নজরে পড়ে যে, একটার পর একটা পিঁপড়ে যেন সহসা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে—মুখ হইতে বিদ্যুৎগতিতে একটি লম্বা আঠালো জিহ্বা বাহির করিয়া অব্যর্থ-লক্ষ্যে ব্যাং তাহা ক্ষুদে-পিঁপড়ের গায়ে ঠেকাইয়া দেয় এবং তন্মুহূর্ত্তেই পিঁপড়েসমেত ভিতরে টানিয়া লয়। এক প্রান্তে একটা হাল্কা বল বাঁধা একগাছি রবারের দড়ির বিপরীত প্রান্ত হাতে বাঁধিয়া বলটাকে ছুড়িয়া মারিলে যে অবস্থা হয়—জিহ্বার সাহায্যে ব্যাঙের শিকার ধরিবার কায়দাটা অনেকাংশে সেইরূপই মনে হয়। কিন্তু দূর হইতে জিব্ বাড়াইয়া অব্যর্থ সন্ধানে পিঁপড়ের মত ক্ষুদ্র প্রাণীকে স্পর্শ করিবার ক্ষমতা অতীব কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নাই!

টিকটিকির মত বহুরূপী নামক অদ্ভুত প্রাণীদের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। ইচ্ছামত দেহের রং পরিবর্ত্তন করিতে পারে বলিয়া ইহারা বহুরূপী নামে পরিচিত। যখন সবুজ পত্রাবৃত ডালপালার মধ্যে অবস্থান করে তখন গায়ের রং থাকে পত্রপল্লবের মতই সবুজ; আবার শুষ্ক ডালপালার উপর অবস্থান করিবার সময় দেহের রং ধূসর হইয়া যায়। শিকারের আশায় ইহারা ডালের গায়ে লেজ জড়াইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চলভাবে একই স্থানে বসিয়া থাকে; তখন দেখিলে জীবন্ত প্রাণী বলিয়া মনেই হয় না। কিছু দূরে কোন কীট-পতঙ্গ উড়িতে দেখিলেই কেবল এদিক বা ওদিকের একটা মাত্র চোখ ঘুরাইয়া তাহার উপর কড়া নজর রাখে। নিরীহ পোকাটি শত্রুর অবস্থান বুঝিতে না পারিয়া ৭.৮ ইঞ্চি দূরে কোন স্থানে বসিলেই হইল। তড়িদ্গতিতে জিব্‌টাকে ৭।৮ ইঞ্চি বাড়াইয়া বহুরূপী পোকাটাকে মুখের মধ্যে টানিয়া লয়। জিব্‌টাকে অত দূর বাড়াইয়া আবার মুখের মধ্যে টানিয়া লইতে অতি অল্প সময়ই ব্যয়িত হইয়া থাকে। ইহাদের জিবের অগ্রভাগটা বেশ স্ফীত এবং এক প্রকার আঠালো পদার্থে আবৃত। লম্বা কাঠির মাথায় আঠা মাখাইয়া ছেলেরা যেমন দূর



কুনো ব্যাং পিঁপড়ে শিকারে ব্যস্ত

হইতে ফড়িং ধরিয়া থাকে, ইহাদের শিকার-প্রণালীও অনেকটা সেইরূপ, উপরন্তু লক্ষ্যভেদের কৃতিত্ব ইহাদের অসাধারণ।

উপরে যে সকল প্রাণীদের বিষয় আলোচিত হইল তাহারা লক্ষ্যভেদে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে—আহার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় কতকগুলি প্রাণী দেখা যায় যাহারা শত্রু হইতে আত্মরক্ষা অথবা প্রতি-হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই লক্ষ্যভেদের কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে। শুঁড়ের মধ্যে জল লইয়া হাতী দূর হইতে অব্যর্থ-লক্ষ্যে বিরক্তকারীদের নাকে মুখে ছিটাইয়া দিয়াছে—এরূপ অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। শত্রুর উপস্থিতি টের পাইলে কাটল্ মাছ প্রথমতঃ দেহের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার দৃষ্টিবিভ্রম উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে সিপিয়া নামে এক প্রকার কালো রং ছুড়িয়া জল ঘোলা করিয়া দেয়। কালো জলের আড়ালে শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া সে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, জাল বা অন্য কোন যন্ত্রের সহায়তায় বন্দী হইয়া পলায়নের উপায় না দেখিলে ইহারা জল হইতে দশ-বারো ফুট দূরে অবস্থিত মানুষের নাকে মুখে অব্যর্থ লক্ষ্যে পিচকিরির মত করিয়া কালি ছুড়িয়া মারে।

ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের উপকূল ভাগে এবং তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে ফুলমার পেট্রেল নামে এক প্রকার সুদৃশ্য মৎস্যাশী পাখী দেখা যায়। ইহাদের সন্তানবাৎসল্য অতি প্রবল। বাচ্চা হইবার সময় কেহ ইহাদের বাসার নিকটে উপস্থিত হইলে পেটের ভিতর হইতে পচামাছের মণ্ডের মত দুর্গন্ধময় তৈলাক্ত পদার্থ উদ্গীরণ করিয়া পিচকিরির মত তাহার নাকে মুখে ছুড়িয়া মারে। লক্ষ্য ইহাদের অব্যর্থ। এইরূপ

বিরক্তিকর অভিজ্ঞতার পর কেহ আর দ্বিতীয় বার ইহাদের বাসার নিকট যাইতে ভরসা করে না।

লামানামক লোমশ জন্তুদের এক প্রকার অদ্ভুত স্বভাব দেখা যায়। গৃহপালিত লামা কাহারও প্রতি বিরক্ত হইলে মুখ কুঁচকাইয়া দূর হইতে অব্যর্থ লক্ষ্যে তাহার গায়ে থুথু নিক্ষেপ করিয়া থাকে, লক্ষ্যভেদে বড় একটা বিফলমনোরথ হইতে দেখা যায় না। রিংহল্‌স্ কোব্রা নামে আফ্রিকা দেশে এক প্রকার ভীষণ প্রকৃতির বিষধর সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্যভেদে ইহাদেরও অসাধারণ নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়। কাহাকে নিকটে আসিতে দেখিলেই ইহারা ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়। আগন্তুক ব্যাপারটা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না-করিতেই সাপটা কয়েক ফুট দূর হইতে তাহার চোখে বিষ ছুড়িয়া মারে। ইহাদের লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা অপূর্ব্ব ; ঠিক চোখের মধ্যেই বিষ নিক্ষেপ করিবে।

মালয় ও তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে এক জাতীয় বানর দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্য স্থির করিয়া ঢিল ছুড়িতে ইহারা খুবই ওস্তাদ। কেহ উত্যক্ত করিলে ইহারা নারিকেল গাছে চড়িয়া বসে এবং উপর হইতে অব্যর্থ-লক্ষ্যে তাহাদের প্রতি নারিকেল ছুড়িয়া মারিতে থাকে। বানরদের এই অদ্ভুত স্বভাবের সুযোগ লইয়া মালয়বাসীরা তাহাদের দ্বারা গাছ হইতে নারিকেল সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে মালয়বাসীরা যথেষ্টসংখ্যক বানর পুষিয়া থাকে।



লক্ষ্যবেধী নেকড়ে-মাকড়সা

আচার্য্য শঙ্করের জীবন ও ধর্ম্মমত

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ

আচার্য্য শঙ্করের জীবনী-লেখকদের মধ্যে নানা মতভেদ দেখা যায়। আমি অন্যান্য মত ত্যাগ ক'রে এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের মত গ্রহণ করবো। তিনি সিটি স্কুল ও কলেজে আমার ছাত্র ছিলেন এবং ধর্ম্ম-বিষয়ে আমাদ্বারা কিয়ৎপরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি সারাজীবন বেদান্ত মতের আলোচনা করছেন, শঙ্করের জন্মস্থানে গিয়ে তাঁর জীবন ও বংশ-পরিবারাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করেছেন, এবং তদ্বিষয়ে অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি সম্প্রতি পরমহংস রামকৃষ্ণের প্রবর্ত্তিত বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁর নাম হয়েছে স্বামী চিদ্ঘনানন্দ।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, আরব-সাগরের পূর্ব্ব উপকূলে, মালাবার দেশ অবস্থিত। এদেশের প্রাচীন নাম কেরল। এই কেরলদেশে, প্রসিদ্ধ নম্বুরি ব্রাহ্মণ-কুলে, ৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, ১২ই বৈশাখে, শঙ্করের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম শিবগুরু, মাতার নাম বিশিষ্টা। শঙ্কর শৈশব থেকেই শান্তপ্রকৃতি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রবল স্মৃতিশক্তিশালী ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তির কতিপয় দৃষ্টান্ত যথাস্থানে বল্‌বো। জার্ম্মান্ দার্শনিক ফিক্‌টে ও ইংরেজ দার্শনিক জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতির সুপ্রমাণিত স্মৃতিশক্তির দৃষ্টান্ত বর্ত্তমানে, শঙ্কর-জীবনের ঐ সকল দৃষ্টান্ত বিশ্বাসের অযোগ্য বোধ হয় না। রাজেন্দ্রবাবু তাঁর শঙ্কর-জীবনীতে বলেছেন,

"তিন বৎসর বয়সে তিনি নিজ মালয়ালম্ ভাষায় গ্রন্থ অধ্যয়নে সমর্থ হইলেন, এবং যখনই যাহা পড়িতেন তখনই তাহা তিনি অবিকৃত ভাবে আবৃত্তি করিতে পারিতেন।" জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিলের আত্মজীবনীতে বলা হয়েছে যে তিনি তিন বৎসর বয়সে Greek Vocabulary, গ্রীক্ ভাষার শব্দার্থমালা, মুখস্থ করতেন। শঙ্করের এ সকল শক্তি দেখে শিবগুরু মনস্থ করেছিলেন পঞ্চম বর্ষেই শিশুকে উপনয়ন দিয়ে বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত করবেন। কিন্তু শিশুর তিন বৎসর পূর্ণ হবার আগেই শিবগুরু দেহত্যাগ করলেন। বিশিষ্টা দেবী স্বামীর ইচ্ছানুসারে শিশুকে তার পঞ্চম বৎসরারম্ভেই উপনয়ন দিয়ে গুরুগৃহে প্রেরণ করলেন। কিন্তু তাকে বেশী দিন বিদ্যালয়ে শিক্ষা করতে হ'ল না। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই কয়েক জন দৈবজ্ঞ শঙ্করের প্রতিভার কথা শুনে তাঁর জন্মপত্রিকা দেখ্‌তে চাইলেন। দৈবজ্ঞগণ শঙ্কর-জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখে অতিশয় বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন, কিন্তু তাঁর অল্পায়ু দেখে ভীত হলেন। বিশিষ্টার আত্যন্তিক আগ্রহে তাঁরা বলতে বাধ্য হলেন যে শঙ্করের অষ্টম, ষোড়শ ও দ্বাত্রিংশৎ বৎসরে জীবন-সংশয়। এ কথায় শঙ্কর ও তাঁর মাতা উভয়েই চিন্তাকুল হলেন, কিন্তু দু-জনের চিন্তা ভিন্ন রকমের। শঙ্কর ভাবলেন,—"এই অল্পায়ুর ভিতরে কতটুকুই বা সিদ্ধি লাভ করতে পারবো আর দেশের সেবাই বা কতটুকু হবে!" দেশের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দুরবস্থার চিন্তা তাঁর মধ্যে খুব প্রবল ভাবে এসেছিল আর নিজ সাধন-ভজনের সহিত একীভূত হয়ে গিয়েছিল। তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প করলেন যত শীঘ্র সম্ভব সন্ন্যাস অবলম্বন করবেন। গৃহস্থাশ্রমে থেকে যে তিনি নির্জ্জন সাধনে ও দেশের সেবায় বিশেষ কৃতকার্য্য হ'তে পারবেন না, তা তিনি অতি স্পষ্টরূপে বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং তখন থেকেই তিনি সন্ন্যাসগ্রহণে মাতার অনুমতি প্রার্থনা করতে লাগলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর অনুমতি পেলেন না। এমন সময় একটি ঘটনা হ'ল যাতে বিশিষ্টা অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন। গ্রামের সম্মুখস্থ নদীতে সময়ে সময়ে জল বৃদ্ধি হ'ত আর সেই সময় সমুদ্র থেকে নদীতে কুমীর আস্‌তো। এক দিন একটা কুমীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শঙ্কর চীৎকার করতে লাগ্‌লেন, কিন্তু কিছুতেই কুমীরকে ছাড়াতে পারলেন না। তখন তিনি বিশিষ্টাকে বললেন, "মা, আমাকে সন্ন্যাস-গ্রহণে অনুমতি দাও, আমি আমার সঙ্কল্পিত সন্ন্যাস মনে মনে গ্রহণ ক'রে প্রাণত্যাগ করি।" বিশিষ্টা বাধ্য হয়ে অনুমতি দিলেন। এমন সময় কতিপয় মৎস্যধারী এসে কুমীরটাকে তাদের জাল দিয়ে বেষ্টন করলো ও ধরে ফেললো। অন্য কেউ কেউ শঙ্করকে নদীতীরে উঠিয়ে একজন বৈদ্যের চিকিৎসাধীনে রাখলো। শঙ্কর ক্রমশঃ কুম্ভীর-দংশনজনিত ক্ষত ও বেদনা থেকে মুক্ত হলেন। পিতৃদত্ত সম্পত্তি এবং মাতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার আত্মীয়দের হাতে দিয়ে তিনি নিজেই সন্ন্যাসের মন্ত্র পাঠ ক'রে অষ্টম বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করলেন। মাতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন ব'লে তাঁর মৃত্যুকালে দেশে গিয়ে তাঁর মৃতদেহের যথাবিধি সৎকার করেছিলেন।

গৃহ থেকে বের হয়ে শঙ্কর চললেন মহাপণ্ডিত ও মহাযোগী গোবিন্দপাদের অন্বেষণে। গোবিন্দপাদ বাস করতেন নর্ম্মদাতীরস্থ ওঁকারনাথে। শঙ্কর তাঁর নিকট নানা প্রকার যোগ শিক্ষা করলেন। তাঁর শাস্ত্রশিক্ষা পূর্ব্বেই সম্যক্‌রূপে হয়ে গিয়েছিল। দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি বারাণসীতে উপনীত হলেন এবং মণিকর্ণিকা-ঘাটের নিকটস্থ একটি স্থানে বাস করতে লাগলেন। অতি শীঘ্রই তিনি বহু শিষ্যকর্ত্তৃক বেষ্টিত হলেন। চার বছর এখানে বাস ক'রে তিনি বেদান্ত শিক্ষা দিতে লাগলেন এবং তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলি লিখলেন। ইতিমধ্যেই তিনি কতিপয় শিষ্যসহ বদরিকাশ্রম প্রভৃতি কোনও কোনও প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ ক'রে এলেন। তাঁর দীর্ঘ-ভ্রমণের কথা পরে বল্‌বো। তাঁর নামে চলিত গ্রন্থ অনেক, কিন্তু পাশ্চাত্য গবেষণাকারীদের মতে বৈদান্তিক প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য ছাড়া তিনি অন্য কোনও গ্রন্থ লেখেন নি। মূল এবং প্রকৃত বেদান্ত হচ্ছে আটখানা উপনিষদ্, যেগুলি বেদের অন্তর্গত,—বেদের অন্তভাগ বা বেদের সিদ্ধান্ত। এই আটখানার মধ্যে পাঁচ খানা ক্ষুদ্র (minor) উপনিষদ্, যাতে বেদান্তমত সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে মাত্র ব্যাখ্যাত হয় নি। এই পাঁচখানা হচ্ছে ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয়। অবশিষ্ট তিনখানা,—কৌষীতকি, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক,—হচ্ছে major, বৃহৎ উপনিষদ্। এগুলিতে বেদান্তমতের অল্পাধিক দীর্ঘ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য ও শ্বেতাশ্বতর, এই চারখানা 'minor Upanishads' বেদে পাওয়া যায় না, যদিও এগুলিকে অথর্ব্ব বেদের উপনিষদ্ ব'লে ধরা হয়। এগুলিতে এক দিকে দ্বৈত ব্রহ্মবাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, অপর দিকে বেদবিরুদ্ধ মূর্ত্তিপূজা শিক্ষা দেওয়া হয় নি, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে বেদের অন্তর্ভূত না হলেও এগুলিকে আর্ষ অর্থাৎ ঋষি-প্রণীত

মনে ক'রে উক্ত আটখানার সঙ্গে প্রকৃত উপনিষদ্ বলে ধরা হয়। এই বারোখানা উপনিষদ্ই আমি প্রকাশ করেছি। 'উপনিষদ্'-নামধারী অল্লাধিক আড়াই-শ গ্রন্থের অধিকাংশই 'সাম্প্রদায়িক' অর্থাৎ শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি মূর্ত্তিপূজক হিন্দুর লেখা বলে ব্রহ্মবাদীদের কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হয়। 'আল্লোপনিষদ্' নাম্নী একখানা উপনিষদে মহম্মদীয় ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হয়েছে। মহম্মদীয় ধর্ম্ম ভারতীয় ধর্ম্মের অন্তর্গত নয়, এই জন্যে এই উপনিষদ্কে 'সাম্প্রদায়িক'ও বলা হয় না, 'কৃত্রিম' বলা হয়। যা হোক, শঙ্কর উক্ত ১২ খানা উপনিষদের মধ্যে দশখানার ভাষ্য করেছেন,—'কৌষীতকি' ও 'শ্বেতাশ্বতরে'র ভাষ্য করেন নি। তাঁর অনুশিষ্য শঙ্করানন্দ স্বামী এই দু-খানার ভাষ্য করেছেন। নামের সাদৃশ্যে ভ্রান্ত হয়ে অনেকে এই ভাষ্যদ্বয়কে আচার্য্য শঙ্করের লেখা ব'লে মনে করেন, যদিও এগুলির ভাষা শঙ্করের ভাষা থেকে খুব ভিন্ন। এইরূপে অন্যান্য অনেক গ্রন্থকেই শঙ্করের বলে ভ্রম করা হয়। শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত চারিটি মঠের অধ্যক্ষেরা সকলেই 'শঙ্করাচার্য্য' উপাধি প্রাপ্ত হন, সুতরাং তাঁদের লিখিত উপনিষদ্-ভাষ্য বা অন্য কোনও বৈদান্তিক গ্রন্থ আদিম শঙ্করাচার্য্য দ্বারা লিখিত ব'লে ভ্রম হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কিন্তু শঙ্করের ভাষ্যগুলিতে ব্রহ্মোপাসনাই প্রবর্ত্তিত হয়েছে, কোনও দেবতার পূজা শিক্ষা দেওয়া হয় নি। এই জন্যেই তিনি রাজা রামমোহন রায়ের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন এবং কোনও বৈষ্ণব গোস্বামী তাঁকে শঙ্কর-শিষ্য ব'লে নিন্দা করাতে তিনি বলেছিলেন, শঙ্কর-শিষ্যত্ব তাঁর কাছে শ্লাঘ্য, নিন্দনীয় নয়। সুতরাং শঙ্করের নামাঙ্কিত কোনও গ্রন্থে যদি কোন সসীম দেবতা বা গঙ্গা-যমুনাদি নদীর স্তব থাকে, তবে নিশ্চিতরূপেই বলা যায় যে, সে গ্রন্থ শঙ্করের লেখা নয়।

যা হোক্, এখন শঙ্করের দীর্ঘ ভ্রমণের কথা বলি। যে সময় রেল ছিল না, ষ্টীমার ছিল না, সুনির্ম্মিত রাজপথও অল্প ছিল, ইংরেজি ভাষার মত সহজ ও বহুদেশব্যাপী ভাষা ছিল না, কেবল পণ্ডিত শ্রেণীর অধীত ও অধ্যাপিত কঠিন সংস্কৃত ভাষা মাত্র ছিল, তখন তিনি উত্তরে হিমালয়-প্রদেশ, দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ, পূর্ব্বে আসাম ও বঙ্গ, এবং পশ্চিমে গান্ধার, অর্থাৎ আফ্গানিস্তান,—যা তখন হিন্দুদেশ ছিল,—এই সুপ্রশস্ত ভারত মহাদেশে বহু শিষ্য সহ ভ্রমণ করেছেন, সংস্কৃতে বক্তৃতা করেছেন, মহাসম্মান লাভ করেছেন, এবং বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়কে নিজমতে আনয়ন করেছেন। এই দীর্ঘ কাহিনী বলবার সময় আমার নেই, সুতরাং শঙ্কর-শিষ্যদের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান, তাঁর মত পরিবর্ত্তনের কথা সংক্ষেপে বলেই আমি এ বিষয় শেষ করবো। এই শঙ্কর-শিষ্য হচ্ছেন নর্ম্মদা-তীরস্থ মাহিষ্মতী নগরীর মণ্ডন মিশ্র। তিনি ছিলেন পূর্ব্ব-মীমাংসা-কার জৈমিনির মতাবলম্বী কুমারিল ভট্টের শিষ্য। শঙ্কর তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বিচার-প্রার্থনা করলেন। মণ্ডন শঙ্করের পরিচয় পেয়ে বিচারে সম্মত হলেন। মণ্ডনের পত্নী মহাপণ্ডিতা উভয়ভারতী দেবী বিচারের মধ্যস্থা নিযুক্তা হলেন। আঠারো দিন বিচারের পর মণ্ডন পরাস্ত হলেন, শঙ্করের মত গ্রহণ করলেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণে সম্মত হলেন। তখন উভয়ভারতী বললেন যে, তিনি যখন মণ্ডনের অর্দ্ধাঙ্গিনী, তখন তাঁকে পরাজিত না করা পর্য্যন্ত শঙ্করের বিচার সম্পূর্ণ হবে না এবং মণ্ডনের সন্ন্যাস-গ্রহণও যুক্তিযুক্ত হবে না। এই ব'লে তিনি শঙ্করের সহিত বিচার প্রার্থনা করলেন এবং প্রার্থনা গৃহীত হ'ল। এ বিষয়ে আখ্যায়িকা এই যে, উভয়ভারতীর জিজ্ঞাসিত কামশাস্ত্রবিষয়ক প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে অসমর্থ হয়ে শঙ্কর এক মাস সময় গ্রহণ করে এক মৃত রাজার দেহে প্রবেশ করলেন, রাজগৃহে বাস করলেন, তৎপরে নিজ দেহে পুনঃ-প্রবেশ ক'রে উভয়ভারতীর প্রশ্নসমূহের উত্তর দিলেন এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই শিষ্যরূপে প্রাপ্ত হলেন। নিজদেহ ছেড়ে অন্যের মৃতদেহে প্রবেশ করা যদি সম্ভবও হয়, তথাপি জন্ম-সন্ন্যাসী শঙ্করের পক্ষে অল্প সময়ের জন্যেও পারিবারিক জীবন গ্রহণ করা নিতান্তই বিশ্বাসের অযোগ্য কথা। যা হোক, সন্ন্যাসাশ্রমে মণ্ডন মিশ্র 'সুরেশ্বরাচার্য্য' নামে অভিহিত হয়ে গুরুর ধর্ম্ম ও দর্শন প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন।

এখন আচার্য্য শঙ্করের দর্শন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে মত সংক্ষেপে বলে বক্তব্য শেষ করবো। ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মুলার বলেছেন, পাশ্চাত্য দেশে 'দর্শন' বল্লে যা বুঝা হয়, ভারতের দর্শন তা নয়। পাশ্চাত্য দেশে 'দর্শন' বললে বুঝায় জগৎ, জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা। কিন্তু ভারতীয় দর্শন, শ্রুতি অর্থাৎ বেদকে একটা স্বাধীন প্রমাণ বলে মানে। কোনও মত বা বিশ্বাসকে শ্রুতিসম্মত বলে দেখাতে পারলে এই দর্শনানুসারে সেই মত বা বিশ্বাস প্রমাণিত হয়ে গেল। তবে প্রমাণ বলে গৃহীত বেদ-বাক্যের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ থাকৃতে পারে। যা হোক, বেদ-মূলক ভারতীয় দর্শনে এই শাস্ত্রাধীনতা থাকাতে পাশ্চাত্য দেশের অনেকে এ'কে দর্শনই বলতে চান না। এই দর্শনে যেটুকু স্বাধীন

চিন্তা আছে, তাও কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রণালী (method) অবলম্বন করে নি। বিশেষতঃ ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি অন্বেষণ করতে গিয়ে আমি যে সকল বৈদান্তিক গ্রন্থ পড়েছি, যেমন শঙ্করের ভাষ্যত্রয়, ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্যের 'পঞ্চদশী', শঙ্করের নামে চলিত 'বিবেকচূড়ামণি', সদানন্দ-রচিত 'বেদান্ত-সার', গৌড়পাদ-রচিত 'মাণ্ডূক্যকারিকা' ইত্যাদি, সে সব গ্রন্থের একটিতেও সেই ভিত্তি পাই নি। অনেক বার বলেছি যে, দেশীয় দর্শনে অসন্তুষ্ট হয়েই আমি পাশ্চাত্য দর্শনাধ্যয়নে নিবিষ্টচিত্ত হলাম এবং দীর্ঘ-অধ্যয়নের পর তাই পেলাম, যা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। ক্যাণ্টের পূর্ব্বে পাশ্চাত্য দর্শনেও নির্দ্দিষ্ট যুক্তি-প্রণালীর যথেষ্ট অভাব ছিল। মোটের উপর বল্‌তে গেলে তখনকার প্রণালী ছিল (১) Dogmatism, অর্থাৎ চলিত মত বিনা বিচারে নেওয়া, (২) Scepticism, লৌকিক মত অবিশ্বাস্য বলে প্রমাণ করে ত্যাগ করা। ক্যাণ্ট দেখালেন যে, প্রকৃত জ্ঞান-প্রণালী হচ্ছে Cricisim of Experience, অভিজ্ঞতা অর্থাৎ জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মানসিক ক্রিয়ার সূক্ষ্ম পরীক্ষা। এই পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে, অভিজ্ঞতার ভিতরে যে পাঁচ প্রকার উপাদান আছে, সেগুলি স্বতন্ত্র নয়, পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য। সেই উপাদানগুলি হচ্ছে (১) আত্মজ্ঞান, (২) ইন্দ্রিয়বোধ, (৩) ইন্দ্রিয়-বোধের আকার দেশ-কাল, (৪) ইন্দ্রিয়-বোধের গুণ, পরিমাণ ও সম্বন্ধ বিষয়ে আত্মার বিবিধ ধারণা (Conceptions or categories), (৫) জগৎ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই তিনটি মূল বস্তুর ধারণা (Three ideas of reason)। ক্যাণ্টীয় দর্শন আয়ত্ত করলে দেখা যায়, লৌকিক ও চলিত নৈয়ায়িক চিন্তা যে প্রত্যক্ষ (perception) ও অনুমান (inference)-কে দুই স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে মনে করে, এতেই মস্ত ভুল রয়েছে। ফলতঃ প্রত্যক্ষ ছাড়া পরোক্ষ নেই, পরোক্ষ ছাড়াও প্রত্যক্ষ নেই, জ্ঞান হচ্ছে বহু উপাদান-যুক্ত একটি অখণ্ড ক্রিয়া, এবং এই অখণ্ড ক্রিয়ার বিষয় হচ্ছে জগৎ ও জীববিশিষ্ট এক অখণ্ড পরমাত্মা। যা হোক, ক্যাণ্ট জ্ঞানের এই অখণ্ডত্ব দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু তা দৃঢ়রূপে ধরতে পারেন নি। জ্ঞানের বাইরে একটা স্বাধীন বস্তু (thing in itself) আছে, যা থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধ আস্‌ছে,—এই ধারণা তাঁর সমস্ত দর্শনের বিরুদ্ধ হলেও তিনি তা পরিত্যাগ করতে পারেন নি। সর্ব্বাধার ব্রহ্মের ধারণাটাকে তিনি একটা ধারণামাত্র বলেই ব্যাখ্যা করেছেন, ব্রহ্মজ্ঞান যে আমাদের আত্মজ্ঞানের সঙ্গে এক, সসীম জীব যে মূলে অসীমের সঙ্গে এক, তা বুঝতে পারেন নি। আমাদের ধারণাগুলি শ্রেণীবদ্ধ করতে গিয়ে তিনি বুঝেছেন যে, প্রত্যেক ধারণারই বিপরীত ধারণা আছে বটে, কিন্তু এই দুই ধারণার ভেদের ভিতরে অভেদও আছে। এই যে প্রত্যেক বস্তুতে ভেদাভেদ দর্শন, একেই বলে Dialectical Method। ক্যাণ্টের অব্যবহিত পরবর্ত্তী জার্ম্মান্ দার্শনিক ফিক্‌টে, শেলিং ও হেগেল, বিশেষরূপে হেগেল, ক্যাণ্টের ভুল দেখাতে গিয়ে এই Dialetical Methodএ, ভেদাভেদ-ন্যায়ে উপনীত হলেন। হেগেল ও তাঁর ইংরেজ অনুবর্ত্তিগণ এই ন্যায়ের উপরই তাঁদের আত্মবাদ বা ব্রহ্মবাদ-দর্শন স্থাপন করেছেন। আমি এই দর্শনে প্রবেশ করে দেখলাম যে, এই দর্শনের মূল সিদ্ধান্ত ঔপনিষদ ব্রহ্মবাদের সহিত অভিন্ন। তখন ভারতীয় দর্শনাধ্যয়নে ফিরে গিয়ে উপনিষদ্ ও তন্মূলক প্রধান প্রধান গ্রন্থ বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়লাম। পড়ে দেখলাম যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ব্রহ্মবাদ পরস্পর সদৃশ বটে, কিন্তু প্রতীচ্য ব্রহ্মবাদের পশ্চাতে রয়েছে উক্ত স্পষ্ট ও গভীর Dialectical Method, পরন্তু ভারতীয় দর্শনের পশ্চাতে রয়েছে কেবল শ্রুতির দোহাই, আর সেই লৌকিক দ্বৈতবাদী ন্যায়, যদ্দ্বারা কখনও ব্রহ্মবাদ প্রমাণিত হতে পারে না। দেখলাম যে, শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ প্রমাণ করবার জন্যে কিছুই ব্যস্ত নন, শ্রুতির দোহাই দিয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট। তাঁরা যুক্তি যা দেন, তা তখনকার বিশ্বাসপ্রবণ লোকদের সন্তোষকর হয়ে থাকতে পারে, এখনকার সন্দেহ-প্রবণ এবং বিজ্ঞান দর্শনে প্রতিষ্ঠিত লোকদের পক্ষে তা কিছুই সন্তোষকর নয়। ব্রহ্মবাদের ভিত্তি হচ্ছে আত্মবাদ, সবই আত্মিক; অনাত্ম, জড় বলে কোনও বস্তু নেই, এই মত। আত্মবাদ উপনিষদে আছে। খুব স্পষ্টভাবে আছে 'কৌষীতকি' উপনিষদে। সেখানে ইন্দ্র বলছেন, প্রজ্ঞামাত্রা ছাড়া ভূতমাত্রা নেই, ভূতমাত্রা ছাড়া প্রজ্ঞামাত্রা নেই। অর্থাৎ আত্মা ছাড়া জগৎ নেই, জগৎ ছাড়াও আত্মা নেই। শঙ্কর এই উপনিষদের ভাষ্য করেন নি, সুতরাং এ পড়েছিলেন কি না তাই সন্দেহ। আত্মবাদ সাধারণ ভাবে ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যক আছে। শঙ্কর এই দুয়েরই ভাষ্য করেছেন, কিন্তু ছান্দোগ্যের আরুণি এবং বৃহদারণ্যকের যাজ্ঞবল্ক্য এই ব্রহ্মর্ষিদ্বয় যে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদী, আর ছান্দোগ্যের রাজর্ষি প্রবাহণ এবং দেবর্ষি প্রজাপতি যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, এই প্রভেদ বুঝতে পারেন নি। নির্বিশেষবাদীরা জ্ঞানের বিষয় ও বিষয়ীতে একান্ত ভেদ দেখেন। বিষয়কে অনিত্য এবং বিষয়ীকে নিত্য মনে

করেন, সুতরাং অবশ্যম্ভাবীরূপেই, নির্গুণবাদে, নির্বিশেষবাদে, উপনীত হন। পক্ষান্তরে রাজর্ষিরা ও দেবর্ষিরা বিষয়-বিষয়ীকে অচ্ছেদ্য বলে বুঝেন, সুতরাং ব্রহ্মকে সগুণ, সবিশেষ বলে সিদ্ধান্ত করেন। শঙ্কর ঋষিদের এই মতভেদ কিছুই দেখতে পান নি। আত্মবাদ সম্বন্ধেই তাঁর স্থির মত নেই। কোনও কোনও স্থানে তিনি বলেন, আত্মা ছাড়া জগৎ নেই, যদিও এই মত তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে প্রমাণ করেন নি, ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রদত্ত প্রমাণাভাসও ব্যাখ্যা করেন নি। আবার কোনও কোনও স্থলে, যেমন ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদের সঙ্গে তর্ককাণ্ড নিয়ে, তিনি জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। স্পষ্টই দেখা যায় যে, শঙ্কর আত্মবাদের যৌক্তিক প্রমাণ পান নি। ঋষিরা আত্মবাদী বলে স্থানে স্থানে আত্মবাদ স্বীকার করেছেন মাত্র। বস্তুতঃ অভিজ্ঞতার পরীক্ষা ব্যতীত আত্মবাদের সত্যতা বোঝা যায় না। ঔপনিষদ ঋষিদের উক্তিতে এই প্রণালীর আভাস মাত্র পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ মন্ত্রদ্রষ্টা, সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ সেই প্রণালীতেই এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত প্রমাণ উপনিষদ্-লেখকেরা, যাঁরা স্পষ্টতঃই শোনা কথা লিখেছেন,তা যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারেন নি। অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে বর্ণ, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও আস্বাদন এবং এ সমুদায়ের আকার দেশ-কালকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত, আত্মস্বরূপান্তর্গত বলে বুঝা যায়। এই ভাবে এ সকলকে বুঝলে জগৎ ও আত্মার, বিষয় ও বিষয়ীর, দ্বৈতবোধ চলে যায়। এরূপ বিশ্লেষণেই জীবাত্মা-পরমাত্মার একান্ত ভেদবোধও সংশোধিত হয়, জীবাত্মা যে পরমাত্মার অচ্ছেদ্য অংশ, এই সত্য প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মর্ষিরা সুষুপ্তিতে জগৎ ও জীবাত্মার অপ্রকাশ দেখে ভাবেন, নির্বিশেষ পরমাত্মাই সত্য, জীব ও জগৎ অসৎ। কিন্তু নির্বিশেষ পরমাত্মা তাঁরা কোথায় পান? সুষুপ্তিতে কেবল জীবাত্মা নয়, বিশ্বাত্মাও অপ্রকাশিত হন। তাতে কি তিনি অসৎ হয়ে যান? বস্তুতঃ জীবের সুষুপ্তির অবস্থায় চিরজাগ্রত সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মারত জীব ও জগৎ স্থায়ী ভাবে বর্ত্তমান না থাকলে জাগ্রদবস্থায় এসব পুনঃপ্রকাশিত হতে পারত না। জাগ্রদবস্থায়ও জীবের জ্ঞান আংশিক ভাবে লুপ্ত হয়, কিন্তু নিত্যজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাতে সমস্ত জ্ঞান স্থায়ী ভাবে থাকাতে স্মৃতির পুনরুদয়ে তা প্রকাশিত হয়। যা হোক্, আরুণি ও যাজ্ঞবল্ক্যের ভ্রম যেমন চিত্র ও ইন্দ্র কৌষীতকিতে দেখিয়েছেন, প্রবাহণ ও প্রজাপতি তেমনি 'ছান্দোগ্যে' তাই দেখিয়েছেন। ইতিপূর্ব্বেই সংক্ষেপে তা বলেছি। যাজ্ঞবল্ক্য জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, আত্মার এই তিন অবস্থা স্বীকার করেন, কিন্তু সুষুপ্তির উপরে যে তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা আছে, যাতে জ্ঞান স্থির, অপরিবর্ত্তনীয় থাকে, তা তিনি বুঝতে পারেন নি। ঋষিদের সঙ্গে যে মতভেদ থাকতে পারে, তা শাস্ত্রবাদী শঙ্কর বোধ হয় মুহূর্ত্তের জন্যেও ভাবতে পারেন নি, সুতরাং রাজর্ষি ও দেবর্ষিদের দার্শনিক মত মনোযোগপূর্ব্বক, সমালোচনার সহিত (critically) পড়ে ব্রহ্মর্ষিদের সঙ্গে তাঁদের উক্তির প্রভেদ বুঝতে পারেন নি। রাজা রামমোহন রায় শঙ্করের মতন শাস্ত্রবাদী না হলেও সম্ভবতঃ শাঙ্কর মত দ্বারা অত্যধিক প্রভাবিত হয়ে রাজর্ষি ও দেবর্ষিদের মত অধ্যয়ন করেন নি, অন্ততঃ সে মতের বিবরণ দেন নি। বৈষ্ণবাচার্য্যদের লেখার সহিত তিনি সুপরিচিত না থাকাতে সম্ভবতঃ ঋষিদের মতামতের দিকে তাঁর দৃষ্টি আদৌ আকৃষ্ট হয় নি। কিন্তু তাঁদের মতভেদটা তো সামান্য নয়। ব্রহ্মর্ষিদের মতে জগৎ মিথ্যা, জীবের জীবত্ব মিথ্যা, ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা, মঙ্গলময়ত্ব প্রভৃতি সমস্ত ব্যক্তিগত লক্ষণই মিথ্যা। তিনি নির্বিশেষ জ্ঞানমাত্র, তাতে জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, সসীম-অসীম, প্রিয়-প্রেমিক, এ সব ভেদ নেই। জীবের কর্ম্মফল রূপ জন্ম-মরণ-প্রবাহ যখন শেষ হবে, এবং সে এই মিথ্যাত্ব বুঝতে পারবে, তখন সে সমুদ্রে নদী-মিশ্রণের ন্যায় ব্রহ্মে বিলীন হবে। রাজর্ষি ও দেবর্ষিদের মতে জগৎ ও জীব স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু নয়, ব্রহ্মের স্বগত, অন্তর্ভূত ভেদমাত্র। এই ভেদ কিন্তু নিত্য, অবিনাশী। কর্ম্মফল-জনিত জন্মান্তর-প্রবাহ শেষ হলেও জীব জ্ঞানময় 'দেবযান' পথ দিয়ে উন্নতির নানা স্তর অতিক্রম করে, মুক্তাত্মাদের চির বাসস্থান ব্রহ্মলোকে চির বাস করবে। ব্রহ্মলোক ও ব্রহ্মধামের উজ্জ্বল শাস্ত্রীয় বর্ণনা আমি বার বার পাঠ ও ব্যাখ্যা করেছি। নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদপ্রতিষ্ঠিত লয়বাদের সঙ্গে এই মুক্তিবাদের খুব প্রভেদ। উপনিষদের ঋষিগণ এবং শঙ্কর-রামানুজ প্রভৃতি উপনিষদ্-ব্যাখ্যায়ক আচার্য্যগণ, সকলেই ব্রহ্মবাদের আবিষ্কারক ও ব্যাখ্যাকার বলে আমাদের গভীর শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু তাঁদের মতভেদ ও সাধনভেদ না জানা অথবা জেনেও উপেক্ষা করা, উভয়ই অতিশয় ক্ষতিজনক। এই জন্যেই এই প্রভেদ যথাসম্ভব সংক্ষেপে দেখালাম।

শঙ্করের অবতারবাদের দু-একটি কথামাত্র সংক্ষেপে বলি। বৈদান্তিক অবতারবাদের ভিত্তি হচ্ছে এক অদ্বৈতবাদ,—জীব-ব্রহ্মের মৌলিক একত্ববোধ। ব্রহ্ম দেশ-কালের অতীত হ'য়েও দেশ কালে, জগৎরূপে, জীবের জীবনরূপে প্রকাশিত হন। এই প্রকাশই তাঁর অবতার, অবতরণ,

নেবে আসা। "তিনি বিশেষ বিশেষ মহাজনরূপে অবতীর্ণ হন, সাধারণ জীব তাঁর অবতার নয়," এই মত শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, যুক্তি-বিরুদ্ধ। সত্য অবতারবাদ উপনিষদে আছে, ব্রহ্মসূত্রে আছে, গীতায় আছে, বেদান্তমূলক পুরাণসমূহে আছে। শঙ্কর এই অবতারবাদই মান্‌তেন। এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রধান প্রমাণ হচ্ছে কৌষীতকি উপনিষদের ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন-সংবাদ এবং ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায় প্রথম পাদের ত্রিংশৎ সূত্র। ব্রহ্মযোগে যুক্ত হয়ে আমরা সকলেই ব্রহ্মবাণী বল্‌তে পারি, কিন্তু যোগ ভঙ্গ হ'লে আর সে ভাবে কথা কহা ঠিক নয়। 'ভগবদ্গীতায়' শ্রীকৃষ্ণ আগাগোড়াই ব্রহ্মভাবে কথা কইছেন, কিন্তু "অনুগীতাতে" সেই কথা পুনরুক্তি করতে অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি বল্‌ছেন, "সেই যোগ এখন আর আমার নেই, সে কথা আর বল্‌তে পারি না।" অথচ গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে বলেন ব্রহ্মের পূর্ণাবতার। এ মতও শাস্ত্রবিরুদ্ধ, যুক্তি-বিরুদ্ধ। জীবমাত্রেই ব্রহ্ম অবতীর্ণ, অর্থাৎ জীবের সহিত ভেদাভেদ ভাবে প্রকাশিত। আমরা সকলেই মূলে তাঁর সঙ্গে এক, অথচ আমরা অপূর্ণ। তাঁর পূর্ণ-জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, পুণ্য দেশে কালে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বরূপে, আমাদের জীবনে প্রকাশিত হচ্ছে। এখানেই তাঁর সঙ্গে আমাদের ভেদ। এই ভেদাভেদ অনন্ত কালই চল্‌বে। আমরা সসীম ভোক্তা, তিনি অসীম ভোগের বস্তু। অনন্ত কালই এই ভোক্তৃভোগ্যের সম্বন্ধ চল্‌বে। আমাদের সমক্ষে এই মধুর সম্বন্ধ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত করে ঈশ্বর আমাদের জীবন ধন্য করুন।

শঙ্করের তীক্ষ্ণ স্মৃতির দৃষ্টান্তগুলি যথাস্থানে বলা হয় নি। এখন বলি। তাঁর গ্রাম যে-রাজার রাজ্যভুক্ত ছিল, সেই রাজা, রাজশেখর বর্ম্মা, বিদ্বান্ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর লিখিত 'বাল রামায়ণ' প্রভৃতি তিনখানা পুস্তক গৃহদাহে দগ্ধ হয়ে যায়। রাজা তাতে অত্যন্ত মনঃপীড়া পেয়ে শঙ্করকে সেই কথা বলেন। শঙ্কর সেই বই তিনখানা পড়েছিলেন। তিনি রাজাকে বল্‌লেন, "আপনি লিখুন, আমি বইগুলি পুনরাবৃত্তি করি।" এইরূপে রাজা তাঁর লিখিত পুস্তকত্রয় পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন।

শঙ্কর-শিষ্য পদ্মপাদেরও এই দুর্ভাগ্য ঘটেছিল। তাঁর মাতুল ছিলেন পূর্ব্ব-মীমাংসাবাদী। পদ্মপাদ এই বাদের বিপক্ষে একখানা বই লেখেন। পদ্মপাদের সাময়িক অনুপস্থিতিতে তাঁর মাতুল এই বই পড়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন আর বইখানা পুড়িয়ে ফেলেন। এতে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পদ্মপাদ শঙ্করকে এই ক্লেশের কথা বলেন। শঙ্কর বললেন, "তোমার বই আমি পড়েছি, তুমি লিখে নেও, আমি বলছি।" এইরূপে পদ্মপাদ তাঁর লিখিত পুস্তক অবিকলভাবে পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন।

তীক্ষ্ণ স্মৃতির দুটি সুপ্রমাণিত পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত এই :— জার্ম্মান দার্শনিক ফিক্‌টে অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। তিনি তাঁর বার বৎসর বয়সে তাঁর গ্রামের গির্জায় নিয়মিতরূপে যেতেন এবং সেই গির্জায় প্রসিদ্ধ আচার্য্যের উপদেশ শুনতেন। সেই আচার্য্যের বক্তৃতাশক্তির খ্যাতি বার্লিনে পৌঁছেছিল। জার্ম্মানির তখনকার শিক্ষা-পরিদর্শক তাঁর বক্তৃতা শুনতে কৌতূহলী হয়ে এক রবিবার দীর্ঘ ভ্রমণের পর ঐ গ্রামে সায়ংকালে উপনীত হয়ে শুনলেন যে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গির্জার কাজ শেষ হয়ে গেছে। তিনি নিরাশ হয়ে রাত্রিবাসের জন্যে গ্রামের হোটেলে উপস্থিত হয়ে হোটেল-রক্ষককে তাঁর নিরাশার কথা বললেন। হোটেল-রক্ষক বললেন, "আমি আপনাকে আজকের বক্তৃতা শুনাতে পারি। এই গ্রামের ফিক্‌টে নামক একটি দরিদ্র ছেলে আচার্য্যের বক্তৃতা তাঁর সমস্ত অঙ্গভঙ্গির সহিত অবিকল পুনরুক্তি করতে পারে।" শিক্ষা-পরিদর্শকের অনুরোধক্রমে সেই বালক তাঁর সমক্ষে আনীত হ'ল এবং আচার্য্যের অঙ্গভঙ্গি, উচ্চারণক্রম প্রভৃতির সহিত সেদিনকার বক্তৃতা অবিকল পুনরুক্তি করলে। পিতার দরিদ্রতা বশতঃ বালকের শিক্ষা চলছে না শুনে সেই রাজকর্ম্মচারী বালকের পিতাকে ডেকে এনে বালকের শিক্ষাভার গ্রহণের প্রস্তাব করলেন, বালকের পিতা সহর্ষে সম্মত হ'ল। এর ফল হ'ল জার্ম্মানির সুবিখ্যাত দার্শনিক, বক্তা ও দেশহিতৈষী ফিক্‌টে।

Pleasures of Hope-এর প্রসিদ্ধ কবি ক্যাম্‌বেল একটি কবিতা লিখে তখন-তখনই প্রতিবেশী প্রসিদ্ধ স্কচ কবি স্যার্ ওয়ালটার স্কট্‌কে শুনাতে গেলেন। কবিতা আবৃত্তির পরেই স্কট্ হেসে বললেন, "চুরি করা কবিতা আমাকে নিজের বলে শুনাতে এয়েছ ?" ক্যাম্‌বেল বললেন, "আমি এই মাত্র লিখে আনলাম, আপনি কি ক'রে এ'কে বলছেন 'চুরি করা' ?" স্কট্ বললেন, "চুরি প্রমাণ করবো আমি কবিতাটি অবিকল আবৃত্তি ক'রে।" এই বলে তিনি সেই দীর্ঘ কবিতা অবিকল পুনরুক্তি করলেন। ক্যাম্‌বেলের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। তখন স্কট্ আবার ঈষৎ হাস্য করে বললেন, "তুমি যে তোমার কবিতা আমাকে পড়ে শুনালে, তাতেই তা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।" এ সকল স্পষ্ট প্রামাণিক আধুনিক দৃষ্টান্তে শঙ্করের সুতীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির বিবরণ প্রমাণিত হচ্ছে।

অবু ঠাকুর

শ্রীকালিদাস নাগ

চন্দননগরের পাশে চাঁপদানির বাগান
শিশু করছে খেলা হাঁস পায়রা ময়ূরের সঙ্গে
কেউ হুঁস রাখে না ;
কত ছেলেই খেলে কত রকমে, দিনরাত।
কোথা থেকে জুটে যায় খেলার তুলি, ভুষো-কালি
অবু লেখে প্রথম ছবি, মাটির প্রদীপ।
ভালো ছেলেরা লেগে যায় বই পড়তে
কেউ হবে জজ, কেউ ম্যাজিষ্ট্রেট্
অবু কিছুই হতে চায় না।
পড়া সারলো নমো নমো করে'
ভেসে চলল রূপের স্রোতে রঙের বন্যায়।
কত ছেলে মেয়ে বৈরাগী বাউলের মুখ
ভেসে ওঠে তার কালি কলমের টানে,
কেউ দেখে না।
সেকালের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে
চল্‌ছে যাত্রা থিয়েটার কথকতা।
অবুর তুলিতে জেগে ওঠে 'কথকের মুখ',
নেচে ওঠে নাচের ওস্তাদ 'বৃহন্নলা',
রেখার নেশায় মশগুল!

(২)

অখ্যাত শিল্পী অবু ঠাকুর
রবি-কাকার দৃষ্টি এড়ায় না ;
শিল্পীর ডাক পড়ে কবির দরবারে,
রেখা ছোটে রূপ দিতে 'স্বপ্ন প্রয়াণে',
সুর দিতে 'বিম্ববতী'র রূপকথায়,
'বধূ'র স্নিগ্ধ-করুণ কান্নায়।
কাকা গড়েন 'মানসী-প্রতিমা', ভাইপো গড়েন 'ক্ষীরের পুতুল',
কাকা রচেন 'চিত্রাঙ্গদা', ভাইপো জমান ছবির সঙ্গত,
কথায় রেখায় চলে গভীর ঐকতান।
কাকা পড়েন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস,
ভাইপো মক্‌সো করেন গোবিন্দদাসের পদ
পদাবলীর পাপড়ী থেকে উঁকি মারেন
অভিসারিকা 'রাধা'।
নেশা জাগে রচ্‌তে হবে রেখার পদাবলী,
অবু ঠাকুরের 'কৃষ্ণলীলা'—
বিরহ মিলন বসন্ত ঝুলন
যেন ছবির ঝরণা ঝরে!
দু-এক জন থম্‌কে দাঁড়ায়
সাড়া পড়ে রসিক মহলে।
রূপের অভিসারে সম্বল ছিল রবি-কাকার সুর,
শিল্পীর পেশা সুরু হ'ল বিদেশী ওস্তাদের কৃপায়,
এল হ্যাভেল্, গিলার্দ্দী, পামার ;
চলল কসরৎ গড়ে তুল্‌তে 'বাঙ্‌লার টিসিয়ান্'
জমে উঠ্‌ল ক্যান্‌ভ্যাস্-ভরা রঙ-বেরঙের ছবি ;
সব বিসর্জ্জন গেল ম্যাকেঞ্জিলায়েলের নিলেমে!

(৩)

অবু ঠাকুর চল্‌লেন মুঙ্গের ;
বিশ্রাম ঘাটের গঙ্গাতীর,
মোগল যুগের ভাঙ্গাবাড়ী,
ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে ওঠে নামে যাত্রীর দল।
খুলে যায় নতুন চোখ
দেখা দেয় সাধারণের বুকে অসাধারণ
মানবপ্রেমিক অবু ঠাকুরের মোহন-তুলির টানে।
প্রাণ পায় বিক্রমাদিত্য কালিদাসের যুগ,
ছবির রূপকথায় ঋতুসংহার, মেঘদূত
রাজপুত পাঠান মোগল কেউ বাদ যায় না
সবাই ভেসে চলে রূপের স্রোতে।
বৌদ্ধযুগ—সুজাতার সেবা, অশোকের সাধনা,জাতক, অবদান
হিন্দুযুগ—কত সাধুসন্ত রাজকাহিনীর চিত্রকাব্য,
আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, ওমর খৈয়ম্,
'সাজাহানের স্বপ্নে'র সঙ্গে 'আবু হুসেন্'
. দারার ছিন্ন মুণ্ডের পাশে 'আলমগীর'

ইতিহাসের স্বপনপুরীর এমন কত ছায়াছবি
অবাক হয়ে দেখেছি ছেলেবেলা থেকে।
ভারত-ইতিহাসের রূপভাষ্যকার
আমাদের শিল্পগুরু অবনী ঠাকুর
সত্যকে করেছেন সুন্দর।
এগিয়ে চলেছেন রূপ-জাহ্নবীর ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করে',
পিছনে ছুটছে—চির নবীন গুরুর পদ চিহ্ন ধরে'—
নতুন চেলার দল—নন্দলালের গোষ্ঠী
অসুন্দর-মরু জয় ক'রে সুন্দরের মন্দির গড়তে।

সে মন্দির না-ইটে না-পাথরে গড়া
সে মন্দির নর-নারীর প্রেমে
বাঙলা দেশের ঘাটে বাটে আকাশে বাতাসে
বোষ্টম বাউলের গানে
ছোট ছেলেমেয়ের পুতুল খেলায়।
'ভারতমা তা'র চরণে অবনীন্দ্রনাথের সার্থক অর্ঘ্য
স্বরূপ সাধকের রূপের আরতি॥

পূর্ণিমা-সম্মিলনীতে অবনীন্দ্র-উৎসবের অর্ঘ্য।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের এক সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। ইয়োরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে ভল্গা ও ডন নদদ্বয়ের মধ্যভাগে, স্টালিনগ্রাডের চারিপাশে ও নগরের ভিতরে, যে প্রচণ্ড শক্তি পরীক্ষা চলিয়াছে তাহার ফলাফলের উপর এই মহাযুদ্ধের গতি বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধেই যে এই মহাসমরের চরম পরিণতি ঘটিবে তাহা নয়, কিন্তু ইহার ফলাফল যে উভয় শক্তিপুঞ্জের পক্ষে সাংঘাতিক তাহা নিঃসন্দেহ। স্টালিনগ্রাডের অবরোধের পর প্রথম কিছু দিনের মধ্যেই যদি নগরের পতন হইত তাহা হইলে এক দিকে যেমন জার্ম্মানদলের পক্ষে কাস্পীয় সাগরের কূলে স্থিত তৈলের আকর দখলের প্রচেষ্টায় সুবিধা হইতে পারিত অন্য দিকে রুশদলের বিরাট্ সৈন্যবাহিনী কিছু হটিয়া যাইয়াও প্রবল থাকিতে পারিত। তাহাদের বলক্ষয় এবং অস্ত্রক্ষয় এরূপ বিষম অনুপাতে হয়ত ঘটিত না। তবে অস্ত্র ও রসদ সরবরাহের বাধা, পিছু হটিবার সঙ্গে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া পরে অতি বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করিয়া রুশদলের পক্ষে পাল্টা আক্রমণের পথে অসম্ভব বাধার সৃষ্টি করিতে পারিত। অন্য দিকে বিচারের বিষয় ছিল স্টালিনগ্রাড রক্ষার চেষ্টা সফল হইলে, জার্ম্মানদলের অবস্থা শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ দাঁড়াইতে পারে। এই সকল কথার সমা[illegible] হইবার পর রুশরাষ্ট্রপতি স্টালিন ও তাঁহার সমরপরিষদ এই স্থলেই যুদ্ধ দান করিয়া শত্রুর বল পরীক্ষার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা স্থির করেন।

ঐরূপ সিদ্ধান্তের পর রুশ সেনাদল অভূতপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত জীবন-মরণ পণ করিয়া যুদ্ধ চালাইতে থাকে। এখন যুদ্ধ যে অবস্থা ধারণ করিয়াছে তাহাতে ব্লিট্‌স্ বা ঝটিকাযুদ্ধের বিদ্যুদ্‌গতি বা ব্যূহগঠন, ছেদন ও স্থিতি পরিবর্ত্তনের দ্রুত বেগ, কোনটাই নাই। এখন চলিয়াছে অস্ত্র বিজ্ঞানের ও যুদ্ধশাস্ত্রের অভিনব প্রথা অনুযায়ী ধ্বংস ও সংহারলীলার প্রলয়তাণ্ডব। এখন এই পঞ্চাশ মাইল বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর উভয় পক্ষের শক্ত প্রয়োগ প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। এই অগ্নিবৃষ্টি, উল্কাপাত ও রক্ত প্লাবনের মধ্যে মহাসমরের বহু জটিল প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে।

যেভাবে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া রুশরাষ্ট্র এখানে যুদ্ধ চালাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে ইহার শেষ নিষ্পত্তির ফল অনেক দূর গড়াইবে। যুদ্ধ যেভাবে চণ্ড হইতে প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধরিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছে তাহাতে মনে হয় এক পক্ষের সম্যক পরাজয় ভিন্ন ইহা ক্ষান্ত হইবার নয়। একমাত্র রুশ দেশের শীত ঋতুর দুর্দ্দান্ত প্রকোপে ইহার আপেক্ষিক শান্তি সম্ভব। শীত প্রবল হইতে এখনও মাসাধিক বাকী আছে, ইতিমধ্যে অনেক কিছুই ঘটিতে পারে। যদি শীতের আরম্ভের পূর্ব্বে জার্ম্মানদল সফল না হয়, তবে ইহা নিশ্চিত যে অক্ষশক্তিপুঞ্জের বিজয় অভিযানে

অতি প্রবল আঘাত লাগিবে, যাহার ফলে তাহাদের শক্তির স্রোতে ভাটা পড়া সুনিশ্চিত। অন্য দিকে জার্ম্মানদল শীতের পূর্ব্বেই জয়যুক্ত হইলে মিত্রপক্ষের বিপদের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা দেখা দুরূহ হইবে।

অক্ষশক্তির দিগ্বিজয়ের পথে প্রবলতম বাধা রুশ রাষ্ট্রের গণসেনা। এই মহাসমরে এ পর্য্যন্ত স্থলে ও আকাশে যত যুদ্ধ হইয়াছে তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট ও সাংঘাতিক ঘাত-প্রতিঘাত সোভিয়েটের রণক্ষেত্রেই ঘটিয়াছে। সোভিয়েটের গণসেনা যে প্রচণ্ড অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে এবং হইতেছে তাহার তুলনায় অন্য সকল ক্ষেত্রের ঘটনাবলী অতি সামান্যই। মিত্রশক্তিপুঞ্জের মধ্যে একমাত্র রুশই আজ ষোল মাস যাবৎ একলা জার্ম্মান, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী এবং ফিনল্যাণ্ডের সম্মিলিত শক্তিকে অবিশ্রাম যুদ্ধে প্রবল বাধা দিয়া যাইতেছে। রুশ গণসেনার শৌর্য্য ও বীর্য্য অতুলনীয়, কিন্তু তাহারও সীমা আছে। সুতরাং তাহারা মিত্রদলের নিকট উপযুক্ত সহায়তা অতি শীঘ্র না পাইলে যুদ্ধের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা বলা যায় না, এবং এই জন্যই ইয়োরোপে দ্বিতীয় সমরক্ষেত্রের সূচনা অতি শীঘ্রই হওয়া মিত্রপক্ষের জন্য অত্যন্তই আবশ্যক। ইহা কি কি কারণে এখন অসম্ভব তাহার বিশদ বিবরণ না প্রকাশিত হইলেও তাহা সকলেই জানে। কিন্তু এখন যাহা অসম্ভব তাহা কোন দিনই সম্ভব হইবে কি না তাহা কেহই জানে না। আজ যেরূপ বাধাবিঘ্ন আছে তাহা তিন বৎসরের আয়োজনের পর ব্রিটেনের পক্ষে লঙ্ঘন করা কঠিন মনে হইতেছে। কাল যদি জার্ম্মানদল পূর্ব্ব-ইয়োরোপ হইতে অপেক্ষাকৃত মুক্ত হয়, তবে ঐ বাধা যে কত গুণ বৃদ্ধি পাইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। সময় এত দিন জার্ম্মানীর সপক্ষেই ছিল এবং এখনও আছে। বস্তুতঃ যদি স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে জার্ম্মানদল সম্যক বিজয়-লাভ করে তবে মিত্রশক্তিদলের পক্ষে শেষরক্ষার প্রশ্ন বহুগুণ জটিলতর হইবে।

* * *

ছয় মাসের ঝটিকাযুদ্ধে জাপান যাহা গ্রাস করিয়াছে তাহার রক্ষা এবং সেখানকার অধিকার দৃঢ়তর করা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যধারার সূচনা এদিকে এখনও দেখা যায় নাই। সলোমন দ্বীপপুঞ্জে ও নিউগিনিতে যে সকল খণ্ডযুদ্ধ চলিয়াছে তাহা ঐরূপ রক্ষণাবেক্ষণেরই অংশ বলিয়া মনে হয়। চীন দেশ হইতে বিলক্ষণ কিছু সৈন্য সরাইয়া অন্য কোথাও লইয়া যাওয়ায় সেখানকার জাপানী অধিকার কিছু লঘু হয়। স্বাধীন চীন সেনা সেই সুযোগ



ফন বক

গ্রহণে মুহূর্ত্তমাত্রও দেরী না করায় কিছু দিনের জন্য চীন দেশের সমুদ্রতীরস্থ প্রদেশগুলিতে জাপানী সেনাদল হটিয়া যাইতে থাকে। সম্প্রতি নূতন সৈন্য আসায় আবার সেই সকল অঞ্চলে নূতন জাপানী অভিযান আরম্ভ হইয়াছে।

নিউগিনি ও সলোমন অঞ্চলে জাপানের সৈন্যদল এখন প্রবলতর বাধার সম্মুখীন হইয়াছে। নিউগিনিতে জাপানী-দলের প্রধান বিঘ্ন মাল সরবরাহে। ঐখানে অষ্ট্রেলিয় এবং মার্কিনী আকাশবাহিনীদ্বয় তীব্র আক্রমণ চালাইবার ফলে জাপানীদল ওয়েনষ্টানলী পর্ব্বতমালার দুর্গম পথে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ আনিতে বাধ্য হইয়াছে। সেই কারণে ওখানে জাপানীদিগের এখন অস্ত্রবলে প্রাধান্য নাই। সলোমন দ্বীপপুঞ্জে মার্কিনী নৌবহর সদা সর্ব্বদাই যুদ্ধ দানে ইচ্ছুক থাকায় সেখানেও জাপানীদিগের বিশেষ সুবিধা হয় নাই। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে ঐ দুই অঞ্চলে জাপানীদল পরাজয় স্বীকার করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত গ্রু জাপান হইতে স্বদেশ প্রত্যা-গমনের পর কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছেন। সেগুলির মূলকথা এই যে, জাপানীদিগের দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধকামতা পূর্ব্বের ন্যায়ই অটুট আছে এবং তাহাদের যুদ্ধশক্তিও প্রচণ্ড। রাষ্ট্রদূত

গ্রু বলেন যে জাপান ষাট লক্ষ সৈন্য যুদ্ধে নিযুক্ত করিতে পারে এবং তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের ক্ষমতাও বিশাল। জাপানী নৌবহর পূর্ব্ব-এশিয়ার মহাসমুদ্র অঞ্চলগুলিতে এখনও প্রবল তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং এখন যে অপেক্ষাকৃত যুদ্ধবিরতি দেখা যাইতেছে তাহার পিছনে নূতন কোনও অভিযানের ব্যবস্থা চলিতেছে ইহা অসম্ভব নহে। জাপান এখন সকল যুদ্ধক্ষেত্রে আনুমানিক বিশ লক্ষ সৈন্য নিয়োগ করিয়াছে মনে হয়। ইহার মধ্যে চীন ও মঙ্গালীয়া-মাঞ্চুকুও সীমান্তে প্রায় পনর লক্ষ সৈন্য আছে। বাকী পাঁচলক্ষ নানা দিকে ছড়াইয়া আছে। সম্ভবতঃ দ্বীপময় ভারত ও নিউগিনি ইত্যাদি ভারতমহাসাগর ও দক্ষিণ প্রশান্তমহাসাগর অঞ্চলে প্রায় তিন লক্ষ এবং ইন্দোচীন, মালয় ও ব্রহ্মদেশে দুই-লক্ষের কিছু অধিক সৈন্য আছে। সৈন্য চলাচলের সংবাদ এখন প্রায়ই চুংকিং-এর ঘোষণায় থাকে; সুতরাং নূতন সৈন্য চীন দেশে পাঠাইয়া সেখানকার অভিজ্ঞ সেনাদলকে ব্রহ্মদেশ বা নিউগিনিতে পাঠান হইতেছে ইহাই সম্ভব। যে শক্তিপ্রয়োগে জাপান ব্রহ্মদেশ জয়ে সমর্থ হইয়াছিল, ভারত আক্রমণে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বলের প্রয়োজন। সুতরাং এদেশের উপর আক্রমণের ব্যবস্থা হইতেছে কি না তাহা বলা অসম্ভব। কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে ভারত আক্রমণের ক্ষমতা এখনও জাপানের আছে, যদিও সে শক্তি এতদূরে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা জাপানের পক্ষে সহজসাধ্য নহে।

জেনারেল ওয়েভেল ব্রহ্মদেশ আক্রমণ ও জাপানীদিগকে বিতাড়িত করার কথা বলিয়াছেন, যদিও তিনি কবে সেটা করা সম্ভব হইবে তাহার কোনও নির্দ্দেশ দেন নাই—এবং তাহা দেওয়াও অনুচিত। তাঁহার বক্তৃতা হইতে এই পর্য্যন্ত মনে করা চলে যে ভারতে স্থিত যুক্তজাতির সমর পরিষদ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা নিজেদের অধিক সবল জ্ঞান করেন এবং ব্রহ্মে ও মালয়ে যেরূপ ঝটিকাবর্ত্তের মত জাপানী অভিযান চতুর্দ্দিকে অধিকার স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল সেরূপ অবস্থা এখন ভারতে ঘটিতে পারে না ইহাই তাঁহাদের বিচার।

কিন্তু যেমন ইয়োরোপে তেমনি এশিয়া ভূমিখণ্ডে কালের দেবতা এখনও অক্ষশক্তিরই প্রতি পক্ষপাত করিতেছেন। যত দিন যাইতেছে ততই জাপান তাহার অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে সুদৃঢ়ভাবে রক্ষণের ব্যবস্থা স্থাপনে সমর্থ হইতেছে, এবং অন্য অক্ষদলের ন্যায় জাপানের প্রতিপত্তি ও শক্তি সকলই নির্ভর করিতেছে তাহার প্রতিদ্বন্দী দলের শক্তিনাশের উপর। স্থাণু হইয়া বসিবার ক্ষমতা অক্ষশক্তি দলের মধ্যে কাহারও নাই। স্থাণু হইলেই সময়ের প্রভাব বিপক্ষ দলের দিকে চলিবে। সুতরাং ভারত সীমান্তে বেশী দিন যে এইরূপ অচল ভাব থাকিবে তাহা মনে হয় না।

মিত্রশক্তি দলের সম্মুখে যে "হারানো মাণিক উদ্ধার" রূপ বিষম সমস্যা রহিয়াছে তাহাও দিনের দিন জটিলতরই হইতেছে। এদিকে শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে সন্দেহ নাই কিন্তু অন্য দিকে বিপক্ষদলও বসিয়া দিন কাটাইতেছে না তাহাও নিঃসন্দেহ।

এদেশের উচ্চতম অধিকারীবর্গ এ বিষয়ে কি ভাবিতেছেন তাহা বুঝা ভার। যে ভাবে কার্য্যকলাপ চলিতেছে তাহার বর্ণনা না করাই ভাল।

ভ্রম-সংশোধন

বর্ত্তমান সংখ্যায় ৮০ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের যে পত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছে তাহা শ্রীরামানুজাচার্য্য গোস্বামীকে লিখিত।

গত আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত "প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ধর্ম্মসমন্বয়" প্রবন্ধে কয়েকটি ভুল রহিয়া গিয়াছে—

পৃষ্ঠা	পাটি		অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৯২	২	"জ্ঞানসাগর" হইতে উদ্ধৃত অংশে	"নবরূপ"	"নররূপ"
ঐ	ঐ	ঐ	"উড়িয়ার রাজা"	„"উড়িয়ার রামা
৫৯৩	২	৪র্থ ছত্রে	"প্রতত্তি"	"প্রকৃতি"
ঐ	ঐ	১৩শ ছত্রে	"নবীন"	"নবীর"
৫৯৪	১	(২) উদ্ধৃত অংশে	"জামিন"	"জমিন"
৫৯৫	১	২৭ম ছত্রে	"শাফকির"	"শাফরিদ"



লেনিনগ্রাড। জগদ্বিখ্যাত হেরমিটেজ্ মিউজিয়ম



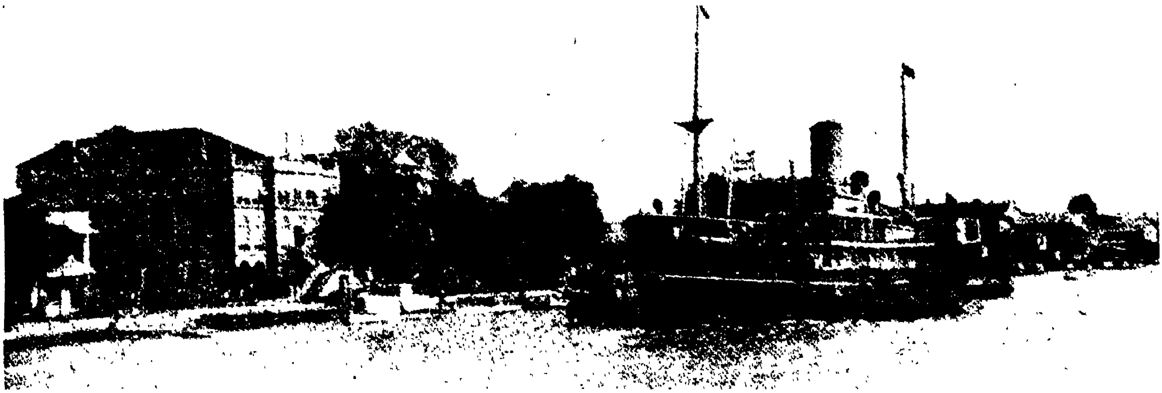
লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিকোলায়েভস্কি সেতু



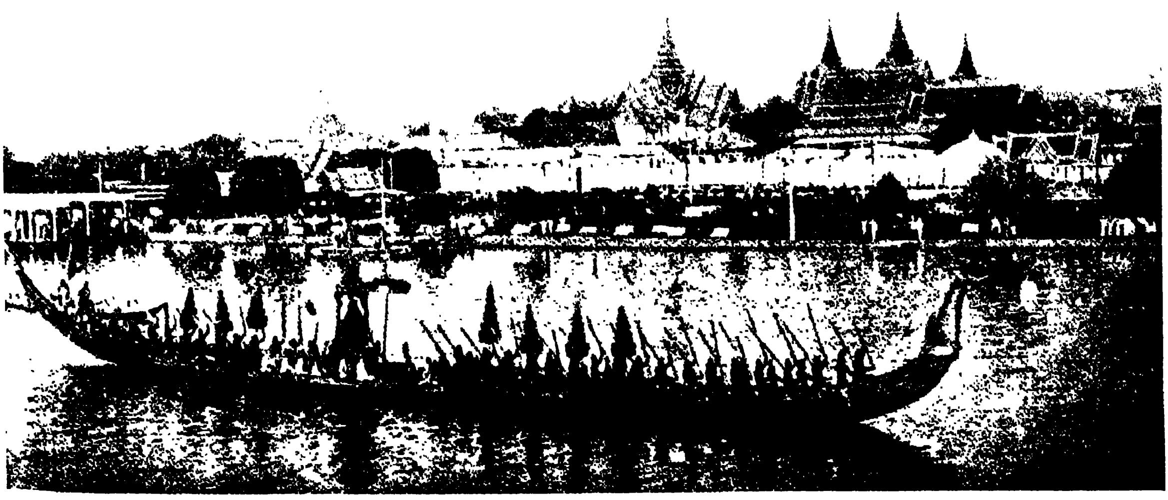
রেঙ্গুন নগরী ও পোতাশ্রয়



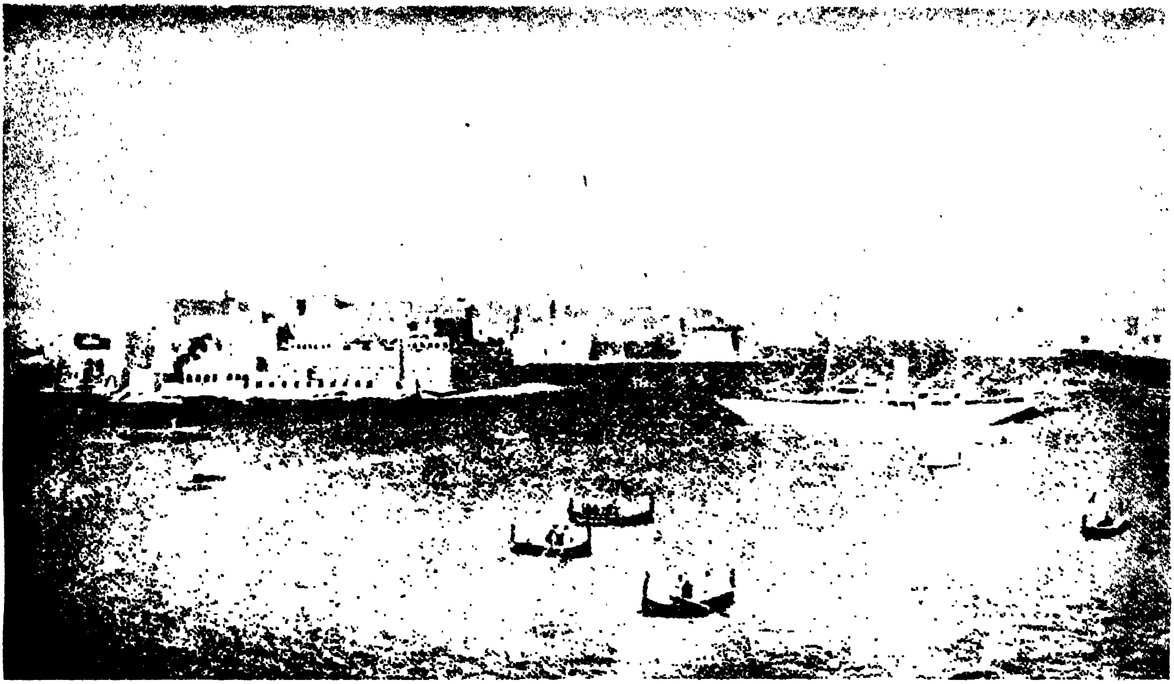
রেঙ্গুন নগরী ও নদী



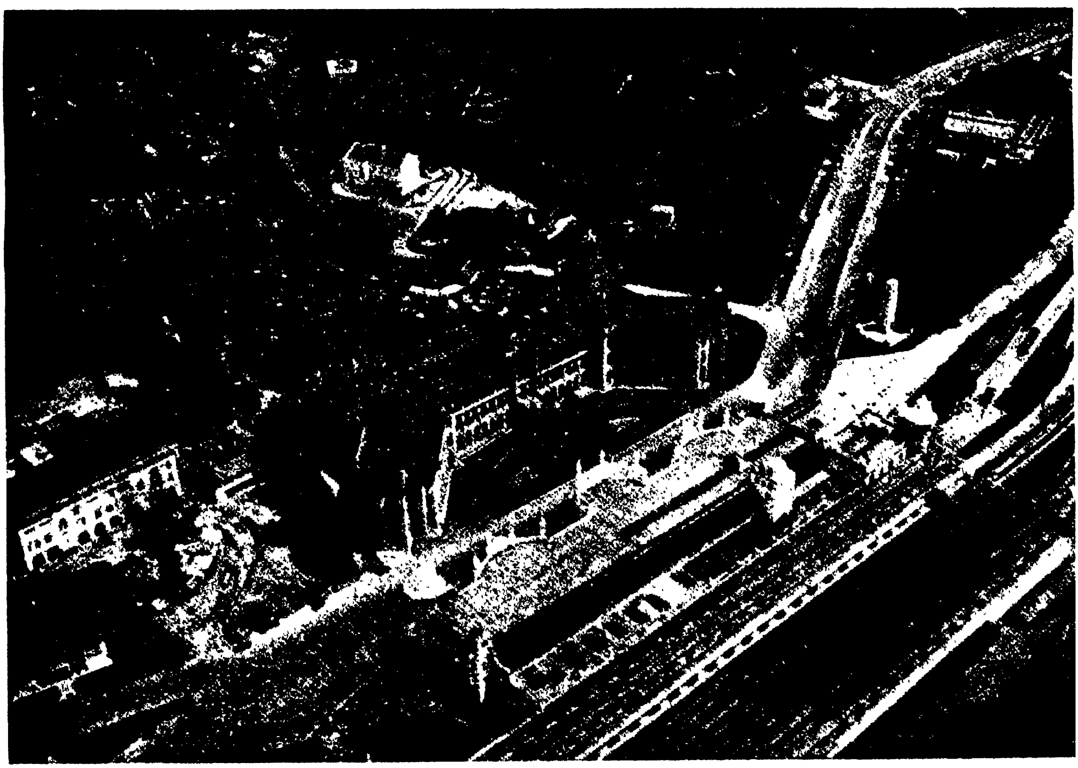
শ্যাম। ব্যাঙ্ককে মেনাম নদের দৃশ্য। সম্মুখে শ্যাম ষ্টিম নেভিগেশন কোং-র অফিস



শ্যাম। ব্যাঙ্ককে প্রধান রাজপ্রাসাদ। সম্মুখে রাজকীয় বজরা



মল্টা। প্রধান পোতাশ্রয়



মালয়। কুয়ালালম্পুর ষ্টেশন, রেলওয়ের প্রধান অফিস ও ম্যাজেষ্টিক হোটেল

আলোচনা

"বল ও সমাজ"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

আশ্বিনের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত অধীররঞ্জন দে মহাশয় শ্রাবণের "প্রবাসী"তে প্রকাশিত আমার "বল ও সমাজ" প্রবন্ধের আলোচনা বা সমালোচনা করিয়াছেন। আমি কোন পাণ্ডিত্যের দাবী করি না, তবে সমালোচক আমাকে যে সমস্ত গ্রন্থ পড়িতে বলিয়াছেন সেগুলি আমি পড়িয়াছি এবং তদতিরিক্ত ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় লিখিত আরও অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছি। সমালোচক যাহা বলিয়াছেন দুই-একটি স্থল ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থলে তাঁহার সহিত আমার মতের বৈষম্য নাই। আমি কম্যুনিজম্ বুঝিতে পারিয়াছি কি না জানি না, কিন্তু সমালোচক মহাশয় যে আমার লেখার তাৎপর্য্য বুঝেন নাই এ বিষয়ে আমি অনেকটা নিঃসংশয়। "প্রবাসী" ও "ভারতবর্ষে" রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে একরূপ ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। সেগুলি সমস্ত প্রণিধানপূর্ব্বক পড়িলে আমার বক্তব্য হয়ত অধীরবাবু বুঝিতে পারিবেন। প্রবন্ধগুলি একটি অখণ্ড গ্রন্থের অংশ মাত্র। কাজেই, ক্ষুদ্র কয়েক পৃষ্ঠা হইতে শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের আমার বক্তব্য বিষয়টি সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্ট ধারণা করিতে না পারিবারই কথা। অধীরবাবু যদি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধগুলি শেষ হইলে তাঁহার সমালোচনা দ্বারা আমাকে সম্মানিত করেন তবে সুখী হইব। এই সামান্য কয়েক পংক্তিকে কেহ অধীরবাবুর সমালোচনার উত্তর বলিয়া মনে করিবেন না। কোন সমালোচনার কোন উত্তর আমি এ পর্য্যন্ত দেই নাই, দিতেও ইচ্ছা করি না, কারণ কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে তাহা সর্ব্বসাধারণের বিচারযোগ্য। সমালোচক লেখকের যাহা ভ্রমপ্রমাদ বলিয়া মনে করেন তাহা ঠিকও হইতে পারে, ভুলও হইতে পারে। তাহার বিচারকর্ত্তা পাঠকবর্গের মধ্যেই রহিয়াছে। যে সমস্ত পাঠক কিছু লেখেন না তাঁহারা যে বিচার করেন না এমন কথা বলা যায় না। এ অবস্থায় সাধারণের দরবারে যাহাকে স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে তাহার পশ্চাতে সর্ব্বদা সশস্ত্র হইয়া আত্মসমর্থনের চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই মনে করি। অবশ্য লেখক কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি কোন অসম্মান দেখাইয়াছেন এরূপ অভিযোগ দিলে সে কথা স্বতন্ত্র। কোন মতবিশেষের প্রতি অশ্রদ্ধার কোন কৈফিয়ৎ আবশ্যক হয় না।

"হসন্তের পত্র"

শ্রীসুধাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়

গত ভাদ্রের প্রবাসীতে 'হসন্ত' মশায় আমাদের শোভাযাত্রা নিয়ে যে সমস্ত যুক্তি ও তত্ত্বের অবতারণা করেছেন, সেগুলো অকাট্য কিনা সে সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদের আশঙ্কা থাকলেও শেষ পর্য্যন্ত এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, এই সম্পর্কে ন্যায় নামক অতি elastic পদার্থটি আপাততঃ হিন্দুর দিকেই আছে।...সুতরাং "হিন্দুর দিকে 'ন্যায়টা' যখন আছেই তখন এক কথায় আমরা মুসলামনদের সমজিদ্‌-গুলোর সামনে দিয়ে আমাদের শোভাযাত্রাগুলো নিয়ে যাবার সময় extra উৎসাহের সঙ্গে জগঝম্প বাজিয়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে দশ দিক্‌ কম্পিত করে আমাদের 'ন্যায়' ও তৎসহ জিদটা বজায় রাখতে পারলেই যে পরমার্থ লাভ হবে তাতে আর সন্দেহ কি? আর যেহেতু বর্ত্তমান civilizationটা (সভ্যতা নয় সেটাকে আর এর মধ্যে না টানাই ভাল) —is a civilization of noises,"—সুতরাং মসজিদগুলোর সামনে আর political platform-এর ওপর আমরা যত বেশী noise করতে পারব,—বিশ্বের দরবারে আমরা তত বেশী civilized বলে গণ্য হব!

একটা কথা স্বঃসিদ্ধ যে, বাংলা দেশে হিন্দুকে আর মুসলমানকে এক সঙ্গে বসবাস করতেই হবে। কিন্তু সে বসবাসটা পরস্পরের পক্ষে মারাত্মক করে তুলতে না হলে—"মুসলমানদের মতলববাজীটা"র—সম্বন্ধে অত্যধিক গবেষণা করবার মতলবটা ছেড়ে দেওয়াই ভাল। আর সেই সঙ্গে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে উভয় পক্ষই যে মনোবৃত্তির public exhibition করে বেড়াচ্ছি সেটারও কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। "অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে"—এর মধ্যে কেহই যে শ্রদ্ধেয় নয়, এটা নিয়ে তর্ক করবার কিছু নেই। কিন্তু এটা ছাড়া আরও একটি অতি গুরুতর বিষয় আছে—সেটা হচ্ছে—অপরের অন্যায়গুলোর অজুহাত দেখিয়ে নিজেদের অন্যায়গুলো কায়েম রাখবার দুর্দ্দমনীয় প্রয়াস।

দুনিয়ার ঘোড়দৌড়ের মাঠে হিন্দু-মুসলমানের বাঙালী জাতটা যে ক্রমেই বড় পেছিয়ে পড়ছে সেটা কি এখনও আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে না? ঢাক পেটাবার রাস্তার হদিস করতে গিয়ে, আর কাটা গরুর মুণ্ডুটা কোথা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তার ব্যবস্থা করতে গিয়েই দিন কেটে গেল—পথ আর এগনো হ'ল না। বাঙালীর ঠাকুর, বাঙালীর মসজিদ, বাঙালীর বাজনা, বাঙালীর নমাজ, বাঙালীর schedule, বাঙালীর percentage, বাঙালীর কর্পোরেশন-এর বোঝাগুলো এমন করেই বাঙালীর ঘাড়ে চেপে ধরেছে যে, সেই বোঝার ভারে আমরা আর এক পাও এগুতে পারছি না, কেবল খোঁটায়-বাঁধা এক জোড়া বলদের মত হিন্দু-বাঙালী আর মুসলমান-বাঙালী সেই দুর্ব্বিষহ বোঝা ঘাড়ে নিয়ে, একজন আর একজনকে গুঁতিয়ে নিজেদের অক্ষমতা জাহির করছি। বি. সি. চাটুজ্যে সেই বলদ দুটোকে সমান উৎসাহের সঙ্গে তাদের 'বলদত্ব' প্রকাশের সুবিধা দেবার প্রস্তাব করে যে খুব অন্যায় করেছেন, তা মনে হয় না। বর্ত্তমানে এই 'Bobine energy'টা যে ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে সেটা জাতির পক্ষে মোটেই কল্যাণপ্রদ নয়।




CASTOROL
CASTOR OIL



পুস্তক পরিচয়

বঙ্গীয় শব্দকোষ — পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত। শান্তিনিকেতন। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

এই উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ অভিধান শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে। ইহার ৮৯তম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার শেষ শব্দ 'সংজ্ঞা' এবং শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ১৮০০।

ড.

জগৎ কোন্ পথে?—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। এস্. কে. মিত্র এণ্ড্ ব্রাদার্স, ১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। দাম এক টাকা চার আনা।

যান-বাহন, কলকারখানার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের লোক পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে পড়েছে। ঘরকুণো হয়ে থাকবার দিন আর নেই। সাহিত্যে, সমাজে আদান-প্রদানের সম্পর্ক উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, আর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সমস্যা এমন ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যে একটিকে না জানলে অপরটিকে ভালো ভাবে জানবার উপায় নেই। এই দিনে যাঁরা আমাদের নিজেদের ভাষায় সহজ ক'রে, দেশ-বিদেশের কথা শোনাতে উদ্‌যোগী হয়েছেন তাঁরা ধন্যবাদের পাত্র। যোগেশবাবুর প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে সাফল্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অল্প পরিসরের মধ্যে তিনি সারা দুনিয়ার আধুনিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাস আলোচনা করেছেন, অথচ তথ্যের বিষয়ে কার্পণ্য করেন নি। রচনার গুণে ইতিহাস গল্পের মত মনোহারী হয়ে উঠেছে। ছেলেদের মতন ক'রে লিখলেও যাতে বইখানা বড়দেরও কাজে লাগে, লেখক সে দিকে দৃষ্টি রেখেছেন। এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের কথা এতে আছে। ভারতবর্ষের কথা নিয়ে হয়েছে সুরু, তার পর স্থান পেয়েছে তার প্রতিবেশী দেশগুলি, এবং পরে পাশ্চাত্য জগৎ। শেষ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সাম্রাজ্যবাদ ও স্বাধীনতা, তাতে আছে তিনটি নিবন্ধ,—চীন, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আফ্রিকা,—বিশেষতঃ মিশর ও আবিসিনিয়ার প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ থাকা উচিত কি না, লেখককে বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করছি।

তিন বছরের [illegible]তনটি সংস্করণ বইখানির জনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বলা বাহুল্য, এ সমাদর আলোচ্য গ্রন্থের ন্যায্য প্রাপ্য। নবতম সংস্করণে তিব্বত সম্বন্ধে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উল্লেখে অন্যান্য বিবরণ সুসম্পূর্ণ করা হয়েছে। ভারত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির শেষ সিদ্ধান্ত, নেতৃবর্গের গ্রেপ্তার এবং দেশব্যাপী বর্ত্তমান বিক্ষোভের কথাও বাদ পড়ে নি।

চলন্তিকা—সম্পাদক: শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। চলন্তিকা পাবলিসিটি সিণ্ডিকেট, জামসেদপুর। মূল্য আট আনা।

ইহা জামসেদপুরে বাংলা-সাহিত্যানুরাগী বাঙালীগণের বার্ষিক পত্রিকা। বর্ত্তমান সংখ্যায় খ্যাত ও অখ্যাত ১৮ জন লেখকের ১৮টি রচনা সঙ্কলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় অনূদিত একটি বৈদিক সূক্ত, শ্রীযুক্ত চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কৃত পার্ল বাকের একটি গল্পের অনুবাদ—"সারা জীবনের পাথেয়" এবং শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "এ গ্রিম ট্র্যাজেডি" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সংখ্যাটি কোন্ বৎসরের তাহা উল্লিখিত থাকা উচিত ছিল।

উরোপের শিল্পকথা—শ্রীঅসিতকুমার হালদার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। দামের উল্লেখ নাই।

গ্রন্থকার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বেই বাংলা-সাহিত্যে সমাদর লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে তিনি সংক্ষেপে ইউরোপীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য এবং চিত্রকলার ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও সুবোধ্য এবং হৃদয়গ্রাহী। কয়েকটি ছাপার ভুল এবং একই নামের বিভিন্ন বানান সংশোধিত হইলে ভাল হইত।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হিন্দুর জীবন-মরণ সমস্যা লেখক ও প্রকাশক—শ্রীনলিনীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, জঙ্গলবাড়ী, ময়মনসিংহ। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য পুস্তকে গ্রন্থকার হিন্দুসমাজ ও হিন্দুজাতির বর্ত্তমান

সঙ্কটাবস্থার বিষয় বেশ স্পষ্ট ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু নরনারীকে মরণের পথ হইতে জীবনের পথে ফিরাইয়া আনিবার বিবিধ উপায় তিনি আলোচনা করিয়াছেন। হিন্দুর সাধনা বৈদিক সাধনা। সে সাধনা বল, বীর্য, শক্তি, তেজ ও মহানের সাধনা। আজ এই ভাঙা-গড়া আবর্ত্তনের যুগে হিন্দুকে পরিপূর্ণরূপে ক্ষাত্রধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে ক্ষাত্রবীর্যের যেরূপ অভাব ঘটিয়াছে জগতে তাহার তুলনা নাই। এখন হিন্দুকে তাহার আত্মবিনাশী ভাব, ধারণা ও অভ্যাস হইতে মুক্ত হইয়া দৃপ্ত পৌরুষ ও বল-বীর্য্যের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, গীতার ধর্ম্ম অনুসরণ করিতে হইবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিচলিত মনোবৃত্তিই গীতার মূলমন্ত্র। হিন্দুকে মনে রাখিতে হইবে যে অতীতের দুর্দ্দিনে হিন্দু মরে নাই, বর্ত্তমানেও হিন্দু মরিবে না এবং ভবিষ্যতেও হিন্দু মরিবে না। হিন্দু অমৃতের পুত্র—হিন্দু মরণ-বিজয়ী মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, জনসাধারণের মধ্যে এই পুস্তক আদৃত হইবে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

শোভাসিংহের বিদ্রোহ ও বিশালাক্ষীমাতার ইতিবৃত্ত—শ্রীরজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। মেদিনীপুর, মিউনিসিপ্যাল অফিস রোড, "লক্ষ্মী ভবন" হইতে শ্রীবিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বরদাগ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিশালাক্ষী দেবীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই বিবরণ প্রধানত জনশ্রুতি অবলম্বনে রচিত। পূজা-পদ্ধতি ও ধ্যান দেওয়া না থাকায় দেবতার প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করা কঠিন। এই দেবতা এই অঞ্চলের জমিদার রাজা শোভাসিংহের আরাধ্য দেবতা ছিলেন। তাই বর্ধমানের মহারাজের বিরুদ্ধে শোভাসিংহের বিদ্রোহ এবং তাহার ফলে পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সর্বত্র যে অশান্তির সূত্রপাত হয় তাহার বিবরণ প্রসঙ্গ ক্রমে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে এই পুস্তিকায় দেওয়া হইয়াছে। ইংপূর্বে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত বাংলার বিভিন্ন জেলার গেজেটিয়ার ও ষ্টুয়ার্ট লিখিত বাংলাদেশের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এই বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। সুতরাং বাঙালী পাঠক ইহা পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বাইওকেমিক ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রদর্শিকা—ডাঃ নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়। হোমিও পাবলিশিং হাউস, উয়াড়ী, ঢাকা। মূল্য ৩৲ টাকা।

প্রায় ৭০ বৎসর হইল ডাক্তার শুস্লারের বাইওকেমিক চিকিৎসা প্রচলিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া চিকিৎসা-জগতে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি অতি সরল ও বোধগম্য ভাষায় লিখিত হইয়াছে এবং ইহার ৭ম সংস্করণ হইতেই বুঝা যায় যে এইরূপ পুস্তকের চাহিদা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহাতে ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা উভয়েরই সমাবেশ আছে এবং গ্রন্থকার স্বীয় অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার বিশিষ্ট পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই দিয়াছেন। একটু যত্ন ও চেষ্টার সহিত অধ্যয়ন করিলে সকলেই কিছু না-কিছু উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীনকুলেশ্বর সরকার

হোমিওপ্যাথিক সহজ গৃহ-চিকিৎসা—এস্. এন্. রায় এণ্ড কোং, ৮৫।এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

অল্প মূল্যের যে সকল পুস্তক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালীকে সহজ ও বোধগম্য করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছে উক্ত পুস্তকখানিও সেই পর্য্যায়ভুক্ত নয় এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না। মহাত্মা হ্যানিম্যান প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে পরীক্ষিত হইয়াছে যে প্রতি ঔষধে শত শত বিভিন্ন লক্ষণ বিরাজমান আছে। রোগাক্রান্ত মানব শরীরেও শত শত রোগ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। রোগের এই শত শত লক্ষণসমূহ কোনও ঔষধে বিদ্যমান লক্ষণসমূহের সমশ্রেণীভুক্ত হইলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ঐ নির্দ্দিষ্ট ঔষধে আরোগ্য লাভ করে। অতএব ঔষধের ২।৪টি মাত্র এই পুস্তকে বর্ণিত লক্ষণ মিলাইয়া রোগ চিকিৎসার সহজ পন্থা অবলম্বন করা ভ্রমপূর্ণ। উপরন্তু এই ক্ষুদ্র গৃহ চিকিৎসা পুস্তকে কঠিন ও দুরারোগ্য রোগসমূহের পরিচয় দিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া ও উহাদের চিকিৎসা করিবার জন্য সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণকে অনুরোধ করিয়া লেখক ও প্রকাশক অতি দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। ইউরিমিয়া, উপদংশ, কালাজ্বর, ধনুষ্টঙ্কার, নিমোনিয়া, মেনিনজাইটিস্ প্রভৃতি রোগ চিকিৎসায় যেখানে বিচক্ষণ চিকিৎসকমণ্ডলীকেও বিচলিত হইতে দেখা যায় সেখানে লেখক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণ দ্বারা স্বহস্তে ঐ রোগ-সমূহের চিকিৎসা করাইবার জন্য এত গৃহ-চিকিৎসা পুস্তকে কয়েকটি মাত্র লক্ষণ উল্লেখ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন। এই পুস্তক পাঠে স্বতঃই ইহা মনে হয়—যেন রোগ হইতে কোন ভীতির কারণ নাই, সাধারণ নরনারীর দ্বারাও সকল রোগীর চিকিৎসা সম্ভব—যে স্বল্পসংখ্যক লক্ষণ বর্ণিত ঔষধ এই সহজ গৃহ-চিকিৎসা পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহারাই সর্ব্বকালে ও সর্ব্বরোগে ধন্বন্তরি। ইহাই প্রচার যদি লেখকের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে লেখকের শ্রম সফল হইয়াছে সন্দেহ নাই।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দে

শাশ্বতী—শ্রীনির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও গ্রন্থকারের নিকট (১।১সি সদানন্দ রোড, কালীঘাট) প্রাপ্তব্য। মূল্য পাঁচ সিকা।

একান্নটি কবিতার সমষ্টি। অধিকাংশই আধ্যাত্মিক ভাবের কবিতা। প্রেমের দু-চারটি যা কবিতা আছে তাহাতেও রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর ছায়া সুস্পষ্ট। 'আমার কথা বা মুখবন্ধে' জানিলাম গ্রন্থকারের সাহিত্য সাধনার ইহাই 'প্রথম অর্ঘ'। অর্ঘ্য 'দীন' হইয়াছে সন্দেহ নাই। লেখকের বয়স রচনার পরিপক্কতার অনুপাতে চৌদ্দ বা পনেরোর অধিক হইলে বলিব বই ছাপাইবার এই মোহ তাঁহার পরিহার করাই উচিত ছিল, কারণ ছন্দে মিলে ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে কোন কবিতাতেই বৈশিষ্ট্যের আভাসমাত্র নাই।

"পশ্চিমেরি আকাশ জুড়ে
দিনের চিতা উঠল জ্বলে," (পৃঃ ১২)
"বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজে না হায়," (পৃঃ ২৮)
"নীল আকাশে মেঘের ভেলা
কে ভাসাল প্রভাত বেলা" (পৃঃ ৩৯)
"আজিকে তাহারে যে গো সে কথাটি বলা যায়
এমনি কাজল ঘন সজল বরিষায়— (পৃঃ ৫২)

এই ধরণের পঙক্তিকে রবীন্দ্রানুসরণ বলিব না রবীন্দ্রানুকরণ বলিব?

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একদা নিশীথ কালে ও অন্যান্য গল্প—শ্রীমনোজ বসু। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

কথাসাহিত্যে শ্রীযুক্ত মনোজবাবুর স্থান সুনির্দ্দিষ্ট। আলোচ্য পুস্তকখানিতে নয়টি গল্প আছে। আটটি গল্পই সচিত্র। মনোজবাবুর ভাষাসম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই। যে-কোন গল্প পড়িতে আরম্ভ করুন, আপনাকে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইবেই। গল্পগুলি খুবই হাল্কা ছন্দে লেখা, হাস্য-পরিহাস ইহার পাতায় পাতায়। এক দিকে কলেজের বা সদ্য কলেজ-উত্তীর্ণ যুবক-যুবতী, অন্য দিকে পরিণতবয়স্ক পিতা, মাতা বা অভিভাবক—ইহাদের চালচলন, ধরণধারণ, হাবভাব কার্য্যকলাপ গল্পগুলির রস জোগাইয়াছে। 'একদা নিশীথ কালে' নীলাদ্রির বিপদ সদ্য-বিবাহিত ভাবী আইনের ছাত্রকে নিশ্চয়ই সাবধান করিয়া দিবে। 'নৌকা-বিলাসে' প্রভাত ও অনুপমার নৌকা পথে যাত্রা ও পথবিভ্রম অসোয়াস্তিকর হইলেও বড়ই উপভোগ্য, পাঠকালে নদীবহুল বা বিল অঞ্চলের পাঠকদের পথবিভ্রমের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'খাজাঞ্চি মশাই ও ভাই-ঝি' পাঠের পর মনে একটি রেশ রহিয়া যায়। সেরেস্তায় বসিয়া 'খাজাঞ্চি মশাই'য়ের লুকাইয়া লুকাইয়া ভাগবত পাঠ ও যাত্রা গান শুনিবার ঐকান্তিক আগ্রহ আমরা কখনও ভুলিব না। শেষ গল্প 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'। ইহা বাস্তবিকই মধুরেণ সমাপয়েৎ। বইখানিতে কিছু মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে।

বার্ষিক শিশুসাথী, ১৩৪৯—শ্রীআশুতোষ ধর কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বার আনা।

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও চিত্র সম্পদে 'বার্ষিক শিশুসাথী' পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারেও বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে। বাংলার বহু খ্যাতনামা লেখকের রচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। আজিকার শিশুসাহিত্য এক হিসাবে বিশেষ ভাগ্যবান্। সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত, এরূপ বহু লেখক ও সাহিত্যিক শিশুমনের উপযোগী রচনার পরিবেশনে মনঃসংযোগ করিয়াছেন। বার্ষিক শিশুসাথী তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহা তরুণ পাঠক-পাঠিকার 'সাথী' হইবার সত্যই যোগ্য।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

যোগসাধনার ভিত্তি—শ্রীঅরবিন্দ। অনুবাদক শ্রীনলিনী-কান্ত গুপ্ত। প্রকাশক—কাল্‌চার পাব্‌লিশার্স, ২৫এ বকুলবাগান রো, কলিকাতা। ফিকে হল্‌দে রঙের এণ্টিক্ কাগজে ছাপা। পৃষ্ঠা ১২০।

প্রকাশকের ভাষায়—"শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার শিষ্যগণের প্রশ্নের উত্তরে যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতে সঙ্কলন করিয়া ইংরাজি Bases of Yoga নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়; এই পুস্তকখানি তাহারই বাংলা অনুবাদ।" অনুবাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত শ্রীঅরবিন্দের প্রধান শিষ্যগণের অন্যতম,—গুরুর বিশিষ্ট সহকারী। তাঁহার রচিত "সাহিত্যিকা", "আধুনিকী," "বাংলার প্রাণ" প্রভৃতি গ্রন্থে গভীর চিন্তাশীলতা ও অসাধারণ রসবিচার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে পাওয়া যায় শ্রীঅরবিন্দের ভাবদৃষ্টি ও ভাবধারার অদ্ভুত মিশ্রণ ও প্রকাশ। বর্ত্তমান ভারতে তথা বর্ত্তমান জগতে শ্রীঅরবিন্দ এক মনস্বী মহাপুরুষ। ভারতের ধর্ম্মধারা ও সাধনার ধারা তাঁহার চরিত্রে সুপরিস্ফুট হইয়াছে। এই ধর্ম্ম পালনের যে-সব বিধি-নির্দ্দেশ তিনি শিষ্যগণকে দিয়াছেন তাহা সাধারণের পক্ষে পালন করা দুষ্কর ব্যাপার। তথাপি সাধারণ মানুষই অনেক সময় অসাধারণ চিন্তার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া অসাধারণত্ব লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী নির্দ্দেশগুলির অনুবাদ করিয়া অনুবাদক আমাদের মত সাধারণ লোকের উপকার করিয়াছেন। অনুবাদকের নিজের মনন ও চিন্তন গভীর থাকায় অনুবাদ শ্রীঅরবিন্দের ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

পুস্তকখানিতে স্থিরতা—শান্তি—সমতা, শ্রদ্ধা—আস্পৃহা সমর্পণ, বাধাবিঘ্ন, বাসনা—আহার—কাম এবং শারীর চেতনা—অবচেতনা—সুপ্তি ও স্বপ্ন—ব্যাধি ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দ্দেশ বা উপদেশ সংগৃহীত হইয়াছে। এই বিষয়ে কৌতূহলী পাঠক পুস্তকখানি পড়িয়া অশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

—গুপ্ত

দেশ-বিদেশের কথা

কোলাপুরে রবীন্দ্র-স্মৃতি-বার্ষিকী

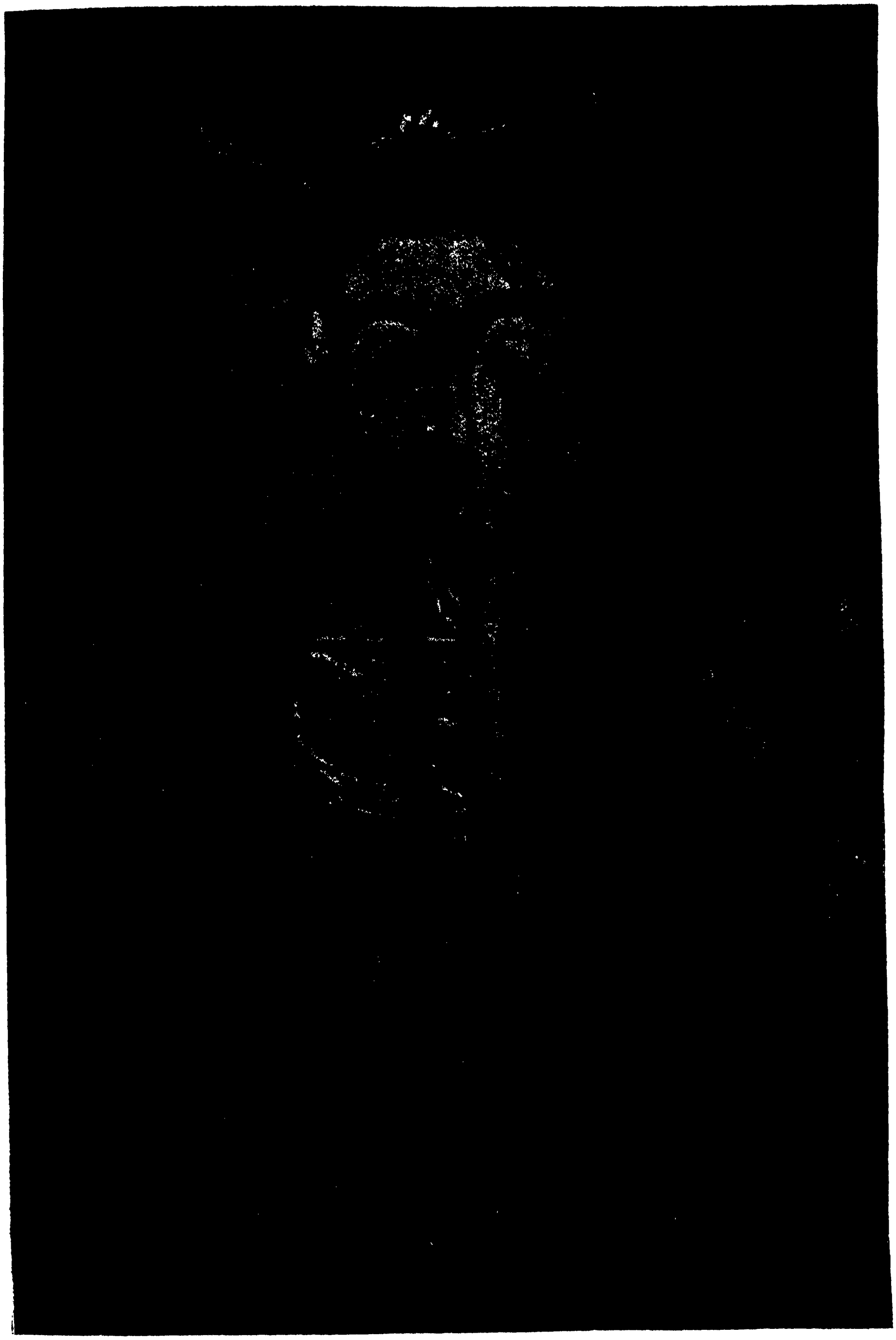
এবার অপূর্ব্ব ঘটনা সহযোগে বাংলা হইতে দুই হাজার মাইল দূরবর্ত্তী কোলাপুর রাজ্যের রাজধানীতে শতাবধি বাঙ্গালী স্থানীয় লোকের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া ৺রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত করিয়াছেন। বর্ম্মা সরকারের আফিস কোলাপুরে স্থানান্তরিত হওয়াতে এখানে এত বাঙ্গালী সমাগম হইয়াছে। স্থানীয় রাজারাম কলেজের অধ্যাপক ডাঃ অবিনাশচন্দ্র বসুকে সভাপতি ও শ্রীযুত শান্তি গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুত এ. বি. পার্টেকে সেক্রেটারী করিয়া কোলাপুরে "রবীন্দ্র-পরিষদ" স্থাপিত হয়, এবং সে পরিষদ দ্বারা রবীন্দ্র-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। রাজারাম কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বি. এইচ. থার্ডেকর সে সভার সভাপতি হইয়াছিলেন এবং তথায় মারাঠী ঔপন্যাসিক শ্রীযুত এন. এস. ফড়কে, ডক্টর বসু ও শ্রীযুত আইয়ারের বক্তৃতা হয় এবং শ্রীযুত পরেশনাথ মৈত্র, শ্রীযুত গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত অজিতকুমার রায়, শ্রীযুত নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত প্রীতিবিকাশ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের বাংলা গান গাহিয়া সমবেত জনতাকে প্রীত করেন। স্থানীয় মহারাণী তারা বাঈ গার্লস্ হাই স্কুলের ছাত্রীরা সঙ্গীত দ্বারা সভার উদ্বোধন করেন ও স্কুলের কয়েকটি মেয়ে এবং শ্রীমতী হিমা কেসর কোডী (মহারাষ্ট্রে বিবাহিত বাঙ্গালী মহিলা) ও শ্রীযুত পার্টে ইংরেজীতে রবীন্দ্রকাব্যের আবৃত্তি করেন এবং স্থানীয় বহু সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সঙ্গীত ও বাদ্য দ্বারা অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন। বর্ম্মা হইতে আগত। শান্তি-নিকেতনের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী কুমারী সিং (নেপালী মহিলা) পরিষদের পক্ষ হইতে নারীদের নিমন্ত্রণের ও অভ্যর্থনার কার্য্য করেন। সভায় শতাধিক স্থানীয় মহিলা ও কয়েক শত স্থানীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। কোলা-পুরে বাঙ্গালীর এরূপ অনুষ্ঠান এই প্রথম।

এতদ্ভিন্ন বাংলাতে আর একটি অধিবেশন হয়। সেখানেও উপরোক্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণ এবং শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুত সুজিত চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত রূপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুত সুনীল-বরণ রায়, শ্রীযুত সুধীরকান্ত দাস ও অন্যেরা প্রবন্ধ পাঠ, আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতি দ্বারা অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। ডক্টর বসু সে সভায় সভাপতিত্ব করেন।

বর্ম্মা হইতে বহু দুর্য্যোগ ও পথক্লেশের পর সুদূর কোলাপুরে আসিয়া বাঙ্গালীরা স্থানীয় লোকের সহযোগে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে সেক্রেটারী ব্যতীত শ্রীযুত সুনীলবরণ রায় ও শ্রীযুত সুধাংশু গুপ্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা



প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয়

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪২শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

"শক্তিপূজা কথার কথা নয়"

হিন্দু সমাজের বালকবালিকারা, সাধারণ অশিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরা, এবং প্রাপ্তবয়স্ক বিস্তর শিক্ষিত লোকেও দুর্গাপূজার মজার অংশেই সন্তুষ্ট থাকেন, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী যাঁরা তাঁরা তাতে সন্তুষ্ট থাকৃতে পারেন না। তত্ত্বজ্ঞানী হিন্দু অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় গত ১৩৪৮ সালের "মেদিনীবাণী"র শারদীয়া সংখ্যায় "শক্তিপূজা কথার কথা নয়" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে তিনি নিম্নলিখিতরূপে শক্তিপূজার মর্ম উদ্‌ঘাটন ক'রেছেন।

আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহে রাত্রি ১টার সময় পূর্ব আকাশে কালপুরুষ নক্ষত্রের উদয় হয়। একটি পুরুষের আকার বোধ হয়। উত্তরে তিনটি ছোট ছোট তারা পুরুষের মস্তক, পূর্বে ও পশ্চিমে দুইটি উজ্জ্বল তারা দুই বাহু, কটিতে তিনটি তারা মেখলা, দক্ষিণে পূর্বে ও পশ্চিমে দুইটি উজ্জ্বল তারা দুই পদ, আর মেখলার দক্ষিণে দুই পদের মধ্যে তিনটি অস্পষ্ট তারা বস্ত্রাঞ্চল। জ্যোতিষে নক্ষত্রটির নাম মৃগ। বৈদিক কালে এই নক্ষত্রে কেহ বরাহ কেহ মহিষ কেহ অসুর ইত্যাদি দেখিয়াছিলেন। যে তিন তারায় মেখলা বলিতেছি, সেটি ত্রিকাণ্ডশর। বৈদিক গ্রন্থে আছে, তদ্দারা মৃগ বিদ্ধ হইয়াছে। অথবা ত্রিশূল, তদ্দারা মহিষ বিদ্ধ হইয়াছে। ত্রিশূল দক্ষিণ-পূর্বে বাড়াইলে একটি অতিশয় উজ্জ্বল তারা দীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। এটি রুদ্র। ইনিই কিরাত-রূপে মৃগ বা বরাহ বধ করিতেছেন। এই তারাই চণ্ডী মহিষাসুর বধ করিতেছেন। আকাশে এই ব্যাপার নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। ছয় হাজার বৎসর পূর্বে শরৎকালে সূর্যাস্তের পর দেখা যাইত, এখন পৌষ মাসে সূর্যাস্তের পর দেখা যায়।

একদা মহিষাসুর প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া দেবগণকে পরাজিত করিয়াছিল। কোন একটি দেবতা তার সম্মুখীন হইতে পারেন নাই। তখন সকল দেবতার তেজঃ পুঞ্জীভূত হইলে ভয়ঙ্করী চণ্ডী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তিনিই দুর্গা। নারায়ণ উপনিষৎ (২।২) বলিতেছেন, দুর্গা অগ্নিবর্ণা, তেজে জ্বলন্তী। এই কারণে দুর্গা-প্রতিমা রক্তকাঞ্চনবর্ণা। মস্তকে জটাজূট, জ্বালামালা।

কেন-উপনিষদে আছে একদা অসুরগণের সহিত সংগ্রামে দেবতারা জয়ী হইয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, এই বিজয় তাঁহাদেরই, এই মহিমা তাঁহাদেরই।

তিনি জানিতে পারিলেন, এবং তাঁহাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। কিন্তু এই পূজ্য-স্বরূপ কে? ইহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না। তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন, হে জাতবেদঃ (সর্বজ্ঞ), এই পূজনীয় স্বরূপ কে? তুমি জানিয়া আইস।

অগ্নি নিকটে গেলেন। **তিনি** বলিলেন,

—তুমি কে?

—আমি অগ্নি, আমি জাতবেদাঃ।

—এমন যে তুমি, তোমাতে কি শক্তি আছে?

—পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি তৎসমুদয় দগ্ধ করিতে পারি।

—এই তৃণটি দগ্ধ কর।

অগ্নি সমুদয় বল প্রয়োগেও দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বলিলেন, এই পূজনীয় স্বরূপ কে, আমি জানিতে পারিলাম না।

দেবতারা বায়ুকে পাঠাইলেন। তিনি গেলেন।

—তুমি কে?

—আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা (আকাশে আমার নিশ্বাস প্রশ্বাস)

—এমন যে তুমি, তোমাতে কি শক্তি আছে?

—পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি তৎসমুদয় গ্রহণ করিতে পারি।

—এই তৃণটি গ্রহণ কর।

বায়ু সমুদয় বল প্রয়োগেও গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং বলিলেন, এই পূজনীয় স্বরূপ কে, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না।

দেবতারা ইন্দ্রকে বলিলেন, হে মঘবন্ (ঐশ্বর্য্যশালী) তুমি জানিয়া আইস।

ইন্দ্র নিকটবর্তী হইলে **তিনি** অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্র দেখিলেন, সেই আকাশে স্ত্রীরূপিণী বহুশোভমানা হৈমবতী উমা। ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পূজনীয় স্বরূপ কে? উমা বলিলেন, ইনি ব্রহ্ম। ইঁহার প্রদত্ত বিজয়েই তোমরা মহিমান্বিত হইয়াছ।

ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ শক্তির উপাসক ছিলেন। ভূতলে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু, স্বর্গে ইন্দ্র (মহিমান্বিত সূর্য), এই তিন দেবতা ত্রিলোকের শক্তি। কিন্তু কেহই বিশ্বভুবনের সমগ্র শক্তি নহেন। প্রত্যেকেই অংশাংশ। কর্মদ্বারা শক্তির প্রকাশ হয়, ঋষিগণ যত প্রকার কর্ম দেখিয়াছিলেন, প্রত্যেকের শক্তিকে দেবতা বলিতেন।

কিন্তু সকল দেবতাই স্বর্গে, কেহই প্রত্যক্ষ হন না। কেবল অগ্নি এক শক্তি, প্রত্যক্ষ হন। এই কারণে ঋষিগণ অগ্নিকে সর্বশক্তির প্রতিমা করিয়া তাঁহার সম্মুখে এক এক দেবতার উদ্দেশে স্তব করিতেন, কাম্য বর প্রার্থনা করিতেন।

দুর্গা সেই অগ্নি, যাহাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তি পুঞ্জীভূত হইয়াছে। তিনিই সৃজনরূপা, পালনরূপা, সংহাররূপা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্ত দেবীসূক্ত নামে খ্যাত। এখানে দেবী বাঙ্‌ময়ী হইয়া বলিতেছেন, আমি দেবতাদের যাবতীয় কর্ম করি। আমি যাবতীয় দেবতাকে ধারণ করি। আমি পিতা আকাশকে প্রসব করিয়াছি। আমি তাবৎ ভুবন নির্মাণ করিয়াছি। আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্তোতা, বলবান কিংবা বুদ্ধিমান্ করিতে পারি। ইত্যাদি।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণ দেবী-মাহাত্ম্যে দেবী-সূক্তের বিস্তারিত ভাষ্য করিয়াছেন। এই কারণে দুর্গাপূজায় দেবী-সূক্ত পাঠ ও চণ্ডী-মাহাত্ম্য পাঠ অবশ্য কর্তব্য। পূজাকর্ম দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে কর্ম মিথ্যা, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ভক্তি না জন্মিলে তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যা। এই কারণে কবি বলিয়াছেন, "দুর্গাপূজা কথার কথা নয়।"

—

রবীন্দ্র-বার্ষিক স্মৃতিপূজা

চিরস্মরণীয় ২২শে শ্রাবণ আগত দেখে সুদূর দাক্ষিণাত্যের মদন-পল্লীতে অবস্থিত "আরোগ্যভবন" স্বাস্থ্যনিবাস থেকে শ্রীমায়া দাশগুপ্তা আমাদের লিখেছিলেন :

"এত দিন ধরিয়া দেশ ও জাতি কবির কাছ হইতে কেবল অঞ্জলি ভরিয়া গ্রহণই করিয়াছে কিন্তু এখন তাহার প্রতিদানে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার দিন আসিয়াছে। কবি যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন আমাদের সম্মুখে তাহাকে আমাদের ভুলিলে চলিবে না। তাঁহার আজন্ম সাধনার ধন "বিশ্বভারতী"কে শুধু বাঁচাইয়া রাখিলেই চলিবে না, জগতের কাছে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তির যথোপযুক্ত সম্মান দিতে হইবে। কবি যে-সব কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন সেই সব কাজ সম্পূর্ণ করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন, যদিও আমাদের দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এ বিষয়ে খুবই চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু এই এক বৎসরে তাঁহারা কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা এখনও জানা যায় নাই।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে হয়ত অবান্তর হইবে না—গত ডিসেম্বর মাসে গড়ের মাঠে নকল যুদ্ধের দৃশ্য দেখাইয়া সরকার-পক্ষ যুদ্ধের জন্য অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে অর্থ দান করিতে ধনী দরিদ্র সকলেরই আগ্রহ দেখা গিয়াছিল—সৎকার্য্যে অর্থদান উদার মনের পরিচায়ক সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার বক্তব্য যে, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের জনসাধারণ নিজের দেশের প্রকৃত গুণীকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইতে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না। গত আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দবাবু যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহা যে ঠিক সময়োপযোগী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের একখানা করিয়া পুস্তক কিনিয়া যদি আমরা প্রত্যেকে কবির বিশ্বভারতীকে সাহায্য করিয়া কবির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাই তাহা হইলেই আমাদের বার্ষিক স্মৃতিপূজা সম্পূর্ণ ও সার্থক হইবে।

আজ আমরা বাঙ্গলা দেশ হইতে বহু দূরে কয়েকটি বাঙালী দুরন্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া স্বাস্থ্যনিবাসে আরোগ্য লাভের আশায় আসিয়াছি। আজিকার দিনে যদি আমরা প্রত্যেকে কিছু কিছু অর্থ দিয়া আমাদের বাঙ্গলা লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পুস্তক ক্রয় করিয়া রাখি তবেই আমরা বিশ্বভারতীকে সামান্য সাহায্য করিয়া কবির স্মৃতির প্রতি প্রকৃত সম্মান দেখাইতে সমর্থ হইব। আমার আশা আছে কেহই এই প্রস্তাবে আপত্তি করিবেন না।"

—

বাংলার নারী-আন্দোলন ও আত্মরক্ষা-সমিতি

বাঁকুড়ার "জাগরণ" ত্রৈমাসিকের বর্ত্তমান আশ্বিন সংখ্যায় বাংলার নারী-আন্দোলন ও আত্মরক্ষা-সমিতির কতকগুলি সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তার ভূমিকাস্বরূপ বলা হয়েছে :—

আসন্ন জাপ আক্রমণ বাংলার নারীদের মধ্যে যে চেতনার সঞ্চার করেছে তারই ফলে বাংলার বিভিন্ন জেলায় নারী-আন্দোলনের সাড়া পড়ে গেছে। নিজেদের মানসম্ভ্রম, নিজেদের ধনপ্রাণ বাঁচাবার জন্য তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে সংঘবদ্ধ হচ্ছে, অসহায়ের মত ঘরের কোণে চুপ ক'রে আর বসে নেই।

সংবাদগুলি রংপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, মুন্সীগঞ্জ, আসাম, বহরমপুর, খুলনা, নোয়াখালি, মাদারিপুর, সুনামগঞ্জ, পাবনা, বরিশাল, ও বাঁকুড়া জেলা সম্বন্ধে। বাঁকুড়া শহরের কাজ আমরা স্বয়ং কিছু দেখেছি। বাঁকুড়ার সংবাদ এইরূপ :—

কলিকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী বাঁকুড়ায় ২রা আগষ্ট ছাত্রী কমীটির উদ্যোগে নিখিল-বঙ্গের শাখা কমীটি গঠিত হয়েছে।

বাঁকুড়া শহরে আটটি পাড়ার মধ্যে পাঁচটি পাড়ায় মহিলা ও ছাত্রীদের সাপ্তাহিক বৈঠক হয়। বাংলার মহিলা ও ছাত্রীদের প্রতি কলিকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির আবেদন-পত্র শহরের বিভিন্ন পাড়ায়ও

বিষ্ণুপুর, সানবাঁধা, খাতড়া, তিলুড়ী প্রভৃতি গ্রামে বিলি করা হয়েছে ও বোঝান হয়েছে।

২১শে আগষ্ট লালবাজার মিশনারী স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী শতদল রায়ের সভানেতৃত্বে এক সভা হয়।

৩০শে আগষ্ট স্কুলডাঙ্গায় ব্রাহ্মসমাজ হলে বিভিন্ন পাড়া কমীটিগুলির সহযোগিতায় এক সাধারণ সভা হয়।

বাঁকুড়ায় এর মধ্যে দুটি দল মেয়ে প্রাথমিক প্রতিবিধান শিক্ষা পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রথম দলের নয় জন সিমলা কেন্দ্র থেকে সার্টিফিকেট পেয়েছে। এর পর প্রত্যেক পাড়ায় এই শিক্ষা চালান হবে যাতে প্রায় প্রত্যেক মহিলা প্রাথমিক প্রতিবিধান শিক্ষা করবার সুযোগ পায়। মাননীয় মোহনলাল গুপ্ত মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জন্য প্রথমে পঞ্চাশ টাকা ও পরে পঁচিশ টাকা আত্মরক্ষা সমিতির ফাণ্ডে দান করেন এবং তিরিশ টাকার বই ছাত্রী কমীটির জন্য দেবেন বলেছেন। তাঁকে আমরা আত্মরক্ষা সমিতির তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাঁকুড়া জেলার তিলুড়িতে ও বিষ্ণুপুরে এক-একটি শাখা স্থাপিত হয়েছে।

—

বাঁকুড়া মহিলা-আত্মরক্ষা সম্মেলন

"জাগরণ" ত্রৈমাসিকে বাঁকুড়া মহিলা-আত্মরক্ষা সম্মেলনের নিম্নমুদ্রিত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছে।

গত ৪ঠা অক্টোবর বাংলার বিখ্যাত মহিলা নেত্রী কমরেড মণিকুন্তলা সেনের সভানেতৃত্বে এবং শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্বোধনে বাঁকুড়া জেলা মহিলা-আত্মরক্ষা সম্মেলন হয়। উদ্বোধন-সঙ্গীত করেন কুমারী আরতি গোস্বামী। শ্রদ্ধেয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, আত্মরক্ষার জন্য প্রথম এবং প্রধানতঃ দরকার সাহস ও শক্তি। কমরেড মণিকুন্তলা সেন সে কথা খুবই সমর্থন করেন এবং বলেন—আমাদের আত্মরক্ষার চেষ্টা শুধু জাপানী দস্যুদের হাত থেকেই নয়,—অরাজকতার জন্য, দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার (economic crisis) জন্য, চোর-ডাকাতের হাত থেকেও। কিন্তু মানসম্ভ্রম রক্ষার চেয়ে প্রাণরক্ষার প্রশ্নটা দিন দিন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দেশের আর্থিক অবস্থা, ফসল উৎপাদনের অবস্থা এমন হয়ে উঠেছে যাতে মনে হয় মানসম্ভ্রম বাঁচাবার আগে অনাহারের জন্য আমাদের প্রাণ বাঁচানই দায় হবে। তাই কমরেড সেন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের দিকে এবং জিনিষপত্রের দর বাঁধার দিকেই বেশী নজর রাখতে বলেন। বাঁধা দরের জিনিষপত্রের সরকারী দোকানের সংখ্যা বাড়াবার জন্য এবং বস্তীতে বস্তীতে এক-একটি বাঁধা-দরের (controlled price) দোকান খুলবার জন্য সরকারকে চাপ দিতে বলেন। শ্রীযুক্তা লীলা রায় বলেন, মেয়েরা অসহায় নয়, তাঁরা ইচ্ছে করলে সব কিছুই করতে পারেন। বিশেষ এই বিপদের সময় যখন বাড়ীর কোন পুরুষই বলতে পারেন না, তাঁর বাড়ীর মেয়েদের রক্ষার ভার তিনিই নেবেন তখন আমাদের প্রত্যেককেই আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তরুণী-সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্তা ডলি রাহাও ক্ষুদ্র একটি বক্তৃতা করেন।

এই সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ছ-টি গৃহীত হয়ঃ

বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে মেয়েরাই সবচেয়ে বিপন্ন। সমস্ত রকম বিপদের মধ্যে মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষার প্রশ্নও আজ,আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ। চীন-যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা থেকে তা আমরা বুঝতে পারি। এই অবস্থায় আত্মরক্ষার প্রয়োজন আজ সমস্ত মহিলা সাধারণের পক্ষে একটি মাত্র ভাবনার বিষয়। এ প্রয়োজন শ্রেণী, জাতি, ধর্ম্ম বা রাজনৈতিক মত ও পথের বৈষম্য কোন বাধা সৃষ্টি করে না। কাজেই আত্মরক্ষার উপায় স্থির ও অবলম্বন করা আজ মহিলা সাধারণের একমাত্র কাজ। অতএব এই সম্মেলন প্রস্তাব করে যে বাঁকুড়া জিলার মহিলাগণ নিম্ন পন্থাগুলি তাঁদের আত্মরক্ষার কর্ত্তব্য হিসাবে গ্রহণ করুন এবং সমস্ত মহিলাদের মধ্যে এই কার্য্যক্রমকে ব্যাপক করিয়া তুলুন—

(ক) ফ্যাসী-বিরোধী সংগ্রাম ও আত্মরক্ষার জন্য মহিলাদের মধ্যে ঐক্য ও সাহস থাকা প্রয়োজন এবং তাঁরা কার বিরুদ্ধে লড়ছেন তাও বুঝবেন। (খ) সমস্ত রকম মিথ্যা সংবাদ, ত্রাস, আতঙ্ক ও বিভীষণ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচার করতে হবে। (গ) প্রাথমিক চিকিৎসাকারী হিসাবে, গৃহরক্ষীদল হিসাবে, খাদ্য পরিবেশন ও বণ্টনকারী হিসাবে আমরা সাহায্য করতে পারি। (ঘ) নিজের বাড়ী-ঘর যাদের ত্যাগ করতে হয়েছে তাদের আশ্রয় ও খাদ্যের বন্দোবস্তের সাহায্য করতে পারি। যে-সব লোক দেশ ও গৃহ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে তারা যাতে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পায় ও তাদের অন্যান্য কষ্ট দূর হয় তা আমাদের দেখতে হবে। (ঙ) ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, কর্পোরেশন, সরকার প্রভৃতির সহায়তায় বস্তী ও দরিদ্র গৃহস্থ অঞ্চলে যাতে সস্তায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলি বিক্রয় হয় তার ব্যবস্থা করতে পারি। (চ) বর্ত্তমান সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত্তে মেয়েদের প্রত্যেকের আত্মরক্ষামূলক শিক্ষা ও শক্তি থাকা দরকার। লাঠি, ছোরা, যুযুৎসু প্রভৃতির খেলা শিখতে ও গরিলা যুদ্ধে যা-কিছু সাহায্য তা করতে হবে। একটি ছোট নারীবাহিনী এ কাজ শিখাতে পারে।

বিষ্ণুপুরেও মহিল-আত্মরক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছে।

—

বাঁকুড়া জিলা বোর্ডের আজব খবর

গত শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে বাঁকুড়া জিলা বোর্ড সম্বন্ধে আমরা কিছু লিখেছিলাম। আমরা নিজে যা জানতে পেরেছিলাম এবং "বাঁকুড়া দর্পণে" যা পড়েছিলাম, তা অবলম্বন ক'রে কিছু মন্তব্য করেছিলাম। তার পরও কিছু কিছু খবর ঐ কাগজে বেরিয়েছিল। শেষ যা খবর পেয়েছি, তা গত ১লা নবেম্বরের নিম্নমুদ্রিত প্যারাগ্রাফটি।

গত ২৬শে অক্টোবর বাঁকুড়া জিলা বোর্ডের তিনটি বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাগুলির বিশেষত্ব এই যে, প্রতি সভারম্ভে চেয়ারম্যান খান বাহাদুর সিদ্দিক মহোদয় সদলবলে উপস্থিত হয়ে "সভাগুলি আইন-সঙ্গত নহে" বলিয়া সদলে সভাস্থল ত্যাগ করেন। অবশিষ্ট সভ্যগণ প্রথম ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ রায় মহাশয়কে প্রেসিডেণ্ট করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। এই সভায় চেয়ারম্যান খান বাহাদুর সিদ্দিক ও দ্বিতীয় ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্রের উপর অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই সভাগুলি নাকি বে-আইনী বলিয়া অনাস্থাজ্ঞাপককারী সভ্যগণকে সভার প্রস্তাব রেকর্ড করিবার জন্য বোর্ডের মিনিট-বইটি দেওয়া হয় নাই বলিয়া প্রকাশ। আরও শুনা যাইতেছে যে বোর্ডের বাহিরে সভাকালীন পুলিস ঘোরাফেরা করিতেছিল এবং সভার পর ১ম ভাইস চেয়ারম্যান বিনয়কৃষ্ণ রায় ও রাইপুরের সভ্য ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হন। সভ্য ও ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ সিংহ এম-এল-এ, ও সভ্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোস,

তাঁহাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে শুনিয়া পরদিন ভোর রাত্রে থানায় গিয়া তাঁহারা আত্মসমর্পণ করেন। প্রকাশ, বিনয় বাবুকে ভুলক্রমে ধরা হইয়াছিল বলিয়া পরদিন ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আরও প্রকাশ, সভার প্রস্তাবগুলি নাকি খান বাহাদুর সিদ্দিক, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগীয় কমিশনার ও স্বায়ত্বশাসন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়-গণের নিকট পাঠান হইয়াছে। ফলাফল জানিবার জন্য সেস-দাতাগণ উৎসুক রহিল।

ইতিপূর্বে "বাঁকুড়া দর্পণে" বাঁকুড়া জিলা বোর্ড সম্বন্ধে যা বেরিয়েছিল সেই সমস্ত কথা এবং অন্য বহু তথ্য স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে বহুপূর্বেই জানান হয়েছে। বাঁকুড়ার ভূতপূর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ঘোষ সব কথা জানতেন। তিনি বোর্ডের কাজে ও বজেটে সন্তুষ্ট ছিলেন না। বর্তমান বোর্ড ভেঙে দিয়ে নূতন বোর্ড নির্বাচিত হ'লেই ঠিক্ হ'ত। ভূতপূর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট বদলি হয়েছেন। বোর্ডের কাজে তাঁর অসন্তোষের সহিত তাঁর বদলির কি কোন সম্বন্ধ আছে?

প্যাসিফিক কন্‌ফারেন্সে "ভারতীয় প্রতিনিধি দল"!

ভারতবর্ষে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ইণ্টারন্যশনাল অ্যাফেয়ার্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। সর্ রামস্বামী মুদালিয়ার উহার চেয়ারম্যান ছিলেন এবং বড়লাট লর্ড লিনলিথগো উহার অবৈতনিক প্রেসিডেণ্ট। গত ২১শে সেপ্টেম্বর সর্ রামস্বামী পদত্যাগ করিয়াছেন এবং সর্ সুলতান আহম্মদ নূতন চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি কানাডায় প্যাসিফিক রিলেশন্‌স্ কন্‌ফারেন্সে সর্ রামস্বামীর অধিনায়কত্বে একটি "ভারতীয় প্রতিনিধি দল" যাত্রা করিতেছেন। সর্ রামস্বামী স্বয়ং এই "প্রতিনিধিদের" বাছাই করিয়াছেন এবং ইঁহারা আপনাদিগকে উক্ত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন বাদে অপর সকলেই সরকারী কর্ম্মচারী এবং চারি জন ইনষ্টি-টিউটের সভ্য পর্য্যন্ত নহেন। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এই ব্যাপারটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ধারণা, এই প্রতিনিধিরা নিজেদের টাকায় কানাডা ভ্রমণ করিবেন না, সম্ভবতঃ ভারত-সরকারই ইঁহাদের ভ্রমণ-ব্যয় যোগাইবেন। এই ঘটনার সহিত ভারত-সরকারের দুই দিক দিয়া যোগ আছে। প্রথমতঃ, বড়লাট স্বয়ং ইনষ্টিটিউটের সভাপতি। কোন ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান ইনষ্টিটিউটের নামে পরিচয় দিয়া খামখেয়ালী কোন কাজ করিতে গেলে তাহার প্রতিবাদ করা তাঁহার কর্ত্তব্য। পণ্ডিত কুঞ্জরু ইহাও দেখাইয়াছেন যে, চেয়ারম্যান স্বয়ং নিজ দায়িত্বে কোন প্রতিনিধি দল মনোনয়ন করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, পণ্ডিত কুঞ্জরুর আশঙ্কা যদি সত্য হয়, অর্থাৎ ভারত-সরকার যদি ইঁহাদের ভ্রমণ-ব্যয় বহন করেন তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, বড়লাট এবং তাঁহার গবর্ণমেণ্ট এই নিয়মতন্ত্রবিরোধী কাজ সমর্থন করিয়াছেন। সর্ সুলতান আহমদের অবস্থা যে করুণ হইয়া উঠিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সর্ রামস্বামীর কার্য্য সমর্থন করা যদি বড়লাটের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে বড়লাটের কর্ম্মচারী হইয়া তিনি উহার প্রতিবাদই বা করিবেন কিরূপে?

"ভারতীয় প্রতিনিধি" নামধারী এই ধরণের সরকারী কর্ম্মচারীদের বিদেশ যাত্রা ও বৈদেশিক প্রচারকার্য্যের উপর ভারতবাসীর মনোযোগ আজকাল মোটেই আকৃষ্ট হয় না। ভারতবর্ষের তরফ হইতে কথা বলিবার অধিকার ও বিদ্যাবুদ্ধি এই শ্রেণীর লোকের নাই বিদেশীরাও যে ইহা বুঝিয়া লইয়াছে, ভারতবর্ষের নিরক্ষর লোকটিও একথা আজ জানে। ইঁহাদের আসা-যাওয়ার টাকাটা দরিদ্র করদাতাদের যোগাইতে হয় এইটুকুই যা অসুবিধা।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তবে থাকিবেই?

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল এত দিন পরে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন:

"I have not become the King's first Minister in order to preside over the liquidation of the British Empire."

অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাঙন দেখিবার জন্য তিনি প্রধান মন্ত্রী হন নাই। ক্রিপ্‌স-ব্যাপারটা লইয়া এত দিন যে তর্কবিতর্ক চলিতেছিল, চার্চ্চিল সাহেবের এই উক্তিতে সেটা পরিষ্কার হইয়া গেল। কংগ্রেসের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার জন্য আমেরী সাহেব ও ক্রিপ্‌স্ সাহেব যে প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছিলেন, তার জের টানিয়া চলিবার প্রয়োজন আর রহিল না। জাপান একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ায় চার্চ্চিল সাহেব সম্ভবতঃ একটু ভয় পাইয়া-ছিলেন, এবং কংগ্রেসকে দলে পাইলে সুবিধা হইবে ইহা বুঝিয়াই দৌত্যকার্য্যে ক্রিপ্‌স্ সাহেবকে পাঠাইয়াছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসনযন্ত্রে নবপ্রবিষ্ট ক্রিপ্‌স্ সাহেব ঝুনা রাষ্ট্রবিদ্ মিঃ চার্চ্চিলের মনের কথাটি বুঝিতে পারেন নাই; প্রস্তাবের বাহ্যিক চটকে মুগ্ধ হইয়া এত বড় একটি সমস্যা সমাধান করিয়া নাম কিনিবার লোভ তিনি সামলাইতে পারেন নাই। ক্রিপ্‌স্ সাহেব যখন ভারতবর্ষে, চার্চ্চিল

তখন দেখিলেন জাপান ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত আসিয়াই থামিয়া গেল। ভারতবর্ষ এখনই আক্রান্ত না হইতে পারে, এই ধারণা সম্ভবতঃ তাঁহার হইয়াছিল এবং তাহারই ফল হয়ত লুই ফিশার-বর্ণিত সেই রহস্যময় টেলিগ্রাম, এবং শশব্যস্তে ক্রিপ্‌স্ সাহেবের ভারতবর্ষ পরিত্যাগ। যাত্রাকালে ক্রিপ্‌স্ বলিয়া গেলেন, প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত হইল; বিলাতে চার্চ্চিল সাহেব বলিলেন, উহা ত বজায় আছেই—ভারতবাসী গ্রহণ করিলেই হয়। সমগ্র ব্যাপারটির মধ্যে মেকী চালাইবার একটা বিরাট্ ব্যবস্থা ছিল, এই সব ঘটনা হইতে তাহারই আভাস পাওয়া যায়। এত দিনে প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতায় আসল রহস্যের সন্ধান মিলিল।

উপরোক্ত উক্তিতে আরও একটি রহস্য অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এবং প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল স্বাক্ষরিত আটলান্টিক চার্টারের ব্যাখ্যা লইয়াও একটা বড় রকমের তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। চার্টার স্বাক্ষর করিয়া চার্চ্চিল সাহেব দেশে ফিরিবার পূর্ব্বেই ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী এটলী আমতা আমতা করিয়া বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ হয়ত ঐ চার্টার হইতে বাদ না পড়িতেও পারে। চার্চ্চিল সাহেব ফিরিয়া আসিয়া কিছুদিন পরেই জানাইয়া দিলেন যে, আটলান্টিক চার্টার এশিয়াবাসীদের জন্য নহে। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট নীরব রহিলেন। তার পর কয়েক দিন পূর্ব্বে মিঃ উইলকির বক্তৃতার পর রুজভেল্ট স্বীকার করিয়াছেন যে চার্টারটি সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রযোজ্য। চার্টারের তৃতীয় দফায় আছে।

"They respect the right of all peoples to choose the form of Government under which they will live; and they wish to see sovereign rights and self-government restored to those who have been forcibly deprived of them."

অর্থাৎ "যে কোন জাতির লোকের নিজেদের গবর্ন্মেণ্ট গঠনের অধিকার তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন; এবং যাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলপূর্ব্বক অপহৃত হইয়াছে তাহারা যাহাতে উহা ফিরিয়া পায় ইহাও তাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন।" চার্টারের এক স্বাক্ষরকারীর মতে যদি উহা মানব জাতির প্রতি প্রযুক্ত হয়, তবে মালয় ও ব্রহ্ম দেশের স্বাধীনতা এবং নিজ নিজ গবর্ন্মেণ্ট গঠনে তাহাদের নিরবচ্ছিন্ন অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হয়। অপর স্বাক্ষরকারীর উক্তিতে বুঝা যায় জাপান বলপূর্ব্বক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত যে মালয় ও ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়াছে, তিনিও বলপ্রয়োগ করিয়াই জাপানের কবল হইতে ঐ দুটি দেশ পুনরুদ্ধার করিবেন এবং উহাদিগকে পুনরায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, এশিয়াবাসী তবে কাহার কথা বিশ্বাস করিবে—রুজভেল্টের না চার্চ্চিলের?

সর্বশেষে একটি বাস্তব প্রশ্ন উঠিবে। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের কর্ণধারেরা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মালয় ও ব্রহ্ম দেশের জনসাধারণ গবর্ন্মেণ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ফলেই ঐ দুইটি দেশ হারাইতে হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের শাসন-পদ্ধতির উপর যদি ইহারা বিরূপ হইয়া থাকে, তবে শাসিতদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইয়াও নিছক বাহুবলের সাহায্যে ঐ দুইটি দেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখিতে পারিবেন বলিয়া কি আজও তাঁহারা মনে করেন?

—

ইংলণ্ডেশ্বরের বক্তৃতা

যুদ্ধবিরতি দিবস উপলক্ষে ইংলণ্ডেশ্বর পার্লামেণ্টে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। রাজার বক্তৃতায় সাধারণতঃ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উল্লেখ থাকে না, এবার তাহা আছে। রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের বক্তৃতাতে প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল এবং ভারত-সচিব আমেরী সাহেবের চিরপুরাতন যুক্তিরই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে; সমস্যা সমাধানের কোন ইঙ্গিত ইংলণ্ডেশ্বরের উক্তিতে নাই। তাঁহার গবর্ন্মেণ্ট ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন দেশরূপে দেখিবার ইচ্ছা পোষণ করেন, এ কথা স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের মুখ হইতে শুনিয়াও ভারতবাসী আশ্বস্ত হইবে না এই জন্য যে, তাঁহার গবর্ন্মেণ্টই এই স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথে চূড়ান্ত প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতবাসী ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বলিয়া রাজা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনি আশা করেন যে ভারতীয় নেতাদের সুবুদ্ধি হইবে, নিজেদের মধ্যে মতৈক্য স্থাপন করিয়া তাঁহারা বর্তমান সমস্যার দ্রুত সমাধান করিতে পারিবেন। দেশের সকল দল অথবা সকল ধর্মের লোক একমত না হইলে স্বাধীনতা ভোগের যোগ্য হয় না, ব্রিটিশ ইতিহাস নিজেও কিন্তু এ কথা বলে না। ইংলণ্ডে বহু শত বৎসর ধরিয়া ক্যাথলিক এবং প্রটেষ্টাণ্ট দল পরস্পর বিবাদ করিয়াছে; পিউরিটান, প্রেসবিটারিয়ান, অ্যাংলিকান প্রভৃতি ধর্ম্মগত নানা উপদলও প্রচুর পরিমাণে পরস্পর হানাহানি করিয়াছে,—টুডোর আমলেও পোপের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণেই বিদ্যমান ছিল। ইহা দেখিয়া ইংলণ্ডের একটি লোকও কিন্তু কখনো এ কথা বলে নাই যে, ইংলণ্ডের সকল অধিবাসী যখন একমত হইতে পারিতেছে

না, তখন আবার সেই পুরাণো রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

—

আটলাণ্টিক চার্টারের নূতনতম ব্যাখ্যা

আটলাণ্টিক চার্টারের ব্যাখ্যা লইয়া এত দিন তর্ক চলিতেছিল মিঃ চার্চ্চিলের সহিত এশিয়াবাসীর। এবার বিতর্ক সুরু হইয়াছে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ও ইংলণ্ডের রাজার মধ্যে। চার্টারটি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল আটলাণ্টিক মহাসাগরের বক্ষে, এই জন্য প্রশ্ন উঠিয়াছিল প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত-মহাসাগরের তীরে যাহারা বাস করে, চার্টার তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য কি না? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে একটি প্যাসিফিক চার্টারই বা রচিত হইবে না কেন?

বহু দিনের নীরবতার পর রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট সম্প্রতি বলিয়াছেন যে আটলাণ্টিক চার্টার সমগ্র মানব জাতির জন্যই লেখা হইয়াছে।

"The Atlantic Charter was meant for all Humanity."

মিঃ চার্চ্চিল বহু পূর্ব্বেই ইহার বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া বসিয়া আছেন; রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের ঘোষণার পর চার্চ্চিল সাহেবের উক্তির আর কোন মূল্যই রহিল না। অতঃপর ইংলণ্ডেশ্বর তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন,

"The declaration of the United Nations endorsing the principles of the Atlantic Charter provides the foundation on which international society can be rebuilt after the war."

অর্থাৎ "আটলাণ্টিক চার্টারের মূলনীতি সমর্থন করিয়া সম্মিলিত জাতিসমূহ যে ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়াছে, যুদ্ধের পর আন্তর্জ্জাতিক সমাজ কি ভাবে গঠিত হইবে তাহার নির্দ্দেশ উহারই ভিতর রহিয়াছে।" তবে,

"My Government desire to do utmost to raise standards and conditions in colonies who are playing full part in united war effort."

অর্থাৎ "যে-সব উপনিবেশ সম্মিলিত যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় পূর্ণোদ্যমে সাহায্য করিতেছে তাহাদের জীবনযাত্রার মান ও অবস্থা উন্নত করিবার ইচ্ছা আমার গবর্ন্মেণ্টের আছে।" আটলাণ্টিক চার্টারের ধারা অনুসারে প্রত্যেক জাতের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে কোন জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেখানে ব্রিটিশ রাজত্ব বা অপর কোন সাম্রাজ্য কায়েম রাখিবার দাবী তোলা চলে না। ২৬টি সম্মিলিত জাতির যে ঘোষণায় চার্টার সমর্থন করা হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষের স্বাক্ষর আছে, এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশের স্বাক্ষরও উহাতে রহিয়াছে। এশিয়ার দেশসমূহ নিজেরা পরাধীন থাকিয়া আটলাণ্টিকের তীরবর্তী দেশসমূহের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য ধন ও প্রাণ অকাতরে ঢালিয়া দিবে, নিজেদের স্বাধীনতার দাবী তুলিবে না, ইহা অসম্ভব। মিশর, তুরস্ক, রাশিয়া ও চীন ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়াই মিঃ উইলকি এই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, আমেরিকার কোটি কোটি নরনারী তাঁহার কথার উত্তর লাভের জন্য জিজ্ঞাসু নেত্রে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের দিকে তাকাইয়াছিল। রুজভেল্টের জবাব শুনিয়া কিন্তু অন্যতম স্বাক্ষরকারী চার্চ্চিল সাহেব অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়িয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরের বক্তৃতায় তাল সামলাইবার প্রয়াস সুস্পষ্ট। সমস্যা অত্যন্ত কঠিন—যুদ্ধের গতি যখন ইংলণ্ডের অনুকূলে একটুখানি মোড় ফিরিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে সাম্রাজ্যের উপর স্পৃহা নাই ইহাও বলা চলে না, রুজভেল্টকে অসন্তুষ্ট করাও অসম্ভব।

—

আল্লা বখ্‌শ কাহার আস্থা হারাইয়াছিলেন?

সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী আল্লা বখ্‌শ তাঁহার খাঁ বাহাদুর এবং ও. বি. ই. উপাধিদ্বয় ত্যাগ করিয়া বড়লাটকে একটি পত্র লেখেন এবং সংবাদপত্রে উহা প্রকাশিত হয়। বড়লাট আল্লা বখ্‌শকে যে জবাব দেন তাহাতে পত্রখানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সিন্ধুলাট তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন যে তিনি তাঁহার আস্থা হারাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আল্লা বখ্‌শ পদত্যাগে অস্বীকৃত হইলে লাট-সাহেব তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। পার্লামেণ্টে প্রশ্নের উত্তরে আমেরী সাহেব স্বীকার করেন যে ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত তিনি জানেন। সম্প্রতি আল্লা বখ্‌শকে লাহোরে ইউনাইটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধি এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন যে, বড়লাটের পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, উহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াই তাঁহার পদচ্যুতির কারণ; কিন্তু "লাটসাহেব আমাকে বলেন যে, আমাদের মধ্যে কতকগুলি আলোচনার ফল আমার পদত্যাগের কারণ; অথচ এমন কোন আলোচনা আমাদের মধ্যে হয়ই নাই।" নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের মূলনীতিই এই যে, প্রধান মন্ত্রী যত দিন ব্যবস্থা-পরিষদের আস্থাভাজন থাকেন, তত দিন রাজা বা গবর্ণর তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। বিলাতী নিয়মতান্ত্রিকতার

এই মূলনীতি সিন্ধুতে পদদলিত হইয়াছে। বড়লাট এবং সিন্ধুলাট দুই জনের তরফ হইতে হস্তক্ষেপের দুই প্রকার কারণ দেখা গিয়াছে এবং ভারত-সচিব মিঃ আমেরীর মারফৎ ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক ডেমোক্রাটিক গবর্ণমেণ্ট ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

—

এক পয়সার কুপন

কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী পয়সা সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়া অবশেষে এক পয়সা ও দুই পয়সার কুপন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। পত্রান্তরে প্রকাশ, যাত্রীদের এই কুপন সাদরে গ্রহণ করিতে দেখিয়া কোম্পানীর ট্রাফিক ম্যানেজার আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। কুপন যে শুধু ট্রামে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা নহে, পান বিড়িওয়ালারাও খুচরা পয়সার অভাবে এইগুলি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাও তিনি জানাইয়াছেন। কুপনগুলির জনপ্রিয়তা প্রমাণ করাই সম্ভবতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য। আমাদের কিন্তু ধারণা এই যে, ট্রাম কোম্পানী বা গবর্ণমেণ্ট কাহারও পক্ষেই ইহাতে আনন্দিত হইবার কারণ নাই। রূপার টাকার অভাবে বিব্রত জনসাধারণ যেমন এক টাকার নোট পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়াছিল, পয়সার অভাবে ব্যতিব্যস্ত ও অসুবিধাগ্রস্ত জনসাধারণ ঠিক তেমনি এই এক পয়সার নোটকে নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণখণ্ড ধারণের ন্যায় আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। ট্রাম কোম্পানী কেন, কলিকাতা কর্পোরেশন যদি তাঁহাদের বাজারে চলিবে এই আশ্বাস দিয়া এক পয়সার নোট প্রচার করিতেন তাহাও ঠিক এরূপই জনপ্রিয় হইত। তামা, দস্তা, কাঁসা, টিন প্রভৃতি যে কোন প্রকার ধাতু নির্ম্মিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের পয়সাও গবর্ণমেণ্ট বাহির করিতে পারিলেন না। এক পয়সার কুপন বাহির করিতে দিয়া ভারত-সরকার ও তাঁহাদের মুদ্রানীতি কর্ত্তৃপক্ষের উপর জনসাধারণের আস্থা শিথিল হইতে দেওয়া অসহায়তার পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু রাজনীতির দিক দিয়া ইহার ফল কি হইবে ভারত সরকার সেটা একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে পারেন। ভারতবর্ষের আর্থিক বনিয়াদ সুদৃঢ় রাখিবার জন্য ভারত-শাসন আইনে বড়লাটের উপর যে বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে, সেটা তবে কিসের জন্য? মুদ্রানীতির উপর জনসাধারণের অনাস্থা কি আর্থিক বনিয়াদের দৃঢ়তার পরিচয়?

—

শিক্ষার সহিত গণতন্ত্র ও যুদ্ধের সম্বন্ধ

আমেরিকার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মিঃ ওয়ালেস আমেরিকান-সোভিয়েট মৈত্রী সম্মেলনে বলিয়াছেন,

"The power of the Soviet Union to resist Germany lay in the way M. Stalin had pushed educational democracy."

(মিঃ ষ্টালিন গণতন্ত্রের স্তম্ভরূপে শিক্ষাকে যে ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহার ফলেই জার্মেনীকে প্রতিরোধে সোভিয়েটের বর্ত্তমান শক্তি সম্ভব হইয়াছে।) দেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার যে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় এবং শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে কত দূর মূল্যবান, মিঃ ওয়ালেসের উক্তিতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশে গত দুই শত বৎসরে শিক্ষার প্রসারের কথা ছাড়িয়া দিলেও যুদ্ধের মধ্যেই দেখিতেছি গণ-শিক্ষার বাহন সংবাদপত্রগুলি সরকারী আদেশে পৃষ্ঠাসংখ্যা কমাইতে এবং মূল্য বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছে, এবং অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে নূতন সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা পর্য্যন্ত প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারী হইয়াছে।

—

মাইনরিটি স্বার্থরক্ষায় রাশিয়ার দৃষ্টান্ত

মিঃ ওয়ালেস ঐ বক্তৃতাতেই আরও একটি কথা বলিয়াছেন যাহা বিশেষভাবে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার উক্তিটি এই,

"Russia has probably gone further than any other nation in the world in giving equality of economic opportunity to different races and minority groups."

বিভিন্ন জাতি ও মাইনরিটি দলকে অর্থোপার্জ্জনের সমান সুযোগ দানের দিক দিয়া রাশিয়া পৃথিবীর অপর সকল দেশকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। মাইনরিটি স্বার্থ রক্ষার জন্য রাশিয়াকে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের রক্ষণাধীনেও আসিতে হয় নাই, রুশ শাসনতন্ত্রে বিশেষ দায়িত্বের রক্ষাকবচের ব্যবস্থাও করিতে হয় নাই। সমস্যা সমাধানের ইচ্ছা যেখানে আছে, উপায়ও সেখানে হইয়াছে। রাশিয়া ত এখন ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের মিত্র, এই বেলা মাইনরিটি সমস্যা সমাধানের রুশ পদ্ধতিটা ভারতবর্ষে পরখ করিয়া লইতে বাধা কি? অবশ্য সে ইচ্ছা যদি থাকে।

—

ভারতীয় খ্রীষ্টানদের দাবী

যুক্ত প্রদেশের ভারতীয় খ্রীষ্টান সঙ্ঘের এক অধিবেশনে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, ভারতের যতগুলি সম্ভব দলের সহযোগিতায় গঠিত জাতীয় গবর্ন্মেণ্টের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অভিপ্রায় ঘোষণা

করা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টেরই কর্তব্য। সমগ্র ভাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য ৪০ কোটি নরনারীর স্বাধীনতা অত্যাবশ্যক। ভারতীয় খ্রীষ্টানদের এই উদার মনোভাব প্রশংসনীয়। পাকিস্থান, শিখিস্থান, খ্রীষ্টানীস্থান প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া বর্তমান জগতে টিঁকিয়া থাকিবার বিপদ ইঁহারা অনুভব করিয়াছেন এবং ধর্মগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য আলাদা-রাজনীতি সৃষ্টি করিবার চেষ্টা না করিয়া ইঁহারা দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।

—

মুসলমানেরা কংগ্রেসের সহিতই আছে

গত ৩১শে অক্টোবর লণ্ডনের কনওয়ে হলে ভারতীয়দের এক বিরাট্ সভা হইয়াছে। সভার উদ্দেশ্য ছিল অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতার দাবী জ্ঞাপন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি সকল ধর্মের নারী পুরুষ সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং বিশিষ্ট মুসলমান ব্যবসায়ী মিঃ এ শাহ সভাপতিত্ব করেন। ভারতবর্ষের নয় কোটি মুসলমান কংগ্রেস-বিরোধী এবং মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান, মিঃ চার্চ্চিলের এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া মিঃ শাহ বলেন, "আমরা মুসলমানরা ভারতের স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামে কংগ্রেসের সহিতই আছি।" ভারতবর্ষের সব মুসলমান যে কংগ্রেস-বিরোধী নয় বরং সীমান্ত প্রদেশের অধিকাংশ মুসলমানই যে কংগ্রেসী এবং জমিয়ৎ-উল-উলেমা, অর্হর, মোমিন, আজাদ মুসলিম প্রভৃতি বড় বড় এবং প্রচুর প্রভাবশালী মুসলমান দল যে কংগ্রেস-সমর্থক, এ কথা আজ বহু লোকে জানে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ইহা জানিতে পারেন না, কারণ জানিলে অসুবিধা আছে। লণ্ডনে বসিয়া দশ জনকে শুনাইয়া চার্চ্চিল সাহেবের কানে এই রূঢ় সত্য কথাটি পৌছাইয়া দিবার সার্থকতা আছে।

—

যত পায় তত চায়

মুসলিম লীগের দাবী অসীম। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় দলগত ভাবে বিরত থাকিয়াও যাহারা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের পরম প্রিয়পাত্র, যুদ্ধে কোনরূপ সাহায্য না পাইয়াও যাহাদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ও ভারত-সচিব সতত ব্যাকুল, তাহাদের দাবী যে ক্রমেই পর্দ্দায় পর্দ্দায় চড়িতে থাকিবে ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। বর্তমান আন্দোলন সম্পর্কে ভারতবর্ষের যে-সব স্থানে পাইকারী জরিমানা বসানো হইতেছে, তাহার কবল হইতে সাধারণ ভাবে মুসলমানদের এ যাবৎ গবর্মেণ্ট বাদ দিয়াই আসিয়াছেন। মুসলিম লীগ কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। নিখিল-ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমীটি প্রাদেশিক লীগগুলিকে নির্দেশ দিয়াছেন যে তাহারা যেন মুসলমানের উপর কোন স্থানে পাইকারী জরিমানা বসিয়াছে কি না তাহার সন্ধান লয় এবং এরূপ ঘটনা কোথাও ঘটিয়া থাকিলে প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের নিকট যেন প্রতিকার দাবী করে। প্রতিকার না পাইলে লীগগুলিকে অবিলম্বে ওয়ার্কিং কমীটির সাধারণ সম্পাদককে তাহা জ্ঞাপন করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সংবাদ পাইলে সাধারণ সম্পাদক নাকি "যথাবিহিত ব্যবস্থা" অবলম্বন করিবেন। বড়লাটের শাসন-পরিষদে লীগের কোন প্রতিনিধি নাই, সর্ সুলতান আহমদের নাম কাটা গিয়াছে। সাধারণ সম্পাদক মহাশয় তবে কাঁহার মারফৎ প্রাদেশিক গবর্মেণ্টসমূহের বিরুদ্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন? ভারত-সচিবের নিকট হইতে কোন আশ্বাস পাইয়াছেন কি? লীগকে হাতে রাখিবার প্রয়োজন আজও শেষ হইয়া যায় নাই বলিয়া লোকে এ কথাটা মনে করিতে পারে।

—

রাজাগোপালাচারীর দৌত্য

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের সমাধান করিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র। তাঁহার কর্ম্ম-পদ্ধতির সহিত সকলে একমত না হইলেও, রাজাগোপালাচারীর আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ওয়ার্কিং কমীটির সদস্যপদ ত্যাগ করিবার পর তিনি মান্দ্রাজ ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যপদও ত্যাগ করিয়াছেন এবং নিজেকে কংগ্রেস-নেতা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা তিনি করেন নাই।

মিঃ জিন্নার সহিত আপোষ-মীমাংসার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। মিঃ জিন্না ভারতবর্ষের সকল অধিবাসীর কথা চিন্তাও করেন না, কেবল মুসলমান-সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি মনে করেন। সম্ভব হইলে ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার স্বপ্নও তিনি দেখিয়া থাকেন। কংগ্রেস তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছে, তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ পর্য্যন্ত কংগ্রেস করে নাই, ওয়ার্কিং কমীটির দিল্লী প্রস্তাবে পাকিস্তান সম্বন্ধেও জিন্না সাহেবের দাবী খানিকটা অন্ততঃ মানিয়া লওয়া হইয়াছিল,—তথাপি কংগ্রেস তাঁহার

ঝটিকা-বিধ্বস্ত মেদিনীপুর অঞ্চল



তমলুক শহর হইতে দুই মাইল উত্তরে ঝটিকা-বিধ্বস্ত চন্দ্রামেড় গ্রাম



তমলুক শহরের একটি বিধ্বস্ত পল্লী



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   শিল্পী :—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

মূল চিত্রখানি চীন-গবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত হইয়াছে।

তুষ্টি বিধান করিতে পারে নাই। এ হেন মিঃ জিন্নার সহিত শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল যদি কংগ্রেসের মিলন ঘটাইতে পারেন তবে তিনি অসাধ্য সাধন করিবেন।

মিঃ জিন্নার সহিত আলাপের পর শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাতের জন্য বড়লাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অনুমতি তিনি পান নাই। এই প্রত্যাখ্যানের পর শ্রীযুক্ত রাজাগোপালের উক্তিতে এবং লাটপ্রাসাদের ইস্তাহারে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল বলিয়াছেন, "বড়লাট আমাকে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দেন নাই। গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি আমি চাহিব, মিঃ জিন্না ইহা জানিতেন। ইহার ফল কি হইয়াছে তাহাও তিনি জানেন। আমার বিশ্বাস তিনিও এই প্রত্যাখ্যানে ঠিক আমারই ন্যায় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।" সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালের অনুরোধে বড়লাট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তিনি গান্ধীজীর সহিত দেখা করিবার অনুমতি চাহিলে তাহা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।

এখানে প্রশ্ন এই, মুসলিম লীগকে অগ্রাহ্য করিয়া বহু মুসলমান ভারতবর্ষের বর্ত্তমান আন্দোলনে যোগ দিতেছেন এবং আজাদ মুসলিম, অহ্‌রর, মোমিন, জমিয়ৎ-উল-উলেমা প্রভৃতি স্বাধীনতাকামী ও কংগ্রেস-সমর্থক মুসলমানদের দল দিন দিন শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে, জনাব জিন্না ইহা বুঝিতে পারিয়াই নরম হইয়া আসিতেছেন কি না? বাহিরে তাঁহার মেজাজ যত কড়াই দেখা যাউক, ভিতরে ভিতরে তিনি যে অনেকখানি নরম হইতে বাধ্য হইতেছেন, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালের উক্তিতে তাহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। মিঃ জিন্নার সর্ব্বশেষ বক্তৃতায় বিচার-বুদ্ধির চিহ্নমাত্র নাই। আহত অভিমান ও ক্ষুব্ধ মন যেন ঐ বক্তৃতাকে অবলম্বন করিয়া শূন্যে আঘাত হানিতে চাহিতেছে। যুক্তির আসনে কটূক্তিকে বসাইয়া মিঃ জিন্না বুঝাইয়া দিয়াছেন, নিজের উপর এবং নিজের প্রতিষ্ঠানের উপর তাঁহার বিশ্বাসের ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া আসিতেছে।

লীগ সম্বন্ধে কংগ্রেস তাহার শেষ মনোভাব দিল্লী-প্রস্তাবে জানাইয়া দিয়াছে, মহাত্মা গান্ধী জিন্না সাহেবের অনমনীয়তা দেখিয়া প্রকাশ্যে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা তিনি জানেন। তথাপি শ্রীযুক্ত রাজাগোপালের মারফৎ তিনি কি গান্ধীজীর নিকট কোন প্রস্তাব পাঠাইতে চাহেন? এই নূতন প্রস্তাবে তাঁহার নমনীয়তা কোনরূপে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই কি বড়লাট রাজাগোপালের সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎকার ঘটিতে দিতে অনিচ্ছুক? রাজনৈতিক সঙ্কটের অবসানের জন্য রাজাগোপালাচারী কি ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা লইয়া বড়লাটের সহিত তাঁহার আলোচনা হইয়াছে সরকারী ইস্তাহারে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে।

যে কোনরূপেই হউক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করিতেই হইবে,—মিঃ চার্চ্চিলের ন্যায় লর্ড লিনলিথগোও এই অভিমত পোষণ করেন ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ দেশবাসী পাইয়াছে। সর্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সও সম্ভবতঃ ইহা জানিতেন। লুই ফিশার বলিয়াছেন, সর্ ষ্টাফোর্ড বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব লইয়া ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে লর্ড লিনলিথগোর অপসারণের দাবী করিয়াছিলেন। লুই ফিশারের উক্তির কোন প্রতিবাদ এখনও হয় নাই। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েম রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইলে লর্ড লিনলিথগো গান্ধীজীর সহিত জনাব জিন্নার আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করিবেন ইহা কি অসম্ভব?

—

সীমান্ত প্রদেশে আন্দোলন

সীমান্ত প্রদেশে অন্দোলন সম্পর্কে খাঁ আবদুল গফুর খাঁ গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ভূতপূর্ব মন্ত্রী কাজী আতাউল্লা, ভূতপূর্ব পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারী খাঁ আমিরুদ্দীন খাঁ এবং আরও দুইজন মুসলমান পরিষদ্‌সদস্য ভারতরক্ষা আইনে ধৃত হইয়াছেন। ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খাঁ সাহেব আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন এ সংবাদও পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। সীমান্ত প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। সেখানে কংগ্রেস আন্দোলন চলিতেছে। লীগওয়ালা বা রাজভক্ত মুসলমানেরা ইহাতে কোন বাধা দেন নাই, অথবা বাধা দিবার মত শক্তি তাঁহাদের নাই। এই ঘটনাতেও বোঝা যায় ভারতের সব মুসলমান লীগের অনুবর্ত্তী নহে, কংগ্রেস-বিরোধীও নহে। সীমান্ত প্রদেশের ন্যায় সামরিক গুরুত্ব-পূর্ণ প্রদেশের মোট ৩০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ২৮ লক্ষ মুসলমান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কংগ্রেসের সমর্থক, বর্ত্তমান আন্দোলনে যোগ দিয়া তাহারা ইহাই প্রমাণ করিয়াছে।

—

কমিউনিষ্ট দলের "প্রগতি"!

ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট দল জাতীয় গবর্ন্মেণ্টের দাবী করিয়া বৃটিশ গবর্ন্মেণ্টের বরাবরে বহু সহস্র লোকের

স্বাক্ষরযুক্ত একটি বিরাট আবেদনপত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ইতিমধ্যেই দশ সহস্র লোকের স্বাক্ষরও সংগৃহীত হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কমিউনিষ্টরা আপনাদিগকে বৈপ্লবিক দল বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। আবেদন-নিবেদনের কার্য্যকারিতায় বিশ্বাসী বলিয়া মডারেট দলকে ইহারা অত্যন্ত কৃপার চক্ষে দর্শন করেন এবং মহাত্মা গান্ধী আপোষ-মীমাংসায় কোন সময়েই অনিচ্ছা প্রকাশ করেন না বলিয়া তাঁহাকেও ইহারা যথেষ্ট উপহাস করিয়াছেন। আজ ইহারাই কংগ্রেসের আদি যুগে পরীক্ষিত ও বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত আবেদন নিবেদন ও ডেপুটেশন প্রেরণের নীতি নূতন করিয়া অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন এ দৃশ্যে দেশের লোক আশ্চর্য্য হইবে সন্দেহ নাই।

—

হার্ব্বার্ট ম্যাথিউজের টেলিগ্রাম

নিউ ইয়র্ক টাইমসের ভারতবর্ষস্থ প্রধান সংবাদদাতা মিঃ হার্ব্বার্ট ম্যাথিউজ কর্ত্তৃক প্রেরিত একটি টেলিগ্রামে নিম্নলিখিত কথাগুলি ছিল বলিয়া রয়টার প্রথমে সংবাদ দিয়াছিলেন :—

"Virtually all Indians are convinced that the British will have no friend in India after the war."

অর্থাৎ "ভারতবর্ষের প্রায় সকল লোকেরই দৃঢ় ধারণা যে যুদ্ধের পর এ দেশে ইংরেজের বন্ধু কেহ থাকিবে না।" পরে রয়টারই আবার সংবাদ দেন যে "owing to a telegraphic mutilation" অর্থাৎ টেলিগ্রাফ প্রেরণের দোষে উপরোক্ত বাক্যটি একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। উহা নিম্নোক্তরূপ হইবে।

"He found that virtually all Indians are convinced that the British Government have no intention of freeing India after the war."

অর্থাৎ "তিনি দেখিয়াছেন প্রায় সমস্ত ভারতবাসীরই দৃঢ় ধারণা যে যুদ্ধের পর ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবার ইচ্ছা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের নাই।" উপরোক্ত দুইটি বাক্যের গঠন ও অর্থ দুই-ই ভিন্ন। টেলিগ্রাফ অফিস কি তবে আজকাল প্রাপ্ত বার্ত্তা যথাযথভাবে অক্ষরে অক্ষরে না পাঠাইয়া নিজেরাই উহার উপর কলম চালাইতেছে?

—

মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের প্রতি গান্ধীজীর পত্র

বর্ত্তমান আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী মার্শাল চিয়াং কাই-শেককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, লুই ফিশার তাহা আমেরিকার 'নেশন' পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। পত্রটির একটি অংশ মাত্র রয়টার কর্ত্তৃক এ দেশে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা এই : "চীনের প্রতি আমার টান আছে এবং এই দুইটি বিরাট দেশ পরস্পরের প্রতি অধিকতর প্রীতিসম্পন্ন হইয়া উভয়ে উভয়ের সহযোগিতায় লাভবান হউক, ইহা আমার আন্তরিক অভিপ্রায়। এই কারণেই আমি আপনাকে বুঝাইয়া বলিতে চাই যে, জাপানের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিবার অথবা বর্ত্তমান সংগ্রামে আপনাদিগকে বিব্রত করিবার কোন প্রকার ধারণা লইয়া আমি ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তিকে সরিয়া যাইতে বলি নাই। আপনার দেশের স্বাধীনতার বিনিময়ে আমার দেশের স্বাধীনতা অর্জনের অপরাধ আমি করিব না। যে কোন প্রকার আন্দোলন আরম্ভ করিবার পরামর্শ দিবার পূর্ব্বে আমি ভাবিয়া দেখিব যেন উহা চীনের ক্ষতি না করে, অথবা চীন বা ভারতবর্ষ আক্রমণে যেন জাপানকে উৎসাহিত না করে।"

পত্রখানির এই কয়েকটি ছত্রে চীনের বর্তমান সংগ্রাম ও ভারতবর্ষে জাপানী আক্রমণ সম্বন্ধে গান্ধীজীর মনোভাব সুস্পষ্ট। জাপানের প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন, কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন জাপানকে ভারতবর্ষে ডাকিয়া আনিবার ছুতা মাত্র—এই ধরণের অভিসন্ধি যাঁহারা গান্ধীজীর উপর আরোপ করিয়াছেন, উল্লিখিত পত্রে তাঁহাদের চোখ ফুটিতে পারে।

—

একাদশ গর্দভের মামলা

নয়াদিল্লী, ১৫ই অক্টোবর

দিল্লীতে এগারোটি গাধার মাথায় শোলার টুপি চড়াইয়া এবং গলায় কাঠের চাকতিতে বড়লাটের শাসন পরিষদের এগারো জন ভারতীয় সদস্যের এক-এক জনের নাম ঝুলাইয়া শোভাযাত্রা বাহির করা সম্পর্কে যে মামলা হইয়াছিল, তাহার রায় দেওয়া হইয়াছে। "ম্যাক্সওয়েল" লেখা চওড়া একটি ফিতা বুকে ঝুলাইয়া শিবকুমার নামক জনৈক ব্যক্তি ঐ শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করিতেছিল। দশ জনের অধিক ব্যক্তি একত্রে শোভাযাত্রা বাহির করিতে পারিবে না জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এই আদেশ অমান্য করিবার অভিযোগে উক্ত ব্যক্তিকে ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্মীরাম নামক অপর এক ব্যক্তিও অনুরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

প্রকাশ, গর্দভগুলির সঙ্গে ২০০ হইতে ২৫০ জন লোক

ছিল। পুলিসের আদেশে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া চলিয়া যায়, কেবল শিবকুমার ও লক্ষ্মীরাম সেখানে থাকে।

বিচারের সময় গাধাগুলিকে আদালত-প্রাঙ্গণে হাজির করা হইয়াছিল, শোলার টুপি ও নামলেখা চাক্তিগুলি আদালতগৃহের ভিতরে রাখা হইয়াছিল। গর্দভগুলিকে কয়েক সপ্তাহ পুলিসের হেফাজতে রাখিবার পর উহাদের মালিকের নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ভারত-সরকারের সদস্যগণের প্রতিনিধিস্বরূপ গাধাগুলিকে খাড়া করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করিবার উদ্দেশ্যে যে সেগুলিকে লওয়া হইতেছে ইহা সে জানিত না, এই কথা বলিয়া গাধার মালিক অব্যাহতি লাভ করে।—এ. পি.

—

আল্লাবখ্‌শের পদত্যাগে সিন্ধুবাসীর অভিমত

করাচী, ১৪ই অক্টোবর

সিন্ধুর জমিয়ত-উল-উলেমার সভাপতি মৌলানা মহম্মদ সাদিক এবং জেনারেল সেক্রেটারী হাকিম ফতে মহম্মদ শেহওয়ানী এক বিবৃতিতে মিঃ আল্লাবখ্‌শের পদচ্যুতির নিন্দা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, মিঃ আল্লাবখ্‌শ যে স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, জমিয়ত-উল-উলেমা এবং সিন্ধুর মুসলমানেরা তাহার আন্তরিক প্রশংসা করিতেছেন। জমিয়ত-উল-উলেমার মারফৎ সিন্ধুর মুসলমান অধিবাসীবৃন্দ ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রীকে তাঁহার দৃঢ়তা এবং সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রধান মন্ত্রীর আসন হইতে অবসৃতির জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে।—এ, পি

—

শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট অবসানে মৌলবী ফজলুল হকের চেষ্টা

ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট দূর করিবার জন্য বাংলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক যে চেষ্টা করিতে গিয়াছিলেন তাহা একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে। ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে গভীর ক্ষোভের সহিত তিনি বলিয়াছেন, "আমার দুঃখ এই, ভারতীয় রাজনৈতিক অচল অবস্থা সচল করিবার জন্য মিঃ চার্চিল, মিঃ আমেরী অথবা ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কাহারও ইচ্ছাই আন্তরিক নয়।" বাংলার ন্যায় প্রগতিশীল প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী বর্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারেন নাই এবং এখনও তিনি চার্চিল বা আমেরী সাহেবের ন্যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আন্তরিকতার উপর নির্ভর করেন, ইহা মনে করিতেও দুঃখ হয়। এ দেশের লোক আবেদন-নিবেদন ডেপুটেশন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছে তাহার অন্যতম কারণ কি ইহা নয় যে, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে তুলিয়া দিবে না, রাজনীতিক্ষেত্রে আন্তরিক অভিপ্রায়ের কোন স্থান নাই, দেশের লোকের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে? ক্ষমতা হস্তান্তর না করিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট এতকাল যে-সব মামুলী যুক্তির অবতারণা করিয়া আসিয়াছেন সেগুলির অন্তঃসারশূন্যতাও পরিষ্কাররূপে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক ভারত আজ একটি মাত্র প্রশ্ন তুলিয়াছে—এখনই ভারত-শাসনের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ করিতে প্রস্তুত কি না? এই প্রশ্নের দুইটি মাত্র উত্তর আছে—হাঁ অথবা না। আন্তরিক অভিপ্রায়, সদিচ্ছা, প্রতিশ্রুতি প্রভৃতির অবকাশ ইহাতে নাই, এ দেশের লোক এবং ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট উভয় পক্ষই ইহা জানেন।

ভারতীয় রাজনীতি লইয়া মাথা না ঘামাইয়া মৌলবী ফজলুল হক বাংলার দরিদ্র জনসাধারণের অন্নকষ্ট ও অর্থকষ্ট দূর করিবার জন্য চাউল-সরবরাহ ও পাট সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিলে বরং ভারতের ৪০ কোটির মধ্যে অন্ততঃ ৬ কোটি লোকের দুঃখভার একটুখানিও লাঘব হইত। পরিষদে পূর্ণ মেজরিটি লইয়া হক সাহেব এদিক দিয়া এক বার আন্তরিক চেষ্টা করিয়া দেখিলে পারিতেন। এটা ডাল-ভাতের ব্যাপার, এখানে আন্তরিকতা, সহৃদয়তা ও দৃঢ়তার স্থান খানিকটা আছে।

—

বিহার গবর্ন্মেণ্টের ছাত্র শাসন

প্রকাশ, বিহার গবর্ন্মেণ্ট পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটকে লিখিয়াছেন যে পূজার ছুটির পর কলেজ খুলিলে তাঁহারা যেন প্রত্যেক ছাত্রের নিকট হইতে পাঁচ মাসের বেতনের টাকা অগ্রিম লইয়া উহা আলাদা ভাবে জমা করিয়া রাখেন, এবং ছাত্রেরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিবে না—এই মর্মে তাহাদের নিকট হইতে যেন অঙ্গীকারপত্র আদায় করিয়া লয়েন। বলা বাহুল্য, সিণ্ডিকেট এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বিহারে জনসাধারণের ঘাড়ে পাইকারী জরিমানা বসাইতে বসাইতে বিহার-সরকারের মেজাজ এত বেশী গরম হইয়া উঠিয়াছে যে, দোষী-নির্দ্দোষ নির্বিচারে ছাত্রদের উপরেও তাঁহারা উহা বসাইবার চেষ্টা করিতে গিয়াছিলেন।

—

পাইকারী জরিমানা

বর্ত্তমান আন্দোলন সম্পর্কে ভারতবর্ষের বহু স্থানে শহরে ও গ্রামে পাইকারী জরিমানা বসান আরম্ভ হইয়াছে। এই জরিমানাটা প্রধানতঃ চাপিয়াছে হিন্দু মধ্যবিত্ত ও কৃষিজীবী ব্যক্তিদের ঘাড়ে। যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে পণ্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির এবং পাট, তুলা, তিসি প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের মূল্য কমিবার ফলে কৃষীজীবীদের দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, চাকুরিয়া প্রভৃতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরও জীবনযাত্রানির্বাহ করা দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। দেশের এই প্রকার আর্থিক অবস্থার মধ্যে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণের নিকট হইতে পাইকারী জরিমানা আদায় করিতে আরম্ভ করিলে তাহার আপাত ফল শান্তি-স্থাপন হইতে পারে বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার ফল কখনও ভাল হয় না। এক জন নিরীহ লোকের শাস্তি হওয়া অপেক্ষা দশ জন দোষী লোকের অব্যাহতি লাভও ভাল— বিলাতী ফৌজদারী আইনের এই মূলনীতি অনেক দুঃখ ভোগের পর সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। বিলাতী কর্ত্তারাই এ দেশে, বিশেষ ভাবে ১৯৩০ সালের আন্দোলনের পর হইতে, নিজেদের দেশের নীতিটিকে উল্টাইয়া "এক জন প্রকৃত অথবা কাল্পনিক দোষীও পার পাওয়া অপেক্ষা দশ জন নির্দোষীর শাস্তি হওয়া ভাল"—এই নূতন নীতি স-দাপটে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন।

ন্যায়ের মর্য্যাদাকে উপেক্ষা করিয়া কোন গবন্মেণ্টই চিরকাল চলিতে পারে না। প্রকাশ্য বিচারে দোষ সপ্রমাণ না হইলে কাহাকেও দণ্ড দেওয়া চলে না—ইহাই ন্যায়ের বিধান। রাজনৈতিক কারণেও এই বিধান লঙ্ঘন করা অন্যায় এবং অদূরদর্শিতার পরিচয়। প্রবল শক্তির অধিকারী ব্রিটেন জনসাধারণের কণ্ঠরোধ, বিচারে ও বিনা বিচারে যথেচ্ছ কারাদণ্ড, ঘরবাড়ী, জমিজমা বাজেয়াপ্ত করা, গুলিচালনা প্রভৃতি দমননীতির সর্ববিধ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াও আয়র্লণ্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের স্বাধীনতার কামনা চিরতরে পিষিয়া ফেলিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষ আয়র্লণ্ডের চেয়ে অনেক বড় দেশ।

—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুনর্জন্ম?

ইউনাইটেড কিংডম ক্রেডিট কর্পোরেশন নামক একটি খাস বিলাতী ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান কিছু দিন যাবৎ ভারতবর্ষে কারবার আরম্ভ করিয়াছে। কর্পোরেশনটির মূলধনের সমস্ত টাকা ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট দিয়াছেন এবং তাঁহাদেরই সহায়তায় ও আনুকূল্যে ইহা পরিচালিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ইহা একটি বিরাট্ একচেটিয়া ব্যবসায় গড়িয়া তুলিতেছে এবং ইহার কার্যকলাপের ফলে ভারতীয় ব্যবসায়গুলি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিঃ পি. এন. সপ্রু এই কর্পোরেশনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মিঃ সপ্রু অভিযোগ করেন যে এই ক্রেডিট কর্পোরেশন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়া উঠিয়াছে। বলকানে বাণিজ্য করিবার জন্য উহা প্রথম গঠিত হয়। তার পরে মধ্য-এশিয়ার দেশগুলিতে কারবার আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে উহা ভারতবর্ষে আসিয়া পোক্ত হইয়া বসিয়াছে। ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের সহায়তায় কর্পোরেশন এ দেশে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এবং চালান দেওয়ার সর্ববিধ সুবিধা ভোগ করিতেছে। বর্তমান অবস্থায় যে-সব সুবিধা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কল্পনার অতীত, এই কর্পোরেশন গবন্মেণ্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্যে তাহার সবই লাভ করিতেছে। শ্রীযুক্ত রামশরণ দাস দেখাইয়াছেন যে ভারতীয় বণিকেরা ত্রিশ বৎসর ধরিয়া মধ্য-এশিয়ায় যে-সব বিক্রয়-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল, কর্পোরেশন সেখান হইতে তাহাদিগকে হঠাইয়া দিতেছে। ভারতবর্ষে সাধারণ লোকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পণ্যদ্রব্য পায় না, কিন্তু ইহারা গবন্মেণ্টের সাহায্যে সরকার-নির্দিষ্ট দরে যে কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। ফলে ইহারা সাধারণ বণিক অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ করিতে পারে। ভারতীয় বণিকদের পক্ষে মাল চালান দেওয়া বা আমদানীর জন্য জাহাজে স্থান সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব, কিন্তু ইহারা অনায়াসে তাহা পারে। রেলের মালগাড়ী সংগ্রহ করা ভারতীয় বণিকদের পক্ষে অতিশয় দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু ইহাদের বেলায় তাহা অতি সহজ। মিঃ হোসেন ইমাম বলেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই কর্পোরেশানকে যে ভাবে সহায়তা করে তাহা অর্থসাহায্যদানেরই নামান্তর মাত্র। ভারতবর্ষ হইতে বাজার দরে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিলে ব্রিটেনের নিকট ভারতের বহু টাকা পাওনা দাঁড়াইয়া যায়; কিন্তু এখানে গবর্মেণ্টকে দিয়া এক একটি দ্রব্যের জন্য এক একটি "নিয়ন্ত্রিত মূল্য" ঠিক করাইয়া লইয়া সেই দরে কর্পোরেশনটির মারফৎ পণ্য ক্রয় করিলে ভারতবর্ষের পাওনা অনেক কম হয়। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ও বাজার দরে তারতম্য প্রায় প্রত্যেক দ্রব্যের বেলাতেই আজকাল দেখা যায়। গবর্মেণ্ট এই দুই দরের সমতা সাধন করিয়া জনসাধারণের অসুবিধা দূর করিবার কোন আগ্রহই দেখান

না; ক্রেডিট কর্পোরেশন তাহার সুবিধাটুকু লইতে পারিলেই বোধ হয় তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন। মিঃ সপ্রুর প্রস্তাব ভারত-সরকারের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটরী সর্ এলান লয়েড গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন এবং কর্পোরেশনকে সমর্থন করিয়া আমতা আমতা করিয়া যাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে অভিযোগকারী বক্তাদের কোন যুক্তিই খণ্ডন করিতে পারেন নাই। কেন্দ্রীয় পরিষদে কোন প্রস্তাব গৃহীত হওয়া না-হওয়া একই কথা বলিয়াই বোধ হয় উহা গ্রহণে আপত্তি করিয়া নূতন গোলযোগ সৃষ্টি না করাই তিনি বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে করিয়াছেন। —

জয়কালী দত্ত

বিগত ১৮ই অক্টোবর তারিখে ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মী ও সেবক জয়কালী দত্ত পরলোকগমন করিয়াছেন। কলেজে পাঠকালে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শেষ বয়স পর্য্যন্ত তিনি সমাজের সেবা করিয়াছেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ তিনি রাঁচির ব্রাহ্মমন্দিরের দায়িত্ব বহন করিয়াছেন। রাঁচির বালিকা বিদ্যালয়টিকে অতি সামান্য অবস্থা হইতে তিনি বড় স্কুলে পরিণত করেন—বর্ত্তমানে সেটি হাইস্কুল হইয়াছে। —

মেদিনীপুরের ঘূর্ণীবাত্যা

১৬ই অক্টোবর মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুক মহকুমাদ্বয়ের উপর দিয়া যে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া গিয়াছে, বাংলার ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই বলিলেই চলে। চব্বিশ পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা এবং উড়িষ্যার বালেশ্বর উপকূলবর্ত্তী স্থান সমূহও এই ঝড়ে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু মেদিনীপুরের ক্ষতি হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বাংলা দেশের রাজস্ব সচিবের হিসাবে মেদিনীপুরে পনর লক্ষাধিক ব্যক্তি গৃহহীন হইয়াছে, সাত লক্ষ গৃহ ধ্বংস হইয়াছে এবং পঁচাত্তর হাজার গবাদি পশু মারা গিয়াছে। তাঁহার হিসাবে নিহত নরনারীর সংখ্যা মেদিনীপুরে অন্যূন দশ হাজার এবং চব্বিশ পরগণায় এক হাজার। মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটির গণনায় নিহত মানুষের সংখ্যা চল্লিশ হাজারের অধিক। মোটের উপর পঁচিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার লোক এই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্যদান সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের যে শৈথিল্য, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং অকর্ম্মণ্যতার গুরুতর অভিযোগ আসিতেছে তাহার তদন্ত হওয়া উচিত। ঝড়ের প্রচণ্ডতা বুঝাইবার জন্য সর্ব্বাগ্রে রাজস্বসচিব-প্রদত্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১২ই নবেম্বর রাজস্বসচিব শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা দিয়াছেন:

"১৬ই অক্টোবর সকাল ৭-৮টার সময় ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা আরম্ভ হয় এবং বাংলার অনেকগুলি জেলার উপর দিয়া বহিয়া গিয়া পরদিন প্রাতে উহা শেষ হয়। ১৬ই তারিখে অপরাহ্ণে ঘূর্ণীবাত্যার ফলে বঙ্গোপসাগর হইতে প্রচণ্ড ঢেউ উঠিয়া পারের উপর আসিয়া আছড়াইয়া পড়ে এবং মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণার বহু স্থান ভাসাইয়া লইয়া যায়। ঝড়ের সহিত মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল—কোন কোন স্থানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছে। এই জেলার সমস্ত নদীতে বান ডাকিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে বহু লোক মারা গিয়াছে—বর্ত্তমান হিসাবে মেদিনীপুরে ১০ হাজার এবং ২৪ পরগণায় এক হাজার লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। শতকরা প্রায় ৭৫টি গবাদি পশু মারা গিয়াছে। প্রায় সমস্ত মাটির ঘর হয় ধ্বংস হইয়াছে না-হয় একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। টিনের চাল ছাড়া পাকা বাড়ীগুলি শুধু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

"মেদিনীপুরের যে পাঁচটি উপকূলবর্ত্তী থানায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছে, ১৯৩১-এর সেন্সাসে সেখানে ১,০৩,৬১৩টি বাড়ী অর্থাৎ পরিবার ছিল এবং উহাতে ৫,৫৬,১২৫ জন লোক বাস করিত। এই সমস্ত স্থানে প্রায় সমস্ত গৃহ ধ্বংস হইয়াছে এবং শতকরা ৭৫টি গবাদি পশু মারা গিয়াছে। প্রতি বাড়ীতে গড়ে তিনটি করিয়া কুটীর এবং শতকরা ৮০টি পরিবারে গড়ে একটি করিয়া হালের বলদ অথবা দুগ্ধবতী গাভী ছিল ধরিয়া লইলে প্রায় ২ লক্ষ কুটীর এবং ৬০ হাজার গবাদি পশু একমাত্র এই অঞ্চলে ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া হিসাব পাওয়া যায়। তমলুক এবং কাঁথি মহকুমার অপর ৭টি থানায় এবং সদর ও ঘাটাল মহকুমার ১৩টি থানায় ৪ লক্ষ বাড়ী ও ২০ লক্ষ লোক ছিল। এখানেও অত্যন্ত কম করিয়া ধরিলেও অন্যূন ৪ লক্ষ কুটীর এবং ১৫ হাজার গবাদি পশু ধ্বংস হইয়াছে। এই হিসাবে প্রায় ৭ লক্ষ কুটীর ভাঙিয়া ১৫ লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে এবং সর্বসমেত প্রায় ৭৫ হাজার গবাদি পশু মারা গিয়াছে। এই অনুপাতে খাদ্যদ্রব্য, কাপড়-চোপড় এবং বাসনপত্র নষ্ট হইয়াছে এবং রাস্তাঘাট ও বাঁধের ক্ষতি হইয়াছে।

"ঝড়ের সংবাদ রাজস্ব-বিভাগের সেক্রেটরীর নিকট প্রথম আসে ১৯শে তারিখে। ২৪-পরগণার কালেক্টর টেলিফোন করিয়া তাঁহাকে শুধু ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার ক্ষতির কথা জানাইয়াছিলেন। ঐ দিন অপরাহ্ণে রয়েল এয়ার ফোর্সের জনৈক পাইলটের নিকট হইতে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। পাইলটটি হাওড়া-মেদিনীপুর রেলওয়ে লাইনের উপর দিয়া উড়িয়া আসিয়াছিল। শেষ বেলার দিকে মেদিনীপুরের কালেক্টরের নিকট হইতে একটি

সংবাদ আসে। উহাতে তিনি এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, জেলার দক্ষিণাঞ্চলে নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সাহায্যপ্রেরণের আয়োজন করা হয়। ২০শে তারিখে ২৪-পরগণার কালেক্টর খাদ্য, ১২ হাজার গ্যালন জল, ডাক্তার এবং ঔষধ সমেত একটি সাহায্যকারী দল প্রেরণ করেন। মেদিনীপুরের কালেক্টরকে বেতারে সংবাদ পাঠাইয়া অনুরোধ করা হয় যে, তিনি যেন কোলাঘাট হইতে রূপনারায়ণ দিয়া সাহায্য পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন। সঙ্গে সঙ্গে কাঁথি ও তমলুকে কলিকাতা হইতে সাহায্য পাঠাইবার আয়োজনও করা হয়। ২২শে হইতে ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে চারি দলে ইঁহারা ডাক্তার, ঔষধ ও খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাত্রা করেন। ইঁহাদের সঙ্গে ৮৯৫২ মণ চাউল দেওয়া হয়।

"সাধারণতঃ যে সময়ের মধ্যে এইরূপ ক্ষেত্রে সাহায্য পাঠানো হয়, এই ব্যাপারে তাহা অপেক্ষা বিলম্ব ঘটিয়াছে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের লাইন নষ্ট, রাস্তা বন্ধ, একটি জেলায় রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে পুলিস পাহারা ব্যতীত সরকারী কর্ম্মচারীদের পক্ষে বাত্যা-বিক্ষুব্ধ অঞ্চলে যাওয়ার অসুবিধা, এবং নৌকা সরাইয়া লওয়ার ফলে তাড়াতাড়ি সাহায্য পাঠানো সম্ভব হয় নাই।

"জেলার স্থানীয় কর্ম্মচারীরা প্রথম ৪।৫ দিন রাস্তাঘাট পরিষ্কার করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, কারণ রাস্তা পরিষ্কার না হইলে সাহায্য প্রেরণ সম্ভব নয়। তারপর তাঁহারা সাহায্য পাঠান। অবশ্য তখনকার অবস্থায় সরকারী কর্ম্মচারিগণ নিরাপদে যে-সব স্থানে যাইতে পারেন সেই সব স্থানের পক্ষেও সাহায্যের পরিমাণ যথোপযুক্ত হয় নাই।

"মাসের শেষে রাজস্বসচিব এবং আর কয়েকজন মন্ত্রী মেদিনীপুরে যান এবং কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ-পত্রে ঘূর্ণীবাত্যার সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। সরকারী আদেশে এই সংবাদ এতদিন প্রকাশ করা হয় নাই।

"অতিরিক্ত কমিশনার বর্ত্তমান মাসের ৯ই তারিখে মেদিনীপুর যান এবং বে-সরকারী সাহায্যপ্রতিষ্ঠান-সমূহকে কর্ম্মকেন্দ্র ভাগ করিয়া দেন। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এবং নববিধান রিলিফ মিশন ইতি-মধ্যেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটিকে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কাজ করিতে দেওয়া হয়। এই সব প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে খাদ্য ও বস্ত্র দিয়া সাহায্য করিবে।"

রাজস্বসচিবের এই বর্ণনার পর কয়েকটি প্রশ্ন উঠিবে। প্রথম, গবর্ন্মেণ্টের একটি আবহাওয়া বিভাগ আছে, এবং করদাতারা অন্যান্য সরকারী বিভাগের ন্যায় তাহারও ব্যয় যোগাইয়া থাকে। এই বিভাগ ঘূর্ণীবাত্যার আগমন সম্পর্কে পূর্ব্বে কোন সংবাদ দিয়াছিল কি না? না দিয়া থাকিলে, কেন দেয় নাই সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইতেছে কি না? বিজ্ঞান বলে, এই প্রকার ঘূর্ণীবাত্যার সংবাদ অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে দিয়া জনসাধারণকে সতর্ক করা যায়। যদি আবহাওয়া বিভাগ টেলিগ্রামে সংবাদ দিয়া থাকে, তবে সে সম্বন্ধে মেদিনীপুরের এবং ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট-দ্বয় কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন? জনসাধারণকে তাঁহারা সতর্ক করিয়াছিলেন কি না? না করিয়া থাকিলে কেন করেন নাই, এবং এ দিক দিয়া এই সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যুর অন্ততঃ কতকটা দায়িত্বও তাঁহাদের উপর অর্শিবে কি না?

দ্বিতীয়, সংবাদপ্রকাশে প্রায় একপক্ষ কাল বিলম্বের কারণ স্বরূপ গবর্ন্মেণ্ট যে সামরিক কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করা যায় না। সামরিক বিভাগের আপত্তি বাঁচাইয়া সংবাদটি প্রকাশযোগ্য করিয়া লিখিয়া দিতে পারিতেন কলিকাতায় এরূপ অভিজ্ঞ সাংবাদিক অনেক আছেন। সেন্সর বিভাগ এই সংবাদ ছাপিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি, অথবা নিজ দায়িত্বেই তাঁহারা ইহা করিয়াছেন?

তৃতীয় প্রশ্ন, মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে সংবাদ পাইতে তিন দিন সময় লাগিল কেন? শেষ পর্য্যন্ত যদি বেতারেই সংবাদ আসিয়া থাকে, তবে আরও আগেই সে ব্যবস্থা করা হয় নাই কেন? ১৬ তারিখের পর হইতে মেদিনীপুরের সহিত কলিকাতার সকল যোগাযোগ ছিন্ন হইতে দেখিয়া মেদিনীপুরে এরোপ্লেন পাঠাইয়া সংবাদ সংগ্রহ করা কি সম্ভব ছিল না? ষ্টীমারের পথও বন্ধ ছিল কি? বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে বন্ধ হইতে দেখিয়াও কি ঝড়ের প্রচণ্ডতা সরকারী কর্ণধারেরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, এবং এরোপ্লেন পাঠাইয়া মেদিনীপুরের সংবাদ লইবার বুদ্ধিটা তাঁহাদের মাথায় খেলে নাই? রয়েল এয়ার ফোর্সের এক জন পাইলট যদি এরোপ্লেন হইতে দেখিয়া ঘটনার গুরুত্ব বুঝিয়া থাকিতে পারে, তবে এরোপ্লেনে ব্যাপক ভাবে অনুসন্ধান করা সম্ভব হইত না কি? মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট তিন দিন পরে কি সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, যে মন্ত্রীদল আরও দশ দিন অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে সেখানে সাক্ষাৎ তদন্তের প্রয়োজনীয়তা বুঝেন নাই? এবং গবর্ণর আরও দশ দিন অতীত হইবার পরে পরিদর্শন উচিত মনে করেন?

চতুর্থ প্রশ্ন, বর্দ্ধমান ডিভিসনের কমিশনার কবে প্রথম সেখানে গিয়াছিলেন এবং তিনি সাহায্যদানের কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন?

পঞ্চম, এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন, সাহায্যপ্রেরণে

অস্বাভাবিক বিলম্ব। রাজস্বসচিব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন ১৫ লক্ষ লোক গৃহহীন ও আশ্রয়হীন হইয়াছে। ইহাদের জন্য ঘটনার দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে মাত্র ৮৯৫২ মণ চাউল প্রেরণ করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন কেন? তাঁহার হিসাবেই এই পরিমাণ চাউলের ভাগ জন প্রতি এক পোয়া করিয়াও পড়ে না। রামকৃষ্ণ মিশন, মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটি, নববিধান রিলিফ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রভৃতিকে ঘটনার সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুর পাঠাইয়া দিলে কি ক্ষতি হইত? গবন্মেণ্ট উপযাচক হইয়া হোরেস আলেকজাণ্ডারের দলকে যদি পাঠাইয়া থাকিতে পারেন, তবে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের সাহায্য তাঁহারা চাহিতে পারিলেন না কেন? স্পেনে এবং লণ্ডনে সাহায্যদানের অভিজ্ঞতা কি উপরোক্ত বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান সমূহের এদেশে সাহায্যদানের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান? মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটি প্রথম যখন গিয়াছিলেন তখন মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের সহিত কিরূপ সহযোগিতা করিয়াছিলেন মন্ত্রীরা কি তাহা জানেন? মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কাঁথি ও তমলুকের মহকুমা হাকিমদ্বয় সাহায্যদান ব্যাপারে শুধু অক্ষমতাই দেখান নাই, প্রথমদিকে সাহায্যদানে উদ্যোগী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত কিরূপ সহযোগিতা করিয়াছিলেন তাহাও বিচার্য্য। রাজস্বসচিব ১৩ই নবেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে মেদিনীপুরের কালেক্টরের মাথা ঠিক ছিল না:—"The Collecter of Midnapore himself was upset"।

অকর্ম্মণ্যতার সাফাই গাওয়া সহজ কিন্তু তাহাতে দোষ ক্ষালন হয় না। এতবড় ভয়ানক দুর্ঘটনা চক্ষের উপর দেখিয়া যে ব্যক্তি দায়িত্বজ্ঞান হারায় তাহাকে অবিলম্বে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে অপসারিত করা যে কোন সভ্য বলিয়া পরিচিত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে কি?

সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে যে-সব ছাড়পত্র অথবা অনুমতি-পত্র দেওয়া হইয়াছে সেগুলিকে যুদ্ধের সময় সীমান্ত প্রদেশে চলাফেরার ছাড়পত্র বলাই সঙ্গত, সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এত রকমারি বাধানিষেধ ঘাড়ে লইয়া কাজ করা দুরূহ। এই সব কড়াকড়ি নিয়ম বাঁধিবার সময় তো ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মাথা ঠিক ছিল মনে হয়! রাজস্বসচিব ঘটনার এক মাস পরেও স্বীকার করিতেছেন যে সর্ব্বত্র সাহায্যপ্রেরণ এখনও সম্ভব হয় নাই। এক মাসের মধ্যে কলিকাতা হইতে মাত্র শত মাইল দূরের একটা জেলার দুইটি মহকুমার তিনটি থানার কয়েকটি মাত্র গ্রামে যে-গবন্মেণ্ট সাহায্য পৌঁছাইতে পারে না, জনসাধারণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তাহারা কিরূপে আশা করিতে পারে? যে-সব উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর অকর্ম্মণ্যতার জন্য আজও সর্ব্বত্র সাহায্য প্রেরণ সম্ভব হইতেছে না এবং যাহার ফলে গবন্মেণ্টের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস শিথিল হইতেছে, তাহাদিগকে আর একদিনও বিলম্ব না করিয়া অপসারিত করা উচিত। রাজস্বসচিব বলিয়াছেন, যথোপযুক্ত পুলিস পাহারা না লইয়া এই ভয়ানক ঝড়ের পরেও সরকারী কর্ম্মচারীদের পক্ষে বাত্যা-বিক্ষুব্ধ অঞ্চলে গৃহহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, মৃতপ্রায় লোকদের মধ্যেও যাওয়া বিপজ্জনক। এরূপ অবস্থা বিশ্বাস করা কঠিন এবং যদি তাহা হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ কি তাহারও বিচার প্রয়োজন। এই সঙ্গে মহিষাদল রাজ-ষ্টেটের কথা তুলনা করা চলে। বর্ত্তমান আন্দোলনে মহিষাদল-রাজের বহু কাছারি ভস্মীভূত হইয়াছে এবং তাঁহারা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তৎসত্ত্বেও ঝড়ের পরদিন আশ্রয়হীন অপরাধী প্রজারাই আসিয়া তাঁহাদের দ্বারে দাঁড়াইলে রাজবাড়ীর দ্বার উদ্ঘাটনে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ঘটে নাই। হাজার হাজার লোক রাজবাড়ীতে আশ্রয় লাভ করে। সাত দিন ইঁহারা আশ্রয়প্রার্থীগণকে চাউল, লবণ ও নারিকেল বিতরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের উদ্যোগে দুইটি স্থানে সাহায্যকেন্দ্রও স্থাপিত হয় এবং মহিষাদল-রাজের যে সমস্ত কর্ম্মচারীর পক্ষে ঝড়ের পূর্ব্বদিন প্রজাদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া কঠিন ছিল, তাহারা পূর্ণোদ্যমে সাহায্য দানে আত্মনিয়োগ করে। মহিষাদলের দুই-তিন জন জমিদারের মনে যে সহানুভূতি, কর্ম্মতৎপরতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল, সমগ্র বাংলা-সরকার ও মেদিনীপুরের শাসকবৃন্দের মধ্যে একজনেরও কি উহা ছিল না? মহিষাদল-রাজের কর্ম্মচারীবৃন্দের মনে যে পরিমাণ কর্ত্তব্যপরায়ণতা আছে, বাংলা-সরকারের অধীনস্থ মেদিনীপুরের কর্ম্মচারীদের মধ্যে এক জনেরও কি তাহা নাই? এ সকল কথার বিচার একদিন হইবেই, এখন সর্ব্বাগ্রে অত্যাবশ্যক কথা আর্ত্তের পরিত্রাণ এবং লক্ষ লক্ষ অসহায় নরনারীকে নরকযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করা।

—

হালসীবাগান কালীপূজায় মর্ম্মন্তুদ ঘটনা

কলিকাতার হালসীবাগানে আনন্দ আশ্রম নামক একটি আশ্রমের উদ্যোগে কালীপূজার আয়োজন হয় এবং তদুপলক্ষে এক দিন ব্যায়ামপ্রদর্শনের বন্দোবস্ত হয়। ব্যায়াম-ক্রীড়া দর্শনের জন্য বহু পুরুষ নারী বালকবালিকা তথায় সমবেত হন। হোগলা-নির্ম্মিত প্যাণ্ডেলের তিন

দিকে দেওয়াল ছিল এবং একদিক বাঁশের বেড়া দিয়া ও লোহার গেট বসাইয়া "সুরক্ষিত" করা হয়। মেয়েদের আসনের ও পরদার কড়া বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহাদের আগমন-নির্গমনের জন্য একটি মাত্র দ্বার ছিল, সেটিকেও গেট বসাইয়া তালাচাবি দিয়া "সুরক্ষিত" করিয়া রাখা হইয়াছিল। হঠাৎ গ্রীণ-রুমে আগুন লাগে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত প্যাণ্ডেলে আগুন ধরিয়া যায়। সুরক্ষিত দ্বার আর খোলা হইল না, সতর্ক এবং কড়া রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যেই ১১৯টি নারী ও শিশু দশ মিনিটের মধ্যে পুড়িয়া মরিল। এই ঘটনা সম্পর্কে পরে কলিকাতা কর্পোরেশনে আলোচনা হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত সুধীর রায় চৌধুরী ইহার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার খানিকটা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

আগুন লাগিবার কারণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী বলেন যে গ্রীণরুমে প্রথম আগুন লাগিয়াছিল এ সম্বন্ধে সকলেই একমত। ব্যায়ামপ্রদর্শনীতে লাঠির মাথায় আগুন লাগাইয়া খেলা দেখাইবার অল্প পরেই আগুন লাগে। বৈদ্যুতিক তারের দোষে অথবা অপর কোন কারণে আগুন লাগিয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। প্যাণ্ডেলের মধ্যে মেয়েদের বসিবার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল এবং পুরুষদের ও মহিলাদের বসিবার আসনের মাঝখানে বাঁশের বেড়া দেওয়া ছিল। সকলেই বলিয়াছেন যে দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল।

ঘটনাস্থলে ফায়ার-ব্রিগেডের আগমন সম্বন্ধে তিনি বলেন যে স্থানীয় জনৈক ভদ্রলোকের নিকট তিনি শুনিয়াছেন যে আগুন লাগিবামাত্র উপরোক্ত ব্যক্তি ফায়ার-ব্রিগেডে টেলিফোন করিয়া অবিলম্বে উহাদিগকে আসিতে বলেন। টেলিফোনের প্রায় ২০ মিনিট পরে ফায়ার বিগেড আসে এবং দগ্ধীভূত মৃত-দেহগুলির উপর বড় বড় নল দিয়া জল ছিটানোই তাহাদের সার হয়। এই প্যাণ্ডেলে স্বেচ্ছাসেবকের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। প্যাণ্ডেলের ভিতরে নারী ও শিশুদের সাহায্য করিতে পারে এরূপ একটিও যুবক বা বালক ভলণ্টিয়ার ছিল না। আগুন নিভাইবার কোন বন্দোবস্ত ছিল না, অগ্নিনির্ব্বাপক যন্ত্র ত দূরের কথা, এক বালতি জলও রাখা হয় নাই। ঘটনাস্থলে আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষ অথবা এ-আর-পি কাহারও প্রাথমিক চিকিৎসা করে নাই। আশ্রমের ঠাকুর অথবা সভাপতি কেহই সেখানে ছিলেন না। ঘটনার পরেই স্থানীয় লোকেরা ঠাকুরের সন্ধানে যান কিন্তু তিনি তখন সরিয়া পড়িয়াছেন। ব্যাপারটির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করিবার জন্য কর্পোরেশন একটি বিশেষ কমীটি নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

উপরোক্ত মর্ম্মন্তুদ ঘটনাটি ঘটিতে মিনিট দশেক সময় লাগিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে পুরুষ ও নারী আসনের মাঝখানে যে বাঁশের বেড়া ছিল তাহা ভাঙিয়া ফেলা কি সম্ভব ছিল না? ব্যায়াম-বীরেরা আগুন হইতে নারী ও শিশুদের বাঁচাইবার কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন কি? বলিষ্ঠ যুবকেরা সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বীরত্ব প্রদর্শনের যে অবকাশ পাইয়াছিলেন তাহার সুযোগ তাঁহারা লইয়াছিলেন কি? এরূপ দুর্ঘটনার পুনরভিনয় যাহাতে আর কখনও না হইতে পারে তাহার জন্য কর্পোরেশনের তরফ হইতে কঠোর ব্যবস্থা যেন শেষ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয়।

—

গোবিন্দনাথ গুহ

অশীতিপর মনীষী সুপণ্ডিত গোবিন্দনাথ গুহ মহাশয় গত মাসে মজঃফরপুর শহরে দেহরক্ষা করেছেন। তিনি ছাত্রজীবনে কৃতিত্বের সহিত ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায়, প্রবেশিকা পরীক্ষাতে এবং বি-এ পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। তার পর দর্শনে এম-এ পাস করেন। বাংলা ও বিহার প্রদেশে তিনি বিভিন্ন স্কুলে হেড্ মাস্টারের কাজ করেন। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৩ পর্য্যন্ত তিনি অন্ধ্র দেশের গঞ্জাম জেলার বহরমপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। বাল্মীকিরই ভাষা ও ছন্দ বজায় রেখে "লঘুরামায়ণম্" নাম দিয়ে তিনি বাল্মীকির রামায়ণের যে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন, তা ভারত-বর্ষের সকল অঞ্চলে আদৃত হয়, তার চার-পাঁচটি সংস্করণ হয়েছে। "দাসী" পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদে যাবার পর তিনি কিছু দিন তার সম্পাদন ক'রেছিলেন। তিনি উন্নতচরিত্র, সংযতবাক্ ও সাতিশয় নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান ক'রে গেছেন।

—

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী

বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীর সপ্ততিপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে কলিকাতার সাংবাদিকগণ ও পূর্ণিমা সম্মিলনীর সভ্যেরা তাঁহার বাটিতে গিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁহার কন্যাদ্বয় হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবীর হাতে ভারতী সম্পাদনের ভার দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তাহার পর সরলা দেবী দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করেন। ইনি ছয় বৎসর Journalists' Association-এর সভানেত্রী ছিলেন। তিনি স্বদেশী যুগেরও পূর্ব্বে বাঙালী ছেলেমেয়েদের মধ্যে শরীরচর্চ্চা ও বীরত্বের উদ্বোধনকল্পে বীরাষ্টমী, শিবাজী উৎসব, প্রতাপাদিত্য উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। বাংলা দেশে ও বাংলার বাহিরে অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য তিনি ভারত স্ত্রী মহা-মণ্ডলের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীশান্তা দেবী

কাশ্মীর-ভ্রমণ

শ্রীশান্তা দেবী

(৩)

কাশ্মীরী মানুষ ত প্রত্যহই দেখতাম। কিন্তু তাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার কিছুই জানি না। নিয়োগী-মহাশয়ের কৃপায় হঠাৎ এই একটা বিয়ে দেখবার সুযোগ জুটে গেল। টাঙ্গায় ক'রে রাত্রে শ্রীনগরের যত বিশ্রী রাস্তা ঘুরে একটা অন্ধকার মাঠের মত জায়গায় গিয়ে নামলাম। কনের বাড়ীর লোকেরা আলো নিয়ে এসে কোনও রকমে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। কাশ্মীরী সাধারণ বাড়ীতে সৌন্দর্য্য কিছু নেই। খুব সরু সরু সিঁড়ি, এলোমেলো নানা দিকে ঘর। উপর তলার একটি ঘরে বিবাহ-সভা বসেছে। না জানি কি দেখব ভেবে উৎসুক হয়ে ঢুকলাম। পাগড়ী টাগড়া পরে প্রায় যোদ্ধার মত বেশে বর বসেছে; চুড়িদার পায়জামা এবং কোটের উপর পৈতে পরেছে ব্রাহ্মণত্ব দেখাবার জন্য। পণ্ডিতরা চার পাশে বসে বৈদিক মন্ত্র পড়ছে; বাড়ীর মেয়েরা রূপের পসরা খুলে আর এক দিকে বসেছে; তারা গান গাইছে আর বাঙালী মেয়েদের মত শাঁখ বাজাচ্ছে থেকে থেকে। কিন্তু কনে কই? বিবাহ-সভার মধ্যস্থলে সবাই পুরুষ। কনের ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, "যার বিয়ে হচ্ছে সে কই?" সে দেখিয়ে দিল ধোঁয়া-রঙের একটা পুঁটলি। বললে, "ঐ শালের পুঁটলির ভিতর কনে আছে। ওকে কাউকে দেখ্‌তে নেই।" বর কিম্বা বরকর্ত্তা কেউ তার কাপড়ের একটা কোণও দেখ্‌তে পেলে মুস্কিল। আচ্ছা বিয়ে যা হোক! মেয়েটিকে নাকি দু-দিন এই রকম থাকতে হবে। কি আর করি? কনে দেখ্‌তে না পেয়ে কনের ভাই ভাজের সঙ্গেই ভাব করলাম। ভাজটি এমন সুন্দর দেখ্‌তে যে তার মুখের দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না। তাকে আমার ভাল লেগেছে দেখে সে মহা খুশী হয়ে আমার সঙ্গে 'মা' পাতাল। বললাম, "তোমার একটা ছবি আমায় দাও।" কিন্তু তার ছবি নেই। একটি কাশ্মীরী ছেলে আমায় বিবাহ সংক্রান্ত সব ব্যাপার বুঝিয়ে দিচ্ছিল। সে আগাগোড়াই বরকে বললে "bride" এবং কনেকে বললে "bridegroom"।

প্রথম দিন ছিল বিয়ে, তার পর দিন আবার খাবার নিমন্ত্রণ হ'ল। সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে দেখি সামিয়ানার তলায় এবং একতলার ঘরে সর্ব্বত্র মানুষ খেতে বসেছে। বাড়ীশুদ্ধ সবাই এসে আমাদের উপরতলায় অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। আজ বাড়ীর বড়বৌও এলেন। বড়বৌটি



মাঝির মেয়ে। লেখিকা কর্ত্তৃক অঙ্কিত

প্রায় অপ্সরী বললেই হয়। এত সুন্দর মেয়ে এ দেশে দেখা যায় না। তাঁর ছেলেমেয়েদের রং ফরসা, কিন্তু তারা দেখতে এত সুন্দর নয়। মেয়েদের নাম একেবারে বাংলা:—শোভাবতী, চন্দ্রাবতী, কমলাবতী ইত্যাদি। অনেক পুণ্যে আজ কনেকে দেখা গেল। তাকে পুঁটলির ভিতর থেকে বার করা হয়েছে। জরির পাড় তোলা নীল রঙের রেশমী শাড়ী ঘুরিয়ে পরেছে। হাতে কাশ্মীরী চুড়ের উপর ব্রেসলেট, কানে দুল, তার পাশ দিয়ে এয়োতির চিহ্ন সোনার ঝিঁঝিরে মাদুলি দোলানো। মাথায় একটা সাদা stiff কলার বাঁধা, তার উপর ঘোমটাও আছে। কনে ছাড়া বাড়ীর আর কোনও মেয়ে শাড়ী পরে নি, তারা সব লাল, সবুজ, নীল, সাদা জোব্বার মত

পরেছে। কোনও কোনও মেয়ের হাতে গহনা নেই, একেবারে খালি। তবু দেখলে মনে হয় সবাই এক এক জন রাজকন্যা। গৃহকর্ত্তী পণ্ডিতানী সাদা জোব্বা চাদর ফোঁটা পরে অতিথিদের খুব আদর-অভ্যর্থনা করলেন। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের অধিকাংশের চেহারায় খুব একটা আভিজাত্যের চিহ্ন আছে। সামান্য গৃহস্থ, কিন্তু দেখলে মনে হয় একটা কেষ্টবিষ্টু হবে, যে সে নয়। কার্পেট আর রঙীন ফুলদার সতরঞ্চি মোড়া ঘরে আমাদের বসতে দিল। তার উপর আবার লম্বা কম্বল পেতে হ'ল খাবার জায়গা। বড় পিতলের গামলা ও জগে এল হাত ধোবার জল। তার পর এল খাবার :—বড় বড় কাঁসার থালায় ভাত ও বাটিতে বাটিতে তিন-চার রকম মাংসের তরকারি; ঝাল ঝোল অম্বল সবই মাংসের, পাতে সামান্য একটু শাক ও আচার দেয়। প্রচুর লঙ্কা বাঁটা দিয়ে রান্না। আমরা তাদের দেখব কি, তারাই আমাদের দেখতে এত ব্যস্ত যে মেয়ে পুরুষ সবাই প্রায় ঘাড়ের উপর ঝুঁকে রইল। মেয়েরা অনেকে উর্দ্দু ঘেঁসা হিন্দী বলতে পারে। আমার গহনা কাপড়, সিঁদুর, ছেলেপিলে, নাড়ীনক্ষত্র সব কিছু বিষয়েই তাদের কৌতূহল। সাধ্যমত তাদের কৌতূহল মিটিয়ে সেদিনকার মত ফেরা গেল।

শ্রীনগরে শঙ্করাচার্য্যের পাহাড় বলে যে পাহাড়টি আছে, ৬ই সকালে তাতে উঠ্‌ব ঠিক করলাম। রাস্তা ভালই, কিন্তু পাথর দিয়ে বাঁধানো নয় বলে মাঝে মাঝে পা ফস্কে যায়। আমি তাড়াতাড়ি পাহাড়ে উঠ্‌তে পারি না, আমার পাশ দিয়ে অনেকগুলি সাহেব ও পাঞ্জাবী তর তর ক'রে উঠে চলে গেল। কাশ্মীরে রোদ আশ্চর্য্য উজ্জ্বল, অনেক মাইল পর্য্যন্ত চারিদিক সুস্পষ্ট দেখা যায়। একটু উপরে উঠ্‌লেই দেখা যায় কাশ্মীর উপত্যকাকে ঘিরে আছে হীরার মালার মত বরফের পাহাড়। রোদে বরফ ঝক্‌ঝক্ করছে, মাথার উপরে উপরে মেঘ, কিন্তু তুষারশৃঙ্গগুলি ঢাকা পড়ে নি। তিন দিক খুব স্পষ্ট আর একটা দিক সেদিন একটু আন্দাজ ক'রে নিতে হচ্ছিল। পাহাড়ের উপর বসে এরোপ্লেন থেকে দেখার মত ক'রে শ্রীনগর দেখা যায়। চারি দিকে জলের খাল আর নদী চলেছে, বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় বহু পূর্ব্বে শ্রীনগর সবটাই প্রায় হ্রদ ছিল, তারপর আস্তে আস্তে ভরাট ক'রে সহর বাগান ক্ষেত সব হয়েছে। এখনও ক্রমাগত ভরাটের কাজ চলছে। জলপথগুলি ক্রমশঃ নালা হয়ে উঠেছে, তাকে এরা বলেও নালা। কথিত আছে, কাশ্মীর পুরাকালে সতী-সায়র নামে হ্রদ ছিল।

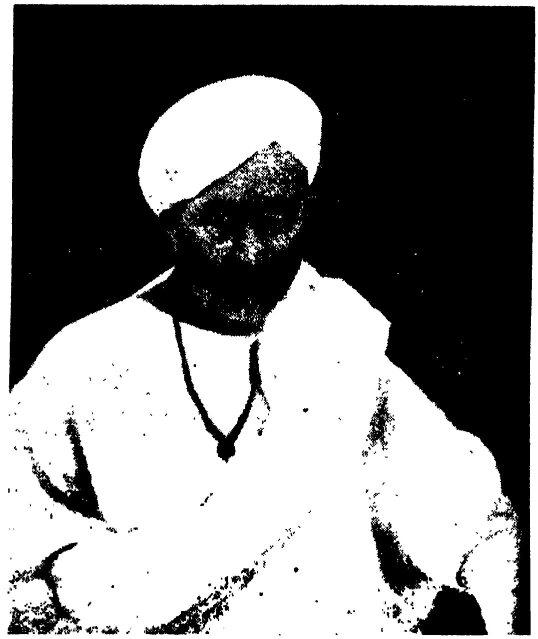
ঠিক কতটা উঠেছিলাম জানি না, ১০০০ ফুটও হ'তে পারে, বেশীও হ'তে পারে। এক দিকে ডাল হ্রদ, নাগিনা বাগ, নাশিম বাগ প্রভৃতি বড় বড় বাগান, অন্য দিকে নেডুস হোটেল পার হয়ে জম্মুর রাস্তা পর্য্যন্ত সব দেখা যায়। দূরে হরিপর্ব্বত, তার পিছনে শুভ্র তুষারশৃঙ্গ। কাশ্মীর উপত্যকার অপূর্ব্ব শ্যামশ্রীর ও তার বিভিন্ন স্তরের সবুজের খেলার একটা ছবি পাওয়া যায় উপরে উঠলে। প্রায় প্রতি রাস্তার ধার দিয়ে জলের নালা চলেছে, তাতে ছোটবড় নৌকা, জলপথের ওদিকে ভাসমান উদ্যান। এক সময় এগুলি জল ছিল, এখন চাষীরা ভরাট ক'রে ক'রে ক্ষেত করছে, তার ফলে নদীর মত বড় বড় জলপথগুলি ক্রমশঃ সংকীর্ণ নালা হয়ে উঠেছে। কাশ্মীর-রাজ এই রকম ক'রে কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য নষ্ট করতে যদি না দেন তবে তাঁরই রাজ্যের সুনাম হবে। যেদিকে উন্মুক্ত হ্রদটুকু আছে সেই দিকেই সাহেবদের বড় বড় হাউস-বোটগুলি জলে ভাসছে। তীরে নাশিম বাগ, নাগিনা বাগ প্রভৃতি উদ্যান। 'ভাসমান উদ্যান' শুনতে সুন্দর; কিন্তু জলের তুলনায় উদ্যানের সংখ্যা বেড়ে গেলে জলের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রকৃতি তাঁর সৌন্দর্য্যের পসরা উজাড় ক'রে কাশ্মীরের কোলে ঢেলে দিয়েছেন, কোনও দিকে এতটুকু কার্পণ্য করেন নি। প্রভাত সূর্য্যালোকে শঙ্করাচার্য্যের চূড়ায় বসে তাই দেখছিলাম। বিকালে গেলাম বাজারে মানুষের সৃষ্টির নৈপুণ্য দেখতে। মানুষ একত্রে স্বর্গ ও নরক কি ক'রে সৃষ্টি করতে পারে দেখে বিস্মিত হলাম। ভাঙা, জীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন, বাঁকা-চোরা, হেলে-পড়া সারি সারি বাড়ী, ঘরে দোরে পথে নর্দ্দমায় মানুষের গায়ে পোষাকে স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা ও ক্লেদ! বিধাতা এদের স্থলে জলে আকাশে দেহে এত সৌন্দর্য্য দিয়েছিলেন কি বিধাতাকে এমনই করে ব্যঙ্গ করবার জন্য? কাশ্মীর ভূস্বর্গ বটে অনেক দিকে, তবে নরকও পাশাপাশি আছে। এত ভাল এবং এত মন্দ জিনিষ এমন পাশাপাশি কোথাও দেখতে পাওয়া যায় কি না জানি না। এখানকার শিল্পীরা রেশমে পশমে, কাঠে, সোনায় রূপায় যা সব জিনিষ তৈরি করে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। পাঁচ-ছয় টাকা দামে যে-সব সেলাইয়ের কাজ এরা বিক্রী করে তা মিউজিয়মে রাখবার মত, যেন সদ্যফোটা ফুলের বাগান। কাঠের কাজ এত সূক্ষ্ম যে মানুষের কাজ মনে হয় না। কলকাতার বাজারে কাশ্মীরী কাঠের কাজ বলে যা পাওয়া যায় সে অতি মোটা কাজ। এই সব কাঠের কাজ কেউ কেন নিয়ে যায় না জানি না।

অথচ এই অপূর্ব্ব রূপস্রষ্টা শিল্পীরা কি রকম বাড়ীতে আর কি রকম পাড়ায় থাকে দেখলেও বিশ্বাস করা যায় না। ধুলো ও মাছি ভর্ত্তি নোংরা গলির দুপাশে পচা নর্দ্দমার গায়ে অন্ধকার ঘোরান সিঁড়ি দেওয়া নানা মাপের বাঁকা-চোরা বাড়ী। এমন ঠেসে গায়ে গায়ে সেগুলি তৈরি যে সেখানে ঢুকলে কাশ্মীরে যে পাহাড়-পর্ব্বত, হ্রদ, গাছ, নদী, শস্যক্ষেত্র কিছু কোথাও আছে ভাবতেই পারা যায় না। মনে হয় এই শিল্পীরা পার্থিব সৌন্দর্য্য দেখে রূপ সৃষ্টি করে না, অন্তরের প্রেরণা থেকে করে, মনের কোনও কোণে এদের সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী চোখ বুজে বসে আছেন, তিনি দূরের আবেষ্টনের রূপঐশ্বর্য্যসম্ভারও দেখেন না, নিকট আবেষ্টনের ক্লেদ-কালিমাও দেখেন না।

আমরা যে আট-নয় দিন শ্রীনগরে ছিলাম তার মধ্যে চার-পাঁচ বারই বাজারে গিয়েছিলাম; তা ছাড়া নৌকায় ক'রে ব্যবসাদারেরা আমাদের হাউস-বোটেও প্রায়ই জিনিষ বিক্রি করতে আসত। শ্রীনগরে মোটামুটি তিনটা সওদা করবার জায়গা আছে। প্রথমটি হচ্ছে বড় রাস্তার উপর শহরের আদত বাজার। এখানে সব রকম জিনিষেরই দোকান আছে। কিন্তু আমাদের মত বিদেশী যারা জিনিষ কিনতে যায় তারা এখানে গিয়ে অনেকটাই নিরাশ হয়ে আসে। কলকাতার বাজারে আধুনিক যে-সব জার্ম্মান শালের উপর কাশ্মীরী সস্তা সূচীশিল্পের নিদর্শন আমরা দেখি, অধিকাংশ দোকানে সেই সবই পাওয়া যায়। কাশ্মীরে বোনা শালও যা পাওয়া যায় তার মধ্যে ভালগুলির এক দিকের পশম কাশ্মীরের, আর এক দিকের বিদেশী। এগুলি সাদাই বিক্রী হয়, এর উপর কাজ প্রায় কিছুই নেই। অর্ডার দিলে অবশ্য কাজ করে দেয়। বেড-কভার, কুশান-কভার, ব্লাউস-পিস ইত্যাদিতে যে-সব ছুঁচের কাজ এই বাজারে পাওয়া যায় তা বেশীর ভাগই সস্তা বিলিতি পর্দ্দা প্রভৃতির নক্সা থেকে নেওয়া। অনেক বস্তা জিনিষ ঘাঁটলে আসল প্রাচীন কাশ্মীরী নক্সা কিছু বেরোয়। এই সব দোকানে জিনিষ খুব সস্তা কলকাতার তুলনায়; এরা দরও খুব বেশী করে না। তবে মেকি টাকা চালাতে এরা অদ্বিতীয়। এক দোকানে টাকা ভাঙিয়ে দেখতাম পরের দোকানে সে টাকা পয়সা আর চলে না। এই বাজারে একটি খাদি-প্রতিষ্ঠানের দোকান আছে, তারা কাশ্মীরী প্রথায় দর করে না এবং ভাল জিনিষ রাখে।

সেকেলে কাশ্মীরী কাজ কিনতে হ'লে যেতে হয় কাশ্মীরী কারিগর ও ব্যবসাদারদের পাড়ায়। সেটা



কন্যাকর্ত্তা। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত নারায়ণ জু

দোকানপাড়া নয়। কারিগররা এইখানেই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বসবাস করে, কাজ করে এবং ঘরগুলি তৈরি জিনিষ-পত্রে বোঝাই করে রাখে। এখানে নূতন ও পুরাতন সব রকম শাল, কার্পেট, সেলাই, রূপার কাজ, কাঠের কাজ ইত্যাদি পাওয়া যায়। হাজার দু-হাজার দামের জিনিষ থেকে পাঁচ-দশ টাকা দামের জিনিষ পর্য্যন্তও পাওয়া যায়। তবে সত্য যে কোন্ জিনিষের কি দাম সে 'দেবাঃ ন জানন্তি' আমরা ত কোন্ ছার! একে ত শাল দোশালা, কার্পেটের দাম আমাদের মত মানুষের পক্ষে আন্দাজ করা শক্ত, তার উপর কারিগরদের পাড়ায় ঘরগুলি এমন চমৎকার অন্ধকার যে সেখানে হীরেকে জিরে এবং জিরেকে হীরে মনে করা কিছুই বিচিত্র নয়। খুব প্রাচীন শালের নক্সা যে রকম সুন্দর এবং কাজ যে রকম ভরাট, আজকাল সে রকম বড় আর তৈরি হয় না। কাজেই এ-সব জিনিষ কিনতে হ'লে পুরানোই কিনতে হয়। একটা দোকানে এই রকম শ-দুই শাল দেখে আমরা একটা পছন্দ করেছিলাম। কারিগরটি জিনিষ বিক্রী করতে পাবার লোভে নিজের শিকারায় ক'রে আমাদের তার বাড়ী নিয়ে গেল। জিনিষ দেখার পর যেটি পছন্দ করলাম তার কাজ আশ্চর্য্য সুন্দর। তিন শত টাকা দাম বলে দর সুরু হ'ল, শেষে নাম্‌ল ১৫০

টাকায়। লোকটি ত তৎক্ষণাৎ জিনিষ দিয়ে টাকা নেবার জন্ম ব্যস্ত। আমার সঙ্গে অত টাকা ছিল না বলে লোকটিকে বললাম, "চল আমাদের নৌকায়।" সে রাজি হ'ল, কিন্তু বলল, "আপনারা যে আমার দোকানের জিনিষ পছন্দ করেছেন এবং ১৫০ টাকা দিয়ে কিনচেন, তা লিখে দিন। পরে অন্য লোককে দেখালে আমার ব্যবসার সুবিধা হবে।" লিখে দেওয়া হ'ল। শালওয়ালার শিকারায় চড়েই আমাদের নৌকায় ফিরে এলাম। সেখানে এসে আলোতে শালটি খুলেই দেখি, সেটি শাল ত নয় যেন ফকিরের আলখাল্লা! অনেকগুলি অতি প্রাচীন জীর্ণ শালের টুকরাকে জোড়া দিয়ে তৈরি করা হয়েছে; ছবি তুলে রাখলে দেখতে ভালই হবে কিন্তু গায়ে দিতে গেলে এক টানেই বোধ হয় ছিঁড়ে যাবে। আমার বড় সন্দেহ হ'ল। বললাম, "আজ শালটা রেখে যাও, কাল আমাদের এক বন্ধুকে দেখিয়ে দাম দেব।" লোকটা চটে গেল, কিন্তু রেখে গেল। আমরা শাল নিয়ে মিসেস নিয়োগীর বাড়ীতে গেলাম। তাঁরা বললেন, "এ তালি-দেওয়া শাল এক মাসও টিকবে না। এ কুড়ি টাকা দিয়েও কিনবেন না।"

পরদিন আবার শালওয়ালা এল। শাল ফিরিয়ে দেওয়াতে মহা তম্বী। শেষে শিকারার তিন বারের ভাড়া নিয়ে তবে গেল। কিন্তু সে পর্ব্বের শেষ এখানে হ'ল না। আমরা কলকাতায় ফিরে আসবার কিছু দিন পরে কাশ্মীরের Tourist Bureau থেকে আমাদের নামে এক চিঠি এল যে আমরা এক জন ব্যবসাদারকে কথা দিয়েও তার জিনিষ কিনি নি, এতে তার ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। সুতরাং যেন আমরা অবিলম্বে ১৫০ টাকা দিয়ে তার জিনিষ কিনি অথবা না-কেনার কারণ দেখাই। কারণটা লিখে পাঠাবার পর আর চিঠি আসে নি এই রক্ষা।

এই সব পুরানো জিনিষ কেনা অনেকটা জুয়াখেলার মত। ভাগ্যে থাকলে খুব ভাল জিনিষ পাওয়া যায়, না হ'লে সব টাকা জলে যায়। তবে এই সব কারিগরদের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ করবার ক্ষমতা এবং বাড়ী নিয়ে গিয়ে জিনিষ পরীক্ষা করবার ধৈর্য্য ও পশ্চাদ্ধাবমান অসংখ্য দোকানদারের অনুরোধ এড়ানোর নৈপুণ্য যদি কারুর থাকে তিনি এই পাড়াতে কাশ্মীরের আশ্চর্য্য সুন্দর শিল্প-সমূহের নিদর্শন সংগ্রহ করতে পারবেন।

তৃতীয় জিনিষ কেনবার জায়গা বাঁধের উপর সাহেব পাড়ার দোকানে। মেমসাহেবরা নিজেদের দেশের বাজে নক্সার নকল কিনতে আমাদের দেশে আসে না, সুতরাং এই সব দোকানে আসল পার্সিয়ান, কাশ্মীরী, তিব্বতী ইত্যাদি নক্সার জিনিষ ও ভাল কাটের কোট প্রভৃতি পাওয়া যায়। এরা দাম নেয় খুব বেশী এবং দর করে তার চেয়েও বেশী। বাঁধের উপরের একটি চীনা দোকান থেকে আমরা একটি চীনা ঘণ্টা ও চীনা করুণা দেবীর মূর্ত্তি কিনেছিলাম, দুটিই খাঁটি চীনা শিল্প। দোকানদারটি অনেক আশ্চর্য্য সুন্দর চীনা জিনিষ দোকানে রেখেছে। আমরা তার দেশ দেখেছি শুনে আমাদের খুব খাতির করল। আমার সঙ্গে নিয়োগী মহাশয়ের ছোট মেয়ে উমা দোকানে গিয়েছিল। চীনা দোকানদার তাকে আমার মেয়ে মনে করে একটা সুন্দর চীনা পুতুল উপহার দিল।

জিনিষ কিনবার চতুর্থ স্থান নিজেদের নৌকা। ব্যবসাদাররা শিকারায় করে সেখানে জিনিষ নিয়ে আসে। তাদের কাছে ঠিক দর করে কিনতে পারলে সব চেয়ে সস্তা হয়। সব রকম জিনিষই তারা আনে এবং কিছু ঘাড়ে না চাপিয়ে ছাড়ে না। আজকাল সুতার সাধারণ শাড়ীর দাম হয়েছে পাঁচ টাকা; এদের কাছে দু-বছর আগে সুন্দর রঙীন কাশ্মীরী রেশমী শাড়ী এই দামে পেয়েছি। অবশ্য ঠকাতে এরাও খুবই চেষ্টা করে, কারণ এরা কারিগরের পাড়ারই লোক।

৬ই যখন বাজারে গেলাম বাজারের ব্যবসাদার শিল্পীরা তাদের নাম ছাপা কার্ড নিয়ে গাড়ীর পিছন পিছন আমাদের তাড়া ক'রে বেড়াতে লাগল। সবাই আমাদের পাকড়াতে চায়, দরও করে অসম্ভব। কোন প্রকারে তাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নগিনা বাগ প্রভৃতির পথে বেড়াতে গেলাম। এগুলি বোধ হয় বাদসাহী বাগান নয়, পাশ্চাত্য ধরণের বাগান, হ্রদের ধারে বড় বড় জমি, যেন ঘাসের গালিচা পাতা, তার ধারে ধারে চেনার প্রভৃতি বিরাট্ সব মহীরুহ। উইলো, পপলারেরও অভাব নেই। সুসজ্জিত হাউস-বোটগুলি জলের ধারে দাঁড়িয়ে। জল এখানে অনেকটা পরিষ্কার। বড় বড় বজরার ছাদে চাঁদোয়া-টাঙানো, তার তলায় সাহেব-মেমরা বসে প্রকৃতির শান্ত শোভা দেখছেন। কেউ কেউ ছেলেপিলে নিয়ে নীচে নেমে বোটের ধারে জলে খেলা করছে, কেউ দল বেঁধে হাঁটতে বেরিয়েছে। পথের ধারের সরু জলের নালা দিয়ে ধূসর ও কৃষ্ণবসনা কৃষক-রমণীরা তরিতরকারীর নৌকা বেয়ে চলেছে, কেউ নূতন ভাসমান উদ্যান তৈরী করছে, কেউ ক্ষেত থেকে বড় বড় ওলকপি ইত্যাদি তুলছে।

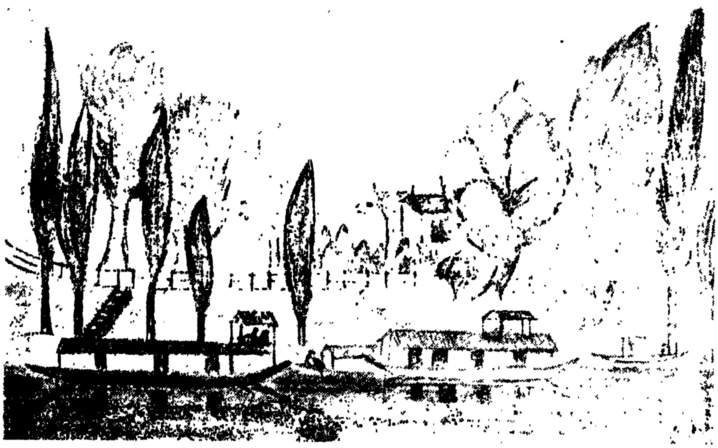
৭ই জুন শ্রীপ্রতাপ কলেজে একটা মস্ত মজলিশ হ'ল চায়ের। ময়দানের সামিয়ানার তলায় প্রায় শ'খানেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এসেছিলেন। কাশ্মীর রাজ্যের মন্ত্রী, চীফ সেক্রেটারী প্রভৃতি ছাড়া আরও অনেক বড় বড় লোককে দেখলাম। বাগানে বাতাসের দোলার সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি চলেছিল। এত সুন্দর অভ্যর্থনা মানুষের পক্ষে করা শক্ত। দেবতাই সহায় হয়েছিলেন। সভাতে লেডি সাফি, তাঁর পুত্রবধূ, অধ্যাপক কিচলুর কন্যা, চীফ সেক্রেটারীর কন্যা প্রভৃতি অনেক মহিলা এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে খাঁটি কাশ্মীরী বোধ হয় কিচলু-কন্যা। উচ্চ বংশের কাশ্মীরী মেয়েদের ওখানে পর্দ্দার বাইরে বিশেষ দেখি নি। এঁরা বোধ হয় নেহরুদের মত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে কিছু দিন বাস করার জন্য পোষাক পরিচ্ছদ ও শিক্ষাদীক্ষায় আধুনিক ভাবাপন্ন হয়েছেন। যাই হোক, কলেজ কর্তৃপক্ষের সাদর আদর-অভ্যর্থনার পর আজ আমরা হোটেল ছেড়ে হাউস-বোটে চলে যাব কথা ছিল। কাশ্মীরে এসে জলে বাস না করলে এখানকার অর্দ্ধেক অভিজ্ঞতা বাকি থেকে যায়। নিয়োগী মহাশয় আমাদের একটি নৌকা ঠিক ক'রে দিলেন, তার দৈনিক ভাড়া ৭ টাকা করে। খাদ্যও নৌকাওয়ালাই দেবে। শ্রীনগরের বাড়ীর মত নৌকাটির সব কিছুই ভাঙা; চেয়ার টেবিল খাট মেঝে সবই নড়বড় করছে। তবে চারখানা ঘরেই কার্পেট পাতা আছে। বাসনকোসনও অনেক। শ্রীনগরের "Bund" অর্থাৎ বাঁধ খুব ফ্যাশনেবল জায়গা; এইখানে যত সাহেবদের বাড়ী, ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস, রেসিডেন্সী, ডিস্পেন্সারী, বড় বড় দোকান ইত্যাদি। বাঁধে বড় বড় চেনার ও উইলো গাছ, তার পরেই ঝিলম নদী। নদীর দুই পাশে সার বেঁধে হাউস-বোট দাঁড়িয়ে আছে। তার ভিতর অনেকগুলি খুব দামী আসবাবে সজ্জিত। বাঁধের দিকে একটি ঘাটের কাছে আমাদের নৌকা "উইণ্ডসর" দাঁড়িয়ে থাকত। গ্রীষ্মকালেই এদেশের লোকে স্নান করে, কাজেই যতক্ষণ রোদ থাকত, ততক্ষণ ধরে সেই ঘাটে চলত কাপড় কাচা আর স্নান। কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী, শিখ, বালক বৃদ্ধ যুবা কত লোক যে আসত তার ঠিক নেই। মন্দস্রোতা ঘোলা নদীর জল সারা শহরের আবর্জ্জনা বয়ে বয়ে এত নোংরা হয়ে



হরিপর্ব্বতের কেল্লা শ্রীনগর

উঠেছে যে মানুষে তাতে কি করে স্নান করে বুঝতে পারতাম না। নৌকায় বসে বসে সারাদিন দেখতাম এক দিকে স্নানার্থীদের আনাগোনা আর একদিকে ফিরিওয়ালাদের ঘোরাঘুরি। এই জলপথটিই শ্রীনগরের প্রকৃত রাজপথ, সারাদিন কত পণ্য বোঝাই নৌকা যে চলেছে কত দিকে তার ঠিক নেই। সুদর্শন ফিরিওয়ালারা সবাই একবার ক'রে এসে নৌকো লাগাচ্ছে আমাদের নৌকার পাশে। বিদেশী পর্য্যটক যতক্ষণ না তার জিনিষ দেখবে সে ততক্ষণই জোঁকের মত তার পিছনে লেগে থাকে। কত রকমের সব জিনিষ। শাল, রেশম পশমের কাজ, কাঠের কাজ, কাগজের মণ্ডের বাসনকোশন, শাড়ী, গহনা, রূপার বাসন, গালিচা, ফল, তরকারি সবই নৌকা বোঝাই হয়ে স্রোত বেয়ে চলেছে। এদের অপরিসীম ধৈর্য্য, দর করারও অন্ত নেই, জিনিষ দেখানোরও শেষ নেই। কেউ খুব ঠকিয়ে যায়, কেউ খুব সস্তাও দেয়। আমরা যে ঘাটে থাকতাম তার নাম ল্যাম্বার্ট ঘাট।

ল্যাম্বার্ট ঘাট থেকে নিয়োগী মশায়দের বাড়ী ছিল খুব কাছে। তাঁর ছোট মেয়ে উমা রোজ এসে আমাদের তদারক ক'রে যেত আর কত গল্প করত। মাঝে মাঝে নিয়ে আসত তার মায়ের রান্না তরি তরকারী। নৌকাতে আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে ছিল, তারা কাশ্মীরী মাঝির মেয়ে। সব চেয়ে ছোট্ট মেয়েটির নাম নূরজাহান। বেশ গোলাপ ফুলের মত দেখতে, কিন্তু পোষাকটা ছিল কমলে অথবা গোলাপে কণ্টকের মত চক্ষুপীড়াদায়ক। ভোর হলেই মেয়েটি তার দিদিকে নিয়ে এসে সামনে দাঁড়াত,



ল্যাম্বার্ট ঘাট। লেখিকা কর্তৃক অঙ্কিত

এবং বাঁহাতটা উল্টে মাথায় ঠেকিয়ে বলত "ছেলাম, মেম ছা'ব।" উদ্দেশ্য একটি পয়সা কি বিস্কুট আদায় করা। যেদিন ফুল নিয়ে আসত সেদিন তার বাবা শিখিয়ে দিত দু-আনা চাইতে। এরা নৌকাওয়ালার মেয়ে। বড় মেয়েটির ৮।৯ বছর বয়স। সে কাশ্মীরী প্রথায় সরু সরু বিনুনী বেঁধে মাথায় জরি দেওয়া টুপির সঙ্গে রূপার ঝুমকো দুলিয়ে পরত। ছোট মেয়েটির বয়স ৩।৪ মাত্র। তখনও তার চুল ছাঁটা, এবং পোষাকও ঠিক মহিলাজনোচিত নয়। আমার কাছে একদিন একটা সাবান উপহার পেয়ে সে মহাখুসী। সাবান মেখে নদীতে নেমে কত যে জলক্রীড়া দেখালো তার ঠিক নেই।

নৌকাওয়ালা তার সামান্য পুঁজিপাটা দিয়ে এই পুরানো হাউস-বোটটি কিনেছে। এইটিই তার জীবিকার উপায়। বিদেশীদের এই নৌকা দিন হিসাবে কিম্বা মাস হিসাবে ভাড়া দিয়ে তারা সংসার চালায়। তারা স্বামী-স্ত্রীতেই রান্নাবান্না, বাজার করা, পরিবেষণ করা সব করে। সঙ্গে আরও দু-এক জন আত্মীয় থাকে তারা কাজে সাহায্য করে। একজন লোক স্নানের জল দিত এবং মেথরের কাজ করত, সে ওদের আত্মীয় কি না জানি না। তবে মেথরের কাজের জন্য তাকে অপাংক্তেয় বলে ত মনে হ'ত না। হাউস-বোটের গায়ে আরও দুটি নৌকা থাকে, একটি রান্নার নৌকা, অন্যটি শিকারা অর্থাৎ ছোট ডিঙ্গী। রান্নার নৌকায় রান্নাবান্না হয় এবং চাকর-বাকর সপরিবারে থাকে। শিকারাটি গাড়ীর কাজ করে। এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় তাড়াতাড়ি যেতে হ'লে কিম্বা এপার থেকে ওপারে যাবার কাজ থাকলে হাউস-বোটের অধিবাসী ও চাকর-বাকরেরা শিকারা ব্যবহার করে। প্রত্যেক বারই আলাদা ভাড়া দিতে হয়। আমরা ল্যাম্বার্ট ঘাটের যেখানে হাউস-বোট রেখেছিলাম সে জায়গাটা নানা কারণে আমার ভাল লাগত না। ইচ্ছা ছিল ওপারে নৌকা রাখি, কিন্তু তাহ'লে এদিক-ওদিক যাওয়া-আসার জন্য বার বার শিকারা ভাড়া করতে হ'ত, অথবা বন্দী হয়ে সারা দিনই বড় বোটে বসে থাকতে হ'ত। এই ভয়ে ওপারে থাকা হয় নি।

শ্রীনগরে একটি সুন্দর মিউজিয়ম আছে। আমরা দু-তিন বার সেখানে গিয়েছি। ল্যাম্বার্ট ঘাট থেকে শিকারা ক'রে ওপারে গিয়ে তার পর একটি টাঙ্গা নিতাম। কাশ্মীরে যে-সব পুরানো শাল ও সূচিশিল্পের চিহ্ন আজকাল আর বেশী দেখা যায় না, তার অনেক আশ্চর্য্য নিদর্শন এই মিউজিয়মে আছে। হারওয়ানে প্রাপ্ত বহু প্রাচীন কতকগুলি টালির রিলিফ ছবি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। এখন মুসলমানপ্রধান দেশ হ'লেও হিন্দু মন্দির, দেবমূর্ত্তি, যোগী সন্ন্যাসীর রিলিফ ছবি ইত্যাদি কাশ্মীরের হিন্দুপ্রধান যুগের ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দেয়। বিষ্ণুমূর্ত্তি ত গ্যালারির পর গ্যালারিতে সাজান। অধিকাংশের তিনটি মাথা, কোন কোনওটি কালো মার্ব্বেল পাথরের তৈরি। বিষ্ণু কোথাও গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করেছেন, আবার কোথাও তাঁর দুই পায়ের মধ্যে পৃথিবী দাঁড়িয়ে। কাশ্মীরের প্রাচীন রাজবংশের অনেকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মিউজিয়মে দর্শকের দৃষ্টিপথের সম্মুখেই বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে।

ক্রমশঃ

[বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত]

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

শ্রীশান্তা দেবীকে লিখিত

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, জেনোয়াতে এসে তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হলুম। তুমি আমার ডায়ারির কথা লিখেছ—কিন্তু সেই ডায়ারিতে কি যে বকেচি তার প্রায় কিছুই মনে নেই। তাতে মেয়েদের কথা লিখেছিলুম তা মনে আছে, কিন্তু কি ভাবে তা মনে নেই। ও সম্বন্ধে যা বলবার আছে সব যে সম্পূর্ণ ক'রে বলেছিলুম তা সম্ভব নয়। কেন-না ডায়ারি জিনিষটা মনের ক্ষণিক মেজাজের প্রতিবিম্ব—ওতে কেবল এক পাশের ছবি ওঠে—চার পাশ ঘুরিয়ে ত ছবি তোলা যায় না।

এত দিনে খবর পেয়ে থাকবে দক্ষিণ আমেরিকার পথে আমার শরীর খুব খারাপ হয়েছিল, পেরু যাওয়া হ'ল না, আর্জেন্টিনায় ডাক্তারের হাতে প্রায় দু'মাস বন্ধ হয়ে চুপচাপ পড়েছিলুম। ছুটি পেয়েই ইটালিতে এসেছি। এখানকার কাজ সেরে ভারতযাত্রা করতে আর দিন পঁচিশেক দেরি আছে। অর্থাৎ জেনোয়া থেকে যে জাহাজ ১৫ই ফেব্রুয়ারিতে ছাড়বে সেইটেতে যাওয়া স্থির করেছি। আশা করি কোনো কারণে আর তারিখ বদল হবে না। কেন না এ শরীর নিয়ে বিদেশে ঘুরতে আর ইচ্ছে করচে না। অতএব যখন এই চিঠি পাবে তার এক মাসের মধ্যেই দেখা হবে। বড় গল্প লিখতে বলেছ। সে কি সম্ভব? চলতে চলতে গলাবন্ধ বোনা যায় কিন্তু চলতে চলতে কি ষোলো হাত বহরের সাড়ি বোনা সহজ? আজ সকালে মিলানে যাচ্ছি। সামনে অনেক ঘোরাঘুরি অনেক বকাবকি আছে। ইতি ২১শে জানুয়ারী ১৯২৫

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Santiniketan,
Bengal, India.

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার আশা ত্যাগ কর—যুগলক্ষ্মী ক্ষণকালের জন্যে আমার খেয়ালে ভর করেছিলেন, সম্প্রতি তাঁর ঠিকানা কোথায় কেউ জানে না। এখানে এসে অবধি নিজের শরীরের দুঃখটা নিয়েও যে একটু বেশ আরাম করে তাকে লালন করব তারও সময় পাইনি। কাল গবর্ণর দেখা দিয়ে চলে গেছেন—কিন্তু অবকাশের ফাঁকা কোথাও নেই, সমস্ত নিরেট করে কাজে অকাজে ঠাসা। এর উপরে ইংরেজি লেক্‌চারটা যেমন করে হোক যত শীঘ্র পারি শেষ করে দিতে হবে। সব চেয়ে মুস্কিল হচ্চে লেখায় অরুচি। নানা দিকের দাবীতে নানা দিকে আমাকে যতই টানচে আমার মন ততই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠচে।

ক্ষুদুর বিয়ের ত আর দেরি নেই—এর মধ্যে কলকাতায় যাওয়া আসা আমার হাড়ে সইবে না। বিবাহ আসরে সশরীরে থাকতে পারব না—আমাদের অন্তরের আশীর্ব্বাদ পৌছবে। ইতি ৯ অগ্রাণ ১৩৩২

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

6, Dwarkanath Tagore Street,
Calcutta.

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, তোমার চিঠি পড়ে মনে হয়েছিল আমার "বুদ্ধজন্মে"র কবিতাটি প্রবাসীর বৈশাখী নৈবেদ্যরূপে তোমরা গ্রহণ করতে পার নি। তাই "বৃক্ষবন্দনা" বলে আর একটি কবিতা কাল পাঠিয়েছি। আমার ইচ্ছা আমার এই রকম কবিতাগুলি প্রবাসীতে দ্বিধাবিভক্ত পাতায় ছাপা না হয়। অন্য নানা জাতের নানা লেখার সঙ্গে কবিতা মিশে গেলে হোয়াইট্‌য়াবে লেডলর দোকানের শেল্‌ফ মনে পড়ে। এই জন্যে কবিস্বভাব-সুলভ অভিমানবশত আমি আমার কবিতাগুলির জন্যে স্বতন্ত্র পংক্তি ও আসন দাবী করি। তোমাদের সাময়িক পত্রের সাম্যতন্ত্রে যদি তা বাধে তা হলে আমরা নাচার।

ভিয়েনা থেকে তেজেশকে যে একটি পত্র লিখেছিলুম আমার গাছের কবিতার ভূমিকা-স্বরূপ সেটি দিতে হবে। পত্রের কাপি এই সঙ্গে পাঠাই। ইতি ১১ চৈত্র ১৩৩৩

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

মেডান
সুমাত্রা

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, সেদিন লিখলুম প্রবাসী পাইনি আজ লিখতে বসেচি প্রবাসী পেয়েচি। হয়ত দুটো চিঠি এক সঙ্গেই পাবে। এবারকার প্রবাসী দেখে খুসি হলুম—ফজলি আমের মতো, শাঁস অনেকখানি। বিপরীত ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্চি। ইংরেজি ভাষায় বলে "গড়িয়ে যাওয়া পাথর শ্যাওলা জমাতে পারে না।" কোথাও এবং কোনো সময়ে একটুখানি বসে যে লিখব সে আশঙ্কা মাত্র নেই। যদি বা দু-দশ মিনিট বসবার সময় পাই, দেহমনে ঘূর্ণি হাওয়ার দম শীঘ্র বন্ধ হতে চায় না। সেই ঘুর বন্ধ না হলে সামান্য একখানা চিঠি জমানোও শক্ত হয়, "প্রবন্ধ পরে কা কথা"—পাক-খাওয়া মন বাক্যগুলোকে যেন তুলো ধুনে নয়-ছয় করতে থাকে। কাল ছিলেম মালয় উপদ্বীপে, আজ এসেছি সুমাত্রায়—আজ বিকেলে এখান থেকে পাড়ি দেব যবদ্বীপে। সেখানে গিয়েও ঘুর ঘুর ঘুর। তার উপরে বক্ বক্ বক্।

তোমার কন্যার নামের ফর্দ্দ সেদিন তাড়াহুড়ো ক'রে পাঠিয়েছি—কারণ এখানে সব কাজই তাড়াহুড়োর ঝাঁপতালে—দিনগুলো মোটর গাড়ি চড়ে ছোটে, স্বপ্ন দেখি দ্রুতলয়ে। পছন্দসই কিছু জুটল কি? * * * শান্তিশ্রী * * * কিন্তু ওদিকে তোমার নামকরণের দিন বোধ হয় চুকে গেছে। তোমার চিঠি যখন আমার হাতে পৌঁছল তখন সে চিঠি তোমার শুভদিনের পঞ্জিকা হিসাব করে পৌঁছয় নি—তখনি দেরি হয়ে গিয়েছিল।

এই চিঠিটা তোমাকে লিখচি, কেবলমাত্র চিঠি লেখা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন এই খবরটি দেবার জন্যে। কিন্তু সেই খবর দিতে গিয়ে যদি লম্বা চিঠি লিখি তা হলে চিঠির দৈর্ঘ্য আমার কথার প্রতিবাদ করবে। এই জন্যে নীচের ক'টা লাইন বাদ দিতে হ'ল। বাদ দেবার আর একটা কারণ আছে। সকালে এই হোটেলে এসে পৌঁচেছি এখনো স্নান হয় নি। বলা বাহুল্য স্নান হলে তবে আহার হবে। শরীর রক্ষার জন্যে আহারের কত প্রয়োজন সে কথা তোমার মতো বিদুষীকে বলা অনাবশ্যক, তবু কথাটার প্রসঙ্গ যে এখানে তুললুম সে কেবল মাত্র আরো দুটো লাইন পুরিয়ে দেবার জন্যে। এর থেকেই বুঝবে ক্রমাগত নাড়া খেয়ে খেয়ে মগজ থেকে সমস্ত স্বাধীন চিন্তা কি রকম ঝরে পড়েচে। যে কথাগুলো না লিখলে চলে না সে কথা ছাড়া আর কিছুই লেখবার শক্তি নেই। চিঠির কাগজের রেখাগুলো দেখচি ভর্ত্তি হয়ে গেল—যে দুটো বাকি আছে সে দুটোতে নামজারি করব—নামের দ্বারা মানুষ কাল দখল করতে চায় আমি চিঠির কাগজের স্থান দখল করব। ইতি ১৭ আগষ্ট ১৯২৭

তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

গোটাকতক বেশ প্রমাণসই ভুল এবারকার আলাপ আলোচনায় দেখা গেল। "অসীম"কে "সসীম" করে অর্থটাকে এক মেরু থেকে আর এক মেরুতে চালান করে দেওয়া হয়েচে। ১৬১ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের এক জায়গায় হওয়া উচিত ছিল "সেই বিশেষ রকম করে দেখা শোনা জানার সুযোগ আমার ও আমার প্রিয়জনের দেহমনের বিশেষ **প্রকৃতির উপরই নির্ভর করে সেই** প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হলে সেই অভিজ্ঞতার সুখ থাকে না।" চিহ্নিত অংশটি লুপ্ত হওয়াতে তাৎপর্য্যটা কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েচে, এই সমস্ত বাক্যবিকারে তোমাদের কোনো দোষ নেই—এ সমস্ত এখানকার লিপিকারের স্বরচিত। যা হোক ভাবীকালে এক বার আমার স্পেপার প্রুফ আমার হাত দিয়ে গেলে রচনা হয়তো নিরাপদ হতে পারে—আমি যে খুব পয়লা নম্বরের প্রুফ-দেখিয়ে এমন অহঙ্কার নেই—তবে কিনা স্বকৃত পাপের জন্যে স্বয়ং শাস্তি পাওয়ার মধ্যে একটা নৈতিক তত্ত্ব পাওয়া যায়-প্রুফ দেখার ব্যাপারে পরকীয় পাপের সমস্ত শাস্তিই নিজেকেই পেতে হয়, অপরাধকারীর গায়ে আঁচড় মাত্র লাগে না। বিশ্ববিধানে প্রুফ দেখা ব্যাপারে ন্যায়নীতির একটা মূলগত ব্যত্যয় আছে এ কথা অতি বড় আস্তিককেও মানতে হবে। যদি বল এতে লেখকের ধৈর্য্যচর্চ্চার সহায়তা করে আজ পর্য্যন্ত তার প্রমাণ পাই নি—বরঞ্চ প্রত্যেকবারের আঘাতেই অধৈর্য্যের পরিমাণ বাড়ে বই কমে না। আজ এই পর্য্যন্ত। ইতি অগ্রহায়ণ ১৩৩৪।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"যা ইচ্ছা করি তাই যদি অসীম হয়ে দাঁড়ায়, তবে যা অনিচ্ছা করি তারও **অসীম** হতে বাধা কি?" এইটেই হচ্ছে ভদ্র পাঠ।

ওঁ

Visva-Bharati,
Santiniketan.

কল্যাণীয়াসু

একটি মেয়েকে চিঠিগুলি লিখেছিলুম, তিনি নাম দিতে চান না। এর মধ্যে আমার অনেক মনের কথা আছে হয়ত সেগুলি অপাঠ্য হবে না। মেয়েটি আশ্চর্য্য বুদ্ধিমতী অথচ স্বভাবতই ভক্তিনম্র। এই জন্যেই তাঁকে বিশেষ স্নেহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি চিঠি লিখেছিলুম। তোমার সম্পাদকীয় বিচারে এগুলি যদি প্রবাসীতে গ্রহণীয় মনে করো তবে ছাপিয়ো। যদি না মনে করো লেশমাত্র সঙ্কোচ কোরো না। একটা কথা নিশ্চিত মনে রেখো যদি আমার কোনো লেখা কোনো কারণে তোমাদের ভালো না লাগে আমি বিরক্ত হই নে। হয়ত তার একটা কারণ, নিজের উপর আমার বিশ্বাস আছে, আর একটা কারণ মানবচিত্তে অপরিহার্য্য রুচিবৈচিত্র্য সম্বন্ধে আমার ধৈর্য্য আছে—পূর্ব্বে এতটা ছিল না। আমাকে গাল দিলে এখনো লাগে কিন্তু অকপট ভাবে অপ্রশংসা করলে সেটাকে সহজে মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারি।

এই মেয়েটির কাছে আমার আরো অনেক চিঠি আছে—পরে দেবেন বলেচেন। যদি উৎসাহ পাই তবে সেগুলিও কপি করে তোমার দপ্তরে উপহার পাঠাব।

৪ তারিখে কলকাতায় যাচ্ছি তার পরে কোনো দিন প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের আশা রইল। ইতি ১ ডিসেম্বর ১৯২৭

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ভিন্ন মোড়কে "সংস্কার" নামে একটি ছোট্ট গল্প পাঠালুম। দুর্ভাগ্যক্রমে আলস্যবশত প্রশান্তকে দিয়ে কপি করিয়েছি—আশা করি তাতে তোমাদের বা ছাপাওয়ালার গুরুতর পীড়ার কারণ হবে না।

জাহাজে উপযুক্ত জায়গা এখনো পাইনি। জুনের শেষাশেষি পাব এমন আশা পাওয়া যাচ্চে। ইতিমধ্যে নীলগিরি অঞ্চলে কুনুর পাহাড়ে অবস্থান করা স্থির করেচি। এবারকার প্রবাসী যদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাও তাহলে বিদেশে পাড়ি দেবার পূর্ব্বে হস্তগত হবে। আপাতত আছি আডিয়ারে, সহর থেকে দূরে নির্জ্জনে। সেই সুযোগে গল্পটা লিখেচি—এটা তোমাদের পক্ষে উপাদেয় হবে কি না জানি নে—একদল পাঠক ভ্রূকুটি করবে বলে আশঙ্কা করি। ইতি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার ঠিকানা :—
C/o Maharajah Bahadur
Pithapuram
Coonoor. Nilgiri Hills
Madras

ওঁ

চন্দননগর

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, নিশ্চয় পড়ে দেখব তোমাদের বই,—অনেক দিন এ কাজ করি নি। নদীর জল শুকিয়ে এলে তার ক্ষীণাবশেষ প্রবাহের সঙ্গে ডাঙার সম্বন্ধ যেমন দূরে পড়ে যায়, ভয় হয় পাছে এখনকার কালের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের তেমনি দূরত্ব ঘটে থাকে। আয়ুর জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে রুচির এবং ঔৎসুক্যের ওঠা পড়া চলে—তাই বর্ত্তমানকে বিচার করা ব্যাপারে নিজের যোগ্যতাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নে—সেই জন্যে আমি এখনকার বাণী থেকে আমার কানটাকে সরিয়ে রাখি। তা হোক, পড়ে দেখব তোমাদের বই তার পরে বোঝাপড়া হবে। ইতি ১৭ জুন ১৯৩৫

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"Uttarayan" Santiniketan,
Bengal.

কল্যাণীয়া শান্তা ও সীতা

তোমাদের মায়ের মৃত্যুসংবাদ দুদিন হোলো পেয়েছি। যখন তিনি বেঁচে ছিলেন তখন তাঁর প্রতি সেবাই ছিল তোমাদের ভালবাসার দান—আজ তোমাদের একমাত্র অর্ঘ্য তাঁর জন্যে শোক। সেই শোকে তোমাদের চিত্তকে পবিত্র করুক, দুঃখের গভীরতা থেকে উৎসারিত হোক নির্ম্মল শান্তি ও সান্ত্বনা, তাঁর স্মৃতি কল্যাণ বর্ষণ করুক তোমাদের জীবনে। ইতি ১৮ জুলাই ১৯৩৫

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

"Uttarayan" Santiniketan,
Bengal.

কল্যাণীয়াসু

আজকাল আমি শরীর মনের অবসাদের জন্যে পড়াশুনোয় বিমুখ হয়েছি। ইজি-চেয়ারাসনে নৈষ্কর্ম্য

সাধনাতেই আমি নিযুক্ত। সেই জন্যে, তুমি আমাকে যে বই পাঠিয়েছিলে সেটা আমার অগোচরে কোনো গল্পপাঠ-পিপাসু অধিকার করেছে, আমিও সতর্ক ছিলুম না। আজকাল লঘু দায়িত্বও আমার পক্ষে গুরুভার। তাই কাজে ফাঁকি দিতে পারলে আমি ছাড়ি নে, কিন্তু নির্মম কাজ এই পলাতকার পিছনে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তোমাদের রচনা আমার ভালোই লাগবে, কিন্তু ভালো করে বলবার মতো বেগ কলমে নেই। ইতি

৬ আশ্বিন ১৩৪৩ স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, ডুবুডুবু দেহটাকে পাঁচ-দশটা ডাক্তার জাল ফেলে অতলের থেকে টেনে তুলেছে। বোধ হচ্চে মনটা এখনো সম্পূর্ণ ডাঙায় ওঠে নি, তার কাজ চলচে না পুরো পরিমাণে, থাক্ কিছু দিন জলে স্থলে বন্যা নেমে যাওয়া ঘাটের কাছটায়। পশু দিন এক জ্যোতিষী গণনা করে লিখেছেন যে ৯২ বছর আমার আয়ু। শুনে অবধি উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। কিছু দিন দেহটার উপর কড়া চিকিৎসা চালালে গ্রহ নক্ষত্রেরা আশা করি হঠে যাবে। মিসেস ওয়াডাকে ছবি অনেকদিন হোলো পাঠিয়েছি—কোনো খবর মেলে নি। সমুদ্রের কোন্ পারে তার গয়াপ্রাপ্তি হোলো কী জানি। ছবিটা ভালো আঁকা হয়েছিল।

কলমটা খোঁড়াচ্চে অতএব তাকে ছুটি দেওয়া যাক্। ইতি তারিখ ? আশ্বিন ১৩৪৪

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। এবার কলকাতায় গেলে তোমার মেয়ের সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করব—কিন্তু কবে যেতে পারব এখনো ঠিক করি নি। যেতে একটুও ইচ্ছে নেই। আগেকার মতই একটা ক্লান্তি আমাকে ক্রমে ক্রমে পেয়ে বস্‌চে—কলকাতায় গেলে নানা উপদ্রবের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে এই আশঙ্কা। তা ছাড়া রেলযানে ভ্রমণটা আমাকে অল্পেই কাবু করে তোলে। তোমার বাবা আসবেন লিখেছেন—তাঁর মুখে তাঁর নবতমা নাৎনির কথা শুনতে পাব। আমার আশঙ্কা হচ্চে পাছে আমার নন্দিনীর নামে আমি যে সব গান রচনা করেছি সেগুলি তিনি নিজের ব্যবহারে বাজেয়াপ্ত করেন। নিজের কাব্য সম্বন্ধে কবিদের ঐ এক মস্ত বিপদ—Trespassers will be prosecuted এই নুটিস দরজায় লটকে দেবার জো নেই। ইতি

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, প্রুফ কাল প্রশান্তর হাতে দিয়েছিলুম, সে নিশ্চয় হারিয়ে ফেলেচে। "ভুবন" শব্দে দীর্ঘ উকার ছিল এ ছাড়া আর ভুল ছিল না।

ঢাকায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলুম তারই একটা তোমাদের দেব ঠিক করেছিলুম। কিন্তু সেগুলো খবরের কাগজে একবার মোটামুটি বেরিয়ে গেছে। তার পরে আবার বই আকারে সেগুলো ছাপা আরম্ভ হয়েছে—প্রবাসী বেরিয়ে যাবার যথেষ্ট আগেই ছাপা হয়ে যাবে।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। কোনো কাজ অত্যল্পমাত্রও করা আমার পক্ষে একান্ত অরুচিকর ও শ্রান্তিজনক হয়েছে। দুই-এক দিনের মধ্যে শান্তিনিকেতনে পালাবার ইচ্ছে। আজ বৌমা ও পুপেকে দেখতে এখানে জোড়াসাঁকোয় এসেছি—রাত্রে আলিপুরে ফিরব। তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

6, Dwarkanath Tagore Street,
Calcutta.

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, কথা ছিল মঙ্গলবারে শান্তিনিকেতনে যাব—আর আজ তোমাদের ওখানে গিয়ে তোমার কন্যাকে আর কন্যার মাকে দেখে আসব। কিন্তু দুদিনের উপদ্রবে শরীর আজ একেবারে ভেঙে পড়েছে—তাই আজ বিকেলের গাড়িতেই পালাতে বাধ্য হলুম। ইতিমধ্যে চুপচাপ করে থাকব। ইতি রবিবার তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীসীতাদেবীকে লিখিত

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম, এখনো সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাই নি।

ধাঁ করে যে কয়টা নাম মাথায় এল লিখে দিই অমেয়া, (অমিয়া নয়) আনতি, সুমনা (ফুল), স্বরেণু।

এইটুকু মাত্র লিখেচি হেনকালে আলিগড়ের সন্নিহিত কোন এক জায়গা থেকে পাঁচজন ব্যক্তি আমার ঘরে এসে প্রবেশ করলে। আমার সময় হনন করতে। তার পর এলেন দুজন ওলন্দাজ। তাঁরা এই মাত্র চলে গেলেন, কার্ড পাঠিয়েছেন দুজন পার্সি—এখনি আসবেন। তার পরেই চায়ের সময় আসবেন এক জন ইংরেজ। সন্ধ্যের সময় আর কে আসবেন জানা নেই। ইতি ১০ই পৌষ, ১৩৩৪। তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

১

বধূজীবনের গৌরব বহিয়া যোগমায়া আজ শ্বশুর-বাড়িতে আসিতেছে। জীবন গতির তালে তালে মানুষের পশ্চাতের পটভূমি প্রতি মুহূর্ত্তে মুছিয়া যায়, ট্রেনের তালে তালে তেমনই কুষ্টিয়ার বাসার বৎসরাধিক সঞ্চিত স্মৃতি—বাড়ি পৌঁছানোর তাড়ায় মলিন হইয়া আসিতেছিল।

শ্বশুরবাড়ির গ্রাম কতকাল পরে সে দেখিল। আম বাগানের মধ্যে সেই ছোট টিনের চালা দিয়া তৈয়ারী স্টেশন ঘরটি, স্টেশনের সম্মুখে সঙ্কীর্ণ পাকা রাস্তায় সেই নীচু ছাদওয়ালা রুগ্ন ও খর্ব্বকায় অশ্বচালিত গাড়িগুলি এলোমেলোভাবে দাঁড়াইয়া আছে; ট্রেন আসিবামাত্র গাড়োয়ানেরা লোহার রেলিঙের ওপারে দাঁড়াইয়া তেমনি কলরব তুলিল, গাড়ি লাগবে বাবু, গাড়ি? টিকেট দিয়া গেটের বাহিরে আসিতে-না-আসিতে কেহ বা রামচন্দ্রের হাত হইতে পুঁটুলি কাড়িয়া লইয়া বলিল, এদিকে বাবু, এদিকে আসুন।

পাকা রাস্তার নীচের ডোবাগুলিতে ও নয়নজুলিতে জল থই থই করিতেছে—রাস্তায় ধুলাও নাই। কাল বিকালে যে ঝড় কুষ্টিয়ায় উঠিয়াছিল—এখানেও সে পৌঁছিয়াছিল তাহা , আজ যোগমায়াদের সাদর অভ্যর্থনা জানাইতে রুদ্র বৈশাখী-প্রকৃতি সুস্নিগ্ধ হইয়াছে; আকাশে কিরণ আছে—তাপ নাই, পথে ধুলা নাই।

দুয়ারগোড়ায় শাশুড়ী ও পিসিমা দাঁড়াইয়াছিলেন। শাশুড়ী আগাইয়া আসিলেন পথ পর্য্যন্ত। রামচন্দ্র তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইল—যোগমায়াও শাশুড়ীকে প্রণাম করিল। তিনি চিবুক চুম্বন করত দুই জনকেই প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন, এত দেরি হ'ল যে?

রামচন্দ্র বলিল, এক ঘণ্টা গাড়ি লেট।

পিসিমার পায়ে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, ভাল ত মা?

পিসিমা বড় রোগা হইয়া গিয়াছেন। চুল অনেকগুলি পাকিয়াছে, দাঁত একটিও নাই, চামড়া সব লোল হইয়া অমন যে গৌর বর্ণ—তামাটে করিয়া দিয়াছে।

—আপনি বড্ড রোগা হয়ে গেছেন, পিসিমা।

—আর মা, বেঁচে উঠলাম এই ঢের! যে শীত এবার। ফুলে ফেঁপে পড়েছিলাম। মুখে কিছু ভাল লাগত না, অরুচি। তোমার খোকা দেখব বলেই বুঝি মা-গঙ্গা এবার নিলেন না।

খবর পাইয়া প্রতিবেশিনীরা দেখিতে আসিল। গাড়ি বোঝাই করিয়া জিনিস আনিয়াছে রামচন্দ্র। আনাজ-পাতি হইতে বাসনকোসন পর্য্যন্ত—কত কি মাটির, কাঠের, পিতল কাঁসার জিনিস! কুশল-প্রশ্ন আদান-প্রদানের পর তাহারা চলিয়া গেল। বধূ যোগমায়াকে তাহারা যেমন আগ্রহের সহিত দেখিয়াছিল—ভাবী জননী যোগমায়াকেও তাহারা তেমনই আগ্রহের সহিত নিরীক্ষণ করিল। মেয়েদের যত রূপই থাকুক—খালি কাঁকে নাকি সবই বৃথা!

এখানকার উজ্জ্বল আকাশের আবরণে কুষ্টিয়ার ঝটিকা-ক্ষুব্ধ আকাশ চাপা পড়িয়া গেল। আহারাদি করিয়া সুস্থ হইতে সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা দেখাইবার তাড়া আজ যোগমায়ার নাই; শ্রান্ত বধূকে ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিয়া সে-সব লক্ষণের কাজ শাশুড়ীই সারিলেন। যোগমায়া বড় ঘরটিতেই বসিয়া রহিল। সেই বিবাহ-দিনের বসুধারা-বিচিত্রিত দেওয়াল—সপ্ত ধারার মাথায় সিঁদুর ও ও হলুদের ফোঁটা; ঘিয়ের ঈষৎ কালো সাতটি ধারা দেওয়ালের গা বাহিয়া খানিকটা গড়াইয়া নীচে নামিয়াছে। জোড়া কুলুঙ্গির নীচেই সেই দাগ। এই বসুধারা শুধু রামচন্দ্রের বিবাহ দিনেই ওই দেওয়ালে বিচিত্রিত হইয়া উঠে নাই। এই বংশের কত ছেলের অন্ন প্রাশনে, উপনয়নে ও বিবাহে—পুরাতন চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অনুসন্ধান করিলে কয়েক পুরুষের ইতিহাস উহার মধ্যে মিলিতে পারে।

পূর্ব্বরাত্রি জাগরণজনিত ক্লান্তি দুইজনেরই ছিল—তবু দশটার আগে ঘুমাইবার অবসর মিলিল না। নিজের বাস্তুভিটায় আসিয়া যোগমায়া যেন রামচন্দ্রকে সব সংশয়,

সব দ্বন্দ্বের অতীত করিয়া পাইয়াছে, তাই গাঢ় নিদ্রায় দণ্ডেকের মধ্যে দীর্ঘ রাত্রি শেষ হইয়া গেল।

সকালে শাশুড়ী বলিলেন, ঠাকুরঝি, আজ তরকারি কুটো না, আমাদের দু'জনের খাওয়া বই ত না, ভাতে ভাত ক'রে নিলেই হবে। ওদের গাঙ্গুলি বাড়ি নেমন্তন্ন হ'য়েছে।

পিসিমা বলিলেন, গাঙ্গুলি-বাড়ি কিসের নেমন্তন্ন?

—ছেলের বউ-ভাত। দ্বিতীয় পক্ষ বলে বেশি জাঁক জমক করে নি। আমাদের সঙ্গে একটা কুটুম্বিতে আছে বলে বলেছে।

যোগমায়া তখন কুয়াতলায় কাপড় কাচিতেছিল, এ সব কথা শুনিতে পাইল না। কাপড় ছাড়িয়া সে পিসিমার ঘরে আসিয়া বলিল, আজ আকায় আগুন দেন নি কেন, পিসিমা?

পিসিমা বলিলেন, তোমাদের নেমন্তন্ন আছে মা। খানিক ভাবিয়া বলিলেন, সে ত সেই বিকেলবেলা। দুটি ঝালের ঝোল ভাত খেয়ে গেলে মন্দ হ'ত না।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় নেমন্তন্ন?

—গাঙ্গুলি বাড়ি। বউভাতের নেমন্তন্ন।

—বউভাতের? কার বিয়ে পিসিমা?

—আর মা শুনলে তুমি দুঃখ পাবে—অনুকূলের বিয়ে।

—অনুকূলবাবু? সইয়ের বর?

—হ্যাঁ মা, তোমরা ত দেশে ছিলে না, জানবে কোত্থেকে। বউটা ছেলে মরতে সেই যে শয্যে নিলে—আর শ্বশুরভিটেয় পা দিতে হ'ল না। আজ ছ-মাস হ'ল—

যোগমায়ার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে দেওয়াল ধরিয়া অতি কষ্টে সে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইল। পিসিমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ও কি মা, অমন করছ কেন?

আমার মাঝে মাঝে এমন হয়, পিসিমা। একটু জল দিন, খেলেই সামলে নেব। জল পান করিয়া বলিল, সই মরে গেল!

—আর মা, কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তবে অসময়ে গেলেই দুঃখু। তা হাতের নোয়া সিঁথির সিঁদুর নিয়ে ভাগ্যিমানী গেছে—

যোগমায়া কাষ্ঠ মূর্ত্তির মত সৌভাগ্যবতীর বৈকুণ্ঠযাত্রার ইতিহাস শুনিতে লাগিল। না পড়িল তার চোখ হইতে এক ফোঁটা জল, না ফেলিল সে দীর্ঘনিশ্বাস। যেন এ ঘটনা মোটেই নূতন নহে, যোগমায়ার জীবনে কতবারই যে ঘটিয়া গয়াছে

খানিক পরে সে বলিল, কিন্তু আমি ত ওদের বাড়ি খেতে যেতে পারব না, পিসিমা।

—কেন পারবে না, মা? তোমার সই হ'ত, শোক লাগবারই কথা। সংসারের এই নিয়ম। না গেলে তোমার শাশুড়ী দুঃখু করবেন।

দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া যোগমায়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল। কাছেই বাড়ি; লোকজন সব ব্যস্ত হইয়া এধার ওধার করিতেছে। এইমাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়া গেল। লুচি নহে, ভাত। কাজেই—খুরি বা গেলাসে করিয়া সামান্য কিছু কিছু মিষ্ট লইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে স্ফীতোদর ব্রাহ্মণেরা পৈতা গলায় ও চাদর কাঁধে ফেলিয়া কচি কচি ছেলে মেয়ের হাত ধরিয়া রন্ধনের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

বাড়ি ঢুকিবার মুখেই অনুকূল অর্থাৎ সয়াকে দেখা গেল। সেদিন আমতলায়-বসা বিমর্ষ বদন ও উদ্যমহীন অনুকূল নহে, কর্ম্মব্যস্ততায় আজ তার সারা দেহে চাঞ্চল্য। হাতে হলদে সুতায় বাঁধা শুকনা দূর্ব্বাগুচ্ছ, পরনে ধবধবে একখানি ধুতি। সেখানটা পুষ্পসার সুরভিতে ভারাক্রান্ত।

সইয়ের ভাবনা আজ শেষ হইয়াছে। তাহার বিরহে লোকটি আত্মহত্যা করে নাই বা সন্ন্যাস লয় নাই। সই বাঁচিয়া থাকিলে সে সুখী হইতে পারিত!

কিছুই ভাল লাগিল না। যে ঘরে সই পাতানো হইয়াছিল সেই ঘরেই যোগমায়াদের খাইবার জায়গা হইয়াছে। এক ঘর মেয়ে খাইতে বসিয়া কল কল করিতেছে। যোগমায়া ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া এক কোণে গিয়া বসিল। ঘর ভরিয়া কত মেয়েই না বসিয়াছে, সই তাহার কোথাও নাই। তবু যোগমায়ার মনে হইল, ঐ হাফ জানালা দিয়া ঝির ঝির করিয়া যেমন হাওয়া আসিতেছে—সেই হাওয়ার সঙ্গে সইয়ের নিশ্বাসও বুঝি ভাসিয়া আসিতেছে! সে নিশ্বাস কাহারও কানের কাছে বাজিল না, যোগমায়ার কানের গোড়াতেই শোঁ-শোঁ করিয়া একটানা বহিতে লাগিল। কুষ্টিয়া স্টেশনে আদালত প্রাঙ্গণের সেই সারিবদ্ধ ঝাউগাছগুলির একটানা করুণ আর্ত্তনাদের মত।

কিছুই সে মুখে তুলিতে পারিল না, বউ দেখিবার আগ্রহে ও-ঘরেও গেল না।

শাশুড়ী বলিলেন, বউ দেখেছ?

—আমার মাথাটা বড্ড ঘুরছে—মা।

—মাথা ঘুরছে? আচ্ছা একটুখানি দাঁড়াও, আমি

বউয়ের মুখ দেখেই আসছি। বলিয়া টাকাটি আঁচল হইতে খুলিতে খুলিতে ও-ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, খাসা বউ হয়েছে, যেমন রং—তেমনি গড়ন-পেটন।

বাড়ি হইতে বাহির হইবার মুখে যোগমায়া আর একবার পিছন ফিরিয়া সেই ঘরখানির পানে চাহিল।

রাত্রিতে হঠাৎ রামচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘর অন্ধকার। মনে হইল, ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া কে যেন মৃদু স্বরে কাতরাইতেছে। হাতড়াইয়া সে বিছানার এপাশ ওপাশ দেখিল। না, যোগমায়া কোথাও নাই। বুকটা তার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তবে কে—

সদ্য ঘুমভাঙা স্বরে সে ডাকিল, মায়া, মায়া? গলার মধ্যে ঘড় ঘড় করিয়া ধ্বনি উঠিল—স্বর বুঝি তেমন বাহির হইল না। তবে কি সে দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে? দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিলে অমনই গলার স্বর বাহির হয় না। কিন্তু না, এই ত সে জাগিয়া আছে। এই ত হাত দিয়া বুঝিতেছে—ডান ধারে অনেকখানি জায়গা খালি পড়িয়া আছে, কেহ নাই। কানেও ত মৃদু যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি শোনা যায়। শেষ তন্দ্রাটুকু সবলে ঝাড়িয়া রামচন্দ্র বিছানার উপর বসিয়া ডাকিল, মায়া?

সেই বিকৃত ভয়ার্ত ধ্বনি দেওয়ালে আহত হইল, মৃদু আর্তনাদ থামিয়া গেল।

রামচন্দ্র আবার ডাকিল, মায়া? সঙ্গে সঙ্গে বালিশের নীচেয় রাখা দীপশলাকা জ্বালিয়া ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইল। ঐ যে মেঝেয় মাদুর পাতিয়া ও পাশে মুখ ফিরাইয়া যোগমায়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে।

শিয়রের কাছেই প্রদীপ ছিল, কাঠি জ্বলিয়া শেষ হইবার আগেই সে সলিতায় অগ্নি স্পর্শ করাইয়া দীপ জ্বালিয়া ফেলিল। এবং দ্রুতপদে নীচেয় নামিয়া যোগমায়ার শিয়রে আসিয়া ডাকিল, মায়া?

যোগমায়া অল্প একটু নড়িয়া শব্দ করিল, উঁ।

এখানে এসে শুয়েছ কেন? যোগমায়ার দেহে কর স্পর্শ করিয়াই রামচন্দ্র চমকিত হইয়া উঠিল, এ কি, তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে! জ্বর হয়েছে নাকি?

যোগমায়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না ত।

—না কি? গা যে পুড়ে যাচ্ছে? দেখি কপাল, এদিকে ফের ত

রামচন্দ্রের দিকে যোগমায়া ফিরিল। শুধু কপাল তাতিয়া উঠে নাই, প্রদীপের অস্পষ্ট আলোয় যোগমায়ার মুখখানিও লাল টক্‌টকে দেখাইতেছে; চোখ ফুলিয়াছে, গাল ফুলিয়াছে এবং কুঞ্চিত ললাট ও ভ্রূ দেখিয়া ভিতরের যন্ত্রণাও বেশ বুঝা যাইতেছে।

—আমায় বল নি কেন, মায়া?

—তোমার যে ঘুম ভেঙে যাবে। সারাদিন খেটেখুটে এসেছ—

—তাই বলে অসুখ হ'লে বলবে না? এ ভারি অন্যায়। আমাকে তুমি আপন মনে কর না তাহ'লে?

যোগমায়া তাহার জ্বরতপ্ত দু'খানি হাত দিয়া রামচন্দ্রের ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, ওকথা বলো না, কত পাপ যে তোমার কাছে করেছি—

রামচন্দ্র বলিল, পাপ কিসের? স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সুখদুঃখের ভাগ যদি না নিলে ত কিসের সংসার?

যোগমায়া কাতর কণ্ঠে আবেগ ঢালিয়া বলিল, ওগো না—না, তুমি জান না—তোমায় আমি কত সন্দেহ করেছি—কত অন্যায় করেছি।

রামচন্দ্র বুঝিল, জ্বরের ঝোঁকে যোগমায়া অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে। এমন অনেকে হয়। কেহ গান গায়, কেহ অসংলগ্ন বকে, কেহ বা দোষ না করিয়াও খালি কাঁদে আর ক্ষমা প্রার্থনা করে। যোগমায়ার তেমনই হইয়াছে হয়ত।

ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সে বলিল, ঘুমোবার চেষ্টা কর—আমি বাতাস করছি।

এই কথায় যোগমায়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রামচন্দ্র যত সান্ত্বনা দেয়—ততই তার ক্রন্দনের বেগ বাড়ে। যত বুঝাইতে চেষ্টা করে—ততই সে অবুঝের মত বলে, ওগো, আমার এ পাপ কি তুমি ক্ষমা করবে?

রামচন্দ্র ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিল, শুধু শুধু বাজে বলছ কেন, আর ক্ষমাই বা চাইছ কেন? কিছুই ত কর নি তুমি।

—শুনবে—শুনবে? শোন তবে। যদি মরে যাই, আর বলতে না পারি, যমের বাড়ি গিয়ে যে সাজা ভোগ করব চিরকাল।

—একটু চুপ কর না, মায়া? জল খাবে?

যোগমায়া হাঁ করিয়া কহিল, দাও। বড় তেষ্টা—বুকের মধ্যে শুকিয়ে উঠছে। ঢক্ ঢক্ করিয়া এক ঘটি জল পান করিয়া যোগমায়া বলিল, শুনবে?

—আজ নয়, কাল শুনব।

—না, আজই। তোমার ক্ষমা না পেলে আমি যে স্বস্তি পাচ্ছি না। বড় জ্বালা এইখানটায়। বুকে এমন ভাবে হাত রাখিল যোগমায়া যে চাপড় মারার মতই শব্দ হইল।

শশব্যস্তে তাহার হাত ধরিয়া রামচন্দ্র কহিল, আচ্ছা—শুনছি—শুনছি তোমার কথা। বল।

—আর একটু জল দাও। আঃ—শোন। তুমি পূর্ণিমা দিদির সঙ্গে কথা কইতে, সে গান গাইলে তুমি বাজাতে—আমার সন্দেহ হ'ত।

কাষ্ঠমূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল রামচন্দ্র, এ যোগমায়া বলে কি? পরস্পরকে ভালবাসিলে—প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিলে—ছু'টি হৃদয়ই কি স্বচ্ছ দর্পণের মত হইয়া উঠে পরস্পরের কাছে? সেদিনের প্রণয়ভীরু বালিকা—কোথা হইতে বুকের মাঝে তার জাগিল নারীমনের চিরন্তনী ঈর্ষা—যে বিষে জর্জ্জর হইয়া সোনার সংসার জ্বলিয়া যায়, প্রেমের পুষ্পোদ্যান শুকাইয়া উঠে।

জ্বরের ঘোরে যোগমায়ার এ উচ্ছ্বাস নহে—এ যেন রামচন্দ্রেরই মৃত্যুদণ্ডাদেশ। যোগমায়া কি বলিতেছে—সে কথা রামচন্দ্রের কানে বাজিতেছে শুধু, মস্তিষ্কে আঘাত করিয়া চেতন দ্বারে কোন অর্থ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে না। অমন করিয়া সেই দুর্দ্দিনে যোগমায়াই বা সরিয়া গেল কেন? তেমন দুর্দ্দিন রামচন্দ্রের জীবনে আর আসে নাই।

সব বলা হইয়া গেলে যোগমায়া কাতর স্বরে বলিল, আমায় ক্ষমা করলে?

রামচন্দ্র বলিল, দোষ কর নি, তবু যদি ক্ষমা পেলে তুমি খুসি হও—আমি ক্ষমা করলাম।

হাত বাড়াইয়া যোগমায়া বলিল, তোমার পায়ের ধুলো?

রামচন্দ্র নিজের পাদস্পর্শ করিয়া সেই হাত যোগমায়ার মাথায় ঠেকাইল। যোগমায়া মৃদুস্বরে বলিল, আর একটু জল।

সকাল বেলায় শীত করিয়া জ্বর আসিল।

শাশুড়ী বলিলেন, ম্যালেরিয়া।

রামচন্দ্র বলিল, বোশেখ মাসে ম্যালেরিয়া হবে কেন?

শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, বউমা, কাল কি ওদের বাড়িতে দই খেয়েছিলে বেশী?

যোগমায়া মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

—তবে? শশী কবিরাজকে একবার খবর দেব? তাই যাই। পোয়াতী মানুষ—এমন ধারা জ্বরই বা হঠাৎ হ'ল কেন? দৃষ্টি-ফিষ্টি লাগে নি ত? অমনি ভট্চাজ্জি মশায়ের কাছেও একবার ঘুরে আসি। নৃসিংহ কবচ কি মৃত্যুঞ্জয় কবচ যদি দেন।

জ্বরের ঘোরে যোগমায়া কয়েকবার রাধারাণীর নামও করিল।

শাশুড়ী চিন্তিত মুখে কহিলেন, পাতান সই কি না। কাল ওবাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়াতে না নিয়ে গেলেই হ'ত। আমার কি সব সময়ে বুদ্ধি যোগায়। ঠাকুর-ঝিও এমনি—যে একটা পরামর্শ দিয়ে উপ্‌গার নেই। বকিতে বকিতে তিনি ভট্টাচার্য্য-বাড়ি ছুটিলেন।

সাতদিন পরে পাঁচন বড়ি খাইয়া কি নৃসিংহ কবচ বাহুমূলে বাঁধিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল—কেহ বলিতে পারে না। তবে সাত দিন পরে খুব খানিকটা ঘাম হইয়া যোগমায়ার দেহ শীতল হইয়া গেল, সে ঘুমাইয়া পড়িল। দীর্ঘ আট ঘণ্টা বাদে ঘুম ভাঙিলে সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিল, সন্ধ্যে হয়েছে বুঝি? পিদীমটা জ্বেলে—

রামচন্দ্র বলিল, সন্ধ্যে নয়—এখন বিকেল বেলা। তোমার ত জ্বর ছেড়ে গেছে। কোথায় আছ বল দেখি?

—কেন, কুষ্টেয়।

—না, বাড়িতে আছ। আজ সাত দিন তোমার জ্বর হয়েছিল—বেহুঁসে পড়েছিলে।

ক্ষীণকণ্ঠে যোগমায়া বলিল, সাত দিন?

—একটু দুধ খাবে মিছরি দিয়ে?

—দাও। দুধ পান করিয়া যোগমায়া বলিল, হাঁ, মনে পড়ছে। কুষ্টে থেকে আসবার দিন কি ঝড়! গাড়িতে বেশ শীত শীত করছিল।

—আর কিছু মনে পড়ে না?

মাথা নাড়িয়া যোগমায়া বলিল, হাঁ। ওদের বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গেলাম। একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আহা, সই মরে গেল!

যোগমায়ার চোখে জল টল টল করিয়া উঠিল। রামচন্দ্র সেই অশ্রু মুছাইয়া দিলে কহিল, আচ্ছা, লোক মরে যায় কেন?

—মানুষ মাত্রই মরে, না মরলে সৃষ্টি থাকে না।

—কেন থাকে না? মানুষ বেঁচে থাকলেই ত ভাল, মরলেই ত দুঃখু। দেখ—সই মরে নি। যদি মরল ত রোজ আমার কাছে আসত কি করে? কত কথা বলত।

রামচন্দ্র বলিল, ও সব কথা বলতে নেই।

যোগমায়া বলিল, বললেই কি আমি মরে যাব! না গো, আমি মরব না। সই ত কত ডাকলে, আয়—আয়, আমি গেলাম না।

রামচন্দ্রের ইচ্ছা হইল—জিজ্ঞাসা করে, কেন?

যোগমায়া বলিল, তার অদৃষ্ট মন্দ—সে মরে গেল। আমি এসব ছেড়ে যাব কেন? কেন যাব বল তো? রামচন্দ্রের হাত ধরিয়া সে হাসিল।

রামচন্দ্র বলিল, ঘুমোও।

যোগমায়া পথ্য করিলে শাশুড়ী বলিলেন, বেয়াইকে খবর পাঠাই, তিনি নিয়ে যান। এখানে থাকলেই ওর সইয়ের কথা মনে হবে। দিষ্টি-ফিষ্টিতে আমি বড় ডরাই বাপু। জোড়া মাস ত নয়, সাধ দিতে হয় তাঁরা দিন।

পিসিমা বলিলেন, সেই ভাল। সাধের কাপড়-চোপড় যা দেবার দিয়ে—বউমাকে বাপের বাড়িই পাঠিয়ে দাও।

শাশুড়ী বলিলেন, একখানা ভাল কাপড় কিনে আনিস ত রাম। প্রথম বার—নেহাৎ একখানা সুতির লালপাড় শাড়ী ত দেওয়া যায় না।

রামচন্দ্র বলিল, আচ্ছা।

রাত্রিতে কাপড় দেখাইয়া রামচন্দ্র বলিল, পছন্দ হয়?

যোগমায়া উজ্জ্বল চোখে শাড়ীর পানে চাহিয়া বলিল, বেশ কাপড়। এ শাড়ীর নাম কি গা?

—পার্শী শাড়ী, সাত-আট বছর হ'ল উঠেছে।

যোগমায়া নাড়িয়া-চাড়িয়া শাড়ীখানা দেখিতে লাগিল।

রামচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, একটু মনে করে দেখ দেখি—এ শাড়ী আর কখনও দেখেছ কি না?

দেখেছি বই কি, কিন্তু কোথায়—কবে—ঠিক মনে হচ্ছে না।

আমারই হাতে আর এই ঘরে দেখেছিলে। মনে পড়ে! রামচন্দ্র কৌতুকে চক্ষু নাচাইয়া প্রশ্ন করিল যোগমায়াকে।

যোগমায়া হতবুদ্ধির মত চাহিয়া বলিল, কই, না ত!

তখন তুমি মার ভয়ে নাও নি এ শাড়ী। আমি বলেছিলাম, আচ্ছা আর এক দিন দেব তোমায়। সাধ ক'রে যখন কিনেছি—ফিরিয়ে দেব না।

যোগমায়া ভাবিতে লাগিল।

রামচন্দ্র বলিতে লাগিল, বলেছিলাম—এক দিন সুবিধা বুঝে দেব। তখন মা'র ভয়ে পরতে চাও নি, আজ মার হাত দিয়েই পেলে ত এখানা।

এইবার যোগমায়ার একটি রাত্রির কথা মনে পড়িয়া গেল। মুখে লজ্জা ফুটিল। মুখ নামাইয়া সে বলিল, উঃ, এতও মনে থাকে তোমার!

রামচন্দ্র বলিল, থাকবে না মনে। বাক্স খুললেই শাড়ীখানা আমার নজরে পড়ত—আর ভাবতাম, কবে এখানা দেবার সুবিধা হবে।

—যাও। বলিয়া যোগমায়া হাসিমুখেই ঘাড় কাৎ করিল।

রামচন্দ্র তাহাকে বাহুবেষ্টনে বন্দী করিয়া কহিল, যাব বই কি। তবে আজ নয়—ছুটি ফুরোলে।

সংবাদ পাইয়া রামজীবনবাবু আসিলেন। আসিয়া মেয়ের খোঁজ যত না লইলেন—বৈবাহিকার সঙ্গে খোস-গল্প করিলেন তত। সেদিনকার অপমান ও ব্যথা আজ তাঁহার মনের কোণেও লাগিয়া ছিল না। গৌরবিনী মেয়ে আজ তাঁহাকে মর্য্যাদা দান করিয়াছে। শ্বশুরকুলের মর্য্যাদা ও পিতৃকুলের মর্য্যাদা। এ কথা বেয়ান অনেক বার বলিলেন, শুনিতে শুনিতে তিনিও কন্যাগর্ব্বে হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার মায়া যে ছেলেবেলা হইতেই সুলক্ষণা—সে কথা তাঁহার চেয়ে আর জানে কে? সে যেবার হয়—সেইবারই ত—দক্ষিণের বড় আটচালাখানা উঠিয়াছে, তার অন্নপ্রাশনের দিনে ছ-সেরি দুধের রাঙী গাইটা ঘোষেরা তাঁহাকে দান করিল। সেই রাঙীর বাছুর আজ সাত-আট সের দুধ দেয় দু-বেলায়। মায়ার বিবাহের সময়—

যাত্রাকালে পিসিমাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি নিজের ঘরের মধ্যে যোগমায়াকে আনিয়া একখানা আসন পাতিয়া বসাইয়া দুয়ারটা ভেজাইয়া দিলেন। পরে পিতলের ঘটি হইতে একটি তিলের নাড়ু ও খানকতক বাতাসা বাহির করিয়া বলিলেন, একটু জল খেয়ে যা, মা। মোণ্ডা-মেঠাই কে এনে দেবে, পয়সাই বা কোথায়। পরে কণ্ঠস্বর নামাইয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিলেন, একটা কথা বলি—কাউকে ব'লো না। তোমায় একখানা গহনা দেব—আমার কানবালা। অল্প সোনাই আছে—হাঁসুলি ত হবে না, যদি খোকা হয়—সোনার পুঁটে গড়িয়ে দিও ওর ভাতের সময়। আর মেয়ে হ'লে—

যোগমায়া বলিল, তা আপনিই দেবেন গড়িয়ে।

পিসিমা চাপা গলায় বলিলেন, চুপ—চুপ, কেউ শুনতে পাবে। আমার দেবার জো নেই। তোমার শাশুড়ী জানেন—আমার হাতে কিছু নেই। শুনলে কি আর রক্ষে রাখবেন, মা। তুমি ওখান থেকে গড়িয়ে এনে বলো—তোমার বাবা দিয়েছেন, আমি আশীর্ব্বাদ করব।

নিজেই তিনি ন্যাকড়ার পুঁটুলি করিয়া জিনিষটি যোগমায়ার পেটকোঁচড়ে বাঁধিয়া দিলেন।

যোগমায়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিল।

ক্রমশঃ

লিপিকার সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের গুটি কয়েক চিঠি এখানে প্রকাশিত হইল। এই চিঠিগুলি কবি সত্যেন্দ্রনাথ কিছু কম এক বছরের মধ্যে তাঁহার অন্তরতম বন্ধু স্বর্গত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন। মূল চিঠিগুলি স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় যেরূপ যত্নের সহিত এই দীর্ঘকাল রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন তাহা তাঁহার পরলোকগত বন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার নিদর্শন। পরলোকগত দত্ত মহাশয় বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকা কালে কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে এই চিঠিগুলি লিখিয়াছিলেন। দত্ত মহাশয় কলিকাতার অভিজাত বংশীয় (হাটখোলার দত্ত বংশীয়) কাব্যরসিক অকৃতদার পুরুষ ছিলেন। একদা তিনি কলিকাতার সামাজিক, সাহিত্যিক বিবিধ কাজের অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত দত্ত মহাশয় ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন। সুগভীর রবীন্দ্র-ভক্তি এবং সত্যেন্দ্র-প্রীতি তাঁহার একক জীবনের অক্ষয় পাথেয় হইয়া রহিয়াছে। এই চিঠিগুলি প্রকাশের অনুমতি দিয়া তিনি আমাকে অনুগৃহীত করিয়া গিয়াছেন। চিঠিগুলির হস্তলিপি দেখিলে বুঝা যায় যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ কত দ্রুত এই চিঠিগুলি রচনা করিয়াছেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া মুসাবিদা করা চিঠি এগুলি নয়। দুইখানি চিঠিতে কবির নাম স্বাক্ষরও নাই। সম্ভবত স্বাক্ষর করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন তবুও ইহাদিগের বৈচিত্র্য ও ব্যঞ্জনা অপূর্ব্ব। মন ও হৃদয় যখন সুনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাশক্তি ও ভাবধারার দ্বারা চালিত হইয়া একযোগে মস্তিষ্কের সহিত কাজ করে লেখনী মুখেও তখন বিনায়াসে বাক্যচ্ছটা প্রকাশ পাইয়া রচনা যে বহু বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে ইহা তাহারই নিদর্শন। চিঠিগুলির পাদটীকা আমার দেওয়া।

বন্দেমাতরম (১)

প্রিয়বরেষু

ধীরেন, মরুভূমিতে বৃষ্টি হয় কি না জানি না। কলিকাতায় কিন্তু কাল রাত্রি হইতে বিশ্রী রকম বাদলা, ঘরের বাহির হইবার জো নাই। এবার Christmasটা নিতান্ত নিরামিষ ভাবে কাটান গেল। থিয়েটার, সার্কাস কিছুই দেখি নাই, কেবল মনশ্চক্ষে খবরের কাগজরূপ চশমা লাগাইয়া সুরাট-সার্কাসে মডারেট কুলের antiques দেখিলাম। *

বড়দিনের পূর্ব্বে ষ্টারে একদিন 'চন্দ্রশেখর' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অমৃত বসু—চন্দ্রশেখর মানাইয়াছিল, অভিনয় ভাল লাগিল না। এমন কি অমৃত মিত্রের চেয়েও খারাপ। শৈবলিনী চমৎকার তুলনা হয় না। বিশেষত প্রতাপকে মুক্ত করিবার জন্য মত্ততার ভান এবং রামানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক গুহা মধ্যে বন্দী অবস্থায় প্রকৃত মত্ততায় যে পার্থক্য সেদিন দেখিয়াছি তাহা কখনও ভুলিব না।

দলনীর চলনসই কথাবার্ত্তা অতি দ্রুত সুতরাং পূর্ব্ব অভিনেত্রী অপেক্ষা খারাপ। * * গ্রে ষ্ট্রীটের পথ * অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া এখন বেড়াইয়া ফিরিবার সময় ঐ পথেই ফিরি। 'মেজদা'র (১) সঙ্গে মাঝে দেখা হইয়াছিল। ভাল আছে। প্রমথ বাবু বেচারা (২) ক্রমাগত অসুখে ভুগিতেছেন এবং ছুটি পাইলেই শান্তিপুর যাইতে ভুলিতেছেন না। chatterjee junior (৩) এখনও শান্তিপুরে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং এখনও দর্শনলাভ ঘটে নাই। তোমাদের পাড়ার সংবাদের মধ্যে মহেন্দ্র সরকারের (৪) মুখে ভয়ানক ঘা। আর কি—আর খবর জানি না। বাগচীদের (৫) বাড়ী প্রায়ই যাই না। কারণ সেখানে বড় কয়লার (৬) কথা হয়। দ্বিজেন বাবু (৭) বোধ হয় কয়লার গর্ত্তে ডুবিলেন। যদিও তিনি কলিকাতায়। ডাক্তার বাবু * ভাল আছেন। রাজেন বাবু (১) সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়াছেন। উপেন বাবু (২) বড়দিনের সময় আসিয়াছিলেন। আমি এখন Psychology of Sex এবং Stipphen Phillips-এর Paola and Francesca পড়িতেছি। আলমারী (৩) এসেছে। এবারকার মেলার সময় (৪) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু

---

(১) শব্দটি হাতে লেখা

* সুরাট কংগ্রেসে নরম পন্থী ও চরম পন্থী দলের বিরোধ

---

* স্বর্গত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের তৎসাময়িক বাসভবন

(১) কানন গো হিরণ্ময় রায়। অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভাগিনেয়। (২) প্রমথ চট্টোপাধ্যায়, প্রতিবেশী। শান্তিপুর তাহার শ্বশুরালয়। (৩) প্রমথবাবুর পুত্র। (৪) জষ্টিস সারদাচরণ মিত্রের বাড়ীর সরকার। সারদাবাবু কবি সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের উইলের Executor ছিলেন। (৫) কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি প্রভৃতির গৃহ। (৬) ইঁহারা কয়লার ব্যবসা করিতেন। (৭) কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি।

* দ্বিজেনবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার জ্ঞান বাগচি। (১) ডাক্তার জ্ঞান বাগচির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (২) বাগচিদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন বাগচি এম, এল। (৩) Chatterjee Furnishing Company হইতে। বর্ত্তমানে সত্যেন্দ্র গ্রন্থাবলীর সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে স্থান পাইয়াছে। (৪) বোলপুরের ৭ই পৌষের মেলা।

(৫) কোথায় ছিলেন ? দিনু বাবুর (৬) কণ্ঠ কাহার মত ? নিজকে সামলে নিতে পেরেছ—ভাল; কিন্তু অসামাল হ'লে কেমন ক'রে ? অধ্যাপক সমিতি(৭) ব্যাপারটা কিরূপ ? তুমি প্রবন্ধ পড়েছ ?(৮) হার্ম্মোনিয়ম শিক্ষা (৯) একদম বন্ধ—French leave নিয়েছে। আমি কিছুই লিখি নি, কয়েকটা অনুবাদ করেছি মাত্র।

কলিকাতায় লাজপত রায় আসিয়াছেন। আছেন কিন্তু গোখেলের বাসায়। সোমবারে গোলদীঘিতে তাঁহার অভ্যর্থনা সভা হইবে। তোমার অভ্যর্থনার জন্য সুরাটীদের মত গুণ্ডা ভাড়া করিব কি ?* লিখিও। French Revolution পড়িতেছ শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। কাহার রচিত ? কংগ্রেসের কেলেঙ্কারী 'সুলক্ষণ' জীবনের চিহ্ন। আমার অন্ততঃ এইরূপ বোধ হয়। কলিকাতায় এক গোলদীঘি ছাড়া সমস্ত উত্তরাংশের public park-এ সভা নিষিদ্ধ। যুগান্তরের নূতন Printer-কে ধরিয়াছে। ডাক্তারখানার (১) খবর রাখি না, ভনির (২) সঙ্গেও দেখা হয় নাই। গিরীশের (৩) ভাই চারুর (৪) সঙ্গে এক দিন পথে দেখা হওয়ায় তোমার ঠিকানা জানিয়া লইয়াছে। চিঠি লিখিয়াছে কি ?

আমার খবর :—প্রাতে গাত্রোত্থান, ভ্রমণ, সতীশ ডাক্তারের (৫) বাড়ী কাগজ পাঠ, স্নান, আহার, পাঠ, জলযোগ, হ্যারিসন রোড গমন, পুরাণ গ্রন্থ মন্থন (৬) ক্বচিৎ বাগচী ভবন গমন, নচেৎ প্রত্যাবর্ত্তন, পাঠ ! নৈশ ভোজন এবং নিদ্রা। শীঘ্র চিঠির উত্তর চাই। ইতি :—

আমার সম্মান নিত্য
হইতে বিশ্বাসী ভৃত্য (৭)
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২৭শে পৌষ রবিবার
১৩১৪

(৫) কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ। (৬) দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। (৭) বোলপুরের অধ্যাপক সমিতি। (৮) বোলপুরের অধ্যাপক সমিতিতে তখন প্রবন্ধ পড়া হইত। (৯) কবি সত্যেন্দ্রনাথ কিছুদিন হার্ম্মোনিয়ম শিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

* সুরাট কংগ্রেসে ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা মারামারি করিয়াছিল। (১) (Hindu Medical Hall) (২) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতা (৩) ডাক্তার গিরীশচন্দ্র ঘোষ (৪) চারুচন্দ্র ঘোষ, এটর্ণি (৫) ডাক্তার সতীশচন্দ্র বরাট (৬) কবি সত্যেন্দ্রনাথকে হ্যারিসন রোডে পুরাণো বই-এর দোকানে প্রায়ই দেখা যাইত [৭] I have the honour to be, sir, your most obedient servant-এর অনুবাদ।

(২)

বন্দেমাতরম (১)

১৩১৪ মাঘ

সুহৃদ্বরেষু

যখন তুমি এই চিঠি পাইবে তখন আমার জীবনের পঁচিশটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। জীবনকালের পরিমাণ পূর্ণ এক শত বৎসর ধরিলেও তাহার তিন ভাগ মাত্র রহিল। কিন্তু জীবনের আদর্শ এখনও বহু দূরে। Keats এ বয়সে তাঁহার অন্তরের সমস্ত রসসৌন্দর্য্য ঢালিয়া একটি অপূর্ব্ব স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মৃত্যুখণ্ডিত অসম্পূর্ণ জীবনের মধ্যেই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন। আর আমি ?—?—?—?

আমার কথা যাক। তোমার সংবাদ কি ? তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ * তাহার অন্তরে যে কতখানি মহৎ শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে তাহা উপলব্ধি করিবার জিনিস বটে। বিকাশোন্মুখ তরুণ মনকে তোমার মনের অনুকূল হাওয়ার মধ্যে এক-একটি করিয়া পাপড়ি খুলিতে অবসর দেওয়া যে কতখানি আনন্দের ব্যাপার তাহা আমি অনুমান করিয়া লইতে পারি।

সেদিন পরেশনাথের মন্দির হইতে ফিরিবার সময় একটা অপরিচ্ছন্ন পল্লীর মধ্য দিয়া আসিতেছিলাম, একটা দুর্গন্ধের উদ্বেজনায় মনটা এই পল্লীর অধিবাসীদের প্রতি একটা ঘৃণার ভাবে বাঁকিয়া বসিতেছিল। পচা আমানির গন্ধ, পচা ডিমের গন্ধ, পাঁকের গন্ধ এবং গোহাটার অকথ্য দুর্গন্ধ বাতাসটাকে একেবারে ঘোলা করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার উপর কলের ধোঁয়া, গাড়ীর ধূলা, গাভী বিক্রেতাদের বাক্‌বিতণ্ডা, ঋণকারী বৃদ্ধ চাচার শ্মশ্রু উৎপাটনকারিণী ভোজপুরবাসিনীর বীর রসাত্মক গ্রাম্য ভাষার উত্তর-প্রত্যুত্তর ও পল্লীর মিঞা মহলে উত্তেজনা। ইহারই মধ্যে,—তুমি কি মনে করিতেছ ? রূপের ঝলক ?—না, একটি সদ্যঃজাত নিতান্ত শিশুর ক্রন্দন শব্দ ! এক মুহূর্ত্তে—আমার সমস্ত অবজ্ঞা সমস্ত বিরাগ অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই আবর্জ্জনার মধ্যে যে ক্ষুদ্র মানব সন্তানটির কণ্ঠস্বর শুনিলাম, সে স্বর আমাদের নিতান্ত পরিচিত সে আমার কিংবা তোমার ঘরে যে মূর্তিতে প্রকাশ হইয়া থাকে এখানেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটায় নাই। সে স্বর মনের যে পর্দ্দায় আঘাত করে এবং যে অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সামঞ্জস্য এবং সামঞ্জস্যের সঙ্গীত রচনা

(১) শব্দটি হাতে লেখা
* বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধ্যাপনা

করে তাহা স্থান ও কালের একেবারে অতীত হইয়া মনের রাজ্যে সনাতন হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানবশিশু! মানবের সমস্ত আশা ভরসা! মানবের ভবিষ্যত! মানবের সর্ব্বস্ব! তুমি সেই শিশুদের অপূর্ব্ব এবং অপরিণত জীবনের পথপ্রদর্শক, সহচর এবং গুরু একাধারে। তোমার জীবন ধন্য। এই মাত্র পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর পত্র পাইলাম। পত্র পড়িয়া আনন্দিত যে হইয়াছি তাহা বোধ হয় লিখিয়া জানাইতে হইবে না। তিনি লিখিয়াছেন,—"হোম শিখা পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। নামটি সার্থক হইয়াছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে একটা পূণ্য তেজস্বিতা আছে—যাহা পূর্ব্বতম ঋষিদের হোম শিখাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাতে উচ্চ চিন্তার সহিত কল্পনার সুন্দর সম্মিলন হইয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক বাক্য আছে যাহা স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য। সমস্ত কবিতাগুলির মধ্যেই সাম্যরসের একটা স্রোত বহিতেছে। শেষ কবিতাটিতে ইহার চরম বিকাশ হইয়াছে। আমার মতে "সাম্যসাম" কবিতাটাই প্রচ্ছন্ন শ্রেষ্ঠ অংশ, যেন একটি সমগ্র বৃন্ত বাড়িতে বাড়িতে একটি সুন্দর পুষ্পে পরিণত হইয়াছে। আমার রাশি রাশি আশীর্ব্বাদ।" তুমি কি মনে করিতেছ জানি না, আমার পক্ষে এই সমগ্র চিঠিটা তোমাকে না পড়াইয়া থাকিতে পারা একেবারেই অসম্ভব। আমার বই হয়ত এতটা ভাল না হইতে পারে। কিন্তু এই চিঠি আমার দেহে যতটা জীবন সঞ্চারিত করিয়াছে সেই পরিমাণে যদি লিখিয়া উঠিতে পারিতাম তাহা হইলে আর একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইয়া উঠিত। মানুষ মিষ্ট কথার একান্ত কাঙাল। এই ফাল্গুনের প্রথম দিনে তুমি পূজনীয় রবীন্দ্রবাবুর "বসন্ত যাপন" মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবে এবং বোলপুরের শাল এবং মহুয়া গাছের আকস্মিক কিশলয় এবং মুকুল অঙ্কুরিত হওয়া প্রত্যক্ষ করিয়া কল্পনাকে বাস্তবের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে সক্ষম হইবে সন্দেহ নাই। আমাদের পক্ষে 'বসন্ত-যাপন' নিতান্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপার। কারণ সহরে যে বসন্ত* বিকাশ হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা দাগ রাখিয়া যাইতে ভুল করে না। অতএব তাঁহাকে দুর হইতে নমস্কার। তুমি ডাক্তারবাবুকে[১] যে চিঠি লিখিয়াছ,তাহা পড়িলাম। যাহারা নিজে না লিখিয়া কেবল অন্যের লেখা সমালোচনা করিয়া বেড়ায় তাহাদের সঙ্গে যাহারা নিজে বিবাহ না করিয়া অন্যের বিবাহের কথা আলোচনা করে তাহাদের প্রভেদ কি? লিখিও। আমার মনে যাঁহারা নিজে সুলেখক (যেমন Goethe এবং রবীন্দ্রনাথ) তাঁহারাই সুসমালোচক। এবং যিনি নিজে সুবিবাহিত, তিনিই নিজে সুঘটক। তুমি কি বল?

কলিকাতা
৪৬ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট
মাঘ সংক্রান্তি

তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ

(৩)

৪ঠা চৈত্র, ১৩১৪
৪৬ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সুহৃদ্বরেষু,

অনেক দিন তোমার চিঠি পাই নাই। কেমন আছ? সেদিন শিবপুর বাগান দেখিতে গিয়াছিলাম। নৌকায়। মাঝিদের মধ্যে একজন অদ্ভুত ভাষায় কথা কহিতেছিল যে তাহা শুনিলে মনে হয় 'এক লিপি প্রচারিণী' সভার মত এক ভাষা প্রচারিণী সভাও হয়ত কোথাও গজাইয়া উঠিতেছে। তাহার ভাষা (সাহিত্য সম্পাদকের* ভাষায়) বাংলা ও হিন্দির 'ওগরা'। যে লোকটি হাল ধরিয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ঐ লোকটি পঁচিশ বৎসর পরে অণ্ডামান হইতে দেশে ফিরিয়াছে। জল-হাওয়ার গুণেই হোক কিংবা নিয়মিত পরিশ্রমের গুণেই হোক তাহার চরিত্র এমনি বদলাইয়াছে যে বাঙালী বলিয়া চিনিবার জো নাই। সে উহার মামাতো ভগ্নীপতি হয়। মদের লোভ দেখাইয়া কোনও লোক ইহাদের গুণ্ডার কাজে নিযুক্ত করে। সঙ্গে আরও পাঁচজন ছিল। সকলে পড়িয়া একটা লোককে পথের মধ্যে নেশার ঝোঁকে ঠেঙাইয়া মারিয়া ফেলে। তার পর দ্বীপান্তর হয় সেখানে হুগলীর কোনও গোয়ালার মেয়েকে কয়েদী প্রথায় বিবাহ করে। ঐ স্ত্রীলোকটি নিজ সপত্নীকে হত্যা করিয়া দ্বীপান্তরিত হইয়াছিল। আণ্ডামানে ইহাদের দুইটি পুত্র সন্তান হয়। ঐ স্ত্রীলোকটি শুনিলাম আগামী বৎসর দেশে ফিরিবে। ইহাদের প্রেম তোমার কেমন মনে হয়?

এদিকে উহাদের পূর্ব্বতন পত্নী এবং পতি বিদ্যমান। লোকটি শুনিলাম প্রথমে দেশে ফিরিতে চাহে নাই।

* বসন্ত ব্যাধি (১) ডাক্তার জ্ঞান বাগচিকে * স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতির

তার পর যখন ইহারা (আত্মীয়েরা) উহার বৃদ্ধা মাতার নাম করিয়া লিখিল যে সে আর বেশী দিন বাঁচিবে না এবং মরিবার পূর্ব্বে একবার পুত্রকে দেখিতে চায় তখন এই দ্বীপান্তরের কয়েদী, এই খুনী আসামী, এই ভয়ানক নেশাখোর, কাণ্ডজ্ঞানহীন দুর্দ্দান্ত দস্যু দেশে ফিরিল। বলিতে পার কেন ?

অতুল চম্পটি* তাহার 'জগদ্গুরু' রচিত একখানি 'হরিকথা' তোমাকে পাঠাইতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। যতীনবাবু(১) দ্বিজেনবাবু(২) ভাল আছেন ডি, এল, রায় এবং দেবকুমার চৌধুরী(৩) কোনও মতেই আমার বই(৪) পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই।(৫)

(৪)

বন্দেমাতরম †

সুহৃদ্বরেষু

ইহার পূর্ব্ব চিঠিতে শিবপুর যাইবার কথা লিখিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় আর একটি ব্যাপার দেখিয়াছি। নৌকার জন্য যখন ঐ বাগান সংলগ্ন ভাসা-চাতালের (৬) উপর অপেক্ষা করিতেছি সেই সময় সাহেব বিবি বোঝাই একখানা লঞ্চ আসিয়া লাগিল। ইহারা Free Church এবং General Assembly'র পাদরী অধ্যাপক, অবশ্য সপরিবার এবং সবান্ধব। প্রথমেই সাহেবেরা লাফাইয়া তীরে নামিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন আস্তিন গুটাইয়া বিবিদের হাত ধরিয়া (কয়েকটি কোলে করিয়া) নামাইতে লাগিলেন। এই সময় বিবিদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। গল্পে শুনিয়াছিলাম দুয়োরাণীর শিশুপুত্রের আদরে ঈর্ষান্বিতা সুয়োরাণী নোড়া দিয়া দাঁত ভাঙিয়া নগ্ন দেহে প্রাচীরের উপর বসিয়া শিশুর স্বর অনুকরণ করিয়া রাজা বাবুকে "আদা বাবু" বলিয়া ডাকিয়া নির্ব্বাসিতা হইয়াছিল। আজ তাহা প্রায় প্রত্যক্ষ করিলাম। তাঁহাদের জোড় পায়ে লাফাইয়া পুরুষের ঘাড়ে পড়া অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকিল। তারপর বাকী রহিলেন দুইটি বৃদ্ধা বিবি। তাঁহাদের নামাইতে কোনও chivalrous ব্যক্তিই অগ্রসর হইলেন না। একজন পড়িয়া গেলেন এবং নিজেই ধুলা ঝাড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুবক যুবতীর দল তখন বাগানের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে। ইহা বোধ হয় Reverend শ্রেণীর chivalry; তোমার কি মত ?

অতুল চম্পটি দোলের দিন প্রাতঃকালে আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। শুনিলাম তাঁহার "গুরু" * যে বই লিখিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারে বাঙালীর মাথা এখনও তত পরিষ্কার হয় নাই। সুতরাং বাঙালী হইয়া তাঁহার "হরিকথা" কিনিতে সাহস পাইলাম না। দ্বিজেন বাবুর সঙ্গে সেদিন বলাই নন্দীর (১) বাড়ীতে গিয়াছিলাম। ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর কাব্যগ্রন্থ (২) মরক্কো দিয়া এমন চমৎকার বাঁধাইয়া আনিয়াছেন,—দেখিয়া হিংসা হয়। জ্ঞান বাবু (৩) বুধবারে সম্বলপুর যাত্রা করিয়াছেন। যদি মন বসে তবে পূজা পর্য্যন্ত থাকিতে পারেন। নচেৎ এক মাস। যতীন বাবুর (৪) সঙ্গে আজ Mayo Hospital-এ শ্রীকান্ত বাবুকে (৫) দেখিতে গিয়াছিলাম। যতীন বাবু Browning পড়িতেছেন। গিরিশ বাবু(৬) ভাল আছেন, বোধ হয় দারজিলিং যাইবেন। "মেজদা"র (৭) সঙ্গে দেখা হয়।

প্রমথবাবুর † পুত্র এখনও গোকুলে (৮) বাড়িতেছে। হার্ম্মোনিয়মে(৯) বোধ হয় এত দিন ইঁদুরে বাসা করিয়া থাকিবে। অনেক দিন স্পর্শ করি নাই। তোমার routine দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। D. L. Roy আমায় যাহা বলিয়াছেন দুই জনের মুখে দুই রকম শুনিলাম প্রথম সুরেশবাবুর (১০) মুখে, সে কথা তোমায় লিখিয়াছি।

* 'পাগলের ঔষধ'—প্রসিদ্ধ W. C. Royএর শ্যালক। চম্পটি মহাশয় পাটনায় হেডমাষ্টার ছিলেন।

(১) কবি যতীন বাগচি

(২) কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি

(৩) কবি দেবকুমার রায় চৌধুরী (বরিশাল)

(৪) বেণু ও বীণা

(৫) নাম স্বাক্ষর নাই। চিঠিখানি এরূপ স্থানে শেষ হইয়াছে যে নাম স্বাক্ষরের স্থানটুকুও ছিল না।

† শব্দটি হাতে লেখা

(৬) জেটি

* জগদ্বন্ধু। (১) ব্যবসায়ী সুবর্ণবণিক (২) মোহিত সেনের সংস্করণ (৩) ডাক্তার জ্ঞান বাগচি (৪) কবি যতীন বাগচি (৫) শ্রীকান্ত রায় New India'র স্বত্বাধিকারী, স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পাল ইহার সম্পাদক ছিলেন (৬) গিরিশ শর্ম্মা, কবি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ভায়রা (৭) হিরণ্ময় রায় সিভিলিয়ান জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভাগিনেয়।

† প্রতিবেশী বন্ধু (৮) মাতুলালয়ে (৯) কবি সত্যেন্দ্রনাথ কিছু দিন পূর্ব্বে হার্ম্মোনিয়ম শিখিতে সুরু করিয়াছিলেন। (১০) সুরেশ সমাজপতি।

দ্বিতীয় আমাদের দ্বিজেন বাগচীর মুখে। বিজয় মজুমদার মহাশয়ের ওখানে এক দিন দ্বিজেনবাবু ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বেড়াইতে যান। এই সময় D. L. Roy উপস্থিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে একখানা বঙ্গদর্শন লইয়া আমার পুস্তকের বিজ্ঞাপন পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে দ্বিজেনবাবু জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি ঐ বই দেখিয়াছেন ?"

D. L. Roy—"হাঁ খুব দেখিচি, প্রথম গ্রন্থকার ডাকে পাঠিয়ে দ্যান, ভাল না লাগাতে ফেলে রাখি তারপর সুরেশ সমাজপতি বারম্বার বলায় প্রবৃত্ত হই। কিছু দূর অগ্রসর হ'য়ে শেষে হাত থেকে ফেলে দিতে হ'ল। না আছে ভাব, না আছে ভাষা অনুকরণের ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।" এই ত বাংলা দেশের অন্যতম ভাল লেখকের সমালোচনা, রবীন্দ্রবাবুর চিঠি এবং এই টিপ্পনী দুই-এর সামঞ্জস্য করিতে পারে কি ?

তোমাদের কূপের জল* বৃত্রাসুর হরণ করুন এই আমার কামনা এবং আষাঢ়ের পূর্ব্বে যেন ইন্দ্রদেবের কৃপা বর্ষিত না হয় এ জন্য আমি স্বস্ত্যয়ণ করিতে অথবা মারণ উচাটন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতেও প্রস্তুত। শীঘ্র চিঠির উত্তর দিও। ইতি (১)

(৫)

তোমার চিঠি এবং পোষ্ট কার্ড যথাসময়ে পৌঁছেছে। ব্যোমকেশ দাদার† মুখে শুনিলাম ৭ই বৈশাখ তোমাদের বিদ্যালয় বন্ধ হইবে সেই জন্য আর উত্তর লেখা হয় নি। তা ছাড়া আমাদের বাড়ীশুদ্ধ অসুখ। মামার ছেলেটি (২) বিয়াল্লিশ দিন টাইফয়েড জ্বরে ভুগছে। সকলের ছোট মেয়েটি বার দিন ভুগছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি নববর্ষের প্রথম দিনে শয্যা ত্যাগ করেই অনেক দিনের পর একটু ডাম্বেল স্পর্শ করেছিলাম। তারপর একটু ফরাসী ভাষা শেখবার চেষ্টা করেছিলাম। Ruskin-এর Elements of Drawing এবং Cowell সাহেবের সম্পাদিত বৌদ্ধ জাতক পড়েছিলাম। বাড়ীতে অসুখ বলে ইচ্ছা সত্ত্বেও হার্ম্মোনিয়ম সম্বন্ধে নূতন খাতা করা হয় নি।

নূতন বর্ষ সম্বন্ধে সম্রাট বাবর যা লিখেছিলেন, তার অনুবাদের অনুবাদ পাঠালুম—

হাসি ভরা বসন্ত সুন্দর।
সুন্দর সে বৎসর প্রবেশ
রসে ভরা আঙুর মধুর,
মিষ্টতর প্রেমের আবেশ!
ধর, ধর, জীবনের সুখ না পালায়
একবার গেলে সেও, ফিরিবে না হায়।

এই কবিতাটি তিনি কাবুলের নিকটবর্ত্তী একটি পাহাড়ের উপর একটি লাল পাথরের চৌবাচ্চা গাঁথিয়ে তারই গায়ে খোদিত করে নিয়েছিলেন। ঐ লাল পাথরের চৌবাচ্চা লাল রঙের মদিরায় পরিপূর্ণ করে রাখা হ'ত। এবং ঐ চৌবাচ্চার সিঁড়িতে বসে সুন্দরীদের নৃত্যগীত উপভোগ কর্ত্তে কর্ত্তে তিনি লাল পাথরের চৌবাচ্চায় লাল মদিরার পাত্র ভরে নিতেন। আমার এই চৌবাচ্চাটা দেখবার ভারি ইচ্ছা হ'চ্চে। তোমার হ'চ্চে কি ?

দ্বিজু রায়ের নূতন গান আমার ভালই লেগেচে অবশ্য একটা লাইন ছাড়া ; সেটা হ'চ্চে—"মানুষ আমরা নহি ত' মেষ"। ও গানটি আমার গানের* দ্বারা suggested মনে হ'বার কারণ কি ? বুঝিতে পারিলাম না। পূজনীয় রবীন্দ্রবাবু কি এখন বোলপুরে অবস্থান কর্ব্বেন ?

অজিতবাবুর† খবর কি ? তাঁহার বিবাহের কি হ'ল ? তোমার শুভেচ্ছার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।‡

ইতি :— শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২সরা বৈশাখ
১৩১৫

ক্রমশঃ

* বোলপুরে তখন কূপ খনন হইতেছিল। কূপ খননে গোলযোগ হইলে অথবা জলাভাব ঘটিলে কবি-বন্ধু কলিকাতায় ফিরিতে পারেন তাহারই ইঙ্গিত।

(১) চিঠিখানিতে নাম স্বাক্ষর নাই। চার পৃষ্ঠা ব্যাপী চিঠি, নাম স্বাক্ষরের স্থানও ছিল না।

† ব্যোমকেশ মুস্তফি

(২) সুধীরকুমার মিত্র

* "কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল"

† স্বর্গত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

‡ এই চিঠিখানার প্রারম্ভে সম্বোধন নাই।

প্রশ্ন

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

১০

ভাদ্র মাসের শেষ দিকে—সেদিন সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে সারাটা দিন ধরিয়া বৃষ্টিধারা অঝোরে ঝরিয়া পড়িতেছিল। আজ আর কাজ নাই—অবনী বিছানায় শুইয়া বৃষ্টির রিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্ শব্দের সঙ্গে আপনার বল্গাহীন চিন্তা মিশাইয়া দিতেছিল। এই চিন্তায় কোন সম্ভব-অসম্ভবের কথাই ছিল না—কখনও লতিকাকে লইয়া রচনা করিতেছিল কত কল্পনার স্বর্গ—দৈব হঠাৎ হয়ত হইল তাহার প্রতি এমন অনুকূল যে সে হইয়া গেল দশ জনের এক জন—ধন-দৌলত লোকজন প্রাসাদতুল্য বাড়ী মোটর গাড়ী আরও কত কি—আর তারই মাঝে সে আর লতিকা। পরক্ষণেই আবার হয়ত তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল—তাহার মা বোন, তাহার জীর্ণ খড়ের ঘর—হয়ত আজিকার এই বৃষ্টিধারায় তাহার জীর্ণ চালাঘর জলে ভিজিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে—তাহার মা আর ছোট বোনটি কত কষ্টে তাহারই একটি কোণ আশ্রয় করিয়া দিনরাত্রি কাটাইয়া দিতেছে।

অনাদিনাথ যদি তাহাকে আর প্রাইভেট টিউটর না রাখেন? তার পর আবার সেই বেকার জীবন, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া টিউশনির জন্য উমেদারী করিয়া বেড়ান, যদি টিউশনি না জোটে—কোন দিনই না জোটে—সেদিন কাগজে পড়িয়াছে এই কলকাতা শহরেই নাকি কয়েক জন শিক্ষিত যুবক গোপনে রিক্স টানিয়া বেড়ায়, তাহাদের মধ্যে এক জন নাকি বি-এ পাস। কেহ তাহাদের জানিত না—হঠাৎ সেদিন একটা মামলায় কথাটা হইয়া গেল প্রকাশ। আচ্ছা তাহারাও যদি এমনি একটা শেষকালে করিতে বাধ্য হয়—হয় রিক্স না হয় ঝাঁকা মুটে। অবনী পরেশ নিরাপদ তিন জন কুলি তিন-জন রিক্স-চালক। তার পর এক দিন যখন আর শরীর চলিবে না তখন হয় রাস্তায় পড়িয়া না-হয় "এম্বুলেন্স" চড়িয়া হাসপাতালে যাইয়া মরিবে। কুলি বইত নয়—কুলির মতই মরিবে।

এতক্ষণ পরে এক ঝলক দমকা বাতাস আসিয়া তাহার আশেপাশে একটা মিষ্ট গন্ধ ছড়াইয়া দিল। অবনী মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে লতিকা তাহারই পাশে টেবিল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার এলো চুল পিঠ বাহিয়া পড়িয়াছে—সুবাসিত তেলের গন্ধে সারা ঘরখানি উঠিয়াছে মাতাল হইয়া।

—এই বর্ষার দিনে মেঘের দিকে চেয়ে এত কি ভাবছেন বলুন ত? আপনি কি কবি নাকি?

—না মোটেই নয়, কবি আমাদের পরেশ, সে এতক্ষণ কাল মেঘকে কাহার এলো চুল মনে করত—আর বৃষ্টিধারাকে ভাবত কোন বিরহিণীর অশ্রুজল। কিন্তু আমি নীরস কঠিন, আমার ওসব বালাই নেই।

লতিকা পাশের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, "একটু একটু হওয়া ভাল। প্রত্যেক লোকই অল্পবিস্তর কবি। যে লোক একটুও কবি নয়, জ্ঞানীরা বলেন তারা বড় ভয়ঙ্কর।"

—আমি তা হ'লে তাই।

—না মোটেই নয়—কবি আপনিও।

—যা হোক, তুমি দেখছি তা হ'লে আমার একজন ভক্ত হয়ে উঠলে।

—ভক্ত?

—হ্যাঁ, কবিদের সব এমনি ভক্ত থাকে কিনা?

—তা বেশ, ভক্ত হ'তে গররাজী নই, কিন্তু আমাকে একটা কবিতা শোনাতে হবে।

—তা হ'লে এই বার দেখছি পরেশের শরণাপন্ন হওয়া দরকার।

লতিকা হাসিয়া বলিল—ইস্ ভারী বাহাদুরি ত। এতক্ষণে বৃষ্টি আবার জোর করিয়া আসিল। অবনী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কি যেন ভাবিয়া লইল। পরে লতিকার দিকে মুখ তুলিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—একটা কথা বলব লতা?

লতিকা হাসিমুখে বলিল—একটা কেন, বেশী শুনতেও রাজী আছি, কিন্তু তাই বলে মুখখানা অমন গম্ভীর করবেন না যেন।

—না, লতা এই কথার উপরে আমার জীবনের অনেক কিছু নির্ভর করছে—আজ মনে হচ্ছে আমার জীবনে হয়ত শীগ্‌গিরই একটা বড় পরিবর্ত্তন আসবে। সে ভালই হোক আর মন্দই হোক। তুমি রাগ করবে কি না জানি না—কিন্তু আমার আর গোপন ক'রে রাখা সম্ভব নয়। সেদিন টাকা পাঠানর কথায় তোমার কোন কথারই অর্থ আমি আজও বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না। লতা! আমায় তোমাকে স্পষ্ট বলতে হবে তুমি আমায় ভালবাস কি না।—আমার অর্থ নাই, বিদ্যা নাই, সহায়-সম্পদ কিছুই নাই, তবুও শুনতে চাই।—আমার কথা শুনবে? আমি তোমাকে ভালবাসি, কেমন ভালবাসি? প্রতি মুহূর্ত্তে যেন মনে হয় আমি আছি তোমার সঙ্গে সঙ্গে, তুমি আছ আমার সঙ্গে সঙ্গে। দু-জনার জীবন যেন এক হয়ে গেছে—কোথায়ও একটুও ফাঁক নাই।" অবনী চুপ করিল এবং পর-মুহূর্ত্তেই তাহার সারা অন্তর লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। সে এত কথা এমন ভাবে বলিয়া গেল কেমন করিয়া—লতিকা হয়ত কি ভাবিয়া বসিবে।

কিন্তু লতিকা হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তবে তুমি না কি কবি নও? "এমন ঘন বরষায় কি যেন বলা যেত তায়"—একেবারে বাস্তব কবিতা।

এমন সময় হঠাৎ দৌড়াইয়া নীরেন ঘরে ঢুকিল—দিদি শীগ্‌গির এস অজিতবাবু এসেছেন মোটর হাঁকিয়ে—বাবার ঘরে ব'সে আছেন—বাবা তোমায় তাঁর ঘরে এখুনি ডাকছেন।

লতিকার মুখ এক নিমিষে যেন কালিবর্ণ হইয়া গেল,—পরে নীরেনের দিকে ফিরিয়া বলিল—তুই যা নীরো—আমি আস্‌ছি—নীরেন দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

অবনী জিজ্ঞাসা করিল—অজিতবাবু কে?

—সে পরে শুনো। কিন্তু তুমি অমন করে শুয়ে রইলে যে—ওঠ। বলিয়া লতিকা অবনীর হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল।—এখনও কি তোমার কথার জবাব চাও? আরও স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে?

—না আর জানতে চাই নে।

—তবে চল বাবার ঘরে যাই—তুমি না গেলে আমি একা সেখানে আজ কিছুতেই যাব না।

—কেন?

—সে পরে শুনো।

—কিন্তু আরও যে আমার অনেক কথা ছিল।

"সে পরে হবে। তুমি এস—আমি যাই।" বলিয়া লতিকা বাহির হইয়া গেল।

১১

অবনী অনাদিবাবুর ঘরে গিয়া দেখিল, অনাদিনাথের পাশে একজন বছর পঁয়ত্রিশের যুবক বসিয়া অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেছে। বুঝিল ইনিই অজিতবাবু। লতিকা টেবিলের এক পাশে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া মুখ নীচু করিয়া চা তৈরি করিতেছিল। অবনী ঘরে ঢুকিতেই অনাদিনাথ বলিয়া উঠিলেন—এস বাবা অবনী এস। ইনি অজিতবাবু—তোমার সঙ্গে ত পরিচয় নাই—আমাদের পুরাতন বন্ধু। কিছু দিন হ'ল বোম্বাই থেকে কাপড়ের কলের কাজে বিশেষজ্ঞ হ'য়ে এসেছেন। শীগ্‌গিরই এঁরা একটা মিল 'ষ্টার্ট' করবেন। আর অজিত, ইনি অবনী—আমার নীরেন আর লতার গৃহশিক্ষক।

—ওঃ নমস্কার। বলিয়া অজিত দুই হাত কপালে তুলিল, অবনী প্রতিনমস্কার করিয়া পাশের খালি চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল। অজিত আরম্ভ করিল—হাঁ, এই বৃষ্টি-বাদলার দিনের কথা বলছিলেন না? আমাদের কি আর বৃষ্টি-বাদলার জন্য বসে থাকলে চলে? কত বড় একটা কাজের ভার হাতে নিয়েছি আমরা। সকালবেলা উঠে গিয়েছি উকীলের বাড়ী, তার পর মিলের ডিরেকটরদের সঙ্গে নিয়ে এঞ্জিনীয়ারের বাড়ী,—এমনই সারাটা দিন এই বাদলা মাথায় ক'রে ছুটোছুটি করতে হয়েছে। কাল যাওয়ার কথা নৈহাটীর ঐদিকে মিলের জন্য একটা জায়গা দেখতে। আর এটাও ত ঠিক, কোন বড় কাজের ভার যারা মাথায় ক'রে নেয়, তাদের কি আর ঝড়-বৃষ্টি বলে বসে থাকা চলে? কত বড় একটা মহৎ কাজ বলুন ত? কত সহস্র সহস্র লোকের অন্ন জোটাতে পারে এমনি একটি কাপড়ের কলে। আজকাল আমাদের দেশের প্রকৃত হিত কিছু করতে হ'লে চাই প্রত্যেক জেলায় জেলায় এমনি একটি ক'রে কাপড়ের কল স্থাপন।

অবনী হঠাৎ কথা কহিয়া উঠিল—বিদেশের কাপড় হয়ত দেশে বিক্রি তাতে কমতে পারে, কিন্তু প্রকৃত হিত কি তাতে কিছু হবে?

অজিত এমনতর লোক যে তাহার কথার কোন প্রতিবাদই সে কোন দিন সহ্য করিতে পারে না। বলিয়া উঠিল—প্রকৃত হিত বলতে আপনি কি বুঝেন? আপনার এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাই বা কতটুকু আছে বলুন ত?

অবনীর নিকট কথা কয়টা বড় রুক্ষ মনে হইল—স্বাভাবিক একটা সৌজন্যও যেন ইহাতে নাই। সে উত্তর করিল—আপনার মত অভিজ্ঞতা আমাদের হয়ত নাই, কিন্তু আমরাই ছোট বেলায় আমাদের গ্রামের আশেপাশে কত তাঁতিকে দেখেছি কাপড় বুনতে—তখন তাদের অবস্থাও ছিল বেশ সচ্ছল, কিন্তু আজ এই বিশ-পঁচিশ বৎসরের ভিতরে অবস্থা তাদের এমনি দাঁড়িয়েছে যে কারু বাড়ী একখানা ভাল ঘর নাই—অনেকে দু-বেলার অন্ন পর্য্যন্ত জোগাড় ক'রে উঠতে পারে না এমনি অবস্থা।

অজিত বলিল—এর কারণ কি? এর মূল অনুসন্ধান করেছেন কখনও?

—না, তেমন ক'রে কোন দিন অনুসন্ধান হয়ত করি নি, কিন্তু মিলের প্রতিযোগিতায় দিন দিন এরা হটে যাচ্ছে। যে কলকারখানা কুটীরশিল্পকে ধ্বংস করে তা কখনও দেশের প্রকৃত হিত করতে পারে না। আমার এই ত ধারণা।

—আপনার ধারণা হ'তে পারে; আপনার বয়সই বা কি আর ধারণাই বা কতটুকু?

—বয়স আমার বেশী না হ'লেও আপনার চেয়ে দু-চার বৎসরের ছোট হব বোধ হয়।

যাহাদের আত্মমর্য্যাদাবোধ বড় বেশী তাহারা স্বভাবতঃই আত্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়। অবনীর কথায় অজিত গুম হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না। ক্ষণপরে অনাদিনাথ বলিয়া উঠিলেন—অবনীর কথাটা বড় মিছে নয় অজিত—আমাদের দিকনগরে ছোটবেলায় দেখেছি কত জোলা তাঁতি—সে প্রায় দু-চার-শ ঘর হবে—আর কত ভাল ভাল রঙীন কাপড় তৈরি করত তারা—এখন সবসুদ্ধ বিশ-পঁচিশ ঘরের বেশী তাঁতি ত নাই-ই, অবস্থাও তাদের হয়েছে আবার একেবারে শোচনীয়। এই পঁচিশ ঘরের মধ্যে পাঁচ-ছয় জনকে এইবার খাজনা পর্য্যন্ত আমার মাপ করে আসতে হয়েছে। আমার বয়স ত কম হ'ল না—আমরা ত দেখছি যতই দেশে কলকব্জা হচ্ছে, মানুষের দুর্গতিও দিন দিন ততই বেড়ে চলেছে।

অনাদিনাথ ভুল করিলেন, মনে করিলেন অজিতের অপ্রসন্ন ভাবটা হয়ত ইহাতে কাটিয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহার কথায় অজিত বলিয়া উঠিল—কি যে বলেন আপনারা—বয়স বেশী হ'লেই যদি সব জিনিস বোঝা যেত তা হ'লে আমাদের বাড়ীর বুড়ো দারোয়ানটা হ'ত সব চাইতে বিজ্ঞ। আপনি আইনে হয়ত পাকা হ'তে পারেন কিন্তু—

কিন্তু অজিতের আর কথা শেষ করা হইল না—এই তুলনাটি যে কত বড় অভদ্রজনোচিত হইয়াছিল তাহা সেও বুঝিতে পারিতেছিল, তাই কথা বাড়াইয়া কথাটি ঢাকিতে যাইতেছিল। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা বিফল হইল।

লতিকা হঠাৎ তাহার আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তুমি কি এমনি ক'রে সারা বেলা বসে বসে কাটিয়ে দেবে, না একটু বারান্দায় পায়চারি ক'রে বেড়াবে বাবা। গল্প করতে পারলে আর তোমার কিছুই জ্ঞান থাকে না।

অনাদিনাথ মেয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—এই আর একটু পরে যাই মা—অজিত বসে আছে—বেশ ত আছি।

কিন্তু লতিকা আর কথা না কহিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে যে রাগ করিয়া গেল তাহা তাহার গতিভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। অবনী একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল—এক জন ভদ্রলোক এক জন প্রবীণ লোককে কেমন করিয়া এমন কথা বলিতে পারে? অবনীর কোন কিছু সহিয়া যাওয়া অভ্যাস নয়।

সে অনাদিনাথের দিকে ফিরিয়া বলিল—জ্যাঠামশায় আকাশের দিকে মুখ করে থুথু ফেললেও যা, আপনাকে অপমানকর কথা বলাও তাই—আশা করি আপনি এতে কিছু মনে করবেন না।

অবনীর কথা শুনিয়া অজিতের মুখ রাগে লাল হইয়া গেল। সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল—দেখুন অনাদিবাবু, আমি একটা ভুল করে ফেলেছি সেজন্য আপনার নিকটে আমার ক্ষমা চাইতে লজ্জা নেই কিন্তু এক জন বাইরের লোক কেন আসবে এর ভিতরে?

—আরে না না···আমি কিছু মনে করি নি, কিন্তু তুমি উঠছ যে—তুমি ব'স অজিত ব'স বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইলেন।

অবনী বলিয়া উঠিল—ক্ষমা করবেন—স্বাভাবিক ভদ্রতাটুকু রক্ষা হ'লে আর বাইরের লোক কথা বলতে আসত না কিন্তু—

অবনী কথা শেষ করিতে পারিল না, অনাদিনাথ তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলেন—বাবা অবনী আর নয়—আজকের মত চুপ কর খুব হয়েছে। কিন্তু একবার রাগ চাপিলে অবনী স্থানকাল ভুলিয়া যায়, তাই তবু যখন সে

থামিল না তখন অগত্যা অনাদিবাবু অবনীর কানের কাছে মুখ লইয়া বলিলেন—কর কি অবনী, অজিত আমাদের আপনার লোক, আমার লতার ভাবী বর।

এক মুহূর্ত্তে অবনী একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল। লতার ভাবী বর অজিত? কথাটা ভাল করিয়া মনের মধ্যে আলোড়ন করিয়া অবনীর বুঝিয়া উঠিতে কয়েক মিনিট সময় লাগিল।

অজিতের ভদ্রতাজ্ঞানের সীমানা—তাহার সহিত কলহ সকলই একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল অবনীর মন হইতে—শুধু সারা অন্তর জুড়িয়া এই কথাটাই জাগিয়া রহিল—"অজিত লতার ভাবী বর।"

আজিকার এই দিনটায় তাহার অদৃষ্টের উপরে গ্রহ নক্ষত্রের কি অদ্ভুত সমাবেশই না হইয়াছে। যে অসম্ভব আশার বাণী এই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে শুনিয়া আসিয়াছে, তাহ তাহার অন্তর হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গেল। মিনিট পাঁচেক কেহ কোন কথা কহিল না। ইতিমধ্যে অবনী অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছে। হঠাৎ সে তাহার আসন হইতে উঠিয়া অজিতের দিকে হাত বাড়াইয়া তাহার হাতে হাত মিলাইয়া বলিল—কিছু মনে করবেন না অজিতবাবু, আপনার সঙ্গে এ বাড়ীর সম্বন্ধ আমার জানা ছিল না—আর যা নিয়ে তর্ক তাও আমার বিষয় নয়—সে আপনিই ভাল জানেন এও ঠিক। আশা করি এবার আপনার মনের উত্তাপ কমবে? আচ্ছা নমস্কার!

বলিয়া অবনী বাহির হইয়া যাইতেছিল—অজিত বলিল—না না, সে-সব চুকে-বুকে গেছে, কিন্তু আপনি যাচ্ছেন যে—বসুন!

অবনী ফিরিয়া বলিল—আজ্ঞে মাপ করবেন, আমাকে এখনই একবার বেরুতে হবে। বলিয়া অবনী বাহির হইয়া গেল।

লতিকা বাহিরে আসিয়া এতক্ষণ বারান্দার রেলিং ধরিয়া, রাস্তার দিকে তাকাইয়া ছিল। এই লোকটির সান্নিধ্য তাহার কথাবার্ত্তার ভঙ্গী বরাবরই তাহাকে পীড়া দিত, কিন্তু কেন যে তাহার বাবা ইহাকে এত প্রশ্রয় দেন সে ভাবিয়া পায় না। তাহার পিতার মত লোককে যে এমন অভদ্রোচিত কথা বলিতে পারে তাহার সম্মুখে বসিয়া সে কি আর স্বাভাবিক ভাবে আলাপ-আলোচনা করিতে পারে? আর একটু থাকিলে সেই হয়ত তাহার সহিত কলহ বাধাইয়া তুলিত।

এমন সময় নীচে গেট খুলিবার শব্দ হইল—লতিকা চাহিয়া দেখে অবনী বাহির হইয়া যাইতেছে।

বৃষ্টি তখনও বেশ পড়িতেছিল, কিন্তু অবনীর সে খেয়াল নাই—একটা ছাতা পর্য্যন্ত না লইয়া সে বাহির হইয়া যাইতেছিল। লতিকার ইচ্ছা হইতেছিল এখান হইতেই ডাকিয়া বলে একটা ছাতা লইয়া যাইতে, কিন্তু অবনী ততক্ষণ রাস্তায় গিয়া পড়িয়াছে। তাহার মনে মনে অবনীর উপরে রাগ হইতেছিল—এমন কি জরুরি কাজ যে একটা ছাতা পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারিল না। যে বৃষ্টি—মাত্র কয়েক মিনিটেই জামা কাপড় ভিজিয়া একাকার হইয়া যাইবে না? হঠাৎ পিঠের উপরে স্পর্শ পাইয়া লতিকা ফিরিয়া দেখে অনাদিনাথ তাহার ঠিক পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আবার তাহার পাশেই অজিত।

—এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস মা?

—মাস্টার মশায়ের কি বুদ্ধি দেখলে বাবা, এই বৃষ্টির মধ্যে খালি মাথায় কোথায় বেরিয়ে গেলেন—একটা ছাতা পর্য্যন্ত নিলেন না।

—ছাতাটা পর্য্যন্ত নেয় নি—ইস্ যে বৃষ্টি একেবারে ভিজে যাবে যে!

"লোকটা একগুঁয়ে বুঝেছ লতিকা।" বলিয়া অজিত লতিকার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। "আর এই সব লোকের স্বভাবই এই যে কখন কাকে কি বলতে হয় সে ভদ্রতাটুকু পর্য্যন্ত জানে না। তুমি জান না এই মাত্র—কি অপদস্তই না ভদ্রলোক হয়ে গেলেন। শেষটায় যদি ক্ষমাই চাইতে হ'ল তবে আর না ভেবেচিন্তে এমন কথা বলা কেন?"

লতিকা অজিতের কোন কথার জবাব না দিয়া অনাদিনাথের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছিল বাবা!

—ঐ সেই ব্যাপার মা—একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে অজিত আর অবনীতে তর্ক লেগে গেল—অবনী আমাকে বড় শ্রদ্ধা করে কিনা—তাই একটু কিছুতেই মনে করে আমার বুঝি অসম্মান হ'ল।

—তোমাকে বুড়ো দারোয়ানের সঙ্গে তুলনা করা সেই কথাটা ত? সেটা তোমার কাছে তুচ্ছ হ'তে পারে বাবা, কিন্তু আমার কিংবা মাস্টার-মশায়ের কাছে কিছুতেই তুচ্ছ নয়।

—কিন্তু আমি কি তোমাদের চেয়ে অনাদিবাবুকে কম শ্রদ্ধা করি, এই তোমাদের বিশ্বাস?

—ও কথা যেতে দাও অজিত—চুপ কর লতা—যা চুকে বুকে গেছে তার জের টেনে আর মন খারাপ করা



নৃত্যরতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ

কেন বল ত?—লতা মা অজিত বলছিল তার মোটরে ক'রে যদি আমরা তিন জনে একটু ঘুরে আসি তবে বেশ হয়।—

—না বাবা, মোটরের ঝাঁকানিতে তোমার শরীরে বেদনা হবে—কাজ নেই। লতিকার ভাব দেখিয়া অজিতের মোটরে করিয়া বেড়ানর সখ অনেকখানি কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তবু মরিয়া হইয়া বলিল, "আমি খুব আস্তে ড্রাইভ করব।" কিন্তু লতিকা মাথা নাড়িয়া বলিল—না না, তা হ'তেই পারে না, যে বৃষ্টি এর মধ্যে বেরুলে বাবার নিশ্চয় ঠাণ্ডা লাগবে। শেষটা ভুগে মরতে হবে ত আমাকে। এত বড় জোরালো কথার উপর কাহারও কথা টিকিবে, এমন ভরসা হইল না। অজিত মুখ ভার করিয়া চুপ করিয়া রহিল। অনাদিনাথ কৈফিয়তের সুরে যেন বলিতে লাগিলেন—বুঝলে না অজিত লতা মা আমার সব সময়েই তার এই বুড়ো ছেলের জন্য শঙ্কিত—কোথায় কখন একটু ঠাণ্ডা লাগল, কখন একটুখানি গরমে রইলাম, কোন্ দিন স্নানের একটু বেলা হ'ল এই নিয়ে রোজ রোজ আমার ত বকুনি খাওয়ার অন্ত নেই। বলিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু অজিতের মুখভার কাটিল না, সে মুখ তুলিয়া বলিল—"বেশ তা হলে আমি আসি" বলিয়া আর একটা কথাও না বলিয়া সোজা সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

অজিত অদৃশ্য হইয়া গেলে লতিকা মুখ তুলিয়া বলিল—এই লোকটার নিকটে এত কৈফিয়তের কি দরকার ছিল বাবা। যে তোমাকে অসম্মান করেছে, তার সঙ্গে আমাদের কিসের খাতির—কিসের বন্ধুত্ব? মাস্টার মশায় এই নিয়ে ঝগড়া করেছেন আমি জানলে তাঁকে এই জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতাম।

—কখনও কোন লোককে আঘাত দিতে নেই মা। তা ছাড়া অজিত ত ভাল ছেলে—বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ কিসে কম? তার উপরে আমি অনেক আশা ভরসা রাখি।

—কিসের আশা ভরসা বাবা! বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ তার খোঁজেই বা আমাদের কি দরকার?

—ও সব এখন থাক মা, পরে এক দিন তোমায় সব বলব—এখন তোমার মন ভাল নেই। বৃষ্টি ধরেছে—চল যাই ছাতে একটু পায়চারি করি গিয়ে। বলিয়া লতিকাকে ধরিয়া লইয়া তিনি সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

ক্রমশঃ

ঐক্য

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

দাঁড়ায়ে হেরিনু ছাদে প্রভাতে একেলা
কত না বিচিত্র পাখী করিতেছে খেলা,
নীলাম্বরে রচি' তার আনন্দের দোল,
সম্মুখে সবুজ মাঠে নদী উতরোল
নেচে করে কলধ্বনি, ধরি' শস্যভার
মধুর হরিৎ ক্ষেত্র নাচে বারেবার।
রাখাল বাজায় বাঁশী, চাষার ঝিয়ারী
কলসী করিয়া কাঁখে চলে সারি সারি,
আনন্দে দোলায়ে কটি। শ্যামশষ্পদল,
রৌদ্রমাখা রুচিপ্রাণ আনন্দে উতল।
আকাশে মাটিতে বাঁধা সৌন্দর্য্যের ডালি,
বিশ্বজোড়া দৃশ্য ভরি' লেগেছে মিতালী।

গগনের নীচে এই ধরণীর কোলে,
সকলের সাথে আজি প্রাণ মোর দোলে।

তুষু বা টুষু পূজা

শ্রীভবেশ ভট্টশালী

শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে 'বাউরীদের উৎসব' প্রবন্ধে তিনটা ভাগ আছে—ভাদু পূজা, তুষু পূজা এবং বাউরীদের বিয়ে। আমার প্রবন্ধ বাউরীদের উৎসব নিয়ে নয়, আমার প্রবন্ধ শুধু তুষু পূজা, সুতরাং ভাদু পূজা এবং বাউরীদের বিয়ে বাদ দিয়ে শুধু তুষু পূজা নিয়েই আলোচনা করব।

লেখিকার তুষু কথার সঙ্গে টুষু কথাটা আমি বসিয়েছি এই জন্য যে সিংভূমের খনি-অঞ্চলে তুষু না বলে টুষু বলা হয়। আমি এর পর থেকে তুষুর পরিবর্ত্তে টুষু কথাটা ব্যবহার করব। টুষু পূজার সময় উপকরণ এবং বিধি সম্বন্ধে প্রথম অনুচ্ছেদে লেখিকা যা লিখেছেন সবই আমার সঙ্গে মিলে, তবে তিনি লিখেছেন ইহাতে প্রতিমার ব্যবহার নেই তা ঠিক নয়। কয়লা-কুঠি অঞ্চলে কি জানি না, তবে গোটা সিংভূম জেলায়, ময়ূরভঞ্জেও দেখেছি, সারা পৌষ মাসটা ধরে প্রতি সন্ধ্যায় টুষু পূজা মাটির সরাতে হ'লেও সংক্রান্তির আগের দিন অর্থাৎ 'জাগরণ' দিন সন্ধ্যায় প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হয় এবং পরের দিন অবস্থাবিশেষে বাদ্যভাণ্ড সহকারে প্রতিমা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে নিকটবর্ত্তী নদীতে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেয়। কাছে নদী বা ঝরণা না থাকলে পুকুর বা বাঁধেও বিসর্জ্জন দেয়। এমন অনেক দেখা গিয়েছে যে, টুষু প্রতিমা নদীতে বিসর্জ্জন দিবার জন্য দশ-বার মাইল দূরেও যায়। পৌষ সংক্রান্তির দিনটা মকর-সংক্রান্তি বলেই অভিহিত এবং মকর-সংক্রান্তির দিনের উৎসবকে 'মকর পরব' বলা হয়। মকর সংক্রান্তির দিনে যাহারা জামশেদপুর, গালুডি বা ঘাটশীলায় কাটিয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন নদীতে টুষু বিসর্জ্জনের সময় কি ভীড় হয় এবং এক বেলার জন্য নদী-ঘাটে বেশ মেলাও বসে।

টুষু পূজাকে শ্রদ্ধেয়া পুষ্পরাণী ঘোষ বাউরীদের উৎসব বলেছেন। কিন্তু সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জে এই পূজা বাগাল, বাগ্দী, তাঁতি, কামার, ভূমিজ প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণী হিন্দুর মধ্যে ত আছেই, এমন কি, অনেক স্থলে বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচলন আছে। কোলদের কথা ঠিক জানি না, তবে সাঁওতাল-গণ ঠিক হিন্দুদের অনুরূপ না হ'লেও মকরসংক্রান্তির দিনে যে 'মকর পরব' মানে, আমার লেখা 'সাঁওতাল জাতির পূজা-পার্ব্বণ' নামক প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ আছে। যে-সকল জাতি টুষু পূজা করে তারা ত নিশ্চয়ই, এমন কি অন্যান্য জাতির প্রত্যেকেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে 'মকর পরবে'র দিন টুষু প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর নদীঘাটে নূতন কাপড়-জামা প'রে বাড়ী ফিরবে। এই উপলক্ষে মাংসের সঙ্গে চাউলের গুঁড়া গুলিয়ে একরূপ পিঠা প্রত্যেকের ঘরে ঘরে তৈরি হয়।

টুষু পূজা এবং সঙ্গীতের ইতিহাস আমি যত দূর জানি তাহাতে মনে হয় ইহার আদি স্থান বাঁকুড়া জেলা। বাঁকুড়া হইতে মানভূম এবং পরবর্ত্তী কালে ক্রমান্বয়ে সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ এবং মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। বাঁকুড়া জেলাকে টুষু পূজার আদি স্থান বললাম এই জন্য যে, প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে প্রথম যখন সিংভূম জেলায় টুষু পূজার প্রচলন হয় তখন বাঁকুড়া জেলার এক পল্লীকবির টুষু সঙ্গীতই সিংভূমে প্রচলিত ছিল। উপরোক্ত পল্লীকবির লিখিত টুষু সঙ্গীত, এমন কি তাঁর নামও অনেক চেষ্টা করে আমি জানতে পারি নি। বাঁকুড়ার পরেই মানভূমের নাম করলাম এই জন্য যে সিংভূম এবং ময়ূরভঞ্জে উপরোক্ত বাঁকুড়ার পল্লীকবির যে সকল টুষু সঙ্গীত পুস্তক আসত সবই পুরুলিয়া বাজার থেকে। বাঁকুড়ার টুষু সঙ্গীত সিংভূমে প্রথম প্রচলিত হলেও ইদানীং আর প্রচলন নেই।

সিংভূম এবং ময়ূরভঞ্জে টুষু সঙ্গীত রচনা করেছেন অনেকেই, তার মধ্যে ধলভূমের ভক্তকবি বৈষ্ণব বিষ্ণুপদ দাস এবং পল্লীকবি কৃষ্ণচন্দ্র রাউলের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইহাদের সঙ্গে তরুণ সাঁওতাল কবি প্রফুল্ল সারেঙের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। কবিত্বের দিক থেকে বিচার করলে বিষ্ণুপদ দাস এবং কৃষ্ণ রাউলের সঙ্গে তুলনা প্রফুল্ল সারেঙের হয় না, তবুও তার নাম উল্লেখ করলাম এই জন্য যে ধলভূমের সাঁওতালদের মধ্যে বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় মাতৃভাষা বলা চলতে পারে এবং সাঁওতাল জাতির মধ্যে প্রফুল্ল সারেঙই প্রথম বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। যদিও কৃষ্ণ রাউল মহাশয় আজ আর জীবিত নেই, তা হলেও এখানে উল্লেখ না করে

পারলাম না। কবি কৃষ্ণ রাউল এবং বিষ্ণুদাস উভয়েই ঘাটশীলা সুবর্ণ সংঘের সঙ্গে কমবেশী যুক্ত ছিলেন। কবি বিষ্ণুদাস এখন জীবিত।

পল্লীকবি কৃষ্ণচন্দ্র রাউল মহাশয় তাঁর টুষু সঙ্গীত নামক পুস্তিকাতে লিখেছেন, টুষু পূজা পৌষ লক্ষ্মী পূজারই নামান্তর, আবার কারো কারো মতে রাধাকৃষ্ণের যুগল পূজার একটা রূপ, যদিও হিন্দু শাস্ত্রের কোথাও টুষু পূজার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। আমার মনে হয় টুষু পূজাকে রাধাকৃষ্ণের যুগল পূজার একটা রূপ মনে করার এইমাত্র কারণ যে টুষু সঙ্গীতের অধিকাংশই শ্রীমতী ও কৃষ্ণের বিরহমিলন নিয়ে। অবশ্য স্থানকালোপযোগী অনেক সঙ্গীত সমাবেশও আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কবি কৃষ্ণ রাউলের টুষু সঙ্গীত পুস্তকখানা আমার হারিয়ে গেছে, তাই তার রচিত কোন টুষু সঙ্গীত এখানে উল্লেখ করতে পারলাম না। নীচে ভক্ত কবি বিষ্ণুদাস-রচিত কয়েকটি টুষু সঙ্গীত দিলাম।

১। রাধা কৃষ্ণ যুগল-মিলন
টুষু গানে আমদানি
এক মনেতে শুনলে হবেন
আহ্লাদেতে আটখানি।
রসে রাজা কেমন মজা
পড়ে দেখুন বইখানি
পৌষমাসেতে ভুলবেন না আর
বিষ্ণুদাসের এই বাণী।

২।
প্রিয় নাইরে ঘরে
বল সখী ধৈর্য্য ধরি কি করে।
কুসুমে গুঞ্জরে অলি গো, অতি সুমধুর স্বরে,
ফুটিল মাধবী লতা, পিকবর কুহরে।
কোন্ রসবতী নারী গো সে মথুরা নগরে
রাখে শ্যামে বন্দী করি, হৃদয়-কারাগারে।
যাও সখি মধুপুরে গো, বলিবে বংশী ধরে,
তোমার বিরহ বিষে কমলিনী যায় মরে।
এ নব যৌবন আমি গো, সমর্পিব আর কারে,
বিষ্ণু বলে ভেব না রাই, সে যে আসিবেন ফিরে॥

৩।
যাব বৃন্দাবনে,
ওগো বৃন্দে রইব না যে এখানে
আজি কালি যাবো আমি গো ভেবেছিলাম মনে,
কিন্তু সখি তোমায় দেখি বড় প্রীতি পাই মনে।
যদিও রয়েছি আমি গো, তমুলয়ে এখানে
নিশ্চয় জানিবে আমার মন বাঁধা সেখানে।

৪। নাগর মানে মানে
যাও, চলে যাও, নিশি ছিলে যেখানে।
অতি এ প্রভাত কালে হে, উঠে এলে কেমনে,
ও শ্যাম, যাও হে সখা,
আমি কথা কইব না তোমা সনে।
পরের বঁধুয়া তুমি হে, কেন এলে এখানে
ওহে পরানেতে যাবে মারা, সে যদি শুনে কানে।

৫।
আমার কোথায় সে ধন,
যার কারণে শ্যামকুণ্ড করি রচন,
যার কারণে সহি বন্ধন গো, মস্তকে বাঁধা বহন,
যার কারণে বৃন্দাবনে ধরি গিরি গোবর্দ্ধন,
যার কারণে রাখাল সাজা গো যার কারণে গোচারণে
যার কারণে কদমতলা, যার কারণে বাঁশী সাধন,
যার কারণে ঘাটে দানী গো, কুঞ্জে রাস বস্ত্র হরণ,
যার কারণে নিধুবনে কালি রূপ ধারণ,
তার কারণে ও কুবুজা গো, চলিলাম শ্রীবৃন্দাবন,
বিষ্ণুদাস বলে এবার হেরিব যুগল চরণ॥

৬। বহুদিন পরে
প্রাণ বঁধুয়া এল হে কুঞ্জদ্বারে।
শ্রীমুখ চুম্বন কত গো, উলসিত অন্তরে
হারানিধি বলে তখন বসালেন হৃদয় 'পরে।
চন্দ্র মনে করি তখন গো, চকোরিণী চকোরে
আসিয়ে নির্ভয়ে তারা চাঁরিপাশে যায় ঘুরে।
এ তমুটি পরশনে গো, ও তমুটি শিহরে।
শ্রীমুখ চুম্বন যত আশা বাড়ে অন্তরে।
রাধাকৃষ্ণে বসেন তখন গো, রত্ন সিংহাসন 'পরে
মলয় পবন তখন মৃদু মৃদু বয় ধীরে।
যত সখিগণ তখন গো, চামর ব্যজন করে
মূঢ় বিষ্ণুদাস তখন যুগল-লীলা নেহারে।

স্থান-কালোপযোগী সঙ্গীত :—
১। বলি ও ভাই কান্ত*
টুষুর গানে মাতালিরে দেশ যত।
২। টুষুর প্রেম মটরে
রসিকরা সব চেপেছে টিকিট করে।

*কান্তদাস কবি বিষ্ণুদাসের অনুজ। কবির সকল পুস্তিকার একমাত্র প্রচারক। ধলভূমের প্রতি হাটে সুর ক'রে কবির সঙ্গীত পুস্তিকাগুলি বিক্রয় করে।

বেশ ছুটেছে গানের সার্ভিস গো,
সুসঙ্গত চাকার ঘোরে,
গ্রাম সহর বোঝাই করে, নিত্য
নূতন প্যাসেঞ্জারে।
প্রেমের মজা যে জন বুঝে গো, রিটার্ণ টিকিট
সেই করে
শুধু করে চাপ্‌লে পড়ে পিরিতি চেকার ধরে
ভাবের রোডে পৌষ মাস ড্রাইভার লো,
চালায় তিরিশ দিন ধরে
টুষুর প্রেম মটরে।

৩। দিদি ও রঙ্‌ বেটে
আমি যাবো সিনাতে নদীর ঘাটে।
শুনেছি স্বর্ণ রেখা গো, দুর্গতিনাশী বটে
মকর ভরে স্নান তরে সম গঙ্গা এই বটে।
পাড়ায় পাড়ায় শুনে এলাম গো,
সবাই টুষুর গান রটে।
(দিদি) শুনে সে গান আনন্দে প্রাণ বুক যেন ফুলে উঠে।
নূতন বসন এসেন্স সাবান গো বেঁধে দে
আমার গেঁঠে
(দিদি) সমান বয়সী সাথে, সই পাতাব স্নান ঘাটে।
তেরোশ চুয়াল্লিশ সালে গো সবাই খাও
মকর পিঠে।

৪। টাটার সাকচী হাটে,
টুষুর সঙ্গীত নিবি যদি আয় ছুটে,
লাগে না সে অধিক মূল্য গো,
ছাপাই খরচ নেয় বটে,
জিজ্ঞাসা করেছি সখি, দুইটি আনা দাম মোটে।
সে বই যেই জনা বিক্রী করে গো,
ঠুরকা হেন লোক বটে।
শুধু কেন সাকচী হাটে গো, বিক্রী করে সব হাটে,
গালুডিতে গিয়ে দেখি, তাই বটে সই
তাই বটে।

৫। আমার টুষু মুড়ি ভাজে বড় কোঠার ছাতে গো,
ওদের টুষু ছেঁচ্‌রা মাগী, বুলে আঁচল পেতে গো।
আমার টুষু আম পাড়ে আম বাগানের
ডালে গো,
ওদের টুষু ছেঁচ্‌রা মাগী, উপর দিকে ভালে গো।
আমার টুষু সাধের বিটি, দিতে নারলাম মাদুলি,
অভিমানে কেঁদে গেল কেন্দাত্তির কুলি কুলি।

ধলভূমে গ্রাম্য চলতি কথায় হলুদকে রং বলে, তাই তৃতীয় গানটাতে রঙ্‌ কথার উল্লেখ দেখ্‌তে পাই। এই অঞ্চলে একটা কথা আছে, যদি মকরসংক্রান্তি দিনে নদীর কোন দুই জন নব বস্ত্র পরে এবং মালা-বদল করে ফুল পাতায় অর্থাৎ সখিত্বে বা বন্ধুত্বে পরস্পর আবদ্ধ হয় তা হ'লে উহা চির জীবনে ভাঙে না। তৃতীয় সঙ্গীতটিতে তারই উল্লেখ দেখি।

দুইটি দিন

শ্রীসত্যব্রত মজুমদার

অপরূপ কারুকার্য্যে ধরণীরে বিচিত্রিত করি'
নিঃসঙ্গী বিধাতা যবে পাঠালেন প্রথম মানবে,
পথিকের চক্ষু হ'তে আনন্দের বন্যা পড়ে ঝরি'
বিধাতা হেরেন তাহা সুনিভৃতে বিপুল গৌরবে।

অকস্মাৎ এক দিন সে পথিক দম্ভস্ফীত তনু
কৃপাণ হস্তেতে ধায় মত্তপ্রায় ভুলি দিগ্বিদিক্—
শ্যামল ধরার দেহ খড়্গাঘাতে করে অণু অণু,
বিধাতা রহেন চাহি দূর শূন্যপানে অনিমিখ্‌।

আস্তিক

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

সুলোচন হালদারের বুকেও যে একজোড়া মানুষের হৃৎপিণ্ড ধুক্‌ধুক্‌ করিতেছিল এ সংবাদ পাইয়া গ্রামের সকলেই অতি মাত্র বিস্মিত হইয়া উঠিল।

লোকটার কাছে ধর্ম নাই, সমাজ নাই, এমন কি যদি বলা যায় যে আত্মীয়-পরিজনও নাই ত নেহাৎ মিথ্যা বলা হয় না। কাকার মৃত্যুতে তাঁহার ইন্সিওরেন্সের টাকাগুলার কিনারা করিতেই সুলোচন হালদার নাকি এমন মাতিয়া গিয়াছিল যে শ্রাদ্ধটা পর্যন্ত বাদ পড়িয়া যায়। কথাটা শত্রুপক্ষের, ষোল আনাই সত্য নয়; তবে শ্রাদ্ধের পূর্বের ক'টা দিন সুলোচন গ্রামে ছিল না; কাজের দিন সকালবেলা কলিকাতা হইতে ফিরিয়াই অনুগত বন্ধু এবং পরামর্শদাতা নবীন দত্তকে ডাকাইয়া আনাইয়া বলিল, "নাও, তিলকাঞ্চনের যোগাড়টুকু তাড়াতাড়ি ক'রে ফেল নবীন, আমি গুটি-বারো ব্রাহ্মণ ব'লে আসি। মনে করেছিলাম গাঁয়ের ব্রাহ্মণগুলিকে খাওয়াব—আমার বিশ্বাস নেই ওসবে, তবুও একটা সমাজপ্রথা—তা টাকাগুলো এমন গোলমাল করে গেলেন, যদি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে না পৌঁছুই—জোচ্চোরদের পেটে যায়। পরলোক তো আছে নবীন একটা?—তাঁর কষ্টার্জিত টাকাগুলি যদি তাঁর ঘরে এসে না পৌঁছত…"

নবীন দত্ত পূরণ করিয়া দিল, "তা হ'লে হাজার ঘটা ক'রে শ্রদ্ধ করলেও কি তাঁর আত্মার শান্তি হ'ত?… আর লোক খাওয়াবার কথা নিয়ে তুমি মনে খেদ রে'খ না দাদা; হাঁা গো, এমনও তো গ্রাম আছে যেখানে বামনের পাটই নেই, সেখানে ত লোকে মরেও না, তাদের শ্রাদ্ধও হয় না!"

পারিবারিক জীবনটি একটি নিতান্ত পুরান পদ্ধতি ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে—পূজাপার্বণে কি অতিথি অভ্যাগতে যে একটু বিচিত্রতা আনিবে তাহার উপায় নাই। কাকার টাকা বের করার মত অবস্থায় পড়িলে সুলোচন পরলোকের নাম করে মাঝে মাঝে, প্রসঙ্গ উঠিলে কথার কথা হিসাবে দেবতাদের কাহাকে কাহাকেও আনিয়া ফেলে, কিন্তু দেবতারা যখন কাল, লগ্ন প্রভৃতি ঠিক করিয়া নিজেরা আসিতে চান তখন আমল দেয় না। বলে, "তর্কবাগীশ মশাইয়ের শিষ্য—আমার কাছে ওসব ধাপ্পাবাজী খাটবে না। তা ভিন্ন যাদের নিজেদের একটু উপায় ক'রে নিজের পেট চালাবার ক্ষমতা নেই, কোথায় কে একটু ভোগ দেবে তার উপর নির্ভর, তাঁরা আবার আমার উপকার করবেন! —গেছি আর কি!"

লোকটা কখনও প্রবঞ্চিত হয় নাই—সাধু সন্ন্যাসী গুণী গণৎকার ঘেঁষিতে চায় না, বলে—"আমার বিশ্বাস নেই।" দু-মুঠা ভিক্ষা দিয়া পুণ্যার্জ্জন করিতে চায় না, বলে—"বিশ্বাস নেই।" বাড়িতে অসুখ-বিসুখ করিতে ডাক্তার বৈদ্যের হাঙ্গাম করে না; ঐ এক বুলি—"বিশ্বাস নেই।"

মোট কথা, সুলোচন অবিশ্বাসের বেড়া দিয়া খরচের সমস্ত দ্বারগুলি রুদ্ধ করিয়া নিজের সঞ্চীয়মান অর্থভাণ্ডারের মধ্যে জীবনের প্রায় সবটাই কাটাইয়া দিল। এখন বয়স তাহার পঞ্চান্নের কাছাকাছি।

গ্রামের লোক পরোক্ষে তাহাকে এবং তাহার বাক্সবন্দী টাকাকে অভিসম্পাত করে। প্রয়োজন হইলে গোটাকতক শ্রুতিরোচক কথা বলিয়া চড়া সুদে হাওলাৎ লইয়া যায়। এই ভাবে দিন যায়, এমন সময় এক দিন সুলোচনের স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিল।

সুলোচনের স্ত্রী মানময়ী প্রায় বৎসরাবধি নানা রকম জটিল ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। প্রথমে উপসর্গগুলি সামান্য আকারে দেখা দেয়। অত সূক্ষ্ম জিনিস এ-বাড়িতে কাহারও নজরে পড়ে না, কেহ গা করিল না। যখন জটিলতা দেখা দিল, সুলোচন বেশ ঘটা করিয়া গৌরচন্দ্রিকা করিয়া স্ত্রীকে বলিল—"দেখ, তোমার শরীর তুমিই ভাল বোঝ, বল ত না হয় শহর থেকে বড় ডাক্তারকে নিয়ে আসি। আমি ত মনে করছিলাম নাইতে খেতে সেরে যাবে; রোগকে যত আস্কারা দেওয়া যায় ততই পেয়ে বসে; কিন্তু ঐ যে বললাম—তোমার শরীর তুমিই ভাল বোঝ, শেষে এমন না হয়…"

মানুষ এক দিনেই চেনা যায়, মানময়ী ত এই লোকের সঙ্গে প্রায় ত্রিশ বৎসর ঘর করিতেছেন, মনের অভিমানটা

চাপিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি, কি হয়েছে শুনি যে শহর থেকে সাত তাড়াতাড়ি বড় ডাক্তার এনে ফেলতে হবে? বয়স হয়েছে, এখন ত এসব একটু-আধটু দেবেই দেখা মাঝে মাঝে···"

স্ত্রীর কাছেও একটু চক্ষুলজ্জা হয় এবং সুলোচনের মত মানুষেরও চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটা বস্তু থাকে। পাশের গ্রামের উদীয়মান হোমিওপ্যাথ দীনেনকে ডাকা হইল। সে মাসচারেক আগে আসিলে বোধ হয় কিছু ঠাহর করিতে পারিত। কোন থৈ পাইল না।···সুলোচন কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে নবীন দত্ত এবং আরও পাঁচ-সাত জন যাহারা কাছে ছিল তাহাদের বলিল, "মেয়েদের কথায় কখনই বিশ্বাস করি নি, একবার করলাম, তার ফলও হাতে হাতে পেলাম। কত ক'রে বললাম— ওগো, গতিকটা যেন ভাল বোধ হচ্ছে না, যাই, একবার শহর থেকে এ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জেনকে ডেকে আনি। মাথার দিব্যি দিয়ে ডাকা-গাড়ি ফিরিয়ে দিলে—কি?—না; আমার শরীর আমিই ভাল বুঝি, বয়সের দোষে ওরকম একটু-আধটু হয়, আবার নাইতে খেতেই সেরে যাবে··· এই তো সেরে যাওয়া?·· উফ্‌!··"

২

যাই হোক, স্ত্রীর শ্রাদ্ধক্রিয়াটা সুলোচন ভাল ভাবেই করিল এবং এই অভাবনীয় ব্যাপারে সকলে বিস্মিত হইল। অবশ্য দানসাগরও নয়, বৃষোৎসর্গও নয়, তবে গ্রামের ইতর-ভদ্র সবাইকেই এবং পাশাপাশি তিনটি গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণগুলিকে বলিল। যাহারা একটু ব্যঙ্গপ্রবণ তাহারা বলাবলি করিল, "পরিবার আর কাকার তফাৎ আছে বইকি।" অনেকে সোজাভাবেই লইল ব্যাপারটা, বলিল, "যাই হোক মানুষের চামড়া গায়ে আছে বলতে হবে। স্ত্রীর বেলাও যদি অষ্টরম্ভা দেখাত ত কে কি করত বল?"

অভিমত যে যাহাই দিক, কি করিয়া যে ব্যাপারটা সম্ভব হইল সেটা গ্রামের সকলেরই একটা গভীর সমস্যা এবং গবেষণার বিষয় হইয়া রহিল।

জ্ঞাতি-ভোজনের দিন কতকটা আভাস পাওয়া গেল।—

আহারের পর সকলে আসিয়া বৈঠকখানায় বসিয়াছে, পান-তামাকের সঙ্গে গল্পসল্প চলিতেছে। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, "না, কাজটি তুমি বেশ সুচারুভাবেই করেছ সুলোচন, কাল অনাথকে আমি সেই কথাই বলছিলাম,— বলি, সুলোচনের প্রাণ আছে, বৌমার কাজটা যেভাবে করলে··।"

নবীন দত্ত ঠিক তাল বোঝে, বলিল, "তা যদি বললেন খেতু-কাকা, সুলোচনদাদার কবে কোন্ কাজটাই খেলো হয়েছে?"—সকলের মুখের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বিজ্ঞভাবে একটু হাসিল।

এর পূর্বে যে আবার সুলোচন কবে কি কাজ করিয়াছে—কাহারও মনে পড়িল না। তবে অবস্থাটা অনুকূল নয় বলিয়া সে কথাটায় আর কেহ উচ্চবাচ্য করিল না।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, "তা যে হয়েছে তা ত বলছি না, মন দরাজ হ'লে কাজ ভাল না হয়ে উপায় নেই। তবে এবারকার এ কাজটা যেন আরও উৎরে গেছে। বলতে পারি না আমার মনের ভ্রম কি না, তবে···"

"ভ্রম নয়, এর রহস্য আছে।···দাও, অনেকক্ষণ হয়েছে"—নবদ্বীপ ক্ষেত্রমোহনের হাত থেকে গড়গড়ার নলটা লইয়া দুইটা টান দিয়া বলিলেন, "ভ্রম নয়, এর রহস্য আছে। যাঁর কাজটি হ'ল, তিনি কত বড় সতীলক্ষ্মী মেয়ে ছিলেন? তিনি ওপর থেকে দেখছেন না? এই যে একটা কাজে সাতখানা গ্রামে সাড়া পড়ে গেল, এতে তাঁর পুণ্যি, তাঁর ভাগ্যি কাজ করছে না? সুলোচন রাগ করুক, কিন্তু এর সবটুকু যশ ত আমি তাকেই দিতে পারছি না··"

সুলোচন বাইরে বাইরে কতকটা অনাসক্ত ভাবে নিজের যশোগীতি শুনিয়া যাইতেছিল, এই সুবিধাটকু আর হাতছাড়া করিল না। একটু নড়িয়া-বসিয়া বলিল, "নবদ্বীপ কাকা ভাগ্যির কথা বলায় মনে পড়ে গেল। ওসব কি আগে কিছু বিশ্বাস করতাম? তর্কবাগীশ মশাইয়ের শিষ্য আমরা, শিখিয়েছিলেন—এক আছে প্রকৃতি আর আছে পুরুষ, বাকী সব বাতিল; ও সব যাগযজ্ঞি, পুজো-পার্বণ, ঘটক-পুরুৎ—সব বুজরুকি। গণৎকার ত তাঁর ত্রিসীমানার মধ্যে আসতে পারত না। তাঁর কাছ থেকে সেই ধাত পেয়েছিলাম, পরলোকও মানি নি ভাগ্যিও মানি নি, নিজের অহঙ্কারেই কাটিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি না মানলেই ত বিধির বিধান পালটে যাচ্ছে না। মানাবার যিনি কর্তা তিনি এমন ভাবে মানিয়ে দিলেন যে···"

কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসায় আর শেষ করিতে পারিল না। সকলে সান্ত্বনা দিল—আর খেদ করিয়া কি হইবে? যাহার যত দিন সুখদুঃখের ভোগ

এ সংসারে তাহার এক দিন বেশি থাকিবারও উপায় নাই, এক দিন কমও নয়। তিনি পুণ্যবতী ছিলেন, ভালই গিয়াছেন; এখন, যে কুচোকাচাগুলিকে রাখিয়া গিয়াছেন সেগুলির মুখ চাহিয়া সব সহ্য করিয়া যাইতে হইবে, ইত্যাদি।

সুলোচন নীরবে সব শুনিয়া গেল, তাহার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "অথচ সে গণৎকারটা সবই বলে গেল, স্পষ্ট না বলুক, একটু ঘুরিয়ে বললে, তা তখন যদি বিশ্বাস ক'রে একটু ভাল ক'রে শুনি ত একটা কাটান-টাটান হ'তে পারে। কিন্তু কিছুই কখনও আমল দিই নি—বিভ্রুল বকছে বলে খেদিয়ে দিলাম ব্রাহ্মণকে, এখন…"

আবার গলা ধরিয়া আসায় থামিয়া গেল। নবদ্বীপ বলিলেন—"যাক শোকের আলোচনা ক'রে আর মন খারাপ করবার দরকার নেই। মতিগতি মানুষের বদলায়ই, এখন ভগবানের ওপর ভরসা রেখে চল, তিনিই সব সামলে দেবেন। যা হয়ে গেল তার জন্যে আর…" সুলোচন আর একটা নিরুপায়ের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যা হয়ে গেল তার জন্যে ত আমি ভাবছি না নবদ্বীপ কাকা, সে ত হয়েই গেল, তর্কবাগীশ মশাইয়ের শিক্ষাই ছিল—গতস্য শোচনা নাস্তি; যা বাকি আছে, স্পষ্টাক্ষরে তা দেখতে পাচ্ছি ঘটবেই—তারই জন্যে এখন ভাবনা। শেষকালে বুড়ো বয়সে কি এই ছিল কপালে—উফ্ "

সকলেই দুঃখ না করিতে জেদাজেদি করায় সেদিন কথাটা ঐ পর্য্যন্তই রহিল।

নবীন দত্ত দিন পনরর জন্য বাহিরে নিজের কি কাজে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিলে সুলোচন রহস্যটা আর একটু ভাঙিল। বলিল, "যতই মিলিয়ে দেখছি, ততই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি নবীন। শাস্ত্র বলি ত একে, সবার মুখেই এক কথা। আর আশ্চর্য, ঠিক এই কথাটিই সে লোকটাও হাত গুনে বলেছিল। তখন ত আর এসবে বিশ্বাস ছিল না। নেহাৎ—"হাতটা দেখি এক বার" বলে ফ্যাচাখেউ ক'রে তুললে, দিলাম বাড়িয়ে—বড়্ বড়্ ক'রে বকে গেল, শুনে গেলাম। তার পরে যখন ফলল, চোখ খুলে গেল। ভগবান যেন চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন—হ্যাঁ, বড় নাস্তিক হয়েছিস? তবে দেখ্।"

ধীরে ধীরে হুঁকা টানিতে লাগিল। কথাগুলার মধ্যে উদ্দেশ্যের কোন সন্ধান না পাইয়া, কোন্ ফাঁকে সেটা বাহির করিবে নবীন দত্ত মনে মনে তাহারই উপায় খুঁজিতেছিল, সুলোচন নিজেই সেটা আরও পরিষ্কার করিয়া দিল। হুঁকাটা সরাইয়া, চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল, "স্পষ্ট বললে হে—দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ, হস্তরেখা বলছে, কোন উপায় নেই।…একেই মানি না ওসব, তার ওপর ও রকম অলক্ষুণে কথা শুনে আরও ভক্তি গেল চটে; বললাম—'পঞ্চান্ন পেরিয়ে এখন ঘাটের ধাক্কা চলছে, দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ মানে?'…ভাগিয়ে দিলাম। মাসখানেকও গেল না, গিন্নী বাদ সাধলেন। কে জানত বল এ সব? এখন এই হাতে হাতে প্রমাণ, বিশ্বাস না ক'রেই বা কি করি বল?"

নবীন দত্ত চেনে, ব্যাপারটা বুঝিল। বলিল—"কথায় বলে, 'দৈবং কেন বাধ্যতে'; আমরা না মানলেই ত হবে না দাদা। বলে—যা ভবিতব্যি…"

সুলোচন বলিল—তবে ভবিতব্যি বলেই যে এক কথায় মেনে নিয়েছি এমন নয়। গিন্নীর কাজটা শেষ হলে আরও ক'জনকে দেখালাম হাতটা—দেখি না, যদি একটা লোকও 'না'—বলে। উঁহুঃ, সব শেয়ালের এক রা।"

নবীন বিজ্ঞের মত বলিল, "তবেই বুঝুন, সবার মুখেই যখন এক কথা…"

"হুবহু এক কথা, তবে আর বলছি কি? সবার কাছে এক এক কলম লিখিয়েও রেখেছি, এই দেখ না।"

সুলোচন উঠিয়া গিয়া একখানা কাগজ লইয়া আসিল। ইংরেজি, সংস্কৃত, বাংলায় সাত আটজন লম্বা লম্বা পদবীধারী জ্যোতিষী গণৎকারের অভিমত—দারপরিগ্রহ অনিবার্য। নবীন দত্তের কোথায় একটা হাসি ঠেলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু হাসিকে আস্কারা দিলে সে সুলোচনের মন্ত্রী হইতে পারিত না। অভিমতগুলার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। একটু পরে সোজা হইয়া বসিয়া বলিল—"একটা কথা বাদ দিয়েছেন, তাই দেখছিলাম।…আপনি যা আপনভোলা লোক!"

সুলোচন একটু উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, "কি আবার ছাড়তে দেখলে তুমি? পাঁচ জনে আমার ঘাড়েই ফেলবে জেনে ত লিখিয়ে পর্যন্ত নিলাম,—ভাববে বুড়ো বয়সে সখ হয়েছে। এদিকে আমি যে কী এক সমস্যায় পড়ে গেছি।…"

নবীন দত্ত তিরস্কারের স্বরে বলিল, "ঘটনাটা ঘটবে কবে সেটা জেনে নিতে হয়ত? জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ দৈবাধীন ব্যাপার; যে সময় ঘটনাটি ঘটবার, না জেনে বোধ হয় লঙ্ঘন হয়ে গেল। সেই মানলেন, অথচ শুভ কাজে একটা প্রত্যবায় দোষ ঢুকে রইল…"

সুলোচন যেন একটা দ্বিধায় পড়িয়া কি চাপিতে চেষ্টা

করিতেছিল, অবশেষে সেটুকু কাটাইয়া উঠিয়া বলিল, "করেছিলাম জিগ্যেস নবীন, অর্থাৎ যত দেরি হয় ততই ত ভাল?—তাই করেছিলাম জিগ্যেস, এক জন ত বলে মাসখানেকের মধ্যেই করতে হবে? তা কখন পারা যায়? তুমিই বল না?···কেউ আবার বলছে ছ-মাস লাগবে। মোট কথা, সময় নিয়ে সবার মতের মিল নেই দেখে ভাবলাম ওটা আপাতত হাতে রাখা যাক, দু-দিন পরে এক জন ভাল জ্যোতিষীকে দেখিয়ে ঠিক করা যাবে, তাড়া কিসের?···তা ভিন্ন তুমিও ছিলে না, মনটাও এই দুর্গ্রহে পড়ে ঠিক নেই···"

নবীন দত্ত বলিল, "অবিশ্যি এ যা বলেছেন এ একটা সুযুক্তির কথা,—যখন সময় নিয়ে ওদের সবার মিল হচ্ছে না তখন একটা ভাল লোক দিয়ে গুনিয়ে ঠিক ক'রে নেওয়াই ভাল দাদা, আমার আছেও জানা ভাল লোক—দণ্ড পল পর্যন্ত গুনে বলে দেবে। কিন্তু একটা কথা বলিয়ে নোব তবে এ কাজে হাত দোব দাদা, সে যা বলবে সেটি মেনে নিতে হবে। তুমি রাগ করবে কর দাদা, আমার বিশ্বাস তোমার নিষ্ঠার অভাবেই বৌদি আমাদের অকালে ছেড়ে গেলেন। হয় লগ্ন নিয়ে, নয় অন্য কোন খুঁটিনাটি নিয়ে একটা কিছু বিঘ্নি হয়েছিল, নইলে তাঁর কি এটা যাবার বয়েস? আজ তাঁকে বিদায় দিয়ে কি নতুন বৌদি ঘরে আনবার কথা আমার?"

নবীন দত্ত চোখে কোঁচার খুঁট দিল। তামাক টানিতে টানিতে সুলোচন হালদারও একবার চোখের কোণগুলা মুছিয়া লইল।

৩

দু-দিন পরেই নবীন দত্ত সনাতন গোঁসাই নামে এক জনকে আনিয়া হাজির করিল। বলিল—"পণ্ডিতপাড়ায় বাড়ী, নামী-গুণী। গোঁসাই অবিশ্বাসের জন্য সুলোচন হালদারের উপর গোটাকতক কাটা-কাটা বুলি ঝাড়িয়া হাতটা লইয়া যত দূর সম্ভব দূরে ঠেলিয়া ধরিয়া তীর্যক নেত্রে চাহিয়া রহিল। অনেক বুলি আওড়াইল, অনেক আঙুল নাড়িল, তাহার পর আবার গোটাকতক বুলি আওড়াইয়া বলিল—দুই মাস আট দিন, এত ঘণ্টা, এত মিনিট, এত সেকেণ্ড, এত পল, এত অনুপলের মধ্যে বিবাহ অনিবার্য।

নবীন নিতান্ত কৌতূহলবশে একটা পাঁজি আনাইল। হিসাব করিয়া দেখা গেল ঠিক ঐ সময়ে একটি বিবাহের দিন পাওয়া যাইতেছে! নবীন বলিল—"দাদা, এতেও তুমি যদি গণনা বিশ্বাস না কর ত কি বলব? এ লগ্ন হাত ছাড়া করলে আবার একটা দুর্বিপাক এনে ফেলবে। বিধির নির্দেশ যখন এত স্পষ্ট, তখন আর অমত ক'রো না তুমি দোহাই।"

সুলোচন গোঁসাইকে পাঁচটি টাকা বিদায় দিয়া চক্ষে কোঁচার খুঁট দিয়া বলিল—"ওফ্, এতও লেখা ছিল কপালে?"

* * *

গণৎকারে বিশ্বাস করে না এমন চ্যাংড়ার সংখ্যা গ্রামে বড় অল্প নয়। নবীনের পরামর্শে শুভ কার্যটা যথাসম্ভব সঙ্গোপনেই হইল। তবে বৌভাতের দিন সুলোচন আবার বেশ এক চোট ঘটা করিল। ব্যবস্থা করিতে, নেমন্তন্নর ফর্দ করিতে পাড়ার গণ্যমান্যেরা একত্র হইয়াছে, ক্ষেত্রমোহন, নবদ্বীপ, আরও সব। নবীন দত্তও আছে।

নবীন বলিল, "রাজী কি করতে পারি? এক হাত এগোন ত সাত হাত পেছিয়ে যান।···এখন শুভ কাজটা সু-ভালয় ভালয় উৎরে গেলে বাঁচা যায়।"

ক্ষেত্রমোহন গড়গড়া থেকে মুখটা সরাইয়া বলিল—"যাবে উৎরে। কত বড় সতীলক্ষ্মী ঘরে এসেছেন! এ ত আর অন্য কেউ নয়, আমার সেই মা-ই। সুলোচন সেদিনকার ছেলে শাস্ত্র না মানুক—স্ত্রীর যেমন সেই এক স্বামী, পুরুষেরও ঠিক তেমনই সেই একই স্ত্রী কি না, শুধু ভিন্ন মূর্তি নিয়ে আসেন···"

সুলোচন বলিল, "আর অবিশ্বাসের পাট উঠিয়ে দিয়েছি ক্ষেতুকাকা, যা-শিক্ষা পেলাম। আশুকের বংশ আমরা, তর্কবাগীশ মশাই যে কি বিষ ঢুকিয়ে গিয়েছিলেন মনে!···"

চারিটি আঙুল দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া একটি বুকভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিল।

রবীন্দ্র-স্মৃতি*

শ্রীজীবনময় রায়

'পুণ্যস্মৃতি,' বিশ্বের বরেণ্য, ভারতের ঋষি ও বঙ্গজননীর প্রিয়তম পুত্র রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকাহিনী।

অন্তরের অন্তস্তলে অন্তরতমের বিচ্ছেদ যে বেদনার সুর জাগায়, সেই মহৎ বেদনার সুরই আমাদের সমস্ত সত্তা সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে গোপনে গোপনে নিবিড়তর মিলনের এক নিরবচ্ছিন্ন অনুভূতিতে হৃদয় মন তন্ময় করিয়া রাখে। বৈষ্ণব সাধকগণ মিলন অপেক্ষা বিরহকেই সাধনার ক্ষেত্রে অনুভূতির শ্রেষ্ঠতর ও নিবিড়তর অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

"নয়ন সমুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।
আজি তাই,
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল,
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।"
[ছবি—"বলাকা"]

'পুণ্যস্মৃতি' প্রিয়জনবিরহের শূন্যতামরুভূর অন্তরালে সেই অনবচ্ছিন্ন অনুভূতির ফল্গুধারা। ইহাতে তৎ-সমর্পিতচিত্তের ঐকান্তিকতাপূর্ণ প্রচ্ছন্ন ধ্যানযোগের একটি সুনির্ম্মল পুণ্যস্রোত প্রবাহিত। যে চিত্ত লইয়া যুগে যুগে দেশে দেশে সাধুসন্ত মুনিঋষিগণের ভক্তেরা তাঁহাদের বাণীসম্বলিত চরিতামৃত জনসমাজে পরিবেশন করিয়াছেন, 'পুণ্য-স্মৃতি'তেও সেই ভাবাশ্রুবিধৌত পূজারত চিত্তের আত্মোপলব্ধি ও আত্ম-নিবেদন বিদ্যমান।

বর্ত্তমান যুগে লিখিত রামকৃষ্ণকথামৃত, রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থের কথা এই প্রসঙ্গে অনেকেরই মনে উদিত হইবে। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের সহিত সীতা দেবীর 'পুণ্যস্মৃতি'র স্বাতন্ত্র্য আছে। তাহার প্রথম কারণ, আমাদের স্মৃতির সম্পূর্ণ অধিগম্যকালের মধ্যে সংঘটিত যে সকল ঘটনা তিনি বিবৃত করিয়াছেন তাহা আমরা নানারূপে অনায়াসে যাচাই করিয়া লইতে পারি; এবং রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সহিত সন ১৩১৭ হইতে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল বলিয়া 'পুণ্যস্মৃতি'তে বর্ণিত বহু ঘটনা ও উৎসবাদির আনন্দ আমি স্বয়ং উপভোগ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। সুতরাং আমার নিকট এবং তখন হইতে এখনও জীবিত আছেন এইরূপ আরও বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তির নিকট ইহার ঐতিহাসিক মূল্য সুস্পষ্ট ও নিঃসংশয়।

দ্বিতীয় কারণ, ভগবান্ রামকৃষ্ণকে তাঁহার ভক্তেরা আপন আপন মানসলোকে ঈশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই অবাঙ্মানসগোচর ভগবানের ব্যক্তলীলার স্বরূপ ভক্তবৃন্দের নিকট প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। ইহার সম্যক্ উপলব্ধি মানুষের বিশেষ মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। আর 'পুণ্যস্মৃতি' স্নেহপ্রেমকরুণা ও বিচিত্র কর্ম্ম-শক্তির মূর্ত্ত প্রকাশস্বরূপ যে মহান্ মানুষ আমাদের দুর্ব্বল চিত্তের সুখ-দুঃখ শোক-উৎসব আনন্দ ও বেদনার নিগূঢ়তম অনুভূতির অন্তরতম কবিরূপে নিতান্ত আপনার জন হইয়া আমাদের স্বল্পপরিসর তৃষার্ত্ত হৃদয়ে আসিয়া অনায়াসে ধরা দিয়াছেন, তাহারই অনতিদূরকালবর্ত্তী বিচ্ছেদবেদনার ভক্তিপ্রীতিকরুণাসরস পুণ্যস্মৃতির কাহিনী। দেবতা আমাদের নিকট কল্পনাসাপেক্ষ ও কল্পনাতীত, আর প্রিয়জন আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ ও বাস্তব; দেবতা আমাদের নিকট অনন্ত, অনধিগম্য, অনায়ত্ত সুতরাং অসম্পূর্ণ। কিন্তু যিনি আমাদের প্রত্যক্ষ প্রিয়জন, তিনি আমাদের স্পর্শলোকে সুস্পষ্ট, আমাদের রসলোকে আনন্দ ও বেদনায় সুপ্রত্যক্ষ এবং অনুভূতিজ স্মৃতির পুনর্জাগ্রত জীবনে তিনি আমাদের নিকট বিচিত্র অথচ সম্পূর্ণ, বিস্ময়কর অথচ আয়ত্তগম্য। আজ লেখিকার সহিত পৃথিবীর বহু নরনারী কণ্ঠ মিলাইয়া বলিবেন, "আমরা যে তাঁহাকে মানুষরূপেই জানিয়াছিলাম, পরমাত্মীয়ের মত জানিয়াছিলাম।"

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে রচিত গ্রন্থগুলির সহিত 'পুণ্যস্মৃতি'র তৃতীয় পার্থক্য এই যে সেগুলির প্রাণ হইল ভগবান্ রামকৃষ্ণের অমৃত-বাণী—তাঁহারই অকৃত্রিম সারল্যমণ্ডিত অতুলনীয় ভাষায়, অতি সুমধুর ছন্দে বিবৃত ভক্তের সত্তায় ভগবানের উপদেশবাণী। 'পুণ্যস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথের কোন ভাগবতী বাণী নাই। রবীন্দ্রনাথ এখানে—

"যিনি সকল কাজের কাজী,
মোরা তাঁরই কাজের সঙ্গী;
যাঁহার নানা রঙের রঙ্গ
মোরা তাঁরই রসে রঙ্গী।"
[অচলায়তন]

তিনি এখানে অক্লান্তকর্ম্মী, তিনি কবি, তিনি চালক, তিনি শিক্ষক, তিনি আমাদের খেলার সাথী, উৎসবের নায়ক, হাস্যকৌতুকপরায়ণ বন্ধু এবং নিতান্ত ঘরোআ মানুষ। এবং 'পুণ্যস্মৃতি'তে এই অতি সাধারণ সামান্য মানুষ রবীন্দ্রনাথের সুখদুঃখ স্নেহপ্রীতি শোক-আনন্দ বেদনা ও কৌতুকের ধারা কলচ্ছন্দে স্বচ্ছন্দে তাঁহার বিচিত্র স্মৃতি বহন করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, এবং এই সকলের অন্তরাল হইতে অসামান্য বিরাট্ পুরুষ রবীন্দ্রনাথের মহান্ চরিত্র রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। সরস গল্প ও সামাজিক উপন্যাস রচনায় কুশলশিল্পী লেখিকার লেখনী 'পুণ্যস্মৃতি'-তীর্থে আসিয়া ধন্য হইয়াছে এবং আপন শক্তিকে সার্থক করিয়াছে। সহজ মানুষ মহাকবির এই নির্ম্মল প্রতিকৃতি ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে এবং অপরিচয়জনিত সংশয়ে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার কাব্যকে যাঁহারা দুর্বোধ ও প্রহেলিকাচ্ছন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তিনি সহজ সরল আপনার জন হইয়া ধরা দিবেন।

পুস্তকখানির আয়তন ৫২৮ পৃষ্ঠা। সে হিসাবে ইহার মূল্য ২৸৹ এই দুর্মূল্যের বাজারে সস্তাই বলিতে হইবে।

লেখনীর সরসতা, লেখিকার ঐকান্তিক নিষ্ঠা, এবং বিষয়বস্তুর আকর্ষণী শক্তি পাঠকের চিত্তকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে।

'পুণ্যস্মৃতি'তে-উক্ত মানুষগুলির পরিচয় আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বিবৃত করিলে এবং তারিখ ও বর্ষগুলি আরও একটু বিশেষ করিয়া নির্ণীত ও নির্দ্দিষ্ট হইলে ইহার ঐতিহাসিক মূল্য আরও বর্দ্ধিত হইবে। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা করা চলিবে।

পরিচ্ছেদে বিভক্ত না করিয়া, ধারাবাহিক স্মৃতির স্বাভাবিক নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু ইহাতে পাঠকের স্মৃতি-বিপর্য্যয় ঘটাইয়া ঘটনাগুলির পারম্পর্য্য বিস্রস্ত ও ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। "গীতাঞ্জলি", "বলাকা", "বিশ্বভারতী" ও "শেষ সপ্তক" এইরূপ গুটিচারেক ছেদরেখা টানিলে পাঠকসাধারণের পক্ষে এই বিচিত্র ঘটনাবহুল স্মৃতিধারাকে আয়ত্তগম্য করা অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য হইবে। পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহাও করা চলিবে।

---

* "পুণ্যস্মৃতি"—শ্রীসীতা দেবী। প্রাপ্তিস্থান—প্রবাসী কার্য্যালয়। মূল্য ২৸৹ আনা।

ব্ল্যাক-আউট

শ্রীপ্রতিমা ঠাকুর

রাসবিহারী এভেনিউ-এর কাছাকাছি ছিল 'মিলনী' ক্লাবের বাড়ি। শনি, রবিবার সন্ধ্যায় সেখানে মেম্বারদের সমাগম হ'ত। আজকাল ব্ল্যাক-আউটের দিন বলে ক্লাব সকাল সকাল বন্ধ হয়, পূর্বের মত জমাট ভাব আর নেই। ইভ্যাকুয়ীদের দলে পড়ে অনেক সভ্য বিদেশে চলে গেছেন, বিশেষত মহিলা সভ্যরা। তবে দু-চার জন সাহসী যাঁরা সাইরেণের আওয়াজ অবজ্ঞা ক'রে এখনো বুক ফুলিয়ে শহরের পথেঘাটে চলে বেড়াতেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সেদিন ক্লাবে একটি সভার আয়োজন করেছিলেন। নীলিমা ছিল সেই ক্লাবের সেক্রেটারী। আপিসে আজ তার অনেক কাজ পড়েছে; মেম্বারদের নামের লিষ্ট, চাঁদার হিসাব করতে সে আজ ভারি ব্যস্ত, আর পাঁচ মিনিট অন্তর টেলিফোনের বেল কেবলই ক্রিং ক্রিং করছে, আর পরমুহূর্তে 'হ্যালো' 'হ্যালো'।

নীলিমা হাবেভাবে বেশ কেজো, লম্বায় সে বাঙালী মেয়ের চেয়ে কিছু দীর্ঘ, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। স্বভাবের গাম্ভীর্যে আর বুদ্ধির উজ্জ্বলতায় তার চেহারার মধ্যে একটু বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলেছে। পরনের মোটা খদ্দরের শাড়ী বেশ আঁটসাঁট ক'রে বাঁধা, চুলগুলি কিছু এলোমেলো ভাবে মুখের উপর এসে পড়েছে, চোখে রিমলেস চশমা, হাতে রিষ্টওয়াচ, গয়না ও কাপড়ের বাহুল্যবর্জিত দেহ। আজকালকার দিনে প্রসাধনের ভিতর অবহেলার লক্ষণ কিছু না থাকলে বুর্জুয়া-শ্রেণী থেকে নাম কাটানো যায় না, তাই তার বেশভূষার মধ্যে ছিল কিঞ্চিৎ বৈরাগ্যের আভাস।

ক্লাবের আর এক মহিলা সভ্য বীণা দেবী সম্প্রতি একখানি নতুন নাটক লিখে সভ্যমহলে খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি গোঁড়া হিন্দুঘরের মেয়ে, বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান, তাই পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েছিলেন। তাঁর মায়ের আশা ছিল কোনো রাজপুরুষের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে কৃতার্থ হন। অবশেষে বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল, একদিন বিয়ে হ'ল তার এক আই-সি-এসের সঙ্গে; সেই সঙ্গে বীণার বিলেত যাবার সুযোগ ঘটল।

বিলেত গিয়ে বীণা আর কিছু না হোক সেখানকার বর্তমান যুগ-উপযোগী হাবভাবগুলি শিখে এল। য়ুরোপীয় কালচারের শাঁসটি নেবার ক্ষমতা তার ছিল না কিন্তু বাইরের খোলসটা পরেই সে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করল। সে যখন ফিরল ঠিক যেন একটি প্যারিসিয়ান লেডী।

তার একটু স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল লেখবার। এই কারণে পুরুষমহলে সে বেশ পসার জমাতে পারত। পুরুষরা আর কিছু না হোক মেয়েদের পিঠ থাবড়াতে পারলে খুশী হয়, আর এমন মেয়ের অভাব নেই যারা ঐ কথার উপর আস্থা করে নিজেকে একজন মস্ত জিনিয়াস ভাবতে থাকে। বীণার হয়েছিল সেই দশা;—সে স্বপ্ন দেখত তার প্রতিভার আলো সমাজের অন্ধকার দূর করবে।

তার চেহারাটা মন্দ নয়, অন্তত চটক আছে, আর আছে তন্বী দেহ যা এখনকার দিনে পছন্দ। সলিলা ছিল তার বন্ধু, সেই প্রথম তাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিল। মিলনীর মেম্বার হওয়া সম্বন্ধে স্বামীর মত ছিল না, সেও ইতস্তত করছিল, এমন সময় সলিলা এসে একদিন বললে, "তুমি লোকের কথায় ভড়কাও কেন, লোকে কী না বলে, ওসব চাল কিন্তু এখনকার মেয়েদের পোষাবে না। তোমার মধ্যে যে শক্তি আছে সে কি শেষে সামাজিক চাপে পড়ে মারা যাবে। এই যে সংস্কারের বন্ধন তার থেকে মেয়েদের মুক্তি না দিলে আমরা দাঁড়াতে পারব না ও সব সংকীর্ণতা ভেঙে ফেলে দাও, বেরিয়ে এসো সামাজিক গণ্ডী থেকে, তোমার মধ্যে প্রতিভা আছে সেটি বিকশিত হোক।" তার পর দিন স্বামীকে না জানিয়ে বীণা মিলনী ক্লাবে নাম লিখিয়ে মেম্বার হ'ল।

আজ অনেক দিন পরে ক্লাবের অধিবেশন হবে। তাই সলিলা তার যাবার পথে বন্ধুকে তুলে নিতে এসেছিল। বীণা ছিল তখন সাজঘরে, সলিলা তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। বীণা যখন বেরিয়ে এল তার চেহারাটা অনেক বদলে গেছে—সলিলা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'বাঃ! বেশ দেখাচ্ছে তোকে—তোর মধ্যে সত্যি একটা আর্টিস্টিক জিনিয়াস আছে। যাতে হাত লাগাস তাই দিস বদলে।'

বীণার পরনে ছিল রুপালী পাড়ওয়ালা নীলাম্বরী ঢাকাই, গলায় একগাছি মুক্তার মালা, মুখে মেখেছিল মোলায়েম ক'রে একটু রং যাতে বর্ণের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে দিয়েছিল, আঁকা ভুরুর ছায়া পড়েছিল চোখের পল্লবের কোলে, তাতে তার দৃষ্টির মধ্যে এনে দিয়েছিল একটা গভীর আবিষ্টতা, খোঁপার পাশ থেকে ঝুমকো ফুলের গুচ্ছ ঝুলে পড়েছিল গালের পাশ দিয়ে, দেখাচ্ছিল তাকে 'ছবি ছবি'। সলিলার প্রশংসাতে সে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করল। বীণার পয়সা ও রূপ আছে আর আছে সাহস। এদিকে কুমারী সলিলা জীবনের রসাস্বাদে চিরকাল বঞ্চিত, তাই তার মনটা হয়ে-উঠেছে স্বার্থপর। অন্যের ভিতর দিয়ে নিজের বঞ্চিত আনন্দ উপভোগ করে নেওয়া ছিল তার স্বভাব। অভাবী মন সবসময়েই ভিক্ষু, তাই কারুর পরিপূর্ণ সুখ সে সইতে পারত না। বস্তুত তার প্রকৃতি ছিল কেজো, তাই তার উদ্দামতা সংযত হ'ত যখন সে বাস্তব জগতে এসে ঠেকত। একেবারে নিজেকে দেওয়া সেটাও ছিল তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, অথচ তার ভিতর-কার অতৃপ্ত বাসনা মনকে হুতাশে পূর্ণ করে তুলত। সেই জন্য পরচর্চ্চা, দৈনন্দিন খুঁটিনাটির অযথা আলোচনা তার মনকে আকর্ষণ করত।

যখন সলিলা ও বীণা এসে ক্লাবে পৌঁছল, তখন নীলিমা আপিস নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে দেখতে দেখতে প্রায় খ্যাতনামা সকল মেম্বারই উপস্থিত হয়েছেন। কমিউনিষ্ট প্রিয়রঞ্জন, লেখক বিমলেন্দু, গায়ক অবনী ইত্যাদি সুধীজন সমাগমে বসবার ঘর ভরে উঠেছে। অবনীবাবুর গানের গলা আছে, কিন্তু ম্যানারিজম আছে বলে সকলের আবার পছন্দও হয় না। অথচ অনেক স্থলে তিনি প্রশংসাও পেয়ে থাকেন, এই সব লোকের এক শ্রেণীর মেয়ে শিষ্যও জুটে যায়, যারা ভাবপ্রবণতার ইন্ধন জোগায়।

কমিউনিষ্ট প্রিয়রঞ্জনবাবু খামখেয়ালী লোক। যাঁর সঙ্গে তাঁর মতের মিল হবে না তার উপর তিনি খড়্গহস্ত, যেন তিনি ভারতের হর্তাকর্তা। বিচারবুদ্ধির চেয়ে উদ্দামতাই তাঁকে কাজে প্রবৃত্ত করায়। ভাবখানা তাঁর এমনই যেন তেত্রিশ কোটি লোকের স্বাধীনতা তাঁর উপর নির্ভর করছে। তিনি স্থান-কাল-পাত্র বিচার না ক'রে রাশিয়ান রাজনৈতিকদেরই উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছেন। একদিকে তাঁর নিজের উপর যেমন অগাধ বিশ্বাস, অপরের উপর তেমনই ততোধিক পরিমাণেই আস্থাহীনতার পরিচয় দেন। তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকে লাঠিটা এক কোণে রেখে, টেবিলের উপর থেকে কতকগুলি মাসিক পত্রিকা তুলে নিয়ে পাতা ওন্টাতে লাগলেন। লেখক বিমলেন্দু এদিকে মাদ্রাজী ফ্যাসানে গলায় চাদর জড়িয়ে একটু শৌখিন কায়দায় ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। বিমলেন্দুবাবু এখনকার দিনের কবি, ছন্দের বন্ধন থেকে কবিতাকে মুক্তি দেবার জন্য তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন। বন্ধনমুক্তিই হ'ল এ যুগের আদর্শ। ইলিয়ট, স্পেণ্ডর, ডেলুইস্ তাঁর হাতে হাতে ঘোরে। সাহিত্যে রিয়ালিজম্ আনবার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাই চায়ের দোকান থেকে শুরু ক'রে আস্তাকুঁড়ের আবর্জনার মধ্যেও তিনি রঙবেরঙের স্বপ্ন দেখে থাকেন। মেয়েদের সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর সবসময় তর্ক হয়, অবশেষে তর্কের শেষ সীমায় এসে তিনি বলেন,—মেয়েরা সাহিত্যের কিছু বোঝে না।

এঁরা সকলে যখন একে একে এসে পৌঁছচ্ছেন অন্য দিকে সলিলা সে সময় সিঁড়িতে ওঠবার পথের ধারে একটা বেঞ্চির উপর কোণঠাসা হয়ে বসে; একজন মেয়ে মেম্বারের কাছে নতুন আগন্তুক মঞ্জুলার আদি-অন্ত খোঁজ নিচ্ছিল। বিমলেন্দুর সঙ্গে মঞ্জুলার ঘনিষ্ঠতা সলিলার চোখ এড়াতে পারে নি, কিছুদিন ধরেই সে এই দু'জন সভ্যের উপর বেশ একটু নজর রাখত। সলিলার প্রকৃতিই ছিল কোন জিনিসের পূর্বাভাস পেলে তার সত্য একেবারে নির্ধারিত করে নিত, তাই মঞ্জুলা সম্বন্ধে তার অত্যন্ত মাথাব্যথা। তাদের খবরের জন্য কৌতূহলী মন তার সর্বদাই জাগ্রত, এই নিয়ে মেয়েমহলে বেশ একটু আলোচনার আবহাওয়া সৃষ্টি হ'ত, গাঁয়ে-মানে-না-আপনি-মোড়ল ভাবখানা নিয়ে সভ্য মহলে হাসাহাসির বিরাম ছিল না।

মঞ্জুলা ভালমানুষ, লাজুক মেয়ে; থাকে সকলের থেকে দূরে দূরে, আত্মপ্রকাশের ভয়ে সতত সংকুচিত একটি সহজ আত্মগৌরব তাকে রেখেছে ঘিরে। তাই তার নাগাল পাওয়া সাধারণের সহজ হয় না। ক্লাবের সকলে তাকে সোফিষ্টিকেটেড মনে করে থাকে, তার বড় বড় চোখের ত্রস্ত দৃষ্টি এড়াতে পারে নি কবির নজর, সেটা সকলেই লক্ষ্য করেছিল।

সব মেম্বাররা মিলে তখন ড্রইংরুমে জটলা চলছিল। আজ বর্ষার দিনে সাঁতলা ভাজার আয়োজন আছে, এই পরিবেশন করতে মেয়েরা ব্যস্ত; এই সুযোগে ড্রইংরুমে দূরের কোণে একটা কৌচের উপর বসে সভায় যোগ দেবার আগে বীণা লিপষ্টিকটা লাগিয়ে নিচ্ছে। তার ছোট হাতব্যাগ কোলের উপর খোলা, তার থেকে ছোট কৌটো বের ক'রে পাউডারের থোপনাটা মুখে ঘষে নিল।

বাদামী প্যাটার্নের আয়নাটা এক পাশে ধরে ঘাড় বেঁকিয়ে আড়-আড় চোখে পাশের মুখখানার দিকে ভাল ক'রে তাকাল। তার মন বললে—এইবার প্রস্তুত। এমন সময় কে পিছন থেকে এসে চোখ টিপে ধরল। বীণা তার হাতের চুড়িগুলি গুনতে গুনতে বললে, "বুঝেছি কে, ধূর্তমী করে আর কাজ নেই।" নীলিমা সামনে দাঁড়াল, বলল—"ভাই তোমাকে বইখানার জন্য কনগ্রাচুলেট না ক'রে থাকতে পারছি না। হ্যাঁ ভাই লেখিকা, তুমি আমাদের সনাতনী প্রথাগুলিকে স্বর্ণ শৃঙ্খল আখ্যা দিয়ে বড় নরম ক'রে দিয়েছ; মনু ব্যাচারী কি তোমাকে ঘুষ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন? যে আইন তিনি ক'রে গেছেন সে তো আরামের নয়, এ যে ঘোরতর ফাঁস; তা বেশ, খুশী হয় তাকে সোনাই বল আর হীরেই বল, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই,—শৃঙ্খল তো বটে; সোনার শৃঙ্খল পরলেও লোহার শৃঙ্খলের মত ফাঁস লাগে, তাতে একটুও কসুর হয় না গো। তবে কর্ণকুহরে স্বর্ণ-শৃঙ্খল বললে যদি মধুর শোনায় তো শোনাক, তাতে এসে যায় না; ফাঁসটা সমানই বজ্র-কঠিন হয়।"

বীণা কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল এমন সময় কমরেড্ প্রিয়রঞ্জনবাবু সামনে এসে বীণাকে নমস্কার ক'রে দাঁড়ালেন, "ধন্যবাদ, বীণা দেবী, আপনার বইখানার জন্য; লিখেছেন তো বেশ তবে ব্যাচারা পুরুষগুলোর মুণ্ডপাত করে আপনাদের কী লাভ হয় বলুন তো? আমরা তো সবসময় আপনাদের অনুরক্ত! দেখুন আমরা কী রকম উদার; আপনারা যখন অভিশাপ দেন তখন আমরা বলে উঠি,

"আমি বর দিনু দেবী তুমি সুখী হবে
ভুলে যাবে সর্ব দুঃখ বিপুল গৌরবে।"

চতুর্দিক থেকে মেয়েদের হাসির রোল উঠল, তার মধ্যে কোনো-একজন উচ্চকণ্ঠে বললে, "আপনারা তো কলির বামুন, আপনাদের বর দেবার যোগ্যতা কোথায়। আমরা তো চাই না আপনাদের বর।" "বিমলেন্দু এই সময় চৌকিটা একটু প্রিয়রঞ্জনের কাছঘেঁসা ক'রে টেনে এনে মুচকে হেসে বললেন, "কমরেড ভায়া, শুধু সাধারণভাবে নয় আপনাদের উপরও কটাক্ষপাত আছে।" প্রিয়রঞ্জন—"আসল কী জান, মেয়েরা যতই বড়াই করুক, শেষ পর্যন্ত কন্‌ভেনশান ছাড়িয়ে বেরতে পারে না, কোথায় একটুখানি খোঁচ থেকে যায়।"

গায়ক অবনী—

যথার্থ বলতে কী ওঁরা যে-রকম কমল-কলিকা, পুষ্প-লতিকা, উজ্জয়িনীর কালে কালিদাসের মেঘদূতের মধ্যে ছিলেন, সেখানে ওঁদের মানাত ভাল। করতালি দ্বারা নৃত্যপরা শিখিকে সঙ্গত দিয়ে, মুখে লোধ্র-রেণু মেখে, প্রিয়জন উদ্দেশ্যে লিপি রচনা ক'রে মেঘের দূতকে পাঠাতেন; তার মধ্যে রোমান্স ছিল, মনে রঙ লাগাত। আর সেই জায়গায় এখন ভ্যানিটি ব্যাগ, লিপষ্টিক একই ছাঁদের আঁকা ভ্রূ। এখনকার রিয়লিজমের তলায় ওঁরা বড় ম্লান হয়ে গেছেন, একেবারে ফিকে।

বীণা—

হ্যাঁ, তা তো বটেই, পুরুষরা আমাদের যতই কমল-কলিকা আর লতিকা বিশেষণ দিন, কিন্তু বাস্ রে! এই এক একটি লতা যে জড়ায়,—শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হয়; আর মশাইদের টুঁ শব্দটি করবার যো থাকে না, আপনাদের এই তো বীরত্ব। আর রিয়লিজমের যুগ বলে দুঃখ ক'রে কী হবে বলুন, এ তো আপনাদেরই আমদানি; করতালি এখন পিকেটিং আর সাবমেরিণের কাজে লেগেছে, তার উন্মাদনা উজ্জয়িনীর দিনের চেয়ে কম হবে না, মনকে সান্ত্বনা দিতে পারেন—জীবনটা একেবারে ফাঁকি নয়।

নীলিমা—

এই যে সরলা দুর্বলা নিরীহ অবলারা—আমরা বড় কম নই। পুরুষরা নিজেদের মন ভোলাবার জন্য যতই না নমনীয় বিশেষণ দিক বিধাতার তৈরি আপনাদের মত অচল এঞ্জিনগুলিকে সচল করবার জন্য মেয়েরাই বিশ্বকর্মার কারখানায় বেকার খাটুনির ভার নিয়েছে।

লেখক বিমলেন্দু—

(প্যাট্রনাইজিং ভাবে) এটা বলতেই হবে, মেয়েরা এখন অনেকখানি এগিয়ে এসেছেন তাঁদের হাসি-কান্নার মধ্যে এখন তবু হৃদয়ের সন্ধান মেলে; একেবারে ক্যামেরা-তোলা ছবি তাঁরা আর নন।

প্রিয়রঞ্জন তাঁর রাশিয়ান কায়দায় ছাঁটা দাড়ির ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে কণ্ঠে মিঠে রস এনে বললেন—

আহা, ঘোমটার আড়ালে ব্যঞ্জনপরায়ণা পল্লীবালার স্বহস্ত-পাক খ্যাসাড়ির ডাল আর পান্তা ভাত সংযোগে কচি আমের অম্লমধুররসিত রসনার চটুল বাক্যবাণ একেবারে থেমে গেছে।—এই সব ক্লাসিক যুগের নায়িকাদের এখন-কার দিনে বড় দুর্গতি।—"পরের মুখের হাসির লাগিয়া অশ্রুসাগরে ভাসা"র দিন এখন গত। বিমলেন্দু ভায়া, তাদের কবরস্থ করবার গান তো আপনারই জানা আছে, আপনি যে এ যুগের কবি।

বিমলেন্দু—

এই সব পরিবর্তনের তলায় তলায় যে সেক্স-সাইকলজির কাজ চলছে, সেটা আপনারা লক্ষ্য করেছেন কি?

সলিলা—

আর রাখুন আপনাদের সেক্স-সাইকলজির বোলচাল। আপনারা বৃথাই সাইকলজি পড়ে মাথা ঘামিয়ে মরেন, শেষে একটা সামান্য মেয়ের মন বুঝতে হাঁপিয়ে ওঠেন—আর সেই সাধারণীই হয় তো সাইকলজির "স" না জেনেও বড় বড় ডিগ্রিওয়ালা গ্রাজুয়েটদের জলের মত বুঝে ফেলে। এ তত্বটা জানবার জন্য আপনারা ঐ ফ্রয়েডের বইয়ের পাতাগুলো না উলটে ঘরের স্ত্রীদের শরণাপন্ন হন তো ঢের কাজ হয়।

নীলিমা কথার বাঁকটা একটু ফিরিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে সকলকে থামিয়ে দিয়ে বললে—আচ্ছা কমরেড মশায়, আপনাদের মার্কসিজমের দিনপঞ্জীর ভিতর কী তথ্য লেখা আছে বলুন তো? রাশিয়ার অনুরূপ একটি রাষ্ট্রতন্ত্র গড়ে তুলতে চান তো কিন্তু দেখবেন তা হবে না। India তো আর আপনার Russia নয়। ভারত কখনও অনুকরণ করে নি, আজও সে করবে না। তার স্বভাবের মধ্যে এমন একটি স্বকীয়তা আছে যে সে আপন পথ খুঁজে নেবে।

প্রিয়রঞ্জন তাঁর জোড়া ভ্রূকে তীব্রভাবে কুঁচ্‌কে বলে উঠলেন—

মার্ক্‌সের কথাগুলিতে আপনারা মনোযোগ দিলে বুঝবেন তিনি জগতের কত উপকার করে গেছেন, ধনিক-সম্প্রদায় অর্থের জোরে বলিষ্ঠ হয়ে উঠে গরীব মজুরদের মজুরি অপহরণ ক'রে নিজেদের বিলাসিতা চরিতার্থ করত। এই ধনবৃদ্ধির সঙ্গে ক্যাপিটেলিষ্টদের বলবৃদ্ধি হয়েছিল সেই জন্য সোভিয়েট যুনিয়ান মানুষের ন্যায্য অধিকার সমানভাবে বিভক্ত করে দিয়ে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সমাজ রাষ্ট্র সংস্কৃতিতে মানুষের সমান অধিকার দাবি করেছেন।

বীণা—

সেটা তো বুঝতে পারছি ideaটাকে তো আমরা অবজ্ঞা করছি না। কিন্তু আপনার মত সর্বভূতে মার্কসিজ্‌ম্ দেখতে দেখতে অবশেষে ইজ্‌ম্‌টাই না আমাদের পেয়ে বসে, গোঁড়ামি জিনিসটা দুর্বল, মনকে সংকীর্ণ করে, সেটা হিন্দু আইনের চেয়ে কিছু কম হবে না। বাসুকীর নাগপাশের মত ঐ ইজ্‌ম্‌গুলোকে বড় ডরাই।

কবি বিমলেন্দু হাঁসের মত একটু গলা উঁচু করে তাঁর মিহি কণ্ঠে একটু শ্লেষ টেনে এনে বললেন—মশায়, আপনার মার্ক্‌সাহেব বুর্জোয়াদের ভস্ম করতে গিয়েই তো এই লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়েছেন,—

"ক্যাপিটেলিষ্ট ভস্ম করে করিলে এ কি কমিউনিষ্ট
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে
বিপুল তার ধনের স্পৃহা কামানে ওঠে নিশ্বাসি
গর্ব তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

ভরিয়া ওঠে নিখিলভব ডিক্‌টেটারির গর্জনে
সকল দিক কাঁপিয়ে ওঠে আপনি।"

বাস্ আর না—"

সকলে "না বলুন বলুন" ব'লে হাস্য ক'রে উঠলেন, একজন বলে উঠলেন, 'কবির মদনভস্মে'র ছন্দে ধনিকভস্ম বেশ খাপ খেয়েছে।

বিমলেন্দু—

সত্যি, এই যুদ্ধে কমিউনিষ্ট, সোসালিষ্ট, ব্যুরক্রেসী সকলেরই পরীক্ষা হয়ে যাবে, কে কত টেঁকসই, এর থেকে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। আমাদের জীবদ্দশাতেই একটা কিছু দেখব, কেন-না ষ্টালিন বা হিট্‌লার সহজে মরবার নয়। ফ্রান্স সব চেয়ে বুড়ী হয়েছিল তাই সে টিকতে পারল না। সাম্রাজ্যবাদের গোড়াতেই এবার ঘা পড়েছে। মোগল সাম্রাজ্যও ত কম বড় ছিল না, তারও পতন হ'ল। তবে আমাদের মত য়ুরোপ এলোমেলো নয়। ওদের মধ্যে একটা একতা আছে, সেদিক থেকে এই সব ভেঙেচুরে যা থাকবে ওরা যদি এক হ'তে পারে ত তাই দিয়ে একটা মস্ত জাত গড়ে তুলবে। কবির উত্তেজিত স্বরের সঙ্গে তাঁর গোল চশমার উপর ইলেকট্রিক আলোর দীপ্তি ঝক ঝক করে উঠেছিল।

মঞ্জুলা স্থির কণ্ঠে বলে উঠল—আপনি যে আমাদের এলোমেলো বলছেন কিন্তু এত বড় নিঃসহায় আমরা কখনও ছিলুম না। আজ আমাদের এতটা পঙ্গু করে দিয়েছে কিসের জন্য? আমরা পরের হাত থেকেও নিজেদের রক্ষা করতে পারছি না এবং নিজেদের কাছ থেকেও আপনাদের বাঁচাতে পারছি না। এমন একটা প্রণালীতে আমরা বাঁধা, যাতে করে আমরা ক্রমশ দুর্বল ও নির্জীব হয়ে পড়ছি।

নীলিমা—

আজকের দিনে ভারত যে ত্র্যহস্পর্শের মধ্যে ধরা পড়েছেন তাতে ফল কি হবে বলা শক্ত। বৃহস্পতি গোসা ক'রে ছুটি নিয়েছেন, গ্রহের উপর শনির দৃষ্টি প্রবল। তরী ভাসানো গেছে, কোন্ কূলে গিয়ে ভিড়বে তা বলা যায়

না। আর যাই হোক আমরা যেন আজকের দিনে পৃথিবীর এই মেছোবাজারের হাটে পাইকিরি দরে বিকিয়ে না যাই ; আমাদের যা বলবার তা চূড়ান্ত ব'লে যেন মরতে পারি।

বিমলেন্দু—

বাস্তবিক, সমস্ত সংসারটা আজকাল এমন অন্ধকার হয়ে উঠেছে কিছুরই উপর যেন আস্থা থাকছে না, জীবনটাকেই যেন মনে হয় বিধাতার একটা মস্ত তামাশা। দেখ না পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার গঙ্গাযাত্রার পালায় এবার স্থবির হ'লেও, নাম মাহাত্ম্য শোনাবার ডাক পড়েছে সেই প্রাচীন সভ্যতার ; তাদেরি এবার গা ঝাড়া দিয়ে ওঠবার পালা। শ্মশানের ভস্মের ভিতর অবশেষে মানুষের ডাক তারাই হয়ত শোনাবে পৃথিবীকে।

অবনী—

এখন থেকেই ত আমাদের সোসালজিকাল পরিবর্ত্তন বেশ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। সেও কম নয় ; অনেক ভাঙা-চোরা চলবে, অনেক দিতে হবে, অনেক নিতে হবে, অনেক অনুকরণ অপহরণের পর মিলবে খাঁটি জিনিসটি। দেখ না, আজকাল ঘরে ঘরে রব উঠছে 'ডাক শুনেছি'। ডাক শোনাটা ভারতীয় ইন্‌স্‌টিংট্‌ বটে, বুদ্ধদেবও ডাক শুনে রাজত্ব ত্যাগ করেছিলেন, গোপিনীরাও বাঁশির ডাকে গোকুল ছেড়েছিল ; সেটা হ'ল দ্বাপরে। আবার সেই ডাক এল কলিতে, এবার বৈরাগ্য নয়, প্রেম নয়—এ যে রণভেরী। চিত্রাঙ্গদাদের এবার জয়জয়কার, ব্যাচারী আমরা শিশুপালক হয়ে গৃহচারী হব। বায়লজীর নিয়ম এবার সব বদলে যাবে, যুদ্ধের প বজ্ঞানীদের নতুন ক'রে মন্তব্য পাস করতে হবে।

প্রিয়রঞ্জনবাবু (সকলকে থামিয়ে দিয়ে),—আরে চুপ, চুপ! তর্ক আলোচনা এখন থাক্। শিশুপাল বধ মহাকাব্য না এখনই শুরু হয়ে যায়, শুনুন ত কান পেতে।—সকলে আতঙ্কিত হয়ে উঠল, কোথা থেকে একটি বুকফাটা কান্নার আওয়াজ অন্ধকারের বুক চিরে গুমরে গুমরে বে'রয়ে আসছে অস্ফুট ধ্বনিতে। সকলে বলে উঠল,—সাইরেণের আওয়াজ! নিরাপদ গৃহে যাওয়ার জন্য তখন দৌড়চ্ছে সকলে। এদিকে ঘোমটাটানা আলোগুলো সব অদৃশ্য হয়ে গেছে; চারিদিকে নি'বড় অন্ধকার, মানুষরা সিঁড়িতে হাতড়ে হাতড়ে নামছে। বাইরে তখন অনবরত বৃষ্টির ঝপঝপ শব্দ আর তারি সঙ্গে সাইরেণের মর্ম্মান্তিক ডাক। সেই ব্ল্যাক-আউটের আচ্ছন্নতার মধ্যে একজন আর-একজনকে কাছে টেনে বলছে—আপনি ভয় পাবেন না, আপনাকে আমি বর্ষাতি দিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেব। অন্ধকারে পরস্পরের সঙ্গ আরও নিবিড় হয়ে উঠে, মনে হ'ল, সেই অস্ফুট গাঢ় কণ্ঠস্বর যেন মানুষের এক অজানা পরিচয়।

তবুও হাসিবে ধরা

শ্রীকমলরাণী মিত্র

প্রতি দিবসের আলো, গানগুলি
হারায়েছে প্রতি রাতে,
কত আশা হায় ব্যর্থ-নিরাশে
ঝরেছে নয়ন-পাতে!
তবু ফুটিয়াছে ফুল,
নেমেছে জ্যো'স্নাধারা
বারে বারে তাই উন্মনা হ'য়ে তবুও দিয়েছি সাড়া॥

দুঃখ-দৈন্য রূঢ়তমরূপে
ফিরিতেছে ঘরে ঘরে,
কত ক্রন্দন, কত হাহাকার
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরে ;—
তবুও অমৃত-গান
গেয়েছি কণ্ঠ ভরি,
মুক্ত অসীম গগন-সাগরে বেয়েছি স্বপ্ন-তরী॥

থাক ক্ষয় ক্ষতি জীবন ভরিয়া,
থাক যত পরাজয়,
হারায় যদি বা হারাইয়া যাক
যাহা কিছু সঞ্চয় ;
তবুও হাসিবে ধরা
শারদ শুভ্র হাসি,
তাই তো নিখিল ভুবন-ভবনে বাজাই প্রেমের বাঁশি॥

আলোচনা

"অখিল-বঙ্গ কায়স্থ সম্মেলনে সভাপতির বক্তৃতা"

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

গত কার্ত্তিকের "প্রবাসী'তে অখিল-বঙ্গ কায়স্থ সম্মেলনে প্রদত্ত আমার অভিভাষণটি সম্পাদকীয় স্তম্ভে আলোচিত হয়েছে। আমার অভিভাষণটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়েছে তা আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা এবং সেটি নিয়ে আপনি আলোচনা করেছেন তা আমার আরও আনন্দের কথা। তার সম্ভবতঃ বিস্তৃত বিবরণ না পাওয়ায় ঐ আলোচনার এক জায়গায় একটু তথ্যঘটিত অসঙ্গতি ঘটেছে যা আপনার এবং 'প্রবাসী'র পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই।

আপনি লিখেছেন, আমি আমার অভিভাষণে রাউ কমিটি কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হিন্দু-বিবাহ-সম্বন্ধীয় বিলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং "তারই ফলে বোধ হয় সম্মেলন নিম্নমুদ্রিত প্রস্তাব ধার্য্য করেছেন।" কিন্তু বাস্তবিক তা হয় নি। আমার মুদ্রিত অভিভাষণ এই সঙ্গে একখানি পাঠাই। তাতে আমি হিন্দুসমাজের বল ও সংহতি বৃদ্ধির কথা আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃ রাউ কমিটির কথা উল্লেখ করি। আমি তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন মন্তব্যই করি নি এবং সম্মেলনে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে সে আমার অভিভাষণের ফলে নয়। যে সময় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল আমি সে সময় সভায় ছিলাম না, থাকলেও সভা মতাধিক্যে আমার মতবিরোধী কোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারতেন।

রাউ কমিটির প্রস্তাব বা হিন্দুনারীদের সম্পত্তিতে অধিকার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে মনে হয়, বর্ত্তমানে বিশ্বজগতে সমাজসংস্কারের দুটি ধারা আছে। একটি, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে, অপরটি সমষ্টির কাছে ব্যষ্টির স্বার্থ বলি দিয়ে। ঘটনার চাপে ইংলণ্ড প্রভৃতি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী দেশগুলিকেও শেষ পদ্ধতি অল্পবিস্তর গ্রহণ করতে হচ্ছে। আমাদের দেশে যদি আমরা এই নবযুগের আত্ম-সচেতন সমাজসংহতিকেই আদর্শ বলে মনে করি, তা হ'লে যে ব্যবস্থা আমাদের ভাঙনের দিকে এগিয়ে দেয় তা অনুচিত। অবশ্য এই সমাজসংহতির অজুহাতে অচলায়তন বজায় রাখার চেষ্টা সর্ব্বনাশকর, কেন-না এই নতুন সমাজসংহতি অচলায়তনের ঠিক বিপরীত, এই সংহতি কেবল যুক্তিতর্ক হ'তে উদ্ভূত সুস্পষ্ট সমাজবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে অন্ধসংস্কার লেশমাত্র থাকলেও চলবে না। কিন্তু যদি দেখা যায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভাঙনের মধ্য দিয়ে ছাড়া সেই নতুন সংহতি সামাজিক ভাবে জাগানো সম্ভব নয়, তা হ'লে ভাঙনের ব্যবস্থাই আমাদের নবযুগের সূচক। আমার মনে হয় আমাদের দেশে বিশ্বজগতের চাপে যে সমাজবিবর্ত্তনের রীতি আসা অনিবার্য্য এবং বিশ্বজগতে যা কল্যাণের আদর্শ বলে স্বীকৃত হয়েছে তা আমাদের কি ভাবে গ্রহণ করা চলতে পারে এই দিক্ দিয়ে বিচার করলেই রাউ কমিটির প্রস্তাবের প্রকৃত দোষগুণ নির্দ্ধারণ হ'তে পারে।

"প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ধর্ম্মসমন্বয়"

শ্রীকল্যাণী দেবী

গত আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধের এক স্থানে বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমান কবিদের হিন্দু দেবদেবীর সম্বন্ধে কবিতা রচনার উল্লেখ করেছেন এবং মুসলমান লেখকদের মধ্যে কবি 'আলওয়াল'কে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। 'আলওয়ালে'র লেখা গ্রন্থের নামোল্লেখ কালে লেখক 'পদ্মাবতী' কাব্যের উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, এই গ্রন্থ আরবী অক্ষরে ও বাংলা ভাষায় লিখিত। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। হিন্দী সাহিত্যে হিন্দী ভাষায় রচনাকারী মুসলমান কবির সংখ্যা কম নয়। এমন এক জন কবির নাম মলিক মুহম্মদ 'জায়সী'। ইনি 'জায়স' দেশে জন্মিয়াছিলেন, এবং ইনিই হিন্দী ভাষার একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'পদ্মাবত্'-এর রচয়িতা। এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই তিনি এইরূপে ঈশ্বরের স্তুতি করেছেন :—

> সুমিরোঁ আদি এক করতারূ।
> জেহি জিউ দীনহ্ কীনহ্ সংসারূ।
> কীন্হেসি ধরতী সরগ পতারূ, কীনেসি বরণ বরণ ঔতারূ।
> কীন্হেসি সপ্ত মহী বরমণ্ডা (ব্রহ্মাণ্ড)
> কীন্হেসি ভুবন চৌদহো খণ্ডা। ইত্যাদি

'প্রবাসী'তে উদ্ধৃত

> 'প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
> যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার।
> সৃজিলেক পাতাল মহী স্বর্গ নর্ক আর।
> স্থানে স্থানে নানা বস্তু করিল প্রচার।
> সৃজিলেক সপ্ত মহী এ সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড।
> চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজিল খণ্ড খণ্ড।'

কবিতাটি যে উপরিলিখিত কবিতারই অনুবাদ এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। অতএব 'আলওয়াল' যে এই 'পদ্মাবত্' বা 'পদ্মাবতী' কাব্যের মূল রচয়িতা বাঙালী কবি নন্ অপিচ অনুবাদক মাত্র, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এর বাস্তবিক রচয়িতা কবি মলিক মুহম্মদ 'জায়সী', যাঁর দুটি মাত্র গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত হিন্দীসাহিত্যানুরাগী ও প্রাচীন হিন্দী রচনার অনুসন্ধানকারীদের পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে এবং যার জন্য আজ মলিক মুহম্মদ 'জায়সী'র নাম হিন্দী সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই গ্রন্থের একটি 'পদ্মাবত্' বা 'পদ্মাবতী' ও অন্যটি 'অখরাবট্'। এই দ্বিতীয় গ্রন্থটির নাম হিন্দী সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে সুপ্রসিদ্ধ হ'লেও বই-খানি আজ কালের অতল জলে তলিয়ে গেছে। কিন্তু 'পদ্মাবত্' আজ হিন্দীভাষানুশীলনকারী, হিন্দীপ্রেমী জনসাধারণের প্রিয় কাব্যগ্রন্থ। এই বইয়ের কিছু অংশ এ বৎসর আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষার একটি কাব্যগ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে, যে পুস্তকের নাম 'সংক্ষিপ্ত জায়সী' ও সঙ্কলন-কারীর নাম শম্ভুদয়াল সক্সেনা।

"সমাজ ও এষণা"

(১)

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

গত আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে "সমাজ ও এষণা" প্রবন্ধে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় অশোকের প্রথম শিলালেখে (Rock Edict I) লিখিত "ন চ সমাজো কতব্বো" অংশে 'সমাজ' শব্দের অর্থ 'প্রীতিসম্মেলন' ধরিয়া লইয়াছেন এবং "সমাজম্হি বহুকং দোষং পশ্যতি দেবানম্ পিয়ো পিয়দশী রাজা" উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, "সেকালে এইরূপ প্রীতিসম্মেলনে বিরাট ভোজের আয়োজন হইত এবং তাহাতে বহু প্রাণী নিহত হইত। তাহাই নিষেধ করিবার জন্য অশোকের শিলালিপির এই নির্দেশ।"

আমার বক্তব্য এই যে, অশোকের শিলালিপিতে "ন চ সমাজো কতব্বো" অংশে 'সমাজ' অর্থে "প্রীতিসম্মেলন" নহে। 'সমাজ' অর্থে রঙ্গস্থল (মল্লভূমি) ["মল্লানামশনিঃ……রঙ্গং গতঃ সাগ্রজ"—ইতি ভাগবতে ১০।৪৩।১৭ শ্লোকে 'রঙ্গ' শব্দ দ্রষ্টব্য]; এইরূপ রঙ্গস্থলে বহু দর্শকের সমাগম (সম + √অজ) হইত এবং সেস্থানে মল্লেরা পরস্পর বিগ্রহ করিয়া অথবা ধৃত বন্য জন্তুর সহিত যুদ্ধ করিয়া স্ব-স্ব বীর্য্যের পরিচয় দিতেন। ইহাতে মানুষের ও অন্য প্রাণীর জীবননাশের সম্ভাবনা ছিল বলিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মে নবদীক্ষিত রাজা অশোক তাহা নিষিদ্ধ করিলেন। এই 'সমাজ' হইল ইংরাজী শব্দে Amphitheatre।

কিন্তু তদানীং বর্ত্তমান অন্যবিধ 'সমাজ' অশোক অনুমোদন করিলেন, যথা—"অথি চাপি একা সমাজা (সাধুমতা) বহুমতা দেবানাম্ পিয়স পিয়দশিনো রাঞো"। এই অন্যবিধ 'সমাজে'র অর্থও রঙ্গস্থল—কিন্তু ইহা নাট্যসমাজ বা ইংরাজী শব্দে Theatre; এই রঙ্গস্থলেও বহু দর্শকের সমাগম (সম + √অজ) হইত এবং নটসম্প্রদায় রসপরিবেশনের দ্বারা দর্শকের মনে আনন্দের সৃষ্টি করিতেন। এই 'সমাজ' অর্থাৎ অভিনয়-স্থান "দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা" অনুমোদন করিলেন।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে প্রাচীন ভারতে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের আসন শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজান হইত এবং পূর্ব্ব অপেক্ষা পশ্চাতের শ্রেণী উচ্ছ্রিত বা কিছু উঁচুভাবে অর্থাৎ আজকালকার গ্যালারীর আকারে সাজান হইত এবং প্রেক্ষাগৃহের সম্মুখে কুশীলবগণের অভিনয়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত। অনুমান করা যাইতে পারে যে মল্লভূমিতেও দর্শকের সুবিধার জন্য আসন অনুরূপ ভাবে সাজান হইত। কাজেই theatre বা amphitheatre দুই রঙ্গস্থলকেই সমাজ বলা চলিতে পারিত।

রঙ্গস্থল, অভিনয়স্থান, নাট্যশালা বা আজকালকার দিনের ক্লাব (club)-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অর্থে 'সমাজ' শব্দের প্রয়োগ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায়; যথা—

১। বাৎস্যায়ন-কামসূত্রে (কাশী) ১।৪।২৭,২৮ (পৃ. ৪৯, ৫০) —"পক্ষস্য মাসস্য বা প্রজ্ঞাতেঽহনি সরস্বত্যা ভবনে নিযুক্তানাং নিত্যং **সমাজঃ**"। পক্ষের বা মাসের নির্দ্দিষ্ট দিনে সরস্বতী দেবী দ্বারা অধিষ্ঠিত গৃহে কুশলব্যক্তিগণের নিয়মিতভাবে 'সমাজ' বা অভিনয়াদি হইবে।

"কুশীলবাশ্চ আগন্তবঃ প্রেক্ষণকমেষাং দদ্যুঃ"—বিদেশ হইতে আগত আগন্তুক অভিনেতারাও এখানে তাহাদের অভিনয় (প্রেক্ষণকং = Show) দেখাইবেন।

২। কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্রে (মহীশূর) ২।২৫—

"উৎসব-সমাজ-যাত্রাসু চতুরহস্সৌরিকো দেয়ঃ"

পুনঃ ১৩।৬—

"দেশ-দৈবত-সমাজ-উৎসব-বিহারেষু চ ভক্তিমনুবর্ত্তেত।" জেতা বিজিত দেশের দেশাচার দেবতা 'সমাজ' উৎসব ও বিহারের প্রতি সম্মান
[illegible]

৩। রামায়ণে (বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেস) ২।৬৭।১৫

"নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনটনর্ত্তকাঃ।
উৎসবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্দ্ধন্তে রাষ্ট্রবর্দ্ধনাঃ।"

যে জনপদে রাজা নাই—সেই জনপদে (রাজার দ্বারা পোষণের অভাবে) সন্তুষ্ট নট ও নর্ত্তকগণ দ্বারা সেবিত, রাষ্ট্রের উন্নতিকারী, উৎসব সকল ও 'সমাজ' সকল (বর্ত্তমান থাকিতেও) বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

'সমাজ' হইতেছে রাষ্ট্রবর্দ্ধন অর্থাৎ রাষ্ট্রের হিতকারী ও দেশবাসীর আনন্দবর্দ্ধক অতএব উন্নতিকারী, দেশের ও দেশবাসীর বহু হিতকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমাজ (অভিনয়স্থান, থিয়েটার) অন্যতম। এই জন্যই তাহা রাজগণকর্ত্তৃক অনুমোদিত এবং অনেক ক্ষেত্রে রাজ-অর্থে পুষ্ট হইত। এই 'সমাজ' রাজা অশোক অনুমোদন করিয়াছিলেন; কিন্তু মল্লযুদ্ধের স্থান বা ধৃত বন্য জন্তুর সহিত যুদ্ধ করিবার স্থান (সমাজ) অশোক নিষিদ্ধ করিলেন। ইহাই অশোকের প্রথম শিলালিপির 'নির্দ্দেশ'।

(২)

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

গত আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে ৫৬৩-৬৭ পৃষ্ঠায় শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের "সমাজ ও এষণা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে মৌর্য্যসম্রাট অশোকের প্রথম শিলালিপি থেকে দু'টি উদ্ধৃতি আছে (৫৬৩ পৃষ্ঠা)। কিন্তু উদ্ধৃতি দুটিতে কিছু ভুল থেকে গিয়েছে। প্রবন্ধকার প্রথমতঃ লিখেছেন, "সমাজম্হি বহুকং দোষং পশতি দেবানম্ পিয়ো পিয়দশী রাজা।" কিন্তু লিপির ঐ অংশের প্রকৃত পাঠ গিরনার শৈলের ভাষ্য অনুযায়ী,—"বহুকং হি দোসং সমাজম্হি পসতি দেবানং প্রিয়ো প্রিয়দসি রাজা।" অবশ্য কালসি, ধৌলি জৌগড়া সাহবাজগড়ি মানসেরা প্রভৃতি স্থানের লিপিগুলিতে ভাষার কিছু তারতম্য লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু "সমাজ" কথাটি সর্বত্র "বহুক" কথাটির পরে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবন্ধকারের দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি আরও ভ্রমাত্মক। "অথি চাপি একা সমাজা বহুমতা দেবানাং পিয়স পিয়দশিনো রাঞো"—এ রকম পাঠ অশোকের শিলালিপিতে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। গিরনারের ভাষ্য অনুযায়ী এই অংশের প্রকৃত পাঠ—"অস্তি পি তু একচা সমাজা সাধুমতা দেবানং প্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো।" অন্যান্য স্থলে ভাষার সামান্য অনৈক্য থাকলেও তা গুরুতর নয় এবং বাক্যটির গঠন-প্রণালীও অভিন্ন। "সাহবাজগড়ির লিপিতে "সাধুমতা"র স্থানে Buhler "শ্রেষ্ঠমতি" পড়েছিলেন। Hultzsch-এর সর্ব্বজন গৃহীত প্রামাণ্য পাঠ অনুযায়ী ওখানে "সস্তমতে" হবে। কিন্তু "বহুমত" ডাঃ দাসগুপ্ত কোথা থেকে পেয়েছেন বুঝলাম না। অশোক-শিলালিপির পাঠ নিয়ে উপরিউক্ত আলোচনাটি আমরা করলাম—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ডাঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রী সম্পাদিত অশোকের অনুশাসনগুলির সংস্করণ ও ডাঃ হুলট্‌স এর প্রামাণ্য সংস্করণ এই দুখানি গ্রন্থের উপর নির্ভর ক'রে। শেষোক্ত গ্রন্থে শিলালিপিগুলির যে সুন্দর Plate দেওয়া হয়েছে তা পরীক্ষা ক'রেও প্রবন্ধকারের উদ্ধৃত পাঠের কোনও সমর্থন খুঁজে পেলাম না।

ডাঃ দাসগুপ্তের প্রবন্ধটি সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং উল্লিখিত ত্রুটি আপাতদৃষ্টিতে সামান্য। কিন্তু অশোকের শিলালিপি সাধারণ পুস্তক নয়—তা মহামূল্য ঐতিহাসিক দলিল। এ বিষয়ে সাধারণের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। সুতরাং ডাঃ দাসগুপ্তের ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তির মতামতকে সাধারণ যদি এ প্রসঙ্গে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করে তাতে বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে ভুলটির গুরুত্ব
[illegible]

ক্ষাত্রধর্মী বৈষ্ণব বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "যদ্দ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম।" ধর্মের এই মর্মকথা ভুলে গিয়েই যে জাতির সর্বনাশ ঘটেছে একথা বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে দেখতে পাই লেখা রয়েছে :

"আমরা মহতী কৃষ্ণকথিত নীতি পরিত্যাগ করিয়া, শূলপাণি ও রঘুনন্দনের পদানত,—লোকহিত পরিত্যাগ করিয়া তিথিতত্ত্ব, মলমাস-তত্ত্ব প্রভৃতি আটাইশ তত্ত্বের কচকচিতে মন্ত্রমুগ্ধ। আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে তো কোন্ জাতি অধঃপাতে যাইবে ?"

ধর্মতত্ত্বে লেখা আছে :

"আরও বুঝিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম।"

কৃষ্ণচরিত্রে যা তিনি লিখেছেন একথা তারই প্রতিধ্বনি। দেশরক্ষাকে শুধু গুরুতর ধর্ম ব'লে বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষান্ত থাকেন নি।

"যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম।"

বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রীতিকে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম ব'লে মনে করতেন। নইলে বন্দেমাতরমের মতো মহাসঙ্গীত তাঁর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হ'তে পারতো না।

এখন প্রশ্ন—দেশরক্ষা বলতে বঙ্কিমচন্দ্র কি বুঝতেন ? 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে এ প্রশ্নের উত্তর পাই। সেখানে আছে :

"দেশের মঙ্গল ? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল ? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি কিন্তু তুমি আমি কি দেশ ? তুমি আমি দেশের কয়জন ? আর এই কৃষিজীবী কয়জন ? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে ? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।...যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।"

তা হ'লে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, মুষ্টিমেয় ধনী এবং মধ্যবিত্ত লোকের স্বার্থরক্ষা এবং দেশরক্ষা একই কথা—এমন বিশ্বাস বঙ্কিমের ছিল না। বরং তিনি উল্টো বিশ্বাস করতেন। 'বঙ্গদেশের কৃষকে'ই রয়েছে :

"জীবের শত্রু জীব, মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য, বাঙালী কৃষকের শত্রু বাঙালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে। রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য সফরীদিগকে ভক্ষণ করে। জমীদার নামক বড় মানুষ কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।"

দেশ বলতে তিনি বুঝতেন গ্রামের সহস্র সহস্র নিরন্ন হাসিম শেখ এবং রামাকৈবর্ত্তকে। দেশরক্ষা বলতে তিনি বুঝতেন ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামের কোটি কোটি জীবন্ত নরকঙ্কালকে দারিদ্র্য থেকে, অজ্ঞতা থেকে, ভীরুতা থেকে, চিত্তের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করা।

কিন্তু কিসের জন্য দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্য থেকে, সম্পদ থেকে, জ্ঞান থেকে, শক্তি থেকে বঞ্চিত হ'য়ে আছে ? দাস ব'লে। ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা ভারতবাসীরা নয়। যারা আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা তারা আমাদের বোঝে না, বুঝবার চেষ্টাও করে না। ধর্মতত্ত্বে গুরু শিষ্যকে বলছেন :

"ইংরেজের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙালী হইয়াও বলি। আমি গোষ্পদ বলিয়া যে ডোবাকে সমুদ্র বলিব, এমত হইতে পারে না। যে জাতি একশত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিল না, তাহাদের অন্য লক্ষ গুণ থাকে স্বীকার করিব, কিন্তু তাহাদিগকে প্রশস্তবুদ্ধি বলিতে পারিব না।"

ইংরেজ শাসনে আমাদের ক্ষতি যে কেবল অর্থের দিক থেকে ঘটেছে তা নয়। শিক্ষা এবং সংস্কৃতির দিক থেকেও যে এই শাসন মারাত্মক হয়েছে এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন। ধর্মতত্ত্বে গুরু বলছেন শিষ্যকে :

"ইংরেজের শিক্ষা অপেক্ষাও যে আমাদের শিক্ষা-নিকৃষ্ট, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের সেই কুশিক্ষার মূল ইউরোপের দৃষ্টান্ত।"

ইংরেজের অনুকরণ করবার বিড়ম্বনা থেকে আমাদিগকে মুক্ত রাখবার জন্য বঙ্কিম যে এতখানি চেষ্টা করেছিলেন তার কারণ ইংরেজ-শাসনের নৈতিক প্রভাবকে আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশের পক্ষে তিনি অনুকূল ব'লে মনে করতেন না। ইংরেজ-শাসনে আমাদের দেশের মুচিরাম গুড় জাতীয় এক শ্রেণীর মেরুদণ্ডহীন লোকের আর্থিক মঙ্গল হলেও এই শাসন দেশের অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবীর যে কোন মঙ্গলই করে নি এ কথা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে বঙ্কিমচন্দ্রের কোথাও বাধে নি। 'বঙ্গদেশের কৃষকে' তিনি লিখেছেন :

"আর তুমি ইংরেজ বাহাদুর—তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর

হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডুয়িত করিতেছ—তুমি বল দেখি যে, তোমা হ'তে এই হাসিম শেখ এবং রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে? আমি বলি অণুমাত্র না, কণামাত্র না।"

বঙ্কিমচন্দ্র পরাধীনতাকে আমাদের অমঙ্গলের হেতু ব'লে যে মনে করতেন, এতে কোনই সন্দেহ নেই। যে শাসন-ব্যবস্থায় হাজার হাজার মানুষ পেট ভরে খেতে পর্য্যন্ত পায় না, তাকে অমঙ্গলের হেতু বলা ছাড়া উপায় কি? বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, কারণ স্বাধীনতার মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন আমাদের সমস্ত বৃত্তির অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তির উপায়। বঙ্কিম স্বাধীনতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন:

"সমাজের যে অবস্থা ধর্ম্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়।"

এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীনতা বলতে শুধু ইংরেজ শাসনের অবসান বুঝতেন না। তিনি লিখে গেছেন, "স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু।"

ইংরেজ-শাসনই যদি দেশের সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলের কারণ হয়, তবে সে শাসনের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবার উপায় কি? ইংরেজ ত স্বেচ্ছায় আমাদিগকে মুক্তি দেবে না। কেন দেবে না তার যুক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে ইংরেজ লেখক অলডাস হাক্সলী নগ্ন ভাষাতেই লিখেছেন:

But if I were a member of the I. C. S. or if I held shares in a Calcutta Jute Mill (I wish I did), I should believe in all sincerity that British rule had been an unmixed blessing to India and that the Indians were quite incapable of governing themselves.

তাৎপর্য্য। আমি যদি কোন আই-সি-এস্ অফিসার হ'তাম অথবা কলিকাতার কোন পাটের কলে আমার যদি শেয়ার থাকত (থাকলে ভালই হ'ত) তবে সর্ব্বান্তঃকরণে আমি বিশ্বাস করতাম ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হয় নি এবং ভারতবাসীরা স্বায়ত্ত শাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

যেহেতু স্বার্থ কেউ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে না, সেই হেতুই চেয়ে-চিন্তে আমরা ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাব না। তবে কিসে আমরা স্বাধীনতা পাব? বঙ্কিমচন্দ্র বললেন ভিক্ষার দ্বারা কিছুতেই নয়, শক্তির দ্বারা। সেই শক্তির উৎস যে একতায়—অনন্যসাধারণ প্রতিভার আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র এই সত্যকে সহজেই আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি আনন্দমঠের সন্ন্যাসীকে দিয়ে গাওয়ালেন মহাসঙ্গীত বন্দে মাতরম্। যাদের ভাষা বিচিত্র, ধর্ম্মমত বিচিত্র, বেশভূষা বিচিত্র, আদব-কায়দা বিচিত্র তাদের একই পতাকার তলে মেলাতে পারে শুধু দেশাত্মবোধের জাদু। আমাদের ভাষা, আমাদের ধর্ম্মমত যাই হোক না কেন একটা জায়গায় আমরা সবাই এক আর সেই জায়গাটা হ'ল ভারতবর্ষ আমাদের সকলেরই মাতৃভূমি। যেদিন সমস্ত ভারতবাসী ভেদবুদ্ধিকে দূরে সরিয়ে রেখে ভারতবর্ষকে মা বলে ডাকতে আরম্ভ করবে, সেদিন থেকে আমাদের ইতিহাসের ধারা যে একটা নূতন পথে চলতে আরম্ভ করবে—এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। নূতন ভারতবর্ষের জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্ন বাস্তবের মধ্যে কবে সত্য হ'য়ে উঠবে, এ প্রশ্ন মহেন্দ্র যখন জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মচারী উত্তর দিলেন, 'যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে।' বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্র উচ্চারণ ক'রে শতধা-বিচ্ছিন্ন ভারতবাসীকে শেখালেন মাকে মা বলে ডাকতে। এই জন্যই অরবিন্দ বঙ্কিমকে বললেন ভারতবর্ষের 'পোলিটিক্যাল গুরু।'

স্বাধীনতার মন্দিরে পৌঁছবার প্রথম সোপান তৈরি করল বন্দে মাতরম্। শতধাবিচ্ছিন্ন মানুষগুলি একই আদর্শের পতাকাতলে মিলিত হবার মহামন্ত্রের সন্ধান পেল। কিন্তু শুধু ঐক্য ত স্বাধীনতা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। যারা আমাদের দেশকে গ্রাস ক'রে আছে তারা তো সহজে স্বার্থকে ছেড়ে দেবে না। একমাত্র শক্তির কাছেই তারা পরাজয় স্বীকার করবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাই আমাদিগকে 'কুক্কুরজাতীয় পলিটিক্স' চর্চ্চা ছেড়ে 'বৃষজাতীয় পলিটিক্সে'র চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ দিলেন। আমরা যা চাই ভিক্ষাপাত্রকে আশ্রয় ক'রে তা পাব না—তাকে জিতে নিতে হবে আমাদের পৌরুষের দ্বারা। তিনি বললেন, স্বাধীনতা যদি পেতে চাও—তার জন্য পুরা মূল্য দিতে হবে। দেশমাতৃকার চরণমূলে সমস্ত স্বার্থকে নিঃশেষে বলি দিতে পারলে তবেই মিলবে মুক্তি, মিলবে সমষ্টির কল্যাণ। তাই তো আনন্দমঠে সত্যানন্দের মুখ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নব্য ভারতকে শোনালেন দুঃখবরণের অগ্নিবাণী:

"সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ। যে সর্ব্বত্যাগী, সে ভিন্ন অপর কেহ এ কাজের উপযুক্ত নহে।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন:

"যে স্ত্রী পুত্রের মুখ দর্শন করে, সে কি কোন গুরুতর কার্য্যের অধিকারী নহে?"

উত্তর এলো:

"পুত্র-কলত্রের মুখ দেখিলে আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই। সন্তানধর্ম্মের নিয়ম এই যে, যে দিন প্রয়োজন হইবে, সেই দিন সন্তানকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।"

অবসর মতো দেশকে ভালবাসবার ভাববিলাসিতার

কোনো স্থান রইলো না বঙ্কিমের দেশপ্রেমে। ঘরমুখো বাঙালীকে আমবাগানের আর কাঁঠালবাগানের স্নিগ্ধ ছায়া থেকে টেনে এনে তিনি তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন মুক্ত পথের কঙ্করময় বুকে। স্ত্রী-পুত্র, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ভিন্ন আর কিছুকে যে মূল্য দিত না—সেই সঙ্কীর্ণমনা বাঙালীকে তিনি ক'রে দিলেন গৃহধর্ম্মে উদাসীন। তাকে বললেন, যত দিন না মাতার উদ্ধার হয় গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করতে হবে—উপার্জ্জিত সম্পদ দিতে হবে বৈষ্ণব-ধনাগারে—ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার ভুলে গিয়ে সকলের হাতের সঙ্গে মেলাতে হবে হাত। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের ভাবের জগতে খুলে দিলেন একটা নূতন জগতের তোরণ-দ্বার যার মাথায় লেখা রয়েছে : জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। হুইট-ম্যান্ যেমন নব্য আমেরিকানদের নূতন সন্ন্যাস-মন্ত্রে দিলেন দীক্ষা—বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি নব্য-ভারতবর্ষের আত্মাকে সন্ন্যাসের অগ্নিমন্ত্রে করলেন দীক্ষিত। আমাদের জীবনতরী ভাসছিল বন্দরের নিস্তরঙ্গ নিরাপদ জলরাশিতে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই তরীকে ঠেলে দিলেন কূল থেকে অকূলের পানে যেখানে মৃত্যু রয়েছে হাত বাড়িয়ে, বিপদ রয়েছে কোল পেতে। স্পেংলারের মতোই তিনি বললেন,

> Greatness and happiness are incompatible and we are given no choice.

> যদি সুখ চাও—গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে, যদি গৌরব চাও, সুখের প্রত্যাশা করো না।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু গৃহধর্ম্মের আদর্শকে ভেঙেই ক্ষান্ত হলেন না—আর একটা মস্ত আদর্শকে তিনি নির্ম্মম আঘাত দিলেন আর সে আঘাত হ'ল ধৈর্য্যের আদর্শ, ক্ষমার আদর্শ, অহিংসার মুখোস-পরা 'নিরাপদ নীরব নম্রতা'র আদর্শ। ঐশ্বর্য্যে যারা ভাগ্যবান তারা করবে দীনকে দয়া, আর ভাগ্যহত দরিদ্র যারা তারা ধৈর্য্যের সঙ্গে অদৃষ্টের দেওয়া দুর্ভাগ্যের বোঝাকে নতশিরে বহন করে চলবে—এই আদর্শই এতকাল ধরে পেয়ে এসেছে প্রশ্রয়। এই আদর্শের আধিপত্যেই লক্ষ লক্ষ মানুষের অভিশপ্ত জীবনকে আজও রেখেছে শৃঙ্খলিত ক'রে। যারা এসেছে সাগর-পার থেকে রাজ্যজয়ের লোভ নিয়ে, পররাজ্যে করেছে প্রবেশ, সেখানকার মানুষগুলিকে বানিয়েছে স্বার্থসিদ্ধির ক্রীড়নক, তাদের জীবনকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে সম্পদ থেকে, জ্ঞান থেকে, মুক্তির আনন্দ থেকে,—তাদের ঔদ্ধত্যকে আঘাত ক'রো না, বাধা দিয়ো না, তা করা পাপ। এই যে নিরীহতাকে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে অত্যাচারীর শাসনদণ্ডকে নিঃশব্দে সহ্য ক'রে চলার বিড়ম্বনা—এ বিড়ম্বনা দূর করবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে আঘাত দিতে হ'ল ক্লৈব্যের শাসনকে। সেই জন্য তাঁকে বলতে হ'ল—

> "চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্ম-মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন তিনি অনন্ত শক্তিময়।"

তাঁকে লিখতে হ'ল—

> "প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার।"

অন্যায়ের শাসনকে নতশিরে মেনে চলবার যে সর্ব্বনেশে ধৈর্য্যের আদর্শ তাকে ভাঙবার জন্যই তাঁকে লিখতে হ'ল কৃষ্ণচরিত্র। কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম অহিংসা পরম ধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখলেন,

> "তবে অহিংসা পরমধর্ম্ম, এ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম্ম। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম্ম নহে; বরং পরম ধর্ম্ম।"

একটা নির্ব্বীর্য্য শৃঙ্খলিত পোষমানা জাতিকে শক্তিমন্ত্রে, ক্ষাত্রধর্মে, দীক্ষা দিতে গিয়েই বঙ্কিমকে আনন্দমঠ, ধর্ম্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র সব কিছুই লিখতে হয়েছিল।

বঙ্গদেশের কৃষক, আনন্দমঠ, কৃষ্ণচরিত্র সমস্ত রচনাই জাতিকে একটি লক্ষ্যে পৌছে দেবার জন্য লেখা—সেই লক্ষ্য স্বদেশের স্বাধীনতা। এই রচনাবলীর এক প্রান্তে অস্থিচর্ম্মসার রামাকৈবর্ত্ত এবং হাসিম শেখের ছবি—ভাদ্রের প্রচণ্ড রৌদ্রে শীর্ণকায় দুটি বলদে ভোঁতা হাল ধার ক'রে এনে তারা এক হাঁটু কাদার উপর দিয়ে চাষ ক'রে চলেছে; আর এক প্রান্তে গীতার উদ্গাতা অর্জ্জুনের কপিধ্বজ রথের সারথী কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের প্রচণ্ড-মনোহর মূর্ত্তি। শ্লোকের পর শ্লোক তিনি উচ্চারণ ক'রে চলেছেন ভগ্নোদ্যম মহাবীরকে গাণ্ডীব ধরিয়ে দুষ্টের দমন কার্য্যে নিয়োজিত করবার জন্য। এই যে দুটো ছবি এদের মধ্যে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা মিল। দেশের লক্ষ লক্ষ নিরন্ন সর্ব্বহারাদের মুক্তির জন্য বঙ্কিমের চিত্ত কেঁদেছিল। সেই মুক্তির উপায় তিনি দেখেছিলেন প্যাট্রিয়টিজ্‌মের মধ্যে। যারা বিদেশ থেকে এসে দেশকে জোর ক'রে দখল ক'রে নিয়েছে তাদের রাহুগ্রাস থেকে জন্মভূমিকে মুক্ত করবার উপায়কেই বঙ্কিম প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্ বলতেন। কিন্তু ধৈর্য্যের আদর্শকে যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে পূজা ক'রে এসেছে তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে দাঁড়াতে চায় না! চৈতন্যদেব নিরীহতার জয়ধ্বজা হাতে নিয়ে যাদের চিত্তকে অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন করেছেন তাদের অসহিষ্ণু ক'রে তোলা যে এক রকম অসম্ভব! বঙ্কিমকে তাই লিখতে হ'ল কৃষ্ণচরিত্র। এই কৃষ্ণের হাতে বাঁকা বাঁশরী নয় যার স্বরে মুগ্ধ হ'য়ে যমুনার তীরে ছুটে যেতো গোপনারীর দল;

বঙ্কিমের কৃষ্ণের হাতে মহাশঙ্খ পাঞ্চজন্য যার গর্জ্জনে নূতন প্রেরণা এল অর্জ্জুনের মনে, হৃৎকম্প জাগলো দুঃশাসনের প্রাণে। যেখানে ছিল চৈতন্যদেবের সিংহাসন সেখানে বঙ্কিম বসালেন কৃষ্ণকে—যাত্রার দলের ময়ূরপুচ্ছধারী কৃষ্ণকে নয়—কুরুক্ষেত্রের ভীষণ-সুন্দর কৃষ্ণকে যাঁর কণ্ঠ থেকে রণভূমিতে উৎসারিত হ'ল:

"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।"

বাঁকুড়ার পুঁথি

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ নাকি রাঢ়ে রচিত হইয়াছিল। মল্লভূম রাজ্য রাঢ়ের কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল কে জানে। রামাঞী পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রকাশ করিয়াছেন। বাঁকুড়ায় পূর্ব্বে বহু শাস্ত্রের আলোচনা হইত। কবিচন্দ্র গোবিন্দমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

"অক্ষর পড়িয়া হরি পড়ে অভিধান।
ষড়শাস্ত্র পড়িয়া হরি হৈলা বুদ্ধিমান।
ব্যাকরণ পড়িয়া হরি জানিল সকল।
চারি বেদ পড়িয়া হরি হইল বিকল।
রামায়ণ পড়ি হরি বড় পাল্য দুখ।
... ...
কাব্যাংলঙ্কার পড়ি হরি নাটক নাটিকা।
পুরাণ ভারত পড়ি আঅড়াল্য টীকা।
নানা রসকলা হরি শিখিলেন গীত।
বৌদ্ধবিদ্যা শিখিলেন হরি বিচিত্র চরিত।
শৃগাল চরিত্র পড়ি কাগশাস্ত্র পড়ি।
অক্তার (?) নাগবিদ্যা শিখিল গাড়ুরী।
ক্ষেত্রিবিদ্যা শিখিল হরি ছত্রিশ বিবরণ।
গজবিদ্যা শিখিয়া হরি হইল সিয়ান।
চুড়ি কর্ম্মকার বিদ্যা শিখিল মায়ারণ।
সকল বিদ্যা শিখিল হরি অতি বিচক্ষণ।
মালবিদ্যা শিখিল হরি নিজ ভুজবলে।
... ...
ধনুর্বিদ্যা শিখিল হরি বড় সুখ বুঝে।
ছয় মাসের পথে যাহার বাণ যুঝে।
ইত্যাদি।

শ্রীনিবাস আচার্য্য ব্রজগিরিমাঝ হইতে গ্রন্থমেঘ আনিয়াছিলেন। বাঁকুড়া পুঁথির দেশ। রামাঞী পণ্ডিত, চণ্ডীদাস কোন্ বেদব্যাসের পোথা অনুসরণ করিয়া পুঁথি লিখিয়াছিলেন—বলেন নাই। চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী কালেও বাঁকুড়ায় অনেকে পুঁথি লিখিয়াছিলেন। কতক জ্ঞাত, বহু অজ্ঞাত। বাঁকুড়ায় কখনও গ্রন্থ-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় নাই। বাঁকুড়ার সংস্কৃত পণ্ডিতগণ পোথা নকল করিতেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একজন বেদব্যাস ছিলেন। বাঁকুড়ার ভবিষ্যপুরাণে নাগবিদ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁকুড়ার বায়ুপুরাণে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর অবতারত্ব বর্ণন পরিচ্ছেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁকুড়ায় আবিষ্কৃত, 'চণ্ডীদাসচরিতে' অশ্রুতপূর্ব্ব পৌরাণিক কথা আছে। বাঁকুড়ার কবিচন্দ্রের গোবিন্দ-মঙ্গল শুনিয়াছি একবার ছাপা হইয়াছিল। উহা দেখি নাই। মনে হয় উহা সম্পূর্ণ ছাপা হয় নাই। গোবিন্দ-মঙ্গল সুবৃহৎ গ্রন্থ। কবিচন্দ্রের অনেক রচনা কাশীরাম দাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গলেও নূতন রকমের পৌরাণিক কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণ সংস্কার-সমিতি দেশে এখনও গড়িয়া উঠে নাই। বাঁকুড়ায় অনুসন্ধান করিলে এখনও বহু পুরাণ, উপপুরাণ আবিষ্কৃত হইতে পারে। শৃগাল-চরিত্র, গজবিদ্যা, গাড়ুরী বিদ্যা ইত্যাদি সকল বিদ্যা এই সব পুরাণে পাওয়া যাইবে। বহু পুরাণ, কাব্য, জ্যোতিষ, দর্শন, অলঙ্কার, ব্যাকরণ আদি বাঁকুড়া হইতে আবিষ্কৃত হইয়া অবশ্য অন্যত্র গিয়াছে। এই সকল পুঁথির অধিকাংশগুলিতেই লিপিকরের নাম, ধাম, লিপিস্থান ইত্যাদির উল্লেখ নাই। পুঁথিগুলির সহিত সেগুলি কোথায় কিরূপ ভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে অবশ্য তাহার লিখিত বিবরণ আছে। না থাকিলে ভবিষ্যতে উহাদের সংস্কর্ত্তাগণের ভ্রমে পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। ধর্ম্মমঙ্গলের গানের কাল এখনও সঠিক নির্ণীত হয় নাই। বাঁকুড়া হইতে বহু ধর্ম্মমঙ্গলের পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়া অন্যত্র গিয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থের অধিকাংশ রচয়িতাই বাঁকুড়ার। 'জিতরাম'-

এর ধর্ম্মমঙ্গল এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। বাঁকুড়ায় ধর্ম্মমঙ্গলের গানের ছড়াছড়ি ছিল। এখনও অনুসন্ধান করিলে বহু 'নৌতনমঙ্গল' পাওয়া যায়। 'শিবগায়ন' কোনও পুঁথিশালায় আছে কিনা জানি না। বাঁকুড়ায় ইহার প্রচলন ছিল। এই সব গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে উহা হইতে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। তরণীরমণের 'অষ্টাদশপদ' বাঁকুড়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাতে কবি নিজকে চণ্ডীদাস বলিয়া পরিচয় দেন নাই। ছাতনার পরমানন্দ দাস 'রসকদম্ব' পুঁথি লিখিয়াছিলেন। উহা বৃহৎ গ্রন্থ। উহার শেষ পত্রটি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রবাসী প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'চণ্ডীদাস চরিত'-এর পরিশিষ্টশেষের—'তাকো নিবাসহু ছাতনা সুন্দর সুঠাম'—ইত্যাদি পদটি রসকদম্ব পুথির শেষ পদ। আমার মনে হয় 'রসকদম্ব' পদসংগ্রহের পুস্তক। উহাতে চণ্ডীদাসের বহু পদ থাকিলেও থাকিতে পারে। ঐ পুঁথির আবিষ্কার নিতান্ত প্রয়োজন। বাঁকুড়ায় 'বিদ্যাপতি' প্রবাদ এখন আর শুনিতে পাওয়া যায় না। বাঁকুড়ায় অনেক রাজপুত ছত্রির বাস। ইহাদের বাড়ীতে অনুসন্ধান করিলেও দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত অনেক প্রাচীন পুথি পাওয়া যায়। এইরূপ পুথিতে গোবর্দ্ধন নামক কোনও কবির কৃষ্ণলীলার সুললিত পদ আমি দেখিয়াছি। এই কবি 'গীতগোবিন্দে'র কবি গোবর্দ্ধন কিনা জানিবার চেষ্টা করি নাই। পাঁজি উল্টাইলেই বাঁকুড়ায় জ্যোতিষ-শাস্ত্রালোচনার পরিচয় পাওয়া যায়। অনুসন্ধান করিলে শহরের বুকেই এখনও রকমারি জ্যোতিষ গ্রন্থের প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হইতে পারে। বাঁকুড়ার পাঠক-পাড়ায় পূর্ব্বে এই শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইত। সঙ্গীত-শাস্ত্রালোচনায়ও বাঁকুড়া অগ্রণী। সঙ্গীতশাস্ত্রেরও নানারূপ পুঁথি বাঁকুড়ায় অনুসন্ধান করিলে এখনও পাওয়া যাইতে পারে। নীলাচল হইতে বৃন্দাবনের পথে শ্রীচৈতন্য-দেব পথ হারাইয়া রাঢ়ের জঙ্গলে তিন দিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বীর হাম্বীর তখন রাঢ়ের রাজা। শ্রীচৈতন্যদেব বিষ্ণুপুরে পদার্পণ করিয়াছিলেন কি না—বীর হাম্বীর কর্ত্তৃক তাঁহার স্মৃতিপূজার কোনও ব্যবস্থা হইয়াছিল কি না, এ প্রশ্নের সমাধান কি প্রকারে হইবে? ভক্তিরত্নাকরের ন্যায় সুবৃহৎ বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রচলন বাঁকুড়ায় ছিল না। বাঁকুড়ায় আবিষ্কৃত বৈষ্ণবামৃত পুঁথি হইতে বীর হাম্বীরের দস্যু-অপবাদ গিয়াছে। 'নরোত্তমবিলাস' গ্রন্থ বাঁকুড়ায় পাওয়া যায় না। বাঁকুড়ায় 'শ্যামানন্দবিলাস' পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। রাঢ়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলা। বাঁকুড়ায় চৈতন্যধর্ম্ম প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্য বীর হাম্বীরকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বাঁকুড়ার লোক ছিলেন—এরূপ জনশ্রুতি বাঁকুড়ায় আছে। বাঁকুড়ার পুঁথিতে ইহার কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়। বীর হাম্বীর, বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্য বাড়ী তৈয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন। কবি যদুনন্দন শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য ছিলেন। যদুনন্দন কোথায় বসিয়া রূপগোস্বামী-আদির গ্রন্থসমূহের ভাষা করিয়াছিলেন কে জানে। যদুনন্দন-কৃত যে-সব ভাষার পুঁথি বাঁকুড়ায় পাওয়া যায়, সেগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। বাঁকুড়ার রাধাদাস সুললিত পদ ছন্দে হংসদূতের ভাষা করিয়াছিলেন। রূপ, সনাতন, রঘুনাথ, শ্রীজীব প্রভৃতির বহু অনাবিষ্কৃত গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে বাঁকুড়ায় পাওয়া যাইবে। কৃষ্ণ কবিরাজ শুধু চৈতন্যচরিতামৃতই লেখেন নাই, তিনি আরও গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ছয় গোস্বামীর অষ্টক তিনি লিখিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামীর অষ্টকে তিনি উঁহাদের বংশ-পরিচয় দিয়াছেন। কবিরাজ ঠাকুরের 'নিগূঢ় তত্ত্বসার' গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাতে চৈতন্যদেবের অনুসার যে ধর্ম্ম, তাহাই কথিত হইয়াছে। বিল্বমঙ্গল 'শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত' রচনা করিয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গলের অপর নাম লীলাশুক ছিল কি না শুনি নাই। বাঁকুড়ায় 'লীলা-শুকেন' বিরচিত কৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রচলন ছিল। শ্রীকৃষ্ণ-কবিরাজ ঠাকুর তাঁহার এক গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর রসাস্বাদন ব্যাপারে জয়দেব, লীলাশুক এবং চণ্ডীদাসের উল্লেখ করিয়াছেন, বিল্বমঙ্গলের উল্লেখ করেন নাই। বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত কবিরাজ ঠাকুরের আর এক গ্রন্থে 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র 'শ্রীরূপরঘুনাথপদে যার আশ'-এর রঘুনাথ, রঘুনাথ ভট্ট—এরূপ উল্লেখ আছে। বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের পুঁথিতে নিম্নলিখিত নূতন রকমের ভণিতা পাওয়া যায়:—

"মহামিশ্রি জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রির তাত
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ।

দুই স্থলে:—

ললিত প্রবন্ধ . দ্বিজবর মুকুন্দ
শ্রীকবিচন্দ্রে ভণে।

অপর কয়েক স্থলে :—

করগো করুণাময়ী শিবরামে দয়া।"

ইহা হইতে বুঝা যায়—'কবিকঙ্কণ' মুকুন্দের ছোট ভাই ছিলেন। মুকুন্দের উপাধি ছিল—'কবিচন্দ্র'। 'কবিকঙ্কণে'র আসল নাম ছিল শিবরাম। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য—'কবিচন্দ্র' এবং 'কবিকঙ্কণ' অথবা মুকুন্দ এবং শিবরাম—দুই ভায়ে রচনা করিয়াছিলেন। বাঁকুড়ায় বহু লোকে রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। জগদ্রামী রামায়ণ বাঁকুড়া লক্ষ্মীপ্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। জগদ্রামের দুর্গাপঞ্চরাত্র ছাপা হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। বাঁকুড়া জেলায় আগে এই দুর্গাপঞ্চরাত্র মতে দুর্গাপূজা হইত। বাঁকুড়ার প্রসাদদাস পদছন্দে রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। বাঁকুড়া পাঁড়রহাটী বা পাঁড়রা গ্রামের এক ব্যক্তি রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। সে রামায়ণের কিয়দংশ আমি দেখিয়াছি। অঙ্কশাস্ত্রে বাঁকুড়ার দানের তুলনা নাই। শুভঙ্কর 'শুভঙ্করী' লিখিয়াছিলেন। সে শুভঙ্করী এখনও আবিষ্কৃত হইয়া মুদ্রিত হয় নাই। পঞ্চানন বাবু শুভঙ্করের অঙ্ক কষিবার প্রণালীগুলি মাত্র লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বাঁকুড়ায় আবিষ্কৃত পুঁথি হইতে জানা যায়—শুভঙ্কর এবং ভৃগুরাম ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বাঁকুড়ায় শুভঙ্করের 'কাগজসার' নামক এক পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শুভঙ্কর বর্গী-হাঙ্গামার কালের লোক ছিলেন। বাঁকুড়ায় আবিষ্কৃত রতন কবিরাজের 'মদনমোহনবন্দনা' হইতে তাহা জানা গিয়াছে। কোনও বিশেষজ্ঞ শুভঙ্করীর 'কুড়োবা' শব্দ ধরিয়া শুভঙ্করের কালকে বহু পিছাইয়া দিতে চান। নিত্যানন্দ ঘোষের শান্তিপর্ব্ব মহাভারতে 'কুড়োবা' শব্দ আছে। নিত্যানন্দ ঘোষ বাঁকুড়ার লোক ছিলেন কি না কে জানে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'আউট' শব্দ বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত সহজিয়া 'দেহনির্ণয়' গ্রন্থে আছে। ঐ গ্রন্থে 'আউট' আট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'আউট' শব্দ শুভঙ্করীতে আছে। 'আউটী', বৃদ্ধ 'আউটী, 'অতিবৃদ্ধ আউটী'—অঙ্ক। আটটি করিয়া অঙ্ক লইয়া এক প্রকারের অঙ্ক। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গঠনে বাঁকুড়া কত না মালমসলা যোগাইয়াছে। বাঁকুড়ার পুঁথি লইয়া কত পুঁথিশালা সমৃদ্ধ হইয়াছে—হইতেছে। বৎসর বৎসর বাঁকুড়ার কত পুঁথি উইয়ে, ইঁদুরে নষ্ট করিতেছে—কত পুঁথি বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তথাপি এখনও বাঁকুড়ায় পুঁথিসংগ্রহ ও সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা হইতেছে না। তাই যদি হইবে, তবে বীরভূম বীরভূমই থাকিবে, মেদিনীপুর মেদিনীপুরই থাকিবে, বর্দ্ধমান বর্দ্ধমানই থাকিবে—মল্লভূম বাঁকুড়ায় পরিণত হইবে কেন!

মেঘে ও রোদে

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

সকালেতে মেঘ ছিল, আকাশ ঘিরে।
কখনো চলিছে দ্রুত, কখনো ধীরে।
কখনো বা শাদা-শাদা, কখনো কালো।
কখনো বা ছেঁড়া ছেঁড়া, দেখায় ভালো।
কখনো বা রোদ ওঠে, মেঘের ফাঁকে।
কখনো বা মেঘদল রোদেরে ঢাকে।

তার পর এ কি হ'ল,—রোদ বিজয়ী
গাছে পাতে পড়ে তেজ ভরিয়ে মহী।
তার পরে একেবারে সব উজলি
রোদে রোদে গলা রূপা উঠিল জ্বলি।
সবুজ পাতায় আর বনের গায়ে,
মায়াময় মহারোদ রহে জড়ায়ে॥

স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীদেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের মধ্যে যাঁহারা যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায় অন্যতম। তাঁহার বাল্যকালের অভিভাবকস্থানীয় স্যর প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত তিনিও হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াও জনসাধারণের মাঝখানে থাকিয়া নিজস্ব একটা স্থান সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন। লিখিতে কষ্ট হয় যে প্রবাসী বাঙালীদের যে-সকল বিদ্যালয় আছে তাহাতে প্রাতঃস্মরণীয় প্রবাসী বাঙালী কর্ম্মবীরগণের ইতিহাস নিয়মিতভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় না। অথচ, আমরা সকলেই মুখে বলি যে জাতীয় ইতিহাস না জানিলে আদর্শ গঠন হয় না। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের পর আর কোন লেখক ভারতব্যাপী বাঙালী জীবনের ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করেন নাই; ফলে, অনেক প্রকারের মূল্যবান উপকরণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের যে একটা বিশিষ্ট জাতীয় ইতিহাস আছে তাহা আমাদের বালক ও যুবকগণ জানেও না; সাহিত্যিকগণ তাহার পরিচয় পরিবেশনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনেও করেন না।

লালগোপালের জন্ম হয় নবদ্বীপের রাণাঘাট মহকুমাস্থ অংশুমালী বা অনিশমালী গ্রামে ২৯ জুলাই, ১৮৭৭ তারিখে। তাঁহার পৈতৃক ভিটা বর্ত্তমানে এককালের "সিংহ দরজা" ও নহবৎখানার ভগ্নবিশেষ বুকে করিয়া স্থানীয় "বাবু"দের অতীত গৌরবের স্মৃতিমাত্র বহন করিয়া পড়িয়া আছে। লালগোপালের বংশাবলীর আখ্যায়িকা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনীর পক্ষে অবান্তর, যদিও তাঁহার দূর ও নিকট আত্মীয়গণের অনেকেই রায় বাহাদুর ও উচ্চপদাভিষিক্ত রাজকর্ম্মচারী। তাঁহার পারিবারিক বিস্তার কলিকাতা অঞ্চল হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত থাকিলেও তাঁহার নিজের কর্ম্মক্ষেত্র বিশেষভাবে যুক্তপ্রদেশেই সীমাবদ্ধ।

তাঁহার পিতা অক্ষয়কুমার ১৮৭৪ সালে যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে গাজীপুর শহরে ওকালতি আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি সরকারী উকীল ছিলেন, কিন্তু কোন কারণে সেই চাকরী ত্যাগ করিয়া তিনি স্বাধীনভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়া অল্পকালের মধ্যেই বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন। অনেক আশা করিয়া বিপুল অর্থব্যয়ে



স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়

একখানি প্রকাণ্ড বাসভবনও নির্ম্মাণ করান এবং ছেলেমেয়েদের বাংলা শিক্ষার সুবিধার জন্য দেশ হইতে শ্রীযুক্ত নবগোপাল চক্রবর্ত্তী নামে একজন শিক্ষককে গাজীপুরে আনান ও একটি বাংলা পাঠশালাও স্থাপন করান; কিন্তু সকল উদ্দেশ্য সফল হইবার পূর্ব্বেই, মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে, ১৮৮৯ সালে, অকালে পরলোকগমন করেন। সে সময়ে তাঁহার চারি পুত্র ও এক কন্যা ছিল। লালগোপাল জ্যেষ্ঠ ছিলেন।

গৃহশিক্ষকের নিকট বাংলা, অঙ্ক ও কিছু ইংরেজী শিক্ষা

করিয়া তিনি ৯ বৎসর বয়সে গাজীপুরের ভিক্টোরিয়া হাই স্কুলে ভর্ত্তি হন ও তৎকালীন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ ভাদুড়ী মহাশয়ের পরামর্শমত "দ্বিতীয় ভাষা" হিসাবে উর্দ্দু শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু এক দিন শিক্ষকের হাতে কানমলা খাইয়া তিনি উর্দ্দু ছাড়িয়া হিন্দী গ্রহণ করেন। হিন্দী সাহিত্যের সহিত পরিচয় ও সপ্রেম ব্যবহার তিনি শেষ জীবন পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন।

পনর-ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সকলে তাঁহাকে এক জন খুব সাধারণ ছাত্র বলিয়াই জানিত। কিন্তু ১৮৯০ সালে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পাস করিবার পর হইতেই তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হয় ও পর-পর ইণ্টারমীডিয়েট এবং বি-এ পরীক্ষাও তিনি প্রথম বিভাগে পাস করেন ও "এলিয়ট" বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯৪ সালে তাঁহার মত স্যর্ তেজবাহাদুর সপ্রুও প্রথম বিভাগে বি-এ পাস করেন। তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মিত্র, এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই লালগোপালের পূর্ব্বেই স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। যে বৎসর তিনি বি-এ পাস করেন সেই বৎসরে তাঁহার দ্বিতীয় সহোদর ননীগোপাল এণ্ট্রান্স পাস করেন। পরে ননীবাবু সরকারী এঞ্জিনীয়ার হইয়া বরিশাল, ফরিদপুর, রাজসাহী প্রভৃতি স্থানে চাকরী করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা করিলেও লালগোপাল চিরজীবন বাংলা ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে থাকেন। জগদীশ ঘোষের "গীতা" তাঁহার অতিশয় আদরের সাথী ছিল এবং তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উপনিষদ পাঠ করিতেন। তিনি টেনিস খেলিতে ভালবাসিতেন এবং ৫২।৫৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিয়মিতভাবে এই খেলা খেলিতে দেখা গিয়াছে।

কলেজে গণিত ও বিজ্ঞান লইবার উদ্দেশ্য ছিল যে তিনি কালে রুড়কীর এঞ্জিনীয়ার হইবেন। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় অন্য প্রকার ছিল। পিতার সঞ্চিত অর্থ বাটী নির্ম্মাণে ব্যয় হয় ও বাকী যাহা কিছু ছিল তাহা কলেজের খরচা ও সংসারের পিছনে যায়। লালগোপালের প্রাপ্ত বৃত্তি যথেষ্ট সাহায্য করিলেও তাঁহার এম্-এ পড়িবার খরচা চালান সম্ভব হইল না। ফলে এলাহাবাদ ছাড়িয়া তাঁহাকে গাজীপুরে ফিরিয়া যাইতে হইল। বি-এ পড়িবার সময় তিনি বে-সরকারীভাবে আইন অধ্যয়ন করিতেছিলেন তাহাই এখন তাঁহার কাজে লাগিল। বাটীতেই আইন-অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি ১৮৯৫ সালে এল্-এল্-বি পরীক্ষা দেন ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পর-বৎসর গাজীপুরেই তিনি ওকালতি আরম্ভ করেন ও প্রায় বিনা আয়াসেই পিতার লুপ্ত প্রতিপত্তি ও পসারের পুনরুদ্ধার করেন। প্রথম বৎসরের ওকালতিতে ৬০০৲, দ্বিতীয় বৎসরে ১২০০৲ ও তার পর মাসে মাসে ৩০০।৪০০৲ আয় যে কোন ব্যবহারজীবীর পক্ষে শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

১৯০১ সালে তিনি একবার দেশে যান। ফলে ম্যালেরিয়ার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন; সারিয়া উঠিতে তাঁহার প্রায় বৎসরাবধি সময় লাগিয়াছিল।

১৯০২ সালে গবর্মেণ্ট তাঁহাকে অস্থায়ী ভাবে মুন্সেফ নিযুক্ত করিয়া বস্তিতে পাঠান। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি এই চাকরী গ্রহণ করেন, ফলে কিন্তু তাঁহার এই সময় হইতে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভই হয়। তাঁহার চাকরী-জীবনের ইতিহাসের প্রধান ঘটনাগুলি,—গোরক্ষপুরের মুন্সেফী (১৯০৪-৯), আলীগড়ের সব-জজীয়তী (১৯১৬), জেলা-জজীয়তী (১৯১৯-২৪), হাইকোর্টের জজীয়তী (১৯২৪-৩৪)। ১৯২১ সালে তাঁহাকে ভারত-গবর্মেণ্টে ডেপুটেশনে যাইতে হয়, কারণ সে সময়ে তাঁহার Transfer of Property সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও গবেষণার সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত এবং আদৃত। ১৯৩২ সালে তিনি "স্যর" উপাধি লাভ করেন। তাহার বহু বৎসর পূর্ব্বে তিনি রায় বাহাদুর হইয়াছিলেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টে তিনি দুই বার প্রধান বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

এই প্রসঙ্গে তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা স্বনামধন্য ও সর্ব্বজন-মান্য ডাক্তার জয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর, মহাশয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। সত্যনিষ্ঠ, নিস্পৃহ ও বৈরাগ্যমণ্ডিত ব্রাহ্মণ জয়গোপালকে লক্ষ্ণৌ শহরে কে না চেনে? সেখানে মেডিকাল কলেজে বহু বৎসর Pathologyর অধ্যাপকের কাজ করিয়া তিনি এখন অকালে অবসর গ্রহণ করিয়া তাঁহার অতি সাধের বাগান ও অধ্যাত্ম-চর্চ্চা লইয়া শারীরিক রক্তের চাপের পীড়ার বিরুদ্ধে মানসিক শান্তি নিয়োজিত করিয়া বাদশাবাগের বাড়ীতে প্রায় নির্জ্জনেই বাস করিতেছেন।

৬০ বৎসর বয়সে পেন্সন লইবার পরও লালগোপালকে

চাকরী হইতে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। কাশ্মীরের রাজ-দরবার তাঁহাকে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের "ন্যায় সচিব" বা Judicial Minister নিযুক্ত করেন, কিন্তু তিনি দুই বৎসর মাত্র, তাহাও মাঝে মাঝে, কাজ করিয়া শেষে ১৯৩৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি মসুরী পাহাড়ে বিখ্যাত চার্লভিল হোটেলের কাছে একখানি বাড়ী ক্রয় করেন ও অবসর গ্রহণের পর গরমের পাঁচ-ছয় মাস সেইখানেই থাকিতেন। বাকী সময়ের অধিকাংশই তিনি এলাহাবাদের বাড়ীতে পরিবারবর্গের সহিত কাটাইতেন।

১৯৪১ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্য মোটের উপর ভালই ছিল, যদিও তাহার দেড় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর দেহান্ত হইবার পর হইতেই তাঁহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ তেমন আর দেখা যায় নাই। আমার বিশ্বাস যে তাঁহার অসাধারণ আত্ম-সংযম পত্নী-বিয়োগের দারুণ শোককে বাহিরে প্রকাশ হইতে দেয় নাই বলিয়া তাঁহার অন্তর কাতর ও পীড়িত হইয়া পড়িতেছিল। তাহার উপর তাঁহার বহু দিনের হাঁপানি রোগ দেহযন্ত্রকে ক্রমশঃ জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল। যে কারণেই হউক, ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে মসুরীতে তাঁহার রক্তের চাপ হঠাৎ বাড়িয়া উঠে এবং অন্যান্য উপসর্গও দেখা দেয়। চিকিৎসক-গণের পরামর্শ মত তিনি পাহাড় হইতে নামিয়া আসেন ও প্রথমে মোরাদাবাদে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের নিকট ও পরে এলাহাবাদে প্রথম পুত্রের নিকটে বাস করিতে থাকেন। শীতকালে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়ে ও একাধিক বার তাঁহার ধমনী কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া জ্ঞান-সঞ্চার করিতে হয়। এই সময়ে তিনি "প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের" সভাপতি ছিলেন বলিয়া আমাকে ডাকাইয়া পাঠান ও বারাণসী অধিবেশনে যাহাতে সম্মেলনের কোন প্রকার অনিষ্ট বা কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্কোচ না হয় তজ্জন্য উপদেশ দেন। তাঁহার অবস্থার কিছু উন্নতি দেখা দেওয়ায় কিছু দিন তাঁহাকে লক্ষ্ণৌতে তাঁহার ভ্রাতা জয়গোপালবাবুর নিকট প্রসিদ্ধ ডাক্তার বীরভান ভাটিয়ার চিকিৎসাধীন রাখা হয়। আমরা জুন মাসে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু দেখা করিতে দেওয়া হয় নাই, তাঁহার অবস্থা তখন এতই খারাপ ছিল। জুলাই মাসের শেষে, তাঁহার নিজের বিশেষ অনুরোধ ও আগ্রহের ফলে, তাঁহাকে প্রায় সেই অবস্থায় এলাহাবাদের বাস-ভবনে ফিরাইয়া আনা হয়। ৯ই আগষ্ট তারিখে স্বজন-পরিবৃত অবস্থায় তাঁহার দেহান্ত হয়।



কাশ্মীর রাজ্যের ন্যায়-সচিব বেশে স্যর লালগোপাল

তাঁহার পরলোকগমনে এলাহাবাদের বাঙালী-সমাজের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হওয়া প্রায় অসম্ভব। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মেজর বামনদাস বসু, ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার কৃতী পুত্র ললিত-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে পর পর হারাইয়া আমরা অনাথ হইয়া পড়িয়া-ছিলাম। কিন্তু লালগোপাল একাই সেই সকল ধুরন্ধর বঙ্গ-সন্তানদের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং কোন প্রতিষ্ঠানকেই কোন প্রকারের অভাব অনুভব করিতে দেন নাই। যেখানে জল পড়িয়াছে সেখানেই তিনি ছাতা ধরিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ সৌজন্য ও মিষ্ট ব্যবহার, তাঁহার কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সেই সঙ্গে সর্ব্বত্র সম-ভাবের সেবাপরায়ণতা, তাঁহাকে সকলের নিতান্ত "আপন জন" করিয়া রাখিয়াছিল। ২০ বৎসর ধরিয়া তিনি এলাহাবাদের কি যে ছিলেন তাহা কাহাকেও জীবদ্দশায়

বুঝিতে দেন নাই, আজ আমরা তাঁহার অভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি।

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তাঁহার প্রাতর্ভ্রমণ, আহার ও বিশ্রামের সময় সুনির্দ্দিষ্ট ছিল, তেমনই জনসাধারণের কাজে তিনি কখনও প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দিতেন না, এবং কোন কারণে নিয়ম ভঙ্গ হইলে তিনি অত্যন্ত কষ্ট বোধ করিতেন। তিনি বলিতেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা তত দিন ভাল হইবে না যত দিন না কর্ম্মকর্ত্তারা স্ব-ইচ্ছায় এবং কর্ত্তব্যবোধে বাঁধাধরা নিয়মের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিবেন। এলাহাবাদের প্রায় সকল বাঙালী প্রতিষ্ঠান-গুলির সহিত তিনি নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁহার গভীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় মাত্র একটি উদাহরণের দ্বারা দিতে পারা যায়।

প্রায় আঠার বৎসর পূর্ব্বে যখন মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের স্মৃতি-বিজড়িত "জগত্তারণ গার্লস্ হাই স্কুলে"র অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে, তখন লালগোপালবাবু হাইকোর্টের জজ হওয়া সত্ত্বেও ঐ বিদ্যালয়ের সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়া স্ব-ইচ্ছায় সম্পাদক বা সেক্রেটরীর কার্য্য গ্রহণ করেন ও কয়েক বৎসর নানা প্রকারে চেষ্টা করিয়া বিদ্যালয়টির অবস্থা ফিরাইয়া আনেন। একবার বিদ্যালয়-সংক্রান্ত কোন কাজের জন্য তৎকালীন শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর ম্যাকেঞ্জী সাহেবের সহিত তাঁহার দেখা করিবার প্রয়োজন হয়। হাইকোর্টের জজ আদব-কায়দা অনুসারে নিম্নপদস্থ ডাইরেক্টরের নিকট যাইতে পারেন না, সেই কারণে তিনি ম্যাকেঞ্জী সাহেবকে স্বগৃহে চায়ের নিমন্ত্রণে ডাকেন ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করেন।

এলাহাবাদের এংলো-বেঙ্গলী কলেজ ও কর্ণেলগঞ্জ হাই স্কুলের সভাপতির পদে তিনি বহু বৎসর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং স্থানীয় বাঙালী বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, কালীবাড়ী, ব্যায়াম-সমিতি, নাট্য-সমিতি প্রভৃতিকে নিয়মিত অর্থ-সাহায্য করিতেন। তাহা ছাড়া হিন্দু-মিশন, রামকৃষ্ণ-মিশন, হরিজন-সেবক-সংঘ প্রভৃতি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান-গুলিও তাঁহার নিকট প্রচুর অর্থ-সাহায্য পাইত। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের Court ও Faculty of Law এবং কিছু দিনের জন্য Executive Council-এও তিনি সদস্য ছিলেন এবং হরিজন-আশ্রম, পাবলিক লাইব্রেরি, ক্রসুয়েট গার্লস্ কলেজ ও অধুনা-স্থাপিত কমলা নেহরু হাসপাতালের পরিচালক-সমিতির সভ্য ছিলেন। সকলেই তাঁহার উপস্থিতি এবং পরামর্শ মূল্যবান্ বলিয়া মনে করিতেন।

লেখকের নিকট লালগোপালবাবুর অন্তরের পরিচয় ক্রমশঃ প্রকাশিত হয় "প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে"র বিংশবর্ষব্যাপী কর্ম্মক্ষেত্রে। সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয় ১৯২৩ সালে প্রয়াগে ও সেই বৎসর লাল-গোপালবাবু সভায় সমাগত সকলকে স্বাগত-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। সেই যে পরিচয়-সূত্র তাঁহাকে সম্মেলনের সহিত আবদ্ধ করিল তাহা বিংশতি বৎসর পরে কেবলমাত্র কাল আসিয়াই ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৯২৫ সালে কানপুর অধিবেশনে অতুলপ্রসাদ সেন, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কাশীর) ললিতবিহারী সেন রায়, ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ প্রবাস-গৌরব মনস্বিগণের সহিত লালগোপালবাবুও যোগদান করিয়া সম্মেলনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এলাহাবাদে প্রথম যখন সম্মেলনের কেন্দ্র ছিল তখন তিনি তাহার সভাপতি ছিলেন। পুনরায় যখন ১৯৪০ সালে কানপুর হইতে এলাহাবাদে কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় তখনও তাঁহাকেই তাহার কর্ণধার হইতে হয়। ১৯২৮ সালে ইন্দোরে এবং পুনরায় ১৯৩৪ সালে কলিকাতায় সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহাকে মূল-সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয়। তাঁহারই আগ্রহে ১৯২৯ সালে সম্মেলনকে রেজিষ্ট্রী করান হয় ও নয়াদিল্লীর অধিবেশনে তাঁহারই প্রস্তাবমত অতুলপ্রসাদের স্মৃতি-রক্ষার্থ "অতুল-স্মৃতি-ভাণ্ডার" স্থাপন করা হয়। বর্ত্তমানে সম্মেলনের যে বিপুল নিয়মাবলী আছে তাহা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং পরিচালক-সমিতির কার্য্যাবলীর প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁহার প্রবীণ অভিজ্ঞতা ও নিপুণ কর্ম্ম-কুশলতার নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। তাঁহার "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" উপদেশমালা আবার যে কবে কি ভাবে কাহার কাছে আমরা পাইব তাহা শুধু বিধাতাই জানেন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অন্ধ গতানুগতিকতার বিষময় ফল সম্বন্ধে একটা বিষয় লইয়া তিনি প্রায়ই বলিতেন যে যত দিন না আমরা আমাদের খাওয়া-দাওয়া ও রান্নাবান্নার নিয়ম বা অভ্যাস সমূলে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিব তত দিন আমাদের জাতীয় উন্নতি সম্ভব হইবে না। আমাদের ঘরের মেয়েদের জীবন ক্ষয় হয় সারাদিন রান্না করিতে করিতে ও পুরুষদের শক্তির অপব্যয় হয় সেই রান্না উদরস্থ করিয়া হজম করিতে করিতে। অথচ, সেই রান্নামাত্র কার্য্য লইয়া মেয়েদের জীবন কোন মতেই বিস্তার

বা গভীরতা লাভ করিতে পারে না, এবং সেই রান্নায় এমন কিছু প্রচুর প্রয়োজনীয় বা পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী থাকে না যাহা পুরুষদের অজীর্ণ রোগ বা অন্যান্য পীড়া হইতে রক্ষা করিতে পারে। এই অভিমত তিনি প্রথম ১৯৩৩ সালে সম্মেলনের গোরক্ষপুর অধিবেশনে প্রকাশ করেন; পরেও অনেক বার উহার পুনরুক্তি করিয়াছিলেন।

তাঁহার অসাধারণ সৌজন্যের কথা সকলেই জানেন। বড় ছোট ও ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার নিকট ভদ্র ও মিষ্ট ব্যবহার পাইতেন। কেহ তাঁহার নিকট আসিলে তিনি স্বয়ং ঘরের বাহিরে আসিয়া স্বাগত সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ঘরে লইয়া গিয়া আসনে বসাইতেন এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা শেষ হইলে অভ্যাগতের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দিতেন। যাহার যাহা বক্তব্য তাহা তিনি অসীম ধৈর্য্য ও মনোযোগের সহিত কর্ণগোচর করিতেন এবং ধীরভাবে স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিতেন। তাঁহাকে কোন পরিস্থিতিতেই চঞ্চল বা বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই এবং কখনও তাঁহার ব্যক্তিগত সদ্ব্যবহারের ব্যতিক্রম হইতে দেখি নাই। ১৯৪০ সালে যখন আমি প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় শয্যাগত, তখন তিনি প্রায় প্রত্যহ আসিয়া চুপি চুপি আমার অজ্ঞাতে আমার স্ত্রীর নিকট আমার অবস্থা জানিয়া গিয়াছেন ও নিজের আন্তরিক কল্যাণ-কামনা জানাইয়া গিয়াছেন। কত দুঃখী, আতুর ও অভাবগ্রস্তকে যে তিনি কতভাবে সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়া গিয়াছেন তাহার হিসাব শুধু সর্ব্বজ্ঞ ভগবানই জানেন। মহাপ্রাণতার এমন জীবন্ত নিদর্শন ক্রমেই বিরল হইয়া পড়িতেছে।

তাঁহার শেষ লেখা সম্মেলনের বুলেটিনে গত বৎসর "শারদীয়া" সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সে কথাগুলি বাঙালী মাত্রকেই পুনরায় জানাইতে চাই। তিনি নিজে যেমন কর্ম্মবীর ও দানবীর ছিলেন, ঠিক তেমনিভাবেই বাঙালীর পৌরুষ ও কর্ম্মশক্তি জাগাইবার জন্য মহাভারতের কর্ণের ভাষায় সকলকে মনে রাখিতে অনুরোধ করেন এই শ্লোকে—

সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহং।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং চ পৌরুষং॥ *

* এই লেখার অন্তর্গত তারিখ, নাম ও স্থানগুলি এবং ছবি স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথের সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়াছি।—লেখক।

রবীন্দ্রনাথের গান

শ্রীকমলেশ রায়, এম. এসসি.

গানে সুর প্রধান কি কথা প্রধান এ নিয়ে তর্ক আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। উত্তর দিতে গিয়ে হিন্দী গান বা হিন্দী ক্লাসিক্যাল গানের তুলনা টেনে আনি। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় তর্কের সুরু বাংলা গান নিয়ে।

এ কথা হয়ত অস্বীকার করা যায় না যে, সুরের ঠাটই শ্রোতার মনকে সবার আগে আকর্ষণ করে এবং গীতি-কাব্যের মূল কাঠামোকে সুরই লীলায়িত রূপ দেয়। কাঠামোর চেয়ে পটুয়ার শিল্প-চাতুর্য্য যদিও দর্শকের মনে প্রথমেই শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে, তবু প্রাণ-প্রতিম মূর্ত্তি গঠনে সুষ্ঠু কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা কতখানি, সে সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করবে না। তবে এটাও অসম্পূর্ণ উপমা। সঙ্গীতে কথা-কাব্য শুধু কাঠামো নয়, কেননা কথা ছাড়াও সঙ্গীত সম্ভব। এই সঙ্গীত ব্যাপক অর্থে বলছি, ইংরেজিতে যা music ব'লে অভিহিত। যন্ত্র-সঙ্গীত বা কথা-কাব্য-বিহীন কণ্ঠ-সুরলহরীও music-এর পর্য্যায়ভুক্ত।

সাধারণ গানে সুর ও কথার প্রাধান্য বিচার করা যতটা সহজ ব'লে মনে হ'তে পারে, রবীন্দ্রনাথের গানে সে সমস্যা আরও জটিল হয়ে দেখা দেয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সুর আছে, কাব্য আছে, আর আছে—সুর ও কাব্যের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়। তাই সে গানে 'সুর প্রধান না কথা প্রধান' এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না। অথবা এ কথাও বলা

যায় যে, এক্ষেত্রে কোনটির প্রাধান্যের প্রশ্নই ওঠে না, কেননা তাদের ঠিক পৃথক্ ক'রে দেখা যায় না,—তারা যেন অচ্ছেদ্য।

বাংলার নিজস্ব গানে কীর্ত্তন, বাউল, ভাটিয়ালের স্থান ব্যাপক। সে গানেও কাব্যরসের প্রাচুর্য্য দেখতে পাওয়া যায়। শুধু বাংলা দেশ ব'লেই নয়, কণ্ঠ-সঙ্গীতে কাব্যের স্থান সকল দেশে, সকল কালেই আছে ও থাকবে। যন্ত্রে সঙ্গীত উৎপন্ন হয়, কণ্ঠেও হয়। কিন্তু কণ্ঠে কাব্য উচ্চারিত হয়, যন্ত্রে হয় না। যেখানে শুধু সুরের ধারার প্রয়োজন সেখানে দুইই চলতে পারে; যেখানে হৃদয়ের কথার প্রস্ফুট অভিব্যক্তির প্রয়োজন সেখানে কণ্ঠ-সঙ্গীতই একমাত্র সহায়। এক্ষেত্রে সঙ্গীতে কাব্যের প্রয়োজন নেই বা প্রয়োজন অল্প তা কি ক'রে বলি? আর সঙ্গীতে সুরের প্রয়োজনীয়তা নেই এ কথাই বা কে বল্‌বে? তবে প্রধান কোন্‌টি এ প্রশ্নের উত্তর উত্তরদাতার রুচি ও রসবোধের উপর অনেকটাই নির্ভর করবে। রুচি মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে শিক্ষা, সাধনা ও আপনার সংস্কৃতির ভিত্তিতে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত উপলব্ধি করতে হ'লে এক প্রকার সূক্ষ্ম সমতাজ্ঞান বা balanced temperament থাকা প্রয়োজন। এই ব্যালান্সের চরম ও উৎকট ব্যতিক্রম দেখা যায় কোন কোন ক্লাসিক্যাল গায়কের মধ্যে। মনে হয়, ক্লাসিক্যাল গানে সঙ্গীত-ব্যাকরণের অতিমাত্রা কঠোরতা ও গোঁড়ামির জন্য সেখানে কাব্যের স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়ে আছে, এবং আমরাও তাতে অনেকটা অসহায় ভাবে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছি। গীতিকাব্যের রচনায় রচয়িতার অধিকার, গায়কের সম্পদ কণ্ঠ মাধুর্য্যে ও লয়-জ্ঞানে। এই কারণে সকল গায়ক আপনার স্বর সাধনায় গভীর ভাবে নিমগ্ন—তাঁদের কাছে সুরসাধনাই একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান। কিন্তু সুর ও কাব্যের সাধনা যে একই বাণীর বন্দনা এ কথা ভুলে যাই কেন? সঙ্গীতে এই ভুল কত বড় ক্রটি!

সুর লয় আয়ত্ত করতে গিয়ে যে সাধনায় গায়ক মগ্ন হন তারই ফলে পরে তিনি সুর-লয়ের প্রাধান্য সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হ'য়ে ওঠেন। কিন্তু এই সাধনা কেন? ভুলে যাই এই সাধনা সঙ্গীতের আংশিক সাধনা মাত্র। এই আংশিক শিক্ষা ও সাধনার ফলে যে ক্রটি গানের মধ্যে প্রকাশ পায় তা ভাবজগতের পক্ষে অত্যন্ত নির্ম্মম। শ্রোতার মনও সে জগতের উদ্দেশ না পেয়ে একমাত্র সুরের রাজ্যে আশ্রয় খুঁজে ফেরে। কিন্তু যে গায়ক সঙ্গীতের কাব্যরসকে স্বীকার ক'রে সুরের তরী ভাসাতে পারেন তাঁর কণ্ঠের সঙ্গীতে অপার্থিব ভাব শ্রোতার মনকে অপূর্ব্ব রসে আপ্লুত করবেই। তবে এরূপ গায়ক দুর্লভ।

ঠিক এই কারণেই রবীন্দ্র-সঙ্গীত অনেক ক্ষেত্রে নিরর্থক হয়। যেখানে কর্ম্মকোলাহলে গায়ক ও শ্রোতার ধৈর্য্য অল্প, যেখানে গভীরতা উপলব্ধির পরিবেশ নাই, সেখানে রবীন্দ্রনাথের অনেক গান অনেক সময়ই নিষ্প্রভ ব'লে মনে হবে। কিন্তু সেই গানগুলিই আবার সুসঙ্গত পরিবেশের মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে তাদের পূর্ণ ভাবধারা নিয়ে। এই ধরণের গানগুলি বেশীর ভাগ কাব্য ভাবধারায় পূর্ণ, হয়ত সুরের উচ্ছলতা স্বল্প। কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীত মাত্রেই সব এই ধরণের তা নয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সুরের সাবলীল উচ্ছলতা বা dynamic ভাবেরও প্রাচুর্য্য দেখতে পাওয়া যাবে। তাঁর অনেক গানই ঠুংরী চালে এবং বিদেশী ধরণের শ্রুতিমধুর মীড়ে পরিপূর্ণ,—তবে তা অত্যন্ত সুসংযত ও অনুপাতসম্মত। কোন সুরই তাঁর কাব্যকে উপেক্ষা করে নাই, কাব্যের কোন পংক্তিও সুরসঙ্গীর হাত ছাড়ে নাই। এই সমন্বয়ই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রধান বিশেষত্ব।

টেক্‌নিকের দিক থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আরও কতকগুলি বিশেষত্ব দেখবার আছে। একটি বিশেষত্ব modulation বা যাকে বলা যেতে পারে সঙ্গীতিক ভাবাবেগ এবং তারই ফলে স্বরতেজের উত্থান-পতন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে এর অপূর্ব্ব প্রস্ফুটন দেখতে পাই। এই মডিউলেশনের মধ্যে বিদেশী সঙ্গীতের প্রভাব আছে, কিন্তু বাংলা গানে তার অভিব্যক্তি রবীন্দ্র-সঙ্গীতে একান্ত নিজস্ব হয়ে গিয়েছে। এই মডিউলেশনের ভিত্তি কাব্যাংশের ভাবাবেগ, আবার এই ভাবাবেগ মডিউলেশনের মধ্য দিয়েই শ্রোতার মর্ম্ম স্পর্শ করবার পথ ক'রে নেয়।

আধুনিক বাংলা গানে vibrato-র প্রবর্ত্তক রবীন্দ্রনাথ। ইংরেজি গানে এই ভাইব্রেটো বা স্বর-কম্পন সঙ্গীতে ভাব গ্রহণের একটি প্রকৃষ্ট উপাদান ব'লে পরিগণিত। টানা দাঁড়ানো সুরের অধিকাংশ স্থলে এই কম্পন বাংলা গানে বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়। বিলাতী গানে vibrato-র কম্পন দ্রুত ও তীক্ষ্ণ, কিন্তু বাংলা গানে তা শ্রুতিকটু হবে। রবীন্দ্রনাথের গানে—এবং তার পর থেকে আধুনিক বাংলা গানে—এই ভাইব্রেটো অপেক্ষাকৃত মন্থর ও তরঙ্গায়িত রূপ নিয়েছে। সুরের এই আবেগ স্পন্দন স্বরলিপির অন্তর্ভূক্ত নয়, এবং এর প্রয়োজনার সাফল্য একান্ত ভাবে নির্ভর করে গায়কের ভাবানুভূতির উপর। মডিউলেশনেও তাই।

এই কারণে রবীন্দ্র-সঙ্গীত আয়ত্ত করা সকলের পক্ষে সহজ-সাধ্য নয়।

ভাইব্রেটো বা এই প্রকার স্বর-কম্পন সম্বন্ধে দেশী এবং বিদেশী সঙ্গীতজ্ঞদের বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশের এবং বিলাতের সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে এক দল আছেন যাঁরা এই স্বর-কম্পনের বিরোধী। তাঁদের মতে এই কম্পন সুরের গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়, অর্থাৎ বেসুরো হয়। কথাটা এক দিক দিয়ে ঠিক বটে। কারণ সুরের এই স্পন্দন সাধারণতঃ সুরের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ একশ্রুতি, ওঠা-নামা করে—যদিও তাদের মধ্যরেখা সুস্বরেই ন্যস্ত থাকে। যাই হোক, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এখানে প্রয়োজন হবে না। তবে প্রাচীন-পন্থীদের এই আপত্তি কালের প্রভাবে টিকবে না দেখা যাচ্ছে। কারণ সঙ্গীতের সুরে স্পন্দনহীন টানা সুর থাকতে হবে তার কোনও মানে নেই, কারণ সুরের বিবর্ত্তনেই সঙ্গীতের উৎপত্তি। এত ব্যাপক ক'রে বলবারও কোন প্রয়োজন নেই। সুরের ভাব-স্পন্দন বা ভাইব্রেটো ভাবাবেগ প্রকাশ বা গ্রহণের একটি প্রধান উপাদান এ কথা আজকাল প্রায় সকল সঙ্গীতজ্ঞই স্বীকার ক'রে থাকেন এবং প্রয়োগ ক'রে থাকেন। তবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, এই স্পন্দন যেন স্বাভাবিক অনুভূতি ও আবেগ থেকে উৎপন্ন হয়। ক্লাসিক্যাল গানে, যেখানে কথাগুলি সুরের অবলম্বন বা কাঠামো মাত্র সেখানে স্বর-স্পন্দনকে হয়ত বাদ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু যেখানে কাব্যের ভাবরাজ্যও বর্ত্তমান, সেখানে ভাইব্রেটো ও মডিউলেশন স্বাভাবিক পরিণতিতে এসে পড়বে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তাই এই বিদেশী গুণ দুটি আমাদের দেশী রূপ ধরে ফুটে উঠেছে। তবে এটুকুও বলে রাখা প্রয়োজন যে, কাব্য-সঙ্গীতেই শুধু ভাবাবেগ আছে আর তার জন্য ভাইব্রেটো ও মডিউলেশন দরকার তা নয়, যন্ত্র-সঙ্গীতেও তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাক্যহীন যন্ত্র সঙ্গীতেও ভাবের আবেগ বর্ত্তমান—কখনও সে বিষাদে স্তিমিত হয়ে আসে, কখনও কেঁপে ওঠে করুণায়, কখনো বা ফুঁসে ওঠে তীব্র উচ্ছ্বাসে। বেহালা, বাঁশী, স্বরোদ—সব বাজনাতেই ভাইব্রেটো ও মডিউলেশন ফুটে ওঠে সুদক্ষ শিল্পীর হাতে।

এ পর্য্যন্ত গান শুনবার দিক থেকে বিষয়টি আলোচনা করেছি। সঙ্গীতের আরও একটি দিক আছে, গান গাইবার। গান শুনতে যেমন ভাল লাগে, গান গাইতেও তেমনই ভাল লাগে। পরকে শোনানোর জন্যই যে গান গাইতে ভাল লাগে তা নয়,—এই ভাল লাগা একান্ত ভাবে নিজের তৃপ্তি। এই তৃপ্তি কিসে? এই তৃপ্তি কেন? —মানুষ পার্থিব আবেষ্টনীতে ক্লান্ত। কিছুক্ষণের জন্য সে এমন রাজ্যে যেতে চায় যেখানে পার্থিব পঙ্কিলতা, ক্ষুদ্রতা তাকে স্পর্শ করতে না পারে। তাই মানুষের জীবনে কাব্য ও সঙ্গীতের একান্ত প্রয়োজন।

গান গাইবার আনন্দেরও তেমনই দুটি দিক আছে—সুর এবং কাব্য ভাব। লীলায়িত সুর কণ্ঠে উৎপন্ন করলে দেহ মনে যেমন অপূর্ব্ব আবেশ অনুভূত হয়, কাব্যরসসিক্ত গানের উচ্চারণের সঙ্গে তেমনি ভাবাবেগ আসে। কিন্তু কাব্য-সঙ্গীত—বিশেষতঃ রবীন্দ্র-সঙ্গীত—স্থান কাল ও আবেষ্টনী সম্বন্ধে বড় সচেতন: এ কারণে সেই সূক্ষ্ম অপার্থিব পথচারীকে অতি শুচিতার সঙ্গে হৃদয়ে গ্রহণ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের গানের কাব্যাংশ ও সুর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ—তাদের জন্ম হয়েছে কবিহৃদয়ের নিগূঢ় অনুভূতির মধ্য থেকে।

রবীন্দ্রনাথের গানগুলির কথা ভাবতে গিয়ে সবার আগে মনে পড়ে তাঁর অতলস্পর্শী বর্ষা-সঙ্গীতগুলির কথা। বিরাটের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে বরষণ-গভীর আবেষ্টনীতে—সুন্দরের আবির্ভাব হয় জলভরা বরষায়। আলোয় যার রূপ উজ্জ্বল, শরতে বসন্তে যে উচ্ছল প্রাণময়, আষাঢ়ের ছায়ায় তার রূপ স্নিগ্ধ, গভীর, মন্থর, পরিপূর্ণ।

"কদম্বেরি কানন ঘেরি আষাঢ় মেঘের ছায়া খেলে"—

গানখানি অপূর্ব্ব লাগে। সুরও ছায়াময় গভীর।

…"ঝিল্লিমুখর বাদল সাঁজে
কে দেখা দেয় হৃদয়মাঝে,
স্বপনরূপে চুপে চুপে ব্যথায় আমার চরণ ফেলে।"

প্রকৃতির বিরহসজল রূপের সঙ্গে অন্তরের গভীর অনুভূতির অপূর্ব্ব সমন্বয় হয়েছে এই গানে।

কিন্তু,

"গগনে গগনে আপনার মনে
কী খেলা তব।
তুমি কত বেশে নিমেষে নিমেষে
নিতুই নব।"—

গানখানি একটি মূর্ত্ত চিত্র বললেও হয়। 'কদম্বেরি কানন ঘেরি'র চেয়ে এ গানটি অনেক dynamic,—ভাব ও সুর উভয় দিক থেকেই।

কিন্তু এর চেয়েও উচ্ছল—

এসো নীল বনে ছায়াবীথিতলে,
এসো করো স্নান নবধারা জলে।

দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ,
কাজল নয়নে যূথীমালা গলে
এসো নীল বনে ছায়াবীথিতলে।

প্রত্যেকটি গানের মধ্যেই mood-এর নিবিড় পরিচয় রয়েছে—প্রকৃতির ও অন্তরের।

সুর ও কাব্যের সমন্বয় ভাবতে গেলে শরতের গানগুলি মনে পড়ে।

এই শরৎ-আলোর কমল-বনে
বাহির হ'য়ে বিহার করে
যে ছিল মোর মনে মনে।—

প্রভাতী সুরের আবেশে শরৎ-প্রাতের স্বচ্ছ স্নিগ্ধতা হৃদয়ের মাঝে যেন বাসা বাঁধে।

আমার নয়ন ভুলানো এলে
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলি তলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে,
অরুণ রাঙা চরণ ফেলে,
আমার নয়ন ভুলানো এলে।...

বাহিরের সোনালি রূপের সঙ্গে অন্তরের আনন্দরসের অপূর্ব্ব সমাবেশ!

কোথায় সোনার নূপুর বাজে
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে সকল কাজে
পাষাণ গালা সুধা ঢেলে,
আমার নয়ন ভুলানো এলে।

রবীন্দ্রনাথের গানগুলি উদ্ধৃত ক'রে বিশ্লেষণ করবার আর প্রয়োজন নেই, কারণ সেটা তাঁকে দিয়েই তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা হবে মাত্র। এবং কাব্যাংশ দিয়ে সম্পূর্ণ সঙ্গীতের রস বিশ্লেষণ করা সম্ভবও নয়। সঙ্গীত বোঝাবার বিষয় নয়, উপলব্ধি করবার বিষয়।

বাঙ্গলায় ক্ষত্রিয় হিন্দু-সংগঠন

স্বামী বেদানন্দ

বর্ত্তমান বাঙ্গালী হিন্দুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কে বলিবে যে বাঙ্গলা দেশে কোন কালে ক্ষত্রিয় জাতি ও ক্ষত্রিয় বীর্য্যের বিকাশ-প্রকাশ ছিল? ইতিহাসের বাণী কিন্তু ভিন্ন প্রকার। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যুগের বিবরণ প্রমাণ দেয়—বাঙ্গালী হিন্দুর দুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয় বীর্য্য একদিন বিশ্ববিজয়ী সামর্থ্য প্রদর্শন করিয়াছিল। বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের অন্তর্গত মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়, রাজবংশী, কৈবর্ত্ত, বাগ্দী প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষগণই সে দুর্ব্বার ক্ষত্রিয় শক্তির সাধক ছিল। আত্মবিস্মৃত হিন্দু, আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী—আজ সেই ইতিহাস, সেই গরিমা-দীপ্ত কীর্ত্তিকাহিনী স্মরণ করিবার গৌরবও তার নাই।

মহাভারতীয় যুগের জরাসন্ধ, পৌণ্ড্র বাসুদেব, নরকাসুর, বাণ, মুরদৈত্য, মধুদৈত্য, কীচক, ঘটোৎকচ, ভগদত্ত প্রভৃতি সম্রাট, রাজা ও বীরগণ বাঙ্গালী ছিলেন। মগধ হইতে প্রাগ্জ্যোতিষপুর (গৌহাটী) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড ইঁহাদের জন্মস্থান। জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধে সপ্তদশ বার পরাজিত হইয়া যাদবগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ সুদূর দ্বারকা নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়রাজ পৌণ্ড্র বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযানপূর্ব্বক সুদূর দ্বারকা নগরী অবরোধ করেন। সম্রাট্ দুর্য্যোধন তথা দুর্দ্ধর্ষ কৌরব-বাহিনী কীচক-রক্ষিত বিরাট্ রাজ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হইত না। বাণ, নরকাসুর, মুরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সংঘর্ষ হয়। ঘটোৎকচ ও ভগদত্তের অতুলনীয় বীরত্ব কুরুক্ষেত্রে দেখিতে পাই।

ঐতিহাসিক যুগে দেখি—বিশ্ব-বিজয়ী বীর সেকেন্দর শাহ দুর্জ্জয় গঙ্গারাঢ়ী সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পশ্চাদপসরণ করেন। পাশ্চাত্য কবি ভার্জ্জিল তদীয় কাব্যে লিখিয়াছেন—"গঙ্গারাঢ়ী (বাঙ্গালী) সৈন্যদের বিক্রমের কথা হস্তিদন্ত ও স্বর্ণের অক্ষরে লিখিয়া রাখার যোগ্য।" সম্রাট্ অশোককে প্রথম জীবনে কলিঙ্গ (বর্দ্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর) সৈন্যগণের সহিত ত্রিশ বৎসর যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বাঙ্গালী নৌ-সৈন্যের নিকট পরাজিত হন। বাঙ্গালী সৈন্য-বাহিনী দিগ্বিজয়ী কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের রাজধানী আক্রমণ করিয়াছিল। বাঙ্গলার কর্ণ-সুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্রের সহিত যুদ্ধে সম্রাট্ রাজ্যবর্দ্ধন

পরাজিত ও নিহত হন। বাঙ্গালার বৌদ্ধ পাল-সম্রাট্‌গণ একদা ভারতব্যাপী বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। বাঙ্গালার ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের "রায় বাঘিনী" রাণী ভবশঙ্করীর সহিত যুদ্ধে পাঠান-সম্রাট্‌ কুতলু খাঁর বীর সেনাপতি ওস্মান খাঁ পর পর তিন বার পরাজিত ও বিতাড়িত হন। বাঙ্গলার বারো ভূঁয়ার প্রতাপে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরে"র সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিত। ঈশা খাঁ ও চাঁদরায়, কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধে মোগল সৈন্য কয়েক বার পর্য্যুদস্ত হয়। প্রতাপাদিত্য ও তৎপুত্র উদয়াদিত্যের বীর্য্যবত্তায় মোগল-বাহিনী আঠার বার পরাজিত হয়। বাঙ্গলার নৌ-সৈন্য তখন অজেয় ছিল। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ পাঠান ও মোগল রাজত্বের মধ্যাহ্নকালেও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল।

মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের মল্লক্ষত্রিয় ও মাহিষ্যগণই আলেকজাণ্ডার, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত ও ওস্মান খাঁর সহিত যুদ্ধে দুর্জ্জয় বিক্রম প্রদর্শন করে। পূর্ব্ববঙ্গের নমঃশূদ্র, কৈবর্ত্ত, জলদাসগণকে লইয়াই ঈশা খাঁ ও চাঁদ রায়, কেদার রায়ের দুর্দ্ধর্ষ নৌবাহিনী রচিত হইয়াছিল। পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়গণই (পোত বা পোতসৈন্য) রাজা প্রতাপাদিত্যের দুর্জ্জয় স্থল ও জল বাহিনী গঠন করিয়াছিল।

বাঙ্গালী হিন্দুর ক্ষত্রিয় বীর্য্য মুসলমান যুগে কদাচ স্তিমিত, কদাচ প্রজ্জ্বলিত ছিল; ব্রিটিশ শাসনে সে ক্ষত্রিয় বীর্য্য নির্ব্বাপিত। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষেত্রে বাঙ্গলার ক্ষত্রিয় শক্তির স্থান রহিল না। বিদেশী শাসনকর্ত্তার বিধানে নিরস্ত্র বাঙ্গালীর ক্ষত্রিয় বীর্য্য চর্চ্চার অভাবে ধীরে ধীরে তিরোহিত হইল। তথাপি রাজা ও জমিদারগণের অধীনেও তখন বরকন্দাজ-বাহিনী থাকিত। দেবী চৌধুরাণীর বরকন্দাজ-বাহিনী প্রসিদ্ধ। নড়াইলের তেজস্বী জমিদার রতন রায়ের বরকন্দাজ বাহিনী যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে আটক করিয়া রাখিয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ফোর্ট উইলিয়মে যখন আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন তাঁহার পিতা তেজস্বী জমিদার রাজনারায়ণ দত্ত সাত শত বরকন্দাজ-সৈন্য লইয়া ফোর্ট উইলিয়ম আক্রমণের সঙ্কল্প করেন।

বাঙ্গলার ক্ষত্রিয় বীর্য্যের খেলা রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বাঙ্গলার রাজা, জমিদার ও ধনী ব্যক্তিগণের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ধার্ম্মিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। জন্মাষ্টমী, বীরাষ্টমী, পৌষ-সংক্রান্তি, বিশ্বকর্ম্মা পূজা, কোজাগরী পূর্ণিমা, মনসাপূজা, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি পূজাপার্ব্বণ এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষ্যে নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, বাগ্‌দী, মল্লক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণীর সর্দ্দারগণ দলবল সহ লাঠি, ঢাল-সড়কী ও অসিখেলা প্রদর্শনপূর্ব্বক ক্ষত্রিয় বীর্য্যের অনুশীলন করিত। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও এইরূপ অস্ত্রশস্ত্র চর্চ্চার অভাব ছিল না।

রাষ্ট্র-গঠন ও রক্ষণের জন্য যেমন ক্ষত্রিয় শক্তির আবশ্যক, সমাজের শাসন ও রক্ষণের জন্যও তেমনই উহা অত্যাবশ্যক। বর্ত্তমানে বাঙ্গলার হিন্দু সমাজ আত্ম-রক্ষায় একান্ত অক্ষম। ভিতরের ও বাহিরের শত বিপদ, শত অত্যাচার, শত আঘাত বাঙ্গলার হিন্দু সমাজকে ক্রমাগত মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। উপায় কি? বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার উপায় কি?

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য "হিন্দু মিলন-মন্দির ও রক্ষীদল গঠন" কর্ম্মপদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। আত্মবিস্মৃত ও শতধা-বিচ্ছিন্ন হিন্দুজনগণকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে সংহত করিয়া জনশক্তি সংগঠন মিলন-মন্দিরের উদ্দেশ্য। আর আত্মরক্ষা সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ করিয়া সংহত হিন্দু জনগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় বীর্য্যের সঞ্চার রক্ষীদল-গঠনের উদ্দেশ্য। তিনি বলিতেন—"নমশূদ্র, মাহিষ্য, পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়, রাজবংশী—এরাই বাঙ্গলার লুপ্ত ক্ষত্রিয় জাতির বংশধর; এদের মধ্যে প্রসুপ্ত আছে—বাঙ্গালী হিন্দুর ক্ষত্রিয় বীর্য্য, এদেরকে জাগিয়ে তুললে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ আত্মরক্ষার সামর্থ্য ফিরে পাবে।" সঙ্ঘের বাজিত-পুর আশ্রমে বঙ্গীয় হিন্দু সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে অর্দ্ধ লক্ষাধিক জন-সমাগমে সর্দ্দারগণের অধীনে সহস্র সহস্র নমঃশূদ্র যোদ্ধারা যে বীরত্ব প্রদর্শন করে, তাহাতে ম্রিয়মাণ ব্যক্তির ধমনীতেও শোণিতস্রোত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। বিশ্বকর্ম্মা পূজা কোজাগর পূর্ণিমা, দশহরা প্রভৃতি উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে যে বিরাট্‌ বিরাট্‌ মেলায় সজ্ঞ হইতে অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত বহু নৌকায় সহস্র সহস্র নমঃশূদ্র সর্দ্দার সহ নৌকা বাইচ্‌ ও জলযুদ্ধের আয়োজন করা হয় উহার মধ্য দিয়া সম্মিলিত লক্ষ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে বীরত্বের উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। বাঙ্গালী হিন্দুজাতির ক্ষত্রিয় বীর্য্য এখনও সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই। শিক্ষা ও সংগঠনের মধ্য দিয়া মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়, রাজবংশী, মল্লক্ষত্রিয়, বাগ্‌দী প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দুগণকে উৎসাহ ও সহায়তা দান করিলে পুনরায় সমাজ-রক্ষাকারী ক্ষত্রিয় জাতি গড়িয়া উঠিবে—নিঃসন্দেহ।

বিদ্যাপতি ও বাংলা গীতিকাব্য*

শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম. এ., পি-এইচ্. ডি

বর্ত্তমান ভারতের সকল আর্য্য ভাষারই প্রাচীন যুগে অল্পবিস্তর গীতিকাব্য লেখকের সন্ধান মেলে, কিন্তু তাঁদের সকলের মধ্যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতিই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এহেন প্রতিভাবান্ ব্যক্তির রচনা তাঁর জন্মভূমির লোকদের নিকট বহু দিন যাবৎ অপেক্ষাকৃত অপরিচিত ছিল। মিথিলায় বিদ্যাপতির কাব্যের যে অনাদর তার ইতিহাস হয়ত বেশ প্রাচীন; রাজা শিবসিংহের মত অনুরাগী পেলেও, খুব সম্ভব বিদ্যাপতির সমসাময়িক নিন্দুকের অভাব ছিল না। এ শ্রেণীর লোকের প্রতি লক্ষ্য করেই তিনি তাঁর কীর্ত্তিলতার ভূমিকায় লিখে গেছেন :—

"বাল চন্দ বিজ্জাবই ভাসা, দুহু নহি লগ্গই দুজ্জন হাসা।" (নূতন চাঁদ ও বিদ্যাপতির উক্তি, দুর্জ্জনের উপহাস এ দুইকে স্পর্শ করে না)

উদ্ধৃত উক্তিটিতে বিদ্যাপতির যে দৃপ্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখতে পাই তাঁর সমুন্নত প্রতিভার পক্ষে তা মোটেই বেমানান হয় নি। বাঙালীর একান্ত গর্ব্বের বিষয় এই যে, বিদ্যাপতির কবিত্ব প্রতিভা সম্বন্ধে এ প্রদেশের জনসাধারণের প্রশংসমান দৃষ্টি বহু দিন থেকেই একান্ত জাগ্রত। এ সম্বন্ধে বাঙালীর অনুরাগ আশ্চর্য্যজনক ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল কবির জন্মস্থান সম্পর্কিত অজ্ঞতার সঙ্গে। বহু দিন যাবৎ এ প্রদেশের লোকের ধারণা ছিল যে তিনি বাঙালী কবি। বলা বাহুল্য, আজকালকার দিনে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে বিদ্যাপতির জন্মস্থান সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণা নেই। এখনকার সমস্যা হচ্ছে বিদ্যাপতির রচনাকে নির্ভুল ভাবে সনাক্ত করা নিয়ে। বিদ্যাপতির হাতে মৈথিল গীতিকাব্যের অভূতপূর্ব্ব বিকাশ হওয়ার পরে, উৎকল, বঙ্গ, আসাম প্রভৃতি দেশেও ধীরে ধীরে তার বিশেষ সমাদর ও তদানুষঙ্গিক অনুকরণ দেখা গিয়েছিল। বাংলা দেশে এ অনুকরণের স্রোত যে বিশেষ প্রবল হয়েছিল তার প্রধান কারণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও বিদ্যাপতির গীতে তাঁর পরম ভক্তি রসার্দ্র অনুরাগ।

বিদ্যাপতির ভাষা ও ভাব থেকে যে সকল বাঙালী পদকর্ত্তা গীতি রচনার প্রেরণা বা ইঙ্গিত পেয়েছিলেন তাঁদের সকলকে কেবল সাধারণ অনুকরণকারী বিবেচনা করলে চলবে না। তাঁদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি [যেমন, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস ইত্যাদি] অন্তরের রস-মাধুর্য্যকে এমন কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁদের পদ রচনায় রূপায়িত করেছেন যে, তাঁদের সৃজনীপ্রতিভা অস্বীকার করার জো নেই। নানা কারণে মনে হয়, নাম যশের খ্যাতি না চেয়ে ভাবের সহজ আবেগবশত শুধু রচনার আনন্দেও কেউ কেউ বিদ্যাপতির পন্থানুসরণে বিদ্যাপতির নামে বা উপনামে পদ রচনা করে গিয়েছেন। উল্লিখিত পদনিচয়েরও স্থানে স্থানে উচ্চশ্রেণীর কবিত্বের আভাস মেলে। এ সকল কারণে বিদ্যাপতির নামে প্রচারিত পদ সমূহের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি মৈথিল বিদ্যাপতির রচনা তা নির্ণয় করা অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ হয়ে পড়েছে। কিন্তু দুরূহ হ'লেও এ কাজটি সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের পক্ষে অবশ্য করণীয়। আর বিদ্যাপতির মতো এক জন প্রথম শ্রেণীর কবিকে তাঁর নিজস্ব সাহিত্যিক মহিমায় সমুজ্জ্বল দেখতে উৎসুক হওয়া সাহিত্য-রসিকদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক।

এখানে উল্লেখ থাকা উচিত যে, বিদ্যাপতির প্রভাব এ যুগের বাংলা গীতিকাব্যেও এসে পৌঁছেচে, আর এ প্রভাব স্বীকার করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'ই এ কথার প্রমাণ। কিন্তু এখানেই রবীন্দ্রনাথের উপর বিদ্যাপতির প্রভাব পর্য্যবসিত হয় নি। কবিগুরুর গদ্য রচনায় বহু স্থলে তিনি বিশেষ প্রশংসার সঙ্গে বিদ্যাপতির যে উল্লেখ করে গেছেন তার থেকেই জানতে পারা যায় মৈথিল কবির প্রতি তাঁর অনুরাগের গভীরতা। এমন অনুরাগ থাকাতে হয়ত তাঁর পরিণত বয়সের কবিতায়ও কদাচিৎ বিদ্যাপতির রচনায় এক-আধটু সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন তাঁর একটি প্রসিদ্ধ গানের গোড়ায় আছে :—

"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।"

প্রায় ঠিক এ ধরণের কথা বিদ্যাপতির একটি পদের গোড়ায়ও আছে :—

"সরস বসন্ত সময় ভল পাওলি
দছিন পবন বহু ধীরে।
সপনহুঁ রূপ বচন এক ভাখিএ
মুখ সোঁ দূর করু চীরে।" [পৃষ্ঠা ২৬৬]

কিন্তু কদাচিৎ এরূপ সাদৃশ্য আবিষ্কার করা গেলেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিদ্যাপতির কবিতা থেকে একেবারে পৃথক্ ধরণের। তবু যে এখানে ঐ স্বল্প সাদৃশ্যটি দেখান যাচ্ছে, তার উদ্দেশ্য শুধু বাঙালীর সঙ্গে বিদ্যাপতির সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাকে প্রমাণ করা। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এ শ্রেণীর ঘনিষ্ঠ যোগের জন্যে বিদ্যাপতি-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান আমাদের একটি অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য।

বাঙালীদের পক্ষ থেকে এ দিক দিয়ে প্রবল উদ্যম করবার গৌরব স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের। মুখ্যত তাঁর উৎসাহ ও অর্থব্যয়ে স্বর্গীয় সাহিত্যিক সুপণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় নানা প্রামাণ্য পুঁথি ও অন্যান্য মালমশলার সাহায্যে বিদ্যাপতির পদাবলীর যে সংস্করণ প্রকাশ করেন (১৩১৬ বাং) তাই হ'ল এ উদ্যমের প্রথম ফল। বর্ত্তমান দিনে এ পুস্তকের নানা দোষ-ত্রুটি আবিষ্কার করা সম্ভবপর হলেও বলা যায় যে, এর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপতি সম্বন্ধীয় গবেষণার এক নবযুগ আরম্ভ হয়েছিল। কয়েক বৎসর আগে এ পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায়, স্বর্গীয় পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের উপর এর নূতন সংস্করণ প্রস্তুতের ভার পড়ে, কিন্তু প্রস্তাবিত সংস্করণের প্রথম খণ্ড, ও দ্বিতীয় খণ্ডের কিয়দংশ মুদ্রিত হওয়ার পরে বিদ্যাভূষণ মহাশয় অসুস্থতার জন্যে কার্য্যভার ত্যাগ

---

* বিদ্যাপতি [৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের ব্যয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী] দ্বিতীয় সংস্করণ, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র [রায় বাহাদুর] সম্পাদিত, শ্রীশরৎকুমার মিত্র প্রকাশিত। কলিকাতা ১৩৪৮, ডবল ক্রাউন অষ্টাংশিত ৭৫৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ৭৲।

করতে বাধ্য হন। এমত অবস্থায় বিদ্যাপতির আরব্ধ সংস্কার কার্য্য সম্পাদনের ভার পড়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র (রায় বাহাদুর) মহাশয়ের উপর। অধিকাংশ মুদ্রিত পদের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, দুরূহ স্থল-গুলির ব্যাখ্যা, উক্তি-সাম্য নির্দ্দেশ, টিপ্পনী এবং গ্রন্থারম্ভে একটি ভূমিকা যোগ করে অধ্যাপক মিত্র বিদ্যাপতির পদাবলীর অভিনব সংস্করণটিকে সম্পূর্ণ করেছেন।

উপস্থিত সংস্করণের প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম পরলোকগত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদিত অংশই আলোচ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ অংশে তিনি তাঁর বহুবিখ্যাত পাণ্ডিত্যের কোন বিশেষ নিদর্শন রেখে যেতে পারেন নি। তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গের ফলেই যে এরূপ ঘটেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবু তাঁর কাজের প্রশংসাই করতে হবে। কারণ তিনি কিছু নূতন মাল-মশলা যোগ ক'রে বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদসংগ্রহকে পূর্ণতর করে গেছেন। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-মহাশয়ের সংস্করণে পদসংখ্যা ছিল ৯৩৫, আর উপস্থিত সংস্করণে ১০৭০টি পদ ধৃত হয়েছে। কিন্তু নগেনবাবুর সংস্করণে সংগৃহীত ৯৩৫টি পদকে বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রায় অপরিবর্ত্তিত ভাবেই গ্রহণ করেছেন। এই ঘটনা থেকে নগেনবাবুর পাঠনির্বাচনের গুরুত্ব ভাল ক'রে বুঝা যায়। অবশিষ্ট নূতন ১৩৫টি পদের মধ্যে বিদ্যাপতির রচনা কী পরিমাণে আছে সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও, এগুলিকে তাঁর রচনা-সম্বন্ধীয় বিরাট গ্রন্থের অঙ্গীভূত ক'রে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিদ্যাপতি-সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসুবর্গের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। ভূমিকায় তিনি অন্যান্য কথার মাঝে মুদ্রিত পদগুলির মধ্যে প্রায় ৩০০ পদের প্রামাণ্য অপ্রামাণ্য সম্বন্ধে যে মতামত দিয়েছেন তাও বিদ্বৎসমাজের বিশেষ কাজে লাগবে। মূল পদাবলীর সম্পাদন ও প্রকাশ ছাড়া, গোড়ার ৩১০টি পদের অনুবাদও বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কাজ। এ অনুবাদে তিনি প্রায় সর্বত্র নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কেই অনুসরণ করেছেন। তবে তিনি তাঁর অনুবাদের পাদটীকার মাঝে মাঝে পদ-বিশেষের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু মন্তব্যও যোগ করেছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বিদ্যাপতির অসমাপ্ত দ্বিতীয় সংস্করণকে সম্পূর্ণ করবার ভার পড়ে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের উপর। তাঁর সম্পাদিত অংশের আলোচনার আরম্ভে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, এ কাজ তিনি এমন নিপুণতা ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে নিষ্পন্ন করেছেন যা হয়ত আর কারুর কাছ থেকে আশা করা যেত না। সর্বপ্রথমে আলোচ্য তাঁর কৃত অবশিষ্ট ৭৬০টি পদের অনুবাদ ও তৎসংলগ্ন বিবিধ টিপ্পনী। বর্ত্তমান সংস্করণের এক বিশেষত্ব বিদ্যাপতির পদাবলী সমূহের বঙ্গানুবাদ। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁর সংস্করণে পদ-সংলগ্ন টীকার মাঝে মাঝে (তাঁর মতে) দুরূহ স্থলগুলির আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ দিয়েছিলেন। বর্ত্তমান সংস্করণে এরূপ টীকার বদলে সমগ্র পদাবলীর পৃথক্ বঙ্গানুবাদ ও একটি বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থ সূচী দেওয়া হয়েছে। এরূপ ব্যবস্থার দ্বারা বিদ্যাপতির মূল পদগুলির সম্বন্ধে সাহিত্য-রসিকদের নিকট যে মনোযোগ দাবী করা হয়েছে তা একান্ত ভাবে বাঞ্ছনীয়। তাঁরা শব্দার্থ সূচীর সাহায্যে মূল পদটির আস্বাদন করবার চেষ্টা করবেন এবং বাংলা অনুবাদ সে চেষ্টার সহায়ক হবে। বিদ্যাভূষণকৃত ৩১০টি পদের অনুবাদ সর্বাঙ্গসুন্দর না হ'লেও পাঠকবর্গ মূল পদের আস্বাদনে তার সাহায্য পাবেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা বিশেষ উপকার লাভ করবেন অধ্যাপক মিত্র কৃত পদসমূহের অনুবাদ থেকে। তাঁর প্রাঞ্জল অনুবাদ ও তৎসংলগ্ন নানা টিপ্পনী দ্বারা বিদ্যাপতির ভাষা ও ভাব আশ্চর্য্যজনকরূপে সহজবোধ্য হয়েছে। সাধারণ অনুবাদে যেমন একটা আড়ষ্ট ভাব থাকে এতে তা দুর্লভ। অধ্যাপক মিত্র যে কেবল বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত তা নয়, তিনি একজন সুপরিচিত সাহিত্যিকও বটেন। এ জন্যেই তাঁর কৃত বিদ্যাপতির অনুবাদ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। এ অনুবাদ আশ্রয় ক'রে যাঁরা বিদ্যাপতির পদসমুদ্রে প্রবেশ করবেন তাঁদের যে রত্নলাভ ঘটবে সে সম্বন্ধে সংশয় নেই। কিন্তু সুন্দর ভাষাতেই এ অনুবাদের উৎকর্ষ পর্য্যবসিত নয়, বিশুদ্ধির দিক দিয়েও এ অনুবাদ খ্যাতিলাভের দাবী রাখে। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরে বিদ্যাপতি, তথা বৈষ্ণব পদাবলীর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নানাভাবে স্পষ্টতর হয়ে এসেছে; তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা আর গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। অধ্যাপক মিত্র এ সকল ক্ষেত্রে নূতন ভাবে বিদ্যাপতির অর্থনির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ চেষ্টা যে কিরূপ ফলবতী হয়েছে তা ইতঃপূর্ব্বে সাধারণ ভাবে বলা গিয়েছে। এ বিষয়ে যাঁরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ চান তাঁদের, ৩৩১, ৩৪০, ৩৪১, ৩৫০, ৩৫৪, ৩৫৫ ও ৩৬০ প্রভৃতি সংখ্যক পদগুলির অনুবাদের প্রতি দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি। এ সকল ক্ষেত্রে প্রায়শ দু-একটি কথার ব্যাখ্যার সংশোধন থেকে সমগ্র পদটির ভাব বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। কিন্তু এরূপ প্রশংসনীয় অনুবাদই অধ্যাপক মিত্রের একমাত্র কৃতিত্ব নয়। তিনি এ সংস্করণে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা যোজনা করেছেন তাতেও এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ ভূমিকায় তিনি বিদ্যাপতির সাতটি নূতন পদ মুদ্রিত করেছেন। বিদ্যাপতির ভাষা ও 'ব্রজবুলি' সম্বন্ধে তিনি যে সকল কথা বলেছেন তাতে আমরা এ সম্পর্কে নূতন করে ভাববার ইঙ্গিত পাই। বিদ্যাপতির সমকালীন মৈথিল ভাষার সঙ্গে তৎকালীন বাংলা ভাষার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা অধ্যাপক মিত্র বলেছেন (পৃ. ৭) তার সম্বন্ধে কোন মতভেদ হতে পারে বলে মনে হয় না; এবং এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা মনে রাখলে বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা আলোচনার পথ অনেক সুগম হতে পারে।

বিদ্যাপতি কোন্ ইষ্ট দেবতার উপাসক ছিলেন এ বিষয়ে অধ্যাপক মিত্র যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা বেশ দৃঢ় বলে মনে হয়। এ বিষয়ে প্রচলিত মত এই যে বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন, কিন্তু অধ্যাপক মিত্র পদাবলীর আভ্যন্তরীণ প্রমাণে ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রমাণের বলে, বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রতি বিদ্যাপতির বিশেষ অনুরাগের কথা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু তাঁর সহকর্ম্মী বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎকৃত ভূমিকাতে লিখে গেছেন :—"সাধারণত বিদ্যাপতিকে আমরা বৈষ্ণব বলিয়া জানি। কিন্তু মিথিলায় তিনি শৈব কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ।"* (পৃ. ১১)। এ মতের পোষকতায় তিনি বলেছেন যে, বিদ্যাপতির লিখিত হরগৌরীর পদাবলীই মিথিলায় আদৃত, তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের নামসমূহ থেকেও শিবানুরক্তির প্রমাণ মেলে এবং তাঁর দেহান্ত হলে চিতাভস্মের উপর শিবমন্দিরই নির্ম্মিত হয়। নাম উল্লেখপূর্ব্বক না করলেও অধ্যাপক মিত্র তাঁর দেওয়া প্রমাণের দ্বারা এ মত খণ্ডন করেছেন। তবু আমরা এ বিষয়ে দু একটি কথা বলা সঙ্গত মনে করি। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রদত্ত ঘটনাগুলি সত্য হলেও অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে একত্র করে দেখলে সেগুলি থেকে বিদ্যাপতির শৈবত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। কারণ বিদ্যাপতির যে কয়খানি সংস্কৃত ও অবহট্ট পুস্তক পাওয়া গিয়েছে, সে সকলের মঙ্গলাচরণে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নাম কীর্ত্তন করেছেন। যেমন 'পুরুষ পরীক্ষা'য় আদ্যাশক্তির, 'লিখনাবলী'তে গণেশের, 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী'তে দুর্গার, 'দান বাক্যাবলী'তে বিষ্ণুর। 'শিবসর্ব্বস্ব সারে' শিবের ও 'কীর্ত্তিলতা'য়, হরপার্ব্বতীসহ গণেশের। এ সকল দেখে বিদ্যাপতিকে কখনো শৈব, কখনো শাক্ত, কখনো বা গাণপত্য বলে স্বীকার করতে হয়, অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে হয় যে, তাঁর ধর্ম্মমতের

* উপস্থিত প্রসঙ্গে এ কথা স্মরণীয় যে, গ্রীয়ার্স'ন (Grierson) সাহেব ত্রিহুত জেলায় বিদ্যাপতির যে ৮২টি পদ অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেছিলেন, তার মধ্যে ১টি ছাড়া আর সব ক'টি রাধাকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধে।

কোন ঠিক ছিল না। কিন্তু বিদ্যাপতির মতো এক সুপণ্ডিত ও উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিকের সম্বন্ধে আমরা এ কথা ভাবতে পারি না। ঐক্য ও শৃঙ্খলাবোধ মহৎ চরিত্রের এক শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। বিদ্যাপতির চরিত্রে এ লক্ষণ বিদ্যমান ছিল না, ও তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তার সামনে কোন এক স্থির আদর্শ ছিল না এ কথা কেমন ক'রে চিন্তা করা যায়? আমাদের মনে হয় আধ্যাত্মিকতার যে উচ্চ ভূমি থেকে বিদ্যাপতি নানা দেবদেবীর প্রতি তাঁর ভক্তি নিবেদন করে গেছেন, সেখান থেকে দেখলে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। এরূপ উদার দৃষ্টি সত্ত্বেও, যে রকম দরদ ও আবেগের সঙ্গে বিদ্যাপতি তাঁর রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক পদগুলি রচনা ক'রে গেছেন, তাতে মনে হয় যদি তাঁকে কোন মতবাদের পক্ষপাতী ভাবতে হয় তবে সে হচ্ছে বিশেষ বৈষ্ণব মতবাদ। কোনো বিষয়ে প্রবল আন্তরিক অনুভূতি না থাকলে সে সম্পর্কে কোন উচ্চশ্রেণীর 'লিরিক' সৃষ্ট হতে পারে না। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক 'লিরিক'গুলির অতুলনীয়তা সর্ব্ববাদিসম্মত। কাজেই, বিদ্যাপতি 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী'ই লিখে থাকুন আর 'শৈবসর্ব্বস্বসার'ই লিখে থাকুন, রাধাকৃষ্ণের লীলা সম্পর্কিত রসই যে তাঁর আধ্যাত্মিক, তথা শিল্পী জীবনকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলে ছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হতে পারে না।

বিদ্যাপতির জীবন সম্পর্কিত নানা তথ্য আলোচনা ছাড়াও অধ্যাপক মিত্র তাঁর রচনার কাব্যগুণ, ছন্দ ও উক্তি বৈচিত্র্যাদির সমালোচনা দ্বারা স্বলিখিত ভূমিকাকে উপাদেয় করে তুলেছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে এ ভূমিকা আরো বিস্তৃত হয় নি অর্থাৎ কোন কোন প্রাসঙ্গিক বিষয় এতে অনালোচিত থেকে গেছে। বিদ্যাপতির অনুসৃত বৈষ্ণব তত্ত্ব ও সে সম্পর্কে পদাবলীর আদিরসবাহুল্য আদি সম্বন্ধে তাঁর মতো বিশেষজ্ঞের মত এখানেও প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। তিনি তাঁর 'পদামৃতমাধুরী' নামক পদসংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় যা যা বলেছেন তার অনুরূপ কিছু বর্ত্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় সংক্ষেপে বললেও বিদ্যাপতির পাঠকবর্গ সমধিক উপকৃত হতেন। বিদ্যাপতির পদসমূহের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে অধ্যাপক মিত্রের মূল্যবান মত জানবার কৌতূহলও আমাদের অনিবৃত্ত রয়ে গেল। খুব সম্ভব তাঁর সদ্য পরলোকগত সহকর্মী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতের সমালোচনা হবে বলে তিনি সৌজন্য বশত এ কাজে হাত দেন নি। আশা করি তিনি অন্য কোন প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির সমগ্র পদাবলীর শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে তাঁর মত ব্যক্ত করবেন। তা হলে পদাবলীর অন্তর্গত বিভিন্ন পদের সাহিত্যিক মূল্য নির্দ্ধারণ অপেক্ষাকৃত সহজতর হতে পারে।

ভূমিকার পরেই উল্লেখ করতে হয় শব্দার্থসূচীর। এটিও আলোচ্য সংস্করণের (অধ্যাপক মিত্র-কৃত) বিশেষত্ব। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-লিখিত মূল্যবান ভূমিকার মুখ্য অংশটি এ সঙ্গে মুদ্রিত করাও বিশেষ সুবিবেচনার কাজ হয়েছে। বিদ্যাপতির নূতন সংস্করণটিকে উত্তম ভাবে পরিসমাপ্ত ক'রে অধ্যাপক মিত্র পাঠকসমাজের মহদুপকার করেছেন। তাঁর এবং অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত বিদ্যাপতি-পদাবলীর অভিনব সংস্করণ দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙালীর পাণ্ডিত্যের উত্তম নিদর্শন বলে গণ্য হবে। এ বিরাট সাত শত পৃষ্ঠার পুস্তকে যদি সামান্য ভুলত্রুটি বার করা সম্ভবও হয়, তবু এ কথা স্বচ্ছন্দে স্বীকার্য্য যে, প্রায় তেত্রিশ বছর আগে স্বর্গীয় নগেন্দ্রবাবু বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদন ক'রে বাঙালীর পাণ্ডিত্যকে যে গৌরব দান করে গেছেন বর্ত্তমান সংস্করণে সে গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত হয়েছে। আশা করি বাংলার সাহিত্য-রসিক ও পণ্ডিতবর্গ এ কথা জেনে খুসী হবেন এবং বিদ্যাপতির এ সংস্করণ সর্ব্বত্র সমাদৃত হবে।

জনসেবা-মণ্ডলী

তের বৎসর পূর্বে জনসেবা-মণ্ডলী গঠনের চিন্তা আমাদের মনে উদয় হইয়াছিল। তিন বৎসর কাল এ সম্বন্ধে চিন্তা ও প্রার্থনা করিবার পর পরিকল্পনাটি লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের তিন জন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুর সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় আজ পরলোকে। তিনি আগ্রহ ও সহানুভূতির সহিত পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া এই কাজে আমাদিগকে সাহায্য করিতে ও ইহার কোষাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জনসেবা-মূলক আমাদের সকল কাজেই চিরদিন আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি এই পরিকল্পিত মণ্ডলীর সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ সনে প্রকাশিত জনসেবা-মণ্ডলীর পরিকল্পনা নামক পুস্তিকায় এ সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রিয় বন্ধু আচার্য্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার চিন্তা ও লেখনী দ্বারা এ বিষয়ে আমাদের অশেষ সাহায্য করিয়াছেন। জনসেবা-মণ্ডলীর প্রথম পুস্তিকা—যাহাতে পরিকল্পনাটি পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, আমাদের মনের ভাব গ্রহণ করিয়া সতীশবাবুই তাঁহার সুন্দর ভাষায় উহা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

নিম্নে যে নিবন্ধটি আজ প্রকাশিত হইতেছে তাহারও প্রায় সমগ্র অংশই সতীশবাবুরই রচনা। অন্তরের কতখানি আগ্রহ থাকিলে, কার্য্যটির প্রতি কতটা একাত্মতাবোধ জন্মিলে এমন ভাবে সাহায্য করা সম্ভব তাহা অন্তরে অনুভব করিয়া আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা তাঁহাকে জ্ঞাপন করি।

প্রায় দশ বৎসর হইল, পরিকল্পনাটিকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এত ধীরে ধীরে কাজ অগ্রসর হইতেছে যে, শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুগণের নাম ইহার সহিত জড়িত করিতে মন অগ্রসর হয় নাই। এই ধীর গতির প্রধান কারণ অর্থাভাব। আমাদের প্রতিষ্ঠিত "ঢাকা অনাথাশ্রম", "হিন্দু বিধবাশ্রম" ও "বঙ্গ ও আসাম অনুন্নত জাতিসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতি" এখন প্রচুর সাফল্য লাভ করিলেও আমাদের কর্ম্মিগণকে এ সকলের জন্য অর্থ ভিক্ষা করিতে কত শ্রম ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা ভাবিয়া আমাদের মন নিতান্ত পীড়িত হয়। মনে হয়, তাঁহাদের অন্ততঃ বার আনা শক্তি এই প্রয়োজনীয় কিন্তু অবাঞ্ছনীয় কার্য্যে ব্যয়িত না হইলে তাঁহারা আরও কত ভাল করিয়া এই কাজগুলি করিতে পারিতেন। এই জন্য সংকল্প করিয়াছিলাম, সাধারণের নিকট অর্থসাহায্য ভিক্ষা না করিয়া নিজেই অর্থ উপার্জ্জন করিয়া জনসেবা-মণ্ডলীর কাজ অন্ততঃ প্রথম কয়েক বৎসর চালাইব। তাই প্রথম প্রকাশিত পুস্তিকায় দশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম: "প্রয়োজন বোধ হইলে জনসেবা-মণ্ডলীর জন্য সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিব। ইহার জন্য এখন কাহারও নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিতেছি না।" এখনও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি। আমাদের মনে হয় নিকট ভবিষ্যতে কাহারও নিকট এই কাজের জন্য অর্থভিক্ষা না করিয়া, আমাদের পরিকল্পিত প্রণালী কার্য্যে পরিণত করিলেই তদ্দ্বারাই প্রয়োজনীয় অর্থাগম হইবে।

—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীসরযূবালা দত্ত

জনসেবা-মণ্ডলীর উদ্দেশ্য

দেশের জনসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন জনসেবা-মণ্ডলীর উদ্দেশ্য।

দেহ মন ও আত্মা লইয়া মানুষ। ইহার কোন একটির অপূর্ণতা থাকিলে মানুষের প্রকৃত বিকাশ হয় না।

আমাদের এই দেশের জনসাধারণ শরীর মন ও আত্মার উন্নতি সাধনের বহু উপায় হইতে বঞ্চিত। উপযুক্ত খাদ্যের জন্য দেশে উন্নত প্রণালীতে কৃষি ও শিল্পের প্রচলন আবশ্যক। আমাদের দেশে তাহা নাই। যে সাধারণ শিক্ষা না পাইলে মানুষ অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবিয়া থাকে, তাহাও দেশের শতকরা ৯০ জন লোক পাইতেছে না।

যাহাদের শরীর ও মন এইরূপ অবিকশিত, প্রকৃত ধর্ম্মভাব, আত্মার প্রকৃত বিকাশ তাহাদের মধ্যে কতটুকু হইতে পারে? প্রকৃত ধর্ম্মভাব ও প্রকৃত আধ্যাত্মিক বিকাশ হইলে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল মানুষ পরস্পরকে একই পরমেশ্বরের সৃষ্টি বলিয়া ভালবাসিতে ও সম্মান করিতে পারিবে। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মভাবের অভাববশতঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপ্রেম ও হিংসাই বিস্তার লাভ করিতেছে; সত্যানুরাগ ও সংযমশীলতা হারাইয়া মানুষের জীবন নীচু হইয়া যাইতেছে।

এ দেশের নরনারীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন, অর্থাৎ পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনে সাহায্য করা, জনসেবা-মণ্ডলীর উদ্দেশ্য। এই সুমহৎ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা অতি কঠিন সন্দেহ নাই। কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। সত্যের ও প্রেমের জয় হইবেই, এই বিশ্বাস অন্তরে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া ও ঈশ্বরের দয়ার উপর পূর্ণ নির্ভর স্থাপন করিয়া কর্ম্মে অগ্রসর হইলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের দেশের শতকরা ৮৯ জন লোক পল্লীগ্রামে বাস করে এবং শতকরা ৭৫ জন কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবন ধারণ করে। তাই এ দেশের উন্নতি বলিতে প্রধানতঃ গ্রামের উন্নতি এবং জাতির উন্নতি বলিতে প্রধানতঃ কৃষকের উন্নতি বুঝায়। সুতরাং জনসেবা-মণ্ডলীর কার্য্যক্রম প্রধানতঃ পল্লীবাসীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই রচিত হইয়াছে এবং তদনুসারেই কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

জনসেবা-মণ্ডলীর কর্ম্মপরিকল্পনা

শিক্ষাবিষয়ক—(ক) যেখানে বিদ্যালয় আছে সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা; (খ) যেখানে বিদ্যালয় নাই সেখানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা; (গ) বয়স্কদিগের শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা। এই সকল বিদ্যালয়ে শুধু সাধারণ বিদ্যালয়ের মত পুস্তক পাঠ করিতে ও অঙ্ক কষিতে শিক্ষা

দেওয়া হইবে না; ইতিহাস, ভূগোল, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, পল্লীস্বাস্থ্য, অর্থনীতির মূলসূত্র, এবং দেশের সকল প্রকার অবস্থা সম্বন্ধেও জ্ঞানদান করিবার চেষ্টা করা হইবে। বিবিধ চার্ট, গোলক, মানচিত্র ও আলোকচিত্র ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রাখা হইবে; (ঘ) চরিত্রগঠন ও জনসেবার ভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য বালক-বালিকাদিগকে লইয়া ব্রতীদল সংগঠন করা হইবে; (ঙ) মাঝে মাঝে নানাবিষয়ক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইবে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক—(ক) গ্রামস্থ জনসাধারণকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাদান; (খ) ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি রোগের কারণ, চিকিৎসা ও প্রতিকার সম্বন্ধে আলোকচিত্র সহযোগে শিক্ষাদান; (গ) স্বাস্থ্যপ্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করা; (ঘ) স্ত্রীলোকদিগকে প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুপালন সম্বন্ধে শিক্ষাদান; (ঙ) গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার, জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার এবং রাস্তাঘাট ও পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার করা; (চ) যেখানে পানীয় জলের অভাব সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা; (ছ) খেলাধূলা ও ব্যায়ামচর্চ্চায় উৎসাহ দান।

অর্থনৈতিক—(ক) কৃষকদিগকে মহাজনদের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপন; (খ) কৃষিতত্ত্ব এবং কৃষিকার্য্যের উন্নত প্রণালীসমূহ শিক্ষাদান; (গ) নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং কৃষিকার্য্যের আবশ্যক যন্ত্রপাতি, বীজ, সার ইত্যাদি সস্তা দামে কিনিবার জন্য সমবায় ক্রয়সমিতি স্থাপন; (ঘ) মধ্যবর্ত্তী দালালদের হাত হইতে কৃষকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এবং কৃষকেরা যাহাতে শস্যের ভাল দাম পায় সে জন্য সমবায় বিক্রয়সমিতি স্থাপন; (ঙ) চাষের উন্নত প্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য অনেক চাষের জমি একত্র করিয়া সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য পরিচালন; (চ) কৃষকের অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া তাহার আয় বৃদ্ধির জন্য রেশম উৎপাদন, মধুমক্ষিকা পালন, পশুপক্ষী পালন, এবং নানা প্রকার কুটিরশিল্পের প্রবর্ত্তন।

ধর্ম্মশিক্ষা: সাম্প্রদায়িক ঐক্যস্থাপন—(ক) গ্রামের কেন্দ্রস্থলে গ্রামবাসিগণের অবসর সময়ে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক অবলম্বনে সাধুদিগের জীবনী ও আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া বিভিন্ন ধর্মের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা উৎপাদনের চেষ্টা করা; (খ) জনসেবা-মণ্ডলীর কর্মিগণ যখন যেখানে যাইবেন দেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক ঐক্যের আদর্শ প্রচার করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করা।

জনসেবা-মণ্ডলীর আরব্ধ কার্য

কেন্দ্রীয় আশ্রম

চব্বিশ-পরগণা জিলার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত ধামুয়া রেল ষ্টেশনের নিকটে ১০ বৎসর পূর্বে কেন্দ্রীয় আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ১০ বিঘা জমি লওয়া হয় ও বাড়ীঘরের কাজ আরম্ভ করা হয়। এই কেন্দ্রীয় আশ্রম সকল কার্যের মূল ভিত্তিস্বরূপ থাকিয়া সর্ববিধ প্রেরণা যোগাইবে।

একনিষ্ঠ জনসেবক শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ সেন এই আশ্রমের যাবতীয় কার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আশ্রমবাসিগণের মিলিত ধর্মসাধনার জন্য একটি মনোরম উপাসনা-গৃহ নির্মিত হইয়াছে। এই উপাসনা-গৃহে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে নিয়মিত ভাবে ঈশ্বরোপাসনা, পাঠ, ধর্মালোচনা ও সঙ্গীতাদি হইয়া থাকে।

শিক্ষানিকেতন। এখানকার কর্ম্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। সম্প্রতি বিদ্যালয়টিকে হাইস্কুলে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে; ঐ সঙ্গে মেয়েদের জুনিয়র ট্রেনিং ক্লাসও (Junior Training Class) থাকিবে। এই ক্লাসের পাঠ সমাপ্ত করিলে মহিলাগণ গ্রাম্য বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার যোগ্যতা লাভ করিবেন। উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় পরিচালিত হইতে পারে এইরূপ একটি স্কুলগৃহ ও মেয়েদের জন্য বোর্ডিং নির্মিত হইয়াছে।

এই বিদ্যালয়ের গৃহে বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় বসিয়া থাকে।

একজন কর্মীর চেষ্টায় নিকটবর্তী এক কাওরা-প্রধান গ্রামে একটি নিম্ন-প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কাওরাগণই এ অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অনুন্নত শ্রেণী।

হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়। গত ১৯৪১ সালে একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে। এখন পর্যন্ত এই চিকিৎসালয়ের জন্য পৃথক কোন গৃহ নির্মিত হয় নাই, শীঘ্রই পৃথক্ গৃহ নির্মিত হইবে।

পাঠাগার। এই কেন্দ্রীয় আশ্রমে একটি পাঠাগার স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তকাদি সংগৃহীত হইতেছে।

প্রচার। জনসেবা-মণ্ডলীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করা হইতেছে। পল্লীতে পল্লীতে

ভ্রমণ করিয়া পল্লীসমাজের সহিত মেলামেশা ও আলাপ আলোচনাদি করা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভাসমিতি করা; নানা শ্রেণীর লোকদিগকে এই আশ্রমে আহ্বান করিয়া প্রসঙ্গাদি করা, বর্তমানে এই প্রণালীতে কাজ চলিতেছে। ক্রমে আলোকচিত্রের সাহায্যে বক্তৃতা ও অন্যান্য কালোপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আরও ব্যাপক ভাবে প্রচারের আয়োজন করা হইবে।

রাস্তাঘাট। ধামুয়া রেল ষ্টেশন হইতে আশ্রমবাটীর দূরত্ব অর্ধ মাইলের কম হইবে না। যাতায়াতের সুবিধার জন্য ষ্টেশন পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈয়ার করা হইতেছে।

মফস্বল

এ পর্য্যন্ত ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, চট্টগ্রাম, রংপুর, ফরিদপুর, ও নোয়াখালি এই সাতটি জেলায় জনসেবা-মণ্ডলীর তেরটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শাখা-গুলিতে আপাততঃ কুড়ি জন কর্মী কাজ করিতেছেন। কর্মিগণের মধ্যে দুইজন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য।

জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ভাব সঞ্চারিত করা সমিতির একটি প্রধান কার্য্য। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জনসাধারণ মণ্ডলীর ঐক্যের আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন, নিজেদের অভাব-অভিযোগ বিরোধ ইত্যাদি সম্বন্ধে মণ্ডলীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। কর্মিগণ হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই নানা ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও জনসাধারণ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়াছেন।

কোন কোন স্থানে কোন কোন কর্মী সুতার দুর্মূল্যতার ফলে বস্ত্রবয়নকারী সম্প্রদায়ের ক্রমাবনতি লক্ষ্য করিয়া অল্প অল্প করিয়া চরখা কাটার ও তুলা চাষের প্রচলন করিতেছেন। অনেক শাখায় কর্মিগণ স্কুল কলেজের উৎসাহী ছাত্রদিগের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া প্রাথমিক চিকিৎসা, সাম্প্রদায়িক ঐক্য ইত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছেন, গ্রামরক্ষী সেবকদল গঠন করিয়াছেন, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, মকদ্দমার বাদী ও প্রতিবাদীকে বুঝাইয়া তাহাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। বহু ক্ষেত্রে কর্মিগণ জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া পুল তৈয়ারী, খাল সংস্কার প্রভৃতি জনহিতকর কার্যের চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল কার্যের জন্য কর্মিগণকে ভ্রমণের বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে, পদব্রজে নৌকাযোগে নানা উপায়ে তাঁহারা গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

জনসেবা-মণ্ডলী হইতে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় সম্পদের শ্রীবৃদ্ধিসাধন

মণ্ডলীর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশের ধনীদিগের মত আমাদের দেশের ধনিগণ জনসাধারণের হিতকার্যে তেমন মুক্তহস্তে দান করেন না। এ জন্য এদেশে শুধু চাঁদা এবং দানের উপর নির্ভর করিয়া কোন প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে প্রায় দেখা যায় না। এজন্য আমাদের ইচ্ছা এই যে, এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আমরা স্থায়ী আয়ের নানা পথ প্রস্তুত করিব। তন্মধ্যে বড় বড় যৌথ কারবার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠা হইবে প্রধান।

ক্রমে হয়ত আমরা এমন কতকগুলি বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব, যেগুলি অংশীদারগণের সম্পত্তি না হইয়া শুধু এই মণ্ডলীরই সম্পত্তি হইবে। এই সকল শিল্প ও ব্যবসায় হইতে যে লাভ হইবে তাহার উপরে মণ্ডলীর পূর্ণ অধিকার থাকিবে, ও মণ্ডলী তাহা পল্লী-সংগঠনের এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্যে ব্যয় করিবেন। মণ্ডলীর অধিকারভুক্ত যে সকল শিল্প ও ব্যবসায় থাকিবে, তাহা প্রকৃত পক্ষে জাতীয় সম্পত্তি হইবে। এইরূপ শিল্প ও ব্যবসায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে।

আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র ধনিক ও শ্রমিকে, জমিদার ও প্রজায় স্বার্থজনিত বিরোধ উপস্থিত হইয়া ভীষণ শ্রেণী-সংগ্রামের সৃষ্টি করিতেছে। তাহার তরঙ্গ এ দেশকেও স্পর্শ করিতেছে। হিংসামূলক এই সকল বিরোধ যাহাতে এ দেশে বদ্ধমূল হইতে না পারে, তাহার জন্য সাধারণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে, বিশেষতঃ গ্রামবাসীদিগের অবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে, প্রতিষ্ঠিত এইরূপ যৌথ কারবার বিশেষ সহায় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কর্মিদল গঠন

জনসেবা-মণ্ডলীর সুমহৎ উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিতে হইলে গঠিতচরিত্র বহুসংখ্যক ত্যাগী পুরুষ ও নারী কর্মীর আবশ্যক। এই কর্মিদল গঠন করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে একুশ মাইল দূরে মণ্ডলী একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এই আশ্রমে কর্মিগণ সম্প্রদায় ও জাতিধর্ম-নির্বিশেষে একত্র বাস করিবেন ও উপযুক্ত পরিচালকগণের তত্ত্বাবধানে মণ্ডলীর উদ্দেশ্যের অনুকূল ভাবের চর্চা ও তদুদ্দেশ্যে অধ্যয়নাদি করিবেন এবং প্রতিদিন আত্মপরীক্ষা

ও ধর্মসাধনের দ্বারা অন্তরের সংকল্পকে শুদ্ধ ও দৃঢ় করিয়া লইবেন।

আমরা আশা করি একত্র বাস, একত্র অধ্যয়ন, একত্র সাধনদ্বারা এক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই কর্মীদল একটি ঘন-সন্নিবিষ্ট ধর্মপরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ভ্রাতৃমণ্ডলীতে পরিণত হইয়া দেশের পল্লীসমাজে এক উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবেন।

এই আশ্রম হইতে মাঝে মাঝে কয়েক জন কর্মীকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত গ্রামহিতমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহে (যথা, শান্তিনিকেতনের নিকট সুরুলের শ্রীনিকেতন, আসানসোলের নিকটবর্তী উষাগ্রাম, সুন্দরবনের গোসাবা, পঞ্জাবের গুরগাঁও, ত্রিবাঙ্কুড়ের অন্তর্গত মার্ত্তণ্ডম প্রভৃতি) তত্রত্য কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকিয়া হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইবে।

জনসেবা-মণ্ডলী বিশ্বাস করেন যে, ধর্ম ও নীতির ভূমি ত্যাগ করিয়া কোনও লোকহিতসাধনের প্রয়াস স্থায়ী ও কার্য্যকরী হয় না। মানব-মনে সাধু চরিত্র ও নির্মল জীবনের জন্য ব্যাকুলতা, আত্মোন্নতির জন্য স্পৃহা ও সকলের প্রতি মৈত্রীভাব সঞ্চার করা সর্ববিধ কল্যাণের উপায়। জনসেবা-মণ্ডলী কদাচ শ্রেণীবিশেষের প্রতি শ্রেণীবিশেষের বিদ্বেষকে কিংবা অধিকারঘটিত দ্বন্দ্বের ভাবকে প্রশ্রয় দান করিবেন না। কোন রাজনৈতিক প্রচেষ্টা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত এই মণ্ডলীর সম্পর্ক থাকিবে না।

উপসংহারে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, সকলে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য করিয়া পল্লীভারতের লুপ্তশ্রীর পুনরুদ্ধার, দেশের শিল্পোন্নতি এবং জাতীয় সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া দেশকে শক্তিশালী করুন। সকলের সাহায্য যে এক ভাবে পাইব, তাহা নয়। আত্মত্যাগী কর্মী আপন কর্মশক্তি দিয়া, শিল্পী ও ব্যবসায়ী আপন আপন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়া, অর্থনীতিবিদ্‌গণ তাঁহাদের পরামর্শ দিয়া, দেশের মনীষীবৃন্দ আপন আপন মনীষা দিয়া জনসেবা-মণ্ডলীর মহদুদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিবেন, আমরা এই আশা করি।

সহমরণ

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে

প্রাচীন কালে সহমরণ-প্রথা পৃথিবীর সকল মহাদেশেই প্রচলিত ছিল। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ, সর্ব্বত্রই। সহমরণ অর্থে কেবল স্ত্রীর মৃত্যুকেই বুঝায় না—ভৃত্য, পরিচারিকা, পাচকপাচিকা, মদ্য-প্রদানকারিণী নারী, সহিস এবং ঘোড়া, প্রভুভক্ত সকলকেই মরিতে হইত। রাজা হইলে মন্ত্রী পারিষদ, সেনাপতি, প্রসিদ্ধ নাগরিক, রাজদণ্ড উপাধিধারী, এমন কি, দোকানদার যে রাজাকে জিনিসপত্র সরবরাহ করিত তাহারাও মরিত। তবে স্ত্রী সর্ব্বত্রই আছে।

মরিবার এবং মারিবার প্রক্রিয়া দেশ-বিশেষে পৃথক্ পৃথক্। ফাঁসিমঞ্চের উপর উঠিয়া গলায় ফাঁসি লাগাইয়া, স্বামীর সহিত কবর দিয়া অথবা স্বামীর কবরের উপর স্ত্রীকে তরবারি দিয়া কাটিয়া ফেলিয়া, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে ছোরা দিয়া হত্যা করিয়া এবং এক চিতায় দগ্ধ করিয়া জীবন শেষ করা হইত। এশিয়া মহাদেশে ফাঁসিটাই অধিক প্রচলিত ছিল। পলিনেশিয়ার কোন কোন দ্বীপে অতি বাল্যাবস্থা হইতে স্ত্রীলোকের গলায়, সর্ব্বদা অন্তিম দশা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য, দড়ি রাখিয়া দেওয়া হইত।

অনেকে বলিবেন, ভারতবর্ষে ত কই কখনও ভৃত্য, পরিচারিকা প্রভৃতির মৃত্যুর কথা শুনা যায় নাই। সাধারণ মৃত্যুর ন্যায় সহমরণটা ভারতবর্ষে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে গণ্য ছিল। সাধারণ লোকের ইতিহাস কেহ রাখে নাই, তবে রাজা-রাজড়াদের কথা কোথাও কোথাও পাওয়া যায়:—

কাশ্মীরের রাজা শঙ্করবর্ম্মার সহিত	৩ রাণী ও	৪ জন ভৃত্য
ঐ কলশের ,,	৬ ,,	১ জন অন্য নারী
ঐ উচ্চলের পিতামহের সহিত	২ রাণী	১ ধাত্রী
যোধপুরের রাজা অজিত সিংহের সহিত	৫ রাণী	৩০ জন দাসী
পঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিংহের ,,	৪ ,,	৭ ,,

এই সহমরণ-প্রথা পৃথিবীতে কত দিন হইতে প্রচলিত

হইয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না। পৃথিবীর প্রায় সকল আদিম সমাজে সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যভিচার। ব্যভিচারের অবস্থা পার হইয়া সমাজ যখন আইনসঙ্গতভাবে অন্য নারী রাখিবার প্রথা, বহু-বিবাহ প্রথা এবং এক দার-পরিগ্রহ প্রথা গ্রহণ করিতেছে, বৈধব্য সেই অবস্থায় সম্ভবপর সুতরাং অনুমান করিতে হইবে এইরূপ কোন সময় হ'তে এ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। ভারতবর্ষে মহাভারতের যুগের পূর্ব্বে সহমরণের উল্লেখ নাই।

ব্যভিচার যে দেশের নিয়ম, বিধবার বিবাহ যে দেশের নিয়ম, স্ত্রীলোকের বহুস্বামিত্ব যে দেশের নিয়ম (তিব্বত, ভোট, সিকিম, আরব, মালাবার ভূভাগ, নীলগিরি উপত্যকা, পঞ্জাবের কুনবার প্রদেশ), দেবরকে বিবাহ করা যে দেশের (ইহুদীর দেশ, উড়িষ্যা ভূভাগ) নিয়ম, সহমরণ সে সকল দেশে থাকিতে পারে না।

সহমরণের কারণ কি এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জানা যায় যে পৃথিবীর সকল জাতিরই মনে একটা অবিচলিত বিশ্বাস এই ছিল যে, মানুষ মৃত্যুর পর কোন একটা অজ্ঞাত প্রদেশে গিয়া পৌঁছে, সে বহু দূর, কত দূর কল্পনায় আসে না, স্থূল শরীরে কেহ সেখানে যাইতে পারে না এবং একাকীও তত দূর পথ অতিক্রম করা শক্ত। সেই অজ্ঞাত বহু দূর প্রদেশে তাহাকে বাস করিতে হয়। দূর পথের এবং সেই মহাযাত্রার সঙ্গিনী বা সঙ্গী আবশ্যক এবং সে-দেশে বাস করিবার জন্য দাসদাসী, পাচকপাচিকা, সবই প্রয়োজন। যদি সম্রাট্ বা রাজা হয় তবে মন্ত্রী, সেনাপতি, দেহরক্ষী, সহিস এবং অশ্ব, সবই চাই। রাজার অনুরক্ত প্রজা, রাজদত্ত উপাধিধারী সম্ভ্রান্ত নাগরিক এবং বন্ধুবান্ধব তাহারাই বা এরূপ প্রজাবৎসল ও ধর্ম্মপরায়ণ রাজার সঙ্গ ছাড়িবে কেন? আফ্রিকার কোন কোন দেশে এবং শক জাতির মধ্যে মালিকের সহিত ঘোড়া এবং সহিসকে কবর দেওয়ার প্রথা ছিল। আমেরিকার ইঙ্কা (Inca) রাজার মৃত্যুতে, তাতার জাতির রাজাদের মৃত্যুতে এবং চীন-সম্রাটের মৃত্যুতে, দশ-পনর দিন ধরিয়া মরণের উৎসব চলিত। সকলকে সঙ্গে না লইয়া গেলে সে দেশে পাইবে কোথায়? স্ত্রী এবং অন্যান্য অনুরক্ত নারী চিরদিন জীবন-যাত্রার সঙ্গিনী, ধর্ম্মের সঙ্গিনী, সুখে দুঃখে সম্পদে ও বিপদে সঙ্গিনী, সুতরাং মরণের সঙ্গিনীই বা না হইবে কেন? দাক্ষিণাত্যে মাদুরার এক জন পাণ্ড্য রাজার মৃত্যুতে তাঁহার এগারো হাজার (!!) পত্নী সহমৃতা হইয়াছিল। কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্রকে গল্প মনে করিবার কারণ নাই।

স্বামী যদি বিদেশে মরিত সে অবস্থায় ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকগণ পরজগতে মিলিত হইবার কবিত্বময় আশা বক্ষে লইয়া স্বামীর পাদুকা প্রভৃতি কোন স্মরণচিহ্ন সঙ্গে লইয়া পরে মরিত, তাহার নাম অনুমরণ।

সহমরণ সর্ব্বদাই বাধ্যতামূলক ছিল না। অনেকে নাম এবং যশের মোহে এবং জীবনের কর্ত্তব্য হিসাবে মরিত। মনের উত্তেজনা, প্রেমের উত্তেজনা, নৈরাশ্যের অসীম মর্ম্মবেদনাও ইহার মধ্যে আছে। সহমরণ ত কত কাল উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও ত যুবক-যুবতী একত্রে হাতে সিল্কের রুমাল বাঁধিয়া লেকে, না-হয় গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতেছে। প্রেমের নিকট মরণটা যে কিছুই নয়!

তাহার পর আসিল বাধ্যতামূলক অনুশাসন। জগতের চক্ষে নারী চিরদিন হেয় এবং পাপের আকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন জগতে এমন দেশ বা সম্প্রদায় দেখিলাম না যেখানে নারীকে অবিশ্বাস বা ঘৃণা না করিত। এমন কি, খৃষ্টান সমাজ যাহার মধ্যে সহমরণ ছিল না তাহারাও নারীকে অজস্র গালি দিয়াছে,

as an impure creature almost devilish as the door of hell, as the mother of all human ills, she should be ashamed at the very thought that she is a woman, she should be ashamed of her dress, she should especially be ashamed of her beauty, for it is the most potent instrument of the demon.

যখন সুশিক্ষিত খ্রীষ্টান চার্চ্চ স্ত্রীজাতির উপর এইরূপ মধু বর্ষণ করিয়াছে তখন অন্যান্য সম্প্রদায়ের মনোভাবের ত কথাই নাই। পুরুষ যথেচ্ছাচার ক'রবে তাহাতে সমাজ কলঙ্কিত হয় না কিন্তু নারীকে কোন অধিকারই দেওয়া চলিতে পারে না। এইরূপ মনোভাববিশিষ্ট জগতের শাস্ত্রকার বলিয়া দিল, নারীর ধর্ম্মই যখন জগতকে ভ্রষ্টাচার দ্বারা কলঙ্কিত ও অপবিত্র করা, তখন তাহাকে তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর দগ্ধ করা, কবর দেওয়া, বা হত্যা করিয়া ফেলা আপন আপন নাম এবং সমাজের পবিত্রতা রক্ষার একমাত্র প্রতিকার।

এইরূপ অবস্থায় সহমরণ ভারতবর্ষে পরবর্ত্তী যুগে ভীষণ বাধ্যতামূলক অনুশাসনে দাঁড়াইয়াছিল। বঙ্গদেশে সে নিষ্ঠুরতার তুলনা ছিল না। সতীদাহ শব্দে বাধ্যতা-মূলক ধ্বনিই সুস্পষ্ট। মরণ তখন মারণ অর্থ প্রকাশ করিতেছে।

কালের অগ্রগতির সঙ্গে পৃথিবীর লোকের মনোভাবের পরিবর্ত্তনে এবং কোথাও কোথাও ইউরোপীয়দের আগমনে সহমরণ পৃথিবীর সকল ভূভাগ হইতেই উঠিয়া গিয়াছিল,

কোথাও আইন করিতে হইয়াছিল কি না জানা যায় না, কিন্তু ভারতবর্ষে কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে আইনের দ্বারা এই নিষ্ঠুর প্রথাকে বন্ধ করিতে হইয়াছিল। পুড়াইয়া মারিবার জন্য উৎপীড়ন ও অত্যাচার এত অধিক হইয়াছিল যে আইন ব্যতীত সে-প্রথাকে রোধ করা অসম্ভব হইত। উৎপীড়ন বঙ্গদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

মুসলমান সম্রাটগণ হিন্দুর সহমরণে কখনও আপত্তি করেন নাই; অনেকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুড়াইয়া মারিবার বিপক্ষে ছিলেন। ইংরেজও আপত্তি করেন নাই; এমন কি দুই একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ এ বিষয়ে আন্দোলন করার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় প্রভৃতি কয়েক জন দেশীয় সংস্কারকের চেষ্টাই ইংরেজের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। বেণ্টিঙ্কের বহু পূর্ব্ব হইতেই সহমরণ সম্বন্ধে আলোচনা এবং বিবরণ সংগ্রহ চলিতেছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সহমরণ (সতীদাহ) আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়। যত দূর অনুসন্ধান তখনকার যুগে সম্ভবপর ছিল তাহা হইতে জানা যায় যে, এই বঙ্গদেশের গণ্ডীর মধ্যে প্রতি বৎসর প্রায় এক হাজার করিয়া নারীকে দাহ করা হইত, তাহার মধ্যে নিতান্ত শিশু এবং অতিবৃদ্ধাও বহুজন থাকিত। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ৫৭৫ জনকে দাহ করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৩২ জন নিতান্ত বালিকা এবং ১০৯ জনের বয়স ৬০ বৎসরের উর্দ্ধে। শাস্ত্রে নিয়ম আছে, সুতরাং মরিতেই হইবে, বালিকাই হউক কিংবা বৃদ্ধাই হউক। এই উৎপীড়নমূলক প্রথা যখন উঠাইয়া দেওয়া হইল, হিন্দু সমাজ দলবদ্ধ হইয়া বিলের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করিতেও ছাড়ে নাই।

বঙ্গদেশ এই প্রথার যে ইতিহাস মানুষকে দান করিয়াছে তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও নাই। প্রথমে নিয়ম হইয়াছিল স্বেচ্ছায় রাজী না হইলে পোড়াইতে পারিবে না। যে সমাজ ৮।৯ বৎসরের বালিকা এবং ষাটের উর্দ্ধে বৃদ্ধাকেও চিরদিন পোড়াইয়া মারিয়াছে, তাহার অন্ধবিশ্বাস এবং অমানুষিক নিষ্ঠুরতা কি কম? রাজী করিবার জন্য নেশা খাওয়ান আরম্ভ হইল। নেশার ঝোঁকে উৎসাহ আসিত বটে, কিন্তু অগ্নির সংযোগে নেশা কাটিয়া গেলেই চীৎকার করিতে আরম্ভ করিত, তখন তাহার দেহের উপর কাঁচা বাঁশ চাপাইয়া দু-দিকে জাঁকিয়া ধরিতে হইত। যদি কেহ নামিয়া পড়িয়া পলাইবার উপক্রম করিত, নেপালের হিন্দুরা লাঠি মারিয়া তাহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া দিত এবং বঙ্গদেশে তাহাকে ধরিয়া পুনরায় চিতায় ঠেলিয়া ফেলিত। যাহাতে পলাইতে না পারে এজন্য চিতায় আগুন লাগাইবার পূর্ব্বে নারীকে মোটা মোটা কাঠের সহিত মোটা মোটা কাঁচা লতা এবং কাঁচা কঞ্চি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হই করুণ চীৎকার ও মৃত্যু-যন্ত্রণায় যাহাতে দর্শকগণ অভিভূত না হয় এজন্য ঢাকঢোল এবং খোলকরতাল বাজাইয়া যথেষ্ট ঘটা করা হইত। ইহার মধ্যেও যদি কেহ দৈবাৎ পড়িয়া গিয়া কিংবা পলাইয়া দগ্ধাবস্থায় জীবন পাইত, সমাজ আর তাহাকে ফিরিয়া লইত না, সে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, কিন্তু সে সমাজের চক্ষে এতই হেয় যে ভিক্ষাও তাহার ভাগ্যে জুটিত না। এই বীভৎস উৎসবের অভিনয়ে ঠেলিয়া ফেলিতে ফেলিতে, বাঁশ চাপিতে চাপিতে, ইন্ধন যোগাইতে যোগাইতে মূর্চ্ছিত হইয়া অথবা হার্টফেল করিয়া বাজে লোকও দুই এক জন সহমরণের সঙ্গী হইত।

গর্ভবতী নারীর সহমরণ নিষিদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষ বহু-বিবাহের দেশ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে কুলীন ব্রাহ্মণদের বহু পত্নী থাকিত। সকল নারীর প্রতিই জোরজুলুম করা হইত কিন্তু কখনও কখনও কেহ কেহ বাদও পড়িত। যে বাদ পড়িত, লোকের গঞ্জনা এবং উপহাসে তাহার সমাজে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিত। সুতরাং আজীবন নিন্দা, গঞ্জনা ও উপহাসের ভয়ে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা সহমরণই অনেকে পছন্দ করিত রাজপুতানা, কাশ্মীর, পঞ্জাব, দক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশের ইতিহাসে দেখা যায় বহু রাণীকে সহমরণে যাইতে হয় নাই। নানাবিধ নৈতিক কারণও প্রতিবন্ধক হইত। রাজা মানসিংহের নাকি দুই হাজার পত্নী ছিল, তন্মধ্যে ৬০ জন পুড়িয়া মরিয়াছিল।

মনের অপরিমিত বল এবং বীরত্বের মৃত্যুও এ পৃথিবীতে ছিল। রাজপুত জাতির মধ্যে জহর ব্রত (শুনিয়াছি মধ্য-এশিয়ায় কোন কোন মোগল-সম্প্রদায়ের মধ্যেও জহর ব্রত ছিল) এই শ্রেণীর মৃত্যু, হাজার হাজার একসঙ্গে মরিয়াছে। কখনও বাধ্য করিতে হয় নাই। সতীদাহেও এই প্রকার মরণের কথা শুনা গিয়াছে। এই বঙ্গদেশেই এমন নারী ছিল যাহারা সহমরণের সজ্জায় ভূষিত হইয়া পুত্রকন্যা ও পুত্রবধূকে শেষ উপদেশ দিতে দিতে অবিচলিত হৃদয়ে হাসিতে হাসিতে সেই মহামৃত্যুকে বরণ করিতে যাইত, পুড়িবার সময় কেহ তাহাদের করুণ চীৎকার শুনিতে পাইত না এবং অঙ্গবিকৃতি বা মুখবিকৃতিও লক্ষ্য করিত না।

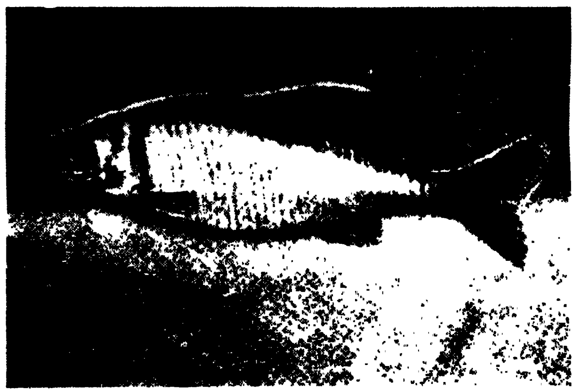
প্রত্যেক দেশেই সহমরণ একটা প্রকাণ্ড উৎসব। পূজা-পার্ব্বণ, মন্ত্রপাঠ, পুষ্পমাল্য এবং বেশভূষা ইহার অঙ্গ। বহু লোকের সমাগম হইত এবং প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু একটু স্মরণচিহ্ন লইবার জন্ত চেষ্টিত থাকিত।

পৃথিবীর কোন দেশে স্ত্রীর মৃত্যুতে পুরুষের সহমরণের কথা শুনা যায় নাই। প্রেমের ব্যাকুলতা এবং মাদকতা যেখানে অত্যধিক, সেখানেও না। সিন্দবাদ নাবিকের গল্পে কোন্ দেশে নাকি পুরুষেরও সহমরণের কথা লেখা আছে, কিন্তু সেটা আরব্য উপন্যাস। জগতের কোন দেশে স্ত্রীলোক কখনও শাস্ত্রকার হয় নাই, হইলে পুরুষেরও সহমরণের বিধান পাওয়া যাইত এবং "সতী" শব্দ বেন্টিঙ্কের সময় যে অর্থ প্রকাশ করিতেছিল তাহার বিপরীত শব্দও অভিধানে দুর্লভ হইত না।

মাছের বাসা

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আত্মরক্ষা, সন্তান পালন ও অন্যান্য বিবিধ প্রয়োজনে মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নস্তরের কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেকটি প্রাণীই কোন-না-কোন প্রকারের আবাসস্থল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, মনুষ্যেতর প্রাণীদিগকে কিন্তু সন্তান প্রতিপালনের উদ্দেশ্যেই বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে দেখা যায়। কতকগুলি প্রাণী অবশ্য বাসগৃহ নির্ম্মাণ না করিয়াও প্রকৃতিদত্ত সুব্যবস্থায় অথবা স্বাভাবিক সংস্কার বশে অসহায় সন্তানদিগকে অদ্ভুত কৌশলে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। কাঙারু তাহার অসহায় শিশুকে নিজের উদর-দেশের থলির মধ্যে রাখিয়া প্রতিপালন করে। স্বাবলম্বী না হওয়া পর্য্যন্ত অপোসাম তাহার বাচ্চাগুলিকে পিঠের উপর লইয়াই গাছে গাছে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে। বাচ্চাগুলি তাহাদের লেজের সাহায্যে মায়ের লেজ আঁকড়াইয়া অবস্থান করে। উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কাঁকড়া-বিছা ও আমাদের দেশীয় মৎস্য-শিকারী মাকড়সারাও তাহাদের বাচ্চাগুলিকে পিঠে করিয়া বেড়ায়। ডিম্ব প্রসবকারী বিভিন্ন জাতীয় কতকগুলি কীটপতঙ্গ বাসস্থল নির্ম্মাণ না করিলেও ডিম রক্ষার জন্ত বিচিত্র গঠনের ডিম্বাধার নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কয়েক জাতীয় মাকড়সা আবার সুগঠিত ডিম্বাধার নির্ম্মাণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; বাচ্চা বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা ডিমের থলি মুখে, বুকে বা শরীরের পশ্চাদ্ভাগে সংলগ্ন করিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। বিভিন্ন জাতীয় কীটপতঙ্গ বিচিত্র আকারের ডিম্বাধার নির্ম্মাণ করে এবং ইহাতে তাহারা অসামান্ত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়ও দিয়া থাকে। সাধারণ ব্যাং, নিউট প্রভৃতি প্রাণীরা শীত-ঘুমের জন্য গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিলেও ডিম বা বাচ্চা রক্ষার জন্য কোন আশ্রয়স্থল তৈয়ার করে না। স্ত্রী ধাত্রী-ব্যাং ডিম পাড়িবার পর পুরুষ-ব্যাং সেই



'বিটারলিং' মাছ

ডিমগুলি লইয়া নিজের পিছনের পায়ে জড়াইয়া রাখে এবং ডিম ফুটাইবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে। "সুরিনাম টোড" নামক এক জাতীয় ব্যাং নিজের পৃষ্ঠদেশের গর্ত্তগুলির মধ্যে এক একটি ডিম গুঁজিয়া রাখে। বাচ্চা ফুটিবার পর, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার মত উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বাচ্চাগুলি মায়ের পিঠের গর্ত্তের মধ্যেই অবস্থান করে। কিন্তু আমাদের দেশীয় গেছো-ব্যাং গাছের ডালে, পাতার ডগায় থুথুর সাহায্যে বাচ্চাদের



স্ত্রী-ষ্টীকল্‌ব্যাক বাসায় প্রবেশ করিয়াছে

জন্য অতি অদ্ভুত আশ্রয়স্থল প্রস্তুত করিয়া থাকে। 'স্মিথ' নামক ব্রেজিল দেশীয় স্ত্রী-গেছোব্যাঙেরাও বাচ্চাদের নিরাপত্তার জন্য অগভীর জলে মাটির সাহায্যে চমৎকার বাসা নির্ম্মাণ করে। কচ্ছপ, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী অবশ্য স্বতন্ত্র বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে না। কারণ প্রকৃতিই তাহাদের শরীরের অংশবিশেষকে সুদৃঢ় বাস-গৃহে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছে। কাঁকড়াদের শরীর শক্ত চর্ম্মাবৃত হইলেও সন্ন্যাসী-কাঁকড়া কিন্তু এইরূপ স্বাভাবিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহারা মৃত শামুক গুগলির খোলাগুলিকে আশ্রয়স্থলরূপে ব্যবহার করে এবং বাসগৃহকে সঙ্গে লইয়াই আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

সন্তান প্রসব করিবার পূর্ব্বে গেছো ইঁদুর খড়কুটার সাহায্যে ঝোপঝাড় বা লতাপাতার উঁচুস্থানে বাসা বাঁধিয়া থাকে। নেংটি-ইঁদুরেরাও ঘরের নিভৃত স্থানে কাপড় বা কাগজের টুকরা দাঁতে কাটিয়া লইয়া তাহার সাহায্যে বাসা নির্ম্মাণ করে। বাচ্চা হইবার পূর্ব্বে কাঠবিড়াল খড়কুটা ও পরিত্যক্ত পশম বা তুলা সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষকোটরে বাসা নির্ম্মাণ করে। ডরমাউস নামক প্রাণীরা বাচ্চাদের জন্য বাসা নির্ম্মাণ ত করেই, অধিকন্তু সারা শীতকাল নিরুদ্বেগে ঘুমাইয়া কাটাইবে বলিয়া নিজের জন্য স্বতন্ত্র আশ্রয়স্থল তৈয়ার করে। খরগোস জাতীয় প্রাণীরা মাটির নীচে গর্ত খুঁড়িয়া বাচ্চাগুলিকে আরামে রাখিবার জন্য নিজের বুকের লোমের সাহায্যে কোমল আস্তরণ দিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। ডিম পাড়িবার সময় হইলেই বিভিন্ন জাতীয় পাখীরা কেহ গাছের ডালে, কেহ মাটির নীচে, কেহ দেওয়ালের ফাটলে বা বৃক্ষকোটরে বাসা নির্ম্মাণ সুরু করে। কচ্ছপ, কুমীর, সাপ প্রভৃতি প্রাণীরা ডিম পাড়িবার সময় কোন না-কোন রকমের আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণে উদ্যোগী হয়। মোটের উপর বিভিন্ন জাতীয় প্রত্যেক প্রাণীর পক্ষেই কোন-না-কোন রকমের বাসগৃহ বা আশ্রয় স্থল অপরিহার্য্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মৎস্য জাতীয় প্রাণীদের উপরও কি এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য ?

জীব-জগতে মৎস্য জাতীয় প্রাণীরা এক বিরাট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীও যে অন্যান্য প্রাণীদের মতই বৈচিত্র্যপূর্ণ—এ সম্বন্ধে অনেকেরই পরিষ্কার ধারণা নাই। তাহার প্রধান কারণ:—স্থলচর প্রাণীদের কার্য্যকলাপ যত সহজে আমাদের গোচরীভূত হয়, জলচর প্রাণীদের জীবনযাত্রা-প্রণালী তত সহজে দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা কম। কাজেই,—মাছেরা ঘুমায় কি না,—ইহাদের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ ভেদ আছে কি না,—সুখ-দুঃখ বোধ কিরূপ,—ইহাদের মধ্যে পিতৃস্নেহ এবং মাতৃস্নেহের বিকাশ হইয়াছে কি না—প্রভৃতি প্রশ্নে অনেকেই বিব্রত হইয়া পড়েন। কিন্তু মাছেরাও যে অন্যান্য প্রাণীদের মতই আহার, নিদ্রা, ক্রোধ, উত্তেজনা, বাৎসল্য, হিংসা প্রভৃতি জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেই পরিচালিত হইয়া থাকে—এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই। তবে বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এ সকল বিষয়ে আলোচনা না করিয়া সন্তান পালন অথবা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রাণীদের মত ইহারা বাসা নির্ম্মাণ করে কি না সে সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অনেকের ধারণা—মাছ যখন জলের নীচে বাস করে



গোবি মাছ শঙ্খের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে



দশ কাঁটা-ওয়ালা ষ্টীকল্‌ব্যাক মাছ

তখন আবার তার বাসা বাঁধিবার প্রয়োজন কি? জলই ত তাহাকে আত্মগোপনে যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করিয়া থাকে! কিন্তু মানুষেরা মাছের প্রবলতম শত্রু হইলেও অন্যান্য জলচর শত্রুরও অভাব নাই। মাছের অসংখ্য ডিম ও বাচ্চা এইরূপ জলচর শত্রুর কবলে পড়িয়া বিনষ্ট হয়। এই কারণেই বোধ হয় প্রাকৃতিক নিয়মে ইহারা দৈহিক আয়তনের তুলনায় অসংখ্য ডিম প্রসব করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, অন্যান্য প্রাণীদের মতই বিভিন্ন জাতীয় মাছেরও কমবেশী সন্তান-বাৎসল্য দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য অনেক মাছই ডিম পাড়িয়া খালাস হয়। তাহারা ডিম বা বাচ্চার আর কোন খোঁজখবর লয় না। কিন্তু কয়েক জাতীয় মাছের সন্তানের প্রতি তীব্র বাৎসল্য দৃষ্টিগোচর হয়। এই বাৎসল্যের ফলেই তাহারা সন্তানের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জলের নীচে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। সকল জাতীয় মাছেরই স্ত্রী, পুরুষ পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু মৎস্য সমাজে সাধারণতঃ স্ত্রী-মাছের সংখ্যাই বেশী এবং বাহিরের আকৃতি দেখিয়া তাহাদের স্ত্রী, পুরুষ নির্ণয় করাও সহজ নহে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ মাছই বর্ণগৌরবে বা পাখনার সৌন্দর্য্যে স্ত্রী-মাছ অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। ডিম পাড়িবার সময় হইলেই পুরুষ মাছ তাহার সঙ্গিনীকে লইয়া কোন সুবিধা-জনক স্থানে উপস্থিত হয় এবং উভয়ে মিলিয়া অতি উৎসাহের সহিত কিছুকাল লাফালাফি ও ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। এই সময়ে পুরুষ-মাছ মাঝে মাঝে স্ত্রী-মাছের উদরদেশে 'ঢুঁ' মারিয়া থাকে। স্ত্রী-মাছ তখন ডিম ছাড়িয়া দেয়। পুরুষ-মাছও সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার তরল পদার্থ পরিত্যাগ করে। ইহার সাহায্যেই ডিম নিষিক্ত হইয়া থাকে। নিষিক্ত ডিম হইতে যথাসময়ে বাচ্চা ফুটিয়া বাহির হয়। যে সকল মাছ ডিম পাড়িবার পর তাহাদের আর কোন খোঁজখবর লয় না—তাহারা এমন ভাবে স্থান নির্ব্বাচন করিয়া ডিম পাড়ে যেখানে স্বাভাবিক বিপদ-আপদ বা শত্রু কর্তৃক বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা খুবই কম। ইহাই তাহাদের সন্তান-বাৎসল্যের পরিচয়। বিভিন্ন শ্রেণীর 'ডগ্-ফিস' নামক মাছেরা আবার ডিমের থলি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। কিন্তু কতকগুলি মাছ উন্নত পর্য্যায়ের প্রাণীদের মতই সন্তান প্রতিপালন করিয়া থাকে।

আমাদের দেশীয় শাল, শোল ও ল্যাটা মাছ সকলের নিকটই পরিচিত। ইহাদিগকে খাল, বিল বা বদ্ধ জলাশয়ে বিচরণ করিতে দেখা যায়। বর্ষার প্রারম্ভেই ইহাদের যৌন-মিলন ঘটিয়া থাকে। যৌন-মিলনের সময় হইলেই পুরুষ-মাছ সঙ্গিনীর খোঁজে বহির্গত হয়। অবশেষে সঙ্গিনীসহ ঘনসন্নিবিষ্ট জলজ লতাগুল্মসমাকীর্ণ একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। উভয়ে মিলিয়া মুখ ও লেজের সাহায্যে খানিকটা স্থান পরিষ্কার করিয়া একটি প্রশস্ত আশ্রয়স্থল গড়িয়া তোলে। এই বাসা নির্ম্মাণে পুরুষ-মাছটিরই বেশী কর্ম্ম-ব্যস্ততা দেখা যায়। বাসা নির্ম্মিত হইবার পর কিছুকাল (সময়ে সময়ে দুই-তিন দিন পর্য্যন্ত) উভয়ে সেই স্থলে এবং তাহার আশেপাশে ছুটাছুটি এবং লুকোচুরি খেলিতে থাকে। তার পর উভয়ে বাসার পরিষ্কৃত স্থানে উপস্থিত হইয়া অনেকটা স্থিরভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে। লেজ ও পাখনাগুলিকে অবশ্য অনবরতই ধীরে ধীরে সঞ্চালন করিতে দেখা যায়। কিছুক্ষণ পরেই স্ত্রী-মাছ ধীরে ধীরে



বাটারফিস্ ঝিনুকের খোলায় ডিম পাড়িয়া পাহারা দিতেছে



ডগ-ফিসের ডিমের থলি জলজ উদ্ভিদের সহিত সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে

ডিম ছাড়িতে থাকে। পুরুষ-মাছটিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডিমগুলিকে নিষিক্ত করিয়া দেয়। ডিম পাড়িবার পর স্ত্রী-মাছটি এদিক ওদিক ঘুরিতে বাহির হয়; কিন্তু পুরুষ মাছটি অতি সতর্কভাবে ডিম পাহারা দিতে থাকে। মাঝে মাঝে স্ত্রী মাছটি পাহারা দিলেও পুরুষটিকে কদাচিৎ সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে দেখা যায়। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইবার পরও তাহাদের সন্তান-বাৎসল্য কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। পিতামাতা উভয়েই বাচ্চাগুলিকে লইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেক সময় বাচ্চাগুলি পিতার সঙ্গেই বেড়াইয়া থাকে। নিরাপদ কোন স্থান দেখিলেই বাচ্চাগুলিকে ইচ্ছামত খেলাধুলা করিবার সুযোগ দেয়। তখন একসঙ্গে শতাধিক বাচ্চা জলের উপর ভাসিয়া উঠে এবং কিলবিল করিয়া খেলা করিতে থাকে। কিন্তু কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা করিলে বোধ হয় অভিভাবকের ইঙ্গিতেই তৎক্ষণাৎ জলের নীচে অদৃশ্য হইয়া পিতামাতার নিকটে অবস্থান করে। মুরগীর ছানাগুলি যেমন মায়ের সঙ্গে চড়িয়া বেড়ায় এবং বিপদের কারণ উপস্থিত হইলেই ছুটিয়া গিয়া তাহার ডানার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে—এই মাছের বাচ্চাগুলিও অবিকল সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে।

উত্তর-আমেরিকার নদী, হ্রদ ও অন্যান্য প্রশস্ত জলাশয়ে বোফিন নামে এক প্রকার ছোট মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের স্বভাব অনেকটা আমাদের দেশীয় শোল মাছের মত। যৌন-মিলনের সময় হইলে ইহাদের পুরুষ-মাছ ঘনসন্নিবিষ্ট জলজ লতাপাতার মধ্যস্থল পরিষ্কার করিয়া উপযুক্ত আশ্রয়স্থল গড়িয়া তোলে এবং খুব সঙ্কীর্ণ একটি প্রবেশ পথ রাখিয়া দেয়। তৎপরে সে সঙ্গিনীর খোঁজে বহির্গত হয়। সঙ্গিনী জুটিবার পর তাহাকে প্রলোভিত করিয়া সেই বাসার মধ্যে লইয়া আসে। স্ত্রী-মাছটি বাসার মধ্যেই ডিম পাড়ে। পুরুষ-মাছটি ডিম নিষিক্ত করিয়া বাচ্চা বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত সেই স্থলেই খাড়া পাহারায় নিযুক্ত থাকে কারণ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ও অপরাপর শত্রুর সংখ্যা খুবই বেশী। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইবার পর পুরুষ মাছটিই বাচ্চাগুলিকে ইতস্ততঃ চড়াইয়া বেড়ায়।

আমাদের দেশীয় মধ্যমাকৃতির কই মাছও জলজ ঘাস পাতার মধ্যে অসংস্কৃত এক প্রকার বাসা নির্ম্মাণ করিয়া ডিম পাড়ে। বাচ্চা বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত উভয়ে মিলিয়া পর্য্যায়ক্রমে লেজ ও পাখনার সাহায্যে ডিমের উপর জলের স্রোত প্রবাহিত করিয়া রাখে। ইহাতে শীঘ্র শীঘ্র ডিম ফুটিবার যথেষ্ট সহায়তা হইয়া থাকে।

চিতল ও ফলুই মাছেরাও ইষ্টক নির্ম্মিত পুরাতন সোপানের ফাটলে বাটির মত গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। সময়ে সময়ে জলনিমজ্জিত বৃক্ষকাণ্ডের নীচের দিকে মাটি খুঁড়িয়া গর্ত্ত নির্ম্মাণ করে। ডিম পাড়িবার সময় হইলেই স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া কয়েক দিনের পরিশ্রমে এইরূপ আশ্রয়স্থল গড়িয়া তোলে। লম্বা নলের মত একটি যন্ত্র বাহির করিয়া স্ত্রী-মাছ একটি একটি করিয়া গর্ত্তের মধ্যে ডিম পাড়ে। তৎপরে পুরুষ মাছ ডিমগুলিকে নিষিক্ত করিয়া দেয়। গর্ত্তের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় থাকিলেও পিতামাতা কিন্তু সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যায় না। দিনের পর দিন উভয়েই সতর্কদৃষ্টিতে ডিম পাহারা দিতে থাকে। এ সময়ে কেহ বাসার নিকটে উপস্থিত হইলে তাহারা তাহাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে। অসতর্কভাবে জলে নামিয়া মানুষ চেতল মাছের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত দেহে উঠিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

বাসা নির্ম্মাণে আড়-মাছেরও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। যৌন-মিলনের পূর্ব্বে পুরুষ আড়-মাছ তাহার শরীরের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী জলের তলায় মাটি



লাম্পসাকার নামক মাছ

খুঁড়িয়া কূপের মত দুই-তিন ফুট গভীর গর্ত্ত নির্ম্মাণ করে। গর্ত্তের নীচের দিক সুঁচালো, উপরের দিক প্রায় দুই ফুট, আড়াই ফুট চওড়া। বাসা নির্ম্মাণ করিতে তাহার প্রায় দুই-তিন দিন সময় অতিবাহিত হয়। তার পর সঙ্গিনী নির্ব্বাচন করিয়া তাহাকে বাসায় লইয়া আসে। সেখানে সে ডিম পাড়িয়া গেলে পুরুষ-মাছ সর্ব্বক্ষণ পাহারা দিতে থাকে। বাচ্চা ফুটিবার তিন-চার দিন পর পুরুষ মাছটি অপেক্ষাকৃত দূরতর স্থানে আহারান্বেষণে বহির্গত হয় কিন্তু নিয়মিতভাবে বাসায় ফিরিয়া আসে। বাচ্চাগুলি দেড় ইঞ্চি হইতে দুই ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হইলেই ক্রমশঃ পিতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

ডোরাকাটা ছোট ছোট ট্যাংড়া মাছেরাও স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ডিম পাড়িবার জন্য বাসা নির্ম্মাণ করে। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত পুরুষটিই প্রধানতঃ ডিমগুলিকে তদারক করিয়া থাকে। বেলেমাছও অগভীর জলে কোন কিছুর আড়ালে মাটিতে খানিকটা গর্ত্তের মত খুঁড়িয়া ডিম পাড়ে। ডিম নিষিক্ত হইবার পরে তাহার উপরে মাটি চাপা দিয়া রাখে। যথাসময়ে ডিম ফুটিয়া বাচ্চাগুলি আপন আপন বিষয়-কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া লয়। স্ত্রী ন্যাদস মাছ ডিম পাড়িবার সময় হইলেই ঘাস পাতার অন্তরালে কাদামাটিতে জলজ শেওলা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। ইহাদের বাসার কোন নির্দ্দিষ্ট গঠন নাই—কোন রকমে একটু আড়াল করিতে পারিলেই হইল। বাসায় ডিম পাড়িবার পর পুরুষ-মাছ সেগুলিকে নিষিক্ত করিয়া চলিয়া যায়। মোটের উপর, আমাদের দেশীয় এরূপ অনেক মাছের নাম করা যাইতে পারে যাহারা ডিম বা সন্তান রক্ষার জন্য কোন-না-কোন রকমের বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশীয় চিতি-কাঁকড়া ও অন্যান্য কাঁকড়ারা গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাসা নির্ম্মাণ করে বটে; কিন্তু সেগুলি ডিম পাড়িবার জন্য ব্যবহার করে না। কাঁকড়ারা সাধারণত জলেই ডিম ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু চিতি-কাঁকড়া ডিম হইতে আরম্ভ করিয়া বাচ্চাগুলিকে পর্য্যন্ত বুকের সম্মুখস্থ ব্যাগের মত আধারের মধ্যে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। চিংড়িরাও তাহাদের ডিমগুলিকে শরীরের নিম্নদেশে আটকাইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকে।

বাল্টিক সাগর ও উত্তর সাগরের উপকূলে 'লাম্প-সাকার' নামক এক প্রকার কদাকার মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। সংখ্যায় ইহারা বেশী না হইলেও সমুদ্রের ধারে প্রায়ই দুই-একটিকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। যৌন-মিলনের সময় ইহাদের পুরুষ মাছগুলি উজ্জ্বল লাল রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠে। শরীরের নিম্ন ভাগে লেজের সম্মুখস্থ এক প্রকার শোষক যন্ত্রের সাহায্যে ইহারা জলমগ্ন প্রস্তর অথবা গাছপালার গায়ে দৃঢ় ভাবে সংলগ্ন হইয়া নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করে। স্ত্রী-মাছ ডিম পাড়িলেই পুরুষ মাছটি জলনিমজ্জিত প্রস্তরসংলগ্ন শেওলা বা আবর্জ্জনাদি পরিষ্কার করিয়া প্রায় পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই গর্ত্তের মত এক প্রকার বাসা প্রস্তুত করে এবং ডিমগুলিকে লইয়া গিয়া সে-স্থানে রক্ষা করে। এক প্রকার আঠার মত পদার্থে ডিমগুলি প্রস্তরের গায়ে লাগিয়া থাকে। এই সময়েই পুরুষ মাছ ডিমগুলিকে নিষিক্ত করিয়া দেয়। ডিম ফুটিবার পর বাচ্চাগুলি শোষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পিতার গায়ের সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকে। ডিম্ব-নিষেক-প্রক্রিয়ার পর হইতেই পুরুষ-মাছের বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ধীরে ধীরে কমিয়া যায়।

চীনদেশীয় 'স্বর্গীয়-মাছ' দেখিতে কতকটা আমাদের দেশের কই-মাছের মত। ডিম পাড়িবার সময় ইহারাও বাসা নির্ম্মাণ করে। ইহাদের বাসা নির্ম্মাণ প্রণালী অতি অদ্ভুত। যৌন-মিলনের সময় হইলে পুরুষ মাছ অগভীর



'বোফিন' মাছ



'ল্যাম্প্রে' মাছ স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া ডিমের উপর পাথরের নুড়ি স্তূপাকার করিয়া রাখিতেছে

জলে কোন একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া জলে উপর মুখ বাহির করিয়া বাতাস সংগ্রহ করে। জলের নীচে ডুবিয়া সেই বাতাস ছাড়িয়া দিলেই তাহার মুখ হইতে নির্গত এক প্রকার আঠালো পদার্থের মিশ্রণে জলের উপর ফেনার মত বুদ্বুদ জমা হইতে থাকে। কিছুক্ষণের পরিশ্রমে ফেনার সাহায্যে অর্দ্ধ-নিমজ্জিত একটি সুদৃশ্য বাসা নির্ম্মিত হয়। বাসা তৈয়ারীর পর পুরুষ মাছটি সঙ্গিনীর খোঁজে বহির্গত হয়। নানা ভাবে প্রলোভিত করিয়া সঙ্গিনীকে সেই বাসার নিকটে লইয়া আসে। সঙ্গিনী সেখানে একটি একটি করিয়া ডিম ছাড়িতে থাকে। জলের তলায় পড়িতে না-পড়িতেই পুরুষ মাছ ডিমটিকে ধরিয়া লইয়া বাসার মধ্যে রাখিয়া দেয়। এক প্রকার আঠাল পদার্থের সাহায্যে ডিমগুলি বাসার সহিত আঁটিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডিম পাড়িবার পর মা তাহার ডিমগুলিকে খাইয়া ফেলিবার জন্য উগ্র হইয়া উঠে; কিন্তু পুরুষ মাছ সঙ্গিনীকে তাড়াইয়া অতি যত্নে ডিমগুলিকে রক্ষা করে। আফ্রিকার জলাভূমিতেও ফেনার সাহায্যে বাসা নির্ম্মাণকারী এক জাতীয় মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষ মাছেরাই এইরূপ বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এই মাছের বাচ্চাগুলির কপালের উপর এক প্রকার শোষণ-যন্ত্র আত্মপ্রকাশ করে। বাচ্চাগুলি এই শোষণ-যন্ত্রের সাহায্যে বাসার গায়ে মাথা আটকাইয়া ঝুলিয়া থাকে।

কুইন্সল্যাণ্ডের নদনদীতে 'ল্যাম্প্রে' নামক কতকটা আমাদের দেশীয় বান মাছের মত এক প্রকার মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী-পুরুষ একত্র হইবার পর জলের তলায় উভয়ে মিলিয়া একটি স্থান পরিষ্কার করিয়া লয়। সেই স্থানে ডিম পাড়িবার পর বাসার কাছাকাছি উজানের দিক হইতে পাথরের কুচি সংগ্রহ করিয়া তাহার উপর স্তূপাকারে সজ্জিত করে। পাথরের কুচি সংগ্রহ করিবার জন্য তাহারা অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহাদের মুখ কতকটা শোষণ-যন্ত্রের মত। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে একসঙ্গে এক একটা পাথরের টুকরা মুখের সাহায্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া আসে। পাথরের টুকরাগুলি সরাইবার ফলে সেই স্থানের বালি আল্‌গা হইয়া স্রোতের টানে ভাসিয়া আসে এবং সজ্জিত স্তূপটিকে বালির আবরণে ঢাকিয়া ফেলে। ডিমগুলিকে এই ভাবে সুরক্ষিত করিবার পর মাতা-পিতার কেহই আর তাহাদের খোঁজখবর লয় না। দক্ষিণ-আমেরিকার এক জাতীয় 'ল্যাম্প্রে' নদীর পাড়ে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাসা নির্ম্মাণ করে এবং গর্ত্তের ভিতরে জলজ শেওলা ও ঘাসপাতার সাহায্যে আস্তরণ দিয়া দেয়।

'পাইপ-ফিস্' নামক নলাকৃতি মাছেরাও ডিম পাড়িবার পূর্ব্বে জলজ উদ্ভিজ্জ পদার্থের মধ্যে এক প্রকার অসংস্কৃত আশ্রয়স্থল তৈয়ার করিয়া লয়। কিন্তু নিষিক্ত হইবার পর পুরুষ-মাছ ডিমগুলিকে তাহার উদরের নিম্নভাগে অবস্থিত থলির মধ্যে সযত্নে রক্ষা করে। ক্যালিফোর্ণিয়ার সমুদ্রোপকূলে 'স্মেল্ট' নামক এক প্রকার মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ডিম পাড়িবার সময় হইলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে জোয়ারের জলের সহিত ডাঙ্গার উপর চলিয়া আসে। সেখানে উভয়ে মিলিয়া বালির মধ্যে গর্ত্ত খনন করে। গর্ত্তের মধ্যে ডিম পাড়িবার পর বালি দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং উভয়ে কিলবিল করিয়া জলে ফিরিয়া যায়। বার-তের দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয় এবং পুনরায় জোয়ারের সহিত তাহারা জলে নামিয়া আসে।

উত্তর-আমেরিকার অগভীর জলে 'বাটারফিস' নামক মাছও সুরক্ষিত স্থানে ডিম পাড়িয়া থাকে। তবে নিজেরা পরিশ্রম করিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে না। ইহারা পরিত্যক্ত ঝিনুকের খোলাকে বাসার মত ব্যবহার করে। এই খোলার মধ্যে ডিম পাড়িয়া স্ত্রী মাছ তাহার শরীরটাকে



স্টীকল্‌ব্যাক নামক মাছের বাসা। উপরে-প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ মাছটিকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

কুণ্ডলী পাকাইয়া ডিমগুলিকে ঘিরিয়া রাখে। গোবি নামক এক প্রকার মাছও ডিম পাড়িবার সময় শঙ্খ অথবা বড় বড় শামুকের খোলাকে আশ্রয় স্থলরূপে ব্যবহার করে। সময় সময় শামুক ঝিনুকের খোলাকে উপুড় করিয়া তাহার তলা হইতে মাটি বাহির করিয়া বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বিটারলিং নামক পুঁটি মাছের অনুরূপ এক প্রকার ছোট ছোট মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। যৌন-মিলনের সময় পুরুষ মাছটি—মুখ খুলিয়া রহিয়াছে এরূপ একটি ঝিনুক খুঁজিয়া বাহির করে এবং সঙ্গিনীকে লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়। স্ত্রী-মাছটি তখন সরু নলের মত একটি যন্ত্র প্রসারিত করিয়া অতি সন্তর্পণে জীবন্ত ঝিনুকটির অভ্যন্তরে ডিম পাড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষ মাছ কর্ত্তৃক ডিম্ব নিষিক্ত হওয়ার পর উভয়েই সরিয়া পড়ে। বাচ্চা বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত ঝিনুকটিই পালক-মাতার মত ডিমগুলিকে বহন করিয়া বেড়ায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বাসা নির্ম্মাণকারী আরও অনেক রকমের অদ্ভুত মাছ রহিয়াছে; এ স্থলে তাহাদের সকলের বিষয় আলোচনা করা অসম্ভব। 'ষ্টিকল্‌ব্যাক্' নামক এক প্রকার মাছের বাসা নির্ম্মাণের অদ্ভুত কাহিনী বলিয়াই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। কয়েক জাতীয় 'ষ্টিকল্‌ব্যাক্' দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও পিঠে তিনটি কাঁটা, কাহারও পিঠে সাতটি কাঁটা; আবার কাহারও পিঠে দশটি কাঁটা থাকে। পিঠের কাঁটার সংখ্যানুযায়ী তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। যৌন-মিলনের সময় হইলেই পুরুষ মাছগুলির গাত্র-বর্ণে উজ্জ্বল সবুজ ও লাল রঙের বাহার খুলিয়া যায়। তখন জলজ ঘাসপাতা সংগ্রহ করিয়া পুরুষ মাছটি বাসা নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করে। মুখ হইতে নিঃসৃত এক প্রকার ঘন পদার্থের সাহায্যে পাতাগুলিকে পরস্পরের গাত্রসংলগ্ন করিয়া জুড়িয়া দেয়। বাসায় প্রবেশ করিবার একটি মাত্র অপ্রশস্ত পথ রাখে। সর্ব্বশেষে বাসার সৌন্দর্য্য বিধানের জন্য অবিন্যস্ত বা অসংলগ্ন লতাপাতাগুলিকে ছাটিয়া-কাটিয়া বাদ দেয়। তার পর সঙ্গিনীর খোঁজে বাহির হয়। মনোমত সঙ্গিনী খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশ কিছু সময় ব্যয়িত হয়। অতঃপর সঙ্গিনীকে প্রলোভিত করিয়া বাসার নিকটে লইয়া আসে। কিন্তু এই সময়ে প্রায়ই তাহার দুই একটি প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়া যায়। প্রতিদ্বন্দ্বীরা আসিয়া সঙ্গিনীকে প্রলোভিত করিয়া



চীন দেশের স্বর্গীয় মাছ। জলের উপরে বুদ্‌বুদের বাসা দেখা যাইতেছে

অন্তত্র লইয়া যাইবার জন্য প্ররোচিত করে। স্ত্রী মাছটি তখন বাসার বাহিরেই ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করিতে থাকে। সহজে বাসায় ঢুকিতে চাহে না। তখন পুরুষ মাছটি প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে সময় সময় উভয়েই ক্ষত বিক্ষত হইয়া থাকে। অপরের এলাকায় অনধিকার প্রবেশের ভীতি জনিত দুর্ব্বলতার ফলেই হয়ত প্রতিদ্বন্দ্বী আক্রান্ত হইয়া অনেক ক্ষেত্রেই পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী অদৃশ্য হইবার পর স্ত্রী-মাছটি বাসায় প্রবেশ করিয়া ডিম পাড়ে। পুরুষ-মাছটিও তাহার পিছনে পিছনে বাসায় প্রবেশ করিয়া ডিম নিষিক্ত করিয়া দেয়। ডিম পাড়িবার পর স্ত্রী-মাছটি-বাসার বিপরীত দিকে নূতন একটি পথ করিয়া বাহির হইয়া যায়। বাসা হইতে নির্গত হইবার পর স্ত্রী-মাছের প্রকৃতি যেন সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়; সে নিজের ডিমগুলিকে উদরসাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। কিন্তু পুরুষ-মাছ এই রাক্ষসী মায়ের কবল হইতে ডিমগুলিকে রক্ষা করিয়া থাকে। বাচ্চা বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ ডিমের পাহারায় মোতায়েন থাকিয়া মাঝে মাঝে পাখনার সাহায্যে জলের স্রোত প্রবাহিত করিয়া ডিমের দ্রুত পরিপুষ্টির ব্যবস্থা করে।

পূজা-স্পেশাল

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

স্যাঁৎসেতে পথঘাট চন্‌চনে রোদ্দুর জলমরা গঙ্গার ছন্দ,
বর্ষার বানধোয়া কান্তার প্রান্তরে সন্ধ্যায় ওঠে পচাগন্ধ।
গ্রামভরা জঙ্গল পাঁকভরা ডোবাগুলো
মশকের দলে হ'ল ভর্ত্তি,
ম্যালেরিয়া কালাজ্বর এলো দিয়ে হুঙ্কার
কেঁপে ওঠে জীবনের বর্ত্তি।
ডাক্তার কোবরেজ তাহাদের পোয়াবারো দিন-রাত
উড়ে মনপক্ষী,
তাহাদের ঘরে আজ কৃপা হ'ল লক্ষ্মীর
রোগাদের ছেড়ে গেল লক্ষ্মী।
ছেলেদের পাঠশালা খালি হ'ল দিন দিন বিছানায়
কাঁদে তারা জ্বর গো,
দুধ-সাগু-বার্লির প'ড়ে গেল ধুমধাম ওষুধের
শিশি ঘর ঘর গো।
বাংলার ছেলেদের হয়নিকো জামা-জুতো,
কিনবার টাকা নেই বাক্সে,
বাপ-মার দল বলে কাজ নেই বাংলায়
আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসকে।
সামনে যে অঘ্রাণ সেও যেন যমদূত
ভাঙে সব হাড় মট্‌মট্‌ গো,
দুঃখের মুখখানা হাস্তেতে চাপা দিয়ে এল ঐ
বোধনের ঘট গো।

পল্লীর ক্ষেতে আজ ধান নেই, লোকজন
বন্ধক দিয়ে টাকা নিচ্ছে,
সুদ্‌খোর খৎ লিখে হাই তুলে তুড়ি দিয়ে
বলে—সব শ্রীহরির ইচ্ছে।
বাজারের দরদাম মাঘ্যির একশেষ কাঙাল
বলির বাজে বাদ্য,
জামা-আঁটা অতি দীন আধুনিক ভদ্রের মুখে হাসি
পেটে নেই খাদ্য।
জমীদার বাবুদের খয়রাৎ বাড়ে পিছে এই ভেবে
গেল তারা চেঞ্জে,
বাংলাকে ফাঁকি দিয়ে বাঁচবার চেষ্টাটা হায় হায়
হরে' নিল ট্রেন যে।
ঘরমুখো বেকারেরা চেকারকে ফাঁকি দিয়ে
ট্রেনে চ'ড়ে দেশে দেয় লম্বা,
আল্‌সের দল সব বলে ভেবে কাজ নেই
যা করেন মাতা জগদম্বা।
পল্লীর পথে চলে নারী-নর-কঙ্কাল
কাঁদে পিতা পুত্র ও কন্যা,
কোনো দেশে পোড়ামাঠ বৃষ্টির লেশ নেই,
কোনো দেশে ভেসে যায় বন্যা

কেঁপে ওঠে যূপকাঠ কেঁদে ওঠে বলিদান
কেঁদে ওঠে মন্ত্রের হিল্লোল,
ধর্ম্মের অনাচার লজ্জারে ঢেকে দিতে প্রাঙ্গণে
বেজে ওঠে ঢাকঢোল।
দুর্গতিবিনাশিনী রজ্জু ও মাটি খড়ে তক্তায় হয়ে র'ল বন্দী,
পুরোহিত মণ্ডপে ফাঁকা শুধু আওড়ায় চণ্ডীর
পাঠে কথা ছন্দি'।
বিশ্বের সব পাপ ধনতন্ত্রের বুকে ধনিকের
ঘরে বাসা বাঁধলো,
পণ্যের লক্ষ্মীমা দোকানীর পাপতাপে খাদ্যের
ভেজালেতে কাঁদলো।
মানুষের 'ব্ল্যাকাউটে' ক'রে দিয়ে 'ব্ল্যাক্-আউট' বিশ্বেতে
এল মসীরাত্রি,
চলেছে অন্ধকারে পাপের মহোৎসব শঙ্কায়
হাঁক ছাড়ে যাত্রী।
মিথ্যা কথার ঢেউ হত্যার বিভীষিকা আনন্দ রবি গেছে অস্ত,
চাঁদ নেই, তারা নেই, অন্ধকারের মাঝে ভূত-প্রেত
বাড়ায়েছে হস্ত।

বিশ্বের দাহে ওঠে ব্যোমপথে সন্তাপ বিধাতার
বেদীতল কাঁপছে,
ক্রুদ্ধ সে মহাকাল সংহার মূর্ত্তিতে মানুষের
মহাপাপ মাপছে।
উড়ে তাই এরোপ্লেন বোমা ছোটে দুম্‌দাম
গর্জ্জায় কামানের অগ্নি,
মৃত্যুর মাঝখানে বাঁচবার সাধ ব'য়ে দিন-রাত
কাঁদে ভাইভগ্নী।
সিন্ধুর বুক থেকে বন্দুকে হুঙ্কারি গর্জ্জায় সমরের ছন্দ,
সংবাদপত্রেতে বিষ হয়ে এল আজ মানুষের যত মকরন্দ।
যুদ্ধেতে দেশবাসী খাবি খায়, থেমে আসে রাস্তায়
মাসিকের ভীড় গো,
অন্তরে হাহাকার বাহিরেতে দাবা-তাসে বাঁধা এই
দুঃখের নীড় গো।
হাস্যের রেলপথে কান্নার ধোঁয়া ছেড়ে এল তবু
শারদীয়া ট্রেন যে,
সুখের পাণ্ডুলিপি দুঃখেতে বেচে ভাই আয় চল্
কে কে যাবি চেঞ্জে।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী কনকপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্রী। তিনি ১৯৩৮ সালে বীটন্ স্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও দশ টাকা সরকারী বৃত্তিলাভ করেন। স্কুলে অধ্যয়ন কালে 'বিদ্যাসাগর-বৃত্তি' ও অন্যান্য পুরস্কারও তিনি পাইয়াছিলেন। ১৯৪০ সালে আই-এ পরীক্ষায় তিনি একাদশ স্থান অধিকার করেন। বর্ত্তমান বৎসরে তিনি দর্শনে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ১৯৪০ সালে বীটন কলেজ হইতে 'নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্বর্ণ পদক' এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'উমেশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বর্ণ পদক' এবং 'নগেন্দ্র স্বর্ণ পদক' পাইয়াছিলেন। শ্রীমতী কনকপ্রভা গীত, বাদ্য, সূচীশিল্প, চিত্রাঙ্কণ ও রন্ধনবিদ্যায়ও নিপুণা।

বেঙ্গল পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসু মহাশয়ের কন্যা এবং ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের নৃতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী উমা গুহ ১৯৪২ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এস্‌সি পরীক্ষায় মনোবিজ্ঞানে প্রথম হইয়াছেন। শ্রীমতী উমা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্রী। তিনি বি-এস্‌সি পরীক্ষাতেও মনোবিজ্ঞানে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছিলেন এবং সমস্ত বি-এ ও বি-এস্‌সি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।


শ্রীউমা গুহ

প্রাচীন ভারতে নারীর সম্পত্তিতে অধিকারঃ পত্নী ও মাতা

শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

প্রাচীন ভারতে কন্যার সম্পত্তিতে অধিকার বিষয়ে আমরা স্থানান্তরে আলোচনা করেছি।* এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় পত্নী ও মাতার সম্পত্তিতে অধিকার।

পত্নী

বৈদিক ধর্মমতে পারমার্থিক ও সাংসারিক সর্ব বিষয়ে পতি ও পত্নীর সমান অধিকার বিদ্যমান। বিবাহ-দিবস থেকে মৃত্যু-দিবস পর্যন্ত—স্বামীর জীবদ্দশায় বা তাঁর পরলোকগমনের পর—সম্পত্তিতে স্ত্রীর সমান বা পূর্ণ অধিকার অবশ্য স্বীকার্য। গৃহ্য-সূত্রোক্ত স্বামি-স্ত্রীর "চাক্রবাকং সংবননং", অর্থাৎ চক্রবাক-মিথুন সদৃশ নিবিড় সম্মেলন, কবিত্বব্যঞ্জক বর্ণনামাত্র নয়, ইহা সত্যকার জীবনের নিখুঁত চিত্রন; দৈনন্দিন কাজে-কর্মে, বৈদিক ক্রিয়া-কলাপে, সম্পত্তি-বিভাগে, পারত্রিক সঞ্চয়াদিতে—সর্ব ব্যাপারে স্বামি-স্ত্রী সত্যই সর্বতোভাবে অবিচ্ছেদ্য—ইহাই ঋষিদের মত। যথা—জৈমিনি ও তাঁর ভাষ্যকার শবরস্বামী এই মত অকুণ্ঠভাবে প্রচার করেছেন।[১] আর্থিক ও যাজ্ঞিক সর্ব ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের সম্মতির প্রয়োজন; অন্যথা, সব ব্যর্থ।

সধবা পত্নী

সম্পত্তি বিষয়ক ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর সম্পর্ক বিবেচনা প্রসঙ্গে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে—১। যখন উভয়ের নিবিড় সান্নিধ্যে ও প্রীতি সৌহার্দ্যে উভয়ে আনন্দ-বিপ্লুত, তখনকার বিষয়ে মুনিদের কি বিধান; ২। পতি যখন ন্যায্য বা অন্যায্য ভাবে স্ত্রীকে গৃহ-বিতাড়িত করেন, তখনকার জন্যও বা মুনিদের কি ব্যবস্থা; ৩। পত্নী যখন স্বেচ্ছায় ন্যায্য বা অন্যায্য ভাবে পতিগৃহ ত্যাগ করেন, তখনকার জন্যও বা স্মার্তেরা কি বিধি-ব্যবস্থা করেছেন; ৪। এবং সর্বোপরি—সম্পত্তির উপভোগের দিক থেকে পতি থেকে পত্নীর কোনও স্বাতন্ত্র্য আছে কি না।

* প্রবাসী, ভাদ্র সংখ্যা, ১৩৪৯

১। স্ত্রী চাবিশেষাৎ—৬ষ্ঠ অধ্যায়, মীমাংসা-দর্শন।

১। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কোনও জটিলতা নাই। বিবাহসূত্রে বদ্ধ হওয়ার সেই শুভ মুহূর্ত থেকেই সর্ববিধ ব্যাপারে—বিষয়-আশয় সব কিছুতে—পতি ও পত্নী এক। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্বর্গের প্রতি বর্গের অনুধ্যানে বা অনুধাবনে পতি ও পত্নী স্বাতন্ত্র্য বিরহিত। সুতরাং দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে, সর্ব বস্তুর উপভোগে বা দুর্ভোগে, উভয়ে যুগপৎ প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হন। সম্পত্তি বিষয়ক সব কিছুর বিধান উভয়ের হাতে; জল্পনা-কল্পনা, সংকল্প, কার্য-পরিণতি—এ সবের জন্য উভয়ে সমান দায়ী ও সমান ফলভাগী। অবশ্য পতি যদি কোন কারণে অনুপস্থিত থাকেন, তা হ'লে পত্নীকে ত একেলা সংসারের ব্যয়ভার গ্রহণ করতেই হয়, সংসারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তখন তাঁর একেলার উপর।[২]

২। পরবর্তী যুগে যেমন কারণে অকারণে—পত্নী অপহৃতা, অপমানিতা বা বিধ্বস্তা হ'লে বা অন্য কোনও সামান্য অভিযোগে পত্নী-ত্যাগ সমাজে চল্‌ত, প্রাচীন কালে সে সব সম্ভবপর ছিল না। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁর ধর্মশাস্ত্রে স্পষ্ট ব'লে গেছেন যে ঐ উপরিলিখিত কারণগুলি অতি তুচ্ছ, ঐ সব কারণে পত্নীত্যাগ চল্‌তে পারে না।[৩] যদি স্বামী অন্যায্যভাবে সতী, সাধ্বী, প্রিয়বাদিনী, বীর-প্রসবিনী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন, তা হ'লে পত্নী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানানুসারে[৪]—স্বামীর সমগ্র সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিকারিণী হবেন। পরিত্যাগের কথা দূরে থাকুক, যদি স্বামী স্বেচ্ছায় সম্পত্তি নষ্ট করেন বা পত্নীকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন, তা হ'লেও পত্নী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে সে সম্পত্তির পুনরুদ্ধার সাধন করতে পারেন।[৫] স্থাবর ও অস্থাবর এই উভয়বিধ সম্পত্তির বেলায়ই এ আইন প্রযোজ্য, সন্দেহ নাই।

যদি অবশ্য ন্যায্য কারণে পতি পত্নীকে ত্যাগ করতে

২। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, ২, ৬, ১৪, ১৬-২০।

৩। ২৮, ২।

৪। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ২, ৭৬।

৫। মিতাক্ষরা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ২, ৩২র টীকা, বস্তুগ্রোঃ, ইত্যাদি।

চান, তা হ'লে পত্নীকে সে শাস্তি বরণ ক'রে নিতেই হয়, এবং স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার থেকেও তিনি সঙ্গে সঙ্গে বঞ্চিতা হন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বলা বাহুল্য যে স্বামী ন্যায়-সঙ্গতভাবে পত্নী ত্যাগ তখনই করতে পারতেন, যখন বাস্তবিকই পত্নী এমন গুরুতর অপরাধ করতেন—যার কোনও প্রায়শ্চিত্ত নেই।

৩। পত্নী যদি অত্যাচারে উৎপীড়িতা হয়ে বা অন্য কোনও ন্যায্য কারণে স্বামীর গৃহ-ত্যাগে বাধ্য হতেন, নিশ্চয় তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে—যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানানুসারে—এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি দাবী করতে পারতেন। অবশ্য অন্যায্য ভাবে পতিগৃহ ত্যাগ করলে পতির সম্পত্তিতে তাঁর কোনও অধিকার থাকত না।

৪। স্বামি-স্ত্রীর যৌথ সম্পত্তি ছাড়াও স্ত্রীর স্বতন্ত্র সম্পত্তির বিধান মহর্ষিরা ক'রে গেছেন—যে সম্পত্তির উপর স্বামীর কোনও হাত নেই। বিবাহের সময়ে স্ত্রী যে যৌতুকাদি প্রাপ্ত হতেন, তা বৈদিক ঋষিরা "পারিণাহ্য" নামে অভিহিত করতেন। এই পারিণাহ্য পত্নীর একেলার সম্পত্তি ছিল, এর উপর স্বামীর কোনও অধিকার ছিল না।[৬] এই পারিণাহ্যই পরবর্তী কালে পরিবর্ধিতাকারে "স্ত্রীধন" নামে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পারিণাহ্য কেবল পত্নীর বিবাহ সময়ে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু স্ত্রীধন পত্নীর বিবাহ সময়ে ও তৎপরবর্তী যে কোনও সময়ে প্রাপ্ত ধনদৌলতের সমষ্টি। স্বামী যদি কোনও কারণে সমগ্র সম্পত্তি পত্নীকে দিয়ে দেন,[৭] তা হ'লে ঐ সমগ্র সম্পত্তিও স্ত্রীধন রূপে পরিগণিত হ'তে পারে। মনু[৮] এই স্ত্রীধন ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন—মাতৃ-পিতৃ-ভ্রাতৃ-দত্ত ধন, বিবাহানন্তর পতি কর্তৃক দত্ত ধন, বিবাহের সময়ে ও নববধূর গৃহ-প্রবেশের সময় প্রদত্ত ধন। বিষ্ণু এই ছয় প্রকারের স্ত্রীধন ব্যতীত আরও তিন প্রকারের স্ত্রীধন মেনে নিয়েছেন—পুত্রদত্ত ধন, অন্যদত্ত ধন, এবং স্বামীর দ্বিতীয় বার বিবাহ সময়ে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদত্ত ধন।[৯] দেবলের মতে বৃত্তি, আভরণ, শুল্ক ও লাভমূলক অর্থও স্ত্রীধনের অন্তর্গত।[১০] বিজ্ঞানেশ্বর তাঁর মিতাক্ষরায় শুধু পূর্বোক্ত ছয় প্রকারের ধন বা বিষ্ণু প্রভৃতি স্বীকৃত নয় প্রকারের ধন নয়—উত্তরাধিকার, ক্রয়, দৈব প্রভৃতি যে কোনও প্রকারে স্ত্রীর প্রাপ্ত সম্পত্তি স্ত্রীধনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১১] কমলাকর ভট্ট, অপরার্ক, নন্দপণ্ডিত, মিত্র মিশ্র প্রভৃতি স্মার্তেরা বিজ্ঞানেশ্বরের এ মত মেনে নিয়েছেন। স্ত্রীধনের অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তি স্ত্রী হস্তান্তর করতে পারতেন কিনা, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে; কিন্তু পিতৃমাতৃপতি প্রভৃতি দত্ত উপহারাদি যে তিনি নিজের ইচ্ছানুসারে হস্তান্তরিত করতে পারতেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যদি স্বামী স্বকীয় কোনও কারণে স্ত্রীধন গ্রহণ করতেন, সুদ সহ তাঁর সে ধন শোধ করতে হ'ত।[১২] দুর্ভিক্ষাদি অত্যন্ত দুঃসময়ে পরিগৃহীত স্ত্রীধন স্বামীর অবশ্য প্রত্যর্পণ করতে হ'ত না।[১৩] কিন্তু যদি ফিরিয়ে দেওয়ার কথা দিয়ে স্ত্রীধন নেওয়া হ'ত, পতি সে ধন প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য হতেন।[১৪] জীবিত সময়ে স্বামী কর্তৃক প্রতিশ্রুত স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি পত্নী পতির মৃত্যুর পরেও স্ত্রীধন হিসাবে প্রাপ্ত হতেন।[১৫]

এর থেকে দেখা যায় যে যদিও পতির সম্পত্তিতে পত্নীর পূর্ণ দাবী ছিল, পত্নীর নিজস্ব সম্পত্তিতে, অর্থাৎ পারিণাহ্য বা স্ত্রীধনে পতির কোনও আইনসঙ্গত অধিকার ছিল না—স্নেহের অধিকার অবশ্য ভিন্ন। এই হিসাবে আইনতঃ পত্নীর একটি বিশিষ্ট অধিকার ছিল, যা পতির ছিল না।

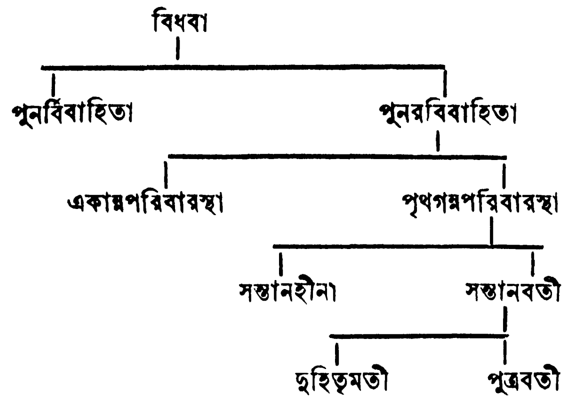
বিধবা পত্নী

বৈদিক সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রচলন হেতু[১৬] বিধবা নারীদের সম্পত্তিতে অধিকার বিষয়ে বিশেষ আইন-কানুনের তেমন হয়ত প্রয়োজন ছিল না। কারণ, বিবাহের পর বিধবা নূতন সংসারে প্রবেশ করায় পূর্ব স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁর আর কোনও অধিকার থাকত না নিশ্চয়ই। তবু স্থানে স্থানে যা প্রমাণ পাওয়া যায়, তার থেকে জানতে পারি যে, যে-বিধবা পুনরায় বিবাহ করতেন না, তিনি স্বামীর বিষয়-সম্পদে অধিকারিণী হতেন। অতি প্রাচীনকালে যে দাক্ষিণাত্যে পত্নীর সম্পত্তিতে অধিকার ছিল, নিরুক্তই তার প্রমাণ।[১৭]

৬। তৈত্তিরীয়-সংহিতা, ৬. ২. ১. ১।
৭। তুলনা করুন—থেরীগাথা ১২—ধম্মদিন্না।
৮। ৯. ১৯৪
৯। ১৭. ১৮। ১০। বৃত্তিরাভরণং শুল্কং লাভশ্চ স্ত্রীধনং ভবেৎ।

১১। যাজ্ঞবল্ক্য, ২. ১৪৩—১৪৪। ১২। বৃথাদানে চ ভোগে চ স্ত্রিয়ৈ দদ্যাৎ সবৃদ্ধিকম্; ব্যবহার-ময়ূখোদ্ধৃত দেবল। ১৩। যাজ্ঞবল্ক্য, ২. ১৪৭। ১৪। স্মৃতিচন্দ্রিকা, ব্যবহার কাণ্ড পৃ. ৬৫৯। ১৫। ঐ, ঐ, ভর্ত্রা প্রতিশ্রুতম্, ইত্যাদি।
১৬। Modern Reviewতে আমার Widow Marriage in Ancient India শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, 1942.

কালে কালে যখন বিধবা-বিবাহ সমাজে অগৌরবকর ব'লে প্রায় অপ্রচলিত হয়ে উঠল, তখন হিন্দু ঋষিরা বিধবা নারীদের প্রতি অবিচার নিরোধ করার জন্য সর্ববিধ প্রয়াসে তৎপর হয়েছিলেন। বিধবার সম্পত্তি-প্রাপ্তি-বিষয়ক আলোচনা মোটামুটি নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা চলে :—



বহু প্রাচীন স্মার্তের মতে বিধবা সকল অবস্থাতেই যৌথপরিবারভুক্তই হোন, বা পৃথগন্নপরিবারস্থাই হোন, নিঃসন্তানাই হোন বা সন্তানবতীই হোন, দুহিতৃমতীই হোন বা পুত্রবতীই হোন—স্বামীর উত্তরাধিকারিণী হন। এমন কি, স্বামীর সম্পত্তির উপরে পুত্রের চেয়েও তাঁরই দাবিদাওয়া বেশী। যথা—বৃহস্পতি[১৮] উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"পত্নীকে বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রে স্বামীর অর্ধেক, পুণ্য ও অপুণ্য ফলভোগে সমান ব'লে বিঘোষিত করা হয়েছে; পত্নীর জীবিত অবস্থায় স্বামীর অর্ধেক অংশ জীবিত থাকে; সুতরাং সে অর্ধেক অংশ জীবিত থাকতে অন্যে সম্পত্তি পাবে কেন?" প্রজাপতিও[১৯] বলেছেন—বিধবা স্ত্রী স্বামীর সর্ববিধ সম্পত্তির অধিকারিণী; তাঁর গুরুজনেরা বিদ্যমান থাকলে তিনি তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তা'তে তাঁর সম্পত্তি প্রাপ্তি বিষয়ে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটতে পারে না। যদি কেউ তাঁর দায়াধিকারে বিঘ্ন ঘটায়, তা হ'লে তাঁর যথোচিত শাস্তিবিধান করা রাজার অবশ্যকর্তব্য।

কিন্তু পরবর্তী স্মৃতিকারেরা এই সাধারণ নিয়ম মেনে নেন নি। তাঁরা বিভিন্ন অবস্থায় বিধবার জন্য বিভিন্ন নিয়ম বিধান করেছেন। তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হচ্ছে।

১৭। গত্বা রোহিণীব ধনলাভায় দক্ষিণাজী; ৩. ৫।

১৮। দায়ভাগের একাদশাধ্যায়ে উদ্ধৃত—আম্নায়ে স্মৃতি-তন্ত্রে চ, ইত্যাদি।

১৯। পরাশর-মাধবীয়, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৬।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যদি বিধবা পত্নী স্বামীর মৃত্যুর পরে পুনরায় বিবাহসূত্রে আবদ্ধা হন, তা হ'লে তাঁর ভূতপূর্ব স্বামীর সম্পত্তির উপর কোনওরূপ দাবীদাওয়া থাকতে পারে না।

যদি তিনি পুনরায় বিবাহ না করেন, তা হ'লে প্রশ্ন উঠে—তিনি স্বামীর ভ্রাতাদির সঙ্গে একপরিবারভুক্তা কি না। যদি একই পরিবারের অন্তর্ভুক্তা হন, তা হ'লে মিতাক্ষরা-মতে পত্নী স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হ'তে পারেন না। পুত্রহীনা পত্নীকে স্বকীয় সম্পত্তির অধিকার-প্রদানের নিমিত্ত মিতাক্ষরানুসারে স্বামীকে জীবদ্দশায় যৌথ পরিবার থেকে পৃথক্ হ'তে হয়।[২০] কিন্তু জীমূতবাহনের মতে যৌথ-পরিবারস্থা হ'লেও পত্নী স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী হন।[২১] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে অন্ততঃ ভারতের কোন কোন স্থানে, যেমন বঙ্গদেশে, বিধবা পত্নী যৌথপরিবারভুক্তা হ'লেও স্বামীর অংশ দাবী করতে পারতেন।

এখন পৃথক্ পরিবারস্থা বিধবার বিষয় আলোচনীয়। পৃথগন্ন-পরিবারস্থা বিধবা সন্তানহীনা হ'লে স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী হ'তেন। ইহা স্মার্তদের উত্তরাধিকারি-নির্ণয়ের তালিকা থেকে জানা যায়। অবশ্য, মনু ও দায়ভাগের মত ভিন্ন।[২২]

যদি বিধবা সন্তানবতী হন—কেবল কন্যা থাকে, পুত্র নয় —তা' হ'লে পত্নী নিজে স্বামীর উত্তরাধিকারিণী হবেন। বিষ্ণু[২৩], যাজ্ঞবল্ক্য,[২৪] প্রভৃতি এ বিষয়ে এক মত। মিতাক্ষরায় উদ্ধৃত বৃদ্ধমনুর[২৫] বিধানানুসারে অপুত্রা স্ত্রী স্বামীর ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়াকলাপের অধিকারিণী বলেই স্বামীর সম্পত্তিরও অধিকারিণী হন। মিতাক্ষরায় এই প্রসঙ্গে কাত্যায়ন ও হারীতের মতও উদ্ধৃত করা হয়েছে। জীমূত-বাহনও দায়ভাগের একাদশ অধ্যায়ে বলেছেন যে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই পত্নী পতির সম্পত্তিতে অধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁর জীবদ্দশায় এই অধিকার থেকে তিনি কিছুতেই বঞ্চিত হ'তে পারেন না। সুতরাং তিনিই স্বামীর যথাযথ উত্তরাধিকারিণী।[২৬] এই সব যুক্তি অকাট্য। সুতরাং

২০। যাজ্ঞবল্ক্য, ২. ১৩৬।

২১। দায়ভাগ, একাদশ অধ্যায়, ন হি সংসৃষ্টত্বাপি, ইত্যাদি। নিম্নে "মাতা" দেখুন।

২২। নিম্নে "মাতা" দেখুন।

২৩। ১৭. ৪৩।

২৪। ২. ১৩৫-১৩৬।

২৫। যাজ্ঞবল্ক্যের ২. ১৩৫-১৩৬এর টীকা।

২৬। পরিণয়নোৎপন্নং ভর্তৃধনম্, ইত্যাদি।

মেধাতিথি প্রমুখ স্মার্তদের দুর্বল মত প্রবল স্রোতের মুখে শেওলার মত ভেসে গেল, সমাজের কেউ তার প্রতি কর্ণপাত করলে না।

যদি বিধবা পুত্রসন্তানের জননী হন, তা হ'লে আইনতঃ সম্পত্তি পুত্রের প্রাপ্য। কিন্তু জননীর জীবদ্দশায় পুত্রেরা সে সম্পত্তি ভাগ করতে পারত না, এবং পত্নীই বাস্তবিক পক্ষে পতির সম্পত্তির সর্বময়ী কর্ত্রী থাকতেন। যদি পুত্রেরা ভাগ নিতান্তই করত, তা হ'লে জননীকে সমানাংশ প্রদান করতে হ'ত–বিজ্ঞানেশ্বর প্রমুখ স্মার্তদের এই মত।[২৭] শুক্রের মতে অবশ্য তিনি এক ভাগের চতুর্থাংশের মাত্র অধিকারিণী,[২৮] কিন্তু এ মত আর কোনও স্মার্তের কাছে সমাদর লাভ করে নি। জননীর সম্মান ভারতীয় সমাজে এত সুপ্রতিষ্ঠিত যে জননীর সামান্য অবমাননাও সহনীয় নহে। জননীর জীবদ্দশায় সম্পত্তির লোভে যে পুত্র জননীর দুঃখের কারণ হ'ত, সে নিতান্ত কুপুত্র ব'লেই পরিগণিত হ'ত।

বিধবা তাঁর জীবদ্দশায় স্বামীর স্থাবর সম্পত্তি ভোগের সম্পূর্ণ অধিকারিণী বটে, কিন্তু তিনি ঐ সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয়াদি করতে পারেন না—এ কোন কোনও স্মার্তের মত।[২৯] বৃহস্পতির মতে কেবল ধর্মসঙ্গত ক্রিয়াকলাপের জন্যই স্ত্রী স্বামীর স্থাবর সম্পত্তি থেকেও ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন। তবে মিত্র মিশ্রের মতে বিধবা পত্নী স্বামীর অধিকারস্থ স্থাবর ও অস্থাবর উভয়বিধ সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারেন।[৩০]

অবশ্য চরিত্রহীনা বিধবা স্বামীর সম্পত্তি কিছুই পাবেন না—এ বিষয়ে স্মার্তেরা একমত।[৩১]

মাতা

জননীর জীবদ্দশায় পুত্রেরা পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করতে পারবেন না, এবং যদিও ভাগ করেন, তা হলে জননীকে সমান অংশ প্রদান করতে হবে—স্মার্তদের এ মত পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আসুর-মতে বিবাহিতা সন্তানহীনা কন্যার সম্পত্তি জননীর প্রাপ্য।[৩২] মনুর মতে নিঃসন্তান মৃত পুত্রের সম্পত্তিরও মাতাই অধিকারিণী হবেন; অবশ্য অন্যান্য স্মার্তেরা মনুর এ মত যে মানেন না, তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

আমাদের এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে প্রাচীন ভারতে নারী—কন্যা, পত্নী ও জননী হিসাবে—সম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন। প্রাচীন ঋষিরা নারীদের হিতজনক বহুবিধ ব্যবস্থা উত্তরাধিকার-প্রসঙ্গে বিহিত করেছিলেন। নারীদের আর্থিক অসঙ্গতি মোচনের সর্ববিধ উপায় তাঁরা উদ্ভাবন করেছিলেন বা করবার প্রচেষ্টা করেছিলেন। উত্তরাধিকার-নির্ণয় বিষয়ে পুরুষের তুলনায় নারীর অমর্যাদা বা অগৌরবের কিছুই ছিল না। শুধু তাই নয়—সম্পত্তির উপর নারীদের স্বতন্ত্র অধিকারমূলক বিধিব্যবস্থা করতেও ভারতীয় সমাজপতিরা পশ্চাদ্‌পদ হন নি। নারীদের সর্ববিধ উন্নতি তাঁদের চরম কাম্য ছিল—কারণ, নারীর উন্নতি ব্যতীত সমাজের উন্নতি যে সম্ভবপর নয়, এই মহা-সত্য তাঁরা পরিপূর্ণ উপলব্ধি করেছিলেন। কালক্রমে সমাজে নারীদের সে সম্মান ও অধিকার হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও, বর্তমানে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে অচিরে তার পুনরুদ্ধার সাধিত হ'বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২৭। যাজ্ঞবল্ক্য, ২. ১৩৬ এর টীকা।
২৮। ৪. ৫. ২৯৭।
২৯। স্মৃতি চন্দ্রিকা, ব্যবহার কাণ্ড, পৃ. ৬৭৭।
৩০। বীরমিত্রোদয়, সংস্কার-প্রকাশ, পৃ. ৬২৮-৬২৯।
৩১। যথা, মিতাক্ষরা, ২. ৩; দায়ভাগ, ১১, ১, ৪৭-৪৮।
৩২। মনু, ৯, ১৯৭



উত্তর-আফ্রিকা। এলজিয়ার্স বন্দরের দৃশ্য

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিকের কূলে রঙ্গভূমির দৃশ্যপটে অতি সহসা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধে জার্ম্মানীর পরাজয় কোনও যুদ্ধক্ষেত্রে হয় নাই। হইয়াছিল প্রেসিডেণ্ট উইলসনের আমেরিকার পক্ষ হইতে ঘোষণার ফলে এবং রুশ দেশে জার্ম্মান রাষ্ট্রবিশারদগণের বুদ্ধিলোপের ফলে জার্ম্মানীর লোকসমষ্টির মধ্যে হতাশা ও রাষ্ট্র বিপ্লব। তাহার ফলে জার্ম্মান সেনার রসদ ও অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় তাহারা ক্ষীণবল ও হতবুদ্ধি হইয়া পশ্চাদ্‌পদ হইতে বাধ্য হয়। এই অধোগতি ক্রমে এরূপ বিপরীত অবস্থায় পৌঁছায় যে জার্ম্মান সম্রাটের পলায়ন এবং জার্ম্মান রাষ্ট্রের পরাজয় স্বীকার ভিন্ন অন্য কোনও উপায় ছিল না। এইরূপে প্রবল প্রতাপ, "অজেয়" জার্ম্মান সেনা, জনমতের সহায়তার অভাবে—পরে বিরোধের ফলে—বিধ্বস্ত হইয়া যায়। বিগত মহাযুদ্ধে রুশ সাম্রাজ্যের পরাজয় স্বীকারেরও একই কারণ ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে রুশসেনা বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়—প্রায় আশী লক্ষ লোক হতাহত ও বন্দী হইয়াছিল—কিন্তু বিপ্লবের ফলেই তাহাদের পতন হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহারা অস্ত্রত্যাগে বাধ্য হয় নাই। জনমত কিরূপে এই দুইটি বিশাল সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ণয়ে শস্ত্রবলের উপরে আসন গ্রহণ করিয়াছিল তাহা এখন জগতের ইতিহাসের অংশ। আশ্চর্য্যের বিষয় এইমাত্র যে এখনও, এই আধুনিক জগতে, বহু শক্তিশালী ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের মস্তিষ্কে ইতিহাসের লেখনের এই অতি সুস্পষ্ট অর্থ প্রবেশ করিতে পারে নাই। যাহা হউক সে অন্য কথা।

এতদিন যুদ্ধ যে পথে ও যে ভাবে চলিয়াছিল তাহাতে অক্ষশক্তিপুঞ্জের অন্তর্গত ও অধিকৃত দেশগুলিতে জনমত বিকাশের কোনও পথ ছিল না। চারিদিকেই অক্ষশক্তির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রত্যেক দ্বারেই অক্ষশক্তির সশস্ত্র শাস্ত্রী সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখিতেছিল। অক্ষশক্তি-পুঞ্জের নেতৃবর্গের সদর্প ঘোষণা দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃত হইতেছিল, "অক্ষশক্তিপুঞ্জ অজেয়, তাহাদের বর্ম্মে কোনও ছিদ্র নাই।" প্রায় সমস্ত ইয়োরোপের মহাদেশে এবং পরে, পূর্ব্ব-এসিয়া ও ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপমালায় অক্ষশক্তি অপ্রতিহত ছিল, সে সকল দেশে ভিন্ন মতাবলম্বীর স্থান তো ছিলই না, বরঞ্চ তাহাদের আশা ভরসার উপর ক্ষীণতম আলোকরশ্মিও প্রতিফলিত হয় নাই। ভিন্ন মতাবলম্বী যে সকল রাষ্ট্র—ডেমক্রাসী নামে পরিচিত—সম্মিলিত ভাবে ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা করিতেছিল, এত দিন তাহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে, অন্ধকারের মধ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রার মত তাহাদের কার্য্যক্রম, গতিরূপ, পরিকল্পনা ও বিচার, সবই অনিশ্চিত ও অনির্দ্দিষ্ট বলিয়াই দেখা যাইতেছিল। "সম্মিলিত" জাতিবর্গের মিলনের পথ এখনও অতি দুর্গম ও বিপৎসঙ্কুল, পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের যোগসূত্র এখনও অতি ক্ষীণ, পরস্পরের সাহায্য করিবার পন্থা এখনও নিতান্তই দোষযুক্ত। এত দিন এই অবস্থার শোধনের ক্ষমতা যে সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের থাকিতে পারে তাহারও কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই।

অল্প কয়দিনের মধ্যে উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকায় যাহা ঘটিয়াছে—এবং ঘটিতেছে—তাহাতে উপরোক্ত অবস্থায় কোনও দ্রুত পরিবর্ত্তন না হইতে পারে, কিন্তু এখন ইহা নিশ্চিত যে অক্ষশক্তির ভাগ্যনির্ণয়ের এক সন্ধিক্ষণ আসিয়া উপস্থিত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এত দিনে উপদেষ্টা ও "জোগানদারে"র আসন ছাড়িয়া, যোদ্ধার বেশে পাশ্চাত্য সমরাঙ্গনে উপস্থিত। যুদ্ধক্ষেত্রে ইহার কি ফলাফল হইবে তাহা পরে দেখা যাইবে। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইহার ফল এখনই দেখা যাইতেছে। এবং যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মতিভ্রম আর না হয় তবে এই নূতন পরিস্থিতির প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে। ভূমধ্যসাগর এত দিন প্রায় "রোমসাগর" রূপেই ছিল। এখন অক্ষশক্তির এই ক্ষেত্রের অধিকারে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত। যদি অক্ষশক্তির এই অধিকার যায়, তবে রুশকে যথাযথ সাহায্য দান, ইয়োরোপের মহাদেশ অঞ্চলে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র স্থাপন, মধ্য-এসিয়ার সুদৃঢ় সংরক্ষণ এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রবল ভাবে অভিযান চালনা—সকলই কল্পনার রাজ্য হইতে বাস্তবের রাজ্যে আসিতে পারে। অক্ষশক্তির অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে—বিশেষতঃ ফ্রান্সে—জনমতের চাঞ্চল্যের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছে, অক্ষশক্তির অন্তর্গত দেশগুলিতে জনমতের বিক্ষোভ হইবার সম্ভাবনাও এত দিনে হইয়াছে, কেননা জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতীক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং তাহার সেনাদল এখন সশস্ত্র বেশে ইয়োরোপের দ্বারে উপস্থিত। এখন সব কিছুই নির্ভর করিতেছে কি ভাবে এই নূতন অভিযান চালিত হয়—বলে এবং কৌশলে, ছলে কিছুই হইবে না। নূতন অভিযানের সূত্রপাত করা হইয়াছে অতি নিপুণ ভাবে, কিন্তু ইহা এখনও কেবলমাত্র সূত্রপাত মাত্রই, অভিযান পূর্ণোদ্যমে চালিত এখনও হয় নাই। বিপক্ষের দৃষ্টি এড়াইয়া সবলে অধিকার স্থাপনের কার্য্যে যুক্তরাষ্ট্রের রণনেতাগণ নরওয়েতে অক্ষশক্তিদলের কার্য্যেরই মত ক্ষিপ্রকারিতা দেখাইয়াছেন। তবে এখনও বিপক্ষের বল পরীক্ষা হয় নাই। তাহাতে বিলম্ব ঘটিলে অক্ষশক্তির বিপদের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যাইবে, কেননা অক্ষশক্তি এখনও যে প্রবল ও বিষম শক্তিশালী তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই এবং এই নূতন অভিযানে তাহাদের বিপদের সামান্য সূচনা হইয়াছে মাত্র সমূহ বিপদ উপস্থিত হয় নাই।

মিশরের রণক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে এবং যাহা ঘটিতেছে তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ এখনও আমরা পাই নাই। যাহা পাইয়াছি তাহার কতক অংশ সামরিক সংবাদ বাকী



এলজিরিয়া। ওরান অঞ্চলের বেনিবাধেল বাঁধ

অনেক অংশ বাস্তবিক বা আনুমানিক অবস্থার উপর গঠিত সাংবাদিকের জল্পনা-কল্পনা। যাহা সঠিক্ সামরিক সংবাদ তাহার সমীচীন রূপে চর্চ্চা করিবার সময় এখনও আসে নাই, কেননা অনেক কিছুই এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে যাহা যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

মিশরে জেনারেল রোমেলের সৈন্যদল প্রচণ্ড আঘাতে বিধ্বস্ত হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট। এখন রোমেলের সৈন্যদল রণে ভঙ্গ দিয়া আত্মরক্ষার জন্য দ্রুতবেগে পিছাইয়াই চলিয়াছে। বলক্ষয় অস্ত্রক্ষয় ও লোকক্ষয় তাহাদের সাংঘাতিক ভাবেই চলিতেছে, এবং মিত্রপক্ষের সেনা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন ও আক্রমণ সমানেই করিয়া চলিতেছে। এখন প্রশ্ন এই যে, মিত্রপক্ষের সৈন্য জেনারেল রোমেলের সেনাগুলিকে সম্পূর্ণ রূপে ঘিরিয়া লইয়া বিনষ্ট করিতে পারিবে কিনা। ষ্টালিনের মতে মিশরে অক্ষশক্তির দলে ১১টি ইতালিয় এবং ৪টি জার্ম্মান ডিভিশন ছিল অর্থাৎ দুই লক্ষ হইতে আড়াই লক্ষ সৈন্য। ইহার মধ্যে প্রায় ত্রিশ হাজার বন্দী হইয়াছে এবং হতাহতও অন্ততঃ পক্ষে ত্রিশ হাজার হইবে। সুতরাং সৈন্যের হিসাবে রোমেলের শক্তির এক-চতুর্থাংশ হইতে এক-তৃতীয়াংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। অবশিষ্টের যুদ্ধক্ষমতায়, অবিশ্রাম যুদ্ধ ও পশ্চাৎপদ হওয়ার ফলে, ভাটা পড়িতে বাধ্য, সেটা সময়ের প্রশ্ন মাত্র। অস্ত্রের হিসাবে রোমেলের শক্তিক্ষয় কতটা হইয়াছে সঠিক বলা যায় না, কেননা কোনও সামরিক সংবাদে বিশদ বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। প্যাঞ্জার যুদ্ধশকট রোমেলের নিকট কত ছিল তাহাও প্রকাশিত হয় নাই, তবে বোধ হয় তিন ডিভিশনের—অর্থাৎ প্রায় ১৫০০, ছোট বড় মিলাইয়া ছিল—অধিক নহে। ইহার মধ্যে ৫০০ সম্পূর্ণ নষ্ট বা মিত্রপক্ষের হস্তগত

হওয়ার সংবাদ ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পর আরো বেশ কিছু ক্ষতি হওয়া সম্ভব। সুতরাং প্যাঞ্জার যুদ্ধশকটের হিসাবে ক্ষতি এক-তৃতীয়াংশের অধিক—সম্ভবতঃ প্রায় অর্দ্ধেক—নিশ্চয়ই হইয়াছে। কামান ইত্যাদির লোকসান আরও অধিক পরিমাণে হওয়াই সম্ভব। রসদ, পেট্রোল, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা হইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুতরাং জেনারেল রোমেলের অবস্থা এখন নিতান্তই সঙ্গীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মিত্র পক্ষে ক্ষতি নিশ্চয়ই হইয়াছে কিন্তু পশ্চাদ্ধাবনকারীর ক্ষতি অনেক কম অনুপাতেই ঘটিয়া থাকে, সেই জন্য মিত্র-পক্ষের ক্ষতির পরিমাণ রোমেলের ক্ষতি অপেক্ষা কমই হওয়া সম্ভব। কেবল মাত্র প্রথম নয় দিনের ব্যূহভেদ ও যন্ত্রযুদ্ধে মিত্রপক্ষের ক্ষতি অধিক হইয়া থাকিতে পারে।

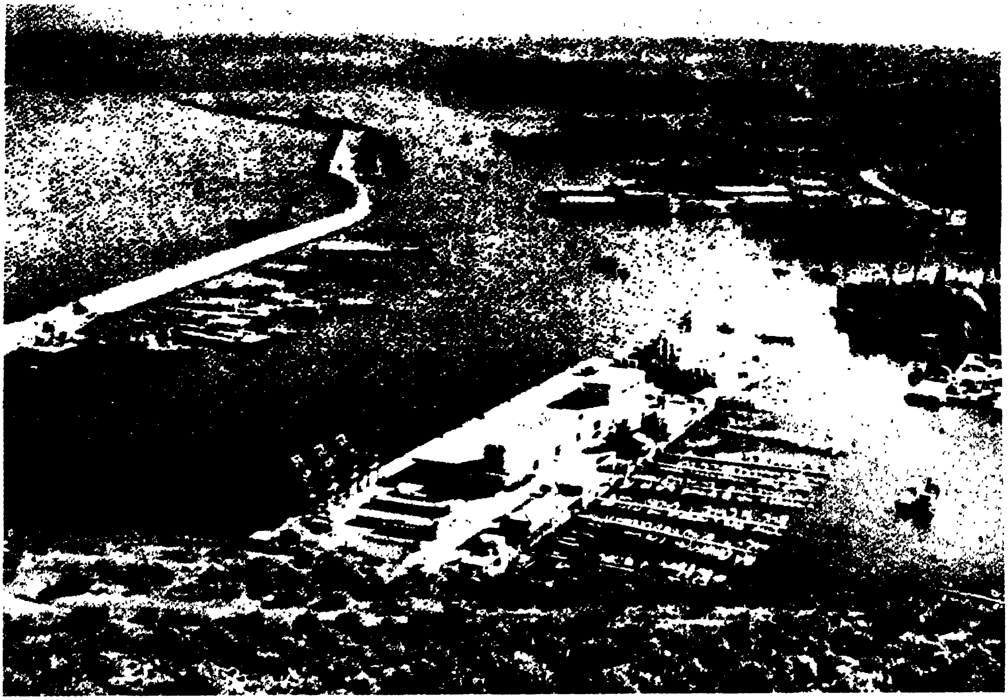
রোমেলের সেনাদল যদি আরও বেশী দূর পিছাইয়া যাইতে পারে, তবে মিত্রপক্ষের সরবরাহের ব্যবস্থা কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। এত দিন রোমেলের অস্ত্রশস্ত্র রসদ আসিতেছিল বহুদূর হইতে, মিত্রপক্ষের ব্যবস্থা ছিল সহজ। ইহার পর মিত্রপক্ষ যত দূর যাইবে এবং যুদ্ধক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হইবে ততই মিত্রপক্ষের ব্যবস্থার উপর টান পড়িবে। এরোপ্লেন আক্রমণেও সেই একই কথা। রোমেলের পক্ষে এরো-ড্রোমের ব্যবস্থা ক্রমেই অনুকূল হইবে, মিত্রপক্ষকে বিধ্বস্ত এরোড্রোমগুলি মেরামত করিয়া তবে এরোপ্লেনের ঘাঁটি বসাইতে হইবে। সুতরাং জেনারেল আলেকজাণ্ডারের পক্ষে এখন প্রয়োজন রোমেলের চতুর্দ্দিকে বেড়াজাল ফেলিয়া সরবরাহের ও পশ্চাদ্‌গমনের পথ রুদ্ধ করিয়া বিপক্ষকে যুদ্ধদানে বাধ্য করা। বাদিয়া টোব্রুক ইত্যাদি দখল করার অর্থ সরবরাহের পথরোধ, কিন্তু দক্ষিণের ও পশ্চিমের অসীম মরুভূমিতে অভেদ্য ব্যূহ-যোজনা সম্ভব নহে। কেবলমাত্র দ্রুতগামী যুদ্ধশকটের চালনায় চতুর্দ্দিকে পথরোধ সম্ভব। সেই জন্যই এখন গতিশীল যুদ্ধ চলিতেছে যাহাতে এক দিক প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে বেড়াজাল ছিঁড়িয়া তাহার শক্তি বৃদ্ধির আকরের দিকে যাইতে, অন্য দল চেষ্টা করিতেছে বেড়াজালের ঘের ক্রমেই সঙ্কীর্ণ করিয়া বিপক্ষের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন। রোমেলের দল এখন ক্ষীণবল, মিত্রপক্ষ প্রবল, সুতরাং রোমেলের কৌশল মিত্র-পক্ষের প্রবল শক্তিকে অতিক্রম করিয়া বেড়াজাল ছিঁড়িয়া পলাইতে পারিবে কিনা তাহাই প্রশ্ন।

রোমেলের সেনা মিশরের রণক্ষেত্রে এইরূপে আক্রান্ত, বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত হওয়ার ফলে সম্মিলিত জাতীয়দলের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। শেষরক্ষা হইলে ইহার পরিণামে অক্ষশক্তিপুঞ্জের রাষ্ট্রগুলিতে জনমতের কিছু পরিবর্ত্তনও সম্ভব। কিন্তু মিশরে বা উত্তর-আফ্রিকায় যাহাই ঘটুক শেষ নিষ্পত্তি এখানে হইতে পারে না। রোমেল সদলে বিনষ্ট হইলেও অক্ষশক্তির অতি সামান্য এক অংশই যাইবে। সুতরাং সে দিক দিয়া মিত্রপক্ষের লাভ বিশেষ কিছুই হইবে না। আসল লাভ হইবে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে চলাচলের পথ সরল হইবার ব্যবস্থা সম্ভব হওয়ায় এবং অক্ষশক্তির অন্তর্গত রাষ্ট্রের লোকমতের পরিবর্ত্তনে।

স্টালিনের বিবৃতিতে ছিল রুশসেনা অক্ষশক্তির ১৭২ ডিভিশনের পথরোধ করিয়া লড়িতেছে এবং মিশরে মাত্র ১৫ ডিভিশনের বলপরীক্ষা হইতেছে। বৃটিশ পার্লামেণ্টে সম্প্রতি বলা হইয়াছে যে, বৃটেনে মিত্রপক্ষ যে পরিমাণ শক্তি গঠন করিয়াছেন, ফ্রান্সে বিপক্ষদলের শক্তি প্রায় সেই পরিমাণেই গচ্ছিত আছে। সুতরাং প্রকৃত বল পরীক্ষার আরম্ভ এখনও হয় নাই ইহা বলা বাহুল্য। সম্প্রতি যাহা ঘটিয়াছে তাহা মিত্রপক্ষের উদ্যোগ পর্ব্বের অংশমাত্র।

... ...

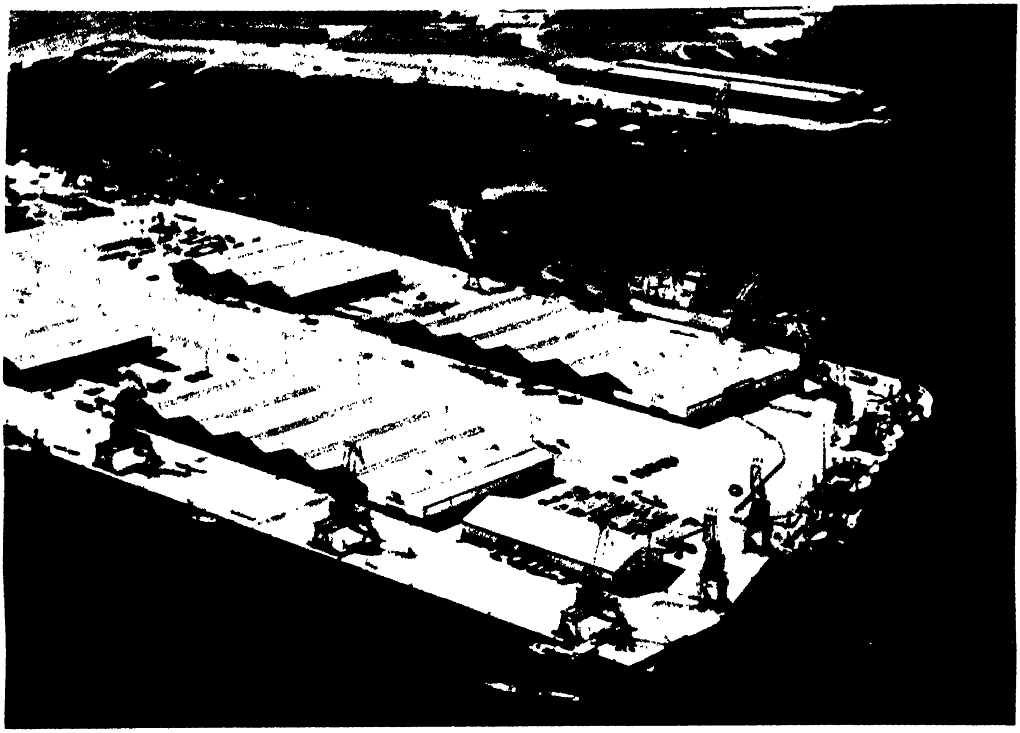
মাদাগাস্কারের অভিযানের শেষ পর্য্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতমহাসাগরের এক প্রান্তে মিত্রপক্ষের এক সুদৃঢ় ঘাঁটি স্থাপিত হইল। ইহাতে মিত্রপক্ষের যুদ্ধচালনায় কোনও ইতরবিশেষ হইবে কিনা সন্দেহ। তবে জাপান যদি উহা সুদৃঢ়রূপে অধিকার করিতে পারিত, তবে ভারত-মহাসাগরে মিত্রপক্ষের অবস্থা শঙ্কাজনক হইত সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে জাপানের পক্ষে দক্ষিণ প্রশান্ত মহা-সাগরের দ্বীপমালার ব্যবধান রক্ষা করাই প্রধান সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। সলোমন দ্বীপপুঞ্জে এবং নিউগিনিতে যে যুদ্ধ চলিয়াছে তাহা খণ্ডযুদ্ধের পর্য্যায়ে পড়িলেও তাহার ফলাফলের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করিতেছে। এখন পর্য্যন্ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তির কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই। তবে মার্কিন অধিনায়কের চালনায় মিত্রপক্ষ এখন আক্রমণই যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।



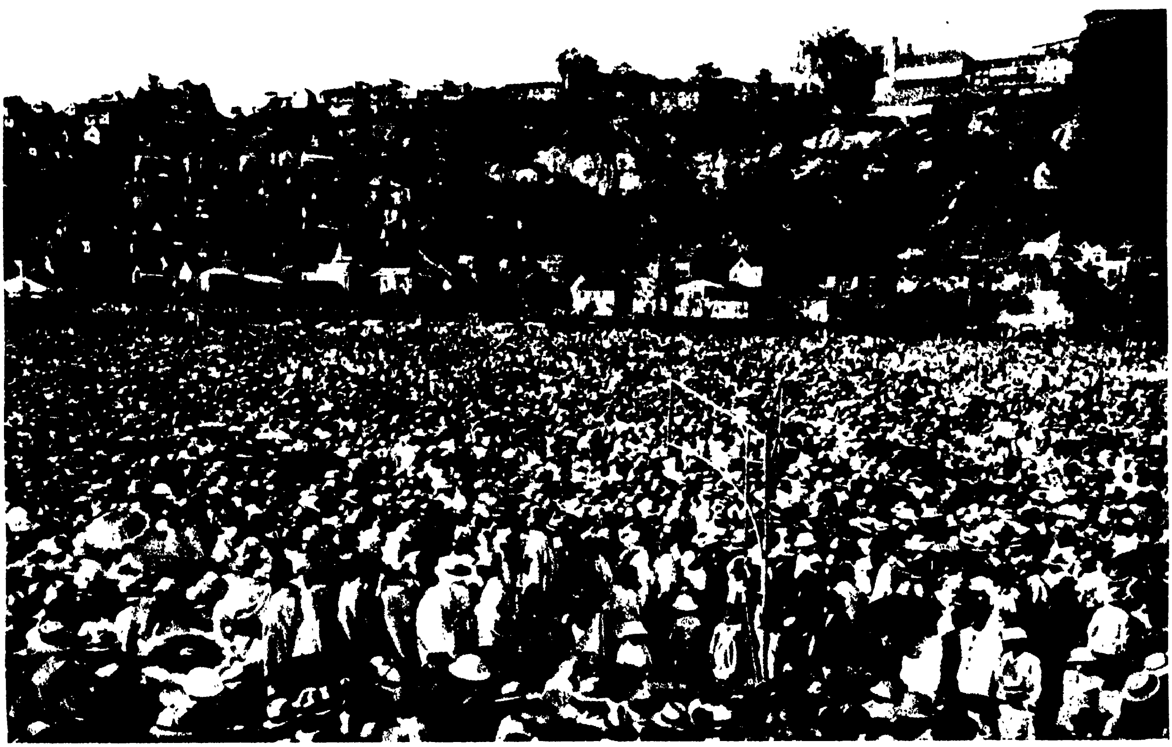
এলজিরিয়া। ওরান বন্দর



এলজিরিয়া। এলজিয়ার্স বন্দর



মরক্কো। কাসাব্লাঙ্কা বন্দরের দৃশ্য



মাদাগাস্কার। রাজধানী টানানারিভের দৃশ্য

পুস্তক পরিচয়

কীর্ত্তন-গীতি প্রবেশিকা—(স্বরলিপিসহ কীর্ত্তন গান) ১ম খণ্ড (১৩৪৮) শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মূল্য ২৷৹ টাকা; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স লিমিটেড।

কীর্ত্তন গানের ব্যাপক ইতিহাস রচনা করিতে হইলে সমগ্রভারত বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা প্রয়োজন। সুদূর মথুরা-বৃন্দাবন তথা দক্ষিণ-ভারতের ভক্তপ্রবর ত্যাগরাজের "কীর্ত্তন" সাধন কেন্দ্রগুলিও পরিদর্শন করা দরকার। তবু স্বীকার করিতেই হইবে যে আমাদের বাঙলা দেশ ও বাঙলা ভাষা কীর্ত্তন-সঙ্গীতে ও পদসাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। অথচ এই অমূল্য সম্পদ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা নাই এবং উচ্চাঙ্গ কীর্ত্তন গায়কের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় আমাদের এই জাতীয় উত্তরাধিকার রক্ষাকল্পে বহু দিন পরিশ্রম করিয়াছেন এবং বড় বড় কীর্ত্তন-গায়কদের সমাদর করিয়া ও কীর্ত্তন-সঙ্গীতের সাধন করিয়া এ বিষয়ে যথার্থ বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন। কীর্ত্তন-গীতি প্রবেশিকার বহু তথ্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল "নিবেদন"টি পড়িলেই সকলে সেটি অনুভব করিবেন। স্বরলিপির সাহায্যে কীর্ত্তন শিক্ষাদানের সাধু প্রচেষ্টা এই প্রথম এবং আমাদের বিশ্বাস এরূপ বিজ্ঞানসম্মত অথচ সরল প্রণালীতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে কীর্ত্তনের বহুল প্রচার হইবে। মুখে মুখে গান শিখাইবার ও শিখিবার সুবিধা ও অসুবিধা দুই আছে। কীর্ত্তনের স্বরবিন্যাসকে যদি composition এর গুরুত্ব দিতে হয় তাহা হইলে পাশ্চাত্য সুরস্রষ্টাদের রচনার স্থায়িত্বদানের চেষ্টা করিতে হইবে। স্বরলিপির সাহায্য ব্যতীত সেটি সম্ভব নয়, সুতরাং গ্রন্থকার ও প্রকাশকের এই সাধু প্রচেষ্টার সমর্থন করা উচিত। কীর্ত্তনাচার্য্য শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও ডাঃ অমিয়নাথ সান্ন্যাল 'কীর্ত্তন-সঙ্গীতে তাল' ও 'কীর্ত্তনে রাগরাগিণী' শীর্ষক দুটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ভূমিকায় উৎসর্গ করিয়া গ্রন্থের মূল্য বাড়াইয়াছেন। আধুনিক কীর্ত্তন রচয়িতাগণের মধ্যে অকিঞ্চন দাস, অশ্বিনীকুমার দত্ত ও দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়ের তিনটি গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাকী ২৬টি কীর্ত্তন সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাগণের রচনা: শ্রীরূপ গোস্বামী ও বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও নৃসিংহদেব, রামানন্দ রায় ও গোবিন্দ দাসের পদগুলি রাগ ও তাল মাত্রাসমেত পবিবেশন করিয়া গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। চণ্ডীদাসের একটি পদও এই খণ্ডে নাই, আশা করি তাঁর অমূল্য পদাবলী পৃথক খণ্ডে তিনি উপহার দিবেন। পদসমন্বিত স্বরলিপির ছাপা সুন্দর

হইয়াছে এবং ছাত্রছাত্রীগণকে প্রভূত সাহায্য করিবে। আমাদের প্রত্যেক সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে কীর্ত্তন-গীতি প্রবেশিকার প্রবেশ বাঞ্ছনীয়।

শাকান্ন—শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল। শ্রীআশু চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ৯১, সর্দ্দার শঙ্কর রোড হইতে প্রকাশিত। দাম ১৸০।

হাতের কাজ—শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল।

'মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়' নিয়ে বাংলা সাহিত্যের আসরে নামেন ডাঃ হিরণ্ময় ঘোষাল; তখন মনে হয়েছিল Tolstoy-এর War and Peace ধরণের গদ্য মহাকাব্য রচনাই লেখকের অভিপ্রেত। হঠাৎ তাঁর 'শাকান্ন' পড়ে বোঝা গেল যে গদ্য খণ্ডকাব্য রচনাতেও তাঁর প্রচুর আনন্দ ও নিপুণতা। Warsaw বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্‌টরেট তিনি পান Tchekov এর মূল রুষ ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী নিয়ে গবেষণার ফলে; তাই অমর নাট্যশিল্পী চেকভেরই মতন তিনি মানুষের ক্ষণিক আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রেরণা-কামনার দাম দিতে শিখেছেন। এই 'মনস্কামের' তাগিদে দেখি বিলেত-প্রবাসী ধনী ছাত্ররা গড়ে Ivory Tower আর গরীব ছাত্ররা গুমরে মরে ভয়ত্রাসে কামনার 'অস্বাস্থ্যকর চোরকুঠরি'তে। 'ফগ্' (fog) গল্পটি তিন পাতায় শেষ অথচ তারই মধ্যে লেখক 'কামনা' নাট্যের প্রস্তাবনা থেকে দেন্যু-ম (denoument) পর্য্যন্ত সবটা দেখিয়েছেন ফরাসী চিত্রীর সংক্ষিপ্ত সবল তুলির টানে। 'ত্রিভুজ' গল্পটির, কাল্পনিক তিলোত্তমা আবির্ভূত হলেন 'হৃষ্টপুষ্ট জার্ম্মান ইহুদিনী' রূপে, তার থুৎনীর নীচে দাড়ি ও নাকের নীচে গোঁফ নিয়ে; সঙ্গে সঙ্গে মাটী হয়ে গেল দেশী খোকাদের বিলাতী প্রেমতর্পণ। 'অবদান' এবং 'লেস্ ও রেশম' গল্পে লেখকের ফরাসী কায়দায় ইংরেজ নারীর 'মাহাত্ম্য' বর্ণন উপভোগ্য। লেখকের হাসির ছটা যেন কান্নার মেঘে চাপা পড়ে 'প্রথম প্রেম' গল্পে; নোঙরা বাচাল ইহুদী দরজীর দোকানে গাঁটরির ভারে নুয়ে পড়া মেয়েটীর শীর্ণ মুখ যেন etching-এর রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারই পাশে ভেসে ওঠে আইরিশ মেয়ে শীলার (Sheila) মুখ; ২২ বছরের ছাত্র কৃষ্ণদয়াল এই প্রবীণা তরুণীর প্রেমে হাবুডুবু খেতে ব'সে হঠাৎ পেলেন বাড়ীর চিঠি; ছোট বোনের বিয়ের খরচের তাগিদ ও পিতার ঋণের বোঝা একসঙ্গে বেড়েই চলেছে—তার মধ্যে ভাবী I. C. S.-cum-Barrister কৃষ্ণদয়ালের ব্যর্থ অভিসার নৈপুণ্যের সঙ্গে দেখান হয়েছে তাঁর 'কান্না গাছ' গল্পে। শাকান্ন গল্প পর্য্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প মনে হ'ল তাঁর 'পুতুল নাচ'; আর্টিষ্ট অমরেশ রায় ও তাঁর maid Anna নড়ছে চল্‌ছে কথা বল্‌ছে শুধু দুজন মানুষ রূপে নয় তাদের যুগের নরনারীর যেন প্রতীক হয়ে—যেমন দেখা যায় চেকভের একাঙ্ক নাট্য মণিমঞ্জুষায়। শেষে Anna রয়ে গেল সেই আল্‌মাসেরই মেয়ে আর অমরেশ Punch and Judyর পুতুল নাচ থেকে বেরিয়ে এল ভারতীয় ছাত্রের এক পোড়-খাওয়া রূপ নিয়ে; প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মেলামেশার মধ্যে প্রতীক রূপে ফুটে উঠ্‌ল কফি-ক্রীমের 'বর্ণসঙ্কর' সমস্যা। ছবি আঁকায় দেখি ঘোষাল শিল্পীর হাত পাকা কিন্তু 'পুতুল নাচ' গল্পে প্রথম যেন তিনি আভাস দিয়েছেন যে সাহিত্যে স্থপতি হবার লোভও তাঁর আছে, তাই এ যুগের "মনস্কামেশ্বরে"র মন্দির ধাপে ধাপে কি করে গড়া যায় তার পরিকল্পনাও তিনি দিতে চেষ্টা করছেন। ভুখা দেবদেবীদের শাকান্নের কুচো নৈবেদ্য না দিয়ে তাদের বুভুক্ষা ও তৃষ্ণার শাশ্বত তাৎপর্য্য ফলাও করে তিনি দেখিয়ে যান এই আমরা চাই।



'হাতের কাজ' গল্পসমষ্টি হিরণ্ময় লেখেন পোলীয় (Polish) দৈনন্দিন জীবন অবলম্বন ক'রে। ও দেশে দীর্ঘকাল থাকার ফলে পোলাণ্ডের নরনারী ও গাছপালার সঙ্গে যে আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল তারই স্বাভাবিক প্রকাশ হয়েছে এই মৌলিক গল্পগুচ্ছে। শ্লাভ জাতি এশিয়া থেকে শেষ প্রবেশ করে ইউরোপে, তাই এশিয়ার সঙ্গে নাড়ীর যোগ যেন শ্লাভদের মধ্যেই এখনও পাই। তাদের গল্পসল্প কাহিনী-কুসংস্কার যেন প্রাচ্য ঘেঁষা; 'মাদনুনা' গল্পের নগ্নশিশু-কোলে বেদেনীর মধ্যে এ সত্য যেন রূপ নিয়েছে। ভারতবর্ষের অমুকানন্দ স্বামী ও তাঁর ভাবী শিষ্য কাউণ্ট হয়েস্কোর কাল্পনিক দানের উপর নির্ভর করে আর্য্যদেবতা মিত্রের মন্দিরপ্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াস 'বিগস্' গল্পে চমৎকার ফুটেছে। পোলাণ্ড প্রবাসী যুবকের Curry Powder অর্ডার দিয়ে প্রায় Gunpowder plot আবিষ্কার করার ভিতর হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটেছে। 'হাতের কাজে' শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন পাই তুরলাক্ (Turlak) গল্পে; সে যেন আধা-মানুষ আধা বন-দানব, গাছপালা কেটে নির্ম্মূল ক'রে যে-সব ধনী টাকা করে, তুরলাক তাদের চিরশত্রু। তাদের সঙ্গে নির্ম্মম সংগ্রামে সে মরল বটে কিন্তু সে ম'রে যেন বুঝিয়ে দিয়ে গেল গাছেদেরও প্রাণ আছে তাদের কুড়ুল দিয়ে কেটে শুধু যারা পয়সা করে তারা জঙ্গলের অনেক পশুর চেয়েও বেশী হিংস্র—এ ধরণের ভাব এক জৈন ভারতেই সম্ভব। আর কোন্ সুদূর পোল দেশে রয়েছে যেন জৈন ধর্ম্মের মানবীয় রূপক অবদান। পোলাণ্ডকে বাংলা সাহিত্যের ভিতর এনে হিরণ্ময় বাঙালীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন

শ্রীকালিদাস নাগ

আকাশ—শ্রীমৃণালকান্তি দাশ প্রণীত। বাণীচক্র ভবন, শ্রীহট্ট। মূল্য এক টাকা।

কোমল ব্যঞ্জনামধুর গীতিকবিতার সমষ্টি; আকাশেরই মত অধরা, বর্ণবৈচিত্র্যে বিমোহন।

"নিবিড় ঘুমের ঢেউয়ে ঢেকে যায় তনুদেহ তার
ভেসে যায় ঢেউগুলি ভীরু কামনার।"

কবির প্রেমচ্ছবিতে রূঢ়তার লেশ নাই। প্রকৃতির ছবিও কবি নিপুণ হাতে আঁকিয়াছেন—

"চিলের পাখা আকাশপারে আঁকা ছবির মতো,
রৌদ্র ছায়া ঝরে :
ঝিমায় দিন ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে
একটি দু'টি ছায়ার পাখি নড়ে পাতার ফাঁকে।"

কোমল স্বপ্নাবেশ ঘনাইয়া আনে মনে।

"চেয়ে থাকি ক্লান্ত উদাস মন,
চোখের 'পরে ভাসে দূরের ছবি—
মিলায় কোথা স্বপ্নে পাওয়া সোনার পাখিগুলি
ছিন্ন আশার আকাশপথে দু'টি পালক ফেলি'।"

কথা শেষ হইলেও ধ্বনি শেষ হয় না। তত্ত্ববাদবিভ্রান্ত অতি আধুনিক যুগে এরূপ সরস কবিতা দুর্লভ।

কনকাঞ্জলি—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম্. এ., বি. টি., ডিপ্. এড. (এডিন্ ও ডাব্)। বীণা লাইব্রেরী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ।৶০।

ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা ছয়টি গল্প। আধুনিক জীবনের কথা লইয়া দুইটি, আর চারিটি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী। রচনা চলনসই।

ভূমিকা—শ্রীকালীগোপাল চক্রবর্ত্তী। ১৩ নং নাথের বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই আনা।

কয়েকটি সমিল ও অমিল পদ্য। [ভাব ও ভাষা শিথিল।

ঝরণা কলম—শ্রীগোপীনাথ নন্দী। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

পাঁচটি ছোট গল্প। প্রথম গল্পের নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। প্রেমস্বপ্নভারাতুর বঙ্গ-সাহিত্যে প্রেমকে বাদ দিয়া গল্প রচিবার সাহস ও নৈপুণ্য লক্ষ্য করিবার বস্তু। 'ঝরণা কলম' গল্পে ছাত্রজীবনের খানিকটা আভাস এবং ভাইস-চান্সেলারের বজ্রকঠোর কুসুমকোমল চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে। প্রতি গল্পেরই কেন্দ্র বালক বা যুবকের জীবন। 'হেড মাষ্টার' গল্পের পরিকল্পনা সুন্দর, বাহিরের রুক্ষতা এবং অন্তরের স্নেহ—উভয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত শিক্ষকের জীবন ইহার বর্ণনীয় বিষয়,

কিন্তু লেখক চরিত্রাঙ্কনে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। কথাবস্তুর নূতনত্বের জন্য লেখক প্রশংসাভাজন, তাঁহার রচনাভঙ্গীও সুন্দর।

তা'রা যা ভাবে—আমিমুল হক। ১৬ নং কিম্বার ষ্ট্রীট, পার্কসার্কাস, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

আধুনিক বাঙালী জীবন লইয়া লেখা উপন্যাস। মোটা মাহিনার সরকারী চাকুরী এবং স্ত্রী সেতারাকে লইয়া নির্ঝঞ্ঝাটে আলমের দিন কাটিতেছিল। অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটিল রাণীর সহিত পরিচয়। সে এক অদ্ভুত রহস্যময়ী নারী। তাহার বুদ্ধিদীপ্ত হাসি-পরিহাস নেশা ধরাইয়া দেয়, আবার দৃপ্ত তেজস্বিতা সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। আলম মুগ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু রাণী তাহার দাম্পত্যজীবনে কোনও বিঘ্ন সৃষ্টি করিল না, নিজেকে গোপন রাখিয়া সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া গেল। গল্পের ঘটনা সামান্য, বিন্যাসও নিখুঁত নহে, কিন্তু বলিবার ভঙ্গী সুন্দর।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ—এন. এল. রাশব্রুক উইলিয়াম্‌স্‌। শ্রীনির্ম্মলকান্তি মজুমদার কর্ত্তৃক অনূদিত। অক্সফোর্ড ইনিভার্সিটি প্রেস। পৃঃ ৩০। মূল্য তিন আনা।

'ভারতবর্ষ' অক্সফোর্ড বিশ্ববৃত্তান্ত বিষয়ক পুস্তিকামালার অন্তর্ভুক্ত। স্বল্পপরিসরে ভারতের বর্ত্তমান সমস্যাসমূহ বর্ণনা ও তাহার সমাধানে ব্রিটিশের কৃতিত্বের পক্ষে ওকালতী পুস্তিকাখানিতে পাঠক পাইবেন। ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই ইহা বিশেষ করিয়া লেখা। ভারতবর্ষের অনৈক্য ও ভেদাভেদ, সাংস্কৃতিক বৈষম্য, আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ব্রিটিশ সেনানীর আবশ্যকতা প্রভৃতি মামুলি কথা নিরপেক্ষতার আবরণে যেন আরও বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এরূপ পুস্তিকা দ্বারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দেশ-বিদেশে প্রচারিত ভুল ধারণা অধিকতর দৃঢ়ীভূতই হইয়া থাকে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মা আনন্দময়ীর কথা—লেখক অভয়। আনন্দময়ী বিশ্ব-মন্দির, কিশনপুর, দেরাদুন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—।০

আলোচ্য পুস্তকে একটি সাধনার ইতিহাস বিবৃত করা হইয়াছে। সাধনার দ্বারা যাঁহারা জীবনে অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পুস্তকখানি বিশেষ সমাদৃত হইবে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

সভ্যতা ও ফ্যাশিজ্‌ম্‌—শ্রীবুদ্ধদেব বসু। ফ্যাশিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ কর্ত্তৃক ২৪৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃ. ১৩। দাম দু আনা।

ফ্যাশিজ্‌ম্‌ ধনতন্ত্রবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদেরই রূপান্তর, তবে ইহা আরও মারাত্মক, ইহার প্রভাব আরও বিষাক্ত। ইহা শুধু রাজনীতিক মতবাদ নয় ইহা একটি বিশিষ্ট মনোভাব। ইহার উদ্দেশ্য নয় নিজে বাঁচিয়া অন্যকে বাঁচিতে দেওয়া। সাম্য ও মৈত্রী ইহার আদর্শ নয়, মানুষে মানুষে যে স্নেহ ভালবাসার মধুর সম্বন্ধ তাহা ইহা স্বীকার করে না। জনকয়েক মুষ্টিমেয় ব্যক্তি দ্বারা নিজ দেশের ও নিজ মতাবলম্বীদের প্রয়োজনে সমস্ত দেশকে এক হৃদয়হীন সামরিক যন্ত্রে পরিবর্ত্তিত করিয়া পৃথিবীর দুর্ব্বল দেশ ও দুর্ব্বল মানুষের স্বাধিকার হরণ করিয়া সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের উপর লোভ ও দাম্ভিকতা প্রতিষ্ঠিত করাই ইহার উদ্দেশ্য। যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্চিত বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য চিত্রকলা ও মানবসভ্যতার যা-কিছু পরম সম্পদ নির্ম্মমভাবে তাহার ধ্বংস-সাধনে ফ্যাশিজ্‌মের দানবীয় উল্লাস দেখিয়া লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘের ফ্যাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রয়াস প্রশংসনীয়। বুদ্ধদেববাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ জোরালো ভাষায় বক্তব্যগুলি বেশ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

ফ্যাশিজ্‌ম্‌ ও নারী—প্রতিভা বসু। প্রকাশক ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ, ২৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১৩। দাম দু-আনা।

রেনেসাঁসের আবির্ভাব কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ-শ বছরে প্রধানতঃ ইয়োরোপে নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি বহুবিধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সুদীর্ঘ দিনের আন্দোলনের ফলে। অবশ্য প্রাকৃতিক বৈষম্য এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের দাবী উপেক্ষা করিয়া পুরুষের সহিত সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্ব সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার দুর্ব্বার নেশার মধ্য দিয়া নারীপ্রগতি যে ধারায় অগ্রসর হইতেছিল তাহা সর্ব্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য না হইতে পারে, কিন্তু নাৎসী জার্ম্মানীর নারীর আদর্শ "গৃহই তাহার একমাত্র স্থান এবং পরিশ্রান্ত সৈনিকের শ্রমবিনোদনই তাহার এক মাত্র কর্ত্তব্য"—ইহাও একটা নিছক প্রতিক্রিয়া মাত্র। আমাদের দেশে যেখানে নারীর অবস্থা অশেষ দুর্গতিপূর্ণ, যেখানে না আছে তাদের মনুষ্যোচিত অধিকার না আছে তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ, সেখানে এই প্রতিক্রিয়াপন্থী ফ্যাশিষ্ট আদর্শ সমস্ত কল্যাণের পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে লেখিকা সকলকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে বলিয়াছেন।

বহু জাতির দেশ সোভিয়েট—গোপাল হালদার। সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি, ২৪৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। পৃ. ৩০। মূল্য দু-আনা।

সোভিয়েট রুশ বহু দিন শুধু জাতি সঙ্ঘ হইতে বহির্ভূত ছিল তা নয়, স্কুল কলেজের পাঠ্য তালিকাতেও তাহার এখন পর্য্যন্ত স্থান নাই। পরীক্ষা পাসের জন্য প্রয়োজন না থাকায় সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার প্রথম বাস্তব রূপ পরিগ্রহকারী এই বিচিত্র দেশ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নাই। লেখক সহজ-সরল ভাষায় রুশ দেশের শাসনপ্রণালী, শিক্ষাবিস্তারপ্রয়াস, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ইত্যাদি জটিল বিষয়গুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া একটি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। দুই শত জাতি, দেড়শত ভাষা ও পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ লইয়া গঠিত এই বিচিত্র দেশে কেমন করিয়া প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ অংশগুলি ভাষায় ধর্ম্মে আচার-ব্যবহারে শিক্ষা-দীক্ষায় আপন আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও এক অখণ্ড শক্তিশালী মহাজাতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার বিবরণ প্রকৃতই চিত্তাকর্ষক। সাধারণের মধ্যে সোভিয়েট ভূমি সম্বন্ধে জ্ঞানবিস্তারের উদ্দেশ্যে পুস্তিকাটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীকালীপদ সিংহ

দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউল—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চৌধুরী। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। পৃ. ২৯১, মূল্য ২।•।

গ্রন্থকার এই পুস্তকে ওয়ালটেয়ার (ভিজিগাপটম্), সিংহাচলম্, রাজমাহেন্দ্রী (গোদাবরী), বেজওয়াদা, মাদ্রাজ, কাঞ্জিভরম্, পক্ষীতীর্থ (মহাবলীপুরম্), চিদম্বরম্, কুম্ভকোনম্, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী (শ্রীরঙ্গম্), মাদুরা, রামেশ্বর, ধনুষ্কোটি, ত্রিবন্দ্রম্ (ত্রিবাঙ্কুর), শুচীন্দ্রম্, কন্যা-কুমারিকা ও আশপাশের যাবতীয় দ্রষ্টব্য দেবমন্দিরগুলি পরিদর্শন করিয়া এই ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "দক্ষিণ-ভারতের দেবালয়-গুলির বর্ণনা ও কাহিনী নিয়ে একাধিক বই থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণাপথের দেবমন্দিরগুলি স্থাপত্যে, কারুকার্য্যে ও ভাস্কর্য্যে অপরূপ ও অচিন্তনীয়, তা ছাড়া হিন্দুজাতির সংস্কৃতি, প্রতিভা, ধর্ম্মপ্রাণতা ও কীর্ত্তি প্রভৃতির নিদর্শন ও আলেখ্য এসবের মাঝে থরে থরে সাজানো" থাকাতে গ্রন্থকার এই নূতন পুস্তক লিখিতে প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। লেখকের স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী পাঠককে তৃপ্তি দান করে। তিনি বৃদ্ধবয়সে টুরিষ্ট কার বা সেলুনগাড়ী, মোটরযান ও গাইড সহযোগে এই ভ্রমণের কাহিনী লিখিলেও টুরিষ্টের অনায়াসলভ্য মামুলি বাঁধি গৎ ইহাতে নাই, পরন্তু এক অনুসন্ধিৎসু, ধর্ম্মপ্রাণ ও রসপিপাসুর সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া আমরা সানন্দে ইহা পাঠককে পড়িতে অনুরোধ করি। বইখানি উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা, অনেক ছবি আছে।

ল

১। বাগানবাড়ীর বিভীষিকা ২। মরণ-সঙ্কেত ৩। রহস্য-প্রহেলিকা ৪। চক্রীর মায়াজাল—রহস্য-রোমাঞ্চ-সিরিজ। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোং। প্রত্যেকটির মূল্য—ছয় আনা।

রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের এই গ্রন্থগুলি তথাকথিত ডিটেকটিভ উপন্যাসের মত হত্যাকারীর অনুসন্ধান-জনিত নানা অবাস্তব ঘটনার সমাবেশে ভারাক্রান্ত নহে। প্রত্যেকটি বইয়ে নূতনতর রস পরিবেশনের চেষ্টা আছে, কাহিনী সরস ও কৌতূহলোদ্দীপক। পড়িতে আরম্ভ করিলে কাজের ক্ষতি হইতে পারে—এইটুকু জানিয়া রাখা ভাল।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যাবলম্বনে)—শ্রীঅনিল-বরণ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক—কালচার পাবলিশার্স, ২৫এ বকুলবাগান রো, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪৩২। মূল্য পাঁচ সিকা।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান কালের মনীষীদের মধ্যে যাঁহারা গীতার উল্লেখ-যোগ্য সারগর্ভ ব্যাখ্যা বা ভাবব্যাখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, বালগঙ্গাধর টিলক, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি। আলোচ্য গীতাটি শ্রীঅরবিন্দের গীতা সম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধ ও পুস্তকের ভাব অনুসরণে সম্পাদিত। সম্পাদক মহাশয় "মুখবন্ধে"

বলিয়াছেন—"যাহাতে বাঙালী পাঠক সহজেই মূল শ্লোকগুলি আয়ত্ত করিতে পারেন সেই জন্য অন্বয়ের সহিত সংস্কৃত কথার বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে এবং শ্লোকগুলির সারমর্ম্ম সংক্ষেপে বুঝাইয়া 'দেওয়া হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ দিব্য দৃষ্টি লইয়া গীতার যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা দিয়াছেন, এখানে তাহাই অনুসৃত হইয়াছে।"

বাস্তবিকই, যাঁহারা শ্রীঅরবিন্দের এই জাতীয় রচনার সহিত পরিচিত আছেন এবং তাঁহার 'গীতার ভূমিকা'' নামক পুস্তক পড়িয়াছেন তাঁহারা তাঁহার ভাবদৃষ্টির অপূর্ব্বত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন। আলোচ্য গীতাটিতে সেই দৃষ্টি ও সেই ব্যাখ্যা সুপরিস্ফুট। তাহার ফলে পুস্তকটি ধর্ম্মকামী ব্যক্তিগণের পক্ষে পরম সহায় স্বরূপ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ইহা যে সাধারণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গুপ্ত

ঘরের লক্ষ্মী—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী। বাণী ভবন, ৫৯ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯৮ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

উপন্যাসখানিতে প্রবীণা লেখিকা আদর্শ-বিপর্যিত ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের পটভূমিকায় বাংলার 'ঘরের লক্ষ্মী'র একটি স্নিগ্ধ-সুন্দর আদর্শ-রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নায়িকা মৃণালের মুখেই লেখিকার বক্তব্য স্পষ্ট,—"বাঙালী পরিবার বা বাঙালী মেয়ে বলতে আমাদের আধুনিক অর্থাৎ আলট্রা-মডার্ণ এই সব মেয়েদের বলছি নে, বলছি আমাদের গ্রামের দিককার মেয়েদের কথা:—শিক্ষার অহঙ্কার যাদের মধ্যে নেই, দেশ ও বিদেশের দোটানায় পড়ে যারা খিচুড়ি হয়ে যায় নি।" মৃণাল নিজে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা, ব্যারিষ্টারদুহিতা হইয়াও খাঁটি 'দেশী' আদর্শকেই জীবনে বরণ করিয়া লইল, এবং পল্লীর বুকে গিয়া গরীব স্বামীর ঘরেই গৃহলক্ষ্মী হইয়া বসিল। একদেশ-দর্শী আদর্শ-কল্পনার কথা ভুলিয়া গেলে, বইখানি সরস ও সুখপাঠ্য।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

সঙ্গীত শাস্ত্র কণিকা—শ্রীশেফালিকা শেঠ। ৮৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৷•।

এই পুস্তকে সঙ্গীত-সাধনা-সংক্রান্ত অনেক তথ্যের এবং নানা প্রকার দেশী ও মার্গ সঙ্গীত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সমাবেশ করা হইয়াছে।

স্বরলিপি পুস্তকে সাধারণতঃ কতকগুলি গান ও তাহাদের স্বরলিপি ব্যতীত বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর গঠন সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ লিপিবদ্ধ করা হয় না, এই পুস্তকে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। কয়েকটি রাগের গঠন ও রূপবিন্যাসের সন্ধান থাকায় পুস্তকখানি সঙ্গীতপরীক্ষার্থীদের উপযোগী হইয়াছে।

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কট—রেবতীমোহন বর্ম্মণ, এম্-এ। ২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে 'পুঁজির প্রতিযোগিতা' 'ডলার সাম্রাজ্যবাদ', 'ফ্যাসিজমের ফ্যাসাদ', 'হিটলার একনায়কত্বের উদ্ভব', 'জাপ সাম্রাজ্যবাদ' ইত্যাদি শীর্ষক কতকগুলি প্রবন্ধ আছে। পৃথিবীর শক্তিশালী দেশসমূহে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ, প্রকাশ ও তাহার প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। ইংরেজী শব্দগুলির উচ্চারণ সম্পর্কে অধিকতর সতর্ক হইলে ভাল হইত।

কৃষক আন্দোলন ও মধ্যবিত্ত—শ্রীসুশীলকুমার বসু। মূল্য দশ আনা।

আমাদের দেশে কৃষক আন্দোলনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের, বিশেষভাবে মধ্যবিত্তের মনে নানা জাতীয় প্রশ্ন, সন্দেহ ও সংশয়ের উদ্ভব হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকে বৈজ্ঞানিক প্রথায় যুক্তি ও বিচারের দ্বারা ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর ও সংশয় নিরসনের চেষ্টা করা হইয়াছে। পাঠক-পাঠিকা পুস্তকখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সাহিত্য-সন্দর্শন—শ্রীশচন্দ্র দাশ। চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃ. ১৩২ ; মূল্য দুই টাকা।

ইংরেজি নন্দনতত্ত্ব ও অলংকার অনুসারে সাহিত্যের রূপ ও রীতি বিচারের মূল কথাগুলি সাহিত্য-রসিক এবং বিশেষ করিয়া ছাত্রছাত্রীদের অবগতির জন্য গ্রন্থটি লিখিত। আটটি অধ্যায়ে লেখক আর্ট, সাহিত্য, কবিতা, নাটক, গদ্য-সাহিত্য প্রভৃতির রীতি-প্রকৃতি আলোচনা করিয়াছেন এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে সংস্কৃত অলংকারের সহিত সাদৃশ্য এবং বাঙলা সাহিত্য হইতে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থ বাঙলা ভাষায় নূতন ; সাহিত্যের এই অতি প্রয়োজনীয় দিকে দৃষ্টি আশার কথা। কিন্তু সাধারণ পাঠক ও ছাত্রছাত্রীকে ছয় পৃষ্ঠার মধ্যে আর্ট বা সাহিত্য সম্বন্ধে একটা ধারণা দেওয়া অসম্ভব ; অধ্যায়গুলি আরো বিশদ হইলে ভাল হইত। গ্রন্থ শেষে গ্রন্থপঞ্জীটি মূল্যবান।

বিদেশী গল্প সঞ্চয়ন—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ; মিত্র এণ্ড ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৮২, মূল্য পাঁচ সিকা।

বিখ্যাত ১০টি বিদেশী বইয়ের গল্পাংশ বালকবালিকার উপযোগী করিয়া বর্ণিত। ইহার রচনাভঙ্গী সরল ও সহজ হইয়াছে। মনোরম প্রচ্ছদপট, ছাপা ও বাঁধাই তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিবে।

শ্রীতারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশ-বিদেশের কথা

রবীন্দ্র-স্মৃতিপূজা, কোকনদ, মান্দ্রাজ

গত ২২এ শ্রাবণ ৭ই আগষ্ট কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রথম বার্ষিক স্মৃতিপূজা উপলক্ষে মান্দ্রাজ প্রদেশের কোকনদ শহরে পিঠাপুরম্ মহারাজ কলেজ ও কোকনদ ব্রাহ্ম সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। প্রাতে ৮টায় স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে কবির বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে ভগবদুপাসনা হয়। প্রবীণ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ভি. পি. রাজনাইডু পৌরোহিত্য করেন। অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটায় ব্রহ্মমন্দিরের প্রশস্ত 'হলে' কবির স্মৃতিসভা হয়। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও কবির বিশিষ্ট অন্ধ্রদেশীয় ভক্ত ও প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত চলাময়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া কবির সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যের উদ্ঘাটন করেন। কবির মানবপ্রীতি, বিশ্বভারতীর আদর্শ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ অনেক উদাহরণ দেন। পিঠাপুরম্ মহারাজ কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দম্, শ্রীযুক্ত এন. বেঙ্কটেশ্বর রাও ও শ্রীমতী স্নেহশোভনা রক্ষিত কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। অধ্যাপক সচ্চিদানন্দম্ দুঃখবাদের ভিতর দিয়া ও দুঃখকে জয় করিয়া কবির আনন্দের উপলব্ধি বিষয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক বেঙ্কটেশ্বর রাও পৃথিবীর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট স্থান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীমতী স্নেহশোভনা রক্ষিত "মৃত্যুঞ্জয়ী রবীন্দ্রনাথ" ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। "জনগণমন অধিনায়ক" গানটি বিরাট সভামণ্ডলী কর্ত্তৃক সমস্বরে গীত হয়।

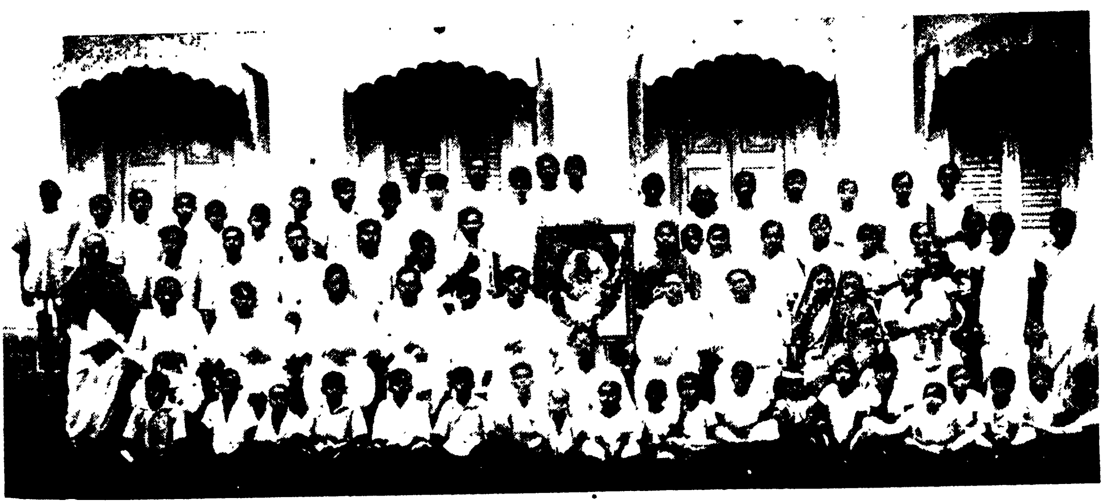
পরদিন কোকনদস্থিত পিঠাপুরম্ মহারাজের অনাথালয়ে ইহার প্রাক্তন ছাত্র ভাস্কর শ্রীরামচন্দ্রমূর্ত্তি কৃত কবিগুরুর আবক্ষ প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচনে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক বিনয়ভূষণ রক্ষিত। সভাপতি কবিকে ছোটদের বন্ধু হিসাবে উল্লেখ করিয়া শিশুদের মনের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য তিনি কি করিয়াছেন তাহার আলোচনা করেন। অধ্যাপক এন বেঙ্কট রাও ও বেঙ্কটরমণ কবির বহুমুখী প্রতিভা ও কবির ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

পরলোকে জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী

হুগলী জিলার অন্তর্গত সিমলাগড়ের জমীদার জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী গত ২রা কার্ত্তিক পরলোকগমন করেন। তিনি শৈশবে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, কবি হেমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকগণের সংস্পর্শে আসেন এবং বহু প্রবন্ধাদি লিখিয়া সাহিত্য-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। পরে ভারতবর্ষ, বসুমতী, ব্যাকবোন, উৎসব প্রভৃতি বহু পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। তাঁহার লিখিত পুস্তকাদির মধ্যে পূজনীয় গুরুদাস, মরণ-রহস্য, শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা, শ্রীরাধা-চিন্তা, ধর্ম্মজীবন, পক্ষকণা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি স্যর জন উডরফ এবং বিখ্যাত সিভিলিয়ন জে, জি, ড্রামণ্ডের সাহায্যে "ফাইফ এফিউশন" নামক একখানি ইংরাজী পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরীতে থাকাকালীন মহীশূর এবং অযোধ্যার রাজবংশের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া একখানি পুস্তক লেখেন। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ১৯২০ সালে 'অল বেঙ্গল মিনিষ্ট্রিয়াল কনফারেন্স'র অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পদে বৃত হন।

প্রবাসী বঙ্গনারীর সাহসিকতা

গত ৬ই সেপ্টেম্বর বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত নাসিকে একটি চারি বৎসরের বালক কুয়ার মধ্যে পড়িয়া যায়। শ্রীমতী কমলা দাস ইহা



রবীন্দ্র-স্মৃতিপূজায় সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, কোকনদ, মান্দ্রাজ



শ্রীকমলা দাস

দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া বালকটিকে উদ্ধার করেন। তিনি এরূপ না করিলে বালকটিকে বাঁচানো সম্ভব হইত না। তাঁহার সাহসিকতা প্রশংসনীয়।

নিউ দিল্লীতে সাহিত্য-সম্মেলনের শততম উৎসব

নিউ দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাবের উদ্যোগে ১৯৩৪-৩৫ সাল হইতে নিয়মিত-ভাবে প্রতি পূর্ণিমায় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। এই সকল সম্মেলনে দিল্লীর অধিকাংশ সাহিত্যিক ও শিল্পী এবং বাহিরের বহু কৃতবিদ্য মনীষী যোগদান করিয়াছেন।

গত ২৫শে অক্টোবর সহস্রাধিক বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা-গণের উপস্থিতিতে এই সম্মেলনের শততম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাবের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার প্রীতিসম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলে শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাস, আই. সি. এস. শারদোৎসবের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অতঃপর ক্লাবের সাহিত্য-সম্পাদকের রচিত একখানি 'শারদোৎসব' নাটিকা রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও নৃত্য-সহযোগে স্থানীয় কিশোর-কিশোরীগণ কর্তৃক অভিনীত হয়। শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ ঘোষের রবীন্দ্র-সঙ্গীত, কুমারী শোভা ভট্টাচার্য্যের নৃত্য ও কুমারী অপর্ণা রায়ের কণ্ঠসঙ্গীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। সর্বশেষে ক্লাবের সভ্যগণ পরশুরামের 'কচি-সংসদ' অভিনয় করিয়া দর্শকগণকে সবিশেষ প্রীত করেন।

মেদিনীপুরে ঝড়

গত ১৬ই অক্টোবর শুক্রবার মেদিনীপুর শহরের উপর দিয়া এক প্রবল ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে যাহাতে খণ্ডপ্রলয়ের আভাস পাইয়াছি। সকাল হইতেই বর্ষা ও দমকা বাতাস অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বর্ষণের জন্য ঘরের বাহির হইবার উপায় ছিল না। সন্ধ্যার সময় প্রবল ঝঞ্ঝাবাত আরম্ভ হইল। রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত ঝড়ের হুহুঙ্কার ও বাহিরে গুরুভার দ্রব্য-পতনের শব্দ শুনিয়াছিলাম। এক রাত্রির ঝড়ে শহরের প্রায় একটিও বড় গাছ বা মাটির ঘর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া নাই। সবই ভূতলশায়ী। বহু গরীব লোক ও গবাদি পশু তাহার চাপে জীবন্ত সমাধি লাভ করিয়াছে। মোট কত প্রাণহানি হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন।

দ্বারিবাঁধের খাল হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সমস্ত বর্ষার জলই চিড়িমার-সহির ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়। ফলে, সে অঞ্চলের সমস্ত মাটির ঘরই প্রবল জলস্রোত ও ঝড়ের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ভাঙিয়া পড়ে। শহরের যে কোন লোক যে কোন রাস্তায় বাহির হইলে পথিপার্শ্বের একই মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য তাহার চোখে পড়িবে। সেখানে কাহারও গৃহের দেওয়াল ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কাহারও বা চালা উড়িয়া গিয়াছে আর কাহারও বা সাধের কোঠা বাড়ী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া শুধু মাটির পাহাড় রচনা করিয়াছে—গরীবের দুঃখের যেন সীমা নাই।

বহুবার শহরের এই ধ্বংসস্তূপ দেখিয়া অভিভূত হইয়া ফিরিলাম। প্রতি ২০০ হাত অন্তর বড় বড় বৃক্ষ পড়িয়া রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল ও কোথাও বা টেলিগ্রাম ও ইলেকট্রিকের খুঁটি-সমেত তারে জড়ানো অর্দ্ধ-পতিত বৃক্ষ মাথার উপর ঝুলিতেছিল ও কোথাও বা তা সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। আশেপাশে চাহিলে হৃদয় আতঙ্কিত হয়। কেহই বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

গৃহহারাদের চোখের চাহনি নীরবে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। যেন অস্ফুটবাক্ দুর্ব্বল শিশু কাঁদিতেও পারিতেছে না, শুধু সাশ্রুনয়নে অপরের মুখের পানে চাহিয়া নিজের অসহায়তাকে ব্যাকুলভাবে ব্যক্ত করিতেছে। প্রকৃতি ইহাদের গৃহহারা করিয়া দিয়াছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
[সব্-জজ, মেদিনীপুর]

মেদিনীপুরের ঝড় ও বঙ্গের লাট সাহেবের আবেদন

মেদিনীপুরে ও অন্যান্য স্থানে গত আশ্বিন মাসে যে ভীষণ ঝড় হইয়াছিল তাহাতে বহু সহস্র নর-নারী, পশু-পক্ষী মারা গিয়াছে এবং ততোধিক ঘর-বাড়ী বিনষ্ট হইয়াছে। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্গতির অন্ত নাই। বঙ্গের গবর্ণর সার্ জন হার্বার্ট দুর্গতদের সাহার্য্যার্থে আবেদন জানাইয়াছেন। আবেদনের সারমর্ম্ম এই,—

সম্প্রতিকার ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তে বঙ্গে যে-রকম প্রাণহানি ও অন্যবিধ ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। দুর্গতদের দুঃখ লাঘবের জন্য গবর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এ কার্য্যে বেসরকারী দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিরও ঢের করণীয় আছে। কাজেই, এই বিপদের সময় বাংলা দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা কালবিলম্ব না করিয়া যথোপযুক্ত সাহায্যদানে অগ্রসর হইবেন নিশ্চয়। অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান ও সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ ইতিমধ্যেই এই উদ্দেশ্যে জনসাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন জানাইয়াছেন। বর্ত্তমানে উদ্দেশ্য-সাম্য-হেতু সকলকেই তাঁহার সঙ্গে একযোগে কার্য্য করিবার জন্য লাটসাহেব অনুরোধ করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি প্রতিনিধি-মূলক কমিটি গঠনেরও প্রস্তাব করিতেছেন। কাপড়-চোপড়, অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং টাকাকড়ি যিনি যাহা দিবেন সাদরে গৃহীত হইবে। টাকাকড়ি পাঠাইতে হইবে এই ঠিকানায়—সেক্রেটারী, সাইক্লোন রিলিফ কমিটি, গবর্ণমেণ্ট হাউস, কলিকাতা। দ্রব্যাদি পাঠাইতে হইবে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, সাইক্লোন রিলিফ ষ্টোর্স, ২১, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



গণপতি-উৎসব
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪২শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৪৯

৩য় সংখ্যা

[বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত]

অধ্যাপক কালিদাস নাগকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী— প্রথম গুচ্ছ

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সাহিত্য-পরিষদের একটা বিভাগ তোমরা দখল করে বসেছ এই খবরটা যখন তোমার কাছে পেলুম তখন মনে বড় সন্দেহ হল। তার পরে যখন শুনলুম এই বিভাগে আমাকে তোমরা স্থান দিয়েচ তখন সন্দেহ আরো বাড়ল। আজ তোমার চিঠি পেয়ে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। আসল কথা তোমাদের জিতটাও ভুল, আমার স্থানটাও তথৈবচ। মায়া থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই মুক্তি। এখন তুমি মুক্ত পুরুষ। এখন যদি কোনো কাজে হাত দাও সেটা ছোট হলেও সত্য হবে। যে ছাত্ররা idea-পিপাসু তাদের নিয়ে একটা ছাত্র-বৈঠক গড়তে কতকক্ষণ লাগে?

আমাকে চাও? আমাকে পাবে। কিন্তু আমি তো এখন বেকার নই। বাংলা দেশের বয়স্কদের কাছ থেকে তাড়া খেয়েচি কিন্তু ছোটদের এখনো বিচারবুদ্ধি হয় নি তাই আমার নিরাপদ আশ্রয় তারাই। বিধাতার আশীর্ব্বাদে বাংলা দেশেও মানুষ কিছু দিন শিশু থাকে, তাদেরই ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমি কোনো রকমে রক্ষা পাব। এদের নিয়ে আমি আছি। আমেরিকা* থেকে ফিরে আসার পর জাল আরো নিবিড় হয়েচে। আমার ক্লাস আছে এই জন্যে ছুটি পাইনে,* আমার মত ঢিলে লোকের পক্ষে সেটা ভাল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটা প্রতিদিন স্পষ্ট করে বুঝতে পারচি যে, নিজেকে চারদিকে ছড়িয়ে ফেলে কোনো লাভ নেই। যেখানে আছি সেইখানটুকুই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এরই কূলকিনারা পাই নে। ক্ষেত্রের পরিধি বাড়ালেই যে ক্ষেত্র সত্যই বড় হয় তা নয়। তাই আমার এই শিশু-দেবতার অর্ঘ্য জোগাতেই আমি লেগে আছি—অন্য কাজের তাড়ায় পূজায় ক্রটি ঘটাতে আর সাহস হয় না। ক্রটি অমনিতেই যথেষ্ট আছে।

অতএব আগামী শনিবারে যদি তুমি আসতে পার ত তোমার সঙ্গে আলাপ করতে পারি, বাক্য সংযোগে এবং সুর-সংযোগে। দুই-একটি ছাত্রও সঙ্গে আনতে পার।

কিছুতে বিচলিত হোয়ো না, মনটাকে খুসি রাখ। ইতি ৩রা এপ্রেল, ১৯১৭

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* ১৯১৬ মে—১৯১৭ মার্চ পর্য্যন্ত কবি জাপান হয়ে আমেরিকায় কাটান; সঙ্গে ছিলেন পিয়ারসন এবং মুকুল দে। দেশে ফিরবার এক মাসের মধ্যে এ চিঠিখানি লেখেন।

* Rousseau এবং Pestalozziর মতন রবীন্দ্রনাথ যে শিশুশিক্ষায় যুগান্তর এনেছেন এ সন্দেহ হয়ত অনেকের মনে এখনও জাগে নি। তিনি শুধু আদর্শ শিক্ষক ছিলেন না, যে কোন স্কুল মাষ্টারের চেয়ে বেশী পরিশ্রমও (শারীরিক ও মানসিক) তিনি করতেন, সে যুগে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।

ওঁ

(ডাকের ছাপ এপ্রেল ১৯১৭)

কল্যাণীয়েষু

কালিদাস, আজ বিকালের গাড়িতে কলকাতায় যাচ্ছি। দুই-এক দিন থাক্‌ব। শরীর ক্লান্ত আছে। ইতি শুক্রবার

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

(ডাকের ছাপ শান্তিনিকেতন ১০ এপ্রেল ১৯১৭)

কল্যাণীয়েষু

পালিয়ে বেড়াচ্চ কেন? তুমিও অটল থাক্‌বে আমিও নড়ব না এমন অবস্থায় যে ব্যবধান ঘুচ্‌তে পারে না জিওমেট্রি না জান্‌লেও একথা নিশ্চয় বলা যায়। বর্ষশেষের দিনে যদি এখানে উপস্থিত হতে পার তাহলে সকলে মিলে বর্ষারম্ভের উৎসব করা যায়। আজ ডাক্তার বেণ্টলী* এইমাত্র চলে গেলেন—বেশ জমেছিল—ডাক্তার মৈত্র† না আসাতে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া জমিয়ে রেখেচি—তাঁকে এই খবর দিয়ো। যদি ভাল চান ত নববর্ষের উৎসবে আস্‌তে যেন চেষ্টা করেন—এখানে তাঁর কাজের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ আছে। ইতি

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

(ডাকের ছাপ ২৬ জুন ১৯১৭)

কাল বুধবারে সন্ধ্যা সাড়ে-ছয়টার সময় বিচিত্রা সভায় বিশ্ববিদ্যা গ্রন্থ‡ প্রকাশের নিয়মালোচনার জন্যে ব্রজেন্দ্রবাবু যদু সরকার প্রভৃতি অনেকে মিলিত হবেন। অতএব তুমি তোমার সিংহদের§ সঙ্গ ত্যাগ করে কিছুক্ষণ নরসিংহ নরশার্দ্দূলদের সালোক্য ও সামীপ্য উপভোগ করতে এস। আমার বর্ত্তমান ঠিকানা ৬নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের ষ্ট্রীট। মঙ্গলবার।

(স্বাক্ষর নাই)

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

শান্তিনিকেতনে আমার সেই কোণ আশ্রয় করেছি। এখানে চারিদিকেই ছুটির হাওয়া, কেবল আমারই ছুটি নেই। দেশবিদেশের এত চিঠি জমেছে যে সমস্ত দিন ধরে উত্তর লিখ্‌চি; উত্তরে বাতাসের ঝড়ে আমার ছুটি থেকে কেবলি পত্র খস্‌চে। এর উপরে বিদ্যালয়ের কাজও আছে।

অরুণদের* সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। আশা করি সে সুস্থ আছে, শান্তিতে আছে এবং যথাসম্ভব বিনাবাক্যে কালাতিপাত করচে। শুনছিলুম তার প্রিন্সিপালকে নিয়ে কাগজে গোলমাল চলছিল, ভরসা করি অরুণ তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে নি। ইতি ১১ কার্ত্তিক ১৩২৫

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Shillong

কল্যাণীয়েষু

এখন ছুটি। তাই শিলঙ পাহাড়ে বিশ্রাম অনুসন্ধানে এসেছি। কিন্তু একাদশীর দিনে কেউ কেউ যেমন ভাত খায় না বলেই গুরুপাক সামগ্রী বিস্তর খেয়ে বসে, আমার ছুটিও সেই রকমের। নিয়মিত কাজ বন্ধ থাকে বলেই অনিয়মিত কাজের চাপ অপরিমিত হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে একটু আধটু সৌখীন ধরণের যে বাংলা লেখা চল্‌ছিল তাকে আমি ডরাই নে কিন্তু ইংরেজি ভাষায় আনমনে লেখা চলে না। মোটর গাড়ির রাস্তা বেয়ে জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণে যাবার সময় শ্বশুরবাড়ির সুখস্মৃতিতে যেমন মন উতলা করলে চলে না, সর্ব্বদাই হাওয়াগাড়ির শিঙে ফোঁকার প্রতিই কান রাখতে হয় তেমনি ইংরেজি লেখবার সময় কলমটাকে বেশ আরামে পায়চারি করাবার জো নেই—সর্ব্বদাই মাষ্টার মশায়ের হুঙ্কারের প্রতি কান পেতে থাক্‌তে হয়। এই ভূমিকার থেকে বুঝবে ছুটির ক'টা দিন ইংরেজি লিখে কাটাচ্চি—সুতরাং এ'কে ছুটি

* Director of Public Health, Bengal

† ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র: ১৯১২ সালে ইউরোপ-আমেরিকায় কবির সহযাত্রী।

‡ পরিকল্পনাটি কবির নিজস্ব। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ছিলেন কবির প্রধান সহায়ক। কিন্তু গত বিশ্বসংগ্রামের ঝড়ে বিশ্ববিদ্যা গ্রন্থ-প্রকাশ কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নি। শুধু বিষয় ও লেখক তালিকাটি ১৩২৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে ছাপা হয়েছিল।

§ আমার পরলোকগত মাতুল বিজয়কৃষ্ণ বসু আলিপুর পশুশালার অধ্যক্ষ ছিলেন ও তাঁর কাছেই আমি থাকতাম সিংহসদনের কাছে—তাই কবির এই স্নিগ্ধ পরিহাস।

* বন্ধুবর অধ্যাপক অরুণচন্দ্র সেন ও তাঁর পরলোকগতা পত্নী চন্দ্রা দেবী।

বলা চল্‌বে না। অষ্ট্রেলিয়ায় যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে সবগুলির কাছ থেকেই নিমন্ত্রণ পেয়েচি। বাঙালীর মনের কথা যদি বাংলা ভাষায় বল্‌লে চল্‌ত তাহলে ভাবনা ছিল না—কিন্তু মন সহজে যে ভাষায় কথা কয় ঠিক তার উল্টো ধরণের ভাষার লাইনে কলম চালাতে হবে—এই অত্যন্ত বেয়াড়া রকমের সার্কাস প্র্যাক্‌টিস করতে আমার শারদীয় অবকাশ কাটাতে হবে।

এবারে আশ্রমে ছুটি হবার আগের দিনে শারদোৎসব অভিনয় হয়ে গেচে। তোমাদের দলের মধ্যে প্রশান্ত এবং সিদ্ধান্ত* এসেছিলেন। এঁরা বলেন এবারকার অভিনয়টা সকল বারের সেরা হয়েছিল। এ খবরটা যে আত্মশ্লাঘার জন্যেই তোমাকে দিলুম তা নয়—লঙ্কাদ্বীপে তোমার কিঞ্চিৎ চিত্তদাহ হবে সে অভিপ্রায়ও আছে।

তোমাদের কলেজেরও† যে বর্ণনা করেচ তা পড়ে খুসি হলুম। এই বিদ্যালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার ভার তুমি গ্রহণ কর। আপনাকে হারিয়ে ফেলা যে কি সর্ব্বনাশ সেটা এদের বুঝিয়ে দিয়ো—নিজের দেহটাকে বিক্রি করে অন্যের পুরানো কাপড় কেনার মত এত বড় ঠকা আর কিছু হতে পারে না সেটা যেন ওরা উপলব্ধি করে। সিংহলে একবার বাঙালী উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, এবার বাঙালীর মানসিক উপনিবেশ ওখানে স্থাপিত কর। যদি দুই-এক জনকে বাংলা ভাষা‡ শিখিয়ে দিতে পার তাহলে বাংলার সঙ্গে সিংহলের আর একবার নাড়ীর যোগ হতে পারবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় যাবার পথে একবার তোমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে। ইতি ৩ কার্ত্তিক ১৩২৬§

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ রথী বল্‌চেন তুমি তাঁকে কোন্ চিঠি কপি করে দেবে এবং তার বদলে তিনি তোমাকে ছবি দেবেন এই কথা ছিল। (প্রবাসী: বৈশাখ ১৩৪৯তে মুদ্রিত দু'খানি চিঠি)

[১৯২০ অক্টোবর—১৯২১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত কবি তৃতীয় বার আমেরিকায় কাটান। সেখানে Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ে আমায় নিয়ে যাবার চেষ্টা চলেছিল কিন্তু হয়ে ওঠে নি। সেই সময়ে আমেরিকা থেকে দু'খানি চিঠি লেখা।]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আর ঘণ্টা দুই-তিনের মধ্যে রেলগাড়িতে উঠ্‌তে হবে। তার পরে কাল চড়ব জাহাজে। নিজেকে যেন একটা মালের বস্তা বলে মনে হচ্চে। যদি তোমাদের বয়স থাকৃত তাহ'লে ভাবী আশার নেশায় এতক্ষণে ভোর হ'য়ে থাকৃতুম—কিন্তু যৌবন যে গেছে তার প্রমাণ এই যে নড়াচড়া ভাল লাগচে না—স্থবিরত্ব হচ্চে স্থাবরত্ব।

সুকুমারের দিদির বই* এণ্ড্রুজ সাহেবের কাছে ছিল—অতি সত্বর সেটা আদায় করবার পরামর্শ দিয়ো—কেন না তার জিনিষপত্রের মধ্যে নশ্বর জগতের নশ্বরতা যত সপ্রমাণ হয় এমন আর কোথাও না।

হার্ভার্ডে লানমানের (Lanman) সঙ্গে দেখা হ'লে তোমার সম্বন্ধে আলোচনা করব—যদি কোনো সুবিধা করতে পারি চেষ্টার ত্রুটি হবে না। কিন্তু আবার মনে করিয়ে দিয়ো।

আবার বসন্তে দেখা হবে—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার এখানকার মেয়াদ প্রায় শেষ হ'য়ে এল। মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি আটলান্টিক পাড়ি দেবার ইচ্ছে। য়ুরোপে ফেরবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে আছে। এ দেশটা য়ুরোপের উপগ্রহ; তার সঙ্গে বাঁধা কিন্তু মস্ত একটা তফাৎ আছে—য়ুরোপের চার দিকে যে প্রাণময় বায়ুমণ্ডলী আছে এ দেশের তা নেই—ভারি শুক্‌নো। বাতাস থাক্‌লে আলোতে ছায়াতে যে গলাগলি হয় এখানে তা নেই—সব যেন কাটা-কাটা ছাঁটা ছাঁটা। আমার ত এখানে প্রতি

* অধ্যাপক প্রশান্ত মহালানবীশ ও নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত

† Mahinda Collegeএর অধ্যক্ষপদে বৃত হয়ে আমি ১৯১৯ সালে সিংহলে যাই।

‡ সিংহলীদের বাংলা শিখান সুরু করি কবির 'জনগণ মন অধিনায়ক' গানটি সিংহলী অক্ষরে Mahinda College Magazineতে ছাপিয়ে। কথা ও সুর শুনে তারা মুগ্ধ হয়েছিল শুধু আক্ষেপ করেছিল সিংহলের নাম কবি বাদ দিয়েছেন বলে। এবিষয়ে তাঁকে লিখে ও তাঁর অনুমতি নিয়ে উৎকলের বদলে সিংহল বসিয়ে আমি সিংহলের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গানটি গাইতে শেখাই। যথা:—

"পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় সিংহল বঙ্গ"।

§ অগ্রহায়ণ ১৩২৬এ লেখা আর একখানি চিঠি 'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩৪৯ ছাপা হয়েছে।

* পরলোকগত বন্ধু সুকুমার রায়ের ভগ্নী সুখলতা রাও তাঁর বেহুলার ইংরাজী সংস্করণ করেন।

মুহূর্ত্তে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌চে। আমি এ দেশকে এত কম জানি যে, বিচার করতে পারি নে, কিন্তু তবু আমার মনে হয় এখানে যেটা আমাকে পীড়ন করে সে হচ্চে এখানে বেশি জান্‌বার নেই;—যেন আমাদের কোপাই নদীতে ডুব সাঁতার কাটবার চেষ্টা—আর সব আছে, পাঁক আছে, বালী আছে, গর্ত্ত আছে, জল এক হাঁটুর বেশি নয়।

Dr. Woods*কে তোমার কথা বলেছিলুম তিনি বলেছিলেন মার্চ্চ মাসের মধ্যে দরখাস্ত করলে তোমার পক্ষে স্কলারশিপ পাওয়া শক্ত হবে না। তাতে যেন উল্লেখ থাকে যে তুমি কলেজের প্রিন্সিপাল ছুটিতে আছ। আমি রথীকে বলেছিলুম তোমাকে জানাতে—সে বোধ হয় ভুলে গেছে। যাহোক তুমি অধ্যাপক লেভির Certificate সহ দরখাস্ত কোরো।

আমার গানের তর্জ্জমা† পেয়ে আমি বড় খুসি হয়েছি। অধ্যাপককে আমার সাদর অভিবাদন জানিয়ো—শীঘ্রই তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে এই প্রত্যাশায় এখানকার প্রবাস দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করচি। একটা জিনিষ এখানে দেখা গেল—বর্ত্তমানে সমস্ত United States ইংলণ্ডের হাতে—তারাই এখানকার মন ধন এবং রাজ-সিংহাসন অধিকার করেচে। এখানে ভারতবর্ষের স্থান সঙ্কীর্ণ হয়েচে—ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও এখানকার মন উত্তেজিত। তোমরা যখন এ দেশে আসবে সুখী হবে না।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি ২৪শে মার্চ আমেরিকা থেকে ফিরে লণ্ডন হয়ে ১৬ই এপ্রেল উড়ো জাহাজে প্যারিসে নামেন। ১৭ই এপ্রেল মনীষী রম্যাঁ রলাঁর (Romain Rolland) সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ও কথা-বার্ত্তা হয়; তার দু'দিন পরে এ চিঠি লেখা।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

প্যারিসে এসে দেখি, তুমি নেই। ফাঁকা বোধ হচ্ছে। এখানে সেই আমার জানলার কোণে* লেখবার ডেস্কের কাছে চুপচাপ বসে আছি। আলোচনা করবার মত কথা অনেক জমে উঠেচে—তুমি থাকলে বসে বসে সেগুলি খালাস করবার চেষ্টা করা যেত। যা হোক্ স্ট্রাসবুর্গে যাব। প্রথমে যাচ্চি স্পেনে—আগামী মঙ্গলবারে যাত্রা করব। সেখান থেকে কোথা দিয়ে কোথায় যাওয়া সহজ সেটা হিসেব ক'রে দেখতে হবে। ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড, জার্ম্মানি, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, সুইডেন এবং নরোয়ে—এই কটা দেশ দেখতে হবে। তোমরা কেউ সঙ্গে থাকলে বেশ হ'ত। যা হোক্ এই ঘুরপাকের মধ্যে কোনো একটা ভাগে স্ট্রাসবুর্গে যেতে পারব।

দেশে ফিরব জুনের শেষে। তখন আকাশের পূর্ব্ব দিগন্তে নবমেঘের ভ্রূকুটী-অন্তরালে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎস্ফুরণ দেখা যাচ্চে। তুমি কি ভাবচ আমি তখন দেশে রাষ্ট্র-নায়কের পদ গ্রহণ করে চরকার চক্রান্তে যোগ দেব? আমাকে তুমি কাজের লোক মনে করচ? আমি যদি জগতের উপকার করবার লোভে পড়ে বিধাতার খাতাঞ্চিখানায় গিয়ে কাজের মজুরা নিয়ে আসি তা হলে আমার জাত যাবে যে,—বেকার কুলীনদের পংক্তিতে আমার স্থান হবে না। তাহলে আকাশের মেঘ যখন তার বার্ত্তা পাঠাবে তখন ধরণীর মেঘমল্লারে তার জবাব দেবে কে? আমি দক্ষিণ হাওয়ার পথের পথিক, আমাদের চাল হচ্চে এলো-মেলো চাল, আমাদের কাজ হচ্চে কাজে ফাঁকি দেওয়া—আমরা সভাসদদের দলের লোক নই—দরবার ভাঙলে তবে আমাদের ডাক পড়ে। এত দিনে এটুকু তোমার বোঝা উচিত ছিল যে আমি মহাযান সম্প্রদায়ের। যা হোক্ দেখা হলে বোঝা পড়া হবে। ইতি ১৯ এপ্রেল ১৯২১

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আচার্য্য লেভীকে আমার নমস্কার দিয়ো এ সময়ে তিনি প্যারিসে নেই এ আমার দুর্ভাগ্য।

Shantiniketan
Oct. 20. 1921

কল্যাণীয়েষু

কালিদাস, তোমার এবারকার চিঠিখানি পড়ে বড় খুসি হলুম। কাল যে নিরবধি এবং পৃথিবী যে বিপুলা

* Prof J. H. Woods হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক

† প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী শুধু প্রাচীন চৈনিক ও ভারতীয় ভাষায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের শিষ্য তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে প্যারিসে থাক্‌বে জেনেই আমার সঙ্গে অধ্যাপক লেভী রবীন্দ্রনাথের কবিতা কিছু দিন পড়েন ও আমরা দুজনে মূল বাংলা থেকে ফরাসীতে কিছু অনুবাদ করি। পরে বলাকার সম্পূর্ণ ফরাসী অনুবাদ "Cygne" প্যারিস থেকে প্রকাশিত করি কবি-বন্ধু P. J. Jouve-এর সাহচর্য্যে।

*এই জানলার কোণটি Albert Kahn-এর Autour du Monde নামক উদ্যানবাটিকার; এইখানে বসে কবি তাঁর বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা ফরাসী মনীষীদের কাছে জানান ১৯২০ সালে, তখন প্রথম আমি প্যারিসে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ আরম্ভ করেছি।

আমাদের এ দেশে সে কথা বার বার ভুলে যেতে হয়। তুমি ইটালিতে দান্তে-উৎসব * থেকে আহরণ করে সেই নিরবধি কালের হাওয়া তোমার চিঠিতে এখানে পাঠিয়ে দিয়েচ—এতে আমার হৃদয় যেন অনেক দিন পরে খানিকটা হাঁফ ছেড়ে নিতে পারল। আমাদের দেশে লোকসমাজে জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিত যে কত সঙ্কীর্ণ তা য়ুরোপে থাকতে একেবারে ভুলে যেতে হয়, তাই সেখানে যে-সব সঙ্কল্প করেছিলেম এখানে দেখি তার প্রশস্ত স্থান নেই। এখানে যে ভাষা সে গ্রাম্য ভাষা, এবং তার মধ্যে দিয়ে যে বার্ত্তা দেওয়া যায় তা বিশ্বের বার্ত্তা নয়—তাতে কলহ করা চলে এবং খবরের কাগজে প্রবন্ধ লেখা যায়। কোনো বড় সঙ্কল্প যখন মনের মধ্যে বহন করা যায় তখনি নিজের পরিবেষ্টনের যে অনৌদার্য্য সেটা নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে থাকে। এতদিন শান্তিনিকেতনের সৃষ্টিকার্য্য আমার একলার হাতেই ছিল—এর দ্বারা মস্ত কোনো লোকহিত করচি সে কথা ভাবিও নি—কেবলমাত্র একলা মাঠের মধ্যে বসে অন্তরের ভাবনাকে বাহিরের সম্ভাবনার মধ্যে দাঁড় করাচ্ছিলেম। কিন্তু বিশ্বভারতী ত লিরিক জাতীয় কর্ম্ম নয়, এ হচ্চে এপিক জাতীয়। আমার দেশ যদি এ কাজ গ্রহণ না করে তবে আমার পক্ষে এ একটা বিষম বোঝা হয়ে উঠ্‌বে। আমি কিন্তু বোঝা বইবার মজুরী করব বলে' বিধাতার হুকুম পাই নি—আমাকে স্বাধীন থাকৃতে হবে। য়ুরোপে আমি এত বেশি আদর পেয়ে এসেচি, আমার দেশের কাছে সেইটেই আমার পক্ষে লাঞ্ছনার কারণ হয়ে উঠেচে। সবাই বলতে চায় যে, যে-হেতু আমি অন্তরে অন্তরে বিজাতীয়ভাবাপন্ন সেই জন্যেই বিদেশীর কাছে আমার সম্মান। যেন ভারতবর্ষের যে আলো সে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের চক্ষুকেই দৃষ্টি দেয় অন্য দেশের পক্ষে তা অন্ধকার—যেন ভারতবর্ষের ক্ষেতে যে-ফসল ফলে বিদেশের কাছে তা অন্নই নয়। অথচ এই সব অত্যুচ্চ স্বাজাতিকরাই, উড্রফ (Woodroffe) সাহেব যখন তন্ত্রশাস্ত্রের গুণগান করেন, তখন বলেন না, অতএব তন্ত্রশাস্ত্রে ভারতীয়তার অভাব আছে।

যাই হোক এই সব নানা দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমি জানকীর মতই আমার বর্ত্তমান অবস্থাকে বলচি তুমি দ্বিধা হও আমি অন্তর্ধান করি। সে আমার অনুরোধ মত দ্বিধা হল। একদিকে কাব্য, আরেক দিকে গান। আমি এর মধ্যেই তলিয়ে গেছি। আমি প্রায় রোজই একটি দুটি করে বাল্যকালের কবিতা লিখ্‌চি। এই বয়ঃপ্রাপ্ত বুদ্ধিমানদের জগৎ থেকে আমি যেন পলাতকা। আমার আরেকবার বোঝা দরকার হয়েচে যে এই জগৎটা খেলারই ধারা—আর যিনি এই নিয়ে আছেন তিনি নিত্য কালেরই ছেলেমানুষ। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারার কোনো ব্যাবহারিক অর্থই নেই, তাদের পারমার্থিক অর্থ—তারা হ'চ্চে, তারা হ'ল, আর কিছুই না। তারা রূপ, তারা কথা, তারা রূপকথা। এইজন্যই যখন আমরা রূপ দিচ্চি, কথা গড়চি, রূপকথা বলচি তখনই সমস্ত বিশ্ব-সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের সুর মিলচে। তাই যেদিন সকালে ছোট্ট একটুখানি গান তৈরি করি সেদিন প্রকাণ্ড এই কর্ত্তব্য-জগতের ভারাকর্ষণটা একেবারে শূন্য হ'য়ে যায়, সেদিন ইণ্টারন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটির* গাম্ভীর্য্য দেখে হাসি পেতে থাকে। পণ্ডিতেরা বলে থাকেন কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি—হায়রে হায়, জীর্ণ কীর্ত্তির ধূলিস্তূপের নীচে কত অসংখ্য নাম আজ চাপা পড়ে আছে। কিন্তু আমার আজ সকালের গান! মানুষ ওকে ভুলে গেলেও ও চলে' যেতে যেতে অন্য গানকে জাগিয়ে দিয়ে যাবে—জগতের সেই গানের চির ধারার মধ্যে ওর গতিবেগ মরবে না—বিশ্বসৃষ্টির ছন্দদোলার মধ্যে ওর দোলনটুকু রইল। তাই বার বার মনে ভাবি আমি আমার খেলার দোসরকে তাঁর চন্দ্র সূর্য্য পুষ্প পল্লবের মধ্যে একা বসিয়ে রেখে আজ কার বোঝা ঘাড়ে করে কোন্‌ চুলোয় চলেচি! সমস্তই ধুলোর মধ্যে ধপাস্‌ করে ফেলে দিয়ে দৌড় মারতে ইচ্ছে করচে। ইস্কুলে পড়তে গিয়েছিলেম পারি নি, সম্পাদকী করতে গেলেম ছেড়ে দিলেম, পলিটিক্‌সে টানে যখন, বাঁধন কেটে পালাই। অতএব আমার নির্ব্বাসন সমস্ত জবাবদিহি থেকে—আর আমি আমার যে দোসরের কথা পূর্ব্বেই বলেচি তাঁরও সেই অবস্থা।

সকালে যে দুটো গান তৈরি করেচি লিখে পাঠালুম। ইতি ৩রা কার্ত্তিক, ১৩২৮

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* অমর কবি দান্তের সপ্তম শতাব্দিক উৎসব ১৯২১ সেপ্টেম্বর হয়, সেই উৎসবে তাঁর জন্মস্থান Florence-এ যোগ দিয়ে সারা ইতালি পরিভ্রমণ ক'রে কবিকে চিঠি লিখি।

* গত বিশ্বযুদ্ধের পর বেলজিয়মে International University স্থাপনের প্রথম চেষ্টা হয়; তার কিছু পরে সেই প্রচেষ্টা দেখি সুইট্‌জরলণ্ডে কিন্তু কোনটাই কার্য্যকরী হয় নি। অথচ কোন রাষ্ট্রশক্তির অথবা ধনকুবেরের সাহায্য প্রত্যাশা না করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীর ভিতর দিয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সূচনা ভারতে তথা এশিয়া মহাদেশে করেন; সেপ্টেম্বর ১৯২০ প্যারিসে তাঁর মুখে এই পরিকল্পনা শুনেছি।

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি এক দিন সকাল বেলায় হরিপুরের সদর দরজার মধুমালতীর ঝোপে বসিয়া বেনেবউ পাখী ডাকিতেছিল, একটা খোকা—ওকা হোক, একটা খোকা—ওকা হোক।

লবঙ্গলতা উঠান ঝাঁট দিতে দিতে বলিলেন, আহা, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আমার মায়ার যেন একটি টুকটুকে রাঙা খোকাই হয়।

দাওয়ায় বসিয়াছিল যোগমায়া। পাখীর ডাক ও মায়ের মন্তব্য সবই তাহার কানে গেল। মনে মনে খুসী হইয়া সে ঘুঁটের ছাই ভাঙিয়া দাঁত মাজিতে লাগিল। যোগমায়ার অনাবৃত বাম বাহুমূলে একখানি কবচ ও গোটা দুই মাদুলি লাল সুতা দিয়া বাঁধা রহিয়াছে। মুখখানি তার আলস্যের ভারে ভারাতুর। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন ভারি কাজই সে করিতে পায় না, তথাপি সারা দেহে তার আলস্য লাগিয়া আছে। যত রাজ্যের আলস্য কি যোগমায়ার দেহকেই আশ্রয় করিয়াছে। কাজ করে না বলিয়াই শুইয়া বসিয়া যোগমায়া দিনরাত অনাগত ভবিষ্যতকে রঙীন করিয়া তুলে। তার সঙ্গে অতীতও উঁকি দেয়। কুষ্টিয়ার সেই বাসা, বিদায় দিনে সেই সকলের অশ্রুসজল মুখ। কিন্তু এ সব চিন্তার উপরেও যে সোনার স্বপ্ন যোগমায়ার বুকে আশ্রয় লইয়াছে, তাহার নারী জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছে—তাহারই উজ্জ্বল রেখা উপচাইয়া পড়িতেছে তার সারা মুখে-চোখে। সকলেই বলে, রাঙা খোকা হোক একটি—কোল আলো-করা খোকা। ছেলের মূল্য নাকি মেয়েদের কাছে অমূল্য। তাহারা রহস্যচ্ছলে একবারও বলে না ত—একটি মেয়ে হোক। সে-ও আজকাল মনে মনে প্রার্থনা করে, হে ভগবান্, খোকাই যেন হয়। তাহাকে চাঁদ ধরিয়া দিবার জন্য, ঘুম পাড়াইবার জন্য, তাহার দুরন্তপনাকে শান্ত করিবার জন্য—অনেকগুলি ছড়া যোগমায়া মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নজাল বুনিবার ফাঁকে গুন্‌গুন্ করিয়া গানের সুরে অত্যন্ত সন্তর্পণে যোগমায়া সেই ছড়াগুলি আবৃত্তি করিতে থাকে।

ভয়—হাঁ, ভয়ও তাহার মনে হয় বইকি। সকলেই ত ঠাকুর-দেবতার মানত করিয়াছেন সুপ্রসবের জন্য। নারীর জীবন-মরণের সন্ধিকাল এই সন্তান প্রসবের মুহূর্ত্ত। তা ছাড়া অগণিত উপদেবতারা নাকি ভাবী জননীর উপর অকল্যাণের দৃষ্টি দিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায় চারি দিকে। ভর সন্ধ্যাবেলায় যোগমায়া দাওয়া হইতে নামিতে পায় না, দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি তার বহু দিন হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ফরসা কাপড় পরিবার বা গন্ধ তৈল মাখিবার উপায় নাই, সুগন্ধি মশলা দিয়া গাত্র মার্জ্জনাও নহে। যিনি আসিতেছেন—তাঁহার কড়া শাসন যোগমায়াকে মানিতেই হয়। ছাঁচতলায় এক দিন আঁচলখানি লুটাইয়া ছিল—ও ঘরের দাওয়া হইতে লবঙ্গলতা দেখিতে পাইয়া হাঁ—হাঁ করিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন।

বাবা ত প্রায়ই এটা-ওটা আনিয়া দেন। ডাঁসা পেয়ারা, আনারস, ইলিস মাছ, ল্যাংড়া আম, পাঁপর ভাজা, চিনা বাদাম ও তিল ভাজা দিয়া মুড়ি, কলাইয়ের ডালের বড়া, ঝিঙে পোস্ত ইত্যাদি কত জিনিসই যে যোগমায়ার খাইতে ইচ্ছা হয়। কাঁচা লঙ্কা ও কাসুন্দির আচারে তাহার প্রীতি জন্মিয়াছে। মা বলেন, ছেলেটাকে রাগী না ক'রে ছাড়বে না মায়া। এত ঝালও ভাল লাগে! একটু মিষ্টি খা না বাপু।

মিষ্ট—নাম শুনিলেই গা ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠে—তার খাওয়া!

সখীরা দুই-এক জন এখানে আছে। সকলেই সন্তান লাভ করিয়া গৃহিণী-সবাচ্যা হইয়াছে। যোগমায়াকে একান্তে পাইলে—জননী-জীবন ও তাহার কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে উপদেশ তাহারা অজস্রই দিয়া থাকে। প্রায় সকলের সন্তানই দুরন্তপনায় ও বুদ্ধিমত্তায় অদ্বিতীয়। কেহ হামা টানিয়া ঘরের জিনিসপত্র একাকার করিয়া দেয়, কেহ দুটি মাত্র দাঁতে 'কুটুস্' করিয়া এমন আঙুল কামড়াইয়া ধরে, কেহ মাড়ি দিয়া নাসিকা লেহন করিতে ভালবাসে, কেহ 'মা' 'বাবা' প্রভৃতি বলিতে শিখিয়াছে, কেহ মায়ের কোল না হইলে ককাইয়া বাড়ি মাথায় করে, কেহ বা যে-কাহারও কোলে কচি হাত বাড়াইয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং অপরিমিত হাসে—এই সব কাহিনী যোগমায়া অহরহ শুনিতেছে।

সন্তানের গৌরবে সকলেই আত্মহারা। যাহাদের কোলে তিন-চারিটি আসিয়াছে—তাহারা কিছু বলে না—মুখ টিপিয়া শুধু হাসে। হাঁ, তাহারাও বলে, কিন্তু সে সন্তান-সোহাগের কথা নহে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসুখের কথা, জ্বালাতনের কথা—সংসারের দারিদ্র্যের কথাও

সোনার স্বপ্নে মোড়া আত্মবিস্মৃত দিনগুলি। কখনও আশঙ্কা প্রবল হয়, কখনও আশার বাতি সূর্য্যের মত জ্বলিয়া উঠে। খোকা আসিতেছে—পিছনে তার মায়া কাননের পটভূমিকা। একটি সমগ্র সংসারের হাসি-হিল্লোলে সেই কাননে বসন্তশ্রী জাগিয়াছে। যোগমায়ার সংসারকে কেন্দ্র করিয়া আর একটি অস্পষ্ট সংসার—ধূসর দিগন্ত কোলে বেলালুণ্ঠিত নীল সমুদ্র-জলরেখার মত দেখা যায়। যোগমায়া যখন শাশুড়ী হইবে—ত হ'ব ঘর আলো করিয়া একটি ফুটফুটে বউ আসিবে। খোকাকে সে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইবে না; নিজের স্নেহডোরে বাঁধিয়া রাখিবে। খোকার উপার্জ্জনে শ্বশুর-ভিটার শ্রী উজ্জ্বল হইবে। তার পর নাতি-নাতিনীদের লইয়া...

কোন্ অনাগত শতাব্দীর সাগরজলে যোগমায়া এই সব স্বপ্ন-তরঙ্গের সৃষ্টি করিতেছে মনে মনে।

আরও বাল্যকালে ইটের খেলাঘর পাতিয়া—কাঁকড়ের অন্ন ও পাতার ব্যঞ্জন রাঁধিয়া—পুতুলের বিবাহ দিয়া—এই অস্পষ্টতম সংসারকে খেলার ছলেই ত যোগমায়ারা আপন মনের উত্তাপে গলাইয়া আকার দিয়াছে কতবার। খেলা আজ সত্য হইয়াছে, ভবিষ্যতের অস্পষ্ট রেখাগুলি কেনই বা আকার লাভ করিবে না।

সেই অপরাহ্নেই আকাশে মেঘ জমিয়া বৃষ্টি নামিল।

লবঙ্গলতা বলিলেন, আজ কি বার রে মায়া?

যোগমায়া বলিল, মঙ্গলবার।

লবঙ্গলতা বলিলেন, তা হ'লে তিন দিনের খেয়া। কথায় বলে:

শনির সাত, মঙ্গলের তিন,
আর সব দিন দিন।

যোগমায়াকে মুখ বিকৃত করিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মুখখানা অমন সিঁটকে আছিস্ কেন মায়া?

—কি জানি মা, গা কেমন পাকিয়ে উঠছে—পেটটায় মোচড় দিচ্ছে।

—আঁা, তাই নাকি! খানিক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তাই ত, উনিও এখন ফিরলেন না—কি যে করি। মুলি ধাই মাগীকে একটা খবরই বা দেয় কে?

রামজীবন ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া দাওয়ায় উঠিলেন।

লবঙ্গলতা বলিলেন, ওগো গা-হাত মুছে আর একবার ধাইবাড়ি যেতে হবে। তাল পাতার টোকাটা মাথায় দিয়ে যাও।

শ্রাবণের মধ্য রাত্রিতে মুষলধারে বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রের গর্জ্জনও শুনা যাইতেছিল। সেই প্রলয় গর্জ্জনের মাঝে এ বাড়িতে ক্ষীণতম একটি শঙ্খের ডাক গ্রামের কেহ শুনিতে পাইল না। যোগমায়াও না। সে তখন অবসন্নের চক্ষু মত মুদিয়া কাত হইয়া শুইয়াছিল। দেহের বত্রিশ নাড়ীতে তার টান ধরিয়াছে; সমস্ত বন্ধন শিথিল করিয়া পরম যন্ত্রণার মাঝে চরম কাম্যফলই বুঝি লাভ হয়। আকাশের মেঘলোকের উৎসব, প্রবল বৃষ্টি ধারায় গাছপালা ও চালের মাথায় সব একাকার-করা শোঁ শোঁ ধ্বনি—মাঝে মাঝে চোখ-ঝলসানো বিদ্যুতের প্রলয় শিখার মাঝে কান-ফাটানো বজ্রের শব্দ—প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইয়া মানুষের দেহেও বিপ্লব বাধিয়া গিয়াছে যেন।

বৃষ্টির বেগ বুঝিয়া ছাঁচতলায় দরমার বেড়া-ঘেরা পাতলা-ছাওয়া খড়ের অস্থায়ী চালায় যোগমায়াকে স্থানান্তরিত করা হয় নাই। দাওয়ারই এক কোণে—রাজাধিরাজের মত যোগমায়ার সন্তান আসিল। লবঙ্গলতা সানন্দে সজোরে শঙ্খে ফুৎকার পাড়িয়া কহিলেন, ওগো মায়ার আমার খোকা হ'য়েছে।

ঘরের মধ্যে উৎকণ্ঠিত রামজীবন পায়চারি করিতেছিলেন; দুয়ারের ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া কহিলেন, খোকা?

ঘরের মধ্যে কাঁথাখানা গায়ে জড়াইয়া হরি তক্তাপোষের উপর বসিয়াছিল। কাঁথাখানা গা হইতে ফেলিয়া তড়াক করিয়া তক্তাপোষ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, দিদির খোকা হ'য়েছে।

আঁতুরঘর হইতে ধাই তখন বলিতেছে, একখানা কাপড় আর একটা ঘড়া নেব—মা ঠাকরোণ। প্রথম পোয়াতি—

এ যেন আনন্দ-কাকলি ধ্বনি উঠিয়াছে। বর্ষার মধ্যেও এই ধ্বনি সুস্পষ্ট। বজ্রধ্বনি শঙ্খধ্বনির মধ্যে আত্মগোপন করিল। যোগমায়ার আচ্ছন্ন ভাবটা সেই মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল, মাথা উঠাইয়া সে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

ধাই ছেলেটিকে দুই হাতে উঠাইয়া দোলা দিতে দিতে বলিল, এই নাও মা, আজপুত্তুর খোকা হয়েছে। আ:রে, আবার পুট্ পুট্ করে চাইছে দেখ!

যোগমায়া হাত বাড়াইল, ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া খোকা

কাঁদিয়া উঠিল। যোগমায়া ছেলেকে বুকে টানিয়া ধরিল।

যোগমায়ার দু'চোখ ভরিয়া ঘুম আসিতেছে। খোকাকে বুকে চাপিয়াই সে পাশ ফিরিল।

সকলেরই যে লইবার পালা। পাঁচটের দিন নখ কাটিয়া দিবার সময় নাপিতানী বলিল, একটা সিকি দিয়ো মা, পেরথম খোকা।

ছয় দিনের দিন যোগমায়া শুনিল মা বলিতেছেন, আজ রাত্রিতে বিধাতা-পুরুষ কি লেখা লিখবেন ছেলের কপালে, কে জানে! মাটির দোয়াত আর কঞ্চির কলম একটা রাখিস হরি। আজ যা লিখবেন—তা খণ্ডাতে কেউ পারবে না।

হরি জিজ্ঞাসা করিল, বিধাতাপুরুষ কখন লিখবেন মা?

সেই দুপুর রাতে—সবাই যখন ঘুমোয়। তখন চুপি চুপি এসে লিখে যান তিনি।

হরি প্রশ্ন করিল, কেউ দেখতে পায় না তাঁকে?

যাদের তপিস্যে আছে—তারা পায় বইকি। একবার এক—

মায়ের গল্প শুনিয়া যোগমায়া মনে মনে করিল, আমিও আজ জেগে থাকব। বিধাতাপুরুষ যদি কিছু মন্দ লেখাই আমার ছেলের কপালে লিখে দেন! তাঁকে মিনতি ক'রে সে লেখা পালটে নেব। এমনও তো হয়েছে।

গোবরের উপর ছয়টি কড়ি বসাইয়া ও কঞ্চি চিরিয়া তাহাতে তালপাতা লাগাইয়া কাদার তালের উপর পুঁতিয়া রাখা হইল। দোয়াত ও কলম পাশে সাজানো রহিল।

ক্রমে রাত্রি গভীরতর হইল। মধ্যযামের শেয়ালগুলি এই মাত্র ডাকিয়া গিয়াছে। শ্রাবণের রাত্রি; বৃষ্টি নাই—কাজেই গুমোট আছে। গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। গভীর রাত্রির থমথমে ভাব অতন্দ্রিত যোগমায়ার মনে লাগিয়া বুকের স্পন্দনকে দ্রুততর করিল। এমনই সময়—এই নিরালা মুহূর্ত্তে—আঁতুরঘরের ছোট দরমার দুয়ারটি ঠেলিয়া বৃদ্ধ বিধাতাপুরুষ বুঝি পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া থাকেন! হয়ত এখনই আসিবেন তিনি। মাথায় তাঁর পাকা চুল, আবক্ষ-লম্বিত শুভ্র দাড়িগোঁফ—এই টানা টানা চোখ, টিকলো নাসিকা, গোলাপ ফুলের মত রং—আর বলিরেখাঙ্কিত শিথিল কপালে ও গালে সে রং যেন রূপের পসরা মেলিয়া ধরিয়াছে। সৌম্য প্রশান্ত রূপ। বীণা বাজাইয়া হরিগুণগান করিতে করিতে যে ঋষিপ্রবর প্রতিদিন জ্যোৎস্নাস্নাত রাত্রিতে মেঘের স্তরে স্তরে—স্বর্গলোকের কিনারায় ঘুরিয়া বেড়ান—তাঁরই মত অপরূপ তিনি। পরিধানে শুভ্র ক্ষৌম বাস, গলদেশে শুভ্র যজ্ঞোপবীত, তদুপরি শুভ্র ক্ষৌম উত্তরীয়। হাতে সোনার কলম, পায়ে সোনার বলো-দেওয়া খড়ম। খট্ খট্ করিয়া খড়মের ধ্বনি তুলিয়া তিনি সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করিয়া নবজাতকের ললাট-লিপি লিখিয়া চলিয়া যান। কেহ জাগিয়া থাকে না বলিয়া মনে করে, তিনি নিঃশব্দে আসিয়া—চুপিসারেই চলিয়া যান!

ও—মায়া—মায়া, এত বেলা হ'ল—মেয়ের ঘুম দেখ একবার!

আঁ, বলিয়া যোগমায়া উত্তর দিল। তাই ত, দরমার ফাঁক দিয়া রৌদ্র দেখা যায়—অনেকখানি বেলা হইয়াছে। ধড়মড় করিয়া যোগমায়া উঠিয়া বসিল। পাশেই ছোট কাঁথাখানিতে শুইয়া খোকা ঘুমাইতেছে। দরমার ছিদ্রপথে ছোট্ট একটু রোদের ফোঁটা আসিয়া খোকার ছোট্ট কপালটিতে সোনার টিপ পরাইয়া দিয়াছে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যোগমায়া খোকার সেই রৌদ্ররেখাঙ্কিত ললাটের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার ঘুমের ফাঁকে বৃদ্ধ বিধাতাপুরুষ কি লেখা সেখানে লিখিয়া রাখিলেন, কে জানে?

আট দিনের দিন সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার অনেক ছেলে-মেয়ে যোগমায়াদের উঠানে জড়ো হইয়া কলরব তুলিল। লবঙ্গলতা একখানি ভাঙা কুলা লইয়া দাওয়ার উপর হইতে বলিলেন, হাঁরে তোরা সব কাঠি এনেছিস্ ত? বেশ ভাল ক'রে ছড়া না বলতে পারলে আট ভাজা দেব না।

ছেলেরা কলস্বরে বলিল, হুঁ, খুব ভাল ক'রে কুলো পিটব, ফেলুন না কুলো। কঞ্চি, বাখারি, সজিনার ডাল প্রভৃতি ঊর্দ্ধে তুলিয়া তাহারা কুলা ফেলিয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল।

লবঙ্গলতা বলিলেন, বেশ ক'রে কুলো পিটে আঁতুড়-ঘরের চালা ডিঙিয়ে ফেলে দিতে পারবে ত?

দলের মধ্যে বড় ছেলেটি বলিল, আপনি ফেলুন ত কুলো।

লবঙ্গলতা কুলা ফেলিয়া দিলে ছেলেরা সজোরে তাহাতে কাঠির বাড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিল:

আটকৌড়ে পাটকৌড়ে ছেলে আছে ভালো?
মার কোল জোড়া হ'য়ে ঘরটি কর আলো।

কি সে চীৎকার—কি সে কোলাহল! আঘাতে

আঘাতে কুলার কাঠিগুলা ছাড়িয়া গেল। বড় ছেলেটি তাহার লম্বা কাঠির ডগায় সেই শতধা-বিচ্ছিন্ন কুলাখানি তুলিয়া সজোরে আঁতুড়ঘরের চালার পানে ছুড়িয়া দিল; অতি উচ্চে আঁতুড় ঘর ডিঙাইয়া কুলা প্রাচীরের ওপিঠে গিয়া পড়িল। আট ভাজা কোঁচড়ে করিয়া ছেলেরাও মহানন্দে প্রস্থান করিল।

নয় দিনের দিন যোগমায়া স্নান করিয়া নখ কাটিয়া আর একবার আঁতুড়ঘরের সামনের দাওয়ায় বসিল। আজ অশৌচের অর্দ্ধেক নাকি কাটিয়া গেল, বাকিটা কাটিবে ষষ্ঠীপূজা শেষ হইলে বার দিন পরে অর্থাৎ একুশ দিনে ষষ্ঠী পূজা সারিয়া শুদ্ধ হইবে যোগমায়া।

শ্রাবণ মাসের কৃপণ দিনে সূর্য্যের সাক্ষাৎকার কদাচিৎ ঘটে। তবু, সকাল—দুপুর—বা বৈকালে যখনই আকাশের মেঘ-মহল হইতে সূর্য্যদেব উঁকি মারেন,—যোগমায়া ছোট্ট পিঁড়িখানি আঁতুড়ঘরের দুয়ার অভিমুখে ঠেলিয়া দিয়া খোকাকে রোদ পোহাইয়া লয়। যে বাগ্‌দী মেয়েটি তেঁতুল কাঠের গুঁড়ি জ্বালাইয়া রাত্রিতে প্রসূতি ও সন্তানকে সেক তাপ দেয়—সে-ও বলে, ওদের (রোদ) কাছে আর কি আছে মা ঠাকরোণ। আগুনের চেয়ে ওতেই ত উব্‌গার হয়—ছেলের গা-হাত শক্ত হয়।

নয় দিন কাটিলে বাগ্‌দী-মেয়েটাকে লবঙ্গলতা ছাড়াইয়া দিলেন। দিন এক পালি সিদ্ধ চাউল, নগদ দু'টি পয়সা ও বিদায়কালে একখানি পুরাতন কাপড়; সচ্ছল সংসার হইলে ষষ্ঠীপূজা না-হওয়া পর্য্যন্ত গৃহস্থ ইহাদের রাখিতে পারে। 'নত্তা'র দিন কাটিলে আঁতুড়ঘর নাকি ততটা অশুচি থাকে না। লবঙ্গলতা রাত্রিতে মেয়ের কাছে শুইয়া সকালে একটা ডুব দিয়া অনায়াসে সংসারের কাজকর্ম্ম করিতে পারেন। তাহাতে নাকি তেমন দোষ নাই!

তা যোগমায়ার ছেলেটি ভারি শান্ত হইয়াছে। দুধের পলিতা মুখে পাইলে চুকচুক্ করিয়া চোষে, স্তন্যপান করিয়াও চুপ করিয়া ঘুমায়। ছেলের রং বেশ ফর্সাই হইয়াছে। মা ব'লতেছেন, ছেলের মুখখানি নাকি হুবহু যোগমায়া বসান। মাতৃ-মুখী সন্তান সুলক্ষণের চিহ্ন। কিন্তু রং সে বাপের মত পাইয়াছে—তেমনই মটর ডালের মত ধবধবে। ছেলের হাত-পাগুলি লম্বা লম্বা, বাপের মতই সে লম্বা হইবে। তেমনই পাতলা, হয়ত বা রোগাই হইবে। তেমনই শান্ত। বাবা যেমন মুচকিয়া মুচকিয়া হাসে—খোকা এখনও হাসিতে শেখে নাই—তবে ভাল করিয়া দেখিলে মুখের রেখা বিকৃতিতে বোধ হয়, সেই রকম মুচকি হাসিই সে হাসিবে এবং হাসিবার কালে বাম গালে সামান্য একটু টোল পড়িয়া সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিবে।

সবই শোনে যোগমায়া, আর ছেলের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবে, কোথায় এই সব সদৃশ্য! এতটুকু রক্তের ডেলা—প্রত্যহ যে আকৃতির পরিবর্ত্তনে একটু একটু করিয়া চঞ্চল হইতেছে—তাহাকে লইয়া এত জল্পনা-কল্পনা কেন? আগে বাঁচিয়াই থাকুক। যোগমায়া সাবধানে আঁতুড়ের দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দেয়, কোথাও বড় ফাঁক থাকিলে সেখানে নেকড়া গুঁজিয়া বাতাসের গতিরোধ করে। ছোট্ট ছেলে—একবার ঠাণ্ডা লাগিলে কি আর রক্ষা আছে!

ষষ্ঠীপূজার দিন অনেকখানি হাঁটিয়া যোগমায়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল। স্নানান্তে একখানি লালপাড় শাড়ী পরিয়া ছেলে কোলে লইয়া পাড়ার আর পাঁচ জন সধবা স্ত্রীলোককে লইয়া ষষ্ঠীতলায় চলিল পূজা দিতে। গ্রামের প্রান্তে বহু পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে খেলাঘরের মত ছোট ছোট কয়েকটি মন্দির আছে। হাত-দুই-আড়াই উঁচু হইবে মন্দির। এককালে চূণ বালির পলস্তারা হয়ত ছিল, আজ শুধু নোনাধরা পাতলা ইটগুলি বাহির হইয়া সেগুলিকে পতনের ভ্রূকুটি দেখাইতেছে। সেই ঈষৎ অন্ধকার ঘরে কয়েকটি শিলাখণ্ড সিন্দুর হলুদ বিচিত্রিত হইয়া ও শুকনা ফুলের মালায় সাজিয়া ষষ্ঠী দেবী রূপে বিরাজমানা। মন্দিরের মাথায় দড়ি দিয়া বাঁধা অনেকগুলি মুচির (মাটির ছোট ভাঁড়) মালা ঝুলিতেছে।

বাঁশের চাঁচারি দিয়া প্রস্তুত ছোট ছোট একুশটি পেতে খই ও কলা সমেত সেখানে সাজাইয়া রাখা হইল। ফুল, নৈবেদ্য ইত্যাদি দিয়া পুরোহিত দেবী অর্চ্চনা করিলেন। পুরনারীরা শঙ্খ ও হুলুধ্বনি দিয়া গ্রামের মধ্যে এই শুভবার্ত্তাকে প্রেরণ করিলেন। পুত্র কোলে যোগমায়া ষষ্ঠী পূজা সারিয়া গাড়ুর জলধারা দিতে দিতে ইহাদের অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া ঘরে আসিয়া উঠিল। মেয়ের কোল হইতে নাতিকে লইয়া লবঙ্গলতা তাহার গালে চুমা খাইতে খাইতে বলিলেন, আমার ধন—আমার মাণিক।

আদরের মাত্রাধিক্যে ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। মেয়েদের মধ্যে একজন বলিল, তোমাকে নাতির পছন্দ হয় নি গো। লবঙ্গলতা হাসিয়া বলিলেন, তাই বটে!

৩

রামচন্দ্র বিষ্ণুপুরে বদলি হইয়াছিল। সেখান হইতে সে যোগমায়াকে লিখিল: তোমার ছেলে কা'র মত

হয়েছে না বললে আমি কিছুতেই যাব না। শুধু তোমার মতটি আমায় জানাবে।

যোগমায়া লিখিল: সবাই ব'লছেন, মোহর দিয়ে ছেলের মুখ দেখবার ভয়ে ওর বাবা এলেন না। সত্যি, একদিনও কি ছুটি পাবে না? আর তুমি না এলে আমি তো খোকার কথা কিছুই জানাব না। আমাদের না হোক, ওর কি একটা দাম নেই?

রামচন্দ্র লিখিল:—দাম বলে দাম! ও জিনিস অমূল্য। মোহর দিয়ে ছেলে দেখা ভাগ্যের কথা। তবে মোহর যোগাড় করতে আমাদের মত লোকের একটু দেরিই হয়। তুমি কবে আমাদের বাড়ি আসবে জানিও। তার আগেই অবশ্য আমি খোকাকে গিয়ে দেখে আসব। মোহর একখানা যোগাড় করেছি।

যোগমায়া লিখিল: এবার আশ্বিনে মলমাস ব'লে মা মেয়ে পাঠাবেন না, কার্ত্তিকে শ্বশুর-বাড়ি গেলে নাকি ভায়ের দোষ হয়। আমার যেতে সেই অঘ্রাণ। তুমি কি তত দিন পরেই আসবে? পুজোর সময় কি ছুটি পাবে না?

রামচন্দ্র লিখিল: পোষ্টাপিসের বিধানে ছুটির কথা লেখাই বাহুল্য। তবে আমি পুজোর সময় যাবার চেষ্টা করব। শুনছি নাকি বিষ্ণুপুর থেকে আমায় সোনামুখী বদলি করবে। তাহলে দিন কতক ছুটিও পাওয়া যাবে।

অনেক দিন হইল—বাপের বাড়িতে আসিয়াছে যোগমায়া। এখানকার দিনগুলি আজকাল ভারি মন্থর বলিয়া বোধ হয়। দিন যদি কাটে ত রাত্রি আর কাটিতে চাহে না। অমন যে গাঢ় ঘুম ছিল যোগমায়ার —আজকাল এমন পাতলা হইয়াছে যে, খোকা হাত নাড়িলে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। উঁ—আঁ করিলে তো কথাই নাই। সর্ব্বক্ষণ ছেলেকে বুকের উত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া রাখিতে ভালবাসে সে। বাহিরের পৃথিবীতে নিত্যই ত রোগের ছোঁয়াচ ঘোরাঘুরি করে। সর্দ্দি, কাসি, গলায় ব্যথা, পেটের অসুখ, দুধ তোলা—কচি ছেলের একটা-না-একটা লাগিয়াই আছে। তবু এই সব ঠেলিয়া—যোগমায়ার মনে হয়—খোকা স্বাস্থ্যবান হইতেছে দিন দিন। পুরন্ত গালে তার রক্তের ছোপ গাঢ় হইয়াই লাগিয়াছে, ছোট চোখ দু'টি বড় হইয়াছে, মাথা ভরিয়া শোভা পাইতেছে ঈষৎ কটা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। হাত পা যেন অগ্রহায়ণের শিশির-খাওয়া সতেজ লাউডগাগুলির মত সুঠাম হইয়া উঠিতেছে। লাল শোলার কদম ফুল দেখিয়া খোকা একদৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া থাকে। মুখের কুঞ্চিত রেখায় তার হাসির রূপটি যেন ধরা যায়।

যোগমায়া আসন পিঁড়ি হইয়া বসিয়া ছেলেকে কোলে লইয়া ঈষৎ হাঁটু নাচাইতে নাচাইতে সুর করিয়া আবৃত্তি করে

ও—ও—আয় রে টিয়ে ন্যাজ ঝোলা,
আমার খোকাকে নিয়ে গাছে তোলা।

দুধ খাইতে খাইতে খোকা যদি কাসিয়া উঠে—যোগমায়া অমনি ষাট্ ষাট্ ধ্বনি করিয়া তাহার মাথায় ফুঁ দিতে থাকে।

লবঙ্গলতা হাসিয়া বলেন, মায়ার আদর দেখে আর বাঁচি নে। ছোটবেলায় কাঠের পুতুল নিয়ে ও অমনি করতো—মনে আছে তোমার?

রামজীবন হাসিয়া বলেন, তোমারও একদিন মাটির পুতুল নিয়ে অমনি দিন গেছে হয়ত।

লবঙ্গলতা বলেন, আমরা গুছোই বলেই তো ঘর-দুয়োরের এমন ছিরি।

রামজীবন বলেন, আমরা ভাঙ্গি বলেই তোমরা গুছোতে ভালবাস।

তারপর অন্য প্রসঙ্গ আসে। লবঙ্গলতা বলিলেন, জামাই নাকি দু'খানা মোহর দিয়ে গেছেন মায়ার হাতে। খোকার ভাতের দিন ওর গলায় সোনার হাঁসুলি গড়িয়ে দিতে বলেছেন।

রামজীবন বলিলেন, খোকা নাকি ভারি পয়মন্ত। জামাই বলছিলেন—এই মাস থেকে পাঁচ টাকা মাইনে বেড়েছে, আর ইনস্পেক্টর হবারও আশা আছে।

তাই নাকি? নেস্পেকটার কি গো?

এই বড় চাকরি। যে চাকরি করছে তার চেয়ে টাকাও বেশি পাবে, মানও বাড়বে।

আহা তাই হোক! মায়া আমার রাজরাণী হোক। হাঁ গো, তোমার একটা কথা মনে আছে?

—কি কথা?

—মায়া যখন পাঁচ বছরেরটি—সেবার গঙ্গাসাগর ফেরত এক সাধু আমাদের গাঁয়ে ওই ষষ্ঠীতলায় এসে ধুনি জ্বেলেছিলেন। রোজ মেলাই লোক তাঁর কাছে যেত—অনেক ছেলেমেয়েও তামাশা দেখতে যেত।

হাঁ, মনে আছে। মায়াকে কাছে ডেকে তিনি ওর হাতখানি দেখে বলেছিলেন, এ মেয়ের লক্ষণ ভাল। যার ঘরে ও উঠবে— তার ধনে-পুতে লক্ষ্মী উথলে পড়বে।

ওঘরে বসিয়া যোগমায়া সব শুনিল। শুনিয়া আনন্দে

সে খোকার গাল দু'টি টিপিয়া আদর করিয়া কহিল, দুষ্টু কোথাকার, বজ্জাত কোথাকার!

কার্ত্তিকের শেষে কুঞ্জ ঘোষ আসিয়া একখানি চিঠি রামজীবনের হাতে দিয়া গেল। চিঠিখানি পড়িয়া রামজীবন সেখানি কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। দাওয়া হইতে লবঙ্গলতা তাহা দেখিয়া বলিলেন, হাঁ গা, কিসের চিঠি—ছিঁড়লে কেন?

রামজীবন বলিলেন, মায়ার পিস্‌শাশুড়ী কাল মারা গেছেন।

লবঙ্গলতা বলিলেন, আহা, আমাদের মায়াকে তিনি বড় ভালবাসতেন। বুড়ির বড় সাধ ছিল মায়ার ছেলেকে তিনি কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করবেন। কি হয়েছিল গা?

রামজীবন বলিলেন, মনে হয় কলেরা। শীতকালেও ওসব রোগ হয়—আশ্চর্য্য! বেয়ান লিখেছেন, মৃত্যুকালেও তিনি মায়ার নাম করতে করতে চোখ বুজেছেন।

লবঙ্গলতা কহিল, মায়ারই কপাল। শাশুড়ী ওর একটু রাগী মানুষ, উনি ছলেন একেবারে নিরেট ভালমানুষ—জোরে কথা কইতে জানতেন না। মায়া যেদিন এখানে আসে—চুপি চুপি ওঁর কানবালা মায়াকে দিয়ে বলেছিলেন—ছেলের ভাতের সময় যেন সোনার পুঁটে গড়িয়ে দেওয়া হয়। মায়ার শাশুড়ীকে লুকিয়ে দিয়েছিলেন কিনা।

—মায়া কোথায়?

—ছেলে নিয়ে বোধ হয় চাটুজ্জেদের বাড়ি বেড়াতে গেছে। ওদের মেজবউ আজ বাপের বাড়ি থেকে এলো কিনা।

—তা মায়াকে শোনাবে এ কথা?

শোনাব না? তার অশৌচ না হোক—শোনাতে হবে বইকি। একটু থামিয়া বলিলেন, তাহ'লে ত অঘ্রাণের দোসরা তেসরাই ওকে পাঠাতে হয়।

—তা হবে বইকি। বেয়ান একা রয়েছেন।

হাত পা ধুইয়া ও গঙ্গাজল মাথায় দিয়া যোগমায়া সব কথাই শুনিল। শুনিল, কিন্তু তার বিশ্বাস হইল না। এই ত সেদিন সে পিসিমাকে দেখিয়া আসিল। আর ইহারই মধ্যে—না না,—ছেলেকোলে যোগমায়া সেখানে গিয়া হয়ত দেখিবে, তিনি আধঘোমটা টানিয়া একটা পেতেয় তুলা ও একটা বাটিতে জল লইয়া ঘড়র ঘড়র শব্দে চরকা কাটিতেছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর বেলায় কালো ভোমরা যেমন ভোঁ-ভোঁ করিয়া ঘরের কড়ি বরগার পাশ দিয়া উড়িয়া বেড়ায়—তেমনই চরকার গুন্‌গুনানি ধ্বনি তোলেন পিসিমা। তাঁর নিপুণ হাতের তৈয়ারী পৈতা ব্রাহ্মণেরা আদর করিয়া কিনিয়া লন। সামান্য উপার্জ্জন পিসিমার—তবু, তাহা বাঁচাইয়া তিনি কুটুম্ব অভ্যাগতের জল-খাবারের ব্যবস্থা করেন কোনদিন, কোনদিন দশমীর রাত্রিতে ছানা আনাইয়া শাশুড়ীকে পর্য্যন্ত জলযোগ করাইয়া থাকেন। তিনি না থাকিলে—সে বাড়ির একটা অংশই যে শূন্য হইয়া খাঁ-খাঁ করিতে থাকিবে।

খোকা কোলে শুইয়া মিটি মিটি চাহিতেছে। তাহাকে সহসা বুকে চাপিয়া ধরিয়া যোগমায়া একটি দীর্ঘনিশ্বাসও সেই সঙ্গে বুকের মধ্যে চাপিয়া ফেলিল। ক্রমশঃ

প্রশ্ন

শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়

আমি যেন ধরণীর চিররুগ্ন শিশু। জীবনের
যজ্ঞশালে তাই মোর প্রবেশ নিষেধ। রুগ্নকক্ষ-
বাতায়নে কাটে মোর দিন—আশাহীন, শূন্য বক্ষ।
শুনি শুধু বসে: ধ্বনিতেছে দিকে দিকে নিখিলের
মর্ম্ম হতে জীবনের জয়গান। হেরি অনুখন—
সহস্র সন্তান মাঝে উন্মোচিয়া গোপন সঞ্চয়
কৌতুকে বসুধা হাসে—চলে সেথা লুট, চলে জয়
পরাজয়, হানাহানি, কাড়াকাড়ি, শোষণ-দোহন।
আমি শুধু ফেলি দীর্ঘশ্বাস, মুছি আঁখিজল।
দিন যায়। আশার মঞ্জরী মোর সকলি শুকায়।
নাহি পারি আহরিতে একবিন্দু অমৃত-কণায়
সংগ্রাম-গৌরব-সুখে—নাহি বল, না জানি কৌশল।
অভিমানী প্রশ্ন তাই মাঝে মাঝে জাগে ভীরু চিতে
কিছু কি রাখে নি মাতা, সঙ্গোপনে অক্ষমেরে দিতে?

কত বৎসরে 'এক পুরুষ' ধরা উচিত

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

আমাদের দেশে কত বৎসরে এক পুরুষ হয়? এই কথার জবাবে কেহ বলেন ২০ বৎসরে, কেহ বলেন ২৫ বৎসরে, কেহ বলেন ৩০এ; আবার কেহ কেহ বলেন ৩৩ বৎসরে। বিলাতে সাধারণতঃ তিন পুরুষে ১০০ শত বৎসর হয়—অনেকের এইরূপ বিশ্বাস। আমাদের দেশ গরম দেশ; লোকে সাধারণতঃ দীর্ঘায়ু নহে—এ জন্য চারি পুরুষে বা পাঁচ পুরুষে এক শত বৎসর ধরা উচিত অনেকের এই মত। এই মতের পক্ষে অনেক কথা বলিবার আছে। বাংলায় লোকের 'গড় বয়স' বা mean age পুরুষদের ২৩·৩ বৎসর; আর স্ত্রীলোকের ২১·৭ বৎসর। আর এই 'গড় বয়স' ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। যথা:—

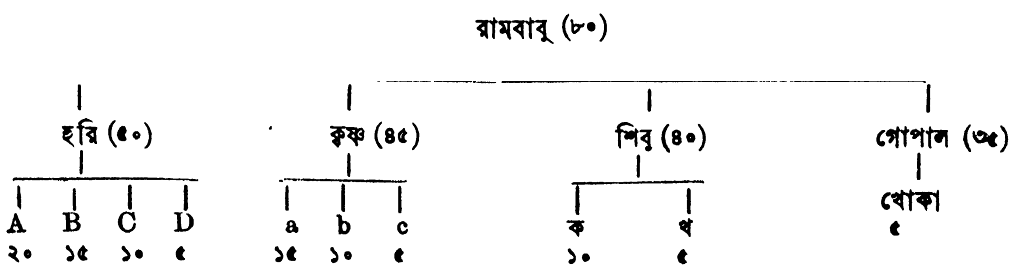
'গড় বয়স' (বৎসরে)

	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	২০ বৎসরে কমতি
পুরুষ	২৩·৮	২৩·৯	২৩·৩	০·৫ বৎসর
স্ত্রী	২৩·২	২৩·১	২১·৭	১·৫ "

কিন্তু এই 'গড় বয়স'কে বা mean ageকে এক পুরুষ ধরা সঙ্গত হইবে না। কারণ 'গড় বয়স' ধরিবার সময় শিশুদেরও বয়স ধরা হয়। কিন্তু সকল শিশুই কিছু আর বড় হইয়া শিশুর জনক হয় না—বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশী। ইং ১৯২১ হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরের শিশুমৃত্যুর হার গড়ে পুরুষদের পক্ষে ১,০০০ হাজারকরা ১৯১·৬, আর স্ত্রীদের পক্ষে ১৮০·৩ করিয়া। কথাটা একটা কাল্পনিক উদাহরণ দিয়া পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা যাউক। রামবাবুদের বাড়ীতে কেহই ৩০এর পূর্ব্বে বিবাহ করেন না। তাঁহাদের বাড়ীর লোকের বয়স নিম্নের কুরচিনামায় দেখান গেল।

ইহাদের বাড়ীতে এক পুরুষ অন্ততঃ পক্ষে ৩০এ ধরা উচিত। কিন্তু ইহাদের বাড়ীর সব লোকের গড় বয়স হইতেছে ২৩·৩ বৎসর। সুতরাং 'গড় বয়স' ধরিয়া এক পুরুষ ধরা আদৌ সঙ্গত হইবে না।

বিলাত স্বাস্থ্যকর দেশ বলিয়াই হউক, বা রোগ হইলে চিকিৎসা করাইবার বহুতর সুযোগ থাকার দরুনই হউক, বা বিলাতে বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা না থাকার দরুনই হউক, যে কারণেই হউক বিলাতে লোকের 'বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা' বা expectation of life ভারতবাসীর অপেক্ষা ঢের ঢের বেশী। বিলাতে সদ্যজাত পুরুষশিশুর ৬০·১৩ বৎসর পর্য্যন্ত 'বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা', আর স্ত্রী-শিশুর ৬৪·৩৯ বৎসর। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে সদ্যজাত পুরুষ-শিশুর 'বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা' ২৬.৯১ বৎসর, আর স্ত্রী-শিশুর ২৬·৫৬ বৎসর। এ কারণে অনেকে মনে করেন যে বিলাতে যত বৎসরেই এক পুরুষ ধরা হউক না কেন, আমাদের দেশে ২০ বৎসরে বা বড় জোর ২৫ বৎসরে এক পুরুষ ধরা উচিত। কিন্তু এই যুক্তিও আমাদের সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কেন মনে হয় না তাহা বলিতেছি। যতই বয়স বাড়ে ততই বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা কমিয়া আসে। এই জন্য বিভিন্ন বয়সের 'বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা' বিলাতে বা ভারতে কিরূপ তাহা নিম্নের কোষ্ঠায় দেখাইলাম। আর উভয়ের মধ্যে যে তফাৎ তাহা নিম্নে দেখান বাহুল্য ভয়ে কেবল মাত্র পুরুষদের 'বাঁচিয়া



থাকিবার সম্ভাবনা' বা Expectation of life দেখান হইল।

বয়স	০ বৎসর	১—	১০—	২০—	৩০—	৪০—	৫০—	৬০—	৭০
বিলাতে	৬০.১৩	৬৩.৩৮	৫৬.৪	৫৭.৩	৩৮.৫	২৯.৮	২১.৫	১৪.৫	৮.৬
ভারতে	২৬.৯১	৩৪.৬৮	৩৬.৪	২৯.৬	২৩.৬	১৮.৬	১৪.৩	১০.৩	৬.৪
পার্থক্য	৩৩.২২	২৮.৭	২০.০	১৭.৭	১৪.৯	১১.২	৭.২	৪.২	২.২

আমাদের দেশে অত্যধিক শিশু ও বালক মৃত্যুর কারণে 'বাঁচিবার সম্ভাবনা' বয়স বৃদ্ধির সহিত না কমিয়া ১০ বৎসর বয়স অবধি বাড়িয়া চলে। আর এই বাড়তিটিও সামান্য নহে, প্রায় ১০ বৎসর (৩৬.৪—২৬.৯=৯.৫ বৎসর)। তাহার পর অবশ্য স্বাভাবিক কারণে ক্রমশঃই ইহা কমিতে থাকে। আরও একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা উচিত। বিলাতের সহিত আমাদের দেশের লোকের 'বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা'র যে পার্থক্য আছে তাহা ক্রমশঃই বয়স বৃদ্ধির সহিত দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ বয়সে পার্থক্য অতি সামান্য।

আরও একটি কারণে 'বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা'কে বুনিয়াদ করিয়া কত বৎসরে এক পুরুষ হয় তাহা নির্দ্ধারণ করা উচিত নহে। বিলাতে 'বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা' কিরূপ দ্রুত বাড়িতেছে তাহা নিম্নের কোষ্ঠা হইতে বুঝা যাইবে। যথা :—

০ বৎসরে বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা (বৎসরে)

	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৩৬	বৃদ্ধি
পুরুষ	৪৩.৪	৪৩.২	৪৫.৯	৫১.৬	৫৫.৫	৫৮.৭	৬০.১	১৬.৭
স্ত্রী	৪৬.৬	৪৬.৭	৪৯.৮	৫৫.৪	৫৯.৫	৬২.৯	৬৪.৪	১৭.৮

আর ভারতে 'বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা' প্রথমে কয় বৎসর কমিয়াছিল, আবার এক্ষণে বাড়িয়া চলিতেছে। যথা—

০ বৎসরে বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা (বৎসরে)

	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
পুরুষ	২৫.৫৪	২৩.৯৬	২৩.৩১	×	২৬.৯১

১৯২১ সালের 'বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা' সরকারের Actuary মহোদয় কষিয়া বাহির করেন নাই, এজন্য উহা সহজে পাওয়া যায় না। দেখা যায় প্রথম ২০ বৎসরে 'বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা' ২.২৩ বৎসর কমিয়াছিল, শেষের ২০ বৎসরে উহা ৩.৬০ বৎসর বাড়িয়াছে। সমগ্র ৪০ বৎসর ধরিলে 'বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা' বাড়িয়াছে ১.৩৭ বৎসর। বিলাতে বাড়িল শতকরা ৩৯ ভাগ, আর ভারতে বাড়িল শতকরা ৫ ভাগ মাত্র।

আমাদের মনে হয় যে কত বৎসরে এক পুরুষ হয় এই প্রশ্নের উত্তরে ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্যের উপর নির্ভর করা উচিত। আর ঐতিহাসিক রাজারাজড়াদের জীবনের ঘটনাবলির অপেক্ষা সামাজিক তথ্য বেশী মূল্যবান, কারণ রাজা-বাদশাহদের জীবন বা বংশক্রম অনেকটা সাধারণ জীবন বা বংশ-ক্রম হইতে বিভিন্ন। অনেক সময় জ্যেষ্ঠানুক্রম বিধান থাকায় তাঁহাদের গড় সাধারণ গড় হইতে বিভিন্ন হওয়া সম্ভব। এইবার আমরা কয়েকটি রাজ-বংশের ও কয়েকটি সামাজিক তথ্য লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিব।

(১) নিম্নে আমরা ভারতের মুঘল বাদশাহদের বংশাবলী দিলাম। যথা :—

১। জহীর উদ্দীন বাবর (জন্ম ইং ১৪৮৩—মৃত্যু ইং ১৫৩০)
|
২। মহম্মদ হুমায়ুন
|
৩। জালালুদ্দীন মহম্মদ আকবর
|
৪। নূরুদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর
|
৫। শিহাব উদ্দীন মহম্মদ শাহজাহান
|
৬। মুহীউদ্দীন মহম্মদ ঔরঙ্গজীব আলমগীর
|
৭। মুয়াজ্জম শাহ আলম বাহাদুর শাহ
|
৮। মুইজউদ্দীন জাহান্দার শাহ
|

৯। আজিজুদ্দীন আলমগীর
|
১০। মির্জ্জা আবদুল্লা আলা গোহর, শাহ আলম
|
১১। আকবর শাহ (দ্বিতীয়)
|
১২। বাহাদুর শাহ (২য়)(জন্ম ইং ১৭৮৫*—মৃত্যুইং ১৮৬২)

বাবরের মৃত্যু (ইং ১৫৩০) হইতে দিল্লীর শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের মৃত্যু (ইং ১৮৬২) পর্য্যন্ত ১১ পুরুষে ৩৩২ বৎসরের পার্থক্য দেখিতে পাই। গড়ে প্রত্যেক পুরুষে ৩০·২ বৎসর দাঁড়ায়। আর যদি জন্ম সময় ধরিয়া হিসাব করি তাহা হইলে ১১ পুরুষে ৩২২ বৎসরের পার্থক্য পাই। গড়ে প্রত্যেক পুরুষে ২৯·৩ বৎসর হয়।

(২) মহারাষ্ট্রের পেশোয়াগণের বংশ-পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল। যথা :—

১। বালাজী বিশ্বনাথ (মৃত্যু :—ইং ১৭২০)
|
২। বাজীরাও (১ম)
|
৩। রঘুনাথ রাও বা রাঘব
|
৪। বাজীরাও (২য়) (মৃত্যু :—ইং ১৮৫৩)

ইঁহাদের ৩ পুরুষে ১৩৩ বৎসরের পার্থক্য, অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেক পুরুষে ৪৪·৩ বৎসর। এই তথ্যটি গ্রহণ করা খুব সমীচীন হইবে না, কারণ নানা কারণে পেশোয়াগণের দেশেও যে দীর্ঘজীবী রাজবংশ হইতে পারে তাহাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে আমরা পেশোয়া বংশের তথ্য দিলাম।

(৩) অপর পক্ষে অল্প-জীবী রাজ-বংশও আছে। নিম্নে আমরা দাক্ষিণাত্যের বাহমনী সুলতানদের বংশলতা দিলাম। যথা :—

১। আলাউদ্দীন বাহমনী (মৃত্যু :—ইং ১৩৫৮)
|
২। আহম্মদ খাঁ
|
৩। আহম্মদ
|
৪। আলাউদ্দীন আহম্মদ
|
৫। হুমাউন
|
৬। মুহম্মদ (৩য়)
|
৭। মাহমুদ
|
৮। আহম্মদ (মৃত্যু :—ইং ১৫২১)

৭ পুরুষে এই রাজ-বংশে ১৬৩ বৎসরের পার্থক্য দেখা যায়। অর্থাৎ গড়ে ইঁহাদের এক পুরুষে ২৩·৩ বৎসর।

(৪) এইবার আমরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বংশের তথ্যাদি লইয়া কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব। নিম্নে আমরা ঠাকুর বংশের তিনটি শাখার বংশলতা দিলাম। যথা :—

পঞ্চানন ঠাকুর
|
জয়রাম (মৃত্যু :—১৭৫৬ খৃঃ অঃ)

- নীলমণি (মৃত্যু :—১৭৯১)
  - রামমণি (মৃত্যু :—১৮৩৩)
    - 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ (মৃত্যু :—১৮৪৬)
      - মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (মৃত্যু :—১৯০৫)
        - রবীন্দ্রনাথ (মৃত্যু :—১৯৪১)
- দর্পনারায়ণ (মৃত্যু :—[illegible]৩)
  - গোপীমোহন (মৃঃ—১৮১৮)
    - হরকুমার (মৃঃ—১৮৫৮)
      - যতীন্দ্রমোহন (মৃঃ—১৯০৮)
        - প্রদ্যোৎকুমার (মৃঃ—১৯৪২)
  - মোহিনীমোহন (মৃঃ—১৮২০)
    - গোপাললাল (মৃঃ—১৮৬৯
      - কালীকৃষ্ণ (মৃঃ—১৯০৫)
        - শরদিন্দু (মৃঃ—১৮৯২)
          - প্রফুল্লনাথ (মৃঃ—১৯৩৮

প্রথম তিন চারি পুরুষ দীর্ঘজীবী ছিলেন। আমাদের

রবীন্দ্রনাথের নিজের শাখায় (৫ পুরুষে) গড়ে ৩৭·০ বৎসরে এক পুরুষ দাঁড়ায়। মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহনের

* বাহাদুর শাহের জন্ম সময় সম্বন্ধে আমার কিছু সন্দেহ আছে।

ধারায় (৫ পুরুষে) গড়ে ৩৫'২ বৎসরে এক পুরুষ হয়। আর রাজা প্রফুল্লনাথের ধারায় (৬ পুরুষে) গড়ে ৩০'৭ বৎসরে এক পুরুষ হয়। তিনটি ধারার গড় ধরিলে ৩৪'৩ বৎসরে এক পুরুষ হয়। একই বংশের দুইটি বিভিন্ন ধারায় কতিপয় পুরুষে গড়ের কিরূপ পার্থক্য হয় তাহা দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথের ধারায় গড় ৩৭'০ বৎসর; আর প্রফুল্লনাথের ধারায় গড় ৩০'৭ বৎসর—উভয় ধারার পার্থক্য ৬'৩ বৎসর। এই সকল তথ্যের জন্য শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

(৫) বিলাতের আমাদের সম্রাট্ বংশের পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে রাজা প্রথম জর্জ্জ ইংরাজী ১৬৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় জর্জ্জ রাজা হয়েন। দ্বিতীয় জর্জ্জের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স ফ্রেডারিক পিতার জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ফ্রেডারিকের জ্যেষ্ঠপুত্র তৃতীয় জর্জ্জ নাম ধারণ করিয়া রাজা হয়েন। তৃতীয় জর্জ্জের চতুর্থ পুত্র হইতেছেন কেণ্টের ডিউক এডওয়ার্ড। তিনি আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পিতা। মহারাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ড। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ অষ্টম এড্-ওয়ার্ড ইং ১৮৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ আমরা ৮ পুরুষে ২৩৪ বৎসরের তফাৎ দেখিতে পাইতেছি। গড়ে এই সম্রাট্ বংশের এক এক পুরুষে ২৯'২ বৎসর। যদি আমরা মৃত্যু ধরিয়া হিসাব করি তাহা হইলেও পার্থক্য বেশী হইবে না। প্রথম জর্জ্জ ইং ১৭২৭ খৃঃ অঃ মারা যান; আর সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ইং ১৯৩৬ খৃঃ অঃ মারা যান। এইরূপে ৭ পুরুষে মৃত্যুর ব্যবধান ২০৯ বৎসর; অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেক পুরুষে ২৯'৮ বৎসর।

(৫) ডেনমার্কের রাজবংশের বংশলতা নিম্নে দিলাম। যথা:—

১। ক্রিশ্চিয়ান ৯ম (জন্ম —ইং ১৮১৮)
|
২। ফ্রেডারিক ৮ম
|
৩। ক্রিশ্চিয়ান ১০ম
|
৪। ক্রাউন প্রিন্স
|
৫। রাজকুমারী—(জন্ম :—ইং ১৯৪০)

চারি পুরুষে ডেনমার্কের রাজবংশের ১২২ বৎসর পার্থক্য। অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষে ইহাদের ৩০'৫ বৎসরের পার্থক্য।

(৬) এই বার আমরা আমাদের নিজস্ব বাংলার কতকগুলি সামাজিক তথ্যের আলোচনা করিব। এই সকল সামাজিক তথ্য বহু বংশের ও বহু ব্যক্তির নিজস্ব তথ্যের সমষ্টির ফল—সুতরাং দুই-একটি রাজবংশের তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া যে সিদ্ধান্ত করা যায় তাহা অপেক্ষা এইরূপ তথ্যের উপর নির্ভরশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ও যুক্তিযুক্ত।

দক্ষিণ রাঢ়ী কুলীন কায়স্থগণের মধ্যে "পর্য্যায়" প্রচলিত আছে। বর্ত্তমানে আমরা সাধারণতঃ ২৬শ হইতে ২৯শ পর্য্যায় দেখিতে পাই। ২৪ পর্য্যায়ের অতি-বৃদ্ধ লোকও দেখিতে পাওয়া যায় ও দেখিয়াছি; অপর দিকে ৩০ পর্য্যায়ের যুবক দেখিয়াছি; এমন কি ৩১ পর্য্যায়ের শিশুর কথা অবধি শুনিয়াছি। আমরা এই অতি-বৃদ্ধ বা অতি-শিশু "পর্য্যায়ে"র কথা বাদ দিয়া ২৬শ হইতে ২৯শ পর্য্যায় ধরিয়া আলোচনা করিব। যে সময় হইতে কুলীন কায়স্থ-গণের মধ্যে "পর্য্যায়" রাখা প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সময় হইতে ধরিয়া কোন কোন বংশে ২৫ পুরুষ অতিক্রান্ত হইয়াছে; আবার কোন কোন বংশে ২৮ পুরুষ অতিক্রান্ত হইয়াছে। সুতরাং এক হিসাবে আজ হইতে এই প্রথা ২৮×২৫=৭০০ বৎসর (এক এক পুরুষে আমরা বাঙ্গালীরা অল্প-জীবী বলিয়া ২৫ বৎসর ধরিলাম) পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে; তাহার পরে যে হয় নাই একথা খানিকটা জোরের সঙ্গে বলা চলে। অপর পক্ষে এই প্রথা ২৫×৩৩=৮২৫ বৎসরের (যদি আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষরা দীর্ঘজীবী ছিলেন এই অজুহাতে ৩৩ বৎসরে এক এক পুরুষ ধরি) আগে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এই দুইয়ের গড় ৭৬২'৫ বৎসর; আর পর্য্যায়ের গড় (২৮+২৫) /২=২৬'৫ পর্য্যায়ের গড় দিয়া ৭৬২'৫ বৎসরকে ভাগ দিয়া আমরা পাই ২৮'৮ বৎসর। এই হিসাবে আমরা ২৮'৮ বৎসরে এক পুরুষ ধরিতে পারি। দক্ষিণ রাঢ়ী কুলীন কায়স্থরা সংখ্যায় অন্ততঃ পক্ষে কতিপয় সহস্র, সুতরাং তাঁহাদের "পর্য্যায়"-তত্ত্ব হইতে সংগৃহীত তথ্য নির্ভরযোগ্য বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

আমাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত যে অসঙ্গত নহে, তাহা নিম্নের বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যাইবে। দক্ষিণ রাঢ়ী বসু বংশের পুরন্দর খাঁ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি বাংলার সুলতান হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ১৩শ পর্য্যায়ের লোক। বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক তাঁহার "বংশ-গৌরব" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে "প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে

মনে হয় যে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২০ খৃষ্টাব্দ তাঁহার (অর্থাৎ পুরন্দর খাঁর) অভ্যুদয়ের সময়।" (৮৮ পৃ. দেখ)। বর্ত্তমানে তাঁহার বংশের ২৮শ ও ২৯শ পর্য্যায় চলিতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ৩০শ পর্য্যায় পর্য্যন্ত নামিয়াছে। আমরা যদি ২৯শ পর্য্যায়কে তাঁহার বংশের বর্ত্তমান (ইং ১৯৪২) পর্য্যায় ধরি ত খুব একটা অন্যায় করিব না। এই হিসাবে পুরন্দর খাঁ (২৯ – ১৩) × ২৮·৮ = ৪৬১ বৎসর আগেকার লোক; অর্থাৎ তিনি ইং ১৪৮১ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। পুরন্দর খাঁ ঠিক্ ঐ সময়েই (১৪০২ শকাব্দে বা ইং ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে) কুলীনগণের একজাই বা সমীকরণ করিয়া গোষ্ঠীপতি হয়েন।

(৭) ইং ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে পুরন্দর খাঁ ১৩শ পর্য্যায়ের একজাই বা সমীকরণ করেন। সমীকরণ বা একজাই সভায় সমগ্র মুখ্যাদি নব-শ্রেণীর কুলীন এবং সিদ্ধ মৌলিকগণ একত্র হইয়া প্রকাশ্য সভার আহ্বানকারীকে মাল্য-চন্দনে ভূষিত ও গোষ্ঠীপতিপদে সম্মানিত করিত এবং সমবেত সভ্যগণ সকলেই অঙ্গীকার করিত যে সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে একজাইকারী গোষ্ঠীপতিকে সর্ব্বাগ্রে মাল্য-চন্দন দিবে। ২২শ পর্য্যায়ে শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ২৪শে মাঘ ১৭০৩ শকাব্দে (ইং ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে) একজাই করিয়া গোষ্ঠীপতি হইলেন। ২৩শ পর্য্যায়ে মহারাজা নবকৃষ্ণের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাংলা সন ১২১৯ সালের ১৪ই শ্রাবণ (ইং ১৮১২) একজাই করেন। ২৪ পর্য্যায়ের একজাই তিনজন কায়স্থ সন্তান আহ্বান করেন। মহারাজা নবকৃষ্ণের দুই পৌত্র রাজা শিবকৃষ্ণ দেব ও রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ১৭৬৬ শকের ১২ই মাঘ (ইং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে) একজাই করেন; এবং ঐ বৎসরেই ইহার কতিপয় দিবস বাদে ১৭ই মাঘ তারিখে কলিকাতা সিমুলিয়া নিবাসী রামদুলাল সরকারের দুই পুত্র সুবিখ্যাত "ছাতু" বাবু ও "লাটু" বাবু একজাই করেন। পুনরায় ১৭৭৬ শকের ৮ই বৈশাখ (ইং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে) রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ২৪শ পর্য্যায়ের একজাই করেন। ২৫শ পর্য্যায়ের একজাই বাংলা ১২৮৬ সালের ২৬শে মাঘ (ইং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে) "লাটু" বাবুর পুত্র অনাথনাথ দেব করেন। এমতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ২৫ – ১৩ = ১২ পুরুষে ১৮৮০ – ১৪৮০ = ৪০০ বৎসর হইতেছে; অর্থাৎ এক এক পুরুষে ৩৩·৩ বৎসর। তারিখওয়ারী একজাইয়ের হিসাব ধরিলেও ৩ পুরুষে ১৮৮০ – ১৭৮১ = ৯৯ বৎসর হয়; অর্থাৎ এক এক পুরুষে ৩৩·০ বৎসর।

(৮) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি 'ছাত্র-মঙ্গল-সমিতি' (Students' Welfare Committee) আছে। তাঁহারা ছাত্রদের সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রথম পুত্র-জন্মের সময় পিতার বয়স কত ছিল এই সম্বন্ধে তাঁহারা তথ্য সংগ্রহ করেন। দেখা যায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে গড়ে প্রথম পুত্রের জন্মের সময় পিতার বয়স ছিল ২৭·২±০·২ বৎসর। অর্থাৎ গড় বয়স ২৭·২ বৎসর, ইহার মধ্যে ০·২ বৎসর বেশীও হইতে পারে, ০·২ বৎসর কমও হইতে পারে। প্রায় ৪০৩টি বংশের হিসাব হইতে উপরোক্ত তথ্যটি সংগৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু তাহা বলিয়া ২৭·২ বৎসরে এক পুরুষ ধরা ঠিক্ হইবে না।. কারণ প্রথম সন্তান পুরুষ হইতে পারে; স্ত্রীও হইতে পারে। কর্ত্তৃপক্ষেরা যখন প্রথম পুত্র-জন্মের সময় পিতার বয়সের খবর লইতেছিলেন, তখন যে-যে ক্ষেত্রে প্রথম সন্তান 'পুত্র' সেই সেই ক্ষেত্রে উপযুক্ত তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু যে-যে ক্ষেত্রে প্রথম সন্তান 'কন্যা' সেই সেই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সন্তান 'পুত্র' হইলে সেই সময়ে তাহার পিতার বয়স কত তাহার হিসাব ধরা হইতেছে। মোটামুটি হিসাবে, অর্দ্ধেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত তথ্য ধরা হইয়াছে: আর অর্দ্ধেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সন্তান-জন্মের সময় পিতার যে বয়স তাহা ধরা হইয়াছে। সুতরাং উপরে প্রাপ্ত গড় ২৭·২ বৎসরে প্রথম সন্তান জন্মের পর হইতে দ্বিতীয় সন্তান জন্মের ব্যবধানের অর্দ্ধেক, অর্থাৎ যাহাকে আমাদের মেয়েলী কথায় "আন্‌জা" বলে তাহার অর্দ্ধেক যোগ দিতে হইবে। "আন্‌জা" খুব কম করিয়া ধরিলেও অন্ততঃপক্ষে ২ বৎসর। তাহা হইলে আমাদের যুক্তি অনুসারে এক পুরুষ হয় ২৭·২ + ১ = ২৮·২ বৎসরে।

(৯) ইংরেজী ১৯৩৬ সালের মার্চ্চ মাসে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কলিকাতাস্থ মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে পিতার কত বয়সে প্রথম সন্তান জন্মিয়াছে সেই সম্বন্ধে একটি তদন্ত করান। ৪২০টি বংশের মধ্যে তদন্তের ফলে জানা যায় যে গড়ে পিতার ২৬·৭±০·২ বৎসরে প্রথম সন্তান জন্মিয়াছে। সুতরাং এই হিসাবের বলে গড়ে ২৬·৭ বৎসরে এক পুরুষ হয় বলা যাইতে পারে।

(১০) আমাদের দেশে গড়ে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নের কোষ্ঠা অনুযায়ী সন্তান জন্মগ্রহণ করে ও বাঁচিয়া থাকে। যথা :—

গড়ে যতগুলি সন্তান (পুত্র ও কন্যা)

জাতি	জন্মিয়াছে	বাঁচিয়া আছে
ব্রাহ্মণ	৬·৩	৪·৬
কায়স্থ	৬·১	৪·৩
বৈদ্য	৭·৭	৫·৭
অপরাপর হিন্দু	৫·৮	৩·৭
মুসলমান	৬·১	৩·৮
অপরাপর সম্প্রদায়	৬·০	৪·১
গড়ে	৬·০	৪·০

কত বৎসরে এক পুরুষ ধরিব এই প্রশ্নের যথাযথ ও সম্পূর্ণ উত্তর দিতে হইলে কেবলমাত্র কোন্ বয়সে প্রথম পুত্র বা প্রথম সন্তান হইয়াছে বা রাজা-বাদশাহদের মধ্যে বিশেষ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের বা যিনি সিংহাসন আরোহণ করিয়াছেন তাঁহাদের বয়সের পার্থক্য ধরিলেই চলিবে না। শেষ সন্তান গড়ে কত বৎসর বয়সে হইয়াছে—তাহাও ধরিতে হইবে। উপরি উদ্ধৃত তালিকা হইতে আমরা জানিতে পারি যে গড়ে ৬·০টি করিয়া সন্তান জন্মায়।

এক্ষণে সন্তান জন্মের মধ্যে গড় ব্যবধান কত বা মেয়েলী ভাষায় যাহাকে "আন্‌জা" বলে তাহার গড় কত তাহা বাহির করিতে হইবে। নিম্নের তালিকায় সন্তান-জন্মের মধ্যে কিরূপ সময়ের পার্থক্য থাকে তাহা দেখান হইল। যথা :—

দেখা যায় ২-৩ বৎসরের "আন্‌জা" শতকরা ৬৯টি ক্ষেত্রে। সুতরাং "আন্‌জা" ২॥ বৎসর মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আরও একটু সূক্ষ্মভাবে হিসাব করিলে গড় "আন্‌জা"র পরিমাণ নিম্নলিখিত মত পাই। যথা :—

$$\text{গড় "আন্‌জা"} = \frac{১/২ \times ৬ + ২॥ \times ৬৯ + ৪ \times ২৫}{১০০} = ২·৭৫ \text{ বৎসর}$$

প্রথম সন্তান জন্ম হইতে শেষ সন্তান জন্মের গড় ব্যবধান তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে ৬·০ × ২·৭৫ = ১৬·৫ বৎসর। যে বয়সে প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহাতে যদি উক্ত ব্যবধানের অর্দ্ধেক, অর্থাৎ ৮·২ বৎসর যোগ দিই তাহা হইলেই আমরা এক পুরুষের নিট তফাৎ হিসাব করিতে পারি।

প্রথম সন্তান জন্মের সময় পিতার বয়স এক হিসাবে ২৮·২ বৎসর, আর এক হিসাবে ২৬·৭ বৎসর। এই দুই হিসাবের গড় ধরিলে প্রথম সন্তান জন্মের সময় পিতার বয়স হয় ২৭·৫ বৎসর। এই ২৭·৫ বৎসরে যদি আমরা ৮·২ বৎসর যোগ দিই, তাহা হইলে আমরা পাই এক পুরুষে ৩৫·৭ বৎসর। আমাদের মনে হয় এই শেষোক্ত হিসাবটিই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত ও প্রামাণ্য। অবশ্য প্রথম সন্তান জন্মের বয়স ২৭·৫ বৎসর সমগ্র বাঙ্গালী জাতির হিসাবে কিছু বেশী বলিয়া মনে হয়। বিশেষ করিয়া

শতকরা হিসাবে

বিবাহের সময় মায়ের বয়স	১ম ও ২য় সন্তান জন্মের মধ্যে ব্যবধান (বৎসর হিসাবে)			২য় ও ৩য় সন্তান জন্মের মধ্যে ব্যবধান (বৎসর হিসাবে)			৩য় ও ৪র্থ সন্তান জন্মের মধ্যে ব্যবধান (বৎসর হিসাবে)		
বৎসরে	০-১	২-৩	৪এর উর্দ্ধে	০-১	২-৩	৪এর উর্দ্ধে	০-১	২-৩	৪এর উর্দ্ধে
০-১৩	৫	৬৯	২৬	৭	৬৬	২৭	৯	৬৬	২৫
১৪-১৬	৫	৬৬	২৯	৫	৬৮	২৭	৬	৬৬	২৮
১৭-২৩	৭	৬৮	২৫	৬	৭৩	২১	৮	৭১	২১
২৪-২৬	৮	৭০	২২	৮	৭০	২২	...	৭৯	২১
গড় সর্ব্ব বয়স	৬	৬৮	২৫	৬	৬৯	২৪	৬	৭০	২৪

উপরোক্ত গড়গুলিকে যদি আমরা নিম্নের মতন করিয়া সাজাই ও 'গড়ের' গড় বাহির করি, তাহা হইলে পর পর সন্তান জন্মের মধ্যে কত ব্যবধান বা "আন্‌জা" কয় বৎসরে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব পাই।

সন্তান জন্মের মধ্যে ব্যবধান	১ম ও ২য় সন্তান	২য় ও ৩য় সন্তান	৩য় ও ৪র্থ সন্তান	সর্ব্ব গড় (শতকরা হিঃ)
০-১ বৎসর	৬	৬	৬	৬
২-৩ "	৬৮	৬৯	৭০	৬৯
৪এর উর্দ্ধে	২৫	২৪	২৪	২৫

যখন পুরুষের বিবাহের বয়স গড় হিসাবে ২০·৭ বৎসরে দাঁড়ায়।

সে যাহাই হউক, কোন একটি বিশিষ্ট তথ্যের উপর বা কোন একটি বিশিষ্ট যুক্তির উপর বিশেষ জোর না দিয়া আমরা যদি সকল তথ্য বা সকল যুক্তিই সমান দরের ধরিয়া লই ত বিশেষ অন্যায় হইবে না। এক্ষণে সমস্ত তথ্যগুলিকে যদি নিম্নের মতন সাজাই তাহা হইলে আমরা পাই যে এক পুরুষ গড়ে ৩১·৫ বৎসরে। এক শত বৎসরে তিন পুরুষ ধরা যাইতে পারে।

			এক পুরুষ	
(১)	মুঘল বাদশাহ	—	৩০·২	বৎসরে
(২)	পেশোয়া	—	৪৪·৩	,,
(৩)	বাহ্মনী সুলতান	—	২৩·৩	,,
(৪)	ঠাকুর বংশ	—	৩৪·৯	,,
(৫)	কুলীন পর্য্যায়	—	২৮·৮	,,
(৬)	একজাই	—	৩৩·৩	,,
(৭)	"ছাত্র-মঙ্গল সমিতি"	—	২৮·২	,,
(৮)	মহলানবিশ	—	২৬·৭	,,
(৯)	গড়পড়তা প্রথম ও শেষ সন্তান জন্মের সময় বয়স		৩৫·৭	,,
	সর্ব্ব গড়		৩১·৫	বৎসর

এ বিষয়ে আমাদের বিলাতের সহিত বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই।

সর্ব্বশেষে একটা কথা বলিয়া রাখি। অনেক সময় উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা হেতু গড়ে কত বৎসরে এক পুরুষ হয় তাহার হিসাব আলাহিদা ভাবে ধরা হয়। যেমন ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনা কালে রাজা-রাজড়াদের বংশাবলী হইতে সংগৃহীত তথ্যের গড় ধরা উচিত। সকল রাজবংশের মধ্যেই জ্যেষ্ঠানুক্রম বিধান প্রচলিত আছে। সুতরাং তাঁহাদের বেলায় পিতার কত বয়সে প্রথম পুত্র সন্তান হইয়াছে এই হিসাবে যে গড় পাওয়া যায় তাহাই প্রযোজ্য। সম্ভবতঃ এই কারণে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় তাঁহার "পুরান-প্রবেশে" পিতার কত বয়সে প্রথম সন্তান হইয়াছে ইহার গড় তাঁহার যুক্তির সাহায্য কল্পে নিয়োজিত করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে বিশেষ করিয়া যখন আমরা কেবল মাত্র সামাজিক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করি, তখন আমাদের উপরে প্রাপ্ত 'সর্ব্ব গড়' ব্যবহার করা উচিত।

পরিশিষ্ট। লেখাটি সমাপ্ত হইবার পর বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৪৮শ ভাগের ১১৮ পৃষ্ঠায় "কৃত্তিবাসের কুলকথা ও কালনির্ণয়" প্রবন্ধে শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, "এক পুরুষে কত বৎসর?" সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমরা নিম্নে দীনেশবাবুর সমস্ত মন্তব্যটি দিলাম। দীনেশবাবু ন্যূন কল্পের পরমসীমা ১ পুরুষে ৩০ বৎসর; আর অধিক কল্পের পরমসীমা ৪০ বৎসর হয় দেখাইয়া এক পুরুষে গড়পড়তা ৩৫ বৎসর ধরিয়াছেন। ইহা আমাদের (৯) দফার সিদ্ধান্তের সহিত মিলিয়া যাইতেছে।

এক পুরুষে কত বৎসর ?

"কৃত্তিবাসের জন্মকাল নির্ণয়ের সাহায্যকল্পে মধ্যযুগের রাঢ়ীয় কুলীন-সমাজে কত বৎসরে এক পুরুষ হইত, তাহার গড়পড়তা অবধারণ করা কর্ত্তব্য। আধুনিক যুগের মেলী কুলীনদের অবস্থা দৃষ্টে তাহা গণনা করিলে অত্যন্ত ভুল হইবে। মিশ্র গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক সূত্র ছড়াইয়া আছে, যাহা ধরিয়া গণনা করা সম্ভব। আমরা দুই-একটি দৃঢ় সূত্র ধরিয়া গণনা করিতেছি। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীর রচনাকাল ১৫০০ হইতে ১৫২৫ সনের মধ্যে সুনিশ্চিত। শেষ ১৫টি সমীকরণে (১০৩ হইতে ১১৭) যে সকল কুলীন সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রথম কুলীন হইতে ১০ম পুরুষ অধস্তন—কেবলমাত্র দুইটি বংশে (খড়দহ মুখ ও ধনো চট্ট) ৯ম পুরুষ দেখা যায় (১০৫ সমীকরণ দ্রষ্টব্য)। পক্ষান্তরে, সমগ্র মিশ্র গ্রন্থে একটি মাত্র বংশে (ঘোষাল) ১১শ পুরুষ পাওয়া যায়। ১১৩ সমীকরণে ঘোষাল ভ্রাতৃ-পঞ্চক সম্মানিত হইয়াছেন (পৃষ্ঠা ১৩৮-৩৯); ইঁহাদের কারিকায় ইঁহাদের পুত্রদের নামোল্লেখ আছে। তাঁহারা ১২শ পুরুষ হইতেছেন এবং তন্মধ্যে ৩ জনকে 'কর্ম্মকুণ্ঠ' বলা হইয়াছে অর্থাৎ এই তিন জন কুলক্রিয়া-সমর্থ বয়সে বিদ্যমান ছিলেন। শেষ ১১৭ সমীকরণের কাল ১৫০০ সনের পূর্ব্বে কিছুতেই নহে, আর ১১৩ সমীকরণ দশ বৎসর পূর্ব্বে হইয়া থাকিলেও ১৪৯০ সনের পূর্ব্বে কিছুতেই হয় না। ১২শ পুরুষ ভ্রাতৃত্রয়ের বয়স তৎকালে ৩৫ ধরিলে তাঁহাদের জন্ম হয় ১৪৫৫ সনে: প্রথম কুলীন শিরো ঘোষালের জন্ম ১১২৫ সনের পরে নহে। গণনা দ্বারা ১ পুরুষে ঠিক ৩০ বৎসর হয়, ইহাই ন্যূনকল্পের পরমসীমা। মিশ্র গ্রন্থের বহু সংখ্যক বংশধারার মধ্যে এই একটি মাত্র বংশে কমাইবার চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াও এক পুরুষে ৩০ বৎসরের কম হয় না, যুক্তিযুক্ত গণনায় ৩২ বৎসর হইবে। শেষ সমীকরণের ১০ম পুরুষীয় কুলীনদের ধারায় গণনা দ্বারা এক পুরুষে ৩৫-৩৭ বৎসর পাওয়া যাইবে। ১০৫ সমীকরণস্থ ৯ম পুরুষীয় কুলীনের ধারায় বেশী পক্ষে চূড়ান্ত গণনায় এক পুরুষে ৪০ বৎসর হয়। ইহাই অধিক কল্পে পরমসীমা ধরিয়া মিশ্র গ্রন্থের ১০—১২ পুরুষ ব্যাপী গণনার ফলে এক পুরুষে গড়পড়তা দাঁড়াইল ৩৫ বৎসর অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ন্যূন ৩ পুরুষে এক শতাব্দী। আমরা বাহুল্য ভয়ে অন্য গণনা পরিত্যাগ করিলাম।"

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের পাঠান বংশীয় রাজনগরের রাজা বা ফৌজদার বংশের নিম্নলিখিত বংশ-তালিকাটি সংগ্রহ করিয়া

দিয়াছেন। এই পাঠান বংশ প্রথমে রাজশক্তি পরিচালনা করিতেন, পরে জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল। বংশে জ্যেষ্ঠানুক্রম বিধান থাকা সত্ত্বেও এই বংশ-তালিকায় অনেক স্থলে কনিষ্ঠ সন্তান ধরিয়া তালিকা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে।

পার্থক্য। অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেক পুরুষে ৩৮'৫ বৎসর হইতেছে। কিন্তু সামস খাঁর মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে—এ জন্য সামস খাঁকে বাদ দিয়া আমরা ৮ পুরুষে জোনেদ খাঁর মৃত্যু হইতে মহম্মদ জহরউল জমা খাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত ২৮৫ বৎসরের পার্থক্য। অর্থাৎ

বীরভূম রাজনগরের রাজা বা ফৌজদার বংশ।

১। সামস খাঁ (মৃত্যু—১৫৩৮ খৃঃ অঃ)
|
২। জোনেদ খাঁ (মৃত্যু—১৬০০ খৃঃ অঃ)
|
৩। রণমস্ত খাঁ (মৃত্যু—১৬৫৯ খৃঃ অঃ)
|
৪। দেওয়ান খাজা কামাল খাঁ বাহাদুর (মৃত্যু—১৬৯৭ খৃঃ অঃ)
|
৫। আসাদউল্লা খাঁ (মৃত্যু—১৭১৮ খৃঃ অঃ)
|
৬। দেওয়ান বাদীউলজমা খাঁ (মৃত্যু—১৭৫২ খৃঃ অঃ)
|
৭। বাহাদুর উলজমা খাঁ (মৃত্যু—১৭৮৯ খৃঃ অঃ)
|
৮। মহম্মদ উলজমা খাঁ (মৃত্যু—১৮০১ খৃঃ অঃ)
|
৯। মহম্মদ দাওয়াউল জমা খাঁ (মৃত্যু—১৮৫৫ খৃঃ অঃ)
|
১০। মহম্মদ জহরউল জমা খাঁ (মৃত্যু—১৮৮৫ খৃঃ অঃ)

দেখা যায় এই পাঠান-বংশে ৯ পুরুষে সামস খাঁর মৃত্যু হইতে মহম্মদ জহরউল জমা খাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত ৩৪৭ বৎসরের গড়ে প্রত্যেক পুরুষে ৩৫'৬বৎসর হইতেছে। এই গড় আমাদের (৯) দফার সিদ্ধান্তের সহিত মিলিয়া যাইতেছে।

তুমি আমি

শ্রীকমলরাণী মিত্র

তোমার বিশ্ব-বীণার গানগুলি
মোর মর্ম্ম-বীণার সুরে ধরি'
আমার মনের রঙে রঙে
রঙীন ক'রে সৃজন করি!
সে-গান তোমার ছড়িয়ে আছে
আকাশ-ভরা তারায় তারায়,
ছড়িয়ে আছে দিগন্তরের
দূর-সীমানা যেথায় হারায়,

ছড়িয়ে আছে তৃণে-তৃণে
ফুলে-ফুলে ভুবন ভরি।
আমার মনের মধু হ'লে তবেই তা'রা মধুর হবে
অ-রূপ এসে মহান্ হবে রূপের লীলা-মহোৎসবে!
আমার সুরের রসে প্রিয়
হবে অনির্বচনীয়;—
তোমার আলোয় আমার ছায়ায়
বৃন্দাবনের মাধুকরী।

ডুরে শাড়ী

শ্রীঅমিয়কুমার সেন

বস্তীর এক দরিদ্র সংসারের স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাত্রার ছোট একটি অধ্যায়।

দুপুরের বেলা গড়াইয়া পাঁচটা বাজিতেই মণিয়া সত্যই চঞ্চল হইয়া ওঠে। আর আধ ঘণ্টা পরেই ত সে যাইবে মান্‌কীর বাড়ীতে। সেখান হইতে সে, মান্‌কী, দুলিয়া সবাই যাইবে সার্কাস দেখিতে। ছয়টায় সার্কাস আরম্ভ, অথচ এখনও মণরু আসিল না। দেখ ত কি কাণ্ড!

হঠাৎ একটা কথা ভাবিয়া মণিয়া শিহরিয়া ওঠে—মণরু যদি ডুরে শাড়ী না আনে, ঐ দুই টাকা দিয়া যদি নেশা-ভাঙ করিয়া আসে? দূর, তা করিবে কেনে। মণরু ত জানেই তার কত সখের কানপাশা মান্‌কীর কাছে বন্ধক রাখিয়া সে ঐ দুই টাকা আনিয়াছে।

মণরুই ত বলিয়াছিল, উরা যাবে ডুরে শাড়ী পরে, তুর যে একখানাও ভাল কাপড় নেই মণিয়া!

কথাটা যে মণিয়াও ভাবিয়া দেখে নাই তা নয়। সে যে ভাল একখানা কাপড় পরিয়া না গেলে মান্‌কীরা তাকে ঠাট্টা করিবে, মণরুর মুখ ছোট হইবে তা সে জানে। তাই ত সে কানপাশা দুইটি নিয়া ছুটিয়া গিয়া টাকা দুইটি আনিয়া মণরুর হাতে দিয়া বলিয়াছিল, এই নে ছুট্‌টে ধা, যাবি আর আস্‌বি, একখানা ভাল ডুরে শাড়ী দোকান থেকে আনবি—বুঝলি?

মণরুই ত বলিয়াছিল, এই যাব আর আসব। চারটে নাগাদ তুকে শাড়ী এনে দেবই দেব। কিন্তু ছয়টা বাজার আর দেরিই বা কি? মণরুর জ্ঞান-গম্যি কিছুই নাই। দেখ ত কখন সে আসিবে, কখন মণিয়া শাড়ী পরিবে, কখনই বা যাইবে সার্কাস দেখিতে! সব মাটি হইয়া যাইবে, মান্‌কীরা কি আর ওর জন্য দাঁড়াইবে—কখ্‌খোনো না।

হঠাৎ বাহিরের ঝাঁপের দরজাটা ক্যাঁচ করিয়া সশব্দে খুলিয়া যাইতেই শুধু হাতে মণরুকে আসিতে দেখিয়া মণিয়ার বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠে—ওর হাতে ডুরে শাড়ী কই?

মণিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে—কি ডুরে শাড়ী আনিস্ নি মণরু? বলিয়াই অকস্মাৎ মণরুর মুখের পানে ভাল করিয়া চাহিতেই রাগে, ক্ষোভে, ঘৃণায় একেবারে স্তব্ধ হইয়া যায়। মণরুর পা টলিতেছে, চোখ দুটি জবা ফুলের মতন লাল, তাহারই আভা যেন সারা মুখখানায়। কিন্তু সে স্তব্ধতা মণিয়ার মুহূর্ত্ত মাত্র। তার পরই আবার চীৎকার করিয়া ওঠে—আমার শাড়ী কই মণরু? বল্—বল্—ছুটিয়া গিয়া মণরুর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাতে বার বার ঝাঁকানি দেয়।

আরে শুন্—শুন্ সব বলি শুন্—চল্ আগে রোয়াকে বসি, বলিয়া মণিয়াকে টানিতে টানিতে বারান্দায় উঠিয়া ভাঙা একটা চৌকির একধারে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। তার পর মণিয়াকে কাছে টানিয়া, তার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—কি হ'ল জানিস্ মণিয়া, ওই সুখনটাই আমার সর্ব্বনাশ করলো। বলে যে গিরিধারীর দোকানে আজ মদটা ভাল এনেছে—বাবুরা খায়, একেবারে টাট্‌কা চীজ্। এমন, যে বাবুরা বোতল নিয়ে বসলে এক চুমুকেই নাকি বোতল ফুক্কা হয়ে যায়, তাই শুনে একটু লোভ হ'ল—খেতে খেতে ঐ দুই টাকাই শেষ করে ফেলে দিলাম—ভাবলাম সার্কাস ত সাত দিনের মত তাঁবু গেড়েছে। আমিই ত তুকে নিয়ে এক দিন যাব—সে দিন ডুরে শাড়ী—

মণরুর কথা শুনিয়া মণিয়া অকস্মাৎ তীরবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, তার পরই ঘরে ঢুকিয়া সজোরে দরজাটা বন্ধ করিয়া, তাহাতে আগড় দিয়া মণরুর শেষ কথাটি টানিয়া লইয়া অভিমান-বিকৃত কণ্ঠে বলিয়া ওঠে—ডুরে শাড়ী—চাই না ডুরে শাড়ী—সুখনই তুর বড় হ'ল, আমি তুর কে?

মণরু উঠিয়া দরজার কাছে আসিয়া বলে—রাগ করিস্ নি মণিয়া-লক্ষ্মী—দোরটা খুলে দে—

—কেনে—যা সুখনের বাড়ী—ঐখানে পড়ে থাক্‌গে—সেই ত তুর পেয়ারে।

—তুই সত্যি রাগ করলি মণিয়া? রাগ করিস্ নি দোরটা খুল—মণরুর কণ্ঠে কাতরতা ফুটিয়া ওঠে।

—না কিছুতেই না—দে আমার টাকা—দিবি এখন, তবেই দোর খুলব—না দিবি, না—মণিয়ার অভিমানজড়িত কণ্ঠে এবার রাগের উষ্ণতা ফুটিয়া ওঠে।

—দূর, টাকা কুথায় রে—টাকা ত গিরিধারীকে দিয়ে এলাম।

মণরুর কথায় মণিয়া রাগে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া ঘরের মাঝ হইতে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া ভেংচি কাটিয়া বলে--টাকা ত গিরিধারীকে দিয়ে এলাম আর ঢক্ ঢক্ করে তুর টাকায় মদ গিলে এলাম—ছিঃ ছিঃ, সরম হয় না তুর, বৌর টাকায় নেশাভাঙ্ করতে ?

—কি যে বলিস্ মণিয়া, তুই কি পর—তুর টাকাও ত আমার, শান্তকণ্ঠে মণরু জবাব দেয়।

মণরুর কথায় মণিয়া ক্রমেই আগুন হইয়া ওঠে এবং তপ্তকণ্ঠে বলে—কেনে পর নয় ত কি ? তুর আপন ত সুখন, তুকে আদর করে মদ খাওয়ালে, আর তুই মনের আনন্দে ভুলে গেলি আমার ডুরে শাড়ী—ফুর্ত্তি ক'রে টাকা দুটো মদের বোতলে ঢাললি—বাঃ।

মণিয়া যেভাবে এই কথাগুলি বলিয়া গেল, মণরুর তাহা ভাল লাগিল না, তাই সে একটু রাগিয়া বলিল--দেখ্ মণিয়া, তুই আমার ঘরের লোক--তুর সঙ্গে সুখনের তুলনা দিস্ না--ভাল শোনায় না।

—এ ভাল শোনায় না তবে কি বৌর টাকায় মদ গিলেছিস্ বললে ভাল শোনাবে ?

—না তাও না, মদ খেয়েছি—খেয়েছি, তুর টাকা আমি কাল দিয়ে দেব--দরজা খুলে আমার মেরজাইটা দে, মিলে যাবার সময় হ'ল। গম্ভীর কণ্ঠে মণরু কথাগুলি বলে।

—না কাল নয়--এখনই দে।

—এখন কুথায় পাব ? বিরক্ত হইয়া মণরু জবাব দেয়। এনে দিতে পারি। কিন্তু মিলে যাওয়ার সময় হয়েছে—শীগ্‌গির মেরজাইটা দে না !

—তুর ত মিলে যাওয়ার সময় হ'ল, আর আমার সময়টা যে মদ গিলে মাটি করলি। মণিয়া রাগের ধমকেই কথা বলে।

একে ত মিলের ডিউটির সময় হইয়া আসিতেছে, তার পর এই সব গণ্ডগোল, নেশার ঝোঁকে মণরুর মেজাজটা হঠাৎ চড়িয়া গেল, সেও মণিয়ার কথার উপর সমান তালে জবাব দিল—দেব না তুর টাকা, দরজা খুল বলছি।

—ইস্ বিষ নেই তার কুলপানা চক্কোর, খুলব না দরজা, দে আগে টাকা। রাগে আগুন হইয়া চীৎকার করিয়া ওঠে মণিয়া।

—মুখ সামলে কথা বলিস্, ভাল চাস্ ত দরজা খুল মণিয়া। মণরু চীৎকার করিয়া সশব্দে জীর্ণ দরজায় আঘাত করে।

—না কিছুতেই না। মণিয়ার কণ্ঠে সুস্পষ্ট জিদ প্রকাশ পায়।

এবার সত্য সত্যই মণরুর মেজাজ অসম্ভব চড়িয়া যায়। বার বার দরজা না খোলার উল্লেখে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, মদের নেশাও তখন সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে; রাগে, অপমানে চোখ-মুখের চেহারাও ভীষণ হইয়া উঠিল, সে সশব্দে দরজা ভাঙিয়া দিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, তার পরই মণিয়ার পিঠে কয়েক ঘা সজোরে বসাইয়া দিয়া দড়ি হইতে মেরজাইটা টানিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইয়া বারান্দায় আসিতেই মণিয়া ক্রোধে, অপমানে, আঘাতের জ্বালায় কাঁদিয়া ফেলিয়া অশ্রুমলিন মুখে বলিতে লাগিল—আমাকে মারলি মণরু—তুই আমাকে মারলি ?

—মারব না—এক-শ বার মারব, বলিয়া মণরু বাহিরের দরজায় পা বাড়াইল। রাগে তখনও ফাটিয়া পড়িতেছিল সে।

—বেশ, তবে শুনে যা, তুই আমাকে দেখতে পারিস না, আমি ও পাড়ার বাবুর বাগান-বাড়ীতে গিয়ে থাক্‌ব। বাবু আমাকে কত দিন নিজে সেধেছে, এবার যাবই দেখিস—দেখিস সেখানে বাবু কত সুখে রাখবে—বলিতে বলিতে কান্নায় মণিয়ার কণ্ঠ জড়াইয়া যায়।

বাহিরের দরজা পার হইতে গিয়া মণরুর কানে মণিয়ার শেষ কথাগুলি যাইতেই সে এক মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া যায়। ও পাড়ার বাবুর বাগান-বাড়ীর কথাটা ভাবিতে গিয়া সে বার-দুই চমকাইয়া ওঠে। কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মাত্র। তার পরই আবার চীৎকার করিয়া ওঠে—যেখানে খুশী যা না—বলিয়াই অতি দ্রুত সামনের গলি দিয়া হাঁটিতে থাকে।

মিলের শ্রমিকদের এক দল। সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত তাহাদের ডিউটি চলিতেছে। মণরুও ইহাদের মধ্যে একজন। শহরে পৌঁছিয়া মিলের ফ্যাক্টরীতে ঢুকিতেই তাহার এক ঘণ্টা দেরি হইয়া গিয়াছে এবং এজন্য কল-ঘরের মালিকের কাছে বকুনিও খাইয়াছে। দেরির কারণ তাঁহার কাছে মিথ্যা জানাইয়াছে। জানাইলেও সে যে-ব্যাপার আজ বাড়ীতে করিয়া আসিয়াছে তাহার সমস্ত ব্যাপারটুকু মনে মনে আলোড়িত হইয়া তাহার কাজের উৎসাহ স্তিমিত করিয়া দিয়াছে। সত্যই সে আজ কি করিয়া আসিল ? মণিয়াকে সে এত ভালবাসে, আর তাহাকেই বকাঝকি করিয়া, মারধর করিয়া আসিল সে। না কাজটা বড়ই খারাপ হইয়াছে। মণিয়ার কি

দোষ? সে কত আশা করিয়া বলিয়াছিল ডুরে শাড়ী পরিয়া সার্কাসে যাইবে। কিন্তু তার সেই টাকা দিয়া সে মদ খাইয়া আসিল। ছিঃ, সে আজ মণিয়ার কাছে সত্যই মাপ চাহিবে। কিন্তু সত্যই কি মণিয়া বাবুর বাগান-বাড়ীতে যাইবে? দূর—মণরুকে ছাড়িয়া সে কি সেখানে থাকিতে পারে? আজ না হয় একটু ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মণরু কি মণিয়াকে ভালবাসে না? বাবুর বাগান-বাড়ীতে সে কি যাইবে?—না সে যাইতে পারে না। সেও ত তাকে কত ভালবাসে। মণরু ভাবিয়াই চলে। রাগের ধমকে সত্যই কি কাণ্ডটা সে করিয়া আসিল।

রাত্রি বারটার পর মণরুর ডিউটি ফুরাইতে সে বাড়ী ছুটিল। কিন্তু বাড়ীতে ত মণিয়া নাই। সারা বাড়ী সে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, আশেপাশে নীরবে খোঁজ লইয়াও তাকে পাইল না। অথচ বাড়ীতে সে রান্নাবান্না করিয়া কলায়ের থালায় মণরুর জন্য ভাত, ডাল, তরকারি রাখিয়া ঢাকা দিয়া, পিঁড়ি পাতিয়া, গেলাসে জল পর্য্যন্ত রাখিয়া দিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে ত নাই, তবে বুঝি সত্যই সে বাগান-বাড়ীতে গিয়াছে। ভাবিতেই তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। বাবুর জঘন্য চরিত্রের কথা মণরু জানে। তার মনে পড়িয়া যায় এক দিনের কথা। বন্ধুবান্ধব লইয়া রাস্তায় চলাচলতি মণিয়াকে একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করিতেই মণিয়া ছুটিয়া বাড়ী আসিয়া মণরুকে তাহা জানাইয়াছিল। তার পর এক দিন যখন বাবুটি মঙ্গলকে দিয়া মণিয়াকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল, মণিয়া তাহার ওখানে থাকিলে সুখে থাকিবে, উত্তরে মণিয়া বলিয়াছিল—বাবুকে ধন্যবাদ, কিন্তু মণিয়া তার ওখানে যাইবে না। মণরু তখন হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল—যা না মণিয়া সুখে থাক্‌বি, বাবু কত বড়লোক। মণিয়া বলিয়াছিল—দূর, কি যে যা তা বলিস, তুকে ছেড়ে সুখ? এই ত সেদিনের কথা। কিন্তু তাহাকে একটু বকাঝকি করিয়াছে, মারধর করিয়াছে, তাই বলিয়া বাবুর বাগান-বাড়ী সত্যই সে চলিয়া গেল!

ভাবিতে গিয়া নিমেষে মণরুর সমস্ত দেহ উত্তেজিত হইয়া ওঠে। মণিয়ার দেওয়া তার রাত্রির খাবার পড়িয়াই থাকে এবং সেই রাত্রির অন্ধকারেই সে বাড়ীর বাহির হইয়া যায়।

গভীর নিশুতি রাত্রি। বাগান-বাড়ীর সুউচ্চ প্রাচীর টপ্‌কাইয়া চোরের মত নিঃশব্দে মণরু ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। সুন্দর বাগানের মধ্যে অতি সুন্দর ছোট দালানটি রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া তাহারই মাঝে যেন তাহার রূপের অস্তিত্ব হারাইয়াছে। মণরু অতি সন্তর্পণে টর্চ্চের আলো ফেলিয়া দালানের বারান্দায় উঠিল। খোলা জানালা দিয়া ভিতরের শূন্যঘর চকিতে দেখিয়া অতি দ্রুত বারান্দা হইতে নামিয়া বাগানের মধ্যে মিশিয়া গেল। আবার সন্তর্পণে, সাবধানে আশেপাশে টর্চ্চের আলো ফেলিয়া দেখিল গেটের ঠিক ভিতরেই অতি ক্ষুদ্র এক কক্ষে ভোজপুরী দারোয়ান গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। আর কাহাকেও তাহার চোখে পড়িল না। কিন্তু কোথায় তবে মণিয়া? কোথায় থাকিল সে? সন্তর্পণেই আবার প্রাচীর টপ্‌কাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। এই রাত্রির অন্ধকারে আর কোথায় তাহাকে খুঁজিবে সে? ক্লান্তিতে, ক্ষোভে, আত্মঅপমানে তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল—মণিয়াকে সে যে কত ভালবাসিত, সেই তাকে ঘরছাড়া করিল।

হাঁটিতে হাঁটিতে রূপসা নদীর পাড়ে আসিয়া নদী হইতে দুই আঁজলা জল পান করিয়া পাড়ের বাঁধান ঘাটটার প্রশস্ত চত্বরে ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। তার পর স্থির দৃষ্টি দিয়া নদীর বুকের অন্ধকারের সঙ্গে নিজের চিন্তা মিশাইয়া দিল। কতক্ষণ এই ভাবে ছিল জানে না, হঠাৎ দূরে মিউনিসিপালিটির পেটা ঘড়িটায় ঢং ঢং চারটা বাজিতেই সে উঠিয়া পড়িল। কিন্তু কোথায় যাইবে সে? তবু কি ভাবিয়া আবার বাড়ীর দিকেই রওনা হইল। বড়বাজারের কাছাকাছি আসিতেই কি ভাবিয়া বাজারের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। তখন কোন দোকান-পাট খোলে নাই। সে আসিয়া দাঁড়াইল গোপাল সাহার দোকানের সুমুখে। সাহার কাপড়ের দোকান। দোকান খুব ছোট। বেশী দামের কাপড় সেখানে নাই। এই গোপাল সাহার দোকানের রোয়াকে মণরু প্রায়ই আসিয়া বসে। মণরুকে গোপাল সাহা একটু খাতির করে। খাতির করার কারণ মণরু একেবারে মিল হইতে বাবুদের ধরিয়া পাইকারী দরে সস্তায় গোপাল সাহাকে কাপড় কিনিয়া আনিয়া দেয়। গোপাল সাহা তাহা চড়া দামে বিক্রয় করে। এই খাতিরের সূত্র ধরিয়াই দুই জনে দুই জনের মনের কথা, ক্ষুদ্র সংসারের কথা একটু-আধটু বলাবলি করে। তাই অসময় হইলেও মণরু ডাকিল—গপাল-দা ও গপাল-দা উঠ।

মণরুর ডাকে ঘরের মধ্যে গোপাল সাহার ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই উত্তর দেয়—কে?

—আরে আমি মণরু।

—মণরু! তা এত রাতে কেন?

—কি যে বল গপাল-দা, রাত্রি কি আর আছে? পূবের আকাশে চোখ দাও—

গোপাল সাহা দরজা খুলিয়াই মণরুকে ডাকিয়া বলিল —ভিত্‌রি এসে বোস্ না ভাই।

ভিতরে আসিয়া মণরু বসিতেই গোপাল সাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—হঠাৎ কি মনে করে মণরু? তার পর লণ্ঠন জ্বালাইতেই মণরুর দিকে ভাল করিয়া চোখ পড়িতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল—মুখখানা ত তোর বড়ই মেহানতী ব'লে মনে হচ্ছে—কোথা হতে আসছিস?

—আস্‌ব কুথা থেকে, ঘর থেকেই। আচ্ছা গপাল-দা এমন করে কি তার ফেলে যাওয়া ঠিক হ'ল—বল ত?

কিছু বুঝিতে না পারিয়া গোপাল সাহা কিছুক্ষণ মণরুর দিকে বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকি পরে কহিল—কার?

—আবার কার? মণিয়ার।

গোপাল সাহাকে মণরু নিজের অনেক কথাই বলিত, এ ব্যাপারও খুলিয়া বলিল।

সব শুনিয়া গোপাল সাহা কহিল—অন্যায় ত তোরই মণরু। ঝংড়ু সর্দ্দার তার মা-মরা মেয়েটাকে কোনদিন দুঃখ্ পেতে দেয় নি। তাই মণিয়া ডুরে শাড়ীর দুঃখুটা সইতে পারে নি।

—তাই বলে কি—

মণরুর অসমাপ্ত কথাটা শেষ না করিতে দিয়া গোপাল সাহা বলিয়া উঠিল—একে বলে অভিমান, বুঝলি মণরু? মারধর বৌকে করে কি? তা কি আর করবি বল্! অদেষ্ট তোর মন্দ! চোখে মুখে অমন দর্শনধারী তোর বৌ, বাবুদের চোখ ত পড়বেই। যা বাড়ী যা। দিনের আলোয় একটু খোঁজ-খবর কর্। না আসে সে, দেখে শুনে আর একটা বিয়ে-থা করবি। এই উঠতি বয়সে কি গিন্নীবান্নী ছেড়ে থাকা ঠিক—বলিয়া গোপাল সাহা হাসির আবেগে একটু ঠাট্টা করিল। কিন্তু মণরুর ইহা ভাল লাগিল না। সে তাড়াতাড়ি গোপাল সাহার হাত দুটি ধরিয়া করুণ কণ্ঠে কহিল—একখানা ভাল ডুরে শাড়ী দিবি গপাল-দা? মাইনে পেলেই দামটা দিয়ে দেব।

—কার জন্য আর নিবি ভাই, সে কি আর আসবে?

—তবু দাও না গপাল-দা!

—নিয়ে যা, দাম লাগবে না। বলিয়া গোপাল সাহা পছন্দমত একখানা ডুরে শাড়ী মণরুর হাতে দিল। আবার কহিল—নিয়ে যা, এই শাড়ী কাছে থাকলে তাকে ভুলবি না।

গোপাল সাহার দেওয়া ডুরে শাড়ী হাতে করিয়া মণরু ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল বাড়ীর ছোট আঙিনায়। তখন সবে ভোর হইয়াছে। সে ধীরে ধীরে বারান্দায় উঠিল এবং সেখান হইতে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি দিয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে শুধু বিস্মিত হইয়াই সেদিক হইতে তাহার দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। ঘরের ভিতরে বেড়ায় ঠেস্ দিয়া দুই হাঁটু ধরিয়া মণিয়া বসিয়া আছে। দৃষ্টিতে তার আনন্দ ও শান্তি যেন উপচাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু মণরুকে দেখিয়া সে দৃষ্টি যেন অকস্মাৎ নিবিয়া গেল। কহিল—এ কি তুর চেহারা হয়ে গেছে মণরু! চোখ বসে গেছে, মুখে রক্ত নেই—

অনেক দিনের হারানো প্রিয় জিনিস—অন্যের অধিকারে দেখিয়াও যেমন যুগপৎ মানুষ আশা ও নিরাশার মাঝে পড়িয়া সেই দিকে অতিবিস্ময়ে তাকাইয়া থাকে, বাবুদের অধিকারে মণিয়াকে কল্পনা করিয়া মণরু সেই ভাবে চাহিয়া রহিল তাহার দিকে। কিন্তু সে অতি সামান্য সময় মাত্র। তার পরই যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেইখানেই ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মণরুর কান্নায় মণিয়া কেমন যেন বিচলিত হইয়া পড়িল। সে তার যায়গা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল মণরুর কাছে, তার পর তার কাছে ঘন হইয়া বসিয়া পড়িয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল—দূর বোকা! কাঁদে না, আমি কি বাগান-বাড়ীতে গিয়েছি নাকি?

মণরু কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া মণিয়ার মুখের দিকে কেবল চাহিতে লাগিল।

মণরুর এই চাহনি মণিয়াকে বড়ই লজ্জিত করিল। তার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সে ভারি অন্যায় করিয়াছে মণরুকে জব্দ করিতে গিয়া। মণরুর আত্মভোলা দৃষ্টি মণিয়াকে ব্যথা না দিয়া পারিল না। সে মণরুর চোখে চোখ রাখিয়া কহিল—দেখিস্ কি, সত্যি বাবুর বাড়ী যাই নি।

—সত্যি? মণরুর বাক্যে সকাতর নির্ভাবিত ভাষা।

—হ্যাঁ গো। হাসিয়া বলিল মণিয়া।

—কেনে যাস নি?

—দূর, ওখানে গেলে কি মান-ইজ্জৎ থাকে—না আবরু থাকে? বলিয়া মণরুর মুখের কাছে মুখ আনিয়া অতি ধীরে কহিল—তুকে ছেড়ে কুথায় যাব? তুই যে ভালবাসিস্—

—কই ভালবাসি—মার দিলাম যে। অশ্রুকাতর চোখে একটু হাসিয়া কহিল মণরু।

—তুই সত্যি বোকা। ভালবাসিস্ বলেই ত মারলি। তা না হ'লে কি আমার গায়ে হাত তুলতে পারতিস্?

আজ মণরুর মনে পড়িল, ঝংড়ু সর্দ্দার মেয়েকে একটু-আধটু লেখাপড়া শিখাইয়াছিল বলিয়া মণিয়া এই সব কথা বলিতে পারে। এই মণিয়াকে অনেকেই চাহিয়াছিল বিবাহ করিতে। কিন্তু ঝংড়ুর যে কেন মনে ধরিয়াছিল মণরুকে তা ঝংড়ুই জানে।

মণরু প্রত্যুত্তরে কহিল—তবে কুথায় ছিলি রাত্রে?

—রাত্রি ভোর নাগাদ ফিরেছি। তুর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে মান্‌কীর বাড়ী চলে যাই। মান্‌কী ওরা আমার জন্য রাগ করে বসেছিল। আমি গেলে সকলে সাড়ে ন'টায় সার্কাস দেখতে যাই। ফিরতে অনেক রাত্রি হয়, তাই রাত্রিটা মান্‌কীর ওখানে ছিলাম। তুর উপর রাগ করেই কিন্তু আসতে পা'রলেও আসি নি। বলিয়া হাসিয়া কহিল—চল মণরু, ঘরে চল্, কি এনেছি দেখ্‌বি।

—কি রে?

—চলই না। বলিয়া মণরুর হাত ধরিয়া ঘরে আনিয়া দুই বোতল মদ তাহার সামনে ধরিয়া কহিল, নে খা, এ বড়লোকেরা খায়। মান্‌কীর কাছে ধার ক'রে টাকা নিয়ে নয়াবাজার থেকে কিনেছিলাম। এই খা। তাড়িটাড়ি ওসব বাজে জিনিস খাস্ নে।

মণরু মাথা নাড়িয়া কহিল—কেনে টাকা খরচ ক'রে এ সব আনলি? তাড়ি, মদ ও সব কিছুই আর খাব না।

চক্ষু টানিয়া হাসিয়া কহিল মণিয়া—কেনে?

—কেনে শুধাস্ না। আমার-খুশী। বার বার ভুল করলে দেবতা খুব শাস্তি দেবেন। বলিয়া মদের বোতল দু'ইটা ধরিয়া বাহিরে সজোরে ফেলিয়া দিতেই ইটের উপর পড়িয়া উহা ভাঙিয়া খান খান হইয়া গেল।

মণিয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিয়া কহিল—ও কি করলি, টাকার মাল।

—দূর তুর টাকার মালের নিকুচি করেছে। যা খাব না, তা সত্যিই খাব না। বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল—বাইরে যাবি মণিয়া?

—কেনে?

—চল্ না। বলিয়া মণিয়াকে ধরিয়া বাহিরে আনিতে আনিতে বলিল—তুর জন্য যে ডুরে শাড়ী এনেছি।

—মাইরি?

—হ্যাঁ রে।

দুই জনে বাহিরে আসিতেই মাচানের উপর হইতে শাড়ীখানা আনিয়া মণিয়ার হাতে দিয়া কহিল—দেখ্ ত, সুন্দর না?

—সত্যি সুন্দর। মণিয়া যেন আনন্দে গলিয়া পড়িল।

—নে তবে পর দেখি। হাসিয়া বলিল মণরু।

—দূর; এখন থাক্, আগে হাড়ি হেঁসেল নিয়ে বসি, তুর জন্য রান্নাবান্না করি, তার পর—বলিয়া মণরুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে কহিল—সারাটা রাত্রি বড় কষ্ট পেয়েছিস্—নারে মণরু?

কৃত্রিম অভিমান করিয়া কহিল মণরু—পাব না? তুই যে ডর দেখিয়েছিলি--বাব্‌বা--বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই মণিয়ার মাথাটা বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিতেই মিলনের অনাবিল আনন্দের আবেশে মণরুর চক্ষু দুইটি ধীরে ধীরে বুজিয়া আসিল।

ক্রোপট্‌কিন্

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নিভৃতে মগন ছিলে জ্ঞান-সাধনায়।
মাটির মানুষ এসে দাঁড়ালো সেথায়—
সর্ব্বহারা! অনশনে অস্থিচর্ম্মসার!
অভিশপ্ত শিরে তার দেনার পাহাড়!
বিদ্যুৎ চমকি গেল মনের আকাশে;
নবদৃষ্টি এলো চোখে। শতচ্ছিন্নবাসে
ঐ যে কিষাণ চলে সন্ধ্যার ছায়ায়—
বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদ ও যদি না পায়,
আর্টের আনন্দ-লোকে না পায় আসন—
মিথ্যা এই সভ্যতার-যত বিজ্‌ৃম্ভন।
নিভৃত তপস্যা হ'তে আসিলে বাহিরে
সর্ব্বহারা মানবের দুঃখ-সিন্ধু-তীরে।
বাজালে বিপ্লব-শঙ্খ যুগান্তের দ্বারে।
রুসিয়ার শ্বেত খ্রীষ্ট, প্রণাম তোমারে।

কাশ্মীর-ভ্রমণ

শ্রীশান্তা দেবী

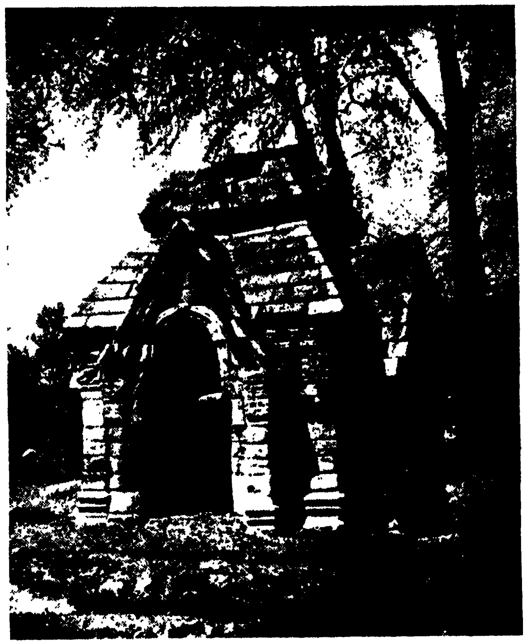
৪

শ্রীনগরে বাড়ীভাড়া খুব বেশী নয়। যাঁরা ওখানে অনেক দিন আছেন তাঁদের সাহায্যে বাড়ীভাড়া নিয়ে চাকর-বাকর রেখে থাক্‌লে খরচ বেশী হয় না। নেডুস হোটেলে খরচ খুব বেশী।

ছোট হাউস-বোট ভাড়া নেওয়ার নানারকম প্রথা আছে। নিজে চাকর-বাকর রেখে শুধু বোটটা ভাড়া নিয়ে ইচ্ছামত রান্নাবান্না করিয়ে নিলে খরচ বেশী হয় না এবং মনের মত খাওয়া-দাওয়া করা যায়। অবশ্য বাড়ীভাড়া ক'রে থাকার চেয়ে খরচ এতে বেশী। কিন্তু বোটওয়ালাকে খাওয়াদাওয়ার সব ভার দিয়ে হোটেলের মত তার বোটে বাস করলে নানা অসুবিধা হয়। যাঁরা খেতে ভালবাসেন, তাঁরা সবদিন ইচ্ছামত খেতে পান না। বোটওয়ালা চায় কত কম খেতে দিয়ে কত বেশী লাভ রাখা যায় তাই দেখতে, কিন্তু খানেওয়ালা খদ্দের হ'লে সে খেতে চায় দামের উপযুক্ত। এ গ্রামে দুধ পাওয়া যায় না, ও গ্রামে আজ তরকারি মিলল না ইত্যাদি ব'লে ফাঁকি দিতে তাদের কিছু বাধে না। একবেলার খাবার তুলে রেখে আর একবেলা চালিয়ে দিতে পারলেও বোটওয়ালারা বাঁচে।

ছোট ছোট বোটেও দুখানা শোবার ঘর, দুটা বাথরুম, একটা খাবার ও বসবার ঘর, একটা জিনিষপত্র রাখবার ঘর থাকে। সুতরাং ইচ্ছা করলে দুতিনটি ছেলেপিলে নিয়ে থাকা যায়।

শ্রীনগর থেকে হাউস-বোট নিয়ে জলপথে অনেক দূরে অনেক দিকে যাওয়া যায়। একটানা একটা দুর্গন্ধওয়ালা ঘাটে না ব'সে থেকে দূরে কোথাও বেড়াতে যাব ঠিক করলাম। কারণ কাশ্মীরের প্রকৃত সৌন্দর্য্য শ্রীনগরের বাইরেই। ১০ই ভোরবেলা আমাদের নৌকা আমাদের ফেলে জলপথে এগিয়ে চলে যাবে কথা হ'ল। আমরা সারাদিন শ্রীনগরে ঘুরে এবং কার্পেটের ফ্যাক্টরী দেখে সন্ধ্যায় স্থলপথে মোটরে গিয়ে নৌকা ধরব ঠিক করলাম। একটা স্থান নির্দেশ করা হল। কার্পেটের ফ্যাক্টরী দেখবার মত জিনিষ। সেখানে কম্বল, সুটের কাপড় ইত্যাদিও তৈরি হয়। সে-সব দেখে গেলাম কার্পেটের ঘরে। কত রকমের সুন্দর নক্সার কার্পেট যে তৈরি হচ্ছে! তার দামও তেমনি! যত দামী কার্পেট তত তার মিহি বুনন ও গ্রন্থি। ছবিগুলি আগে কাগজে আঁকা হয়। তার পর তাঁতে কোন্ রঙের পর কোন্ রঙের পশম ক'বার দিলে সেই নক্সাগুলি তৈরি হবে সেগুলি বড় বড় কাগজে ঘর



পন্দ্রেথান মন্দির—শ্রীনগর, কাশ্মীর

কেটে লেখা হয়। ঘরে ঢুকে দেখলাম কয়েকজন লোক খুব গম্ভীরভাবে নামতা পড়ার মত ক্রমাগত কি পড়ে চলেছে। পরে শুনলাম তারা কার্পেট শিল্পীদের নক্সা তোলবার ইঙ্গিত পড়ে শোনাচ্ছে। শিল্পীরা শুনে শুনে ঠিক সেই মত রঙ দিয়ে বুনে যাচ্ছে।

সন্ধ্যার একটু আগে মুখোপাধ্যায়-মহাশয়ের গাড়ী ক'রে আমরা শ্রীনগরের বন্ধুদের নিকট, বিশেষ ক'রে নিয়োগী মহাশয়দের কাছে বিদায় নিয়ে আমাদের বোটের সন্ধানে চললাম। শ্রীনগর অতিক্রম ক'রে অনেক তরুবীথির ভিতর দিয়ে, অনেক শস্যক্ষেত্রের ধার দিয়ে নানা দিকে খোঁজ নিলাম, কিন্তু নৌকায় কোনও খোঁজ পাওয়া গেল

না। পথে অনেকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। "এই যে এখানে আপনাদের নৌকা" ব'লে জলের ধারে ডেকে নিয়ে গেল। কিন্তু কোনটাই আমাদের নৌকা নয়। আকাশে অল্প মেঘ করেছে, দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে। কি করা যায় ভেবে পেলাম না। চল্‌লাম আবার শ্রীনগরে ফিরে। ভয়ে ভয়ে গেলাম নিয়োগী-মশায়ের বাড়ী, কারণ তিনিই তখন একমাত্র ভরসা। এত ঘটা ক'রে বিদায় নিয়ে আবার তাঁরই আশ্রয়ে আমাদের ফিরে আস্‌তে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন, ডেকে পাঠালেন নৌকাওয়ালাদের সর্দ্দারকে। সে-ই আমাদের নৌকা ঠিক করে দিয়েছিল, সুতরাং দায়িত্ব তারই। উর্দ্দু হিন্দী ও পস্তুতে যত রকম গালাগালি জান্‌ত বন্ধুদের উদ্দেশ্যে সব আওড়ে নিয়ে সে বল্‌ল, "আপনি দয়া ক'রে আপনার গাড়ীতে এঁদের নিয়ে চলুন। আমি ঠিক নৌকা খুঁজে দেব।"

মিঃ নিয়োগী তখনই গাড়ী বার করলেন। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আকাশে মেঘ আরও ঘন হয়ে উঠেছে। এই রকম নিরুদ্দেশ যাত্রায় গা যেন কি রকম ছম্ ছম্ করতে লাগল। অন্ধকার পথ দিয়ে চলেছি, হাওয়া ক্রমে ঝোড়ো হয়ে উঠ্‌ছে, গায়ে বৃষ্টির ছাট এসে লাগছে, আকাশে মেঘ মহাদেবের জটার মত ফুলে ফুলে ছড়িয়ে পড়ছে, সফেদা গাছের উন্নত মাথাগুলি বিরাট সহস্র চামরের মত দুল্‌ছে, যেন প্রলয়ের পূর্ব্বলক্ষণ। নানা জায়গায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে নৌকার লোকটি ডাক দিতে লাগ্‌ল। কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না। খোলা গাড়ীতে বৃষ্টির ছাট যত সজোরে এসে গায়ে লাগছে তত মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছি, "কাশ্মীরে ঝড়বৃষ্টি বেশীক্ষণ থাকে না।" রাজপথে ঘুরলে আর সন্ধান পাওয়া যাবে না বোঝা গেল। অগত্যা গাড়ী ছেড়ে আমরা মাঠের পথে নামলাম। মাঠ জলের দিকে ঢালু হয়ে গিয়েছে, মাঝে মাঝে কাদা মাটি, অথচ আমাদের সঙ্গে একটা আলোও নেই। বোটওয়ালা হাঁক দিতে দিতে চলেছে, অকস্মাৎ বহুদূর থেকে তার হাঁকের সাড়া শোনা গেল। ধড়ে যেন প্রাণ এল। বোটওয়ালা তার আজীবন সংগৃহীত সমস্ত গালির বোঝা উজাড় করে ঢাল্‌তে লাগল। খানিক পরে দেখা গেল ক্ষীণ একটি আলোকরেখা। আমাদের জমাদার আলো নিয়ে আস্‌ছে! জমাদারকে দেখে জীবনে এত খুসী কখনও হই নি।

রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমনো গেল। ভোরবেলা উঠে দেখি যেন আর একটা কোন্ রাজ্যে এসেছি। শ্রীনগরের নদীর উপরের কাঠের বড় বড় সাতটা ব্রীজ ছাড়িয়ে কাশ্মীর উপত্যকার উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পড়েছি। এখানে শহরের নোংরা গলি আর ভাঙাবাড়ীর কোনও চিহ্ন নেই। দুপাশে খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে নৌকা চলেছে, জলের ধারে ধারে জটাজুটধারী ধ্যানস্থ মহাতপস্বীর মত চেনার প্রভৃতি বৃক্ষ সুগম্ভীর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে। এই জায়গাটি যেন একটি তপোবন। ইন্দোরের রাজা এখানে তাঁর তাঁবু ফেলেছেন দেখলাম। তিনি নিজে বোধ হয় হাউসবোটে থাকেন, সাঙ্গপাঙ্গরা তাঁবুতে। রাজারাজড়া দেখে আমরা ভোর চারটের থেকেই নৌকা ছেড়ে দিলাম। উলার হ্রদের দিকে চলেছি। নদী এখানে শ্রীনগরের চেয়ে অনেক চওড়া আর জল পরিষ্কার। শ্রীনগরের জল বড় নোংরা। সেখানে ছোট ছোট বাড়ীও সব দোতলা আর তাতে সারি সারি জানালা। মেয়েরা প্রায় জানালার ধারেই বসে থাকে। সেখান থেকে দরকারমত বালতি নামিয়ে নদী ও খালের নোংরা জল তোলে, আর বাড়ীর ময়লাগুলো ঝুপঝাপ ক'রে খালের মধ্যে ফেলে দেয়। কাপড়চোপড় কাচতে হলে নেমে এসে ঘাটে বসে। বাইরে চেনার কুঞ্জের পর সফেদার সারি সুরু হয়েছে। ডাঙায় গাছগুলি সঙ্গীনের মত খাড়া হয়ে আছে, জলে ছায়াগুলি দুলছে। সারাদিন নৌকা চলেছে। বড় বড় হাউস-বোট, ঘাসের নৌকা, কাঠ বোঝাই নৌকা। শ্রীনগর-যাত্রী-নৌকাগুলিকে গুণ টেনে নিয়ে চলেছে, কারণ সেটা স্রোতের উল্টা দিকে। কোথাও দু-তিন জন টানছে, কোথাও বা দশ-বার জন। উলারের দিকে দাঁড় টেনেই যাওয়া যায়। পয়সা বাঁচাবার জন্যে আমাদের নৌকাওয়ালা সপরিবারেই দাঁড় বাইছে, অন্য লোক রাখে নি। কোনও বৃহৎ চেনার তরুকে নদী বেষ্টন ক'রে চলে গিয়েছে, জলের মাঝখানেই সে ধ্যানস্থ হয়ে আছে। জলের প্রায় মধ্যে হলুদ রঙের সর্ষে ক্ষেত সোনার ফসল বুকে ক'রে ঝলমল করছে। মাঝে মাঝে গ্রাম দেখা যায়, পাল পাল গরু চরছে, ছোট ছোট বাড়ী উঁকি দিচ্ছে, গ্রামবাসীরা ফলফুল বিক্রী করতে শিকারা চড়ে নৌকায় এসে হাজির হচ্ছে। কেউ বা বলছে, "আমার শিকারায় চল, বড় বড় মাছ ধরিয়ে দেব।" তাদের কাছে মৎস্যশিকারী সাহেবদের বড় বড় সার্টি-ফিকেট। গলানো রূপার মত উজ্জ্বল সূর্য্যের আলো প্রকৃতির রূপ আরও দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মাঠের পিছনের প্রকাণ্ড পাহাড়গুলি মাথা উঁচু ক'রে জানিয়ে দিচ্ছে যে এটা শীতের দেশ। গ্রীষ্মের প্রখর দীপ্তি নেই,

শীতের সুতীক্ষ্ণ বায়ু ও কুয়াসা নেই, হাল্কা হাল্কা গরম কাপড়ে বেশ আরামে দিন কেটে যায়। শ্রীনগরের চেয়ে হাওয়া এদিকে অনেকটা ঠাণ্ডা।

সাহেব-মেমরা কেদারা-কুর্সি শোভিত সাহেবী হাউস-বোটে দূরের পথে চলেছেন। এ দেশী অনেকে চলেছে সাদাসিধা ছাউনি-দেওয়া বজরায় কার্পেট পেতে। তাদের শোবার ঘর, খাবার ঘর আলাদা আলাদা নেই।

সূর্য্যাস্তের একটু আগে যখন Windsor এসে উলারের অদূরে একটা ঘাটে থামল তখন হঠাৎ টুপটাপ বৃষ্টি সুরু হ'ল। আমরা ভাবলাম হয়ত কিছুই দেখা হবে না। কিন্তু বৃষ্টি আবার থামল দেখে বোটের লোকেরা বলল, "এখানে বাইরে বসে চা খেতে হয়।" কতকগুলো ভিজে খড়ের গাদার পাশে চেয়ার টেবিল পেতে আমরা চা খেতে বসলাম আর আমাদের খানসামার বৌ মাঠে উনান পেতে রান্না আরম্ভ করল। ছোট্ট নূরজাহান আমাদের রুটি ও বিস্কুটে মাঝে মাঝে ভাগ বসাচ্ছিল এবং নিজের মনে বক্তৃতা করছিল।

১১ই আমরা উলার লেকে পৌছলাম। ছেলেবেলা থেকে ভূগোলে উলার লেকের কথা পড়েছি, কিন্তু কোথায় উলার লেক? প্রথম অংশটিতে অনেকখানি জল দেখা যায় বটে, কিন্তু সমস্ত জলভাগই প্রায় পানফলের ক্ষেতে ভর্ত্তি। মনে হয় যেন মাঠে জল দাঁড়িয়েছে। দাঁড় ফেলার সঙ্গে সঙ্গে লতাগুলি জড়িয়ে ওঠে। ফল কত হয় জানি না, তবে লতাগুলি গরু-বাছুরের খাদ্য হয় ব'লে শুনেছি। দর্পণের মত উজ্জ্বল এমন বিরাট বারিপৃষ্ঠটি দরিদ্র গ্রামবাসীর গরু-বাছুরের সেবায় এমন দশাপ্রাপ্ত হয়েছে দেখে দুঃখ হয়। কত দূর দেশের মানুষ পৃথিবীর কত পথ অতিক্রম ক'রে কাশ্মীর দেখতে আসে। তার এত বড় হ্রদটিকে কাশ্মীর-রাজ এমন অযত্নে নষ্ট হতে দিয়ে নিজেরই প্রতিপত্তি নষ্ট করেছেন।

এই হ্রদটির নাম পুরাকালে ছিল মহাপদ্ম সরস, তারপর হয় উল্লোল হ্রদ, এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে উলার। উলার লেক ১২½ মাইল লম্বা ও ৫ মাইল চওড়া। উলারে একটি ছোট দ্বীপ আছে তার নাম জৈনলঙ্কা। ইহা বোধ হয় কাশ্মীরের রাজা জৈন-উল-আবিদিনের (১৪২১-১৪৭২) নামে পরিচিত। ইনি স্থাপত্য, শিল্প ও চারুকলার উন্নতিতে উৎসাহী ছিলেন এবং হিন্দু প্রজাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করতেন। ইঁহারই উৎসাহে কাশ্মীরে শাল তৈয়ারী ও কাগজমণ্ডের শিল্প ইত্যাদির সূচনা হয় ব'লে শোনা যায়। তাঁর পিতা শিকন্দর বুৎসি খাঁ ছিলেন উল্টা প্রকৃতির।

পানফলের ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে বোট ত আর যাবে না, কাজেই শিকারা নামান হ'ল। সঙ্গে ছোট একটি ছাতা আর দুটি একটি শাল কম্বল ইত্যাদি। গ্রামের ভিতর দিয়ে শিকারা খানিক টেনে খানিক দাঁড়



বন্দীপুরের নিকট একটি গ্রাম

বেয়ে চলল। এক জায়গায় জলপথ এত সরু যে আমাদের সুদ্ধ নেমে পড়তে হল। আমাকে নামতে দেখে গ্রামসুদ্ধ ছেলে-বুড়ো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। সেখানে যা কাদা! প্রত্যেকটি কাশ্মীর-দুহিতাকেই দেখে মনে হচ্ছিল গোবরে পদ্মফুল। এক এক জনের হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা, দুই-একটি ছোট মেয়ে সামলাতে না পেরে পড়ে গিয়েছে, তাদের মুখ পোষাক সবই কর্দ্দমাক্ত। কিন্তু তাতে তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই, এমন মহোৎসাহে চলেছে যেন চন্দন মেখে এসেছে।

নৌকাটা ডাঙার উপর দিয়ে বয়ে নিয়ে আবার ও পারে তাতে চড়া গেল। জলে কুমুদ-কহ্লারও দেখলাম, তাছাড়া ছোট ছোট নাম-না-জানা গোলাপী ফুলও এক রকম দেখলাম। গ্রাম ছাড়িয়ে যখন নৌকা অনেক দূর চলে গেছে, তখন বৃষ্টি সুরু হ'ল। সঙ্গে বর্ষাতি ছিল না, শুধু ছোট ছাতা। তাতে জল আটকায় না দেখে, দাঁড়ি-মাঝিরা তাদের গায়ের কম্বলগুলো তাঁবুর মত করে আমাদের মাথার উপরে তুলে ধরল। কিন্তু তাতেও রক্ষা নাই, এইবার আরম্ভ হ'ল শিলাবৃষ্টি। এদিকে কম্বল-ধোওয়া নোংরা জল টপ্ টপ্ ক'রে শালে পড়ে কালো কালো দাগ হতে লাগল।

অত বড় বিরাট জলপৃষ্ঠের মধ্যে কোথাও একটু আশ্রয় নেই। শিলা যদি বড় বড় হয় ও অনেকক্ষণ ধরে বর্ষণ চলে তা হ'লে আজ আর রক্ষা নেই। কিন্তু তবু ভয় করল না। সৌভাগ্যক্রমে শিলাবৃষ্টি তখনই কমে গেল। অল্প ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে আমরা একটা পোড়ো ঘাটে এসে নামলাম। সমস্ত ঘাটটি ও ঘাটের পরে পথটি ভাঙা মন্দিরের পাথরে আকীর্ণ। একটি ভাঙা মন্দির অথবা বাড়ী তখনও দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে জঙ্গল। দ্বীপে একটি মসজিদ, একটি মন্দির আর একটি কার সমাধি ছিল। সবগুলিই ভেঙে অর্দ্ধেক জলে পড়ে গিয়েছে। একটিরও চিহ্ন নেই। বড় পাথরে বাঁধানো ঘাটটি ভারি সুন্দর, আর সবই ভাঙাচোরা। বৃষ্টির ভয়ে তাড়াহুড়ো ক'রে ফিরলাম। কিন্তু পানসিতে চড়েই আবার বৃষ্টি সুরু হ'ল। কম্বল মাথায় কোন রকমে হাউস-বোটে ফিরে এলাম।

১২ই সকালে আমরা উলার লেকের বড় অংশটিতে গেলাম। এদিকে পানফলের ক্ষেতে জল ঢাকা পড়ে নি তেমন ক'রে, কাজেই দেখতে অনেকটা ভাল। এখানে প্রায় সবটাই জল, তাতে নৌকা চলেছে, জলের চারি ধারে পাহাড়। দুই-চার দল সাহেব এসে জুটেছে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা ভূতের মত নোংরা আর কাদামাখা। বন্দীপুর নামক একটি গ্রামের কিছু দূরে অন্য একটা ছোট গ্রামে আমরা নৌকা রাখলাম। ঘাটে ছোট ছোট শিকারা বাঁধা। ঠিক হ'ল এখান থেকে দুটি ঘোড়া ভাড়া ক'রে আমরা ত্রাগবাল পাসের কাছে যাব। সেইখান থেকে গিলগিট যাবার রাস্তা। গিলগিট ১৭৮ মাইল দূরে। এই পথটির নাম বন্দীপুর-গিলগিট রোড। ইহা ১৯৩ মাইল লম্বা এবং বুরজিল পাসের ভিতর দিয়ে গিয়েছে। এ দিকে আমাদের দেশের লোকেরা বড় আসে না ব'লে আমরা এই দিকটা বিশেষ ক'রে দেখতে এলাম। বন্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও এখানকার গভীর নির্জ্জনতা মনকে মুগ্ধ করে।

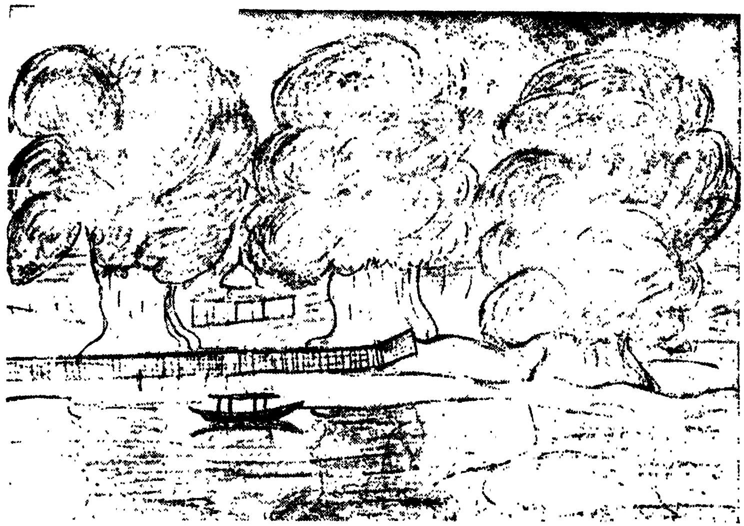
বন্দীপুরে পৌঁছে ঘোড়ায় চড়তে হবে। তার আগের মাইল খানিক পথ ধানক্ষেত, আল, জলের নালা, গ্রাম্য পথ ইত্যাদির ভিতর দিয়ে হেঁটে পার হতে হ'ল। ক্ষেতে আল দিয়ে জল বেঁধে সুন্দরী কাশ্মীরী মেয়েরা নোংরা কাপড় প'রে এক হাঁটু কাদা-জলে দাঁড়িয়ে ধান রুইছিল। পুরুষেরা বিশেষ কিছু করছিল না; মাঝে মাঝে দু-এক জন কাদামাটি কুপিয়ে আলের উপর চাপাচ্ছিল। আমাদের জুতাসুদ্ধ পা সেই কাদা-মাটিতে দেবামাত্র এক বিঘৎ বসে যাচ্ছিল। কিন্তু তাতেও রক্ষা নেই; মাঝে মাঝে এক দিকের কাদা থেকে লাফিয়ে আর এক দিকের কাদায় গিয়ে পড়তে হচ্ছিল। প্রাণ প্রায় যায় আর কি! প্রত্যেক মুহূর্ত্তে কর্দ্দম-শয্যা নেবার আশঙ্কায় মন ভয়ে কাঠ হয়েছিল। গ্রামে নোংরা ভূতের মত এক এক পাল ছোট ছোট ছেলে এক বাটিতে চার-পাঁচ জন ভাত নিয়ে বসে খাচ্ছিল এবং আমাদের দুর্গতি দেখে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

অবশেষে আমরা বন্দীপুরের শুকনো ডাঙায় এবং ভাল রাস্তায় এলাম। এখানে ঘোড়ায় চড়তে হ'ল। এই প্রথম এবং সম্ভবত আমার শেষ ঘোড়ায় চড়া। ঘোড়ার যেমন চেহারা তেমনি সাজ এবং তেমনি তার জিন। সহিসদের সাহায্যে কোন রকমে ঘোড়ায় চড়া গেল। যদিও হেঁটে গেলে এর চেয়ে অনেক আরামে যেতাম। এবার পথ ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠছে, কিন্তু অতি ধীরে। বন্দীপুরের পর নাওপুর, সোনারউইং, ক্রালাপুর, মাতৃগাম, চাকার ও বোনার পার হয়ে ত্রাগবালে পৌঁছাতে হয়। ত্রাগবালে পর্য্যটক ও সরকারী লোকজনদের জন্য একটি বিশ্রাম গৃহ আছে। সেই পর্য্যন্ত আমাদের যাবার কথা ছিল।

বন্দীপুরের পর প্রথম ছয় মাইল ঘরবাড়ী আছে, ক্ষেত আছে, লোক চলাচল করে। তার পর বাকি পথ পার্ব্বত্য ভীষণ খাড়া পথ, দুধারে ঘন পাইন ও ফারের দীর্ঘ বন। গ্রাম-ট্রামের কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। মাঝে মাঝে দেখা যায় ঘোড়ার পাল পিঠে বোঝা নিয়ে চলেছে, অথবা লম্বা দাড়িওয়ালা লোমে-ঢাকা ছাগলের পাল পাহাড়ের গায়ে চরে বেড়াচ্ছে। গুজার জাতি নামক এক জাতীয় লোক এখানে ছাগল চরিয়ে বেড়ায়। এদের রং বেশ কালো, পোষাকও কালো, নাক খুব খাঁড়া খাঁড়া। গুজার জাতি বোধ হয় ঘোড়া ছাগল প্রভৃতির ব্যবসা করে। মাঝে মাঝে তাদের ছোট ছোট তাঁবু খাটিয়ে আগুন জ্বেলে দল বেঁধে রান্নাবাড়া করতেও দেখলাম। বন্দীপুরের কাছেই মস্ত একটা ভ্রাম্যমাণ দল মাঠে তাঁবু ফেলেছে দেখলাম। কালো পোষাক পরা মেয়ে-গুলির নাকে নাকছাবি, মাথায় টুপির ধারে পিঠে লম্বা ঝালর, মুখের ভাব পুরুষের মত। বড় বড় পাহাড়ে মহিষের পালও অল্পস্বল্প দেখা যায়। তবে সব চেয়ে বেশী হচ্ছে ঘোড়ার পাল। কাশ্মীরে বিশেষ ক'রে ত্রাগবালের পথেই প্রথম দেখলাম পাহাড়ের গায়ে ঘোড়ার বাচ্চারা মায়ের দুধ খেতে খেতে চলেছে। বাচ্চাগুলি ভারি সুন্দর কিন্তু রোগা রোগা দেখতে। অশ্বিনীদের সন্তানপালন এখানে অনেক জায়গাতেই চোখে পড়ে।

বন্দীপুর থেকে তিন মাইল দূরে ক্রালাপুরের কাছে একটা প্রকাণ্ড সুন্দর নদী আছে, নামটা কি জানি না। বড় বড় শিলাখণ্ডের উপর দিয়ে নদী লাফিয়ে চলেছে। এত জোরে জল চলেছে যে তরঙ্গ প্রায় সমুদ্র-তরঙ্গের মত চঞ্চল হয়ে উঠেছে; কেবলই পুঞ্জ পুঞ্জ বরফের মত সাদা ফেনা হচ্ছে; মনে হচ্ছে এর তলায়ও বোধ হয় একটা সমুদ্রমন্থন চলেছে।

এই নদীর উপর একটা প্রকাণ্ড লাল ব্রিজ আছে। তার পর আর একটা গ্রামে বোনার পাহাড় থেকে একটা সুন্দর নদী নেমেছে, সেটাও খুব সুন্দর কিন্তু ছোট। ফেনা এতই সাদা যে মনে হয় দুধের কি বরফের নদী। এই নদীটি সত্যিই একটু উপরে গ্লেসিয়ার থেকে নামছে, তবে আমরা সেই পর্য্যন্ত যাই নি।



উলার লেকের পথে

পার্ব্বত্য পথে অনেকখানি উঠলে দূরে অনেক নীচে প্রকাণ্ড উলার হ্রদ, নদী, খাল, ধানের ক্ষেত, পপ্‌লার আর উইলো বন, গ্রাম প্রভৃতি সুন্দর ম্যাপের মত দেখায়। এতখানি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে এমন ছবির মত দেখা একমাত্র এরোপ্লেনেই বোধ হয় সম্ভব। কাশ্মীর যে কি আশ্চর্য্য সুন্দর দেখতে এই পার্ব্বত্য পথ থেকে একবার দেখলে তা ভাল ক'রে বোঝা যায়। ইহাকে ভূ-স্বর্গ ব'লে সত্যই মনে হয় এই নির্জ্জন পার্ব্বত্য পথে এলে।

ত্রাগবালে পাইন গাছেও ফলফুলের শোভা সুন্দর হয়েছে। বসন্তের হাওয়া কাঁটা গাছকেও সৌন্দর্য্যে অলস্কৃত করতে ছাড়ে নি। পথে বন্য ফুলের গাছে বড় বড় সাদা ফুলের তোড়া ফুটে আছে, মাঝে মাঝে সাদা ও রঙীন গোলাপের কুঞ্জ। উঁচু উঁচু গাছে ভর্ত্তি পাহাড়ে বরফ পড়ে রয়েছে। কোথাও পাহাড় ধ্বসে পড়েছে। ত্রাগবালের একেবারে কাছে এসে একটা ফাঁক দিয়ে বহু শৃঙ্গবিশিষ্ট একটি তুষারধবল গিরিশ্রেণী দেখা গেল। এগুলি নাঙ্গা পর্ব্বতের নিকটের কোনও গিরিশ্রেণী কি না জানি না।

আমরা যখন ত্রাগবালে পৌঁছলাম, তখন বেলা তিনটে হয়েছে। সহিসরা বলল, "ফিরে যেতে রাত ৯॥টা বেজে যাবে।" কাশ্মীরে তখন রাত্রি আটটার পরও অস্পষ্ট দিনের আলো দেখতাম, কিন্তু এই নির্জ্জন পার্ব্বত্য পথে রাত্রি ৯॥টায় যাওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না। আমাদের সঙ্গে আলো ছিল না।

ভাবলাম ডাকবাংলোতে রাতটা কাটিয়ে কাল দিনের বেলা ফেরা যাবে। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখলাম সেখানে গদিহীন দুটি খাট, দুটি চেয়ার আর দুটি টেবিল ছাড়া আর কিছু নেই। চৌকিদার বললে, "এখানে যারা আসে তারা ঘোড়ার পিঠে বালতি বাথ-টব, সতরঞ্চি, বাসন বিছানা ইত্যাদি যাবতীয় জিনিষ নিয়ে আসে।"

আগের দিন কারা সব এখানে এসেছিল; দেখলাম এক দল ঘোড়ার পিঠে তাদের সতরঞ্চি, গদি, বাথ-টব, বালতি, টিফিন-বাস্কেট, কমোড ইত্যাদি সংসারের ব্যবহার্য্য যাবতীয় জিনিষ ফিরে চলেছে। এ কথা আমরা আগে জানতাম না, কাজেই মুস্কিলে পড়লাম। চৌকিদার বললে, "চিম্‌নীতে জ্বালাবার কাঠ দিতে পারি, আর কিছু নেই।" ত্রাগবাল শীতের জন্য বিখ্যাত, দিনের বেলাই যে রকম শীত দেখলাম, তা আমাদের কাপড়-চোপড়ের সাহায্যে নিবারণ করা শক্ত, রাত্রে এই রকম পোষাকে বিনা বিছানায় থাকলে ত নিউমোনিয়া হয়ে যাবে। সুতরাং আমি ফিরে যাওয়া ঠিক করলাম। চৌকিদার দু-পেয়ালা শুধু চা দিতেই পাঁচটা বাজিয়ে দিল। এ ছাড়া কোনও খাদ্য তার ভাণ্ডারে ছিল না। দেখলাম পথে দু-এক জন সাহেব-মেম ঘুরছে। এখানে অনেকে পাইন-বনের মধ্যে ক্যাম্পিং করতে আসে। তা ছাড়া ত্রাগবাল পাসে (১২,৬০০ ফুট উঁচু) যাবার এই পথ। সেখান থেকে

নাংগা পর্ব্বতের মহান্ দৃশ্য দেখা যায়। ত্রাগবাল পাসের শীত অবর্ণনীয়।

দিনের আলো থাকতে থাকতেই গভীর পাইন বন-গুলি অন্তত পার হয়ে যেতে পারব আশা হ'ল। কিন্তু কপালে আজ দুর্ভোগ ছিল। পথে বার বার ঝিরঝিরে বৃষ্টি এবং দারুন ঝোড়ো হাওয়া সুরু হ'ল। আমাদের ছাতা, বর্ষাতি, আলো কিছুই ছিল না। পথে দাঁড়াবারও স্থান নেই, এক দিকে খাড়া পাহাড় আর অন্য দিকে গভীর খাদ ও বন। ঝড়ের ধাক্কায় উড়ে যাবার ভয়ে মাঝে মাঝে পাহাড়ের আড়ালেই দাঁড়াচ্ছিলাম; কিন্তু বৃষ্টিকে আমি কিছুতেই আমল দিলাম না। বললাম, "দাঁড়িয়ে ভেজার চেয়ে চলতে চলতে ভেজা ভাল। তবু ত খানিকটা পথ কমে যাবে।" ঝড়ের ধুলোয় চোখ নাক প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল, এদিকে আমার স্বামীর টুপিটা মাথা থেকে উড়ে গেল। সুদীর্ঘ পথ এত খাড়াই যে পা ফস্কালেই পাতালে চলে যেতে হবে; তার উপর দু-তিন মিনিট অন্তর একটা ক'রে নূতন বাঁক এবং ঘোড়ারা নিজেদের ইচ্ছামত খাদের ধার দিয়ে ছাড়া চলে না। আমি ঘোড়ায় চড়তে অনভ্যস্ত ব'লে আমার জন্য দু-জন সহিস রাখা হয়েছিল। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল যে আমি একজন পাকা ঘোড়সওয়ার, কেবল টাকা খরচ করবার খেয়ালের জন্যে তাদের রেখেছি। সুতরাং তারা আমার এক মাইল পিছনে মহানন্দে ধীরমন্থর গতিতে চানা খেতে খেতে আসছিল। আমি অদৃষ্টের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম।

ঘোড়ার জিন এবং পথের খাড়াইয়ের চোটে যখন সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা হয়ে গেল, তখন আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ে হাঁটব ঠিক করলাম। সহিস মনে করল যদি সওয়ারী এত পথ হেঁটে যায় তাহলে হয়ত আমার পয়সা কিছু কাটা যাবে। সে আমাকে কিছুতেই নামতে দেবে না। যাই হোক অনেক কষ্টে তার হাত এড়িয়ে বকে-ঝকে চার-পাঁচ মাইল হেঁটেই নামলাম। কিন্তু পাহাড় এত খাড়া যে প্রত্যেকটি পা ফেলবার সময় মনে হয় পাঁচ হাত নেমে পড়লাম। প্রতি পায়ে পায়ে নিজের শরীরের সমস্ত ভার সজোরে দুই পায়ের উপর পড়ে পড়ে পায়ে ব্যথা হয়ে যায়।

সূর্য্যাস্তের সময় পাহাড়ে বিচিত্র আলোক-রশ্মি ছড়িয়ে পড়ল। একেবারে ত্রাগবালের কাছে থেকে দূরের তুষার শৃঙ্গগুলির উপর রঙীন আলো পড়ে ঝলমল করে। সকলের পিছনে একেবারে খড়ির মত সাদা একটা পাহাড় দেখা যায়, ওখানকার লোকেরা বলে সেটা নাকি নাঙ্গা পর্ব্বত। সত্য মিথ্যা জানি না।

রাত্রি ৮৷৷টার পরে আমরা বন্দীপুরে ফিরে এলাম। কিন্তু তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। খোলা রাস্তায় তখনও পথ দেখা যায়, কিন্তু গ্রামের দু-সারি বাড়ীর মধ্যের পথে ঢুকলে কিছুই দেখা যায় না। দু-চারটা বারাণ্ডা থেকে লণ্ঠনের আলো পথে পড়ছিল। কিন্তু ক্রমে পথ একেবারে ঘুটঘুটে হয়ে গেল এবং সহিসরাও ঘোড়া নিয়ে নিজেদের বাড়ী চলে গেল ব'লে আমরা একেবারে অকূল পাথারে পড়লাম। প্রত্যেক দোকান আর বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম কেউ আলো ভাড়া দেবে কিনা। শেষকালে একজন স্যাকরা দোকানপাট বন্ধ ক'রে আলো নিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। লোকটি সত্যিই ভাল। রাস্তাতে প্রায় প্রতি মিনিটে ঝরণার জল আর কাদা পার হতে হয়। অন্ধকারে যেতে হ'লে কত বার যে আছাড় খেতাম জানি না। লোকটি আমাদের আলো ধরে ধরে নিজেদেরই একটা শিকারায় (শাল্‌তি) তুলে জলপথে একেবারে Windsorএ হাজির ক'রে দিল। তাকে প্রচুর বকশিশ দেওয়া হ'ল।

কিন্তু ঘোড়ায় চড়া আর পাহাড় নামার ফলে পায়ে ও গায়ে এমন ব্যথা হল যে দিন কয়েক হাঁটা চলা শক্ত হয়ে উঠেছিল। আমাদের হাউস-বোটওয়ালার স্ত্রী এই সময় আমার খুব সেবা-যত্ন করেছিল।

ক্রমশঃ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্পর্কে অধ্যাত্ম-সাধকেরাও উদাসীন থাকতে পারেন না। অবশ্য কোন কোন অধ্যাত্ম-সাধনা উপদেশ দিয়েছে ভগবানের জিনিষ ভগবানকে দিতে আর শয়তানের জিনিষ শয়তানকে দিতে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আর ঐহিককে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে, বলা হয়েছে যারা ঐহিক নিয়ে আছে তারা ঐহিক নিয়েই থাকুক, আধ্যাত্মিকতায় তাদের কাজ নেই, অধিকার নেই, আর যারা আধ্যাত্মিক তারা কেবল আধ্যাত্মিকতা নিয়েই থাকুক, ঐহিকে তাদের কোন প্রয়োজন নেই। ঐহিকে ও অধ্যাত্মে এই বিচ্ছিন্নতার জন্য ঐহিক চিরদিন ঐহিকই রয়ে গেল, রয়ে গেল অনাত্মের, অজ্ঞানের, দুঃখ-দৈন্যের চিরস্থায়ী সাম্রাজ্যরূপে—আধ্যাত্মিকতা জীবনের মধ্যে সজীব জাগ্রত প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না।

সাধুসন্তরা অনেকে "জগৎ-হিতায়" অনেক কিছু যে করেন নাই তা নয় কিন্তু তাঁদের কর্ম্ম পূর্ণ-ফলপ্রসূ হতে পারে নাই; হয়েছে মিশ্রিত, পঙ্গু, সাময়িক মাত্র; তার কারণ এই যে তাঁদের কর্ম্ম দুটি নিম্নতর ও ক্ষীণতর ধারা আশ্রয় করে চলেছে। প্রথমতঃ, একটা গৌণ প্রভাব বিস্তার ছাড়া আর কিছু তাঁদের দিয়ে হত না—ঐহিকের আবহাওয়ার মধ্যে অন্য লোকের একটা স্মৃতি, স্পর্শ, রেশ কেবল এনে দিত তাঁদের সাধনা ও সিদ্ধি। আর না হয় জাগতিক কর্ম্মে যখন তাঁরা লিপ্ত হয়েছেন তখন তাঁদের কর্ম্ম ঐহিকের ধর্ম্মকে বেশি ছাড়িয়ে যায় নাই—দান সেবা ইত্যাদিরূপে তা নৈতিক নিষ্ঠা আচার নিয়মের কোঠাতেই আবদ্ধ রয়েছে। এই নৈতিক অর্থাৎ মানসিক স্তরে আবদ্ধ আদর্শ ও প্রেরণাকেই একান্ত আশ্রয় করা হয়েছে ব্যবহারিক জীবনে—যদিও অনেক সময়ে এই নৈতিকতাকেই আধ্যাত্মিকতা বলে ভুল করা হয়। সত্যকার আধ্যাত্মিক—মানসোত্তর—লোকোত্তর শক্তি দিয়ে জাগতিক ব্যাপার পরিচালনা করবার আদর্শই ছিল বিরল; আর যেখানে এ আদর্শ পাওয়া গিয়েছে সেখানে সম্যক উপায় ও পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে কিনা সন্দেহ। অথচ জগতে স্থায়ী পরিবর্ত্তনের, মানুষের ভাগ্য পরাবর্ত্তনের একমাত্র কৌশল হ'ল আধ্যাত্মিক অর্থাৎ ভাগবত চিন্ময় শক্তির সম্যক আবিষ্কার ও প্রয়োগ।

"হিউমানিষ্ট"রা (Humanist) এক সময়ে বলে গিয়েছেন মানুষের সংশ্লিষ্ট যা তার কিছুই তাঁদের পর নয়, সে-সমস্তই তাঁদের নিজস্ব রাজ্য। আধ্যাত্মিকেরাও ঠিক ঐ কথা পূর্ণমাত্রায় বলতে পারেন। শ্রেষ্ঠতম বা বৃহত্তম আধ্যাত্মিকতার লক্ষ্যই হবে সমগ্র মানুষকে, মানুষের যাবতীয় অঙ্গ, যাবতীয় কর্ম্ম-আয়তনকে অধ্যাত্ম সত্যে ও প্রেরণায় গঠিত ও চালিত করা। এ আদর্শ অল্পই স্বীকার করা হয়েছে, অধিকাংশক্ষেত্রে অসম্ভবই বলে বিবেচনা করা হয়েছে—তাই এ জগতের এ দুর্দ্দশা।

কথাগুলি বলতে হ'ল কৈফিয়ৎ হিসাবে। আমরা যদি অধ্যাত্ম সাধক হই, তবুও—তবুও কেন, সেই জন্যেই—বর্ত্তমান যুদ্ধের মত একটি একান্ত জাগতিক ব্যবহারিক ব্যাপারেও আমাদের বক্তব্য আছে। যুদ্ধবিগ্রহের বিপুল তরঙ্গ-সংঘাত তার উপর দিয়ে চলে যায়, সেও বিপুল ঔদাসীন্যে ক্ষণিকের জন্য একটু চেয়ে দেখে আবার ডুবে যায় তার অভ্যস্ত নিবিড় গভীর ধ্যাননিদ্রায়—প্রাচ্যের এই সুলভ খ্যাতি রটে গিয়ে থাকলেও, আমরা তার অংশীদার হতে চাই না।* কিন্তু অধ্যাত্মে আর ঐহিকে, ধ্যানে আর "ঘোর কর্ম্মে" যে অহি-নকুল সম্বন্ধ এ সিদ্ধান্ত ও সংস্কার শ্রীকৃষ্ণ বহুদিন অপ্রমাণ ক'রে দিয়েছেন। ফলতঃ আমরা দেখে এসেছি যুদ্ধবিগ্রহ যে কেবল লড়ায়েরা করে তা নয়, অবতারেরা ঐ কাজ ছাড়া আর কিছু করেন নাই এমন বললে খুব বেশি অত্যুক্তি হয় না—আর মা মহামায়া নিজে কি? দুষ্টের দমন অবতারের প্রধান কাজ—সচ্চিদানন্দময়ী হলেন আবার অসুরদলনী।

বস্তুতঃ আমরা বিশ্বাস করি বর্ত্তমান যুদ্ধটি হ'ল ঠিক অসুরকে নিয়ে যুদ্ধ। এ যুদ্ধ অন্যান্য যুদ্ধের মত নয়—একটা দেশের সঙ্গে আর একটা দেশের, এক দল সাম্রাজ্য-প্রয়াসীর সঙ্গে আর এক দল সাম্রাজ্য-প্রয়াসীর যে যুদ্ধ, কোন একটি বিশেষ রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম প্রভুত্ব স্থাপনের যে প্রয়াস মাত্র তাও নয়। এ যুদ্ধের গভীরতর গম্ভীরতর ভীষণতর ব্যঞ্জনা রয়েছে। ইউরোপের অনেক মনীষী,

* The East bow'd low before the blast,
In patient deep disdain.
She let the legions thunder past,
And plunged in thought again.
Mathew Arnold—"Obermann Once More."

যাঁরা রাষ্ট্রনীতিক নেতা বা পলিটিশিয়ান কেবল তাঁরাই নন যাঁরা চিন্তার ভাবের আদর্শের জগতে বসবাস করেন ও সেখানকার সত্য যাঁদের কাছে কিছু গোচর, তাঁদেরও অনেকে এ যুদ্ধের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করেছেন ও স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন। শুনুন জুল রোমাঁ (Jules Romains)—আধুনিক ফরাসীর শ্রেষ্ঠ মনীষী ও ঔপন্যাসিক—কি বলেছেন—

"মধ্য যুগের শেষ দিক থেকে সুরু ক'রে আজ অবধি (আমরা বলতে পারি যুগে যুগেই) বিজিগীষুরা মানুষের সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষতি করেছে হয়ত, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতা জিনিষটাকেই সন্দেহের বিষয় ক'রে তুলতে হবে এমন দুঃসাহস তাঁদের কারো ছিল না। অনাচার অত্যাচারকে তাঁরা সমর্থন করতে চেষ্টা করেছেন প্রয়োজনের তাগিদ দেখিয়ে—এ সকল হ'ল আদর্শোচিত আচার-ব্যবহার, অতঃপর বিজিত দেশ তার রীতি-নীতি শাস্ত্র এই ছাঁচে ঢেলে গড়বে, এমন আদেশ ও শিক্ষা দেবার কল্পনা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁরা করেন নাই।...অতীতের ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ অনেক ঘটনাধারার মধ্যে একটি ধারা মাত্র ছিল এবং ইউরোপীয় ইতিহাসে আধুনিক যুগের প্রারম্ভ থেকে এ যাবৎ যুদ্ধ-বিগ্রহের অর্থ এমন ছিল না যে তাতে মানুষের শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সম্পদ সব লোপ পেয়ে যাবে, পুরুষানুক্রমে মানব জাতির যে সাধনার গতি চলেছে স্বাতন্ত্র্যের সাম্যের মৈত্রীর দিকে—অর্থাৎ মানুষত্বের দিকে তা সব হঠাৎ নাস্তি হয়ে যাবে।" *

ইউরোপীয় মনীষীরা অসুরের কথা ঠিক হয়ত জানেন না; তাঁদের ঐতিহ্যে "টাইটান"দের (Titan) কথা শুনে থাকলেও, আধুনিক মনে সে-সকল কবিকল্পনা, বড় জোর প্রতীক বলেই দেখা দেয়। তা হলেও অসুরের বা টাইটানের বাহ্য প্রকাশ, ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁরা যতটুকু উপলব্ধি করেছেন ও ব্যক্ত করেছেন তাই মানুষের চক্ষু উন্মীলন করবার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁরা বলছেন, এ যুদ্ধ দুটি বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে ত বটেই—কিন্তু এত বিভিন্ন যে তারা সমান স্তরের বা পর্য্যায়ের নয়, দুটি পৃথক্ স্তরের বা পর্য্যায়ের জিনিষ। মানুষ তার ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় যে পদবীতে আজ উঠেছে সেখান থেকে তাকে নামিয়ে তার পূর্ব্বতন পদবীর অনুরূপ একটা অবস্থায় বেঁধে রাখা হ'ল বর্ত্তমান যুদ্ধের এক পক্ষের সমস্ত প্রয়াস। এ প্রয়াসের স্বরূপ যে ঠিক এই রকমই, সে-কথাও এঁরা নিজেরা খুব স্পষ্ট ক'রে জোর গলায় বলেছেন, কিছু রেখে-ঢেকে বলেন নাই। হিটলারের Mein Kamf বেদ বাইবেল কোরাণ অপেক্ষাও অভ্রান্ত অকপট বেআবরু নব-ব্যবস্থার (New Order) ধর্ম্মশাস্ত্র হয়েছে।

মানুষ যখন প্রায় বনমানুষ ছিল, তখন তার যে-সব প্রবৃত্তি ছিল ও যে ধরণের প্রবৃত্তি ছিল—উগ্র অশুদ্ধ অহংসর্ব্বস্ব প্রাণশক্তি—ধী'র বুদ্ধির আলো যেখানে সম্যক্ প্রবেশ ক'রে নাই, সেখানে ও সে-সকলের মধ্যে ফিরিয়ে নেবার জন্য এই অধঃশক্তির উৎক্ষেপ আজ। এই নবতন্ত্রে মানুষকে বীর্য্যবান, কেবল বীর্য্যবান হ'তে বলেছে—অর্থাৎ নির্ম্মম ক্রূর আর যূথবদ্ধ। যূথবদ্ধতাই এই তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—বন্যকুক্কুরের বা নেকড়ে বাঘের যূথবদ্ধতা। একটা বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র—ইউরোপে তা হ'ল জর্ম্মনী আর এশিয়ায় তার অনুকরণে হ'ল জাপান—হবে প্রভু বা কর্ত্তার জাতি (Herren volk); অবশিষ্ট মানব জাতি—দেশ-দেশান্তর—সব থাকবে তার দাস তার গোলাম হয়ে, তারা জল টানবে আর কাঠ কুড়ুবে মাত্র। প্রাচীন যুগে হেলট (helot)দের যে অবস্থা, মধ্য যুগে ক্রীত দাসদের যে অবস্থা, সাম্রাজ্যতন্ত্রের (Imperialism) নিকৃষ্টতম ব্যবস্থায় পরাধীন জাতির যে অবস্থা সমস্ত মানব জাতির হবে সেই রকম কি তার চেয়ে হীনতর দীনতর অবস্থা। কারণ সেই সমস্ত যুগে ও ব্যবস্থায় বাহ্যতঃ অবস্থা যে প্রকারই হোক, জুল রোঁমা যেমন বলেছেন, মানুষের ঊর্দ্ধমুখী অভীপ্সার সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে নি, তারা সব পূর্ণমাত্রায় পূজ্য ও বরণীয় ছিল। বর্ত্তমানের নবতন্ত্রে দাসদের অবস্থাই যে হেয় তা নয়, প্রভুদের অবস্থা ব্যক্তি হিসাবে কম হীন হবে না। এ তন্ত্রে ব্যক্তির মহিমা স্বাতন্ত্র্য নাই—এ সমাজ বা গোষ্ঠী হবে মৌমাছির চাক বা পিপীলিকার বল্মীক; ব্যক্তিরা অবশ কর্ম্মীমাত্র—একটা বিপুল কঠোর যন্ত্রের চাকা পেরেক বোল্ট্ সব। স্বাধীন মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা গড়ে যে ঊর্দ্ধের ও অন্তরের জগৎ—কাব্য সাহিত্য শিল্প—সুন্দর সুকুমার, শ্রীময় ও হ্রীময় যা-কিছু, সে-সকলের নির্ব্বাসন এখানে,

* "Depuis la fin du moyen-age, les conquerants nuisaient peutetre a la civilisation, mais ils ne pretendaient pas la mettre en cause. Ils attribuaient a des motifs de necessite leurs excès et leurs crimes, mais ne songaient pas un instant a les presenter comme des actions exemplaires, sur quoi les nations soumises etaient invitees a modeler desormais leur morale, leur code, leur evangile........Depuis l'aube des temps modernes, les accidents de l'histoire militaire en Europe n'avaient jamais signifie pour elle la fin de ses valeurs spirituelles et morales les plus precieuses, et l'annulation brusque de tout le travail anterieurement fait par les generations, dans le sens du respect mutuel, de l'equite, de la bienveillance—ou pour tout dire en un seul mot—dans le sens de l'humanite."

France-Orient 1941, Octobre (Vol. I, 6).

তারা সৌখীন জিনিস, চিত্ত দুর্ব্বলকর জিনিস ব'লে। মানুষ হবে বিজ্ঞানের সাধক, অর্থাৎ সেই বিজ্ঞান, যার উদ্দেশ্য কেবল প্রকৃতির, জড় প্রকৃতির, উপর কর্তৃত্ব অর্জ্জন, যন্ত্রের অস্ত্র-শস্ত্রের সমারোহ, ব্যবহারিক জীবন-যাপনে কঠোর নিরেট সুষ্ঠুতা ও সাফল্য—এও এক ভাগ্যবান গোষ্ঠী-বিশেষের জন্য, সে-গোষ্ঠীর যূথবদ্ধ জীবনের জন্য, মানব জাতির সর্ব্বসাধারণের জন্য নয়, ব্যক্তির জন্যও নয়।

এই আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে যারা—সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় না হোক অন্ততঃ অবস্থার পাকে পড়ে দাঁড়াতে হয়েছে যাদের—তারা আজ মানব জাতির সমস্ত ভবিষ্যৎ, পৃথিবীর ভাগ্য বহন করছে। অসুরের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই তারা যে হয়ে উঠেছে সুর—দেবতা—তা মনে করবার কারণ নাই ; তবে তারা যে মানুষ, অসুর নয়, এই যথেষ্ট। অসুর অর্থ উন্নতির, ক্রমগতির, বিবর্ত্তনের শেষ। অসুরের পরিবর্ত্তন নাই, তা হ'ল একটা দৃঢ় ছাঁচ, একটা বিশেষ গুণকর্ম্মের অচলায়তন—স্বৈরতার অহং-সর্ব্বস্বতার আত্মম্ভরিতার দুর্ভেদ্য দুর্গ। মানুষেরই পক্ষে সম্ভব এই পরিবর্ত্তন। সে নীচে নামতে পারে অবশ্য, তেমনি সে উপরেও উঠতে পারে। পুরাণে ভোগভূমি ও কর্ম্মভূমি ব'লে একটা পার্থক্য দেখান হয়েছে। মানুষের আধার হ'ল কর্ম্মভূমি, মানুষের আধার দিয়েই নব নব কর্ম্ম হয়, সেই কর্ম্মের ফলে মানুষ উন্নত অবনত হতে পারে। ভোগভূমি হল সঞ্চিত কর্ম্মের ভোগমাত্র হয় এমন অবস্থা—সেখানে নূতন কর্ম্ম হয় না, চেতনার পরিবর্ত্তন ঘটে না। অসুরেরা ভোগময় পুরুষ, তাদের হল ভোগভূমি—তারা নূতন কর্ম্ম অর্থাৎ এমন কর্ম্ম যাতে চেতনার পরিবর্ত্তন রূপান্তর ঘটে তা করতে পারে না। তাদের চেতনা স্থাণু। অসুরদের পরিবর্ত্তন হয় না, তবে ধ্বংস হয় বটে। অবশ্য মানুষের মধ্যে আসুরিক বা আসুরভাবাপন্ন বৃত্তি ও গুণাবলী থাকতে নিশ্চয়ই পারে—কিন্তু এ সকলের সঙ্গে মানুষের আছে আরো কিছু, এমন একটা অন্তর জিনিস যার প্রেরণায় আসুরিক ভাবকে সে কাটিয়ে উঠতে পারে। তা ছাড়া অসুরের আসুরিক গুণাবলী আর মানুষের আসুরিক গুণাবলীতে বাহ্য সাদৃশ্য থাকলেও, রয়েছে একটা আন্তর বৈসাদৃশ্য—উভয়ের ঠাট, ছন্দ, স্পন্দ (timbre, vibration) বিভিন্ন। কার্য্যতঃ মানুষ যতই নিষ্ঠুর নির্দ্দয় স্বার্থপর অহংসর্ব্বস্ব হোক না, তবুও সে জানে স্বীকার করে—সব সময়ে না হোক, মোটের উপরে, বাহিরে না হোক, অন্তরে—যে এ সব ভাব আদর্শোচিত মোটেও নয়, তারা হেয় ও পরিহার্য্য। কিন্তু অসুর নির্ম্মম, তার হেতু এই যে নির্ম্মমতাই তার মতে আদর্শ, তার স্বভাব স্বধর্ম্ম, তার বরণীয় স্বভাব ও স্বধর্ম্ম, তার ইষ্ট। বলাৎকার তার স্বভাবের শোভা।

স্পেন আমেরিকায় যে অত্যাচার করেছে, রোম খ্রীষ্টীয়ানদের উপর যে উৎপীড়ন করেছে, খ্রীষ্টীয়ানরাও খ্রীষ্টীয়ানদের উপর যে পাশবিক ব্যবহার করেছে (Inquisition)—কিম্বা ভারতে কি আয়র্লণ্ডে কি আফ্রিকায় সাম্রাজ্য-স্রষ্টারা যে কীর্ত্তি করেছে, তা গর্হিত, অমার্জ্জনীয়, অনেক ক্ষেত্রে অমানুষিক। কিন্তু যখন তুলনা করি "নাজি" জর্ম্মনী পোলণ্ডে যা করেছে এবং সারা জগতেই যে কাজ করতে চায়, তখন দেখি উভয়ের মধ্যে কেবল মাত্রাগত নয় একটা গুণগত পার্থক্য রয়ে গেছে। এক ক্ষেত্রে হ'ল মানুষের দুর্ব্বলতার পরিচয়, আর এক ক্ষেত্রে অসুরের প্রবলতার পরিচয়। এ পার্থক্য যাদের চোখে ধরা পড়ে না তারা বর্ণান্ধ—এমন বহুলোক আছে যারা গাঢ় রং দেখলেই বলে কালো, আর ফিকে রং হলেই তা সাদা।

অসুরের জয় আপাততঃ হয় সর্ব্বত্র, কারণ তার শক্তি যেমন সুগঠিত সুব্যবস্থিত মানুষের শক্তি তেমন নয়, সহজে হতে পারে না। অসুরের শক্তির মধ্যে ছেদ নাই, তা নীরন্ধ্র নিরেট। মানুষের সত্তা স্বগত ভেদ ও বিরোধ দিয়ে গড়া এবং তাতে রয়েছে চেষ্টা ও সংঘাতের ভিতর দিয়ে একটা ক্রমগতি ক্রমসংস্কার ক্রমবৃদ্ধি। মানুষের শক্তি অসুরশক্তির বিরুদ্ধে ততখানি জয়ী হয়ে ওঠে যতখানি সে দেবশক্তির ধারায় আপনাকে অভিসিঞ্চিত ক'রে চলে। কিন্তু জগতে দেবতারা, দেবশক্তিরা রয়েছে পিছনে—কারণ সম্মুখের বাস্তব ক্ষেত্র অসুরেরই সম্পত্তি হয়ে আছে। বাহ্যক্ষেত্র, স্থূল আধার, দেহ প্রাণ মন সবই গড়া অজ্ঞান দিয়ে, অহংবোধ দিয়ে, মিথ্যাচার দিয়ে—তাই অসুর অবাধে সেখানে তার প্রভাব প্রতিপত্তি স্থাপন করতে পারে ও করেছে। মানুষ সহজেই অসুরের যন্ত্র হয়ে পড়ে—অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞানতঃ—পৃথিবী তাই অসুরের করতলগত। দেবতার পক্ষে পৃথিবী অধিকার করা, পার্থিব চেতনার উপর কোন কর্তৃত্ব স্থাপন করা আয়াস-সাপেক্ষ, সাধনাসাপেক্ষ, সময়সাপেক্ষ।

প্রাচীনতর যুগে মানুষের ঘোর কর্ম্মাবলীর মধ্যে, বিশেষভাবে গোষ্ঠীগত কর্ম্মৈষণার মধ্যে—আসুরিক প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে যে পড়েছে তার সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ বলতে হবে অসুর কি অসুরেরা স্বয়ং নেমেছে এবং একটা দৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ মানব গোষ্ঠীকে অধিকার ক'রে, নিজেদের

ছাঁচে তৈরী ক'রে পৃথিবীর উপর পূর্ণ বিজয়ের—বিশ্বমেধ-যজ্ঞে পূর্ণাহুতির—প্রয়াসে নেমেছে।

আমাদের দৃষ্টি এই কথা বলছে, আজকার যে মহাসমর তার ফলাফলের উপর নির্ভর করছে মানুষের সমগ্র ভবিষ্যৎ, পার্থিব জীবনের সমস্ত মূল্য। মানুষ এতদিন যে ক্রমোন্নতির ক্রমবিকাশের ধারায় চলে এসেছে—যত ধীর পদে হোক, যত সন্দেহজড়িত মনে প্রাণে হোক—সেই ধারায় সে চলতে পারবে অব্যর্থ সিদ্ধির দিকে—পূর্ণতর শুদ্ধতর মুক্ততর জ্যোতির্ম্ময় জীবনের দিকে—না, সে-পথ তার রুদ্ধ হয়ে যাবে, ফিরে আসতে হবে পূর্ব্বতন পাশব অবস্থার দিকে, অথবা তার চেয়েও নিকৃষ্ট গতির দিকে, অসুরের কবলিত হয়ে অন্ধ অসহায় দাসজীবন যাপন করতে, বা আত্মাকে হারিয়ে অসুরই হয়ে উঠতে কি ছিন্ন-মস্তক কবন্ধ হয়ে পড়তে। এই সমস্যা সম্মুখে।

আমাদের দৃষ্টি বলছে আজকার মহাযুদ্ধ হ'ল অসুরে আর দেবতার যন্ত্র মানুষে। অসুরের তুলনায় মানুষ দুর্ব্বল সন্দেহ নাই—পার্থিব ক্ষেত্রে; কিন্তু মানুষের মধ্যে আছে ভগবান—এই ভাগবতী শক্তি ও বীর্য্যের কাছে কোন অসুরেরই বিক্রম শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াতে পারে না। যে মানুষ অসুরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, দাঁড়িয়েছে বলেই সে নিয়েছে দেবতার পক্ষ, পেয়েছে ভাগবত আশীর্ব্বাদ। যুদ্ধের এই স্বরূপ সম্বন্ধে যত আমরা সজ্ঞান হব, যত সজ্ঞানে ক্রমোন্নতিশীল শক্তির স্বপক্ষে, দিব্যশক্তির স্বপক্ষে দাঁড়াব, ততই মানুষের মধ্যে দেবতার বিজয় অবশ্যম্ভাবী ও আসন্ন হ'য়ে আসবে, ততই আসুরিক শক্তি ক্ষীণবল হ'য়ে পিছনে হটে হটে যাবে। কিন্তু অজ্ঞানের বশে, অন্ধ রিপুর বশে, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি আর নীরন্ধ্র সংস্কারের বশে, যদি পক্ষ আর বিপক্ষে আমরা কোন ভেদ না করতে পারি তবে মানুষের দারুন দুর্দ্দশা আমরা ডেকে আনব।

এই যুগ-সঙ্কটে ভারতের ভাগ্যপরীক্ষাও হ'য়ে চলেছে। ভারতের স্বাধীনতাও ততখানি অনিবার্য্য ও সন্নিহিত হ'য়ে উঠবে যতখানি বর্ত্তমান দ্বন্দ্বের নিহিতার্থ তার জ্ঞান-গোচর হবে, আর সজ্ঞানে দেবশক্তির পক্ষে দাঁড়াবে, যতখানি হ'য়ে উঠবে ভাগবতী শক্তির যন্ত্র—সে যন্ত্র বর্ত্তমানে আপাত-দৃষ্টিতে যতই দোষ-ত্রুটি পূর্ণ হোক না, তার মধ্যে ভগবৎ প্রসাদের, দিব্য আশীর্ব্বাদের স্পর্শ লেগেছে বলেই সব বাধা-বিপত্তি উত্তীর্ণ হ'য়ে সে অজেয় বিজয়ী হ'য়ে উঠবে—একেই ত বলে পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং। তার ভাগ্য এখন এই পন্থা নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করছে।

ভারতের অন্তঃপুরুষের সম্মুখে আজ এসেছে একটা মহাসুযোগ, একটা মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত—যদি সে ঠিক পথটি বেছে নিতে পারে, কুপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বপক্ষকে আলিঙ্গন দিতে পারে—তবেই হবে তার যুগ-যুগান্তর ব্যাপী সাধনার পূর্ণ সার্থকতা। যে অমূল্য সম্পদ, অধ্যাত্মের যে সঞ্জীবনী শক্তি তার সাধুসন্তমণ্ডলীর সাধনা-পরম্পরায় সে জীইয়ে রেখেছে—পুষ্ট করেছে—মানব জাতির মুক্তির জন্য, পৃথিবীর রূপান্তরের জন্য—যে বস্তুটির জন্যই ভারতের অস্তিত্ব এবং যাকে হারালে ভারতের কোন অর্থ থাকে না, পৃথিবী ও মানব জাতিও হারায় সব সার্থকতা, আজ পরীক্ষার দিনক্ষণ এসেছে তাকে আমরা ভারতবাসীরা চিনতে পারি কি না, তার জন্যে পথ ক'রে দিতে পারি কি না—আজকার জগদ্ব্যাপী যুদ্ধে এক পক্ষের জয় হ'লে যে পথ খোলা থাকবে, প্রশস্ত হবে, নির্ব্বিঘ্ন হবে আর অপর পক্ষ জয়ী হ'লে সে পথ চিরকালের জন্য হয় ত—অন্ততঃ বহু যুগের জন্য—রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। কেবল বাহ্য দৃষ্টি দিয়ে নয়—সুবিধার চাল বা কুটনীতির ছলকে আশ্রয় ক'রে নয়—অন্তরের নির্নিমেষ চেতনা দিয়ে পক্ষাপক্ষ আমাদের চিনে নিতে হবে, সমগ্র সত্তা দিয়ে পক্ষকে বরণ ক'রে নিতে হবে, অপক্ষের বিরোধী হয়ে উঠতে হবে। যাকে মিত্রপক্ষ বলা হয়েছে তারা সত্যই আমাদের মিত্রপক্ষ—তাদের শতসহস্র দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তারা দাঁড়িয়েছে আমরা চাই যে সত্যের স্ফুরণ ও প্রতিষ্ঠা তারই পক্ষে। সুতরাং এরাই আমাদের স্বপক্ষ—কায়মনোবাক্যে এদের সঙ্গী-সাথী হয়ে আমাদের দাঁড়াতে হবে—যদি মহতী বিনষ্টি হ'তে উদ্ধার চাই।

দুর্য্যোধনের পক্ষে ছিল তার শত ভ্রাতা, আর ছিলেন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণের মত মহারথীবৃন্দ—তবুও, যত দুঃখকষ্টের পরে হোক আর যত সুদীর্ঘ কাল পরেই হোক পরিশেষে জয় হ'ল পঞ্চ পাণ্ডবের, কারণ তাঁদের পক্ষে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আর ধনুর্দ্ধর পার্থ অর্থাৎ যেখানে ভগবান্ স্বয়ং আর তাঁর যন্ত্রভূত আদর্শ মানুষ সেখানেই অব্যর্থ বিজয়, পূর্ণসিদ্ধিশ্রী।

আমরা চলেছি কোন্ পথে, আমরা চলব কোন্ পথে আমাদের বিধিলিপিতে অগ্নিবর্ণে এই প্রশ্ন ফুটে উঠেছে—আমাদের কর্ম্ম কি উত্তর দেবে আজ?

প্রশ্ন

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

১২

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে—অবনী এখনও ফিরে নাই। সকলের আহারাদি হইয়া গিয়াছে, ঠাকুর অবনীর রাত্রের খাবার তাহার ঘরে ঢাকা দিয়া চলিয়া গিয়াছে। অনাদিনাথের শেষরাত্রে আর ঘুম হয় না—প্রথম দিকে যা একটু ঘুমাইয়া লন—তাই তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। নীরেন এতক্ষণ লতিকার পাশে বসিয়া ঘুমে ঢুলিতেছিল, এই অল্পক্ষণ লতিকা তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বারান্দায় আসিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাত্রি সাড়ে দশটা এইমাত্র বাজিয়া গেল। লতিকা অবনীর কথাই ভাবিতেছিল—সে এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় গেল—এখনও কেন ফিরিতেছে না—এত দেরি ত কোন দিনই হয় না, বিকালে অজিতের সঙ্গে বচসা হইয়াছে কিন্তু তাহাতে অবনীর কি? তাহার বাবা তো অবনীকে কিছু বলেন নাই? না - সে অসম্ভব—সে প্রকৃতিই তাঁহার নয়। তবে অবনীর আজ কি হইয়াছে? এই সব নানা প্রশ্ন একের পর এক তাহার মনে আসিতেছিল। হঠাৎ সিঁড়ির দিকে জুতার শব্দ হইল—লতিকা ফিরিয়া দেখিল অবনী তাহার ঘরে গিয়া ঢুকিতেছে। লতিকা ঘরে ঢুকিয়া দেখে অবনী চেয়ারটার উপরে ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিয়া চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া আছে। আজ এই একটা বেলার মধ্যে তাহার চেহারার একি পরিবর্ত্তন হইয়াছে? চোখ গিয়াছে বসিয়া, সারা মুখের উপরে একটা কাল কাল বিবর্ণ ভাব, মাথার চুল এলোমেলো, লতিকার পায়ের শব্দে অবনী চোখ মেলিয়া চাহিল কিন্তু কিছুই বলিল না। লতিকা কাছে আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া চমকিয়া উঠিল, "একি কাপড়-জামা যে এখনও বেশ ভিজে! তোমার ভাব কি বল ত? বিকালবেলা বাড়ী থেকে বেরুলে কিন্তু একটা ছাতা পর্য্যন্ত নিলে না—এই বৃষ্টি গেল মাথার উপর দিয়ে—এলে রাত এগারটায়—কি হয়েছে?"

—কিছুই ত হয় নি?

—আচ্ছা আগে কাপড়-জামা ছাড়—ঠাকুর ওপাশে খাবার ঢাকা দিয়ে গেছে খেতে ব'সো, তার পর সব শুনবো। বলিতে বলিতে লতিকা কাপড়-জামা দিল আগাইয়া। কাপড়-জামা ছাড়িয়া অবনী আহারে বসিল। লতিকা বসিল তাহারই সম্মুখে। কিছুক্ষণ পরে অবনী এক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবিয়া লইয়া লতিকার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—কাল আমি চলে যাচ্ছি লতা।

—চলে যাচ্ছ? কোথায়?

—আমাদের বাসায়—সেই বস্তির বাড়ীতে।

—তার মানে? তুমি আজ সবই হেঁয়ালী ক'রে বলবে? না আমাকে পরীক্ষা করছ? তোমার এই বেলার ব্যবহার, তোমার চেহারা এই সব আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। আমার মাথা খাও—তোমার পায়ে পড়ি—আমাকে আর ভাবিয়ো না। সত্যি ক'রে বল তোমার কি হয়েছে!

—আমার কি হয়েছে—সে শুনে কাজ নাই। কিন্তু তুমি এত দিন আমার কাছে এ সব গোপন করেছ কেন?

—গোপন করেছি কি?

—তোমার বিয়ে হয়ে আছে ঠিক—তোমার ভাবী বর অজিতবাবু।

লতিকা এক মুহূর্ত্তে উঠিল উত্তেজিত হইয়া—ভাবী বর অজিতবাবু? কে বলেছে তোমাকে?

—তোমার বাবা!

—আমার বাবা! মিথ্যা কথা!

—তা হ'লে আমি মিথ্যাবাদী!

—কিন্তু তুমি বল—এ তোমার পরিহাস নয়—সত্যি?

—সত্যি!

—বাবা কেন বললেন?

—তুমি ঘর থেকে চলে এলে অজিতবাবুর সঙ্গে আমার বচসা হয়—আমি যখন কিছুতেই আর থাম্‌ছি না, তখন তোমার বাবা আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন—'অবনী কর কি, অজিত লতার ভাবী বর।'

লতিকা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তাহার চোখ মুখের রং গেল বদলাইয়া কিন্তু অবনী তাহা দেখিল না—দেখিবার মত মনের অবস্থা তখন তাহার নয়।

লতিকা বলিল—তাই বাবা অজিতবাবুকে দিয়েছেন

এত প্রশ্রয়, কিন্তু আমি যদি কোন দিন এ সন্দেহ করতাম তা হ'লে কবে এ সব মিটে যেত। কিন্তু তুমি ভেবো না—বাবার মত আমি বদলাব—অজিত আমার ত্রিসীমানায়ও আসতে পারবে না।

—কিন্তু তুমি তোমার বাবার মতের অবাধ্য হ'তে পারবে?

—বলেছি ত সে বুঝা-পড়া করব আমি।

—কিন্তু লতা তুমি কাকে সামনে ক'রে করবে যুদ্ধ—আমি যে একান্ত শক্তিহীন।

—কাউকে সামনে ক'রে যুদ্ধ না-হয় নাই বা করলাম, শুধু অজিতবাবুকে যে আমি বিয়ে করবো না এই যথেষ্ট রাত হয়েছে আমি যাই, তুমি মিথ্যা চিন্তা ক'রে মাথা খারাপ ক'রো না। ঘুমোও—বলিয়া লতিকা বাহির হইয়া গেল।

সেদিন রাত্রে অবনী স্বপ্ন দেখিল—সে হইয়াছে একজন বড় চাকুরে—বিকালে আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইজিচেয়ারের উপরে গা এলাইয়া দিয়া আলস্যভরে সিগারেট টানিতেছে—পাশে আছে লতিকা দাঁড়াইয়া।

পরিপূর্ণ সাজ-সজ্জায় যেন অপরূপ দেবী, কোলে তাহার ছোট্ট একটি খোকা—অবনী আর লতিকা মাঝে মাঝে করিতেছে রহস্যালাপ, মস্ত বাড়ী, তাহাদের টাকা-পয়সা দাস-দাসী আরও কত!

ভোরবেলায় অবনীর ঘুম গেল ভাঙিয়া—সুখের স্বপ্ন ফুরাইল। চাকুরী অর্থ ইহারই মায়া-মরীচিকায় সারা জীবন হয়ত তাহাকে ঘুরিয়া মরিতে হইবে, কিন্তু এই নীরস মরুভূমিতে না মিলিবে এক ফোঁটা জল—না মিলিবে সারা জীবনে একদিনের শান্তি।

লতিকা তাহাকে ভালবাসে। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সে গলা ফাটাইয়া সমস্ত জগতকে তাহার আনন্দের কথা শুনাইয়া দেয়। এখনই যাইয়া নিরাপদকে পরেশকে বলিয়া আসে। এ তার বামন হইয়া চাঁদে হাত! অনাদিনাথ যদি রাজী হন তবুও চিরকাল তাহাকে থাকিতে হইবে তাঁহারই গলগ্রহ হইয়া। জগতে অন্ন-সমস্যা প্রথম এবং প্রধান সমস্যা—তার পর স্নেহ-প্রেম-প্রীতি যা-কিছু সব। স্ত্রী, মা, বোন ইহাদের মুখের অন্ন সে সংগ্রহ করিবে কেমন করিয়া! এই চিন্তা মাথায় আসিতেই তাহার মনের সকল আনন্দ—সকল উৎসাহই এক নিমিষে যেন নিবিয়া গেল।

১৩

পরেশ যে ডাক্তার বন্ধুটির বাসায় প্রায়ই বেড়াইতে যাইত তাহার নাম শচীনাথ। পরেশ তাহার মাসীর বাড়ীতে থাকিয়া ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে—এই মাসীর বাড়ীর গ্রামেই শচীনাথের বাড়ী। তাই সেখান হইতেই হইয়াছে শচীনাথের সহিত তাহার পরিচয়। পরেশ যখন থার্ড ক্লাসে তখন মাসীর বাড়ী যাইয়া পড়া আরম্ভ করে, শচীনাথ তখন কলিকাতায় ডাক্তারী পড়িত। তার পর বৎসর-খানেক পরে ডাক্তারী পাস করিয়া শচীনাথ গ্রামে আসিয়া রীতিমত প্র্যাকটিস সুরু করিয়া দিল।

গ্রামের সকল ছেলেই ছিল শচীনাথের একান্ত অনুগত, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, কুস্তি—একটি আখড়া করিয়া সে নিয়মিত ছেলেদের শিখাইতে লাগিল এই সব। পরেশ অল্প দিনেই হাত পাকাইয়া উঠিল। তাই শচীনাথের নজর পড়িয়া গেল। এদিকে তাহার প্র্যাক্‌টিসও জমিয়া উঠিল বেশ, কিন্তু হঠাৎ এক দিন সকলে অবাক হইয়া দেখিল শচীনাথের ডিসপেনসারীতে চাবি পড়িয়াছে। শচীনাথ তাহার মোটঘাট সব বাঁধিয়া কলিকাতায় রওনা হইয়া গেল। সেখানেই করিবে প্র্যাক্‌টিস। তার পর পাঁচ-ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে—ইহার মধ্যে পরেশের সহিত শচীনাথের আর দেখা হয় নাই, কলিকাতায় আসিলে দৈবাৎ এক দিন পরেশের সহিত শচীনাথের দেখা হইল।

বৌবাজারের দিকে এক অন্ধকার গলি ধরিয়া পরেশ এক দিন রাস্তাটা একটু সংক্ষিপ্ত করিয়া লইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা পুরাতন বাড়ীর সামনেকার দরজায় দেখিতে পাইল একটি ছোট্ট সাইন-বোর্ড টাঙান—তাতে লেখা—'ডাঃ শচীনাথ চক্রবর্ত্তী এল, এম, এফ,' পরেশ থামিয়া গেল—মনে হইল এ কোন্ শচী? ভিতরের দিকে উঁকি মারিয়া তাকাইতেই একেবারে শচীনাথের সহিতই হইয়া গেল সাক্ষাৎ। পরেশ ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল—বাহিরের দিকের বৈঠকখানাটি ধূলিমলিন। ভিতরের দিকে কয়েকখানি ছোট ছোট ঘর, কিন্তু সেগুলি যেমন অন্ধকার তেমনি স্যাঁতসেতে।

ভিতরের একটি ঘরে শচীনাথ পরেশকে লইয়া গেল। সেখানে কয়েকখানা আধ-ভাঙা লোহার চেয়ারে কয়েক জন যুবক বসিয়া চা পান করিতেছে, নিকটে একটি ষ্টোভে জল গরম হইতেছিল। শচীনাথ নিজে এক পেয়ালা চা করিয়া পরেশকে খাওয়াইয়া বিদায় দিল।

অন্য কাহারও সহিত সেদিন পরেশের না হইল কোন কথা, না লইল কেহ তাহার পরিচয়। সেই হইতে শচী-নাথের নিকটে চলিতে লাগিল মাঝে মাঝে পরেশের যাওয়া-

আসা। শচীনাথের ছিল একটা অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব—যাহার প্রভাবে সে মানুষকে মুগ্ধ করিতে পারিত।

কথায় কাজে দশ জনকে টানিয়া-আনিয়া বশীভূত করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল। কিছু দিন আসা-যাওয়া করিয়াও কিন্তু পরেশ বুঝিতে পারিল না—শচীনাথ ডাক্তারী করে কখন? আর কে-ই বা তাহাকে দেয় "কল"। যেখানে অলিতে-গলিতে এম-বি বিলাত-ফেরত সেখানে শচীনাথের ডাক্তারী জমিবে কেমন করিয়া? গ্রামে থাকিতে শচীনাথ "কলে" বাহির হইয়া পকেটে আট-দশ টাকা না লইয়া কোন দিন ফিরিত না—সেই শচীনাথ কিসের মোহে এখানে পড়িয়া আছে পরেশ তাহা ভাবিয়া পাইল না। ডাক্তারী শচীনাথের ছল, ইহারই অন্তরালে যে অন্য কিছু লুকাইয়া আছে এ সন্দেহই পরেশ করিত।

এমনই ভাবে মাঝে মাঝে মাস-তিনেক পরেশ শচীনাথের সহিত মিশিতে মিশিতে শেষে বুঝিতে পারিল সে একজন পাকা 'এনার্কিষ্ট' এবং শচীনাথের এই যে মেলামেশা ইহাও শুধু পরেশকে দলে টানিবার মতলব ছাড়া আর কিছুই নয়। কথাটা সঙ্গে সঙ্গেই পরেশ আসিয়া নিরাপদকে বলিয়া ফেলিল। সেই দিন হইতে শচীনাথের সহিত পরেশের দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া গেল একেবারে বন্ধ। কিন্তু মাস-তিনেক পরে মালতীর অসুখে আবার নিরাপদই পরেশকে পাঠাইল শচীনাথকে ডাকিতে। সেদিন অভাবের তাড়নায় নিরাপদ আগের নিষেধের কথা আর তেমন করিয়া বিবেচনা করে নাই। সেই হইতে আবার মাঝে মাঝে শচীনাথের নিকট পরেশের যাওয়া-আসা চলিতে লাগিল। শচীনাথ জলন্ত আগুনের মত—সে মানুষের উপরে বিশেষ একটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত। যাহারা তাহার প্রভাবে পড়িত তাহারা হিতাহিত জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নটা খুব বড় করিয়া সব সময়ে ভাবিয়া উঠিতে পারিত না। পতঙ্গ জলন্ত অনলে পুড়িয়া মরে, কিন্তু এই ধ্রুব মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তের যে আনন্দ, যে উন্মাদনা সেটুকু অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই। জলন্ত অনল তাহাদিগকে হাতছানি দিয়া ডাকিতে থাকে, সেই ডাকে পতঙ্গের সারা অন্তর উঠে পরম উল্লাসে নৃত্য করিয়া—এই পরম উল্লাসের নিকট জীবন-মরণের প্রশ্ন অবান্তর!

কোন কোন মানুষেরও থাকে এমনি জলন্ত আগুনের মত আকর্ষণী শক্তি, তাহারা দলে দলে মানুষকে আনে আকর্ষণ করিয়া—বলির জন্য—মৃত্যুর জন্য। সম্মুখে থাকে হয়ত একটা আদর্শ—দেশভক্তি—না হয় অন্য আরও কিছু। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এই আদর্শটাই সব নয়। এই আদর্শের পিছনে থাকে যে ব্যক্তিটির প্রভাব তাহাকে বাদ দিলে সমস্তই হয়ত বৃথা হইয়া যায়। শচীনাথ এমনি আকর্ষণেই অনেককে টানিত।

সেদিন বিকালে পরেশ বৌবাজারের দিকে আসিয়াছিল—ইচ্ছা হইল এক বার শচীনাথের সহিত দেখা করিয়া যায়। গলির মোড়ে আসিতেই দেখিতে পাইল সেখানে তিন-চার জন পুলিস একেবারে ধড়াচূড়া বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে—পরেশ বিশেষ কিছু সন্দেহ করিল না। কিন্তু কিছু দূরে যাইতে না যাইতেই এই অন্ধকার গলির মধ্যে আরও প্রায় ছয়-সাত জন সার্জ্জেণ্ট ও দেশী পুলিসের সহিত হইল দেখা। পরেশের মনে ক্রমে সন্দেহের ছায়া গভীর হইয়া আসিল।

বাড়ীটার ফটকের নিকট হইতে ভিতরে মাথা গলাইয়া তাকাইয়া পরেশ একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। বাড়ীটা সার্জ্জেণ্টে পুলিসে একেবারে একাকার। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইতেছিল। হঠাৎ ভিতর হইতে এক জন সার্জ্জেণ্ট তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। অগত্যা পরেশ ফিরিয়া দাঁড়াইল। তার পর আরম্ভ হইল প্রশ্নবাণ, কিন্তু তাহাতেও তাহার মুক্তি মিলিল না। সি. আই. ডি. বিভাগের হেড্ আফিস পর্য্যন্ত তাহাকে যাইতে হইল এবং দুই দিন সেখানে নানাভাবে কাটাইয়া অবশেষে তৃতীয় দিনে বাসায় ফিরিতে পারিল।

বলা বাহুল্য, এই অতর্কিত আক্রমণ ও খানাতল্লাসি করিয়া পুলিস শচীনাথের বাড়ীতে খানকয়েক ভাঙা টিনের চেয়ার ও দুই-একটি ঔষধের লেবেলওয়ালা খালি শিশি বোতল ভিন্ন অন্য কিছুই পায় নাই।

১৪

পরেশ ত গেল গ্রেপ্তার হইয়া থানায়, এদিকে নিরাপদ মালতী কেহই তাহার কোন সন্ধানই জানিল না। ঘটনার পরের দিনও যখন পরেশ বাসায় ফিরিয়া আসিল না তখন নিরাপদ ও মালতী রীতিমত ভীত হইয়া উঠিল। এই কলিকাতা শহর—এখানে পথে ঘাটে নানা বিপদ সর্ব্বদা ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে—কখন কাহার উপরে লাফাইয়া পড়িবে, কে বলিতে পারে? উপরে ট্রাম গাড়ীর বৈদ্যুতিক তার—নীচে ট্রাম, মোটর, ঘোড়ার গাড়ী ইহাদের ক্ষুধা মিটাইতেছে কত লোক! নিরাপদ ভাবিয়া পাইল না এমনি কোন বিপদ ছাড়া আর কি হইতে পারে?

মালতী একেবারে ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, সেদিন আর তাহাদের হাঁড়ি চড়িল না। পরের দিন নিরাপদ গিয়া অবনীকে দিল খবর, তার পর সারাটা দিন দুই জনে মিলিয়া এখানে সেখানে অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে শহরের সমস্ত হাসপাতালগুলি অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, কিন্তু কোথাও কোন খোঁজ খবর কিছু মিলিল না। বিকাল-বেলা খোঁজাখুঁজি করিয়া শ্রান্ত দেহে নিরাপদ বাসায় ফিরিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল—সারা বস্তিটা পুলিসে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, নিজের ঘরের নিকটে গিয়া দেখিল ভিতরের জিনিসপত্র সব চারিদিকে ছড়ান,—ঘরের বারান্দায় তিন-চার জন পুলিস দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদেরই একজন বোধ হয় দলের সর্দ্দার হইবে—মালতীকে কি সব যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে, আর জবাব মনের মত না হইলে মাঝে মাঝে ধমক দিতেছে। মালতী আছে ঘরের মধ্যে দরজার অন্তরালে দাঁড়াইয়া—সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কোন রকমে কথার জবাব দিতেছিল। ব্যাপার দেখিয়া নিরাপদ সোজা আসিয়া যে পুলিস অফিসারটি মালতীকে প্রশ্ন করিতেছিল তাহার নিকটে জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি—তাহারা কি চায়?

কিন্তু তাহারা চাহিতেছিল নিরাপদকেই। নিরাপদের ঘরে খানাতল্লাসি শেষ করিয়া তাই তাহারা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া আছে। পুলিস অফিসারটি নিরাপদের পরিচয় পাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তার পর যে প্রশ্নবাণ এতক্ষণ ধরিয়া মালতীর উপরে বর্ষিত হইতেছিল তাহা এখন নিরাপদের উপরে বর্ষিত হইতে লাগিল। প্রশ্নগুলি সবই প্রায় পরেশের সম্বন্ধীয়, ঘরে আপত্তিজনক কিছু না পাইয়া তাহাদের উত্তেজনা এমনই কমিয়া গিয়াছিল—তার পর নিরাপদের জবাবগুলি তাহাদের মনের মত হওয়ায় তাহারা তাহাকে রেহাই দিয়া প্রস্থান করিল।

কিন্তু এত বড় যে একটা দুর্ঘটনা, ইহাতে নিরাপদের মন ভাঙিয়া ত পড়িল না বরং সে অনেকটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। পরেশ হয়ত তাহা হইলে রাস্তার মাঝে গ্রেপ্তার হইয়াছে, সে যাহাই করুক—অপরাধ তাহার যতই গুরুতর হউক ক্ষতি নাই—তবু ত বাঁচিয়া আছে। আজ এই দুই দিন ধরিয়া তাহার সন্ধান না পাইয়া নিরাপদ তাহার নিশ্চিত মৃত্যুই ধারণা করিয়া রাখিয়াছিল।

মালতীকে ডাকিয়া সমস্ত ব্যাপার তাহাকে বুঝাইয়া কতকটা শান্ত করিল। রাত্রি আট-নয়টার সময় পরেশ বাসায় ফিরিয়া আসিল। সারা শরীর তখন তাহার জ্বরে আর বেদনায় ভাঙিয়া পড়িতেছিল। বাসায় আসিয়া নিরাপদ ও মালতীকে সে সকল ঘটনা খুলিয়া বলিল। দুই দিনের মধ্যে পরেশের জ্বর আর শরীরের বেদনা সারিয়া গেল বটে, কিন্তু কুগ্রহ কাটিল না। এখন হইতে প্রায়ই জন দুই করিয়া লোক তাহাদের গলির মোড়ে তাহাদেরই ঘরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যাইতে লাগিল। পরেশ ও নিরাপদ কখনও বাহিরে যাইতে হইলেই অলক্ষ্যে তাহারা পিছু লইত। ইহা কেন? কোন্ অপরাধের জন্য—পরেশ বা নিরাপদ তাহা ভাবিয়া পাইত না। অথচ এই দুই জোড়া সতর্ক দৃষ্টি সব সময়ই তাহাদিগকে কেমন সঙ্কুচিত ও বিব্রত করিয়া তুলিত।

এই ব্যাপারে নিরাপদ ও পরেশ দুই জনেই মনে মনে রীতিমত শঙ্কিত হইয়া উঠিল। এই যে যাহারা স্থানে স্থানে সতর্ক দৃষ্টি ফেলিয়া সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায় ইহাদের সম্বন্ধে তাহারা সত্য মিথ্যা অনেক গল্প শুনিয়াছে—সমস্ত মিশাইয়া মনে মনে তাহারা ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু সত্য মিথ্যা ধারণা করিয়া লইয়াছে, তাই কোন্ সময় কোন্ অকৃত অপরাধের বোঝা ঘাড়ে আসিয়া পড়ে এই আশঙ্কা করিয়া নিরাপদ এখানকার বাসা উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিল।

কোথায় কিরূপ ভাবে তাহারা উঠিয়া যাইতে পারে এই চিন্তায়ই সে রহিল। ইহারই দশ-বার দিন পরে পরেশের এক মেসো বর্ম্মা হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন—সেখানে "ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে" একটা কাজ খালি আছে, পরেশের জন্য তিনি তদ্বির করিয়া সব ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। আগামী মাসের শেষ সপ্তাহে আসিয়া তাহাকে কাজে লাগিতে হইবে।

মাহিনা বেশ মোটা রকমের, তবে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, কিছু ভয়ের কারণও আছে। এই চিঠি পাইয়া নিরাপদ, পরেশ ও অবনী তিন জনে পরামর্শ করিতে বসিল। ঠিক হইল পরেশ চাকুরী করিতে বর্ম্মা যাইবে। পরেশ অবনী ও নিরাপদকে ছাড়িয়া একা একা এত দূরে যাইতে চাহে নাই। সে প্রস্তাব করিয়াছিল—অবনী, নিরাপদ ও মালতী সকলেই তাহার সঙ্গে যাইবে—এখন এখানে যেমন সংসার পাতিয়াছে বর্ম্মা যাইয়াও সেইরূপ সংসারই পাতিবে। নিরাপদ ত এই সংসারের কর্ত্তা আছেই, পরেশ চাকুরী করিবে মাত্র অন্য কোন দায়িত্ব লইবে না, কিন্তু নিরাপদ রাজী হয় নাই, কারণ তাহার কাকা সম্প্রতি বড় কঠিন অসুখে পড়িয়াছেন—জীবনের আশা

নাই—তিনি বড় অনুতাপ করিয়া এই সেদিন মাত্র পত্র দিয়াছেন, কাজেই যত মনোমালিন্যই থাকুক এই সময়ে সে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। অবনীর বাড়ীতে মা বোন আছে—সে অত দূরে গেলে তাঁহাদেরই বা দেখিবে কে? আর তাছাড়া অবনীর চিত্ত এখন লতিকার ব্যাপার লইয়া একান্ত বিচলিত হইয়া আছে। অনাদিবাবু তাহার হাতে লতিকাকে সমর্পণ করিবেন কি না এইটাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বড় আশঙ্কা! পরেশ তো যাইবে স্বীকার করিল, কিন্তু মালতীর কথা চিন্তা করিয়া তাহার সঙ্কল্প ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। মালতীকে সে তিলে তিলে যে এতখানি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে তাহা সেও জানিত না।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে বড় গরম পড়িয়াছিল। নিরাপদ কোথায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, কিন্তু পরেশ ঘরের ভিতরে বিছানায় লম্বা হইয়া শুইয়া চোখ বুজিয়া কত কি ভাবিয়া যাইতেছিল। এখান হইতে চলিয়া গেলে সে জন্মের মত মালতীকে হারাইবে, কিন্তু তাহা তাহার পক্ষে মর্ম্মান্তিক! মালতীকে বিবাহ করা যায় কি না—তার কি কোনই পথ নাই—নিরাপদকে এই কথাই আজ সে খুলিয়া বলিবে। যদি তাহা একান্তই অসম্ভব হয়, তবে রহিল তাহার বড় চাকুরী—রহিল তাহার মাসিক দুই শত টাকা মাহিনা—সে বর্ম্মা কিছুতেই যাইবে না। কিন্তু আবার এই সুযোগ যদি সে ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে সারা জীবন হয়ত এই বস্তির বাড়ীতেই কাটাইতে হইবে। আর কি কোন দিন কোন সুযোগ আসিবে? তাহার রাগ হইতেছিল নিরাপদের উপরে, অবনীর উপরে। তাহারা কেন তাহার সহিত বর্ম্মা যাইতে চাহে না? দুই-শ টাকায় ত তিন জনের দিব্যি চলিয়া যাইত আর মালতীও যাইতে পারিত তাহাদের সহিত। পরক্ষণেই ভাবিতেছিল তাহাতেই বা তাহার কিসের লাভ? মালতীকে তাহার আপনার করিয়া চাই—পত্নীরূপে চাই—তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? মালতী যেন কোথায় গিয়াছিল—ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল পরেশ একেবারে ঘামিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। বিছানার উপর হইতে পাখাখানা তুলিয়া লইয়া সে পরেশকে বাতাস করিতে বসিল। পরেশ চোখ মেলিতেই মালতী হাসিয়া ফেলিল—বলিল এই বুঝি আপনার ঘুম? কিন্তু মালতীর হাসি আজ বড় নির্জীব—তাহাতে প্রাণের আভাস নাই।

—এই গরমের ভিতর ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে কি করছেন বলুন ত?

—ভাবছি অনেক কথাই মালতী—তুমি এসেছ বেশ হয়েছে—আমি তোমাকেই নিরিবিলি চাচ্ছিলাম। আমার বর্ম্মা যাওয়া ঠিক হ'ল, নিরাপদ আর অবনী এই মাত্র উঠে গেল। তাদের মত আমাকে বর্ম্মা যেতেই হবে।

—যেতেই হবে? না—আপনি যেতে পারবেন না। বর্ম্মায় আমার কাকা ছিলেন—তিনি সেখানকার চাকুরী ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছেন। বর্ম্মার লোক নাকি এখন আর আমাদের দেশের লোককে দেখতে পারে না—তারা ছোরা মারে, খুন জখম করে, কিছুই তাদের বাধে না। না—সে কিছুতেই হবে না—বড়দা ছোড়দা মত দিলে কি হবে—আমি মত না দিলে তুমি কি জোর ক'রে যাবে। আর আমি থাকব কার কাছে? আমাকে কি নিয়ে যাবে—না এই কলকাতার রাস্তার মাঝে ছেড়ে দিয়ে যাবে? বলিতে বলিতে মালতী কাঁদিয়া ফেলিল।

পরেশ উঠিয়া মালতীকে নিজের কাছে টানিয়া আনিল—মালতী পরেশের কোলের উপরে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

—আমি সেই কথাই ভাবছিলাম মালতী, আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না—যেতে পারব না। থাক্ আমার বড় চাকরি—থাক, আমার বড়লোক হওয়ার আশা।

—কিন্তু তুমি ওঠ শীগগির, নিরাপদ এল বুঝি। বলিয়া পরেশ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নিরাপদ বাজারে গিয়াছিল, কি সব জিনিসপত্র লইয়া ঘরে ঢুকিল।

ক্রমশঃ

শিল্প সাধনা*

শ্রীনন্দলাল বসু

উপনিষদ বলে, আনন্দ থেকেই সমস্ত বিশ্বভুবনের উৎপত্তি হয়েছে। সেই আনন্দ সমস্ত সুখদুঃখ নিয়ে অথচ সুখদুঃখের অতীত। আর্টিস্টও সৃষ্টি করে—সৃষ্টি করার আনন্দে। কোনো শিল্পবস্তু যথার্থ সৃষ্টির পর্য্যায়ে পড়ল কি না তার বিচারও হয় ঐ থেকে। আনন্দ থেকে যদি কোনো একটি চিত্র বা মূর্তির উদ্ভব হ'য়ে থাকে, অন্যকেও তা আনন্দের স্বাদ দেবে। প্রকৃত শিল্প-সৃষ্টি জীবন্ত, তার মৃত্যু নেই। যদি অজন্তা-ইলোরার সমস্ত চিত্র ও মূর্তি নষ্ট হয়ে যায়, আসলে তবুও তার নাশ নেই। কারণ, রসিকের চিত্তে তখনও তা অমর হ'য়ে থাকবে। যদি এক জন আর্টিস্টও তা দেখে থাকে, তারই কাজের ভিতর তার প্রভাব, তার সত্তা কাজ করবে। অর্থাৎ, দাঁড়াল এই যে, শিল্প যেহেতু সৃষ্টি সেহেতু তা জীবধর্মী; জীবেরই মত তার অস্তিত্বের ধারা পুরুষানুক্রমে ব'য়ে চলে।

অনেক কাল আগে আচার্য প্যাট্রিক গেডিস্ শান্তি-নিকেতন আশ্রমে এসেছিলেন। তখন আমরা দেয়ালে ছবি (fresco) আঁকবার চেষ্টা করছিলাম; ঠিকমত উপকরণের অভাবে ও করণকৌশল (technique) ভাল ক'রে না জানাতে অল্পকাল পরে সে চেষ্টা ছেড়ে দিই। আচার্য গেডিস্ তা দেখে দুঃখিত হলেন। তিনি বললেন, "আঁকবে না কেন? যদি কাঠ-কয়লা দিয়েও আঁক আর সে ছবি ভাল হয়, যদি এক জন লোকও তা দেখে, তা হ'লেই জেন তোমার কাজ করা সার্থক হয়েছে। নিরুদ্যম হয়ে যদি ব'সে থাক, তোমার ভাব কল্পনা যা-কিছু তোমার ভিতর জেগে উঠে তোমাতেই লয় পাবে, তুমিও তা ভাল ক'রে জানবে না, অন্যেরও তা গোচরে আসবে না।..."

সকল শিল্পের লক্ষ্য এক। কবিতা, মূর্তি, চিত্র, নাচ, গান, সবই সৃষ্টির মূল আনন্দের ছন্দকে আপন আপন ছন্দে ধরতে চায়। সে হিসাবে যোগ-সাধনার সঙ্গে শিল্প-সাধনার মিল আছে। অধ্যাত্ম-সাধনায় সৃষ্টির সমুদয় বৈচিত্র্যের অন্তরালে ঐক্যের সন্ধান করা হয়—একের সন্ধান করা হয় যাকে জানলে সব-কিছুকেই জানা যায়। শিল্পও ঠিক ঐ ভাবে বিরাট্ একের সন্দর্শন মানসে চলেছে। এক চীনা আর্টিস্ট বলেছেন, "দেবতার মূর্তি আর দূর্বার অঙ্কুর, যথার্থ আর্টিস্টের নিকট দুইয়ের একই মূল্য; একই রস-প্রেরণা জাগাবার শক্তি দু-জনে ধরে।" তা হ'লেই দেখুন, শিল্পীর পক্ষে একের ধারণা করা কতখানি সম্ভব। অবশ্য, দেবমূর্তির প্রতি অশ্রদ্ধার কোনো কথা নয়, কেবল দূর্বার অঙ্কুরের প্রতি সমান শ্রদ্ধা প্রয়োজন।

শিল্প-সাধনায় শিল্পী সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে যায়। আর্টিস্টের নিজের ব্যক্তিগত আবেগ আকাঙ্ক্ষা সংস্কার—সবই আছে। কিন্তু, এই মুহূর্তে সে একটি ভাবের আবেগে বিচলিত হচ্ছে আর পর-মুহূর্তেই সৃষ্টি করতে ব'সে নিজের আবেগ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিচ্ছে। তখন বিষয়ে-বিজড়িত তার নিজের কোন আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি থাকছে না; ব্যক্তিগত উপলব্ধির তীব্রতা নৈর্ব্যক্তিক রূপ ধরছে। সৃষ্টির সময় শিল্পী নিজের ব্যক্তিত্বের উর্ধ্বে চলে যায় এবং তার বিষয়ও আবেগ থেকে—emotion থেকে রসে গিয়ে পৌছয়।

আর্টিস্ট হৃদয়-বিদারক দৃশ্যও আঁকে, আবার মনো-মুগ্ধকর বিষয়ের ছবিও করে। কিন্তু, উভয়ের কিছুতেই লিপ্ত বা বিচলিত হয় না। শিল্পী সুখকর বা দুঃখকর আবেষ্টনের উর্ধ্বে উঠে উভয়েরই মূলে সত্তার যে আনন্দ বা রস আছে, তারই বিগ্রহ সৃষ্টি করে। রসের দিক থেকে সৃষ্টি করা না হ'লে, রসে না পৌছিলে, রচনা বিকৃত হয়—সুখে বিকৃত, দুঃখে বিকৃত। কাজেই দেখা যায়, সাধকেরও যে ধারা, শিল্পীরও তাই; উভয়েই নিজের নিজের পথ ধ'রে লাভ করে সর্বগত এক বিশুদ্ধ আনন্দ। অন্য উপাসনা বা ব্রত আচার পালন না করলেও, শিল্পী নিজের কলা-কৌশল যোগে সাধনাই করে।

একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত ধরা যাক্। কালীমূর্তি বা নটরাজ শিবের মূর্তি, যার ধ্যানে প্রথম এসেছিল সে ব্যক্তি

---

* গত গ্রীষ্মাবকাশে মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে বাসকালীন একটি আলাপের অনুলেখন। আলোচ্য বিষয় ছিল শিল্প-সাধনার সঙ্গে নীতি ও ধর্মসাধনার সম্পর্ক। অনুলেখন রক্ষা করার জন্য 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র সম্পাদক ধন্যবাদার্হ। এই প্রবন্ধের ইংরাজী উক্ত পত্রিকায় পরে প্রকাশ্য।

শিল্পী—সাধক হ'লেও সে শিল্পী; যার হাতে প্রথম আকার লাভ করেছিল সে ব্যক্তি শিল্পী হ'লেও সাধক। কারণ, দু-জনেই একটি কোনো রসের ভিতর রং রূপ গতি ও ছন্দের বিগ্রহ বা সমষ্টিরূপ সৃষ্টি করেছে, অথবা তা সৃষ্ট হয়েছে দু-জনেরই মনে।···

সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে সুনীতি দুর্নীতির ভেদ টেনে আনা শিল্পের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। কারণ, সামাজিক সংস্কারে যা নিন্দনীয় তাই হয়ত শিল্পীকে রসবোধে উদ্বোধিত ক'রে এমন-কিছু রচনা করাতে পারে যা শিল্প হিসাবে · রস-বিগ্রহ হিসাবে—অন্য হাজার হাজার লোককে সংস্কারবদ্ধ খণ্ডিত ধারণার উর্ধ্বে বিশুদ্ধ রসোপলব্ধিতে নিয়ে যাবে। বিষয়-বিশেষকে লোকে বলুক্ দুষ্ট, কিন্তু মায়াবী তুলির স্পর্শে তাতে বিষয়াতীত এমন কিছু ফুটে উঠবে যা অভিনব। যে দেখে বা যে অনুভব করে সেই বিষয়ীর দৃষ্টিভঙ্গীর ইতরবিশেষে ও চেতনার তারতম্যেই নির্ভর করে, বিষয়টি সুনীতি-দুর্নীতির স্তরেই থেকে যাবে না তার উর্ধ্বে উঠবে। উপনিষদে ত আছে, "আত্মার দ্বারাই রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ও মৈথুনের উপলব্ধি হয়। এ জগতে এমন কী আছে যা আত্মা জানেন না?"* সুতরাং বিষয়বিশেষে দোষ বা গুণ নেই। স্রষ্টা সততই যে বিশুদ্ধ আনন্দ বা রসের ভিতর দিয়ে জানেন, শিল্পীও যদি সেই আনন্দ বা রসের দৃষ্টিতেই বিষয়কে দেখে ও সৃষ্টি করে তা হ'লে বিষও অমৃতত্বের পরিচয় প্রদান করে। বিষয়বস্তুর মোহেই যে আর্টিস্ট ভোলে, বিষয়বস্তুকে তার রসবস্তুতে পরিণত করা হয় না,—বাহ্য বস্তু বা ঘটনাই পাওয়া যায়, রসের ভিতর মন বিস্তার বা মুক্তি পায় না। রোগের চেয়ে রোগীর প্রতি যখন ডাক্তারের নজর থাকে বেশী, আরোগ্য হয় দুর্লভ।

তবু আবার প্রশ্ন ওঠে, সামাজিক হিসাবে দুর্নীতিপূর্ণ যা তাকেই বিষয়বস্তু করলে সমাজের কিছু কি অনিষ্ট হয় না। আমার বক্তব্য এই, শিল্পীর রচনা যেখানেই সার্থক হয়েছে সেখানেই আবেগ রসে পরিণত হয়েছে,—খণ্ড উপলব্ধি একটি অখণ্ডের ছন্দে ধরা পড়েছে; তাতে শিল্পীও যেমন, রসিক দর্শকও তেমনি খণ্ডিত বস্তু বা ঘটনা থেকে—মানসিক অভ্যাস ও সামাজিক সংস্কার থেকে—সম্পূর্ণ মুক্ত হ'য়েছে: অত্যন্ত গৌণভাবেও এর ফল হ'ল সামাজিক শুভই, অশুভ নয়। অবশ্য, এমন রুগ্ন মন আছে, এমন অনেক বয়স্ক শিশুও দেখা যায় যারা উপলক্ষ্যস্বরূপ জিনিসটিকেই দেখতে পায়, রসের আবেদন তাদের কাছে নিষ্ফল। এরূপ মন তুলো মুড়ে আঙুরের বাক্সে বা আরক দিয়ে কাঁচের শিশিতে রাখবার যোগ্য। এদের অপরিণত বা বিকৃত মতির উপযোগী করে শিল্পসৃষ্টি করা চলে না; বরং অন্য ভাবে চেষ্টা করা ভাল, ক্রমে এদের বোধ এদের দৃষ্টি যাতে সুস্থ ও পরিণত হয়।···

কিছু কাল পূর্ব্বে পুরী ও কোনারকে মন্দির-গাত্রের বন্ধ মূর্তিগুলি* নষ্ট করবার কথা হয়েছিল। অত্যন্ত সাংঘাতিক প্রস্তাব! ঐগুলি গেলে শিল্পসৃষ্টির কতকগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শনই চ'লে যায়। নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি নে পুরী ও কোনারকের ভাস্কর শিল্পী কেন এই বিষয় নির্বাচন করেছিল। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। মানুষের জীবনে যে নবরসের লীলা, এটি তার অন্যতম রস—আদিরস। এ কথা নিঃসংশয়ে বলব যে রসসৃষ্টি হিসাবে উক্ত মূর্তিগুলি খুবই উচ্চ শ্রেণীর।···

শিল্পীর চিত্তবৃত্তি ভিন্ন সময়ে ভিন্ন আবেগে দোলায়িত হয়। এমন দেখা যায়, একই শিল্পীর একটি রচনা থেকে রসিকের মনে দিব্যভাব জেগে উঠল, অন্য রচনা হ'ল নীচু ধরণের। লোকে বিস্মিত হয়। কিন্তু, বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। পরিবেশের পরিবর্ত্তনে—মানসিক অবস্থার পরিবর্তনে একই শিল্পী ভিন্ন মানুষ হ'য়ে ওঠে। রস উপলব্ধি ক'রে ছন্দের রহস্য জেনে যে মুহূর্তে শিল্পী সৃষ্টি করে, সে মুহূর্তে মানুষের লভ্য সব চেয়ে উন্নত অবস্থাই তার আয়ত্তের মধ্যে; কিন্তু, সব সময়ে তা হয় না। ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে পড়ে মাঝে-মাঝে স্মৃতিভ্রংশ ঘটে। সমস্ত জীবনই আনন্দের ছন্দে ছন্দময় হবে, আসলে এটাই শিল্পীর সাধনা হ'লেও, সব সময়ে সিদ্ধ হয় না।···

অদ্বৈতের সাধনায় পরম উপলব্ধিতে পৌঁছতে হ'লে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অতিক্রম ক'রে উঠতে হয়। আর্টিস্টের আত্মবিকাশও হয় ঐ ভাবেই। কিন্তু, অদ্বৈতবাদী মনে করতে পারেন, সাধনার পথে যা-কিছু ছেড়ে যেতে হবে তা অনিত্য, তা তুচ্ছ; তাই নিয়েই শিল্পসৃষ্টি করার অর্থ কী? শিল্পীর উত্তর হ'ল এই যে, শিল্পের সৃষ্টিই হচ্ছে

* যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে।
—কঠ ২.১.৩ শ্লোক। শ্রীঅরবিন্দের অনুযায়ী ব্যাখ্যা।

* ঐগুলিকে immoral না ব'লে erotic বলা উচিত। ওদের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নীতির দিক থেকে নয়—রসের দিক থেকে। রসের ব্যভিচার ঘটালেই শিল্পের পক্ষে তা 'দুর্নীতি'। রসের ব্যভিচার ঘটিয়ে 'শিল্প'কে সামাজিক সুনীতি প্রচারেও লাগানো যায়; যথার্থ শিল্পসৃষ্টি তা নয়।

মায়াকে আশ্রয় ক'রে, জগতের সৃষ্টিই হচ্ছে মায়াকে আশ্রয় ক'রে। মায়া স্রষ্টাকে অভিভূত করে না; * শিল্পীও মায়াকে জেনে মায়ার ব্যবহার করেন বলেই তা হ'য়ে ওঠে লীলা। আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছই হোক্ আর উচ্চই হোক্, অনিত্যই হোক্ আর নিত্যই হোক্, সবের ভিতরে অনুস্যূত একের ঐক্যটিকে অনুভব করা ও প্রকাশ করা শিল্পীর সাধনা—শিল্পীর সিদ্ধি। বিষয়ের মোহে পড়লেই ভয়ের কারণ। সেই হ'ল মায়ার দাসত্ব। শিল্পী মায়াকে দেখে একের মধ্যে বিচিত্র ছন্দের দোলারূপে।

যে আর্টিস্টের সমতার বোধ ও সমগ্রতার বোধ হয় নি তারই বিশেষ বিষয় চাই, বিশেষ বেদনা (sentiment) চাই। তার অভাব হ'ল ত তার প্রেরণার উৎস শুকিয়ে গেল; কেন-না রসের চির-উৎসারের খোঁজ মেলে নি।...

হিন্দুঘরে জন্মে হিন্দুর শিক্ষাদীক্ষায় আমি মানুষ হয়েছি। এককালে বিশেষ ক'রে দেবদেবীর ছবিই এঁকেছি। এখন কিন্তু, দেবতার ছবি যেমন আঁকি, সাধারণ জীবনের ছবিও এঁকে থাকি; উভয়েই সমান আনন্দ পেতে যত্ন করি। দেবতার রূপকল্পনাই উঁচুদরের জিনিস, আশপাশের সাধারণ জিনিসের রূপ তুচ্ছ—এই ধারণা পূর্বে ছিল। মনের পরিণতির সঙ্গে রূপকেই আর প্রধান ক'রে দেখি নে; তাদের প্রত্যেকটিকে একই সত্তার বিভিন্ন ছন্দ ও বিগ্রহ (symbol) হিসাবে দেখি। সমুদয় জগৎ—অন্তরে বাহিরে সকল রূপ যে প্রাণ থেকে নিঃসৃত এবং যে প্রাণে স্পন্দমান* সত্তার সেই প্রাণছন্দকেই খুঁজি সমস্ত রূপে রূপে—কী সাধারণ আর কী অসাধারণ। অর্থাৎ পূর্বে দেবত্ব দেবতার রূপেই দেখতাম, এখন সর্বত্র দেখতে যত্ন করি—মানুষে, গাছে, পাহাড়ে।...

সব দেশে সব যুগে বড় আর্টের পিছনে বড় আদর্শ বড় আইডিয়া থাকে। যেমন য়ুরোপে ছিল খ্রীষ্টের আদর্শ, ভারতে ছিল শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধের, চীনে তও (Tao)। ব্যক্তিকে আইডিয়ার বিগ্রহরূপে পূজা করতে থাকলে, কালে আইডিয়া থেকে ব্যক্তি বড় হয়ে ওঠে; ক্রমে আইডিয়াকে মানুষ ভুল বোঝে বা ভুলে যায়। পারিপার্শ্বিক জীবনে অনুরাগরঞ্জিত চেতনার আলো পড়ে না—তা উপেক্ষিত হয়। আমাদের দেশে তাই হয়েছে। কালে কালে প্রকৃতির মধ্যেই সাধকেরা কালীমূর্তি শিবমূর্তি দেখেছে; সেই বিশাল প্রকৃতিকে দেখতেই ভুলে গেছি। ঈশাবাস্য মিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ,† উপনিষদের এই মন্ত্রেই দীক্ষা নিয়ে ভারতের ভাবী শিল্পকলা সমগ্র জীবনকে সমস্ত জগৎকে সত্য দৃষ্টিতে দেখবে ও নূতন ক'রে সৃষ্টি করবে।

* ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপমাচ্ছলে তাই বলেছেন, সাপের বিষ সাপকে লাগে না।

* যদি দং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
—কঠ ২. ৩. ২. শ্লোক।

† ঈশোপনিষদের ১ম শ্লোক। শ্রীঅরবিন্দকৃত অর্থ: জগতের অন্তরে যে-কিছু জগৎ পরমেশ্বরের আবাসমন্দির ব'লে জা[illegible]।

পণ্ডিত বেণীমাধব ভট্টাচার্য

শ্রীঅবনীনাথ রায়

'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। পণ্ডিত বেণীমাধব আদিত্যরামেরই অগ্রজ।

এই সব ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত কেন আলোচনা করিতে হয় এ বিষয়ে সকলের মনে প্রশ্ন উদিত হওয়া স্বাভাবিক। তার প্রথম উত্তর, এই ধরণের মানুষ বর্তমান যুগে দুর্লভ; দ্বিতীয় উত্তর, ইঁহাদের চরিত্রে এমন একটা কম্‌প্লেক্‌স বা স্বতঃবিরোধ আছে যাহা পরবর্তী যুগের মানুষ আমাদের আলোচনা করিয়া দেখিবার বস্তু; কেননা এই ভাবে পূর্ব-পুরুষের জীবন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তবেই অবরপুরুষের পথ চলিবার রাস্তা ও তার নির্দেশ পাওয়া যাইতে পারে।

কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। বেণীমাধব অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির ব্রাহ্মণ ছিলেন। পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় বিপত্নীক হইয়াছিলেন, আর আশী বছর বয়সের সময় মারা যান—এই দীর্ঘ ত্রিশ বছর নিজের হাতে রান্না করিয়া খাইয়াছেন, অপরের ছোঁওয়া খাইতেন না। এই পর্যন্ত শুনিলে আমাদের মনে এমন একজন টুলো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের চেহারা কল্পনায় ভাসিয়া উঠিবে যিনি চিরকাল নিজের ঘরের প্রাঙ্গণে রান্না করিয়াই খাইয়াছেন; পরম বিজ্ঞের মত বলিব, হ্যাঁ, বেণীমাধবের অত নৈষ্ঠিকত্ব শোভা পাইয়াছিল, কেননা তাঁহাকে বিংশ শতাব্দীর বেকার-সমস্যার যুগে বাঁচিয়া থাকিয়া তার বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় নাই—তা যদি হইত তবে দেখিতাম তাঁর ব্রাহ্মণত্বের অত বাড়াবাড়ি কোথায় থাকিত! এই মন্তব্যের উত্তরে জানাইতে হয় যে, বেণীমাধব কেবলমাত্র গোঁড়া নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণই ছিলেন না, তিনি

সাহেবদের দুয়ারেই চাকরি করিয়াছেন এবং সে চাকরিও বেশ দায়িত্ব-পূর্ণ—তিনি যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টের Appointment Department-এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

অতএব দেখা গেল ব্রাহ্মণত্বের গোঁড়ামি এবং বিংশ শতাব্দীর অনুমোদিত কর্মকুশলতা একসঙ্গে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এবং এই দুই বিরোধী বস্তু যাঁর চরিত্রে সমাবেশ হইয়াছিল তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার লোভ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত।

প্রথমে তাঁর অতি-নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণত্বের দিকটাই বলি। তিনি বাংলা দেশ হইতে নিজের মাতামহকুলের শালগ্রাম শিলা এলাহাবাদে পূজা করিবার জন্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন। শোনা যায় বেণীমাধব এলাহাবাদে চলিয়া আসিবার পর ঠাকুর স্বপ্ন দেন যে তিনি গঙ্গাতীরে থাকিবেন। দেশের লোকেরা ভাবিয়া আকুল হইল যে কি করিয়া ঠাকুরের গঙ্গাতীরে বাস সম্ভব করা যায়। তখন হঠাৎ তাঁহাদের স্মরণ হইল এলাহাবাদে বেণীমাধব আছেন এবং এলাহাবাদ গঙ্গার তীরে। বেণীমাধবকে চিঠি লেখা হইল এবং বেণীমাধবও ঠাকুরকে নিজের কাছে আনিয়া তাঁর পূজাপাঠ প্রভৃতি করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। আজীবন তিনি এই ভার বহন করিয়া গিয়াছেন। যখন যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এলাহাবাদ হইতে নৈনিতালে স্থানান্তরিত হয় তখন সরকার বেণীমাধবকে অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদ দিয়া নৈনিতালে লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু এলাহাবাদের গঙ্গার তীর ছাড়িয়া শালগ্রামকে লইয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং বেণীমাধব নৈনিতাল যাইতে অস্বীকার করিলেন এবং চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না, মৃত্যুর পূর্বে নিজের যাবতীয় স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি শালগ্রামের নামে দেবোত্তর করিয়া গেলেন।

তিনি নিজের হাতে রান্না করিয়া খাইতেন পূর্বেই বলিয়াছি। নারায়ণকে ভোগ দিয়া সেই প্রসাদ ব্যতীত অন্য কোন আহার্য গ্রহণ করিতেন না। গঙ্গাস্নান ছিল দৈনিক। আপিস হইতে আসিয়াও কি শীতকাল, কি গ্রীষ্মকাল প্রত্যহ স্নান করিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, আপিসে অনেক লোকের সঙ্গে ছোঁওয়াছুঁয়ি হয়, সাহেবেরা হ্যাণ্ডশেক্ করে,—তারপর একবার স্নান করিয়া না ফেলিলে কি শালগ্রামের পূজায় বসা যায়? তিনি শহরে উৎপন্ন কোন শাকসবজী খাইতেন না—বলিতেন উহারা মলমূত্রের সার দিয়া জিনিষ তৈরি করে। কোন দিন কাহারও নিকট হইতে দান গ্রহণ করেন নাই। এমন কি স্নেহাস্পদ ভ্রাতা আদিত্যরামের বাগানে উৎপন্ন ফলমূলাদি পর্যন্ত তিনি ফিরাইয়া দিয়াছেন—প্রতিগ্রহ করেন নাই। এমনি কঠিন একটা সদাচার এবং শুচিতার বর্মে তিনি নিজেকে একেবারে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

অথচ এই কঠোর নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণই ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সরকারী চাকরি করিয়া গিয়াছেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর চাকরি-জীবনের সূত্রপাত হয় এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পেন্সান গ্রহণ করেন। চাকরি-জীবনে তিনি কিরূপ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাহা তৎকালীন প্রশংসা-পত্র হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলেই বোঝা যাইবে। মিঃ সি. এ. এলিয়ট (পরে যিনি সার উপাধি পান এবং বাংলা দেশের ছোটলাট হন) তখন নর্থ ওয়েষ্টার্ন প্রভিন্সেস্ গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি পণ্ডিত বেণীমাধব সম্বন্ধে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে লিখিতেছেন:—

"Beni Madhab is a tower of strength and one of the most useful men in the office. On all personal questions, as to what appointment any one has held or so forth, he is my referee and I have never found



বেণীমাধব ভট্টাচার্য

him wrong. He is also learned in the Codes and great on Pension Cases. He does all his work in a perfectly honourable and creditable way."

তাঁহার একাধিক প্রশংসাপত্র হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করা দুরূহ। কিন্তু আমি মাত্র আর একখানি প্রশংসাপত্র উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। এই প্রশংসাপত্রখানি তৎকালীন নর্থ ওয়েষ্টার্ন প্রভিন্সেস এবং অযোধ্যার আণ্ডার সেক্রেটারি মিঃ এফ্. বেকার ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল তারিখে লিখিয়াছিলেন:—

"Beni Madhab has always borne the highest character for the diligence and the accuracy and completeness with which his work has been invariably turned out. As a clerk, he has few, if any, equals in the office and in his peculiar work, he is quite unapproached. He is almost the only clerk who could be relied on not to lead Secretaries or Under Secretaries astray and I do not remember on any occasion to have reason to regret initialling or accepting Beni Madhab's notes and suggestions. Beni Madhab is about to retire on pension at his own desire. He has just been made Superintendent of the Appointment Department, a most responsible post, which he doubtless would have filled with the greatest credit to himself. He prefers, however, to retire and I can only wish him many happy years to come of a well-earned ease and a long enjoyment of the pension he has so well deserved."

চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি ২৮ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। এই সময়টাও তিনি বৃথা নষ্ট করেন নাই। প্রথমে তিনি এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা আদিত্যরাম এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক মাঘ মেলার সংশোধন কার্যে নিজেদের শক্তি নিয়োজিত করেন। ঐ সময়

মুসলমান পুলিস সাধু এবং যাত্রীদিগের উপর বড় অত্যাচার করিত। ঐ অত্যাচার নিবারণকল্পে দুই ভাইয়ে মিলিয়া তৎকালীন প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "পাইওনিয়রে" প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।

"*He wrote a series of notes in the Pioneer which attracted the attention of the Government and the local authorities and in consequence, the hardships suffered by the pilgrims have become much less in present times. Of the old residents of the city, Rai Bahadur Ram Charan Das, Lala Gaya Prasad, Babu Charu Chandra Mitra and some other gentlemen helped the Pandit in the matter. After a long and sustained effort made by these gentlemen, improvements have been effected in police and sanitary arrangements. Granting of monopolies to Vendors has been abolished, spread of any disease in epidemic form is promptly checked, proper medical arrangement is made for the treatment of the diseased pilgrims on the Mela glounds as well as outside the Mela area.*"*

সংবাদপত্রে তাঁহাদের আন্দোলনের ফলে মেলায় অত্যাচার বন্ধ হইল বটে, কিন্তু বেণীমাধব পুলিসের কোপদৃষ্টিতে পড়িলেন। কেননা ইহার ফলে পুলিসের আর্থিক হানি ঘটিয়াছিল। পুলিস এক মিথ্যা ফৌজদারী মামলা বেণীমাধবের বিরুদ্ধে আনয়ন করিল। মোকদ্দমা এমন সাজাইয়া ছিল যে বেণীমাধবের জেল হওয়ার সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছিল। পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা করিয়া মোকদ্দমা এলাহাবাদ হইতে মির্জাপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে অবশ্য সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া গেল এবং বেণীমাধব নির্দোষ বলিয়া সম্মানের সহিত মুক্তি পাইলেন।

বেণীমাধব অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য করিয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের কার্য করিবার মেয়াদ ৩ বৎসর। চার বার তিনি এই মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্বাচিত হন এবং ১২ বৎসর যাবৎ এই কার্য করেন। যে বৎসর তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্য আর একজনের নামকরণ হইল সেই বৎসর হইতেই বেণীমাধব কমিশনারের কার্যে ইস্তফা দিলেন। দেশপূজ্য নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বেণীমাধব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "অভি তক্ পুরাণে লোগ কহা করতে হেঁ কি মাধববাবু যো কাম করকে দিখ্‌লা গয়ে হেঁ উহ্ কোই নহি কর শক্তা। উহ্ বড়ে কর্তব্যনিষ্ঠ ঔর স্বাধীন প্রকৃতিকে থে।"

(এখন পর্যন্ত পুরানো অধিবাসীরা বলিয়া থাকেন যে মাধববাবু যে কাজ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন সে কাজ অপর কেহ করিতে পারিবে না। উনি বড় কর্তব্যনিষ্ঠ এবং স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন।)

এখানে এ কথা বলাই বাহুল্য যে পণ্ডিত মদনমোহনের কথা কেবল মাত্র সেণ্টিমেণ্টপ্রসূত নয়।

বেণীমাধব ১৮৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সংযুক্ত-প্রদেশ এবং অযোধ্যায় যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহার প্রতিবিধানকল্পে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা তখনকার এলাহাবাদ ডিভিসনের কমিশনার মিঃ এফ. এল. পিটার কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর এলাহাবাদের কালেক্টর এবং ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ. ম্যাক্‌নেয়ার পণ্ডিত বেণীমাধবের নিকট নিম্নলিখিত চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন:—

Dear Pandit Beni Madhab Bhattacharge,

The famine is now happily over and I take this opportunity of writing to thank you for all the assistance you have given me in dealing with the distress in the city and environs.

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আদমসুমারির কার্যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্তব্য করিয়া বেণীমাধব এলাহাবাদের তখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে. বি. টমসনের নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

* * *

এইরূপে দীর্ঘকাল ধরিয়া দেবতার তথা মানুষের সেবা করিবার পর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখে বেণীমাধবের দেহান্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ১৩১৯ সালের চৈত্র মাসে নবরাত্রির শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিটি প্রয়াগের ইতিহাসে আজও অক্ষয় হইয়া আছে।

তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী মৃত্যুর আট-দশ দিন আগে হইতেই তাঁহাকে গঙ্গার তীরে লইয়া আসা হইয়াছিল। জাহ্নবীকূলে সে কি নয়নাভিরাম দৃশ্য! সে দৃশ্য পণ্ডিত বেণীমাধবেরই উপযুক্ত হইয়াছিল। ত্রিবেণী কিনারে তাঁবু পড়িয়াছে, অহোরাত্র হরিনাম কীর্তন হইতেছে, কখনো বা কনিষ্ঠ আদিত্যরাম সুমধুর কণ্ঠে গীতা বা অপর কোন শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। চারিদিকে আত্মীয়-স্বজন, কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, আর প্রয়াগের অগণিত জনমণ্ডলী—সকলেই একবার বেণীমাধবকে শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছে, শেষ বারের মত তাঁর পদধূলি লইতে আসিয়াছে। মৃত্যুপথযাত্রীর মন কিন্তু তখন এ সবের মধ্যে নাই—যে শালগ্রামকে তিনি জীবনে কখনো এক মিনিটের জন্যও বিস্মরণ হন নাই, তাঁর মন তখন সেই শালগ্রামেরই পাদপদ্মে নিবদ্ধ—কর্ণ মধুর সংকীর্তন শুনিতেছে, চক্ষু কোন্ সুদূরে অবস্থিত। অবশেষে বেলা ১০টা নাগাদ যখন অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হইল তখন বেণীমাধবের অর্ধ অঙ্গ কুলুকুলুনাদিনী গঙ্গার পূতধারায় নিমজ্জিত করিয়া দেওয়া হইল, ঊর্ধাঙ্গ তীরে বালির উপর শায়িত অবস্থায় রহিল এবং সেই ভাবেই তাঁর প্রাণবায়ু অনন্তে মিশিয়া গেল।

* * *

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"-প্রণেতা দাস মহাশয় পণ্ডিত বেণীমাধবের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "প্রতিযোগিতার দিনে সুদূর প্রবাসে বাঙ্গালীকে এই সকল সম্মান লাভ করিতে বড় একটা দেখা যাইতেছে না।" (৮১ পৃষ্ঠা) দাস-মহাশয়ের এ আক্ষেপ সত্য। এলাহাবাদের দারাগঞ্জ অঞ্চল বেণীমাধবের কর্মক্ষেত্র ছিল। সেই দারাগঞ্জের কাহারও নিকট পণ্ডিত বেণীমাধবের নাম করিয়া দেখিয়াছি তাহারা এখনো তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে আকাশের দিকে দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করে। এই যে অযাচিত শ্রদ্ধানিবেদন, এ কি কখনো শূন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এই শ্রদ্ধার উৎসমুখ কোথায়? সে কি বেণীমাধবের অতি-নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণত্বের মধ্যে, না তাঁর আপিসের কার্যে দক্ষতার মধ্যে, না তাঁর উত্তর-জীবনের পৌরসেবার মধ্যে? কিন্তু আমাদের দেশে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণেরও অপ্রতুলতা নাই, কর্মদক্ষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টেরও অসদ্ভাব নাই। কিন্তু এইরূপ শ্রদ্ধা কয় জন লাভ করিতে পারিয়াছেন? উত্তর পাইয়াছি, বেণীমাধবের শ্রদ্ধার উৎসমুখ ওদিকে নয়। তিনি শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন তাঁর মধ্যে ফাঁকি ছিল না বলিয়া। তিনি ভগবান্‌কেও ফাঁকি দেন নাই, মানুষকেও ফাঁকি দেন নাই।

---

* Indian Science Congress Guide Book (1930), Pp. 39-40.

পলায়ন

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সকালের সংবাদপত্রখানির হেড্‌লাইন পড়িয়াই তিনকড়ি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, পাঁচু, ওরে পাঁচু—

পাঁচু ওরফে পাঁচকড়ি ছুটিতে ছুটিতেই বৈঠকখানা ঘরে হাজির হইল। দাদার রুক্ষ মেজাজের কথা শুধু পাঁচকড়ি নহে—এ-বাড়ির সকলেই জানেন। কোন বড় আপিসের তিনি সাম্প্রতিক পদস্থ কর্ম্মচারী। উপরের গ্রেডে প্রমোশন পাইয়াই মেজাজটিকেও উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়াছেন। ধুতি-পাঞ্জাবী ত্যাগ করিয়াছেন, বর্ম্মা চুরুট ধরিয়াছেন, খাস ভৃত্য একজন বাহাল হইয়াছে, এবং অস্টিন একখানি কিনিব-কিনিব করিতেছেন। সম্প্রতি যুদ্ধের বাজারে দ্রব্যমূল্য তিন-চারি গুণ হওয়াতেই যোলকলা সাহেবীয়ানার ঐ কলাটুকু পূর্ণ হয় নাই। পারিপার্শ্বিক মানুষকে তৈয়ারী করে, তাই, মেজাজের উচ্চতার প্রতিক্রিয়া অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও আশ্রিত আত্মীয়-বর্গের মধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

পাঁচকড়ি প্রায় দৌড়াইয়াই ঘরে ঢুকিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, কি দাদা?

কট্‌মট্‌ চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া তিনকড়ি ওরফে বনার্জ্জি-সাহেব বলিলেন, তোদের সময়ের জ্ঞান যে কবে হবে তাই ভাবি?

—তুমি ডাকতেই ত এলাম।

—ছুটে-আসার কথা নয়। একটু সকাল সকাল উঠে খবরের কাগজগুলোয় চোখ বুলিয়ে নেওয়ার অবসর তোদের হয় না।

—বাঃ রে, সকালের কাগজ তোমার হাত থেকে না ফিরলে কারুর পড়বার—

· থাক্, থাক্ কাজ না থাকলে মানুষ খালি বচন-বাগী হয়! আপিসে ত দেখি—যারা ফাঁকি দেয় তাদের কম... ই দিনরাত।

—বল ত আর একখানা কাগজ নিই?

—নিশ্চয়। কালই হকারদের বলে দিবি।

—কিন্তু, বাংলা কাগজ।

—বাংলা? ওই রাবিশগুলোয় থাকে কি? দাঁতের দ্বারা চুরুট চাপিয়া চক্ষু বাঁকাইয়া বনার্জ্জি সাহেব এমন একটি ঘৃণামিশ্রিত ভঙ্গি করিলেন—যাহাতে ও বিষয়ের নিষ্পত্তি এক প্রকার হইয়াই গেল। কিন্তু পাঁচকড়ি শক্ত ছেলে। কেরানী-দাদাকে সে ভাল করিয়াই জানিত—অফিসার-দাদাকেও চেনে। মনে মনে হাসিয়া বলিল, বাঃ রে, আমরা ইংরেজী কাগজ পড়ে না হয় সব জানলাম, যে দিনকাল, মেয়েদেরও সব জেনে রাখা দরকার নয় কি? বিলেতে একটা কুলিও—

—থাম, আর লেক্‌চার ঝাড়তে হবে না। বনার্জ্জি-সাহেব চক্ষু বুজিয়া ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করিলেন। পরে কহিলেন, তোমার কথায় যুক্তি আছে। মেয়েদেরও সব জানা উচিত। অতঃপর তাঁহাকে কিছু প্রসন্ন কিছু বা কোমল বোধ হইল। হয়ত তিনি বুঝিলেন, কোন একটি সুযোগে তাঁহার পদোন্নতি ঘটিলেও—মেয়েদের শিক্ষার যে-সুযোগ কুমারীকালে ঘটিয়াছিল, বধূজীবনে তাহার অগ্রগতি ত দূরের কথা—পশ্চাদপসরণ বরঞ্চ দেখা যাইতেছে।

একখানি বাংলা সংবাদপত্র অন্তঃপুর প্রবেশের অনুমতি পাইল।

পাঁচকড়ি বলিল, ডাকছিলে কেন?

সংবাদপত্রখানি তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া তিনকড়ি কহিলেন, পড়। জাপানীরা ত বর্ম্মায় পা দিল।

দেখি, বলিয়া কাগজ টানিয়া পাঁচকড়ি সেই সংক্ষিপ্ত সংবাদটুকু পড়িয়া কহিল, বর্ম্মা মানে টেনাসেরিয়ম ত?

—ওই হ'ল। কবে যে তোদের চোখ ফুটবে জানি না। ঘন ঘন চুরুট টানিতে টানিতে তিনি ইজিচেয়ারে মাথাটা এলাইয়া দিলেন।

—তা কি বলছ?

আমি বলব—তবে তোমাদের হুঁস হবে। এতটুকু বুদ্ধি তোদের ঘটে নেই। সাধে কি আর বলে কাজ না থাকলে মানুষ—

—বাঃ রে, নিশ্চয়ই তোমার মাথায় মতলব একটা এসেছে।

—কেন, তোমাদের মাথায় আসে না? খালি গোবর পোরা।

পাঁচকড়ি কহিল, তা হ'লে তোমাকে অফিসার না ক'রে আমাদেরই ত ক'রে দিত।

—থাম্। প্রসন্ন হাস্যদীপ্তিতে তিনকড়ির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিলেন, কলকাতায় থাকা আর সেফ্ মনে কর?

—কেন?

—কেন! বাড়িতে সবারই দায়িত্বজ্ঞান যদি এই রকম হয় তাহলে একটা মানুষের ত সব দিক সামলানো মুশ্‌কিল। ওদিকে আপিস সামলাতেই বলে প্রাণান্ত! কাল চীফ্ হুকুম দিলেন—

পাঁচকড়ি জানে—আপিসের কথা উঠিলে—বাড়ির কথা ভুলিতে দাদার একদণ্ডও বিলম্ব হইবে না। জাপানীদের বর্ম্মায় পদার্পণ শুধু সংবাদপত্রের চমকপ্রদ সংবাদ নহে, কলিকাতার বুদ্ধিমান বাসিন্দাদের নিরাপত্তা-সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিতও বটে। দাদার চিন্তার শিখাটি তাহার মনের অন্ধকারকেও একটুখানি ছুঁইয়া গেল যেন। বাধা দিয়া সে কহিল, ঠিক বলেছ, ভেবে-চিন্তে আজই একটা কিছু ঠিক করতে হয়।

তিনকড়ি বলিলেন, যা ভাববার তোমরা ভাব গে, আমি আপিসের ভাবনা নিয়েই পাগল।

—তাইত বলছি সবাই মিলে যুক্তি-পরামর্শ করে—

চুরুটটা সবেগে অ্যাশট্রের উপর নিক্ষেপ করিয়া তিনকড়ি বলিলেন, যুক্তি আর ছাই, কলকাতা ছাড়তে হবে। পারবে? বলিয়া কট্‌মট্ চক্ষে পাঁচকড়ির পানে চাহিলেন।

পাঁচকড়ি মুখ নামাইয়া বলিল, তেমন তেমন হ'লে—

—তেমন তেমন হ'লে! স্রেফ গোবর—গোবর। বলিতে বলিতে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া অন্তঃপুরাভিমুখীন হইলেন।

পাঁচকড়ি সমস্যা ভুলিয়া কাগজখানায় মনোনিবেশ করিল।

অত্যাসন্ন বিপৎপাতের সম্ভাবনা লইয়া সংবাদটি অন্তঃপুরেও প্রবেশলাভ করিল।

পিসিমা কুলুইচণ্ডির ব্রতকথা বলিবার জন্য সবে পা গুটাইয়া বসিয়াছেন। ব্রতচারিণী মেয়ের দল প্রকাণ্ড পাথরের খোরাটায় চালভাজা ভিজানো, দই, কলা প্রভৃতি গুছাইয়া লইয়া শুদ্ধাচারে পিসিমার পানে ও খোরার পানে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিতেছেন; শীতকালের ছোটবেলার কোমল রোদটুকু তাঁহাদের পিঠের উপর আদরলোভী শিশুর মত আঁটিয়া বসিয়াছে—এমন সময় পাশের বাড়ির সরোজিনী আসিয়া ঝাঁকিয়া বসিলেন।

—ওমা, এখনও ফলার মাখিস নি? আর ভাই, যা শুনে এলাম—তাতে ত হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেল। কোন রকমে নেমরক্ষে ক'রে মা কুলুইচণ্ডিকে একটা পেন্নাম করে ছুটতে ছুটতে আসছি।

—কি খবর দিদি?

—খবর মাথা আর মুণ্ডু। কলকেতা ছাড়তে হবে। বাঁধাছাঁদা সব আরম্ভ হয়ে গেছে।

—বল কি গো? কোথায় যাবে?

—চুলোয়। খবরের কাগজ হাতে ক'রে হরি ত হন্যে কুকুরের মত বাড়ির মধ্যে চেঁচানি সুরু করলে। যত বলি, ওরে একটু থাম্, মা কুলুইচণ্ডির বেরতো কথাটা শেষ করি' ততই চেঁচায়, দিদি, ওসব শিকেয় তুলে রাখ। পোর্টম্যাণ্টো গুছিয়ে নাও, কালই কোলকাতার বাইরে তোমাদের রেখে আসব। কি সমাচার? না, কে জানে ভাই—কারা নাকি আসছে। একধার থেকে ছেলে বুড়ো সব জবাই করবে।

ওঃ—যুদ্ধের কথা বলছেন? একটি মেয়ে হাসিয়া প্রশ্ন করিল।

জানি নে দিদি অতশত। এত বয়েস হ'ল—যুদ্ধ কি বুঝি নে। সে হয়েছিল বটে রামায়ণ মহাভারতে একালে। তার পরেও যে—

পিসিমা বলিলেন, তাই তিনু বলছিল বটে—ওবেলা পরামর্শ ক'রে একটা হেস্তনেস্ত করবে। কি ছাড়তে হবে ছাড়তে হবে বললে, অতটা আর কান দিই নি। তা দিদি, তোমরা কোথায় যাবে?

কি জানি ভাই—কেষ্টনগর না কোথায়।

কৃষ্ণনগর! আঃ, সরভাজা সরপুরিয়া খুব খাবেন।

মর ছুঁড়ি, ছিষ্টি সংসার ফেলে কোন্ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে রাজত্বি করব। তুইও যেমন—কলকেতা ছেড়ে গেলাম আর কি।

তার পর যে সব আলোচনা হইল—তাহাতে এই মন্তব্য প্রকাশিত হইল যে, পুরুষেরা যতই লাফালাফি বা ভীতিপ্রদর্শন করুন—মেয়েরা এক পাও নড়িবেন না। এখানকার মত এমন গঙ্গা, কালিঘাট, লেক, বিজলীবাতি ও বিজলী পাখা, ধূলিবিহীন রাস্তা, মোটরের প্রাচুর্য্য ও সিনেমা গৃহের আরাম আর কোথায় আছে? এ শহর ছাড়িলে পর্দ্দানসীন মেয়েদের স্বাধীনতার আর থাকিবেই বা কি।

আপিস-গৃহেও এই আলোচনা চলিতেছিল।

ফ্ল্যাটফাইল বগলে অজিত বনার্জ্জি-সাহেবের ঘরে ঢুকিয়া গুডমর্নিং করিল। বনার্জ্জি-সাহেব তাহার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বসুন।

বিস্মিত অজিত আমতা আমতা করিয়া কহিল, না, সার, এই কোল ডিপার্টমেণ্টের কেসটা—

হবে—হবে। আচ্ছা, নোটটা ঠিকমত দিয়েছেন তো? কিনা আইন বাঁচিয়ে। এই নিন সই করে দিলুম। আহা, দাঁড়ান একটু, কথা আছে।

অফিসার বনার্জ্জি-সাহেবের এতাদৃশ গায়ে-পড়া ভাব কেরানীদের বিস্ময়ের বস্তু। অজিত বিস্মিতমুখে তাঁহার পানে চাহিতেই তিনি বলিলেন, আপনার বাড়ি কৃষ্ণনগর না?

—আজ্ঞে, সার।

—ওখানকার ক্লাইমেট কেমন?

—আজ্ঞে, ভালই।

—ভাল! তবে যে শুনি ম্যালেরিয়া খুব বেশি?

—আজ্ঞে—আমরা তো বাস করি। ম্যালেরিয়ায় কেউ বড় একটা ভোগে না।

—বেশ, বেশ। লাইট আছে?

লাইট, জলের কল সব আছে।

—জিনিস-পত্র?

—কলকাতার চেয়ে সস্তা। টাকায় আট সের দুধ।

—বটে! খানিক থামিয়া বলিলেন, বেশ, বাংলো-প্যাটার্ণের বাড়ি পাওয়া যাবে? নদীর ধারে হ'লেই ভাল হয়।

—তা বোধ হয় যোগাড় করে দিতে পারি।

—থ্যাঙ্কস্। কাল শনিবারে আপনার সঙ্গে আমিও না হয়—

—বেশ তো চলুন না।

—চুরুট ধরাইয়া বনার্জ্জি-সাহেব চাঙ্গা হইয়া চেয়ারে খাড়া হইয়া বসিলেন।

হেমন্ত-সন্ধ্যায় দ্বিতলের একটি খোলা বাতায়নের ধারে ইজিচেয়ারে পাঁচকড়ি এক কাপ ধূমায়িত চা হাতে বসিয়াছিল। চায়ের সামান্য আনুষঙ্গিক চেয়ারের হাতলের উপর রক্ষিত। না চা, না আনুষঙ্গিক কোনটাই পাঁচকড়ি স্পর্শ করে নাই। তাহাকে কিছু উন্মনা বোধ হইতেছে।

এমন সময় একটি কিশোরী বধূ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে! এত কি ভাবছ?

পাঁচকড়ি সনিশ্বাসে বলিল, আর ভাবনা! দাদা এক রকম সব ঠিক করে ফেলেছেন। আসছে সপ্তাহে সকলকেই কৃষ্ণনগর যেতে হবে।

—সবাই গেলে চলবে কি করে? আপিস থেকে এসে সামনে গোছানো জিনিস না পেলে বট্‌ঠাকুরের কষ্ট হবে না?

—বট্‌ঠাকুরের কষ্টটাই দেখছেন সবাই মিলে, অভাগার পানে কেউ ফিরেও চান না।

তরুণী হাসিতে হাসিতে তাহার সন্নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কহিল, তোমার আর কষ্ট কিসের? বট্‌ঠাকুরের মত তো আপিস নেই।

যার হাতে খাই নি—সে বড় রাঁধুনি। তোমার বট্‌ঠাকুরের যা কষ্ট—আহা!

আহা কিগো! দিদি তো বলেন আপিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি—

—বউদি কি আর বলেন, বলান দাদা। আহা, অমন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির সৌভাগ্য যদি সবার হ'ত!

—রঙ্গ রাখ, তোমার কষ্টটা তো বললে না?

—তোমার মুখে আমার সুখের ফিরিস্তিটা আগে আউড়ে যাও। বললে বাবুর অভিমান হবে আবার!

—না বললেও রাগ করব।

তরুণী আশা চেয়ারের হাতল ধরিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া সহাস্যমুখে কহিল, সারাদিন ঘুমিয়ে কম কষ্টটা হয় তোমার!

—কি জান, যে কষ্ট দেখা যায় তাই নিয়ে হৈচৈ করা মানুষের অভ্যাস। :অদেখা কষ্ট দেখার চোখ আলাদা।

তাই নাকি? তেমন চোখ কার আছে?

খপ্ করিয়া আশার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া পাঁচকড়ি গদ্‌-গদ্‌-কণ্ঠে বলিল, যারা বিয়ে করে পুরোনো হয়ে গেছে—তারাও এমন কথা জিজ্ঞাসা করে না। আর তুমি সদ্য ছ'মাসের বিবাহিতা হয়ে—

খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে আশা বলিল, আচ্ছা মশাই, ঢের হ'য়েছে।

—নিষ্ঠুরে, তোমায় কৃষ্ণনগরে নির্ব্বাসিতা করার চেয়ে জাপানী বোমা কি এতই হৃদয়বিদারক?

—নাগো না, সে জিনিস একেবারে মস্তিষ্কবিদারক।

—তোমার কষ্ট হবে না?

আশা ঘাড় দুলাইয়া বলিল, বাঃ রে, সরভাজা খাব বসে বসে!

—সরভাজার থেকে ভাল জিনিস কখনো কি মুখে ওঠে নি?

—উঠেছে। কিন্তু যখন-তখন ভাল জিনিস খেলে সহ্য হয় না তো। আঃ, আবার দুষ্টুমি!

পাঁচকড়ি অবনত হইবার মুখে আপনাকে সম্বৃত করিয়া লইল। বউদিদি ঘরে প্রবেশ করিলেন।

—ঠাকুরপো—শুনেছ?

—কিছু কিছু শুনলাম বই কি।

বউদি বলিলেন, আমি কিন্তু যাব না। আমি গেলে তোমাদের দুর্দ্দশার শেষ থাকবে না।

—কিন্তু বউদি, বড় দুর্দ্দশারা যখন আসবার ভয় দেখান, ছোট দুর্দ্দশারা তখন আমোল পান না।

—তাই ব'লে আপিস থেকে এসে উনি যে মুখ শুকিয়ে—তার চেয়ে মাকে, ঠাকুরঝিদের, পিসিমাকে, ছেলে-পুলেদের নিয়ে তুমি বরঞ্চ কেষ্টনগরে যাও। তেমন তেমন বুঝি আমরাও না হয় পরে যাব।

—আমরা আবার কে কে বউদি?

—ছোট বউ যে কিছুতেই যেতে রাজী হয় না। তা হাতনুরকুত আমার কাছে না হয় থাকুক ও।

—আমি গিয়ে কি করব সেখানে?

—ওঁদের দেখাশোনা করে কে। উনিই তো বললেন—তোমার নাম করে—ও বরঞ্চ যাক সেখানে। তুমি নাকি ওঁকে বলেছিলে—কলকাতায় থাকবে না। তা হেসে বললেন, পাঁচুকে ভাবতুম সাহসী। ফুটবল ক্রিকেট খেলে, সাঁতার দেয়, দৌড় ঝাঁপ করে; ও দেখছি আমার চেয়েও ভীতু!

—কিন্তু এখন দেখছি আমার যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না। ওঁদের আগলাবার ব্যবস্থা দাদা করুন গে, ক্রিকেট সীজ্‌ন্ ফেলে আমি যাচ্ছি না।

—তাইত, তুমি যে আবার গোল বাধালে ভাই। যাই বলে দেখি—যদি মত করেন।

বউদি চলিয়া গেলে পাঁচকড়ি কৃত্রিম রোষ কটাক্ষে আশার পানে চাহিয়া বলিল, তুমিই হ'চ্ছ এর মূল।

—কিসের? তোমার যাওয়ার না আমার থাকার?

—আর ফাজলামি করতে হবে না। দুই আর দুইয়ে চার হয় একথা তুমি জান না?

—আহা, রাগ কর কেন, তোমার দাদার হিসেব যে অন্য রকম। আমাকে মনে করেন সাহসী—তাই দিদির কাছে রাখতে চান। তোমাকে মনে করেন ভীতু—তাই ওঁদের সঙ্গে পাঠাতে চান।

—আচ্ছা—আমিও দেখে নেব কে আমায় পাঠায় সেই সরভাজার দেশে! সাহস আমারও আছে।

আশা হাসিতে হাসিতে বলিল, রাগ করে আর সিঙ্গাড়া দু'খানা ফেলে রেখ না। আজ কারও মন ভাল নেই, রান্নারও দেরি আছে।

বাহিরের ঘরে মজলিস এইমাত্র শেষ হইয়া গেল। মজলিস বলিয়া মজলিস! প্রকাণ্ড হল-ঘরটায় তিল ধারণের স্থান ছিল না। উচ্চপদে উন্নীত হওয়ার পর বহু পরিচিতই তিনকড়ির বৈঠকখানাকে পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অলস-চর্চ্চায় তিনকড়ির উৎসাহ ইদানী আশ্চর্য্যজনকভাবে হ্রাস পাইয়াছিল। তাস-পাশার আড্ডা তিনি তুলিয়া দিয়াছিলেন।

—যা বড় বড় কেস ডিল করতে হয়—তাতে দিন-রাত আইন-কানুন মুখস্থ করা, অকাট্য যুক্তিগুলিকে ভেবেচিন্তে মাথা থেকে বার করা…এর পর ওসব কর্ম্মনাশার চর্চ্চা আর চলে না। তা আপনারা খেলুন না, বেশি চীৎকার করবেন না—ইত্যাদি।

যে খেলার প্রাণধর্ম্মই হইল কলরব—তাহাকে বাঙ্‌-নিষ্পত্তি না করিয়া জমানো—ঠিক যেন বিনা বাদ্য-রোশনাইয়ে অর্থবান বরের শোভাযাত্রার মত। মনুষ্য-রীতি-বহির্ভূত বলিয়াই অন্যত্র আড্ডা জমিয়াছে। আজ সান্ধ্য-বৈঠকে সেই সব পুরাতন বন্ধুবান্ধব ছাড়াও অবাঞ্ছিত বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। বেশি লোক আসাতে সকলের আশা ও আকাঙ্ক্ষা দুইটিই কখনও বদ্ধিত, কখনও বা স্তিমিত হইয়া উঠিতেছিল। মজলিস শেষ হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মেয়েদের আপাতত স্থানান্তরিত করাই যুক্তিযুক্ত। পুরুষরা—কর্ম্মবন্ধনে বাঁধা বলিয়াও বটে, আবার তেমন পরিস্থিতি ঘটিলে পদব্রজে দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে সক্ষমও বটে, আপাতত এই শহরেই অবস্থান করিবেন।

বড়বউ উষা দুয়ারের ওপিঠে চোখ এবং কান সজাগ রাখিয়া এতক্ষণ এই সব আলাপ-আলোচনা শুনিতে-ছিল। কোলাহলে গৃহীত প্রস্তাবগুলির অর্থ ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ছটফট করিতেছিল। বৈঠকখানা খালি হইবামাত্র সে ভারি মখমলের পর্দ্দাটা ঠেলিয়া গৃহপ্রবেশান্তর কহিল, কি ঠিক হ'ল তোমাদের?

আড়মোড়া ভাঙিয়া—একটা হাই তুলিতে তুলিতে তিনকড়ি বলিলেন, তোমাদের সকলকেই যেতে হবে। কলকাতা আর সেফ্‌ নয়।

—আর তোমরা ?

—আমরা সে তখন যা হয় করে—

বাধা দিয়া উষা বলিল, হাঁ, তা বইকি! আমরা অকেজো প্রাণ বাঁচাতে ছুটবো এঁদো পাড়াগাঁয়ে—আর মূল্যবান প্রাণগুলি থাকবে শহরে।

—আহা, বুঝছ না। বিপদের সময় সবাইর প্রাণ অমূল্য। সে রক্ষা করতে কেউ ত্রুটি করবেন না।

—তবে আমাদের সঙ্গেই পালিয়ে চল না।

—দূর পাগল! আপিস ছাড়বে কেন।

—ছুটি নাও দু-মাসের।

—সে যারা ছোটখাটো কেরানী—তাদের বরঞ্চ ছুটি মঞ্জুর হয়; আমরা আপিসের সব ভার নিয়ে আছি, সবাই আমাদের মুখ চেয়ে সাহস করে আছেন—আমরা যদি যাই—

—মানুষ বাঁচলে তবে ত আপিস! ছেড়ে দাও কাজ। তোমায় নিয়ে গাছতলায় ভিক্ষে করে খাব।

তিনকড়ি হাসিলেন, তুমি দেখছি পেঁচোটার মত কথা বললে। যারা বেকার তাদের মুখে ভিক্ষার কথা মানায়।

—মেয়েমানুষের দুঃখ তোমরা কোন কালেই বোঝ না।

সে কথা তিনকড়ি মনে মনে স্বীকার করিলেন। গত পরশু কুড়ি ভরির দু-প্যাটার্ণের চুড়ি স্যাকরা বাড়ি হইতে আসিয়া উষার করপ্রকোষ্ঠে আশ্রয় লাভ করিয়াছে এবং চুড়ি না-আসা পর্য্যন্ত প্রত্যহ যে-সব আলাপ-আলোচনা হইয়াছে তাহা উষার মনে না থাকিবারই কথা, তিনকড়ির মনে গাঁথা আছে। ভিক্ষান্নে প্রাণরক্ষার পরমসুখ ছাড়া সেই সব বাক্যগুলির আরও স্থূল প্রকাশের আশঙ্কা বিদ্যুৎ-গতিতে তিনকড়ির সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ আনিয়া দিল। তিনি মুখে হাসিয়া শুধু বলিলেন, পরে বুঝবে ভাল করছি—কি মন্দ করছি।

বৈঠকখানার আলোচনা এইখানে শেষ হইলেও শয়ন কক্ষে এই আলোচনার জের উষা টানিয়া আনিল, আমরা যেন পাড়াগাঁয়ে গেলুম, টাকাকড়ি—গহনাপত্তর এ-সবের গতি কি হবে ?

—কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, কিছু ব্যাঙ্কে জমা দেব।

—পাড়াগাঁয় চোর-ডাকাতের উপদ্রব নেই।

—তেমন পাড়াগাঁয়ে আমরা যাব কেন।

—না। তোমার বাংলা কাগজে যে-সব খবর বেরয় রোজ—তাতে কোন্ পাড়াগাঁটা যে ভাল তা ত বুঝি না।

—কি বিপদ! সেখানে কি লোক নেই, না গহনাপত্তর নিয়ে তারা বাস করছে না ?

—সে যারা করে করুক—আমি পারব না।

—তবে সব গহনা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে যাও।

—তা আর নয়! চাকরাণীর মত খালি হাত ক'রে ট্যাঙ্‌টেঙিয়ে সেই পাড়াগাঁয়ে গিয়ে উঠব। তোমার মুখখানা কোথায় থাকবে শুনি ?

বৃহৎ সমস্যা এত যে শাখা-প্রশাখাযুক্ত হইতে পারে এ ধারণা তিনকড়ি করিতে পারেন নাই। শহর ত্যাগ বলিলেই যদি শহর ত্যাগ করা চলিত—তাহা হইলে আর ভাবনা কি ? উঁহারা গহনার ভাবনা ভাবিতেছেন—তাঁহার ভাবনা সহস্রমুখী। বাড়ি, আসবাবপত্র, গৃহপালিত পশুপক্ষী, গৃহদেবতা নারায়ণ, ব্যাঙ্কের পরিপুষ্ট অর্থের স্থায়িত্ব চিন্তা—কত কি। হায়, আজ মনে হইতেছে, যাহাদের কিছুই সম্বল নাই—তাহারাই যথার্থ সুখী। সহস্রমুখী সঞ্চয় ও মমতার নিগড় তাহাদের জীবনধারণ-সমস্যাকে কষিয়া বাঁধিতে পারে নাই।

বহু অনুনয়-বিনয় ও যুক্তি প্রদর্শনে বড়বধূ রাজী হইলেন।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা গেল, অলঙ্কার কোম্পানীর ঘরে গচ্ছিত রাখার চেয়ে নিজ অঙ্গের শোভাবর্দ্ধনে প্রযুক্ত রাখাই শ্রেয়। রাম বা রাবণ যাহার হাতেই মৃত্যু ঘটুক—মৃত্যু তো বটেই। আর অর্থ বেশির ভাগ ব্যাঙ্কে রাখিয়া দু-চার মাসের মত হাতখরচা রাখাই ভাল।

—কিন্তু, ঠাকুরপো যেতে চায় না সেখানে।

—কেন ?

—কে জানে, কি খেলা আছে—তাই দেখবে। আর তুমি তাকে ভীতু বলেছ ব'লেও হয়ত জিদ চেপে গেছে।

বেশ ত। ও এখানে থাকলেই ভাল হয়। আমিও তাই ভাবছিলুম। আমি আপিস চলে গেলে—চাকর-বাকরের জিম্মায় সারা দুপুর বাড়ি ফেলে রাখা—তা ভালই হ'ল।

—আমাদের সেখানে দেখাশোনা করবে কে ?

—সে সব ঠিক ক'রে ফেলেছি। রঘুবাবুরা যাচ্ছেন, অনুকূলবাবুরা যাচ্ছেন—তিনখানা পাশাপাশি বাড়ি ঠিক করা গেছে। মাঝেরটা আমাদের; ওঁরা দু-পাশে থাকবেন। ওঁদের বাড়িতে কম্‌সে কম দশ জন পুরুষ মানুষ থাকবেন।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া উষা বলিল, নাও, শুয়ে পড়। আলো নিবিয়ে দিই।

যাকে বলে স্বখাত সলিল। বিদায়-দিনে পাঁচকড়ি শুষ্ককণ্ঠে কহিল, ভাল করলে না আশা। শহর ছেড়ে পালাচ্ছ—তোমাকেই লোকে ভীতু বলবে।

—আমি ত আর নিজের ইচ্ছেয় যাচ্ছি না।

—সে কথা কেউ কি বিশ্বাস করবে?

—কেউ না করুক—তুমি করলেই যথেষ্ট!

আমি! একটু চমকিত হইয়া মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া ম্লান হাসিয়া পাঁচকড়ি বলিল, আমিই যে বিশ্বাস করতে পারছি না।

বট্‌ঠাকুরের কাছে বলগে।—বলিয়া দ্রুতপদে আশা কক্ষত্যাগ করিল। কক্ষত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাহার চোখের পাতা দু'টি কাঁপিতেছিল যেন।

বট্‌ঠাকুরের কাছে বল গে।—এমন ধরাগলায় ও রুদ্ধ আবেগে উচ্চারণ করিল যে, কথা শেষের মুহূর্ত্তে জলধারা পতনের সন্দেহটুকুকে সে মুছিয়া দিয়াই গেল।

পাঁচকড়ি মনে মনে বলিল, আর বলা! অতি বুদ্ধি খাটিয়েই আমার এই দশা। বাড়ি আগলাই বা ক্রিকেট খেলা দেখি—সবই সমান। যে মেজাজ দাদার।

সুতরাং বিদায়-মুহূর্ত্ত বিনা প্রতিবাদে সন্নিকটবর্ত্তী হইল।

শেষ চেষ্টা স্বরূপ পাঁচকড়ি দাদাকে বলিল, এত মোটঘাট তুমি একা সামলাতে পারবে কি? আমি না হয় সঙ্গে যাই।

ভাবিল একবার সেখানে গিয়া পড়িলে সাইকেল হইতে পড়িয়া পা মচ্‌কাইতে কতক্ষণ! মনে আছে, এক বার মচ্‌কানো পা'কে সুস্থ করিতে পুরা তিন সপ্তাহ তাহাকে শয্যাশ্রয় করিতে হইয়াছিল।

তিনকড়ি হাসিয়া বলিলেন, এই ক'টা জিনিস আমরা ক'জন রয়েছি—দু'টো চাকর রয়েছে—খুব সামলাতে পারব। কলকাতার বাড়িতে যা জিনিস রইল—তাতে তোর থাকা দরকার।

গম্ভীর মুখে পাঁচকড়ি বলিল, কি দরকার ছিল এখানে এত জিনিস রাখবার। একটা কিছু হ'লে সব নষ্ট হবে ত?

—হোক্ গে। গুচ্ছেক কাঠ্-কাঠ্‌রা নিয়ে গিয়ে রেল-কোম্পানীকে মাশুল দিই কেন। মানুষ থাকলে জিনিস হতে কতক্ষণ।

পাঁচকড়ি মনে মনে বলিল, তবে আগলাবারই বা দরকার কি। চুরি গেলেই বা জিনিস হ'তে কতক্ষণ।

কিন্তু প্রকাশ্যে সে কিছু বলিল না। শুধু নীরবে চাহিয়া দেখিল, এ-বাড়ির কত না অপ্রয়োজনীয় জিনিস এই সঙ্গে পাড়াগাঁ অভিমুখে চলিয়াছে। তেঁতুলের হাঁড়িটা বিধবা পিসিমা কোলের কাছে সাবধানে রাখিয়াছেন, বড়বধূ গহনার বাক্স আঁচলের আড়ালে ঢাকিয়াছেন। পুরোহিত মহাশয় কুলদেবতা বাণেশ্বর শিবকে সোনার সিংহাসন সমেত বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়াছেন। ছোট ভাইপোর হাতে চেন বাঁধা দিশি কুকুরটা আর কাবুলী বিড়ালটা ভাগ্নী রমা সাদরে কোলে বসাইয়া লইয়াছে। মোটঘাট যাহা স্তূপীকৃত হইয়াছে—তাহার কুলি ও গাড়ি ভাড়ার টাকায় লন তৈয়ারী সমেত খানচারেক টেনিস-র‍্যাকেট কেনা চলে। জীবনধারণের জন্য প্রত্যেকটি জিনিস নাকি মূল্যবান। এত সঞ্চয়ও বাঙালী ঘরে থাকে!

পথে বাহির হইলে শুধু ঘোড়ার গাড়ির সারি ও মাল বোঝাই গরুর গাড়ির সারি দেখা যায়। একটানা অবিরাম স্রোত কলিকাতার প্রকাণ্ড দুই রেলওয়ে স্টেশন অভিমুখে প্রবল বেগে ছুটিতেছে। মৃত্যুভীতি এই জনতাকে প্রকাণ্ড সম্মার্জ্জনী দ্বারা শহর হইতে সাফ করিয়া দিতেছে। পলায়নের কি সমারোহ—কিবা বিশৃঙ্খলা। মুঠা মুঠা টাকা ঢালিয়া এতটুকু আরাম কিনিবার কি আকুল আগ্রহ!

পাঁচকড়ির মন খারাপ হইয়া গেল। এই পলায়ন-দৃশ্যে মনে হইল, যাহারা বাহিরে চলিয়াছে তাহারাই বুঝি বাঁচিয়া গেল। যাহারা রহিল, তাহাদের মৃতদেহ সনাক্ত করিবার লোকই হয়ত পাওয়া যাইবে না; শোক করিয়া দু-ফোঁটা চোখের জলই বা ফেলিবে কে?

গাড়ি ছাড়িয়া দিতেই একটা মিশ্র ক্রন্দনের রোল উঠিল। চোখে রুমাল চাপিয়া পাঁচকড়িও চলন্ত ট্রেনের পানে চাহিয়া রহিল। আন্দোলিত রুমালে বিদায়-বার্ত্তা জ্ঞাপন করা আর হইল না।

শহরের প্রাণশক্তি দিন দিন স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। কলেজ স্কোয়ার বা হেদুয়ার ভিড় পাতলা হইয়াছে। স্কুল-কলেজের ন-যযৌ ন-তস্থৌ অবস্থা। যে দোকানের মাল ফুরাইতেছে তাহার দুয়ারও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইতেছে। রাত্রির অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া নিষ্প্রদীপ শহর থমথমে হইয়া উঠে। এ বৎসর ক্রিকেট খেলাই বা জমিল কই? সিনেমা-প্রত্যাগত লোকের মুখে উপভোগের তৃপ্তির হাসি কোথায়! ও পাশের গলিটায় মাঝে মাঝে একটা বিড়াল সকরুণ 'ম্যাও' 'ম্যাও' ধ্বনি করিতে থাকে। খানিকটা ঘুমাইয়া বেশির ভাগ জাগিয়াই পাঁচকড়ির কাটিয়া যায়।

পাশের ঘরে দাদার ঘুমও যে পাতলা হইয়াছে তাহা ঘন ঘন পার্শ্বপরিবর্ত্তনের শব্দে ও কুঁজা হইতে জল ঢালিবার শব্দে বুঝা যায়। চুরুটের গন্ধও রাত্রির মধ্যযামে পাঁচকড়িকে আর একটি প্রাণীর অনিদ্রার সংবাদ আনিয়া দেয়।

কোনদিন সকালে তিনকড়ি বলেন, কাল রাত্রিতে কি রকম গরম গেল। উঃ, দু'চোখের পাতা এক করতে পারি নি।

পাঁচকড়ি বলে, আমার তো বেশ শীত-শীত করছিল।

কোনদিন তিনকড়ি বলেন, কৃষ্ণনগরের কোন চিঠি পেলি ?

—হ্যাঁ, চিঠি দেবার কথা কারও মনে থাকে! দিব্যি খাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, তাস পিটছে—

—নারে, পরশু বড় খোকা কি লিখেছে জানিস ? জ্যাঠা ছেলে !

—কি লিখেছে ?

—লিখেছে, বাবা, আমাদের শীগ্‌গির এখান থেকে নিয়ে যাও। বড় কষ্টে আছি।

—কি কষ্ট ?

—ভাল সিনেমা নেই, পথঘাটে ধুলো, কলের জল সর্ব্বদা থাকে না—এই সব। তা ছাড়া ভাল মাছটাছও নাকি মিলছে না। লিখেছে—তার চেয়ে কলকাতায় বোমা খেয়ে মরা ভাল।

—তা এত কষ্ট যখন—নিয়েই এস না।

—দূর পাগল ! তাহলে এত খরচখরচা ক'রে পাঠালুমই বা কেন ? তা হয় না। বলিয়া চুরুট ধরাইয়া ধূম উদ্গীরণ করত কহিলেন, আমি বলছিলাম কি—মেয়েদের কোন কষ্ট হচ্ছে কিনা ?

পাঁচকড়ি বলিল, তা কি আর হচ্ছে না ! ভাল সিনেমা নেই তো সেখানে।

—না না, আমি সিনেমার কথা ভাবছি না।

—ভাল মাছও তো পাওয়া যায় না।

—না না, খাওয়া-দাওয়ার কথাও নয়। একটু থামিয়া বলিলেন, এই ক্লাইমেট স্যুট করছে কিনা। যে চাপা ওরা —শরীর খারাপ হলে সহজে তো বলে না।

—তা বটে।

—তা ছাড়া স্কুল কলেজের এই অবস্থা। আজ খুলছে কাল বন্ধ হচ্ছে। ছেলেমেয়েগুলোর লেখাপড়ার দফা গয়া।

পাঁচকড়ি সাগ্রহে বলিল, তাহলে তাদের কলকাতায় নিয়ে আসাই ভাল।

তিনকড়ি সজোরে চুরুটে টান মারিয়া কহিলেন, তোমার মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু নেই। একটা ইস্কুলও কি ভালভাবে খুলেছে ? ওতে পড়াশোনা হয় ? মিছি মিছি ওদের বিপদের মাঝে টেনে আনি কেন ?

পাঁচকড়ি চুপ করিয়া রহিল।

তিনকড়ি বলিলেন, ভাবছি কাল একবার কৃষ্ণনগরে গিয়ে পরামর্শ করে আসি।

পাঁচকড়ি তথাপি কথা কহিল না।

—কথা কইছিস না যে ?

—তুমি যাবে—আমি কি বলব।

—যাওয়া উচিত নয় কি ? তাই ভাবছি—চারদিনের ছুটি নিয়েই যাই। তেমন বুঝি ওদের নিয়েই আসব। কি বলিস ?

দাদা অবশ্য পাঁচকড়ির সম্মতির অপেক্ষা রাখিয়া মনস্থির করেন নাই, কাজেই, সে বেচারাকে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িতে হইল। ইতিপূর্ব্বে বার তিনেক ছুটি না লইয়া অর্থাৎ শনিবারে দাদা একটা-না-একটা ছুতা করিয়া কৃষ্ণনগর ঘুরিয়া আসিয়াছেন। পাঁচকড়ি বাড়ির ধন-দৌলত আগলাইয়াছে। আগলাইয়াছে আর ছাই ! শেষবারে তো রাগ করিয়া ভবানীপুরে মাসীমার বাড়িতে শনি রবি দুই দিন কাটাইয়া আসিয়াছে। এ ঘরে মানুষ ঘুমাইলে ও ঘরে কি চুরি হয় না ?

সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াই পাঁচকড়ির মাথার মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে একটা মতলব খেলিয়া গেল ; একটু হাসিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

দাদা চলিয়া যাওয়ার পঞ্চম দিনে সে মতলবঅনুযায়ী কার্য্য হাসিল করিবার জন্য বিশ্বাসী ভৃত্য সত্যকে ডাকিয়া বলিল, দেখ সত্য, আমি কৃষ্ণনগর চললাম। বড় শরীর খারাপ হয়েছে, বোধ হয় খুব জ্বর আসবে। এখানে কে দেখে-শোনে বল ত ?

সত্য চিন্তিত মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল, গা হাত টিপে দেব, ছোট দাদাবাবু ?

—দূর, তেড়েফুঁড়ে জ্বর এলে গা হাত টিপে তো সব হবে। যদি জ্বরের ঘোরে বেহুঁস হ'য়ে যাই—তখন কি হবে বল ত ? দাদা বাড়িতে নেই—

সত্য চিন্তিত মুখে বলিল, তা বটে ! আজই চলে যাও —ছোট দাদাবাবু।

—যদি দাদা এসে জিজ্ঞাসা করেন—কি হয়েছে ? তুই কি বলবি ?

—বলবো, ছোট দাদবাবু বললো জ্বর আসবে, তাই চলে গেল।

—না না, তুই বরঞ্চ বলিস, বাবু জরে মাথা তুলতে পারছিল না, ভুল বকছিল—তাই গাড়িতে তুলে দিয়ে এলাম।

—তাই বলব। বড় দাদাবাবু আজ আসবেন কি ?

—হুঁ, দাদা সন্ধ্যের সময় আসবে। তুই আমার স্নুটকেসে কাপড় জামা গুছিয়ে দে। বেলা সাড়ে তিনটের গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবি।

—যদি এর মধ্যে জ্বর আসে ?

—না, নাড়ি দেখে বুঝছি—আট ঘণ্টার আগে জ্বর আসবে না।

—তবে এই বেলা কিছু খেয়ে নাও।

দূর, জ্বর হ'লে কিছু খায় নাকি। স্রেফ্ উপোস।

সত্য চিন্তিত মুখে কহিল, একটু দুধ-কি কমলালেবু ?

উঁহু—নিরম্বু উপোস। বলিয়া দুই করতলে রগ টিপিয়া সে চোখ বুজিল।

তা বলিয়া পাঁচকড়ি উপবাস করে নাই। জ্বরে মাথা ধোওয়া বিধি বলিয়া মাথাটাও ধুইয়াছে, চুলে ব্যাকব্রাসও করিয়াছে, এবং 'বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আসি' বলিয়া নিকটবর্ত্তী এক বোর্ডিঙে আহারাদিও সুসম্পন্ন করিয়াছে।

ট্রেনে তুলিয়া দিবার মুখে সত্য বলিল, ছোট দাদাবাবু তোমার মুখ যেন টস্ টস্ করছে। মাথাটা এখনও টিপ্ টিপ্ করছে কি ?

—হুঁ, বোধ হয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জ্বর আসবে।

—ততক্ষণে পৌঁছে যাবে ত ?

নিশ্চয়! কব্জি-শোভিত ওয়াচটা উল্টাইয়া সে কহিল, টাইম না দেখে কাজ করি না। তুই যা।

প্রণাম করিয়া সত্য চলিয়া গেল।

রাণাঘাটে গাড়ি বদল করিয়া যেমন সে তিন নম্বর প্লাটফরমে কৃষ্ণনগরের গাড়ি ধরিবার জন্য ওভারব্রীজের উপর উঠিয়াছে—অমনই দেখিল নীচের দু'নম্বর প্ল্যাটফরমে ধোঁয়া ছাড়িয়া একখানা ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানা কৃষ্ণনগর লোক্যাল। ব্রীজের উপর হইতে সে নামিল না; তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যাত্রীদলের বহির্গমন দেখিতে লাগিল। স্নুট-পরিহিত দাদাও চিরপরিচিত ব্যাগটা হাতে করিয়া মধ্যম শ্রেণী হইতে বাহির হইলেন। ও হরি, বাহির হইয়াই তিনি যে ওভারব্রীজের উপর উঠিবার জন্য সিঁড়িতে পা দিলেন। পাঁচকড়ির আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। এমন সুসজ্জিত বেশে অসুখের ভান করা চলে না। সত্য ভুলিতে পারে, দাদা নিশ্চয়ই ভুল বুঝিবেন না। তৎক্ষণাৎ সে শোলার হ্যাট্‌টা কপালের উপর আর একটু টানিয়া দিল এবং পকেট হইতে ক্যাভেণ্ডারের প্যাকেট বাহির করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া লইল। অতঃপর দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া অবতরণ করিতে লাগিল।

চেহারার সাদৃশ্য ত কত লোকেরই আছে। আর চিনিতে পারিলেও—সিগারেট-সেবী ছোট ভাইকে ডাকিয়া বড় ভাই নিশ্চয়ই হঠাৎ চলিয়া-আসার হেতু জিজ্ঞাসা করিবেন না। এটুকু চক্ষুলজ্জা বাঙালী সমাজে আজও বিদ্যমান!

অপাঙ্গ দৃষ্টিবিনিময় হয়ত হইল।

পাঁচকড়ি মনে মনে বলিল, চিনতে পারেন নি।

তিনকড়ি মনে মনে বলিলেন, ছোঁড়াটা ভীতুর একশেষ, আমি নেই, পালিয়ে এসেছে।

আলোচনা

"উত্তর-পশ্চিমের মুসলমান বৈষ্ণব কবি"

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

বর্ত্তমান বৎসরের গত কার্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে 'উত্তর-পশ্চিমের মুসলমান বৈষ্ণব কবি' প্রবন্ধে রসখান প্রভৃতি মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গান্তরে উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে রসখানের প্রকৃত নাম জানা যায় নি শুধু তাঁর কবিতার ভনিতায় আপনাকে 'রসখান' বলে উল্লিখিত নামে তিনি জনসাধারণে পরিচিত।

হিন্দী ভাষার পুরানো ইতিহাস প্রভৃতিতে দেখা যায় যে 'রসখানে'র প্রকৃত নাম ছিল সৈয়দ ইব্রাহিম জিহানী।

মুসলমান কবিদের মধ্যে যাঁরা ব্রজ-ভাষায় কবিতা লিখে যশস্বী হন তাঁদের নাম হচ্ছে, রসখান, রসলীন, আব্দুর রহীম খান্‌খানা, মালিক মুহম্মদ জায়সী, মুবারক, অহমদ, বহার, জলীল, প্রেমী যমন, নবী, জুলফিকর্ ইত্যাদি।

শাহজাদা আমীর খুসরু রচিত অনেক কবিতা ব্রজভাষায় রচিত হয়েছে।

উল্লিখিত কবিদের বৈষ্ণব-কবি বলা যেতে পারে এবং এ ছাড়াও অনেক কবির নাম পাওয়া যায় যাঁদের রচিত কোনো গ্রন্থ নেই শুধু তাঁদের বাণী লোকের মুখে মুখে চলে আসছে ও সমাদৃত হয়ে আছে।

স্মৃতিচিত্রের কিয়দংশ

শ্রীপ্রতিমা ঠাকুর

[শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ৭১তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আমরা তাঁর অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ নিয়ে "অবনীন্দ্র শিল্পচক্র' স্থাপন করি। সেই সময়ে শিল্পাচার্য্যের ভাগিনেয়ী শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে আমি অনুরোধ করি তাঁর মাতুল সম্বন্ধে কিছু লিখতে। তিনি তখন খুব অসুস্থ ছিলেন তবু আমাদের অনুরোধ স্মরণ ক'রে যে রচনাটি শিল্পচক্রের সদস্যদের প্রতিমা দেবী পাঠিয়েছেন সে জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। শ্রীমতী শান্তা দেবীও অবনীন্দ্রনাথ শীর্ষক প্রবন্ধ "প্রত্যহ" পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন এবং আমরা আশা করি অবনীন্দ্র-ভক্ত আরও অনেকে এই রকম ক'রে ভারতীয় শিল্পের নবযুগ সম্বন্ধে লিখে আমাদের কৃতার্থ করবেন। শ্রীকালিদাস নাগ]

পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ যখন যৌবনে পদার্পণ করেছেন, সেই সময় কলকাতার আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেল সাহেবের চোখে প্রথম ধরা পড়েছিল অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা। তিনি বুঝেছিলেন এই যুবকের মধ্যে আছে সৃষ্টি করবার ক্ষমতা। তাই তাঁকে নানা প্রকারে উৎসাহ দিতে লাগলেন, যাতে তিনি অবাধে কাজ করতে পারেন, বাইরের সমালোচনায় মন যাতে দমে না যায়। তখন বাঙালী শিক্ষিত সমাজ বেশির ভাগই রবি বর্ম্মার ছবি দেখে মুগ্ধ হতেন। অবনীন্দ্রের ছবির সরু সরু হাত পা বহুদিনের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের ছায়া ব'লে সকলে সমালোচনা করত; তা ছাড়া অবনীন্দ্রনাথের চিত্র তো ফোটোর মতো মানুষের হুবহু কপি নয়। তাঁর ছবির আঙুলের প্রতি লক্ষ্য ক'রে কাগজে অনেক কিছু সমালোচনা তখন বেরত। কিন্তু শিল্পীর ভিতর ছিল আগুন, সে আগুন চাপা দেবার কারো সাধ্য ছিল না। তিনি কারুর কথায় কান না দিয়ে নিজের কল্পনারাজ্যের কাজ আপন মনে করে যেতে লাগলেন।

এইখানে তাঁর বড়ো ভাই শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ না করলে অবনীন্দ্রনাথের কথা সম্পূর্ণ ভাবে বলা সম্ভব নয়; এই দুই ভাই ছিলেন যেন "মাণিক জোড়"। এঁদের মন-বীণার তার ছিল, একই টানে বাঁধা এবং তাঁদের চিন্তা ও কল্পনা ছিল চিত্র সাধনায় রত। আকৃতি এবং প্রকৃতিতে দুই ভাই সম্পূর্ণ বিভিন্ন হলেও বস্তুত সেই পার্থক্য বিরোধ সৃষ্টি না করে বরং তাঁদের চরিত্রে ও কর্ম্মে বিশিষ্টতা এনে দিয়েছিল। তাঁদের শিল্প-সৃষ্টি প্রথম থেকেই কলারসের দুইটি স্বতন্ত্র* ধারাকে অবলম্বন ক'রে প্রবাহিত হয়েছে এবং তাঁদের ব্যক্তি-বিশেষত্ব এই আন্তরিক ভাববিনিময়ের দ্বারা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি।

গগনেন্দ্রনাথের অল্প বয়সের শখ ছিল পিসবোর্ড কেটে নানা প্রকার ছবি তৈরি করে এবং কাগজের ষ্টেজ বেঁধে তাতে ছোটো ছোটো চিত্র দিয়ে নাটক অভিনয় করা। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যের সময় সেই চিত্রনাট্যগুলি উপভোগ করত। গগনেন্দ্রনাথ নিজেও একজন বড়োদরের অভিনেতা ছিলেন। জ্যাঠামশায়ের বাড়ির ছেলেরা যখন অভিনয় করতেন তখন এঁদের দুই ভায়েরও সে আসরে ডাক পড়ত। গগনেন্দ্র খুব মজলিসী ও সামাজিকতা-গুণ-সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁর চেহারাতে ও সদালাপে সুধী সমাজে ও রসিক মহলে তাঁকে সুপরিচিত করেছিল।

অবনীন্দ্র শিশুকালে ছিলেন কৌতুকপ্রিয়। তাঁর ধরণ-ধারণ চলাবলা সমস্তই একটি বিশেষ স্বকীয়তাকে প্রকাশ করত। এই সময়, কৌতুকনাট্যের পার্টে অবনীন্দ্রের ক্ষমতা প্রকাশ পায়। শোনা যায় কবিগুরু বিশেষ ক'রে "বিনি পয়সার ভোজে" তিনকড়ের চরিত্রটি তাঁর জন্যই লিখেছিলেন। এই পার্টে তাঁর অভিনয় হয়েছিল অতুলনীয়। পরবর্তী কালে এই নাটকের পুনরভিনয় হ'ল যখন অন্য কেহ তিনকড়ের পার্ট অভিনয় করলে দর্শকদের মধ্যে অবনীন্দ্রের পূর্ব-অভিনয়-দর্শী-যাঁরা উপস্থিত থাকতেন বলতেন অবনীন্দ্রের মতো করে কেহই তিনকড়িকে জীবন্ত করে তুলতে পারবে না। কবিগুরুও তাঁকে ব্যঙ্গনাট্য অভিনয়ে একজন মাষ্টার আর্টিষ্ট বলেই মনে করতেন। ফাল্গুনী এবং ডাকঘরের অভিনয়ে যাঁরা তাঁর অভিনয় দেখেছেন আজও তাঁদের স্মৃতিপটে সে-ছবি উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

এই সময় অনেক সুপ্রসিদ্ধ জাপানী শিল্পী ও পণ্ডিত ভারত ভ্রমণে আসেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সুবিখ্যাত ওকাকুরা। তাঁর সঙ্গে শিল্পীদের প্রথম পরিচয় হোলো সিস্টার নিবেদিতার দ্বারা। তখন বাংলা দেশে

---

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ী

স্বদেশী অন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। ওকাকুরার কাছে জাপানের চিত্রজগতের খবর শুনে দুই শিল্পী ভ্রাতা জাপানী ছবি আঁকার কায়দা দেখবার জন্যে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন। ওকাকুরার দুই বন্ধু টাইকোয়ান ও হিসিদা ভারত ভ্রমণের জন্য এই সময় উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। ওকাকুরার কাছ থেকে এই খবর পেয়ে দুই ভাইয়ের ইচ্ছা হোলো এই শিল্পীদের বাড়িতে অতিথিরূপে রেখে তাঁদের সঙ্গ লাভ করেন; জাপানী চিত্রকরদের কাজ এমন চাক্ষুষ দেখবার সুযোগ সম্ভাবনায় তাঁদের মন উল্লসিত হয়ে উঠল, কিন্তু মায়ের* তো অনুমতি চাই, মাকে গিয়ে দুই ভাই ধরে পড়লেন; "মা! ওকাকুরার দুই আর্টিষ্ট বন্ধু ভারত-ভ্রমণে আসবেন, তাঁদের আমাদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের মতো তারা দু'বেলা মাছ ভাত খায়, আসন পিঁড়ী হয়ে বসে'।" মা বিদেশীদের বর্ণনা শুনে একটু আশ্বস্ত হোলেন, সেই সঙ্গে তাঁর দয়ালু মন বিদেশী অতিথিদের আতিথ্য করবার জন্য প্রস্তুত হোলো। এইরূপে যে-গৃহ কেবল পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তার দ্বার খুলল বাইরের দিকে। এর পর থেকে অনেক গণ্য-মান্য অতিথি অভ্যাগত এসে ওঁদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। এদিকে য়ুরোপ থেকে রদেনষ্টাইন, কাউণ্ট কাইজারলিং, কুমারস্বামী এঁরা সকলেই শিল্প-সংগ্রহ দেখবার জন্যে ওঁদের বাড়ি আসতেন। এই শিল্পীদের গৃহের মধ্যে দিয়ে তখনকার স্বদেশী বিদেশী আগন্তুক, গুণী ও জ্ঞানী ভারতের নতুন ও পুরাতন শিল্পের পরিচয় পেয়ে যেতেন। টাইকোয়ান যখন শিল্পীদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন তখন চারিদিককার আবহাওয়া একেবারে বদলে গিয়েছে। ঐ যে লম্বা বারান্দা দেখা যাচ্ছে, আজ সেখানে যে দু'টি শূন্য চেয়ার পড়ে আছে—ঐ চৌকি দু'টি একদিন বাংলার দুই বড়ো শিল্পীর আসন ছিল। বাংলা দেশে শিল্পের ইতিহাস গড়ে উঠেছিল এই বারান্দাটাকে† কেন্দ্র ক'রে। গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্রের চিন্তা ও প্রেরণা আদান-প্রদানে শিল্পের একটি নব যুগ সূচনা করেছিল। তারই সঙ্গে এসে মিলল স্বাধীন জাপানী শিল্পীর কল্পনা আর তাদের লাইনের দৃঢ়তা এবং রঙের প্রাঞ্জলতা। শিল্পীদের এই নব নব ভাবে বিভোর দিনগুলি এই অলিন্দটিকে ক'রে তুলেছিল একটি মধুচক্র। গুণীদের এই সম্মিলিত তীর্থস্থানে চলেছিল তাঁদের শিল্প-সাধনা। সামনের বারান্দায় মাদুর পেতে বসে গেছেন জাপানী আর্টিষ্টদের দল, আর একদিকে গগনেন্দ্র অবনীন্দ্র চালাচ্ছেন তুলি। ভারতীয় প্রণালীতে আঁকা ভারতমাতার একখানি প্রকাণ্ড ছবি অবনীন্দ্রনাথ সেই সময় কোনও স্বদেশী সমিতির জন্যে তাঁর একটি ছোটো ছবি থেকে বড়ো করে এঁকে দিচ্ছিলেন। সেই ছবির উপর নানা প্রকার রঙের ওয়াশের পরিপ্রেক্ষণ চলেছিল তখন। এদিকে বড়ো ভাই গগনেন্দ্রের মনে লেগেছে জাপানী রঙের মোহ; তিনি তখন তুলির পোঁচে ভারতীয় প্রাকৃতিক চিত্রে জাপানী কমনীয়তা ফলাবার চেষ্টা করছেন আর টাইকোয়ানের তুলিতে চলেছে তখন রাসলীলার সৃষ্টি। এর থেকেই বোঝা যায় ঐ বারান্দার আবহাওয়া তখন কেমন জমাট। তিনটি পাগলে মিলে চলেছে যেন মাতামাতি, রং আর রেখা, রেখা আর রং, তারই মধ্যে একাকার হয়ে গেছে শিল্পীদের ব্যক্তিত্ব। সেদিন হয়তো বা ছিল পূর্ণিমা রাত, ছবির নেশা টাইকোয়ানের মাথার মধ্যে বেড়াচ্ছে ঘুরে আর কেবলি ভাবছেন রাসলীলার ছবিতে তো এখনো সুরের শেষ রেশ বাজে নি। আর সবই তো হয়েছে চিত্রে। প্রেমের উন্মাদনা কৃষ্ণ ও গোপিনীদের চাঁদের তরল জ্যোৎস্নাধারায় দিয়েছে গলিয়ে। চিত্রের মূর্ত্তিগুলি রেখা ও রঙের সমন্বয়ে মিলে, মিশে গেছে কোন তুরীয় লোকের অরূপ সাগরে। তবুও শিল্পীর প্রাণ তৃপ্ত হয় নি—মন কেবলই আনচান করছে আর বলছে আমার সৃষ্টির সাধনা তো এখনও শেষ হোলো না। দেখতে দেখতে ভোরের আলো এসে পড়ল তাঁর ঘরে, তিনি গৃহসংলগ্ন ছোটো বাগানটির ভিতর বেরিয়ে পড়লেন সকাল বেলাকার খোলা হাওয়াতে। বাগানের মধ্যে এ-ফুল সে-ফুল নানাবিধ রঙীন পাতা-লতার মধ্যে তাঁর মন অনেকটা শান্ত হোলো। চা খাবার জন্য যখন ঘরে ফিরে এলেন—দেখেন তাঁর টেবিলের উপর নিপুণ হস্তে ছড়ানো কয়েকটি সদ্যফোটা যুঁই ফুল। তাঁর চোখ উঠল জ্বলে। কোন অদৃশ্য হাতের প্রেরণা তাঁর মাথার মধ্যে যেন উসকে দিল নতুন কল্পনার শিখা। এই ফুলগুলি বহন করছিল যাঁর প্রেরণা, মনে মনে তাঁর উদ্দেশে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি তুলে নিলেন তুলি; বলে উঠলেন 'এইবার আমার রাসের উৎসব শেষ করব ঝরাফুলের পুষ্পবৃষ্টিতে।' অমনি তুলির টানে ছড়িয়ে গেল ঝরা পাপড়ির দল, রেখায় রেখায় উঠল নেচে তালের উচ্ছ্বাস। চাঁদের আলো-মাজা উৎসবের রাত্ আনন্দ মনের উপর স্বপ্নের মাধুর্য্যের আবেশ, শেষ হোলো তাঁর ছবি—আজ সে বিখ্যাত ছবি

* অবনীন্দ্রনাথের মাতা সৌদামিনী দেবী।

† ৫ নং জোড়াসাঁকোর বাড়ির বারান্দা।

আর নাই; জাপানের ভূমিকম্পের প্রলয়ের মধ্যে সে লুকিয়েছে। কিন্তু সৃষ্টির আনন্দ-মুহূর্ত স্রষ্টার কাছে জীবন্ত থাকবে চিরকাল, তাকে তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। জাপানী* তুলিতে আঁকা হিসিদা ও কাট্‌সুতা† এবং টাইকোয়ানের মাস্টারপিসগুলি শিল্পীদের বৈঠকখানার দেওয়ালে শোভিত হোলো। জাপানের শিল্প-প্রভাব তখন ভারতের শিল্পীদের মনকে নাড়া দিয়েছিল এবং সেই বিদেশী শিল্পীদের মনেও ভারতের অনেক জিনিস, অনেক প্রাচীন শিল্প-আনন্দ-রস জাগিয়ে তুলেছিল আর এনেছিল নবীন প্রেরণা।

এদিকে যুগ পরিবর্তন চলেছে—জাপানী আর্টিষ্টদের সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি বেরিয়েছিল; তিনি তাঁর শিশুকন্যার মৃত্যুর বিচ্ছেদ-বেদনার মধ্যে দিয়ে 'সাজাহানের মৃত্যুশয্যা' বলে যে ছবি আঁকলেন—এই চিত্রই নিয়ে এল তাঁর যশ। সেই খ্যাতি তিনি প্রথম পেলেন য়ুরোপীয় বিদেশী মহল থেকে। বাংলা তখন তাঁকে নিজের চিত্রকর বলে গ্রহণ করে নি।‡ কাগজ ভর্তি থাকত—তাঁর ছবির সমালোচনা। সেই সমালোচনা কখনও তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করায় নি। উত্তরে সমালোচকদের দু'কথা শোনাতে তিনি কসুরও করতেন না। এদিকে বিদেশী মহলে তাঁর ছবির নতুন নতুন রিপ্রোডাকসান বেরিয়ে চলেছে। নাম ছড়িয়ে গেল সমুদ্রপার পর্যন্ত। চিত্রকর অজন্তা, মোগল, কাঙরা সব মিলিয়ে যে নবীন আর্ট সৃষ্টি করলেন সে হোল তাঁর সম্পূর্ণ নিজের জিনিস। আপন আবিষ্কৃত আঙ্গিক দিয়ে রূপায়িত করলেন নতুন শিল্প, পূর্বতন বিদেশী ছাঁদে আঁকা তৈলচিত্রগুলি বার-মহল থেকে কখন ক্রমে ক্রমে সরে গেল তা আর চোখে পড়ল না। সেই জায়গায় সাজান হোল ইরাণী মোগল আর কাঙড়ার ছবি। দ্বারিকানাথ ঠাকুরের আমলের ভিক্টোরিয়া প্যাটার্নের আসবাবপত্র তখন গুদামজাত হয়েছে। মেয়েদের গহনাপত্রে কাপড়-চোপড়ে তখন খাঁটি দিশী শিল্পের বিশেষত্ব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা চলছে। স্বদেশী নক্সার টেবিল চেয়ার দেখা দিয়েছে। মাদুরের গদি-আঁটা তক্তাপোষ, পুরনো কায়দায় সুন্দর ছিটের ঢাকা তাকিয়া, পিলসুজের উপর পাথরের গেলাস ঢাকা বাতিদান—এই সব বিচিত্র ব্যবহারিক জিনিস স্বদেশী ও বিদেশী আদর্শের সমন্বয়ে তৈরি করবার চেষ্টা চলেছিল। এই সব নতুন কল্পনা থেকে উদ্ভূত জিনিসগুলি দিয়ে সাজান তাঁদের বসবার ঘরটি ছিল মনোরম ও বিশেষত্বে পূর্ণ।

এই সময় গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল থেকে অবনীন্দ্রনাথের ডাক এল মাষ্টারী করতে হবে। তাঁর অনুরক্ত ভক্ত হ্যাভেল সাহেব তাঁকে কিছুতেই ছাড়তে চান না। অবনীন্দ্রনাথকে তিনি কলকাতা আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল করবেন এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। একেই শিল্পী একরোখা খেয়ালী মানুষ, মাস্টারী করতে হবে শুনে প্রথমেই মাথা নাড়া দিয়ে বলে উঠলেন মাস্টারী করা আমার ধাতে নেই। সাহেব তো নাছোড়বান্দা। তারপর পড়ল মায়ের উপর বরাত—মা যদি বলেন, কাজ নেব। মা ছেলেদের উন্নতির পথে কোনো দিনই বাধা দেন নি, তিনি চিরদিনই দিব্যদৃষ্টিতে বুঝতেন ছেলেদের কিসে মঙ্গল হবে। সাহেব তো মায়ের অনুমতি পেয়ে ভারি খুশী। অবনীন্দ্রের আর কোনো কথা বলবার রইল না, তিনি আর্টস্কুলের ভার গ্রহণ করলেন। হোলো তাঁর ক্লাস শুরু, তাঁর প্রভাবের দ্বারা ছাত্ররা অনুপ্রাণিত হোতে লাগল। বাংলার ভবিষ্যৎ শিল্পের বংশধরেরা, যথা মাননীয় নন্দলাল বসু মহাশয়, শ্রীমান অসিত হালদার আর স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটল এইখান থেকেই। অবনীন্দ্রনাথকে ঘিরে যে-শিল্পের সৌর-জগত গড়ে উঠেছিল, পরবর্তীকালে তাঁদের দ্বারাই শিল্প সংস্কৃতি দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। ছাত্রদের সঙ্গে অবনীন্দ্রের একটি গভীর আত্মীয় সম্পর্ক ছিল। যে সম্বন্ধের সম্পদের মধ্যে দিয়ে তাঁর মন পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে মুক্তি পেয়েছিল। এই গুরুশিষ্যের অন্তরঙ্গতা তাঁর শিল্পপ্রেরণায় প্রচুর রসদ জুগিয়েছিল। তাঁরই উৎসাহে মিসেস হেরিং-হামের সঙ্গে একদল ছাত্র অজন্তাগুহা কপি করতে যান। নন্দলাল বসু মহাশয় ও শ্রীমান অসিত হালদার ছিলেন এই তীর্থযাত্রার দলপতি। এঁদের অজন্তা থেকে ফিরে আসবার কিছু পরেই অবনীন্দ্রনাথের স্টুডিয়োর দেওয়াল ভরে উঠল সেই ভাঙাগুহার ছবিতে। এবার খাঁটি ভারতীয় চিত্র—আর জাপানী ছবি নয়। অজন্তার মনোরম ছবিতে ঘরখানা পূর্ণ হয়ে গেল, জাপানী ছবিগুলি তখন সে ঘর থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, কেবল টাইকোয়ানের 'রাসলীলা' তখনো স্থান পেয়েছিল অজন্তার ছবির এক পাশে। এই স্টুডিয়োর মধ্যে দিয়ে শিল্পীর চারিটি মানসিক পরিবর্তনের পর্ব স্মরণে রইল। প্রথম দেখা

* মিষ্টার সেণ্ডার কাছে গল্পটি শোনা।

† কাটসুতা আর একজন জাপানী যিনি পরে ভারতে আসেন।

‡ "প্রবাসী" তাঁকে প্রথম থেকেই সাদরে গ্রহণ ক'রেছিল। "প্রবাসীর" সম্পাদক।

গিয়েছিল দেওয়ালের উপর লাল পেড়ে-শাড়ী-পরা কলসী-কাঁখে বাংলা দেশের গ্রামের মেয়ের তৈলচিত্র। সে সময় বিষয়বস্তু স্বদেশী হোলেও আঙ্গিক ছিল বিদেশী। তারপর এল কাঙড়া আর মোগল চিত্রাবলী, আর কিছু পরে এল জাপানের চিত্রশিল্পের প্রভাব, তারপর এল অজন্তার বিশ্ববিশ্রুত চিত্র; এই সময় শিল্পীদের মনের সমস্ত আদর্শ বদলে গিয়েছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন স্বদেশী আঙ্গিকের উপরে দেশের নতুন আর্টকে গড়ে তুলতে হবে, বিদেশের কাছে ধার করা জিনিস চলবে না।

এই সময় নব পরিপ্রেক্ষিত শ্রীগগনেন্দ্রের কিউবিজমের তলায় তাঁর ছবির জাপানী প্রভাব ঢাকা পড়ে গেল। যদিও তাঁর ছবিতে সাদা কালোর অদ্ভুত সমন্বয় জাপান ও চায়নার পুরাতন শিল্পকে মনে করিয়ে দিত, তাহলেও তাঁর চিত্র আপন ব্যক্তিবিশেষত্বপূর্ণ ছিল। শ্রীগগনেন্দ্রের মন ছিল অনুসন্ধানী, এঁর বিশেষত্ব দেশ একদিন হয়ত বুঝতে পারবে। ভারতীয় চিত্রকলায় নানা প্রকারের নতুন উন্মেষ তাঁর তুলিতেই প্রথম দেখা যায়; সাদা ও কালোর সামঞ্জস্য দিয়ে জাপানী ও চাইনিজ ধরণের ছবি তিনিই প্রথম চেষ্টা করেছিলেন, যদিও ক্রমে সে চেষ্টা নিজের স্বকীয়তায় পরিণত হয়েছিল। ভারতে স্বাধীন সংস্কৃতির যুগ যদি কখনও ফিরে আসে তবে অন্ধকার গুহা থেকে লুপ্ত শিল্পের উদ্ধার করতে গিয়ে ভারতবাসী হয়ত অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে এই গুণীর অবলুপ্তপ্রায় রত্নগুলির দিকে। গগনেন্দ্রের মন ছিল পরিপ্রেক্ষণশীল। তিনি এক থেকে আর এক নতুনের সন্ধানে ঘুরেছেন; রোমান্টিকের চোখে দেখেছেন বিশ্বকে, তাঁর ছবি মানুষের মনের রহস্যে ভরা, অজানিতভাবে মানুষ যেমন মনের ঝাপসা ছায়া নিয়ে খেলা করে, স্বপ্ন দিয়ে গড়ে তাঁর খেলাঘর, মানুষের সেই অজ্ঞাত প্রকৃতির রহস্যে পূর্ণ তাঁর ছবি। কিউবিজম প্রাকৃতিক দৃশ্য, ব্যঙ্গচিত্রের মধ্য দিয়ে মানুষের সেই বিচিত্র রসপূর্ণ জীবন ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন তিনি। এমন একটি জগতের খবর শিল্পী তাঁর চিত্রে রেখে গেছেন, যার অনুসন্ধান তাঁর নিজের কাছেও শেষ হয় নি। 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে মরে পরশ পাথরে'র মতো কেবলি খুঁজে বেড়িয়েছেন, জানতেও পারেন নি কখন সেই পরশ মণির ছোঁয়া লেগে মন তাঁর লাল হয়ে গিয়েছিল। সাধনা তাঁর অজানিতভাবে অগ্রসর হয়েছিল চরম লক্ষ্যের দিকে, ভাগ্য তাঁকে সেই উপলব্ধির আনন্দে পৌঁছতে দিল না, তার আগেই তিনি বিদায় নিলেন পার্থিব জগতের কাছে। অনুমান ১৩১৪ সাল থেকে স্বদেশী শিল্পের একজিবিশান শ্রীগগনেন্দ্রনাথের বাড়িতে প্রায় হ'ত, অনেক স্বদেশী ও বিদেশী শিল্প-রসিক ও পণ্ডিত লোক এই পুরাতন শিল্প-খণ্ডগুলি দেখতে আসতেন। এই একজিবিশানগুলি সুন্দর ক'রে সাজান হ'ত, অনেক সাধারণ ব্যবহারের তৈজসপত্রও সেদিন একজিবিশানে স্থান পেত। প্রতি দিনের ব্যবহারে যে সব জিনিসের সৌন্দর্য আমাদের চোখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সাজানর কায়দাতে সেদিন আবার নতুন ক'রে তাদের গঠনগুলি মনকে মুগ্ধ করত। বাড়ির যতগুলি পুরনো মরচে ধরা বাসনপত্র ছিল, সেদিন মানুষের দৃষ্টিতে তারা যেন কায়া পরিবর্তন করত। এমন করে লক্ষ্য তাদের আগে ত কেউ করে নি, বহু দিনের অনাদরে সিন্দুকের মধ্যে তারা আভিজাত্যের গৌরব নিয়ে বন্ধ ছিল, গুণীর চোখে তাদের মূল্য ধরা পড়ত সেদিন। স্বদেশী শিল্প ও বিদেশী অনুরাগীদের নিয়ে অবনীন্দ্র-ভ্রাতাদের দিনগুলি ছিল তখন পূর্ণ। এই সময় শিল্পী তাঁর বোনকে বেনারসে এই চিঠিখানি লেখেন,—

ভাই বিনয়,*

সারনাথ অতি আশ্চর্য্য জায়গা, আমি সেবার এলাহাবাদ থেকে গিয়ে দেখে এসেছি। জায়গাটা প্রথম দেখেই আমার খুব চেনা চেনা বোধ হয়েছিল। আমার মনে হ'ল যে মন্দিরের ধারে, কোন্ কুয়োতলায় আমার দোকান-ঘর ছিল, সেখানে বসে আমি মাটীর পুতুল আর পট বিক্রী করেছি। সহরের ছেলেমেয়েগুলো আমার দোকানের সামনে রংচঙকরা পুতুলগুলির দিকে হা করে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, মেয়েরা সামনের কুয়ো থেকে জল তুলছে, গল্পগুজব করছে, মন্দিরের সিঁড়িতে লোক উঠছে নামছে, এ সব যেন অনেক দিনের স্বপ্নের মত মনে পড়ে গেল। আরও আশ্চর্য্য যে অতগুলি ঘর-বাড়ির মধ্যে আমার ঘর আমি দেখেই চিনতে পারলুম। পাঁচ কি ছ হাত চৌকো একটি ঘর, দরজার উপর দুটি হাঁস পাথরের চৌকাঠে লেখা আছে। তোমরা বোধ হয় সে ঘর দেখ নি, সেটা নেহাৎ ছোট সামান্য দোকান ঘর কিনা, আমার মন কিন্তু আজও সেই ঘরখানিতে আছে। সারনাথের যাদুঘরে যে-সব মাটীর ঘোড়া খুরী গেলাস কুঁজো দেখেছ, সে-সব আমার হাতের গড়া, তার কোন ভুল নেই। তখনকার পটগুলো কোথায় গেল কে জানে, আর সেগুলো কেমন ছিল তাই বা কে জানে। লোকে ঘরে ফিরলে মন যেমন হয় সারনাথে গিয়ে মন আমার ঠিক তেমনই হয়েছিল।

ইতি অবনদা

* বিনয়িনী দেবী.

এই চিঠির মধ্যে শিল্পীর পূর্বানুভূতির একটি আভাস পাওয়া যায়। মানুষের অবচেতন মনের তলায় কত সত্যই যে জড়িয়ে থাকে; কত স্মৃতি থাকে লুকনো, আমাদের মননশক্তির পরিধি কম, তাই হয়ত স্মৃতির ধারাবাহিকতায় বিচ্ছিন্নতা আসে, ভুলে যেতে হয় অতীতের ঘটনা কিন্তু চেতনার অজানা ভাণ্ডারে অনেক কিছু সঞ্চিত হয়ে থাকে; চিন্তাশীল লোকের কাছে হঠাৎ তার প্রকাশ দেখলে চমকে উঠতে হয়। শিল্পীর ইন্দ্রিয়বোধ সাধারণের চেয়ে এত তীক্ষ্ণ যে তাঁর অজ্ঞাত মনের সৃষ্টির মধ্যে জন্মজন্মান্তরকেও তিনি জীবন্ত করে তুলতে পারেন, তাই শ্রীঅবনীন্দ্রের মন যেন তাঁর অতীত কালকে বার বার ফিরে পেয়েছে তাঁর ছবির মধ্যে। সেই মন যখন নিজের কেন্দ্র খুঁজে পাবার জন্য হাতড়ে বেড়াচ্ছিল, আত্মীয়বিচ্ছেদ-ব্যথার মধ্যে তাঁর কাছে ধরা পড়ল জীবনের সেই গভীর তাৎপর্য। সাজাহান যে-স্বপ্ন দিয়ে গড়েছিলেন তাজ, সেই রসানুভূতি নিংড়ে ফুটে উঠল তাঁর জেস্মিন টাওয়ারে—মৃত্যুশয্যার চিত্র।

সে কীর্তির কথা তিনি ইতিহাসেই পড়েছিলেন, নিজের চোখে কখনও দেখেন নি, কিন্তু কী এক অপূর্ব অনুভূতির অদৃশ্য শক্তি বাস্তবকে ছাড়িয়ে তাঁকে নিয়ে গেল অনেক দূর, ভাব জগতের নিছক রস্তু দিয়ে খচিত চিত্রখানি তখন আর কাগজের উপর আঁককাটা কেবলমাত্র ছবি রইল না; তার ইঙ্গিত বহন করলে বহু দূরের বাণীকে। এমনি করেই ওমার খায়ামের ও আরব্য উপন্যাসের ছবির উৎপত্তি; এগুলি যেন তাঁর চিত্রজগতের লীরিক্স্। এই লীরিকাল উপাদানই হ'ল অবনীন্দ্র-আর্টের বিশেষত্ব, তাই দিয়ে তিনি গড়েছেন শিল্প-জগতের ইমারৎ। রঙ ও রেখা সমন্বয়ে যে সাংগীতিক আকর্ষণ আছে, তারি রসে ছবি হ'ল তাঁর প্রাণবন্ত। তাঁর পদ্মপত্রের অশ্রুধারার মধ্যে বাজছে কালংরার সুর, মরণোন্মুখ উটের দেহভঙ্গীতে গোধূলির বিদায়-গাঁথায় পূরবীর অবসন্নতা উঠেছে জেগে। এই চিত্রগুলির রঙ-রেখার বিন্যাসে জড়ান আছে সুরের অসীমতা; তাই চোখে দেখার অন্তরালে, মনোলোক ঘিরে কাঁপতে থাকে একটি অনির্বচনীয় সেতারের ঝংকার।

যাত্রা-লগ্ন

শ্রীরথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী

আজ আর ক'রো নাকো দেরি,
যন্ত্রের মুখর ভাষা বিস্মিত করেছে নীলে
বেজেছে আকাশে রুদ্র ভেরী।
পথের আবেগে তার শবদেরা স্পর্শ পেয়ে জাগে,
মৃত্যু-হিম বাতাসের আলোড়নে সুপ্তি ভংগ হয়;
শূন্যের সীমানা-তটে জীবন-স্পন্দন এসে লাগে,
যন্ত্রের ডানার ভর আকাশেরে করিয়াছে জয়,
যাত্রা করো শূন্য সীমা ঘেরি,
যন্ত্রের মুখর ভাষা কাঁপায়ে তুলেছে শূন্য
আজ আর ক'রো নাকো দেরি।

ভোরের সোনালী রশ্মিরেখা,
যন্ত্রের পাখায় লাগে বিজিত সম্মান যেন,
ঝলসি দৃষ্টিতে দেয় দেখা।
তোমার স্বপন আজ ছুটি পেয়ে এসেছে বাহিরে,
মাটির ভাবনা নিয়ে আকাশের নীলে অভিসার,
বাতাসে ছড়ানো আশা বাহুতে এসেছে আজ ফিরে,
রক্তিম দিনের খড়্গ রক্তাক্ত করেছে চারি ধার,
যাত্রা করো বাজে যন্ত্রভেরী,
বিজয়ী ডানার নীচে কেঁপে ওঠে নীল শূন্য
আজ আর ক'রো নাকো দেরি।

'হাইব্রিড' বা বর্ণসঙ্করের বংশধারা-রহস্য

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জীবজগতের বংশধারা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিবিধ তথ্য আবিষ্কৃত হইবার ফলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমান যুগে এ বিষয়ে যে-হারে উত্তরোত্তর জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে



লণ্ডন 'জু'তে উৎপন্ন ব্যাঘ্র ও সিংহের মিলনে 'টাইগন' নামক বর্ণসঙ্কর

অদূর ভবিষ্যতে মানুষ যে জীবজন্তু, বৃক্ষলতা প্রভৃতির বংশধারা নিয়ন্ত্রণে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিবে তাহার লক্ষণ সুস্পষ্ট। আমাদের দেশে এ বিষয়ে নামমাত্র কিছু কিছু গবেষণার কাজ আরম্ভ হইয়া থাকিলেও আবিষ্কৃত তথ্যানুসরণে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি মোটামুটি ভাবে অবগত হইলেও অনেকে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য উৎসাহিত হইতে পারেন। এই উদ্দেশ্যেই বংশানুক্রম-সম্পর্কিত গবেষণায় গোড়ার দিকে যে অদ্ভুত রহস্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

জ্ঞানবুদ্ধি যথেষ্ট পরিণতি লাভ করিবার পূর্ব্ব হইতেই মানুষ হয়ত এ কথা বুঝিয়াছে যে, জীবমাত্রেই অনুরূপ জীবের জন্ম দান করিয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম। উদ্ভিদ-জগৎ সম্বন্ধেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে দৈবাৎ কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইলেও তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম নহে, ঘটনা-সংস্থানের পরিবর্ত্তনজনিত ফলমাত্র। মোটের উপর আম-গাছেও তাল ফলে না এবং কুক্কুরীর গর্ভেও বিড়াল-শাবক জন্মে না। উদ্ভিদ বা জীব যেই হউক না, সন্তান তাহার অনুরূপ হইবেই হইবে। সন্তান যে কেবল সাধারণ ভাবেই পিতামাতার অনুরূপ হইয়া থাকে তাহা নহে, চুলের রং, দেহের বর্ণ, চোখের রং এমন কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনেও পিতামাতার সহিত তাঁহার আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সাধারণ ভাবে যেখানে সামঞ্জস্য দেখা যায়, খুঁটিনাটি হিসাব করিয়া একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলেই সেখানেও যথেষ্ট অসামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বিশেষ ভাবে খুঁটিনাটি পর্য্যবেক্ষণ করিবার ফলেই আমরা এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তির পার্থক্য অনুভব করিতে পারি। সাধারণতঃ মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের অভাবেই সমভাবে পরিণত এক জাতী সব মাছ বা এক জাতীয় সব কাক আমাদের চোখে একাকার হইয়া যায়। কাজেই বংশানুক্রম-সম্পর্কিত 'অনুরূপ' কথাটা যে সাধারণ ভাবেই প্রযোজ্য একথা সহজেই অনুমেয়।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সকলেই মনে করিত যে, পিতামাতার বিবিধ বৈশিষ্ট্যসমূহ সমগ্র ভাবে না হউক অন্ততঃ আংশিক ভাবে বংশানুক্রমে সন্তানে পরিচালিত হয় বটে, কিন্তু তাহা কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-অনুসারে ঘটে না; দৈবাৎ কোন কোন বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে মাত্র। কিন্তু ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি এক সময়ে গ্রেগর মেণ্ডেল নামে অষ্ট্রিয়ার একজন মঠধারী পাদ্রী বংশানুক্রম সম্বন্ধে এমন এক বিস্ময়কর রহস্য আবিষ্কার করেন যাহাতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হয় যে, একটা সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারেই জীব-জগতের বংশধারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কথাটা পুরাতন হইলেও, এই তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই বংশানুক্রম-সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান উত্তরোত্তর প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার



বিভিন্ন জাতীয় কুকুরের সংযোগে উৎপন্ন বর্ণসঙ্কর

বিষয়ীভূত হইলেও সাধারণের পক্ষেও ব্যাপারটা মোটেই দুর্ব্বোধ্য নহে। আমাদের দেশে কৃষিকার্য্য, পশুপালন প্রভৃতি বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তির অভাব নাই। বৈজ্ঞানিক না হইলেও এ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী সম্বন্ধে কিয়ৎ-পরিমাণে অবহিত হইলে তাঁহারা নিজের কৌতুহল পরি-তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশের সুখ-সমৃদ্ধি পরিবর্দ্ধনেও যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারিবেন।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদিগকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় শ্রেণী, গণ, জাতি প্রভৃতি বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। একশ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। আমগাছ এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত উদ্ভিদ। কিন্তু রকমারি ও জাতি ভেদে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। গরু, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর জীবজন্তুর প্রত্যেকের মধ্যেও জাতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে পরস্পর হইতে পৃথক্ বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর অভাব নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়মে সমজাতীয় উদ্ভিদ অথবা প্রাণীর মিলনের ফলে সমজাতীয় বংশধরই উৎপাদিত হইয়া থাকে এবং এইরূপ বংশধারায় নূতন কোন বৈশিষ্ট্য বা উন্নতির লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করে না। বংশধারার উন্নতি সাধন করিতে হইলে একই শ্রেণীর বিভিন্ন জাতীয় প্রাণী অথবা উদ্ভিদের পরস্পর মিলন প্রয়োজন। তাহার ফলে বংশানুক্রমে নূতন গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্জ্জিত হইতে পারে। যেমন—এক জাতীয় মুরগীর আকৃতি অতিশয় বৃহৎ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা খুব কমসংখ্যক ডিম পাড়ে এবং তাহাদের স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা খুবই কম। আর এক জাতীয় মুরগী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় হইলেও অধিকসংখ্যক ডিম পাড়িয়া থাকে এবং রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতাও খুব বেশী। এই দুই বিভিন্ন জাতীয় পিতামাতার মিলনোৎপন্ন সন্তানে তাহাদের এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে পরিচালিত হইবে। বৈশিষ্ট্য বলিতে ভাল বা মন্দ উভয়বিধ বৈশিষ্ট্যের কথাই বলিতেছি। কোন অবাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করিলে মেণ্ডেল-আবিষ্কৃত নিয়ম অনুসরণ করিয়া নির্ব্বাচন প্রথায় তাহার বিলোপ সাধিত হইতে পারে। কি উপায়ে ইহা সম্ভব, মেণ্ডেল-আবিষ্কৃত তথ্যের আলোচনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

সাধারণ মটর গাছ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিবার পর গ্রেগর মেণ্ডেল বংশানুক্রম-সম্পর্কিত এমন একটা অপূর্ব্ব মৌলিক নিয়মের সন্ধান পাইলেন যাহা পদার্থ-বিজ্ঞান অথবা রসায়নশাস্ত্রের নিয়মের মতই সুনির্দ্দিষ্ট এবং অভ্রান্ত। মেণ্ডেলের পূর্ব্বে আরও অনেকে বিভিন্ন জাতীয় গাছের মিলনোৎপন্ন বর্ণসঙ্করের গঠনপ্রণালী ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সকলেই বর্ণ-সঙ্করগুলিকে একক ভাবে পরীক্ষা না করিয়া সমষ্টিগত ভাবে তাহাদের মোটামুটি গুণাগুণের হিসাব করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহারা বংশধারা সম্পর্কে কোন সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। মেণ্ডেল সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থায় কাজ আরম্ভ করেন। একসঙ্গে বহু গাছ না লইয়া প্রত্যেক বারে তিনি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুইটিমাত্র গাছের মিলন ঘটাইয়া বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করেন এবং পিতা বা মাতার কোন্ বৈশিষ্ট্য সন্তানে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে তাহাই লক্ষ্য করিতে থাকেন। প্রত্যেক বারের পরীক্ষায় একই রকমের ফল লাভ করিয়া



মহিষ এবং বাইসনের সংযোগে উৎপন্ন 'ক্যাটালোস' নামক বর্ণসঙ্কর



জেব্রা ও গাধার সংযোগে উৎপন্ন বর্ণসঙ্কর

তিনি এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন যে, বিভিন্ন জাতের মিলনের ফলে উদ্ভূত বর্ণসঙ্করের বংশধারার বৈশিষ্ট্য, একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারেই পরিচালিত হইয়া থাকে।

মেণ্ডেলের পরীক্ষার বিষয়ীভূত মটরগাছগুলি কয়েকটি বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। এক জাতীয় গাছ প্রায় ছয় ফুট লম্বা হয়; আর এক জাতীয় গাছ দেড় ফুটের বেশী লম্বা হয় না। এক জাতীয় মটরের বীজ পাকিলে সবুজ বর্ণ ধারণ করে; অপর এক জাতীয় বীজ পরিপক্ব অবস্থায় হলুদবর্ণ প্রাপ্ত হয়। এক জাতীয় মটরের খোসা সম্পূর্ণ মসৃণ; কিন্তু আর এক জাতীয় মটরের খোসা এবড়ো-খেবড়ো ও খসখসে। বিভিন্ন জাতীয় মটরগাছগুলির একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহারা প্রত্যেকেই বংশানুক্রমে তাহাদের পৈত্রিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলে। মেণ্ডেল প্রথমতঃ দীর্ঘাকৃতি গাছের সহিত দীর্ঘাকৃতি এবং খর্ব্বাকৃতি গাছের সহিত খর্ব্বাকৃতি গাছের মিলন ঘটাইয়া দেখিতে পাইলেন—বংশপরম্পরায় দীর্ঘাকৃতি গাছের বংশধর দীর্ঘাকৃতি এবং খর্ব্বাকৃতি গাছের বংশধর খর্ব্বাকৃতিই হইয়া থাকে। তৎপরে তিনি খর্ব্বাকৃতি ও লম্বা গাছের মিলন ঘটাইয়া বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করেন।* এই বর্ণসঙ্কর-গুলির সকলেই হইল লম্বা। এই বর্ণসঙ্কর লম্বা গাছগুলির পরস্পর মিলনের ফলে যে-সকল গাছ উৎপন্ন হইল তাহার চারি ভাগের তিন ভাগ গাছই লম্বা, বাকী এক ভাগ মাত্র খর্ব্বাকৃতি। এই ভাবে প্রাপ্ত খর্ব্বকায় গাছের সহিত খর্ব্বকায় এবং দীর্ঘকায় গাছের সহিত দীর্ঘকায় গাছের মিলনে নূতন গাছ জন্মাইয়া দেখা গেল—খর্ব্বকায় বংশানুক্রমে খর্ব্বকায় হইয়াই জন্মাইতেছে; কিন্তু দীর্ঘকায় হইতে উৎপন্ন গাছের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র দীর্ঘাকৃতি ধারণ করে এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশ প্রথম পুরুষের বর্ণ-সঙ্কর পিতামাতার মতই ব্যবহার করিয়া থাকে। অর্থাৎ তাহাদের প্রতি চারিটি বংশধরের মধ্যে তিনটি লম্বা ও একটি খর্ব্বকায়—এই অনুপাতেই গাছ জন্মাইতে দেখা যায়। অঙ্কিত চিত্র হইতে পরীক্ষার ফল পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে। দীর্ঘাকৃতি বা খর্ব্বাকৃতি ছাড়া অন্যান্য বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত গাছের পরীক্ষাতেও একই প্রকারের ফল লাভ হইয়া থাকে। হলুদ রঙের বীজের গাছের সহিত সবুজ রঙের বীজের গাছের এবং মসৃণ বীজের গাছের সহিত খসখসে বীজোৎপাদনকারী গাছের মিলন ঘটাইয়া তিনি উপরোক্ত নিয়মেই ফললাভ করিয়াছিলেন।

মোটের উপর, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পিতামাতার যোগাযোগে যে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয় তাহাতে পিতা অথবা মাতার বৈশিষ্ট্যই আত্মপ্রকাশ করে। আপাতদৃষ্টিতে অপরের বৈশিষ্ট্যটি লুপ্ত প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা অপ্রকাশিতভাবে অবস্থান করে মাত্র। দুইটি বর্ণ-সঙ্করের যোগাযোগে পরবর্ত্তী পুরুষে যে বংশধর উৎপন্ন হয় তাহাতে সেই অপ্রকাশ্য বৈশিষ্ট্যটি পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। বর্ণসঙ্কর সন্তানে পিতা বা মাতার যে বৈশিষ্ট্যটি আত্মপ্রকাশ করে, মেণ্ডেল তাহাকে বলিয়াছেন—'ডমিন্যাণ্ট' বা প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং যেটি অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে তাহাকে বলিয়াছেন—'রিসেসিভ' বা অপ্রধান বৈশিষ্ট্য। সুতরাং উল্লিখিত মটরগাছগুলির পক্ষে দীর্ঘাকৃতি, হলুদবর্ণ এবং মসৃণত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি 'ডমিন্যাণ্ট' বা প্রধান এবং খর্ব্বকায়ত্ব, সবুজবর্ণ ও অমসৃণত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি অপ্রধান বা 'রিসেসিভ'।

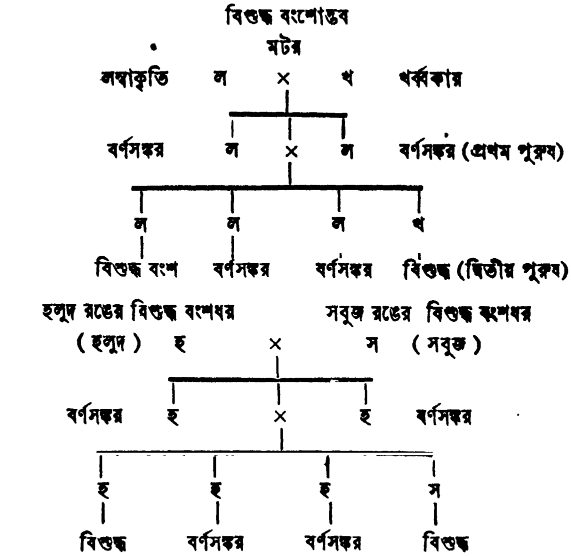
প্রথম পুরুষে অপ্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি অপ্রকাশিত থাকিয়া দ্বিতীয় পুরুষে আবার সেগুলি প্রকাশিত হয় কিরূপে? ইহার কারণ-স্বরূপ মেণ্ডেল বলিয়াছেন যে, বীজকোষ অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাহাকে 'গ্যামিট' বলা হয় তাহা একসঙ্গে উভয়বিধ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে না। বর্ণসঙ্কর-সন্তানে পিতা ও মাতার উভয়বিধ বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান থাকিলেও বীজকোষ বা 'গ্যামিট' গঠিত হইবার সময় তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া যায়। যতগুলি বীজকোষ উৎপন্ন হয় তাহার অর্দ্ধেক পিতৃগুণ এবং বাকী অর্দ্ধেক মাতৃগুণ প্রাপ্ত হয়। মেণ্ডেল এই ব্যাপারকে 'পৃথকীকরণ

* এ স্থলে ফুলের পরাগনিষেক-প্রক্রিয়ার অর্থে 'মিলন' কথাটি এবং এক জাতীয় ফুলে অপর জাতীয় ফুলের পরাগ নিষিক্ত হইবার ফলে উৎপন্ন বংশধরকে 'বর্ণসঙ্কর' অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে।

প্রক্রিয়া' নামে অভিহিত করিয়াছেন। দেহ-কোষে উভয় প্রকারের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান থাকিলেও বীজ-কোষ উৎপন্ন হইবার সময় তাহাদের পৃথক্ হইয়া যাওয়া এবং বীজ কোষ কর্ত্তৃক একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য আহরণ করা—এই দুইটি বিষয়ই মেণ্ডেলের বংশানুক্রম-সম্পর্কিত মতবাদের মূল সূত্র।

মেণ্ডেলের মতবাদ অভ্রান্ত হইলে সহজেই তাঁহার পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গত কারণ বুঝিতে পারা যায়। খর্ব্বাকৃতি ও দীর্ঘাকৃতি মটরগাছের কথাই ধরা যাউক। বিশুদ্ধ খর্ব্বাকৃতি গাছের বীজ-কোষগুলি খর্ব্বাকৃতি উৎপাদনের এবং বিশুদ্ধ দীর্ঘাকৃতি গাছের বীজ-কোষগুলি দীর্ঘাকৃতি উৎপাদনের ক্ষমতা ধারণ করিবে। এখন এই দুই জাতীয় অ-সম গাছের মিলন ঘটাইলে খর্ব্বাকৃতি ও দীর্ঘাকৃতি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বীজ-কোষ দুইটি পরস্পর সম্মিলিত হইবে। অতএব তাহা হইতে উৎপন্ন বর্ণসঙ্করে দুই প্রকার বৈশিষ্ট্য উৎপাদনকারী পদার্থেরই অস্তিত্ব থাকিবে। এই বর্ণসঙ্করের যখন 'গ্যামিট' বা বীজ-কোষ উৎপন্ন হইবে তখন তাহাদের অর্দ্ধেক হইবে দীর্ঘাকৃতি-উৎপাদনকারী এবং বাকী অর্দ্ধেক হইবে খর্ব্বাকৃতি-উৎপাদনকারী। কোন বীজ-কোষেই দুইটি বৈশিষ্ট্য একত্র সন্নিবিষ্ট হইবে না। কাজেই বর্ণসঙ্করের বীজ-কোষগুলি তাহাদের পিতা বা মাতার মতই বিশুদ্ধ হইবে; কেবল এটুকু পার্থক্য যে, প্রত্যেক বর্ণসঙ্করে সমপরিমাণ দুই প্রকারের বীজ-কোষ থাকিবে।

এখন যদি এই বর্ণসঙ্করের পরস্পরের মধ্যে মিলন সংঘটিত হয় তবে স্বভাবতঃই চার প্রকারের বংশধর আবির্ভূত হইবার সম্ভাবনা। কারণ, (১) দীর্ঘাকৃতি-উৎপাদনকারী মাতার বীজ-কোষ (ovum) দীর্ঘাকৃতি পিতার বীজ-কোষের (sperm) সহিত মিলিত হইয়া বিশুদ্ধ দীর্ঘাকৃতি সন্তান উৎপাদন করিতে পারে; (২) দীর্ঘাকৃতি-উৎপাদনকারী মাতার বীজ-কোষ খর্ব্বাকৃতি পিতার বীজ-কোষের সহিত মিলিত হইয়া বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করিতে পারে; (৩) খর্ব্বাকৃতি মাতার বীজ-কোষ দীর্ঘাকৃতি পিতার বীজ-কোষের সহিত মিলিত হইয়া আর একটি বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করিতে পারে এবং (৪) খর্ব্বাকৃতি মাতার বীজ-কোষ খর্ব্বাকৃতি পিতার বীজ-কোষের সহিত মিলিত হইয়া একটি বিশুদ্ধ খর্ব্বাকৃতি সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং দৈবাৎ এরূপ মিলন অসম্ভব না হইলে বর্ণসঙ্করের পরস্পর মিলনের ফলে—একটি বিশুদ্ধ লম্বা, দুইটি বর্ণসঙ্কর (লম্বা) এবং একটি



মেণ্ডেল-নিয়মানুযায়ী বর্ণসঙ্করের বংশবিস্তারের ধারা

বিশুদ্ধ খর্ব্বকায় বংশধর উৎপন্ন হইবে। এখন কথা হইতেছে এই যে, বর্ণসঙ্করের মধ্যে যখন দুই প্রকারের বৈশিষ্ট্যই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে তখন তাহাদের তিন-চতুর্থাংশই লম্বা হইয়া জন্মাইবে কেন? পূর্ব্বে যে প্রধান ও অপ্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছি তাহার কথা বিবেচনা করিলেই ইহার কারণ উপলব্ধি হইবে। বর্ণসঙ্করের মধ্যে দুইটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য এক স্থানে অবস্থান করিলেও বিকশিত হইবার ক্ষমতা উভয়ের সমান নহে। একটি অপরটির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। প্রবল বা প্রধান বৈশিষ্ট্যটিই আত্মপ্রকাশ করে, অপরটি বিলুপ্ত না হইলেও প্রবলের প্রভাবে অদৃশ্য ভাবে অবস্থান করে। সমপরিমাণে সাদা



বন্য ও গৃহপালিত ভেড়ার মিলনে উৎপন্ন বর্ণসঙ্কর



সাদা মোরগ ও কাল মুরগীর মিলনোৎপন্ন নীলবর্ণের বর্ণসঙ্কর

ও কালো রং কিংবা সাদা ও লাল রং মিশ্রিত করিলে যেমন কালো এবং লালেরই প্রাধান্য দেখা যায়, সেরূপ বর্ণসঙ্করের বেলায়ও খর্ব্বাকৃতি ও দীর্ঘাকৃতির মধ্যে দীর্ঘাকৃতিই প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাজেই দীর্ঘাকৃতিই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এইরূপ, হল্‌দে ও সবুজ মটরের মধ্যে হল্‌দেই প্রধান এবং মসৃণ ও খস্‌খসে মটরের মধ্যে মসৃণই প্রধান। পরস্পরের মিলন ঘটাইয়া সন্তান-উৎপাদনের পর তাহাদের বিশুদ্ধতা বা বর্ণসঙ্করত্ব স্থির করিতে পারা যায়।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এরূপ মিলনের পর বীজ বা সন্তানের সংখ্যা যদি কম হয় তবে স্বভাবতঃই এই অনুপাত পাওয়া যাইবে না; তাছাড়া, একটি ফুলের চারিটি ডিম্ব নিষিক্ত হইলে চারিটি যে চার রকমেরই হইবে, এমন কোন কথা নাই। এমনও হইতে পারে যে, তিনটি অথবা চারিটিই খর্ব্বাকৃতি গুণ-উৎপাদনকারী সমজাতীয় খর্ব্বাকৃতি বীজ-কোষের সহিত মিলিত হইয়াছে। কিন্তু যদি চার-পাঁচ শত বীজ উৎপাদিত হয় তবে তাহার মধ্যে ১ : ২ : ১—এই অনুপাত নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।

মেণ্ডেলের পরীক্ষার ফলসমূহ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; কিন্তু সে সময়ে বংশানুক্রম-সম্পর্কিত গবেষণায় বড়-একটা উৎসাহ দেখা যাইত না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃত প্রস্তাবে এ সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। ইহার পর মেণ্ডেল-উদ্ভাবিত প্রণালীতে গাছপালা ও জীবজন্তু লইয়া বিবিধ পরীক্ষা চলিতে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেণ্ডেল-নিয়মের সমর্থনসূচক প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য গাছপালা ও জীবজন্তুর মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা বংশানুক্রমে সন্তানে পরিচালিত হয় না; আবার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সন্তানে অনুপ্রবিষ্ট হইলেও কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলে না। তা ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রধান ও অপ্রধান বৈশিষ্ট্য দুইটি মিলিয়া একটি মিশ্রিত বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু এই সকল ব্যতিক্রমের বিস্তৃত বিবরণ আলোচনা না করিয়াও মোটের উপর বলা যায় যে, পরবর্ত্তী কালের বিশদ পরীক্ষায় এগুলি মেণ্ডেল-নিয়মের ব্যতিক্রম নয় বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। এগুলি ঘটনা-সমাবেশের পরিবর্ত্তন অথবা অদৃশ্য বৈশিষ্ট্যের আত্মপ্রকাশজনিত ফলমাত্র। বীজ-কোষ সম্পর্কিত যে ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া মেণ্ডেল তাঁহার মতবাদ সমর্থন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগে এই সম্পর্কিত অভিনব তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইবার ফলেও তাঁহার সেই ধারণাই সামান্য কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে সমর্থিত হইতেছে। উদ্ভিদ ও জীব-কোষের অভ্যন্তরস্থ ক্রোমোসোম্‌ নামক অদ্ভুত পদার্থ এবং তৎসম্পর্কিত বিবিধ তথ্যের বিষয় আলোচনা করিলেই মেণ্ডেল-উদ্ভাবিত নিয়মের প্রকৃত রহস্য অতি সহজেই উপলব্ধি হইবে। 'ক্রোমোসোম্‌' সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি (প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮); তাহাতেই দেখা যাইবে—'গ্যামিট' বা বীজ-কোষ উৎপন্ন হইবার সময় ক্রোমোসোম্‌গুলি কেমন করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এস্থলে তাহার পুনরুক্তি না করিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রের সহিত



বর্ণসঙ্কর সাদা মোরগ

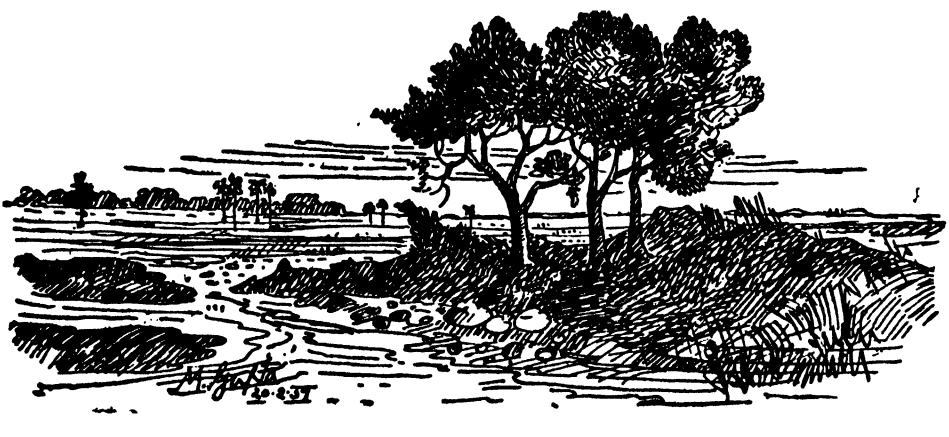
মেণ্ডেল-নিয়মের সম্পর্ক বিষয়ক দুই-একটি কথা আলোচনা করিতেছি। বংশধারা-সম্পর্কিত মেণ্ডেল-নিয়মের ব্যাখ্যা যাহাই হউক না কেন তাহাতে ঘটনার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। উদ্ভিদ ও জীবজগতের বিবর্ত্তন সম্বন্ধে এই অপূর্ব্ব আবিষ্কার প্রচুর আলোক সম্পাত করিয়াছে। অনেকের মতে, অভিব্যক্তির ধারায় বিভিন্ন অভিনব বৈশিষ্ট্য 'মিউট্যাণ্ট' বা 'স্পোর্ট' হইতেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু অ-সম মিলনের ফলে কালক্রমে এই অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। মেণ্ডেল-নিয়ম আলোচনার ফলে দেখা যাইতেছে—এক বংশে কোন বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিলেও দ্বিতীয় বংশে তাহা সম্যক্ বিশুদ্ধভাবেই প্রকাশিত হয় এবং বংশ-পরম্পরায় তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়াই চলে। সুতরাং বিবর্ত্তনের ধারায় এই রীতিও যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই।

উদ্ভিদ ও পশুপালন বিষয়ে মেণ্ডেল-নিয়মানুযায়ী কাজ করিয়া যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। মেণ্ডেল আবিষ্কৃত নিয়ম সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত হইবার পূর্ব্বে উন্নত ধরণের পশুপাখী, গাছপালা প্রভৃতি জন্মাইবার জন্য মানুষ, নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিত। অনিশ্চিত ভাবে নির্ব্বাচনের ফলে দুই-এক ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করিলেও অনেক ক্ষেত্রেই পরিশ্রম ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইত। তা ছাড়া ঈপ্সিত ফল লাভ করিতে সময়ও লাগিত ঢের বেশী। কিন্তু কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের মধ্যে যদি নূতন বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত দুই-চারি বার অ-সম মিলনের পরীক্ষা করিলেই বর্ণসঙ্কর, মেণ্ডেল-নিয়মানুযায়ী ব্যবহার করে কিনা তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়



বন্য ও গৃহপালিত হাঁসের মিলনোৎপন্ন বর্ণসঙ্কর

এবং তাহা হইতে ঈপ্সিত বৈশিষ্ট্য নির্ব্বাচন করিয়া বংশানুক্রমে তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইতে পারে। এ অবস্থায় যে কোন নূতন গুণাবলী সম্মিলিত বা পৃথক্ করা যাইতে পারে। মানুষের কোন কোন বৈশিষ্ট্যও মেণ্ডেল-নিয়মানুযায়ী বংশানুক্রমে পরিচালিত হয়। কোন কোন রোগ বংশানুক্রমে বিস্তৃতিলাভ করে, ইহা সকলেই জানেন। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে—চক্ষু-তারকার নীল রং বাদামী রঙের কাছে 'রিসেসিভ'। মানসিক দৌর্ব্বল্য সুস্থ মানসিক অবস্থার পক্ষে 'রিসেসিভ'। বধিরত্বও সুস্থ-ইন্দ্রিয়সম্পন্নের পক্ষে 'রিসেসিভ' রূপেই অপ্রকাশিত থাকে। অবশ্য ঘটনা-সমাবেশের বৈচিত্র্যের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। মোটের উপর একথা ঠিক যে, মেণ্ডেল-নিয়মানুযায়ী নির্ব্বাচনে মানুষের অনেক অবাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ট্য চিরতরে বিলুপ্ত হইতে পারিত।



বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতার অধিকার কি সকলে পাইবে ?

গত ৫ই ডিসেম্বর কলিকাতার কোন কোন পত্রিকায় আমেরিকান গবর্মেণ্ট কর্তৃক নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হইয়াছে :—

স্বাধীনতার ঘোষণা

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আমেরিকার জনগণ চিরকালের জন্য স্বাধীনভাবে জীবনধারণ করিবার অধিকার লিপিবদ্ধ করিয়াছে। দেড় শতাব্দী পরে আজ আমেরিকার জনগণ তাহাদের রাষ্ট্রপতির মারফৎ সকল মানবের স্বাধীনতার অধিকার পুনরায় ঘোষণা করিতেছে :

বাক্যের স্বাধীনতা	অভাব হইতে মুক্তি
ধর্ম্মের স্বাধীনতা	ভয় হইতে অব্যাহতি

আমেরিকার জনগণ এই সব স্বাধীনতা পৃথিবী হইতে অবলুপ্ত হইতে দিবে না এবং মানুষকে যাহারা শৃঙ্খলিত করিতে চাহে তাহাদের সকল শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিসমূহ বদ্ধপরিকর।

মানুষকে যাহারা শৃঙ্খলিত করিতে চাহিতেছে আমেরিকার জনগণ তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া স্বাধীনতাপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু যে সব দেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাহারা আমেরিকার সহানুভূতির কোনও বাস্তব পরিচয় পাইয়াছে কি ? মানবের স্বাধীনতা বলিতে কি আজও পৃথিবীর ১৮০ কোটি লোকের স্বাধীনতা বুঝাইবে না, বুঝাইবে শুধু ইউরোপ ও আমেরিকার ৬০ কোটি শ্বেতাঙ্গ লোকের অধিকার ? আমেরিকার ঐ ঘোষণাপত্রেই লিখিত আছে যে, ঈশ্বর সকল মানুষকে সমান করিয়া সৃষ্টি করেন ; প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরের নিকট হইতে বাঁচিবার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং সুখ ও শান্তি অন্বেষণের অধিকার প্রাপ্ত হয় ; প্রতিটি লোক যাহাতে এই সব অধিকার ভোগ করিতে পারে তাহারই জন্য মানুষ গবর্মেণ্ট গঠন করে এবং গবর্মেণ্টের শক্তি নির্ভর করে শাসিতদের সম্মতির উপর এবং কোন গবর্মেণ্ট জনগণের এই সব অধিকার রক্ষায় অক্ষম হইলে উহাকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবার অধিকার জনগণের আছে।

যে আমেরিকা মানুষের এই জন্মগত অধিকারে বিশ্বাস করে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া লইতে সে কুণ্ঠিত হয় কেন, ভারতবাসীর নিকট ইহা' এক প্রহেলিকা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা না মানিবার পক্ষে ব্রিটেনের সর্বপ্রধান যুক্তি তাহার মাইনরিটি সমস্যা ; আমেরিকা নিজে এই সমস্যার পূর্ণ সমাধান করিয়াছে। সে জানে স্বাধীনতা আসিলে মাইনরিটি কেন, দেশের সকল সমস্যারই সমাধান হইয়া যায়। প্রাদেশিকতা এবং মাইনরিটি সমস্যা দুয়েরই সমাধান আমেরিকায় হইয়া গিয়াছে, তথাপি আমেরিকা ব্রিটেনের এই নিষ্ফল যুক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতেছে কেন, ভারতবাসীর নিকট ইহা এক গুরুতর প্রশ্ন।

—

সাম্রাজ্য রক্ষা কি ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ?

মিঃ রোনাল্ড ব্র্যাডেল নামক সিঙ্গাপুরের জনৈক ব্যারিষ্টার ওভারসি লীগের মাদ্রাজ শাখার সভায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া এক যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি মালয়ের বহু সামন্ত-রাজ্যের নৃপতিদের পরামর্শদাতা ছিলেন এবং জহোরের সুলতান তাঁহাকে "দাতো" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। সিঙ্গাপুর জাপানের কবলিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে তিনি সেখান হইতে চলিয়া আসেন।

মিঃ ব্র্যাডেল বলিয়াছেন, "লণ্ডনে সমস্ত শক্তি ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিবার পুরাতন ভিক্টোরীয় নীতি আমরা আর বজায় রাখিতে পারিব না। যুদ্ধের পর যদি ইংলণ্ডের ধনী ব্যবসায়ীগণকে তাহাদের নিজেদের স্বার্থে উপনিবেশ-সচিবের মারফৎ উপনিবেশগুলি পরিচালিত করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে মিঃ চার্চ্চিলকে অবশ্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস দেখিতে হইবে। মিঃ চার্চ্চিলের পরে অপর যাঁহারা প্রধান মন্ত্রী হইবেন, এই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলে তাঁহাদের ভাগ্যেও উহাই ঘটিবে।"

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস দেখিতে তিনি রাজার প্রধান মন্ত্রী হন নাই বলিয়া মিঃ চার্চ্চিল যে দম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার মনের অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এইরূপ অস্তিত্ব তিনি বজায় রাখিতে পারিবেন কি না সে সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই মনে সংশয় জাগিয়াছে।

রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন কোটি কোটি মানুষকে কৃত্রিম সমস্যা সৃষ্টি করিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত রাখিয়া সাম্রাজ্য বজায় রাখিবার যে প্রবল চেষ্টা অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া চলিতেছে, তাহা আর খুব বেশী দিন চলিতে পারে না। সম্প্রতি বাংলা গবর্ন্মেণ্ট মেদিনীপুর সম্পর্কে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে ভারতরক্ষা আইনের ন্যায় দমননীতির ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ সত্ত্বেও বাংলা দেশের একটি জেলার দুইটি মহকুমার কয়েকটি গ্রামে ব্রিটিশ শাসন চারি মাসের অধিককাল অচল হইয়া আছে, প্রবল প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে গৃহহারা বুভুক্ষু নরনারী পর্য্যন্ত সেখানে গবর্ন্মেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। ইহা কি কালের প্রগতির সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ নয়? জনসাধারণের হৃদয় যে গবর্ন্মেণ্ট জয় করিতে পারে না, সে গবর্ন্মেণ্ট যে কখনও টিকিতে পারে না,—রাজনীতির এই মূল সূত্রটিকে কি চার্চ্চিল সাহেব নূতন করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে চাহেন এবং এই পরীক্ষায় তিনি সফল হইবেন বলিয়া কি আশা করেন? ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনকে গৃহবিবাদে কলুষিত করিয়া ও অর্থনৈতিক বাঁধনের পর বাঁধনে পঙ্গু করিয়া, এবং দেশের শিশু-শিক্ষা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্য্যন্ত সমগ্র শিক্ষা-পদ্ধতিকে বিজাতীয় খাতে চালিয়াও ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের শক্তিকেন্দ্র কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্পৃহা দমন করিতে পারেন নাই; ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ দৃঢ়তর হয় নাই, উহা শিথিল হইয়াই আসিতেছে।

—

মালগাড়ী কোথায় গেল?

ভারত সরকারের যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সর এডোয়ার্ড বেন্থল এক বেতার বক্তৃতায় খাদ্যাভাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার সার মর্ম এই যে, মালগাড়ীর অভাবকে ইহার জন্য দায়ী করা আজকাল এক ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে খাদ্যাভাবের কারণ অতি লোভী ব্যবসায়ীদের মাল আটকাইয়া রাখিবার প্রবৃত্তি। দেশের বিভিন্ন স্থানে খাদ্যশস্য চালান দেওয়ায় ব্যাঘাত ঘটিবার কারণও নাকি মালগাড়ীর অভাব নহে, এই সব ব্যবসায়ীই তাহার জন্য দায়ী। কিন্তু সরকারী হিসাবেই দেখা যাইতেছে যে গত মার্চ মাসেও দেশে যতগুলি মাল-গাড়ী চালু ছিল, এপ্রিল হইতে তাহার সংখ্যা অকস্মাৎ ছয়ষট্টি হাজার কমিয়া গিয়াছে এবং তৎপর জুন পর্যন্ত প্রতি মাসে আরও কুড়ি হাজার করিয়া কমিতেছে। এগুলি তবে গেল কোথায়? এপ্রিল হইতে জুন মাসের মধ্যে যে এক লক্ষ ছয় হাজার মালগাড়ীতে মাল বোঝাই হইল না সেগুলি কি ব্যবসায়ীরা আটকাইয়া রাখিয়াছে? গত বৎসর এপ্রিল হইতে পরবর্ত্তী মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরে দেখা যায় গড়ে প্রায় ছয় লক্ষ মাল গাড়ী প্রতি মাসে চালু রহিয়াছে; অকস্মাৎ তিন মাসের মধ্যে উহার সংখ্যা লক্ষাধিক কমিয়া গেল? কয়লার বেলায় দেখা যায় গত বৎসর এপ্রিল হইতে বিগত মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় এক লক্ষ মালগাড়ীতে কয়লা বোঝাই হইয়াছে; গত এপ্রিল মাসে উহার সংখ্যা কমিয়া গিয়া হইয়াছে উননব্বই হাজার, এবং তার পরের মাসে আশি হাজার। গত ৯ই ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ শহরে কয়লার দর ছিল মণ প্রতি ৩৲ টাকা, পাটনায় ৬৵০ আনা এবং কলিকাতায় ২৲ টাকা। কয়লার ব্যবসায়টা প্রায় শ্বেতাঙ্গ বণিকদেরই একচেটিয়া। তবে কি বেন্থল সাহেব বলিতে চাহেন যে তাঁহারই স্বজাতীয় ব্যবসায়িগণ হাজার কুড়ি মালগাড়ী এবং কয়লা আটকাইয়া রাখিয়া যথেচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করিয়া অতি লাভ করিতেছেন? যে লক্ষাধিক মাল-গাড়ীর হিসাব সরকার দেখাইতেছেন না সেগুলি কোথায় আছে এবং কোন্ কোন্ ব্যবসায়ী তাহা আটকাইয়া রাখিয়াছে তাহার একটা সন্ধান লইয়া ফলাফল বেন্থল সাহেব আর একটা বেতার বক্তৃতায় প্রচার করিবেন কি?

—

মেদিনীপুরে আর্ত্ত-ত্রাণ সম্বন্ধে বাংলা সরকারের ইস্তাহার

মেদিনীপুরে আর্ত্ত-ত্রাণ কার্য্য সম্পর্কে বাংলা সরকারের ও তাঁহাদের স্থানীয় কর্মচারীদের যে সমালোচনা হইতেছিল তাহার জবাবে এক দীর্ঘ ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ সমালোচনাই অসম্পূর্ণ সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া করা হইয়াছে, সরকারের ইহা প্রথম অভিযোগ। এই অভিযোগ সত্য নহে। সরকার-প্রদত্ত সংবাদ এবং বাংলার লাট ও মন্ত্রীদের বক্তৃতার উপর নির্ভর করিয়াই এই সব সমালোচনা হইয়াছে। প্রধান অভিযোগ ছিল বিলম্বে সাহায্যদান এবং প্রদত্ত সাহায্যের অস্বাভাবিক স্বল্পতা। ইস্তাহারে এই দুইটির একটি অভিযোগও খণ্ডন করিবার চেষ্টা হয় নাই বরং ইহাতে এমন কোন কোন কথা আছে যাহা রাজস্বসচিব-প্রদত্ত বিবরণের বিরোধী। যথা, ইস্তাহারে বলা হইয়াছে কাঁথি ও তমলুক মহকুমার কর্মচারিগণ ১৭ তারিখ হইতেই সাহায্য দানের ব্যবস্থা

আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজস্বসচিব কিন্তু বলিয়াছেন যে প্রথম চার-পাঁচ দিন পথঘাট মেরামতেই অতিবাহিত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে সাহায্য দানের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভবপরই ছিল না। কোন্ কথা সত্য ? ঘটনার প্রায় চারি সপ্তাহ পরে গবর্ণর মেদিনীপুর গিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে অবস্থা এত গুরুতর ইহা তিনি জানিতেন না, জানিবামাত্র তিনি দার্জিলিং হইতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন। যে দুর্যোগে ত্রিশ সহস্রাধিক লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং পনর লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে তাহার বিস্তারিত সংবাদ স্থানীয় কর্মচারিগণ লাট-সাহেবকে পর্যন্ত যদি পৌঁছাইয়া দিতে অক্ষম হয় অথবা তাঁহাকে ইহা জানাইবার প্রয়োজনীয়তা যদি না বুঝিয়া থাকে, তাহা হইলে উঁহাদিগকে জনসাধারণ অকর্মণ্য ও অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারে কি না ? রাজস্ব-সচিব নিজেই বলিয়াছেন, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মাথা ঠিক ছিল না। অভূতপূর্ব একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে মাথা ঠিক রাখিয়া কাজ করিতে পারে এবং মাত্র শত মাইল দূরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী হইতে নদীপথে দ্রুতগতিতে সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য আনিয়া আর্ত্ত-ত্রাণ কার্য আরম্ভ করিয়া দিতে পারে এরূপ দৃঢ়চিত্ত ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বসম্পন্ন সিভিলিয়ান কি বাংলা দেশে এক-জনও ছিল না ? যে ব্যক্তি শহরে কুড়ি জন লোকের মৃত্যু দেখিয়া মাথা ঠিক রাখিতে পারে নাই, তাহার উপর পনর লক্ষ আর্ত্তের সেবার ভার অর্পণ করা কি সঙ্গত হইয়াছে ?

—

মেদিনীপুরে রাজনৈতিক স্থিতি

ইস্তাহারে গবর্মেণ্ট মেদিনীপুরের কোন কোন স্থানের রাজনৈতিক অবস্থার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় সেখানে সরকারী শাসন-ব্যবস্থা অচল হইয়াছে এবং এখনও গবর্মেণ্ট সেখানে সরকারের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। দুইটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থার উক্ত চিত্র প্রকাশের দ্বারা শত্রুকে সাহায্য করা না হইয়া থাকিলে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তথাকার জনসাধারণের কি বক্তব্য আছে তাহা প্রকাশ করিবার অনুমতি দিতে বাধা কি ? মেদিনীপুরের বর্ত্তমান কর্মচারীদের কার্যের সমালোচনা প্রত্যেক সংবাদ-পত্রে হইয়াছে এবং ভূতপূর্ব অর্থসচিব নিজেও তীব্র ভাষায় উঁহাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। ভারতরক্ষা আইনের বলে জনসাধারণের বক্তব্য চাপিয়া রাখিয়া সরকার স্বয়ং কর্মচারীদের দোষক্ষালনে অগ্রণী হইলে তাহাতে আস্থা স্থাপন কেহ করিবে কি না সন্দেহ। প্রকাশ্য ও নিরপেক্ষ কমীটির দ্বারা তদন্ত না করিলে অথবা অবিলম্বে জনসাধারণের অভিযোগ প্রকাশের অনুমতি না দিলে সরকারী ইস্তাহার প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। কাঁথি ও তমলুকে অরাজকতা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে এই সংবাদ প্রচারে আপত্তি যখন নাই, তখন সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কাহারও অভিযোগ আছে কি না সংবাদপত্র মারফৎ তাহা প্রকাশের অনুমতি দানে সামরিক কারণে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।

—

মেদিনীপুর ও সরকারী সাহায্য দান

মেদিনীপুরের সরকারী কর্মচারীবৃন্দ অভূতপূর্ব সমস্যায় পড়িয়া এবং নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে ভাল কাজ করিতে পারিতেছে না বলিয়া ইস্তাহারে তাঁহাদের সাফাই গাহিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা কেন কাজ করিতে পারেন নাই ইহা ফলাও করিয়া বর্ণনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে কি কি কাজ ইতিমধ্যে তাঁহারা করিয়াছেন তাহার বিবরণ ইস্তাহারে দেওয়া হয় নাই কেন ? নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ইস্তাহার নীরব কেন ?—

(ক) বহু ঘোষিত ৮৯৫২ মণ চাউলের পর আর কত চাউল গবর্মেণ্ট কবে কবে পাঠাইয়াছেন ?

(খ) ঘর তৈরির জন্য যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল তাহার কতটা এ যাবৎ বিতরণ করা হইয়াছে ?

(গ) যে প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে তাহার কবল হইতে গৃহহীন ও বস্ত্রহীন আবালবৃদ্ধবনিতাকে বাঁচাইবার কি কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে ?

(ঘ) দূরবর্ত্তী গ্রামাঞ্চলে সাহায্য প্রেরণের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক বাস, লরী এবং নৌকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে কি না ? ঐ অঞ্চলে ঝড়ের পূর্বে বাস, লরী ও চালু নৌকার সংখ্যা কত ছিল এবং একমাস পূর্বে ও এখন কতগুলি সেখানে চালাইতে দেওয়া হইয়াছে ? সরকারের নৌকা আটকাইয়া রাখিবার নীতি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে শিথিল করা হইবে বলিয়া রাজস্বসচিব যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ঐ সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হইলে তাহা কার্যে পরিণত হইয়াছে কি না বুঝা যাইবে।

(ঙ) মৃতদেহ সমাহিত করিবার জন্য সৈন্যদল সাহায্য করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা স্থানীয় যুবক ও ছাত্রবৃন্দ উহা করিয়াছে কি না অথবা করিতে চাহিয়া অনুমতি না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে কি না সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ

নাই। মৃতদেহ সমাহিত করিবার জন্য মৃতের আত্মীয়-স্বজন এবং স্থানীয় লোকেরা একেবারেই কিছু করে নাই, বা করিতে আসে নাই—ইহাই কি সরকারের বক্তব্য?

(চ) গবর্ন্মেণ্ট এ যাবৎ অর্থাৎ প্রায় দুই মাসের মধ্যে, পনর লক্ষ গৃহহীন ব্যক্তির জন্য কত চাউল, কতগুলি বস্ত্র, কতগুলি শীতবস্ত্র, শিশুদের জন্য কি পরিমাণ দুগ্ধ, রুগ্নদের জন্য কি পরিমাণ সাগু ও বার্লি দিয়াছেন ইস্তাহারে তাহার উল্লেখ নাই কেন?

(ছ) জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মাথা যখন ঠিক হইল তখন ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে মৃতপ্রায় লোকদের বাহির করিবার চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কতগুলি লোককে তিনি এ ভাবে উদ্ধার করিয়াছেন তাহা বলা হয় নাই কেন?

(জ) গৃহহারা ব্যক্তিদের আয়ের কি উপায় সরকার করিয়াছেন? জমিগুলিকে লবণ-মুক্ত করিয়া আগামী বৎসর চাষের উপযুক্ত করিবার অথবা কৃষকগণকে নূতন জমি দিবার কোন ব্যবস্থা এখনও হইয়াছে কি না?

সরকারের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের গৃহ হইতে ধান চাউল লুঠের কথা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে। সরকারের নৌকা হইতে চাউল লুঠের কথাও আছে। ইহা কি সরকারের সাহায্যদানকার্য্যে বাধাদান অথবা সরকারের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জব্দ করিবার চেষ্টা, না হতাশাপীড়িত চাউল সংগ্রহে অসমর্থ বুভুক্ষু ব্যক্তিদের প্রাণ রক্ষার শেষ চেষ্টার পরিচয়? ১৫ লক্ষ লোকের জন্য এ যাবৎ কত চাউল বিতরিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ ইস্তাহারে থাকিলে উহা পরিষ্কার করিয়া বুঝা যাইত।

—

সরকারী কার্য্যের সমালোচনার কারণ আছে কি না

গবর্ন্মেণ্টের আর্ত্তত্রাণকার্য্যের সমালোচনা রাজনৈতিক কারণে করা হইতেছে, ইস্তাহারে সুস্পষ্ট ভাষায় এরূপ ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ঘটনার দেড় মাস পরে নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের সামরিক সংবাদদাতা মাদাম সোনিয়া তোমারা আর্ত্তত্রাণের যে বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন তাহার কোন জবাব ইস্তাহারে দেওয়া হয় নাই। মাদাম সোনিয়া বলিয়াছেন, "সাহায্য দেওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু উহা অত্যন্ত ধীরে ও অত্যন্ত বিলম্বে পৌঁছিতেছে। বিলম্বে সাহায্য দেওয়া এবং উহা একেবারেই না দেওয়া প্রায় একই কথা। এখনও লোকের দেহে কিছু জীবনীশক্তি অবশিষ্ট আছে, অবিলম্বে তাহাদিগকে সাহায্য দেওয়া দরকার। কোন কোন স্থানে স্ত্রীলোকদের পরিধানে বস্ত্র নাই বলিয়া তাহারা সাহায্য লইবার জন্য বাহিরে আসিতে পারে না। একটি গ্রামে ১৪ দিন ধরিয়া চাউল বিতরণ করা হইয়াছিল, কিন্তু দুইটি গ্রামের লোকের পাঁচ দিন যাবৎ কিছুই জোটে নাই ইহাও আমি দেখিয়াছি।" মাদাম সোনিয়া নিশ্চয়ই কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি লইয়া উপরোক্ত উক্তি করেন নাই।

সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইবার পর শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী এবং কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ প্রমুখ মেদিনীপুরের বিভিন্ন নির্ব্বাচন কেন্দ্রের চারি জন প্রতিনিধি এক যুক্ত-বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে জনসাধারণের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ চাপা দিবার যে চেষ্টা হইয়াছে তাহার নিন্দা করিয়া তাঁহারা তদন্ত দাবী করিয়াছেন। গবর্ন্মেণ্ট যদি সত্যই বিশ্বাস করেন যে তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ টিকিবে না, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে প্রকাশ্য ও নিরপেক্ষ তদন্তের সম্মুখীন হইতে কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। অভিযোগ না থাকা এক কথা, কিন্তু ভারতরক্ষা আইনের বলে সকল অভিযোগ চাপা দিয়া রাখিয়া অভিযোগ নাই বলিয়া প্রচার করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। দেশবাসীর মন হইতে এই সংশয় দূর করিবার জন্য গবর্ন্মেণ্টেরই অগ্রণী হওয়া কর্ত্তব্য।

সরকারী ইস্তাহারে স্বীকৃত হইয়াছে যে আগষ্ট মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ঘূর্ণীবাত্যায় আন্দোলনকারী মহকুমা দুইটি বিধ্বস্ত হইবার প্রায় দুই মাস পর পর্য্যন্তও তথাকার আন্দোলন থামে নাই। ইহাও কি তথাকার সরকারী কর্ম্মচারীদের কৃতিত্বের পরিচয়? উঁহারা সেখানে এই প্রবল আন্দোলনের মধ্যে নির্ব্বিকার বসিয়া থাকেন নাই ইহা নিশ্চিত, সুতরাং তাঁহারা কি ভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন, জনসাধারণ দমননীতির ফলে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে কি না, তাহাও কি অনুসন্ধানের বিষয় নহে? ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব প্রকাশ্যে বলিয়াছেন যে মেদিনীপুরে নারীদের উপর পর্য্যন্ত অত্যাচার হইয়াছে এবং তাহার কোন প্রতিকার তিনি করিতে পারেন নাই। পৃথিবীর যে কোন দেশের সভ্য বলিয়া পরিচিত গবর্ন্মেণ্ট এই ধরণের অভিযোগে নীরব থাকিতে পারে না। অথচ বাংলা সরকার তাঁহাদের দীর্ঘ ইস্তাহারে উহার কোন জবাব দেন

নাই। মেদিনীপুরের সরকারী কর্মচারিগণ যদি নারীর উপর অত্যাচার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেও সমর্থন করিয়া থাকেন, ঐ সংবাদ পাইয়াও যদি দুষ্কর্মকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে আরও ভয়ানক অত্যাচার করেন নাই, লোকে ইহা বিশ্বাস করিবে কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তর গবর্মেণ্ট এড়াইয়া যাইতেছেন কেন?

—

মেদিনীপুরে দমননীতি সম্পর্কে ভূতপূর্ব অর্থসচিবের বিবৃতি

ইস্তাহারে গবর্মেণ্ট এমন ভাব দেখাইয়াছেন যেন সৈন্যদল ও সরকারী কর্ম্মচারী ভিন্ন তাঁহারা জনসাধারণের তরফ হইতে কোন সাহায্যই পান নাই। ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব গত ৩০শে নবেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের এক সভায় বলিয়াছেন যে তিনি মেদিনীপুরের কারারুদ্ধ নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। নেতারা স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে সমস্ত রাজনৈতিক মতবিরোধ ভুলিয়া জনসাধারণের এই মহাবিপদে তাঁহারা গবর্মেণ্টের সহিত একযোগে আর্ত্তত্রাণে আত্মনিয়োগ করিতে প্রস্তুত। গবর্মেণ্ট ইঁহাদের মুক্তির আদেশ দিয়া আর্ত্তত্রাণকার্য্যে সহায়তা করা দূরে থাকুক, যে সকল কংগ্রেস-কর্মী কায়মনোবাক্যে সেবাকার্য্য করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও ধরপাকড় করিয়াছেন। রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের নামে মেদিনীপুরে যে অত্যাচার হইয়াছে, ভূতপূর্ব অর্থসচিব পদত্যাগের পর যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহা হইতেও উহার আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন, "সেখানে অসাধারণ কঠোরতার সহিত দমন-নীতি চালানো হইয়াছে। জনসাধারণের জীবন, সম্পত্তি ও সম্মান, এমন কি নারীর সম্মান হানি করিবার অভিযোগও আমরা পাইয়াছি। কিন্তু উহার সম্বন্ধে তদন্তের আদেশ দিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত আমাদের নাই।" ২০শে নবেম্বর প্রদত্ত বিবৃতিতে তাঁহার এই অভিযোগ ৩০শে নবেম্বরের সভায় তিনি পুনরায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইস্তাহারে গবর্মেণ্ট জনসাধারণের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া তাঁহাদের কর্ম্মচারীবৃন্দকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণকে তাহাদের অভিযোগ জানাইবার সুযোগ দেন নাই। প্রকাশ্য তদন্তের বন্দোবস্ত করিয়া সত্য আবিষ্কার করিয়া নিজেরা তাহা জানিবার এবং জনসাধারণকে জানাইবার চেষ্টাও করেন নাই।

—

বে-সরকারী আর্ত্তত্রাণ-সমিতিসমূহের উপরে সরকারী নিয়ন্ত্রণ চেষ্টা

বাংলার গবর্ণর বে-সরকারী আর্ত্তত্রাণ-প্রতিষ্ঠান-সমূহের সমুদয় তহবিল একত্র করিয়া উহা গবর্মেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কেন্দ্রীয় রিলিফ কমীটির সম্মুখে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে এবং মেদিনীপুর সম্বন্ধে সরকারী ইস্তাহারেও তাঁহার এই অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। গবর্ণরের দুঃখ এই যে জনসাধারণ বিশ্বাস করিয়া তাঁহার গবর্মেণ্টের হাতে সমস্ত টাকা তুলিয়া দিতেছে না। তিনি সম্ভবতঃ ভুলিয়া গিয়াছেন যে বিশ্বাস কখনো এক তরফা হইতে পারে না। জনসাধারণ তাঁহার স্থানীয় কর্ম্মচারীবৃন্দকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। উহাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠিয়াছে। গবর্ণর তাহার কোন প্রকাশ্য তদন্তের ব্যবস্থা করেন নাই। বরং বার বার তাঁহার গবর্মেণ্ট স্থানীয় কর্মচারিগণকে সমর্থন করিয়াছেন এবং জনসাধারণের দাবী সত্ত্বেও তাহাদের একজনকেও বদলী পর্য্যন্ত করা হয় নাই। যে গবর্ণর জনসাধারণের তরফের একটি কথাও বিশ্বাস করেন নাই, তাহাদের অন্যতম প্রতিনিধি ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব-প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার যোগ্য মনে করেন নাই এবং জনসাধারণকে তাহাদের অভিযোগসমূহ জানাইবার সুযোগ দেওয়াও প্রয়োজন বোধ না করিয়া সরাসরিভাবে এক তরফা বিচারে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের বাক্যকেই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে জনসাধারণের বিশ্বাস প্রত্যাশা করা একটু অযৌক্তিক বলিয়াই বোধ হয়।

—

সরকারী সাহায্য-দানে খরচার হিসাব

সাহায্যদান ব্যাপারে সরকারী কর্ম্মচারীদের অর্থব্যয়ের পদ্ধতিও সমালোচনার অতীত নহে। ইহাদের দ্বারা যে টাকা ব্যয় হয় তাহাতে অপচয়ের এবং অনাবশ্যক ব্যয়ের কিছু বাহুল্য থাকে ইহাই জনসাধারণের ধারণা। এগারটি প্রদেশে সরকার কর্তৃক দুর্ভিক্ষে সাহায্য দানের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। মান্দ্রাজের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা দুর্ভিক্ষে অর্থ সাহায্য করিয়া তাহার যে হিসাব দিয়াছিলেন এবং বাংলা সরকার ঐ বৎসরেই ঐ বাবদে ব্যয়ের যে হিসাব দিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	মাদ্রাজ	বাংলা
	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৮-৩৯
কর্মচারীদের বেতন	১,৯৩,৮৭১ টাকা	১০০ টাকা
সাহায্য দান		
পথঘাট নির্ম্মাণ	১৭,০৮,১৮৩ "	...
পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ	৪,৯১০ "	...
অন্যান্য কাজ	২,২০৬ "	...
এককালীন সাহায্য	৮৭,৫৩৯ "	৩,৭৭,৮৮৮ "
বিবিধ	১,১৯,৪৫৭ "	৪,৩৫,২০৮ "
	২১,১৬,১৬৬৲	৮,১৩,১৯৬৲

ইহার পর-বৎসর, অর্থাৎ ১৯৩৯-৪০ সালে বাংলা সরকারের বিবিধ ব্যয় আরও দরাজ হাতে হইয়াছে। মোট ব্যয় হইয়াছে ৭,৮২,৬৭১ টাকা, তন্মধ্যে এককালীন সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ১,০৫,৫৫৮ টাকা এবং বিবিধ ব্যয় হইয়াছে ৬,৭৭,১১৩ টাকা।

উপরোক্ত নমুনায় হিসাব দেখানো হইতে ইহাই বুঝা যায় যে বিবিধ ব্যয়ের মাত্রাটা কাজের খরচের দ্বিগুণ ত হইয়াছেই, শেষোক্ত বৎসরে উহা হইয়াছে ছয় গুণ! দুর্ভিক্ষে কাজ করাইয়া সাহায্য দান এবং এককালীন সাহায্য দান এই দুই দফা উল্লেখের পর আলাদা বিবিধ ব্যয় ধরিলে ইহাই বুঝা যায় যে বিবিধ ব্যয়ের মধ্যে সাহায্য দানের হিসাব ধরা হয় নাই। অপর সমস্ত প্রদেশ যখন সাহায্যের পরিমাণ দফায় দফায় দেখাইতে পারেন তখন বাংলা-সরকারেরও দফাওয়ারীভাবে পরিষ্কার হিসাব দেখাইতে অসুবিধা হইবার কথা নহে। বাংলার গবর্ণর এ কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া না দিলে বে-সরকারী সমিতিগুলি তাহাদের সমস্ত টাকা এই শ্রেণীর কর্মচারীদের হাতে তুলিয়া দিতে রাজি হইবে এতটা আশা করিতে পারেন কি? ১০ই ডিসেম্বরের পত্রিকায় তমলুকের মহকুমা হাকিম বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে রিলিফ আপিসের জন্য মাসিক ৩০ টাকা বেতনে ৭৫ জন কেরাণী আবশ্যক। ইহা হইতে বুঝা যায় সাহায্য বিতরণের হিসাব রাখিবার জন্য খাঁটি আমলাতান্ত্রিক কায়দায় দপ্তর খুলিবার বিরাট ব্যবস্থা হইয়াছে, মাসিক ২২৫০ টাকা কেরাণীদের জন্য মঞ্জুর হইয়াছে, ইহার উপর "ভূতপূর্ব মিলিটারী এবং সেটেলমেণ্ট কার্য্যে অভিজ্ঞ" দ্বারবানের ব্যবস্থাও হইয়াছে। তার পর ফাইল, লালফিতা, টেবিল, চেয়ার, ঘরভাড়া প্রভৃতিও ধীরে ধীরে আসিবে এবং গবর্ন্মেণ্ট দেশের মোট উৎপন্ন কাগজের যে শতকরা ৯০ ভাগ হুকুমজারী করিয়া কাড়িয়া লইতেছেন তাহার একটা বড় অংশের যথারীতি শ্রাদ্ধেরও ব্যবস্থা হইবে। তমলুক অপেক্ষা কাঁথির ক্ষতি হইয়াছে বেশী, সুতরাং সেখানকার আপিসের জন্য আরও বেশী টাকা খরচ হইবে ইহা আশঙ্কা করা কি অন্যায় হইবে? মারোয়াড়ী রিলিফ সমিতি, নববিধান মিশন এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি প্রদত্ত সাহায্যের হিসাব রাখিবার জন্য কত টাকা ব্যয় করিতেছেন এবং উহা মোট প্রদত্ত সাহায্যের শতকরা কয় ভাগ, বাংলা-সরকার তাহা একটু জানিয়া লইয়া তাঁহাদের প্রিয় এবং তাঁহাদের মতে অসাধারণ দক্ষ কর্মচারীদের ব্যয়ের মাত্রা একবার মিলাইয়া লইবেন কি? দেশবাসীকে এই হিসাবগুলি বুঝাইয়া দিয়া তার পর তাহাদের তোলা চাঁদার টাকাগুলি সরকারী আয়ত্তাধীনে আনিবার চেষ্টা করাই অধিকতর সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না কি?

—

বাংলা দেশের অন্নবস্ত্র সমস্যা

বাংলা দেশের অন্নবস্ত্র সমস্যা ক্রমেই তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। দরিদ্র জনসাধারণকে ডাল-ভাত দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া যিনি প্রধান মন্ত্রীর মসনদ অধিকার করিয়াছিলেন, বেগতিক দেখিয়া তিনি চুপ করিয়া গিয়াছেন। বাংলা দেশের প্রথম অর্থসচিব বর্তমানে ভারত-সরকারের বাণিজ্য-সচিবের মসনদে সমাসীন হইয়া খাদ্য-সমস্যার সমাধানের আশা দেশবাসীকে দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ছয় মাস পূর্বে তিনি ঐ বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে খাদ্য-সমস্যার কোন সমাধানই দেখা যায় নাই; অধিকন্তু ভারত-সরকারের নবগঠিত খাদ্য-দপ্তর মারফৎ সরকারী প্রয়োজনে ফসল সংগ্রহের জন্য যে নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে তিনি তাহার ভার গ্রহণ করায় সমস্যা আরও জটিল হইয়াছে।

প্রথমে চাউলের অবস্থা কি দেখা যাউক। ১৯৪০-এর ডিসেম্বরে, অর্থাৎ ঠিক দুই বৎসর পূর্বে, বালাম চাউলের পাইকারী দর ছিল মণ প্রতি ৫৶০; ১৯৩৯-এর আগষ্টে ঐ চাউলের দর ছিল ৩৷০। ১৯৪০-৪১-এ দেশে চাউল উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা শতকরা ১৫ ভাগ কম হইয়াছিল; এত কম চাউল ইহার পূর্বে বহু বৎসর উৎপন্ন হয় নাই, তৎসত্ত্বেও চাউলের দর ৫৲ টাকার উর্দ্ধে যায় নাই। ১৯৪১-৪২ সালে ব্রহ্মদেশের চাউল আমদানী বন্ধ হইয়াছে, সিংহল এবং মধ্য-এশিয়ায় বহু চাউল রপ্তানী হইয়াছে। ফলে ইহার পর চাউলের দর বাড়িয়া ৯।১০৲

টাকা মণ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বর্তমান বৎসরে ফসলের যে অবস্থা দেখা যাইতেছে এবং সরকারী প্রয়োজনে যে হারে অবাধে চাউল ক্রয় ও উহা ভারতের বাহিরে প্রেরণ চলিতেছে তাহাতে আগামী বর্ষে দেশে ব্যাপক ভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবার আশঙ্কা ঘটিয়াছে। সরকারী বিবরণে প্রকাশ, গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ কম হইবে। এই হিসাব প্রকাশিত হইবার পর প্রবল ঝড়ে ও বন্যায় মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি বহু স্থানের ফসল নষ্ট হইয়াছে। ফলে এবার গত বৎসরের তুলনায় দশ আনার বেশী ধান আশা করা অন্যায়।

—

বাংলায় চাউলের মূল্যবৃদ্ধির কারণ

মাসখানেক যাবৎ চাউলের দর অত্যন্ত দ্রুত বাড়িতেছে এবং বর্তমানে মোটা চাউল পর্য্যন্ত ১৫৲ টাকার কম পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সামরিক প্রয়োজনে দেশে নূতন নূতন লোক আসিবার ফলে চাউলের চাহিদা চারি আনা পরিমাণ বাড়িয়াছে, এবং প্রাপ্য চাউলের পরিমাণ প্রায় আট আনা কমিয়াছে। গত কয়েক মাসে ভারত-সরকার প্রচুর পরিমাণে চাউল ক্রয় করায় বাজারে চাউলের অভাব ঘটিয়াছে, তদুপরি সিংহলে ও মধ্য-এশিয়ায় অত্যধিক পরিমাণে চাউল রপ্তানী চলিতেছে। ইতিমধ্যে এক সিংহলেই প্রায় দেড় লক্ষ মণ চাউল রপ্তানী হইয়া গিয়াছে এবং কোচিনে আরও প্রায় লাখ-দেড়েক মণ পাঠাইবার আয়োজন চলিতেছে। চাউলের মূল্য বৃদ্ধির দায়িত্ব কৃষক এবং ছোট ব্যবসায়ীদের ঘাড়ে চাপাইয়া গবর্ন্মেণ্ট বলিতেছেন যে তাহারা চাউল আটকাইয়া রাখিবার ফলেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে। ভারত-সরকারের বাণিজ্য-সচিবও বলিতেছেন যে মজুত চাউল টানিয়া বাহির করিবার আয়োজন হইতেছে এবং উহা এত নিগূঢ় ভাবে হইবে যে প্রকাশ্যে উহা লইয়া আলোচনা করা চলে না। মূল্যবৃদ্ধির প্রকৃত কারণ ইহা নহে। উহার কারণ দেশে এ বৎসরের জন্য ফসল উৎপন্ন হইয়াছে কম, ভাত খাওয়ার লোক বাড়িয়াছে, আমদানী বন্ধ এবং ইহার উপর সরকার মধ্য-এশিয়ায় এবং সিংহলে পাঠাইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাউল এই স্বল্প পরিমাণে উৎপন্ন ফসল হইতেই ক্রয় করিয়া লইতেছেন।

—

সিংহলে চাউল রপ্তানী

সিংহলের চাউলের চাহিদা অকস্মাৎ অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৯-৪০-এ সিংহলে ভারতবর্ষ হইতে ৯১ হাজার টন এবং ১৯৪০-৪১-এ ১১৭ হাজার টন অর্থাৎ পূর্ব-বৎসর অপেক্ষা শতকরা ২৯ ভাগ অধিক চাউল রপ্তানী হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের চাউল আমদানী যখন বন্ধ হয় নাই তখনই এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। অথচ সিংহলের লোকসংখ্যা ৫৩ লক্ষ, তন্মধ্যে ৮ লক্ষ মাদ্রাজী। এই ভারতীয়দের জন্য জনপ্রতি আধ সের হিসাবে দৈনিক ১০ হাজার মণ, অর্থাৎ বার্ষিক ৩৬ লক্ষ মণ চাউল প্রয়োজন। সিংহলে সাড়ে আট লক্ষ একর জমিতে ধান হয়, অর্থাৎ একর-প্রতি ৯ মণ হিসাবে প্রায় ৭৫ লক্ষ মণ চাউল উৎপন্ন হইতে পারে। সিংহলে চাউলের অভাবের যে ধূয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ এই হইতে পারে যে ধানের জমিতে সেখানে চা, কোকো, রবার প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য ফলানো হইতেছে এবং চাউলের অভাবটা ভারতবর্ষের উপর দিয়া মিটাইয়া লইবার চেষ্টা চলিতেছে। চা, কোকো, রবার প্রভৃতি দ্রব্য উৎপাদনে বিলাতী বণিকদের স্বার্থ আছে এবং ঐ স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্যই নিজের দেশের লোককে অনাহারে রাখিয়াও ভারত-সরকার সিংহলবাসীদের খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেন কি না, বাণিজ্য-সচিবকে প্রশ্ন করিয়া কোন বণিক-সমিতি এই ব্যাপারটা জানিয়া লইতে পারেন না কি?

—

সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ

আমাদের এই আশঙ্কার কারণ আছে। প্রথমতঃ, সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ চেষ্টা জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার দিক দিয়া একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে অথচ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেতাত্মা ইউনাইটেড কিংডম কমার্সিয়াল কর্পোরেশন যথারীতি নিয়ন্ত্রিত মূল্যেই মাল ক্রয় করিতেছে। সুতরাং কাহাদের স্বার্থে পণ্য-মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ পরিচালিত হইতেছে তাহা কতকটা বুঝা যায়। ভারত-সরকার একটি খাদ্য বিভাগ খুলিয়া জানাইয়াছেন যে উহা ফসলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং উহার সরবরাহের বন্দোবস্ত করিবে এবং সৈন্যদের জন্য সরবরাহ বিভাগ ও বাণিজ্য বিভাগ যে ফসল ক্রয় করিত অতঃপর সেই কার্য্যের ভারও এই নূতন খাদ্য বিভাগের উপর অর্পিত হইয়াছে। এই নবগঠিত বিভাগ অতঃপর প্রদেশে ডাল-পালা বিস্তার করিবে ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন এই, কাহার স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই "নিয়ন্ত্রণ-কার্য্য" চলিবে? বাণিজ্য-সচিব নিজেই এ সম্বন্ধে দুইটি

অত্যন্ত অর্থপূর্ণ কথা বলিয়াছেন। বোম্বাইয়ে ভারতীয় বণিক সমিতির সভায় তিনি জানাইয়াছেন যে সৈন্যদল এবং ফসলক্রয়কারী প্রদেশসমূহের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ক্রয়ে সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্যই কার্য্যতঃ খাদ্য বিভাগ গঠিত হইয়াছে। ঐ সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে কৃষকগণ যাহাতে আরও বেশী করিয়া তাহাদের মজুত ফসল ছাড়িয়া দিতে উদ্বুদ্ধ হয় তাহার জন্য যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে তিনি সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন এবং ঐ সব ব্যবস্থার কথা তিনি প্রকাশ্যে বলিয়া দিবেন, ইহা যেন কেহ আশা না করেন। গবর্ন্মেণ্ট এত দিন প্রজাদের প্রকাশ্যে "ভালো" করিয়া তাহাদিগকে যে অবস্থায় আনিয়া দাঁড় করিয়াছেন তাহাতে বাণিজ্য-সচিবের "গোপনে ভালো" করিবার নামে শুধু কৃষককুল কেন, দেশবাসী ৪০ কোটি লোকেরই আঁৎকাইয়া উঠিবার কথা। এবার ফসলই হইয়াছে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, তার উপর আমদানী নাই, কিন্তু অতিরিক্ত নানাবিধ চাহিদা আছে। ইহা বুঝিয়া বেশী টাকার লোভে চাউল বেচিয়া ফেলিলে বৎসরান্তে ২৫৲ টাকা মণেও উহা জুটিবে না এই আশঙ্কায় কৃষকেরা সম্বৎসরের ধান মজুত রাখিলে তাহাদিগকে অবশ্যই দোষ দেওয়া যায় না।

বাংলা দেশের ধান বাংলার বাহিরে যাইতে পারিবে না এই আদেশ দিয়া জনসাধারণকে কথঞ্চিৎ আশ্বস্তও না করিয়া ভারত-সরকার আবার এক নূতন বিভাগ খুলিয়া সৈন্যদল ও অন্য প্রদেশের জন্য কৃষকদের খোরাকী ধান টানিয়া লইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন এবং এই শুভকার্য্যে স্বয়ং ভারত-সচিব আমেরী সাহেবেরও যে হাত আছে বাণিজ্য-সচিব মহাশয়ই তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। বোম্বাইয়ে সরকারী দপ্তরখানায় এক সভায় তিনি বলিয়াছেন যে, দেশে খাদ্যের অবস্থা সম্বন্ধে ভারত-সচিবকে সর্ব্বদা সংবাদ দেওয়া হইতেছে। দেশে খাদ্য-সমস্যার সমাধান কি ভাবে হইতে পারে তাহা দেশবাসী বুঝে না, জনসাধারণের প্রতিনিধিরা বুঝেন না, বণিক-সমিতিগুলি বুঝেন না—বুঝেন শুধু ভারত-সরকারের দপ্তরখানার তিন-চারি জন সিভিলিয়ান; আর দেশের নিজস্ব এই সমস্যার সমাধান দেশের লোকে করিতে পারে না, করিয়া দিবেন ছয় হাজার মাইল দূর হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এক ব্যক্তি—যেহেতু তিনি ভারত-সচিবের গদীতে কয়েক বৎসর যাবৎ অধিষ্ঠিত আছেন—এত বড় আশা ভারতবাসীর নিকট অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত বলিয়াই মনে হইবে। ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক দেশও নয়, স্বাধীনও নয়; এখানের অন্নবস্ত্র সমস্যায় ঐরূপ সরকারী হস্তক্ষেপের অর্থ বিলাতী বণিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য রক্ষণশীল দলের চাপে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতে ভারত-সরকার কর্তৃক প্রদেশে প্রদেশে জেলায় জেলায় হস্ত প্রসারণ,—এই ধারণাই বরং দেশবাসীর মনে বদ্ধমূল হইবে।

খাদ্য সমস্যার সমাধান এমন ভয়ানক কিছু নয়। আসন্ন দুর্ভিক্ষ বাঁচাইবার জন্য বাংলার চাউল বাহিরে রপ্তানী অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দিয়া, অন্যান্য প্রদেশের জন্য অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ও আমেরিকা হইতে গম আমদানী করিয়া এবং আগামী বৎসর ফসলের চাষ বৃদ্ধির জন্য কলিকাতায় পোষ্টার আঁটিয়া ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনের প্রহসন না করিয়া গ্রামে গ্রামে কৃষকগণকে বীজ ধান ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কৃষি ঋণ দিয়া চাষে সাহায্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট এখন হইতেই সচেষ্ট হইতে পারেন। এ বৎসর ধানের দাম বাড়িবে কৃষকেরা তাহা জানিত, তথাপি কেন তাহারা চাষ বাড়াইতে পারে নাই তাহার কারণও অবিলম্বে অনুসন্ধান করা আবশ্যক এবং সেই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য এখন হইতেই উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের মনে হয় সে ভরসায় না থাকিয়া আগামী বৎসর যাহাতে অধিক ফসল উৎপন্ন হয় তাহার জন্য জনসাধারণের প্রতিনিধি এবং বণিক-সমিতিসমূহের তরফ হইতেই চেষ্টা হওয়া কর্ত্তব্য।

বস্ত্র-সমস্যা

অন্নের পর বস্ত্র। পূজার কিছু পূর্ব হইতে কাপড়ের মূল্য হু হু করিয়া চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এবং আপাততঃ দুই টাকা জোড়ার কাপড় ছয় টাকারও উর্দ্ধে উঠিয়াছে। ছয় আনার লং-ক্লথ এবং চারি আনার মার্কিন পাঁচ সিকাতেও পাওয়া কঠিন। কাপড়ের বাজারে হঠাৎ এ ভাবে আগুন লাগিল কেন? নীচের হিসাবটি দেখিলে ইহার কতকটা আন্দাজ পাওয়া যাইতে পারে:—

	ভারতীয় মিলে বস্ত্র উৎপাদন (কোটি গজ)	আমদানী (কোটি গজ)	রপ্তানী (কোটি গজ)
১৯৪০-৪১	৪২৭	৪৫	৩৯
১৯৪১-৪২	৪৪৬	১৮	৭৮
এপ্রিল ১৯৪২	৩৩	·০১	১০·৩
মে "	৩৫	·০১৬	১০·৫

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় ১৯৪০-৪১-এর পর দেশে বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে নাই, আমদানীর

পরিমাণ অনেক কমিয়াছে এবং রপ্তানীর মাত্রা অত্যধিক বাড়িতেছে। ঐ বৎসর যত বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছে, পর-বৎসর তাহার ঠিক দ্বিগুণ ভারতীয় বস্ত্র বাহিরে গিয়াছে এবং গত এপ্রিল হইতে যে হারে রপ্তানী সুরু হইয়াছে তাহাতে মোট উৎপন্ন বস্ত্রের এক-চতুর্থাংশ বাহিরে চলিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। ফলে মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। এই বস্ত্র-রপ্তানীর দ্বারা বিদেশে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প নিজেদের বিক্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ভবিষ্যতের সুরাহা করিয়া লইতেছে ইহাও মনে করা কঠিন।

কয়লা-সমস্যা

অন্ন এবং বস্ত্রের পর ভাত রাঁধিবার কয়লা। খাতায়-পত্রে সরকারী দপ্তরে কয়লার দর মণ-প্রতি পাঁচ সিকা নিয়ন্ত্রণ করা আছে। কিন্তু কয়লাওয়ালারা প্রকাশ্যে ঠেলাগাড়ী করিয়া রাস্তায় রাস্তায় আড়াই টাকা দরে উহা বিক্রয় করিতেছে। সরকারী হিসাবেই দেখা যাইতেছে, ১৯৪১-এর নবেম্বর মাস হইতে ঝরিয়ার এক নম্বর কয়লার পাইকারী দর টন-প্রতি চার টাকা হিসাবে গত জুন পর্য্যন্ত অপরিবর্তিত রহিয়াছে। অর্থাৎ মালগাড়ীর ভাড়া বাদে কয়লার দর মণ-প্রতি দশ পয়সারও কম। রেলওয়ে বিভাগের মালগাড়ী প্রাপ্তি এবং চলাচলের দৌলতে আড়াই আনার কয়লা কলিকাতা শহরে আড়াই টাকায় বিক্রয় হইতেছে। মালগাড়ীর ভাড়া না হয় আর আড়াই বা তিন আনাই গেল! নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে কয়লা চালান দেওয়ার জন্য মালগাড়ীর সংখ্যা কি ভাবে ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে :

অক্টোবর ১৯৪১		১১৫০০০
নবেম্বর	"	১১১০০০
ডিসেম্বর	"	১০১০০০
জানুয়ারি ১৯৪২		১০৭০০০
ফেব্রুয়ারি	"	৯০০০০
মার্চ	"	১০১০০০
এপ্রেল	"	৮৭০০০
মে	"	৮০০০০
জুন	"	৮৫০০০

ইহার পর স্যর্ এডোয়ার্ড বেন্থল বলিয়া দিয়াছেন যে আগষ্ট মাস হইতে কংগ্রেস-আন্দোলন আরম্ভ করিবার ফলে রেলের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে জনসাধারণকেই ভুগিতে হইবে। কংগ্রেস-আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই মালগাড়ীর সংখ্যা কমিয়াছে এবং কয়লার দর বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস হইবার চারি মাস পরে বেন্থল সাহেব বক্তৃতা দিয়াছেন এবং তাঁহার বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গেই কয়লার দর ভীষণ ভাবে বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কয়লার মূল্য মালগাড়ী চলাচলের উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষে মালগাড়ী নির্মাণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়াই আজ ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাপ্তিতে এই অসুবিধা ঘটিতেছে, নিরুপায় হইলেও ভারতবাসী ইহা বুঝে।

চাউল, বস্ত্র ও কয়লা ভিন্ন অপর প্রতিটি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়াছে এবং এখনও বাড়িতেছে। ঔষধের অভাবে চিকিৎসা এখন প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অতিলোভী ব্যবসায়ীদের দোষ ত আছেই, কিন্তু তাহার পশ্চাতে আরও যে-সব ব্যাপার রহিয়াছে তাহাও দেশবাসীর জানা প্রয়োজন। দেশের ভবিষ্যৎ ক্রমেই অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। দুর্ভিক্ষ প্রায় নিশ্চিত, তাহার সঙ্গে মহামারী ও আরও অনেক কিছুর ভয় রহিয়াছে।

—

ঢাকায় মুসলিম লীগের পরাজয়

ঢাকা জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি পদের জন্য মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচিত সদস্য মিঃ ফজলুর রহমান এবং প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন দলের সদস্য চৌধুরী হবিবুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী প্রার্থী ছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। বোর্ডের মোট সদস্য-সংখ্যা ২০, তন্মধ্যে ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন। এক জনের ভোট বাতিল হয় এবং উভয় পক্ষে আট জন করিয়া সদস্য ভোট দেন। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিতেছিলেন শ্বেতাঙ্গ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনি সিদ্দিকী সাহেবের পক্ষে ভোট দেওয়ায় মুসলিম লীগের পরাজয় ঘটে। বাংলা দেশে মুসলিম লীগের প্রধান কেন্দ্র ঢাকায় শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানের কাষ্টিং ভোটে লীগের পরাজয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা বটে।

—

মাইনরিটি ও পাকিস্থানের যুক্তি আমেরিকায় অচল

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী আমেরিকার গণ-চিত্তে কতখানি নাড়া দিয়াছে তাহার কিছু কিছু পরিচয় আজ-কাল পাওয়া যাইতেছে। মিঃ ওয়েণ্ডেল উইলকীর বক্তৃতা এবং বেতারে বার্ট্রাণ্ড রাসেল, পার্ল বাক্ প্রভৃতির

আলোচনার পর সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক টাইমসের পৃষ্ঠায় বহু বিশিষ্ট আমেরিকানের স্বাক্ষরিত যে আবেদনপত্র আমেরিকা-বাসীদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে উহা প্রদত্ত হইল :

"ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কথা বলিবার অধিকার কি আমেরিকার আছে? হাঁ, আছে ; কারণ ভারতের কোটি কোটি লোককে জাপানের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের দলে পাইতে চাই। ভারতবর্ষের জনসাধারণ জাপানকে চায় না। তারা চায় স্বাধীনতা, স্বাধীনতালাভের প্রতিশ্রুতি পাইলে তাহারা চীনের ন্যায় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে।

এই প্রতিশ্রুতি ভারতবাসীকে দেওয়া যায় কি করিয়া? কথায় বা মৌখিক প্রতিজ্ঞায় কাজ হইবে না। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে সুশৃঙ্খল ভাবে স্বাধীনতা পাইবে এই বিশ্বাসে তাহারা গত মহাযুদ্ধে লড়িয়াছে। দুই বৎসর অপেক্ষা করিয়াও তাহারা কিছুই পায় নাই। তার পর হইতে তাহারা নিজেদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিয়াছে ; বর্ত্তমান আন্দোলন উহারই একটি অধ্যায় মাত্র। প্রতিশ্রুতিতে আর তাহারা বিশ্বাস করিবে না।

এবার প্রতিশ্রুতি নয়, কাজ দরকার—অত্যধিক বিলম্ব হইবার পূর্বেই যাহা করিবার করিতে হইবে। ভারতবর্ষের সব সংবাদ ভাল নয়। স্বাধীনতা-সংগ্রাম পূর্ণ শক্তি অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চীনদেশে আমাদের মিত্রেরাও অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে, এশিয়া সম্বন্ধে মিত্রশক্তির মনোভাব কি তাহা জানিবার জন্য তাহারা অতিশয় উদ্‌গ্রীব।

আমরা বিশ্বাস করি ভারতবর্ষে বর্তমান সঙ্কট সৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই অবস্থার পরিবর্তন অবশ্য করা যায়। আমাদের সকলের লক্ষ্য সম্মিলিত জাতিসমূহের জয়, উহার খাতিরে এই অবস্থার পরিবর্তন করা যায় ইহা আমরা বিশ্বাস করি।

ভারতবাসীরা নিজেরাও বলিয়াছে যে একটি ফেডারেল শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাহারা সকল দল ও ধর্ম্মের লোক মিলিয়া গবর্মেণ্ট গঠনের উদ্দেশে নূতন করিয়া আলোচনা চালাইতে প্রস্তুত আছে। এই ফেডারেল শাসনতন্ত্র আমাদের আমেরিকার ন্যায় হইতে পারে। ঐ গবর্মেণ্ট কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতেছি না, কিন্তু জাতি হিসাবে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে ভারতবর্ষের জনসাধারণের বৈষম্য তাহাদের স্বাধীনতা লাভ ও একরাষ্ট্র গঠনের অন্তরায় হইতে পারে না। ফেডারেশনের আদর্শে যে সাময়িক গবর্মেণ্ট গঠিত হইবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ভারতবর্ষের সকল জাতি ও ধর্ম্মের লোক তাহাতে যোগদান করিবে।

এখনই ভারতবর্ষে আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করা দরকার।

হতাশার সমুদ্রে যে জাতি ডুবিতে বসিয়াছে এবং রুদ্ধ রোষে বিপ্লবের দিকে আগাইয়া যাইতেছে, জাপান তাহার সুযোগ লইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। যে নেতারা ভারতবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে ও তাহাদিগকে আক্রমণ-প্রতিরোধে একত্র করিতে পারিতেন তাঁহারা আজ কারাগারে।

যে-কাজ পরিকল্পনা করিয়া ও বন্দোবস্ত করিয়া করিতে হয় তাহা আপনাআপনি হইবে, এই আশায় সম্মিলিত জাতিসমূহের পক্ষে অলস ভাবে বসিয়া থাকা উচিত নহে।

মালয় ও ব্রহ্মদেশে যে মহা বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে ভারতবর্ষে আরও মারাত্মকভাবে তাহার পুনরভিনয় হইলে আমাদের সমূহ বিপদ ঘটিবে।

কারাগারে যাইবার পূর্বে বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের জন্য গান্ধীর ইচ্ছা এবং কারাগার হইতে তাঁহার আবেদন হইতেই মীমাংসার জন্য ভারতবাসীদের ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায়। গান্ধী এবং অন্যান্য ভারতীয় নেতাদের এই যুক্তিপূর্ণ মনোভাবের সুযোগ গ্রহণ করিলে সম্মিলিত জাতি-সমূহেরই লাভ হইবে।

এই কারণে আমরা রাষ্ট্রপতি রুজভেণ্ট ও জেনারেল চিয়াং কাই-শেককে এই দাবী জানাইতেছি যে তাঁহারা ভারতীয় সমস্যা সমাধানে সম্মিলিত জাতিসমূহের স্বার্থ যে কত বেশী তাহা উপলব্ধি করুন, এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের ব্যবস্থা এখনই করিয়া দিয়া তাহাকে অনতিবিলম্বে আমাদের মিত্রশক্তিতে পরিণত করিবার উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য উভয়েই দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া নূতন ভাবে যাহাতে আলোচনা আরম্ভ হয় তাহার জন্য ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এবং ভারতীয় ও কংগ্রেস নেতাদের অনুরোধ করুন।

আমেরিকায় স্বাধীন জনমত ব্যক্ত করিবার যতগুলি উপায় আছে তাহার সবগুলি অবলম্বন করিয়া এই আবেদনপত্রের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে অভিমত প্রকাশের জন্য আমরা আন্তরিক অনুরোধ জানাইতেছি।"

আবেদনে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি

আছে: আমেরিকান ব্যক্তি-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের ডিরেক্টর রজার বলডুইন; নিউ রিপাবলিকের সম্পাদক ব্রুস ব্লিভেল; পার্ল বাক্; অর্থনীতিবিদ্ ষ্টুয়ার্ট চেজ; ভারতবর্ষের ওয়াই-এম-সি-এর ন্যাশনাল সেক্রেটারী ডাঃ শেরউড এডি; জন গুন্থার; আমেরিকান কমার্স চেম্বারের ভূতপূর্ব সভাপতি হেনরী হ্যারিমান; হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম হকিং; সার্ভে গ্রাফিকের সম্পাদক পল কেল্যা; ডেমোক্রাটিক অ্যাক্‌সন ইউনিয়নের সভাপতি ডাঃ ফ্রাঙ্ক কিংডন; নেশনের সম্পাদক ফ্রেডা কার্চওয়ে; কানসাসের ভূতপূর্ব গবর্ণর আলফ্রেড ল্যাণ্ডন; কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট ম্যাকআইভার; আপটন সিনক্লেয়ার; এশিয়া-সম্পাদক রিচার্ড ওয়ালশ।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিতে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের সর্বপ্রধান যুক্তি এই যে এদেশে বহু জাতি ও বহু ধর্মের লোক বিদ্যমান, এতগুলি বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষের বৈষম্য আগে দূর না করিলে তাহারা স্বাধীনতা পাইলেও তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের এই যুক্তি যে আমেরিকা কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারে না উপরোক্ত বিবৃতিতে বিশেষভাবে তাহারই প্রতি বিশ্বমানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে, "জাতি হিসাবে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে ভারতবর্ষের জনসাধারণের বৈষম্য তাহাদের স্বাধীনতা লাভ ও একরাষ্ট্র গঠনের অন্তরায় হইতে পারে না।" ইহা শুধু আমেরিকার অভিমত নহে, তাহার অভিজ্ঞতার ফল। ব্রিটেনের নিকট হইতে বলপূর্বক স্বাধীনতা আদায় করিবার পূর্বে আমেরিকার বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোক ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে একমত হইবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। জর্জ ওয়াশিংটন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ জানিতেন, স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলে গৃহবিরোধ বা দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান কঠিন হইবে না। বর্ত্তমানে আমেরিকায় পৃথিবীর বহু জাতির লোক বাস করে। বহু সংস্কৃতি সেখানে পাশাপাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীস্টানদের মধ্যে ১৯টি ভাগ আছে, তদুপরি রোমান ক্যাথলিক ইহুদী এবং পূর্ব ইউরোপের গোঁড়া খ্রীষ্টান আছে। হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীর বিভাগের সহিত তুলনা করিলে আমেরিকার খ্রীষ্টানদের মধ্যেও দুইশতাধিক ভাগ আছে কিন্তু এক ধর্মের ভিতর বিভিন্ন ভাগ আছে বলিয়া এক দলকে তাহারা তপশীলী করিবার প্রয়োজন অনুভব করে নাই। পাকিস্থানের যুক্তিও আমেরিকায় অচল। দক্ষিণাঞ্চলের কতকগুলি রাষ্ট্র যখন স্বতন্ত্র হইবার এবং আলাদা থাকিবার দাবী তুলিয়াছিল, আমেরিকার কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট তাহা স্বীকার করেন নাই, আমেরিকার পাকিস্থান গড়িতে দেওয়া অপেক্ষা উহাদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য তাঁহারা বলপ্রয়োগেও কুণ্ঠিত হন নাই। ভারতবর্ষের অখণ্ডত্বের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী যুক্তিও তাই আমেরিকার নিজস্ব অভিজ্ঞতার বিরোধী।

খাঁটি আমেরিকার যে মনোভাব এশিয়া, নেশন, নিউ রিপাবলিক প্রভৃতি প্রভাবশালী পত্রিকা এবং প্রগতিশীল ব্যক্তিদের উক্তিতে প্রতিফলিত হইতেছে, বিংশ শতাব্দীতে তাহার সার্থকতা অস্বীকার করা যায় না। ব্রিটেন জনকল্যাণ এবং এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের প্রতিনিধিদের ধূয়া ধরিয়া যে ভেদনীতি দুই শতাব্দী যাবৎ চালাইয়া যাইতেছে, বর্তমান যুগের রাজনৈতিক-চেতনাসম্পন্ন বিশ্বমানব তাহার অসারত্ব উপলব্ধি করিলে মিথ্যার উপর গঠিত প্রাসাদের ভিত্তিমূল ধ্বসিয়া পড়িবে।

—

এশিয়া ও আফ্রিকার লোক স্বাধীনতা পাইবে কি না?

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরেই মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টকে তাঁহাদের যুদ্ধে নামিবার উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিন বৎসর অতীত হইয়াছে, সে প্রশ্নের উত্তর তিনি পান নাই। আজ গান্ধীজী কারাগারে। মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্কী রাশিয়া ও চীন ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিবার পর হইতে ঐ প্রশ্নই তুলিয়াছেন। গান্ধীজীর ন্যায় তিনিও ঐ প্রশ্নের উত্তর পান নাই। কানাডার টরণ্টো শহরে বিলাতী কায়দায় তাঁহার কণ্ঠরোধের চেষ্টার পর তাঁহার বক্তব্য আরও জোরালো এবং সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মিঃ উইল্কীর বক্তব্য প্রশ্ন এই: যাহারা এখনও সাদা মানুষের দায়িত্বের কথা বিশ্বাস করে এবং যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসস্তূপকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার কথা হৃষ্টচিত্তে আলোচনা করে, তাহারা হয় পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা জানে না নতুবা বাস্তবকে উপেক্ষা করিতে চায়। নূতন এবং পছন্দসই বুলির আড়ালে পুরাণো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ইংরেজ ফরাসী ও আমেরিকা সমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহার ফলে লীগ অব নেশন্‌স্ ধ্বংস হইয়াছে। যুদ্ধে প্রকৃত জয়লাভ করিতে হইলে আমাদের নিজেদের মধ্যে এবং মিত্রশক্তিবর্গের সহিত আলোচনায় যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া দরকার।

ইহা অপেক্ষাও অধিক কিছু করিতে হইবে। ক্ষতবিক্ষত ইউরোপে, ভারতবর্ষে, ভূমধ্যসাগরের তীরে, আফ্রিকায়, এশিয়ার দক্ষিণ উপকূলে এবং আমাদের নিজেদের মহাদেশে যে শত শত কোটি লোক রহিয়াছে তাহাদের দুঃখ ও আকাঙ্ক্ষা জানিবার এবং উহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হইবে। প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্ভুক্ত অধিকৃত স্থানগুলি পুনরায় জয় করিয়া আমরা কি উহাদের অধিবাসীবৃন্দকে তাহাদের পূর্ববর্তী অবস্থাতেই দাঁড় করাইয়া দিব? অপর জাতির গবর্ন্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে তাহারা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাদের প্রতিরোধ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে কিন্তু তাহারা ত সাহসের সহিতই দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী বা মিঃ উইলকী তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর কেন আশা করিতে পারেন না, চার্চিল সাহেব তা জানাইয়া দিয়াছেন। সাম্রাজ্য তাঁহারা ছাড়িবেন না, বড়জোর উপনিবেশ-উন্নতি-বোর্ড গঠন করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকা-বাসীদের একটু ভাল খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে তাঁহারা না হয় রাজি হইতে পারেন। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকাবাসী ভাল খাওয়া-পরার দাবী তোলে নাই, তাহারা জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা চাহিয়াছে এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য তাহাদের দৃঢ়সঙ্কল্প কথা ও কাজের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতেছে। এশিয়ার আরব সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা এবং মঙ্গোলীয় সভ্যতা ইউরোপের খ্রীষ্টান সভ্যতা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। প্রত্যেক দেশ আজ নিজ নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছে, এশিয়ার ন্যায় আমেরিকারও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিয়াছেন। কোটি কোটি টাকা এবং লক্ষ লক্ষ আমেরিকান যুবকের রক্ত ঢালিয়া ধ্বংসপ্রায় ব্রিটিশ ফরাসী ও ডাচ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আমেরিকা যুদ্ধে নামিয়াছে কি না—আমেরিকান বর্তমান গবর্ন্মেণ্টকেই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে।

—

ষ্টাণ্ডার্ড কাপড়

সার রামস্বামী মুদালিয়ারের আমল হইতে ভারত-সরকারের বাণিজ্য বিভাগ ষ্টাণ্ডার্ড কাপড় বাহির করা সম্বন্ধে যে জল্পনা সুরু করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত তাহা শেষ হইল না। নূতন বাণিজ্য-সচিব এক সভায় আশ্বাস দিয়াছিলেন যে আগামী বৎসরের প্রারম্ভে ষ্টাণ্ডার্ড কাপড় বাজারে বাহির হইবে, উহার সকল আয়োজন সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু দুই-চারি দিনের মধ্যেই পুনরায় তিনি এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার ভিতর যেন আগের জোর আর নাই। শেষ বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন,

"কলওয়ালারা দয়া করিয়া কাপড় তৈরি করিতে রাজি হইয়াছেন বটে, কিন্তু উহার আর্থিক দায়িত্ব এবং ষ্টাণ্ডার্ড কাপড় যাহাতে দেশের দরিদ্র লোকদের মধ্যেই বিতরিত হয় তাহার বন্দোবস্ত করিবার ভার প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টসমূহকে লইতে হইবে। উপরোক্ত দুটি সর্ত্ত পূরণ করিয়া কোন পরিকল্পনা রচনা এখনও সম্ভব হয় নাই।"

ইহার পর বাণিজ্য-সচিব যাহা বলিয়াছেন তাহা দুর্বোধ্য। কলওয়ালারা নাকি,

"সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে তাহাদের নিজ দায়িত্বে গঠিত ষ্ট্যাটুটরী প্রতিষ্ঠান মারফৎ কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থায় আপাততঃ রাজি হইয়াছেন।"

ষ্ট্যাটুটরী অর্গানাইজেশনই যদি গঠিত হয় তবে তাহা মিল-মালিকদের দায়িত্বে পরিচালিত হইবে কেন? প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টগুলি উহাদের ভার লইতে অনিচ্ছুক কেন? সরকারী প্রতিষ্ঠান যদি মিল-মালিকদের দ্বারা পরিচালিত হয় তাহা হইলে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা অপেক্ষা স্বার্থ হানির আশঙ্কাই অধিক। সরকার নিজেই ত কিছু দিন যাবৎ "ব্ল্যাক মার্কেটের" উদ্দেশে কটাক্ষপাত করিতেছেন।

ষ্টাণ্ডার্ড কাপড়ের সমস্যা সহজ ভাবে কেন সমাধান করা সম্ভব হইতেছে না? দেশী তুলার দাম বাড়ে নাই। ঐ তুলা হইতে মোটা সূতার মোটা কাপড় তৈরি করিয়া সাধারণভাবে অন্যান্য বস্ত্রের ন্যায় উহা প্রকাশ্যে বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় কেন? বহর এবং দৈর্ঘ্য একটু ছোট করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত হইলেই ত নিতান্ত গরীব ভিন্ন অপরে তাহা কিনিবে না। গরীবের হাতে কাপড় পৌছাইয়া দিবার জন্য 'ষ্ট্যাটুটরী অর্গানাইজেশন' গঠন করিয়া অনর্থক টাকা খরচের প্রয়োজন কি? তুলার দাম, শ্রমিকের মজুরী, মালিকের লাভ এবং কারখানার অন্যান্য আনুপাতিক ব্যয় হিসাব করিয়া ষ্টাণ্ডার্ড কাপড়ের দাম ঠিক করিলেই চলে। অতিলোভী ব্যবসায়ীদের কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা করিলেই ষ্টাণ্ডার্ড কাপড় যথাস্থানে পৌছাইবার বন্দোবস্ত হইবে।

—

আমেরিকায় মাদাম চিয়াং

মাদাম চিয়াং অস্ত্রোপচার করাইবার জন্য আমেরিকা গিয়াছেন এই সংবাদ প্রচারের কয়েক দিন পরে 'লুক' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়া মিঃ ওয়েণ্ডেল উইলকী মাদামের আমেরিকা গমনের অন্যতম উদ্দেশ্যের কথা

সকলকে জানাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে মাদাম চিয়াং-এর আমেরিকা আগমনের একটি উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের উপর দিয়া নূতন চিন্তাধারার যে বিপ্লব বহিয়া চলিয়াছে তাহা এবং এশিয়ার সমস্যা বুঝিতে আমেরিকাবাসীদের সাহায্য করা। মিঃ উইলকী লিখিয়াছেন,"চুংকিং-এ অবস্থান কালে তিনি নিজেই মাদাম চিয়াংকে আমেরিকায় আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। চীনের অর্থসচিব ডাঃ কুং-কেও তিনি বলিয়াছিলেন যে আমেরিকানদের পক্ষে এশিয়ার সমস্যা উপলব্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন এবং তাঁহার দৃঢ় ধারণা যুদ্ধের পর প্রাচ্যের সমস্যাসমূহের ন্যায়সঙ্গত সমাধানের উপরই পৃথিবীর ভাবী শান্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে। এশিয়ার কোটি কোটি লোকের মনে স্বাধীনতার যে অত্যুগ্র কামনা জ্বলিতেছে, উপযুক্ত শিক্ষা লাভের, উত্তম জীবনযাত্রার এবং পাশ্চাত্য দেশের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া নিজেদের স্বাধীন গবর্ন্মেণ্ট গঠনের যে দাবী এশিয়াবাসীর হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছে, মাদাম চিয়াং তাহা সুদৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন মিঃ উইলকীর এই ধারণার কথাও তিনি ঐ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"

মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত জওহরলালের সহিত আলোচনা করিয়া মাদাম চিয়াং ভারতের মর্মবাণী জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার তিনি করিতেছেন, একজন বিশিষ্ট আমেরিকানের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া ভারতবাসী আনন্দিতই হইবে। সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি টলাইতে হইলে বিশ্বমানবের কানে এশিয়া ও ভারতের মর্মবাণী পৌছাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

—

সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশ তাহার এক জন সুযোগ্য সন্তান হারাইল। গত ৬ই ডিসেম্বর রবিবারে তিনি ৬৯ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে নিদারুণ ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। আইনজীবী হিসাবে কলিকাতা হাইকোর্টে এবং বিচারকের পদ হইতে বিদায়গ্রহণের পর পাটনা হাইকোর্টে, উভয় স্থানেই তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজি ১৯২৪ হইতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং একাধিক বার তিনি অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার যখন ছুটিতে ছিলেন তখন সর্ মন্মথ তাঁহার স্থানে বড়লাটের শাসন-পরিষদে আইনসচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাংলা গবর্ণরের শাসন-পরিষদের সদস্যও ছিলেন। ভারতের বর্তমান শাসনপ্রণালীতে যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রথা প্রচলিত হইয়াছে তাহার এবং মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের প্রতিবাদকল্পে তিনি দেশের রাজনৈতিক জীবনের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং এই সকলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহাতে তিনি সর্বান্তকরণে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি নিখিল-ভারত হিন্দু-মহাসভার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ও কলিকাতায় ও পাটনায় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সমিতির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের এক জন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রেই মধুর ও উদার ব্যবহারের জন্য, কর্মদক্ষতার জন্য এবং তাঁহার পক্ষপাতহীন স্বাধীন চরিত্রগুণের জন্য তিনি সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা তাঁহার পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

—

সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

গত ২৭শে অক্টোবর সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জীবনের প্রথম ভাগেই তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। সেই জন্য তাঁহাকে একাধিক বার দীর্ঘ বন্দীজীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। ইংরেজি ১৯২৪ সালে তিনি কংগ্রেস স্বরাজ্যদলের পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তাহার পর তিনি ভারতীয় আইন-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হইলে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের দ্বারা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। কিছু দিনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্ব-বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন। নূতন শাসনপ্রণালী অনুসারে গঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি হিসাবে তিনি যে দক্ষতার, উন্নত স্বাধীন চরিত্রের ও পক্ষপাতহীন আত্মমর্যাদাজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতির প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধাঞ্জলিই তাহার প্রমাণ। শোকার্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

—

মুসলমানগণ ও পাকিস্থান

চিন্তাশীল মুসলমান নেতাগণ ক্রমেই পাকিস্থান পরিকল্পনার অসারতার প্রতি সচেতন হইয়া দৃঢ়ভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদে লীগ দলের বাংলার সদস্য মিঃ সেকেন্দার আলি চৌধুরী যে পাকিস্থান পরিকল্পনার সমর্থন করেন না এই মর্মে তিনি পরিষদের লীগ দলের সদস্যপদ ত্যাগ পূর্বক মিঃ জিন্নার নিকট পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ উক্ত পত্রে তিনি লিখিয়াছেন যে মিঃ জিন্না পাকিস্থান প্রস্তাবের দ্বারা মুস্লীম লীগের উপর এক প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছেন। তাঁহার পাকিস্থান পরিকল্পনা হইতে মনে হয় যে তিনি হিন্দুস্থানে একটি স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্র স্থাপন করিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। ইহা নিশ্চিত যে মুসলমানেরা যদি হিন্দুদিগকে তাহাদের মাতৃভূমি ও তাহাদের পুরুষ-পরম্পরাগত সংস্কার ও ঐতিহ্য হইতে বঞ্চিত করে, তাহা হইলে মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করিবে। আর মিঃ জিন্নার ইহাও জানা উচিত যে কোন সম্প্রদায়ের দরিদ্র জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থনের উপর নির্ভর করিয়া এই পরিকল্পনাকে সফল করা অসম্ভব হইবে। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে অভিন্নতাই ইসলামের শ্রেষ্ঠ বাণী। অভিন্ন সমাজের মধ্যে বাস করিয়া পরস্পরের মঙ্গল সাধন করাই ইসলামের নির্দেশ।

কয়েক দিন পূর্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য খান বাহাদুর সেখ মোহাম্মদ জান পাকিস্থান পরিকল্পনার প্রতিবাদ করিয়া ইহার বিপক্ষে অনেকগুলি কারণ নির্দেশ করিয়া একটি বিস্তৃত খোলা চিঠি প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি জিন্না সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছেন যে তিনি যেন পাকিস্থান গঠনে প্রয়াসী হইবার পূর্বে লেখকের যুক্তি সকল খণ্ডন করিয়া ভারতীয় জনসাধারণকে বিশেষ করিয়া মুসলমানদের বুঝাইয়া দেন যে তাঁহার পাকিস্থান পরিকল্পনা মুসলমান সম্প্রদায়ের নিছক মঙ্গল কামনার জন্য এবং সাম্প্রদায়িক কলহ হইতে নিরস্ত করিয়া দুইটি সম্প্রদায়কে শান্তিতে বাস করিবার জন্য।

নিম্নে আমরা খান বাহাদুর সেখ মোহাম্মদ জানের কয়েকটি প্রশ্ন উদ্ধৃত করিলাম। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন :—

(ক) আপনি কি ভারতকে দ্বিধা-বিভক্ত করিবার জন্য বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে ভারতের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ব্যাপারে বৈদেশিক গবর্মেণ্টের হস্তক্ষেপ ভাল বলিয়া বিবেচনা করেন?

(খ) যদি আপনি তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ পছন্দ না করেন, তাহা হইলে রাজ্য সম্বন্ধীয় বিবাদ ও বিভেদ আপনি কেমন করিয়া মিটাইবেন? তখন দুইটি রাজ্যের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ বাধিবে, তাহা কি বিনা অস্ত্রের সাহায্যে মিটিবে? দুইটি যুক্তরাজ্য সম্বন্ধে যাহা সত্য, তাহা কয়েকটি রাজ্যাংশ ও এলাকার পক্ষেও সত্য।

(গ) আপনি কি মনে করেন যে যদি ভারতবর্ষকে দ্বিধা করা হয়, তাহা হইলে হিন্দু ও মুসলমানেরা পরম সুখে, শান্তিতে ও সদ্ভাবে বাস করিতে পারিবে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে একক ভারতের জন্য সম্মানজনক আপোষরফার চেষ্টা করিতে আপনার কি এমন অপ্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষ বাধা-বিপত্তি আছে?

(ঘ) যদি হিন্দুরা মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যাধিকার স্বীকার করে এবং বাংলার কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, বর্দ্ধমান ও হুগলী প্রভৃতি বারোটি উর্ব্বর জেলার এবং পাঞ্জাবের অমৃতসর, জলন্ধর ও লুধিয়ানা প্রভৃতি অতিশয় উর্ব্বর হিন্দুগরিষ্ঠ জেলাগুলির হিন্দুরা মুসলীম পাকিস্তানের বাহিরে যদি স্বাতন্ত্র্যাধিকার দাবী করে তাহা হইলে আপনি কি তাহাতে আপত্তি করিবেন না? হিন্দুগরিষ্ঠ এলাকার হিন্দুদের স্বাতন্ত্র্যাধিকার স্বীকার না করার পক্ষে আপনার কি যুক্তি থাকিতে পারে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সেই সকল এলাকা বাদ দিলে পাকিস্তানেরই বা কি অবস্থা ঘটিবে?

(ঙ) মুসলিম পাকিস্তান অথবা মুসলমান এলাকায় যদি শতকরা ৩৬ জন অধিকতর উন্নত ও শিক্ষিত হিন্দুদিগকে—যাহাদিগকে কোনমতেই উপেক্ষা করা যাইতে পারে না—লইয়া লড়িতে হয়, এবং হিন্দু হিন্দুস্থানে বা হিন্দু এলাকায় যেখানে শতকরা ৮৫ হইতে ৯০ জন হিন্দু বাস করে, যাঁহারা আর্থিক ও রাজনৈতিক সকল বিষয়েই সমৃদ্ধিশালী, তাহা হইলে ইহা কি সত্য নয় যে এই দুই স্থানেই মুসলমানদিগকে হিন্দুদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইবে?

(চ) আপনি মাত্র ৫ কোটি মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যাধিকারের জন্য লড়িতেছেন, কিন্তু হিন্দুগরিষ্ঠ প্রদেশের ৪ কোটি মুসলমান অধিবাসীদের নিরাপত্তা, শান্তি ও মঙ্গলের জন্য কি করিতেছেন? এই সকল মুসলমানদিগকে যদি তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের জন্মভূমি, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সব কিছু পিছনে ফেলিয়া দেশত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা কি সম্ভব হইবে?

কাশ্মীরের মুসলিম নেতা, মিঃ এম, এস, আবদুল্লা মহম্মদ সম্প্রতি প্রেসের নিকট বিবৃতি প্রদান কালে পাকিস্তান পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা করিয়া মুসলিম লীগের চিন্তাশীল ও অগ্রগামী সদস্যদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,

"যখন বহুবার ঘোষণা করা হইয়াছে লীগের নীতি দেশীয় রাজ্যের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না তখন পাকিস্থানের পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অনর্থক অশান্তি সৃষ্টি করা কি ন্যায়সঙ্গত কাজ হইবে? ভারতবর্ষের এই অংশের মুসলমানদের কি জাতি ও সম্প্রদায়গত প্রশ্ন লইয়া হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অশান্তি ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করা উচিত হইবে? সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করা কি তাহাদের কর্ত্তব্য নহে? মুসলিম লীগও কি ঠিক সেই প্রতিশ্রুতি ও নিশ্চয়তাই ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সকলের নিকট দাবী করিতেছে না?"

পাকিস্থানের বিরুদ্ধে মুসলমান নেতাদের এই সমস্ত অভিমত হইতে ইহা কি বুঝা যায় না যে যাঁহারা আজও মুসলিম লীগকে অবলম্বন করিয়া বলেন যে তাঁহারাই

দেশের মুসলমান সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি, তাঁহারা কতই গভীর ভাবে ভ্রান্ত ?

—

পাকিস্থানের বিরুদ্ধে সমালোচনা

যতই দিন যাইতেছে, ততই পাকিস্থান পরিকল্পনার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। দেশকে দ্বিধাবিভক্ত করিবার জন্য যে সকল পরিকল্পনা প্রকাশিত হইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে সমালোচনার পরিমাণ হইতে সহজেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। মাদ্রাজে আডেয়ার হইতে প্রকাশিত 'কনশেন্স' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ জি. এস. অরানডেল কর্তৃক লিখিত এবং ৪ঠা ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার মন্তব্যটির প্রতি আমরা মিঃ জিন্না-প্রস্তাবিত পাকিস্থানের পৃষ্ঠপোষকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উদ্ধৃত করিলাম। মিঃ অরানডেল তাঁহার প্রবন্ধে বলেন, হিন্দুরা মুসলমানদের উপর রাজত্ব করিতে চায়, এই ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা মিঃ জিন্না সহজেই প্রভাবান্বিত হন এবং এই ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি আরও বড় ভুল করিয়া বসেন। তাহা এই যে মুসলমানরা কেবল মুসলমানদেরই উপর রাজত্ব করিবে। মুসলমানরা যতখানি হিন্দুদের উপর রাজত্ব করিতে চায়, হিন্দুরা মোটেই তাহা চায় না। মিঃ জিন্না সেকালের লোক, এবং সেই জন্যই তিনি জাতি, সম্প্রদায় ও ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি মাপকাঠি ধরিয়া নানা প্রকার চিন্তা করেন এবং সম্ভবতঃ স্বপ্নও দেখেন। সত্য কথা বলিতে কি তিনি এ যুগের লোক নহেন এবং ভারতবাসীরা ধর্ম্ম ও সংস্কার-ভেদ ভুলিয়া সাধারণ নাগরিক অধিকার ভোগ করিয়া একটি সাধারণ লক্ষ্যের প্রতি পরিচালিত হইয়া নিজেরা নিজেদের উপর রাজত্ব করিতে পারিবে, এই শিক্ষা বোধ হয় জিন্না সাহেবের কোন দিনই হইবে না।

মিষ্টার ফ্রান্‌ক মোরেইস তাঁহার অধুনা-প্রকাশিত 'দি স্টরি অফ্‌ ইণ্ডিয়া' (Noble Publishing House, Bombay) নামক গ্রন্থে মিষ্টার জিন্নার পাকিস্থান পরিকল্পনা কতটা অর্থশূন্য এবং অযৌক্তিক তাহা উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন, তিনি বলেন—পাকিস্থান পরিকল্পনা দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমস্যা দূর হওয়া দূরে থাকুক, ইহা তাহাকে দ্বিধা করিবে। কারণ পরিকল্পনাটি হইতে যাহা প্রমাণিত হয়, তাহাতে মনে হয়, দেশের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত প্রায় সকল রাষ্ট্রের মধ্যেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থাকিবে। হিন্দুরা হিন্দু এলাকায় এবং মুসলমানেরা তাহাদের এলাকায় উঠিয়া আসার ইচ্ছার উপরই পরিকল্পনাটির সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য নির্ভর করিতেছে। মিঃ জিন্না জোরের সহিত এই পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন। সত্য সত্যই এক স্থানের অধিবাসীদিগকে আর এক স্থানে সমূলে স্থানান্তরিত করার কথা কল্পনা করাও কঠিন। কিন্তু যতক্ষণ না ইহা বাস্তবে পরিণত হয়, ততক্ষণ পাকিস্থানের কোন অর্থই হয় না। ভারতবর্ষে অধিবাসী স্থানান্তরিত করার সমস্যা অন্যান্য নানা সমস্যার সহিত জড়িত। একজন কোকনদ প্রদেশের মুসলমানকে পঞ্জাবে যদি স্থানান্তরিত করা হয়, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব লোপ পাইবে, কারণ সে না পাঞ্জাবী ভাষায় না উর্দ্দু ভাষায় কথা বলিতে পারিবে। তাহা ছাড়া, পঞ্জাবে জীবিকার্জ্জন করাও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। তেমনই একজন হিন্দুকে পঞ্জাব হইতে মহারাষ্ট্র প্রদেশে পাঠাইয়া দিলে তাহার অবস্থাও অনুরূপ শোচনীয় হইবে। হিন্দু ও মুসলমানগণ দুইটি পৃথক্ জাতি; গোড়া হইতেই এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হওয়ায় পাকিস্থানের জন্য জাতি-বিচ্ছেদ ও প্রদেশ বণ্টনের প্রসঙ্গ উঠিয়াছে। বাস্তবের প্রথম সংঘাতেই ইহার ভ্রান্ত কাল্পনিক গঠন ধরা পড়িয়া যায়।

—

বাংলা ও বাঙালীর উপর সর্ সি. ভি. রামনের আক্রোশ

কিছু দিন পূর্ব্বে মিঃ মদনগোপাল কোন এক পত্রিকায় সর্ সি. ভি. রামনের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। লেখকের মতে সর্ চন্দ্রশেখর বলেন যে তিনি বাঙালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতা কিছুই দেখিতে পান নাই এবং তিনি সত্যই বিশ্বাস করেন যে দেশের জাতীয়-জীবন গঠনে বাঙালীর কিছুমাত্র দান নাই। বৈজ্ঞানিক মহাশয় আরও বলিয়াছেন যে বাঙালীর শরীরে মঙ্গোলীয় জাতির রক্ত প্রবাহিত। সুতরাং বাংলা দেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মদেশের সহিত যোগ করিয়া দিলেই সব চেয়ে ভাল কাজ হইবে।

বম্বের 'দি ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্ম্মার' পত্রিকাখানি অত্যন্ত জোরালো ভাষায় লেখকের ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মহাশয়ের রুচির তীব্র নিন্দা করিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলেন যে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য যে সর্ সি. ভি. রামন ও লেখক তাঁহাদের এই জঘন্য নিন্দাবাদের জন্য ত্রুটি স্বীকার করার প্রয়োজনও মনে করেন নাই। মাদ্রাজের সুপরিচিত খ্রীষ্টিয়ান সাপ্তাহিক 'দি গার্ডিয়ান'

নিম্নলিখিত ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে সত্য কথা বলিতে কি এই সকল কটূক্তি অত্যন্ত হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। ইহা একজন বিশিষ্ট দক্ষিণ-ভারতীয়ের দ্বারা উচ্চারিত হওয়ায় তাঁহারা নিতান্ত ব্যথিত। ইহার প্রতিবাদ করিতে তাঁহারা 'ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার'-এর সহিত একমত। বিদ্যালয়ের সকল বালকই জানে যে বর্তমান ভারত গঠনে বাংলা দেশই অগ্রগামী হইয়াছে। কি শিক্ষায়, কি আধ্যাত্মিকতায়, রামমোহন রায় হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কত মহাপুরুষ না বাংলা দেশ হইতে তাহারা পাইয়াছে। যদি একজন পক্ষপাতহীন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে বর্তমান ভারত গঠন করিয়াছে কাহারা, সে নিঃসন্দেহে যত বাঙালীর নাম করিবে তত নাম সারা ভারতবর্ষেও মিলিবে না। 'দি গার্ডিয়ান' আরও বলেন,

রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে বাদ দিয়া আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ভারতের স্থান কোথায় থাকিবে? কে বলিবে যে, সুরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জনকে বাদ দিয়া ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা-ধারার উন্নতি হইয়াছে? বর্তমানে অরবিন্দকে বাদ দিয়া ভারতের কথা কি করিয়া ভাবিতে পারা যায়? নামের তালিকা অফুরন্ত। পূর্বেকার চেয়ে আজ তাঁহারা যে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছেন সে জন্য তাঁহারা বাংলা দেশের কাছে ঋণী। মিশ্রিত রক্তের কথা প্রসঙ্গে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন যে রক্ত বিশুদ্ধ কাহার? অপ্রিয় সত্য বলিতে গেলে দক্ষিণ-ভারতীয়দের রক্তে কি অষ্ট্রেলিয়াবাসী ও নিগ্রোদের রক্ত প্রবাহিত নয়? পৃথিবীতে অবিমিশ্রিত জাতি কোথাও নাই। কেবলমাত্র মধ্য-আফ্রিকার নিগ্রোরা জারজসন্তান নহে বলিয়া সকল প্রকার দুর্নাম অস্বীকার করিতে পারে। আশ্চর্য্য এই যে, কেমন করিয়া একজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক একটি প্রদেশের লোকের প্রতি এমন অবৈজ্ঞানিক ও অনুদারভাবে মন্তব্য করিতে পারেন, যিনি জীবনের মুল্যবান সময় তাহাদের সহিত একত্রে যাপন করিয়াছেন।

—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে মুসলমান ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শন

এই বৎসর গত ২৭শে নবেম্বর তারিখে পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এবং ২রা ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষ্যে বক্তৃতা করিবার জন্য সর্ মির্জা ইসমাইল আহূত হইয়াছিলেন। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অখণ্ড ভারতের একতার প্রয়োজনীয়তা এবং দ্বি-জাতি বিধানের অবাস্তবতা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি উক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উভয় স্থানের বক্তৃতাই চিন্তাপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ। দেশের শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত জনসাধারণ জাতিধর্মনির্বিশেষে সাগ্রহে উহা পাঠ করিবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রেরা সার মির্জা ইস-মাইলের পাটনার বক্তৃতায় অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। সেই হেতু তাহাদের বিক্ষোভ জানাইবার জন্য যে সকল ছাত্রের সমা-বর্তন উৎসবে উপাধি লইতে আসিবার কথা ছিল, তাহারা অনুপস্থিত ছিল, এবং কতিপয় মুসলমান ছাত্র পিকেটিং করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Executive Council-এর মুসলমান সদস্যদিগকে, শিক্ষকদিগকে, এবং ছাত্রাদগকে সমাবর্তন উৎসবে যোগদান করিতে বাধা দিয়াছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার খান বাহাদুর ডক্টর এম, হাসান এবং রেজিষ্ট্রার খানবাহাদুর নসিরুদ্দিন আমেদ বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মাত্র কয়েক জন মুসলমান এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম যে চ্যান্সেলার এই বিশেষ সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বাংলার লাট তাঁহার হঠাৎ অসুস্থতার জন্য দুঃখ প্রকাশ পূর্বক উপস্থিত হইতে পারিবেন না এই সংবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে পূর্বেই জানাইয়াছিলেন।

সমস্ত দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ছাত্রদের এই অশিষ্ট আচরণ কিরূপ গর্হিত ও নিন্দনীয় তাহা প্রতিবাদের ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সর্ মির্জা ইসমাইলকে সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া-ছিলেন। মুসলমান ছাত্ররা তাহাদের আচরণে আমন্ত্রিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও খ্যাতনামা মুসলমান অতিথির নিকট আতিথেয়তার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই, ইহা নিতান্তই দুঃখের কথা। নির্ভীক, সত্য ও স্বাধীন অভিমত ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিবার মত সামান্য সহিষ্ণুতা, সৌজন্য ও সদাচারের শিক্ষা যে ছাত্রেরা লাভ করে নাই ইহা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের বিষয়। এ বিষয়ে মুসলমান অভিভাবকগণ, শিক্ষকগণ, ও অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরণ আরও গভীর পরিতাপের বিষয়। ঘটনার অব্যবহিত পরেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য খান বাহাদুর সেখ মোহাম্মদ জান মুসলমান ছাত্রগণের নিন্দনীয় আচরণের যে প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সদ্‌বিবেচনা ও সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিচার করা নানা কারণে জটিল সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। এখন যুদ্ধের কেন্দ্র প্রধানতঃ চারিটি অঞ্চলে; প্রথম এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড যুদ্ধের ক্ষেত্র রুশ রাষ্ট্রে; দ্বিতীয়, উত্তর-আফ্রিকার দুই অঞ্চলে; তৃতীয়, চীনদেশে এবং চতুর্থ দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ। ইহার মধ্যে অক্ষশক্তির সর্ব্বগরিষ্ঠ যুদ্ধ উদ্যমের বলপরীক্ষা চলিয়াছে রুশ রাষ্ট্রের মধ্যে। উত্তর-আফ্রিকায় মার্কিন সেনার আবির্ভাবে এক অভিনব পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল। এখনও তাহার চরম পরিণতি কোন্ দিকে যাইবে তাহা দেখা যাইতেছে না। মিশরের যুদ্ধ এখন ৮০০ মাইল পশ্চিমে ট্রিপলিটানায় গিয়া চালফেরের তরল অবস্থায় রহিয়াছে। চীনদেশে যুদ্ধ চলিতেছে এইমাত্র সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছিতেছে, যদিও ইহা নিঃসন্দেহ যে জাপানের বর্ত্তমান স্থলযুদ্ধ-শক্তির তিন-চতুর্থাংশ এখনও চীনদেশেই প্রযোজিত আছে। সলোমন দ্বীপপুঞ্জের স্থলদেশে যাহা চলিতেছে তাহা নৌযুদ্ধের প্রতিধ্বনি মাত্র, মূলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর নৌবলের পরীক্ষার পালা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সমুদ্রের উপরে এবং আকাশে ঘাত-প্রতিঘাত চলিবে। নিউগিনিতে যাহা চলিতেছে তাহাকে মিত্রজাতি দলের প্রতি-আক্রমণের সূচনা মাত্র বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান কালের যুদ্ধের আয়তন বা শক্তি প্রয়োগের পরিমাণ বিচার করিলে নিউগিনির ব্যাপার খণ্ডযুদ্ধের সংজ্ঞায়ও পড়ে কিনা সন্দেহ। তবে মিত্রপক্ষ এখানে আক্রমণকারী, আক্রান্ত নহে, ইহাই প্রধান কথা।

যুদ্ধের পরিস্থিতি বিচারের মধ্যে সমস্যা আসিয়া পড়িতেছে সংবাদ-প্রমাদে। সংবাদ ঘোষণা -বিশেষতঃ বেতার-যোগে—এখন যুদ্ধের অস্ত্র-বিশেষ হইয়া পড়িয়াছে। বিপক্ষের দেশে এবং তাহার সহানুভূতিকারীদিগের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করা এবং নিজপক্ষকে উৎসাহিত রাখার জন্য অনেক সময় অনুকূল সংবাদগুলিকে অতিরঞ্জিত করা হয়। প্রতিকূল যাহা কিছু তাহা হয় গোপন করা হয়, নয়ত তাহার এরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যাহাতে তাহার প্রকাশে বিপক্ষের উৎসাহ বৃদ্ধি বা নিজপক্ষের নিরুৎসাহের সৃষ্টি না হয়। এক বৎসর পূর্ব্বে হাওয়াই দ্বীপের পার্ল হারবার আক্রমণে জাপানীগণ কতটা সফল হইয়াছিল তাহার পূর্ণ বিবৃতি সবেমাত্র মার্কিন সরকার প্রকাশ করিয়াছেন। মিশরে রোমেলের পরাজয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ অক্ষশক্তির অন্তর্গত দেশগুলিতে অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে এবং স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধের অভিনবতম অবস্থার সম্বন্ধে কোন বিশেষ বৃত্তান্ত সে দেশে প্রচারিত হয় নাই নিঃসন্দেহ। আবার চীনদেশের যুদ্ধের সংবাদ আমরা অতি অল্পই পাইতেছি, অথচ নিউগিনি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের অভাব নাই। শত শত যোজন বিস্তৃত রুশ যুদ্ধক্ষেত্রের বিবরণের পরিমাণ এবং কয়েক শত গজ মাত্র বিস্তৃত নিউগিনির গুনা অঞ্চলের বিবরণের পরিমাণ সংবাদপত্রের পংক্তিতে প্রায় সমান। সুতরাং যুদ্ধের পরিস্থিতি অন্য পথ দেখিয়া বিচার করিতে হইবে।

যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থার সাধারণ সংবাদ পাঠে দুই প্রকার ধারণার উদয় হয়। প্রথম কথা এই যে, সমস্ত দেশেই একটা যুদ্ধবিরতির অবস্থা আসিয়াছে এবং দ্বিতীয় ধারণা এই যে জলে স্থলে ও আকাশে এখন মিত্রজাতির ক্ষমতা অক্ষশক্তির সমকক্ষ। রুশদেশে, আফ্রিকায়, চীনে বা দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে কোথায়ও সেরূপ প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে না যেরূপ সামান্য কয় মাস পূর্ব্বেও চলিতেছিল। ব্রহ্মদেশে জাপানীদিগের সাড়াশব্দ নাই, কেবল মাত্র মাঝে মাঝে আকাশপথে সন্ধানী বা বোমারু এরোপ্লেনের চলাচল হয়। চীনে ও দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান এখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত বলিয়াই বিদিত, তাহার বিজয়-অভিযান ক্ষান্ত। আফ্রিকায় রোমেলের অধীনস্থ অক্ষশক্তি-সেনার অবস্থাও ঐরূপ, আট শত মাইল পিছু হটিবার পর তাহারা পুনরায় প্রায় সর্ব শেষের ঘাঁটিতে যাইয়া তাহার রক্ষার চেষ্টায় ব্যস্ত। অন্য দিকে টিউনিসিয়ায় আর একদল অক্ষশক্তিসেনা "কোণ" লইয়া লড়িতেছে, সেখানেও তাহাদের কোন ব্যাপক অভিযানের চিহ্ন দেখা যায় নাই। বরঞ্চ সেখানে মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনা ভূমধ্যসাগরের এক দিকের কূল নিষ্কণ্টক করিবার চেষ্টায় আছে যাহার ফলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের "দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্ত" বাস্তবের পর্য্যায়ে আসিতেও পারে। রুশ-রণক্ষেত্রে নাৎসী-চালিত অভিযান এখন ক্ষান্ত। আত্মরক্ষা ও বিপন্ন সৈন্যদলের উদ্ধারের চেষ্টাই সেখানের প্রধান ব্যাপার। সোভিয়েটের শীত-অভিযান গত বৎসরেরই মত জার্ম্মানদিগের যুদ্ধ-বিরতির সঙ্গে সঙ্গেই চালিত হইয়াছে। প্রথমের খবরে মনে হইয়াছিল এই শীত-অভিযানও গত বারের মতই প্রবল ভাবে চালিত হইবে, যদিও সোভিয়েট সেনানায়কগণ পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে জার্ম্মান সেনানায়কগণ গত বারের ভুলগুলি পুনর্বার করিবে এরূপ আশা করা বৃথা। এখন দেখা যাইতেছে যে, সোভিয়েট যুদ্ধবিশারদগণের ঐ ধারণাই ঠিক, অর্থাৎ এবার জার্ম্মান রণনায়কগণ শীতকালীন যুদ্ধবিরতির সময় সেনাদলের রক্ষণাবেক্ষণের রক্ষার ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত



দক্ষিণ-টিউনিসিয়ায় সৈন্য-চলাচলের রাস্তা। পথিমধ্যে ফরাসী ট্যাঙ্ক



টিউনিস শহরের একটি দৃশ্য



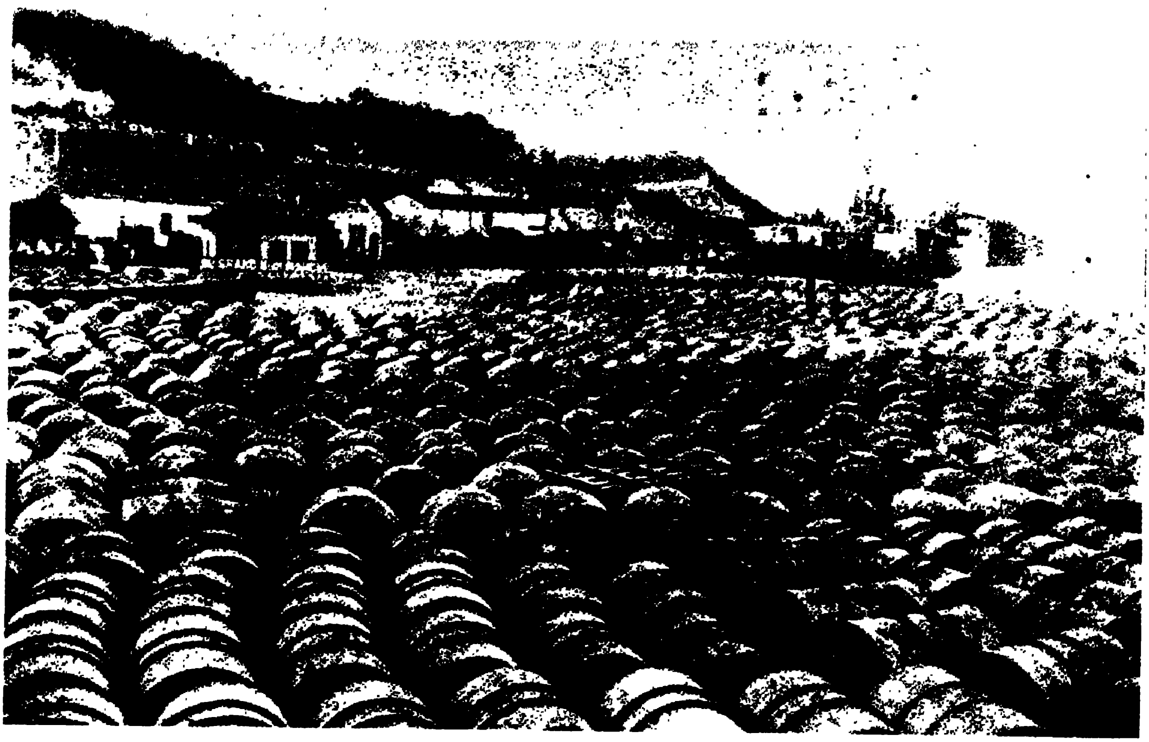
এলজার্স বন্দরের একটি দৃশ্য



সেনেগাল। ডাকার বন্দর



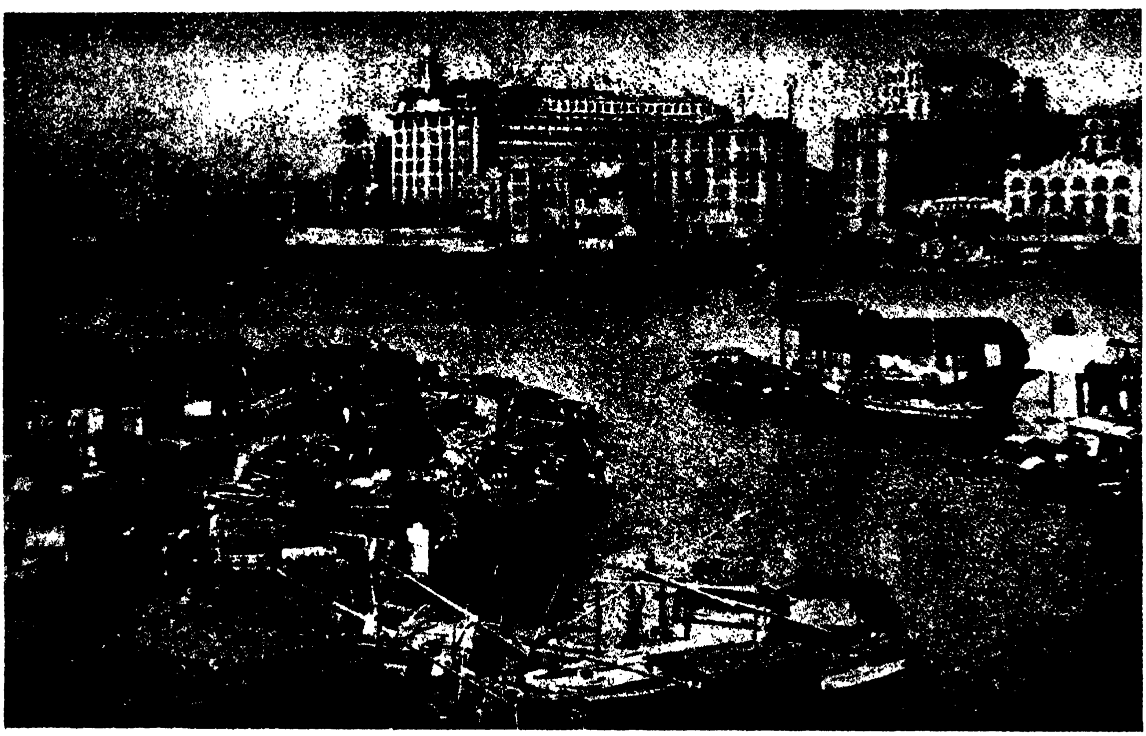
মরক্কো ঃ উয়েদ ন'ফিসা বাঁধের দৃশ্য



আলজিরিয়া। বোন বন্দরের দৃশ্য



উত্তর-চীনের একটি গ্রাম



ক্যাণ্টন বন্দরের একটি দৃশ্য

সুদৃঢ়ভাবেই করিয়াছে। সুতরাং ঐ অঞ্চলে স্থানে স্থানে খণ্ডযুদ্ধ ভিন্ন আর কিছুই চলিতেছে না।

জলে জাপানী, জার্ম্মান ও ইতালীয় নৌবহরের কোনও সাড়া-শব্দ নাই, এমন কি সাবমেরিন আক্রমণেরও কোনও বিশেষ সংবাদ আমরা পাইতেছি না, যদিও অল্প কিছু দিন পূর্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এক মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, সাবমেরিন আক্রমণ এখনও ব্যাপকভাবেই চলিয়াছে। আকাশেও অক্ষশক্তির বিমান-অভিযানের কোনও চিহ্ন নাই, মিত্রপক্ষের আক্রমণও এখন অল্প পরিসরের উপরই ন্যস্ত।

শক্তিসংগঠনের পর্য্যায়ে দেখা যাইতেছে যে প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌবহর এখন জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সচেষ্ট এবং সক্ষম। স্থলদেশে সলোমান দ্বীপপুঞ্জে মার্কিন দল এবং নিউগিনিতে জাপানী দল আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। চীনদেশে ও ব্রহ্মসীমান্তে উভয় পক্ষই অপেক্ষাকৃত স্থাণুভাব ধরিয়া আছে। আফ্রিকার অবস্থা ঝড়ের পূর্ব্বের অস্বাভাবিক স্থিরতা, তবে এখানে মিত্রদলেরই পাল্লা ভারী আছে। কেবলমাত্র রুশদেশের শীতদেবতা উভয় পক্ষকেই কাবু করিয়াছেন, নহিলে মনে হয় সর্ব্বত্র এখন অক্ষয়-শক্তির বিজয়সূর্য্য অস্তাচলের পথে। আধুনিক যুদ্ধের প্রথম পর্ব্ব অস্ত্রনির্ম্মাণাগারে চালিত হয়। এখন অক্ষশক্তি-পুঞ্জের অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণের পর্ব্বে কি ঘটিতেছে তাহা আমরা জানি না এবং জানিবার উপায়ও নাই। তবে গত বৎসরের যে সকল অঙ্কপাতি পাওয়া যায় তাহা দৃষ্টে মনে হয় যে এখন মিত্রপক্ষের শস্ত্রনির্ম্মাণের ক্ষমতা—বিশেষতঃ এরোপ্লেন ও প্যাঞ্জার শ্রেণীর যুদ্ধশকট হিসাবে—অক্ষশক্তিদল অপেক্ষা অনেক অধিক। এ পক্ষের অস্ত্রশস্ত্রও এখন বিপক্ষের অস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়াই ঘোষিত। সুতরাং অন্ততঃপক্ষে সে হিসাবেও এপক্ষ বিপক্ষের সমতুল্য।

এই সকল কথার বিচার করিলে মনে হয় যে এত দিনে অক্ষদলের বিরাট ও প্রচণ্ড শক্তির স্রোতে ভাটা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে এবং সে কারণেই এই থমথমে যুদ্ধবিরতির অবস্থা আসিয়াছে। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে কয়েকটি বিচার্য্য বিষয় আছে। প্রথমতঃ ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা যাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে তিনি এখনও কোন কারণ দেখিতে পাইতেছেন না যাহাতে বলা যায় যে এই যুদ্ধ দীর্ঘকালব্যাপী এবং অতি কঠোর হইবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ইহা সম্ভব যে ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ হইবার পরে এসিয়ার যুদ্ধ চলিবে। ইহা অসম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ মার্কিন দেশের যে সকল সংবাদ বেতারযোগে এদেশে আসে তাহাতে বুঝা যায় যে সে দেশের বিশেষজ্ঞদিগের মতে সে যুদ্ধের থাকিতে পারে

সূচনা মাত্র হইয়াছে যাহাতে অক্ষশক্তির এবং মিত্র পক্ষের মধ্যে বল পরীক্ষার শেষ নিষ্পত্তি হইবে। যদি অক্ষ-শক্তির ক্ষমতা এখন ধ্বংসের পথে তবে এরূপ সকল উক্তির সার্থকতা কি? অবশ্য ইহা সত্য যে "আমরা জিতিয়া যাইতেছি" এরূপ ভাবের উদয় হইলে মিত্রদলের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায়—বিশেষতঃ অস্ত্রনির্মাণে—বিরতির ভাব আসিতে পারে এবং তাহাতে মিত্রপক্ষের বিষম বিপদের কারণ ঘটিতে পারে। কিন্তু অন্য দিকেও নানা যুক্তি আছে যাহা নিরর্থক নহে।

অল্প কিছু কাল পূর্বে লর্ড হ্যালিফাক্স এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, এখনকার অবস্থার বিশদভাবে বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে সময় এখন আর মিত্র দলের সপক্ষে নহে। যুদ্ধের পূর্বেই পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিগুলি প্রধানতঃ দুই দলে বিভক্ত হয়। একদল বর্ত্তমান অক্ষশক্তি-পুঞ্জ, দ্বিতীয়টি বর্ত্তমান মিত্রজাতীয় দল। ইহাদের প্রথমটি "হ্যাভনট" অর্থাৎ সম্বিৎবিহীন, এবং দ্বিতীয়টি "হ্যাভ" অর্থাৎ সম্বিৎযুক্ত বলিয়া খ্যাত ছিল। এই তিন বৎসর যুদ্ধ চলিবার পরে প্রথম দল এখন "হ্যাভ" শ্রেণীতে আসিয়াছে—বিশেষতঃ জাপানের সেই অবস্থা—দ্বিতীয় দল এখন কিছু অংশে "হ্যাভ নট" যদিও তাহা হইলেও প্রায় অসীম সম্পত্তির অধিকারী। এখন প্রশ্ন এই যে এই যুদ্ধ বিরতির ভাব বেশী দিন চলিলে কোন পক্ষের সুবিধা বেশী।

যুদ্ধের পূর্বে জাপানে প্রায় সকল প্রকার কাঁচা মালের বিশেষ অভাব ছিল। অভাব ছিল না কেবল মাত্র কঠোর পরিশ্রমী শিক্ষিত কারিগরের। বিগত এক বৎসরের অভিযানের ফলে যে সকল দেশ জাপানের করায়ত্ত হইয়াছে সে সকল দেশের খনিতে ও কৃষিক্ষেত্রে জাপানের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল কিছুই পাওয়া যায়। অভাব কেবল মাত্র সে-সকল কাঁচা মাল লইয়া যাইবার ব্যবস্থায় এবং সেগুলিকে সুসংস্কৃত করিয়া যুদ্ধ-উপাদানে পরিণত করার মত শিল্পকেন্দ্রের বিস্তারে। জাপান নিশ্চেষ্ট নাই ইহা নিঃসন্দেহ, সুতরাং সময় পাইলে জাপানের শক্তি বৃদ্ধি হইবেই। বোধ হয় এই কারণেই ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর এসিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কের ঐরূপ উক্তি। অক্ষশক্তির ইয়োরোপীয় অংশীদারদিগের অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। কেবল মাত্র একটি দারুণ সমস্যার কোনও সমাধান হয় নাই, সেটি খনিজ তৈল সম্পর্কে। ফ্রান্স হইতে ১৫০,০০০ শিক্ষিত কারিগর জার্মানিতে লইয়া যাওয়ার চেষ্টায় মনে হয় অস্ত্রশস্ত্রনির্মাণ-কেন্দ্রের বিস্তারের ক্ষেত্রের শেষ পরিণতি এখনও সেখানে ঘটে নাই। সুতরাং বর্ত্তমান যুদ্ধ-বিরতিই অক্ষশক্তির ধ্বংসের আরম্ভ, এযুক্তি অকাট্য বলিয়া এখন বলা যায় না।

পুস্তক পরিচয়

সুকবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্ এ, পিএইচ-ডি সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৭১৮ শকাব্দে লিখিত একখানি পুঁথি অবলম্বনে নারায়ণদেবের পদ্মপুরাণের এক সংক্ষিপ্ত রূপ আলোচ্য গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়ের ধারণা—এই পুঁথি নারায়ণদেবের 'মূল পুঁথি অনুযায়ী লিখিত।' পুঁথিখানির আদ্যন্ত খণ্ডিত। খণ্ডিত অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি পুঁথি হইতে অংশতঃ পূরণ করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি হইতে মাঝে মাঝে যদৃচ্ছাক্রমে কিছু কিছু পাঠান্তর প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে পাঠান্তর নির্দ্দেশের জন্য বিশেষ করিয়া এই পুঁথিখানিকে বাছিয়া লইবার কোনও কারণ সম্পাদক মহাশয় নির্দেশ করেন নাই। অবলম্বিত পুঁথি বিশেষ প্রাচীন ও তেমন মূল্যবান্ না হইলেও ইহাতে ব্যবহৃত শব্দের বানানের অনিয়ম গ্রন্থমধ্যে সর্বত্র অব্যাহতভাবে রক্ষিত হইয়াছে—প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনের প্রচলিত নিয়মানুসারে তৎসম শব্দের লিপিকরকৃত বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করা হয় নাই। ফলে অনেক স্থলে অর্থ গ্রহণ করা দুঃসাধ্য—অবাধে পড়িয়া যাওয়াও কষ্টকর। কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দের অর্থ পাদটীকায় ও গ্রন্থশেষে সন্নিবেশিত 'শব্দকোষে' নিরূপিত হইয়াছে। এ বিষয়েও কোনও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসৃত হয় নাই। মূল গ্রন্থের প্রাচীনতা প্রতিপাদনের একান্ত আগ্রহ ভূমিকায় প্রকটিত হইয়াছে। সকল দিক্ দিয়া বিচার করিলে মনে হয়, প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন বিষয়ে যে বৈজ্ঞানিক নিয়ম বর্তমানে পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃত, এই গ্রন্থে তাহার মর্যাদা সংরক্ষিত হয় নাই।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অনুবর্ত্তন—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৸০ আনা।

সামান্য বিষয়বস্তু লইয়া দক্ষ কথাশিল্পী অপূর্ব্ব রস-সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন, আলোচ্য উপন্যাসখানি তাহার প্রমাণ। কলিকাতার পিটার লেনের একটি বিদ্যালয়; ইহার সঙ্কীর্ণ পরিধিতে যদু বাবু, নারায়ণ বাবু, ক্ষেত্র বাবু, জ্যোতিবিনোদ প্রভৃতি শিক্ষকবৃন্দ—হেডমাষ্টার ক্লার্কওয়েল সাহেবের কড়া নিয়মকানুনের মধ্যে কর্ত্তব্যে, স্বার্থে, স্নেহে, লোভে, দুর্ব্বলতায় বিকাশ লাভ করিতেছেন। ইঁহাদের হাতে জ্ঞানের বর্ত্তিকা—অথচ আলোর নীচের বিস্তৃত ছায়ায় কখন আসিয়া ইঁহারা কখন নিঃশব্দে মিলাইয়া যাইতেছেন! ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হইলেও—সকলকে লইয়া এক অখণ্ড কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। কাহিনীর মূলে নিহিত বহুযুগসঞ্চিত গ্লানি ও সমস্যার রূপটি ব্যাপকভাবে উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পরিস্ফুট। তাহার মধ্যে বোমা-আতঙ্কগ্রস্ত মৃত্যুভীত অসহায় জীবনের চিত্রটি বর্তমানকাল পর্য্যন্ত দক্ষতার সহিত টানিয়া আনিয়া লেখক কাহিনীকে সরস ও উপভোগ্য করিয়াছেন। যদু বাবুর দুর্দ্দশা ও চুনিকে আশ্রয় করিয়া নারায়ণ বাবুর জীবনের নিঃসঙ্গতা অন্তর স্পর্শ করে; তারাজোল গ্রামের মাঠের ছবিতে বিভূতিবাবুর দৃষ্টি চমৎকারিত্ব লাভ করিয়াছে। শুধু কল্পনা নহে, কঠোর অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাব্রতী ও তাঁহাদের সামাবদ্ধ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে লেখক নিপুণ ভাবেই যাচাই করিয়াছেন। সূক্ষ্ম শিল্পদৃষ্টি ও দরদ 'অনুবর্ত্তন'কে সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত করিয়াছে—একথা অসঙ্কোচে বলা যায়।

ধ্যানের ছবি—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং। ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—দু' টাকা।

অত্যন্ত কাঁচা লেখা। প্রকাশভঙ্গী বা কাহিনী-সৃষ্টির দিক দিয়া কোথাও আশাপ্রদ কিছু চোখে পড়ে না।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

নাচ গান হল্লা—'মৌমাছি'-সম্পাদিত। মধুচক্র, ১।১, গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানিকে শিশু-বার্ষিকী পর্য্যায়ে হয়ত ফেলা চলিবে না, তবে শিশুবার্ষিকীর মতই ইহাতে বিভিন্ন দক্ষ রেখা ও লেখ শিল্পীর বিচিত্র অবদান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রচলিত বার্ষিকীগুলির তুলনায় ইহার বৈশিষ্ট্য বেশী করিয়া চোখে পড়ে। 'নাচ গান হল্লা' নামেই ইহার বিশিষ্টতার পরিচয়। সাজঘর, হল্লা হাসি, আবৃত্তি, নাচের আসর, গানের আসর, স্বর লিপি, যাদুখেলা, নাটমঞ্চ—এই কয়টি অধ্যায়ে অহীন্দ্র চৌধুরী, সুনির্ম্মল বসু, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, অখিল নিয়োগী, যাদুকর পি. সি. সরকার, নরেন্দ্র দেব, দিলীপকুমার রায় প্রভৃতি নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে মৌলিক রচনা ও আলোচনা পরিবেশন করিয়াছেন। এই নূতন ধরণের সঙ্কলন পুস্তকখানি কিশোর-কিশোরীদের নানা ভাবে আনন্দ দিতে পারিবে আশা করি।

শিল্প সম্পদ বার্ষিকী ১৩৪৯-৫০—শ্রীকমলচন্দ্র নাগ সম্পাদিত। শিল্প সম্পদ প্রকাশনী, ১৫।১সি নীরদবিহারী মল্লিক রোড, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

বাংলার শিল্প-সম্পদ সম্বন্ধে একখানি বার্ষিকীর বড়ই অভাব ছিল। ইহা দ্বারা তাহা কতক অংশে পূরণ হইবে। বাংলার কৃষি, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, এতদ্বিষয়ক আইনকানুন, বাংলার শস্যসম্পদের আবাদ ও উৎপাদন, ব্যবসা-শিক্ষা ও পড়িবার মত শিল্প-সংক্রান্ত পুস্তক-পত্রিকার তালিকা প্রভৃতি বাঙালী ব্যবসায়ীদের এবং সাধারণ বাঙালীরও কাজে লাগিবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

নালন্দা প্রেস (২০৪, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত **১৯৪২ নালন্দা ইয়ার বুক**, এবং বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন (সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী, ইউনিভার্সিটি, কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত **বেঙ্গল লাইব্রেরী ডিরেক্টরী** বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। ইহাদের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

ব.

পশারিণী—মাহমুদা খাতুন ছিদ্দিকা। পাবনা। মূল্য এক টাকা।

কবিতার বই, রচনাভঙ্গী রাবীন্দ্রিক, ভাষায় ও ছন্দে মাধুর্য আছে।

ভানুমতীর মাঠ—অশোকবিজয় রাহা। ওপারেতে কালো রং—সুধীরচন্দ্র কর। ২২শে শ্রাবণ—বুদ্ধদেব বসু। —কবিতা ভবন। ২০২, রাস- বিহারী এভেনিউ। কলিকাতা।

তিনখানিই 'এক পয়সায় একটি' সংস্করণের কবিতার বই। প্রত্যেক বইয়ে ষোল পৃষ্ঠা, দাম চার আনা।

'ভানুমতীর মাঠে' কবির চিত্রণ-নিপুণ ভাষা কয়েকখানি ছোট ছোট উপভোগ্য ছবি আঁকিয়াছে।

'ওপারেতে কালো রং'-এ আছে প্রকৃতি ও প্রেম সম্বন্ধীয় কয়েকটি সুখপাঠ্য কবিতা।

'২২শে শ্রাবণ' ভাবগাঢ় ভাষায় রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-তর্পণ। অন্য বিষয়ক কবিতাও কয়েকটি আছে।

বসুন্ধরা—চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। কবিতা ভবন। ২০২, রাসবিহারী এভেনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। দাম বারো আনা।

সমাজ-জীবনের ঘনায়মান অন্ধকার আধুনিক কাব্যের একাংশে অদ্ভুত কালো ছায়া ফেলেছে। পূর্ব যুগের সোনালি স্বপ্ন প্রায় নিঃশেষ। ভাষার সহজ রূপ, চিত্তের সহজ স্ফুরণ বিরল হয়ে এলো; আলোচ্য কাব্যে ভাষার দৃঢ় ভঙ্গী মাঝে মাঝে মুগ্ধ করে, আবার অস্পষ্টতার কুয়াশা দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। নবযুগের ভাব-কল্পনা, নৈরাশ্য-অবসাদ কাব্যে রূপ নি'ক, তাতে কারও আপত্তি করবার কথা নয়, কিন্তু ভাষা তার ঋজুতা হারাবে কেন? বিশেষ ক'রে 'কাসাণ্ড্রা' এবং পরবর্তী কয়েকটি কবিতা দুর্বোধ্য মনে হ'ল।

স্নায়ু—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। কবিতা ভবন; ২০২, রাস-বিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ। মূল্য এক টাকা।

অতিআধুনিক কবিতার বই। 'অতি-আধুনিক' নামে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা নিজেদের একগোষ্ঠীভুক্ত মনে করলেও সকলে এক পথের পথিক ন'ন। ভাষা ও ভাবের রাজ্যে তাঁরা অনেকেই বিদ্রোহী। তাঁদের লেখার কয়েকটি লক্ষণ লক্ষ্য করেছি: (১) রচনা সুস্পষ্ট নয়, সাঙ্কেতিক। অনেক সময়ে অর্থোদ্ধার করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে অসম্ভব। (২) দেশবিদেশের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ব্যাপারের অপ্রত্যাশিত উল্লেখ। (৩) রঙের এবং বিশেষ্য বিশেষণের নির্ব্বিচার ব্যবহার; যথা: এ গ্রন্থে:—নীল বিদ্যুৎ, সবুজ চোখ, সবুজ মানুষ, সবুজ মৃত্যু, "সবুজ হৃদয় তরল বরফ গলা" ইত্যাদি। (৪) বাস্তবতার নিশান ওড়ালেও মনে প্রাণে এঁরা রোমান্টিক। বর্ত্তমান কাব্যে দু-একটি ছত্র মনে আশার সঞ্চার করে। ভালো লাগে পড়তে: "জনসমুদ্রে না মিলিলে উদ্দেশ, হৃদয়বাষ্পে বাঁধি স্বর্গের সেতু," কিংবা "নাগরিক-দিন চিরদিন ভালোবাসি," অথবা "নীল উর্মির ফেনায় ধূসর বন্যা, আদিম সাগরে যুদ্ধজাহাজ দেখি;" কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, বেশী দূর এগোতে পারি না, ধোঁয়ায় সব আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অবচেতন মনের সন্ধান তো রাখি না, কি ক'রে বুঝব ঐ সাঙ্কেতিক ভাষা? দুঃখ হয় কবিকল্পনার রুগ্নতা দেখে—যখন তিনি বলেন: "সিনেমা-ঘন স্বপ্ন নিয়ে হেসো, রুগ্ন ঠোঁটে হাসির রেখা টানি।" কবিপ্রিয়া হাসলেও আমরা হাসতে পারি না।

ওমর খৈয়াম—সুজাতা দেবী। প্রকাশক: শ্রীসুধীরকুমার হাজরা, ৬।১৪ একডালিয়া রোড, বালিগঞ্জ। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

স্বর্গীয়া লেখিকার স্মৃতিচিহ্নরূপে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার এই শেষ রচনাটি প্রকাশ করিয়াছেন। ওমর খৈয়ামের আরও কয়েকটি অনুবাদ ইতিপূর্ব্বে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও আর একখানি অনুবাদ ওমর খৈয়ামের লোকপ্রিয়তা সপ্রমাণ করে। বর্ত্তমান গ্রন্থের ভাষা অনেক স্থলে দুর্ব্বল।

স্বপ্নলেখা—এ. এইচ. এম. বসির উদ্দিন, বি-এ। ঢাকা, কাজির পাগলা, কুতুবিয়া লাইব্রেরী। মূল্য ১৲।

কবিতার বই। কবির স্বপ্ন অস্ফুট; পরিচ্ছন্ন ভাষামূর্ত্তি গ্রহণ করে নাই। কিন্তু দেখিয়া আনন্দ হইল, গ্রন্থকার খাঁটি বাঙালী, তাঁহার ভাষা অকৃত্রিম বাংলা।

সাহারা মরুর কন্যা—শ্রীদেবেন্দ্র পাল। চপলা বুক ষ্টল, শিলঙ। দাম দশ আনা।

কবিতার বই। সম্ভবতঃ কবি নিজের মনকে সাহারা মরুর সহিত তুলনা করিয়াছেন; এ কাব্য তাঁহার মানসী কন্যা। কিন্তু পড়িয়া তাঁহার হৃদয় সরস বলিয়াই ত মনে হইল। কবিতাগুলিতে বাংলার পল্লী-প্রাঙ্গণের স্নিগ্ধ মাধুর্য্য অনুভব করিলাম এবং গৃহদীপের কল্যাণদীপ্তি দেখিলাম।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নারদ-পরিব্রাজকোপনিষৎ—শ্রীপবিত্রানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত। কাশী-যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹

এই উপনিষৎখানি অথর্ব্ববেদান্তর্গত একত্রিংশ উপনিষদের একটি। এই উপনিষদে প্রকৃত সন্ন্যাস ও পারিব্রাজ্য ধর্ম্ম কি, তাহা বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভ্রমণকারী মাত্রই পরিব্রাজক নয়। প্রকৃত পরিব্রাজক কে, তাহার উল্লেখ এই উপনিষদে ও গরুড় পুরাণে (২০৫।২০-২২) আছে। পরিব্রাজককে সদাচারী হইতে হইবে, তাঁহার স্বধর্ম্মে মতি থাকা চাই। আচারহীনতাই ভারতের দুর্গতির কারণ। ব্রহ্মজ্ঞানই উপনিষৎ শাস্ত্রের রহস্য অর্থাৎ নিগূঢ় তাৎপর্য্য। গ্রন্থকার তাঁহার মাধুকরী ব্যাখ্যার দ্বারা এই সকল বিষয় বেশ সরলভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তকের শেষে, বজ্রসূচীকোপনিষৎ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ পরিশিষ্টরূপে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

পাকিস্থানের বিচার—মৌলবী রেজাউল করীম, এম-এ, বি-এল। প্রকাশক—বুক কোম্পানী লিমিটেড কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৪২, মূল্য ১৲।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের রাষ্ট্রীয় আলোচনার ক্ষেত্রে 'পাকিস্থান' লইয়া যত গণ্ডগোল হইয়াছে এত বোধ হয় আর কিছুতেই হয় নাই। অথচ এই 'সোনার পাথর-বাটী' যে কত অবাস্তব তাহা কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় না। রেজাউল করীম সাহেব তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় পাকিস্থানের পাঁচটা খসড়া, যথা—(১) পঞ্জাবী ভদ্রলোকের কন্‌ফিডারেসী স্কীম, (২) আলিগড় অধ্যাপকদ্বয়ের স্কীম, (৩) হায়দ্রাবাদের ডাঃ লতিফের স্কীম, (৪) সার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁর স্কীম এবং (৫) মুসলীম লিগের স্কীম আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহাদের সবগুলিই অবাস্তব এবং ভাববিলাসীদের রচনা মাত্র। ইহার যে কোনটি কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে তাহাতে মুসলমানের এবং ভারতবর্ষের মঙ্গল না হইয়া ক্ষতিই হইবে। ইতিহাস সংস্কৃতি এবং সংহতির দিক দিয়া ভারতবর্ষ এক এবং অখণ্ড, এবং ভারতবাসী এক মহাজাতি মাত্র। লেখক দেখাইয়াছেন যে, পাকিস্থান-আন্দোলনের পশ্চাতে রহিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসকগণের উৎসাহদান ও ইঙ্গিত; ইহা কয়েক জন স্বার্থান্বেষী রাজনীতিক ব্যতীত কোন সম্প্রদায় বা দেশের মঙ্গলের জন্য প্রচারিত হয় নাই। আর অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানও যে ইহার স্বপক্ষে নহে, ১৯৪১ সনের ৩০শে এপ্রিলের আজাদ্ মুসলিম দলের ঘোষণা তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পাকিস্থান সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন এবং বুঝিতে পারিবেন যে এই দেশের মঙ্গল সকল ধর্ম্ম ও সকল ভাষাভাষীর একতাবন্ধনে এবং দেশের অখণ্ডতা-রক্ষায়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

প্রেম-রেখা—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ডি-এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৸৹।

আলোচ্য গ্রন্থে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় আছে, যথা—বিপিনকৃষ্ণ বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমে প্রেমের রূপ, দেশের ডাক, ডিরোজিও এবং অজ্ঞাত জননায়ক। মনস্বী বিপিনকৃষ্ণের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য বস্তু পাওয়া গেল, তবে শরৎচন্দ্র এবং বঙ্কিমে প্রেমের রূপ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার মামুলী কথাই শুনাইয়াছেন। "দেশের ডাক" লেখকের জীবনস্মৃতি এবং তাহা উপভোগ্য হইয়াছে। ডিরোজিও খণ্ডকাব্যে সেকালের শিক্ষা ও সমাজ সম্বন্ধে যে-সব তথ্যের অবতারণা করা হইয়াছে, সেগুলির সহিত ইতিপূর্ব্বে আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছে। অজ্ঞাত জননায়ক গল্পটি চলন-সই রচনা হইলেও মন্দ লাগিল না। গ্রন্থকারের ভাষা মার্জ্জিত এবং মনোভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও আছে। গ্রন্থখানি পাঠক-সমাজে একেবারে অনাদৃত হইবে না, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

ঝলসে দিগন্তর—অমূল্যরতন ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—কমলকৃষ্ণ মুখার্জ্জি, এম-এ, ৭১বি, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে সতেরটি কবিতার মধ্যে সাতটির চরণগুলি মিত্রাক্ষরের মায়াজাল মুক্ত হইয়াছে। প্রকাশভঙ্গিমায় ও শব্দচয়নে স্থানে স্থানে কিছু ত্রুটি আছে। মাঝে মাঝে এমন পদও আছে যাহা পড়িতে ভাল লাগে না। এক স্থানে লেখক আকাশে অকাল মেঘ দেখিয়া বলিতেছেন—'চারিদিকে অবিরল, চলে জনতার জল।' কয়েকটি কবিতা মন্দ লাগিল না, যেমন—'ভুলের ফসল', 'অকারণ', 'সুজাতা', 'নিদর্শনী'।

আধুনিকা—শ্রীবারীন্দ্রকুমার বিশ্বাস। গ্রন্থকারের প্রতিকৃতি প্রচ্ছদপটের উপর দেখা গেল।

ষোলটি কবিতা একত্র করিয়া 'আধুনিকা'র সৃষ্টি হইয়াছে। স্থানে স্থানে লিরিক সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে, পড়িতে মন্দ লাগে না।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সাঁঝের ছায়া—শ্রীঅজিতকুমার সেন, এম-এ। প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৪।১, টাউওসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

সুন্দর ছন্দে রচিত এই কবিতা-পুস্তকটি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। আধুনিকতার উগ্র দীপ্তি নাই, শান্ত সুন্দর জ্যোৎস্নাধারার মত কবিতাগুলি মনের উপর স্নিগ্ধ পরশ বুলাইয়া যায়। কবিতাগুলি প্রেমের এবং সর্ব্বত্র কবির মানসী কোন-না-কোন রূপে তাঁহার মনোমুকুরে কাব্য-মাধুরিমা জাগাইয়া তুলিয়াছেন। কবি তাঁর মানসীকে নানা রূপে নানা ভঙ্গিমায় চিত্রিত করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার আঁকা শেষ হয় নাই—তাই ভূমিকায় বলিয়াছেন,—

"সব কাব্য-প্রচেষ্টার মূলে অসীম যে প্রকাশবেদনাটি রহিয়া গিয়াছে

—শুধু তারই প্রেরণায় এই কবিতা কটি পাঠকসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছি—"

কাব্যানুভূতির হৃদয় তাঁহার আছে এবং প্রকাশ করিবার যে প্রয়াস তিনি করিয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ। প্রথম কবিতাতেই তিনি কবিতা-দেবীর আবির্ভাবের আভাস পাইতেছেন :—

"সে এলো আজ অলখ পথে, সঙ্গোপনে অতি
ত্রস্ত ভীরু প্রথম প্রেমের মত,
তেমনিতর চমক-মাখা থমকে থাকা গতি,—
দ্বিধার ভারে তেমনি তনু নত।"

এইরূপে কবিতা-দেবীর আগমনীর আভাস জাগিয়াছে কবির অন্তরে। তথাপি প্রকাশ বেদনায়—

"বুকে মোর ঘুরে মরে নির্ব্বাক ক্রন্দন,—
বিফল সে প্রেরণার বেদন-স্পন্দন।"

তবুও কবি আঁকিয়া চলিয়াছেন :—

"ধরণী রাঙ্গিয়া উঠে কি বিচিত্র রাগে
মোর ছন্দে গানে শুধু তারি বাণী জাগে।"

বইখানির ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার। দুঃখের বিষয় মুদ্রাকর-প্রমাদ তো ঘটিয়াছেই—কয়েকটি স্থানে শব্দের—যেমন পড়বে স্থলে "পরবে" পড়েছে স্থলে "পরেছে" প্রভৃতি ভুল ঘটিয়াছে। এই সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও "সাঁঝের ছায়া" পড়িতে বসিয়া মনের মধ্যে সাঁঝের ছায়ার রসঘন আবেশ ঘনাইয়া উঠে।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

রজনীগন্ধা—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ ১৪২, মূল্য দেড় টাকা।

গ্রন্থটিতে সাতটি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ভাবে ছায়াচিত্রের জন্য লিখিত এবং রজনীগন্ধা নামক গল্পটি কঙ্কন নামে হিন্দী ছায়াচিত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গল্পলেখায় গজেন্দ্র বাবুর খ্যাতি আছে; এই গ্রন্থটির গল্পগুলিতেও পাত্র-পাত্রীর হৃদয়াবেগের মধ্য দিয়া অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গল্পগুলির ইহাই প্রধান আকর্ষণ এবং সেই কারণে সুখপাঠ্য হইয়াছে।

সাতডিঙা—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ ১৭০; মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীরাধাকিঙ্কর রায় চৌধুরী লিখিত সাতটি গল্প লইয়া এই গ্রন্থটির সৃষ্টি হইয়াছে। লেখকেরা বাংলা সাহিত্যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন; কিন্তু সকল গল্পেই সকলের পূর্ব্বখ্যাতি বজায় রহে নাই।

শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গীয় শব্দকোষ—পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শান্তিনিকেতন, প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

এই বৃহৎ অভিধানখানির ৯০তম খণ্ড শেষ হইয়াছে। ইহার শেষ শব্দ "সপ্তা", শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২৮৭৪। ড.

মহিলা-সংবাদ

মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত দ্রুগ প্রবাসী প্রবীণ আইনজীবী রায়সাহেব নলিনীকান্ত চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী আশা দেবী বাড়ীতে পড়িয়া চিত্রবিদ্যা ও চারুকলা বিভাগে এই বৎসর



শ্রীমতী আশা দেবী

সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত ছবি ও রচনা বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।



শ্রীমতী সন্ধ্যা সরকার

ঢাকানিবাসী অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রমোহন সরকার মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সন্ধ্যা সরকার এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-টি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সমস্ত পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১০০৲ পুরস্কার ও সুবর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। ইনি ১৯২৫ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম হইয়া মিসেস্ ইংলিস্ পুরস্কার ও ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। আই, এ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ২০৲ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৯ সনে কৃতিত্বের সহিত বি-এ উপাধি লাভ করিবার অব্যবহিত পর হইতেই ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী সরকারী বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

দেশ-বিদেশের কথা

বাঁকুড়াস্থ মেদিনীপুর বন্যা-সাহায্য সমিতি

বাঁকুড়াস্থ মেদিনীপুর বন্যা-সাহায্য সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী জানাইতেছেন—

মেদিনীপুর জেলার বন্যাবিধ্বস্ত জনগণের চিকিৎসার জন্য বাঁকুড়াতে একটি বন্যা সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। সহরের অনেক সরকারী ও বে-সরকারী ভদ্রমহোদয়গণ এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত আছেন। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুলের ডাক্তারগণ ও ছাত্রবৃন্দের মধ্য হইতে তিনটি দল তমলুক, কাঁথী ও মহিষাদলে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহাদের কার্য্য বিশেষ সন্তোষজনক বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা আমাশয়, টাইফয়েড ইত্যাদির প্রতিষেধক চিকিৎসা করা ছাড়া বহুসংখ্যক ঐ সকল রোগাক্রান্ত লোকেরও চিকিৎসা করিতেছেন। কাপড় ও পথ্যের বিশেষ অভাব। সমিতি আজ পর্য্যন্ত ১৭৫০৲ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন এবং ইহার মধ্যে ৫০০৲ টাকা আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড বন্যা সাহায্য তহবিল হইতে পাওয়া গিয়াছে, এ জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। সমিতির অর্থ হইতে চিকিৎসা খরচ ছাড়া বস্ত্র ও পথ্যের জন্যও কিছু খরচ করা হইয়াছে; কিন্তু তহবিলের স্বল্পতায় এই কার্য্য প্রয়োজন অনুসারে অগ্রসর হইতে পারে নাই। পুরাতন কাপড় সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। বাঁকুড়ার সাহায্যকারিগণ এবং মেডিক্যাল স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতার জন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় দেওঘরে তাঁহার পিতামহ শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে সম্প্রতি নৃত্য-বিদ্যা দেখাইয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার কতিপয় নৃত্যের মধ্যে রাধা ও অর্জ্জুন' নৃত্য সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

পরলোকে রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া

বিগত ৭ই আশ্বিন আসাম-গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী, অমায়িক সঙ্গীতজ্ঞ এবং উচ্চশ্রেণীর শিকারী ছিলেন। শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে তাঁহার উৎসাহ অতুলনীয় ছিল। তাঁহার পিতার স্থাপিত মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়টিকে তিনি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করেন। তিনি ধুবড়ীতে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানচর্চ্চার অভিপ্রায়ে কটন লাইব্রেরী স্থাপিত করেন এবং

গৌরীপুরস্থ সংস্কৃত চতুষ্পাঠির অশেষ উন্নতি সাধন করেন। তিনি বিদেশ হইতে উচ্চাঙ্গের কৃষিবিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়া আসিবার জন্য কয়েক জন ভদ্রসন্তানকে যথেষ্ট বৃত্তিও দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার এষ্টেটের মোক্তাব, মাদ্রাসা, বালিকা মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়, উচ্চ-প্রাথমিক, নিম্নপ্রাথমিক প্রভৃতি বিদ্যালয়গুলিকে মাসিক সাহায্য দিতেন। নিজে এষ্টেটের গরীব প্রজাবৃন্দের সন্তানগণের শিক্ষোন্নতি কল্পে "গৌরীপুর শিক্ষা সমিতি" নামে একটি প্রতিষ্ঠান তাঁহার উদ্যোগেই স্থাপিত হইয়াছে। তিনি বিশ্বভারতী ও বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির আজীবন সদস্য ছিলেন।

জনহিতকর কার্য্যেও তাঁহার দান যথেষ্ট ছিল। তাঁহার জননী কর্তৃক স্থাপিত বেনারস রাঙ্গামাটী সত্রে তিনি চব্বিশটি বিদ্যার্থীর আহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সত্রের যাবতীয় ব্যয়ই তিনি নির্ব্বাহ করিতেন। গৌরীপুরের 'রাণী ভবানীপ্রিয়া' নামক দাতব্য চিকিৎসালয়টির যাবতীয় ব্যয়ও তিনি বহন করিয়া আসিতেছিলেন এবং আরও অনেক চিকিৎসালয়ের মাসিক সাহায্যের বিধান করিয়াছিলেন। স্বনামধন্য স্বর্গীয় মাণিকরাম বড়ুয়ার সহযোগে তিনি আসাম এসোসিয়েশন স্থাপন করেন এবং উক্ত এসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে উহার সভাপতিত্ব করেন।



শ্রীমান্ শুকদেব বসু (৪ বৎসর বয়সের ছবি)

পাটগ্রাম অনাথবন্ধু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

ঢাকা জেলার লেছরাগঞ্জ পোষ্ট আপিসের এলাকাধীন পাটগ্রাম অনাথবন্ধু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের গৃহটি গত ২৪শে অক্টোবর আগুন লাগিয়া ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। এই বিদ্যালয়টি পঁচিশ বৎসর যাবৎ নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের ছেলেদের শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিয়া আসিতেছে। ইহার কর্তৃপক্ষ, পৃষ্ঠপোষকগণ ও স্থানীয় বহু গণমান্য ব্যক্তি বিদ্যালয়-ভবনটি পুনর্নির্ম্মাণের জন্য সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্যের আবেদন করিয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহারা শীঘ্রই আশানুরূপ অর্থ লাভে সমর্থ হইবেন।

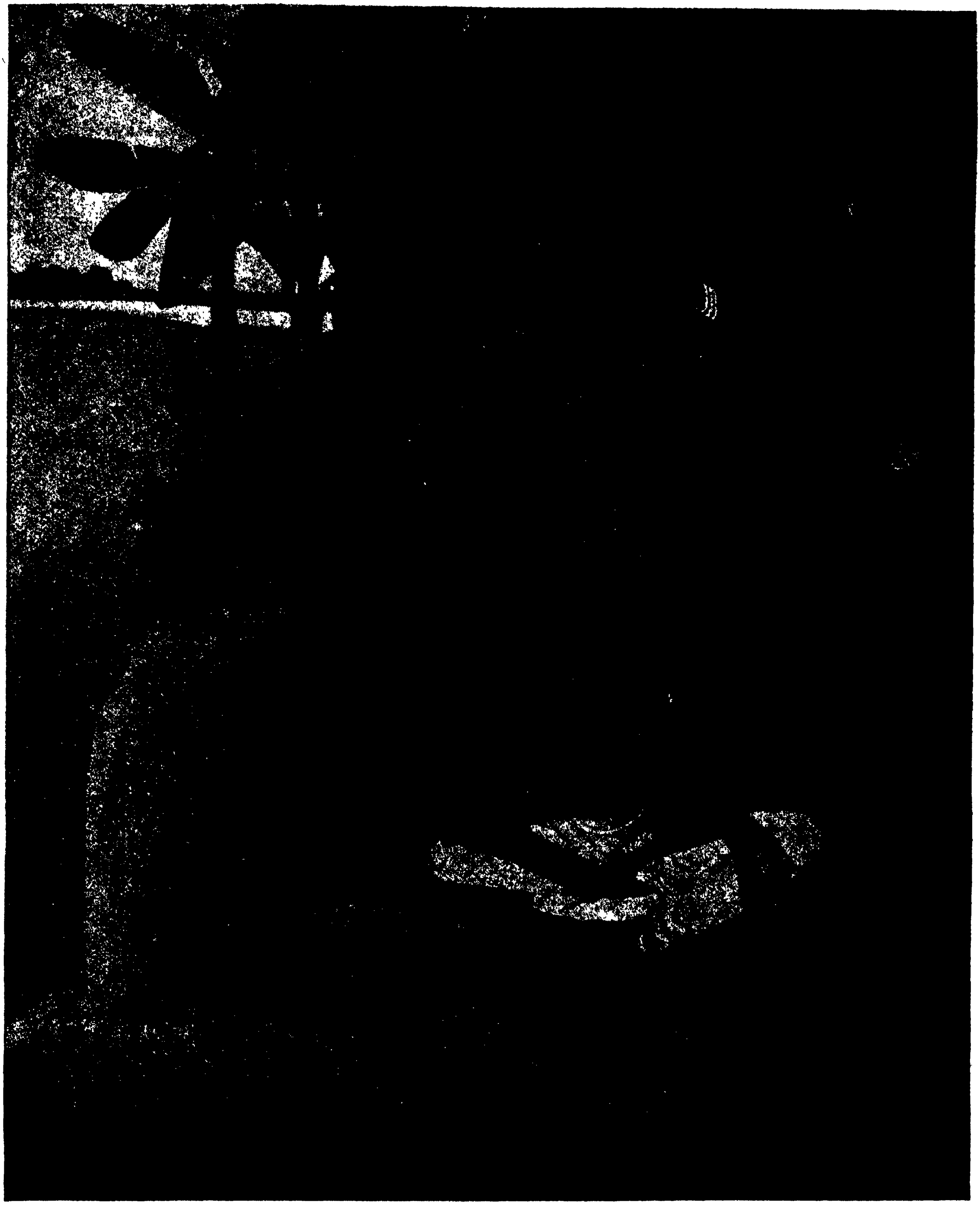


ভস্মীভূত স্কুল-গৃহের একাংশ

শ্রীমান্ শুকদেব বসু নিরুদ্দিষ্ট

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র শ্রীমান্ শুকদেব বসুকে গত মহালয়ার দিন (২২শে আশ্বিন) বেলা ১০। ঘটিকার সময় কুমারটুলী ঘাটে স্নান করিবার সময় স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়। বালকটির বয়স ১০ বৎসর ৮ মাস, রং ফরসা এবং চক্ষু একটু টেরা। কলিকাতাস্থ বিদ্যাভবন স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিল। অদ্যাবধি তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যদি কেহ এ বিষয়ে সন্ধান জানেন, প্রবাসী আপিসে অথবা ৬৪ নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় জিতেন্দ্রবাবুকে সংবাদ দিলে বিশেষ সুখী হইব।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস



জয়দেব ও পদ্মাবতী

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪২শ ভাগ, ২য় খণ্ড | মাঘ, ১৩৪৯ | ৪র্থ সংখ্যা

অধ্যাপক কালিদাস নাগকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

26 March, 1917

কল্যাণীয়েষু

সাহিত্যমণ্ডলীতে আমি ত আজকাল একঘরে', তুমি বুঝি আমাকে জাতে তোলবার চেষ্টায় আছ? যারা আমাকে একঘরে' করেচে তারা আমাকে না জেনে সম্মান করেছে, আমাকে স্বতন্ত্র আসন দিয়েছে, তাতে ক্ষতি কি? আর কিছু না হোক্ নিরালা পাওয়া যায়। ভক্তমালে কবিরের গল্প পড়েচ ত?

যাই হোক্ যুবকদের আহ্বান আমি কখনো অনাদর করি নে। ঐ বয়সের সঙ্গেই আমার মিল হয়; ওটা যারা পেরিয়েচে, যাদের চাল্‌সে ধরেছে তাদের চষমায় আমার চেহারা বীভৎস হয়ে ওঠে। আমি যৌবনের কবি, জরা আমাকে পরিহার করে। তোমরা আমাকে লুটপাট করে যদি দখল করে নেও তাতে আমার আনন্দ আছে—আমার পাকাচুল দেখে ভয় কোরো না, ওটা আমার অদৃষ্ট পিতামহীর পরিহাসের হাস্যে শুভ্র হয়ে উঠেছে।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

হিন্দু য়ুনিভার্সিটি কন্‌ভোকেশনে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। প্রথমে টেলিগ্রাফ করেছিলুম যাব না। মনে করেছিলুম আমার বদলে রথীরা গিয়ে বরোদার মহারাজকে চেপে ধরবে। কিন্তু রথীরা দিল্লীর সপ্তভূপতি সঙ্গমে যাচ্ছে—তারা যখন দিল্লীতে রাজদ্বারে ভিক্ষার্থী ঠিক সেই সময়েই বরোদা বারাণসীতে। আমি চীনে চলে যাব, রাজা যাবেন য়ুরোপে—মাঝের থেকে বিশ্বভারতীর ঝুলি ধনাধ্যক্ষের হাতে শূন্য ফিরে আসবে। তাই রাজাকে তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাতে যেতে হবে। সেখানে বিজয়নগরমের ভূতপূর্ব্ব মহারাণীও যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গেও দেখা করা দরকার হবে। তোমাকে সঙ্গে নিতে চাই, তুমি সেখানে একটা লেকচার দেবে, সেটাতে বিশ্বের মধ্যে বিশ্বভারতীর স্থান তোমাকে নির্দ্দেশ করতে হবে। বৃহস্পতিবার রাত্রে ছাড়ব, রবিবার রাত্রে প্রত্যাবর্ত্তনের যাত্রা করব। ঐ কয়দিন যদি কলেজে কাজ থাকে ছুটি নিয়ো। আসলে কেবল শুক্রবারটা তোমাকে হয়ত কাজ কামাই করতে হবে—শনিরবি ত তোমাদের প্রায়ই ছুটি থাকে। অতএব এতে তোমার কর্ত্তব্যের বিশেষ ত্রুটি হবে না। অথচ কবিসঙ্গমে তীর্থদর্শনও হতে পারবে। পথিমধ্যে নানা আলোচনার অবকাশও পাওয়া যাবে। ইতি ১১ জানুয়ারী ১৯২৪

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Feb. 26 1924

কল্যাণীয়েষু

Romain Rollandকে যে চিঠি লিখেচি তার কপি তোমাকে পাঠাই। কাগজে ছাপাবার জন্যে নয়, তোমার দেখবার জন্যে।

ভারতীকে যে কবিতা দিতে বলেছিলুম সেটা মণিলালকে এখনো দিলে না কেন ?

একটা সনেট লিখেচি। কপি ক'রে প্রবাসীতে পাঠিয়ে দিয়ো।

যে তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যুষ বেলায়
প্রথম শুনাল মোরে নিশান্তের বাণী
শান্তমুখে ; নিখিলের আনন্দ মেলায়
স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডেকে নিয়ে এল ; দিল আনি
ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে ; যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি কম্পিত পরশে
চম্পক অঙ্গুলিপাতে তন্দ্রা-যবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা ;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা,
এ সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে,
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

শান্তিনিকেতন

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাই সম্ভবতঃ বাংলা দেশে জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা। ইহারই পূর্ণ পরিণতি শান্তিনিকেতন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা এবং তৎপরে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি ব্রহ্ম বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া যাইবার পর মহর্ষি পাকা বনিয়াদের উপর একটি স্থায়ী ব্রহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পরেই তিনি এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উদ্যোগী হন এবং এক বৎসরের মধ্যে একটি ট্রষ্ট ডীড সম্পাদন করিয়া ব্রহ্ম মন্দির, আশ্রম ও ব্রহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তিনিকেতনে তাঁহার লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি এবং দুইটি রেশম কুঠী দান করেন। ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ২৬শে ফাল্গুন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ ট্রষ্ট ডীড সম্পাদিত হয়। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসের ৪ঠা তারিখে শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর ব্রহ্ম মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয় ; পর বৎসর ৭ই পৌষ মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। ৭ই পৌষ মহর্ষির ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের দিন। ঐ তারিখের সহিত শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের যোগ

রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা হইতেই প্রতীয়মান হইবে :—

"শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবের সফলতার মর্ম্মস্থান যদি উদ্ঘাটন করে দেখি, তবে দেখতে পাব, এর মধ্যে সেই বীজ অমর হয়ে আছে, যে-বীজ থেকে এই আশ্রম-বনস্পতি জন্মলাভ করেছে, সে হচ্ছে সেই দীক্ষা গ্রহণের বীজ।…এই সেই ৭ই পৌষ এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং এখনও প্রতিদিন সৃষ্টি করে তুলছে।"*

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই পৌষ মহর্ষির দীক্ষা গ্রহণের শতবর্ষ পূর্ণ হইবে।

ট্রষ্ট ডীড সম্পাদনের চারি বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি রবীন্দ্রনাথকে আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন। ট্রষ্ট ডীডে বর্ণিত তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ করিবেন এ আশা মহর্ষির তখনই ছিল। শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করেন, ব্রহ্ম মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন উৎসবে তিনি সঙ্গীত করেন এবং অবশেষে ব্রহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অনুমতি প্রার্থনা করিলে মহর্ষি সাগ্রহে সম্মতি দান করেন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই পৌষ ২১শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মন্দিরে উপাসনায় উপদেশ দেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৭ই পৌষ ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের প্রথম "ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষাদান" অর্থাৎ সমাবর্ত্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সম্পূর্ণ ট্রষ্ট ডীডটির নকল নিম্নে প্রদত্ত হইল :

ট্রষ্ট ডীড

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাং জোড়াসাঁকো কলিকাতা। শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়। পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। সাং মাণিকতলা কলিকাতা। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী। পিতার নাম কৃপানাথ মুন্সী। হাং সাং পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্নেহাস্পদেষু।

লিখিতং শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার নাম ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর সাকিম সহর কলিকাতা জোড়াসাঁকো হাল সাং পার্ক ষ্ট্রীট।

কস্য ট্রষ্ট ডীড পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতি ডিষ্ট্রিক্ট রেজেষ্টারী বীরভূম সব রেজেষ্টারী বোলপুর পুলিস ডিভিজন বোলপুর পরগণে সেনভূম তালুক সুপুরের অন্তর্গত মুদা বোলপুরের পত্তনির ডোল খারিজান মৌজে ভুবন নগরের মধ্যে বাঁধের উত্তরাংশে প্রথম তপসিলের লিখিত চৌহদ্দির অন্তর্গত আনুমানিক বিশ বিঘা জমি ও তদুপরিস্থিত বাগান ও এমারত যাহা এক্ষণে শান্তিনিকেতন নামে খ্যাত আছে ঐ বিশ বিঘা জমি আমি সন ১২৬৯ সালের ১৮ ফাল্গুন তারিখে প্রতাপনারায়ণ সিং দিগরের নিকট হইতে মৌরসী পাট্টা প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি বাগান একতলা ও দোতলা ইমারত প্রস্তুত পূর্ব্বক মৌরসী স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলীকার আছি। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে ও অত্র ট্রষ্ট ডিডের লিখিত কার্য্য সম্পাদনার্থে আমি উক্ত শান্তিনিকেতন নামক সম্পত্তি ও তৎসংক্রান্ত স্থাবর-অস্থাবর হক হকুক যাহা কিছু আছে ও যাহার মূল্য আনুমানিক ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা হইবেক ঐ সমুদায় সম্পত্তি তোমাদিগকে অর্পণ করিয়া ট্রষ্টী নিযুক্ত করিতেছি যে তোমরা ট্রষ্টীস্বরূপে স্বত্ববান হইয়া স্বয়ং ও এই ডিডের সর্ত্তমত স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে চিরকাল এই ডিডের উদ্দেশ্য ও কার্য্য পশ্চাৎ লিখিত নিয়ম মতে সম্পন্ন করিয়া দখলীকার থাকিবে। আমার বা আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণের ঐ সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব দখল রহিল না। উক্ত সম্পত্তি চিরকাল কেবল নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইবে। ঐ ব্যবহারের প্রণালী এই ট্রষ্ট ডিডে যেরূপ লিখিত হইল তৎ বিপরীতে কখনো হইতে পারিবে না। 'এই ট্রষ্টীর কার্য্য সম্বন্ধে ট্রষ্টীগণের মধ্যে মতভেদ হইলে অধিকাংশের মত অনুসারে কার্য্য হইবেক। কোন কার্য্য ত্যাগ করিলে কিম্বা কোন ট্রষ্টীর মৃত্যু হইলে অবশিষ্ট ট্রষ্টীগণ তাহার স্থানে এই ডিডের উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে উপযুক্ত ও ইচ্ছুক কোন প্রাপ্তবয়স্ক ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ট্রষ্টী নিযুক্ত করিবেন। নূতন ট্রষ্টী সর্ব্বাংশে এই ডিডের নিয়মাধীন হইবেন। উক্ত শান্তিনিকেতনে অপর সাধারণের একজন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন, গৃহের অভ্যন্তরে উপাসনা করিতে হইলে ট্রষ্টীগণের সম্মতি আবশ্যক হইবেক, গৃহের বাহিরে ঐরূপ সম্মতির প্রয়োজন থাকিবেক না। নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত কোন সম্প্রদায়বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু, পক্ষী, মনুষ্যের মূর্ত্তির বা চিত্রের বা কোন চিহ্নের পূজা বা হোম যজ্ঞাদি ঐ শান্তিনিকেতনে হইবে না। ধর্ম্মানুষ্ঠান বা খাদ্যের জন্য জীবহিংসা বা মাংস আনয়ন বা আমিষ ভোজন বা মদ্যপান ঐ স্থানে হইতে পারিবে না। কোন ধর্ম্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোন প্রকার নিন্দা বা অবমাননা ঐ স্থানে হইবে না। এরূপ উপদেশাদি হইবে যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পূজা বন্দনাদি ধ্যানধারণার উপযোগী হয় এবং যদ্দ্বারা নীতিধর্ম্ম উপচিকীর্ষা এবং সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হয়। কোনপ্রকার অপবিত্র আমোদ-প্রমোদ হইবে না। ধর্ম্মভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রষ্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধুপুরুষেরা ধর্ম্মবিচার ও ধর্ম্মালাপ করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোনপ্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ উল্লাস হইতে পারিবে না, মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ-বিক্রয় হইতে পারিবে। যদি কালে এই মেলার দ্বারা কোনরূপ আয় হয় তবে ট্রষ্টীগণ ঐ আয়ের টাকা মেলার কিম্বা আশ্রমের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। এই ট্রষ্টের উদ্দিষ্ট আশ্রম ধর্ম্মের উন্নতির জন্য ট্রষ্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম-বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথি-সৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহনির্ম্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন এবং ঐ আশ্রম-ধর্ম্মের উন্নতির বিধায় সকল প্রকার কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ট্রষ্টীগণ যত্ন সহকারে চিরকাল ঐ অর্পিত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ও তজ্জন্য এবং শান্তিনিকেতনের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত তথায় একজন উপযুক্ত সচ্চরিত্র, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে আশ্রমধারী নিযুক্ত করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহাকে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। ঐ আশ্রমধারী ট্রষ্টীগণের তত্ত্বাবধানের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিবেন। যদি আশ্রমধারী আপনার শিষ্যগণ মধ্যে কাহাকেও উপযুক্ত বোধ করেন তবে তিনি ট্রষ্টীগণের লিখিত অনুমতি

* শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত মহর্ষির আত্মচরিতের পরিশিষ্ট।

গ্রহণে সেই শিষ্যকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে পারিবেন। কিন্তু ট্রষ্টীগণের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ করিতে পারিবেন না, কিম্বা আশ্রমধারী তাহার যে শিষ্যকে ঐরূপ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে ইচ্ছা করেন যদি ট্রষ্টীগণের বিবেচনায় ঐ ব্যক্তি ঐ কার্য্যের উপযুক্ত না হয় তাহা হইলে তাঁহারা ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে আশ্রমধারী মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে পারিবেন। আশ্রমধারীর মনোনীত শিষ্যকে আশ্রমধারীর পদে নিযুক্ত করিবার ও তাহাকে পরিবর্ত্তন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ট্রষ্টীগণের থাকিবে। যদি কখন কেহ এই আশ্রমের উন্নতি বা সাহায্যের জন্য কিছু দান করেন তবে ট্রষ্টীগণ তাহা গ্রহণ করিবেন এবং তাহা এই ডিডের লিখিত কার্য্যে ব্যয় করিবেন। এই ডিডের লিখিত উদ্দেশ্য সাধন ও কার্য্য নির্ব্বাহ ও ব্যয়-সঙ্কুলান জন্য দ্বিতীয় তপশীলের লিখিত সম্পত্তি সকল দান করিলাম, উহার আনুমানিক মূল্য ১৮৪৫২ টাকা। ট্রষ্টীগণ অদ্য হইতে ঐ সকল সম্পত্তি সংরক্ষণ ও সর্ব্বপ্রকার বিলি-বন্দোবস্তের ভার প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সকল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের সর্ব্বপ্রকার ব্যয় ও রাজস্ব প্রভৃতি বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা দ্বারা আশ্রমের আবশ্যকীয় ব্যয় আশ্রমের গৃহাদি মেরামত ও নির্ম্মাণ এবং এই ডিডের লিখিত অন্যান্য সকল কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন; উক্ত প্রদত্ত সম্পত্তি সকলের আয়ের দ্বারা ট্রষ্টের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয় তবে ট্রষ্টীগণ তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট বা কোনরূপ নিরাপদ মালিকী স্বত্বে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিবেন কিম্বা আশ্রম কিম্বা মেলার উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। যদি কোনরূপ সম্পত্তি কিম্বা প্রমিসরি নোট খরিদ করা হয় তবে তাহা ট্রষ্টী সম্পত্তি গণ্য হইয়া এই ডিডের সর্ত্তমত ব্যবহার হইবেক। কিন্তু উদ্বৃত্ত আয় হইতে যদি কোন গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট খরিদ করা হয় তাহা হইলে যদি আশ্রমের কোন কার্য্যে সেই প্রমিসরি নোট বিক্রয় করা আবশ্যক হয় তবে তাহা ট্রষ্টীগণ বিক্রয় করিতে পারিবেন। ট্রষ্টীগণ এই আশ্রমের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। এই ডিডের লিখিত কার্য্যসমূহ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে অর্পিত সম্পত্তির কোনরূপ দান-বিক্রয় দ্বারা হস্তান্তর ও দায় সংযোগ করিতে পারিবেন না। ও ট্রষ্টীগণের নিজের কোনরূপ দেনার নিমিত্ত এই সকল সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ দায়ী হইবে না। কিন্তু দ্বিতীয় তপশীলের লিখিত সম্পত্তির মধ্যে জেলা রাজসাহী ও পাবনার অন্তর্গত গালিমপুর ও ভর্ত্তিপাড়া নামে রেশমের যে দুইটি কুঠী আছে কোন কারণ বশতঃ ঐ কুঠীরদ্বয়ের আয় যদি বন্ধ হয় তাহা হইলে আবশ্যক বিবেচনায় ট্রষ্টীগণ এই দুই কুঠী বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যের টাকার দ্বারায় ট্রষ্টীগণ গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট অথবা অন্য কোন নিরাপদ স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবেন। সেই খরিদা সম্পত্তি আমার অর্পিত মূল সম্পত্তির ন্যায় গণ্য হইয়া এই ডিডের সর্ত্ত মতে কার্য্য হইবেক এতদর্থে তৃতীয় তপশীলের লিখিত দলিল সমস্ত ট্রষ্টীগণকে বুঝাইয়া দিয়া সুস্থচিত্তে এই ট্রষ্ট ডিড লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল তারিখ ২৬ ফাল্গুন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ট্রষ্ট ডীড সম্পাদনের সাত মাস পরে, ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ৪ঠা কার্ত্তিক শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হয়। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত এবং ১৮১০ শকের অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে জানা যায় মহর্ষি "সুসজ্জিত শান্তিনিকেতন ও বার্ষিক ১৮০০ শত টাকা আয়ের সম্পত্তি" ট্রষ্টীগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন:

"এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিগত ৪ঠা কার্ত্তিক শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় এক সভা আহূত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল যিনি ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বহুকাল ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ইঁহারা দুই জনে উপাসনার আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।...তিনি (মহর্ষি) স্বদেশের আধ্যাত্মিক উন্নতির কামনায় সদাই ব্যাকুল, তাই বহু মূল্যের ভূ সম্পত্তি ও তাঁহার এই প্রিয় শান্তিনিকেতন, যাহা লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত ও সুসজ্জিত হইয়াছে কেবল ধর্ম্মোন্নতির জন্য দান করিলেন।"

আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রায় দুই বৎসর পরে, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন হয়। এই অনুষ্ঠানের তারিখ ২২শে অগ্রহায়ণ রবিবার ১৮১২ শক অথবা ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ। ভিত্তি স্থাপনের নিম্নলিখিত বিবরণ* উল্লেখযোগ্য:

"সুপ্রশস্ত ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণের জন্য (মহর্ষি) প্রচুর অর্থ ট্রষ্টী মহোদয়দিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ২২শে অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় এই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে পরব্রহ্মের উপাসনা হয়।...ভিত্তিমূলে যে খোদিত তাম্রফলক প্রোথিত করা হয়, সত্যেন্দ্রবাবু† সর্ব্বসমক্ষে তাহা পাঠ করিলেন। তাম্রফলকে এই কয়েকটি কথা দেবনাগর অক্ষরে খোদিত আছে। 'ওঁ তৎসৎ।' ঠক্কুর বংশাবতংসেন পরমর্ষিণা শ্রীমতা দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণা ধর্ম্মোপচয়ার্থং শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠাপিতমিদং ব্রহ্মমন্দিরং। শুভমস্তু ১৮১২ শক, ১৯৪৮ সম্বৎ, ৪৯৯১ কল্যব্দ। অগ্রহায়ণ ২২ রবিবাসর।' পরে সকলে মন্দিরের ভিত্তিমূলে গমন করিলে তাম্রফলক, পঞ্চরত্ন ও প্রচলিত মুদ্রা এবং উক্ত ২২শে অগ্রহায়ণের Statesman পত্রিকা, এই অগ্রহায়ণ মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' একটি আধারে আবদ্ধ করিয়া মন্দিরের ঈশান কোণে প্রোথিত করা হয়। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত দ্রব্যগুলি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া স্বহস্তে কর্ণিক দ্বারা ভিত্তিপ্রস্তর গাঁথিয়া দিলেন।"

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই পৌষ, ২১শে ডিসেম্বর, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তাঁহার বক্তৃতায়* বলেন,

"...এ দেশে ব্যায়ামশিক্ষার স্থান আছে, জ্ঞানশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়াদি আছে, কিন্তু যেখানে অধ্যাত্ম বিদ্যা অধীত হইতে পারে এরূপ কোন স্থান নাই। নিরবচ্ছিন্ন শরীর লইয়া মনুষ্য নহে, মনের উন্নতি সাধনও মনুষ্যের পক্ষে তাবৎ নহে, আত্মার উন্নতি চাই। এই এক আত্মার উন্নতি সাধনেই মনুষ্যের দেবত্ব স্থাপিত হইতে পারে। শরীর মন ও আত্মা লইয়াই মনুষ্য। আমরা দেখিতে পাই বিদ্যা দুই প্রকার, পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। এই অপরা বিদ্যার সঙ্গে পরা বিদ্যার আলোচনা চাই, তাহা হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে।...প্রাচীন ঋষিগণ আমাদের জন্য অক্ষয় অমূল্য সম্পত্তি বেদ উপনিষদের মধ্যে

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ, ১৮১২ শক।
† সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
*তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৮২১ শক

সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ঐ সমুদয়ের জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। দেশীয় সত্য সম্বন্ধে অগ্রে অভিজ্ঞতা লাভ হইলে পরে বিদেশের সত্য আলোচনা করা যাইতে পারে। এই পৃথিবীতে নানা ধর্ম্ম প্রচলিত। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিগণ মধ্যবর্ত্তিতা স্বীকার করেন, মুসলমানেরা মহম্মদকে প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং বাইবেল ও কোরাণকে এই দুই সম্প্রদায় আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম নিরবচ্ছিন্ন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্য দেশ কাল বা মনুষ্যবিশেষে আবদ্ধ নহে। বৌদ্ধগণ নীতির উপরেই আস্থাবান কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁহারা সন্দিহান। কিন্তু আমরা বলি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে না নীতি দাঁড়াইতে পারে, না প্রকৃত শান্তি লাভ হইতে পারে, না আমাদের অন্তরে যে-সব উৎকৃষ্ট বৃত্তি আছে তাহা চরিতার্থ হইতে পারে। সেই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুত্ব এত অধিক। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা এবং প্রচারের জন্য এই ব্রহ্মবিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র; তাঁহার নিকট সকলেরই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৭ই পৌষ তথাকার ছাত্রগণকে প্রথম ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষা দান উৎসব সম্পন্ন হয়। ইহাকে আধুনিক সমাবর্ত্তনের ভারতীয় রূপ বলিতে পারা যায়। এই উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ ১৮২৩ শকের মাঘের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'যথার্থ বড়ো কাহাকে বলে' এই অমূল্য উপদেশটি রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষেই দিয়াছিলেন এবং দীক্ষাদান কার্য্যও তিনিই সম্পন্ন করেন।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতেই রবীন্দ্রনাথ উহার ভার গ্রহণ করেন এবং উহার জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে তিনি বহু ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ বরণ করেন। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে উহা বিবৃত হইবে।

কাশ্মীর-ভ্রমণ

শ্রীশান্তা দেবী

৫

উলার থেকে ফিরে আমরা মানসবলের দিকে চললাম। হাউস-বোটটাকে ফিরবার মুখে ঘুরিয়ে নেওয়া হ'ল। সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের অপূর্ব্ব শোভা মনটা ভরিয়ে তুলল। চওড়া নিস্তরঙ্গ জলস্রোত বাঁক ফিরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। ডান দিকে দূরের নীচু পর্ব্বতমালার উপর হাল্কা জালের মত কুয়াশা ভাসছে, পালিশ-করা প্রকাণ্ড সোনার থালার মত সূর্য্য নিষ্প্রভ হয়ে ধীরে পাহাড়ের উপর নেমে এল। কুয়াশার জালের উপর ও দূর পর্ব্বতশ্রেণীর উপর হাল্কা একটা বেগুনফুলী রং ছড়িয়ে পড়ছে, জলস্রোতের আধখানা মরা সোনার চক্‌চকে পাতের মত ঝল্‌মল্‌ ক'রে উঠছে, তার পাশে সবুজ জলস্রোত, তার পর কালো জলস্রোত পরস্পরের সঙ্গে মিশে চলেছে।

অতি ধীর গতিতে ক্রমে সূর্য্য একেবারে পাহাড়ের পিছনে লুকিয়ে গেল। তার পর সূর্য্যের বুকের সোনালি রং পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে মেঘে ছড়িয়ে পড়ল, জলস্রোতে তারই সোনালি ছায়া ঝিলমিল ক'রে কাঁপতে লাগল। ধীরে সোনার রং ঘন বেগুনী হয়ে কালো অন্ধকারে মিশিয়ে গেল। হাউস-বোটের ছোট বারাণ্ডায় বেরিয়ে বসে ঠাণ্ডা হাওয়ায় রাত ৮টায় সূর্য্যাস্ত দেখে ঘরে ঢুকলাম।

জলের মধ্যে ছোট একটা দ্বীপমত পেয়ে এক জায়গায় কাঠে-বোঝাই পনের-ষোলটা নৌকা নোঙর ক'রে দাঁড়িয়েছে। কোন কোনটার মাদুরের ছাউনির তলায় কাশ্মীরী সুন্দরীরা ব'সে কাজ করছে। নিকট গ্রাম থেকে কালো পোষাক-পরা পল্লীবালারা মাটির কলসী নিয়ে জল ভরতে আসছে। অন্ধকারে মাথায় কলসী তুলে তারা গ্রামের পথে মিলিয়ে গেল।

১৪ই সকালে মানসবলের কাছে এসে আমাদের হাউস-বোট ঘাটে বাঁধা হ'ল। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে কয়েকটা চিঠিপত্রের জবাব দিয়ে আটটার সময় ডাঙায় নেমে পড়লাম। কাশ্মীরের এই হ্রদটি সৌন্দর্য্যে আর সব হ্রদের শ্রেষ্ঠস্থানীয়। খানিকটা হেঁটে একটা সরু খালের কাছে যেতে হ'ল শিকারা ভাড়া করতে। গদি কুশান দেওয়া সুন্দর সাজানো শিকারা একটা ছিল, কিন্তু ভাড়া অনেক চাইল। তাই আমরা একটা সাধারণ জেলে-ডিঙি নিয়ে চললাম।

মানসবলের চারি ধারে ঘেরা পাহাড়গুলি জলের খুব কাছে এসে পড়েছে, তাদের মাথার উপর তুলোর মত সাদা বরফ গ্রীষ্মের দিনেও পড়ে আছে। তারও উপরে দেখা যায় শ্বেত ধ্বজার মত শুভ্র মেঘ, মেঘের উপর ঘন নীল আকাশে চিল উড়ছে। পাহাড়ের গায়ের খাঁজগুলি তরঙ্গের মত, তাদের পায়ের তলায় ছোটবড় পপ্‌লার প্রভৃতি গাছ। তার পর সবুজ মাঠে জলের ধার পর্য্যন্ত গরু চরে বেড়াচ্ছে।

জল শহরের জলের মত রাস্তোর আবর্জ্জনায় নোংরা ঘোলাটে নয়, তা ছাড়া জলপথ চওড়া। এ-পারে ছোট গ্রামে কোন কোন ক্ষেতে তখন লাঙল দিচ্ছে, কোনো জলাতে ধানের চারা মাথা তুলছে, তার আলের উপর উইলো গাছের সারি মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে ছোট ছোট দোচালা দোতলা বাড়ী।

অনেক জায়গায় প্রকাণ্ড খাল ভূমুখো হয়ে গিয়েছে, মাঝে দ্বীপের মত জমি পড়ে আছে যেন চক্‌চকে সবুজ, কার্পেট। তার উপর মোটা আঁকাবাঁকা ডাল মেলে দুই-চারিটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। পাতার বাহুল্য নেই।

বেশী দূর যেতে-না-যেতেই মানসবলের হ্রদ দেখা দিল। যে-মুখটা সরু খালের দিকে সেদিকে জোলো গাছ-গাছড়ার চোটে জল প্রায় ঢাকা। হ্রদের রূপ দেখে প্রায় হতাশ হচ্ছিলাম, কিন্তু একটু এগোতেই জল ক্রমে পরিষ্কার হয়ে এল, চক্ষু সার্থক হ'ল। এত স্বচ্ছ এত স্থির জল কখনও দেখি নি, যেন পালিশ-করা কাচের আয়না। দুই দিক দিয়ে দুই সারি পাহাড় হ্রদের অপর প্রান্তে গিয়ে মিলেছে। জলে দু-সারি পাহাড়ের ছায়া আয়নার ছায়ার মতই স্পষ্ট। মেঘের টুকরা, পাহাড়ের গায়ের প্রত্যেকটি পাথর সবই ছায়ায় দেখা যাচ্ছে। জলের তলায় যত রকম গাছ-গাছড়া আছে তারও প্রত্যেকটি পাতা ও শিরা দেখা যাচ্ছে, ডিঙি থেকে হাত বাড়িয়ে জলে ডুবিয়ে দেখলাম কলের জলের মত পরিষ্কার।

বাঁদিকে পাহাড়ের গায়ে বাগানের মত সুন্দর সুন্দর গাছ ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার মাঝে মাঝে ঘর। গাছের আড়ালে ভাঙা-চোরা ঘরের কুশ্রীতাটুকু ঢাকা পড়ে গিয়ে ছবির মত দেখাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ের কাছে মস্ত পদ্মবন। আর কিছুদিন পরে ফুলে ফুলে ভরে উঠবে। তখন সবে কুমুদ ফুল ফোটা সুরু হয়েছে দেখলাম।

বসন্তের দিনে কাশ্মীর-রাজের উজির কাজে বেরিয়েছেন, দেখলাম তাঁদের সব তাঁবু কিছু দূরে পড়েছে। একদল সৈন্য অনেক ঘোড়া নিয়ে লম্বা লাইন ক'রে পাহাড়ের পথে তাঁবুর দিকে চলেছে। তারও কিছু দূরে দিল্লীর অধীশ্বরী নূরজাহান বেগমের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত উদ্যান-বাটিকা। কেল্লার থামের মত গোল গোল কয়েকটা মাত্র থাম আর পাতলা পাতলা ইটের কয়েকটা দেয়ালমাত্র বাদশাহের মহিষীর স্মৃতি বুকে ক'রে পড়ে আছে। দুই-একটা ভাঙা-চোরা খিলান মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। হ্রদের পাড় অনেক দূর পর্য্যন্ত পাথর দিয়ে বাঁধানো। পুরাকালে ছিল প্রকাণ্ড তিন-চার তলা উদ্যান, এখন হয়েছে সবটাই ধানের আর মকাইয়ের ক্ষেত। একটা পুরানো গাছের তলায় কয়েকটা খোদাই-করা পাথর আসনের মত পাতা। উদ্যানের তিনতলায় একটা ছোট ঘর খুঁড়ে বার করা হয়েছে; আমরা গিয়ে তার ভিতর ঢুকলাম। চৌকিদার বলল, "এইটি ছিল নূরজাহান বেগমের ঘর।" মোগল-আমলের ঘরের মতই দেখতে, তেমনি দেয়ালে ছোট ছোট কুলুঙ্গি, আলো ও জিনিষপত্র রাখবার জন্য কাটা। হ্রদের দিকে ছোট ছোট জানালা।

প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করতেও যে নূরজাহান বেগম জানতেন তা তাঁর এই নিভৃত মানসবল হ্রদের তীরের আশ্চর্য্য সুন্দর স্থানটিতে উদ্যান রচনার ইচ্ছা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। হ্রদের একেবারে গায়ে ইটের মধ্যে লম্বা একটা খাঁজকাটা, বোধ হয় এখানে কাঠের কড়ি দিয়ে বাদশাহ-মহিষীর জন্য কোনও ঘর কি বারান্দা করা ছিল।

বাগানের মালী বকশিশ পাবার লোভে আমাদের কিছু পুদিনা শাক ও কিছু তুঁতে ফল পাতার ঠোঙায় ক'রে এনে উপহার দিল। তার বাড়ীর একটি মেয়ে ডালিম ফুল নিয়ে এল।

এই উদ্যানের একটু দূরে অপর পারে বাঁদিকের পাহাড়ে একটা সাদা পাথরের quarry। পাহাড়টা একেবারে ন্যাড়া, তার উপরদিকের একটি গ্রামে মাস কয়েক আগে আগুন লেগে ঘরদোর পুড়ে যায়, এখন চালহীন ছাদহীন ধ্বংসস্তূপগুলি পড়ে আছে। দরিদ্র গ্রামবাসীরা তার মধ্যেই কয়েকটা আধপোড়া জীর্ণ বাড়ীতে বাস করছে। এমন রূপের ঐশ্বর্য্যের পাশে এই ধ্বংসস্তূপ, জীর্ণ কুশ্রী কুটীরগুলি চোখে কাঁটার মত ফোটে।

হ্রদের একেবারে শেষ প্রান্তে পাহাড় থেকে দুটি ঝরণা নেমে হ্রদের জলের খোরাক বাড়াচ্ছে। এইখানে পুরা-কালে একটি পাথরের মন্দির ছিল; এখন মন্দিরটি সব জলে ডুবে আছে, জেগে আছে শুধু তার পিরামিডের মত কোণওয়ালা মাথাটা। মন্দিরের এক দিকে একটা কোণাল খিলান, তার মাথার কাছে একটি কুলুঙ্গি কাটা। এখানে বোধ হয় কোনও দেবমূর্ত্তি ছিল।

মানসবলের শেষে এসে আমরাও পারে নামলাম। এখানে কার একটি ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত বড় বাগান। পাহাড়ের গায়ে গুহাকাটা একটি অন্ধকার ঘর, মাঝে মাঝে পাথর-বাঁধানো। বাগানে আখরোট, আপেল, তুঁতে ও খোবানি প্রভৃতির গাছ। আমরা বাগানে বেড়িয়ে

আবার শিকারায় চড়ে হাউস-বোটের দিকে চললাম। ফিরবার সময় জলে একটু তরঙ্গ উঠেছিল, স্বচ্ছ জলে পাহাড়ের পরিষ্কার ছবি আর দেখা যায় না। আমাদের বোটটা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল। নৌকা থেকে নেমে গ্রামের ভিতর দিয়ে মাইল দেড়েক হেঁটে এসে আমরা তাকে ধরলাম।

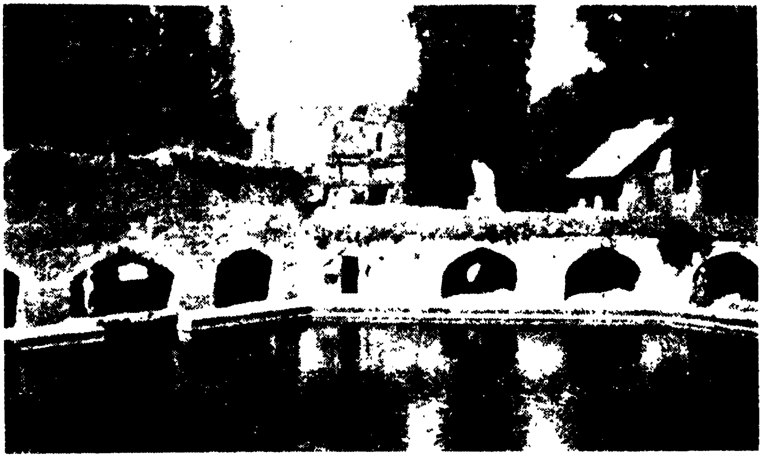
"মানস" সরোবরের মত সুন্দর মানসবল ছেড়ে আসতে দুঃখ হচ্ছিল।

এখান থেকে চললাম গন্দরবল দেখতে। এই জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, পরিচ্ছন্নতা ও নির্জ্জনতা দেখে বোঝা গেল কেন এখানে রাজারাজড়া সাহেবমেম ও সৌখীন ভ্রমণকারীরা বোট ঘাটে লাগিয়ে বাস করেন। ছোট গ্রাম, কিন্তু রূপে মন মুগ্ধ করে। সিন্ধ্ নদী বলে একটি প্রকাণ্ড নদী এখানে আছে। তারই ধারে বড়লোকদের সব বজরা বাঁধা। ঝিন্দের মহারাজার বজরা দেখলাম অনেকগুলি। নিজের আছে, রাণীদের আছে, তার উপর আড়াই শ কুকুরের জন্য প্রকাণ্ড খাঁচার মত একটা হাউস-বোট। রাজার কুকুর হয়েও সুখ আছে। তারা কাশ্মীরে হাওয়া খেতে আসে। নদীর তীরে রাজার সেপাইরা তাঁবু খাটিয়ে প্রায় সব জায়গাটাই জুড়ে বসেছে।

নদীর কিছু দূরে প্রকাণ্ড মোটা মোটা চেনার গাছের সারি পথের দু ধারে সারি সারি কেল্লার মত দাঁড়িয়ে আছে। গুঁড়িগুলি নিরন্ধ্র কেল্লার বুরুজের মত, কিন্তু মাথার উপর সবুজে সবুজে আকাশ আড়াল হয়ে আছে। একটি গাছের গুঁড়ির ভিতর গর্ত্ত ক'রে ঘর করলে বেশ পাঁচ-ছয় জন বাস করতে পারে। পথের ধারে প্রকাণ্ড ধানের ক্ষেত, নদীর ধারে বেড়াবার জন্য বড় বড় বাগিচায় সুন্দর ঘাসের জমি।

আমরা একটা টাঙ্গাকে ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া ক'রে এক চক্কর ঘুরে গেলাম, খুব ভাল ক'রে দেখা হয় নি। ঝিন্দের রাজার সৈন্যসামন্তদের ছাউনিগুলিই সব চেয়ে চক্ষুশূল হয়ে আছে।

এরই কাছে ক্ষীরভবানী বলে এক হিন্দু দেবীর মন্দির আছে। সেখানে হিন্দুরা পিণ্ড দেন। মন্দিরের আশে-পাশের জায়গা ভীষণ নোংরা। ভিতরে জুতা পায়ে যাওয়া নিষিদ্ধ, তদুপরি পাণ্ডারা ত নিশ্চয়ই আছেন। আমরা মন্দিরের প্রকাণ্ড বাঁধানো উঠানের দিক দিয়ে একটু ঘুরে এলাম। এধারে-ওধারে দু-চার জন কাশ্মীরী পণ্ডিতের দর্শন মিলল। আশেপাশের খাল ও জলপথগুলি এমন নরককুণ্ডের মত নোংরা যে অন্য কোনও দিকে আর তাকাতে ইচ্ছা করল না। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মানুষের নোংরামির এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চোখকে এদেশে বারে বারে পীড়া দেয়। ফিরবার পথে অন্যান্য হাউস-বোটের মত আমাদের বোটটিকেও গুণ টেনে আসতে হ'ল। এর জন্য একটা বাড়তি লোক রাখতে হ'ল, তা ছাড়া নূরজাহানের মাও পুরুষদের সঙ্গে সমানে গুণ টেনে চলল।



ভেরিনাগের জলকুণ্ড

১৫ই জুন ভোরে আমাদের উইগুসর আবার ফিরে এসে শ্রীনগরের সীমানা ৭নং ব্রীজের তলা দিয়ে শহরে ঢুকল। শ্রীনগরে কয়েকটি দ্রষ্টব্য তখনও দেখা হয় নি, সেগুলি তাড়াতাড়ি দেখে নিতে হবে বলে একটি টাঙ্গা ভাড়া ক'রে শ্রীনগরের নোংরা পথে পথে আবার ঘুরতে আরম্ভ করলাম। এই রকম অপরিচ্ছন্ন একটা বস্তির মধ্যে কাশ্মীরের এক মুসলমান রাজার মাতার সমাধি মন্দির। মন্দিরটি যত্নে রচিত হলেও এখন পরিত্যক্ত ভূতের বাসার মত পড়ে আছে। প্রাচীন বহু হিন্দু মন্দির ভেঙে তারই খোদাই করা পাথর ইত্যাদিতে সমাধিটি রচিত। আশে-পাশে [illegible]ড়ো জমিতে অনেক খোদাই করা পাথর গড়াগড়ি যাচ্ছে। এ[illegible]ত্রে হিন্দু-মুসলমান স্থাপত্যের যেন শ্মশান রচিত হয়েছে। তার পর জুম্মা মসজিদ দেখতে গেলাম। প্রকাণ্ড সুন্দর মসজিদ! কাশ্মীরের কাষ্ঠশিল্পের সুন্দর

নিদর্শন; কিন্তু যত্নের চিহ্ন নাই। এই গালিচা-তুলিচার দেশে এসে কার্পেট ফ্যাক্টরী না দেখলে চলে না, সুতরাং সেখানেও একবার সময় ক'রে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। প্রকাণ্ড হাতার ভিতর পরিষ্কার বাড়ীগুলি। ধারে ধারে ফুলের কেয়ারি করা, ভিতরে বাইরে রঙের ছড়াছড়ি। এই কারখানা স্যর কৈলাসনাথ হস্করের জামাতা কাশ্মীর-রাজের উৎসাহে স্থাপন করেন। প্রাচীন অনেক নক্সা উদ্ধার ক'রে নূতন ক'রে বোনা হচ্ছে। খুব দামী কার্পেট বেশী হয় না, কারণ তার এক এক বর্গ ইঞ্চিতে যতগুলি বুননের গ্রন্থি পড়ে তা ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে। তিব্বতী ছবির নকল ইত্যাদি সূক্ষ্ম কাজ দু-একটি দেখলাম। যে ছবি দেখে বোনা প্রায় তারই মত কার্পেটটি যেন তুলি দিয়ে আঁকা। কার্পেট ছাড়া এখানে পশম, কম্বল, স্যুটের কাপড় ইত্যাদিরও বড় কলকারখানা দেখলাম। ভাল কার্পেটে এক বর্গ ইঞ্চিতে ৩০০০।৪০০০ গ্রন্থি পড়ে। একজন ক'রে মানুষ শিল্পীদের সামনে দাঁড়িয়ে গানের সুরে রঙের পর রঙের নাম পড়ে যায়, তাঁতীরা সেই শুনে বোনে। পশমের ফ্যাক্টরীর নাম করণসিং উলেন ফ্যাক্টরী। এরা এত কাজ পায় যে যোগান দিয়ে উঠতে পারে না।

শ্রীনগরে ফিরে আমাদের হাউস-বোট ছাড়বার ব্যবস্থা চলতে লাগল। শ্রীনগরে কাশ্মীরী শিল্পের কিছু নমুনা সংগ্রহ ক'রে ১৬ই জম্মু চলে যেতে হবে।

যে পথে কাশ্মীরে ঢুকেছি ফিরব তার উল্টা পথ দিয়ে। যাত্রার আগের রাত্রে নিয়োগীমহাশয়ের গৃহিণী আমাদের খুব ঘটা করে খাওয়ালেন। তাঁরা এই কয়দিনেই ঘরের মানুষের মত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের ছেড়ে আসতে কষ্ট হচ্ছিল। পর দিন সকালে তাঁর ছোট মেয়ে উমা আমাদের মোটরে তুলে দিয়ে গেল। আবার সেই রাধাকিসেন কোম্পানীর মোটর।

এবার সহযাত্রিণী একটি বৃদ্ধা মেমসাহেব। সারাপথ তাঁর এক ছেলের চাকরী-বাকরীর গল্প করছিলেন এবং আমাদের সেবা-যত্নও করছিলেন। নদীর ধার দিয়ে দিয়ে মোটর চলল। কোথাও আফিং ফুলের বাগান ফুলে আলো হয়ে আছে, কোথাও ফলের বাগান সুদীর্ঘ জমি জুড়ে আছে। চাষীরা নিস্তরঙ্গ জলে নৌকা বেঁধে ঘর-সংসার করছে। জলের উপর তাদের বারো মাস বাস। পথের ধারে কোথাও বড় বড় ধান-ক্ষেত।

শ্রীনগর থেকে ৫০ মাইল দূরে পথে ভেরিনাগের উদ্যানে "ঝিলম" নদীর উৎপত্তিস্থল দেখে যাবার লোভ সামলানো গেল না। প্রকাণ্ড বাগানের মাঝখানে একটি মন্দির। তার ভিতর ঝিলমের জন্মভূমি কুণ্ডে পরিণত। ৬০ ফুট গভীর কুণ্ডে দিবারাত্রি জল উঠ্‌ছে। কুণ্ডের চারধারে আগে মন্দির ছিল, পরে বাদশাহরা ভেঙে মসজিদ করেছিলেন, এখন তাও ভেঙে পড়ে আছে। দেখলে মন্দিরই মনে হয়, মসজিদ মনে হয় না। ভাঙা অবস্থাতেও ভারি সুন্দর, ভাল যখন ছিল তখন না-জানি কি রকম ছিল। কুণ্ডটির পিছনে খাড়া পীরপঞ্জল পাহাড় আকাশে গিয়ে মাথা ঠেকিয়েছে, সমস্ত পাহাড় বড় বড় পাইন বনে ঢাকা, তার উপর আকাশে সাদা মেঘের পতাকা।

সামনের দিকে একটি সুন্দর উদ্যান। সেই উদ্যানে চেনার গাছের তলায় বসে আমরা রুটি মাখন আর টাট্‌কা জল থেকে. তোলা কাঁচা শাক (water cress) খেলাম। জল খেলাম ঝরণা থেকে তুলে। পরিষ্কার স্ফটিকের মত জল। অনেকগুলি গাছতলাতেই লোকজন ছেলেপিলে নিয়ে বসে আছে। কেউবা ঘুমোচ্ছে। কাশ্মীরীদের দেশে ঘরবাড়ী অতি বিশ্রী বলে মানুষে বাগানে থাকতে খুব ভালবাসে।

এই উদ্যানের যে রক্ষী তার নামটা অর্দ্ধেক ফার্সী আর অর্দ্ধেক সংস্কৃত। সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ। এখানে সব কিছুতেই হিন্দু-মুসলমান এইভাবে মিশে আছে। তিলক ফোঁটা কাটা ব্রাহ্মণ পুঙ্গবের নাম বোধ হয় ইখ্‌বালরাম ত্রিবেদী। লোকটি আমাদের খুব যত্ন করল এবং তার অবস্থার একটু উন্নতি করিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করল। বেচারী বোধ হয় মাত্র আট টাকা মাইনে পায়। "কেয়ার-টেকার" বেচারীর 'কেয়ার' নেবার কেউ নেই। তাই সে দীক্ষিত সাহেবকে তার হয়ে একটু অনুরোধ করতে বলছিল। এই উদ্যানে জাহাঙ্গীর নূরজাহান ও সাজাহান প্রভৃতি বিহার করে গিয়েছেন। প্রাচীরে তাঁদের শিলা-লিপি পাওরা দেখাল। রাজভোগ্য উদ্যান হবার উপযুক্ত বটে! যেমন ফলফুলের ঐশ্বর্য্য তেমনি জলের ঐশ্বর্য্য। কিন্তু যত্নের অভাবে সবই ম্লান হয়ে আছে।

ভেরিনাগে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ও মেমসাহেবের যত্নে কিছু খেয়ে আবার যাত্রা করা গেল। দূরে বানিহাল পাস দেখা যাচ্ছে মোটর চালক বললে। ভেরিনাগের উচ্চতা ৬১০০ ফুট, বানিহাল পাস ৯৯০০ ফুট উচ্চে। এদিকে এত উঁচুতে আমরা আসি নি কখনও। গ্রামের পথে একটি শোভাযাত্রা আসছিল এদিকে। আগাগোড়া কাপড়ে মুড়ে কাকে যেন কাঁধে নিয়ে চলেছে একদল লোক। মেমসাহেব বললেন, "মৃতদেহ বুঝি!"

শোনা গেল, "না, কনেকে নিয়ে যাচ্ছে।" বেচারী কনে! নিতান্ত শীতের দেশ না হলে মৃতদেহে পরিণত হতে তার বেশী দেরি হ'ত না।

ক্রমে আমরা বাটোটের দিকে নেমে এলাম। এখানে উচ্চতা ৫১১৬ ফুট। রাত্রে অনেকে এখানে বিশ্রাম করে, পর দিন আবার যাত্রা করে। আমরাও তাই করব ঠিক হ'ল। সাহেবমেমদের ভিড়ে স্থান পাওয়া মুস্কিল ডাক-বাংলোতে। দেখলাম একজন সাহেব shorts-পরা এক পাল মেয়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে কয়েকটা ঘর দখল করল। তাদের সঙ্গে জিনিসপত্র নেই। হেঁটে বেড়াচ্ছে বলে হাল্কা দু-একটা ব্যাগ কাঁধে ঝোলানো। জায়গাটা এমন শান্ত, নিস্তব্ধ ও ঘন পাইন বনে ঘেরা যে হাঁটতে খুব ইচ্ছা হয়। তা ছাড়া মোটর চালানোর পক্ষে কাশ্মীর রাজ্যের রাস্তা খুবই খারাপ। খাদের দিকে অনেক জায়গায় কোনও বেড়া নেই, পথে ক্রমাগত ভাঙা পাথরে হোঁচট খেতে খেতে দু-মিনিট অন্তর মোড় ফিরতে হয়। গাড়ী হর্ণও সর্ব্বদা দেয় না। বাটোটে সুন্দর পাইন বনের মধ্যে ছোট ছোট বাংলোগুলি সাজানো। আমরা অনেক কষ্টে একখানা ঘর পেলাম। মেমসাহেব বেচারী তাও পান না দেখে অনেক বকাবকি করে একেবারে পাহাড়ের মাথায় একটা ছোট ঘর তাঁকে যোগাড় ক'রে দেওয়া হ'ল। সন্ধ্যাবেলা হাল্কা রকম ভাত মাংস একটু জুটল। বিল অবশ্য খুব লম্বাচওড়া।

সকালে উঠে ঘরের ভাড়া, আলোর ভাড়া, তেলের দাম ও মেথর, মুটে, খানসামা, বাবুর্চ্চি প্রভৃতির অসংখ্য বকশিশ মিটিয়ে আবার মোটর চড়ে যাত্রা করা গেল। ঘণ্টা দুই বেশ সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে পথ, কিছু চড়াই। তার পর নীচের দিকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ন্যাড়া পাহাড় ধুলোভরা পথ ও গরম ক্রমে সজোরে আক্রমণ করল। পথ কতক্ষণে শেষ হবে এই জপ করতে করতে তাউই নদীর সুবিস্তীর্ণ বালুকাময় জলহীন গর্ভ অতিক্রম করে জম্মুতে এসে ঢোকা গেল। যে-পথে আমরা শ্রীনগর থেকে জম্মু এলাম তার নাম বানিহাল কার্টরোড, ২০০ মাইল লম্বা।

শীতকালে এই পথে এত বরফ পড়ে যে পথের অনেকখানিতে চলাচল করা যায় না।

জম্মু শ্রীনগরের মত ভাঙা বাড়ীর আড্ডা নয়, মস্ত মস্ত পাকা বাড়ী, প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, প্রকাণ্ড মন্দির সব আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বালাই নেই, মস্ত নদীতে এক ফোঁটাও জল নেই, বড় একটা বালির চড়া, তার মাঝখান দিয়ে খানিকটা লাল মাটির স্রোত। পাশের সব শুকনো পাহাড় থেকে অনেকগুলি বালির স্রোত (?) তাতে এসে পড়েছে। তারও উপরে যে-সব পাহাড় দুধারে দেখা যাচ্ছে সেগুলি Sedimentary rocks, কোনও সময় বোধ হয় জলের তলায় ছিল। এখনও পাহাড়ের গায়ে জলের স্রোতের দাগ আর থাক থাক স্তরীভূত পাথর (sediment) দেখা যাচ্ছে।

জম্মুতে ভীষণ গরম। আমরা আগের রাত্রে লেপের তলায় শীতে কেঁপেছি আর জম্মুতে সারাদিন পাখা চালাতে হয়েছে। এখানকার ডাকবাংলো খুব প্রকাণ্ড। এটা বোধ হয় পুরাকালে রাজপ্রাসাদ ছিল। ডাকবাংলোর বারান্দা থেকে প্রকাণ্ড যে হিন্দু মন্দিরটি দেখা যায়, তার অনেকগুলি চূড়া আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। এই মন্দিরের এলাকা মস্ত, নাম বোধ হয় রঘুনাথ মন্দির। এঁদের লাইব্রেরি, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি এই মন্দির-প্রাঙ্গণেরই ভিতরে। প্রাচীন হিন্দু আদর্শে শিক্ষাদীক্ষার ধারা মন্দিরে প্রচলিত। রঘুনাথ মন্দিরের একজন প্রতিনিধি একদিন এসে আমাদের অনেকগুলি ভাল আম এবং রেশমী রুমাল ইত্যাদি উপহার দিয়ে গেলেন। তাঁদের ভদ্র ব্যবহার ভারি চমৎকার।

জম্মুর প্রিন্স অব ওয়েলস কলেজের প্রিন্সিপাল সপরিবারে আমাদের খুব আদর-অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর একটি আট-নয় বৎসর বয়সের সুন্দর ছেলে আমাদের জন্যে কিছু ফল ইত্যাদি উপহার নিয়ে হোটেলে এল। বিকালে তাঁরা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ালেন। প্রিন্সিপাল সূরী মহাশয়ের স্ত্রী ও কন্যা বেশ মিশুক ও খুব ভদ্র। বোধ হয় ১৭ই ও ১৮ই কলেজ প্রাঙ্গণে ডাঃ নাগের বক্তৃতা হয়। অনেক শিখ, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী ও দু-চার জন বাঙালীও বক্তৃতায় এসেছিলেন।

১৮ই প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আমাদের কিছু দোকানপাট দেখালেন। এখানে বেশ ভাল সিল্ক পাওয়া যায়। জম্মুর সিল্ক খুব মোটা ও টেঁকসই। নানা রঙের আছে। পরে কলেজের কেমিষ্ট্রি ও জিওলজির বিভাগ এক জন বাঙালী অধ্যাপক খুব ভাল ক'রে দেখালেন। এঁদের অনেক সংগ্রহ আছে। বাড়ীটাও খুব বড় এবং সুন্দর। এদেশে কত যে মূল্যবান মণি ও স্ফটিক পাওয়া যায় তার নমুনা কলেজে দেখলাম।

১৯শে ভোর পাঁচটায় টাঙ্গা চড়ে আমরা তাউই ষ্টেশনে এলাম ট্রেন ধরতে। নদীর নাম থেকে জম্মুর এই ষ্টেশনটির নাম তাউই। এবার কাশ্মীর রাজ্য ছেড়ে যাবার পালা। ষ্টেশনে এসে শ্রীনগরের নেডুস হোটেলের কাঠের ঘর দুখানির জন্য আর "উইওসর" নৌকার জন্য মন কেমন

করতে লাগল। শ্রীনগরের চূর্ণ কুসুমপ্লাবিত যে-পথ দিয়ে প্রত্যহ উমাদের বাড়ী যেতাম সেই পথটি আমার খুব প্রিয় ছিল। আর কখনও সে পথে হাঁটব কি না কে জানে? সেই যে মাঝিদের বাচ্চা মেয়ে নূরজাহান আসবার দিন ডাঃ নাগের একটা কোট পেয়ে মহা খুসী হয়ে তার গোলাপী মুখখানি ঘুরিয়ে অনেক বক্তৃতা করল তাকেও আর হয়ত জীবনে কোন দিন দেখব না। তবে শালিমারের জলস্রোত ও ফুলের স্রোত, গন্দরবলের বিরাট চেনার মহীরুহ, মানসবলের স্বচ্ছ স্থির কাচের মত নির্ম্মল জলে শুভ্র মেঘের খেলা, পহলগামের অসংখ্য নৃত্যরতা শুভ্র জলধারা, গিলগিট রোডের নিরন্ধ্র পাইন বন, ঝিলম-ভ্যালি রোডের ঊর্দ্ধমুখী সফেদার সারি এবং কলনাদিনী ঝিলম নদীর উন্মত্ত নৃত্য হয়ত আবার কোনও দিন কাশ্মীর রাজ্যে আমাদের ডেকে নিয়ে যেতে পারে।

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৪

কুঞ্জ ঘোষের সঙ্গে পাল্‌কি করিয়া সেই বহুপরিচিত পথ দিয়া দীর্ঘ ছয় মাস পরে যোগমায়া শ্বশুর-ভিটায় পদার্পণ করিল। শাশুড়ী দোরগোড়াতেই দাঁড়াইয়াছিলেন। পাল্‌কি আসিয়া থামিতেই তিনি নিজে একরূপ ছুটিয়া পাল্‌কির দুয়ার খুলিয়া যোগমায়ার কোল হইতে খোকাকে টানিয়া নিজের কোলে লইলেন ও চুমায় চুমায় তাহার দুটি গাল রাঙাইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, আমার ধনমণি, আমার যাদুমণি, আমার বংশধর।

পাড়ার অনেকেই ছেলে দেখিতে আসিলেন। সকলেই ছেলের সুখ্যাতি করিয়া কহিলেন, বেশ ঠাণ্ডা নাতি হয়েছে গো। কোল বাছাবাছি নেই, কান্না নেই। আহা, বেঁচে থাক্।

সেই প্রাচীর-ঘেরা বাড়ির মধ্যে সেই প্রশস্ত উঠান। আম, কাঁঠাল, লেবু গাছগুলি আসন্ন শীতের মুখে ঈষৎ যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সারারাত্রি হেমন্তের শিশিরে ভিজিয়া—সকালবেলাতেই পাতাগুলি হইতে জল ঝরিতে থাকে—টুপটাপ্। বেলা আটটা হইতে চলিল—তখনও রৌদ্রের তেজে শিশির-বিন্দু শুকায় নাই। বেলা খাটো হইয়া আসিতেছে; সূর্য্যও উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে সরিয়া আসিতেছেন। সকালের দিকটা প্রায় ঠিক আছে—সন্ধ্যার দিকটা সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। যোগমায়াদের উঠানে আম-কাঁঠালের শাখাপত্র ভেদ করিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা রৌদ্র উঠানময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে রৌদ্র শোভাই বৃদ্ধি করে, শীত নিবারণ করে না।

পা ধুইয়া যোগমায়া ঘরে আসিয়া বসিল। খোকার জন্য শাশুড়ী একখানি রেলিং-দেওয়া ছোট খাট তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছেন। সেই খাটে পরিপাটি করিয়া ছোট বিছানা পাতা থাকে। মাথায় বালিশ, দু'পাশে বালিশ, পায়ের তলায় বালিশ। খাটের উপর একটা বিচিত্রিত কাঠের পুতুল ও একটা লাল চুষিকাঠি রহিয়াছে, মাথার উপর কাগজের লাল ফুল টাঙানো।

ছেলে শাশুড়ীর কোলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনি খাটের দিকে অগ্রসর হইতেই যোগমায়া অস্ফুটস্বরে বলিল, ওর দুধ খাবার সময় হয়েছে, মা।

শাশুড়ী খোকাকে সন্তর্পণে খাটে শোয়াইয়া তাহার গায়ে মৃদু চাপড় দিতে দিতে বলিলেন, তা হোক, খিদে পেলে ও আপনি জেগে উঠবে। ঘুমন্ত ছেলেকে কখনও উঠিয়ো না, বউমা।

হাত পা ধুইয়া যোগমায়া আমতলার ঘরের পানে চাহিতেই শাশুড়ী বলিলেন, আহা, ঠাকুরঝি—আমার বংশধরকে দেখে যেতে পারলে না। কত সাধ ছিল—তোমার ছেলে মানুষ করবে। আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলেন।

যোগমায়া আমতলার ঘরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। না, ও ঘরের শিকল খুলিয়া নিষ্ঠুর সত্যকে জানিয়া লাভ নাই। তিনি যেখানেই থাকুন, এই বাড়িতে

কিংবা আকাশের উপর, যোগমায়ার কাছে তো তাঁহার মৃত্যু নাই। যে স্নেহ যোগমায়ার অন্তরে তিনি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন—সেই স্নেহই আজ যোগমায়ার অন্তর উপ্‌চাইয়া আর এক ক্ষুদ্র আধারে সঞ্চারিত হইতেছে ধীরে ধীরে। 'রঘু'র সেই এক দীপ হইতে আর এক দীপ জ্বালার উপমা। ও উপমা রামচন্দ্র একদিন যোগমায়াকে বলিয়াছিল। এই অনির্ব্বাণ দীপ সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে জ্বলিয়া—কত নর-নারীর অন্তরের মণিকোঠা যে আলোকিত করিয়া তুলিতেছে আজ অবধি—আদি-অন্তের সেই ইতিহাস কোন মানুষই বুঝি লিখিয়া শেষ করিতে পারিবে না! ওই সূর্য্য যেমন কত দিন হইতে পূর্ব্বে উঠিয়া পশ্চিমে ঢলিয়া পড়েন, সঙ্গে সঙ্গে কলা-আবর্ত্তনে দেখা দেন চাঁদ, আকাশে একে একে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়া উঠে—প্রকৃতির আবর্ত্তনে সংসারও চলিতেছে তাল রাখিয়া। সূর্য্য কোন দিন মধ্যআকাশে দেখা দেন না, সূর্য্যের পাশে নক্ষত্র কোন দিন ফুটিয়া উঠে নাই। স্নেহের ধারা নদীধারার মত নিম্নগামী। ছোটদের সঙ্গে—অবোধদের সঙ্গে তার কারবার।

আহারাদি শেষ হইলে—খোকাকে কোলের কাছে লইয়া শাশুড়ী শয়ন করিলেন। যোগমায়াও খানিক সেখানে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। ক্রমে শাশুড়ীর তন্দ্রাকর্ষণ হইল, তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। একটু পরে খোকার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ওদের ঘুমও যেমন পাতলা—জাগরণও তেমনই অল্পক্ষণের জন্য। পাখীর ছানার মত প্রহরে প্রহরে ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদিয়া উঠে শিশু—বুকে মুখ ঘষিয়া মাতৃস্তনের সন্ধান করে।

ছেলেকে কোলে চাপিয়া যোগমায়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নিস্তব্ধ দুপুর। চরকার গুন্‌গুনানি নাই, ও ঘরে শিকল দেওয়া। উঠান পার হইয়া যোগমায়া আমতলার ঘরের রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর সন্তর্পণে ঘরের শিকল খুলিল। সন্তর্পণে—কেননা শাশুড়ীর ঘুম ভাঙিয়া যাইতে পারে। পিসিমার সঙ্গে যোগমায়ার যত কিছু গোপন হৃদয়-কথা—সবই চলিত শাশুড়ীর অগোচরে। তিনি জল আর যোগমায়া যেন বালুচর। উপরে সংসারের কঠোর কর্ত্তব্যের সূর্য্য-কিরণে সে বালু চিক্ চিক্ করিয়া জ্বলে,—বালুর নীচের স্নিগ্ধ জলের ধারার মতই যোগমায়ার সঙ্গে তাঁর সংযোগ।

ধীরে ধীরে দুয়ার খুলিল যোগমায়া। একটা ভাপ্‌সা গন্ধ বাহির হইল ঘর হইতে, যোগমায়ার বুকও বুঝি একবার দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। জীবনের রাজ্যে যে-মানুষের সঙ্গ কামনা করিয়া পরম প্রিয় ভাবিয়াছে এত দিন, মরণের রাজ্যে গিয়া তিনি যোগামায়ার ভয়ের বস্তু হইয়া দাঁড়াইলেন। ভয় ত যোগমায়ার জন্য নহে—খোকার জন্য। কি জানি, অশুভ দৃষ্টিতলে কচি ছেলের যদি কোন অমঙ্গলই ঘটে! মনে মনে দুর্গানাম স্মরণ করিয়া যোগমায়া সেই ঘরের একমাত্র জানালাটাও খুলিয়া দিল। ঘরে আলো আসিতেই তার ভয় ভাঙিয়া গেল। ঘরের সব জিনিসই তেমন আছে, নাই শুধু পিসিমা। ঘোমটা-দেওয়া সলজ্জা নববধূটির মত সামনে চরকা রাখিয়া এক হাতে তুলার পাঁজ—অন্য হাতে চরকার হাতল ঘুরাইয়া চলিতেছেন না তিনি। ঘরের মেঝেয় ধুলা জমিয়াছে কিছু। আরশুলা এখানে-ওখানে উঁকি মারিতেছে।

সেই ধুলার উপর ছেলে কোলে করিয়া বসিয়া পড়িল যোগমায়া। বসিয়া ভাবিল, কোথায় গেলেন পিসিমা? বকুনি খাইয়া সেই হাসি-হাসি মুখ, সেই ধীর প্রশান্ত মিষ্ট কথাগুলি, সেই সন্তর্পিত চলন,—কোথায় গেলেন তিনি? মানুষ কেনই বা এমন ভাবে না বলিয়া এক দিন কোথায় চলিয়া যায়। সই এমনই নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে—পিসিমাও গেলেন। সবাই বুঝি অমনই নিঃশব্দে পলাইয়া যায়। সুখের ভাগ যাহাদের ভাগ করিয়া দিবার কথা, যাহাদের সুখ বিলাইয়া আনন্দ চতুর্গুণ হয়—তাহারাই একে একে নিঃশব্দে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল!

খোকা না কাঁদিলে যোগমায়া আরও কতক্ষণ ধরিয়া সেই ধুলায় বসিয়া ওই সব কথা ভাবিত বলা যায় না। খোকার কান্নায় সে চিন্তার জগৎ হইতে বাস্তবের মৃত্তিকায় পা দিল। মুখে ঘোমটা টানিতে গিয়া দেখিল দুটি গণ্ড চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছে; অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়াছে যোগমায়া।

রাত্রিতে আকাশে নক্ষত্র উঠিলে—অনেকক্ষণ যোগমায়া সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। ওগুলির মধ্যে কোন্‌টি তাহার পিসিমা, কোন্‌টি বা সই? ওই ডবডবে উজ্জ্বল তারাটি? না না, সই যখন বাঁচিয়া ছিল—তখনও ত ও তারাটি প্রতি সন্ধ্যায় উঠিত। ওর পাশে ওই মিটমিটে তারাটি? হইতে পারে। প্রত্যেক সন্ধ্যায় আকাশের যবনিকায় কত নক্ষত্র যে নবজন্ম লাভ করিতেছে—কে তাহার সংখ্যা গণনা করিবে বল! কত তারার স্বর্গধাম সমাপ্ত হইলে ওখান হইতে খসিয়া পড়ে, কত তারা মর্ত্ত্যের অক্ষয় পুণ্য লইয়া অনন্ত স্বর্গ ভোগ করে। একটা চোখ

বন্ধ করিয়া আরেকটা চোখ চাহিলে—তারারা চোখের উপর আলোর রেখা ফেলে। আলোর রেখা নয়, ওদের সস্নেহ স্পর্শ।

একটি দিনই যোগমায়া এই সব চিন্তা করিবার অবসর পাইল। পরের দিন হইতে একটি বেঁটে-মত বিধবা আসিয়া শাশুড়ীকে বলিল, দিদি, একটা কথা তোমায় বলি। গরীব দুঃখী মানুষ—গতর খাটিয়ে খাই, কখন বাড়ি থাকি-না-থাকি, বউমাকে খাইয়ে-দাইয়ে তোমাদের বউমার কাছে রেখে যাই।

শাশুড়ী বলিলেন, বেশ ত, দুটিতে গল্প করবে বসে বসে। আমারও এদিক-ওদিক ঘুরতে হয়, ঠাকুরঝি ছিলেন—কত ভরসা ছিল। বেশ ত ভাই, বউমাকে তুমি রোজ রেখে যেয়ো।

পর দিন বেলা এগারোটার পর একটি ছোট্ট বউকে লইয়া তাহার শাশুড়ী যোগমায়াদের বাড়িতে রাখিয়া গেলেন। যোগমায়াদের তখন রান্না চড়িয়াছে মাত্র। কালো ছোট বউ—কতই বা বয়স, যোগমায়ার অর্দ্ধেকই হইবে—বড় জোর বছর-দশেক। নাকে নোলক, পায়ে মল, কোমরে রূপার গোটও একগাছি আছে। সোনার গহনা শুধু দুই হাতে মুড়কি-মাদুলি, উপর হাতে কিছু নাই। হাঁ, আর দুই হাত ভরিয়া অনেকগুলি এয়োতির লোহা আছে।

ঘোমটার মধ্য দিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতেছে বউটি। তাহার শাশুড়ী চলিয়া গেলে যোগমায়া পিঁড়ি পাতিয়া তাহাকে বসাইল। আলাপ করিবার জন্য বলিল, তোমার নামটি কি ভাই?

বউটি মুখ না তুলিয়াই বলিল—শ্রীমতী নিস্তারিণী দাসী।

—কাদের বউ তুমি ভাই? আমি ত কাউকে চিনি না।

বউটি বলিল, তিলিদের বউ। উই যে আপনাদের পাড়া ছাড়িয়ে নিকুড়ি পাড়ার প্রথমেই যে বাড়ি। কালো হইলেও বউটির মুখখানি বেশ। চোখ দু'টি ডাগর, নাকটি ঈষৎ খাঁদা এবং খাঁদা বলিয়াই গোলগাল মুখখানি বেশ মানাইয়াছে। লজ্জা বউটির আছে, তবে সে-লজ্জার আগাছা দিয়া আলাপের ফুলগাছগুলিকে সে চাপা দিয়া রাখিল না। দশ বছরের মেয়ে, কথা শুনিয়া যোগমায়ার মনে হইল,—গৃহিণী-পদবীতে উঠিবার সাধনা ওর যেন শেষ হইয়া গিয়াছে—অনেক আগে। এই গ্রামকে—যোগমায়া যা জানে না—নিস্তারিণী অনেক বেশি জানে। বলিল, আপনাদের বাড়ি এই প্রথম এলাম, দিদি—কিন্তু বেশ লাগছে। সুষ্যি কলুদের বাড়ি মা ক'দিন বসিয়ে রেখেছিলেন, প্রাণ যেন হাঁপাই-হাঁপাই করে।

যোগমায়া বলিল, কেন কলুবাড়ির ঘানিঘোরা দেখতে ভাল লাগত না?

নিস্তারিণী বলিল, অরুচি! ক্যাঁ কোঁ ক'রে ঘুরচে ত ঘুরচেই রাতদিন। যে দুর্গন্ধ ঘরে। ছেলেগুলো দিনরাত চেঁচায়, শাশুড়ীতে-বউতে খেয়োখেয়ি ঝগড়া—

যোগমায়া হাসিল, এখানে ছেলের চীৎকার নেই, ঝগড়াও নেই।

নিস্তারিণী বলিল, বেশ ঘরটি আপনার দিদি—খোকাটিও কেমন শান্ত। দেবেন আমার কোলে? কাঁদবে না তো?

যোগমায়া বলিল, না, খোকনের আমার কোল বাছা-বাছি নেই। এই দেখ, টুঁ শব্দটি করলে না।

নিস্তারিণী বলিল, রোজ রোজ দেবেন ত আমার কোলে? আমি কিন্তু খোকাকে দুধ খাইয়ে দেব।

—দিও।

—আচ্ছা, কি নাম রেখেছেন এর?

—নাম? নাম ত এখনও হয় নি ভাই। মা বলেন—হারাধন, আমি বলি, মধুসূদন।

—আপনার বর কি বলেন?

তিনি বলেন—বিমল। আজকাল নাকি পুরোনো নাম রাখার রেওয়াজ নেই।

—কেন দিদি, ঠাকুর-দেবতার নাম কি মন্দ? বেশ ত ভাল নাম।

—কি জানি, ওঁদের পছন্দ। চিঠিতে ওই নিয়ে আমাদের কত ঝগড়া হয়।

—চিঠিতে ঝগড়া? সে কি রকম দিদি?

—কেন, চিঠি লিখতে জান না তুমি?

নিস্তারিণী মাথা নাড়িয়া বলিল, না ত।

—ও আমার কপাল! আচ্ছা তোমার বরকে যখন চিঠি লিখবে—আমার কাছে এসো—লিখে দেব।

নিস্তারিণী মুখ নামাইয়া বলিল, তাঁকে চিঠি লিখব কি ক'রে? তিনি ত বাড়িতেই থাকেন।

—বাড়িতে থাকেন? কি করেন?

—পাঁচকড়ি বিশ্বাসের দোকান আছে—চাল, ডাল, নুন, তেল এই সব বেচে কিনা। সেইখানে চাকরি করেন।

—ও। তা কখন দোকানে যান তিনি?

—এই ত খাওয়া-দাওয়া ক'রে তিনি গেলেন দোকানে, আমি এলাম আপনাদের বাড়িতে।

—ও।

শাশুড়ী ডাকিলেন, বউমা, খাবে এস।

খোকাকে লইবার জন্য যোগমায়া হাত বাড়াইল। নিস্তারিণী বলিল, আমার কোলেই থাক না দিদি। আপনি খেয়ে আসুন।

—তোমার ত কষ্ট হবে ভাই।

—কেন কষ্ট হবে! পাঁচ বছর বয়স থেকে মা'র ছেলে বইছি। আমার অভ্যেস আছে দিদি।

—ছেলে কাঁদলে রান্নাঘরে দিয়ে এসো।

—আচ্ছা। একটু থামিয়া বলিল, আমি রান্নাঘরে গেলে আপনার শাশুড়ী বকবেন না?

যাইতে যাইতে যোগমায়া দাঁড়াইল। একটু কি ভাবিয়া বলিল, রান্নাঘরের রোয়াকে কি দোরগোড়ায় দাঁড়ালে কি আর বলবেন। উনি সে রকম মানুষ নন্।

অসমবয়সী, তবু, খোকাতে আর নিস্তারিণীতে যোগমায়ার মনের ফাঁকগুলি অতি দ্রুত পূরণ করিয়া দিল। এখন আমগাছতলার ঘরটিতে গিয়া বসিলে মন হু-হু করিয়া উঠে না, রাধারাণীও অনেকখানি অন্তরালে পড়িয়াছে। কোন সঙ্গীহীন নিরালা মুহূর্ত্তে হয়ত রাধারাণীর কথা মনে পড়িয়া যায়, কোন দ্বিপ্রহরে নিস্তারিণী না আসিলে আমতলার ঘরটিতে চরকার শব্দ শুনিবার জন্য কান হয়ত সচকিত হইয়া উঠে। সে কতক্ষণের জন্যই বা! খোকাকে খাওয়াইতে, টিপ ও কাজল পরাইতে, ভিজা গামছা দিয়া গা মুছাইতে, আদর করিতে অনেকখানি সময়ই যোগমায়ার কর্ম্মব্যস্ততায় কাটিয়া যায়। তার উপর জ্যেঠ্‌শ্বশুরের ভিটায় আবার পালং শাক, লাউ, সিম ও লঙ্কাগাছ সুরু দেওয়া হইয়াছে. সেখানেও সকাল-বিকালের খানিকক্ষণ কাটে। তা ছাড়া, সন্ধ্যা-দেখানো যোগমায়া নিজের হাতে লইয়াছে। কুষ্টিয়ার অভ্যাসটুকু সে ত্যাগ করিতে পারে নাই। যেদিন কোন কারণবশতঃ সে তুলসীতলায় সন্ধ্যাদীপ রাখিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিতে পায় না, সেদিন ভাল করিয়া ঘুমও যেন যোগমায়ার হয় না। অসন্তুষ্ট দেবদেবীরা আসিয়া সারারাত্রি অনুযোগ করিয়া যোগমায়ার পাতলা ঘুমটুকু ভাঙিয়া দেন। তাই সন্ধ্যার দীপ জ্বালিবার ও শুভ শঙ্খধ্বনি করিবার পূর্ব্বে—শাশুড়ীর কোলে ছেলেকে দিয়া সে বলে, একে একটু ধরুন ত, মা।

শাশুড়ী সন্ধ্যা-দেখানোর চেয়ে নাতি কোলে করিয়া বসিতেই ভালবাসেন। নাতিকে কোলে লইয়া বলেন, অমনি হরিনামের ঝুলিটাও পেড়ে দাও মা। জপটা সেরে নিই।

আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া বাঁ-হাতের তালুর নীচে খোকার মাথাটি রাখিয়া ঈষৎ হাঁটু দোলাইতে দোলাইতে ডান হাতে মালা জপ করিতে থাকেন। ঠাকুরের নাম বা খোকার স্পর্শ কোন্‌টি তাঁহাকে বেশি অভিভূত করে, কে জানে! একসঙ্গে পারলৌকিক কর্ত্তব্য সারা ও ইহলৌকিক সাধ মিটানো দুইই তাঁর হয়।

ক্রমশঃ

বন-মায়া

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

কে তুমি বন-পথে চলিছ একাকিনী!
চরণে রণিতেছে নূপুর রিনি-ঝিনি।
সে-ধ্বনি শুনি মম পরাণ উন্মনা,
কমল-পাতে যেন কাঁপিছে জল-কণা।
স্বপন-পসারিণী, অচেনা মায়াবিনী!
কে তুমি বন-পথে চলিছ একাকিনী॥

নূপুর-ধ্বনি শুনি শিহরে বন-ভূমি,
দখিনা কহে কেঁদে, 'কে তুমি, কে গো তুমি!'
ফুলেরা ঝরে গেল পুলকে দলে দলে,
জ্যোছনা লুটাইছে শ্যামল-বনতলে।
পাপিয়া পিউ-তানে গাহিছে উদাসিনী!
কে তুমি বন-পথে চলিছ একাকিনী॥

লিপিকার সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

(৬)

দার্জ্জিলিং
২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

বন্ধুবরেষু*
আমি এখন বসে আছি সাত শ' তলার ঘরে
বাতাস হেথা মলিন বেশে পশিতে ভয় করে।
(১) ফিরোজা রং আকাশ হেথা মেঘের কুচি তায়
গরুড় যেন স্বর্গপথে পাখনা ঝেড়ে যায়।
অস্তরবির আভা লাগে পূর্ণিমা চাঁদে
শীর্ণ ঝোরা যক্ষনারীর দুঃখেতে কাঁদে
তবুও (২) এখন নাই অলকা নাই সে যক্ষ আর
মেঘের দৌত্য সমাপ্ত, হায়, কবি কল্পনার।

*　　*　　*

হঠাৎ এল কুজ্ঝটিকা হাওয়ায় চড়িয়া
ধুম পাহাড়ের বুড়ী দিল মন্ত্র পড়িয়া
কুহেলিকার কুহকে হায় সৃষ্টি ডুবিল।
ঝাপসা হ'ল কাছের মানুষ দৃষ্টি নিবিল।
ভস্মভূষণ ভোলানাথের অঙ্গ বিভূতি
বিশ্ব 'পরে ঝরে যেন বিশ্ব বিস্মৃতি
সকল গ্লানি যায় ধুয়ে গো দৈব এই স্নানে,—
অরুণ আভা অঙ্গে জাগে আমার পরাণে!

*　　*　　*

ক্ষণেক পরে আবার ভাঁটা পড়ে কুয়াশায়,
গুল্ম ঘেরা পাপড়িগুলি আবার দেখা যায়;
নীল আকাশের আব্‌ছায়াতে নিলীন তরু তায়;
"কাঞ্চি" মণির দুল দুলিয়ে হাল্কা হাওয়া বয়!
মেঘ টুটে, ফের ফুটে ওঠে আকাশ ভরা নীল,—
নীল নয়নের গভীর দিঠি যেথায় খোঁজে মিল;
শান্তি হ্রদে সাঁতারি তার মিটে না আশা,
নীল নীড়ে হায় আঁখি-পাখীর আছে কি বাসা?

*　　*　　*

সাঁতার ভুলে মেঘ চলে আজ লস্করী চালে,
অস্তরবির সোহাগ তাদের গুমর বাড়ালে।
মেঘের বুকে কিরণ-নারী পিচকারী হানে,
রাম ধনুকের রঙ্গীন মায়া ছড়ায় বিমানে,
মেঘে মেঘে পান্না চুনীর লাবণ্য লাগে,
আচম্বিতে তুষার গিরি উদ্যত জাগে।
দিব্য লোকের যবনিকা গেল কি টুটি'?
অপ্সরীদের রঙ্গশালা উঠে কি ফুটি'?

*　　*　　*

গিরিরাজের গায়েবী টোপর ওই গো দেখা যায়,-
স্বর্ণ-সারে সিঞ্চিত কি স্বর্গ-সুষমায়!
পায়ের কাছে মৌন আছে পাহাড় লাখে লাখ;
আকাশ-বেঁধা শুভ্র চূড়া করেছে নির্ব্বাক্!
নরচরণ-চিহ্ন কভু পড়ে নি হোথায়;
নাইক শব্দ, বিরাট স্তব্ধ—আপন মহিমায়!
সন্ধ্যা-প্রভাত অঙ্গে তাহার আবীর ঢেলে যায়,
রুদ্ধগতি বিদ্যুতেরি দীপ্তি জাগে তায়!
শিখায় শিখায় আরম্ভ হয় রঙীন মহোৎসব,
বিদুর ভূমে রত্ন ফসল হয় বুঝি সম্ভব!
মর্ত্তে যদি আনাগোনা থাকে দেবতার—
ওই পাদপীঠ তবে তাঁদের চরণ রাখিবার।

*　　*　　*

ওই বরফের ক্ষেত্রে হলের আঁচড় পড়ে নাই,
ওই মুকুরে সূর্য্য, তারা, মুখ দেখে সবাই।
হোথায় মেঘের নাট্যশালা, রঙ্গ কুয়াসার
হোথায় বাঁধা পরমায়ু গঙ্গা-যমুনার!
ওইখানেতে তুষার নদীর তরঙ্গ নিশ্চল,
রশ্মি-রেখার ঘাত-প্রতিঘাত চলছে অবিরল।
উচ্চ হতে উচ্চ ও যে মহামহত্তর
নির্ম্মলতার ওই নিকেতন অক্ষয়-ভাস্কর!

*　　*　　*

---

* এই চিঠিখানি কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচির ঠিকানায় পাঠান হইয়াছিল (স্বর্গত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্দেশ্যে)।

(১) ছাপাইবার সময় এই দুইটি লাইন এইরূপ পরিবর্ত্তন করা হয়।

"ফিরোজা পাথরের মত নীল আকাশের গায়
স্বর্গ লোকের যাত্রী গরুড় পাখনা ঝেড়ে যায়।

(২) ছাপাইবার সময় 'তবুও' স্থানে 'যদিও' করা হয়।

হয় তো হোথাই যক্ষপতির অলকা নগর
হয় তো হবে হোথাই শিবের কৈলাস-ভূধর ;
রজত গিরি শঙ্খ বেড়ি অঙ্কোপরি হায়
কিরণময়ী গৌরী বুঝি ওই গো মুরছায় !
হয় তো আদি বুদ্ধ হোথায় সুখাবতীর মাঝে
অবলোকন করেন ভূলোক সাজি কিরণ সাজে !
কিংবা হোথা আছে প্রাচীন মানস সরোবর,
স্বচ্ছ শীতল আনন্দ যার তরঙ্গ নিকর !
কবিজনের বাঞ্ছা বুঝি হোথাই পরকাশ—
সরস্বতীর শুভ্র মুখের মধুর মৃদু হাস !

* * *

লামার মুলুক লাসা কি ওই ঢাকা কুয়াশায় ?
বাংলা দেশের মানুষ যেথা আজো পূজা পায় !
এই বাঙালী পাহাড় ঠেলি' উৎসাহ শিখায়
ঘুচিয়েছিল নিবিড় তমঃ নিজের প্রতিভায়।
এই পথেতে গেছেন তাঁরা দেখেছেন এই সব,
এইখানে উঠেছে তাঁদের হর্ষ-কলরব !
এমনি ক'রে স্বর্ণ শৃঙ্গ বিপুল হিমালয়,—
আমার মত তাঁদের প্রাণেও জাগিয়েছে বিস্ময়।
দেশের লোকের সাড়া পেয়ে আজ কি তাঁহারা
চেয়ে আছেন মোদের পানে আপনা হারা ?
চোখে পলক নাইক তাঁদের—পড়ে না ছায়া,
মমতা কি যায় নি তবু—ঘোচে নি মায়া ?
তাই বুঝি হায় ফিরে যেতে ফিরে ফিরে চাই,
কে যেন, হায়, রইল পিছে, কাহারে হারাই !
সন্ধ্যা এসে ডুবিয়ে দিল রঙীন চরাচর
অনিচ্ছাতে রুদ্ধ হ'ল দৃষ্টি অতঃপর।
উঠ্‌ল সেজে সাঁঝের আলোয় দার্জ্জিলিং পাহাড়,
ফুটল যেন ভুবন-জোড়া গাঁদা ফুলের ঝাড় !
কুজ্ঝটিকায় সাঁঝের আঁধার দিগুন কালো,
অরুণ ছটায় ছাতা মাথায় হাসে গ্যাসের আলো।
তখন দুয়ার বন্ধ ক'রে বন্ধ ক'রে সাসি
অন্ধ-করা অন্ধকারে স্বপন-সুখে ভাসি।
ঘুমের বুড়ীর মন্ত্র মোহ অমনি তখন খসে
চেনা মুখের ছবিগুলি ঘিরে ঘিরে বসে !
ঘোর নিশীথে দারুণ শীতে কষ্ট যখন পাই
ইচ্ছা করে কৃচ্ছ-সাধন পাহাড় ছেড়ে যাই ;
শিক্ষা-শাসন হেথা ; সেথায় হরষ হিন্দোল,
এ যে কঠোর গুরুগৃহ সে যে মায়ের কোল।
তাই নিশীথে ঘরের কথা জাগে সে সদাই,
মেঠো দেশের মিঠে হাওয়ায় গা মেলিতে চাই।
সংগোপনে শব্দ যোজন করি দু'চারিটি
সশরীরে যেতে না পাই তাই তো পাঠাই চিঠি।
ভগ্ন স্বাস্থ্য কর্ত্তে আস্ত পড়ছে ভেঙে মন,
ডাক পিয়নের মূর্ত্তি ধেয়ান করে সকল ক্ষণ ;
তাই অনুরোধ মাঝে মাঝে পত্র যেন পাই,
চিঠির ভেলায় প্রবাস-পাথার পার ক'রে নাও, ভাই !

ইতি*

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(৭)

রবিবার†

৪৬, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট

সুহৃদ্বরেষু

ধীরেন, তোমার চিঠি কলিকাতায় আসিয়া পাইয়াছি। তুমি বোলপুরে যাইবার আগেই কলিকাতা আসিবার ইচ্ছা ছিল নানা কারণে দেরী হইয়া গেল।

শুনিলাম বোলপুরে নূতন কূপ খনন হইতেছে। শেষ হইয়াছে কি ? তোমার অধ্যয়ন অধ্যাপনা কেমন চলিতেছে ? অজিতবাবুর সংবাদ কি ? আমার লেখা বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। নূতন খাতা নূতনই ফিরিয়াছে। তিন চারিটি কবিতা দার্জ্জিলিঙে লিখিয়াছি। এখানে আসিয়া কয়েকটা অনুবাদ করিয়াছি। অনুবাদগুলা শীঘ্রই প্রেসে দিব। পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর নামে উৎসর্গ করিতেছি। "তীর্থ সলিল" নামটা তোমার কেমন বোধ হয় ? নানা দেশের, নানা তীর্থের সংগ্রহ—কেমন ? এখানে গত মঙ্গলবার হইতে একাদিক্রমে বৃষ্টি হইতেছে। আজ একটু ভাল। তবে রৌদ্রের দেখা নাই।

আমি ১৪ই জুন কলিকাতায় আসিয়াছি। প্রথম দুই দিন ভয়ানক গরম সহ্য করিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ দার্জ্জিলিং হ'তে এসে।

দ্বিজেনবাবু আজ সকালে আমাদের এখানে এসেছিলেন। খবর ভাল। উপেনবাবুর খবর ভাল। ফকিরের‡ বিবাহ ২৪শে আষাঢ়। সে তার পাঁচ-সাত দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় আসবে। তুমি শারীরিক কেমন আছ ? আমি একরূপ ভালই আছি। চিঠির উত্তর দিয়ো। ইতি

প্রীতিপ্রয়াসী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

* এই কবিতাটি 'কুহু ও কেকা'-তে প্রকাশিত হইয়াছে।
† তারিখ নাই। শীর্ষে চিরাভ্যস্ত 'বন্দেমাতরম' নাই।
‡ কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচির ভ্রাতুষ্পুত্র।

শনিবার (১)

বন্দেমাতরম*

(৮)

সুহৃদ্বরেষু

সম্প্রতি আমি একটা অত্যন্ত বিরক্তিজনক কাজে ব্যস্ত আছি। অর্থাৎ সেই অনুবাদগুলিকে (২) নকল কচ্ছি। সাত-আট দিনের মধ্যে ছাপাখানায় দেবো। সুতরাং তোমার ১১ই আষাঢ়ের চিঠির উত্তর ২৭শে আষাঢ় লিখতে বসেছি। ফকিরের বিবাহ হ'য়ে গেল। বৃষ্টির জন্যে ইচ্ছে সত্বেও যেতে পারি নি। মেয়েটির Photo দেখেচি চেহারা ভালই।

দার্জ্জিলিঙে অবসর ছিল বটে কিন্তু সুবিধা ছিল না। Sanitoriumটি হট্টগোলের পীঠস্থান বেশীক্ষণ একলা থাকিবার জো নাই। একজন না একজন শান্তিভঙ্গ করিতেছেনই। সুতরাং লিখিবার অনুকূল হাওয়া দার্জ্জিলিঙে থাকিলেও Sanitorium-এ নেই। স্টার থিয়েটারের অভিনেতা অমৃত মিত্র সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। শুনিয়াছ কি? ভনির (৩) সঙ্গে এক দিন রাস্তায় দেখা হইয়াছিল।

পূজনীয় রবীন্দ্রবাবু এখন শারীরিক কেমন আছেন? তুমি এখন Sandow'র মতে exercise করছ? তোমার শরীর কেমন? চিঠির উত্তর দিতে আমার মত দেরী করিয়ো না।

প্রীতিপ্রয়াসী
শ্রীসত্যেন্দ্র—

(৯)

৮ই শ্রাবণ

সুহৃদ্বরেষু

দ্বিজেনবাবু এখনও দেশ থেকে ফেরেন নি, ডাক্তার-বাবুও না। জগদীশও এসেছে। তেঁতুর ভাই রামদাসের(৪) মুখে শুনিলাম বোলপুর হইতে "সাধনা"র মত আর একখানি মাসিকপত্র বাহির হ'বে। সত্য কি? আমাদের যতীনবাবু (বাগচী) নাকি তার সম্পাদক হ'বার জন্য রবিবাবু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হ'য়েছেন? সবিশেষ লিখবে। "বৌঠাকুরাণীর হাট" নাটকাকারে পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধের মত নয় ত?* "যৎকিঞ্চিৎ" (১) শুনিতেছি ভাল হয় নাই। অমৃত মিত্রের জন্য এক শোকসভা হয়েছিল। * * চম্পটির সঙ্গে আর দেখা হয় নি। কিরণ(২) ভাল আছে। মেজদার(৩) খবর জানি না। হোদো'র(৪) সংস্কার কার্য্য শেষ ত হয় নি, কবে হ'বে তাও বলা কঠিন।

তোমার শরীর বিশেষ ভাল নেই—অর্থ কি? জ্বর নাকি? সবিশেষ খুলে লিখবে।

কাল সন্ধ্যায় ভনির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তোমাদের বাড়ীর খবর ভাল।

অজিতবাবুর খবর কি? পূজনীয় রবীন্দ্রবাবু কোথায়? সিলাইদহে?

সুকিয়া ষ্ট্রীটে এক পাবলিসিং হাউস হয়েছে। ম্যানেজার দেখিলাম চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। "প্রবাসী"র চারুবাবু বোধ হয়। গদ্য গ্রন্থাবলী ছাপানোর ভার নাকি ওরাই মজুমদারদের কাছ থেকে নিয়েচে। তোমাদের আশ্রমের সংবাদ কি?

'উদ্বোধনে' হোমশিখার একটা সমালোচনা বেরিয়েছে। মোটের উপর ভালই বলেছে। এবং উহার সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দ নাকি আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

শ্রীসত্যেন্দ্র

(১০)

৩১ জুলাই

বন্দেমাতরম†

সুহৃদ্বরেষু,

দ্বিজেন বাবুরা আজ দু'দিন হ'ল কলকাতায় ফিরেচেন। নকল করা কাজটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। সুতরাং আজোও তা শেষ ক'রে উঠ্‌তে পারি নি। প্রমথ

(১) তারিখ নাই।

* হাতে লেখা নয়। চিঠির কাগজে মুদ্রিত। ঐ ধরণের চিঠির কাগজ তখন বাজারে পাওয়া যাইত।

(২) 'তীর্থ সলিলে' স্থান পাইয়াছে।

(৩) স্বর্গত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যম ভ্রাতা

† সহাধ্যায়ী।

(৪) অধ্যাপক রামদাস খাঁ যাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধ লইয়া গোলযোগ ঘটিয়াছিল।

* কোনও সাহিত্যিক অথবা সাহিত্য ক্ষেত্রে বিচরণকারী ব্যক্তি একদা এই ভাওতা দিয়া নিজের মান বাড়াইবার চেষ্টায় ছিলেন যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বৌ-ঠাকুরাণীর হাট নাটকাকারে পরিবর্ত্তনের ভার দিয়াছেন। কথাটির মূলে কোনও সত্য ছিল না।

(১) শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নাটক

(২) অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসুর পুত্র ব্যারিষ্টার কিরণ বসু।

(৩) হিরণ্ময় রায়

(৪) হেদুয়া পুকুর কবি সত্যেন্দ্রনাথের সান্ধ্য ভ্রমণের প্রিয় ক্ষেত্র ছিল।

† চিঠির কাগজে মুদ্রিত

বাবুর ভাগিনেয়ী বিভার আগামী রবিবারে বিবাহ। আমাদের ললিত বাবুর (১) মেয়েরও ঐ দিন বিবাহ। 'যৎকিঞ্চিৎ' বইটা এখনো হাতে এসে পড়ে নি। সুতরাং পড়া হয় নি।

* * *

সুরেশবাবুর* সঙ্গে সপ্তাহখানেক দেখা হয় নি।

দার্জ্জিলিং থেকে এসে অবধি অর্থাৎ এই দেড় মাসের মধ্য এক দিন মাত্র হার্ম্মোনিয়াম ছুঁয়েছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় যে stick কর্ত্তে আরম্ভ হয় নি।

শোনা গেল স্বামী শুদ্ধানন্দ কলকাতা থেকে অন্যত্র প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং Memory Drops (২) স্বয়ং 'উদ্বোধনে'র ভার নিয়েছেন।

আমিও নিষ্কৃতি লাভ ক'রলাম।

'প্রভু'! 'প্রভু'!

চারুবাবুর (৩) এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? কবি ও লেখক থেকে একেবারে নিতান্ত গুরুদাসগন্ধী প্রকাশক; 'উপিন্যাস'!...

তোমাদের নূতন মাসিকের নামকরণ হ'য়েছে কি? যদি হয়ে থাকে ত লিখবে। এবং কবে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব তা'ও লিখো। ভনির সঙ্গে কাল আমার দেখা হয়েছিল। ভাল আছে। ইতি

শ্রীসত্যেন্দ্র—

(১১)

রবিবার†

বন্দেমাতরম (৪)

সুহৃদ্বরেষু

যথাসময় কলিকাতায় পৌছিয়াছি। কলিকাতায় নূতন খবরের অত্যন্তাভাব।

কাল রাত্রে বাগচী বাসায় আনন্দ ভোজ ছিল। ঐ ভোজে বাহিরের লোকের মধ্যে, বলাইবাবু, প্রতুল এবং আমি।

তোমাদের উৎসবের কি দিন স্থির হইয়াছে? লিখিও। 'তীর্থ-সলিল' ছাপা চলিতেছে পূজার পূর্ব্বে বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি।

যতীনবাবু* এবং চারুবাবু (১) কি এখনও বোলপুরে আছেন? কাগজের (২) খবর কি? কতদূর

শ্রীসত্যেন্দ্র

(১২)

রবিবার(৩)

বন্দেমাতরম (৪)

সুহৃদ্বরেষু

ধীরেন তোমার চিঠি যথাসময়ে পৌছেচে। এখানে এখনও বৃষ্টির উৎপাত চলিতেছে। সে দিন ভনির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তুমি নাকি লিখেচ আমি চিঠিপত্রের জবাব দিই নি? এক লিপি বিস্তার পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সে দিন উপস্থিত হয়েছিলুম। থিয়েটারের চেয়েও কৌতুককর, কারণ ওখানে বাংলা, বেহারী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, মারাঠি, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু, মলয়ালম্ প্রভৃতি ভাষায় সেই দেশের লোকেরা বক্তৃতা করেছিলেন।

অর্দ্ধেন্দু মুস্তফির মৃত্যুসংবাদ বোধ হয় পেয়েছ। বাংলা দেশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা থেকে বঞ্চিত হ'ল। 'প্রবাসী'তে আমার বই দুখানার 'সমালোচনা দেখেচ? কি মনে হয়? ধ'রে প'ড়ে করিইচি? শ্রীমতী কামিনী সেনকে (আমি 'রায়' লিখতে রাজী নই) চাক্ষুষ দেখি নি—সে তোমার ভাগ্যের কথা; আমি একখানা তাঁহার ফোটোগ্রাফও দেখিতে পাইলাম না। অথচ জোগাড়ের চেষ্টায় আছি বহুদিন।

"শারদোৎসব" পড়িলাম। গানগুলির তুলনা নাই। তা ছাড়া প্রাচীন ভারতের একটি বিচিত্র atmosphere ইহাকে ঘিরে রয়েছে। ভাল কথা, "শারদোৎসবে"র আমি প্রথম ক্রেতা। প্রকাশকদের পক্ষে "বউনি" কেমন? শুভ না অশুভ?

আমার বইয়ের কম্পোজ কাল শেষ হ'য়েছে,

---

(১) ললিতকৃষ্ণ বসু স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবকে বিশ্বকোষ প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছিলেন।

* সুরেশ সমাজপতির

(২) স্বামী সারদানন্দ। কথা বলিতে বলিতে সূত্র হারাইয়া বলিতেন 'কি বলছিলাম?'

(৩) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এ সময় পর্য্যন্ত চারুবাবুর সঙ্গে কবি সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা হয় নাই।

† তারিখ নাই

(৪) চিঠির কাগজে মুদ্রিত

* কবি যতীন বাগচি

(১) চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি মাসিক বাহির করিবেন কথা হয়।

(৩) তারিখ নাই।

(৪) চিঠির কাগজে 'বন্দেমাতরম' মুদ্রিত।

এখন বোধ হয় আর চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই বেরুতে পারবে।

দিনেন্দ্র বাবুর কাগজ অত দেরীতে বেরুবে কেন? তুমি শারীরিক কেমন আছ? কলিকাতায় কবে নাগাদ পৌঁছিবে?

তোমাদের উৎসবে সর্ব্বসমেত (বোলপুরওয়ালা এবং তোমরা ও ছেলেরা ছাড়া) কতগুলি লোক হইবে? আন্দাজ করিতে পার? আমরা যদি যাই তবে তোমাদের কোনও অসুবিধা হইবে না? জ্যোতিরিন্দ্র বাবু যাইবেন কি? লিখিয়ো। ইতি

উৎসব কবে?

প্রীতিপ্রয়াসী
শ্রীসত্যেন্দ্র

(১৩)

ধীরেন,

যোল শ' মাইল দূরে
হিমাদ্রীর অন্তঃপুরে
আঙুরে আঙুরে যার কাটে অহর্নিশ
এবারের বিজয়ায়
পাঠাইছে সে তোমায়
কাশ্মীরী "বন্দেগী" আর
কাশ্মীরী কুর্ণিস

সত্যেন্দ্র*

---

* কবিতায় এই পত্রখানি কাশ্মীর হইতে একটি চিত্রিত কার্ডে লেখা। কার্ডখানির ঠিকানা লিখিবার পৃষ্ঠার বাম দিকে কবিতাটি লেখা এবং ডান দিকে

D. N. Dutt Esq.
15, Paikpara Road
P. O. Belgachia
Calcutta.

লেখা রহিয়াছে। অপর পৃষ্ঠায় একটি ছবি। ছবিটির নীচে লেখা
Raja Sir Ram Singh's House Boat Kashmir.

চরৈবেতি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কালবোশেখীর মেঘের পাতায় বিজলীর অক্ষরে
চরৈবেতির অগ্নিমন্ত্র। কর্ণবিদারী স্বরে
বজ্র হাঁকিছে চল, চল, চল নবযৌবনদল!
জীবনের ধ্বজা উড়াইয়া চল আনন্দে চঞ্চল।
জীবন সত্য, জীবন নিত্য। দুর্ব্বার তার ধারা
পশ্চাতে ফেলে শত মৃত্যুরে চিরবন্ধনহারা
চলে অবিরাম সম্মুখপানে। মাঘের রিক্ত ডাল
মুকুলে মুকুলে মুকুলিত করি আসে বসন্তকাল!
দূর দিগন্তে সান্ধ্য সূর্য্য নিতি নিতি ডুবে যায়,
পূর্ব্ব গগনে নবগরিমায় দেখা দেয় পুনরায়!
অন্তবিহীন অন্ধকারেরে পলে পলে করি ক্ষয়
চলে আলোকের চিরঅভিযান দুর্দ্দম দুর্জ্জয়।
সেই আলোকের আমরা বাহিনী। মৃত্যুর পশ্চাতে
আমরা দেখেছি সবুজ পতাকা দোলে জীবনের হাতে।

মূর্চ্ছিত ধরা পড়ে আছে আজি মৃত্যুর পদতলে
দিগন্ত জুড়ে আজিকে চিতার রক্তবহ্নি জ্বলে।
বিজ্ঞান হ'ল দেশে দেশে আজ মৃত্যুর কিঙ্করী,
জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশ হইতে অনল পড়িছে ঝরি!
পূর্ণিমা রাতে ঘাসের পাতায় নররক্তের দাগ!
দো'পেয়ের কাছে হার মানিয়াছে বনের সিংহ বাঘ!
মানুষের মাঝে লুকানো ছিল যে গুহাবাসী জানোয়ার—
—বাহির হইয়া এলো সে আজিকে হাতে নিয়ে হাতিয়ার
বহুমানবের তপশ্চর্য্যা গড়িয়া তুলিল যারে
সেই সভ্যতা-মন্দির ডোবে রক্তের পারাবারে!

জীবনপূজারী সৈনিক দল! আজিকে ঝড়ের রাতে
চলার মন্ত্র কণ্ঠে লইয়া বিজয়ধ্বজা হাতে

চলো সম্মুখে ভবিষ্যতের রচিতে বৃন্দাবন—
মৃত্যুর শিরে উড্ডীন যেথা প্রাণের জয়-কেতন।
আমরা গড়িব নূতন জগৎ—তোরণ-দুয়ারে যার
লেখা রহিয়াছে, 'মানুষের চেয়ে বড়ো নাহি কিছু আর।'
পুরুষ সেখানে মুক্তি পেয়েছে, মুক্তি পেয়েছে নারী;
কোষের মধ্যে মুখ লুকায়েছে গর্ব্বিত তরবারি;
ফাঁসির মঞ্চে পুষ্পের হাসি, ভগ্ন কারার দ্বার,
বন্দীমানব ফিরে পেলো তার বিলুপ্ত অধিকার;
শৃঙ্খলভারে ধূলি-লুণ্ঠিত নহে সে সরীসৃপ—
উন্নতশিরে চলেছে, নয়নে জ্বলিছে আশার দীপ।

ভবিষ্যতের জগৎ—জানিও ভিত্তি তাহার প্রেমে।
মানুষে মানুষে বিরোধ সেথায় চিরতরে গেছে থেমে!
জাতিতে জাতিতে এই সংগ্রাম লভিয়াছে অবসান!
আকাশে আকাশে রণিয়া উঠিছে মিলনের মহাগান।
যা-কিছু বিভেদ বাহিরেতে শুধু—ভিতরে এক সবাই!
মনের চেহারা সবারই সমান—এক ছাড়া দুই নাই।
অবিচ্ছেদ্য স্বার্থসূত্রে বাঁধা যে পরস্পর!
এক আকাশেরই নিম্নে আমরা সবাই বেঁধেছি ঘর!
সবার তৃষ্ণা হরণ করিছে একই নদীর জল!
ক্ষুধায় আনিছে পরিতৃপ্তি একই বনের ফল।
একই সূর্য্য সবার চক্ষে আলোক করিছে দান,
একই লোহিত রক্ত সবার শিরায় প্রবহমান।

বিধাতার আলো, বিধাতার বায়ু, বিধাতার প্রান্তর—
একা কারও নয়—সকলের তরে। আমরা পরস্পর
স্বার্থ লইয়া বিরোধ করেছি হয়েছি লোভের দাস,
খোদার যে জমি করেছি তাহারে আপনার বলি' গ্রাস,
দেবতার যাহা লোভে প'ড়ে তারে করেছি আত্মসাৎ,
স্বার্থ-প্রাকার তুলে মানুষেরে বলেছি, 'যাও তফাৎ'।
মানুষের ঘাড়ে জোয়াল দিয়েছি, দাস বানায়েছি তারে,
বাঁচিবার তার আছে অধিকার—ভুলেছিনু একেবারে।
ঝড় হয়ে তুমি আসিলে কি, তাই, শাসন-দণ্ড নিয়ে?
সঞ্চিত ধন করিতেছ ছাই অগ্নিবন্যা দিয়ে?
বিধাতার ধনে অন্যেরে যারা দিল নাকো অধিকার,
সকলের তরে খুলিয়া যাহারা রাখিল না গৃহদ্বার—
সেই দুর্ভাগা মানবের দল আজি ভিখারীর বেশে
ভাগ্যের স্রোতে ঘাট থেকে ঘাটে বেড়াইছে ভেসে ভেসে!

চরৈবেতির জলদমন্ত্রে আনো সে নূতন দিন
বৈষম্যের দুর্গ যেখানে ধূলিতে হয়েছে লীন।
সম্পদ যারা সৃষ্টি করিছে সবল বাহুর জোরে
সোনার ধান্যে শূন্য তাদের আঙিনা গিয়েছে ভ'রে,
রুগ্ন শরীর স্বাস্থ্যে হয়েছে বলিষ্ঠ-সুন্দর,
মনের আঁধার হরণ করিছে জ্ঞানের অরুণ-কর,
কৃষ্টি এনেছে স্বচ্ছ দৃষ্টি, ললাটে নূতন চোখ,
ভেদবুদ্ধির আসন নিয়েছে প্রেমের স্বর্গলোক।
সুন্দর দেহ, সতেজ মগজ, অন্তরে ভালোবাসা,
চিত্তে সাহস, মৌনকণ্ঠে বীরের দীপ্ত ভাষা!
পূর্ণ মানব! মুক্ত মানব! যার বন্দনা-গান
কবিরা গাহিল—কালের মঞ্চে হ'ল সে দৃশ্যমান।
কল-দানবের বন্ধন ছিঁড়ে মানুষ আসিল ফিরে
সবুজ ঘাসের মখ্‌মলে ঢাকা মঞ্জুল নদীতীরে!
পাহাড়ের গায়ে দেবদারু-বনে রচিল সে নিকেতন,
ঝরণার গান! পাখীর কাকলি! নির্ম্মল সমীরণ!
পরিচ্ছদের বাহুল্য নেই, সরল জীবনখানি!
আত্মীয় হ'ল জলের মৎস্য, কাননের যত প্রাণী!
নাহি ছুটাছুটি, নাহি ঠেলাঠেলি, রৌদ্রালোকিত মাঠে
নর ও নারীর কর্ম্মে মুখর আনন্দে দিন কাটে!
মানুষের মতো বাঁচার জন্য প্রয়োজন যার আছে—
অধিকার তার ফিরিয়া এসেছে প্রতি মানুষের কাছে।
মানব-সেবার নব-আদর্শে অনুপ্রাণিত নর
জয়-যাত্রায় চলেছে, কণ্ঠে 'আল্লা হো আকবর'!

অস্পৃশ্য যে—খোলা পেয়েছে সে মন্দির-প্রাঙ্গণ!
মানুষ রেখেছে মানুষের ভালে সুকোমল চুম্বন!
প্রেমের শাসনে এক হয়ে গেছে হিন্দু-মুসলমান,
বন্দিনী নারী পেয়েছে মুক্তি, মানুষের সম্মান।
কর্ম্মহীনেরা কর্ম্ম পেয়েছে, চক্রের গুঞ্জনে
মৌন কুটীর মুখর হয়েছে—কৃষকের অঙ্গনে
লক্ষ্মী আবার ফিরিয়া এসেছে—হস্তে ধানের ঝাঁপি!
নব-জীবনের আনন্দে ওঠে পল্লীর বুক কাঁপি।
গাঁজা আফিমের দোকান বন্ধ, লুপ্ত মদের বিষ;
অত্যাচারী যে—কারও কাছ থেকে পায় না সে কুর্ণিশ!
কণ্ঠে চলার মন্ত্র—মানুষ চলেছে উচ্চশির।
বসুন্ধরারে ভোগ করে যারা মৃত্যুবিজয়ী বীর!
মৃত্যুশাসিত বিশ্ব আবার হবে প্রাণ-চঞ্চল।
তারই লাগি চলে রাতের তিমিরে দুঃখ-জয়ীর দল।

ঘরে খিল দিয়ে কুড়েরা ঘুমায়, পড়ুয়ারা পুঁথি পড়ে ;
চরৈবেতির মন্ত্র কণ্ঠে কালবৈশাখী ঝড়ে
যাত্রীরা শুধু চলে—অন্তরে নব-জগতের ধ্যান !
রুদ্রবীণায় বাজে চারণের যুগান্তরের গান।
শুক্‌নো রুটী ও কম্বল ছাড়া সম্বল নাহি আর !
সিংহের মতো সাহসী চিত্ত, শরীর চমৎকার !
বিপদ দেখিলে ঝাপ্‌টিয়ে ধরে, দুঃখ সে প্রিয় সাথী,
বন্ধুর পথ হয়েছে বন্ধু ! নিভেছে ঘরের বাতি !
অত্যাচারীর হাস্যেরে ভয়, ভালো লাগে ভ্রূকুটিরে !
বন্দর ছেড়ে যাত্রীরা, তাই, চলে সে অকূল নীরে
আকাশের নীচে যেথায় ফেনিল উর্ম্মি গর্জ্জমান।
জানিও আরাম করে পুরুষের শৌর্য্যেরে ম্রিয়মাণ।
পথে চলে যারা তাদেরই ললাটে যশের মুকুট ঝলে,
লক্ষ্মী পরায় বরণমাল্য কর্ম্মবীরের গলে।

চারণ-কণ্ঠে তাই তো চরৈবেতির মহিমা গান।
ঘুণ-ধরা জাত দাওয়ায় বসিয়া হুঁকায় মারিছে টান।
নয়তো ঘুরায় জপের মাল্য চোখ বুঁজে বসে' বসে',
চলিতে চলিতে কোমর হইতে কাপড় পড়িছে খসে',
পঞ্জিকা হাতে দেখে কোন্‌দিন অলাবু খাইতে নাই,
হাঁচি টিকটিকি পুলিসের ভয়ে কাতর সর্ব্বদাই,
গ্রামখানি নিয়ে জগৎ ওদের ! ওরই মাঝে চলাফেরা !
বাধা নিষেধের কাঁটার বেড়ায় সারাটা জীবন ঘেরা !
এক পা চলিতে দুই পা পিছায়, আচারের ক্রীতদাস,
পুঁথিতে নাই যা—সে কথা শুনিলে বলিবে, সর্ব্বনাশ !
মালপুয়া খায়, শ্রীখোল বাজায়, ধেই ধেই ক'রে নাচে,
লাল পাগড়ীর আভাস পাইলে লাফ দিয়ে ওঠে গাছে !
নামাবলী গায়ে চিতাবাঘ সেজে ব'সে থাকে চুপ চাপ—
ধর্ম্মেরে জানে ফোঁটা ও তিলকে, মানুষেরে ছুঁলে পাপ !
বামুন হইয়া মদ্য খাওয়াবে—তবু সে আসন পাবে !
চাষী যদি যায় ফরাসে বসিতে অম্‌নি সে তাড়া খাবে।
মদ্যদাতার সম্মান আছে অন্নদাতার নাই !
আমাদের যদি এমন না হবে কাহাদের হবে ভাই ?
পানের ডিবে ও নস্যির কোটো, বাঁয়া ও তবলা সাথী!
আমরা যদি না লাথি খাই তবে কোন্ জাত খাবে লাথি ?
লাথি খাই আর আরামে ঘুমাই সুকোমল শয্যাতে !
পরচর্চ্চার সুযোগ মিলিলে কোহিনূর পাই হাতে !
খাবার বেলায় হাজির দু-বেলা ! কাজের সময় এলে
বলি, 'সংসার নিশার স্বপন—নাই ঘুম ভেঙে গেলে' !

লুচি-সন্দেশে নেইকো অরুচি, রাব্‌ড়ী খাওয়ার যম !
যদি কেহ বলে, মাঠে মাঠে যারা ফলায় ধান্যগম
তাদের জন্য কাজ করা যাক—পালাবার পথ খুঁজি !
'কর্ম্মটা বাজে, জ্ঞানেই মুক্তি'—বলি চোখদুটো বুঁজি।

জাতটা হয়েছে জরদ্গবের জড়ভরতের জাত।
চায়ের টেবিলে বসে' বসে' করি রাজা ও উজীর মাৎ।
শহরের সীমা ছেড়ে যেতে, হায়, মন যে কেমন করে !
'প্রলিট্যারিয়েট' বলিতে আঁখিতে কুম্ভীরাশ্রু ঝরে !
'মস্কো' মোদের মক্কা ও কাশী ! বাইবেল—'ক্যাপিটাল্'।
ষোল আনা মার্ক্সবাদী না হইলে নিশ্চয়ই দেবো গাল !
'হোলি' রাসিয়ার আমরা পাদ্রী, ছাড়ি বাক্যের ধোঁয়া,
মতে মত যদি না দাও তবে তো একদম বুর্জ্জোয়া !
গান্ধীটা বেনে ! ধনীর বন্ধু ! গরীবের দুষমন !
শুধু কৌপীনে রেখেছে বাঁধিয়া জনতার শিশুমন !
বিড়্‌লার টাকা—কিছু তারও জোরে এখনো ক'ল্কে পায়।
নইলে কবে সে ছাতু হ'য়ে যেত 'ত্রিপুরী'র ধাক্কায় !
যন্ত্রপূজারী—চক্রের পানে বক্র নয়নে চাই।
তারে নিয়ে কেন এত টানাটানি যাদুঘরে যার ঠাঁই !
চণ্ডীদাসটা বাজে ! ওর মাঝে কোথা বস্তীর সুর ?
শোলোকফ্ আর গোর্কির যুগে অচল রবি ঠাকুর !
গাঁজাখোর ঋষি কল্পনা দিয়ে গড়িয়েছে ভগবান !
আছে পৃথিবীতে একটি সত্য—সে সত্য বিজ্ঞান।
মানবতা ব'লে চেঁচাই আমরা নব্য নন্দলাল !
দেশ ডুবে যাক্—বিশ্ব মোদের বেঁচে থাক চিরকাল !

এক দিকে যত টু'লো পণ্ডিত মনুর দোহাই পাড়ে,
আর এক দিকে প্রগতিবাদীরা মার্ক্সের বুলি ঝাড়ে !
ভাটপাড়া আর মস্কো—এদের কারে লবো, কারে ছাড়ি ?
ভালো নয় জানি এতদুভয়ের একটারও বাড়াবাড়ি !

এই গোঁড়ামির কুজ্ঝটিকায় সত্যের দীপ জ্বেলে
চারণেরা চলে বাধা-বিঘ্নেরে দুই হাতে ঠেলে ঠেলে।
মগজের মাঝে সঞ্চিত যত কুসংস্কারের বোঝা
জ্ঞানের আগুনে পোড়াইয়া চল শিরদাঁড়া করি সোজা।
এক হাতে ভাঙো নির্দ্দয় হ'য়ে—আর হাতে গ'ড়ে চল।
স্বর্গের মোহ, নরকের ভয়—নিষ্ঠুর পায়ে দলো।
তোমরা কেবল সত্যের শুধু! আর কারও নয়, নয় !
চরৈবেতির মন্ত্র কণ্ঠে চলো চিরদুর্জ্জয় !

ব্যবধান

শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্তা

দীর্ঘ সাত বৎসর পরে বিপাশা শ্বশুরবাড়ী ফিরিয়া আসিতেছে। খোলা মাঠের মধ্য দিয়া টেলিগ্রাফ-লাইনের গা ঘেঁষিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছিল। বিপাশা জানালার কাছে বসিয়া বাহিরে চাহিয়া ছিল। সন্ধ্যাবেলা সে গাড়ীতে উঠিয়াছিল, সন্ধ্যার সন্ধ্যাতারা উঁকি মারিয়া উঠিয়া আসিল। এখন শুকতারাটি ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। সমস্ত রাত্রি ভরিয়া কত তারা উঠিল, কত তারা নিবিল, কত তারা খসিয়া পড়িল, একখণ্ড বিবর্ণ চাঁদ উঠিয়া ধীরে ধীরে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, কোন কোন গাছের আগায় ঝাঁক বাঁধিয়া জোনাকী পোকা উড়িতে লাগিল, অন্ধকারের মধ্যে ছোট ছোট জলাশয়গুলি বৃহৎ একখানা দর্পণের মত চক্ চক্ করিয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল, বিপাশা একদৃষ্টে এই সব দেখিলেও বাহিরের কোন দৃশ্যের সহিত তাহার অন্তরের যোগ ছিল না, যে-চিন্তায় সে নিমগ্ন হইয়া ছিল সে তাহার বিগত জীবনের সুখ-দুঃখের ইতিহাস।

সে ধনী পিতার কন্যা, বিবাহ হইয়াছিল মধ্যবিত্ত ঘরে। জামাতার রূপ গুণ দেখিয়াই পিতা কন্যাদান করিয়াছিলেন, অর্থ দেখিয়া নয়। কিন্তু সেজন্য বিপাশা অথবা তাহার পিতাকে কোন দিনই আক্ষেপ করিতে হয় নাই।

বিবাহের কিছু দিন পর শ্বশুর মারা গেলেন। স্বামী তখন সবে মাত্র বি-এল পাস করিয়াছেন। তিনিই ছিলেন শ্বশুরের প্রথম সন্তান, সুতরাং পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাকেই সংসারের হাল ধরিতে হইয়াছিল। স্বামীর কর্তব্যের অংশ বিপাশাও সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিল। স্বামী বলিতেন, আমার মা-ভাই-বোনকে যদি ভালবাস, তবেই বুঝব তুমি আমাকে ভালবাস। তাহার ভালবাসায় স্বামী যেন কিছুতেই সন্দিহান হইতে না পারেন, সে-ই ছিল বিপাশার একমাত্র লক্ষ্য।

গাড়ী একটা স্টেশনে দাঁড়াইল দেখিয়া বিপাশা চক্ষু মুছিয়া ফেলিল।

স্বামী ওকালতি আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বিধবা মা নাবালক দুইটি ভাই ও শিশু দুইটি বোন লইয়া সংসার পাতিলেন। তাঁহার যাহা আয় হইত, সংসারের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়; সমস্ত সংসারের ভার মাথায় লইয়া সংসারের সমুদয় অভাব অস্বাচ্ছন্দ্য হইতে স্বামী শাশুড়ীকে বিপাশা আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল।

বিপাশার পিতা মেয়েকে কিছু টাকা যৌতুক দিয়াছিলেন, স্বামীর অমতেই সে সেই টাকা দিয়া মাঝারি-গোছের একখানা বাড়ী করিয়া ফেলিল। স্বামীকে বুঝাইয়া বলিল যে বাড়ীভাড়ার টাকাটা অপব্যয় যায়, বরং ভাড়ার টাকাটা মাসে মাসে সে পাস-বুকে জমা করিয়া লইবে। কিন্তু কোনো মাসেই টাকা জমা রাখা হইত না বলিয়া স্বামীর অসন্তোষের সীমা ছিল না। এখনও পাস-বই খালিই পড়িয়া আছে, কিন্তু কেহ তাহা লইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করে না।

একটা ঠিকা ঝি শুধু বাসন মাজিয়া জল তুলিয়া দিয়া যাইত, আর সমস্ত কাজই বিপাশা নিজের হাতে করিত। স্বহস্তে স্বামী ও তাঁহার পরিজনের সেবা করিয়া কি তৃপ্তিতে কি আনন্দেই তাহার দিন কাটিয়া গিয়াছে! বিবাহের পর তিন-চার বৎসর কাটিয়া গেলেও তাহার সন্তান হইল না বলিয়া শাশুড়ী কত ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু বিপাশার মনে সেজন্য এতটুকু ক্ষোভ ছিল না, সন্তান-স্নেহেই সে দেবর ননদ কয়টিকে মানুষ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে।

তার পরে বিপাশার সুখের ঘর ভাঙিল। বিবাহের দশ বৎসর পরে স্বামীর কঠিন পীড়া হইল। বিপাশা কিন্তু শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে তাহার এই সাজানো সংসার এমন করিয়া ভাঙিয়া যাইবে! বিধাতার কাছে সে ত বেশী কিছু চাহে নাই, যাহা চাহিয়াছিল, তিনি হাত ভরিয়া তাহা দিয়াছিলেন, দিয়া আবার কাড়িয়া লইলেন কেন?

জামাতার পীড়ার সংবাদে পিতা রেঙ্গুন হইতে আসিলেন, অনেক অর্থব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাইলেন, কোন ফল হইল না। জামাতার শেষকার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি কন্যাকে সঙ্গে লইয়া রেঙ্গুন চলিয়া গেলেন।

তার পর সাত বৎসর বিপাশা রেঙ্গুনে পিতার কাছে

ছিল। স্বামীর সংসারের অর্থের অপ্রতুলতা স্বামী-সৌভাগ্যবতী কন্যার আনন্দের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু এখন নিঃসন্তান বিধবার তাহা অসহ্য হইবে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস হইল। দরিদ্র শাশুড়ীও ধনী পিতার বিধবা কন্যাকে আনিতে সাহসী হইলেন না। আর দীর্ঘ দিন হইলেও এই সাত বৎসর বিপাশার কেমন করিয়া কাটিয়াছে সে ঠিক্ করিয়া বলিতে পারে না।

রেঙ্গুনে থাকিয়াই সে খবর পাইয়াছে, মেজ দেবর পড়া ছাড়িয়া আদালতে কাজে ঢুকিয়াছে, ছোট দেবর বি-এল্ পাস করিয়া উকীল হইয়া বসিয়াছে, ননদ দুইটিও বড় হইয়া উঠিয়াছে, বড়টির বিবাহ হইয়াছে এবং নির্বিঘ্নে একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। মেজ দেবরেরও বিবাহ হইয়াছে এবং বউটি নাকি বেশ সুন্দরী হইয়াছে, ইত্যাদি।

সম্প্রতি শত্রুর আক্রমণে বিপাশার পিতা রেঙ্গুনের বাস উঠাইয়া দিয়া বাংলায় পলাইয়া আসিয়াছেন, তাই বিপাশা সাত বৎসর পরে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে।

ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া যখন গেটের কাছে থামিল, দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া বিপাশা আগ্রহভরে চাহিল। কিন্তু পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া লইল, তাহার স্বামীর নামের সাইনবোর্ডের পরিবর্ত্তে ছোট দেবর বোপদেবের নামের সাইনবোর্ড গেটের গায়ে ঝুলিয়া আছে।

চোখ মুছিবার পূর্ব্বেই দুই ননদ ছিটে, ফোঁটা আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া নামাইল। বিপাশা দেখিল ছিটের সীমন্তে সিন্দূর, সেই ফ্রক নোলকপরা ছোট মেয়ে দুটি বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে। সে দুই হাতে তাহাদিগকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল।

শাশুড়ী তাহাকে দেখিয়া ছেলের নাম লইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রাণের যে ক্ষত তাঁহার এই সাত বৎসরে প্রায় শুষ্ক হইয়া আসিয়াছিল, আজ বিধবা বধূকে দেখিয়া তাহা নূতন হইয়া উঠিল। নূতন বধূটি তাহাকে প্রণাম করিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বিপাশা এক হাতে চোখের জল মুছিয়া অন্য হাতে চিবুক চুম্বন করিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইল।

ছিটে, ফোঁটাও কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিবার জন্য একখানা মূল্যবান আসন বিছাইয়া দিল। বিপাশা জলভরা চোখে তাহাদের দিকে চাহিল, তাহারা কি তাহাদের সেই বৌদিকে চিনিতে পারে নাই? কি একটা বেদনায় তাহার বুকটা মোচড়াইয়া উঠিল। এতক্ষণে বাহিরের কাজ সারিয়া দেবর দুই জন ভিতরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং অতি সংক্ষেপে কুশল-প্রশ্ন করিয়া আবার বাহিরে চলিয়া গেল। একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় বিপাশা সেই দিকে চাহিয়া রহিল; আজ ভদ্রতার খাতিরে বৌদির সঙ্গে দুই-চারিটা কথা বলা ভিন্ন উহাদের কিছু বলিবার নাই, কিন্তু এক দিন উহাদেরই অনর্গল কথায় বিপাশার গৃহকার্য্যের কত ব্যাঘাত ঘটিয়াছে! খেলার মাঠে কবে কি ঘটিয়াছে, কে কবে কয় গোলে হারিয়াছে, জিতিয়াছে, হেড্‌মাষ্টার মহাশয় পড়াইবার সময় কেমন করিয়া হাত নাড়েন, হেডপণ্ডিত বেঙ্গলীকে কি ভাবে ব্যাঙ্গলী উচ্চারণ করেন, এই সব কত কথাই না ধৈর্য্য ধরিয়া বিপাশাকে শুনিতে হইয়াছে। না শুনিলে ইহাদের অভিমানের অন্ত ছিল না! আজ তার মনের মধ্যে সাত বৎসরের যত সুখ-দুঃখের কথা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, মুহূর্ত্তে তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গেল!

স্নানের জন্য অনুরোধ করিয়া ছিটে তেলের বোতল আনিয়া তাহার মাথায় তেল মাখাইতে বসিল, ইচ্ছা হইলেও বিপাশা বাধা দিল না। ছিটের এক বৎসরের ছেলেটি মায়ের পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। বিপাশা আদর করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। ছিটে ব্যস্ত হইয়া বলিল, "নামিয়ে দাও বৌদি, তোমার কাপড় খারাপ ক'রে দেবে।" বলিয়াই হাত ধরিয়া তাহাকে নামাইয়া দিল।

বিপাশা শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কত কথাই তাহার মনে হইল। শাশুড়ী যখন বিধবা হন, ছিটে, ফোঁটা যমজ দুটি বোন তখন দেড় বৎসরের ছিল। শোকাতুরা শাশুড়ী তাহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না, বিপাশাই তাহাদিগকে বড় করিয়া তুলিয়াছে। মাঘ মাসের শীতে কত রাত্রিই তাহার সিক্ত শয্যায় কাটাইতে হইয়াছে তাহার ঠিক নাই। আজ সেই ছিটের খোকা যদি তাহার কাপড় খারাপ করিয়া দেয় তাহাতে এত ব্যস্ততার কি আছে সে ভাবিয়া পাইল না। সে মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার শত প্রশ্ন শতবার মাথা কুটিতে লাগিল।

স্নানের পূর্ব্বে সে বাড়ীর পিছন দিকে একবার ঘুরিয়া আসিল। দেখিল গোয়ালঘরে আগের গরু একটিও নাই। বিপাশা লুকাইয়া হাতের রুলি বিক্রয় করিয়া কয়েকটা গরু কিনিয়াছিল, সে নিজের হাতে তাহাদের খড় কাটিয়া খাওয়াইয়াছে, ফেন খাওয়াইয়াছে, তাহারা বিপাশাকে দেখিলেই কত আনন্দ প্রকাশ করিত! যে গরুগুলি আছে হয়ত তাহাদেরই বাচ্চা হইতে পারে ভাবিয়া বিপাশা আদর করিয়া তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া দিল।

বাগানে তাহার হাতের ফুলগাছ একটিও নাই, দুই-চারিটি লাউ-কুমড়ার গাছ বেড়া বাহিয়া উঠিয়াছে। বেড়ার ধারে ধারে কয়েকটা লঙ্কা, বেগুনের গাছ লাগানো আছে। স্বামী ফুল ভালবাসিতেন বলিয়া বিপাশা নিজের হাতে এই ছোট্ট বাগানখানা করিয়াছিল। নূতন বধূ হয়ত ফুলের চেয়ে তরকারীর বাগানই বেশী পছন্দ করে। বিপাশার পছন্দমত এ বাড়ীতে কিছু হইবার দিন হয়ত আর নাই! এক ঝলক অশ্রু আসিয়া অকস্মাৎ তাহার চক্ষু প্লাবিত করিয়া দিল।

স্নান করিয়া আসিয়া আহ্নিক করিতে গেলে ফোঁটা আসিয়া তাহার হাত হইতে আসন লইয়া পাতিয়া দিল, ফুল চন্দন গুছাইয়া দিল, সে যে নিজেই সব ঠিক করিয়া লইতে পারে সে জন্য ফোঁটার এত ব্যস্ততার কিছু নাই, একথা বলিতে গিয়াও সে বলিতে পারিল না।

পূজা করিতে বসিয়া বিপাশার চোখ দিয়া কেবল জল পড়িতে লাগিল। যাহাকে হারাইয়া এই সাত বৎসর সে অশ্রুপাত করিয়াছে, তাহার চেয়ে সে যে আরও কত বেশী হারাইয়াছে, আজ তাহা বুঝিল।

পূজা শেষ করিয়া সে দেখিল নিরামিষ-ঘরের সম্মুখের রোয়াকে তাহার আহারের ঠাঁই হইয়াছে। শাশুড়ী রাঁধিতেছেন, বলিলেন, "বড় বৌমা, তুমি খেয়ে বিশ্রাম কর, কাল রাত্রে জলটুকুন খাও,নি, গাড়ীতে ঘুমই কি আর হয়েছে?"

বিপাশা স্তম্ভিত হইয়া গেল! দেবর ননদেরা খায় নাই, শাশুড়ী খান নাই, সে কি ইহাদের অভুক্ত রাখিয়া কোনো দিন আহার করিয়াছে? সোমবারের ব্রত করিয়া শাশুড়ী উপবাসী থাকিতেন, তাঁহার অম্বলের ব্যথা ছিল বলিয়া বিবাহের পর হইতে বিপাশা তাঁহাকে উপবাস করিতে না দিয়া নিজে উপবাস করিয়াছে। পরদিন আমিষ-নিরামিষ দুই ঘরের রান্না মিটাইয়া সকলকে খাওয়াইয়া তাহার খাইতে বেলা গড়াইয়া গিয়াছে। আজ তাহার জন্য সকলের উৎকণ্ঠা কেন? তাহার এত আদর কিসের জন্য?

সে মৃদু আপত্তি করিলে মেজ-জা, বলিল, "তুমি ক'দিন বা থাকবে দিদি, সকলের সঙ্গে তোমার কি কথা! তুমি খেতে ব'সো।"

বিপাশা এতক্ষণে চমকাইয়া উঠিল, একথা সে ভাবে নাই! সত্যই ত, সে ত দু-দিনের জন্য আসিয়াছে, সে যে এ বাড়ীর অতিথি! এ বাড়ীর অন্য লোকের সঙ্গে তাহার তুলনা হইতে পারে না!

বৃদ্ধা শাশুড়ী ভাত বাড়িয়া গরম ভাজা ভাজিয়া দিলেন, শাক, সুক্তো, ঝাল, ঝোল রাঁধিয়াছেন অনেক। শাশুড়ীকে বিপাশা কোনদিন রাঁধিয়া খাইতে দেয় নাই, আজ তাঁহার শ্রান্ত মুখের দিকে চাহিয়া ব্যথিতা হইয়া বলিল, "এত রেঁধেছেন কেন মা? আমার জন্য?"

সাবধানে ভাজা উল্টাইতে উল্টাইতে শাশুড়ী বলিলেন, "তোমার মায়ের কাছে তুমি কত যত্নে থাক মা, দু-দিনের জন্য আমার কাছে এসেছ, কি দিয়ে দুটি ভাত মুখে দেবে?"

ঘন দুধে সর্‌ড়ি কলা ভাঙিয়া দিতে দিতে ফোঁটা বলিল, "কিছুই খাচ্ছ না বৌদি, রান্না ভাল হয় নি বুঝি?"

বেদনায় বিপাশার বুক টন্ টন্ করিয়া উঠিল। স্বামী দেবরকে আহার করাইয়া আফিস, স্কুলে পাঠাইয়া, ননদ দুটিকে স্নানাহার করাইয়া ঘুম পাড়াইয়া, শাশুড়ীর আহারান্তে হরিতকী লবঙ্গ তাঁহার হাতে দিয়া, গরুর খড় কাটিয়া, অবেলায় ভাত বাড়িয়া সে খাইতে বসিয়াছে! অন্য জলখাবার না থাকায় দেবরেরা স্কুল হইতে আসিয়া ভাত খাইত। খাইতে বসিয়া বিপাশার মনে হইয়াছে যে হেঁসেলে ভাত ছাড়া সেদিন অন্য কিছুই নাই। সে নিজের মাছের ঝোলের বাটিটি ঢাকুনির তলায় ঢাকা দিয়া রাখিয়া ডাল চচ্চড়ি দিয়া খাইয়া উঠিয়াছে। কেহ খোঁজ লয় নাই, কেহ আক্ষেপ ক'রে নাই, কি পরিতৃপ্তিতে তার বুক ভরা ছিল, কিন্তু আজ সকলের সমাদরে তাহার বুকে এত বেদনা বাজে কেন?

অনেক কষ্টে চোখের জল সামলাইয়া সে ভাত ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। মেজ-জা আসিয়া সুপারি লবঙ্গ হাতে দিয়া বিশ্রামের জন্য ঘরে মাদুর বিছাইয়া দিল।

বিপাশা চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। বাহিরের কর্ম্ম-কোলাহল কানে আসিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে লাগিল। দেবরদের স্নান হইল, আহারের স্থান হইয়াছে কিনা, কে জানে? এখনই হয়ত তাহারা বলিবে খাবার কাছে বৌদি না থাকিলে তাহাদের পেট ভরে না জানিয়াও বৌদি শুইয়া আছে কি বলিয়া? বিপাশা উৎকর্ণ হইয়া রহিল এখনই তাহাদের উচ্চ কণ্ঠের আহ্বানে হয়ত তাহাকে উঠিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু কেহই তাহার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইল না। তাহাদের খাওয়া হইয়া গেল, হয়ত পান সাজা হয় নাই, টিফিন গোছাইতে হয়ত মেজবৌ ভুলিয়াই গিয়াছে। ছিটে খাইতে বসিয়াছে, তাহার খোকা কাঁদিয়া তাহাকে বিরক্ত করিতেছে, শাশুড়ীর আহারের পর একটু তেঁতুল খাওয়ার

অভ্যাস, সেটুকু হয়ত তিনি পান নাই। এইরূপ কত চিন্তা তাহাকে উতলা করিয়া তুলিতে লাগিল। কিন্তু সে উঠিয়া গেল না, কেনই বা যাইবে, সে যে এ বাড়ীর অতিথি! সে যে দু-দিনের জন্য এখানে সমাদর পাইতে আসিয়াছে! এ বাড়ীর সুখ-দুঃখের সহিত তাহার যোগাযোগ ঘুচিয়া গিয়াছে।

বৈকালে মেজবউ আসন পাতিয়া পাথরের রেকাবিতে ফল মিষ্টি আনিয়া দিল। জায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বিপাশা বলিল, "এ সব আবার কেন মেজবউ ?"

জা বলিল, "ও বেলা ত ভাত খেতে পার নি, তোমার ত কষ্ট করা অভ্যেস নেই, দু-দিনের জন্য আমাদের কাছে এসে কেন কষ্ট করবে বল ?"

আর কিছু না বলিয়া বিপাশা দু-টুকরা ফল তুলিয়া মুখে ফেলিয়া দিল। ছিটের খোকা আসিয়া হাত বাড়াইয়া দিল, বিপাশা মিষ্টিটি উঠাইয়া তাহার হাতে দিল। ছিটে বলিল, "কেন ওকে দিলে বৌদি, ভারি হ্যাংলা ছেলে, তুমি কি খাবে ?" বলিয়া অন্য একটি মিষ্টি আনিয়া বিপাশাকে দিল।

খোকা তৃপ্তির সহিত সন্দেশটি খাইতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া বিপাশা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। ছিটে যখন ছোট ছিল, তখন কোন ভাল জিনিসই বিপাশা খাইতে পারে নাই—ছিটে, ফোঁটা কাড়িয়া খাইয়াছে। আজ তাহাদের ছেলেকে একটা সন্দেশ দিলে তাহার আহার অসম্পূর্ণ থাকিবে এ কথা তাহারা ভাবিল কেমন করিয়া ?

সন্ধ্যার সময় মেজ দেবর আফিস হইতে আসিয়া হাত-মুখ ধুইয়া জল খাইতে খাইতে বলিল, "ক-দিন থাক্‌বে বৌদি, তাঐ মশায় নিতে আসবেন, না চঞ্চলবাবুর সঙ্গেই ফিরবে ?"

বিপাশা বলিতে পারিল না যে সে যাইবে বলিয়া আসে নাই, সে থাকিতেই আসিয়াছে, তাহারই হাতে গড়া সংসারে সে একটু স্থান পাইতে আসিয়াছে! সে সমাদর লাভ করিতে আসে নাই, সমস্ত জীবন যেমন সে সমস্ত অভাব-দৈন্যের অংশ গ্রহণ করিয়াছে, আজও সে তাহাই চায়! কিন্তু বিবর্ণ মুখে বলিল, "না চঞ্চলের সঙ্গেই ফিরব।"

কেহ তাহাকে দু-দিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিল না, এত শীঘ্র চলিয়া যাইবে বলিয়া অনুযোগ করিল না, দুঃখ প্রকাশ করিল না। ছোট দেবর বলিল, "চঞ্চলবাবু ত বললেন, তিন দিন ছুটি নিয়ে তোমার সঙ্গে এসেছেন, তবে তুমি কালই যাচ্ছ ?"

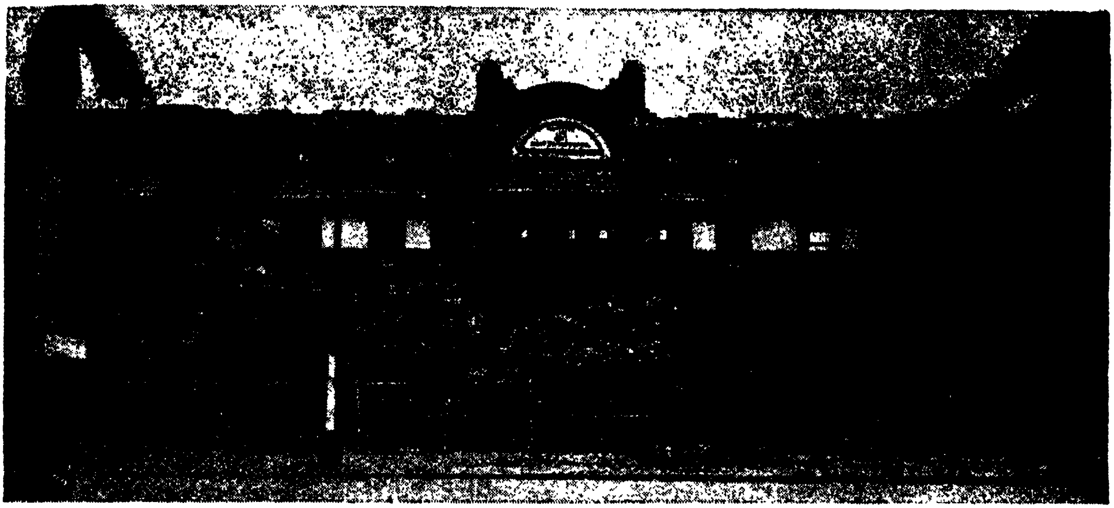
সংক্ষেপে বিপাশা বলিল, "হ্যাঁ"—

যাত্রার সময় মেজ দেবর একখানা গরদ আনিয়া তাহার হাতে দিল। দেবর, ননদ, জা সকলেই আসিয়া প্রণাম করিল। শাশুড়ী কাঁদিয়া বলিলেন, "আমার ত সচ্ছল সংসার নয় যে জোর ক'রে তোমায় ধরে রাখব মা ? ওরা দু-ভাই কোন মতে সংসার চালায়, ছিটের বিয়েতে কতক-গুলো ঋণ হয়েছে, আবার ফোঁটাকেও ত দিতে হবে। এখানে থাকলে কত কষ্ট হবে, এই মেজবৌ কত সময় কত কষ্ট করে—"

বিপাশা হাত বাড়াইয়া ছিটের খোকাকে কোলে নিতে গিয়াছিল, আর সহ্য করিতে না পারিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

চঞ্চল বলিল, "থাকবে ব'লে মিথ্যে এতগুলো জিনিস টেনে আনলে কেন দিদি ?"

চোখের জল মুছিয়া বিপাশা হাসিতে চেষ্টা করিল।



কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়

মূক-বধিরদের শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার

পৃথিবীর যত প্রকার ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ ইত্যাদি আছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে হতভাগ্য মূক-বধিরদিগের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাদের শিক্ষা বা সংস্কৃতির জন্য কোন ব্যবস্থার নিদর্শন পাওয়া যায় না। উহারা চিরকালই ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। সকলেরই ধারণা ছিল এবং এখনও অনেকেরই আছে যে ইহারা সংসারক্ষেত্রে বৃথাই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বৃথাই মৃত্যু-যবনিকার পশ্চাতে সরিয়া যাইবে।

স্থানবিশেষে মূক-বধিরদিগের অবস্থার তারতম্য দৃষ্ট হয়। পুরাকালে ইউরোপে ইহাদের প্রতি যে প্রকার অমানুষিক অত্যাচার হইত ভারতবর্ষে সেই প্রকার অত্যাচারের কথা কোথাও শোনা যায় না। রোম প্রভৃতি স্থানে অত্যাচারের ধারা ও পরিমাণ মর্ম্ম-বিদারক ছিল। তাহারা আদর্শ জাতি গঠন করিবার প্রয়াসে এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানব জাতিকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিত। কিন্তু ভারতবর্ষে ইহাদের প্রতি ঐরূপ কোন অত্যাচার না হইলেও ইহাদের ভাল-মন্দর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ আবশ্যক বলিয়া কেহ মনে করিতেন না। ভারত চিরদিনই দয়া-দাক্ষিণ্য গুণের অধিকারী। কিন্তু সকলেরই আহারের প্রাচুর্য্য থাকায় এবং একান্নবর্তী পরিবারে বাসের দরুণই মনে হয় এই হতভাগ্য মূক-বধিরদিগের প্রতি কেহ মনোযোগী হন নাই। হিন্দু আইনের প্রখর দৃষ্টি হইতে কিন্তু ইহারা আজও মুক্তি পায় নাই। আইনে ইহারা পৈতৃক সম্পত্তি অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছে। অধুনা মূক-বধিরগণ উপযুক্ত শিক্ষিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও আইনের কঠিন ব্যবস্থা হইতে মুক্তি পায় নাই। আইনের এই সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ করিয়া অনেক ক্ষেত্রেই অসহায় শিক্ষিত মূক-বধিরদের উপযুক্ততা সত্ত্বেও তাহাদের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইয়া থাকে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বহু শিক্ষিত মূক-বধির তাহাদের পিতৃদত্ত সম্পত্তি সাধারণের ন্যায়ই অতি দক্ষতার সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। সুতরাং আইনের এই কঠিন ধারাটির পরিবর্ত্তন করিয়া শিক্ষিত মূক-বধিরদের সম্বন্ধে নূতন আইন-প্রণয়ন বিশেষ আবশ্যক। এ বিষয় দেশের আইন-প্রণয়নকারীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করা উচিত।

শিক্ষাসম্ভূত সভ্যতার ফলস্বরূপ আজ এই কঠিন জীবন-সমস্যার দিনেও পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মূক-বধির, অন্ধ ও জড়বুদ্ধিদের শিক্ষার জন্য অল্পবিস্তর চেষ্টা-প্রচেষ্টার ব্যবস্থা দেখা যায় এবং সাধারণের সহানুভূতিরও অভাব হইতেছে না।



আবে ডিলাপে

পাশ্চাত্য দেশে সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মূক-বধির-দিগের শিক্ষার তেমন কোনই ব্যবস্থা ছিল না। অষ্টম শতাব্দী হইতে তাহাদিগের শিক্ষার বিষয়ে কিঞ্চিৎ চেষ্টা আরম্ভ হয়। প্রথমে যে সকল মহাত্মা মূক-বধিরদিগের শিক্ষা-পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই নিজ নিজ শিক্ষাপদ্ধতি বিভিন্ন পন্থায় শিক্ষা-দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইঁহারা কেহই তাঁহাদের শিক্ষা-প্রণালী কাহাকেও শিক্ষা দিয়া যান নাই। শিক্ষা প্রণালী গোপন রাখার জন্য পরবর্ত্তী কালে উক্ত মহাত্মাদের আবিষ্কৃত প্রণালী দ্বারা মূক-শিক্ষা জনসাধারণে প্রচারিত হয় নাই এবং তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল প্রণালী লোকচক্ষু হইতে লুপ্ত হইয়া যায়।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে আবে ডিলাপে নামে এক মহাত্মা দুইটি মূক-বধির বালিকার দুরবস্থায় আকৃষ্ট হইয়া প্যারিস নগরে একটি মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিদ্যালয়। আবে ডিলাপে ইহাদের শিক্ষার জন্য 'সাঙ্কেতিক প্রণালী' আবিষ্কার করেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই বিদ্যালয়টির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ প্যারিসে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে (রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশন ফর দি ডেফ এণ্ড ডাম্ব) এবং তাঁহার জন্মস্থান ওভারসেইলিস্ নামক স্থানে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে প্যারিসে নানা দেশ হইতে আগত মূক-বধির ও বহু গণ্যমান্য লোক সম্মিলিত হইয়া তাঁহার স্মৃতিপূজা করিয়া থাকেন। আজ সমগ্র ফ্রান্সে ২২,৬১০ মূক-বধিরের জন্য ৭১টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে সেমুয়েল হাইনিকা নামে এক মহাত্মা জার্ম্মেনীর অন্তর্গত ড্রেসডেন নগরে মাত্র দুইটি মূক-বধির বালককে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার অসীম যত্ন ও প্রচেষ্টায় বালক দুইটি উন্নতি লাভ করে। তাঁহার এই শিক্ষার বিষয় সাধারণে প্রচারিত হইলে তিনি ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে নয়টি মূক-বধির বালক সংগ্রহ করিয়া লিপ্‌জিক নগরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জার্ম্মেনীতে ইহাই সর্ব্বপ্রথম মূক-বধিরদের শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। হাইনিকা তাঁহার আবিষ্কৃত মৌখিক প্রণালীতে শিক্ষা দিতেন। প্রথমাবস্থায় তিনি তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী সাধারণের নিকট গোপন রাখিতেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। হাইনিকা তাঁহার আবিষ্কৃত মৌখিক প্রণালী সম্বন্ধে প্যারিসে আবে ডিলাপের সহিত কয়েক বার পত্র ব্যবহার করেন। এই পত্র বিনিময়ের ফলে মূক যে যত্ন ও চেষ্টা করিলে মুখর হইতে পারে এবং উহারা দৃষ্টিশক্তি দ্বারা অন্যের কথিত ভাষা বুঝিতে সমর্থ হয় ইহা জগতে প্রচার



সেমুয়েল হাইনিকা



ডাঃ ই এম গ্যালাউডেট

হইয়াছিল এবং অধুনা সমস্ত সভ্য জগতেই হাইনিকার আবিষ্কৃত মৌখিক প্রণালী দ্বারাই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ৩০শে এপ্রিল সন্যাস রোগে হাইনিকার মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রতি সম্মানের জন্য তাঁহার স্থাপিত বিদ্যালয়ে সাধারণের সাহায্যে একটি প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। অধুনা জার্ম্মেনীতে ৩৮,৪৮৯ মূক-বধিরের জন্য ৯৭টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

প্যারিসে আবে ডিলাপে এবং জার্ম্মেনীতে সেমুয়েল হাইনিকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়কালীন টমাস ব্রেইড-উড নামে এক মহাত্মা এডিনবরা নগরে সাঙ্কেতিক প্রণালী ও মৌখিক প্রণালীর সংমিশ্রণে "যুক্ত প্রণালী" দ্বারা একটি মূক-বধির বালককে শিক্ষা দিতে থাকেন এবং লণ্ডন সহরের নিকটবর্ত্তী হেক্‌নি নামক গ্রামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র মিঃ যোসেপ্‌ ওয়াটসন উভয়ে মিলিত হইয়া মাত্র ৬টি মূক-বধির বালক লইয়া লণ্ডন সহরে দি ওল্ড কেণ্ট রোড ইন্‌ষ্টিটিউশন নামে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। যুক্তরাজ্যের প্রথম মূক-বধির বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ব্রেইডউড সাহেবের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে ন্যাশনাল কলেজ অব্‌ দি টিচার্স অব্‌ দি ডেফ "ব্রেইউউড" নামে একটি স্বর্ণ পদক প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। মূক-বধির শিক্ষার উন্নতিকল্পে মৌলিক গবেষণা ও ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব টিচার্স অব দি ডেফের প্রথম সম্মেলনের স্মৃতিরক্ষা এই পদক প্রবর্ত্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অধুনা যুক্তরাজ্যে মূক-বধিরের সংখ্যা ১২৩৭১ এবং ইহাদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৫।

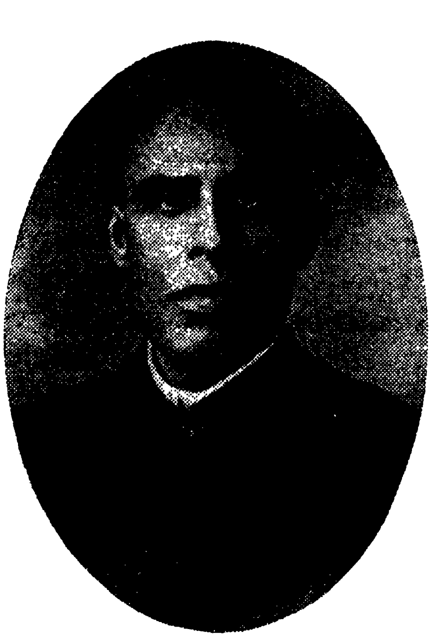
ফ্রান্সে আবে ডিলাপে, জার্ম্মেনীতে সেমুয়েল হাইনিকা এবং যুক্তরাজ্যে টমাস ব্রেইডউড সর্ব্বপ্রথম অসহায় মূক-বধিরদের উপযুক্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের জন্য প্রকাশ্য-ভাবে সাধারণ বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া সমগ্র জগতের সম্মুখে ইহাদের শিক্ষা বিস্তারের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত মহাত্মাদের স্বার্থত্যাগ, কর্ম্মপ্রচেষ্টা এবং মহানুভবতা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। উঁহারা যথার্থই আর্ত্তের বন্ধু ছিলেন। হতভাগ্য মূক-বধির যাহারা সর্ব্বপ্রকার আনন্দের অনুভূতি হইতে বঞ্চিত, তাহাদের জন্য সত্যই ইঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়াছিল। ইঁহাদের দান যুগ যুগ ধরিয়া দেশবাসী সম্ভ্রমে স্মরণ করিবে সন্দেহ নাই। আজ ঐ তিন জন মহাপুরুষের জীবনের কর্ম্মধারা হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া নব নব প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত হইয়া সারা পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করিতেছে।

অধুনা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য প্রদেশেই অসহায় মূক-বধিরদিগের জন্য স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকা মূক-বধিরদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে মূক-বধির বালক-বালিকাদের শিক্ষা সাধারণের ন্যায়ই বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

আমেরিকায় প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার মূল



টমাস এইচ গ্যালাউডেট



৺যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কারণ একটি ছোট মূক-বধির মেয়ে। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার অন্তর্গত হার্টফোর্ড নামক স্থানে ডাক্তার কগ্‌জওয়েল (Dr. Cogswell) সাহেবের মেয়ে প্রায় আড়াই বৎসর বয়সের সময় কঠিন রোগে বধির হইয়া যায়। পিতামাতা উভয়েই কন্যার এই অবস্থায় অত্যন্ত দুর্ভাবনায় পড়েন এবং কি উপায়ে কন্যার শিক্ষা হইতে পারে এ বিষয় নানাভাবে চিন্তা করিতে থাকেন। এই সময় ডাঃ কগ্‌জওয়েলের প্রতিবেশী এক শিক্ষিত যুবক মিঃ টমাস্ এইচ গ্যালাউডেটের দৃষ্টি এই অসহায় বালিকাটির প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি প্রত্যহ এই বালিকাটিকে নানাভাবে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যেই বালিকাটি দুই-একটি কথা উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। এই সময় গ্যালাউডেট সাহেব ইউরোপ ও ফ্রান্সের মূক বধির বিদ্যালয়ের কথা জানিতে পারেন। ডাঃ কগ্‌জওয়েল, মিঃ গ্যালাউডেট এবং আরও কয়েক জন স্থানীয় সহৃদয় ব্যক্তি আমেরিকায় আরও বহু মূক-বধিরদের অসহায় অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া একটি উপযুক্ত বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য হার্টফোর্ডে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির উদ্যোগে মিঃ গ্যালাউডেট ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে মূক-বধিরদের শিক্ষা-প্রণালী শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। দুঃখের বিষয় তিনি বিলাতে এ বিষয়ে তেমন কোন বিশেষ উৎসাহ পান নাই, পরে তিনি প্যারিস নগরীতে আবে ডিলাপের স্থাপিত বিদ্যালয় হইতে মূক-বধির শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র সাতটি ছাত্র লইয়া আমেরিকার প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

অধুনা আমেরিকাতে ৩৩,৮৭৮ মূক-বধিরদের জন্য ১২৬টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উপরন্তু মূক-বধিরদের উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গ্যালাউডেটের সুযোগ্য পুত্র ডাঃ ই, এম, গ্যালাউডেট ওয়াসিংটন নগরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই কলেজটি গ্যালাউডেট পিতার নামানুসারে গ্যালাউডেট কলেজ নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর বহু মূক-বধির ছাত্র ও ছাত্রী এই কলেজ হইতে বি-এ ও এম-এ উপাধি লাভ করিতেছে।

পাশ্চাত্য দেশে মূক-বধিরদের শিক্ষার ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ হইবার পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত ভারতে ইহাদের শিক্ষার নিমিত্ত কোন সুব্যবস্থা হয় নাই।

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে, বঙ্গের মাননীয় ছোট লাট সর্ রিভার্স টমসন স্থানীয় লোকের সহায়তায় কলিকাতা মহানগরীতে একটি মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপনের বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় এবং জনসাধারণের সহানুভূতির অভাবে তাঁহার এই সাধু প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই।



৺শ্রীনাথ সিংহ



৺উমেশচন্দ্র দত্ত

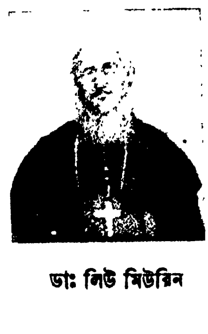
বোম্বাই প্রদেশের প্রধান ধর্ম্মযাজক মাননীয় ডাঃ লিউ মিউরিন (Dt. Leo Meurin) অভাগা মূক-বধিরদের গভীর দুঃখ উপলব্ধি করিয়া ইহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হন। তাঁহারই প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টার ফলে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে ভারতের প্রথম মূক-বধির বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত ও সুচারু রূপে পরিচালনার উদ্দেশ্যে ডাঃ মিউরিন আয়র্লণ্ড হইতে মূক-বধিরদের শিক্ষা-প্রণালীতে অভিজ্ঞ একজন শিক্ষক আনয়ন করেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ডাঃ মিউরিনের স্থাপিত বিদ্যালয়টিকে সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হন। মাননীয় ধর্ম্মযাজক ডাঃ লিউ মিউরিনই ভারতবর্ষে মূক-বধির শিক্ষার প্রথম পথ-প্রদর্শক।

অধুনা বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে নয়টি মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই নয়টি বিদ্যালয়ের মধ্যে বরোদা রাজ-সরকার ১৯০৯ এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বরোদা ও মাহেসানা নগরে দুইটি সরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

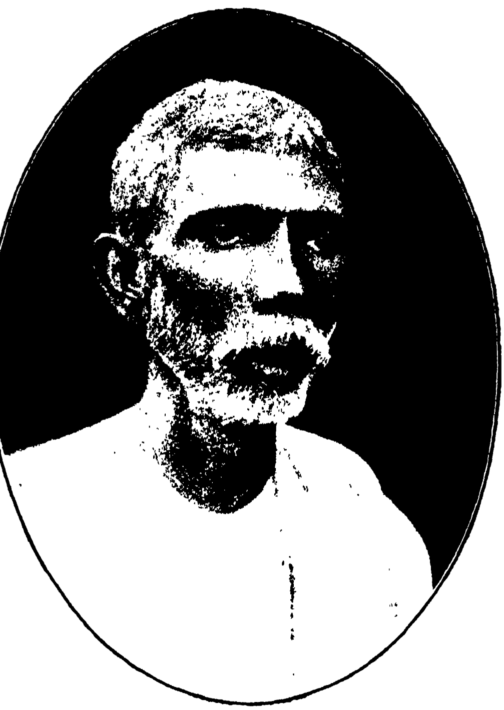
১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরীতে একটি মূক-বধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও তদ্দ্বারা বঙ্গদেশে মূক-বধির শিক্ষার বিশেষ কোন সহায়তা হয় নাই। এই সময় লণ্ডনের সুবিখ্যাত ওল্ড কেণ্ট রোড ইনষ্টিটিউশনের প্রাক্তন ছাত্র একটি শিক্ষিত বধির মিঃ ফ্রান্সিস ম্যাগিন, বি-এ, ভারতবর্ষে প্রায় আড়াই লক্ষ হতভাগ্য মূক-বধিরের জন্য বোম্বাই প্রদেশের একমাত্র শিক্ষায়তন ব্যতীত আর কোনও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা নাই জানিয়া ভারতে মূক-বধির বিদ্যালয় সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে তদানীন্তন বড়লাট বাহাদুরের নিকট এক আবেদন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার সেই শুভেচ্ছা তখন কার্য্যকরী হয় নাই। তাঁহারই ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় ইউরোপের সমস্ত শিক্ষিত বধির মিলিত হইয়া ভারতের অসহায় মূক-বধিরদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা প্রার্থনা করিয়া পরলোকগতা ভারতেশ্বরী মাননীয়া ভিক্টোরিয়ার নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা নিবাসী বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় গিরীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা মূক-বধির ছিলেন। তিনি তাঁহার এই হতভাগ্য সন্তানদের সুশিক্ষার জন্য আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা করিতে থাকেন। তিনি মূক-বধিরদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় কয়েকখানা পুস্তক ও সংবাদপত্র সংগ্রহ করেন। এবং তিনি নিজে বোম্বাই মূক-বধির বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া আসেন। তিনি স্বর্গীয় শ্রীনাথ সিংহ মহাশয়কে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে পুত্র-কন্যাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। শ্রীনাথবাবুর চেষ্টা ও যত্নে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ছেলেমেয়েরা কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিতে শিক্ষালাভ করে। গিরীন্দ্রবাবু এই সময় কলিকাতা নগরীতে একটি মূক-বধির বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য বিশেষ আন্দোলন করেন এবং প্রচুর অর্থও ব্যয় করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় জনসাধারণের নিকট হইতে বিশেষ কোন সহযোগিতা বা উৎসাহ না পাওয়ায় তাঁহার এই মহান প্রচেষ্টা কার্য্যকরী হয় নাই।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে শ্রীনাথ সিংহ মহাশয় মাত্র দুইটি মূক-বধির ছাত্র লইয়া সিটি কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহাপ্রাণ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহযোগিতায় উক্ত কলেজের একটি ঘরে মূক-বধির ক্লাস



ডাঃ লিউ মিউরিন



শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার

আরম্ভ করেন। কিছু দিনের মধ্যেই কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মজুমদার ও স্বর্গীয় যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীনাথ-বাবুর নবপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে যোগদান করেন। মোহিনীবাবু ইহার পূর্ব্বেই গিরীন্দ্রবাবুর মূক-বধির সন্তানদের চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিতে লিপ্ত ছিলেন এবং সেই সূত্রে তিনি শ্রীনাথবাবুর সহিত বিশেষ পরিচিতও ছিলেন। উমেশবাবুর তত্ত্বাবধানে ও তাঁহার ঐকান্তিক উৎসাহে এই তিনটি নগণ্য যুবক বিশেষ যত্ন সহকারে মূক-বধিরদিগের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুখের বিষয় অল্প দিনের মধ্যেই ইঁহাদের পরিশ্রম ও অসীম প্রচেষ্টার ফলে বালকগণ অল্প অল্প শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসংখ্যাও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে উমেশবাবু একটি উপযুক্ত কমীটি সংগঠন করিয়া তাহাদের হস্তে বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার অর্পণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের ভার কর্ম্মবীর উমেশবাবুর উপরেই অর্পিত হয়। চারজনের সম্মিলিত চেষ্টার ফলস্বরূপ ক্ষুদ্র ক্লাসটি কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় নামে অভিহিত হয়। আধুনিক উন্নততর প্রণালীতে মূক-বধিরদের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যামিনীনাথ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বিলাত যাত্রা করেন। তিনি দুই বৎসর কাল ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও আমেরিকায় উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে বিদ্যালয়ের কার্য্য সুনিয়মিতরূপে পরিচালিত হইতে থাকে এবং অনেক সহৃদয় ব্যক্তির মন বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মাসিক ১২৫৲ সাহায্য মঞ্জুর করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশন মাসিক ১০০৲ সাহায্য দিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যালয়ের তদানীন্তন সভাপতি মাননীয় সি, ডবলিউ, বোণ্টন সাহেবের অক্লান্ত যত্ন ও চেষ্টায় লক্ষাধিক অর্থ সংগৃহীত হইয়া ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ২৯৩, আপার সার্কুলার রোডস্থিত অধুনাতন সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়।

যাঁহাদের সাধু প্রচেষ্টায় আজ এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছে দুঃখের বিষয় তাঁহাদের ভিতর শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মজুমদার ব্যতীত আর কেহই ইহ-জগতে নাই। মোহিনীবাবুও বার্দ্ধক্যবশতঃ বিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে আজ ২৪০টি মূক-বধির ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে। মূক-বধিরদের ভবিষ্যৎ জীবনে স্বাবলম্বী হইবার জন্য বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিল্প শিক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছে। আজ বহু মূক-বধির শিক্ষিত হইয়া নিজ নিজ জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে।

অধুনা বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যক্ষ রায় সাহেব অটল-চাঁদ চট্টোপাধ্যায়। তিনিও আমেরিকা হইতে মূক-বধির



মূক-বধির শিল্প শিক্ষা করিতেছে

শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সুপরিচালনায় বিদ্যালয়ের কার্য্য দিন দিন যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতেছে।

আজ ভারতবর্ষে মূক-বধিরদিগের শিক্ষা ইহাদের সংখ্যানুপাতে যতটা হওয়া উচিত দুঃখের বিষয় তাহার কিছুই হয় নাই, তবে পূর্ব্বের অবস্থা হইতে এখন কিঞ্চিৎ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে সে বিষয় সন্দেহ নাই। এখন প্রায় সমস্ত প্রদেশেই এই হতভাগ্যদের জন্য শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হইয়াছে এবং হইতেছে। জনসাধারণের দৃষ্টিও এই দিকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে ৪০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে যথা—

বাংলা—১১; বোম্বাই—৯; মাদ্রাজ—৮; বিহার—২; উড়িষ্যা—১; আসাম—১; দিল্লী—১; হায়দ্রাবাদ—১; যুক্তপ্রদেশ—২; মহীশূর—১; কোচিন ১; মধ্য-প্রদেশ—২;

উল্লিখিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা পাইতেছে মাত্র ৮০০ জন ছাত্রছাত্রী। প্রায় আড়াই লক্ষ মূক-বধিরের তুলনায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই।

মূক-বধিরদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য আজ ভারতে



মূক-বধির শিল্পশিক্ষা করিতেছে

যে সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, ইহাদের প্রয়োজনীয়তা কোন অংশে উপেক্ষণীয় নয়। মূক-বধির শিক্ষার গুণে আজ নানা প্রকার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছে।

আমাদের দেশের সম্পন্ন ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যত্নবান না হইলে হতভাগ্য মূক-বধিরদের দুঃখ ঘুচিবে না। প্রয়োজন দেশবাসীর আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা।

"বাল্মীকিপ্রতিভা"-য় বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'য় দেখা যায়, কবির "বাল্মীকিপ্রতিভা" যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে অভিনীত হত, সুতরাং এর অনেকবার অভিনয় হয়েছে। এর মধ্যে শেষ অভিনয় আমার প্রবন্ধের বিষয়।

আমার বয়স তখন পনর-ষোল বছর—পাড়াগাঁয়ের স্কুলে পড়তাম—গ্রীষ্মের ও শীতের ছুটিতে কলকাতায় আসতাম। আমার বড়দাদা মহর্ষিদেবের সংসারে খাজাঞ্চি ছিলেন—কলকাতায় তাঁর বাসায় থাকতাম, কিন্তু আমার অধিকাংশ সময়ই তাঁর অফিসেই কাটত। তাঁর কাছে কবির অনেক কথা শুনতে পেতাম। একবার শীতের ছুটিতে কলকাতায় এসেছি—বড়দাদার কাছে শুনলাম, বাবুদের বাড়ীতে "বাল্মীকিপ্রতিভা"র অভিনয় হবে—খুব ধূমধাম—প্রত্যহই রিহার্সেল হচ্ছে। কবির কলকণ্ঠের গানের ভূয়সী প্রশংসা আগেই লোকের মুখে মুখেই শুনেছিলাম—প্রত্যক্ষ করার ভাগ্য কখনও হয় নি; তাই অভিনয়ের কথা শুনে বড় আনন্দ হ'ল। দিন গুনতে লাগলাম—ক্রমে অভিনয়ের দিন নিকট হ'ল। তখন বড়দাদা বললেন, দু-দিন অভিনয় হবে—প্রথম দিন সাহেব-সুবো, কলকাতার বড় বড় মান্যগণ্য লোক অভিনয় দেখবেন—পর দিনের অভিনয় সাধারণের জন্য, সেদিন তুমি গেলে দেখতে পাবে। আমি সেই আশায়ই থাকলাম।

বাড়ীতে এই শেষ "বাল্মীকিপ্রতিভা"র অভিনয়ে খুব ধূমধামই হয়েছিল। এর পরে শান্তিনিকেতনে কবির উদ্যোগে মাঝে মাঝে ছাত্রছাত্রীদের এই নাটকের অভিনয় দেখেছি, কিন্তু তার সঙ্গে এসব অভিনয়ের তুলনাই হয় না। তখন লর্ড ল্যান্সডাউন বড়লাট। 'ঘরোয়া'য় দেখা যায়,

মহর্ষিদেব এই অভিনয়ের মূল কারণ, তাঁর কি খেয়াল হয়েছিল, লেডী ল্যান্সডাউনকে পার্টি দেবেন, তাই তাঁর হুকুম "বাল্মীকিপ্রতিভা"র অভিনয় হবে। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর নিকটে শুনেছি, "সত্যেন্দ্রনাথ একবার যখন বিলাত থেকে আসেন, সেই সময়ে সেই জাহাজে লেডী ল্যান্সডাউন আসছিলেন। কথোপকথন প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ লেডী ল্যান্সডাউনকে যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আহ্বান করার কথা বলেন। বোধ হয়, এ কথা মহর্ষিদেবের কানে গিয়েছিল, তাই তাঁর এরূপ খেয়াল।" মূল কারণ যাই হোক, এইবার "বাল্মীকিপ্রতিভা"র অভিনয় সর্ব্ববিলক্ষণ—খুব জাঁকজমক—অর্দ্ধচন্দ্রাকারে নির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চের সুশোভন সজ্জা—নাটকীয় প্রত্যেক দৃশ্যপটের স্বভাবের অনুকরণের নিখুঁত বাস্তব পরিপাটি—দস্যুদলপতি ও দস্যুদের অনুরূপ পোশাক-পরিচ্ছদ—কবির দস্যুপতি-বাল্মীকির সাজ—আর আর অভিনেতা অভিনেত্রী সকলেরই পাত্রোচিত বেশ-ভূষা—সবই বেশ মনোমোহকর হয়েছিল—তাই বলি, এ অভিনয় সর্ব্ববিলক্ষণ।

বড়দাদার সঙ্গে আমি অভিনয় দেখতে গেলাম। বাড়ীর মধ্যে যে বিস্তৃত আঙিনা, দেখলাম তা শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবিষ্ট দর্শকে পরিপূর্ণ—মাথায় মাথায় লাগালাগি, ন স্থানং তিলধারণে। আঙিনার উত্তরে দালান—তার বারাণ্ডায় কোন প্রকারে একটু স্থান হ'ল। দূর হ'লেও সেখানে থেকে রঙ্গস্থল বেশ দেখা যাচ্ছিল। নাটক আরম্ভ হল। প্রথমে বনদেবীদের নৃত্য—পরে দস্যুদলের আবির্ভাব। অক্ষয় বাবু দস্যুদলপতি। তাঁকে আগেই আমি দেখেছিলাম। তিনি দীর্ঘ দেহ স্থূলকায় কাল, তাঁর বেশ একটু ভুঁড়ি ছিল—ঝাপটা চুল—স্বর একটু গম্ভীর। অভিনয়ে তাঁর পাত্রতা বেশ সুসঙ্গত হয়েছিল—তাঁর অভিনয়ও সহজ-সুন্দর। সহচর দস্যুদের অভিনয় অনুরূপই হয়েছিল, মনে হয়। আমি এসব দেখছিলাম বটে, কিন্তু মনে একটা কথা সর্ব্বদাই জাগছিল, সেটা কবির কথা—কতক্ষণ বাল্মীকির বেশে কবিকে দেখব—কখন তাঁর কলকণ্ঠের গান শুনতে পাব। অত্যন্ত ঔৎসুক্য—তখন দেখলাম, দস্যুপতি-বাল্মীকির বেশে কবির রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ—লম্বা জোব্বা-পরা, গলায় শঙ্খ ঝুলছে—ডাকাত ডাকবার। একে কবির সহজ মনোমোহনকর রূপ, তাতে পূর্ণ যৌবনের ললিত লাবণ্য অনুকূল পোশাক-পরিচ্ছদে সৌষ্ঠব-সম্পন্ন—তাতে আবার রঙ্গমঞ্চের পরিস্ফুট আলোক-প্রভা প্রতিভাত—সে সৌন্দর্য্য আরও মনোমোহকরতর হয়েছে। দর্শকেরা কবির সেই বাল্মীকি-বেশ দেখে চিত্রার্পিতের মত নির্বাক্ নিস্পন্দ। তখন কবিকণ্ঠে সঙ্গীত শোনা গেল—কবি গাইলেন,—

"এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে। ইত্যাদি।

এর পরে বাল্মীকির প্রস্থান। তার পরে দৃশ্য কালী-প্রতিমা—বাল্মীকির স্তবগান,—

রাঙাপদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা। ইত্যাদি।

একে মধুর কণ্ঠ, তাতে সময়োপযোগী বেহাগ-রাগের সুরে ছন্দোবন্ধন—সেই স্তুতিগীতি গানের স্বরসম্পদে সম্পূর্ণ হ'য়ে আসর একেবারে মাত করে ফেললে! গান গাওয়া শেষ হ'ল—বাল্মীকি নেপথ্যের অভিমুখ হ'লেই দর্শকদের মধ্যে মহাকোলাহল উঠলো—"এন্‌কোর" "এন্‌কোর"! সকলেই কবির সেই এক-ফেরতা গান শুনে তৃপ্তি লাভ কত্তে পারেন নি—আবার শোনবার জন্য সমুৎসুক! কবি কি করবেন—আবার ফিরলেন—গানের আমূল পুনরাবৃত্তি হ'ল—কবি নেপথ্যে অন্তর্হিত হ'লেন। আর "এন্‌কোর" হ'ল না, কিন্তু সকলে অতৃপ্ত না হ'লেও, সুতৃপ্ত হওয়ার ভাব কারো মুখে দেখা গেল না—আমি সামান্য শ্রোতা—দর্শক, আমার কথা কি বলবো! এর পরে, পূর্ব ভূমিকায় সরস্বতীর আবির্ভাবে তদ্‌গত-চিত্ত কবির রামপ্রসাদী সুরের শ্যামা-সঙ্গীত,—

শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা।
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি, মা। ইত্যাদি।

মধুর প্রসাদী সুর, শ্যামা-সঙ্গীতের অনুকূল—তাতে কবির মধুর কণ্ঠে আরও মধুরতর হয়ে সঙ্গীত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল। সে সময় এই দুটি গানের সুর আমার কানে এমন মিষ্টি লেগেছিল যে, তা বলবার নয়। "বাল্মীকি-প্রতিভা"র অভিনয়ের কথা শুনলেই, এখনও এই দুটি গানের সুরের অনুরণন আগেই কানে বেজে ওঠে—সে এক কেমন মদিরভাবমাখা সুর!

"ঝিম ঝিম ঘন ঘন রে বরষে"—ইত্যাদি বর্ষণের গানের সময়ে রঙ্গমঞ্চে বৃষ্টিধারাপাতে—বিদ্যুতের ক্ষণপ্রভায়—বজ্রের কড়-কড় ঘোর শব্দে—মেঘাড়ম্বরের গড়গড় গভীর ধ্বনিতে বর্ষার মূর্ত্তি-অনুকরণের সৌষ্ঠব যেন স্বাভাবিক বলে বোধ হয়েছিল। "ঘরোয়া"য় দেখি, সাহেব-মেমরা এই দৃশ্যে স্বাভাবিকের অনুকরণপটুতায় বড় খুসী হয়েছিলেন—হাততালির পর হাততালি পড়েছিল। এ দিনও বর্ষার দৃশ্য অঙ্গহীন হয়েছিল বলে মনে হয় না। এর পরে ক্রৌঞ্চ-মিথুনের পালা—ব্যাধশরে ক্রৌঞ্চবধ—ক্রৌঞ্চীর করুণ বিলাপে করুণবেদী বাল্মীকির কণ্ঠ হ'তে ক্রৌঞ্চীশোকে

অতর্কিত-ভাবে শ্লোকের উচ্চারণ,—"মা নিষাদ!" ইত্যাদি। পরে সরস্বতীর আবির্ভাব। তার পরের দৃশ্যে লক্ষ্মী আবির্ভূত—লক্ষ্মীর পরীক্ষা। ইন্দিরা দেবী মূর্ত্তিমতী ইন্দিরা হয়েছিলেন। ধনরত্নরাশি ধূলিরাশিতে ভারতীগত-চিত্ত বাল্মীকি নিস্পৃহ—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ—অনাদৃতা লক্ষ্মীর তিরোভাব।

এইবার শেষ দৃশ্য—বিদ্যার সমাদর—প্রিয়তম বর-পুত্রকে বর দিতে সরস্বতীর পটভূমিকায় আবির্ভাব! দেবী সর্ব্বশুক্লা—শুক্ল বর্ণ—শুক্ল বাস—শুক্ল পদ্মে সমাসীনা—শুক্ল হস্তে তুষার-শুভ্র শুক্ল বীণা—সর্ব্বাঙ্গ শুক্ল পরিচ্ছদে সমাবৃত—কেবল বীণার তারে সংলগ্ন বাঁ হাতের বাঁকা আঙুলগুলি অবধি কনুই পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল—যেন ভুজাকারে কোঁদা তুষার দণ্ড,—ডান হাত বীণার অন্তরালে—তত সুস্পষ্ট নয়। দূরে ছিলাম—বোধ হ'ল, যেন মৃন্ময়ী প্রতিমা!—অনির্ব্বচনীয় শোভা! সরস্বতী পদ্মাসন থেকে উঠলেন, হাতের বীণা বাল্মীকির হাতে দিলেন, বললেন,—

আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান,
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ প্রাণ!

*　　*　　*

এই যে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার!
যে গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার।

বীণাপাণির এই বরবাণী বরপুত্র কবির জীবনে সত্য সত্যই বর্ণে বর্ণে সার্থক হয়েছিল!

উপরে 'বাল্মীকিপ্রতিভা"র যে-সব দৃশ্য বর্ণনা করলাম, তা আমার প্রত্যক্ষ। দেখার পরে প্রায় ৫৬।৫৭ বৎসর অতীত হয়েছে, সব মনে না থাকা, আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। যে কয়টি দৃশ্য মনে ছিল, তাই লিখলাম—পর পর বিষয়গুলির বর্ণনায় কোন অভিপ্রায় নাই।*

* অধ্যাপক ডাক্তার কালিদাস নাগ মহাশয়, আমার কাছে কবির এই অভিনয়ের কথা শুনে, আমার প্রত্যক্ষ বিষয় বলে, আমাকে এটা লিপিবদ্ধ কত্তে বলেছিলেন, তাই এই প্রবন্ধ।

সুরেন্দ্র-স্মরণে

শ্রীঅরুণা দেবী

মৃত্যু আসিয়া যখন আমাদিগের নিকট হইতে আমাদিগের অতি আদরের প্রিয়জনটিকে ছিনাইয়া লইয়া যায়, আমরা যখন আর তাহাকে নিকটে পাই না, তখন তাহার স্মৃতি অবলম্বন করিয়াই আমরা তাহার বিয়োগ-ব্যথা ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করি। তাই স্মৃতি বড়ই মধুর।

যাঁহার স্মৃতি অবলম্বন করিয়া আমি আজ আমার এই ক্ষুদ্র লেখনী ধারণ করিয়াছি, তিনি ছিলেন—রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র 'শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর'। তিন মাস কাল অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ১৯৪০ সালের ৩রা মে তিনি পৃথিবীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছেন। আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার আত্মীয়-বন্ধু-পরিবারের মনের মধ্যে তাঁহার আকাশের মতন উদার মনেরই এক গভীর স্মৃতিরেখা।

মনে পড়ে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত তাঁহার সেই শান্ত, সৌম্য, সুন্দর ঋষিতুল্য মূর্ত্তি—সামান্য একটু ক্লান্তির ভাব ছাড়া দৈহিক যন্ত্রণার কোন ভাবই সেই প্রসন্ন মুখখানির উপর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। চক্ষু দুটি মুদ্রিত—দেখিলে মনে হয়—মন যেন দুঃখকষ্টের অতীত কোনও অজানা দেশের উদ্দেশ্যে অসীমের পানে চলিয়া গিয়াছে—এমনই তদ্গত সমাহিত ভাব।

চোখের সামনে ছবির মতনই ভাসিয়া উঠে সেই ঘরখানি। আসন্ন সন্ধ্যা—ম্লান আলো আসিয়া ঘরের ভিতর পড়িয়াছে, ঘরখানি নিস্তব্ধ, তদপেক্ষা নিস্তব্ধ সেই ঋষিমূর্ত্তিটি। ঘরের প্রজ্জ্বলিত ধূপের গন্ধ, বাতাসে ভাসিয়া-আসা মসজিদের আজানের অস্পষ্ট শব্দ, সব মিলাইয়া একটা শান্ত পবিত্র ভাব ঘরখানির ভিতর কেমন যেন একটা মায়ার সৃষ্টি করে।

ইহারই মধ্যে মনে পড়িয়া যায় তাঁহার অসীম ধৈর্য্যের কথা, কি সহ্যশক্তিই না ছিল তাঁহার। সাংসারিক কত-শত বিপদে পর্ব্বতের মতনই অচল অটল থাকিতে তাঁহাকে

দেখিয়াছি, আর শেষ দেখিলাম তাঁহার মৃত্যুশয্যায়। রোগের অসহ্য যন্ত্রণা ত ছিলই—উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও চিকিৎসকগণের যন্ত্রণাও বড় কম ছিল না। নীরবে শান্ত ভাবে তিনি এই যন্ত্রণা সহ্য করিয়া গিয়াছেন; এতটুকু কাতরতা বা বিচলিত ভাব কখনও তাঁহাতে প্রকাশ পায় নাই, এমন কি তাঁহার সেই প্রসন্ন মুখের ভাবের এতটুকু পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত হয় নাই। অন্যের সেবা করিতে সব সময় উন্মুখ থাকিলেও আপনার সম্বন্ধে সে বিষয়ে তিনি ছিলেন বড়ই সাবধানী। অসুস্থাবস্থায় সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হইয়া পড়িয়া বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সেবা গ্রহণ করিতে হইলে কেবল আপনার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার নিকট হইতেই নেহাৎ যতটুকু দরকার তদপেক্ষা এতটুকু বেশী সেবা তিনি গ্রহণ করেন নাই। শয্যা গ্রহণের দিন হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত একই রকম নীরব ও শান্ত ভাবে থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁহার অত বড় হৃদয়ের কতটুকুর সঙ্গেই বা আমি পরিচিত; তবু সেটুকুর পরিচয় দিতে গেলেও অনেক বলিতে হয়; এই প্রবন্ধে ত তাহা সম্ভব নহে, কাজেই সংক্ষেপে যতটুকু পারি বলিয়া শেষ করিব।

নাম-যশের প্রত্যাশী তিনি কোনও দিনই ছিলেন না, লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নীরবে কাজ করিয়া যাইতেই তিনি ভালবাসিতেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত কর্ম্মী। তাঁহার প্রকৃতিও ছিল স্বভাবতঃ শান্ত। সকল কাজেই তাঁহার ধীরতা প্রকাশ পাইত। বাহিরের সমারোহ অপেক্ষা অন্তরের সমারোহের প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি অধিক ছিল বলিয়া তাঁহার সকল কাজই সাধারণের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

তাঁহার আত্মীয়-বন্ধু মাত্রেই তাঁহার বহুমুখী গভীর জ্ঞানী হৃদয়ের সহিত পরিচিত; পাঠই ছিল তাঁহার অবসর-বিনোদনের অত্যন্ত আদরের বস্তু। কি একাগ্রতাই না ছিল তাঁহার মনের। লেখা বা পড়ার জন্য তিনি তাঁহার বাড়ীর যে স্থানটি পছন্দ করিয়া লইয়াছিলেন, সেই বারান্দাটি ছিল তাঁহার পরিবারস্থ সকলের একত্রে বসিয়া আলাপের স্থান। অত বড় বাড়ীতে নির্জ্জন স্থানের ত অভাব ছিল না, তবুও লিখিবার বা পড়িবার জন্য ঐ স্থানটি বিশেষ ভাবে পছন্দ করিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যই ছিল তাঁহার সম্ভবতঃ অবসর-বিনোদনের সময়টুকু পরিবারস্থ সকলের সহিত একত্রে অতিবাহিত করার। কল-কোলাহল-মুখরিত, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-নাতি-নাতিনী-পরিবেষ্টিত স্থানটির মধ্যে উপবিষ্ট সেই নিস্তব্ধ পাঠরত ধ্যানমগ্ন ঋষিমূর্ত্তিটি দেখিলে এমন কোন হৃদয় আছে যে মনে মনে তাঁহার নিকট নত না হইয়া, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারে? যিনি তাঁহার এই মূর্ত্তির সহিত পরিচিত, তিনিই কেবল আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

তাঁহার ভিতরের সৌন্দর্য্যও ছিল বাহিরেরই অনুরূপ। মন ছিল তাঁহার আকাশের মতনই উদার। পার্থিব কোন ঘটনাই তাহাতে ছায়াপাত করিতে পারিত না। তাঁহার জীবনকে তিনি আপনার পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন নাই; আত্মীয়, বন্ধু সকলের মধ্যেই তিনি আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন; তাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ লইয়া সকলকে আনন্দ বিলাইয়া অন্যের আনন্দে আনন্দিত হইয়াই তিনি তাঁহার জীবনের দিনগুলি কাটাইয়া দিয়া গিয়াছেন। দিয়াছিলেন আপনাকে নিঃশেষ করিয়াই; জগৎও তাহার স্বভাববশে পূর্ণ ভাবেই তাহা গ্রহণ করিয়াছিল, পরিবর্ত্তে তাঁহাকে যাহা দিয়াছিল তাহা এই স্থানে লিখিয়া আমার লেখনীকে আর কলঙ্কিত না করাই ভাল। প্রত্যেকেই আপনার প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে—দোষই বা কাহাকে দিব। আর তাঁহার কথা লিখিতে বসিয়া অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখাইতে বসিলেও তাঁহার আত্মাকেও ক্লিষ্ট করা হয় যে।

আনন্দ দিলেই আনন্দ পাওয়া যায়; আপনি আনন্দ পাইতে চাও, তবে পরকে আনন্দ বিলাও; 'পরস্পরের প্রতি প্রেমই মনুষ্য জীবনের উন্নতির পথ'; 'প্রীতি বিনা সকল কাজই বৃথা হয়'; 'লোকহিতে রত থাকাই ক্ষুদ্রতা হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়'। 'ইচ্ছা করিলেই মানুষ, মানুষকে আপন করিয়া লইতে পারে।' এই সবগুলিই ছিল তাঁহার মত; পরকে আপন করার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক যা আছে তা আছে; নিজের স্ব-ভাব দিয়ে যেটিকে আরও মিষ্টি ক'রে তুলতে পারবে সেটি তোমার হাতে-গড়া সম্বন্ধ হবে। যেখানে সম্পর্ক থাকার কোনও লৌকিক কারণ নেই, সেখানে সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে সম্বন্ধ পাতিয়ে বসা যায়। কাজে ব্যবহারে কথায় কথায় নিত্যি নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায়। নিজের মন হৃদয়ের রস দিয়ে জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াকে উৎসব, প্রত্যেক উৎসবকে আনন্দময় ক'রে তোলা যায়। একবার সৃষ্টি করবো ব'লে বসলে দেখবে এমন ঘটনা নেই যাকে নিজের ছোঁয়া দিয়ে আপনার না ক'রে নেওয়া যায়।"

এই কথাগুলির ভিতর যে কতখানি সত্য নিহিত আছে তাহা সহজেই অনুমেয়। আপনার অনুভূতি দিয়া বুঝিয়া তবে যে এই কথাগুলি তিনি বলিয়া গিয়াছেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ তাঁহার কথা ও কাজের ধারা একই ছিল।

তিনি বলিতেন এক উদ্দেশ্য লইয়াই সকল মানুষ পৃথিবীতে আসে। সকলেই ভবের খেলুড়ে। খেলা করিতে যখন আসিয়াছি তখন খেলাটাকে ভাল রকমে জমাইয়া তুলিয়া সকলে মিলিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া যাওয়াই ত ভাল। আর খেলিতে নামিয়া হারিয়া যাওয়া অপেক্ষা জিতিয়া উঠাই আনন্দের কথা নয় কি? পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া খেলাটা যাহাতে জমিয়া উঠে, তাহারই চেষ্টা করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। ভাল ভাবে খেলা জমাইয়া তুলিতে হইলে ভাল খেলোয়াড় হওয়ার প্রয়োজন। ভাল খেলোয়াড়ের লক্ষণ কি? তিনি বলেন— স্থিত-প্রজ্ঞ না হ'লে ভাল খেলোয়াড় হয় না তা খুব জানি। যে স্থিত-প্রজ্ঞ সে ভবের ছবি লীলার নিয়ম মনে এমনই বসিয়ে নিয়েছে যে তাকে পথ খোঁজার জন্য আঁকুবাকু করতে হয় না। উপরের আলোকে সে কখনও চোখের আড় হ'তে দেয় না। এগিয়ে না চললে পিছুতে হবে তা সে কখনও ভোলে না। কিন্তু সে চঞ্চল নয় ব'লে মোটেই শান্ত নয়। সে জানে আবেগ শান্ত হ'লেই সব মাটি। কাজেই শান্তির প্রার্থনা করে না। সে চায় আবেগ, তীব্র আবেগ যাতে যত শীঘ্র সম্ভব জিতে উঠে যেতে পারে।

সহজ সুন্দর ভাবে বলা কত বড় সত্য কথা। ভাল খেলোয়াড় হইতে হইলে আবেগকে কিছুতেই শান্ত হইতে দেওয়া চলিবে না।

তিনি ছিলেন প্রকৃত দাতা; তাঁহার সকল দানই গোপনে সম্পন্ন হইত, বাহিরে প্রকাশ পাইত না কখনও। কোনও প্রার্থীকে কখনও তাঁহার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হয় নাই। অনাথ গৃহহীনদিগের জন্য তাঁহার বাড়ীর দরজা সব সময়েই উন্মুক্ত থাকিত। তাঁহার সরল বিশ্বাসী মনের সুযোগ লইয়া কত জন যে তাঁহার মত মনীষীকেও প্রতারিত করিয়াছে, এমন কি সেই ঋষিতুল্য ব্যক্তিটিকে তাঁহাদের প্রখর রসনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দেন নাই তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি তাঁহার স্বভাব-সুলভ মৃদু হাসির সহিতই সে সকল উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। শেষ দিন পর্য্যন্ত কাহারও সম্বন্ধে কোনও অভিযোগ করিতে, বা কাহারও প্রতি এতটুকু অবিশ্বাসের



সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাব আনিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। মহৎ ব্যক্তি-দিগের প্রকৃতি ত ইঁহাই। আপনাদের যাহা-কিছু ভাল নিঃশেষে জগৎকে দান করিয়া জগতের যত কিছু মন্দ তাহাই পরিবর্ত্তে গ্রহণ করিয়া লইয়া যান। অর্থাৎ তাঁহার ভালটি গ্রহণ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে জগৎ তাঁহাকে যাহা দেয় তাহাকে মন্দ ছাড়া আর কিছু কি বলা যাইতে পারে? পৃথিবীর ইতিহাসই ত তাহার বহু প্রমাণ দিতেছে, এই স্বার্থ-ক্ষুদ্রতায় পরিপূর্ণ জগতের কজনেরই বা মহৎকে চিনিবার শক্তি আছে? এই নিষ্ঠুর জগৎ মহৎ মাত্রকেই লাঞ্ছিত করিয়াছে—তাই তাঁহাকেও ছাড়িয়া দেয় নাই।

ভগবানের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকার বা সাংসারিক সামান্য সামান্য ঘটনার ভিতর ভগবানকে টানিয়া আনার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ইহাতে যে কেবলমাত্র 'ভগবানের গাম্ভীর্য্য নষ্ট করা হয়', ইহাই ছিল তাঁহার মত। অবস্থা যত দুঃখকর বা কষ্টকরই হউক না কেন, তাহার প্রতীকারের কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া 'ভগবানের ইচ্ছা' বলিয়া মানিয়া লইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী তিনি মোটেই ছিলেন না। তিনি বলেন—

"এ ভাবে থাকলে স্বাধীন চিন্তা দূর করার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি-বৃত্তি সুখ-শান্তি সবেতেই জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। একবার বুদ্ধি খুলে গেলে মানুষ দেখলো যাঁকে যন্ত্রণাময় অবস্থার মূল কারণ মনে করে বোঝা গিয়েছিল তাঁকে 'মিত্র' বললে ভাষার একটু উল্ট প্রয়োগ হ'ত নাকি ?"

"তাঁর শক্তি তোমার মধ্যেই, তাঁর ইচ্ছায় নয়—তাঁর অভাবেই তোমরা হীন হ'য়ে আছ ; আত্মশক্তি জাগাও—তাঁকেও পাবে আর মানুষের মনে ভগবানকে শয়তানের সঙ্গে এক কোঠায় বাস করতে হবে না।"

সত্যই ত এই ভাব দিয়া দেখিলে তবেই না ভগবানকে 'সর্ব্বমঙ্গলময়' বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, আর ইহাতে ভগবান সম্বন্ধে মানুষের মনের ভাব অনেকখানি উচ্চ স্তর লাভ করে নাকি ?

সিভিলিয়ানের এক মাত্র পুত্র, পিতামাতার অত্যন্ত আদরের সন্তান ছিলেন তিনি। তাঁহার বাল্য ও কৈশোর অতুল সম্পদের মধ্যেই অতিবাহিত হয়। কিন্তু বিলাসিতা তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই। অত ঐশ্বর্য্যের ভিতরে আপনাকে তিনি যে কতখানি নির্লিপ্ত রাখিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন-প্রণালী হইতেই। অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখারও তিনি মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। উপায় করিয়া তাহা ভোগ করিয়া যাওয়ার স্বপক্ষেই তাঁহার মত ছিল। তবে তাহার বিশেষতঃ এই যে ভোগটা যেন ব্যক্তিগত না হয়, ব্যক্তিগত ভোগের মোহ ত্যাগই তাঁহার নিকট ত্যাগের প্রকৃত তাৎপর্য্য ছিল এবং আপনার জীবনে তিনি তাহাই করিয়া দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন—"উপনিষদে ক'রে ভোগ করার কথা যা বলা হয়েছে বিষয়ীর কাছে তা'র মানে হতেই চায় না। বড় জোর তাদিকে এইটুকু বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে ব্যাঙ্কে টাকা তোলা থাকলে ভোগে আসে না; খরচ করলেই তবে সেটা মূলধন হয়ে ভোগের উপায় জন্মাতে পারে। ওদিকে যাঁরা বৈরাগ্যরোগগ্রস্ত তাঁরা ভুলে যান যে আনন্দ সম্ভোগের উপায় শিখিয়ে দেওয়াই ঋষির উদ্দেশ্য। মনে করেন বুঝি ত্যাগের গুণপনাই করা হচ্ছে। যেটা ত্যাগ করা দরকার সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত ভোগের মোহ যাতে একের লোকসান বিনা আরের লাভ হয় না।" এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃতিতে এই ভাবটাই বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠে যে যিনি মানুষকে পৃথিবীতে খেলিতে পাঠাইয়াছেন তিনি স্বয়ং যে লীলাময় সে বিষয়ে যেরূপ বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না সেরূপ প্রত্যেক মানুষও খেলার আনন্দটা পূর্ণভাবে যাহাতে উপভোগ করিতে পারে তাহাই তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়াই অবশ্য সম্ভব। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তিনি মানুষ মাত্রকেই বুদ্ধি ও বৃত্তি দিয়াছেন—এইগুলি কাজে লাগাইয়া যাহাতে তাহারা আনন্দ-সম্ভোগের উপায় বাহির করিতে পারে। তাহা হইলে দেখা যায় যে প্রত্যেক মানুষকেই তিনি আনন্দের অধিকারী করিয়া পাঠাইয়াছেন। ভগবানদত্ত এই অধিকার হইতে একে অন্যকে বঞ্চিত করার অধিকার মানুষের থাকিতে পারে না। ব্যক্তিগত ভোগের দ্বারাই অপরকে তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, কারণ ব্যক্তিগত ভোগ অন্যের লোকসান বিনা সম্ভব হয় না।"

তাঁহার কাজের ধারা হইতে বুঝা যায় যে তিনি plain living and high thinking-এর মতবাদী ছিলেন। তাঁহার সন্তানদিগকে সেই জন্যই তিনি বিলাসের মধ্য দিয়া গড়িয়া তুলেন নাই। এই বিষয়ে তিনি বলেন—

"যে ছেলে কষ্ট সয়ে মানুষ হয়েছে সে বড় হয়ে অল্পে সন্তুষ্ট থাকে। মজবুত শরীর মন নিয়ে সংসারে তেড়ে ফুঁড়ে উঠে। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দান নিয়ে বেশ আনন্দে থাকতে পারে ; বিলাসের খরচ যোগাবার জন্যে শরীর পাত ক'রে তাকে অকালে বুড়িয়ে যেতে হয় না।"

পুত্র-কন্যাদিগের প্রতি স্নেহ ছিল তাঁহার অগাধ ; কিন্তু তাহা 'অন্ধ' নহে। পুত্র-কন্যার মঙ্গলার্থে বা আনন্দ বিধানার্থে এমন কোন কাজই ছিল না যাহা আপনার পক্ষে পীড়াদায়ক হইলেও তিনি করিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করিতেন। পুত্র ও কন্যার আদর তাঁহার নিকট সমান ছিল। কন্যাদিগের সম্বন্ধে তাঁহার মত অত্যন্ত উদার ছিল। সেই মত সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি তাঁহার দুই কন্যাকেই য়ুরোপ পাঠাইয়াছিলেন।

সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহের রূপ তিনি এই ভাবে দিয়াছেন—"স্নেহ কথাটা বেশ। যে ভাব মায়ের বুকে দুধ টেনে আনে, যে ভাবে ছেলেকে কোলে ধ'রে মা বাবা আদর করেন, সাজান, গোজান, খেলেন খেলান স্নেহ তার উপযুক্ত নাম। অপর পক্ষে স্নেহের বিনিময়ে যে মিষ্ট রস মা বাপ আদায় ক'রে নেন, ছেলেকে পালন করার পরিশ্রমের তাই তাঁদের পুরস্কার। বড় হ'য়ে ছেলে কৃতজ্ঞ হবে তার অপেক্ষা দুনিয়াদারীর অভ্যাসে মা বাপ করতে পারেন কিন্তু স্নেহতে তা করায় না।"

পিতামাতার পক্ষে তাহা হইলে দেখা গেল যে সন্তানের প্রতি স্নেহবশত তাঁহারা যাহা কিছু করেন তাহাতেই তাঁহারা সুখী, তাহাতেই তাঁহাদের আনন্দ। এই আনন্দটুকুই তাঁহাদের সন্তানকে পালন করার পুরস্কার; বড় হইয়া সন্তান কৃতজ্ঞ হইবে এই আশা যেরূপ উপযুক্ত পিতামাতাতে সম্ভবে না, সেইরূপ অপর পক্ষে উপযুক্ত সন্তানেরও পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যবোধ আপনা হইতেই জাগিয়া উঠিয়া পিতৃমাতৃঋণ শোধ করিবার ইচ্ছা হওয়াই সম্ভব। কিরূপে সে তাহা করিতে পারে? ইহার উত্তরে তিনি বলেন—"সর্ব ঐশ্বর্যসম্পন্ন ভগবানকে তাঁর দেওয়া ভোগ্য বস্তু ফিরে নিবেদন করার তাৎপর্য কি হ'তে পারে? যে মানুষ প্রাসাদের অধিকারী সে অনধিকারীকে নিজের আসনে তুলে নিয়ে ভাগ দেবার চেষ্টা করলে সেটা বরং বেশ দিলারাম দৃশ্য হয়। তেমনি মা বাবাকে সন্তান প্রতিদান কি বা দিতে পারে? মা বাপের কাছে পাওয়া যা-কিছু ভাল জিনিস সুদসুদ্ধ সেগুলো তার নিজের ছেলে-পিলেকে বুঝিয়ে দিয়ে তবেই তার পিতৃমাতৃঋণ শোধ হ'তে পারে।"

প্রত্যেক পিতামাতা যদি সন্তান-স্নেহের রূপ এই ভাবেই দিতে পারেন, তাহা হইলে সন্তানের কোনও কাজই তাঁহাদিগের দুঃখ দিতে পারে না। যে পিতামাতা যেরূপ ভাবে সন্তানের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা আশা করেন ঠিক সেই ভাবে না পাইলেই তাহা দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। অপর পক্ষে সন্তানগণও যদি এই ভাবে পিতৃমাতৃ-ঋণ শোধ করিতে পারেন, তবে সমস্ত মানব জাতির উন্নতি রোধ করিতে পারে কে?

পৃথিবীর সমস্ত মানব উন্নত হইয়া এক বিশাল জাতিতে পরিণত হইলে তবেই না সে এই বিশাল সৃষ্টিকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। সন্তান-উৎপাদনের মূলে সৃষ্টিরক্ষার উদ্দেশ্যই যে নিহিত আছে।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি অবাধ স্বাধীনতারই পক্ষপাতী ছিলেন। মনোবৃত্তিকে স্বাধীন ভাবে খেলিতে না দিলে তাহা যে সঙ্কুচিত হইয়া আর প্রসারতা লাভ করিতে পারে না, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। এই জন্যই তিনি পুত্র-কন্যার স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই বা তাহাদিগের প্রকৃতিকে স্ব-স্ব মনোবৃত্তি অনুযায়ী খেলিতে না দিয়া তাহাকে আপনার মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার সকল কাজেই নূতন সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যের পড়া বা করা কাজের নকল করা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। বুদ্ধি দ্বারা ভাবিয়া, হৃদয় দ্বারা অনুভব করিয়া আগ্রহসহকারে কাজ করিতেই তিনি সকলকে বলিতেন। তাঁহার মতে আপন সত্তার টলটলে অবস্থা করিয়া তুলিতে পারিলেই প্রত্যেক মানুষেই নূতন সৃষ্টি করিতে পারে।

চিরপরিবর্ত্তনশীল জগতে উত্থান-পতন আছেই। অসাধ্য বলিয়া নিরাশ হইয়া পড়িবার কোনই কারণ নাই; তাই তিনি বলেন—"তোমার অভিধান থেকে 'অসাধ্য' আর 'নৈরাশ্য' এই কথা দুটি কেটে দাও। সমস্যা আসে মেটাবার জন্যে, সঙ্কট আসে পার হবার জন্যে, দুঃখ আসে শক্তি যোগাবার জন্যে। রাত যত ঘনিয়ে আসে উষা তত এগিয়ে আসে সে কথা ভুলো না।"

"অন্তর্যামী ভর্ৎসনাকে যদি ভয় করে চল তাহলে জগতে আর কিছুরই ভয় থাকবে না—মৃত্যুরও না।"

তাঁহার এই সকল কথা হইতে নিঃসন্দেহে ইহাই প্রমাণিত হয় যে—সুখ-দুঃখে মিশান এই পৃথিবীতে আসিয়া, ভাল-মন্দর সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করাই প্রত্যেক মানুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। জয়লাভ করিতে হইলে শক্তির প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের স্ব-স্ব মনের শক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় শক্তি; এই শক্তি জাগাইয়া তোলাই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রকৃত উপায়। পথ যতই কণ্টকময় হউক না কেন মন যদি তাহাই গ্রহণ করিতে বলে তবে দুঃখ-কষ্টের ভয়ে ভীত না হইয়া অবিচলিত-ধীর-পদক্ষেপে সেই পথে অগ্রসর হইতে পারিলেই জয় নিশ্চিত যে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

তিনি ছিলেন উপযুক্ত সন্তান, উপযুক্ত ভ্রাতা, উপযুক্ত স্বামী, উপযুক্ত পিতা, উপযুক্ত বন্ধু; কি ছিলেন না তিনি। তাঁহার জীবনের সব দিকটাই তিনি পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। ইহা যে কতখানি শক্তি ও সাধনায় সম্ভব তাহা বলিবার কি কোনও প্রয়োজন আছে।

কোন এক সুন্দর নবালোকিত প্রভাতের মৃদু কর-স্পর্শে তাঁহার জীবন পবিত্র ফুলের মতনই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সুমধুর গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর তাপে ক্লিষ্ট হইয়া দিনান্তে আবার ধীরে ধীরে ফুলের মতই ঝরিয়া পড়িয়া গেল—কজনই বা তাহার খবর রাখেন। তাঁহার আত্মীয়-বন্ধু-পরিবারের নিকট তাঁহার অভাব কোনও দিনই পূর্ণ হইবার নহে। প্রত্যেক কাজে, সুখের দিনে, দুঃখের দিনে তাহার অভাব বড় বেশী করিয়াই মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। তাঁহার

সেই বিরাট্ আত্মার পরিচয় দিতে পারি আমার সে ক্ষমতা কোথায়? সামান্য চেষ্টাটুকু তাঁহারই আশীর্ব্বাদে সম্ভব হইল। তাঁহার শেষজীবনের লেখা 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ' নামক পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাঁহার সেই উদার হৃদয়ের কতক পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রবন্ধে তাঁহার বলা বলিয়া উদ্ধৃত অংশগুলি সেই পুস্তকখানি হইতেই গৃহীত।

আমার শেষ কথা 'সমস্ত মনুষ্য জাতি এক হউক', বিশ্বের মঙ্গল হউক, ইহাই ছিল যাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা বড় আকাঙ্ক্ষা, সেই মহাত্মার কয়েকটি বাণী মনুষ্যসমাজে শুনাইতে বসিয়া ও তাঁহার সেই উদার হৃদয়ের কিয়দংশের পরিচয় দিতে বসিয়া লোকচক্ষে আপনার প্রকাশে তিনি কতখানি বিরোধী ছিলেন তাহাই মনে পড়িয়া যাইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নটি বার-বার মনের মধ্যে উদয় হইতেছে—'তাঁহার আত্মাকে ক্লিষ্ট করিতেছি কি'; তবে এই প্রশ্নের সমাধান এরূপ ভাবে করা যাইতে পারে যে, যিনি মানুষের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাঁহার মহৎ হৃদয়ের কিছু পরিচয় লাভে মনুষ্য-সমাজের যৎসামান্য হিতও যদি সাধিত হয়, বিশেষ করিয়া এই উদ্দেশ্যে যখন তাঁহাকে প্রকাশ করা তখন ইহাতে তাঁহার আত্মার শান্তি বই অশান্তি যে হইবে না এইটুকু নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

প্রশ্ন

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

১৫

এই কয় মাসের ভিতর আরও একটা ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। মণিয়ার মার স্বামী বুড়া ডালওয়ালা কয়েক দিনকার জ্বরে মাসখানেক হইল মারা গিয়াছে। মণিয়ার মারও আজকাল আর তেমন খাটিবার সামর্থ্য নাই—একে বুড়ো তার পর এই শোক তাহাকে অনেকখানি কাবু করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। কাজেই নিরাপদদেরই সময়ে-অসময়ে টাকা-পয়সা দিয়া সাহায্য ও দেখাশুনা করিতে হইত বুড়ীকে।

একে নিজেদের লইয়া নিজেরাই ব্যস্ত—কেউ একটা টিউশনি পায় ত কেউ থাকে বসিয়া, এমনি অবস্থা, তার উপরে আবার নিরাপদদের সংসার যাইতেছিল ক্রমেই বাড়িয়া। মালতী আসিল—এখন হইতে মণিয়ার মার ভারও লইতে হইবে সম্পূর্ণভাবেই, আবার এদিকে পরেশের উপরে পুলিসের নজর এই সব ভাবিয়া নিরাপদ যখন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল এমন সময় বর্ম্মা হইতে আসিল পরেশের চাকুরীর খবর।

এখানকার বাস যখন উঠাইতেই হইবে, তখন পরেশ যদি চাকুরী লইয়া বর্ম্মায় যায় সেই-ই উত্তম। অবনী অনাদিবাবুর বাড়ীতে সুখেই আছে—আরও কিছু দিন পরে এখানে যদি কোন সুবিধা নাই-ই হয় তবে বোনের বিবাহ দিয়া সেও না হয় বর্ম্মা চলিয়া যাইবে। পরেশের নিকটে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিবে—আর দু-জনের ছাড়াছাড়ি হইবে না।

তাহার নিজের এখন পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক নাই—কাকার শরীরের যাহা অবস্থা সে জানিয়াছে তাহাতে বো[illegible] হয় বেশী দিন বাঁচিবেন না। এই দুঃসময়ে কাকাকে একাকী ফেলিয়া যাওয়া উচিত হইবে না—তা সে পরে আর অবনীকে যতই ভালবাসুক—তার পর কাকা যখ[illegible] আর বাঁচিয়া থাকিবেন না তখন যাহা হয় করিবে। কি[illegible] সে 'যাহা হয়' আর দশ জনের মত নয়। নিজে দেখি[illegible] শুনিয়া বিবাহ করিবে—কাকার টাকা ত যথেষ্টই মজু[illegible] আছে কিংবা কলিকাতায় একখানা বাড়ী ভাড়া করি[illegible] সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার করিবে—তাহাও নয়।

হয়ত কোন নিভৃত পল্লীতে গিয়া তথাকথিত ছো[illegible] লোকের ছেলেমেয়ে লইয়া একটা স্কুল খুলিবে—ছোটখা[illegible] একটা দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়া দিবে—এমনি আর[illegible] কত কি—সবসুদ্ধ গড়িয়া তুলিবে একটা আশ্রমের মত—এই কল্পনা ভিন্ন অন্য বাসনা, অন্য আশা নিরাপদর নাই। সম্প্রতি মালতী আর মণিয়ার মাকে লইয়া সে দা[illegible] ঠেকিয়াছে—ইহাদের কি করিবে। মণিয়ার মাকে না হ[illegible] সঙ্গে করিয়া কাকার ওখানেই লইয়া যাইবে, কি[illegible]

মালতীকে কোথায় রাখিবে কি করিবে। তাহার পিতার নিকটে গিয়া তাহাকে রাখিয়া আসা—সে অসম্ভব—মালতীও তাহাতে কখনও রাজী হইবে না। নিরাপদ ঘরে বসিয়া এমনই সব চিন্তা করিতে যাইতেছিল, এমন সময় ঘরে ঢুকিল মণিয়ার মা।

নিরাপদ প্রথমে তাহার দিকে ততটা দৃষ্টি দেয় নাই। পিছনে মণিয়ার মা ডাকিল "বাবু", নিরাপদ পিছন ফিরিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মণিয়ার মার দুই চোখভরা জল—সে কাঁদিতেছে। নিরাপদ প্রশ্ন করিয়া জানিল—আজ এই মাত্র সে মালতীর মুখে শুনিয়াছে যে তাহারা এখান হইতে একেবারে চলিয়া যাইবে—তাই সে তাড়াতাড়ি আসিয়াছে কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে। নিরাপদরা যদি চলিয়া যায় তবে তাহার কি অবস্থা হইবে? সে কেমন করিয়া বাঁচিবে। না খাইতে পাইয়াই মরিয়া যাইবে বলিয়া বুড়ী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নিরাপদ তাহাকে শান্ত করিয়া এই আশ্বাস দিল যে সে কখনও তাহাকে ফেলিয়া যাইবে না। যদি দরকার হয়, না-হয় সঙ্গে করিয়া তাহার দেশেই তাহাকে লইয়া যাইবে। সেখানে তাহার কোন কষ্ট হইবে না। মণিয়ার মা শান্ত হইল বটে, কিন্তু তার পরেই প্রশ্ন করিল—কিন্তু বাবু আমি ত একা নই—মালতী দিদির তা হ'লে কি হবে? সেও যে আমার ঘরে ব'সে কাঁদছে!

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করিল—মালতী কাঁদছে? কেন বল ত?

—পরেশবাবু যে বর্ম্মা চলে যাবে?

—পরেশ বর্ম্মা যাবে ত মালতীর কি?

—কেন? সে যে তাহাকে ভালবাসে!

—ভালবাসে? নিরাপদ একেবারে অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল।

—হাঁ বাবু—ভাল না বাসলে কি অমনি ক'রে কেউ কাঁদতে পারে?

ইহা নিরাপদর নিকটে এক অভিনব ব্যাপার। ভালবাসা—ভালবাসিয়া তাহার জন্য কাঁদা—ইহা সে কোন দিন ভাবিয়া দেখে নাই—তাহার জীবন আগাগোড়া অন্য ছাঁচে গড়া।

তাহার মনে পড়িল সে নিজেও মালতীর উপরে পরেশের টান দেখিয়া কখনও ঠাট্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে ত ছিল শুধু ঠাট্টাই মাত্র—ইহার বেশী এক বিন্দুও নয়।

কিন্তু আজ মণিয়ার মার কথায় মনে মনে ইহাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি ব্যবহারগুলি ভাবিয়া দেখিল—ইহা মোটেই অসম্ভব নয়। ইহার কি মীমাংসা করিবে নিরাপদ ভাবিয়া পাইতেছিল না। মণিয়ার মা পুনরায় প্রশ্ন করিল—আচ্ছা বাবু মালতী দিদির সঙ্গে পরেশবাবুর বিয়ে হয় না? তা যদি হ'ত তা হ'লে মালতী দিদিও ত পরেশবাবুর সঙ্গে চলে যেতে পারত বর্ম্মা।

নিরাপদ ভাবিল—উত্তম প্রস্তাব! কিন্তু সে কি হইবে? মালতীর নিকটে তাহার বংশের পরিচয় যত দূর পাইয়াছে তাহাতে বোধ হয় অমিল হইবে না—তাহা হইলে আর অসম্ভব কি? মুহূর্ত্তমধ্যে নিরাপদর সকল সংশয় কাটিয়া গেল—সে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। তাহার এইটিই প্রধান গুণ যে, কি করিবে না-করিবে এই লইয়া ভাবিয়া সারা দিন কাটাইয়া দেয় না, মুহূর্ত্তমধ্যেই নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে পারে।

মণিয়ার মাকে বলিল—মালতীকে একবার ডাক ত মণিয়ার মা।

মণিয়ার মা মালতীকে ডাকিয়া লইয়া আসিল। নিরাপদর মন এই মুহূর্ত্তমধ্যেই আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। মালতীর দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল—মালতী দিদি এইবার তোমার বাড়ীর ঠিকানাটা কিন্তু দিতে হবে।

মালতী শুষ্ক মুখে প্রশ্ন করিল—কেন?

নিরাপদ তবু হাসিয়া হাসিয়াই বলিতে লাগিল—আমরা যে কেউ এখানে থাকব না, পরেশ যাবে বর্ম্মায়—অবনী ত অনাদিবাবুর বাসায়ই আছে—আমি যাব বাড়ীতে—তাই তোমার ত একটা ব্যবস্থা করতে হবে—তোমাকে তোমার বাবার কাছে রেখে আসব মনে করেছি।

—যাক আর অত দয়া করবেন না বড়দা—এই কলকাতা শহরের রাস্তায় ভিক্ষে করে খেলেও আমার দিন এক ভাবে কেটে যাবে।

—ইস্—নারী-স্বাধীনতার যুগ কি না—তোমরা দেখছি দস্তুরমত স্বাধীন হয়ে উঠেছ।

কিন্তু নিরাপদর এই রহস্যে মালতী কাঁদিয়া ফেলিল—আমার এই দুঃসময়ে আপনি এমনি ক'রে ঠাট্টা করবেন?

এমন সময় বাহিরে পরেশের কথার শব্দ পাওয়া গেল। নিরাপদ ডাকিল—পরেশ ঘরের ভিতর আয় ভাই—বড় ভয়ানক ব্যাপার!

পরেশ ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল—এক পাশে মণিয়ার মা আর মালতী দাঁড়াইয়া আছে। মালতীর চোখে জল, আর নিরাপদ বসিয়া হাসিতেছে। নিরাপদ পরেশকে দেখিয়া বলিল—ভাই পরেশ, ঐ দেখ সম্মুখে তোমার ভাবী-পত্নী শ্রীমতী মালতী দেবী ক্রন্দন করছেন, আর সম্মুখে এই দুরাত্মা নিরাপদ তাকে কাঁদিয়ে রগড় দেখছে—তুমি অবনীর মত আমার আস্তিন গুটিয়ে আমার কপালের উপরে দুই-একটা ঘুসি বসিয়ে বীরত্ব প্রকাশ কর দেখি ?

—তার মানে—কি সব পাগলের মত ব'লে যাচ্ছিস্ ?

—কিসের মানে ? ভাবী পত্নীর কথা ? সে সব ঠিক ক'রে ফেলেছি। তোমাকে বর্ম্মা যাওয়ার আগেই বিয়ে করতে হবে। তার পর মালতীর দিকে তাকাইয়া বলিল—তুমি দিদি আমার খান-দুই কাপড় আর একটা জামা পরিষ্কার করে দিও ত, সামনের বুধ-বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত যেতে হবে আমাকে তোমার বাবার খোঁজে—সেই বুড়ো না হ'লে আর সম্প্রদান করবে কে ?

পরেশ বিস্মিত হইয়া বলিল—আচ্ছা নিরাপদ, তুই কি থট-রিডিং জানিস নাকি। এ বিয়ে একান্ত সম্ভব কিনা তোকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করব ব'লে এসেছিলাম—যাক বাঁচালি আমাকে !

মালতী একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। হে ভগবান, নিরাপদর এ কথা যেন রহস্য না হয়—সত্য হউক—এই প্রার্থনাই তাহার মন করিতেছিল। সে এইবার কথা কহিল—কিন্তু বড়দা—বাবা কি আর আমার নাম শুনলে আসবেন।

—আসবেন ভাই—নিশ্চয় আসবেন। তোর বড়দা যে-কাজে হাত দেয়—সে কাজ কোন দিন অসম্পূর্ণ রাখে না ! কিন্তু দিদি কোথায় গেল তোমার কান্না, আর কোথায় গেল তোমার চোখের জল।

—যান আপনি দিন দিন বড় ফাজিল হচ্ছেন বড়দা—বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১৬

যেদিন পরেশ পুলিসের হাত হইতে ফিরিয়া আসিল, উহারই দুই দিন পরে রায় বাহাদুর অনাদিবাবুর বাড়ীতে এক অভাবনীয় ব্যাপার গেল ঘটিয়া। ভোরবেলা যোগীন সদরের দরজা খুলিয়া বাহিরে যাইতেছিল, সেখান হইতে একেবারে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল অনাদিবাবুর শয়ন-ঘরে। অনাদিবাবু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি রে যোগীন, ব্যাপার কি ?

যোগীন বলিল—বাবু পুলিসে বাড়ীর চারি দিক ঘিরে রেখেছে—আমি সদরের দরজা খুলে বাইরে যাচ্ছিলাম, আমাকে যেতে দিল না—সব এই ভিতরেই ঢুকছে !

অনাদিনাথ প্রথমটা কিছু বুঝিতেই পারিলেন না—শেষে ভয়ে হইয়া গেলেন একেবারে হতবুদ্ধি, কি করিবেন না-করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এমন সময় এক জন পুলিস অফিসার খানাতল্লাসীর পরোয়ানা লইয়া আসিল তাঁহার সম্মুখে এবং তাঁহাকে প্রশ্ন করিল—অবনী নামে কেহ এখানে থাকে কি না—কি জন্য থাকে, কোন্ ঘরে থাকে—পরেশকে তাঁহারা চেনেন কি না—এই সব। অনাদিনাথ যথাসাধ্য উত্তর দিলেন। তার পর সুরু হইল খানাতল্লাসী—প্রথমে অবনীর ঘরে—এবং তার পরে অনাদিনাথেরও দুই-একটি ঘরে জিনিসপত্র ঘরময় ছড়াছড়ি করিয়া পুলিস অনেক বেলায় বিদায় লইল। কিন্তু এই ব্যাপারে অনাদিনাথ একেবারে গেলেন মুষড়াইয়া। বাড়ীতে সকলেই একেবারে নীরব নিস্তব্ধ, কোথাও একটা সাড়াশব্দ নাই, থম্‌থমে ভাব। বাড়ী হইতে সদ্য সদ্য কোন আত্মীয়-স্বজন বিয়োগ হইলে বাড়ীর যেমন অবস্থা হয়, এমনি হইয়াছে অবস্থা।

অবনীর হইল সব চেয়ে দুঃখ এই যে তাহার জন্য নিরীহ অনাদিবাবু শেষে এমন বিব্রত হইয়া পড়িলেন—এখন সে তাঁহাকে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া। আর একটা আশঙ্কা সারাক্ষণ তাহার মনে উঁকি মারিতেছিল—লতিকাকে পাওয়ার যে ক্ষীণ আশাটি ছিল সেটিও বুঝি এবার নির্ম্মূল হইয়া যায় !

অনাদিবাবু একে রায় বাহাদুর তাহাতে অত্যন্ত ভীতু স্বভাবের লোক। তিনি যে পুলিসের সন্দেহজনক কোন ব্যক্তিকে তাঁহার কন্যা সম্প্রদান করিবেন ইহা অসম্ভব।

পরের দিন সকালবেলা অবনী বাহিরে যাইতেছিল—ইচ্ছা নিরাপদ ও পরেশের সহিত এক বার দেখা করিয়া গত কল্যের ঘটনার কথা সব বলিয়া আসে। এমন সময় যোগীন আসিয়া ঘরে ঢুকিল। অবনী মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি চাই যোগীন।

—বাবু আপনাকে এক বার ডাকছেন তাঁর বসবার ঘরে।

—আচ্ছা যাচ্ছি, তুমি যাও।

অবনী ঘরে ঢুকিয়া দেখে—অনাদিবাবু বিমর্ষমুখে আরামকেদারায় বসিয়া আছেন, পাশে বসিয়া অজিত

অনর্গল কি সব বলিয়া যাইতেছে। অবনীকে দেখিয়াই অজিত বলিল—এই যে আসুন অবনীবাবু, আপনার কথাই হচ্ছিল।

অবনী বরাবর অনাদিবাবুর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—জ্যাঠামশায় কি আমাকে ডেকেছেন ?

কিন্তু অনাদিবাবু কথার জবাব না দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। জবাব দিল অজিত—হ্যাঁ, ডেকেছেন উনিই—অবশ্য আমারই উপদেশে, এবং আপনাকে যা বলতে হবে তাও আমার মুখ দিয়েই বলতে হবে—উনি নিজে ত আর বলতে পারেন না—আপনাকে স্নেহ করেন কি না। কথাটা অপ্রিয় হবে অবনীবাবু, কিন্তু আপনিই ভেবে দেখুন ওঁদেরও ত ভবিষ্যতে একটা মঙ্গলামঙ্গলের ভাবনা আছে।

অবনী ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, বলিল—কিন্তু এত ভূমিকার ত দরকার নাই অজিতবাবু—কথাটা কি তাই আগে বলুন না।

—হ্যাঁ, সেই কথাই ত বলতে যাচ্ছি। দেখুন আর আপনার এ বাড়ীতে থাকাটা খুব ভাল মনে হয় না—অন্ততঃ আমি আপনাকে রাখতে এঁদের পরামর্শ দিতে পারি নে।

অবনী বাধা দিয়া বলিল—আপনি কি পারেন না-পারেন সেকথা আমার শুনবার কোন আগ্রহই নাই। পরে অনাদিবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল—আপনারও বোধ হয় এই ইচ্ছাই জ্যাঠামশায়! কিন্তু তবু অনাদিবাবু মুখ ফিরাইয়াই রহিলেন—একটা কথাও কহিলেন না।

অবনী বলিল—বেশ আমি এজন্য একটুও অসন্তুষ্ট হ'ব না জ্যাঠামশায়—কাল থেকে আমিও এই কথাই ভাবছি।

অজিত বলিল—তা'হলে কি এই বেলাই আপনি এখান থেকে যাওয়া স্থির করলেন না কি !

এবার অনাদিবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—না-না এবেলা যাবে কি ? আহারাদির পর বিকাল বেলায়—

অবনী বলিয়া উঠিল—না জ্যাঠামশায়—আমার এই বেলাই যেতে হবে—সেজন্য আমি প্রস্তুতও হয়েছি।

অজিত বলিল—তা যদি ওঁর বিশেষ কোন কাজই থাকে তবে অযথা একটা বেলার জন্য আটকে রেখে—

অবনী বলিল—বিশেষ কাজই আছে অজিতবাবু—আমি এখনই যেতে চাই। বলিয়া অবনী বাহির হইয়া যাইতেছিল।

অনাদিবাবু বলিলেন—শোন শোন অবনী, আর একটা কথা আছে। বলিয়া জামার পকেট হইতে খানতিনেক দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন—এ টাকা কয়টা রাখ অবনী—আর মাসে মাসে যত দিন না অন্য টিউশানি পাও তোমার যা মাইনে ছিল তাই আমি তোমাকে দেব—এসে নিয়ে যেও।

অবনীর দুই চোখ ছল্ ছল্ করিতেছিল,—আপনার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে জ্যাঠামশায়, কিন্তু টাকা আমি কিছুতেই নিতে পারবো না। অযথা অনুগ্রহ গ্রহণ করার মত পাপ খুব কমই আছে আমি মনে করি। আচ্ছা, আসি তবে—বলিয়া বরাবর দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

নোট কয়খানা বাতাসে টেবিলের উপরে ফর্ ফর্ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। অজিত সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া অনাদিবাবুর হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল—পাঁচ টাকার একটা টিউশনির জন্য এখন বেড়াবেন ত পথে পথে—এতগুলো টাকা গ্রাহ্য হ'ল না।

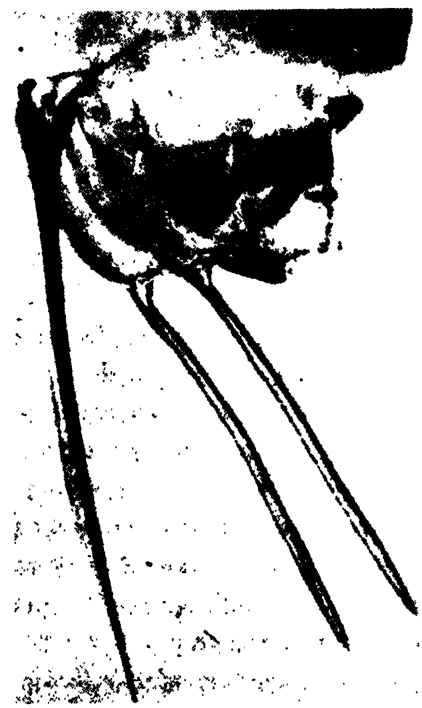
অবনী একেবারে নিজের ঘরে গিয়া দাঁড়াইল। এই ঘরখানি তাহার এই কয় মাসের আশ্রয়স্থল। এখনি চলিয়া যাইবে, জীবনে আর কখনও যে ফিরিতে পারিবে সে ভরসাও রহিল না। তবু ইহারই সুখ-স্মৃতি চিরজীবন তাহার প্রাণে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের মত জ্বলিতে থাকিবে। এই বাড়ী এই ঘর এইখানে ক্রমে ক্রমে সে ভালবাসিয়াছে লতিকাকে—জীবনের একটা নূতন দিকের রহস্য হইয়াছে এইখানেই উদ্‌ঘাটিত। সমস্ত চিত্ত ব্যথায় ভরিয়া উঠিল—কয়েক বিন্দু অশ্রু পড়িল গড়াইয়া। এখনি তো চলিয়া যাইবে, কিন্তু যাইবার আগে একবার কি লতিকাকে দেখিয়া যাইবে না? একবার ভাবিল নীরেনকে দিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠায়, কিন্তু আবার ভাবিল—যাইতে যখন হইবেই তখন আর অনর্থক এ বাসনায় লাভ কি! তাহার নিজের বলিতে একটি টিনের সুটকেস, তাহাতেই খান দুই ধুতি ও জামা ভর্ত্তি করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ঘরের আলনা টেবিল চেয়ার—প্রসাধনের দ্রব্যাদি যাহা সে ব্যবহার করিতে পাইয়াছিল—সকলই রহিল পড়িয়া।

ক্রমশঃ

নেউলে-পোকার জন্ম-রহস্য

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গবেষণাগার-সংলগ্ন উদ্যানে বসিয়া এক দিন লজ্জাবতী-লতার সংকোচন-সম্পর্কিত একটা বিশেষ ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম। বেলা তখন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। উদ্যানের পাশেই ছোট ছোট আয়াপানের গাছ সারবন্দি-ভাবে লাগান হইয়াছে। হঠাৎ নজরে পড়িল—প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা ধূসরবর্ণের একটা শুঁয়াপোকা আমার পাশ দিয়াই অতি দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। অস্বাভাবিক গতিভঙ্গীর জন্য পোকাটার উপর নজর না দিয়া উপায় ছিল না। মনে হইল যেন প্রখর উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া সে আয়াপানের গাছগুলির দিকেই ধাবিত হইতেছে। যাহা হউক, পোকাটা আমাকে অতিক্রম করিয়া সমান বেগেই আরও প্রায় আট দশ হাত অগ্রসর হইয়া একটা আয়াপানের পাতার উপর উঠিল এবং দম লইবার জন্যই যেন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর আবার এপাতা ওপাতার উপর অস্থিরভাবে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিল। ছুটাছুটি করিলেও তাহার গতিবেগ যে ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে—ইহা পরিষ্কাররূপেই প্রতীয়মান হইতেছিল। প্রায় দশ বারো মিনিট এরূপ ভাবে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিবার পর একটা পাতার উপর সে নির্জ্জীবের মত চুপ করিয়া রহিল। চলিবার সময় শুঁয়াপোকার শরীর অনেকটা প্রসারিত হইয়া থাকে; কিন্তু নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিবার কালে যথেষ্ট সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এক্ষেত্রেও দেখা গেল—শুঁয়াপোকটার শরীর, ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হইতেছে। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল এভাবে কাটিবার পর কাঠি দিয়া নাড়িয়া দেখিলাম—পোকাটার জীবন-স্পন্দন রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার আর নড়াচড়া করিবার ক্ষমতা নাই। কিছু কাল পূর্ব্বে গতিবেগে জীবন-শক্তির যে প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ এমন কি ঘটিল যাহাতে সে একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়িল? পুত্তলীতে রূপান্তরিত হইবার কিছুকাল পূর্ব্বে এই জাতীয় শুঁয়াপোকা কিছুকাল নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করে বটে; কিন্তু গুটী বাঁধিবার জন্য আবার সক্রিয় হইয়া উঠে। তখন মুখ দিয়া গায়ের শুঁয়াগুলিকে ছিঁড়িয়া লয় এবং মুখ-নিঃসৃত আঠালো সূত্রের সাহায্যে শরীরের চতুর্দ্দিকে ডিম্বাকৃতি আবরণী গড়িয়া তুলে। ইহাই শুঁয়াপোকার গুটী। যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হইলেও এক্ষেত্রে কিন্তু সেরূপ গুটী নির্ম্মাণের কোনই লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। তবে কি ইহা খোলস পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বাভাস? খোলস পরিবর্ত্তনের প্রক্রিয়াটা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কৌতূহল তীব্র হইয়া উঠিল। আরও কিছুকাল অপেক্ষা



নেউলে-পোকার শরীরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত ডিম পাড়িবার যন্ত্রকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে

করিবার পর দেখিতে পাইলাম—শুঁয়াপোকার শরীরের চামড়া ভেদ করিয়া তিন কি চার মিলিমিটার লম্বা সূতার মত সূক্ষ্ম একটি কীড়া, শুঁয়াগুলির উপর উঠিয়া আসিয়া ঠিক জোঁকের মত এদিক ওদিক শুঁড় আন্দোলন করিতে লাগিল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও তিন-চারটা কীড়াকে একই ভাবে কিলবিল করিয়া শুঁয়াগুলির উপরে উঠিয়া আসিতে দেখিলাম। আট দশ মিনিটের মধ্যেই আরও প্রায় বিশ-পঁচিশটা পোকা শরীরের নানাস্থান হইতে



এক জাতীয় করাতে-পোকার আক্রমণে গোলাপ গাছের আক্রান্ত স্থানে অদ্ভুত উপাঙ্গ বাহির হইয়াছে

বাহির হইয়া আসিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একটি কীড়াও শুঁয়াপোকাটার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই এবং প্রত্যেকটিই শুঁয়াগুলির উপরিভাগে অবস্থান করিয়া শরীরের সূক্ষ্মাগ্রভাগ ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত করিয়া কেবলই চতুর্দ্দিকে সঞ্চালন করিতেছিল। মাছ, মাংস বা ময়লা পচিলে যেরূপ পোকা উৎপন্ন হয়, এই কীড়াগুলিও দেখিতে তদ্রূপ; কিন্তু আকারে অনেক ছোট। শুঁয়াপোকার শরীর ভেদ করিয়া বাহির হইবার পর কীড়াগুলি শুঁয়া আকড়াইয়া অনবরত মস্তক আন্দোলন করিতেছে কেন—তাহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া ব্যাপারটা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সাত-আট মিনিটের মধ্যেই দেখিতে পাইলাম প্রত্যেকটি কীড়ার শরীরের চতুর্দ্দিকে যবের দানার মত ছোট ছোট ডিম্বাকৃতি আবরণী গড়িয়া উঠিতেছে। তখন বুঝিতে বাকী রহিল না যে, পোকাগুলি কোন এক প্রকার পতঙ্গের বাচ্চা; পুত্তলীতে রূপান্তরিত হইবার পূর্ব্বে নিরাপদে অবস্থান করিবার জন্য গুটী বাঁধিতেছে। প্রায় মিনিট দশেকের মধ্যেই ছোট ছোট শ্বেতবর্ণের গুটীতে শুঁয়াপোকার দেহটা প্রায় ঢাকিয়া গেল। শুঁয়াপোকাটাকে নাড়াচাড়া দিয়া দেখিলাম জীবনের কোন চিহ্নই নাই। গুটী হইতে কিরূপ পতঙ্গ বহির্গত হয় দেখিবার জন্য গুটীসমেত শুঁয়া পোকাটাকে একটা কাচের বাক্সে আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। দিন দশেক পর দুপুরবেলায় এক দিন দেখিতে পাইলাম—গুটীর এক পাশে সূক্ষ্ম ছিদ্র কাটিয়া ক্ষুদে-পিঁপড়ের মত কালো রঙের এক প্রকার ডানাওয়ালা পতঙ্গ বাহির হইয়া আসিতেছে; সবগুলি গুটী হইতে পতঙ্গ বাহির হইতে প্রায় দুই দিন অতিবাহিত হইল। এই ক্ষুদ্রকায় ডানাওয়ালা পতঙ্গগুলি এক জাতীয় নেউলে-পোকা। এই ঘটনার পর অনেক দিনের চেষ্টায় এই জাতীয় নেউলে-পোকাকে শুঁয়াপোকার গায়ে হুল ফুটাইয়া ডিম পাড়িতে দেখিয়াছিলাম। শুঁয়াপোকা যখন আহারের ব্যস্ত থাকে তখন নেউলে-পোকা অকস্মাৎ উড়িয়া আসিয়া তাহার গায়ের উপর বসে এবং দেহের পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত হুলের মত ডিম পাড়িবার যন্ত্রটি তাহার দেহে প্রবেশ করাইয়া ডিম পাড়িয়া যায়। দেহে ডিম প্রবিষ্ট হইবার পর দিন কয়েক পর্য্যন্ত শুঁয়াপোকাটা কতকটা স্বাভাবিক ভাবেই চলাফেরা করিয়া থাকে; আসন্ন মৃত্যুর কথা সে মোটেই বুঝিতে পারে না। পাঁচ-সাত দিন পর যখন পোকাগুলি শরীরের সারাংশ চুষিয়া খাইয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করে তখন শুঁয়াপোকা যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করে। ইহার পরই সব শেষ।

কলিকাতার কোন একটি বাড়ীর প্রাঙ্গণে মাঝারি-গোছের একটা শিউলি গাছের পাতার গায়ে দেড় ইঞ্চি লম্বা ধূসরবর্ণের একটা কাঁকড়া-মাকড়সা থলির মত বাসা নির্ম্মাণ করিয়া ডিম পাড়িয়াছিল। কয়েক দিন ধরিয়াই তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম। অধিকাংশ



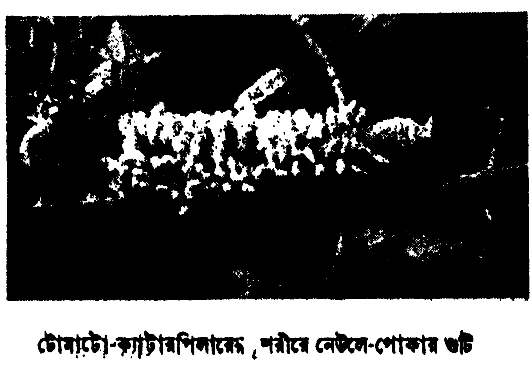
লম্বা লেজওয়ালা নেউলে-পোকা



করাতে-পোকার ডিম পাড়িবার যন্ত্রটিকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে

কালই মাকড়সাটা ডিম আগলাইয়া বসিয়া থাকিত; বাসা ছাড়িয়া বেশী দূরে যাইত না। বেলা প্রায় চারটার সময় এক দিন দেখিতে পাইলাম, মাকড়সাটা বাসার বাহিরে পাতার এক প্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। কতক্ষণ যাবৎ এভাবে বসিয়াছিল বলিতে পারি না। কিছুক্ষণ পর ঘুরিয়া আসিয়া মাকড়সাটাকে সেই স্থানে একই ভাবে অবস্থান করিতে দেখিলাম। কিন্তু এবার একটা অদ্ভুত দৃশ্য নজরে পড়িল। অনেকটা কুমোরে-পোকার মত দেখিতে, প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা একটা সরু লিক্‌লিকে পোকা মাকড়সাটার মাথার উপর এদিক ওদিক কয়েক বার উড়িয়া কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হইয়া গেল। মাকড়সাটা বোধ হয় কোন বিপদের আভাস পাইয়াছিল। কারণ শেষ মুহূর্ত্তে পোকাটা যখন তাহার কাছ ঘেঁষিয়া চলিয়া যায় তখনই সে তড়িদ্বেগে ছুটিয়া গিয়া তাহার বাসার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাঁচ-সাত মিনিট নিঃশব্দে কাটিবার পর পোকাটা হঠাৎ আবার কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া মাকড়সার বাসাটার ঠিক উপরেই অবতরণ করিল। শরীরের পশ্চাদ্দেশ অদ্ভুত ভঙ্গীতে সঞ্চালন করিতে করিতে পোকাটা বাসার চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখিবার পর বাসার এক মুখ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। বলা বাহুল্য, যে সকল মাকড়সা শিকার ধরিবার জন্য জাল পাতে না তাহাদের বাসায় প্রবেশ অথবা বহির্গমনের জন্য দুইটি করিয়া পথ থাকে। পোকাটা বাসার ভিতরে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিতে-না-করিতেই মাকড়সাটা অন্য মুখ দিয়া যেন ছিট্‌কাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল এবং আত্মগোপন করিবার জন্য পাতার তলার দিকে গিয়া আশ্রয় লইল। পোকাটাও তাহার পিছনে পিছনে বাহিরে আসিয়া থামিয়া থামিয়া কতকটা যেন নৃত্যের ভঙ্গীতে তাহাকে খুঁজিতে লাগিল। পোকাটা পাতার নীচের দিকে যাইবামাত্রই মাকড়সাটা যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত ছিট্‌কাইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গেই পোকাটা আসিয়া তাহার পিঠের উপর চাপিয়া বসিল এবং দেহের পশ্চাদ্ভাগ ধনুকের মত বাঁকাইয়া ক্ষুদ্র একটি ডিম পাড়িয়া উড়িয়া গেল। চক্ষের নিমেষেই এতগুলি কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

পোকাটা উড়িয়া যাইবার পর মাকড়সাটা যেন কতকটা অভিভূতের মত ধীরে ধীরে তাহার বাসায় প্রবেশ করিল। পরের দিন সকালে গিয়া মাকড়সাটাকে দেখিতে পাইলাম না। বাসার ভিতরেই রহিয়াছে স্থির করিয়া পাতাটাকে একটু নাড়া দিতেই মাকড়সাটা বাহিরে আসিয়া পাতার মধ্যস্থলে এক স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেখিলাম, পিঠের উপরের গতকল্যকার ক্ষুদ্র সাদা পদার্থটি এখন একটি সরিষার দানার মত বড় হইয়াছে। ব্যাপারটা পরিষ্কার অনুধাবন করিতে না পারিয়া অতি সন্তর্পণে পাতা-সমেত মাকড়সাটিকে কাচের টিউবে বন্দী করিয়া পরীক্ষাগারে লইয়া আসিলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদেই মনে হইল যেন সরিষাকার পদার্থটি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বড় হইয়া উঠিয়াছে। মাইক্রোস্কোপের পরীক্ষায় পরিষ্কার দেখা গেল—গোলাকার পদার্থটা আসলে গোলাকার নয়; লম্বাকৃতি একটা কীড়া বা লার্ভা মাত্র। শরীরটাকে বাঁকাইয়া দুই প্রান্ত এক স্থানে রাখিয়াছে বলিয়া গোলাকার বোধ হইতেছিল। কীড়াটা মাকড়সার পিঠের চামড়া কামড়াইয়া ধরিয়া তাহার রস রক্ত চুষিয়া খাইতেছে।



টোম্যাটো-ক্যাটারপিলারের শরীরে নেউলে-পোকার গুটি



এক জাতীয় নেউলে-পোকা শুঁয়াপোকার শরীরে ডিম পাড়িয়াছিল। নেউলে-পোকার গুটিগুলি শুঁয়াপোকার পাশে পড়িয়া রহিয়াছে

বেলা আড়াইটার সময় কীড়াটা বেশ মোটা একটা মুড়ির আকার ধারণ করিল। অদ্ভুত ইহাদের বৃদ্ধি পাইবার ক্ষমতা! মাকড়সাটার স্ফীত উদরদেশ অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার শরীরে জড়তার লক্ষণ সুস্পষ্ট। আরও ঘণ্টাখানেক বাদে তাহার হৃৎস্পন্দন একরূপ থামিয়া আসিয়াছে বলিয়াই মনে হইল। এখন খোলা চোখেই দেখিতে পাইলাম, কীড়াটা মাকড়সার উদরদেশ কুরিয়া কুরিয়া খাইতে সুরু করিয়াছে। আরও প্রায় আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই উদর হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশ নিঃশেষে উদরসাৎ করিয়া ফেলিল। ঠ্যাংগুলি শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম সেগুলি হয়ত তাহার প্রয়োজনে আসিবে না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, দেখিবার মত কোন ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব না থাকিলেও বোধ হয় গন্ধ বা স্পর্শের সাহায্যেই ঠাহর করিয়া একাদিক্রমে সব কয়টি ঠ্যাংই নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিল। প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কীড়াটা তাহার শৈশব অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পুত্তলিরূপ ধারণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। খাওয়া শেষ হইবার পর কীড়াটা প্রায় আধঘণ্টাকাল চুপ করিয়া রহিল। তার পরেই সুচালো মুখটি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সুতা বুনিতে লাগিল। পনর-বিশ মিনিটের মধ্যেই সুতা বুনিয়া শরীরের চতুর্দ্দিকে পাতলা একটা ডিম্বাকৃতি আবরণী গড়িয়া তুলিল। সূক্ষ্ম সুতার আস্তরণের ভিতর দিয়া তখনও পোকাটার কার্য্য-প্রণালী পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ডিম্বাকৃতি গুটীর অভ্যন্তরে সে একবার এদিকে মুখ করিয়া আবার বিপরীত দিকে ঘুরিয়া সুতার বেষ্টনী দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহার গুটী বাঁধা শেষ হইয়া গেল। গুটীর রং হইল এখন গাঢ় বাদামী। গুটীর এক প্রান্ত কালো রঙের একটা টুপীর মত পদার্থে আবৃত। আলোর দিকে ধরিয়া দেখিতে পাইলাম, খোলের ভিতর পোকাটা লম্বাটে হইয়া নিশ্চেষ্ট অবস্থায় রহিয়াছে। ছয় দিনের মধ্যেই সে পুত্তলীর আকার ধারণ করিল এবং দিন পনর পরে গুটীর কালো মুখটা কাটিয়া ডানাসমেত একটি পূর্ণাঙ্গ নেউলে-পোকা গুটী হইতে বাহির হইয়া আসিল।

জীবন্ত কীট-পতঙ্গের দেহে ডিম পাড়িয়া ভবিষ্যৎ বাচ্চাদের খাদ্য সংগ্রহের সুব্যবস্থা করিয়া রাখে এরূপ অসংখ্য বিভিন্ন জাতীয় পোকা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও এ জাতীয় বহুসংখ্যক রকমারি পোকা অহরহই নজরে পড়ে। ইহারা সাধারণতঃ নেউলে-পোকা নামে পরিচিত। বিভিন্ন জাতীয় নেউলে-পোকার দৈহিক গঠন যেমন বিভিন্ন, দেহবর্ণও সেরূপ বিচিত্র। এক বা দুই মিলিমিটার হইতে আরম্ভ করিয়া দেড় ইঞ্চি, দুই ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা নেউলে-পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। 'এফিডিয়াস্' নামক এক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় নেউলে-পোকা দেখা যায় যাহারা অনায়াসে ছোট্ট একটি সূচের ছিদ্রের মধ্য দিয়া গলিয়া যাইতে পারে। এই ক্ষুদ্রকায় নেউলে পোকারা শস্যাদির অনিষ্টকারী এক জাতীয় সবুজ পোকার শরীরে ডিম পাড়িয়া থাকে। এই সবুজ পোকাগুলি চাবাগাছের কচি পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। 'এফিডিয়াস' পোকারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহাদের শরীরে একটি করিয়া ডিম প্রবেশ করাইয়া দিয়া যায়, যেস্থানে সবুজ পোকা থাকার সম্ভাবনা সে-সব স্থানে একত্রিতভাবে দুইটি শুঁড় উঁচু করিয়া 'এফিডিয়াস' পোকাগুলিকে বেপরোয়াভাবে ঘোরাফেরা করিতে দেখা যায়। বেপরোয়া



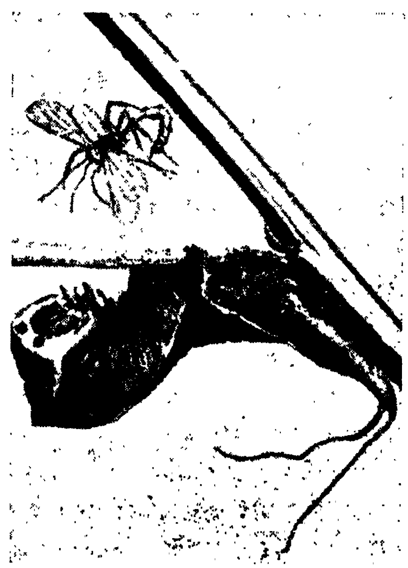
এফিডিয়া নামক নেউলে-পোকা সবুজ পোকার শরীরে ডিম পাড়িতেছে



এই নেউলে-পোকা পুস-মথ ক্যাটারপিলারের শরীরে ডিম পাড়িয়া থাকে

বলিলাম এই জন্য যে, যখন ইহারা সবুজ পোকার অনুসন্ধানে ঘোরাঘুরি করে তখন 'ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসে'র সাহায্যে ইহাদের অতি নিকটে বসিয়া কার্য্য-প্রণালী পরিদর্শন করিলেও ইহারা কিছুমাত্র ভীত হয় না। পোকার দেখা পাইলেই উভয় শুঁড়ের বাঁকানো অগ্রভাগের সাহায্যে স্পর্শ করিয়া তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেই উল্লাসে যেন অধীর হইয়া উঠে। তখন শুঁড় দুইটিকে অনবরত নাচাইতে থাকে। সেই সময় পোকাটার অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া তাহার উল্লাস এবং উত্তেজনার ভাব পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। সবুজ পোকাটাকে তখন শুঁড় দিয়া বার বার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে থাকে এবং কিছুক্ষণের জন্য থামিয়া তাহার পিছন দিকে উপস্থিত হয়। তার পর পশ্চাতের পায়ের সাহায্যে সবুজ পোকার পিঠ আঁকড়াইয়া ধরে এবং শরীরটাকে সম্মুখের দিকে কিঞ্চিৎ উঁচু করিয়া দ্রুতগতিতে ডানা কাঁপাইতে আরম্ভ করে। দুই-এক সেকেণ্ডের মধ্যেই শরীরের পশ্চাদ্দেশ ধনুকের আকারে বক্র করিয়া পোকাটার পেটের দিকে হুল ফুটাইয়া দেয়। দুই-তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই ডিম-পাড়া শেষ হয় এবং উড়িয়া গিয়া অন্য একটা পোকাকে ধরে। এইরূপে ক্রমাগত কয়েকটা পোকার শরীরে এক-একটি করিয়া ডিম প্রবেশ করাইয়া দেয়। সবুজ পোকারা সাধারণতঃ এক সঙ্গে অনেকগুলি একত্রে অবস্থান করে। কাজেই একটা নেউলে-পোকার পক্ষে তিন-চার মিনিট সময়ের মধ্যে দশ-বারটা পোকার শরীরে ডিম পাড়িতে কোনই অসুবিধা হয় না। ডিম শরীরে প্রবেশ করিবার পর হইতেই সবুজ পোকা ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িতে থাকে। দুই-এক দিনের মধ্যেই তাহার শরীরের রং বদলাইয়া বাদামী বা ঈষৎ হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং শরীরটা ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে দেহাভ্যন্তরে ডিম হইতে কীড়া বাহির হইয়া তাহার রস রক্ত চুষিয়া খাইতে থাকে। দশ-বারো দিন পরে ডানাওয়ালা পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ শুষ্ক মৃতদেহের শক্ত বহিরাবরণীর মধ্যস্থল ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া আসে। বিভিন্ন জাতীয় নেউলে-পোকার সাহায্যে প্রতিদিন এ ভাবে বিভিন্ন জাতীয় বহুসংখ্যক অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক বিধানে এরূপ সমতা রক্ষিত না হইলে কিরূপ গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইত তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের দেশে যে সকল নেউলে-পোকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের জাতিগত বিভিন্নতা হিসাবে দৈহিক গঠন ও বর্ণ-বৈচিত্র্যের পার্থক্য থাকিলেও প্রায় প্রত্যেকেরই শরীরের পশ্চাদ্ভাগে শরীরের তুলনায় অসম্ভব লম্বা তিনটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলিকে সাধারণ তন্তুর মতই মনে হয় বটে; কিন্তু মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় দুইটি সূত্রের গায়ে করাতের মত সূক্ষ্ম



আত্মরক্ষার জন্য শুঁয়াপোকা আক্রমণকারী নেউলে-পোকাকে ভয় দেখাইতেছে

সূক্ষ্ম অসংখ্য দাঁত রহিয়াছে। এই সূক্ষ্ম করাতের সাহায্যেই তাহারা নিরীহ পোকার শরীরে ছিদ্র করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মাগ্র ডিম্ব-নলটি প্রবেশ করাইয়া ডিম পাড়িয়া দেয়। আক্রান্ত পোকাগুলির শরীরে এই তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রটি প্রবেশ করাইতে তাহাকে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় না এবং মুহূর্ত্তের মধ্যেই কার্য্য সমাধা করিয়া সরিয়া পড়ে। ইহাদের নজরে পড়িলে শুঁয়া-পোকা বা অন্যান্য পতঙ্গের কীড়াদের আর রক্ষা নাই। বিশেষ ভাবে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতি ও পতঙ্গের বাচ্চারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত দেহের রং বা আকৃতির সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অনুকরণ করিবার ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। আমাদের দেশীয় লেবু-প্রজাপতি, কপি-মথ, দুধলতা প্রজাপতির বাচ্চারা এ বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় অনেক ক্ষেত্রে নেউলে-পোকার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। কোন কোন শুঁয়া-পোকা আবার অনুকরণশক্তির আশ্রয় না লইয়া ভয় দেখাইয়া বা শরীর হইতে বিষাক্ত পদার্থ নির্গত করিয়া নেউলে-পোকার হাত হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক শ্রেণীর নেউলে-পোকা দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা কেবল ফল, মূল, লতাপাতার গায়ে হুল ফুটাইয়া ডিম পাড়িয়া থাকে। ইহারাও দেখিতে প্রায় উপরোক্ত নেউলে-পোকারই অনুরূপ; কিন্তু কেবল উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া ইহাদিগকে করাতে-পোকা বলা হয়। বিভিন্ন জাতীয় ফলের বহিরাবরণে কোন ক্ষতচিহ্ন না থাকা সত্ত্বেও ভিতরে বহু পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা করাতে-পোকার ডিম হইতে উদ্ভূত পোকা। তা ছাড়া লতাপাতার কচি ডগায় গ্রন্থির মত স্ফীতি, কাহারও পাতার গায়ে ফোস্কা অথবা গুটীর মত অদ্ভুত পদার্থ জন্মাইতে দেখা যায়। ইহাও করাতে-পোকার কাণ্ড। লতাপাতার মধ্যে ডিম পাড়িবার সময় ইহাদের ডিম্বনল হইতে এমন কোন পদার্থ নির্গত হয় যাহার প্রভাবে পাতার গায়ে গুটী, স্ফীতি অথবা কয়েক রকম উপাঙ্গ আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে।

মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

১

সালটা ঠিক মনে নাই। পূজার ছুটিতে আমি শান্তি-নিকেতন হইতে বাড়ী গিয়াছিলাম। পূজ্যপাদ মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বরচিত স্বপ্নপ্রয়াণের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হওয়া মাত্র তাহার এক খণ্ড আমাকে পাঠাইয়া দেন। আমি তাহা পাইয়া তাঁহাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাহারই প্রত্যুত্তরে তিনি আমাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন—

পরমপ্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়

করকমলেষু

হরিশ্চন্দ্রপুর

মালদহ

ওঁ

দেই

কহিল বিমলেশ্বর মুণ্ডমালা-দুঃখে।
"বিহরে যে-ব্রজবন মধুরের গুচ্ছে —
হাড়ে মাসে জড়িত কুমার সে আমার।
শুধুই কেবল মাস নব এ কুমার!!!"

আমার পূজ্য শাস্ত্রী মহাশয়

আপনি নিষ্কলঙ্ক বিধু — আমি সকলঙ্ক দ্বিজ — এই কারণে আমি আপনার বিজয়ার প্রণাম প্রণত মস্তকে গ্রহণ করিয়া আশীর্বাদ করিতেছি যে আপনি এবং আপনার জ্যোৎস্না-লক্ষ্মী নির্বিঘ্নে রাহুমুক্ত হইয়া আনন্দ-শারদ-পূর্ণিমার মধ্যস্থলে নিত্য বিরাজ করুন; — আর এই শুভযোগে — সুধার মিলনে ষোলকলায় পাইতেছি হৃদয় ভরিয়া রাশিরাশি — তাহাও সং-[illegible]-কোলে স্মরণদান করুন।

বিধোঃ বন্দনাদেঃ দ্বিজ-পুরাচিত প্রতি (অর্থাৎ দ্বিতীয় সংস্করণে নবীভূত পুনঃপ্রকাশিত প্রতি) আপনার যে প্রসন্ন দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে ইহাতেই তাহার জন্ম সার্থক হইয়াছে। কালিদাস এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন — যে,

"আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানং" আমিও তাহাই বলি; — ~~তাহা~~ কিন্তু তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া তাহার সঙ্গে [illegible] ত্রিবেণী জুড়িয়া দিতে চাই — এই যে

"বিদুষাং বিধুমৌলীতু বন্দনানাং যথা বিধুঃ ॥"

আপনার শুভ্র গুণরশ্মির সূক্ষ্ম অথচ দুর্ভেদ্য মৃণাল জালে বাঁধা

ভুবনডাঙার কলুষিত জলাশয়ের

দ্বিজরাজ পরমহংস (অর্থাৎ Swan)

☞ [এ দ্বিজ কেচর বই খেচর নহে]

২

তাঁহার রেখাক্ষরের শেষ সংস্করণ বাহির হইলে তিনি আমাকে যে বইখানি দিয়াছিলেন তাহাতে আমার নামের পূর্বে এই বিশেষণটি লিখিয়াছিলেন—"নিখিল শাস্ত্রপারাবারের অগস্ত্যমুনি।"

৩

১৩২৪ সালের চৈত্র মাসে তাঁহার গুরুতর ব্যারাম হইয়াছিল। তাঁহাকে তখন শান্তিনিকেতনের অতিথি-শালায় রাখা হয়। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সকলেরই মনে আশঙ্কা হইয়াছিল। ৯ই চৈত্র, রাত তখন অনেক। তাঁহার কাছে অনিলকুমার মিত্র, কালীমোহন ঘোষ ও আমি ছিলাম। তিনি আমাদিগকে হঠাৎ কিছু লিখিয়া লইতে বলিয়া নিম্নলিখিত কয়টি কথা বলিয়াছিলেন এবং কালীমোহনবাবু লিখিয়া লইয়াছিলেন, কাগজখানি আমার কাছে আছে—

"সাঙ্খ্যমতে প্রকৃতি without পুরুষ blind, এবং পুরুষ without প্রকৃতি অকর্মণ্য। Kant-এর মতে intuition without thought is blind. Thought without intuition is empty."

একটি রাত্রি

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত, এম-এ

রাত্রি এগারটা। প্যারির রঙ্গালয়গুলি সবেমাত্র দ্বার বন্ধ করেছে। আধ ঘণ্টা আগে কাফে ও রেস্তোরাঁ-গুলিও বন্ধ হয়েছে। পথের এক পাশে আমরা ক'জন দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে দাঁড়িয়ে—রঙ্গালয় থেকে বেরিয়ে জনতার স্রোত ক্রমশঃ অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে। রাস্তার ঠুলি-ঢাকা ল্যাম্পের আবছা আলো অন্ধকারের সঙ্গে যুঝতে পারছে না, বারংবার পরাজিত হয়ে ফিরে আসছে। গৃহগামী পথিকের দল মাঝে মাঝে ত্রস্ত দৃষ্টি তুলে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। কালো আকাশের বুকে দু-চারটে নক্ষত্র এদিক-ওদিক দেখা যায়। এক সময় আকাশে দেখা যেত শুধু নক্ষত্র, এখন সার্চ্চ-লাইটের চকিত আলোয় আকাশে মাঝে মাঝে সিগারাকৃতি জেপেলিন্ চোখে পড়ে।

রাতটা বাইরে কাটানোই আমাদের ইচ্ছা। আমরা সবসুদ্ধ চারজন—এক জন ফরাসী লেখক, দু-জন সার্ব্বিয়ান ক্যাপ্টেন আর আমি। এই অন্ধকার রাত্রে কোথায় যে আমরা আশ্রয় নেব তা ঠিক করতে পারছিলাম না—শহরের সব বাড়ীর দরজাই ত বন্ধ হয়ে গেছে। সার্ব্বিয়ান ক্যাপ্টেনদের একজন একটি সৌখীন হোটেলের কথা বললে যেখানে সারা রাতই লোকের আসা-যাওয়া চলে। যে-সব অফিসার রাতটা আমোদ ক'রে কাটাতে চায় তারা সচরাচর ওখানেই জোটে। যখনই কোন সৈনিক প্যারিতে আসে অবসর যাপনের উদ্দেশ্যে তখনই এ তথ্য সহকর্ম্মীরা তাকে জানিয়ে দেয় গোপনে। খুব সাবধানে আমরা হোটেলের ভিতর ঢুকলাম। উজ্জ্বল আলোয় চতুর্দ্দিক আলোকিত—এতক্ষণ অন্ধকারে চলার পর হঠাৎ আলোর মাঝখানে এসে চোখ ধেঁধে গেল। ঘরখানা যেন একটা বিরাট্ লাইট-হাউসের অভ্যন্তর ভাগ—চারি দিকে অসংখ্য আয়না, আয়নার গায়ে ঘরের বিচিত্র সাজসজ্জা প্রতি-বিম্বিত। মনে হ'ল আমরা যেন দু-বছর পেছিয়ে গেছি। বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত বিলাসিনী তরুণীর দল, শ্যাম্পেনের গ্লাস, বেহালার চিত্তস্পর্শী করুণ ঝঙ্কার—যুদ্ধের আগে এ-সব জায়গায় যে-দৃশ্য চোখে পড়ত অবিকল তাই। কিন্তু পুরুষদের মধ্যে একজনও সান্ধ্য পোষাক প'রে আসে নি। ফরাসী, বেলজিয়ান, ইংরেজ, রাশিয়ান, সার্ব্বিয়ান—সকলেরই গায়ে সামরিক পোষাক, আর সে পোষাক জীর্ণ ও ধূলিধূসর। জনকতক ইংরেজ সৈনিক বেহালা বাজাচ্ছিল করুণ সুরে আর মাঝে মাঝে মৃদু হাস্যের সঙ্গে প্রশংসমান জনতার দিকে দৃষ্টিপাত করছিল, তবে সে হাসি যেন নিষ্প্রাণ, অন্তঃসারশূন্য। আগেকার দিনের লাল কোর্ত্তা পরা জিপ্সিদের স্থান অধিকার করেছে ওরা। ওদের একজনকে লক্ষ্য ক'রে মেয়েরা

ফিস্‌ফিস্‌ করতে থাকে—তার বাপের নামটা বলাবলি করে—বাপ লর্ড— বংশমর্য্যদা ও ঐশ্বর্য্যে স্বদেশে বিখ্যাত।

হোটেলের প্রমোদকক্ষে উৎসবের যেন সমারোহ। রণদেবতার বেদীমূলে জীবন ওরা উৎসর্গ করেছে। তাই আজ জীবনের সুধাপাত্র নিঃশেষে ওরা পান করতে চায়—হাসছে, গাইছে, নারীর প্রেমে মাতোয়ারা হচ্ছে। প্রভাতে বিঘ্নসঙ্কুল সমুদ্রে যাত্রা করার আগে নাবিকেরা যেমন রাত্রিটা উদ্দাম আনন্দে কাটিয়ে দেয় এও ঠিক তেমনি।

সার্ব্বিয়ান দু-জনই তরুণ। নিয়তির রহস্যময় সঙ্কেতে আজ ওরা যাযাবর, কিন্তু এর জন্য কোন দুঃখ নেই ওদের, বরং স্বদেশের ক্ষুদ্র শহরের একঘেয়ে জীবনধারা থেকে মুক্ত হয়ে ওরা যে আজ ধনীদের বিলাসতীর্থ প্যারি শহরে উপস্থিত হয়েছে এর জন্য মনে মনে খুশী বলেই মনে হ'ল।

গল্প বলতে হয় কেমন ক'রে তা ওরা দু-জনেই জানে। ওদের দেশে—সকলেই যেখানে কবি—গল্প বলার ক্ষমতাকে কেউই অসাধারণ মনে করে না। অনেক কাল আগে লা মার্টিন যখন তুর্কীশাসিত সার্ব্বিয়ায় পদার্পণ করেন তখন ঐ মেষপালক ও যোদ্ধার দেশে কাব্যের সমাদর দেখে অবাক্‌ হয়েছিলেন। ওখানে খুব কম লোকই তখন লিখতে পড়তে পারত, অথচ কাব্যরচনায় সবারই ছিল পরম উৎসাহ—ওদের যা-কিছু চিন্তা ও অনুভূতি সবই কাব্যে রূপায়িত হয়ে লোকের মুখে মুখে ফিরত।

শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ক্যাপ্টেন দু-জন মাসকয়েক আগেকার এক শোচনীয় ঘটনা আলোচনা করছিল। শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হয়ে ওরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ক্ষুধায় আর শীতে কষ্টের অবধি ছিল না—বরফের মধ্যে হাতাহাতি লড়াই, দশ জনের বিরুদ্ধে একজন—ভয়ত্রস্ত মানুষ আর পশুর ভীড়, প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল ছুটাছুটি আর ঠেলাঠেলি—পিছনে শত্রুর মেশিন-গানের অবিরাম গুলিবর্ষণ—লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে আহতের আর্ত্তনাদ—পথের দু-পাশে আহত নারীদের ক্ষত-বিক্ষত দেহ, আকাশে অপেক্ষমাণ শকুনির দল—বাতে পঙ্গু রাজা পিটার তুষারাবৃত পাহাড়ের উপর দিয়ে অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে পলায়নে তৎপর, লাঠির উপর ভর দিয়ে ওষ্ঠ কুঞ্চিত ক'রে নীরবে তিনি চলেছেন নিয়তির ক্রূর ব্যঙ্গ উপেক্ষা ক'রে।

সার্ব্ব দু-জন যখন পরস্পরের সঙ্গে আলাপে রত তখন আমি ভাল ক'রে তাদের লক্ষ্য করছিলাম। বয়সে ওরা দু-জনেই তরুণ, দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, নাকের গঠন ঈগলের ঠোঁটের মত। গোঁপের রঙ কালো, দু-পাশ সরু ক'রে ছাঁটা। টুপীর নীচে থেকে কয়েক গুচ্ছ চুল বক্রভাবে কপালের উপর এসে পড়েছে। ওদের চেহারা অনেকটা ভাবুক শিল্পীর মত—গায়ে বাদামী রঙের সামরিক পোষাক রয়েছে এই যা, নইলে ঠিক ঐ ধরণের চেহারাই ভাবপ্রবণ তরুণীদের কাছে সমাদর লাভ করত চল্লিশ বছর আগে।

ওদের গল্প চলতে থাকে। কয়েক মাস আগে যে ঘটনা ঘটেছে তাই নিয়ে ওরা আলোচনা করছিল বটে, কিন্তু ওদের উৎসাহদীপ্ত চোখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওরা সুদূর অতীতের কোনো স্বপ্নময় আখ্যান বর্ণনা করছে—যেন সার্ব্বীয় বীর মার্কো ক্রেলোভিচ বনের অপদেবতা উইলাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ।

কিছু কাল আগে পর্য্যন্ত ওরা আদিম সমাজের হিংস্র বর্ব্বর জীবন যাপন করেছে। আজও তার স্মৃতি যেন ওদের অন্তর অধিকার ক'রে রেখেছে।

আমাদের ফরাসী বন্ধুটি বিদায় নিলে। সার্ব্ব যুবকদের আলোচনা তখনও থামে নি, তবে ওদের মধ্যে যে তখন কথা বলছিল তার উৎসাহ যেন একটু কমে এসেছে—কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে সে পাশের টেবিলের দিকে দৃষ্টি হানছিল। পালকযুক্ত মস্ত একটা টুপীর নীচে দুটো কালো চোখের একাগ্র দৃষ্টি যুবকটির মুখের দিকে নিবদ্ধ। যুবকটি নিঃসন্দেহেই সেটা লক্ষ্য করেছিল, আর তাই বোধ করি তার এই আকস্মিক চাঞ্চল্য। গল্পের ফাঁকে এক সময় সে আমাদের টেবিল থেকে উঠে পাশের টেবিলে গিয়ে বসল। ব্যাপারটা অত্যন্ত সাধারণ বলেই কেউই সেটা লক্ষ্য করল না। খানিক পরে দেখলাম, যুবকটি সেখানে নেই, আর সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে সেই টুপী আর কালো চোখের চুম্বক দৃষ্টি।

সার্ব্ব দুটির মধ্যে বয়সে যেটি অপেক্ষাকৃত ছোট সে-ই শুধু এখন আমার সঙ্গে—বাকী দু-জন বিদায় নিয়েছে। একটু আগে যে আলোচনা চলছিল তাতে ও যোগ দিয়েছিল বটে, তবে কথা কয়েছে সব চেয়ে কম। এক পাত্র মদ পান ক'রে দেওয়ালে টাঙানো বড় ঘড়িটার পানে ও তাকালো। তার পর আবার একপাত্র মদ ঢেলে নিয়ে খেতে সুরু করলে। পাত্রটা নিঃশেষ করে হঠাৎ সোজা হয়ে বসে আমার পানে ও তাকালো। তার গভীর বিশ্বাসভরা দৃষ্টি দেখে বুঝলাম, আমার কাছে সে এমন কিছু বলতে চায় যা তার অন্তরকে অহরহ পীড়িত করছে। আবার সে ঘড়িটার পানে তাকালো। রাত একটা—টং করে ঘড়ি বেজে উঠল।

"ঠিক এই সময়ে", যুবকটি হঠাৎ উত্তেজিতকণ্ঠে ব'লে উঠল, "আজ থেকে চার মাস আগে—"

যুবকটি বলতে সুরু করে—শুনতে শুনতে আমি তন্ময় হয়ে পড়ি—চোখের সামনে আমার ভেসে ওঠে নিকষ কালো অন্ধকার রাত্রি, বরফে ঢাকা দুর্গম উপত্যকা, বীচ আর ঝাউ গাছে ভরা তুষারমণ্ডিত পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে ঝড়ের উন্মত্ত দাপাদাপি আর সব শেষে কামানের গোলায় বিধ্বস্ত একখানি গ্রাম আর সেই গ্রামের মাঝে হতাবশিষ্ট এক দল সার্ব্বিয়ান সৈন্য।

সৈনিকদের মুখ শুষ্ক মলিন—ধীর পদবিক্ষেপে তারা পশ্চাদপসরণ করছে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের দিকে।

এই বিপর্য্যস্ত বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে যে ক্ষুদ্র সেনাদল ছিল আমার বন্ধুটিই ছিল তার অধিনায়ক। এক সময় এরা ছিল সুশৃঙ্খল যোদ্ধৃবাহিনী, এখন নেমে গেছে উচ্ছৃঙ্খল জনতার পর্য্যায়ে। সৈনিকদের সঙ্গে চলেছে ত্রস্ত কৃষকের দল—নিদারুণ কষ্টে ও ভয়ে তারা এমনই বিমূঢ় হয়ে পড়েছে যে তারা চলছে অবিকল যন্ত্রের মত—পশুর দলকে যেমন তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয় এদেরও তেমনই তাড়না করতে হচ্ছে।

মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে চলেছে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের হাত ধরে, তাদেরই মধ্যে যারা আবার সাহসী ও বলিষ্ঠ তাদের চোখে জল নেই; নীরবে পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝে তারা মৃত সৈনিকদের বুকের উপর ঝুঁকে পড়ছে তাদের বন্দুক আর টোটাভরা বেল্ট সরিয়ে নেবার জন্যে।

অদূরে গ্রামের ধ্বংসাবশেষ থেকে মাঝে মাঝে শেল বিদীর্ণ হয়ে রক্তবর্ণ আলোকচ্ছটায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করছে। সঙ্গে সঙ্গে কামানের গর্জ্জনও শোনা যাচ্ছে—কামানের গোলা জ্বলন্ত উল্কার মত বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটে চলেছে। বন্দুকের গুলির অবিরাম গুঞ্জনে আকাশ-বাতাস যেন মুখর।

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড আক্রমণ সুরু হবে। কারা যে তাদের আক্রমণ করবার জন্যে অন্ধকারে সমবেত হয়েছে তা তারা জানে না। ওরা জার্ম্মান, না অষ্ট্রীয়ান, না বুলগেরিয়ান, না তুর্কী? শত্রু তাদের অনেক—কে জানে কারা এসে হানা দিয়েছে!

"আমাদের পশ্চাদপসরণ করা ছাড়া উপায় ছিল না," সার্ব্ব বন্ধুটি বলতে লাগল, "ভোর হবার আগেই যেমন ক'রে হোক পাহাড়ের দিকে আশ্রয় নিতে হবে। যারা আমাদের সঙ্গে যেতে অক্ষম তাদের ফেলে আমরা যাত্রা সুরু করলাম।"

স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ, সব সারি বেঁধে চলেছে ভারবাহী পশুদের সঙ্গে—চতুর্দ্দিকের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে তাদের দেখা যায় না। শুধু সুস্থ বলিষ্ঠ লোকেরাই তখনও গ্রাম ছেড়ে বেরোয় নি—আশ্রয়-স্থান থেকে শত্রুদের দিকে তারা মধ্যে মধ্যে গুলি ছুঁড়ছে। কিন্তু তাও বেশীক্ষণ চালান সম্ভব মনে হ'ল না—তারাও ক্রমশঃ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হ'য়ে সরে আসতে লাগল। হঠাৎ কি মনে পড়ায় ক্যাপ্টেন সচকিত হয়ে উঠলেন—"আহতদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায়?"

কিছু দূরে এক খামার বাড়ীর মধ্যে জন-পঞ্চাশেক আহত নরনারী খড়ের উপর শুয়ে যন্ত্রণায় এপাশ-ওপাশ করছে। এদের মধ্যে কয়েক জন আহত হয়েছে দিন-কয়েক আগে, তবে আঘাত খুব মারাত্মক হয় নি ব'লে আহত দেহটাকে কোন রকমে টেনে এনেছে ঐ খামার বাড়ী পর্য্যন্ত; কয়েক জন আহত হয়েছে সেই রাত্রেই, যন্ত্রণায় তারা অর্দ্ধ-অচেতন, আর স্ত্রীলোক যারা রয়েছে তারা আহত হয়েছে শেলের বিক্ষিপ্ত টুকরায়।

ক্যাপ্টেন গম্ভীর মুখে খামার বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। ঘরখানা শুকনো রক্ত ও পচা মাংসের দুর্গন্ধে ভরা। ক্যাপ্টেনের গলা শুনেই লণ্ঠনের ধোঁয়াটে আলোয় সকলেই অস্থিরভাবে নড়ে উঠল।...কাৎরানি থেমে গেছে। বিস্ময় ও আতঙ্কে সকলেই নিস্তব্ধ—মনে হ'ল যেন ঐ মুমূর্ষু হতভাগ্যের দল মরণের চেয়েও ভয়াবহ আর কিছুর সম্ভাবনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

রক্ষিসৈন্য তাদের ত্যাগ ক'রে চলে যাবে শুনে সকলেই উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে, কিন্তু বেশীর ভাগই আবার মেঝের উপর শুয়ে পড়ল।

ক্যাপ্টেন ও তাঁর সঙ্গীদের লক্ষ্য ক'রে আহতের দল ব্যাকুল মিনতি জানাতে লাগল, "ভাইগণ, তোমরা আমাদের ফেলে যেয়ো না—যীশুর দোহাই—"

তার পর তারা ধীরে ধীরে বুঝতে পারলে,—সৈনিকেরা নিরুপায়, এখনি ওদের যাত্রা সুরু করতে হবে। বুঝে তারা নিরস্ত হ'ল—অদৃষ্টের নির্ম্মম বিধান স্বীকার ক'রে নেবার জন্য মনকে দৃঢ় করলে।...কিন্তু শত্রুর কবলে পড়া! চিরশত্রু বুলগেরিয়ান বা তুর্কীর অনুগ্রহে বেঁচে থাকা! মুখে তারা যা ব্যক্ত করতে পারলে না, চোখের নীরব ভাষায় তা ফুটে উঠল। সার্ব্বের পক্ষে বন্দী হওয়া মরণাধিক যন্ত্রণা। মৃত্যুপথযাত্রী অনেকেই স্বাধীনতা হারাবার চিন্তায় আতঙ্কে শিউরে উঠল।

বন্দানদের প্রতিহিংসা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

"ভাই—বন্ধু—"

তাদের কাতর আবেদনের অন্তরালে যে আকাঙ্ক্ষা লুকানো ছিল ক্যাপ্টেন তা বুঝতে পেরে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন।

"তোমরা কি চাও আমিই—"এক মুহূর্ত্ত পরে ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করলেন।

সকলেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে। ওদের ছেড়ে যাওয়া যখন একান্ত দরকার, তখন যাবার আগে একজন সার্ব্বকেও জীবিত রেখে যাওয়া উচিত হবে না তাঁর। তিনি নিজে যদি ঐ অবস্থায় পড়তেন তাহলে তিনিও কি ওদেরই মত ঐ প্রার্থনা জানাতেন না?

পলায়নের ব্যস্ততায় সৈনিকেরা কেউই বেশী টোটা সংগ্রহ করতে পারে নি, সঙ্গে যা আছে তা ভবিষ্যতের সঞ্চয়। ক্যাপ্টেন তরবারি কোষমুক্ত করলেন। জনকতক সৈনিক ইতিমধ্যেই কাজ সুরু ক'রে দিয়েছে সঙ্গীনের সাহায্যে, তবে তাদের কাজ নিতান্ত এলোমেলো ও বিশৃঙ্খল, যেখানে খুশী সঙ্গীনের খোঁচা মারছে, আহত ছট্‌ফট্ করছে অব্যক্ত যাতনায়, রক্তের ধারা ছুটছে ফোয়ারার মত। আহতেরা সবাই প্রাণপণ চেষ্টায় এগিয়ে আসছে ক্যাপ্টেনের দিকে—সাধারণ সৈনিকের হাতে মরার চেয়ে ক্যাপ্টেনের হাতে মরাই ভাল, তাতে সম্মানও আছে, যাতনা অপেক্ষাকৃত কম।

"আমায় নাও, ভাই—আমায় নাও—" আর্ত্তকণ্ঠে একজন মিনতি করলে।

তরবারির একটি নিপুণ আঘাতে মুহূর্ত্তে ক্যাপ্টেন তার কণ্ঠদেশের একটি শিরা কেটে ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গে তার নিষ্প্রাণ দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

হামাগুড়ি দিয়ে একে একে আসতে লাগল তারা—ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে কতকগুলো সরীসৃপ যেন এগিয়ে আসে। ক্যাপ্টেনের পায়ের কাছে ওরা ভীড় জমাতে থাকে—প্রথমটা ক্যাপ্টেন মুখ ফিরিয়ে নেন, ঐ বীভৎস অনুষ্ঠান তিনি দেখতে চান না, চোখ তাঁর জলে ভরে ওঠে। কিন্তু এই দুর্ব্বলতার ফলে মন তাঁর একটু নিস্তেজ হয়ে পড়ে, আগের মত নিপুণভাবে আঘাত হানতে পারেন না, বার-বার আঘাত করতে হয়, আহতের যাতনা হয় দীর্ঘায়িত। ক্যাপ্টেন বোঝেন, সংযত হওয়া তাঁর দরকার—মনে মনে বলেন, "দুর্ব্বল হ'লে চলবে না—হাত স্থির রাখতে হবে! হাত স্থির রাখতে হবে!"

"বন্ধু, এবার আমায় নাও…এবার আমায়…"

মরণের প্রতিযোগিতা চলেছে—সবাই চায় আগে মরতে—কে জানে এই মৃত্যুযজ্ঞ শেষ হবার আগেই শত্রুরা যদি এসে পড়ে! কি ভাবে বসা দরকার তা ওরা এরই মধ্যে যেন শিখে নিয়েছে। প্রত্যেকেই মাথাটা এক পাশে কাৎ করে বসছে যাতে ঘাড়টা শক্ত হয়ে ওঠে আর শিরাটা চোখে পড়ে সহজেই।

"আমায় নাও ভাই—আমায় নাও—" ব্যাকুল প্রার্থনা জানায় আরেক জন। তরবারির শাণিত ফলাটা এগিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তাক্ত দেহ গড়িয়ে পড়ে পাশের মৃতদেহগুলির উপর।

* * *

হোটেল খালি হয়ে আসে। সৈনিকদের বাহুবন্ধনে সুবেশা তরুণীর দল ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়—সুবাসের হিল্লোল তুলে। তরল হাস্যধ্বনির মধ্যে ইংরেজ সৈনিকদের বেহালা নীরব হয়ে গেছে।

সার্ব্ব যুবকটির হাতে শাদা রঙের ছোট একখানা ছুরি, ছুরিখানা তুলে ধরে আপন মনে সে টেবিলের উপর বারংবার আঘাত করে আর অস্ফুট স্বরে বলতে থাকে, "ট্যাক্…ট্যাক্…"

তার চোখের দিকে চেয়ে মনে হয় যেন স্মৃতির পীড়নে অন্তর তার নিষ্পেষিত হচ্ছে।*

---

* বিখ্যাত স্পেনীয় কথা-সাহিত্যিক Vicento Blasco Ibamez-এর A Serbian Night-এর অনুবাদ। এঁর রচিত দুখানি উপন্যাস Four Horsemen of the Apocalypso ও Blood and Sand জগদ্বিখ্যাত হয়েছে।

যাদের কথা আমরা ভাবতে চাই না

শ্রীপার্ব্বতীচরণ সেন, এম. বি.

সংস্কার

তাগাতাবিজ, মন্ত্রতন্ত্র, তুক্‌তাক্‌, ঝাড়ফুঁকের দেশ আমাদের। সিন্নি মেনে ও মানসিকের পুঁটুলি বেঁধেই আমরা আমাদের গরীব ঘরের হাজারো রোগের হাত থেকে মুক্তি পাবার প্রত্যাশা ক'রে আসছি। তীর্থকুণ্ডের জল, বুড়ো বটের শেকড়, সন্ন্যেসীর গাছান্ত, দেবমন্দিরে হত্যে আমাদের বিদ্যেহীন দেশের অমোঘ চিকিৎসা। এমনই ক'রে মোহান্ত-মহারাজার বিলাস-সম্পত্তির বিস্তৃতি ঘটেছে, সন্ন্যেসীর ভস্মমাখা কামুক মনের ইন্ধন জুটেছে। বিশ্বাসের জোরে এবং রোগের স্বধর্ম্মগুণেই কোন কোন রোগ আরোগ্য হয়েছে—অনেক হয় নি। যাদের হয় নি তারা সমাজের ঘৃণার পাত্র হয়েছে; লোকে তাদের বলেছে ভগবানের অভিশপ্ত। একে একে বন্ধুরা দূরে সরে গেছে, আত্মীয়জনেরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সমাজ, সংসার তাদের মুখের ওপরে, হতাশাক্লান্ত চোখের করুণ মিনতির সামনে দুয়ার রুদ্ধ ক'রে দিয়েছে। তাদের তাই দেখতে পাবেন তীর্থমন্দিরের প্রাঙ্গণ-কোণে, বদরিকাশ্রমের দুর্গম নির্জন পথে, তারকেশ্বরে, পুরী, কাশী, বৈদ্যনাথে। এদের মধ্যে সংখ্যাগুরু কুষ্ঠরোগীদের দুঃখ কারও কারও মনকে স্পর্শ করেছে এবং করুণা ক'রে পুণ্যলোভী যাত্রীরা এদের কাউকে কাউকে একটা-দুটো আধলা বা পয়সা দান ক'রে ভবপারের খেয়ার কড়ির সংস্থান করেছেন। কিন্তু এ রোগ যে ঝাড়ফুঁক তাগাতাবিজ কিছুই মানে নি। তাই যুগে যুগে মানুষ কুষ্ঠরোগীকে ব'লে আসছে ভগবানের অভিশপ্ত জীব। মানুষের সকল কিছু রোগ শোক যদি অভিশাপ হয় তবে এও নিশ্চয়ই অভিশাপ। এ রোগে মানুষকে তিলে তিলে বিকৃত অঙ্গ, কুঞ্চিত দেহ ও গলিত হস্তপদ ক'রে জীবনকে দুর্বহ ও দুঃসহ ক'রে তোলে। সমাজের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান ও নির্যাতনের ভয়ে কুষ্ঠরোগীরা মৃত্যুকামনা করে, কিন্তু মরণ তাদের কাছে সহজে আসে না। এ অভিশাপই, কিন্তু এমন কোন বিশেষ অভিশাপ নয় যার জন্যে দুষ্কৃত, অজ্ঞাত পাপের সঙ্গে হতভাগ্যের জীবনকে জড়িয়ে দিয়ে তাকে সমাজের বোঝা ক'রে তুলতে হবে।

ইতিহাস

কুষ্ঠরোগের ইতিহাস বহু দিনের। আমাদের দেশে বৈদিক যুগ থেকে সুরু ক'রে আজ পর্য্যন্ত গোপনে গোপনে এ রোগের জীবাণু দেহকে আশ্রয় ক'রে কত মানুষের সোনার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে আসছে। কুষ্ঠরোগের উল্লেখ ঋগ্বেদ, সুশ্রুত, চরক প্রভৃতি আয়ুর্বেদ গ্রন্থে, মহাভারত ও পুরাণে রয়েছে। পাশ্চাত্য দেশেও সামাজিক নানা ইতিহাসে ও বাইবেলে কুষ্ঠরোগের উল্লেখ অনেক দেখতে পাওয়া যায়। বাইবেলে দেখতে পাই লেখা রয়েছে—

> 'Now whosoever shall be defiled with leprosy and is separated by the judgment of the priest, shall have his clothes hanging loose, his head bare, his mouth covered with a cloth and he shall cry out that he is defiled and unclean. All the time that he is a leper and unclean he shall dwell alone without the Camp. [*Leviticus* XIII. 44-46]

কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন তারও আগে সে দেশে কুষ্ঠরোগ ছিল—প্রমাণ পাওয়া গেছে, সেখানকার প্রাচীন মাটির পাত্রের আঁকা ছবির ঢং থেকে। তারও কত আগেকার কাল থেকে এ রোগের নজিরের উদ্ধার হ'তে পারে এখন পর্য্যন্ত জানা নেই। তবে কুষ্ঠবিদ্‌রা মনে করেন, কুষ্ঠরোগের প্রথম সূচনা হয়েছিল প্রাচীন ইজিপ্টে এবং সে আজ কমপক্ষে ছয়-সাত হাজার বৎসর আগে। দাসব্যবসা, যুদ্ধবিগ্রহ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে এ রোগ ছড়িয়েছিল—পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে। বারো শতকের ইতিহাস পড়লে ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে হাজার হাজার কুষ্ঠালয়ের (Lazar house) কথা জানতে পারা যায়। তার মধ্যে একমাত্র ফ্রান্সের সীমানার মধ্যেই কুষ্ঠালয় ছিল অন্ততঃ দু-হাজার। মধ্য-যুগের ইয়োরোপের পথে পথে ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে কুষ্ঠরোগীরা চলত এবং দিনের কোন সময় সে-সব পথে ঘণ্টাধ্বনির বিরাম হ'ত বলে শোনা যায় নি। বহু বছর ধরে বহু মানুষের আগ্রহে, উৎসাহে ও সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় ইয়োরোপের পথে আজ ঘণ্টাধ্বনি একেবারেই থেমে গেছে বলা চলে। অশ্রুত ঘণ্টা বাজছে আজ দূর প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে, চীন, জাপান, বর্মা, ভারতবর্ষ ও আফ্রিকায় এবং দক্ষিণ-

আমেরিকায়। এ দুর্দ্দান্ত কুৎসিত ব্যাধির কবল থেকে বাঁচবার চেষ্টা আমাদের দেশের মানুষ অন্ততঃ আধুনিক যুগে মিলিতভাবে করে নি। আমাদের বাংলা দেশের সীমানার মধ্যেই আজ কমপক্ষে আড়াই লাখ কুষ্ঠরোগী রয়েছে বলে কুষ্ঠবিদ্‌রা অনুমান করেন। সংহত, সুশৃঙ্খল প্রচেষ্টায় এই অশ্রুত ঘণ্টাধ্বনি থামিয়ে দেবার সময় কি আজও আমাদের আসে নি?

বাহ্য লক্ষণ

কলকাতার পথে, কালীঘাটের মন্দিরের চারি পাশের রাস্তায়, বড় শহরের অলিতে-গলিতে ভিখারী কুষ্ঠরোগীরা ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়। তাদের সকলকার রোগের চেহারা এক রকমের নয়। কারও দেহ গেছে কুঁকড়ে, বিকৃত হয়ে—চেনা যায় না কি চেহারা নিয়ে এক দিন তারা এসেছিল এই পৃথিবীতে; হাত পায়ে ঘা, হাত পায়ের আঙুল খসা—বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার ক'রে পথিকের দয়া-ভিক্ষা করছে। আবার এক রকমের রোগী দেখা যায় যাদের গায়ের চামড়ার ওপরে কতকগুলো দাগ ফুটে ফুটে উঠেছে। এই সব দাগে প্রায়ই অনুভবশক্তি কমে যায়। এ সব রোগীর সংক্রমণ-ক্ষমতা নেই। আর এক রকমের রোগী দেখতে পাওয়া যায় যাদের মুখ-কানের চামড়া মোটা হয়ে ঝুলে পড়েছে, গায়ের এখানে-সেখানে উঁচু উঁচু গাঁট গাঁট হয়ে উঠেছে, অসমান হয়ে গেছে মুখের চামড়া, নাকটা অস্বাভাবিক বিকৃত। রোগ ছড়ায় এরাই, কারণ এরা সংক্রামী। কুষ্ঠরোগ এই তিনটি রূপ নিয়েই সাধারণতঃ রোগীর দেহে ফুটে বের হয়।

উদ্ভব ও বিস্তার

কুষ্ঠরোগীর শরীরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুষ্ঠজীবাণু থাকে। কুষ্ঠরোগের জনক এরাই। এরা যদি কোন সুযোগে সুস্থদেহের সংস্পর্শে আসতে পারে বিপদটা অসম্ভব নয়। কিন্তু ঠিক কেমন ক'রে এই কুষ্ঠজীবাণু মানুষের শরীরকে আশ্রয় করে তার সন্তোষজনক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আজও মেলে নি। খুব সম্ভব শরীরের কাটা-চেরার সুযোগ নিয়ে জীবাণু দেহে প্রবেশ করে এবং তিন-চার কি পাঁচ বছর পরে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ বাইরে প্রকাশ পায়। এমন কি বিশ-ত্রিশ বছর পরেও রোগ ফুটে বেরুতে দেখা গেছে। কারা তবে এই জীবাণু ছড়ায়? যে কুষ্ঠরোগীর হাত-পায়ে ঘা আছে তারাই যে সব সময় জীবাণু ছড়ায় তা নয়। এদের দেখতে যতই খারাপ দেখাক্ বিপদপ্রবণতা সাধারণতঃ এদের কমই। যাদের গায়ে অনুভবশক্তিহীন দাগ বেরয় তারাও মোটেই অন্যের পক্ষে অনিষ্টকর নয়। এই দুই রকমের রোগীদের শরীরে কুষ্ঠজীবাণু বদ্ধ অবস্থায় থাকে ব'লে অন্যকে এরা সংক্রমিত করতে পারে না।

তৃতীয় রকমের রোগী যাদের নাক মুখ কান অথবা গায়ের চামড়া মোটা হয়ে গেছে তারাই বিপদ্‌জনক সব চেয়ে বেশী। এসব রোগীর নাক ও গলার ভেতরে সাধারণতঃ ঘা থাকে যা বাইরে থেকে দেখা যায় না। এ রকম রোগীদের এই সব নাক ও গলার ঘায়ে এবং গায়ের চামড়ায় সংখ্যাতীত কুষ্ঠজীবাণু মুক্ত অবস্থায় থাকে। এই জন্যে এদের সঙ্গে এক বিছানায় শুলে, এক সঙ্গে খেলে, এক আসনে বসলে ও এদের গাত্র-সংস্পর্শে থাকলে অন্যের কুষ্ঠরোগ হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। আরও দশ জন সাধারণ লোকের মতই এরা লোকের ভীড়ে ঘুরে বেড়ায় এবং জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে যে দুঃসহ করুণ কাহিনীর ভূমিকা সৃষ্টি করে তার তুলনা নেই।

কোন ক্ষণিক সংস্পর্শের ফলে কি এ রোগ সংক্রমিত হয়? কুষ্ঠরোগীদের গায়ে হঠাৎ একটুখানি গা ঠেকলেই রোগ অন্যে সংক্রমিত হয় না, খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার ফলে এ রোগ ছড়ায়। কুষ্ঠ-জীবাণুর সংক্রমণ-ক্ষমতা অন্যান্য অনেক সংক্রামী রোগ-জীবাণু অপেক্ষা কম। পূর্ণবয়স্ক লোকেরা সাধারণতঃ কমই কুষ্ঠরোগপ্রবণ—ভয় সব চেয়ে বেশী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরই, কারণ কুষ্ঠ-রোগ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা এদের খুবই কম। সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায় স্বামীর সংক্রামী কুষ্ঠ থাকলেও স্ত্রী সুস্থ থাকেন, অথবা স্ত্রীর থাকলে স্বামী সুস্থ থাকেন, কিন্তু সংক্রামী কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত মাতার সন্তানদের কুষ্ঠরোগ হ'তে প্রায়ই দেখা যায়। তার প্রধান কারণ শিশুদের স্বাভাবিক কুষ্ঠরোগ-প্রবণতা ও মায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ। কুষ্ঠরোগ বংশগত ব্যারাম নয়। সংক্রামী কুষ্ঠরোগীদের সন্তান জন্মাবার পর তাদের অন্য সুস্থ আত্মীয় মানুষ করলে এবং সংক্রামী কুষ্ঠরোগীর সংস্পর্শে বা সংসর্গে না আসতে দিলে এ সব সন্তানের কুষ্ঠ হয় না। এতেই প্রমাণ হয় কুষ্ঠরোগ বংশানুক্রমিক নয়। কুষ্ঠরোগের প্রসার কমাতে হ'লে সংক্রামী কুষ্ঠরোগীদের সংস্পর্শ ও সংসর্গ থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের দূরে রাখবার সব রকমের ভাল ব্যবস্থা করাই প্রধান কথা।

চিকিৎসা

কুষ্ঠরোগ পাপের শাস্তি এ মনে করা বাতুলতা।

তাগাতাবিজে এ রোগ সারতে না পারে, কিন্তু সে জন্যে এ রোগের আরোগ্যবিধান অসম্ভব মনে করা ভুল। "মিশন টু লেপার" খ্রীষ্টীয় মিশনরী প্রতিষ্ঠান আজ আটষট্টি বছর ধ'রে আমাদের দেশের কুষ্ঠরোগীদের আশ্রয়, সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসার যথাসাধ্য ব্যবস্থা ক'রে আসছেন। তাঁদের যে কোনও বার্ষিক বিবরণী পড়লে দেখতে পাওয়া যায় যে তাঁরা যে রকমের বাড়াবাড়ি অবস্থার রোগীদের পান তাদের মধ্যেও সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ফলে শতকরা নয়-দশ জন রোগীকে প্রতি বৎসর রোগ-লক্ষণমুক্ত ক'রে থাকেন। সময়মত চিকিৎসা করালে অসংক্রামী রোগীদের মধ্যে অনেকেই রোগ-লক্ষণমুক্ত হ'তে পারে। এর জন্যে দরকার রোগের প্রারম্ভিক অবস্থায়ই সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এ কথা আজকের যুগের নূতন কিছু আবিষ্কার নয়, আড়াই হাজার তিন হাজার বছর আগেকার সুশ্রুত-সংহিতায় এ রোগের বিশদ বিবরণ ও চিকিৎসা-প্রণালী বিস্তৃত লেখা রয়েছে। শুধু যদি আমরা সুশ্রুত-সংহিতার পরিভাষা জানতে পারতুম তা হ'লে হয়ত আজ বহু লক্ষ হতভাগ্যের রোগলাঞ্ছনা লাঘব হ'ত এবং শ্রদ্ধানন্দ পার্কের রেলিঙে হেলান দিয়ে অথবা ইউনিভার্সিটি বিল্ডিংসের চারি পাশের রাস্তার ফুটপাথে যারা রোদে পোড়ে, জলে ভেজে তারা অন্ততঃ একটুখানি শান্তিতে মরতেও পারত। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা না করালে হয়ত রোগ চিকিৎসকের আয়ত্তে আসবে না। কিন্তু রোগ একেবারে নির্মূল করতে না পারলেও আধুনিক এলোপাথিক চিকিৎসা রোগীকে এমন অবস্থায় আনতে পারে যখন রোগ-সংক্রমণের ক্ষমতা একেবারেই থাকে না। সমাজ-কল্যাণের দিক দিয়ে এর মূল্য কিছু কম নয়।

রোগভীতি ও ঘৃণা

কুষ্ঠরোগ ও কুষ্ঠরোগীকে মানুষ চিরদিন ভয় ও ঘৃণা ক'রে আসছে। মানুষের এ মনোবৃত্তির পিছনে কোনই সুস্পষ্ট যুক্তি নেই। কুষ্ঠরোগীর বিকৃত চেহারা অনেক সময় মনকে সঙ্কুচিত করেই। কিন্তু কুষ্ঠ ছাড়া আর কি কোন ব্যাধি নেই যা মানুষের মনে অনুরূপ ঘৃণা ও ভয়ের উদ্রেক করতে পারে? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু মানুষের যুগসঞ্চিত সংস্কার 'কুষ্ঠ' নামের সঙ্গে কি ঘৃণা, উত্তেজনা, ভয় যে জড়িয়ে দিয়েছে, তার ঠিক নেই। 'কুষ্ঠ' নামটা শুনলেই লোকে অন্তরে অন্তরে শিউরে ওঠে। যদি এই বহুকালের পুরানো 'কুষ্ঠ' নামটার বদল ঘটানো চলে তাহ'লে হয়ত মানুষের এই মনোবৃত্তির পরিবর্তন হবে। ইয়োরোপ, আমেরিকা থেকে প্রস্তাব উঠেছে—নূতন নাম হোক—Hansen's disease—কুষ্ঠ-জীবাণু-আবিষ্কারকের নাম অনুসারে। আমাদের ভাষায় ওর কি বদল-নাম দেওয়া যেতে পারে এখনও ভাববার বিষয়। হয়ত এই উপায়েই কুষ্ঠরোগীর মনের অসীম ব্যথা ও দুঃসহ আত্মগ্লানি কথঞ্চিৎ লাঘব করা যেতে পারে।

উচ্ছেদ ও সামাজিক কর্তব্য

ইয়োরোপ তার শতাব্দীর চেষ্টায় কুষ্ঠরোগের প্রায় একেবারে উচ্ছেদ ক'রেছে। তাদের আদর্শ নিয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমবেত চেষ্টায় আমাদেরও দেশ থেকে এক দিন কুষ্ঠরোগ নির্মূল করা সম্ভব হবে। তার জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন সামাজিক চেতনা। আমাদের এই চেতনারই একান্ত অভাব। সেজন্যেই কুষ্ঠরোগীদের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে এবং কুষ্ঠরোগ দূর করবার আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে আমরা এত উদাসীন। পূর্বেই বলেছি যে একমাত্র বাংলা দেশেই অন্ততঃ আড়াই লাখ কুষ্ঠরোগী আছে। ভারতবর্ষে অন্ততঃ দশ লাখ কুষ্ঠরোগী রয়েছে। মন্দের ভাল এইটুকু যে, এদের মধ্যে সবাই সংক্রামী নয়। আমাদের দেশে কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে গড়পড়তা শতকরা মাত্র কুড়ি-পঁচিশ জন রোগী সংক্রামী অর্থাৎ বাংলা দেশে আড়াই লাখ রোগীর মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার রোগী মাত্র সংক্রামী এবং ভারতবর্ষে দশ লাখ কুষ্ঠরোগীর মধ্যে প্রায় আড়াই লাখ সংক্রামী। কিন্তু বাংলা দেশে কুষ্ঠ-রোগীদের পৃথক্ থাকবার আজ পর্যন্ত যে-সব ব্যবস্থা হয়েছে তাতে মাত্র সাড়ে সাত শত রোগী থাকতে পারে এবং সারা ভারতবর্ষে মাত্র চৌদ্দ হাজার কুষ্ঠরোগীর আলাদা থাকবার ব্যবস্থা আছে। একমাত্র বাংলা দেশেই অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার সংক্রামী কুষ্ঠরোগীদের পৃথক্ বস-বাসের ও পরিচর্যার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। তাছাড়া কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার জন্যে ছোটবড় নানা রকমের হাসপাতাল ও 'কুষ্ঠক্লিনিক' দেশের সর্বত্র তৈরি করতে হবে। বাংলা দেশে মাত্র চারটি কুষ্ঠাশ্রম ও একটি হাসপাতাল আছে। গ্রামের ও মফস্বলের শহরের কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার জন্যে কয়েকটি মিউনিসিপালিটি ও জেলাবোর্ডের চেষ্টা ও খরচে প্রায় এক-শ চল্লিশটি কুষ্ঠ-ক্লিনিক আমাদের এই বাংলা দেশে হয়েছে। এ ব্যবস্থা বিশাল সমুদ্রে এক ঝিনুক জলের মতই। এ যৎসামান্য ব্যবস্থায় আমরা কখনই আশা করতে পারি

না যে কুষ্ঠরোগ-সমস্যার সমাধানে আমরা এক পাও এগিয়েছি। বাঙালীর কর্ম্মশক্তি ও বুদ্ধির প্রশংসা করা আমাদের প্রায় মজ্জাগত হ'য়ে গেছে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি ও শক্তি এ সমস্যার সমাধানে এখনও পর্যন্ত মোটেই নিয়োগ করি নি। কত দিনে আমাদের সামাজিক চেতনা এমন জাগবে যখন আমরা সকলের আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে দেশ জুড়ে বহুসংখ্যক কুষ্ঠাশ্রম, কুষ্ঠনিবাস, কুষ্ঠালয় স্থাপন ক'রে সাধারণের—বিশেষতঃ ছোট ছেলে-মেয়েদের সংস্পর্শ থেকে সব সংক্রামী কুষ্ঠরোগীদের দূরে রাখতে পারব? কুষ্ঠরোগ বিস্তার প্রতিহত করবার আর কোন বৈজ্ঞানিক উপায় নেই। ব্যাপক চিকিৎসার জন্যে বহু কুষ্ঠ-হাসপাতাল ও কুষ্ঠ-ক্লিনিক সঙ্গে সঙ্গে স্থাপন করা চলবে, কিন্তু সর্বপ্রথম প্রয়োজন সংক্রামী কুষ্ঠরোগীদের পৃথক্ রাখবার সুব্যবস্থা।

কুষ্ঠরোগ একটা জাতীয় কলঙ্কের মত ভারতবর্ষের ঘাড়ে আজ বহু শতাব্দী ধরে চেপে বসেছে। ভারতবর্ষে সমাজের দিক থেকে আজও কেন এই সমস্যার দিকে নজর ভাল করে পড়ে নি? কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, যক্ষা যদি সমাজের দৃষ্টি, সমাজের সহানুভূতির দাবী করতে পারে, কুষ্ঠ কেন পারবে না? ভারতবর্ষে সর্বশুদ্ধ মাত্র নব্বইটি কুষ্ঠাশ্রম আছে। তার বেশীর ভাগ আশ্রমের পরিচালক খ্রীষ্টান মিশনরী। এটা তাঁদের পক্ষে খুবই গৌরবের কথা এবং এ জন্যে তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমাদের কি এ বিষয়ে কিছুই কর্তব্য নেই, দায়িত্ব নেই? আরও কুষ্ঠাশ্রম, কুষ্ঠকেন্দ্র, কুষ্ঠ-চিকিৎসালয় গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা কেন আমরা করব না? সংহত, সুপরিচালিত চেষ্টা আর আগ্রহ দিয়ে সমাজ-স্বাস্থ্যের এই কালো দাগ মুছে ফেলবার দিন আজ আমাদের এসেছে। সমাজকে যাঁরা ভালবাসেন, সমাজ-সেবার কাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন, সমাজের এই লজ্জিত কলঙ্ক মোচনের দিকে তাঁদের দৃষ্টি পড়ুক এই কামনা করি।

ইং ১৯২৭ সাল থেকে কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে নানা তথ্যের অনুসন্ধান ও এ সমস্যা সম্বন্ধে বাংলা দেশের সকলের মনকে সজাগ করবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ এম্পায়ার লেপ্রোসি রিলিফ এসোসিয়েসনের বাংলা শাখা বহু চেষ্টা করছেন। এ বিষয়ে দেশের লোককে উদ্বুদ্ধ ক'রে এ দেশ থেকে সমূলে কুষ্ঠরোগের উচ্ছেদ করাই এই সমিতির আদর্শ। এই সমিতি একটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান, গবর্ণমেণ্ট অথবা কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অন্তর্গত নয়। কুষ্ঠরোগ-বিস্তার প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে সুসংহত প্রচেষ্টায় এই সমিতির কর্মীদের সাহায্য সব সময়েই পাওয়া যেতে পারে।

মহিলা-সংবাদ

কলিকাতা ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের অধ্যাপিকা শ্রীমতী কমলা দেবী, এম-একে তাঁহার 'বঙ্গসাহিত্যে গ্রাম' শীর্ষক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ১৯৪২ সনের জুবিলী রিসার্চ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ছিল। ১৯৩০ সনের পর কাহাকেও এই পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। একজন মহিলা হিসাবে তিনিই প্রথম এই পুরস্কারটি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি তিন বার বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত মোক্ষদাসুন্দরী সুবর্ণপদক অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রীমতী কমলা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মচারী শ্রীযুত আশুতোষ বাগচীর কন্যা।



শ্রীকমলা দেবী

বিবিধ প্রসঙ্গ

মৌলবী ফজলুল হকের ষষ্ঠাংশ

বাঙ্গালা দেশের প্রজাদের মঙ্গলসাধনের বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়া মৌলবী ফজলুল হক গত ছয় বৎসরের মধ্যে তাহাদের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন কাজই করিতে পারেন নাই। ঋণ সালিশী বোর্ড বসিয়াছে, মহাজনী আইন হইয়াছে, কিন্তু অল্প সুদে ও সহজে ঋণ দানের বন্দোবস্ত না করিয়া দেওয়ায় ঐ দুই আইনের দ্বারা কৃষক-সাধারণের উপকার হয় নাই। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সেস আদায় হইয়াছে, কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই বলিলেই চলে। নিজের এই সব অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য অবশেষে মৌলবী ফজলুল হক ফ্লাউড কমিশনের এক পাল্টা পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরিকল্পনাটির সার মর্ম যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে উহার প্রকৃত রূপটি কল্পনা করা কঠিন। যে দুইটি বিষয় উহাতে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন, সমগ্র পরিকল্পনাটি হস্তগত হইলে উহার অপর বিষয়গুলি বিচার করা যাইবে।

হক সাহেব কৃষকদের "মোট উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ" রাজস্ব স্বরূপ আদায় করিতে চাহেন। এই ষষ্ঠাংশের মূল্য আদায় হইবে, ফসল নহে। কৃষকেরা বর্তমানে উর্ধ্বপক্ষে বিঘাপ্রতি ৩৲ হারে খাজনা দিয়া থাকে। গড়ে খাজনার হার দুই টাকার বেশী হইবে না। ইহার উপর কয়েক দফা সেস আছে বটে, তবে তাহার পরিমাণ খুব নহে, খাজনার উপর আর এক টাকার বেশী হইবে না। হক সাহেবের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কার্যে পরিণত হইলে কৃষকগণ যেখানে উর্ধ্বপক্ষে তিন-চার টাকা করিয়া দিত, সেখানে তাহাদিগকে ন্যূনপক্ষে তের-চৌদ্দ টাকা করিয়া দিতে হইবে। মোট উৎপন্ন ফসলের ষষ্ঠাংশ হক সাহেব আদায় করিতে চাহেন, লাভের ষষ্ঠাংশ নহে। কৃষিকার্য্যের ব্যয় বাদ যাইবে না।

কৃষিকার্যে একজন সাধারণ দরিদ্র কৃষকের নিম্নলিখিত-রূপ ব্যয় হয় ও লাভ হয়:—

ধান-চাষের বিঘাপ্রতি ব্যয়—

বীজধান পাঁচ সের	...	৷৷৹
জমি-চাষে চার জন লোক চার দিন খাটিতে হয়। তন্মধ্যে পিতাপুত্র খাটিলে এবং দুই জন মজুর লইলে দৈনিক তিন আনা হারে দু-জন মজুরের চার দিনের মজুরি	...	১৷৷৹
ধান বোনা	...	১৷৷৹
ফসল কাটা	...	২৷৷৹
মাঠ হইতে ধান ঘরে তোলা	...	১৲
ঝাড়াই	..	৩৲
		১০৲

সাধারণ অবস্থায় ধানের দর খুব বেশী হইলে ২৷৷৹ টাকা থাকে। বিঘাপ্রতি সাধারণতঃ অর্থাৎ সার না দিলে ৬ মণের বেশী ধান উৎপন্ন হয় না। আড়াই টাকা হারে ৬ মণ ধানের মূল্য ১৫৲ এবং খড়ের দাম ৪৲ মোট ১৯৲ পর্যন্ত সাধারণ দরিদ্র কৃষকের বিঘাপ্রতি জমির আয়। সুতরাং তাহার লাভ হইতেছে—

আয়—১৯৲
ব্যয়—১০৲
৯৲

এই নয় টাকাকে লাভ বলা সঙ্গত নহে এই জন্য যে ইহার মধ্যে খাজনা এবং পিতাপুত্র কৃষকের মজুরি,—চাষ দেওয়া, ধান বোনা, নিড়ানো, ফসল কাটা, ফসল বহন এবং ঝাড়াই, কোনটির মধ্যেই ধরা হয় নাই। সাধারণ কৃষকের মধ্যে কৃষিকার্যে লাভ হয় না, নিজের মজুরি উঠিয়া আসিলেই তাহারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া থাকে।

ধান উঠিয়া গেলে কৃষকেরা একটি অর্থকরী ফসল বুনিয়া থাকে; তন্মধ্যে আলুর হিসাব ধরা যাক্। আলু-চাষে ব্যয় হয় নিম্নোক্তরূপ:

সার	২০৲
জল-সেচার মজুরি	১০৲
বীজ	৫৲
অন্যান্য মজুরি	১০৲
	৪৫৲

মোটামুটি সার দিলে বিঘাপ্রতি ২৫ মণ পর্যন্ত আলু উঠিয়া থাকে। সাধারণ অবস্থায় আলুর দর কৃষকেরা পায় ২।।০ টাকা মণ, অর্থাৎ ২৫ মণে পায় ৬২।।০ আনা। আলু-চাষে তাহার লাভ হয়—

আয়	৬২।।০
ব্যয়	৪৫৲
	১৭।।০

ধান এবং আলু চাষে তাহার মোট লাভ হয়—৯৲ টাকা + ১৭।।০ টাকা = ২৬।।০ টাকা।

হক সাহেবের ষষ্ঠাংশ আদায় হইলে তাহাকে দিতে হইবে মোট আয় ১৯৲ টাকা + ৬২।।০ টাকা = ৮১।।০ টাকার ষষ্ঠাংশ, অর্থাৎ ১৩।।০ টাকা। দুই ফসলে মিলাইয়া তাহার নীট আয় যেখানে হইতেছে ২৬।।০ টাকা, সেখানে তাহাকে নূতন ব্যবস্থায় গবর্ন্মেন্টকে দিতে হইবে ১৩।।০ টাকা। বর্ত্তমানে জমিদারকে সে ৩।৪ টাকা উর্ধ্বপক্ষে দিয়া রেহাই পাইতেছিল।

ফ্লাউড কমিশন রিপোর্টে কৃষিকার্য্যের ব্যয়ের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা গ্রহণযোগ্য নহে, রিপোর্টের মাত্র দশ প্যারা পূর্ব্বে তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের হিসাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ১৬৮ প্যারায় তাঁহারা বলিয়াছেন যে দিনমজুরের মজুরি সমেত কৃষিকার্য্যের ব্যয় ফসলের মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ এবং ঐ সঙ্গে দেখাইয়াছেন বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনেও ঐ অনুপাতই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ১৫৮ প্যারায় তাঁহারাই বলিয়া গিয়াছেন যে ১৯২৯ সালের পর হইতে ফসলের মূল্য অত্যন্ত কমিয়াছে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস হইয়াছে ১৯২৮ সালে। সুতরাং ঐ আইনে গৃহীত অনুপাতকে ১৯২৯-৩০-এর দারুণ মন্দার বাজারের পর কোন মতেই প্রামাণিক বলিয়া ধরা চলে না। দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর ধারণা না থাকিলে এই প্রকার ভুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কৃষিকার্য্যের ব্যয়ের অনুপাত এ দেশে জমির উৎকর্ষ এবং কৃষকের মূলধন বিনিয়োগ (Capital Expenditure) ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, এবং এই অনুপাত সম্বন্ধে অত্যন্ত মোটামুটি ধারণা করিবার উপযুক্ত সংখ্যামূলক তথ্য এখনও সংগৃহীত হয় নাই।

হক সাহেবের ষষ্ঠাংশ আদায়ের ব্যবস্থা হইলে দরিদ্র কৃষক বর্ত্তমানে যাহা দিতেছে তাহার চতুর্গুণ তাহাকে দিতে হইবে, বর্দ্ধিষ্ণু যে কৃষক ভাল সার ও বেশী টাকা ব্যয় করিয়া চাষ করিতেছে, তাহাকে দশ গুণ পর্য্যন্ত দিতে হইতে পারে।

অতঃপর প্রশ্ন, এই ষষ্ঠাংশের মূল্য ধার্য্য করিবে কে, এবং কোন্ হিসাবের উপর নির্ভর করা হইবে? মোটামুটি জমিতে বিঘা-প্রতি ২৫ মণ আলু উঠে, আবার ভাল সার দিলে ও জলসেচা ভাল হইলে ৬০ মণ পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। উৎপন্ন ফসলের পরিমাণে যেখানে এত প্রভেদ, সেখানে কোন গড়পড়তা হার নির্দ্ধারণ করা চলে না; প্রতি বৎসর প্রতি কৃষকের উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে হয়। ইহা সম্ভব হইলে তোডরমল্লকে কেন ফসলি হিসাব বাতিল করিয়া নির্দিষ্ট জমির উপর খাজনা বাঁধিয়া দিতে হইয়াছিল?

খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে হক সাহেবের প্রস্তাব অত্যন্ত ঝাপসা। প্রকাশিত সারমর্ম হইতে ইহাই বুঝা যায় যে জমিদার তালুকদার প্রভৃতি আর জমির মালিক থাকিবেন না, তাঁহারা খাজনা-আদায়কারী রূপে অতঃপর পরিগণিত হইবেন এবং তাঁহাদিগকে প্রতি বৎসর একটা অত্যন্ত মোটা রকমের পেন্সন দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি হস্তগত হইলে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

পঞ্চাশ বিঘার প্রশ্ন

মৌলবী ফজলুল হকের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব এই যে কোন প্রকৃত কৃষক ৫০ বিঘার অধিক জমির মালিক হইতে পারিবে না। সোসালিজমের মূলনীতি না জানিয়া, এবং দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা না বুঝিয়া সাম্যবাদী বুলি আওড়াইতে গেলে হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হইবারই সম্ভাবনা অধিক। কৃষকের মৃত্যুর পর হিন্দু আইনে তাহার জমি ভাগ হইবে, তাহার তিন পুত্র থাকিলে জনপ্রতি ১৭ বিঘার মত পড়িবে। এক পুরুষের মধ্যেই ৫০ বিঘা ১৭ বিঘায় এবং দ্বিতীয় পুরুষে উহা আরও তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ হইয়া ৫ বিঘায় দাঁড়াইবে। ইহাও কি কৃষকের মঙ্গলসাধনের সমাজতান্ত্রিক উপায়? হিন্দু এবং মুসলমান আইন বদলাইয়া জমির উত্তরাধিকার বন্ধ না করিলে হক সাহেবের পক্ষে এই ৫০ বিঘা জমিকে অবিভক্ত রাখা কিরূপে সম্ভব? হিন্দু দায়ভাগ আইনে যাহারা পড়ে, তাহাদের পক্ষে আরও অসুবিধা আছে। দায়ভাগ আইনে হিন্দু পিতার জমি দান-বিক্রয়ের অবধি অধিকার রহিয়াছে। ৬০ বৎসর বয়স্ক পিতার সহিত ৩০ বৎসর বয়স্ক পুত্রের যদি সদ্ভাব না থাকে, সে যদি উত্তরাধিকারে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা করে, তাহা হইলে সে কত জমি ক্রয় করিতে পারিবে? যখন সে জমি ক্রয় করিতে চাহিতেছে, তখন

সে 'প্রকৃত কৃষক' নহে, কৃষকের সাহায্যকারী মাত্র। কৃষকের সাহায্যকারীকেও যদি 'প্রকৃত কৃষক' ধরা হয়, এবং তদনুসারে যদি তাহাকে ৫০ বিঘা জমি ক্রয়ের অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ১৭ বিঘা এবং স্বোপার্জ্জিত অর্থে ক্রীত ৫০ বিঘা এবং ৬৭ বিঘা হইতে হক সাহেব যে ১৭ বিঘা কাড়িয়া লইতে চাহেন, তাহা কোন্ জমি? উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, না ক্রীত জমির অংশ? কোন্ জমি নেওয়া হইবে তাহা কে ঠিক করিবে? হক সাহেবের এই উদ্ভট পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন অত্যাবশ্যক, তাহা গঠিত হইয়াছে অথবা অদূর ভবিষ্যতে অর্থাৎ হক সাহেবের আগামী নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই গঠিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া কি তিনি বিশ্বাস করেন?

এই ৫০ বিঘা জমি বাঁধা পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আরও একটি আপত্তি আছে। বাংলা দেশে জমি খণ্ড খণ্ড ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকায় কলের লাঙ্গল প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ অসম্ভব। ৫০০ বা হাজার বিঘা জমি একসঙ্গে না পাইলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করা যায় না। এই সুবিধা না দিলে শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণকে কৃষিকার্য্যে আগ্রহশীল করিয়া তোলাও যায় না। বাংলার সরকারী খাসমহলে এবং অন্যান্য স্থানে লক্ষ লক্ষ বিঘা কর্ষণযোগ্য জমি পতিত রহিয়াছে, এইগুলিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের উৎসাহ ও সুযোগ দিবার পরিবর্তে হক সাহেব বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্রবাদের নামে খণ্ডিত ক্ষুদ্র জমিকেই পাকা করিতে চাহিয়া বাংলায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্যের পথ রোধ করিতে চাহিতেছেন।

হক সাহেব ব্যক্তিগত হিসাবে যে-সব পরিকল্পনা দিয়াছেন তাহা প্রগতির নামে প্রগতিবিরোধী, কৃষকের মঙ্গলের নামে তাহাদের পক্ষে অতিশয় ক্ষতিকর—এবং উদ্ভট বলিয়াই বিবেচিত হইবে। এগুলি হক সাহেবের ব্যক্তিগত অভিমত বলিয়া প্রকাশিত হইলেও তিনি এখনও বাংলা দেশের প্রধান মন্ত্রী, লোকে ইহা ভুলিতে পারে না। প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে আরও বিবেচনা করিয়া এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিয়া উপরোক্ত পরিকল্পনা প্রকাশ করিলে শোভন হইত।

—

চিরপুরাতন কৈফিয়ৎ

জনকল্যাণমূলক কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ব্যর্থ হইলে কর্তৃপক্ষ সচরাচর একটি বাঁধা কৈফিয়ৎ দিয়া নিজেদের অক্ষমতা চাপা দিয়া থাকেন। অর্থের অপচয়ের একমাত্র কৈফিয়ৎ তাঁহারা এই দেন যে, "এরূপ না করিলে অবস্থা আরও খারাপ হইত।" সুনির্দিষ্ট ও ব্যাপক সরকারী পরিকল্পনা না থাকিলে জনমতের চাপে পড়িয়া কোন বড় কাজে হস্তক্ষেপ করিলে তাহা ব্যর্থ হইবার আশঙ্কাই অধিক, গবর্ন্মেণ্ট ইহা জানেন না বা বুঝেন না, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। তথাপি গবর্ন্মেণ্ট পরিকল্পনা না লইয়াই বড় বড় ব্যয়সাধ্য কার্যে অগ্রসর হইতেছেন এবং চূড়ান্ত ব্যর্থতা লইয়া ফিরিয়া আসিয়া ঐ একই বাঁধা কৈফিয়ৎ দিয়া দরিদ্র দেশবাসীর লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয়ের সাফাই গাহিয়া চলিয়াছেন। পাটের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, ফসল-বৃদ্ধি আন্দোলন প্রভৃতিতে এই একই ঘটনার অভিনয় হইয়াছে; সম্প্রতি খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ব্যর্থতার সাফাই গাহিতে গিয়া ভারত-সরকারের বাণিজ্য-সচিবও ঐ একই কথার আবৃত্তি করিয়াছেন।

কলিকাতায় কয়েকটি বণিক-সমিতির এক মিলিত সভায় ভারত-সরকারের বাণিজ্য-সচিব স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারত-সরকারের খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় যে ফল দেশবাসী আশা করিয়াছিল তাহা তাহারা পায় নাই। এই ব্যর্থতার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, "ইহা অবশ্য বুঝা উচিত যে নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার অভাবে অবস্থা আরও খারাপ হইত।" খাদ্যসঙ্কট সমাধানে সরকারী চেষ্টা আংশিক ভাবেও ফলপ্রসূ হইয়াছে কি না তাহা বুঝিবার উপযুক্ত কোন তথ্য তাঁহার বক্তৃতার রিপোর্টে পাওয়া যায় না। দেশের কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে গবর্ন্মেণ্ট যে অদূরদর্শী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্বার্থান্ধ নীতি দীর্ঘকাল অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, বর্তমান অন্নবস্ত্র-সঙ্কট তাহারই ফল। বর্তমান অবস্থা হইতে দেশবাসীকে উদ্ধার করিবার দায়িত্ব গবর্ন্মেণ্টের এবং সরকারী সাহায্য ব্যতীত জনসাধারণ নিজেদের চেষ্টায় ইহার প্রতিকার করিতেও পারে না। গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে দেশবাসী অন্নবস্ত্র-সমস্যার সমাধান দাবী করে; "এরূপ না করিলে অবস্থা আরও খারাপ হইত" এই অর্থহীন কৈফিয়ৎ শুনিবার জন্য তাহারা সরকারের হাতে তাঁহাদের প্রার্থিত অর্থ তুলিয়া দেয় নাই। দেশবাসীর অন্নবস্ত্র-সমস্যার সমাধান গবর্ন্মেণ্টের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য, উহার বিরুদ্ধে কোন কৈফিয়ৎ গ্রহণ-যোগ্য নহে, বিশেষতঃ সঙ্কট যেখানে গবর্ন্মেণ্টের নিজের সৃষ্টি।

—

খাদ্য-সঙ্কটের দুই দিক

বাণিজ্য-সচিব বলিয়াছেন,

"খাদ্য-সঙ্কটের দুইটি দিক আছে। প্রথমটি দেশে ফসলবৃদ্ধির সমস্যা; দ্বিতীয়, উৎপন্ন ফসল প্রয়োজনানুসারে সর্বত্র সরবরাহ করা। এই দুই বিষয়েই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট জনসাধারণকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতাও অত্যাবশ্যক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গবর্ন্মেণ্ট ও জনসাধারণের সহযোগিতার পরিমাণের উপরই ইহার সাফল্য নির্ভর করিবে।"

ফসলবৃদ্ধি-আন্দোলন যে প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে তাহার ফল দেখিয়াই উহা বুঝা যাইতেছে। সমবায় সমিতির পুনর্গঠন করিয়া কৃষকগণকে পর্যাপ্ত ঋণ, বীজশস্য, সার প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা না করিলে শুধু বিজ্ঞাপন দিয়া ফসল উৎপাদন বাড়ানো যায় না। এই সব দিক দিয়া কৃষকগণকে কতখানি সাহায্য করা হইয়াছে তাহার কোন বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। প্রদত্ত কৃষিঋণের পরিমাণও পর্যাপ্ত নহে। ফসলবৃদ্ধির গত আন্দোলন ব্যর্থ হইবার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া একান্ত আবশ্যক। ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে জনসাধারণের সহযোগিতার প্রশ্ন বড় নহে এই জন্য যে ফসলের বর্দ্ধিত মূল্যই তাহাদিগকে অধিক জমি চাষ করিতে উদ্বুদ্ধ করিবে। গত বৎসর অপেক্ষা এবার ফসলের দাম বাড়িবে জানিয়াও কেন তাহারা চাষ বাড়াইতে পারে নাই, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাহারা বাধা পাইয়াছে, সরকার তাহাদিগকে কার্যক্ষেত্রে কতখানি সাহায্য করিয়াছেন দেশবাসীর ইহা জানা দরকার।

দ্বিতীয় সমস্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য এই যে, মালগাড়ী কম দিয়া, লরী বন্ধ করিয়া এবং নৌকা আটকাইয়া রাখিয়া একমাত্র গরুর গাড়ীর সাহায্যে গবর্ন্মেণ্ট ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে 'প্রয়োজনানুসারে' ফসল সরবরাহ কিরূপে সম্ভব বলিয়া মনে করেন?

—

জাহাজ নাই কাহার দোষে?

বিদেশ হইতে চাউল আনিয়া দেশে চাউলের অভাব মিটাইবার অসুবিধা সম্পর্কে বাণিজ্য-সচিব বলিয়াছেন,

"চাউল আমদানী কঠিন, কারণ ভারতের নিকটবর্ত্তী যে-সব দেশে চাউল উৎপন্ন হইত তাহাদের অধিকাংশই শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। ব্রেজিলে কিছু উদ্বৃত্ত চাউল আছে। কিন্তু জাহাজের অভাবে সেখান হইতে চাউল আনা সম্ভব হইতেছে না। অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচুর গম আছে এবং উহার দামও সস্তা। এক্ষেত্রেও জাহাজের অভাবে অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রচুর পরিমাণে গম আনা যাইতেছে না।"

জাহাজের অভাব ঘটিয়াছে কাহার দোষে? ভারতবর্ষে লোহা আছে, কাঠ আছে, কারিগর আছে, মূলধন তুলিবার উপযুক্ত লোক এবং টাকা আছে, তথাপি এ দেশের লোক জাহাজের অভাবে অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে থাকিতে বাধ্য হইতেছে কাহাদের স্বার্থান্ধ কার্য্যের ফলে—বাণিজ্য-সচিব এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন?

—

বণিক্‌সমিতি কর্ত্তৃক দোকান খোলার প্রস্তাব

শ্রীবৈজনাথ বাজোরিয়া বণিক্‌সমিতি-সমূহের উপরোক্ত সভায় এই প্রস্তাবটি করিয়াছেন,

"অতিলাভ বন্ধ করিতে হইলে বণিকসমিতি-সমূহকে শহরের বিভিন্ন স্থানে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের জন্য দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া একান্ত আবশ্যক।"

বাণিজ্য-সচিবও স্বীকার করিয়াছেন যে এইরূপ দোকান খুলিবার অনুমতি লাভের প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত। এই যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব এত দিন কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই কেন? যেখানে বণিক্‌সমিতি-সমূহ দায়িত্ব ও কার্য্যভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, সেখানে গবর্ন্মেণ্টের অনুমতি দানে কি বাধা থাকিতে পারে? আমলাতন্ত্রের লাল ফিতা কি এই অতি প্রয়োজনীয় এবং প্রার্থিত কার্য্যেও অন্তরায় সৃষ্টি করিবে?

—

মেদিনীপুর আর্ত্তত্রাণে চিয়াং-দম্পতির দান

মার্শাল ও মাদাম চিয়াং কাই-শেক মেদিনীপুরের আর্ত্তত্রাণের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্বে বিশ্বভারতীতে তাঁহারা লক্ষ টাকা দিয়াছেন। পাঁচ বৎসরাধিক কাল যুদ্ধরত দরিদ্র চীনের রাষ্ট্রনায়কের এই মহানুভবতা ভারতবাসীর স্মৃতিপটে চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। মেদিনীপুরের তমলুক ও কাঁথির বিপদে চীনের সাহায্যের একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। বর্ত্তমান তমলুক প্রাচীন যুগে তাম্রলিপ্তি বন্দর ছিল। চীনা পর্য্যটকেরা উত্তর-পশ্চিমের স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিয়া দেশ ভ্রমণ সমাপ্ত করিবার পর তাম্রলিপ্তি বন্দর হইতে জাহাজে উঠিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তি হইতেই চীনে ফিরিয়া যান।

—

খুচরা মুদ্রার অভাব

খুচরা মুদ্রার মধ্যে এত দিন পয়সার অভাবই তীব্র

ভাবে অনুভূত হইতেছিল। গবর্মেণ্ট এই অসুবিধা দূর করিতে অক্ষম হইয়া একটি প্রেস নোটে দেশবাসীর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নীরব হইয়া ছিলেন। ইহার কিছু দিন পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে অকস্মাৎ আধ-আনি, এক আনি ও দুয়ানি পর্য্যন্ত খুচরা মুদ্রাগুলি যেন উবিয়া গিয়াছে। পয়সাগুলি লোকে তামার লোভে সংগ্রহ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে, কিন্তু আধ-আনি, এক আনি প্রভৃতি লোকে সংগ্রহ করিবে কিসের লোভে? ধাতুর লোভে হইলে তো আধুলি সিকি প্রভৃতিরই আগে অন্তর্হিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। এক টাকার নোট প্রচারের পূর্বে দশ টাকার নোট ভাঙানো যেরূপ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, বর্তমানেও ঠিক সেই অবস্থাই আসিয়া পৌছিতেছে, এক টাকার নোটে এক আনা ও পাঁচ টাকার নোটে পাঁচ আনা বাট্টা অনেক স্থলেই দিতে হইতেছে। ইহাকে অনায়াসে ইনফ্লেশনের ফল নোটের উপর প্রিমিয়াম বলা চলে।

ভারতবর্ষ হইতে ধারে মাল আমদানী করিয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট উহার মূল্যবাবদ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ষ্টার্লিং সিকিউরিটি জমা করিয়া দিতেছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার জোরে প্রতি সপ্তাহে কোটি কোটি টাকার নোট বাড়াইয়া চলিয়াছেন, কিন্তু উহার উপযুক্ত খুচরা মুদ্রা বাহির করিতে পারিতেছেন না। ইহার ফলে বর্ত্তমান মুদ্রা-সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী।

ভারতবর্ষে যে-হারে ইনফ্লেশন চলিয়াছে তাহা বন্ধ করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে হয়ত শীঘ্রই এক পয়সার জিনিসের দাম এক টাকা দেখিতে হইতে পারে।

—

চাউল ও বস্ত্র লুণ্ঠন

সংবাদপত্রের নিষ্পেষিত ক্ষীণ কণ্ঠ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে চাউল ও বস্ত্র লুণ্ঠনের যে-সব সংবাদ আসিতেছে তাহা বস্তুতঃই আশঙ্কার বিষয়। নূতন ধান উঠিবার পর সাধারণতঃ যে চাউলের দর পাঁচ টাকা মণ থাকে, এখনও তাহা চৌদ্দ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। বৎসরান্তে এবার চাউলের দর ত্রিশ টাকার কোঠায় পৌছিলেও অবাক হইবার কারণ থাকিবে না। বস্ত্রের অবস্থাও সঙ্গীন। ষ্টাণ্ডার্ড ক্লথের বিজ্ঞাপন চলিতেছে, বাহির হইলেও উহার কয় জোড়া বাজারে আসিবে তাহাও দ্রষ্টব্য। চাউল ও গমের ব্যাপারে গবর্মেণ্ট বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই; বস্ত্র-সমস্যা সমাধানেও যে তাঁহারা উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে পারিবেন এতটা ভরসা দেশবাসী আর করিতে পারিতেছে না। চাউল ও বস্ত্র লুণ্ঠন এবং চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি বন্ধ করিবার জন্য সৈন্য পুলিসের উপর নির্ভর করা বৃথা। ইহার অর্থনৈতিক সমাধান করিতে না পারিলে কঠোর দণ্ড সত্ত্বেও এই সব চুরি ডাকাতি বন্ধ হইবে না, এবং গ্রামাঞ্চলে শান্তিরক্ষা কঠিন হইয়া উঠিতে পারে।

—

কলিকাতায় বিমান হানা

ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে কলিকাতায় পাঁচ বার বিমান আক্রমণ হইয়াছে। কলিকাতায় বিমান আক্রমণ যে অনিশ্চিত সম্ভাবনা মাত্র নহে, এক বৎসর পুর্বেই গবর্মেণ্ট তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং বিমান-আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ও করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যকালে বোমারু বিমান-পোত পৌছিবার পর দেখা গেল তাহাদের তোড়জোড়ে অনেক গলদ আছে। বিমান আক্রমণ ঘটিলে শহরের অপ্রয়োজনীয় লোক যাহাতে ধীরে ধীরে সুশৃঙ্খলভাবে সরিয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া জনসাধারণকে যে-সব আশ্বাস গত এক বৎসর ধরিয়া দেওয়া হইয়াছিল, বোমা পড়িবার পর তাহা রক্ষিত হয় নাই। এক বৎসর পূর্বে শহরত্যাগকারী ব্যক্তিগণকে অস্থায়ী আশ্রয় দিবার জন্য বাঁশের চালাঘর শহর হইতে দূরে নিরাপদ স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল, বোমা পড়িবার পর সেগুলি কাজে লাগিয়াছে কি না তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। শুক্লপক্ষ আসিয়াছে, পুনরায় বোমা পড়িবার সম্ভাবনাও বাস্তব হইয়া উঠিতেছে। এবারও হয়ত কিছু লোক চলিয়া যাইতে পারে। গত পনরো দিন সময়ের মধ্যে বাঙ্গালা সরকার কলিকাতা-ত্যাগকারী ব্যক্তিদের জন্য কি করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার করিয়া তাঁহারা এখনও জানান নাই।

শহরে যাহারা রহিয়াছে এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম্ম চালাইবার জন্য যাহাদের থাকা একান্ত প্রয়োজন, তাহাদের অন্নবস্ত্র প্রাপ্তির কোন সুবন্দোবস্তও বাঙ্গালা সরকার করিতে পারেন নাই। পাঁচ সের করিয়া চাউল দিবার জন্য গোটাকয়েক দোকান খুলিয়া কয়েক দিন চালাইবার পর সেগুলিও আর দেখা যাইতেছে না। কলকারখানা অথবা সরকারী আফিসে যাহারা কাজ করে তাহাদিগকে বাজার হইতে কম দামে খাদ্যদ্রব্য দেওয়ার ব্যবস্থা কতকটা হইয়াছে, কিন্তু ঐ দুই পর্য্যায়ে পড়ে না অথচ নাগরিক জীবনযাত্রায় যাহাদিগকে

অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন এরূপ লোকও তো আছে। মুটে, ঠেলাওয়ালা, রিক্সওয়ালা, দোকানদার, হোটেলওয়ালা প্রভৃতিকে বাদ দিয়া এক দিনও চলা যায় না। ইহাদিগকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের কি ব্যবস্থা হইয়াছে? একজন মুটেকে যদি এক পোয়া আটার জন্য পাঁচ-ছয় ঘণ্টা সারিতে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়, সে কাজ করিবে কখন? সরকারী দোকান সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, বণিক-সমিতিগুলি দোকান খুলিবার অনুমতি চাহিয়াও তাহা পান নাই। অন্নবস্ত্র ও ভাত রাঁধিবার কয়লা যেখানে দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে, লোকে সেখানে ভরসা করিয়া থাকিতে পারে না ইহা স্বাভাবিক নিয়ম।

বিমান আক্রমণের পর কলিকাতায় দুর্মূল্য জিনিসপত্র আরও দুর্মূল্য হইয়াছে ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগ নির্লজ্জভাবে নিজেদের ব্যর্থতার জের টানিয়াই চলিয়াছেন। এই অসহ্য অবস্থার প্রতীকারের জন্য বণিকসমিতিগুলির সহযোগিতা গ্রহণ করা অথবা দেশের জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই কার্য্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। সাইরেণ বাজিবার পর আশ্রয়প্রার্থীর মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দেয় এরূপ সঙ্কীর্ণচিত্ত স্বার্থপর যেমন আছে, আপনার জীবন বিপন্ন করিয়া দেশবাসীকে সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত এমন লোকও তেমনি অনেক আছে। কিন্তু ইঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিবার কোন আগ্রহ বা চেষ্টা গবর্ন্মেণ্টের দেখা যায় না। বিমান আক্রমণের পূর্বে ও পরে ব্যবস্থা অবলম্বনের সমস্ত প্রয়াসটিকেই তাঁহারা যেন সরকারী লাল ফিতা দিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিতে চান। বিমান আক্রমণের পর পনরো দিন অতিবাহিত হইল, সরকার এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটিবারও নাগরিকদের ডাকিয়া তাহাদের প্রকৃত প্রতিনিধিবর্গের সহিত প্রকাশ্যে পরামর্শ করিয়া ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের প্রয়োজনমাত্র অনুভব করিলেন না।

—

বিমান আক্রমণের সংবাদ সেন্সর

বিমান আক্রমণের সংবাদ সেন্সর শুধু নয়, সাধারণভাবে যুদ্ধের সংবাদ সেন্সরেই গুরুতর গলদ ধরা পড়িতেছে। ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রিতে যে বিমান আক্রমণ হইয়াছিল, সরকার নিজেই যাহা বেপরোয়া বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, পরদিন সংবাদপত্রে তাহার সম্বন্ধে একটি ছত্রও প্রকাশিত হয় নাই। রাত্রিতে বিমান আক্রমণ হইয়াছে—শুধু এই সংবাদটুকু ছাপাইবার অনুমতি কোন কোন পত্রিকা চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাও তাঁহারা পান নাই। প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনার সংবাদ প্রকাশে অহেতুক বিলম্ব গুজবসৃষ্টিতে কতখানি সহায়তা করে, ইহা বুঝিবার বুদ্ধিটুকু পর্য্যন্ত যে-সব কর্ম্মচারীর নাই তাহাদিগকে সেন্সরের দায়িত্বপূর্ণ পদে বজায় রাখিয়া গবর্ন্মেণ্ট নিজেকেই জনসাধারণের চোখে খেলো করিয়া তোলেন।

এই সেন্সরদের নির্বুদ্ধিতার ও অদূরদর্শিতার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখা গিয়াছে ৮ই জানুয়ারী প্রকাশিত বঙ্গোপসাগরের একটি ঘটনার বিবরণ প্রকাশে। ঘটনাটি এই—বঙ্গোপসাগরে একটি জাপানী ব্যাট্‌ল্‌শিপ, একটি বিমানপোতবাহী জাহাজ, একটি ক্রুজার ও দুইটি ডেষ্ট্রয়ার একটি বাণিজ্য-জাহাজকে ঘিরিয়া ফেলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। ভারতীয় বিমানবাহিনীর রিজার্ভ ভলাণ্টিয়ার দলের দুই ব্যক্তি একটি এরোপ্লেনে চড়িয়া ইহা দেখিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া চলিয়া আসিয়া যথারীতি উহা রিপোর্ট করিয়াছে। কবে এই ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার কোন উল্লেখ নাই। উপরোক্ত নৌবহর, বিশেষতঃ বিমানপোতবাহী জাহাজটি বঙ্গোপসাগরে এখনও রহিয়াছে কি না তাহার সম্বন্ধে একটি কথাও নাই। আসাম কিংবা মণিপুরের পথে ব্রহ্ম আক্রমণ না করিয়া জেনারেল ওয়াভেলের বাহিনী আরাকানের ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়ায় অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল যে বঙ্গোপসাগরে নিশ্চয়ই ব্রিটিশ নৌবহর আধিপত্য লাভ করিয়াছে, নতুবা উপকূলবর্ত্তী পথ ধরিয়া সৈন্যদল অগ্রসর হইবে কেন? ইহাতে জাপ-অভিযান সম্বন্ধে অনেকেই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেন্সর দুইটি কর্ম্মচারীর কৃতিত্ব জাহির করিবার জন্য উপরোক্ত সংবাদটি ঘটনার তারিখ না দিয়া প্রকাশ করিতে দেওয়ায় জনসাধারণের পক্ষে ইহাই মনে করা স্বাভাবিক যে বঙ্গোপসাগরে জাপানই এখনও প্রবল, এই কারণে উপকূলের পথ ধরিয়া ওয়াভেলের বাহিনী অগ্রসর হইতে পারিতেছে না এবং বিমানপোতবাহী জাহাজ হইতে কলিকাতায় আরও তীব্রভাবে বোমা বর্ষিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, এমন কি জাপ-অভিযানের আশঙ্কাও অমূলক নহে।

গবর্ন্মেণ্ট এ সম্বন্ধে সরকারীভাবে কোন বিবৃতিই বা প্রকাশ করিতেছে না কেন? উপরোক্ত সংবাদটি যাহারা প্রচার করাইয়াছে তাহাদিগের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে গবর্ন্মেণ্টের সম্মান কমিবে না, বরং বাড়িবে। প্রেষ্টিজ বাঁচাইবার জন্য অযোগ্য

কর্মচারীকে প্রশ্রয় দিলে সরকারের উপর জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস শিথিল হইয়া যায়।

—

কলিকাতায় ৭ই পৌষ উৎসব

মহর্ষির দীক্ষার দিন, ৭ই পৌষ, বাংলার জাতীয় ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ। শান্তিনিকেতনে এই দিনে উৎসব হইয়া থাকে, কিন্তু কলিকাতায় হয় না। এ বৎসর ভবানীপুর ব্রাহ্ম যুব সমিতির উদ্যোগে ঐ তারিখে একটি সভায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও সাধনা এবং বাংলার ইতিহাসে ৭ই পৌষ তারিখের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। পর পর তিন রাত্রি বোমা বর্ষণের পরেও সভা স্থগিত করা হয় নাই এবং মহর্ষির অনেক ভক্ত ৭ই পৌষ বুধবার সন্ধ্যায় সভাক্ষেত্রে সমবেত হন। বাঁশবেড়িয়ার রায় ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় নিজ অভিজ্ঞতা হইতে মহর্ষির স্মৃতিকথা বিবৃত করেন। প্রচারক শ্রীযুক্ত সুব্ব কৃষ্ণায়া কিছু বলেন। সভাপতি অধ্যাপক কালিদাস নাগ মানুষ দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এবং দেখাইয়া দেন যে মহর্ষির ব্রাহ্ম আন্দোলন সর্ব ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। উত্তর-ভারতের আর্য্য সমাজ, পশ্চিম-ভারতের প্রার্থনা সমাজ এবং দক্ষিণ-ভারতের বেদ সমাজ সমানভাবে মহর্ষিকে শ্রদ্ধা করিয়াছেন, তাঁহার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রেরণা লইয়াছেন। ৭ই পৌষ ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মহর্ষি তাঁহার জীবন ভারতবাসী ও বিশ্বমানবের কল্যাণে উৎসর্গ করেন। মনুষ্যত্ব গঠনে, জাতি গঠনে ও সমাজ গঠনে ধর্মের স্থান মহর্ষি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণী অন্তরে গ্রহণ করিয়া সেই সত্যকে তিনি দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন। প্রায় শতাব্দীব্যাপী তাঁহার দীর্ঘ জীবন বাঙ্গালার ও ভারতের জাতীয় ইতিহাসের উপর যে আলোকপাত করিয়াছে—তাহা লইয়া গবেষণা চলিতেছে, ডাঃ নাগ ইহা শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে জানাইয়া দেন। আগামী বৎসর মহর্ষির দীক্ষার শতবার্ষিকী পূর্ণ হইবে। তদুপলক্ষে কলিকাতাতেও উপযুক্তভাবে উৎসবের আয়োজন করিবার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করেন।

—

ভারতে শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার

গত ডিসেম্বর মাসে ইন্দোরে নিখিল-ভারত শিক্ষা-সম্মেলনের সভাপতিরূপে মাননীয় এম. আর. জয়াকর একটি জ্ঞানগর্ভ ও চিন্তাপূর্ণ অভিভাষণ দিয়াছিলেন। যাঁহারা ভারতের ভবিষ্যতের মঙ্গল চিন্তা করেন, উক্ত অভিভাষণ তাঁহাদের প্রণিধানযোগ্য। প্রথমেই তিনি তীব্র ভাষায় গবর্মেণ্ট বর্তমানে শিক্ষা সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, সরকার শিক্ষার ব্যয়-সংকোচ করিয়া, সামরিক উদ্দেশ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অধিকার করিয়া এবং অন্যান্য প্রকারে শিক্ষা বিস্তারে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছেন। ব্রিটেন ও চীন কেমন করিয়া নানা দুরূহ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও শিক্ষার প্রসার করিয়া চলিতেছে সে বিষয়ে তিনি কর্তৃপক্ষের এবং ভারতীয় জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ভারতবর্ষের শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সমস্যাই ডাঃ জয়াকরের বক্তৃতার প্রধান অংশ। তিনি দেশের জনসাধারণের জন্য অধিকতর ব্যাপক ও অধিকতর ত্রুটিহীন শিক্ষাপদ্ধতির পরিকল্পনার আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শিক্ষাপ্রণালী এমন হইবে যে তাহা স্বাধীনতা, সত্য ও সুন্দরের জন্য জ্বলন্ত বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে,—যাহা জাতীয় শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। ডাঃ জয়াকর দেশবাসীকে উদ্দেশ করিয়া বলেন যে, তাঁহাদিগকে এই দুর্গম সংকট পথে যাত্রা করিবার পূর্বে স্থির করিতে হইবে তাঁহারা ভবিষ্যতে কি প্রকার সমাজ গঠন করিতে চলিয়াছেন, তাঁহারা কোন্ সামাজিক আদর্শ তথায় প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাঁহারা বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তে সর্বসম্প্রদায়ের পারস্পরিক কল্যাণ সাধন করিবে এমন কোন সমন্বয়পূর্ণ উদার পদ্ধতির উদ্ভাবনে উদ্যোগী হইয়াছেন কি না, কিংবা তাঁহারা সাধারণের কল্যাণের কথা ভুলিয়া ব্যক্তিবিশেষ ও সম্প্রদায়বিশেষের কথা ভাবিতেছেন? এই সময়ে তাঁহাদিগকে অবশ্যই ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং তাহার উপরই ভিত্তি করিয়া শিক্ষাপদ্ধতির পরিকল্পনা করিতে হইবে। বর্তমান ভারতের যে সকল সংস্কার প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে নিবদ্ধ আছে, তাহা এই যে, প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে স্বাধীন করিয়া তোলা; স্বাধীনভাবে বিচার করিতে ও বিশ্বাস করিতে সক্ষম করা; ধ্যান-ধারণায় ও নিষ্ঠায় স্বাধীন করিয়া তোলা এবং আত্ম-বিকাশে ও আত্মানুভূতির প্রকাশে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা। সেই শিক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্রের কঠোর বিধিনিষেধ এবং রাজনীতি-

অন্ধ বা ধর্মান্ধ নেতাদের গোঁড়ামি দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইবে না। সাধারণের যে-ধারণা, যে যুদ্ধের সময় শিক্ষাপদ্ধতির পরিকল্পনা কেন, কোন সংগঠন কার্যই সম্ভব নয়, ডাঃ জয়াকর ইহা বিশ্বাস করেন না। তাঁহার মতে যুদ্ধের সময়েই শিক্ষা-প্রণালীর ও শিক্ষা-প্রসারের এবং অন্যান্য বিষয় সংস্কারের প্রকৃষ্ট সময়। যুদ্ধকালীন উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে স্বতঃই সমগ্র মানবজাতির অন্তরাত্মায় জরাজীর্ণ সমাজের পুঞ্জীভূত অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে আলোড়ন চলিতে থাকে, তাহারই ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে তাহারা পুরাতন শিক্ষা-প্রণালী পরিবর্তন ও পরিবর্জন করিয়া শিক্ষা-প্রসারের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে। এই যুদ্ধ সমস্ত দেশে সকল প্রতিষ্ঠানেই সংস্কারের একটা প্রবল নাড়া দিবে। এই বিপুল পরিবর্তনের হাত হইতে ভারতবর্ষও নিষ্কৃতি পাইবে না; এবং আসন্ন নবযুগের দাবী পূরণ করিতে হইলে শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কার দ্বারাই তাহা অধিকতর সফল করা সম্ভব হইবে। তাঁহার মতে এ সমস্যার সমাধান আরও শীঘ্র এবং সহজেই হইতে পারিত যদি গবর্মেণ্ট যথাসময়ে ভারতের যুবকদের দেশরক্ষার আহ্বান গ্রহণ করিতেন। শিক্ষা-বিষয়ে গবর্মেণ্ট কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া ভারতবর্ষের নেতাগণও যে চুপ করিয়া থাকিবেন, ইহা সঙ্গত হইবে না। অধিকন্তু, গবর্মেণ্ট কর্তব্য অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া দেশ-নেতাদিগকে হারান সময় ও সুযোগের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য চতুর্গুণ উৎসাহে তাঁহাদের শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে।

—

মিঃ হ্যাডোর বক্তৃতা

গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার ফেডারেশন অফ দি এ্যাসোসিয়েটেড চেম্বারস্ অফ কমার্স-এর বাৎসরিক সভার অধিবেশনে মিঃ হ্যাডো তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ-কালে বলেন: ভারতে থাকিয়া ভারতবাসীদের মঙ্গল-সাধন করা এবং তাহাদিগকে কৃষি ও শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করাই ভারতে ব্রিটিশ জাতির অভিপ্রায়। ব্রিটিশেরা যাহা ভারতে দাবী করে তাহা এই যে ভারতীয়গণ ব্রিটেনে যেরূপ ব্যবহার পায়, ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই তাহারা ভারতে প্রত্যাশা করে। আমি আমার ভারতীয় বন্ধুদিগের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, এই সকল দাবী কোনমতেই সিংহল, পূর্ব্ব- ও দক্ষিণ- আফ্রিকা এবং বর্ম্মাদেশের নিকট ভারতীয়দের দাবীর চেয়ে গুরুভার দাবী নহে। মিঃ হ্যাডো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই দেশে কায়েমী স্বার্থ ও সুবিধা অটুট ও অক্ষুণ্ন রাখিবার নামে যে সকল অজুহাত দেখাইয়াছেন, ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বারস অফ কমার্সের সভাপতি মিঃ জি. এল্. মেহটা সম্প্রতি তাহার যথোচিত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। পারস্পরিক আদান-প্রদান-নীতির সুযোগ গ্রহণের জন্য ভারত-বাসিগণ ক্লাইড নদের তীরে জাহাজ-শিল্প নির্ম্মাণ করিতে চায় না, শেফিল্ডে লৌহের কারখানা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করে না এবং ল্যাঙ্কাশায়ারে বস্ত্রশিল্পও প্রসার করিতে প্রয়াসী নয়। বর্তমানে যে-সকল অনধিকার দাবী ও অন্যায় সুযোগ ব্রিটেন ভারতে ভোগ করিতেছে, তাহা রক্ষা করিবার জন্য এবং ভবিষ্যতে এই সকল সুযোগ যাহাতে রহিত না হয় সেই উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থের সমর্থকগণ 'বিভেদন' ও 'বণ্টনে'র কথা তুলিয়া সমস্ত ব্যাপারটিকে ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। সমস্ত স্বাধীন দেশেই যেমন হইয়া থাকে, স্বাধীন ভারতেও সেইরূপ জাতীয় স্বার্থই আদর্শ লক্ষ্য হইবে। গান্ধীজী একবার বলিয়াছিলেন যে বর্তমানের মতই স্বায়ত্ত-শাসনাধীন ভারতেও ইউরোপীয় স্বার্থ নিরাপদ থাকিবে। কিন্তু কোন শ্রেষ্ঠতর জাতির জন্য বিশেষ সর্ত্তও অন্যায়ভাবে লাভ করিবার সুবিধা থাকিবে না। বন্ধু বলিতে যাহা বুঝায়, ইংরাজগণ সেইরূপ বন্ধু হিসাবে কিন্তু শাসক হিসাবে নয়—বাস করিতে পারিবে।

ইহা সুবিদিত যে এই সকল স্বার্থান্ধগণ যেমন ভারতে শাসনপ্রণালীর ক্রমবিকাশে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে বাধা দান করিয়াছে তেমনি শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপারেও আমাদের দেশের অর্থে নির্লজ্জভাবে নিজেদের আত্মস্ফীতি করিয়াছে। মিঃ মেহ্টা বলেন যে ইলবার্ট বিলের যুগ হইতে ক্রীপস-আলোচনার যুগ পর্য্যন্ত তাহারা ভারতে উদার জাতীয় স্বার্থের জন্য বা স্বাধীন ও সমানাধিকার সর্ত্তে ভারতে ইঙ্গ-ভারতীয় আপোষ-রফার জন্য কখনও আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, বরং তাহারা তাহাদের কায়েমী-স্বার্থ ও সাম্প্রদায়িক অধিকার বজায় রাখিতেই ব্যস্ত। আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার আড়ালে থাকিয়া তাহারা বরাবর ভারতবর্ষে শাসনপ্রণালীর অগ্রগতির পথ রোধ করিয়াছে, অত্যাচার ও উৎপীড়ন সমর্থন করিয়াছে, এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিকট প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রকার অবাধ ও অন্যায় ব্যবস্থার অবসান অবশ্যম্ভাবী।

—

স্বাধীনতার দাবী

গত ২রা জানুয়ারী তারিখে আগ্রায় ইণ্ডিয়ান পলিটি-ক্যাল সায়েন্স কংগ্রেসের উদ্বোধন বক্তৃতা কালে মাননীয় পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ অধীনতার মর্য্যাদা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। ভবিষ্যতে ইংলণ্ড ও অন্যান্য স্বাধীন দেশের সহিত সম্মিলিত ভাবে সমান অধিকার লইয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন-রাষ্ট্র হইতে আশা করে। ইহা অপেক্ষা কোন হীন মর্য্যাদা তাহার দেশবাসী স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবে না। ডাঃ কুঞ্জরু বলেন যে গত যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন-সকলের মর্য্যাদা যুদ্ধের পরে সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধের পরেও যে সকল নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহার ফলে যে গ্রেট ব্রিটেন ও তাহার ডোমিনিয়নগুলির মধ্যে শাসন-সম্পর্কের বিস্তৃত পরিবর্তন হইবে ইহাও নিশ্চিত। ডাঃ কুঞ্জরু তাই বলেন যে যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষও সেরূপ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা ব্যতীত সন্তুষ্ট হইবে না। গ্রেট ব্রিটেন ও পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে সমানাধিকারের মর্য্যাদাই ভারতবর্ষ দাবী করে। পৃথিবীর শান্তির জন্য গণতান্ত্রিক দেশসমূহ স্বেচ্ছায় যে ত্যাগ স্বীকার করে, সেই সকল ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত ভারতবর্ষ তাহার রাষ্ট্রীয় শক্তির উপর আর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ বা বিধিনিষিধ প্রয়োগে সম্মত হইবে না। কারণ সমষ্টির নিরাপত্তার জন্য যে কার্য্যকরী আন্তর্জাতিক বিধান, তাহা ভারতবাসী বিশ্বাস করে। সুতরাং ইংলণ্ড ও অন্যান্য স্বাধীন দেশের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা অপেক্ষা হীন মর্য্যাদা ভারত-বাসীদের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর মতে ব্রিটেন কর্তৃক ভারতবর্ষের এই মর্য্যাদার সরল স্বীকৃতির উপরই ভবিষ্যৎ ইঙ্গ-ব্রিটিশ সম্পর্ক বিবেচিত হইবে।

—

ভারতীয় রাজনীতি বিজ্ঞান সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

আগ্রায় ভারতীয় রাজনীতি বিজ্ঞান সম্মেলনের অধিবেশনে (Indian Political Science Conference) আমেদাবাদের এইচ. এল. কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ গুরুমুখ নিহাল সিং সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে মুসলীম জাতীয়তার উৎপত্তি ও প্রসার, মুসলীম লীগ গঠন, মিঃ জিন্নার দ্বি-জাতি বিধানের ঘোষণা এবং সুদেতান (Sudetan) নীতির অনুরূপ ভারতবর্ষকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া পাকিস্তান পরিকল্পনার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মিঃ গুরুমুখ নিহাল সিং বলেন যে কংগ্রেস-লীগ চুক্তি একটা বিরাট ভুল। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট যে কেমন করিয়া দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায়কে পৃথক্ করিয়া রাখিবার নীতি অনুসরণ করিতেছেন তাহাও তিনি বর্ণনা করেন। তাঁহার মতে এই বিষয়টি এখন কল্পনার রাজ্য ছাড়াইয়া যুক্তি-বিচারবর্জ্জিত খেয়ালের রাজ্যে আসিয়া পৌছিয়াছে। তিনি বলেন যে জাতীয়তা বলিতে প্রধানতঃ বুঝায় একত্রে বাস করিবার আগ্রহ, নিজেদের এক মনে করা এবং নিজেদের অন্যের হইতে পৃথক্ করিয়া এবং বিশেষ করিয়া বুঝিতে সক্ষম হওয়া। অন্যান্য কারণের মধ্যে সংহতি, ঐক্য বা একতা; সংক্ষেপে ইহাকেই জাতীয়তা বলা হয়। কিন্তু তিনি মনে করেন ইহাদের মধ্যে কোনটাই অত্যাবশ্যক নয়। ভারতীয় মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি এই বাসনা জাগিয়া থাকে, যে তাহারা একটি স্বতন্ত্র জাতি, তাহা হইলে অন্যের কোন বাধা-বিঘ্নই তাহাদিগকে পৃথক্ জাতি হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। বরং বিঘ্নই তাঁহার মতে তাহাদিগকে সফলতার পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে এবং শীঘ্রই তাহাদিগকে কৃতকার্য্য করিবে। তিনি বলেন, ইহাও সত্য যে সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনানুসারে এবং পরিস্থিতির অবস্থানুযায়ী ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট মত পরিবর্তন করিতেছে। দেশবাসীদের একতা এবং তৎসহ একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় বড়লাট যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে আরও অনিশ্চিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। অনেকের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে বৈদেশিক নীতি বিবেচনা করিলে মনে হয়, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট পরিশেষে মুসলীম লীগের পাকিস্তান প্রচেষ্টা ও প্রয়াস সমর্থন করিবে না। তিনি মনে করেন যে, যে-ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল আর ভারত-সচিব মিঃ আমেরী এবং যাহার ক্রীপস-প্রস্তাবে সম্মতি আছে, সেই ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট মুসলীম লীগের উদ্দেশ্য সমর্থন করিবে।

মিঃ গুরুমুখ নিহাল সিং প্রশ্ন করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের জন্য কি আশা করিতে পারা যায়? ইহার উত্তরে তিনি শঙ্কিত চিত্তে বলেন যে তিনি অদূর ভবিষ্যতের জন্য কোন উজ্জ্বল চিত্র বর্ণনা করিতে

পারেন না। আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে অপরিমেয় ক্লেশ ও সংগ্রাম। পশ্চিমে ও পূর্বে—বিশেষ করিয়া পশ্চিমে—পাকিস্তানের সীমা নির্দেশ তুলিয়া দেওয়ার সমস্যা সর্বাপেক্ষা দুরূহ ব্যাপার। এমনও হইতে পারে যে পঞ্জাবের শিখ ও বাংলার হিন্দুদিগকে তথাকথিত 'উপ-জাতি' বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; মুসলমানদিগের মত তাহাদিগকেও হিন্দুস্থানে যোগ দিবার বা পৃথক্ থাকিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে। যাহা হউক, হিন্দুস্থানেই দেশীয় রাজ্য ও তাহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা লইয়া হিন্দুদিগকে গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। তিনি বলেন যে পাকিস্তান মুসলীম লীগের হাতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। তাঁহার মতে হিন্দুস্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণ ও এক আবেষ্টনী বা গণ্ডীর মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর লোকের একত্র সম্মিলনের উপরই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা লইয়া প্রথমে আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই মন্ত্রিসভাকে ধর্মসম্বন্ধীয় সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে; সংখ্যালঘুদের ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের দায়িত্ব মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু জনসাধারণের ব্যাপারে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে, সর্বপ্রকারের অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে হইবে; এবং ব্যক্তিবিশেষের, স্থানবিশেষের ও সম্প্রদায়বিশেষের আইনকানুন ও রাজনীতি মতবাদ পরিহার করিতে হইবে: এবং সর্বশেষে দেশে এক সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিণতি হইবে। তাহার পর পৃথক্ রাষ্ট্রগুলি ফিরিয়া আসিয়া সকলে মিলিয়া এক সর্বভারতীয় সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র গঠন করিবে।

আমাদের মনে হয় ভারতীয় রাজনীতি বিজ্ঞান সম্মেলনের সভাপতি বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ধারণা পোষণ করেন। উদার ও উন্নত মনোবৃত্তিসম্পন্ন মুসলমানগণ যে ইতিপূর্বেই মিঃ জিন্নার মুসলীম লীগ ও পাকিস্তান পরিকল্পনার পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিতেছেন, ইহা তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিবাদও যে কিরূপ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাও তিনি উপযুক্তরূপে বিবেচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধশেষে সমস্ত ফ্যাসিবাদ শক্তির বিরুদ্ধে যে নূতন শক্তির প্রেরণা আসিবে, তাহার প্রভাবও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।

—

সাম্প্রদায়িক বিরোধ হইতে মুক্তিলাভের উপায়

বর্তমানের সাম্প্রদায়িক প্রচারকার্যের ফল যে কিরূপ বিষময় হইয়া উঠিতেছে, মুসলমান সম্প্রদায়ের উদার ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ক্রমেই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। বিশিষ্ট মুসলমান নেতাগণের বিবৃতি ও বক্তৃতাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সাম্প্রদায়িক প্রচারকার্য দেশের এবং স্ব-সম্প্রদায়ের উভয়েরই প্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। নেতাগণ যদি তাঁহাদের প্রতিবাদ কার্যকরী করিতে চান, তবে তাঁহাদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে ইহা করিতে হইবে।

কিছু দিন হইল, বোম্বাই শহরে একটি সভায় সভাপতি ছিলেন, ঐ শহরের শেরিফ মিঃ আর. এ. বেগ। উক্ত সভায় ডাঃ এস. এইচ. কোরেশী 'সাম্প্রদায়িক নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের পথ' প্রসঙ্গে বক্তৃতা প্রদানকালে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন। ডাঃ কোরেশী বলেন যে যেদিন ভাষা, সংস্কৃতি, পুরাণপ্রসূত জাতি-আখ্যান অথবা এমন কি ভৌগোলিক সীমা-নির্দেশের উপর ভিত্তি করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠী-গুলিকে সংগঠিত করা হইত, সেদিন অতীত হইয়াছে। আজ ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, শ্রেণী এবং জাতি সমস্ত কিছুই এক অবিভাজ্য অখণ্ড মানবজাতির মধ্যে মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া যাইতে হইবে। যদি কেহ আজ পৃথিবীর কোন প্রান্তে সরিয়া দাঁড়াইতে চান, তাহা হইলে তিনি এক অতি দুঃখময় নাটকীয় ঘটনার যবনিকাপাত করিবেন। যদি ইহাই ইসলামের নির্দেশ হয় যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মুসলমানগণ ভাষাগত, সংস্কৃতিগত শ্রেণীগত ইতিহাস ও ভৌগোলিক সীমানির্দেশ উপেক্ষা করিয়া পৃথিবীর সকল মুসলমানকে এক মনে করিবে, তাহা হইলে এই সকল কারণকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করা নিশ্চয়ই মুসলমানদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হইবে না। মানুষ তাহার অভিজ্ঞতায় জানিয়াছে যে ধর্ম ও সংস্কৃতি মিলনের দুইটি উপায়। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ধর্ম ও সংস্কৃতিকেই বিরোধ ও বিভেদ সৃষ্টি করিবার কাজে প্রয়োগ করা হইতেছে।

মিঃ বেগ তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বলেন যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা একটি অত্যাবশ্যক সামাজিক সমস্যা। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাই সাম্প্রদায়িক কলহের জন্য দায়ী। সুতরাং যদি দেশে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী স্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। তিনি সকল ভারতবাসীকে

উদ্দেশ করিয়া এই আবেদন করিয়াছেন যে, তাঁহারা যে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত একথা ভুলিয়া গিয়া সকলেই যে সমানভাবে ভারতবাসী এই কথা ভাবিতে হইবে।

—

পঞ্জাবের নবনিযুক্ত প্রধান মন্ত্রী

গত ২৭এ ডিসেম্বর তারিখে মধ্যরাত্রে পঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যর সেকেন্দার হায়াৎ খানের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর মাননীয় মেজর মালিক খিজির হায়াৎ খান তিওয়ানা প্রধান মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইংরেজী ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে যখন নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হয়, সেই সময় হইতেই স্যর সেকেন্দার যোগ্যতার সহিত প্রধান মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পঞ্জাবে সর্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আগ্রহশীল ছিলেন। স্যর সেকেন্দারের মৃত্যুতে পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অন্যান্য মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করেন। পঞ্জাবের গবর্ণর বাহাদুর তখন মেজর খিজির হায়াৎ খাঁকে নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের জন্য আহ্বান করেন। ইনি স্যর সেকেন্দার হায়াৎ খানের মন্ত্রিসভারও অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। প্রকাশ যে, মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর মালিক খিজির খাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে এবং মাননীয় স্যর ছোটু রাম, মাননীয় স্যর মনোহর লাল, মাননীয় মিঞা আবদুল হাই এবং মাননীয় সর্দার বলদেব সিংকে পুনরায় মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। নূতন মন্ত্রী স্যর সেকেন্দারের মন্ত্রীসভায় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এবং পূর্ত্তবিভাগ, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ও দেশরক্ষার দায়িত্ব বহন করিতেন। এই সকল বিভাগের দায়িত্ব লইয়া তিনি এ পর্য্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। সুতরাং তিনি প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্য যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিবেন একথা এখন কাহারও বলা অত্যন্ত কঠিন। তিনি ইংরেজী ১৯০০ সালের আগষ্ট মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

—

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতবর্ষ

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বিলাতে লর্ড মেয়রের ভোজন-সভায় মিঃ উইন্‌স্টন চার্চিল ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গুটাইয়া ফেলার কাজকর্মে কর্তৃত্ব করার জন্য তিনি ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন নাই ("He had not become the King's First Minister to preside over the liquidation of the British Empire")।

আমেরিকা যুক্তরাজ্যে এবং অন্যান্য দেশের অনেক বিখ্যাত ও বিজ্ঞ লেখক ও নেতাগণ আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধ-সংক্রান্ত যে লক্ষ্য ও আদর্শ পূর্বে ঘোষিত হইয়াছে মিষ্টার চার্চিলের এই উক্তি তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই ক্রমবর্দ্ধমান বিরুদ্ধ মনোভাব ব্রিটেনে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই হেতু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ঔপনিবেশ ও অধীনস্থ দেশগুলি সম্পর্কে মিষ্টার চার্চিলের উক্তির সমর্থনের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সমালোচনার ফলে আমেরিকার প্রেসগুলির যে ধারণা হইয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য জেনারেল স্মাট্‌স যুদ্ধোত্তর যুগে সকল দেশের উপনিবেশগুলির অবস্থা আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে যুদ্ধোত্তর কালে মাতৃভূমির সঙ্গে উপনিবেশগুলির শাসন-সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা অবিবেচনার কাজ হইবে। মাতৃভূমি উপনিবেশগুলির শাসন-কার্য্যের জন্য দায়ী হইবে এবং উহাতে অন্যের হস্তক্ষেপ পরিহার করা হইবে। জেনারেল স্মাট্‌স কতকগুলি উপনিবেশ লইয়া স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ-পরিষদ পরিকল্পনার (Regional control councils for groups of colonies) পূর্বাভাষ দেন এবং বলেন যে আমেরিকা যুক্তরাজ্য যদিও ঔপনিবেশিক শক্তি নহে, তথাপি উহা হয় ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ না-হয় আফ্রিকা অথবা অন্য কোন নিয়ন্ত্রণ পরিষদের সহিত সংযুক্ত থাকিতে পারিবে। জেনারেল স্মাট্‌স আরও বলেন যে তিনি নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন যে আমেরিকা যুক্তরাজ্য যদি উক্ত ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ-পরিষদের সভ্য হয় তাহা হইলে, ব্রিটিশ প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে তিনি যত দূর জানেন, তাহাতে মনে হয়, তাহা সাগ্রহে স্বীকৃত হইবে। আমেরিকা যুক্তরাজ্য নিশ্চয়ই জেনারেল স্মাট্‌সের এই প্রলোভনে ভুলিবে না। মিঃ উইণ্ডেল উইলকী বলিয়াছেন যে আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধসংক্রান্ত লক্ষ্য ও আদর্শ যে প্রকৃত কি তাহা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা প্রয়োজন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তিনি বলেন যে যুদ্ধকালে যদি আমরা সাধারণ ঐক্যে মিলিত হইতে না পারি তাহা হইলে যুদ্ধশেষে যে আমাদের অমিল হইবে ইহা অনিবার্য্য। গত ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন এ্যাসোসিয়েশনের একবিংশ বাৎসরিক সভায় অধিবেশনে স্যার পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস ভারত

সম্পর্কে মিঃ চার্চিলের বক্তৃতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত যে কি তাহার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে এত দিন নিঃসন্দেহে যে-ভাবে ভারতীয় সম্পদ ব্রিটেনের স্বার্থ সাধনের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে, আর তাহা হইতে না দেওয়ার দৃঢ় ও নিশ্চিত দাবী করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই নয় যে এই নীতি অনুসৃত হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দেউলিয়া হইবে। যদি কিছু ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যকে দেউলিয়া হইতে সাহায্য করিয়া থাকে ত ইহা তাহাদের দমননীতি, জনসাধারণের প্রতি অবিশ্বাস, এবং তাহাদিগকে স্বাধীনতার সামান্য অধিকার হইতেও বঞ্চিত করা। গ্রেট ব্রিটেনকে শক্তিশালী করিতে হইলে ব্রিটিশ প্রজাতন্ত্রের সর্ব অংশের মধ্যে শুভ ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যেক অংশ যাহাতে নিজেদের জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি নিজেরা করিতে পারে তাহার জন্য তাহাদের হাতে তাহাদের শাসন-ব্যবস্থা ন্যস্ত করা। তিনি বলেন যে, যুদ্ধারম্ভের পর হইতে ভারতে যে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসৃত হইয়াছে, এই প্রকৃত সত্যে যখন মিঃ চার্চিল সজাগ হইবেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিবেন যে ভারতের প্রতি ন্যায় বিচার করিয়া তিনি গ্রেট ব্রিটেন ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথের কত প্রভূত মঙ্গলসাধন করিতে পারিতেন।

—

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দণ্ড

বহরমপুরের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পোলার্ড সাহেব স্থানীয় একজন উকীলকে প্রহার করিবার অভিযোগে সদর মহকুমা হাকিম কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন এবং দুই শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। পোলার্ড সাহেব আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া নিজেকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু আদালতে তাঁহার অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দায়িত্বপূর্ণ পদে এই ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত রাখা সঙ্গত কি না বাংলা-সরকারের পক্ষে তাহা বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীকে কার্য্যে বহাল রাখিয়া পুলিসকে জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা কখনও সফল হইতে পারে না।

—

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুতে 'প্রবাসী' একজন অকৃত্রিম সুহৃদ হারাইয়াছে। গোড়া হইতেই তিনি



ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার

ঘনিষ্ঠভাবে 'প্রবাসী'র সহিত যুক্ত ছিলেন। 'প্রবাসী'র জন্য তিনি বহু রসরচনা লিখিয়াছেন এবং 'প্রবাসী'র পুস্তক-পরিচয় বিভাগের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছেন। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও আইনের উপর তাঁহার সমান দখল ছিল। একসঙ্গে এতগুলি বিভিন্ন বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের দৃষ্টান্ত বিরল। মূল পালি হইতে থেরীগাথা কবিতায় অনুবাদ করিয়া বাংলা-সাহিত্যে একটি নূতন বস্তু তিনি দান করিয়াছেন। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি ভাষায় তাঁহার সমান দখল ছিল। বাংলা ভাষা, নৃতত্ত্ববিদ্যা এবং উড়িষ্যার ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা ভারতীয় সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ্ হইয়া থাকিবে। নৃতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। জীবনের শেষভাগে প্রায় ত্রিশ বৎসর তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ছিল না, কিন্তু দৃষ্টিশক্তিহীনতা তাঁহার জ্ঞানপিপাসা বিন্দুমাত্র কমাইতে পারে নাই। এই সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁহার বিখ্যাত 'উড়িষ্যা ইন দি মেকিং' গ্রন্থখানি প্রধানতঃ বিভিন্ন অনুশাসনলিপি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া রচনা করেন। অনুশাসন-ফলকের উপর হাত বুলাইয়া তিনি উহার পাঠোদ্ধার করিতে পারিতেন। অন্ধ অবস্থায় রচিত তাঁহার উড়িষ্যার ইতিহাস পাঠ করিয়া বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ বার্ণেট বিস্মিত হন এবং রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে সমালোচনা করিয়া উহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। বাংলা-সাহিত্যে এবং বাংলা ভাষার ইতিহাস রচনায় তাঁহার দান অসামান্য। সোনপুর এবং উড়িষ্যার অন্যান্য কয়েকটি রাজ্য তাঁহার নিকট হইতে

নিয়মিত আইনঘটিত উপদেশ গ্রহণ করিত। চল্লিশ বৎসর কাল তিনি সোনপুর রাজ্যের আইন উপদেষ্টার কাজ করিয়াছেন এবং অসুস্থ হইয়া পড়িবার আগের দিনেও তিনি উঁহার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলের খসড়া তৈরি করিয়া দিয়াছিলেন। সোনপুর-রাজ তাঁহাকে শুধু আইন-উপদেষ্টারূপে নহে, ভক্তিভাজন পরমাত্মীয় বলিয়া গণ্য করিতেন। বিরাশী বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁহার স্মৃতিশক্তি অক্ষুণ্ণ ও অটুট ছিল। মৃত্যুর অল্প কয়েক দিন পূর্বের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার স্মৃতিশক্তি কমিয়া যাইতেছে বলিয়া এক দিন অকস্মাৎ তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠেন। তাঁহার আশঙ্কার কারণ, প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে তাঁহার ক্ষৌরকার পনরো দিনের জন্য যাহাকে বদলি দিয়া গিয়াছিল তাহার নাম মনে পড়িতেছে না। ঘণ্টা দুই পরে নামটি মনে পড়িলে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। কোন্ বইয়ের কোন্ পাতায় কি নোট লেখা আছে তাহা তিনি অনর্গল বলিয়া দিতেন। অন্ধ হইয়াও তিনি যে অক্লান্ত ও অবিশ্রান্তভাবে সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করিতে পারিয়াছেন, এই অসাধারণ স্মৃতিশক্তি তাহার একটি প্রধান কারণ। প্রতিভার সহিত স্মৃতিশক্তির এমন সমন্বয় খুব কমই দেখা যায়।

রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধেও তাঁহার চিন্তাধারা স্বচ্ছ ও দূরদর্শিতাপূর্ণ ছিল। স্বদেশী যুগে লিখিত এবং রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার 'ভারত পতাকা' কবিতাটি লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে প্রেরণা দিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি ছত্র হইতে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়:

"ভারতের সকল জাতি না জাগিলে ও প্রাণে প্রাণে গাঁথা না পড়িলে আমাদের আত্মরক্ষা অসম্ভব। এই খাঁটি স্বার্থের কথা যে-শিক্ষায় সকলে মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারে, যে-শিক্ষায় লোকে শিখিতে পারে যে, অত্যাচারী স্বদেশী হোক বা বিদেশী হোক—কাহারও অধিকার নাই যে কাহারও মনুষ্যত্বকে চাপিয়া রাখিবে বা রাষ্ট্রের নামে বা ধর্মের নামে কাহাকেও কোন প্রভাবশালী ধনীর বা পুরোহিত শ্রেণীর গোলাম করিতে পারিবে, সেই শিক্ষার উদ্যোগ না করিলে সকল স্বরাজ লাভের উদ্যোগ ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন মনুষ্য প্রত্যেক ব্যক্তির ভগবদ্দত্ত এই অধিকার আছে যে সে তাহার মনুষ্যত্বকে অক্ষুণ্ণ ভাবে বাড়াইতে পারিবে। যদি এই মন্ত্র অতি অল্প পরিমাণেও মানুষের প্রাণকে অধিকার করে তবে ধীরে ধীরে মানুষের নিজের উন্নতি, দেশের উন্নতি ও স্বরাজ্যলাভ সুলভ হইতে পারে।"

—

মন্মথনাথ বসু

মেদিনীপুরের প্রবীণ জননায়ক মন্মথনাথ বসু মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ঐ জিলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকীলরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর তিনি মেদিনীপুরের বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাংলার সমবায়-আন্দোলনের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি বর্দ্ধমান বিভাগ দক্ষিণ-পশ্চিম নির্বাচন কেন্দ্র মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জিলাদ্বয় হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি মেদিনীপুর হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন।

—

সত্যানন্দ দাস

বরিশালের প্রবীণ শিক্ষাব্রতী ও ধর্মপ্রাণ সত্যানন্দ দাসের মৃত্যু হইয়াছে। আদর্শচরিত্র ও ন্যায়নিষ্ঠার গুণে তিনি বরিশালের জনসাধারণের অনাবিল শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছিলেন। বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের তিনি অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন। তিনি সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত সাধু আগস্তাইনের আত্মকথা বহু জনে আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। ব্রাহ্ম সমাজের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ, নিরহঙ্কার এই সাধকের পরলোক গমনে বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

—

ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের সঙ্কল্প

ভারতীয় সংবাদপত্র-সম্পাদক সম্মেলন প্রাদেশিক সেন্সরদের অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক কড়াকড়ির বিরুদ্ধে বহুবার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং ইহার প্রতিকারের জন্য ভারত-সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। ভারত-সরকার ও প্রাদেশিক সরকার বার বার সংবাদপত্রসমূহের সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু সংবাদ সেন্সর সম্বন্ধে সম্পাদকগণের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন বলিয়া বোধ করেন নাই। তিন বৎসরাধিক কাল বিবিধ কড়াকড়ি সহ্য করিয়া সম্পাদকেরা দেখিয়াছেন যে, যত সহ্য করা যায়

উহা ততই বাড়িতে থাকে। অবশেষে বাধ্য হইয়া বোম্বাইয়ে সম্পাদকগণ এক সম্মেলনে সঙ্কল্প করেন যে ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে ভারত-সরকার তাঁহাদের অভিযোগ শুনিয়া উহার প্রতিকার না করিলে ঐ তারিখ হইতে তাঁহারা ব্রিটিশ মন্ত্রী ও বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যগণের সরকারী বক্তৃতা, নববর্ষের উপাধি-তালিকা, লাট বড়লাটের প্রাসাদের সংবাদ প্রভৃতি ছাপিবেন না। বক্তৃতার মধ্যে যে-সব স্থানে কোন সিদ্ধান্তের ঘোষণা থাকিবে শুধু সেইটুকুই ছাপা হইবে। ঐ সঙ্গে এই সঙ্কল্পও গৃহীত হয় যে ভারতবর্ষের সংবাদপত্রসমূহ ৬ই জানুয়ারী পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ রাখিবেন। মাদ্রাজের হিন্দুর ন্যায় মডারেট পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস এই সম্মেলনের সভাপতি এবং শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া তাঁহাকেই অপ্রিয় ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে হইয়াছে।

এই সঙ্কল্প অনুসারে ১লা জানুয়ারী নববর্ষের উপাধি-তালিকা ভারতের প্রায় এক শত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই এবং ৬ই জানুয়ারী ঐ সমস্ত পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ ছিল। মাদ্রাজে ইহার তীব্র প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। মাদ্রাজের যে-সব পত্রিকায় নববর্ষের উপাধি-তালিকা প্রকাশিত হয় নাই, গবর্মেণ্ট তাহাদের প্রতিনিধিগণকে সরকারী দপ্তরখানায় গিয়া ইস্তাহার, প্রেসনোট প্রভৃতি আনিবার এবং বিমান আক্রমণ হইলে ঘটনাস্থলে গমন করিবার ছাড়পত্র বাতিল করিয়া দিয়াছেন। সরকারী বিজ্ঞাপন তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না বলিয়াও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মাদ্রাজ গবর্মেণ্টের এই অতিশয় অদূরদর্শী ও অন্যায় আদেশ ভারত-সরকার বা ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট আজ পর্য্যন্ত বাতিল করেন নাই, ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। সরকার যে-ভাবে সংবাদ সেন্সর করিয়া চলিয়াছেন তাহার ফলেই লোকে প্রকাশিত সংবাদের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না। নানাবিধ গুজবের সৃষ্টি হইতেছে। 'গুজব রটাইও না', বলিয়া দেওয়ালে পোষ্টার আঁটিয়া গুজব বন্ধ করা যায় না, জনসাধারণকে অধিক পরিমাণে এবং তৎপরতার সহিত সকল সংবাদ জ্ঞাপন করা গুজব বন্ধ করিবার একমাত্র উপায়। যুদ্ধের সময় দেশের আপামর জনসাধারণ যুদ্ধের সকল সংবাদ সঠিকভাবে জানিতে পারিলে গবর্মেণ্টেরই শক্তি বাড়ে। গবর্মেণ্টের যে-সব কার্য্যকলাপ বা গতিবিধির সংবাদ প্রকাশ করা চলে না, লোকে তখন তাহার অর্থ বুঝিতে পারে, উল্টা বুঝিয়া হিতে বিপরীত ঘটিবার আশঙ্কা বা সম্ভাবনা ইহাতে থাকে না। সাধারণের নিকট হইতে সংবাদ চাপিতে থাকিলে লোকে গবর্মেণ্টের প্রতিটি কার্য্যকলাপ সন্দেহের চোখে দেখিতে আরম্ভ করে, সরকারের কথা অবিশ্বাস করিতে শিখে এবং নানারূপ গুজবের সৃষ্টি হইয়া দেশের ক্ষতি হয়। ইহাতে গবর্মেণ্ট এবং দেশবাসী উভয়কেই সমান-ভাবে অসুবিধাগ্রস্ত হইতে হয়। এদেশে সংবাদ সেন্সর, হেডিং সম্বন্ধে কড়াকড়ি, পত্রিকার পাতা এবং মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া প্রভৃতি যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই অনাবশ্যক বলিয়া জনসাধারণ মনে করে।

মাদ্রাজ-সরকার যাহা করিয়াছেন তাহাতে দেশবাসী সরকারের তরফের কথা একেবারেই জানিতে পারিবে না। ইহার ফল দেশবাসীর পক্ষে যত না খারাপ হইবে, সরকারের নিজের পক্ষে হইবে তদপেক্ষা অনেক অধিক। অন্নবস্ত্র-সমস্যা-সমাধানে সরকারের অক্ষমতায় তাঁহাদের উপর জনসাধারণের নির্ভরশীলতা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে, এই সব কড়াকড়িতে তাহা আরও শিথিল হইবে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যে কোন গবর্মেণ্ট সম্পদে বিপদে যে কোনও সময়ে তাঁহাদের উপর জনসাধারণের আস্থা শিথিল হইতে পারে এরূপ কোন কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন।

শ্রেণীস্বার্থ, দীর্ঘসূত্রিতা, অযোগ্যতা ও উৎকোচ-গ্রহণ-প্রবণতা

বিলাতের 'নিউজ রিভিয়্' পত্রিকার সম্পাদক অক্টোবরের এক সংখ্যায় মিঃ চার্চিলের উদ্দেশে লিখিত একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করিয়াছেন। চিঠিখানির আরম্ভ এই :—

প্রিয় মিঃ চার্চিল,—এই দ্বীপপুঞ্জের সাধারণ লোকেরা শঙ্কা ও বিপদের দিনেও আপনার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাবী অমঙ্গলের ঝুঁকি লইয়াও তাহারা আড়াই বৎসর আপনাকে বিশ্বাস করিয়াছে, আপনার

উপর আস্থা রাখিয়াছে। আজ আপনার চরম পরীক্ষার দিন সমাগত। এই শীতেই যুদ্ধের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইয়া যাইতে পারে। আপনার কর্তব্য এবার আপনাকে করিতে হইবে।

ষ্টালিনগ্রাড বীরত্বের যে আদর্শ দেখাইয়াছে, সেই আদর্শে আগামী ছয় মাসের মধ্যে আমাদিগকে স্থির করিতে হইবে জয়লাভ করিয়া আমরা কি করিব। আজ আপনি ইহা না পারিলে পরে আর করিবার সময় থাকিবে না। ছয় মাস। এই ছয় মাসে শ্রেণীস্বার্থ, দীর্ঘসূত্রিতা, ভীরুতা, অযোগ্যতা এবং উৎকোচ-গ্রহণ প্রবণতা আমাদের দেশ হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। ছয় মাসের মধ্যে সকল স্বাধীন মানুষের মন অধিকার করিয়া আমাদিগকে অমরত্ব অর্জন করিতে হইবে। এই দায়িত্ব অতি ভয়ানক; এই সুযোগ বিপুল গরিমায় মণ্ডিত।"*

চিঠির শেষভাগে তিনি লিখিতেছেন:

"১৯৪৩ সালে রাশিয়াকে ফলোপধায়ক সাহায্য দান করিতে হইলে আর সময় নষ্ট করা চলে না। মিঃ চার্চিল, আপনি **এখনই** দৃঢ়সঙ্কল্প সহকারে কার্যে অবতীর্ণ হইলে আমরা জয়ের পথ পরিষ্কার করিতে পারিব। কয়লার অভাব লইয়া দরকষাকষি বন্ধ হউক; উৎপাদন ও চাহিদার সমতা সাধনের জন্য খনিতে আরও লোক পাঠান হউক এবং আমাদের প্রাপ্য কয়লার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হউক। জাহাজের অভাব সম্পর্কে অভিযোগ বন্ধ হউক; আমাদের খাদ্যের পরিমাণ কমানো হউক। জীবনযাত্রার পুরাতন পদ্ধতি বজায় রাখিয়া চলিবার চেষ্টা বন্ধ করুন: কায়েমী স্বার্থের বাধা দূর করুন। সৈন্য, নাবিক ও বিমানবাহিনীর পাইলটকে ভাল বেতন দিন। সরকারী দপ্তরখানায় যে সকল অযোগ্য কর্মচারী নিরাপদ কর্ম সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন তাহাদিগকে পদচ্যুত করুন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দেখি-কি-হয় নীতি পরিত্যাগ করুন।

অবিলম্বে এই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে আমরা জার্মান সামরিক শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য বিরাট আক্রমণ চালাইতে পারিব। কিন্তু এখনও যদি আমরা মন স্থির করিতে না পারি ও দেরী করি তাহা হইলে আগামী ছয় মাসের মধ্যে আমরা এই যুদ্ধে পরাজিতও হইতে পারি।"†

শ্রেণীস্বার্থ, দীর্ঘসূত্রিতা, ভীরুতা, অযোগ্যতা এবং উৎকোচ-গ্রহণ প্রবণতা যুদ্ধজয়ের পথে যে কতখানি অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে, ষ্টালিনগ্রাডের যুদ্ধের পর তাহা বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এই সব দোষ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সংক্রামিত হইলে ক্ষতির পরিমাণ গুরুতর হইয়া উঠে। আমাদের দেশেই এই দোষগুলি দৃষ্টিকটু হইয়া উঠে নাই, খাস বিলাতের অবস্থাও যে ভারতবর্ষ হইতে বেশী ভাল নহে, নিউজ রিভিয়ু সম্পাদকের পত্র হইতে উদ্ধৃত উপরোক্ত অংশ দুইটি তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের কুটীর শিল্প সংগঠন করিয়া, ঘরে ঘরে বহু দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের মোট পরিমাণ অনেক বাড়ানো যাইত। শ্রেণীস্বার্থ-চেতনাসম্পন্ন মিলমালিকদের বাধায় তাহা হইতে পারে নাই। ভারতীয় কাঁচা মাল বিলাতে টানিয়া না আনিয়া উহা হইতে ভারতবর্ষেই শিল্প-দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারিলে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টেরই অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইত, কাঁচা মাল অপেক্ষা শিল্পদ্রব্য বহন করিলে জাহাজের স্থানও অনেক বাঁচিত, কিন্তু বিলাতী কায়েমী স্বার্থের ইহাতে ক্ষতি আছে। ফলে দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে চলিয়াছে কাঁচামাল, উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য নহে এবং ভারতীয় শিল্প পদে পদে ব্যাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। কাগজ আমদানীর অসুবিধার জন্য দেশবাসীকে বঞ্চিত করা হইতেছে কিন্তু আমদানী কাগজের সঙ্গে মাঝে মাঝে কাগজের মিলের যন্ত্রপাতি আনিয়া এদেশে কাগজের মিল প্রতিষ্ঠার বা কুটীরে কাগজ তৈয়ারীতে ব্যাপক উৎসাহ দানের কোন বন্দোবস্ত হইতেছে না। অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধেও এই একই উদাহরণ প্রযোজ্য।

দীর্ঘসূত্রিতা ও সাহসের সহিত বিপদের সম্মুখীন হইবার ক্ষমতার অভাব এবং অযোগ্যতা বহু ক্ষেত্রে এদেশে দেখা গিয়াছে। ইহার প্রতিকার এখনও হয় নাই। বিমান-আক্রমণ ঘটিলে কলিকাতায় লোক অপসারণ, খাদ্য সরবরাহ প্রভৃতি বিবিধ সমস্যার সমাধান কি ভাবে করা হইবে তাহা লইয়া লালদীঘির দপ্তরখানায় কর্ম্মচারীবৃন্দ এক বৎসর ধরিয়া বহু গবেষণা, আলোচনা ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু বোমা পড়িবার পর দেখা গেল তাঁহারা কোন সমস্যারই সমাধান করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের খাদ্যসমস্যা, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সমস্যা, মালগাড়ী

* Dear Mr. Churchill.—The common people of these islands have stood behind you through some grim and awful days. They have trusted you, and believed in you, for two and a half portentious years. But now the supreme test has come upon you. This can be the decisive winter of war. It is up to you.

In the six months which lie ahead you must weave the pattern of victory cast upon the loom of heroic Stalingrad. If you fail now, it will be too late. Six months! Six months in which to sweep away class prejudice, sloth, timidity, inefficiency and corruption. Six months in which to capture immortality in the minds of all free men. It is a terrible responsibility; it is a glorious opportunity.

† If we are to give Russia effective aid in 1943, there is no time to be lost. We can clear the way to victory if you, Mr. Churchill, act with resolution *now*. Let us stop wrangling about the fuel shortage; send more miners back to the pits and ration us until they have filled the yawning gap between output and consumption. Let us stop moaning about the shipping crisis; give us less food, fewer "frills." Cease trying to preserve the old ways of life; remove the obstruction of vested interests. Give the soldier, sailor and airman decent pay. Sack the incompetent gentlemen who have wangled themselves into soft whitehall jobs. Stop the policy of drift over India.

With these steps taken swiftly we could mount a shattering offensive which would break the power of German militarism. But if we dither and delay much longer we can lose this war in the next six months.

সরবরাহ সমস্যা প্রভৃতির কোন সন্তোষজনক সমাধান আজ পর্য্যন্তও করা সম্ভব হয় নাই। পাঁচ বৎসরব্যাপী যুদ্ধের মধ্যেও দরিদ্র চীন যাহা করিয়াছে, ভারতবর্ষের মোটা বেতনের কর্ম্মচারীবৃন্দ তাহার একাংশও করিতে পারেন নাই।

উৎকোচ-গ্রহণ-প্রবণতায় বিলাত ও ভারতে খুব বেশী তফাৎ নাই। গত যুদ্ধের পর এই দেশে মিউনিশন বোর্ডের যে-সব চুরি এবং উৎকোচের ইতিহাস প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা অনেকেই ভুলিয়া যান নাই। ভারতবর্ষে পণ্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণ-বিভাগে উৎকোচ গ্রহণ চলিয়াছে এ সন্দেহ সর্বসাধারণের মধ্যে রহিয়াছে। গবর্ন্মেণ্ট তাহার প্রকাশ্য তদন্ত করিয়া অভিযোগের সত্যাসত্য যাচাই করিবার চেষ্টা করেন নাই। সরবরাহ বিভাগে উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অভিযোগ উঠিয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া ভারত-সরকারকে সামান্য হইলেও কতকটা প্রতীকার করিতে হইয়াছে। সম্প্রতি সরবরাহ বিভাগের ক্রয় বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ ঐ বিভাগের কর্মচারীদের অযোগ্যতা ও উৎকোচ-গ্রহণ-প্রবণতা, ইহা জনসাধারণ বিশ্বাস করে। প্রকাশ্যে এই সব অভিযোগ উঠা সত্ত্বেও গবর্ন্মেণ্ট ইহার প্রতিকারের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করেন নাই। জনসাধারণের বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তিদের সাহায্যে তদন্ত করিয়া বর্তমান অবস্থায় রিপোর্ট প্রকাশ সঙ্গত মনে না হইলে উহা প্রকাশ না করিয়াও গবর্ন্মেণ্ট ঐ রিপোর্টের সাহায্যে মূল্যনিয়ন্ত্রণ বিভাগ পুনর্গঠন করিতে পারিতেন। এই সব দুর্নীতির শিকড় কত দূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে তাহার অনুসন্ধান ব্যাপক ও সমগ্রভাবে না করিলে দুই-চারিটি মামলা করিয়া বা ইস্তাহার জারি করিয়া মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের উপর জনসাধারণের আস্থা ফিরাইয়া আনা সম্ভব বলিয়া জনসাধারণ মনে করে না।

গবর্ন্মেণ্টের সহস্র সহস্র কর্মচারীর মধ্যে অযোগ্য এবং দুর্নীতিপরায়ণ লোক থাকিবে না ইহা অসম্ভব। এই সব অযোগ্য ব্যক্তিকে কর্মচ্যুত করিলে কোন গবর্ন্মেণ্টের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং উহা দ্বারা গবর্ন্মেণ্টের ন্যায়পরায়ণতা ও জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিরই পরিচয় প্রকাশ পায়। কিন্তু ভারত-সরকার ও প্রাদেশিক সরকারেরা এ বিষয়ে দেখা যাইতেছে যেন এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন যে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠিলেও তাঁহারা সত্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করিবেন না; দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইলেও উহাদিগকে পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়া তাঁহারা 'প্রেষ্টিজ' বাঁচাইয়া চলিবেন। কোন বিভাগে দুর্নীতি বা উৎকোচ গ্রহণ চলিতেছে ইহার আভাস মাত্র পাইলেও গবর্ন্মেণ্টের নিজের তরফ হইতেই তদন্তে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য; প্রত্যক্ষ অভিযোগ আসিবার অপেক্ষায় বসিয়া থাকা উচিত নহে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটেন আজও মন স্থির করিতে পারে নাই। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট বিলাতী কায়েমী স্বার্থের কবল হইতে মুক্ত হইবার পূর্বে বোধ হয় উহা সম্ভবও নহে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করিবার পথে যে-সব অন্তরায়ের কথা জোর গলায় বলা হয় তাহাদের অবাস্তবতা ও অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে ব্রিটেন ও ভারতের জাগ্রত জনমত সমান সচেতন। অষ্টাদশ শতাব্দী গিয়াছে সাম্রাজ্য-অর্জনের যুগ, উনবিংশ শতাব্দী কাটিয়াছে উহা রক্ষা করিবার চেষ্টায়, বিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্য ধ্বংসের সময় আসিয়াছে। মানুষ অনেক বাধা অতিক্রম করিতে পারে, কিন্তু কালের গতি রোধ করিবার শক্তি তাহার নাই।

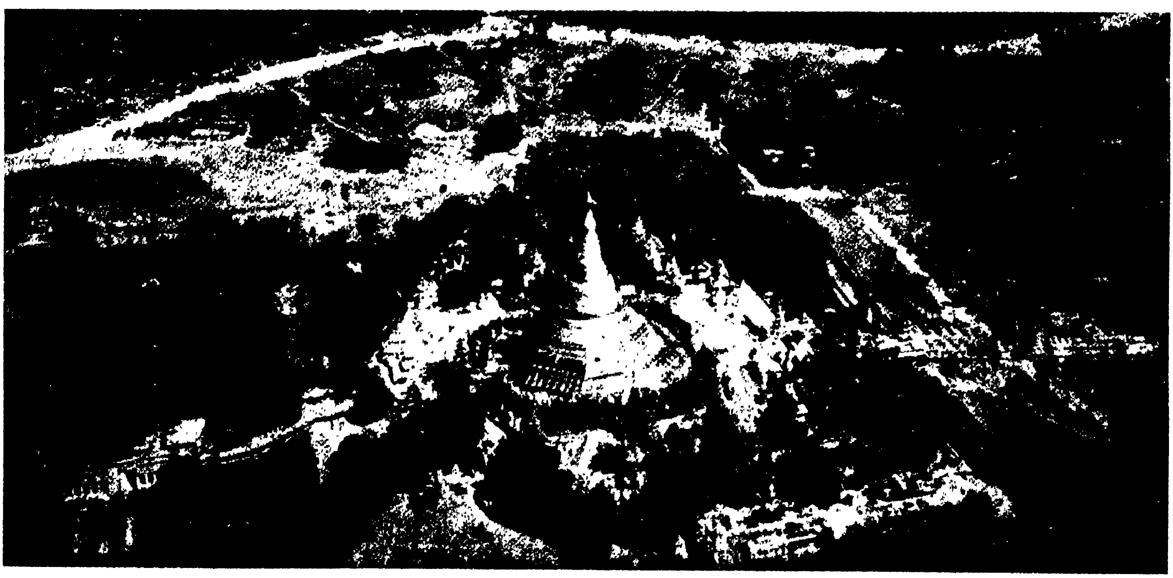
খুচরা মুদ্রা কাহারা সরাইতেছে ?

তামার পয়সার অভাব যখন ঘটিয়াছিল, তখন ভারত-সরকার বেশী করিয়া পয়সা বাহির না করিয়া এক ইস্তাহার জারি করিয়া দেশবাসীর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়াই কর্তব্য সমাধান করিয়াছিলেন। পরে জানা গেল, তাঁহারা ভারতীয় টাঁকশালে অষ্ট্রেলিয়ার জন্য তামার পয়সা তৈরিতে ব্যস্ত।

সম্প্রতি খুচরা মুদ্রার যে তীব্র অভাব ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধেও ভারত-সরকার পূর্বোক্ত পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন এবং লোকেরা খুচরা মুদ্রা সরাইয়া রাখিতেছে এই অভিযোগ করিয়া এবং এই সব লোককে ধরিবার সাধু উদ্দেশ্য ছাপাইয়া তাঁহাদের দায়িত্ব শেষ করিয়াছেন। বাজারের সামান্যতম সব্জী বিক্রেতাটি পর্য্যন্ত আজকাল খুচরা মুদ্রা অভাবে তীব্র অসুবিধা ভোগ করিতেছে। নিজেদের ঘরে এক আনি দুয়ানি লুকাইয়া রাখিয়া লোকে টাকা ভাঙ্গাইবার জন্য বাটা দিয়া বা অনাবশ্যক জিনিস ক্রয় করিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নোটের উপর প্রিমিয়াম দিতে যায় না। কোন কোন লোকে খুচরা মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছে ইহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদিগকে গবর্ন্মেণ্ট ধরিতেই বা



মান্দালয়স্থিত রাজকীয় বৌদ্ধমঠ ও যাজকমণ্ডলী



বিমান হইতে রেঙ্গুনের 'স্বে ড্যাগনে'র (স্বর্ণ প্যাগোডা) দৃশ্য



হাং   শহরের একটি দৃশ্য



নদীতীর হইতে কোটা বারুর দৃশ্য



ম্যাণ্ডায়েস্থিত মায়াথালন প্যাগোডা



ভাট পো। ব্যাঙ্ককের একটি মন্দির



ক্লং মহানক খালের উপর একটি ভাসমান বাজার। ব্যাঙ্কক



মধ্য শ্যামে জলপ্লাবিত ধান্যক্ষেত্র



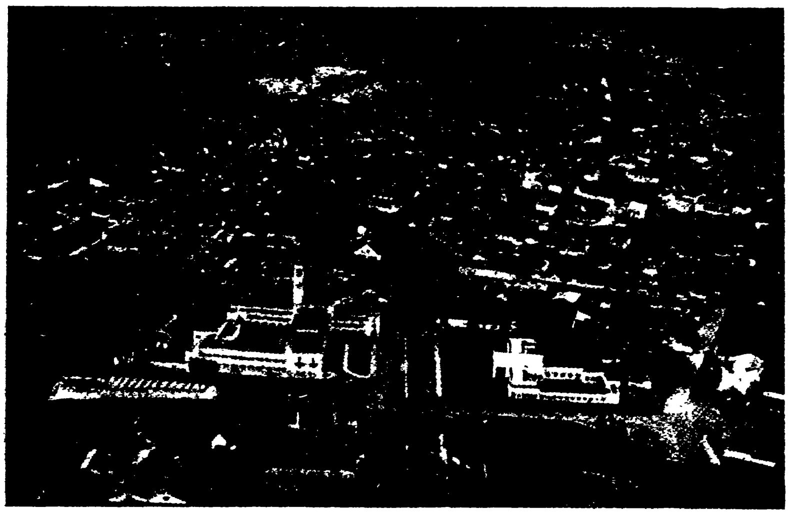
বৃশ্চিক আকারে গঠিত শ্যামদেশীয় ডাকবাহী নৌকা



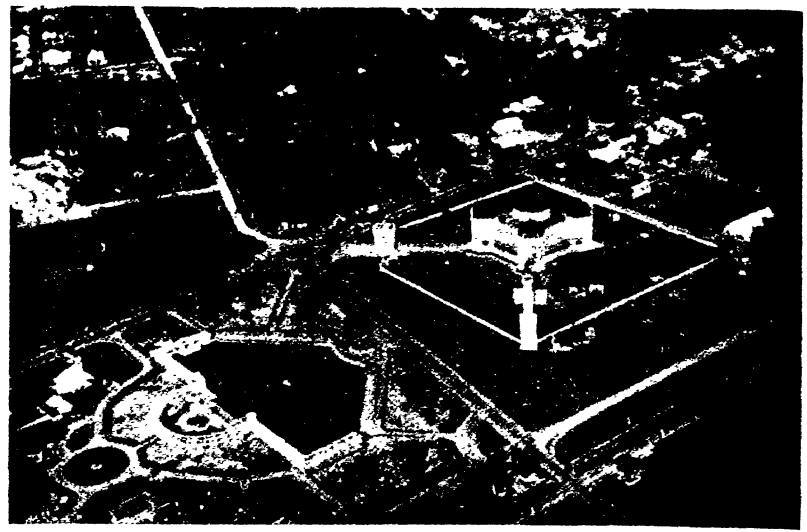
যন্ত্রসাহায্যে শ্যামের নদীগর্ভ হইতে টিন উত্তোলন



মিউনিসিপ্যাল-ভবন. পেন



বিমান হইতে সুরাবায়ার দৃশ্য



মস্‌জিদ। সুমাত্রা

পারিতেছেন না কেন? খুচরা মুদ্রা উঁহারা সংগ্রহ করিতে পারে তিন শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে—ট্রামের কণ্ডাকটার, নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের দোকানের কর্মচারী এবং রেলের টিকিট বিক্রয়কারী কর্মচারীদের নিকট হইতে। ট্রাম কোম্পানী জোর করিয়া যাত্রীদের গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া যাত্রীগণকে টিকিটের সঠিক ভাড়া অর্থাৎ খুচরা মুদ্রা আদায় করিতেছিল। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দ্রব্য বিক্রয়কারী দোকানে টাকা বা আধুলির ভাঙ্গানি দেয় না, সেখানেও সঠিক মূল্য দিতে হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সারিতে দাঁড়াইয়া অবশেষে জিনিস লইবার সময় টাকা দিলে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তিকে ধাক্কা মারিয়া সরাইয়া দেওয়া হয়। এই ভাবে এখানেও প্রচুর পরিমাণে খুচরা মুদ্রা সংগৃহীত হইতেছিল। রেলের টিকিট কিনিতে গিয়াও লোকে কতকটা ঐ প্রকার ব্যবহারই পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাদের নিকট প্রতি দিন হাজার হাজার টাকার খুচরা মুদ্রা পড়িয়াছে। যে-সব ধনী উহা সংগ্রহ করিয়া সরাইয়াছে, ইহাদিগের নিকট হইতেই তাহাদের পক্ষে উহা পাওয়া সহজ।

অল্প কয়েকটি স্থানে প্রতি দিন সহস্র সহস্র টাকার খুচরা মুদ্রা সঞ্চিত হইতে দিয়া গবর্মেণ্ট নিজেই ধনী ব্যবসায়ীদের পক্ষে শহরে উহা সংগ্রহের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। 'সঠিক' ভাড়া, 'সঠিক' মূল্য প্রভৃতি আদায়ের নোটিশ জারিতে প্রথম হইতেই গবর্মেণ্টের বাধা দেওয়া উচিত ছিল। কলিকাতায় বোমা পড়িবার পর অতি অল্প দিনের মধ্যে খুচরা মুদ্রা অদৃশ্য হইয়াছে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

—

বড়লাটের বক্তৃতা

কলিকাতার এসোসিয়েটেড কমার্স চেম্বার্সের বার্ষিক সভায় প্রতি বৎসরের ন্যায় বড়লাট এবারও বক্তৃতা করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় লর্ড লিনলিথগো বর্তমান রাজনৈতিক অশান্তির এক নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:

> ক্ষমতা হস্তান্তরে গ্রেট ব্রিটেন প্রস্তুত বলিয়াই এই সব অশান্তি ঘটিয়াছে। যে দায়িত্ব হস্তান্তরিত করিবার জন্য গ্রেট ব্রিটেন অতিশয় আগ্রহান্বিত তাহা কে গ্রহণ করিবে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট দলগুলি একমত হইতে পারে নাই বলিয়াই বর্তমান অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। গবর্মেণ্টের ক্ষমতা ত্যাগে অনিচ্ছা ইহার কারণ নহে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের অন্যান্য প্রতিশ্রুতি ও কার্য্যকলাপের আলোচনা ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র ক্রিপ্‌স্-দৌত্য হইতেই বড়লাটের উক্তির অসারতা প্রতীয়মান হইবে। ক্রিপ্‌স্ সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়াই এমন কোন দাবী তোলেন নাই যে সকল দল একমত না হইলে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইবে না। সর্বপ্রথমে তিনি কংগ্রেসের সভাপতির সহিত আলোচনা করিয়াছেন, পরে অন্যান্য দলনায়কদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে অবস্থানের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক আলোচনা চালাইয়াছেন কংগ্রেসের সঙ্গে, দেশরক্ষা সম্বন্ধে বিশদভাবে কংগ্রেসের সহিত তাঁহার বার বার মতামতের আদানপ্রদান হইয়াছে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে কংগ্রেসের অভিমত জানাইয়া তৎসম্বন্ধে তিনি তাঁহাদের মত সংগ্রহ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের প্রতিনিধি কর্ণেল জনসনও কংগ্রেসের সহিত মীমাংসা যাহাতে সম্ভব হয় তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। এই আলোচনা যখন চলিতেছিল তাহার মধ্যেই হিন্দু মহাসভা এবং শিখদল ক্রিপ্‌স্-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রকাশ্যে বিবৃতি দেন। মুসলিম লীগ নীরব থাকেন। দুইটি বড় দলের প্রত্যাখ্যান ও মুসলিম লীগের নীরবতাও কংগ্রেসের সহিত ক্রিপ্‌স্ সাহেবের আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করে নাই। ইহাতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, তখন ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ সঙ্গীন অবস্থা ধারণ করিবার ফলে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষের স্বেচ্ছাদত্ত সহযোগিতা কামনা করিয়াছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে গবর্মেণ্টের মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। মুখে স্বীকার না করিলেও অন্তরে তাঁহারা কংগ্রেসের ক্ষমতা ও প্রভাব ভাল করিয়াই জানেন, কাজেই ঘটনার চাপে পড়িয়া সামান্য একটু ক্ষমতা হস্তান্তরেও ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যখন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন তখন তাঁহারা কংগ্রেসের প্রতিই ঝুঁকিয়াছিলেন, হিন্দু মহাসভা ও শিখদের প্রতিবাদ এবং লীগের নীরবতা তাঁহারা গ্রাহ্য করেন নাই। মাইনরিটির মত না লইয়া ভারতবর্ষের কোন শাসনতন্ত্র প্রণীত হইতে পারে না—তাঁহাদের এই মৌখিক উক্তির ভিতর আন্তরিকতা থাকিলে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ক্রিপ্‌স্ সাহেব যুদ্ধের মাঝখানে অন্ততঃ শিখ মাইনরিটির মতের বিরুদ্ধে কাজ করিতে ভরসা পাইতেন না। মাইনরিটির মত গ্রহণের অপরিহার্যতা প্রচারিত হইয়াছিল ক্রিপ্‌স্-দৌত্য ব্যর্থ হইবার পরে, উহার পূর্বে বা আলোচনার মধ্যে নহে।

—

অখণ্ড ভারত সম্বন্ধে বড়লাটের অভিমত

এসোসিয়েটেড কমার্স চেম্বার্সের বক্তৃতায় বড়লাট ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব স্বীকার করিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন:—

বাস্তবতার দিক দিয়া ভৌগোলিক হিসাবে ভারতবর্ষ অখণ্ড। এই অখণ্ডত্বের গুরুত্ব অতীত অপেক্ষা বর্তমানে যেন অধিক বাড়িয়া গিয়াছে এবং এই অখণ্ডত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টাই আমাদের করিতে হইবে। অবশ্য ইহা করিতে গিয়া ছোট বড় মাইনরিটিদের অধিকার ও ন্যায়সঙ্গত দাবী যাহাতে সুবিচার পায় তৎপ্রতিও আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বড়লাটের বক্তৃতার এই অংশ পাঠ করিয়া মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ বিচলিত হইয়াছেন। তাঁহাদের দাবী ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। সর্ নাজিমুদ্দীনের মতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য শুধু ভারতবর্ষে মুসলমান মাইনরিটির স্বার্থরক্ষা নহে, পাকিস্তানকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলসাধনের ঐস্লামিক দায়িত্ব পালন। ইদ উপলক্ষে তিনি এই কথা বলেন :

শক্তি, অর্থাৎ শাসনক্ষমতা হাতে না থাকিলে মানবজাতির সেবা করা যায় না। মুসলমানদের হাতে শাসনক্ষমতা আসিলে তবেই মানবজাতির প্রকৃত সেবা করা যাইতে পারিবে এবং এই কারণেই ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে ঐস্লামিক কর্তব্য বলিয়া মনে করে।

মানবজাতির মঙ্গলের জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী সম্ভবতঃ উপরোক্ত দিবসেই প্রথম উঠিয়াছে। ইতিপূর্বেই মুসলমান মাইনরিটি স্বার্থ রক্ষার জন্য পাকিস্তান দাবী করা হইত। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন-আইন রচনার সময় পাকিস্তানের দাবীও উঠে নাই, উঠিয়াছিল পরিষদে আসন ভাগের দাবী। মুসলিম লীগ হইতে দেশের প্রগতিশীল মুসলমানেরা যতই সরিয়া দাঁড়াইতেছেন, পাকিস্তানের দাবীর উগ্রতাও যেন ততই ধাপে ধাপে চড়িতেছে। বড়লাটের শেষ বক্তৃতায় উহা অতঃপর আরও কোন্ রূপ পরিগ্রহ করে তাহাই দ্রষ্টব্য।

সর্ সিকন্দর হায়াৎ খাঁ

পঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী সর্ সিকন্দর হায়াৎ খাঁ অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সর্ সিকন্দর ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের অবিচলিত অনুবর্ত্তী হইলেও তিনি সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেন নাই। পঞ্জাবে প্রথমাবধি তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ইউনিয়নিষ্ট দলের নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন এবং ঐ দল হইতেই প্রথমাবধি পঞ্জাবের মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে। মিঃ জিন্নার পাকিস্তান-পরিকল্পনার তিনি তীব্র বিরোধী ছিলেন এবং প্রকাশ্যে উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি জীবিত থাকিতে পঞ্জাবে কখনও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। পঞ্জাব-পঞ্জাবীদের জন্য, কোন ধর্ম বা দলবিশেষের লোকের একাধিপত্য সেখানে চলিবে না। সর্ সিকন্দর মুসলিম লীগের সহিত সাধারণ ভাবে যোগ রাখিয়া চলিলেও কোন সময়ই মিঃ জিন্নার সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি সমর্থন করেন নাই। উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী খাকসারের দল সর্বাপেক্ষা কঠিন আঘাত পাইয়াছিল তাঁহারই হাতে। খাকসারদের পিছনে মুসলিম লীগ যোগ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি কর্তব্য হইতে বিচলিত হন নাই। সর্ সিকন্দরের মৃত্যুতে পঞ্জাবের ক্ষতি হইয়াছে প্রচুর, কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট। মুসলমান নেতাদের মধ্যে ইঁহারই উপর তাঁহারা বিপদের দিনে নির্ভর করিতে পারিতেন।

শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ

শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতি আশ্রমবাসীদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের হেতু হইয়াছিল। অবনীন্দ্রনাথকে উৎসবের পূর্ববর্তী কয়েকটি দিনও অতিশয় ব্যস্ততার মধ্যে কাটাইতে হইয়াছে এবং তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া শিক্ষক ও ছাত্রেরা আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। এই উৎসবের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ প্রাক্তনীর উদ্বোধন সম্পন্ন করেন। ৭ই পৌষ প্রত্যূষে বৈতালিকেরা রবীন্দ্রনাথের রচিত গান গাহিয়া আশ্রম প্রদক্ষিণ করে। তৎপরে মন্দিরে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন উপাসনা করেন। বার্ষিক মেলায় এবার জনসমাগম কিছু কম হইলেও উহা যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছে। আশ্রমের যে-সব কর্মী শিক্ষক ও ছাত্র পরলোকগমন করিয়াছেন তাঁহাদের স্মরণার্থ ৯ই পৌষ বিশেষ উপাসনা হয়। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন ঐদিনও উপাসনা করেন।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর ষষ্টিপূর্তি

শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে ১৪ই ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর ষষ্টিপূর্তি উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার কৃতী ছাত্রের অভিনন্দন-উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। প্রাণস্পর্শী ভাষায় অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী নন্দলালের শিল্প-সাধনার কথা বর্ণনা করেন। গুরু অবনীন্দ্রনাথ এবং ছাত্র নন্দলাল দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ভারতীয় শিল্প-সাধনাকে পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর করুন ইহাই কামনা করি।

চিত্র-পরিচয়

কবি জয়দেব "গীতগোবিন্দ" রচনারত। পত্নী পদ্মাবতী গৃহদ্বারে অপেক্ষা করিয়া আছেন, পাছে কবির অভিনিবেশ ভঙ্গ হয় সহসা সম্মুখে আসিতে পারিতেছেন না। কবি কিন্তু নিজের মনেই লিখিয়া চলিয়াছেন।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

এক বৎসর ও এক মাসের কিছু বেশী দিন পূর্ব্বে জাপান তাহার বিদ্যুৎ অভিযান আরম্ভ করে। পাঁচ মাসের অভিযানের ফলেই ১৩,২৭,১৯৬ বর্গ মাইল দেশ এবং ১১,৮৬,৪০,০০০ নরনারী উদীয়মান-সূর্য্য পতাকার আয়ত্তে আসে। তাহার পর বিগত মে মাসে প্রবাল সাগরে জাপানের ঝটিকা প্রগতির মুখে প্রথম বাধা পড়ে। ঐস্থানের নৌযুদ্ধে মার্কিন নৌবহর প্রথম বার জাপানের জয়পতাকা হেলাইয়া দিয়া অষ্ট্রেলিয়ামুখী অভিযানের পথ রোধ করে। তাহার পর এই যুদ্ধারম্ভের সাড়ে সাত মাস পরে, মার্কিন নৌবল সলোমন দ্বীপপুঞ্জে পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করে। বর্ত্তমানে এসিয়া মহাদেশের এবং প্রশান্ত ও ভারতমহাসাগরের দ্বীপমালায় জাপানের করায়ত্ত ভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬,০০,০০০, বর্গমাইল এবং সে সকল অঞ্চলের লোকসংখ্যা প্রায় ১৪,৪০,০০,০০০।

তিন বৎসর চার মাসের কিছু অধিক কাল এই দ্বিতীয় জগদ্ব্যাপী যুদ্ধ চলিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে জার্ম্মানী প্রায় ১১,০০,০০০ বর্গ মাইল ভূমি অধিকার করিয়াছে এবং ঐস্থানের প্রায় ১৭,০০,০০,০০০ অধিবাসীকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের মধ্যের শীতকালে রুশসেনাদল অশেষ ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করিয়া প্রথমে অক্ষশক্তির বিজয় অভিযানের গতি রোধ করে। পরের গ্রীষ্মকালীন অভিযানে রুশসেনার ঐ অদম্য পুরুষকারের সকল চিহ্নই মুছিয়া যায় উপরন্তু আরও বিষম ক্ষতি ও প্রচণ্ড আঘাত সোভিয়েট রাষ্ট্রকে সহিতে হয়। বর্ত্তমান শীতে সোভিয়েটের গণসেনা অপূর্ব্ব শৌর্য্য ও আত্মত্যাগের আদর্শ দেখাইয়া আবার শত্রুতাড়নে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। এবার আর এক রণাঙ্গনে, অর্থাৎ উত্তর-আফ্রিকায়, অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সমর প্রচেষ্টা চলিয়াছে এবং লিবিয়ায় তাহার ফলে "অপরাজেয়" অক্ষসেনা পশ্চাৎ-পদ হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টায় দেশ-দেশান্তরে চলিয়াছে।

জাপানের বিজয় অভিযান চলন্ত থাকার শেষ নিদর্শন আমরা পাইয়াছি তাহার পোর্ট মোরেস্‌বি অভিমুখে সৈন্য চালনায়। নিউগিনি দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলের সমুদ্র-কূলের নগ্ন পাহাড়ী এলাকায় গুটিকতক কাঠের ঘরবাড়ী এবং সমুদ্রের বুকে শ-দুই ফুট লম্বা একটি জেটি, এই ছিল মোরেস্‌বি বন্দর। যুদ্ধের পূর্ব্বে কয়েক হাজার স্থানীয় অধিবাসী এবং সাত-আট শত বিদেশী শ্বেতাঙ্গ সেখানে থাকিত। তাহাদের কাজ ছিল নারিকেল ফল সংগ্রহ এবং আকের চাষ। কিন্তু যুদ্ধের ফলে সেখানে সশস্ত্র সৈন্য ভিন্ন অন্য শ্বেতাঙ্গ নাই বলিলেও চলে এবং যুদ্ধের যোজনায় ঐ ঘুমন্ত মশামাছির দেশ এখন জাহাজ, এরোপ্লেন, কামান, বন্দুকের শব্দে আলোড়িত। ইহার কারণ মোরেস্‌বি বন্দর অষ্ট্রেলিয়ার ইয়র্ক অন্তরীপ হইতে মাত্র ৩২৫ মাইল এবং ইহা শত্রু-করায়ত্ত হইলে অষ্ট্রেলিয়ার বিপদ সঙ্গীন হইয়া উঠিবে। পোর্ট মোরেস্‌বি স্থল পথে অধিকার করার অর্থ পৃথিবীর এক দুর্গমতম পথে পাহাড়-পর্ব্বত বনজঙ্গল অতিক্রম করা। ঐ পথ দিয়া জাপানের সেনাদল অনেক দূর অগ্রসর হয়। সে সৈন্য-দলের সংখ্যা কমই ছিল—বোধ হয় ২৫০০ শতের অধিক নয় এবং তাহাদের যুদ্ধসরঞ্জামও ছিল লঘু। পথে অরণ্য-যুদ্ধে শিক্ষিত অষ্ট্রেলীয় সেনাদল তাহাদের বাধা দিতে চেষ্টা করে। মোরেস্‌বির মুখে মার্কিন ও অষ্ট্রেলীয় সেনার বৃহত্তর শক্তি প্রয়োজিত হয়। তাহার পর চলে মিত্রপক্ষের এরোপ্লেনের—বিশেষতঃ মার্কিন হাওয়াইবহরের—প্রবল আক্রমণ এবং তাহার ফলে জাপানীদিগের সরবরাহ এবং আকাশ-যুদ্ধের ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হইলে পরে পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ হয়। এখন সেই পাল্টা আক্রমণের প্রথম পর্য্যায় বুনা-গোনা অঞ্চলে শেষ হইতে চলিয়াছে। জাপানের দিগ্বিজয় প্রচেষ্টা এখন ক্ষান্ত। এখন এসিয়ার যুদ্ধে জাপান আক্রান্ত এবং আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। মিত্রপক্ষই

আক্রমণকারী, তবে সে আক্রমণ এখনও অতি ধীর এবং স্বল্পতেজ। তাহাতে সে বল-প্রয়োগের কোনও নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নাই যাহার দরুন জাপানের নূতন অধিকার সকল পুনরুদ্ধারিত হওয়া আসন্নপ্রায় ভাবা যাইতে পারে। আক্রমণে জাপান যে তেজ ও বিক্রম দেখাইয়াছিল, রক্ষণে যে তাহা অপেক্ষা অল্প শক্তিসামর্থ্য সে দেখাইবে এ কথা কল্পনা করাও মূঢ়তা।

সোভিয়েট রণভূমিতে দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন অতি অকস্মাৎ হইয়াছে। জার্ম্মান রণনেতাগণ যে সিদ্ধান্তের অনুযায়ী গত বৎসরের গ্রীষ্ম এবং শরৎকালীন অভিযান চালনা করিয়াছিলেন তাহার মূল উদ্দেশ্য ছিল তিনটি। প্রথমতঃ, কৃষ্ণসাগরস্থিত দুর্গ ও বন্দরগুলি অধিকার করিয়া সে অঞ্চলে সোভিয়েট নৌবহর ও সেনাবাহিনীকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ককেশসের জলপথ নিষ্কণ্টক করা। ইহার ফলে রুমানিয়া হইতে জলপথে লোক, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ আনাগোনার পথ সরল হয় এবং রুশবাহিনীর পক্ষে ককেশসের কৃষ্ণসাগরকূলস্থ অঞ্চল রক্ষা অতি দুরূহ হয়। নাৎসী অধিকারীবর্গের এই পরিকল্পনায় চালিত কার্য্যে বার আনা সাফল্যলাভ হইয়াছে বলা যায়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল ডন ও ভল্‌গা নদদ্বয়ের অববাহিকায় স্থিত রণকুশলী টিমোশেঙ্কোর স্থল-ও আকাশ-বাহিনীকে আশ্রয়-চ্যুত করিয়া এবং সরবরাহের পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ধ্বংস করা অথবা অতি নিস্তেজ করা। এই উদ্দেশ্য প্রায় সফল হইয়াছিল, কিন্তু স্টালিনগ্রাডের রক্ষকগণ অশ্রুতপূর্ব্ব বীরত্ব ও আত্মত্যাগের চূড়ান্ত করায় টিমোশেঙ্কোর বাহিনী সরবরাহের পথ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই, সুতরাং তাহার ধ্বংসসাধন বা তেজ দমন কোনটাই শীতের আগমনের পূর্ব্বে ঘটে নাই। তৃতীয় উদ্দেশ্য সাধন নির্ভর করিতেছিল প্রথম দুইটির সাফল্যের উপর। সেটি ছিল ককেশসের তৈলের আকরগুলি অধিকার করায় এবং সেই সঙ্গে জার্ম্মান-বাহিনীর এশিয়া অভিমুখী অভিযান চালনার পথ পরিষ্কার করায়। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে কার্য্যসিদ্ধি হইবার পূর্ব্বেই তৃতীয়টির কার্য্যারম্ভ হয়, কিন্তু চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্ব্বেই দ্বিতীয়টির কার্য্য স্থগিত হওয়ায় তৃতীয় উদ্দেশ্য সাধনে বাধার সৃষ্টি হয়।

স্টালিনগ্রাডে রুশরক্ষণকারীদিগের শীতের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন না করিতে পারায় অক্ষশক্তির যে মারাত্মক ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ডন ও ভল্‌গার অববাহিকায় রুশবাহিনীতে লোকবল ও অস্ত্রবল সঞ্চালনের যোগসূত্র ছিন্ন হয় নাই, যাহার ফলে উরাল ও সুদূর পূর্ব্বে-স্থিত সমরশক্তির আকর হইতে নূতন সেনা ও অস্ত্রশস্ত্র অজস্র পরিমাণে আসিয়া শীতের মধ্যে এক নূতন স্থিতির সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই যে সোভিয়েটের শীতকালীন অভিযান, যাহার প্রকোপ ও বিস্তার জগতের রণবিশারদগণকে আশ্চর্য্য করিয়াছে, ইহার বিকাশ অসম্ভব হইত যদি জার্ম্মাণগণ উপরোক্ত অববাহিকাদ্বয়ে সুদৃঢ় এবং অক্ষুণ্ণ অধিকার স্থাপন করিতে পারিত।

এ বৎসরের শীত অভিযান এক হিসাবে সোভিয়েট রাষ্ট্রের জীবনমরণের শেষ নিষ্পত্তির চেষ্টা। যে সমর-পদ্ধতির উপর সোভিয়েটের বর্ত্তমান অভিযান স্থাপিত হইয়াছে তাহার মূল যুক্তি অক্ষশক্তির ককেশস অভিমুখী শক্তিক্ষেপনের পথ পিছন হইতে কাটিয়া, কয়েকটি বিরাট্ জার্ম্মান ও রুমানীয় বাহিনীকে বেড়াজালে ধরিয়া, নষ্ট করা। এই অভিযানের প্রথম পর্য্যায়ের উদ্দেশ্য অতর্কিত প্রবল আক্রমণে জার্ম্মান রক্ষাবেষ্টনী কয়েক স্থানে ছেদ করিয়া পাশ ও পিছন হইতে প্রচণ্ড আক্রমণের পথ পরিষ্কার করা। তাহার পর সৈন্য চালনা এবং অস্ত্র ও রসদ সরবরাহের যোগসূত্রগুলি ছিন্ন করা এবং সর্ব্বশেষে অক্ষশক্তির বাহিনীগুলিকে বেষ্টনীবদ্ধ করিয়া সেগুলির উচ্ছেদ। এই প্রচেষ্টায় সোভিয়েট সফলকাম হইলে অক্ষ-শক্তির গত বৎসরের রুশরণক্ষেত্রে প্রাপ্ত সকল যুদ্ধ ফল ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাহার পরিণাম যে কি হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। অন্য দিকে সোভিয়েটের এই শীত অভিযান যেভাবে চালিত হইতেছে তাহাতে সহজেই বুঝা যায় যে এই বিরাট্ সমরপ্রচেষ্টা সম্পূর্ণ একমুখী, অর্থাৎ ইহার হিসাবনিকাশে সম্পূর্ণ সাফল্য ভিন্ন অন্য কিছুর স্থান নাই। যদি অভিযান অসম্পূর্ণ থাকিতে থাকিতে আবার নূতন বসন্তকালিন জার্ম্মান অভিযান আরম্ভ হওয়া সম্ভব হয়, তবে সোভিয়েটের বিপদের অন্ত থাকিবে না।

সম্প্রতি যে সকল সংবাদ রুশ-রণক্ষেত্র হইতে এদেশে

আসিতেছে তাহাতে মনে হয় যে রুশ অভিযান এখনও প্রথম পর্য্যায়েই আছে, অর্থাৎ এখনও জার্ম্মান ব্যূহভেদ এবং যোগসূত্রচ্ছেদ এই কার্য্যই চলিতেছে। রুশসেনাকে চলাচলের পথের এবং মাল সরবরাহের যোগসূত্রের অভাব —এই দুই প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে হইতেছে, সেই কারণে তাহাদের গতি অপেক্ষাকৃত ধীর এবং শক্তি প্রয়োগের পন্থাও অসরল। যে-ক্ষেত্রে অভিযান চলিতেছে সেখানকার রেলপথ ও রাজপথ সকলই ইতিপূর্ব্বে জার্ম্মান সেনাদলের অধিকারে ছিল, সুতরাং সেগুলির উপর সোভিয়েটের অধিকার সম্পূর্ণভাবে স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত রুশ সেনাদলের চলাচল সরল বা সহজ হইবে না। এখন পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছে তাহাতে উভয় পক্ষেরই ঐ অঞ্চলে চলাচল ও সরবরাহের পথ অসংলগ্ন ও কঠিন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে জার্ম্মানগণের পক্ষে ডন ও ভল্‌গার অববাহিকাদ্বয়ে যাতায়াতের পথ রাখা দুরূহ ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে। আরও দক্ষিণে, ককেশসের জার্ম্মান অভিযান চালনের পথে, জার্ম্মান অধিকার এখনও ভগ্ন হয় নাই এবং সে কার্য্যসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ও দক্ষিণ রুশদেশে স্থিত জার্ম্মানবাহিনী ধ্বংসের কাজ আরম্ভ হইতে পারে না। তবে এখন পর্য্যন্ত যেভাবে সোভিয়েট সেনা বিপক্ষের সকল প্রতিরোধ-চেষ্টা ভাঙ্গিয়া ব্যূহচ্ছেদ করিতেছে তাহাতে মনে হয় যে এখনও জার্ম্মান রণনেতাগণ সোভিয়েট-অভিযান ব্যর্থ বা অচল করিবার কোনও ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

শীতের করাল বাহুবেষ্টনীর মধ্যে রুশরাষ্ট্রের যুদ্ধ চালনা কি নিদারুণ শক্তিক্ষয়ের ব্যাপার তাহা সাধারণ অনুমানেরও অতীত। সকল বিঘ্ন বিপদ উপেক্ষা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী সোভিয়েট গণসেনা প্রায় নিঃসহায় অবস্থায় যে পৌরুষ ও সহ্যশক্তির জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন বর্ত্তমানে দেখাইতেছে তাহা জগতে অতুল। তাহার বিপক্ষ রণকুশলী এবং দুর্দ্ধর্ষ, সুতরাং এই 'মরণ কামড়ের' ফলাফল কি হইবে বলা কঠিন; কিন্তু ইহাতে রুশসেনার গৌরবের জ্যোতি অম্লান থাকিবে তাহা নিশ্চয়।

অন্যান্য রণাঙ্গনে গত মাসে বিশেষ কিছু হয় নাই। উত্তর-আফ্রিকায় রোমেলের সেনাদল আরো পিছু হটিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। টিউনিসিয়ায় মার্কিন ও ব্রিটিশদল এখনও বলগঠনে ব্যস্ত। সেখানকার যেটুকু খবর এদেশে আসিতেছে তাহাতে মনে হয় অক্ষশক্তি আফ্রিকার রণাঙ্গনের অবস্থা পরিবর্ত্তনের আশা এখনও ছাড়ে নাই। সুদূর পূর্ব্বে জাপানীদল এখন বিব্রত অবস্থায় আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, তবে সে সকল অঞ্চলে মিত্রপক্ষও সেরূপ সম্যকভাবে সমর অভিযানের সূত্রপাত করেন নাই। চীনদেশে ঘাত-প্রতিঘাতই চলিয়াছে, সমরোপকরণের অভাবে স্বাধীন চীন এখনও শত্রু বিতাড়নের ব্যাপক আয়োজন করিতে অসমর্থ।

ব্রহ্মদেশে, চীনের য়ুনান সীমান্তে এবং মাঝে মাঝে ইন্দোচীনে ব্রিটিশ ও মার্কিন হাওয়াইবহর সম্প্রতি ব্যাপক আক্রমণ চালাইতেছে। এই সকল আক্রমণের সংবাদে আকাশযুদ্ধের কথা প্রায়ই কিছু থাকে না এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আক্রমণকারী এরোপ্লেন ঝাঁকগুলি অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়াছে এ কথা বলা হয়। এইরূপ সংবাদের অর্থ এই যে বিপক্ষের আকাশবাহিনীর ক্ষমতা ঐ সকল স্থানে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ সে সকল স্থানে হয় যথেষ্ট সংখ্যায় এরোপ্লেন রাখার ক্ষমতা জাপানের নাই অথবা যেগুলি আছে তাহা মিত্রপক্ষের এরোপ্লেনগুলির সমকক্ষ নয়। এরূপ বিচার করা যথার্থ কি না তাহা এখনও বলা চলে না, কেননা অনেকক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে নিজেদের শক্তি গোপন করিয়া বিপক্ষকে অতর্কিত আক্রমণ করার জন্য এরূপ "চাল" চালান হয়। তবে নিউগিনি ও সলোমনে মিত্রপক্ষের হাওয়াইবহর যেভাবে আকাশে সুস্পষ্ট প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে আকাশযুদ্ধাস্ত্রের হিসাবে জাপানের অবস্থা এখন মিত্রপক্ষের তুলনায় হীন।

ভারত সীমান্তে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই ঘটে নাই। এখন যাহা চলিতেছে তাহা মুখবন্ধ মাত্র। বিশেষ ঘটনার মধ্যে কলিকাতায় বোমা বর্ষণ হইয়াছে। দেশ সাধারণ অবস্থায় থাকিলে ইহাও উল্লেখযোগ্য হইত কিনা সন্দেহ। তবে নেতৃহীন, অসমর্থ, "এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে"-রূপ চালকযুক্ত দেশে এরূপ অবস্থায় যাহা ঘটিতে পারে তাহা কিছু হইয়াছে অবশ্য।

দেশ-বিদেশের কথা

বাংলায় লম্বা আঁশের কার্পাস-চাষ বিষয়ে বর্ত্তমান সমস্যা ও প্রতিকার

বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতির ও গবর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্যে একটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনানুযায়ী বাংলার বিভিন্ন ছয়টি জেলায় প্রতি বৎসর যে কার্পাস চাষ হইতেছে, বর্ত্তমান ১৯৪২-৪৩ সালই তাহার শেষ বৎসর। কার্পাস-চাষ লাভজনক ইহা প্রমাণিত হইলেও গবর্ণমেণ্ট-সাহায্য পাইয়া যাঁহারা ইহার চাষ করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই পরবর্ত্তী বৎসর হইতে নিজে ইহার চাষ গ্রহণ করেন নাই। বাংলার বহু জমিতে ইক্ষু, পাট, আলু প্রভৃতি উৎপাদনেও এই প্রকার লাভ হয়। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল ফসলে কার্পাসের মত বীজ ছাড়াইবার সমস্যা নাই। বর্ত্তমানে যদিও পরিকল্পনানুযায়ী উৎপন্ন কার্পাসের বীজ ছাড়াইবার ব্যবস্থা কোন খরচ না লইয়া সরকারী কৃষি-বিভাগ করিয়া থাকেন। এই বৎসর ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স্ ও মোহিনী মিল্‌স্ সাধারণের মধ্যে ইহার প্রচলন উদ্দেশ্যে কাশিমবাজার শহর-সংলগ্ন কয়েক স্থানে আবশ্যকমত জমি ও মূলধন দিতে স্বীকৃত হইয়া এবং উৎপাদক সম্পূর্ণ লাভ পাইবে এবং লোকসান মিল্‌স্ বহন করিবে এই সর্ত্তে "ইউনাইটেড্ প্রেস" মারফৎ বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে মে মাসের শেষ ভাগে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই আহ্বানে কেহ সাড়া দেয় নাই। বস্ত্রের মূল্য বর্ত্তমানে যেমন বাড়িয়াছে, তাহাতে কার্পাস-চাষ ও চরখার বহুল প্রচলনে যে ইহার অনেকটা প্রতিকার হইবে, ইহা সকলেই বুঝেন। অথচ আমরা এত তমসাচ্ছন্ন যে বর্ত্তমান বস্ত্র-সমস্যায় হা-হুতাশ এবং জল্পনা-কল্পনা ভিন্ন অল্প লোকেই প্রতিকারের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে। অন্যান্য প্রদেশের মত এখানে ধনী, জমিদার, উপাধিপ্রাপ্ত ও প্রতিপত্তিশালী লোক কেহ এই প্রচেষ্টায় আগ্রহ দেখাইতেছেন না বলিলেই হয়। কাজেই এখানে ইহার চাষের প্রসার হইতেছে না। পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইবার প্রথম দুই-তিন বৎসর তেমন আগ্রহশীল উৎপাদক না পাইলেও গত বৎসর হইতে উৎপাদকদের মধ্যে অনেকেই এই বিষয়ে বেশ উৎসাহ দেখাইতেছেন, এবং কেহ কেহ নিজ দায়িত্বে ইহার চাষও করিতেছেন। এমত অবস্থায় আরও কয়েক বৎসর এই ভাবে চেষ্টা হইলে যে ক্রমশঃ ইহার অধিকতর প্রচলন হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রকার প্রচেষ্টায় অর্থেরও আবশ্যক। এই অর্থ সংগ্রহ ও পরিচালনা বিষয়ে অবিলম্বে স্থির করিতে হইবে। এই জন্য বর্ত্তমান বৎসর পরিকল্পনানুযায়ী এবং স্বতন্ত্র ভাবে যাঁহারা এ বৎসর ইহার চাষ করিতেছেন, মিল মালিক সমিতি, ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স্, মোহিনী মিল্‌স্, বিরলা ব্রাদার্স, গবর্ণমেণ্ট কৃষি-বিভাগের ডাইরেক্টর, ইকনমিক ও সেকণ্ড ইকনমিক বোটানিষ্ট, Cotton Supervising Officer, Cotton Demonstrators, Calcutta University, Botanical Section-এর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ও এই বিষয়ে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন, যাঁহারা এই প্রচেষ্টায় অর্থসাহায্য করিতেছেন ও করিবেন প্রভৃতি লোকদের লইয়া একটি সভা আহ্বান করিয়া এ বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করা প্রয়োজন। এখানে বলা আবশ্যক যে আগামী বৎসর হইতে Central Cotton Committee of India (যাহার পরিপোষণে বাংলার মিলগুলি বহু অর্থ দিয়া থাকেন) বাংলার একটি Full-fledged Cotton Botanical Scheme অনুযায়ী কার্য্য করা বিষয়ে আশ্বাস দিয়াও এই বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কিছু স্থির করেন নাই। কাজেই তাঁহারা সাহায্য করিলেও আগামী ১৯৪৩-৪৪ সনে তাঁহাদের অর্থে কোন কাজ হইবে আশা করা যায় না। বাংলার কৃষি-বিভাগ এই বিষয়ে আগামী বৎসর হইতে কি ভাবে কার্য্য করিবেন, তাহাও প্রকাশ করেন নাই। এই সকল সাহায্য হঠাৎ বন্ধ হইবার মত হইয়াছে বলিয়াই বর্ত্তমান অবস্থার সম্মুখীন হইয়া দেশবাসীদের নিজেদের দ্বারা এমন একটি দেশহিতকর কার্য্য যাহাতে বন্ধ না হয় সে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শ্রীসারদাচরণ চক্রবর্ত্তী

বাংলার মেয়ে

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশের মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্র নানাদিকে বাড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও বাড়িয়াছে। এই বিষয়ে সকল প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টার সাফল্য সর্ব্বাংশে দেশবাসীর সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। দেশের বিভিন্ন নারী-প্রতিষ্ঠান এবং অপরাপর যে সকল প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-বিবরণী পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। এই সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এবং আর কোন বিষয় জ্ঞাতব্য মনে হইলে, তাহা লিখিয়া পাঠাইলে পুস্তকের সম্পাদকবর্গ অনুগৃহীত হইবেন। এই সম্পর্কে ব্যক্তিবিশেষের কোনও কিছু জানা কিংবা জানাইবার থাকিলে, তাহাও লিখিয়া পাঠাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হইতেছে।

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা: সম্পাদক, ১২, ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, স্যুইট ৬-এ কলিকাতা।

আলোচনা

"স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়"

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

গত অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীদেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় লিখিত স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জীবনের ইতিহাস পড়িলাম। এক স্থানে লেখকের কিঞ্চিৎ ভুল রহিয়াছে দেখিলাম। লেখক লিখিয়াছেন,—"পরে ননীবাবু সরকারী এঞ্জিনীয়ার হইয়া বরিশাল, ফরিদপুর, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানে চাকরী করিয়াছেন।" মনে হয় 'সরকারী এঞ্জিনীয়ার' না লিখিয়া 'ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের এঞ্জিনীয়ার' লিখিলেই ঠিক হইত। সাধারণে সরকারী ইঞ্জিনীয়ার অর্থে গবর্ন্মেণ্টের চাকুরিয়া পি. ডবলিউ প্রভৃতি বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারগণকেই বোঝেন। ৺ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ইঞ্জিনীয়ার হইয়া রাজশাহীতে বহুকাল বহু জনের প্রিয় হইয়া বাস করিয়া গিয়াছেন। ফরিদপুরেও ইনি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে'ই কাজ করিতেন। আমার সহিত ননীবাবুর ছেলেদের বন্ধুত্ব থাকার জন্য আমি এ বিষয়ে সঠিক জানি।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা কত?

শ্রীক্ষিতিনাথ সুর

পৌষের 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে "স্বাধীনতার অধিকার কি সকলে পাইবে?" শীর্ষক আলোচনায় লিখিত হইয়াছে—"মানবের স্বাধীনতা বলিতে কি আজও পৃথিবীর ১৮০ কোটী লোকের স্বাধীনতা বুঝাইবে না, বুঝাইবে শুধু ইউরোপ ও আমেরিকায় ৬০ কোটী শ্বেতাঙ্গ লোকের অধিকার?"—পৃ. ২৮৮। এই উক্তি দ্বারা ১৮০ কোটীই পৃথিবীর সমগ্র লোকসংখ্যার সমষ্টি বলিয়া বুঝা যাইতেছে।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মডার্ণ রিভিয়ু-তে *Statistical Year Book of the League of Nations 1940-41*-এর "Population and Population Movements" অংশ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহাতে দেখা যায়, পৃথিবীর লোক-সংখ্যা ২,১৭০ মিলিয়ন অর্থাৎ ২১৭ কোটী।—পৃ. ৭৭। খ্রীষ্টীয় ১৯৩৯ অব্দে ইহাই পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল। নালন্দা-ইয়ার বুক (১৯৪২) পুস্তকে, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ২,১৪৪ মিলিয়ন অর্থাৎ ২১৪ কোটী ৪০ লক্ষ বলিয়া লেখা হইয়াছে। সুতরাং 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত সংখ্যা ১৮০ কোটী অপেক্ষা পৃথিবীর লোকসংখ্যা অনেক বেশী।

ইউরোপ ও আমেরিকার লোকসংখ্যা সম্পর্কেও কিছু বলিবার আছে। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অরুণেন্দু দাশগুপ্ত লিখিত Economic and Commercial Geography (3rd Revised Edition, December 1940) পুস্তকে প্রদত্ত বিবরণে উক্ত দুই মহাদেশের লোকসংখ্যা দেখা যায়:

ইউরোপ···৫০ কোটীর অল্প বেশী—Europe has a little over 500 million of population.—পৃ. ১৬৪।

উত্তর-আমেরিকা···১৩ কোটী; পৃ. ২২৯। দক্ষিণ-আমেরিকা··· ৬ কোটী ৫০ লক্ষ, পৃ. ২৪৩। মোট ৬৯ কোটী ৫০ লক্ষ।

ইউরোপ ও আমেরিকার কিছু অ-শ্বেত জাতি আছে। কিন্তু সম্ভবতঃ আলোচ্য প্রসঙ্গে উক্ত দুই মহাদেশের সমগ্র লোকসংখ্যারই উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে লোকসংখ্যা ৬০ কোটী অপেক্ষা বেশী হইবে।

"গোবিন্দনাথ গুহ"

শ্রীবৃন্দাবননাথ শর্ম্মা

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে গোবিন্দনাথ গুহ মহাশয়ের দেহরক্ষা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে -"তিনি অন্ধ্র দেশের গঞ্জাম জেলার বহরমপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন।" বর্ত্তমান অন্ধ্র প্রদেশের মধ্যে গঞ্জাম জেলা অবস্থিত নহে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা নবগঠিত উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই জেলাটি মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সহমরণ

শ্রীবৃন্দাবননাথ শর্ম্মা

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে মহাশয়ের "সহমরণ" নামধেয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দুই-একটি কথা বলিতেছি:—

ঋগ্বেদ সংহিতা দশম মণ্ডল অষ্টাদশ সূক্তে একটি বচন আছে:—

উদীর্ষ্বনার্যভি জীবলোকং
গতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্যদিধিষোস্তবেদং
পত্যুর্জনিত্বমভি সংবভূম।

মর্ম্মার্থ:—হে নারী! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল, গাত্রোত্থান কর তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হইয়াছে, চলিয়া এস! যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া গর্ভাধান করিয়াছিলেন, সেই পতির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, সকলই তোমার করা হইয়াছে।—রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ।

ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল অষ্টাদশ সূক্ত সপ্তম শ্লোকের পাদটীকায় দত্ত-মহাশয় বলিয়াছেন:—ঋগ্বেদে সতীদাহের উল্লেখ নাই, আধুনিক কালে এই কুপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। এই কুপ্রথা ঋগ্বেদসম্মত এইটি প্রমাণ করিবার জন্য বঙ্গদেশের কোন কোন পণ্ডিত এই—"অগ্রে" শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া "অগ্নেঃ" করিয়া এই ঋকের সতীদাহ বিষয়ক একটি অদ্ভুত অর্থ করিয়াছিলেন। আধুনিক কুপ্রথাগুলি সংরক্ষণার্থে কপট শাস্ত্রব্যবসায়িগণ প্রাচীন শাস্ত্রের যে ভূরি ভূরি অযথা ও মিথ্যা অর্থ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই কার্য্যটি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও জঘন্য।

ঐতিহাসিক বদাওনি বলিয়াছেন :—"ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিধবাদিগকে পতির চিতানলে দগ্ধ করিতে সম্রাট আকবর নিষেধ করিয়াছিলেন।" আকবর পুত্র সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের আত্মচরিতে লিখিত আছে:— "বাধ্যতামূলক সতীদাহ ও সন্তানবতী স্ত্রী সহগমন করিবেন না, এই নিষেধ আজ্ঞা তিনি প্রচার করিয়াছিলেন।"

লেখক প্রবন্ধের এক স্থানে বলিয়াছেন : "দেবরকে বিবাহ করা যে-দেশের (ইহুদীর দেশ, উড়িষ্যা ভূভাগ) নিয়ম সহমরণ সে সকল দেশে থাকিতে পারে না।" উড়িষ্যা ভূভাগে অর্থাৎ উৎকলভাষী অঞ্চলে দেবরকে বিবাহ করিবার প্রথা পরিদৃষ্ট হয়। এই প্রথা নিম্নশ্রেণীর শূদ্রাদি সমাজে দেখা যায়। উচ্চ বর্ণের হিন্দুসমাজে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও করণ সমাজে এই প্রথা প্রচলিত নাই। উড়িষ্যাভাষী অঞ্চলে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরমণীরা সহমরণে যাইতেন তাহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে "সতী চউরা," "সতীঘাট," "সতীবট" নামক অনেক স্থান আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই স্থানের রমণীরা জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সতী স্ত্রীর স্মরণার্থে কোন কোন স্থানে 'দাহ' স্থানের উপর সমাধি-মন্দির আজিও পরিদৃষ্ট হয়।

আমি উৎকলভাষী ব্রাহ্মণ, আমার মাতৃকুলের দুই জন রমণী সহমরণে গিয়াছিলেন।

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পি ৩২, মন্মথ দত্ত রোড, বেলগেছিয়া, সাহিত্য-নিকেতন হইতে প্রকাশিত। সাহিত্যপরিষদ গ্রন্থাবলী—৮৯। মূল্য আট আনা।

রবীন্দ্রনাথ যে গ্রন্থকার সে বিষয়ে কারোও সন্দেহ নেই। কিন্তু, তাঁর দীর্ঘজীবনের রচনাবলী যে একটি গ্রন্থশালা অর্থাৎ লাইব্রেরী-বিশেষ এ বিষয়ে অনেকেই এখনও সচেতন হন নি। ক্যাটলগের সাহায্য ছাড়া যেমন বড় লাইব্রেরীতে কাজ করা যায় না, তেমনি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ-পরিচয়ের সাহায্য ছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্যের গবেষণা অসম্ভব। ব্রজেন্দ্রবাবু এই জায়গায় একটি বড় অভাব দূর ক'রে সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তিনি ১৩৩৮ সালের প্রবাসীতে 'রবীন্দ্রনাথের নাম সংযুক্ত প্রথম কবিতা' অমৃতবাজার পত্রিকা (ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫) থেকে উদ্ধার ক'রে ছাপান এবং কবির ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত প্রথম পুস্তক 'কবি কাহিনী'র তারিখ (নভেম্বর ১৮৭৮) সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত করেন। তার পর বহু পরিশ্রমে ১৮৭৮—১৯৪২ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যত কিছু পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে তার নির্ঘণ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংকলিত করেছেন। কবির রচিত বা সংকলিত পাঠ্য পুস্তক, স্বরলিপি-পুস্তক ও সম্পাদিত গ্রন্থও বাদ পড়ে নি। পরিশিষ্ট অধ্যায়ে কবির নামে এবং বেনামে ছাপা কতকগুলি কবিতা এবং ম্যাকবেথের খণ্ডিত বঙ্গানুবাদও স্থান পেয়েছে। এদিকে গবেষণার উদারক্ষেত্র পড়ে রয়েছে এবং আমরা আশা করি রবীন্দ্রনাথের "অচলিত" গ্রন্থ সংকলনের কাজে ব্রজেন্দ্রবাবুর পুস্তিকা প্রভূত সাহায্য করবে। প্রত্যেক রচনার নাম ও তারিখের সঙ্গে ইনি সংক্ষেপে যে নোটগুলি দিয়েছেন তার মধ্যেও প্রচুর পরিশ্রমের আভাস পাই। এই অতিপ্রয়োজনীয় পুস্তিকাটি মাত্র আট আনা মূল্যে এই দুর্বৎসরে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন ব'লে গ্রন্থকারকে সাধুবাদ করি এবং আশা করি স্কুল, কলেজ ও লাইব্রেরীতে "রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়ে"র বহুল প্রচার হবে।

রবীন্দ্র-সংগীত—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর সংগীতকে রচনাবলীর মধ্যে কত বড় স্থান দিয়ে গিয়েছেন তা আমরা জানি অথচ এ পর্য্যন্ত পত্রিকাদির মধ্যে টুক্‌রো-টাক্‌রা প্রবন্ধ ছাড়া কোনও বই লেখা হয় নি। শান্তিদেব ঘোষ সেই অভাব দূর করতে প্রথম চেষ্টা করেছেন বলে তিনি প্রশংসার্হ। রবীন্দ্র-সংগীতের জমাট আবহাওয়ায় শান্তিনিকেতনে তিনি মানুষ হয়েছেন। তার পরিচয় এ পুস্তকের প্রতি ছত্রে পাওয়া যায়। কবির জীবনে শেষ কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে যে সব গান রচিত হ'য়েছে তার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের মত তিনি আলোচনা করেছেন এবং এই আলোচনা আরও বিশদ ভাবে তিনি করে যাবেন এই আশা আমরা রাখি। তিনি স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য এবং দিনেন্দ্রনাথের অকাল-মৃত্যুতে আমাদের যে বিষম ক্ষতি হ'য়েছে তা কতকটা পূরণ করতে তিনি সচেষ্ট হবেন আশা করা যায়। কিন্তু, রবীন্দ্র-সংগীতেও "সেকাল ও একাল সমস্যা" বেশ জটিল হ'য়ে আছে। রবীন্দ্র-কাব্যের মত রবীন্দ্র-সংগীতের ঐতিহ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা সহজ নয়। রবীন্দ্র-সংগীতের পদ, সুর ও ছন্দ কত বিচিত্র ভাবে ও রূপে প্রকাশ পেয়েছে সে রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন এখনও হয় নি। জুলাই ১৮৭৪ প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "পুরু-বিক্রম" নাটকের মধ্যে পাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীত "এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন।" সেই সুদূর কাল থেকে তাঁর জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কত গানই রচনা করেছেন! তার ধারাবাহিক আলোচনা এখনও আরম্ভই হয় নি। অথচ এ বিষয়ে বিশ্বভারতীর ও বিশেষ ভাবে শান্তিনিকেতন সংগীত-ভবনের একটি বড় দায়িত্ব রয়েছে। কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবীর নেতৃত্বে এবং শান্তিদেব প্রমুখ অধ্যাপকদের সাহচর্য্যে এই গবেষণা অবিলম্বে সুরু করা উচিত। শান্তিদেব সংগীতের সঙ্গে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যেরও আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর আলোচনায় যে সকল সমস্যা দেখা দিয়েছে তার মীমাংসা করতে হ'লে এক দিকে বাংলা দেশের নাট্যজগতের সঙ্গে পরিচয় যেমন দরকার তেমনি পাশ্চাত্য অপেরার আঙ্গিক (Technique) সম্বন্ধেও কিছু অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। রবীন্দ্র-সংগীতের আদিপর্ব্বে ১৮৮১ সালে বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্য কেন এবং কি ভাবে আবির্ভূত হ'ল এবং ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত মায়ার খেলা গীতিনাট্যের সঙ্গে তার প্রভেদ কোথায়? মধ্যে ১৮৮৫ সালে দেখি রবীন্দ্র-সংগীতের একজন ভক্ত রবিচ্ছায়া নামে প্রথম সংগ্রহ-পুস্তক ছেপেছেন। কবি তখন মাত্র ২৪ বছরের যুবক কিন্তু প্রায় ১০-১২ বৎসর গান রচনা করে আসছেন এবং সে গানগুলি সেই সুদূর কালেও তিন ভাগে সাজিয়ে ছাপা হয়েছে (কিন্তু সবগুলি ছাপা হয়েছে কি?) বিবিধ সঙ্গীত, ব্রহ্ম সঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীত। সেকালের কবিতার মত রবীন্দ্রনাথের গানেও গ্রহণ-বর্জ্জন কি ভাবে চ'লেছে সে বিষয়ে খুব সতর্ক হ'য়ে গবেষণা করা দরকার। রবীন্দ্র-পদ-কল্পতরুর কাঠামোটি নিশ্চিত ভাবে দাঁড় করাবার পর সেগুলির মধ্যে ছন্দ ও লয়, অলঙ্কার ও দরদ কি ভাবে নব নব প্রেরণায় বিকশিত হ'য়েছে তার কতকটা হদিশ মিলবে। শান্তিদেব এ বিষয়ে আমাদের ঔৎসুক্য জাগিয়েছেন এবং এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুররসিক কবির জীবনের নিভৃত কক্ষে আলোকপাত করেছেন ব'লে তাঁর বইখানির বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

শ্রীকালিদাস নাগ

বিশ্ব-ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক—শ্রীসুখেন্দুবিকাশ মজুমদার, পাবলিশিং সিণ্ডিকেট। মূল্য ২৷০ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সকল অংশই এখন বাঙালীর নিকট আদর ও আগ্রহের জিনিস। তাঁহার বহুবর্ষব্যাপী বিশ্ব-ভ্রমণ কাহিনীও উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ বহু পরিশ্রম করিয়া ও নানা স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া পুস্তকটি প্রণয়ন করিয়াছেন। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের জীবন সকল দিক হইতে আলোচনা করিবেন পুস্তক-খানি তাঁহাদের নিকট মূল্যবান হইবে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী—দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খণ্ড। কাগজের এই দুষ্প্রাপ্যতার দিনেও যে বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ নিয়মমত এই দুই খণ্ড বাহির করিতে পারিয়াছেন, তাহা প্রশংসার বিষয়। দ্বাদশ খণ্ডে বলাকা, ফাল্গুনী, মালঞ্চ, সমাজ, শিক্ষা, শব্দতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্র-সূচীতে আছে, রবীন্দ্রনাথ, 'বলাকা'র পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা, রবীন্দ্রনাথ ও পিয়ারসন,

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। ত্রয়োদশ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে পলাতকা, শিশু ভোলানাথ, গুরু, অরূপ রতন, ঋণশোধ, চার অধ্যায়, ধর্ম, শান্তিনিকেতন ১-৩। চিত্রসূচীতে আছে, জাতীয় মহাসমিতির উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথ ১৯১৭, রবীন্দ্রনাথ (ষ্টাসবুর্গ ১৯২১), রবীন্দ্রনাথ (প্রাগ্ ১৯২১)

স.

সৌন্দর্য্য ও প্রসাধন— শ্রীশরৎকুমারী দেবী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪০, মূল্য ।০।

লেখিকার মতে সৌন্দর্য্য সাধনা-সাপেক্ষ। ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা—চরিত্র গঠনের সাধনা। শরীরকে সুন্দর করিতে হইলে, মনকে সুন্দর, নির্ম্মল করিতে হইবে। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য যে সকল নরনারী পাউডার, স্নো, রুজ প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন লেখিকা গোড়াতেই তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে এইগুলি দ্বারা অ-কান্তি চাপা দেওয়া যায় না এবং প্রকৃত সৌন্দর্য্য লাভ হয় না। কিন্তু লেখিকা প্রসাধনকে একেবারে বাদ দিয়া যান নাই, বরং দেশীয় নানা প্রকারের প্রসাধন-সামগ্রীর প্রস্তুত ও ব্যবহার সম্পর্কে উপদেশ দিয়াছেন। লেখিকার আদর্শ প্রাচীন ভারতের হইলেও তিনি বর্ত্তমান জগতের বাস্তবতায় দৃষ্টি রাখিয়া পাঠক—বিশেষতঃ পাঠিকাগণকে উপদেশ দিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের বিলাতী বিলাসদ্রব্যের প্রসারের দিনে যে সকল তরুণ-তরুণী সরল স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন ও স্বদেশী প্রসাধন দ্বারা নিজেদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে চান এই পুস্তক তাঁহাদের কাজে লাগিবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

শব্দ ও উচ্চারণ—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম্-এ। গ্রন্থ নিকেতন, ১৯২ডি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থের প্রথমার্ধে বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও তাহার বানান-সমস্যা-সম্পর্কে নাতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার বিভিন্ন অংশের কথ্য ভাষার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে সুধীগণ যত বেশী মনোনিবেশ করিবেন ততই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত মঙ্গল হইবে।

বানান সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মতগুলি বিচার করিয়া দেখিবার মত। বড়ই সুখের বিষয়, ভাষার উগ্রতা, উৎকট গোঁড়ামি বা পরমতাসহিষ্ণুতা তাঁহার আলোচনা কলুষিত করিয়া তোলে নাই। তাঁহার মতে 'শব্দের ব্যুৎপত্তিজ্ঞানের সুবিধার জন্য সর্ব্বত্র সংস্কৃতের আদর্শেই তদ্ভব শব্দের বানান গঠিত হওয়া আবশ্যক' (পৃ. ২৮)। তিনি মনে করেন, সংস্কৃত ব্যাকরণের ষত্বণত্বের নিয়ম তদ্ভব শব্দ ছাড়া অন্যত্রও প্রতিপালন করা উচিত। (পৃ. ৪০, ৫৫)। তবে, তোশক, পোশাক প্রভৃতি শব্দে মূর্ধন্য ষকারের ব্যবহার তাঁহার অভিমত নয় (পৃ. ৪৫)। অনুস্বারের ব্যবহার ও রেফযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বিধান প্রসঙ্গে তিনি বলেন—সংস্কৃতের মত 'সংকল্প, শংখ, সংগ বানানই বাংলায়ও গ্রাহ্য, ইহার ব্যতিক্রম গ্রাহ্য নহে' (পৃ. ১০)। 'যে সমস্ত বর্ণ সংস্কৃত ভাষার জন্মকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত নিয়মিত ভাবে দ্বিত্ব হইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগের সহসা অঙ্গহানি করা সমীচীন নহে' (পৃ. ৯)। দুঃখের বিষয়, এই দুই স্থানে গ্রন্থকারের অভিমত সংস্কৃত ব্যাকরণের বা সর্বসম্মত প্রয়োগের অনুগত নহে।

বস্তুতঃ, অনুস্বারের অত্যধিক প্রয়োগ অনেক স্থলে বিশেষ করিয়া আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা গেলেও ইহা সর্বত্র ব্যাকরণসম্মত নহে। রেফযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন বা বিধান বিষয়ে সংস্কৃতে কোনও সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসৃত হয় বলিয়া মনে হয় না—এক শত বৎসর বা তাহার পূর্বে মুদ্রিত বাংলা পুস্তকেও এ বিষয়ে বর্তমান রীতির বৈপরীত্য অনেক স্থলে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

'বানানে আর্য প্রয়োগ' বলিতে গ্রন্থকার কি বুঝাইতে চাহেন উদাহরণ না দেওয়ায় তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। শিষ্ট প্রয়োগ সর্বথা সম্মানের যোগ্য তবে চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস বা কাশীদাস কোন্ শব্দের কিরূপ বানান গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় কি?

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বাণীবিজয়—শ্রীমতী জীবনবালা দেবী। প্রাপ্তিস্থান—নিত্য-গোপাল কুঞ্জ, গোপালবাগ, বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীজয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' অবলম্বনে রচিত 'বাণীবিজয়' গ্রন্থখানি পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। সরল ভাষায় ছন্দ, যতি ও মিল রাখিয়া ত্রিপদী ছন্দে 'বাণীবিজয়' লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে মান অন্তে কলহান্তরিতা শ্রীরাধার বিলাপ অতীব মর্ম্মস্পর্শী—

অভ্রের মত শুভ্র অমল মেঘের খণ্ডগুলি—
তরণীর প্রায় বাহিও তাহায় নিজ পথে পাল তুলি'।
বলাহক দল করি কোলাহল ভাসিবে আকাশ-গাঙ্গে,
তোমার ক্ষেপনী আঘাতে তাদের পক্ষ যেন না ভাঙ্গে।

এইরূপ আন্তরিকতায় গ্রন্থখানি রস-সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে। প্রচ্ছদপটের পশ্চাতে গ্রন্থরচয়িত্রীর প্রতিকৃতি-সম্বলিত ঔষধের বিজ্ঞাপন না ছাপিলেই রুচিসম্মত হইত।

বনফুল—শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস। প্রাপ্তিস্থান—ভাণ্ডিরবন, লাঙ্গুলিয়া পোঃ, বীরভূম। মূল্য আট আনা।

ইহাতে চৌত্রিশটি কবিতা আছে। কবিতাগুলির ভিতর সারল্যের পরিচয় পাওয়া গেল। ছন্দোমাধুর্য্য আছে, ভাবের পারিপাট্য নাই। এতৎসত্ত্বেও 'বনফুল' সুপাঠ্য হইয়াছে।

খেয়াগীতি—শ্রীঅবনীমোহন সান্যাল। তারা প্রেস, গাইবান্ধা। মূল্য বারো আনা।

আলোচ্য গ্রন্থের ভিতর যথাক্রমে 'আবাহন' 'মিলনমোহ' এবং 'প্রেম' নাম দিয়া তিনটি স্তবক রচিত হইয়াছে। লিরিকের লক্ষণ ও গুণ এবং ছন্দ ও ধ্বনি আছে। ভাষা ও কল্পনায় চটুলতা আছে, কতিপয় কবিতায় চরণের মিল আছে, অধিকাংশ কবিতায় মিল নাই। কবিতাগুলি পড়িতে ভালই লাগিল।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রেম—তুলসী দেবী, পারুল দেবী, পাযুষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক ও লেখিকাদের প্রতিকৃতি-সম্বলিত। পৃ. ৬৩। দাম দুই টাকা।

প্রেমের কবিতার বই। ইহাতে চণ্ডীদাস, রামী, রাধাকৃষ্ণ, শেলীর মানসী, দান্তের বিয়াট্রিস—সবই আছেন, তবে কথা হইতেছে—লেখক-লেখিকাদের "সান্ত্বনা দিয়ে কি করিবে লোকে?" কেননা তাহাদের "চোখে রূপনেশা লাগিয়াছে।"

একজন লেখিকা বলিতেছেন,

নেবার যাহা
নিও ওগো নিও।
দেবার যাহা
দিও ওগো দিও। (পৃ. ৩১)

লেখক বলিতেছেন,

পারুল দিয়েছে মোরে স্নেহ-স্নিগ্ধ-সেবা, প্রীতি, দেহ,
ভালবাসা (পৃ. ৬২)

এইরূপ নিতান্ত ব্যক্তিগত যোগাযোগ। এন্টীক কাগজে ছাপাই ও বাঁধাই করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রকাশিত করিবার সার্থকতা আছে, কারণ—

'ভুবন ভরিয়া বাজে সর্ব্বনাশা প্রেমিকের বাঁশী'। (পৃ. ৫৮)

কবিতাগুলির ছন্দ ও ভাষা মন্দ নয়।

শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ওঙ্কার ও গায়ত্রীতত্ত্ব—শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ রায়, বিদ্যার্ণব, এম-এ। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ১।০।

ইহাতে গ্রন্থকার ওঙ্কার মন্ত্রের ও গায়ত্রী মন্ত্রের বিশদ আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে গায়ত্রী ও ওঙ্কারতত্ত্বে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। গীতাতে 'ওম্'কে 'একাক্ষরং ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। দেহান্তকালে ওঙ্কার মন্ত্রের ধ্যান হইতে পরমগতি লাভের বর্ণনা ছান্দোগ্য-

উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ খণ্ডের পঞ্চম মন্ত্রে ও গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ১৩শ মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে এই সকলগুলিরই সুষ্ঠু ভাবে সমাহার ও বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

অন্তঃশীলা—শ্রীরসময় দাশ। পল্লীবাণী কার্যালয়, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

কথার আড়ম্বর যখন সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, সেই সময়ে 'অন্তঃশীলা'র সন্ধান পাইয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। ক্ষুদ্র কাব্য, সব কয়টি কবিতাই চতুর্দশপদী, কিন্তু প্রত্যেকটি স্নিগ্ধ ও সরস। রচনায় পরিচ্ছন্নতা, সংযম এবং ভাবের গাঢ়তা আছে।

রবি সভাজন—শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'ভুবন-ভবন,' খড়দহ।

রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবে শোকোচ্ছ্বাস এবং তাঁহার আদর্শের অনুধ্যান। বইখানি ছোট, রচনা আবেগপ্রবণ, তবু ইহার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের কর্মসাধনার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

যাত্রী—শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য। মডার্ন বুক এজেন্সি, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

বাংলা কাব্যের বিকার দেখিয়া অনেক সময়ে আমরা দুঃখ প্রকাশ করি, কিন্তু কত ভাল কবিতা যে চোখ এড়াইয়া যায়, তাহার হিসাব রাখি না। 'যাত্রী' পড়িয়া সেই কথাই মনে হইল। ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে অনেক স্থলে নূতনত্ব আছে, কিন্তু তাহা ধাঁধা লাগানো নূতনত্ব নয়। শেষের সনেট কয়টি বিশেষ উপভোগ্য।

ফসল—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। ১৫৭ বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

অর্থনৈতিক ভিত্তি শিথিল বলিয়া আজ সমাজে নানা স্থানে ফাটল ধরিয়াছে। জীবন ভরিয়া উঠিতেছে হাহাকারে, সাহিত্যেও শুনিতেছি হতাশার সুর। বর্তমান গ্রন্থে আধুনিক জীবনের ছয়টি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। স্বপ্নময় রঙিন ছবি আঁকিতে লেখকের আগ্রহ নাই, স্পষ্ট রেখায় জোরালো তুলির টানে তিনি সজীব মানুষের ছবি আঁকিয়াছেন। দেহবাদ বা আদর্শবাদ কোনটির আতিশয্য গল্পের স্বাভাবিকতাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। 'ফসল' গল্পে ফকিরের নিষ্ঠুরতা এবং 'খাঁচা' গল্পে মা ও মেয়ের মধ্যে সন্দেহের ব্যবধান লেখক নিপুণ হাতে আঁকিয়াছেন।

কবিতার প্রকৃতি—শ্রীনবেন্দু বসু। ভারতী ভবন, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

কাব্যোপভোগে অনুভূতিই প্রধান অবলম্বন, কিন্তু বিচারণারও প্রয়োজন আছে। ভাল আলোচনা রসগ্রহণে সহায়তা করে। ভিন্নরুচি সাহিত্য-সেবকের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান রসবোধকে প্রসারিত করে এবং নতুন জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করতে শেখায়। নবেন্দুবাবু 'কবিতার প্রকৃতি'তে তাঁর অধ্যয়ন ও উপলব্ধির ফল হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থিত করেছেন। প্রাচীন বা নবীন, দেশী বা বিদেশী কোনও কবিগোষ্ঠীর প্রতি অযথা পক্ষপাত অথবা বিরাগ প্রকাশ করেন নি; সর্ব্বত্র অমায়িক দৃষ্টিতে সৌন্দর্য্য সন্ধান করেছেন। তাঁর মতামতে উগ্রতা নেই, প্রত্যয় এবং সংযত দৃঢ়তা আছে। 'ভাব, রস ও রূপ', 'ছন্দ', 'মিল ও কলি', 'চিত্র ও প্রতীক', 'অর্থালঙ্কার', 'শব্দালঙ্কার', 'অন্যান্য অলঙ্কার', 'কবিতার ভাষা' এবং 'কবিতার প্রকার' নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। আলোচনার ভঙ্গী মনোরম। শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভূমিকায় বইখানিকে স্কুলের অষ্টম শ্রেণী থেকে বি-এ ক্লাস পর্য্যন্ত পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারণ করবার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু, আমাদের ধারণা, এ বই স্কুলের ছাত্রদের অনুপযোগী। হপকিন্স, এলিয়ট, প্রুস্ত প্রভৃতির রচনা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি অথবা নিশীথের গণিকা সম্বন্ধে বিদেশী কবিতা বোঝবার বয়স তাদের নয়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শরৎ-সাহিত্যে নারীচরিত্র—শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত এম-এ। পুঁথিঘর, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসকে কমনীয়, বিশিষ্ট এবং বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে সে-সাহিত্যের নারীচিত্র। এই নারী-চরিত্রগুলি স্বাতন্ত্র্যে যেমন অপরূপ, ইহাদের মধ্যে কোথাও যেন একটা সাদৃশ্য আছে। শরৎ-সাহিত্যে সকল নারীই প্রবল হৃদয়াবেগের অধিকারিণী। এই হৃদয়ের পরিচয়েই তাহাদের পরিচয়। লেখক ক্ষীরোদকুমার অনতিক্রান্ত কৈশোর হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘকাল বঙ্গের বাহিরে বন্দীশিবিরে কাটাইয়াছেন। শরৎ-সাহিত্যে পাওয়া বাংলার ছবি এবং বাংলার নারী তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। বন্দী-জীবনে শরৎ-সাহিত্যের নিভৃত অনুশীলনের ফল এই পুস্তকখানি। নারীর যথার্থ মূল্য ও সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের ধারণা লইয়া লেখক বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে সে ধারণা কিরূপ মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। ভূমিকায় রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান সমাজের জটিল সমস্যাগুলি কিরূপে এই নারী চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া দেখা দিয়াছে তাহাই ক্ষীরোদকুমার নিপুণভাবে একান্ত সহানুভূতির সহিত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।" শরৎচন্দ্রের রচনার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা শরৎচন্দ্রকে বুঝিবার এবং বুঝাইবার পক্ষে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে; কিন্তু স্থানে স্থানে তাঁহার তুলনামূলক মন্তব্যগুলি পড়িয়া বুঝা যায় এই শ্রদ্ধাই অন্যান্য সাহিত্যস্রষ্টা সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টিকে কোথাও কোথাও প্রতিহত করিয়াছে। ভাষা প্রাঞ্জল এবং আলোচনা বিশদ; পুস্তকখানি উপভোগ্য।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ—শ্রীসুধীরকুমার সেন। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১৫৪। মূল্য দেড় টাকা।

পুস্তকখানি খুবই সময়োপযোগী। গ্রন্থকার ইহাতে 'রণ-নীতির ক্রম-বিবর্ত্তন', 'ব্লিৎসক্রীগ', 'ট্যাঙ্ক', 'রণ-বিমান', 'বোমা—ধ্বংসলীলায় যুগান্তর', 'প্যারাশুট সৈন্য', 'নৌ-যুদ্ধের কায়দাকানুন', 'মাইন, শেল, টর্পেডো, আগ্নেয়াস্ত্র', 'সৈন্য-সংগঠন' এই কয়েকটি অধ্যায়ে আজিকার দিনের যুদ্ধ সম্পর্কে বহু অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। এত দিন আমরা মহাযুদ্ধের লীলাক্ষেত্রের কিঞ্চিৎ দূরে ছিলাম, এখন আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে ইহা উপনীত। এ সময় এই সকল বিষয় সম্বন্ধে খানিকটা ওয়াকিবহাল হইলে বিশেষ উপকার হইবে। এদিক হইতে পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। রণ-বিমানপোতের কসরৎ ও তাহার ফলাফল জানিয়া রাখা এখন একান্ত দরকার। পুস্তকখানি সুলিখিত। আমরা প্রত্যেক বাংলাভাষীকে ইহা পাঠ করিয়া দেখিতে বলি। পুস্তকখানিতে বিষয়ানুগ অনেকগুলি ছবিও দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



যাত্রী

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪২শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৪৯

৫ম সংখ্যা

[বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত]

কবিতা-কণা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শূন্য পাতার অন্তরালে
লুকিয়ে থাকে বাণী
কেমন করে আমি তারে
বাইরে ডেকে আনি।
যখন থাকি অন্যমনে
দেখি তারে হৃদয়-কোণে,
যখন ডাকি দেয় সে ফাঁকি
পালায় ঘোমটা টানি।

[শ্রীমতী বীণা দেবীর সৌজন্যে]

জীবনরহস্য যায় মরণরহস্যমাঝে নামি
মুখর দিনের আলো নীরব নক্ষত্রে যায় থামি।

মুসলমান রাজত্বকালে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচার

শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

অনেকের ধারণা আছে যে মুসলমান রাজগণ এবং উচ্চপদস্থ মুসলমান রাজকর্মচারিগণ হিন্দু-সংস্কৃতির বাহন সংস্কৃত সাহিত্যের উচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এ ধারণা যে সর্বাংশে সত্য নয়, বস্তুতঃ, অনেক মুসলমান নরপতি ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী যে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, তার কথঞ্চিৎ প্রমাণ প্রদর্শন এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সংস্কৃতবিদ্যোৎসাহী মুসলমান রাজগণ ও কর্মচারিবৃন্দ বিভিন্ন প্রকারে এ সাহিত্যের প্রসারে সহায়তা করেছিলেন। ১। সংস্কৃতে গ্রন্থাদি প্রণয়ন। ২। কবি জ্যোতিষী প্রভৃতিদের অর্থ ও উৎসাহদান; ৩। সংস্কৃত শাস্ত্র বিষয়ে ফার্সী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন; ৪। বহু প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের ফার্সী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ।

১। সংস্কৃতে গ্রন্থাদি প্রণয়ন

দরাফ খাঁ কৃত গঙ্গাস্তুতি ভক্তিজগতে অতি উপাদেয় সামগ্রী। দরাফের হৃদয়োত্থা ভক্তিমন্দাকিনী হরিপদ-বিনিসৃতা সুরধুনীর মতই পতিতপাবনী ও জগজ্জনবন্দ্যা। পণ্ডিত ধুরন্ধর দারাশিকোর মাতুল শায়েস্তা খাঁর সংস্কৃত কবিতাগুলিও কাব্যপ্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন।

২। কবি, জ্যোতিষী প্রভৃতিদের অর্থ ও উৎসাহদান

মুসলমান রাজত্বকালে যে-সব উচ্চাঙ্গের কবি ভারত-ভূমির ক্রোড় অলঙ্কৃত করেন, তার মধ্যে ভানুকর, অকবরীয়-কালিদাস ও জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ অন্যতম। এতদ্ব্যতীত শাহবুদ্দিনের সভাকবি অমৃত দত্ত, বুর্হান খাঁর সভাকবি পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল, শাহজাহানের সভাকবি হরিনারায়ণ মিশ্র ও বংশীধর মিশ্র, শায়েস্তা খাঁর প্রিয় কবি চতুর্ভুজ ও মহম্মদ খাঁর সভাস্থ লক্ষ্মীপতি প্রভৃতিদের নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(ক) ভানুকর। নানা কারণে মনে হয়, বিভিন্ন কোশ-কাব্যধৃত কবিতাসমূহের রচয়িতা ভানুকর এবং রসমঞ্জরী, রসতরঙ্গিণী, গীতগৌরীশ প্রভৃতি প্রখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের রচয়িতা ভানুদত্ত একই ব্যক্তি। ভানুকরের পিতার নাম গণপতি এবং তিনি মিথিলাবাসী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কবিতাবিশেষে ভানুকর শের শাহের এবং কতিপয় কবিতায় নিজাম শাহের সবিশেষ প্রশংসা করেছেন। শেরশাহের রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় ১৫৪০-১৫৪৫ সাল এবং প্রথম বুর্হান নিজাম শাহের রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় ১৫১০-১৫৫৩ সাল। এ সব ও অন্যান্য কারণ থেকে প্রমাণিত হয় যে ভানুকর খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে দেশজননীর মুখোজ্জ্বল করেছিলেন।

(খ) অকবরীয়-কালিদাস। ইঁহার প্রকৃত নাম গোবিন্দ ভট্ট। হিন্দু কবিসম্রাট্ কালিদাসের কাব্যমহিমা গোবিন্দ ভট্টের কার্যকুশলতায় পরিব্যক্ত বলে স্বকীয় রাজকবির সম্মান প্রবর্দ্ধনার্থ সম্রাট্ আকবর এঁর নাম-করণ করেছিলেন—সাদরে নিজনামের সঙ্গে সংযুক্ত করে—অকবরীয়-কালিদাস। ইঁহার কৃত রামচন্দ্র-যশঃ-প্রবন্ধ ও কোশ-কাব্যোদ্ধৃত বহুবিষয়ক কবিতা প্রভৃতি থেকে বিচ্ছুরিত এঁর প্রতিভাদ্যুতি স্বতঃই সুধীবর্গের বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

(গ) জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ। ইনি পেরুভট্ট ও লক্ষ্মীর তনয় এবং আন্ধ্রদেশবাসী। পেরুভট্ট বহুবিধ বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং স্বীয় পুত্রকেও তত্তদ্বিষয়ে শিক্ষাদানে সুপণ্ডিত ক'রে তোলেন। প্রথম জীবনে জগন্নাথ জয়পুরে একটি টোল স্থাপন করেন। প্রথিত আছে, তিনি কোনও বিখ্যাত কাজী সাহেবকে স্বকীয় অল্পদিন অধ্যয়নের ফল-স্বরূপ আয়ত্তীভূত কোরাণবিদ্যায় পরাভূত করে দিল্লীর সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হন। তিনি লবঙ্গী নাম্নী মুসলমান রমণীর প্রেমে আকৃষ্ট হন এবং তাঁর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

জগন্নাথ তাঁর "পণ্ডিতরাজ" উপাধি প্রাপ্ত হন সম্রাট্ শাজাহানের থেকে। তাঁর আসফ-বিলাস নামক গ্রন্থের প্রথমাংশে এ কথা বলা আছে। সম্রাট্ শাজাহান ও দারা শিকো তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং কবিও যে তাঁদের অত্যন্ত অনুগত ও অনুরক্ত ছিলেন, তা তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কবিতা "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" প্রভৃতি কবিতা

থেকে বুঝতে পারা যায়। দারা শিকোর নৃশংস হত্যার পরে তিনি কঠোর মনস্তাপে দিল্লীর রাজদরবার পরিত্যাগ করেন এবং মথুরায় হরির অর্চনাদিতে দিন যাপন করতে থাকেন। তিনি তাঁর "চিত্র-মীমাংসা-খণ্ডন" নামক গ্রন্থে অপ্পয্য দীক্ষিতের "চিত্র-মীমাংসা" গ্রন্থের যে কঠোর সমালোচনা ও বহুবিধ দোষাদি উদ্ঘাটিত করেন, তজ্জন্যই, বোধ হয়, বিশেষ ক'রে অপ্পয্য দীক্ষিত তাঁর প্রতি অত্যন্ত খড়্গহস্ত হন। ফলে, অপ্পয্য কাশীস্থ কোনও সভায় জগন্নাথকে বিশেষ অপদস্থ করেন। এ অপমানে কবি এত মর্মাহত হন যে তিনি লবঙ্গীসহ গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করেন ব'লে প্রসিদ্ধি আছে।

বিভিন্ন প্রমাণ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি যে কবি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে প্রায় ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বীয় দানে সংস্কৃত ভাষা সমৃদ্ধ ক'রে গেছেন। স্তোত্র, রাজ-স্তুতি, প্রকৃতি-বর্ণন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিস্তর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান—রস-গঙ্গাধর। এ গ্রন্থ যদি তিনি সম্পূর্ণ ক'রে যেতে পারতেন, তা হলে তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক রূপে পরিগণিত হতেন, সন্দেহ নাই।

(ঘ—ঝ) কাশ্মীররাজ শাহবুদ্দিনের সভাকবি অমৃত দত্তের অনেক কবিতা বিভিন্ন কোশ-কাব্যে পাওয়া যায়। তাঁর কবিতা সদুক্তি কর্ণামৃতেও উদ্ধৃত আছে। সুতরাং তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী বা তারও পূর্ববর্তী সময়ে বিরাজমান ছিলেন। পুণ্ডরীক বিট্ঠল ছিলেন বুর্হান খাঁর সভাকবি। তাঁর 'রাগমালা' নামক গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় ১৫৭৬ সালে বিরচিত হয়। শাজাহানের সভাকবি হরিনারায়ণ মিশ্র ও বংশীধর মিশ্রের মধ্যে হরিনারায়ণ ছিলেন সম্রাটের প্রিয়পাত্র এবং বংশীধর সম্রাজ্ঞীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। এ নিয়ে এঁদের মধ্যে রেষারেষির অন্ত ছিল না। পদ্যামৃত তরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে দুটি কবিতা আছে। শায়েস্তা খাঁর আনন্দবর্ধনের নিমিত্ত চতুর্ভুজ তাঁর রসকল্পদ্রুম নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থের প্রথমাংশে শায়েস্তা খাঁর বংশবর্ণন ও গুণকীর্তন আছে। ৬৫ অধ্যায়ে সমাপ্ত এ গ্রন্থ অলঙ্কারশাস্ত্রে একটি অতি উপাদেয় সামগ্রী। ১৭২০ সালে মহম্মদ শাহের সিংহাসনাধিরোহণের পর লক্ষ্মীপতি তাঁর লিপিমালিকা নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে মন্ত্রী সৈয়দ আবদুল্লার নিগ্রহাদি বিষয় সুললিত ভাবে বিবৃত আছে।

৩। সংস্কৃত-শাস্ত্র বিষয়ে ফার্সী প্রভৃতি ভাষায় বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন

এ প্রসঙ্গে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের অগ্রজ দারা শিকোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাঁর সির্-উল-আকবর নামক গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে বেদ ও উপনিষদ্ পাঠে তিনি যে শান্তি পেয়েছেন, অন্য কিছু থেকে তা' তিনি পান নি। সংস্কৃত ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ অনুরাগ হেতু তিনি তাঁর হীরকাঙ্গুরীয় ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যের উপর সর্বদা "প্রভু" শব্দ খোদিত ক'রে রাখতেন। তিনি ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সুফীমতবাদ ও হিন্দুধর্মের সমন্বয়-ব্যঞ্জক মজ্‌ম-উল-বহ্রেন নামক গ্রন্থ রচিত করেন। তাঁর মুকালম-ই-বাবা লাল দাস নামক গ্রন্থে তিনি বাবা-লাল-দাসের সঙ্গে স্বকীয় কথোপকথন প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্মের মর্মোদ্ঘাটনে তৎপর হয়েছেন ও সমধিক কৃতকার্যতা লাভ করেছেন।

৪। বহু প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের ফার্সী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ

এ প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের মুসলমান রাজন্যবর্গের উৎসাহ সর্বতোভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাভারতের প্রথম বঙ্গানুবাদ বঙ্গাধিপ নসির শাহের আদেশে কৃত হয়। হুসেন শাহের প্রচোদনায় মালাধর বসু ভাগবত পুরাণের বঙ্গানুবাদ করেন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের স্ত্রীপর্ব পর্যন্ত অনুবাদ করেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁও শ্রীকর নন্দীকে এবংবিধ কার্যে প্রোৎসাহিত করেন। তিনি যখন চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, তখন তিনি মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অনূদিত করবার জন্য শ্রীকরকে নিযুক্ত করেন।

দিল্লীর মোগল সম্রাটদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ বিষয়ে বিশেষ তৎপর ছিলেন। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর নকীব খাঁকে মহাভারত অনুবাদ করার জন্য নিযুক্ত করেন। রাতের পর রাত আকবর এ অনুবাদের পদ্ধতি বিষয়ে নানা উপদেশ দেন। তারীখ-ই-বদাউনীর গ্রন্থকার আবদুল কাদির সম্রাট কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে এ অনুবাদে নকীবের সহায়তা করেন। কয়েক মাসের ভেতরেই দু-পর্ব সম্পূর্ণ অনূদিত হয়। তার পর মুল্লা সেরী এবং সুলতান হাজী থানেশ্বরী এ অনুবাদের কার্যে নিযুক্ত হন। এ অনুবাদ মহাভারতের প্রতি পর্বের মর্মার্থ গ্রহণে রচিত,

প্রতি কবিতার আক্ষরিক অনুবাদ নহে। এ পুস্তকের নাম দেওয়া হয় রজম-নামা বা যুদ্ধ-পুস্তক। পরে এ গ্রন্থ বহু চিত্রে সুশোভিত হয়। আকবর এ পুঁথির জন্য সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করেন। আবুল ফজল এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেন এবং ইহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিকট বিতরিত হয়। সম্রাটের আদেশে আবদুল কাদের ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করেন এবং ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তা' সমাপ্ত করেন। তাঁরই আদেশে আব্দুল কাদের এবং দাক্ষিণাত্যের একজন মুসলমান সুপণ্ডিত অথর্ব-বেদের অনুবাদ আরম্ভ করেন। তাঁহারা উভয়ে এ কাজে অসমর্থ হওয়ায় সম্রাট্ সেখ কৈজিকে এ কার্যে নিযুক্ত করেন। পরে হাজী ইব্রাহিম সর্হিন্দী এ কার্যভার গ্রহণ করেন। ক্রমে সম্রাটের আদেশে লীলাবতী, তাজক, কাশ্মীরের ইতিহাস, পঞ্চতন্ত্র, হরিবংশ, নলদময়ন্তী, দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা, মহেশ-মহানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ বিভিন্ন মুসলমান পণ্ডিতগণ কর্তৃক ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়।

দারা শিকো ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু পণ্ডিত সংগ্রহ ক'রে তাঁদের থেকে নানা বিষয়ক জ্ঞান আহরণ করেন এবং তাঁদের সহায়তায় নিজেই ফার্সী ভাষায় অনেকগুলি উপনিষদের অনুবাদ করেন। তিনি এ অনুবাদের নামকরণ করেন—সির-উল-আকবর। এ গ্রন্থ তিনি ১৬৫৭ সালে সমাপ্ত করেন। পারস্য ভাষায় তাঁর যোগবাশিষ্ট-রামায়ণের অনুবাদও অতুলনীয় গ্রন্থ।

উপরিলিখিত রাজকীয় প্রচেষ্টা ব্যতীতও বহু মহানুভব হিন্দু ও মুসলমান সাধকদের প্রচেষ্টায় এ উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মসংক্রান্ত সম্মেলনের পথ সুগম হয়ে উঠে। মধ্যযুগের বহু হিন্দু ও মুসলমান সাধু সন্ন্যাসী জাতিধর্ম নির্বিশেষে গুরু বরণ বা শিষ্য গ্রহণ করতেন—স্বকীয় অভিলাষ অনুসারে, তা'তে সামাজিক বাধ্যবাধকতা কিছুই ছিল না। হিন্দুরাও সত্যপীরের পূজা করতেন ও মুসলমানেরাও হিন্দুদের বিভিন্ন পূজায় যোগদান করতেন এবং হিন্দুদের ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে অকৃত্রিম ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। ফলে সংস্কৃত ও বিভিন্ন ভাষা-সাহিত্যও আধ্যাত্মিক দিক থেকে মুসলমানদের অবদানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। যথা—বঙ্গভাষায় নসির মামুদ, ফকির হবিব, সৈয়দ মর্তুজা, ফতন, চাঁদ কাজী প্রভৃতিদের রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী ভাষায় ও ভাবে অতি উচ্চাঙ্গের। হিন্দু ও মুসলমানের এ সম্মেলন পুনরায় সগৌরবে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক—এ প্রার্থনা করি।

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

রাত্রিতে ঘুম ও খোকা যোগমায়াকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে; তার ফাঁকে রামচন্দ্রও উঁকি দেয়। উঁকি দেয়, পত্রবর্ণিত বিষ্ণুপুরের পোষ্ট আপিস, রাজবাড়ি, দলমাদল কামান, মদনমোহনের রাখালবালকবেশে যুদ্ধ, বাগবাজারে আগমন ইত্যাদি অনেক কথা। সেবার খোকাকে দেখিতে উনি যখন হরিপুর গিয়াছিলেন, তখন কয়েকটি রাত্রির মধ্যে এই গল্পগুলি যোগমায়া শুনিয়াছে। ঠাকুর-দেবতার মাহাত্ম্যের কথা—এত ভাল লাগিয়াছে তার যে, অনেক দুপুরবেলায় নিস্তারিণীর কাছে গল্পও করিয়াছে সে। কিন্তু বিষ্ণুপুরের ঐ সব চিত্র মনে উঠিলেই—ঠিক বিষ্ণুপুরটি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে না। বিষ্ণুপুরের শালবনের বদলে কুষ্টিয়ার কোর্ট-প্রাঙ্গণের চিরমর্মরিত ঝাউশ্রেণীকেই সে দেখিতে পায়। কুষ্টিয়ার বাসাঘর-সমন্বিত সেই পোষ্টাপিস, ছোট উঠানসমন্বিত সেই কোয়ার্টার, সেই পশ্চিম প্রাচীর পারে ছাতারে পাখী ভর্ত্তি ঝাঁকরা ডুমুর গাছ, দীর্ঘ তালবৃক্ষের প্রতিটি বালদোয় ঝড়ের দোলা-লাগা অসংখ্য বাবুই পাখীর বাসা। বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ির বদলে—কুষ্টিয়ার বোসেদের নবনির্ম্মিত বাড়িটা চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, আর দীঘির বদলে গোরাই নদীর তীর। ইচ্ছা হয়, আবার বাসায় গিয়া সংসার পাতে। এবার সংসারের স্বাদ স্বাদুতর হইবে। এই পরিপূর্ণ আনন্দকে খণ্ডিত করিতে পূর্ণিমারা নিশ্চয়ই দেখা দিবে না। দেখা দিলেও খোকা যার আছে—তার আবার অভাব কিসের?

পরক্ষণেই মনে হয়, শাশুড়ী দিন দিন বৃদ্ধা হইয়া পড়িতেছেন। এ সময়ে তাঁহাকে ছাড়িয়া বাসায় যাওয়া

ঠিক নয়। বৃদ্ধ বয়সে যদি পুত্রবধূর সেবা-শুশ্রূষাই না পাইলেন···? তার চেয়ে কিছুদিনের ছুটি লইয়া রামচন্দ্র বাড়ি আসুক না কেন। স্বামী, পুত্র, শাশুড়ী লইয়া যোগমায়ার পরিপূর্ণ সংসার আনন্দ ও শান্তিতে ভরিয়া উঠুক।

নিস্তারিণীর মুখে গ্রামের কথা শুনিতে শুনিতে এই গ্রামখানিও যোগমায়ার পরিচিত হইয়া উঠিল। এখানে বৈশাখের শেষ সপ্তাহে যেমন ধুম করিয়া গাজিমের বিবাহ হয়, তেমনটি পৃথিবীর নাকি আর কোথাও হয় না। দুই দিন দুই রাত্রি ডগর বাজাইয়া—ছড়া কাটিয়া দলে দলে লোক পথে পথে ঘুরিতে থাকে। কাঁচামিঠে আম, লিচু, তালশাঁস, তালের পাখা, কত বিচিত্র রকমের মাটির ও কাঠের পুতুল, পাঁপর ভাজা মেলাতলায় বিক্রয় হয়। বাঘ-সিংহের খেলা আসে, আতসবাজি পোড়ে। ধুমধামে তিনটি দিন গ্রামখানি যেন থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে।

দশহরার সমারোহ সে নিজেই দেখিয়াছে। গঙ্গার ঢালু তীরে থরে থুরে নৈবেদ্য সাজাইয়া পুরস্ত্রীরা শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজাইয়া ও ধূপধুনা পোড়াইয়া সেখানটা তখন মুখরিত করিয়া তুলেন।

কিন্তু রথের মেলায়—ফুলগাছ, পাখী, কাঁঠাল, আনারস, কাঠের পিঁড়ি, জলচৌকি প্রভৃতি কেনা-বেচার মধ্যে রথ টানিবার হুড়াহুড়ি—বেশ একটু উত্তেজনার সৃষ্টি করে। উল্টা সোজা দুটি রথের টানে—একটি মাসের আনন্দের খোরাক সঞ্চিত হয়। গুপ্তিপাড়ার রথ টানিলে শ্রীক্ষেত্রের রথ টানার সমতুল্য ফল হয়। আবার উল্টারথের দিন দক্ষিণাভিমুখী টানে অক্ষয় পুণ্য। শাশুড়ী প্রতিবারই গিয়া থাকেন। প্রতিবারই শোলার দাঁড়ে-বসা টিয়াপাখী, সেপাই, আনারস, পিঁড়ি প্রভৃতি লইয়া আসেন। সুন্দর জিনিস; যোগমায়া দেখে, পাড়ার সকলে দেখিয়া প্রশংসা করেন, ঠকা-জেতার কথা বলেন।

দুর্গাপূজায় এ গাঁয়ে তেমন সমারোহ হয় না—যেমন সমারোহ হয় জগদ্ধাত্রী পূজায়। বারোয়ারী বলিয়া ঠাকুর এক দিন বাদে নিরঞ্জন হয়। ঢপ, কীর্ত্তন, পাঁচালী, যাত্রা প্রভৃতিতে গ্রাম গম্ গম্ করিতে থাকে। সন্ধ্যার পর গাজিম-উৎসবের মত ডগর বাজিয়া উঠে; অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আনন্দোন্মত্ত বালক-বৃদ্ধ-যুবা পথে পথে ছড়া কাটিয়া ও নাচিয়া বেড়ায়। তার পর বিজয়ার দিন—সে কি ভিড়, পথে লোক ঠেলিয়া সামনের মুখুজ্জে-বাড়ির ছাদে গিয়া বসিতেও কি কম বেগ পাইতে হয়! কত সং, ময়ূরপঙ্খীর গান, নহবতের বাজনা, ঠাকুরের আগে আগে আলো জ্বালিয়া চলিয়া যায়। গায়ে ময়লা কাপড় জড়াইয়া বুনো বাগ্দীর দল মশাল ধরিয়া দুই সারে শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলিতে থাকে। কেরোসিন তৈলসিক্ত ঘুঁটেগুলি লোহবেড়ের মধ্যে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে; বহু দূর হইতে দেখা যায়—আকাশ ধোঁয়ায় ভরিয়া উঠিয়াছে। মশাল নয়—উহাকে বলে গেস্থির আলো। তার পর ঠাকুরের সে কি সাজ। রাংতা, জরি, চুমকি, শোলার কল্কা, দেবীর কত রকমের কণ্ঠাভরণ—কত রকমের গহনা—কি চমৎকার মুকুট—কি সুন্দর চরণপদ্ম; সিংহের পিঠের উপর রত্নপীঠ, গেস্থির আলোয় গর্জ্জন তেল-মাখা দেবীপ্রতিমার মুখ জীবন-দীপ্তিতে চক্ চক্ করিতে থাকে। কর্ত্তিত হস্তীগুণ্ডের উপর নখর-বিস্তৃত থাবা রাখিয়া কেশর-ফোলানো সিংহেরই বা সে কি দাঁড়াইবার দৃপ্ত ভঙ্গি! শোভাযাত্রায় অনেকগুলি প্রতিমা বাহির হন। গনিয়া কোন কোন বার তেইশ, কোন বার বা পঁচিশ হয়। শুধু জগদ্ধাত্রী নয়—কালী এবং দুর্গা প্রতিমাও এই শোভাযাত্রার মধ্যে থাকে। সর্ব্বশেষ ঠাকুর চলিয়া গেলে তাহার পিছনের দিকে নাকি চাহিয়া দেখিতে নাই।

কেন নাই?

যে শেষ ঠাকুরের পিছন দেখে—আগামী বৎসরে ঠাকুর দেখিবার সৌভাগ্য নাকি তাহার আর হয় না। কাজেই অবগুণ্ঠন বাড়াইয়া পুরস্ত্রীরা বিপরীতমুখী হন; অতি সতর্কতায় কেহ কেহ বা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসেন।

তার পর রাসের মেলা। ও মেলা আরও বিপুল; ইহার বিস্তারও অনেকখানি। বার দুই যোগমায়া ভাঙ্গা রাস দেখিয়াছে। কোথা হইতে আসে এত লোক? কোথা হইতে উঠে সংকীর্ত্তনের এই কলরোল? দোকানের এত খাবার খায়ই বা কে, এত জিনিসপত্র কেনেই বা কাহারা? এক দিন নয়, দুই দিন নয়—এক পক্ষ ধরিয়া এই সব দোকানে কেনা-বেচা চলে। মাদুর, ধামা, কুলা, পেতে, কাপড়, জামা, জুতা, খেজুর, চীনাবাদাম, পাঁপর, নিকেলের গহনা, পুঁতির মালা, ঝুমঝুমি—কত কি জিনিস। রাসের শোভাযাত্রা? বড় গোঁসাইবাড়ির ঢাকের বাদ্যে কানে ত তালা লাগিয়া যায়। তার পর সানাই বাজাইতে বাজাইতে নহবৎ দেখা দেয়, তার পিছনে বিকটাকার এক রাক্ষসী সং। ছোট ছেলেরা সে সং দেখিয়া ককাইয়া মায়ের কোলে মুখ লুকায়, তরুণী মায়েরাও দুরু দুরু বক্ষে

সেই রক্তাক্ত করাল দংষ্ট্রাব্যাদিত রাক্ষসীর পানে চাহিয়া থাকে। কুলার মত কান, মূলার মত দাঁত, তালগাছের গুঁড়ির মত হাত-পা, কোদালের মত নখ আর আগুনের হাপরের মত চোখ! তার পিছনে গাড়ির পর গাড়ি সং। গাড়ির ঝাঁকানিতে কোনটার হাত ভাঙিয়াছে, কোনটার মাথা খসিয়াছে, কোনটা বা হেলিয়া পড়িয়াছে। সব শেষে সঙের সভা আসে। কি বিরাট্ সভা—কত লোক! কোনটায় রাম হরধনু ভঙ্গ করিতেছেন, বেত্রধারিণী পরিবৃতা সীতা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি চারি বোন মাল্য হাতে লইয়া ওপাশে সাগ্রহ-প্রতীক্ষা করিতেছেন, কোনটায় বা নিন্দক চেদিরাজের মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র শূন্যমণ্ডলে আবর্ত্তিত হইতেছে, কোনটায় রাম রাজা হইয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন, কোনটায় বা রাজসূয় যজ্ঞ হইতেছে।

সভার পর ময়ূরপঙ্খী। সেই কালো লম্বা মত চেহারার একটা আদিম জাতীয় স্ত্রীলোক নথ নাকে দিয়া—কয়েকটি পুরুষের সঙ্গে টানিয়া টানিয়া অঙ্গভঙ্গি করত গান গাহিতেছে :—

ওই—আমরা নারী—সারি সারি জল সইতে যাব।

তার পরই বালক-নাচের হাওদা। রাধাকৃষ্ণ সাজিয়া দুইটি কিশোর বালক হাত ধরাধরি করিয়া পায়ে তাল দিয়া নাচিতেছে। তার পর রাধিকা-রাজার হাওদা। ফানুসের মধ্যে মোমবাতি জ্বালিয়া এই সুসজ্জিত হাওদা যখন নয়নপথবর্ত্তী হয়—তখন মহিলারা সমস্বরে হুলুধ্বনি দিয়া উঠেন। হাওদায় পরমাসুন্দরী এক কন্যা সর্ব্বাঙ্গ সোনায় মুড়িয়া কিংখাবের গদির উপর বসিয়া—কিংখাবের বালিশ ঠেস দিয়া, লাল টুকটুকে হাত দু'খানি দু-পাশের বালিশের উপর রাখিয়া ও লাল টুকটুকে পা দু'খানি নীচেয় ঝুলাইয়া আধনিমীলিত নেত্রে শ্রীরাধিকার ঐশ্বর্য্য লইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত স্বল্পাভরণা দুই জন বালিকা শ্বেত চামর ঢুলাইয়া শ্রীরাধিকাকে ব্যজন করিতেছে। অতি ধীরে বেলোয়ারি ফানুসের ঠুন্‌ঠান্ আওয়াজ তুলিয়া হাওদা অগ্রসর হইতেছে। বাইবেঁশেদের লম্বা লম্বা বাঁশ ঘুরাইয়া ঘুরপাক দিয়া নাচ ও মুখে হা-রা-রা হুঙ্কারধ্বনি—যেন ডাকাত পড়িয়াছে—ভয় ও বিস্ময় জাগায় মনে। অনেকক্ষণ ধরিয়া শোভাযাত্রা চলে। একটি দু'টি তো নয়—যেমন জনতার স্রোত—তেমনই অসংখ্য বিগ্রহ—আঙ্লের পর্ব্ব শেষ হইয়া গণনায় ভুল হইয়া যায়। পাশের তরুণী ও বৃদ্ধাতে ঠাকুর গোনা লইয়া হয়ত কলহই হইয়া গেল।

রাসের পর বড় উৎসব আর নাই। ছেলেরা তাই ছড়া কাটিয়া বলে :

রাস গেলেই ফাস (ফরসা অর্থাৎ শেষ)
বসে থাক তিন মাস।

ফাল্গুনে শিবরাত্রি ও দোলের মেলা। শিবরাত্রি এক রাত্রির পূজা—দোলের উৎসব সপ্তাহব্যাপী। পূর্ণিমায় গোকুলচাঁদ ও প্রতিপদে শ্যামচাঁদের দোল, তৃতীয়ায় হরিপুরের মদনগোপালের দোল, পঞ্চমীতে জ্যেঠা গোপীনাথের দোল, সপ্তমীতে শ্রীঅদ্বৈত পাটের সীতানাথের দোল। ফুটকড়াই ভাজা ও মুড়কি, চিনির কদমা, কাটাফেনি ও চিনির মঠ দোলের মেলায় কিনিতে হয়। আবীরে ও রঙে মুখ ও কাপড় রাঙা হইয়া উঠে। হুড়াহুড়ি-দৌড়াদৌড়ির এ এক উৎসব।

দোলের উৎসবে রামচন্দ্রকে বেশি করিয়াই মনে পড়ে যোগমায়ার। দক্ষিণ হাওয়ার দাক্ষিণ্যে যে-উৎসব—সেই উৎসব-দিনে প্রিয়কেই ত মনে পড়ে। আকাশের রং বদলাইয়াছে, গাছের ধূসর বিবর্ণ পাতাগুলি ঝরিয়া নবপত্র-মঞ্জরীতে সেগুলি ঘন সবুজ হইয়া বসন্ত দিনের বাতাসে কাঁপিতেছে, ফুলের গাছে ফুল-ফোটা সুরু হইয়াছে—আম্র-মুকুলের মদাকুল গন্ধের সঙ্গে কোকিল আসিয়া সাধা গলায় সুর মিশাইয়াছে। এই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ পরিবর্ত্তনের জোয়ারে মানুষের মনও তাই সজীব ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। তাই ফাল্গুনের দিনে রামচন্দ্রকে যোগমায়ার বার বার মনে পড়িতেছে।

ফাল্গুনের শেষাশেষি রামচন্দ্র এক দিন বাড়ি আসিল।

৫

শাশুড়ী বলিলেন, হঠাৎ যে বাড়ি এলি রাম?

রামচন্দ্র বলিল, হেড আপিসে বদলি হ'লাম মা। এবার আর পোষ্টমাষ্টার নয়—ইন্‌স্‌পেক্টর হলাম।

—নেসপেক্‌টার? মাইনে বাড়লো ত?

—হাঁ মা, অনেক।

—আহা, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন এত দিনে। বউমার সব গহনা খালাস না হ'লে আমার রাত্তিরে ঘুম নেই বাবা। ছেলেমানুষ বউ, খালি হাত ক'রে বেড়ায় দেখে বুকের গোড়াটা হু হু করে ওঠে।

মায়ের হাতে এক তাড়া নোট দিয়া রামচন্দ্র বলিল, রাখ।

ঘরের মধ্যে যোগমায়া আনন্দে একবার ঘুরপাক খাইয়া লইল। মাহিনা বাড়িয়াছে, ভাল কথা। কিন্তু বাড়িটাও

মেরামত করা দরকার। গেল বর্ষায় নাকি বড় ঘরের ভিৎ বসিয়া জল গড়াইয়াছিল, ছোট ঘরের জানালার খিলান-গুলি ভাঙিয়া গিয়াছে। পাতলা ইট—ঘরের পিছন দিকে নোনা ধরিয়া এমন গর্ত্ত গর্ত্ত হইয়াছে। সিঁড়িটার দুরবস্থার কথা বর্ণনাতীত। যে কোন দিন ওটি হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যাইতে পারে। সিঁড়ি পড়ুক ক্ষতি নাই, কিন্তু মানুষ চাপা পড়িতে কতক্ষণ। শাশুড়ী ত রোয়াকের উপর এই সিঁড়িটার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া সন্ধ্যা-বেলায় বহুক্ষণ ধরিয়া মালা জপ করেন। সরিয়া বসিতে বলিলে বলেন, আর বউ মা, অপঘাত মিত্যু যদি কপালে থাকে, ঘটবে। মানুষের ত হাত নয়।

যোগমায়া ভাবে, কেন মানুষের হাত নয়? রোগে মরা আর সিঁড়ি চাপা পড়ে়া মরা দুইয়ে অনেক তফাৎ। যেখানে একটু সাবধান হইলেই—

শাশুড়ী চিত্রিত ময়ূরের সাপ ভক্ষণের গল্প করেন। যোগমায়া শোনে, পরক্ষণেই ভাবে, ওটা নেহাৎ গল্প। নহিলে দেওয়ালে আঁকা ময়ূর কি করিয়া সাপ গিলিতে পারে। খোকা কোলে আসিবার আগে সে-সব গল্প যোগমায়া নির্ব্বিচারে বিশ্বাস করিত, এখন সেই বিশ্বাসের ভিত্তি তার কিছু কিছু শিথিল হইয়াছে। খোকাকে কোলে পাইয়া তাহার সুখ ও স্বাস্থ্যের পানে যোগমায়ার দৃষ্টি প্রখর হইয়াছে। প্রখর দৃষ্টির তলে আর একটি নয়ন—হয়ত যুক্তি-বুদ্ধি দিয়া গড়া একটি নয়ন—তৃতীয় নয়ন ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইয়া গিয়াছে। কপালে থাকিলে রোগ হয়, সে রোগে মানুষ মরেও; কিন্তু ঠাণ্ডা না লাগাইলে সর্দ্দি কেন হইবে? ঠাণ্ডা লাগানোটাও অদৃষ্ট-সঞ্জাত বলিয়া মানিবার প্রবৃত্তি যোগমায়ার শিথিল হইয়া গিয়াছে। রোগে ঔষধ না খাইয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই কি রোগ সারে? তা যদি সারিত তো এত ডাক্তার-বৈদ্যের সৃষ্টি কেন? যে ব্যাধি দুরারোগ্য, সেইখানে অদৃষ্টের দোহাই দিলে নেহাৎ অশোভন বা অযৌক্তিক হইবে না। হয়ত সেই অদৃষ্টবাদের মধ্যে অনেকখানি সান্ত্বনাও থাকে। কিন্তু পুরাতন বাড়ি মেরামত না হইলে—এক দিন যদি হুড়মুড় করিয়া মাথায় ভাঙিয়া পড়ে—আর সেই ভগ্নস্তূপের তলায় শাশুড়ী, যোগমায়া, সোনার খোকা—

বার বার মাথা নাড়িয়া যোগমায়া আপন মনে বলিতে লাগিল, কাজ নাই আমার গহনায়। সব গহনার বড় গহনা আমার বজায় থাকুক; ও টাকায় আগে বাড়ি মেরামত করিয়া তবে অন্য কাজ!

রামচন্দ্রের পায়ে প্রণাম রাখিয়া মৃদু হাসিয়া যোগমায়া বলিল, কেমন আছ?

—কেমন মনে হচ্ছে?

—মন্দ কি। আমরা চিঠি দিলে দয়া ক'রে উত্তর দাও-এই পর্য্যন্ত। বাড়ির কথা ত তোমার মনেই থাকে না।

—মনে থাকে না ত এলাম কি ক'রে?

সেই কার্ত্তিকের প্রথমে এসেছিলে—আর এই ফাগুনের শেষ। এত বড় শীতটা কেটে গেল—

যোগমায়ার একখানি হাত টানিয়া লইয়া রামচন্দ্র বলিল, দেখেছ ত পোষ্টাপিসের চাকরি, নিশ্বাস নেবার ফুরসৎ কই? তবু বছরে দুতিন-বার এলাম।

—এবার বাসা করছ ত? আমি কিন্তু যাব না।

—যাবে না? সবিস্ময়ে রামচন্দ্র বলিল, মানে?

—মানে আবার কি? এই কচি ছেলে নিয়ে—কেউ নাকি বাসায় যায়? তা ছাড়া মায়ের বয়েস বাড়ছে, না কমছে? ও বয়েসে ওঁর সেবা-শুশ্রূষা যদি নাই হল—তবে ছেলের বিয়ে দিয়ে ওঁর লাভ!

—তার পর? আমি না এলে তোমার কষ্ট হবে না ত?

—তুমি আসবে না-ই বা কেন? বছরে তিনবারও ত আসতে পার।

—তিন বার এলেই যদি তুমি খুসি হও, তাই আসব। কিন্তু চিঠিতে বার বার আসার কথা লিখবে না ত?

—ইস্, আমিই যেন ওঁকে দেখতে চাই, উনি যেন চান না?

রামচন্দ্রের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যোগমায়া চক্ষু মুদিল।

রামচন্দ্র বলিল, আমার চেয়ে তা হ'লে সংসারই তোমার বড় হ'ল।

যোগমায়া চোখ না চাহিয়াই বলিল, তুমি ছাড়া সংসার আমার আছে নাকি? তবে তোমার চেয়েও বড় আর একজন আমার আছে।

—তা ত বলবেই, বিয়ে ফুরোলেই ছাঁদনাতলায় লাথি। শেকড় কেটে ফুল নিয়ে অত মাতামাতি ভাল নয়, মায়া।

—ইস্, আমার শেকড় কাটে এত বড় সাধ্যি কার তা ত জানি না!

রাত্রিতে যোগমায়া বলিল, যাই বল, গহনা না হ'লে এক দিন মনে যা কষ্ট হত! আজ আর তা হয় না।

রামচন্দ্র বলিল, যার হাতে যা টাকা দিলাম—উনি বলেন গহনা না ছাড়িয়ে আনালে তোমার পাড়ায় বেরুনো দায় হয়ে উঠেছে। নেমন্তন্ন খাওয়াও নাকি বন্ধ।

—তা হলে ত আমি বড্ড রোগা হয়ে গেছি, নয়? সুগোল বাহু অন্দোলিত করিয়া যোগমায়া হাসিল।

রামচন্দ্র বলিল, তা হলে তুমিই বুঝিয়ে বল মাকে।

—না, তুমিই বলবে। বউয়ের গহনা না ছাড়িয়ে বাড়ি হবার কথা শুনলে উনি খুসিই হবেন।

—আচ্ছা মায়া, একটা কথা আমায় বলবে? তোমরা মেয়েছেলেরা এই সংসার বলতে যা বোঝ—এই স্বামী, পুত্র, জা, ননদ, ঘরবাড়ি—এর মধ্যে কোন্‌টা তোমাদের কাছে বেশি ভাল লাগে?

—সবটাই আমাদের ভাল লাগে।

—তবু—ওরই মধ্যে কোন্‌টা বেশি?

যোগমায়া উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিল।

রামচন্দ্র বলিল, হাসলে হবে না, বলতে হবে।

যোগমায়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, আমার একটা কথার জবাব দাও ত? খিদে পেলে ভাত, ডাল, তরকারি কোন্‌টা তোমার বেশি ভাল লাগে?

—খিদের সঙ্গে সংসারের তুলনা? খিদে পেলে খাওয়ার যা উপকরণ সবগুলিই ত ভাল লাগে।

যোগমায়া হাসিতে হাসিতে বলিল, পেটুক কোথাকার!

যোগমায়ার হাত টানিয়া ধরিয়া রামচন্দ্র বলিল, তাহ'লে তুমিও পেটুক। আমার খিদে পেটের—আর তোমার খিদে হ'ল গিয়ে মনের।

যোগমায়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গেল।

খোকার বিছানা বদলাইয়া খোকাকে কোলে লইয়া সে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল—রামচন্দ্রের সম্মুখে। রামচন্দ্র মুগ্ধবিস্ময়ে যোগমায়াকে দেখিতে লাগিল। লীলাচটুলা যোগমায়া যেন অতীতের স্মৃতিচিত্রের মত মনের দেওয়াল-বিলম্বিত হইয়া আছে,—সম্মুখে দাঁড়াইয়া নূতন যোগমায়া। জননী—রামচন্দ্রের জননীই বুঝি নব-কলেবরে এই তন্বী কিশোরীর মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ছেলেবেলাকার সেই মাধুর্য্য-উদ্বেল আঁখিতারার মধ্যে, ধীরসন্তর্পিত স্পর্শের মধ্যে ও উত্তীর্ণ কুমারীকালের প্রেম-পরিবর্ত্তিত শুভ্র স্নেহের মধ্যে নবীভূত মাতৃ-মহিমায় তিনি জাগিয়া উঠিতেছেন। মা নহে, যোগমায়া নহে—শাশ্বত নারী।

যোগমায়া হাসিতে হাসিতে বলিল, হাঁ ক'রে চেয়ে দেখছ কি? ছেলেকে একবার কোলে কর।

রামচন্দ্র হাত পাতিল, যোগমায়া ঈষৎ অবনত হইয়া খোকাকে রামচন্দ্রের যুগ্মবাহুর আশ্রয়ে রাখিয়া বলিল, কেমন জব্দ!

রামচন্দ্র হাসিয়া বলিল, কিসের জব্দ?

বলেছিলে না—দায় পড়েছে আমার তোমার ছেলে কোলে করতে?

—বলেছিলামই ত।

—তবে এখন যে বড় কোলে করলে?

রামচন্দ্র হাসিয়া খোকাকে বুকের কাছে আনিয়া কহিল, করলামই ত। এ যে আমার ছেলে।

—ইস্! তর্জ্জনী হেলাইয়া যোগমায়া বলিল, শোবার সময় যদি ওকে কাছে রাখতে পার—তবেই বুঝব তোমার ক্ষমতা।

রামচন্দ্র নীচের বিছানা দেখাইয়া কহিল, আমায় ওখানে শুতে হবে নাকি?

—হবেই ত।

—আর তুমি?

—এই খাটে শোব, যেখানে তুমি বসে আছ।

—পারবে শুতে? পাপ হবে না?

—না গো না।

এমন সময় খোকা কাঁদিয়া উঠিতেই রামচন্দ্র শশব্যস্ত হইয়া কহিল, শীগ্‌গির নাও। আঃ—নাও না।

—কেমন জব্দ? আমার ছেলে! ছোট্ট বলে ওর বুঝি বোধ-শোধ নেই? আমার ছেলে! কেমন জব্দ! হাসিতে হাসিতে যোগমায়া ছেলেকে কোলে করিয়া মেঝেয় পাতা বিছানায় আসিয়া বসিল ও রামচন্দ্রের দিকে পিছন করিয়া তাহাকে শান্ত করিতে করিতে কহিল, আলোটা কমিয়ে তুমি শুয়ে পড়।

—তুমি শোবে না?

—এই ত আমার বিছানা। খোকাকে চুপ করান তোমার কর্ম্ম নয় বলেই এই ব্যবস্থা করেছি। দুর্গা—দুর্গা।

যোগমায়া স্তন্যপানরত শিশুকে বুকে চাপিয়া রামচন্দ্রের দিকে পিছন ফিরিয়াই কাত হইল। অতঃপর তাহার গুন্‌গুন্ ধ্বনি শোনা গেল!

খোকা আমাদের সোনা
স্যাকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেব দোনা।

নারী কণ্ঠোত্থিত সেই অতি মৃদু স্বর—ভাঙ্গা ঘরের বাতায়ন দিয়া—অতীত ও অনাগত কালের তরঙ্গকে স্পর্শ করিবার আগ্রহে বিপুল পৃথিবীর বুকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

সমাপ্ত

সুরের যাদুকর রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কবিতাকে উচ্চস্তরের কবিতা হ'তে হ'লে দুটো গুণ তার মধ্যে থাকা দরকার। কানের দাবীকে সে তৃপ্ত করবে, প্রাণের দাবীকেও। কবিতার মধ্যে শব্দ-চয়নের এমন নিপুণতা থাকা চাই যে ভাষার সৌন্দর্য্য আমাদের কানকে মুগ্ধ ক'রে দেবে। সাপ যেমন ক'রে সাপুড়িয়ার বাঁশী শুনে আনন্দের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, বড় কবির কবিতা পড়তে পড়তে আমরা নিজেকে আনন্দের মধ্যে তেমনি ক'রেই হারিয়ে ফেলি। সুর-সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে সুদূর দিগন্তের স্বপ্নের মধ্যে আমাদের মন নিঃশেষে ডুবে যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে আমাদের কানকে তৃপ্তি দেবার এই উপাদান রয়েছে সুপ্রচুর। শব্দের তিনি রাজা—ভাষার তিনি যাদুকর—সুরের তিনি ঐন্দ্রজালিক। আমাদের কানের দাবীকে তিনি মিটিয়েছেন তাঁর ভাষার যাদু দিয়ে। শব্দের মাধুর্য্য আমাদের কানকে যে কত আনন্দ দিতে পারে তারই পরিচয় দেবার জন্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার থেকে এখানে গোটাকতক নমুনা তুলে দিলাম। 'উর্ব্বশী'তে আছে:

কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকাবয়সী
হে অনন্ত যৌবনা উর্ব্বশী
আঁধার পাথার তলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মাণিক মুকুতা ল'য়ে করেছিলে শৈশবের খেলা,
মণিদীপদীপ্ত কক্ষে সমুদ্রের কল্লোল সঙ্গীতে
অকলঙ্ক হাস্য মুখে প্রবাল-পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে।
যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।

'লীলা সঙ্গিনী'তে রয়েছে:—

নদী কূলে কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি' করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষা-শেষের গগন কোণায় কোণায়
সন্ধ্যা-মেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জন খনে কখন অন্যমনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

এর নামই ত সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল আর কবিদের একটা প্রধান কাজ হ'ল এই সঙ্গীতের ইন্দ্রজালকে মৃত্তিকার কোলে নিয়ে আসা।

মনে আছে সে কি সব কাজ, সখি,
ভুলায়েছ বারে বারে।
বন্ধ দুয়ার খুলেছে আমার
কঙ্কন ঝংকারে।
ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেতো মোর বাতায়নে এসে
কখনো আমের নব মুকুলের বেশে,
কভু নব মেঘ ভারে
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে
ভুলায়েছ বারে বারে।

শব্দের মধ্যে সুরের যে মাধুর্য্য রয়েছে—সেই মাধুর্য্য-ধারা আমাদের চিত্তকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে। হাজার বার ক'রে পড়েও আমাদের কান তৃপ্ত হতে চায় না—যত বার পড়ি তত বারই নতুন লাগে—কবিতার ভাষা পুরোনো আর হ'তে চায় না।

'নববর্ষা'র মধ্যে রয়েছে:

গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত
দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে।

* * *

ওগো নির্জ্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে
দোদুল দুলিছে।
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক,
কবরী খসিয়া খুলিছে।
ওগো নির্জ্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে।

এক কথায় শুধু বলতে ইচ্ছা করে, চমৎকার। কান

জুড়িয়ে যায়—ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে গেলেও অবসাদ আসে না। শব্দের যাদু কানকে তৃপ্ত ক'রেই ক্ষান্ত হয় না, মনের মধ্যে নববর্ষার রূপটিকেও রেখায় রেখায় ফুটিয়ে তোলে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের ছন্দমাধুর্য্য কানের মধ্যে সুধা বর্ষণ করে।

কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া
রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া;
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরাণ ঢালি'।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল তালে তালে দিব তালি।

প্রথম যৌবনে এই লাইনগুলির আবৃত্তি জীবনে এনেছে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দের অনুভূতি। যত বারই পড়েছি তত বারই হৃদয় আনন্দরসে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। তার পর গঙ্গানদীর উপর দিয়ে অনেক জল সাগরে চলে গেছে—কিন্তু আজও যখন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ পাঠ করি—নূতন ক'রে প্রথম যৌবনের সেই আনন্দেরই আস্বাদন পাই।

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোর না বিড়ম্বিত তা'রে।
আজি খুলিও হৃদয়দল খুলিও
আজি ভুলিও আপন পর ভুলিও,
এই সঙ্গীত মুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিও।

এই সুন্দর শব্দগুলির নিপুণ সমাবেশও কি চমৎকার! কান জুড়িয়ে দেয়। নিরুদ্দেশ যাত্রায় আছে:

বলো দেখি মোরে শুধাই তোমায়, অপরিচিতা,
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কুলে দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিকবধূ যেন ছল ছল আঁখি অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
উর্ম্মিমুখর সাগরের পার,
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে।
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে কথা না বলে।

বাস্তব জীবনের সমস্ত কঠোরতাকে, কিছুক্ষণের জন্য অন্ততঃ, ভুলিয়ে দেয় এমনি-সব কবিতা পড়ার আনন্দ। ধূসর মরুর তৃষিত বক্ষ যে আনন্দে নববর্ষার জলধারাকে গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে আমাদের উপবাসী কর্ণ সেই আনন্দেরই আস্বাদন পায়। কানের এই যে তৃপ্তি—একে অনির্ব্বচনীয় বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

'দুঃসময়' কবিতাটির এই লাইনগুলিও কানে কী চমৎকার লাগে।

এ নহে মুখর বনমর্ম্মর গুঞ্জিত,
এ যেন অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুম রঞ্জিত,
ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে।

হাজার বার ক'রে পড়লেও কান কিছুতেই তৃপ্ত হ'তে চায় না! মনে হয় আবার পড়ি! অথবা—

আজি শ্রাবণ-ঘন গহন মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।

সুন্দর কথা দিয়ে এমন মালা গাঁথা বাংলার কাব্যজগতে কি দুর্লভ নয়?

কূজনহীন কানন-ভূমি
দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে
একেলা কোন পথিক তুমি
পথিক হীন পথের পরে।

একবার পড়লে আর ভোলা যায় না—প্রাণের মধ্যে গানের রেশ থেকে যায়। 'বর্ষামঙ্গলে' রয়েছে:

যূথী-পরিমল আসিছে সজল সমীরে
ডাকিছে দাদুরী তমালকুঞ্জ তিমিরে,
জাগো সহচরী আজিকার নিশি ভুলো না,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।
কুসুম পরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে
কোথা পুলকের তুলনা।
নীপশাখে সখি ফুলডোরে বাঁধ ঝুলনা।

শব্দবিন্যাসের এই অতুলনীয় পারিপাট্যের সঙ্গে পরিচিত হবার যে পুলক—এ পুলকের সত্য সত্যই তুলনা হয় না। আমাদের কানের দাবীকে তৃপ্ত করবার এমনি অজস্র উপকরণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছে। এখানে তারই মধ্য থেকে নমুনাস্বরূপ পাঠক-পাঠিকাগণকে কিছু কিছু উপহার দিলাম। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে গিয়ে চেষ্টারটনের একটা দামী কথা বারে বারেই মনে হয়। টেনিসন্ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একটা জায়গায় তিনি লিখেছেন:

Beauty is unanswerable, in a poem as much as in a woman.

সৌন্দর্য্য আমাদিগকে নির্ব্বাক ক'রে দেয়—কবিতা এবং নারী উভয়েরই সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যের ডাকে সাড়া না দিয়ে কোন উপায় নেই। সুন্দরী হেলেনের জন্য গ্রীসের বীরেরা বিদেশে রণক্ষেত্রে বুকের রক্ত দিল।

তার আচরণের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তারা গণনার মধ্যে আনলো না। শব্দের যাদুতে কবিতা যেখানে সৌন্দর্য্যে ভরপুর হ'য়ে উঠেছে—সেখানে আনন্দে আমাদের মন আপনা থেকেই পূর্ণ হ'য়ে যায়। কবির ধারণা আমাদের কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে—কিন্তু তার জন্য কবিতাকে আমরা অবহেলা করতে পারি নে। শব্দের মাধুর্য্যকে আশ্রয় ক'রে সে যে সুন্দর হ'য়ে উঠেছে! সুন্দরের কাছে মাথা যে নত করতেই হবে; কারণ—Nothing in the world is so athirst for beauty as the soul, nor anything to which beauty clings so readily is there. মানুষের আত্মা সৌন্দর্য্যের জন্য যেমন কাঙাল এমন কাঙাল পৃথিবীতে আর কিছু নেই। সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ মানুষের আত্মায় যত কাল অম্লান থাকবে—রবীন্দ্রনাথের কবিতাও তত কাল কাব্যানুরাগী অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে সমাদর পাবে।

কিন্তু এ তো গেল কানের দাবীর কথা। এইবার এলো প্রাণের দাবীর কথা। কবিতাকে মহাকালের বুকে অম্লান দীপ্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে হ'লে কেবল কানকে খুসী করতে পারলেই যথেষ্ট হ'ল না। আধুনিক কবিতায় ভাষার আতশবাজীর জোরে কানকে ভুলিয়ে বাহবা লাভের একটা চেষ্টা চলেছে। শব্দ প্রয়োগের কারসাজি দেখিয়ে কবিযশঃপ্রার্থী হবার এই প্রয়াস কৌতুকপ্রদ সন্দেহ নেই কিন্তু কাব্যজগতে অমরকীর্ত্তির অধিকারী হ'তে হ'লে কর্ণে সুধাবর্ষণ করবার ক্ষমতাই যথেষ্ট নয়, ভাষার নূতনত্ব দিয়ে মনকে চমকে দেবার ক্ষমতাও যথেষ্ট নয়। জীবনের আদর্শের সঙ্গে যে কবিতার কোন যোগ নেই, আত্মার গভীরতম ক্ষুধা সে কবিতার মধ্যে তৃপ্তির কোনো উপাদান খুঁজে পায় না, যে কবিতার মধ্যে কেবলি অর্থহীন কল্পনার বিলাস—কবিতা হিসাবে তাকে খুব মূল্য দেওয়া চলে না। আমাদের আত্মার যে চরম দাবী—কবিতাকে গৌরবের আসন নিতে হ'লে সেই দাবী পূর্ণ করা চাই—It must respond to the ultimate demands of the Soul.

প্রশ্ন

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

১৭

লতিকা তখন স্নানের ঘরে ঢুকিয়াছিল। স্নানশেষে বাহিরে আসিয়া দেখে নীরেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আছে। লতিকা তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিল—কি রে নীরেন কি হয়েছে?

—মাষ্টার মশায় চলে গেলেন দিদি! বলিয়াই সে দিদির কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

—চলে গেলেন? কোথায়?

—তাঁদের বাসায়—আর কোথায়?

—সে কি? কি হয়েছে ভাল ক'রে বল্?

—বাবা মাষ্টার মশায়কে আমাদের বাড়ী হ'তে চলে যেতে বলেছেন তাই ত গেলেন।

—বাবা যেতে বলেছেন? তুই নিজে শুনেছিস্?

—না দিদি, বাবা ঠিক বলেন নি—বলেছেন অজিত বাবু, বাবাও সেখানে ছিলেন।

লতিকার বুঝিতে এক মুহূর্ত্তও দেরি হইল না—বুঝিল গতকল্যকার ব্যাপারই মূল—তাহার পিতা ভীতু মানুষ, তাই অজিত আসিয়া এই কাণ্ড করিয়াছে।

—তিনি কি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছেন নীরো? তুই দেখেছিস্?

—তিনি নিজের ঘরে গিয়ে কাপড়-জামা গুছিয়ে নিচ্ছিলেন, আমি দেখে তোমায় ডাকতে এসেছি।

—তা আগে ডাকিস নি কেন বোকা ছেলে—চল ত যাই।

লতিকা এক প্রকার ছুটিয়া দোতালায় অবনীর ঘরে গিয়া ঢুকিল, কিন্তু সে ঘর তখন শূন্য—অবনী সেখানে নাই। ঘরের যা যেখানে ছিল, ঠিক তেমনি আছে, শুধু অবনীর পরিধানের কয়খানা কাপড় আর জামা আলনার উপর হইতে সে লইয়া গিয়াছে।

সেখান হইতে ছুটিয়া লতিকা একেবারে গেটের কাছে

আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে সোজা রাস্তায় যত দূর চোখ যায় দৃষ্টি মেলিয়া দেখিতে লাগিল।

নীরেন হাত বাড়াইয়া বলিল—ঐ দেখ দিদি, ঐ যে সুটকেস হাতে ক'রে মাষ্টার মশায় যাচ্ছেন।

লতিকা একদৃষ্টে ঠিক তাহারই পানে ছিল তাকাইয়া। অবনীর সেই ঋজু দেহের দৃঢ় পদক্ষেপ তাহার সকল সংকল্প ভুলাইয়া দিল—কেমন করিয়া সে তাহাকে ফিরাইবে—নীরেনকে দৌড়াইয়া ডাকিয়া আনিতে বলিবে কি বলিবে না, কিছুই তাহার মনে রহিল না।

জনস্রোত ক্রমবিলীয়মান অবনীর দেহটাকে ক্রমে ক্রমে আপনার মধ্যে মিশাইয়া লইল।

নীরেন তাহার দিদির গায়ে ধাক্কা দিয়া বলিল—কি দেখছিস্ দিদি? মাষ্টার-মশায় যে চলে গেলেন।

লতিকার চমক ভাঙিল। তাই ত অবনীকে ত আর দেখা যায় না। সে হঠাৎ নীরেনের উপরে রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল—তুই এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিলি হতভাগা—দৌড়ে গিয়ে ডেকে আনতে পারলি নি?

—এখন যাব দিদি? যাই? বলিয়া নীরেন রাস্তায় পা দিতেছিল আর কি। লতিকা তাহার একখানা হাত টানিয়া ধরিয়া বলিল—এখন কোথায় তাঁকে খুঁজে পাবি, শেষে মোটর চাপা পড় আর কি! ঠিক এমন সময় পিছনে জুতার শব্দ হইল—লতিকা তাকাইয়া দেখিল অজিত আসিতেছে বাহির হইয়া। সকল রাগ তখন তাহার গিয়া পড়িল অজিতের উপর। সেই ত অবনীকে তাড়াইয়াছে, কি অধিকার আছে তাহার কেন সে আসে এ বাড়ীতে!

অজিত কাছে আসিয়া হাসিয়া বলিল—তোমাদের মাষ্টারটা আজ চলে গেল লতিকা? তোমার বাবা ত কিছুতেই তাকে যাওয়ার কথা বলতেই চান না—শেষে আমিই না বললাম তাকে—তবে ত সে গেল। কি বিপজ্জনক লোক! বাপ রে আর কিছু দিন ও এখানে থাকলে যে তোমাদের বাড়ী সি. আই. ডি. পুলিসের একটা রীতিমত সন্দেহজনক স্থান হয়ে উঠ্‌ত!

—কিন্তু সেজন্য আপনার মাথাব্যথা কেন অজিতবাবু?

—তার মানে?

—মানে অতি স্পষ্ট—কে আপনাকে এ অনধিকার-চর্চ্চা করতে বলেছে?

—অনধিকারচর্চ্চা? তোমাদের মঙ্গলামঙ্গলের কথা বলা আমার অনধিকারচর্চ্চা?

—হাঁ, আমি ত তাই জানি।

—তা হ'লে তুমি ভুল জেনেছ, তোমার বাবাই আমাকে এ অধিকার দিয়েছেন।

—বাবাকে ভুলানো খুব সোজা, কিন্তু আমি তেমন নই,—আর বাবার মতই চূড়ান্ত নয়, আমারও একটা মত আছে জানবেন। আপনাকে যদি বিয়ে করতে হয়, তবে তার আগে আমি আফিং খাব—বলিয়া লতিকা দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

অজিতের ক্রূর চক্ষু লতিকার দিকে তাকাইয়া জ্বলিয়া উঠিল—তার পর—মাথা হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে গেটের বাহির হইয়া গেল।

১৮

বাসায় ফিরিয়া সেই যে অবনী বাহির হইয়া গিয়াছিল, আর ফিরিল শেষ বেলায়। এতক্ষণ কোন্ রাস্তায় রাস্তায় পার্কে পার্কে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে তাহার ঠিক নাই। সে ঘরে ঢুকিয়া দেখে মালতী ঘরের এক পাশে ব্রাকেটের উপরে পরেশের কাপড়-জামাগুলা পরিপাটী করিয়া গুছাইয়া রাখিতেছে, আর পরেশ বিছানায় উবু হইয়া পড়িয়া হাসিয়া হাসিয়া তাহার সহিত কি যেন বলিয়া চলিয়াছে। সে ঘরে ঢুকিতেই মালতী সঙ্কোচে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পরেশ বলিল—এতক্ষণ কোথায় ছিলি বল ত অবনী—আয় ব'স্। মালতীর সহিত অবনীর এক প্রকার পরিচয় নাই বলিলেই চলে—সেই যে-দিন তার হইয়া ঝগড়া করিয়া খোট্টা লোকটার মাথা ফাটাইয়াছিল, সেদিন ত সে তার মুখখানি পর্য্যন্ত দেখে নাই, তার পরই সে গিয়াছে অনাদিনাথের সহিত কলিকাতা ছাড়িয়া—আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াও সে এখানে থাকে নাই, কাজেই মালতীর সহিত তাহার কোন পরিচয়ই হইতে পারে নাই। আজ অবনী ঘরখানার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। ঘরখানিতে এই কয় মাস পূর্ব্বের সে চেহারা আর নাই। পূর্ব্বে ধূলায় থাকিত মেঝে এক ইঞ্চি পুরু হইয়া, কোথাও ছেঁড়া কাগজ, কোথাও চীনাবাদামের খোসা—বিছানাগুলা একান্ত বিশ্রী ভাবের ময়লা—তার মাঝে আবার কালির দাগ—এক পাশে যে আধভাঙা টেবিলখানা সেখানার উপরে থাকিত রাশীকৃত বই—একখানার উপরে আর একখানা এলোমেলো ভাবে গাদা করা। কিন্তু আজ আর তাহার লেশমাত্র নাই, সারা ঘরখানা পরিপাটী করিয়া সাজান,

যত স্বল্প আসবাবপত্রই হউক, অন্য যত দীনতাই থাকুক—শ্রীহীনতার চিহ্ন ইহার কোথাও আজ নাই। এই কথা মনে হইতেই অবনীর নিজের জীবনের এই কয়টা মাসের কথাও মনে পড়িয়া গেল। নিতান্ত দরিদ্রের সন্তান সে—কিন্তু অনাদিবাবুর বাড়ীতে এক প্রকার বিলাসের মধ্যেই তাহার দিন কাটিয়াছে বলিতে হইবে। আর প্রথম সঙ্কোচ কাটিবার পর এমনই করিয়াই লতিকা আসিয়া তাহার ঘরখানাকে সুশ্রী করিয়া তুলিত—আলনার উপরে ধোপার বাড়ীর কাপড় চাদর ঠিক করিয়া রাখিত—ব্রাকেটে ঝুলাইয়া রাখিত ব্যবহারের জামাগুলা ;—টেবিলের উপরে সাজাইয়া রাখিত বই, লিখিবার সরঞ্জাম। এই সব ভাবিতেই অবনীর মন আবার নূতন করিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল। সে চোখ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল। পরেশ ইতিমধ্যে কখন বাহির হইয়া গিয়াছিল। এখন হঠাৎ মনে হইল অনাদিবাবুর বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় যোগীন তাহার হাতে একখানা চিঠি দিয়াছিল, চিঠিখানা তাহার মা দিয়াছিল, কিন্তু তখন উত্তেজনার মুখে সে চিঠি পড়িতে পারে নাই—তার পর আর সারাদিন সে কথা মনেই ছিল না। এখন পকেট হইতে পত্রখানা বাহির করিয়া পড়িতে বসিল।

তাহার মা জানাইয়াছেন তাহার বোনের বিবাহ এই অগ্রহায়ণ মাসের শেষে তিনি একেবারে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন—ছেলেটি তাঁহাদের সকলেরই পরিচিত, বড় ভাল ছেলে। এ ছেলে হাতছাড়া হইলে আর এমনটি মিলিবে না—তাঁহারা খুব কমেই রাজী হইয়াছেন। অবনী যেন পত্র পাঠমাত্র দুই শত টাকা সংগ্রহ করিয়া বাড়ী রওনা হয়। টাকাটা যেন অনাদিবাবুর নিকট হইতেই সংগ্রহ করিয়া আনা হয়—সে যে সেখানে সুখে আছে আর অনাদিবাবুও যে তাহাকে স্নেহ করেন ইহা জানিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি যে টাকাটা চাহিলেই দিবেন এই বিশ্বাসেই তাহার মাতা এই বিবাহ ঠিক করিয়াছেন। আর যদি নিতান্তই টাকা সে যোগাড় করিতে না পারে, তবে তিনি যে জমি-জমা বাঁধা দিয়া এ কাজ করিবেন তাহা জানাইতেও ছাড়েন নাই। কর্ত্তা তাঁহার নামে যে জমি-জমা করিয়াছেন, তাহা তিনি মেয়ের জন্যেই বিক্রি করিয়া দিবেন—তার পর তাঁহার কপালে যাহা থাকে হইবে, ইত্যাদি। এই ত গেল চিঠির মর্ম্ম। অন্য সময় হইলে উহা অবনীর মনে যতটা আঘাত করিত, এখন ততটা করিল না। সে অত্যন্ত বিরক্তি ও অসহিষ্ণু ভাবে চিঠিখানা দুই খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া মেঝেয় ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। ভারবাহী পশুর পিঠে যখন মাত্রাজ্ঞানরহিত হইয়া ভার চাপান হয়, তখন সে তাহার শেষ পন্থা অবলম্বন করে অর্থাৎ ভূতলশায়ী হইয়া তাহার অসামর্থ্য জ্ঞাপন করে। চিন্তা-ভাবনা যখন মাত্রা ছাড়াইয়া উঠে, তখন মনেরও হয় বিকল অবস্থা, সে আর কিছুই ধারণা করিতে পারে না। অবনীর মনের অবস্থাও এখন হইয়াছে তাহাই।

কিছুক্ষণ পরে নিরাপদ নিঃশব্দ পদক্ষেপে ঘরে ঢুকিল। প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল ছিন্ন চিঠির টুকরা দুইখানি। সে তাহা কুড়াইয়া লইয়া পড়িয়া ফেলিল। তাহার পর অবনীর শিয়রের নিকটে গিয়া বসিল। অবনী সাড়া পাইয়া চোখ মেলিল। নিরাপদ ধীরে ধীরে তাহার একখানা হাত নিজের কোলের উপরে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোর কি হয়েছে অবনী, আমাকে বলবি না? বাড়ীর এই চিঠি পেয়ে মন খারাপ হয়েছে? এমন ত আগেও কত দিন হয়েছে, কিন্তু তোকে ত এত মুষড়ে পড়তে কোন দিন দেখি নি? আর যে অনাদিবাবু তোকে এত ভালবাসেন, তাঁর বাসা থেকে তুই চলে এলি—কেন কি হয়েছে—টাকা পাস নি বলেই কি? আমায় বল ভাই?

স্নেহের স্পর্শ পাইয়া অবনীর দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। নিরাপদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—এ কি অবনী, তুই কাঁদছিস? কি হয়েছে, কেন কাঁদছিস? কিছুক্ষণ পরে মনের উত্তাপ কিছু কমিলে অবনী একে একে নিরাপদকে সব কথা খুলিয়া বলিল—লতিকাকে ভালবাসার কথা—লতিকা যে তাহাকে ভালবাসে সে কথা—অজিতের কথা—আর গতকল্যকার খানাতল্লাসীর কথা—যাহার ফলে অনাদিবাবু অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছেন এবং লতিকাকে পাওয়া তাহার পক্ষে হইয়াছে একান্ত অসম্ভব—ইহার কিছুই সে নিরাপদর কাছে গোপন রাখিল না। কিন্তু ভালবাসার কথা, না পাওয়ার যে দুঃখ তাহার কথা, ইহা নিরাপদ কতক বুঝিল, কতক বুঝিল না। বুঝুক আর নাই বুঝুক, সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় গলিয়া গেল, কিন্তু কোন পথ খুঁজিয়া পাইল না। এমন কি একটা আশার কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। এতক্ষণে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—নিকটে কোন একটা বিগ্রহের মন্দির হইতে একটানা ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাইতেছে—অবনী এখনও চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল—কি যেন একটা কথা বলিবার জন্য নিরাপদর দিকে চোখ মেলিয়া দেখে নিরাপদ সেখানে নাই—কোন্ ফাঁকে তাহার পাশ হইতে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ক্রমশঃ

সুভাষিতাবলী

শ্রীনন্দলাল বসু

পূর্বকালে বিদ্যার্থীরা আগে ব্যাকরণ আয়ত্ত করত দীর্ঘ কালের হাড়ভাঙা খাটুনিতে; তার পর অলঙ্কারে ও কাব্যে অধিকার হ'ত। অর্থাৎ আগে পরিশ্রম, পরে আনন্দ। কিন্তু আমরা ব্যাকরণ আর কাব্য একসঙ্গে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করেছি। পরিশ্রম করবে আর আনন্দ পাবে, আনন্দ পাবে আর পরিশ্রম করবে।

২

রূপরচনায় এত বেশী আয়াস লাগে কেন? সাধারণতঃ, আমাদের মনের সামনে একটা যেন চিক টাঙানো থাকে; সেইটে সরাতে না পারলে বস্তুকে যথার্থ দেখা হয় না, আর না দেখলে আঁকাও যায় না। দীর্ঘকালীন অনুরাগে ও অভ্যাসে কোন বিশেষ প্রতিভাবান শিল্পী হয়ত এমন অবস্থা লাভ করেন যে যখন যে বস্তুর পানেই তাকান চোখের আগে থেকে ঐ আবরণ সরে যায়। রূপরচনা কাজেই তাঁর পক্ষে পরম সহজ হয়। আমাদেরও হবে। অভ্যাস ও অনুরাগ চাই।

৩

ধ্যানের বিষয় সম্মুখে করে ছাত্র[1] সমস্ত বেলা পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে: নিষ্পত্র মহানিমের ঊর্দ্ধগ শাখায় প্রশাখায় সোনার গুটির মত গুচ্ছ গুচ্ছ ফল। পথ দিয়ে যাবার সময় গুরু বলে গেলেন: তুমি আজ এই যে বৃক্ষের আরাধনা করছ, ছবি আঁকছ, এ তোমার সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে যাচ্ছে। জীবনে কোনো দিন হয়ত অশেষ দুঃখ পাবে, প্রিয়পরিজন মারা যাবে, সংসার শূন্য মনে হবে; তখন পথের ধার থেকে এই গাছ বলবে: এই যে আমি আছি। তুমি সান্ত্বনা পাবে। এ তোমার অক্ষয় সঞ্চয়, এ জীবনের নয় শুধু—জীবনান্তরেরও।

৪

এক ছাত্রকে[2] বনপুলকের গাছ আঁকতে আদেশ ক'রে সেই সঙ্গে বললেন: কিছু কাল ধরে গাছটিকে দেখো আগে। গাছের কাছে গিয়ে বসে থাকবে—সকালে, দুপুরে, বৈকালে, সন্ধ্যায়, আবার নিশুতি রাত্রে। সে খুব সহজ হবে না। কিছুক্ষণ ব'সে থেকে আর ভাল লাগবে না। মনে হবে গাছও যেন বিরক্ত হয়ে বলছে: তুই এখানে কেন?—চলে যা!—যা বলছি। তখন গাছের কাছে তোমায় কাকুতিমিনতি করতে হবে। বলতে হবে: আমার গুরুর আদেশ অমান্য করবার উপায় নেই; রাগ করো না তুমি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও; আমার কাছে তুমি স্বরূপ প্রকাশ কর। এই রকম ক'রে কিছু দিন নীরব সাধনা করার পর যখন মনে হবে গাছটিকে দেখেছ, তখন ঘরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে গাছের একটি ছবি তৈরি ক'রো।

৫

গাছের কিছু একটা আগে ভাল লাগা চাই; তবে তো গাছটিকে দেখবে, তবে তো তোমার দেখা উত্তরোত্তর বেশী ক'রে সার্থক হবে। ভাল লাগার সাধনাই শিল্প-সাধনা। কিন্তু, প্রথম ভাল লাগাটি বিধিদত্ত জিনিস; যার আছে সেই আর্টিষ্ট: অন্যে কি ক'রে তোমায় দেবে? অবনী-বাবু বলতেন: গুরু আর্টিষ্ট তৈরি করেন না; আর্টিষ্ট হয়েই শিষ্য আসে। যেমন আলো বাতাস জল দিয়ে যত্ন ক'রে চারা-গাছ মানুষ করা। চারা-গাছ সৃষ্টি করবে কে?

৬

এক জায়গায় থাকতে থাকতে ক্রমশঃ ভাল লাগে। ভাল লাগে বিচিত্র সম্বন্ধসূত্রে। দেখা গেল বনপুলক গাছটি আকাশের নীচে কেমন দাঁড়িয়ে আছে; অমনি ভাল লাগল। অথবা দেখা গেল তার ফুল ফোটা; তাই ভাল লাগল। ফুল ঝরছে; তাও হয়ত ভাল লাগল।

কাগজের গোলাপ, যেমনটি তেমনিই আছে সব সময়: কতক্ষণ আর ভাল লাগে। আসল গোলাপ কেবলই চলেছে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধের পর সম্বন্ধ রচনা ক'রে। সেই চলার ছন্দই তার জীবন। সেই জীবনটি ঠিকমত দেখা গেলে সে আর কিছুতে ফুরোয় না; কাজেই কিছুতে ফুরোয় না আর্টিষ্টের ভাল লাগা।

১। শ্রীনীহাররঞ্জন চৌধুরী।

২। শ্রীমণিমোহন রায়চৌধুরী।

৭

যে জিনিস আঁকবে সেটি ভাল লাগা চাই।…ভাল-বাসা চাই। তোমার সেই ভালবাসাই তুলির ডগে আপনি ফুটে উঠবে। তা হলেই সত্যিকারের ছবি হবে। ছবি আঁকার অন্য কোনো কৌশল বা পদ্ধতি (technique) নেই।

•৮

অন্তর রসান্বিত না হ'লে, ভাল না লাগলে, উত্তরোত্তর-বৃদ্ধিশীল সেই ভাল লাগার প্রেরণেই কাজ না করলে, শুধু কলাকৌশল (technique) আয়ত্ত করবার চেষ্টা নিষ্ফল।…এক বার আমার এস্রাজ বাজাতে সখ হয়েছিল; নিয়মিত সা-রে-গা-মা সাধতে লাগলাম। কয়েকটা গৎও শিখেছিলাম। কিন্তু যেই বাজানো বন্ধ করলাম, ছ মাসের শিক্ষা নিঃশেষে ভুলতে ছ-দিনও লাগল না আমার। কারণ সঙ্গীতের ব্যাকরণই শুধু 'মুখস্ত' করেছিলাম, রসের ভিতর প্রবেশ করি নি।

৯

অথচ ধৈর্য চাই; যে উদ্দেশ্যে এই একান্ত সাধনা, তার সফলতা চাই। কারণ শিল্পচর্চা একটা সাধনাই, সখ ত নয়।…নইলে অনেকে আছে, সেই আমেরিকান সাহেবের মত করে। সে ভদ্রলোক সাত সমুদ্র পার হয়ে এসেছিল মহাত্মাজীর আশ্রমে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে ব'লে। আশ্রমের লোক বললে, এখন তাঁর সময় নেই; তুমি থেকে যাও। কিন্তু, সাহেব থাকে কি করে; কোন্‌টার পর কি করবে সব তার আগে থেকে ঠিক করা আছে; পরবর্তী ট্রেনটা তার ধরাই চাই। সুতরাং মহাত্মাজীর সঙ্গে না দেখা ক'রেই চলে গেল। একে বলে মূঢ়তা। আর দেখা হলেই বা কি লাভ হ'ত কে জানে; হয়ত নাম সংগ্রহের খাতায় আরেকটা স্বাক্ষর পড়বে, এর বেশী তার আকাঙ্ক্ষাই ছিল না।

১০

নিত্য অভ্যাস চাই। [ঠাকুরকে তোতাপুরি বলেছিলেন ঘটি রোজ মাজলে তবেই ঝক্ ঝক্ করে।] প্রতিনিয়ত পরীক্ষা করবে। ভয় ক'রো না। লোভ ক'রো না। যেটুকু অনুভব করবে শুধু সেটুকুই প্রকাশ ক'রো।

১১

কবির কখনো কখনো এ রকম হয় যে অবান্তর একটা শব্দের মোহ বা একটা উপমার মোহ বা একটা আইডিয়ার মোহ তাকে পেয়ে বসল। তেমনি শিল্পী হয়ত দেখলে একটা গাছের তলায় একটা লোক ব'সে আছে; ভাল লাগল; তার পর ছবি আঁকবার সময় একটা কুঁড়েঘর তার সঙ্গে জুড়ে দিলে বা গাছের পাতাগুলি ধ'রে ধ'রে আঁকলে বা আকাশের মেঘে রঙের বাহার দেখাতে গেল: সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। ফলে ছবি নষ্ট হ'ল। [অবনীন্দ্র-নাথকে বলতে শুনেছি, কতখানি আঁকব তার চেয়ে বেশী জানা দরকার কতখানি আঁকব না।] একেই বলে লোভ বা মোহ।

১২

ঐতিহ্য দরকার?—যদি সমস্ত ঐতিহ্যই কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনায় লোপ পায়, আ চিরদিনের জন্যে লুপ্ত হবে কি? আর্টের কারণ আদিকারণে। যে আনন্দে সৌরজগতের আর পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, সেই আনন্দ-বশতঃই শিল্পী ছবি আঁকে। সুতরাং মহাপ্রলয়ের পর পুনরায় যেমনি সৃষ্টি হবে, পুনরায় মানুষের মত ধীমান জীব হবে, অমনি আর্টেরও সুরু হবে।

তবে ঐতিহ্য ব্যবসার মূলধনের মত। তাকে খাটিয়ে অল্পায়াসে আরও অনেক ঐশ্বর্য্য লাভ করা সম্ভব হয়। (এক কালের ঐশ্বর্য্য অন্য কালের মূলধন হয়ে দাঁড়ায়। স্বামিজী বলেছেন, It is good to be born within a church but bad, indeed, to die within it.)

১৩

যে আর্টিষ্ট তার বন্ধু সর্বত্র, তার বন্ধু গোনা যায় না। তোমায় ভাল লাগছে। তুমি চলে গেলে গাছটা ভাল লাগছে। গাছও নেই তো এই দরজাটাই ভাল লাগছে। ভাল লাগে কেন? emotional [আবেগ-প্রবণ? sentimental?] ভাল লাগা গভীর নয়। কৌতূহলে ভাল লাগে, সেও অচিরস্থায়ী। আরেক রকম ভাল লাগা আছে, তা গভীর একাত্মানুভূতি। কোনো ভূদৃশ্য এত ভাল লাগল যে মনে হয় তার মাঝখানে ম'রে যেতেও দুঃখ নেই।…সকলেই গভীর আশ্বাস দিচ্ছে; সকলেই যে বন্ধু। গাছ ভাল লাগল তো মরবার ভয় ঘুচে গেল। কারণ, জানলাম আমি ম'রে গেলেও এই গাছ তো রইল।

১৪

ছবি দু-রকম। এক, শিল্পী যে ছবি করেছে; আর শিল্পী যে ছবি হয়েছে। ভাল ছবিতে আছে, বিষয়, পদ্ধতি এবং শিল্পী স্বয়ং।

[শুনে ভাবি, বস্তুর আছে তিনটি দিক (aspect), তিনটি পরিচয় স্বরূপ বা সত্য: ভগবান যা দেখেন, ভগবান যে দেখা দিয়ে বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন ও প্রতিনিয়তই সৃষ্টি করছেন। স্বপ্ন বা কল্পনা: বস্তু নিজেই নিজের বা অপরেও তার চতুর্দিকে ভাবনা বেদনা কামনা দিয়ে যে অবাস্তব ও রঙীন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। বাহ্য রূপ: যা দশের চোখে পড়ে। অর্থাৎ, যা জ্ঞানের দৃষ্টি, যা মনের সৃষ্টি, আর যা ইন্দ্রিয়ের প'ড়ে-পাওয়া জিনিস। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের লিখিত ও কথিত উক্তি: ভাবসাদৃশ্য, কল্পনাসাদৃশ্য, এবং রূপসাদৃশ্য।...ছবিতে বস্তুর এক ও একাধিক পরিচয় বা 'সাদৃশ্য' থাকে। স্বরূপ বা স্বভাব যা প্রকাশ করে তাই শ্রেষ্ঠ। কেবল বাহ্য রূপকেই যা প্রকটিত করে, আসলে তা ছবিই নয়।]

১৫

ছবিতে রং দেওয়া সম্বন্ধে শিল্পাচার্য্য বলেন: ধানক্ষেতের সবুজ তোমার এত ভাল লাগা চাই যে তুমি ঐ সবুজ হয়ে গেলে। তোমার সত্তার অন্তহীন পরিচয়ে ঐ পরিচয়টুকু যুক্ত হ'ল। তার পর ছবি আঁকতে বসলে কেমন ভাবে সবুজ লাগাতে হবে, তার সঙ্গে অন্য কোন্ রংটি কোথায় মানাবে, অন্তরঙ্গ অনুভব থেকেই অনায়াসে তুমি বুঝতে পারবে; তুলির ডগে সব আপনি এসে যাবে। আরেক কথা, শিল্পী ধানক্ষেতের সবুজ আকাশেও দিতে পারে, মেঘেও দিতে পারে, পাহাড়েও দিতে পারে, তাতে কোনো দোষ হয় না। কারণ, প্রকৃতির কাছে শিল্পী শিখে নেয়, রঙে রঙে সূক্ষ্ম যে সম্বন্ধ, গভীর যে আত্মীয়তা (relation) সেইটেই; নইলে সে স্বাধীন, স্বতন্ত্র। এই রীতি প্রাচীন রাজপুত, মোগল বা পারসিক চিত্রে দেখা যায়। রচনার তাতে কিছুমাত্র ন্যূনতা না ঘ'টে বরং বিশেষ উৎকর্ষই হয়েছে।

১৬

যে পাহাড় দেখে নি সে মেঘ আঁকতে পারবে না। স্থিরতার ধারণা না থাকলে চঞ্চলতার ধারণা হয় না। ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্যে যে রস আর চিত্তের ধ্যান-মগ্নতায় যে রস, দু-ই আর্টিষ্টের জানা প্রয়োজন। আর্টিষ্টের একদেশদর্শী হ'লে চলে না। তার হওয়া চাই সর্বদর্শী ও নির্লিপ্ত।

১৭

গল্প আছে: এক জন বলেছিল, নবোদ্গত যবের শিষ দেখতে কেমন, না, যেন ডানা-ছেঁড়া প্রজাপতি। কিন্তু যথার্থ প্রতিভাসম্পন্ন এক কবি বললেন, শিষটি দেখে ভাবি দুখানা ডানা হ'লেই ও প্রজাপতির মত উড়ে যাবে। একই উপমা; কিন্তু দেখবার ভঙ্গীতে আর বলবার কৌশলে কি অসীম তফাৎ। ছিল প্রাণহীন; হ'ল জীবন্ত।

১৮

প্রকৃতির দুটো ধারা আছে। একটাতে দেখি রূপের সঙ্গে রূপের বৈসাদৃশ্য, ফলে বৈচিত্র্য। এ হ'ল স্থূল। আরেকটাতে দেখি এই সমস্ত বৈসাদৃশ্য বা বৈচিত্র্য যে অন্তর্নিহিত নিয়ম থেকে নিয়ত উদ্ভূত হচ্ছে তার ঐক্য। বৈসাদৃশ্যের—বৈচিত্র্যের অন্তরে ঐক্য। এ-ই প্রকৃতি। বিশ্বপ্রকৃতিও বটে; আর তার ভিতরের মানবপ্রকৃতিও বটে।

১৯

প্রথমে আকৃষ্ট হয় শিল্পী বাইরের রূপে। তার পর রূপে রূপে আপতিত আলোয়। তার পর যে ভাব যে রস প্রত্যেক রূপকে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে রূপায়িত ও সঞ্জীবিত ক'রে চলেছে, সেই জিনিসটিতে। এই ভাবে শিল্পী যত এগিয়ে যায়, ততই তার সৃষ্টিক্ষমতা বাড়ে, ততই ক্রম-প্রসারিত হয় তার সৃষ্টিক্ষেত্র।

২০

Convention জিনিসটা বিষয়কে সহজ করা নয়, সম্পূর্ণ করা। জ্ঞানের ও সাধনার বিশেষ পরিণতি থেকে তার উদ্ভব। সর্বত্র যে নিখুঁত ভাব আর নিখুঁত রূপের দিকে উন্মুখ হয়ে চলেছে প্রকৃতির সকল আবেগ ও ইচ্ছা, অথচ ঝড় রৌদ্র শিলাবৃষ্টি আছে—কীটপশু মানবের শত উপদ্রব আছে—জড়-উপাদানের জড়ত্বের বাধা আছে, তাই কিছুতেই ঠিক মত পৌঁছুচ্ছে না, দৃষ্টি দিয়ে প্রীতি দিয়ে সেইটিকেই দেখে বিশ্বসংসারের গোচর করাতেই তার সার্থকতা। এর চরম দৃষ্টান্ত হ'ল ভারতীয় নটরাজ ও ও বুদ্ধমূর্ত্তি অথবা চীনা ড্রাগনের পরিকল্পনা।

২১

ভারতীয় ভাস্কর্য্যের বিশেষত্ব হ'ল গতিশীলতায়।...হাঁ, রোদ্যাতেও গতিবেগ আছে; কিন্তু তফাৎ আছে। ওদের

হ'ল কেন্দ্রাতিগ গতি; চলেছে বাইরের দিকে, ছড়িয়ে পড়ছে। আর ভারতীয় নটরাজ বা বুদ্ধমূর্ত্তি দেখো, সব আসছে কেন্দ্রাভিমুখে; সব নিয়ে একটা অখণ্ড সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা (harmony) সৃষ্ট হচ্ছে।

২২

বিনিয়ন সাহেব ঠিক বলেছেন যে চীনা চিত্রকলা ভারতীয় থেকে ভাল। ভারতীয় ভাস্কর্য্যের তুলনা নেই; কারণ ভারতীয়রা in the round দেখেছে, আর সে দেখা প্রকাশ করবার ঠিক ক্ষেত্র হ'ল ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য। কিন্তু চিত্রের জমি two dimensional, তাতে বিশেষ দ্রষ্টব্য হ'ল space; এবং এই two dimensional space নিয়ে রসসৃষ্টি চীনাদের ভূদৃশ্যের চিত্রাবলীতে যেমন সম্ভব হয়েছে, ভারতীয় চিত্রকলায় (তার বিষয় হ'ল মানুষ বা দেবতা) কেমন ক'রে হবে। স্বভাব (Nature) হ'ল two dimensional শিল্প-পদ্ধতির যোগ্য বিষয়। সেই বিষয় নির্বাচনের যথাযোগ্যতায় চিত্রকলায় চীনারা জগতের সমস্ত জাতিকেই ছাড়িয়ে গেছে।

২৩

ওকাকুরা বলেছিলেন: স্বভাব (Nature), ঐতিহ্য (Tradition) ও স্বকীয়তা (Originality) এই তিন নিয়ে হয় সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ আর্ট। স্বভাবজ্ঞান না থাকলে আর্ট হয় দুর্বল বা কৃত্রিম। ঐতিহ্যে অধিকার না থাকলে হয় স্থাণু বা অনেক পিছিয়ে পড়ে থাকে। আর নিজস্ব দান যদি কিছু না থাকে তবে অন্য সব থাকলেও ঠিক প্রাণ পায় না। অপর পক্ষে শুধু স্বভাবসম্মত হ'লে হয় অনুকরণ; শুধু ঐতিহ্য 'মুখস্ত' করলে হয় কারিগরী; আর শুধু মৌলিকতাটুকু সম্বল ক'রে মানুষ ব্যবহার করে উন্মাদের মত। ওকাকুরা যে তিনটি কথা বলেছিলেন তারই উপর আমাদের শিল্পসাধনা প্রতিষ্ঠিত, তাই ধরে অগ্রসর হচ্ছে।

২৪

বিভিন্ন বয়সে মানুষের জীবন বিভিন্ন বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে চলে। শৈশবে মা; কৈশোরে বন্ধুবান্ধব; যৌবনে স্ত্রী বা প্রেয়সী। এই রকম। এই কেন্দ্রটি থাকলে জীবনের স্বাদ থাকে, সুখ থাকে, উৎসাহ থাকে। এই কেন্দ্রটি হারালে সবই হয় বিস্বাদ, কাজেই কাজেরও কোনো প্রেরণা থাকে না। তাই, যে যত স্থায়ী জিনিসকে কেন্দ্র ক'রে জীবন গড়ে, তার জীবনের সুখশান্তি ও কর্মের প্রেরণা তত অফুরন্ত হয়। এ রকম একটি স্থায়ী জিনিস বলা চলে—এই বিশ্বপ্রকৃতি।

২৫

নিত্যনিয়মিত সাধনার ফলে অবশেষে মনটি হবে পরিপূর্ণ কলসের মত। পরিপূর্ণ কলস একটু হেলিয়ে দিলেই যেমন জল ছলকে পড়ে, তেমনি কোনো কারণে মন একটু নাড়া পেলেই মনের অক্ষয় রসানুভূতি রূপানুভূতি ছলকে পড়ে হবে—ছবি, মূর্ত্তি, নৃত্য, কবিতা, গান।

২৬

অনেক আশা উদ্যম নিয়ে আরম্ভ ক'রে আজ ভাবছ কিছু হ'ল না। কিন্তু, আসলে হয়ত হবার আর দেরি নেই। ধরো, তুমি পুরীর মন্দিরে চলেছ। সকাল বেলা অনেক দূরে দেখতে পেলে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে মন্দিরের চূড়া। উৎসাহের সঙ্গে হাঁটতে লাগলে। যত বেলা গেল রৌদ্র আর বালির উত্তাপ বাড়তে লাগল, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হলে, কখন্ মন্দিরের চূড়া ও নিকটবর্তী লোকালয়ের বাড়ীঘর গাছপালায় ঢাকা পড়ল। একেবারে দিশা হারালে। চৌমাথায় প'ড়ে কোন্ দিকে যে যাবে বুঝতে পারলে না। তবু হয়ত প্রত্যেক পদে একটু একটু এগিয়েই এসেছ তুমি, যখন একেবারেই হতাশ হয়েছ তখন রাস্তার আরেকটা বাঁক পেরুলেই বা সমুখের আরেকটা গাছ ছাড়লেই দেখবে একেবারে মন্দিরের খোলা দরজা।[১]

২৭

শিল্পীকে সদা সচেতন হ'তে হবে। ভাগীরথীতে মৃণালসমেত পদ্মফুল পদ্মপাতা ভেসে যাচ্ছে ঢেউয়ের তালে তালে উঠে প'ড়ে। মাছও খেলা করছে সেই জলে; **ইচ্ছামত অনুকূলে বা প্রতিকূলে যাচ্ছে স্রোতের।** দু'য়ের প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ হ'ল সাধারণ মানুষে আর শিল্পীতে।*

১ শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলা হয়েছিল।

* অনুলেখক শ্রীকানাই সামন্ত। শ্রুতিলেখন ও অনুলেখনে তফাৎ আছে। অনুলেখন, বলতে গেলে, শোনার কিছু কাল পরে লেখা বা স্মৃতিলেখন। চৌকো বেষ্টনীবদ্ধ অংশগুলি অনুলেখকেরই সংযোজন। আগাগোড়া সমস্তটাই শিল্পাচার্য্যের অনুমোদিত।

জৈব-তড়িৎ

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

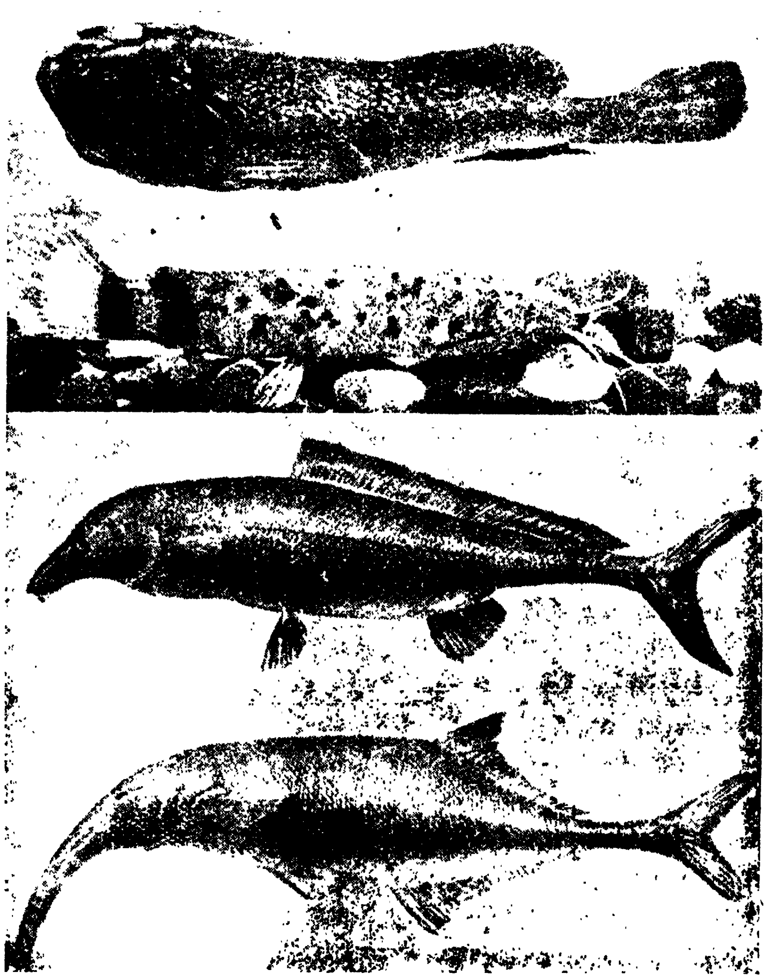
বুদ্ধিবৃত্তি সম্প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দিনের পর দিন প্রকৃতির গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া মানুষ আজ তাহার সভ্যতার প্রয়োজন মিটাইয়া লইতেছে। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই জীবজগৎ বহুবিধ উপায়ে প্রাকৃতিক শক্তিকে তাহাদের কার্য্যোপযোগী করিয়া লইয়াছে। কথাটা সহসা অদ্ভুত মনে হইলেও ইহাতে কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি নাই; কারণ চোখের সম্মুখেই ইহার অগণিত দৃষ্টান্ত পড়িয়া রহিয়াছে। তড়িৎ-শক্তির কথাই ধরা যাউক। যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি বর্ত্তমানে মানবের বিবিধ কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে তড়িৎ-শক্তির স্থানই সর্ব্বোচ্চে—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে, মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই তড়িৎ-শক্তিকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার উপায় আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু কোন্ সুদূর অতীত যুগ হইতেই মনুষ্যেতর বিবিধ প্রাণী এই বিরাট শক্তিকে সাফল্যের সহিত নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে তাহার সঠিক হিসাব নিরূপণ করা অসম্ভব।

তড়িৎ জিনিসটা কি, তাহা এক কথায় বুঝাইয়া বলা শক্ত। তবে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনা—যেমন ঘর্ষণের ফলে কোন কোন পদার্থে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তির আবির্ভাব, কোন কোন পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষ অথবা ক্ষেত্রবিশেষে কতকগুলি পদার্থে চৌম্বক আকর্ষণ শক্তির বিকাশ—প্রভৃতি ব্যাপারগুলিকে আমরা তড়িৎ-শক্তির ক্রিয়া বলিয়াই জানি। যে তড়িৎ-শক্তির প্রভাবোৎপন্ন ভীষণ বজ্র-নির্ঘোষ ও তীব্র আলোকস্ফুরণে মানুষ ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়ে সেই শক্তিকেই আজ বুদ্ধি-বলে আয়ত্ত করিয়া তাহার সাহায্যে তাহারা অশেষবিধ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লইতেছে। বিদ্যুৎ আমাদিগকে আলো দিতেছে, ঠাণ্ডা ঘর গরম করিতেছে, পাখা চালাইতেছে, আমাদের রন্ধন-কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, দূরত্বের ব্যবধান ঘুচাইয়াছে, যানবাহন পরিচালন করিতেছে, এমন কি আমাদের রোগনিরাময়েও সহায়তা করিতেছে। এতদ্ব্যতীত আরও যে কত কিছু করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সম্ভবতঃ এই তড়িৎই বিশ্বরহস্যের মূল কারণ এবং জীবনী-শক্তির মূলেও যে এই তড়িৎ-শক্তিই ক্রিয়া করিতেছে তাহা একরূপ নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে।

মানুষ তাহার মস্তিষ্কের শক্তিবলে তড়িৎ-শক্তিকে প্রয়োজনে খাটাইতেছে; কিন্তু মস্তিষ্কের শক্তিতে অন্য কোন প্রাণীই মানুষের সমকক্ষ নহে। অথচ বিস্ময়ের কথা এই যে, মানুষ অপেক্ষা বহু নিম্ন পর্য্যায়ের কতকগুলি প্রাণী প্রাকৃতিক উপায়ে এই বিস্ময়কর শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া আত্মরক্ষা এবং খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। উন্নততর প্রাণীদের কেহই কিন্তু এই ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে নাই।

কাচ অথবা লাক্ষাদণ্ডকে রেশমী রুমালে ঘর্ষণ করিলে তাহাতে তড়িৎ-শক্তির উন্মেষ ঘটে। অন্ধকারে কালো বিড়ালের শরীরের লোমগুলির উপর উল্টাদিকে হাত বুলাইতে থাকিলে মট্ মট্ শব্দ করিয়া ক্ষীণ বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে দেখা যায়। অন্যান্য কতকগুলি স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শরীরের লোম হইতে এরূপ ক্ষীণ বিদ্যুৎ স্ফুরণ অস্বাভাবিক ঘটনা নহে। গাটাপার্চার চিরুণী দিয়া ভিজা চুল আঁচড়াইলে এরূপ শব্দ ও অতি ক্ষীণ বিদ্যুৎ-স্ফুরণ অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কালো রং ব্যতীত অন্য কোন রঙের চুলে এরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় না। চুলের বিশেষ বিশেষ রঞ্জক পদার্থ বিদ্যুৎ-তরঙ্গের গতিপথের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। বিভিন্ন জাতীয় জীব-জন্তুর শরীরের লোম হইতে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ ঘটিতে দেখিয়া, প্রকৃত রহস্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা-বশতঃ বনজঙ্গলের অধিবাসী অসভ্যদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এরূপ ঘটনাকে স্বভাবতঃই তাহারা ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া মনে করে। আমেরিকার এমাজনের পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলে ক্ষুদ্রকায় এক প্রকার প্যাঁচামুখী বানর দেখিতে পাওয়া যায়। রাত্রিবেলায় দলে দলে ইহারা আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। অতি দ্রুতগতিতে এক ডাল হইতে অন্য ডালে ছুটাছুটি করিবার সময় ঘন-সন্নিবিষ্ট লতাপাতার সহিত শরীর ঘষিত হইবার ফলে

ইহাদের লম্বা লম্বা লোম হইতে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া থাকে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পর পর অনেকগুলি প্রাণীর শরীর হইতে আলোকস্ফুরণ হয় বলিয়া মনে হয় যেন অন্ধকারে একটা আলোর স্রোত ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। কাজেই এরূপ ব্যাপারকে ভৌতিক কাণ্ড মনে করা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। জীব-জন্তুর শরীরের লোম এবং মানুষের মাথার কালো চুলে বিদ্যুৎশক্তির উন্মেষ ঘটিলেও তদ্দ্বারা তাহাদের কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না। কিন্তু কয়েক জাতীয় অদ্ভুত মাছ নিজেদের শরীরে প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিয়া তাহার সাহায্যে জীবনধারণের অত্যাবশ্যক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইতেছে। এই তড়িৎ-মাছ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম; বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহাদের বিষয়েই একটু বিশদ আলোচনা করিব। যত দূর জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়—অন্ততঃ ছয়-সাত প্রকারের বিভিন্ন জাতীয় মাছ তড়িৎ-শক্তিকে অতি দক্ষতার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া থাকে। দক্ষিণ-আমেরিকার বিরাটকায় তাড়িতিক বাণমাছই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী। ব্রেজিল ও গায়েনার জলাভূমিতে এই মাছগুলিকে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম—'জিম্‌নোটাস্ ইলেকট্রিকাস্'। এক একটা মাছ ওজনে আধমণেরও বেশী হইয়া থাকে, এবং আট হইতে দশ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। ইহাদের গায়ের রং অনেকটা শ্লেট পাথরের রঙের মত; কিন্তু মাথার নীচের দিকটা লাল। চোখ দুটি অতি ক্ষুদ্র। এই মাছের শরীরের অধিকাংশই লেজের সামিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিরাট লেজটিই তড়িতোৎপাদক একটি শক্তিশালী 'ব্যাটারী'-বিশেষ। তড়িৎ-উৎপাদক কোষগুলি চওড়া ফিতার মত লেজের উভয় পার্শ্বে লম্বালম্বিভাবে সজ্জিত। এই যন্ত্রগুলি মাংসপেশীর তন্তুর মতই বিশেষ গুণসম্পন্ন তন্তুর সমষ্টিমাত্র। এই সমষ্টিবদ্ধ তন্তুর সাহায্যে গঠিত কোষগুলি জেলীর মত এক প্রকার অর্দ্ধ তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে—সহস্র সহস্র এই ক্ষুদ্রাকার কোষগুলির প্রত্যেকেই এক একটি গ্যালভ্যানিক ব্যাটারীর মত এবং প্রত্যেকেই আবার সূক্ষ্ম স্নায়ু সহযোগে মৎস্যের মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। কাজেই মাছ ইচ্ছানুযায়ী অতি সহজেই



উপর হইতে নীচে ১ হইতে ৪ নং। ১। তাড়িতিক ষ্টার-গেজার; ২। নীল-নদের বৈদ্যুতিক ক্যাট-ফিশ; ৩। সুচালো-মুখ তাড়িতিক মর্মিরিড মাছ, ৪। হাতীশুঁড়ো মর্মিরিড মাছ



তাড়িতিক টর্পেডো মাছ

শরীরোৎপন্ন তড়িৎ-শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, ইহারা যদি ধনুকের মত শরীর বাঁকাইয়া লেজ ও মাথার সাহায্যে একই সময়ে কাহারও শরীর স্পর্শ করিতে পারে তবে তাহার ৩০০ ভোল্টের মত বৈদ্যুতিক 'শক' অনুভূত হইবে। কারণ ইহাদের শরীরের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগে বিপরীতধর্ম্মী তড়িতের সমাবেশ ঘটিয়া থাকে। কাজেই আক্রান্ত প্রাণীর শরীরের ভিতর দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুৎশক্তি পরিচালিত হইলে 'সার্কিট' পূর্ণ করিতে পারে। এই জন্যই শরীরের উভয় প্রান্ত একযোগে স্পর্শ করাইলে তীব্র আঘাত অনুভূত হয়। এই বাণ মাছের বিদ্যুতশক্তি লেজের দিক হইতে মস্তকের দিকে পরিচালিত হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্য তড়িৎ-মাছের বিদ্যুৎশক্তি ইহার বিপরীত দিকেই পরিচালিত হয়। ইহাদের দ্বারা তড়িতাহত হইয়া মানুষকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। ভারবাহী পশুরা জল পান করিতে আসিয়া সময় সময় ইহাদের দ্বারা তড়িতাহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই তড়িৎশক্তির সাহায্যেই ইহারা অন্যান্য মৎস্যাদি শিকার করিয়া উদরস্থ করিয়া থাকে। শিকার করিবার সময় প্রায়ই একটা বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে দেখা যায়। জীবদেহ স্বভাবতঃই কিয়ৎপরিমাণে তড়িৎ-পরিচালক। এই জন্যই উচ্চ চাপের তড়িৎ-সংস্পর্শে জীবদেহে আঘাত লাগিয়া থাকে। কিন্তু কি উপায়ে মাছগুলির শরীরের একাংশে তড়িৎ উৎপন্ন হইয়া অপরাংশ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে তাহা যে অতীব রহস্যজনক ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই।

আদিম অধিবাসীরা তাড়িতিক মাছকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। সভ্য সমাজের অনেকেও এই মাছ উপাদেয় বোধে ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই বিরাটকায় ভীষণ প্রকৃতির মাছগুলিকে শিকার করা বিশেষ আয়াস-সাধ্য ব্যাপার। স্থানীয় অধিবাসীরা এই মৎস্য শিকারের জন্য অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহারা তাহাদের গরু, ঘোড়াগুলিকে দলে দলে তাড়িতিক-বাণ-অধ্যুষিত জলে নামাইয়া দেয়। পশুগুলিকে তড়িতাঘাত করিতে করিতে মাছগুলির তড়িৎশক্তি নিঃশেষিত হইয়া গেলেই তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং নিজেদের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া আত্মগোপনের জন্য জলাভূমির পাড়ে আসিয়া আশ্রয় লয়। বর্শার সাহায্যে লোকেরা তখন অনায়াসেই তাহাদিগকে গাঁথিয়া ফেলে। কৃত্রিম জলাশয়ে এই মাছগুলিকে প্রতিপালন করিয়া দেখা গিয়াছে—কাহাকেও প্রবল ভাবে তড়িতাঘাত করিবার পর তাহাদের শরীরে সঞ্চিত বিদ্যুৎশক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং পুনরায় তড়িৎ সঞ্চারের জন্য প্রচুর খাদ্য এবং বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

অন্যান্য তড়িৎ-মাছের কথা বলিতে গেলে প্রথমতঃ টর্পেডো বা রে-মাছের কথাই উল্লেখ করিতে হয়। কারণ অভিব্যক্তির ধারার দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহারা বৈদ্যুতিক-বাণ অথবা অন্যান্য মাছ অপেক্ষা অনেক পূর্ব্বে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। টর্পেডো মাছের মস্তকের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত মূত্রগ্রন্থিসদৃশ দুইটি অপূর্ব্ব যন্ত্র হইতে ইহাদের তড়িৎ-শক্তি উদ্ভূত হইয়া থাকে। 'টর্পেডো মারমোরাটা' নামক এক প্রকার মাছ প্রায় দুই হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া হইয়া থাকে। ইহাদের মুখ ও কান্‌কোর মধ্যস্থলে শক্তিশালী তড়িৎ-উৎপাদক কোষ সমূহ খাড়াভাবে সজ্জিত থাকে। উত্তেজিত হইলেই ইহাদের তড়িৎশক্তির বিকাশ ঘটে; সেই সময় ইহাদিগকে হাত দিয়া স্পর্শ করিলে হাত অবশ হইয়া যায়, এমন কি, মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

রয়েল সোসাইটির সভ্য, খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডাঃ ওয়াল্‌স্ টর্পেডো মাছের তড়িৎশক্তির তীব্রতা নির্দ্ধারণের জন্য এক অদ্ভুত পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একটা জীবন্ত তড়িৎ-মাছকে ঝুলানো তোয়ালের উপর শয়ান ভাবে রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে তিনি আট জন লোককে চক্রাকারে বসাইয়া দিলেন এবং প্রত্যেকের পাশে পাশে

এক-একটা জলপূর্ণ গামলা রাখিয়া প্রত্যেকের দুইখানি হাতকে দুই দিকের জলে ডুবাইয়া রাখিতে বলিলেন। এই ব্যবস্থায় প্রথম ও শেষের গামলার জলে দুই জনের দুইটি মাত্র হাত ডুবান রহিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি একটি পিতলের তারের এক প্রান্ত প্রথম গামলার জলে ডুবাইয়া অপর প্রান্তকে টর্পেডোর মস্তকের এক পার্শ্বস্থিত একটি তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্রের সংস্পর্শে রাখিয়াছিলেন। এখন মাছের মস্তকের অপর পার্শ্বস্থিত যন্ত্রের সহিত আর একটি তার যোগ করিয়া তাহার অপর প্রান্ত নবম গামলার জলে ডুবাইবামাত্রই সবগুলি লোক একসঙ্গে একটা তীব্র তড়িতাঘাত অনুভব করিল। 'লিডেন-জার' স্পর্শ করিলে যেরূপ আঘাত লাগে একসঙ্গে এতগুলি লোকও সেরূপ আঘাত অনুভব করিয়াছিল। অনুরূপ অপর একটি পরীক্ষায় একটি টর্পেডো মাছ দেড় মিনিটের মধ্যে প্রায় চল্লিশ বার তড়িৎ আঘাত করিয়াছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় রে-মাছের চোখ দুইটি বাহিরের দিকে কিঞ্চিৎ প্রসারিত অবস্থায় থাকে। বিদ্যুৎ আঘাত করিবার সময় প্রত্যেক-বারই চোখ দুইটিকে কোটরের ভিতরে ঢুকিয়া যাইতে দেখা যায়। কিন্তু অন্য কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনই চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় না।

বিবিধ পরীক্ষার ফলে দেখা দিয়াছে—রে-মাছের তড়িত-উৎপাদক যন্ত্র দুইটির যে কোন একটি স্পর্শ করিলেই অতি সামান্য মাত্রায় আঘাত অনুভূত হয়। কাচ অথবা অপর কোন তড়িৎ-অপরিচালক পদার্থের মধ্য দিয়া যেমন যান্ত্রিক তড়িৎ প্রবাহিত হইতে পারে না, কাচ-দণ্ড বা মোমে আবৃত পদার্থ দ্বারা এই মাছের দেহ স্পর্শ করিয়া দেখা গিয়াছে তাহাতে কোন আঘাতই অনুভূত হয় না। ১০০ হইতে ১৫০ জোড়া প্লেট সমন্বিত 'ভল্টেক পাইল' হইতে যে পরিমাণ তড়িৎ-শক্তির বিকাশ ঘটে রে-মাছের শরীর হইতে উৎপন্ন তড়িৎ-শক্তির তীব্রতাও তদনুরূপ। বৈদ্যুতিক বাণ মাছের মত এই রে অথবা টর্পেডো মাছও বহু লোক খাদ্যহিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। পশ্চিম-ব্রিটেন, স্পেন ও পর্ত্তুগালের উপকূলে এই মাছ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইয়োরোপের লোকেরা বহুকাল হইতেই রে-মাছের অপূর্ব্ব ক্ষমতার বিষয় অবগত ছিলেন। প্লিনি, এরিষ্টোটল এবং অন্যান্য লেখকেরা রে-মাছের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় বিশদ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের চিকিৎসকেরা বাতব্যাধি বা পক্ষাঘাত নিরাময়ের জন্য যেমন ব্যাটারী প্রয়োগ করেন, প্রাচীন রোমক চিকিৎসকেরাও অনুরূপ অবস্থায় এই রে-



তাড়িতিক রে-মাছ

মাছের তড়িৎ-শক্তি ব্যবহার করিতেন। তৎকালীন অনেক চিকিৎসক বাত-রোগাক্রান্ত বিবিধ রোগে টর্পেডো চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞরূপে যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। একটা জীবন্ত টর্পেডো মাছকে উবুড় করিয়া রাখিয়া রোগীকে খালি পায়ে তাহার পিঠের উপর দাঁড় করাইয়া রাখা হইত। মাছটার তড়িৎ-শক্তি সম্পূর্ণ রূপে নিঃশেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে তাহার পিঠের উপর হইতে কিছুতেই নড়িতে দেওয়া হইত না। বৈদ্যুতিক টর্পেডো কতকটা গোলাকার অথচ চেপ্টা ধরণের মাছ। সাধারণতঃ ইহাদের গায়ের রং ধূসর, কিন্তু বাদামী রঙের মাছও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা জলের তলায় মাটির উপর নেপ্‌টিয়া পড়িয়া থাকে। আত্মরক্ষার জন্য ইহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দেহের বর্ণ পরিবর্ত্তন করে। ছোট ছোট মাছ খাইয়াই ইহারা প্রাণধারণ করে; কিন্তু ঝিনুক জাতীয় এক প্রকার নিরীহ প্রাণীকেই অধিকতর উপাদেয় বোধে উদরস্থ করিয়া থাকে। অবস্থান স্থলের সহিত বেমালুম মিশিয়া গিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিবার ফলে অন্যান্য মাছেরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে তাহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্রই সে তলদেশ হইতে খানিকটা উপরে ভাসিয়া উঠে এবং অতর্কিতে শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে।

রে-মাছ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতই বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চাগুলি দেখিতে কিন্তু সাধারণ মাছের মত।



তাড়িতিক বাণ-মাছ

অন্যান্য তড়িৎ-মাছের মত এই মাছের শরীরের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না। শরীরের সর্ব্বত্রই কতকগুলি বিদ্যুৎ-উৎপাদক গ্রন্থি দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থিগুলি বৈদ্যুতিক—'য়্যাকুমুলেটরে'র মত বিদ্যুৎপূর্ণ। মস্তিষ্ক হইতে শরীরের উভয় পার্শ্বে পরিচালিত দুইটি মাত্র স্নায়ুসূত্রের সাহায্যে এইগুলি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। জলের মধ্যে চলিবার সময় শরীরটাকে পিছলাইয়া অপর কোন মাছের গায়ে ঠেকাইয়া দেয়। ইহাতেই অপরের শরীরে বিদ্যুৎস্রোত পরিচালিত হয়।

আফ্রিকার নদনদীতে 'মর্মিরিড' নামক কয়েক জাতীয় মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এক জাতীয় মর্মিরিডের মুখ হাতীর শুঁড়ের মত। এই হাতী-শুঁড়ো 'মর্মিরিডে'র লেজের উভয় পার্শ্বে তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র সজ্জিত থাকে। ইহারা লেজের দাপটে আততায়ীকে তড়িতাহত করিয়া অবলীলাক্রমে নির্জীব করিয়া ফেলে। অপর এক জাতীয় সূচালো-মুখ 'মর্মিরিডে'রও তড়িতাঘাত করিবার ক্ষমতা অসাধারণ। কিন্তু ইহাদের তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র লেজের মধ্যে স্থাপিত নহে, অন্যান্য তড়িৎ-মাছের মত মস্তকের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত।

ধীরে ধীরে তাহাদের দৈহিক গঠনের পরিবর্ত্তন সুরু হয় এবং কয়েক মাস পরে পিতামাতার মত আকৃতি গ্রহণ করে।

আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের অগভীর জলে 'ষ্টার-গেজার' নামক এক প্রকার কদাকার মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মাছের চোখ দুইটি উর্দ্ধদিকে প্রসারিত। এই চোখ দুইটিই অপরাপর প্রাণীদের পক্ষে মারাত্মক যন্ত্র-বিশেষ। ইহাদের অক্ষিগোলকের পেশীসমূহ বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া জীবন্ত বিদ্যুৎ-উৎপাদক কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। অপরাপর জলচর প্রাণীরা চলিতে চলিতে এই চোখ দুইটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া হঠাৎ ছোঁ-মারিয়া আক্রমণ করিয়া বসে। কিন্তু চোখ দুইটির সংস্পর্শে আসিবামাত্র ভীষণ ভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় কোন অপরিজ্ঞাত উপায়ে মাংসপেশীর কোষগুলি তড়িৎ-শক্তি উৎপাদন করে এবং মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ুসূত্রের সাহায্যে এই শক্তি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

আফ্রিকার নীলনদের নিম্নভাগে দাড়িওয়ালা এক জাতীয় মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণতঃ 'ক্যাট-ফিস' নামে পরিচিত। ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম—'ম্যালপ্‌টেরারাস্‌ ইলেক্‌ট্রিকাস্‌'। মাছগুলি প্রায় দুই হাত লম্বা হইয়া থাকে। আকৃতিতে বৃহৎ হইলেও ইহারা বড়ই অলস প্রকৃতির মাছ এবং অন্ধকারে থাকিতেই ভালবাসে। অলসতার জন্য ছুটাছুটি করিয়া শিকার করিতে পারে না। এই জন্যই দেহোৎপন্ন তড়িৎ-শক্তির সাহায্য গ্রহণ করে। তড়িৎশক্তি প্রয়োগে অন্যান্য মাছকে অসাড় করিয়া সহজেই উদর পূরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এই মাছগুলির তড়িৎ উৎপাদনের ক্ষমতা অসাধারণ। কোন কোন মাছের শরীর হইতে উৎপন্ন তাড়িতিক চাপ ৪৫০ ভোল্টের কম নহে। অদ্ভুত তাড়িতিক ক্ষমতার জন্য আরবেরা এই মাছের নাম দিয়াছে—'রাড্‌' অর্থাৎ বজ্র।

এই সকল তড়িৎ-উৎপাদক প্রাণীসমূহের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় ভাবিলে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, এই জৈব-তড়িতের কার্য্যকরী ক্ষমতা কতখানি। যন্ত্রোৎপন্ন তড়িৎ-শক্তির মতে এই জৈব-তাড়িতের সাহায্যেও কি কোন কাজ পাওয়া সম্ভব? অথবা ইহার সাহায্যে কি কোন তাড়িত-যন্ত্র, যেমন ইলেট্রিক ট্রেন, বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক মোটর প্রভৃতিকে পরিচালিত করিতে পারা যায়? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, জৈব-তড়িতের চাপ বেশী হইলেও ইহার পরিমাণ এত কম যে, উক্তরূপ কার্য্যে তাহার প্রয়োগের কথাই উঠিতে পারে না। তবে তড়িৎ-শক্তির পরিমাণের অনুপাতে ক্ষুদ্রকায় তড়িৎযন্ত্রকে অনায়াসেই কার্য্যকরী করিতে পারে। ইহার কার্য্যকরী ক্ষমতা ও যান্ত্রিক-তড়িতের কার্য্যকরী ক্ষমতার মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—১০,০০০ বাণ-মাছের দেহোৎপন্ন বিদ্যুতের সাহায্যে বড় একখানি ইলেট্রিক ট্রেনকে দুই মিনিট কাল পর্য্যন্ত চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই দুই মিনিট পরে ২৪ ঘণ্টা পূর্ণ বিশ্রাম ও উপযুক্ত পরিমাণ আহার প্রদান করিলে--

পুনরায় ঐ মাছগুলির বিদ্যুতে ট্রেনখানি আরও দুই মিনিট চলিতে পারিবে। তবে মোটের উপর কথা হইতেছে এই যে, প্রকৃতির তড়িৎ-সম্পদ আহরণ করিবার জন্য মানুষ সহজলভ্য এত কলকৌশল উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই জৈব-তড়িতের তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের আদিপর্ব

শ্রীকালিদাস নাগ

পদ্য ও গদ্য রচনার রীতিবৈচিত্র্যে রবীন্দ্র-সাহিত্য অতুলনীয়। তবুও এ কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি। তাঁর কাব্য-প্রেরণার উৎস অনেক কাল থেকে অনেকেই খুঁজেছেন কিন্তু তাঁর কাব্য-রচনার পারম্পর্য্য ও স্তরভেদ নিয়ে বিচার ও বিশ্লেষণের কিছু অবকাশ হয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃক তাঁর "অচলিত" রচনাগুলি প্রকাশের পর। সম্প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' প্রকাশ ক'রে এই দিকে নূতন ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তিনি তাঁর পরিশিষ্টে প্রথম মুদ্রিত কবিতা হিসাবে "অভিলাষে"র উল্লেখ করেছেন; এটি ১৭৯৬ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যা (নভেম্বর—ডিসেম্বর ১৮৭৪) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যখন এটি ছাপা হয় তখন কবির বয়স ১৩ বছর ৬ মাস কিন্তু কবিতাটি তার অন্ততঃ এক বছর আগে লেখা কারণ লেখকের নাম না দিয়ে, শুধু "দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত" এইটুকু "অভিলাষে"র সঙ্গে জুড়ে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কবিতাটি ছাপিয়ে দেন। শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ফাইল ঘেঁটে এটা মিলিয়েছি এবং লক্ষ্য করেছি যে সে সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথই এই পত্রিকার সম্পাদক-রূপে আষাঢ় ১৭৯৭ শকে "প্রকৃতির খেদ" শীর্ষক আর একটি কবিতাও "বালকের রচিত" বলে মুদ্রিত করেছিলেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার আসল জহুরী ছিলেন যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে আজ কাহারও সন্দেহ নেই।

কবি নিজেও সে কথা বার বার স্বীকার ক'রে গেছেন। কিন্তু রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সেই তরুণ বয়সেই যে সেজদাদার সহকর্মী (Collaborator) ছিলেন সেটি সম্প্রতি জানা গিয়েছে; ব্রজেন্দ্রবাবু দেখিয়েছেন যে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ জুলাই ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'পুরুবিক্রম' নাটকে রবীন্দ্রনাথের এই গানটি (হয়ত একটু অদল-বদল করে) জুড়ে দেন:

খাম্বাজ—একতালা।

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।
আমরা ডরাইব না ঝটিকা ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন।
তা হ'লে আসুক বাধা বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়॥

আবার দেখি ৩০শে নভেম্বর ১৮৭৫এ প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকে রবীন্দ্রনাথের "জ্বল, জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" গানটি বসান হয়। হয়ত রবীন্দ্রনাথের আরও এমন বেনামী রচনা অনুসন্ধানের ফলে বেরিয়ে পড়বে। "অভিলাষ" কবিতাটির মত আরেকটি বেনামী কবিতা সম্প্রতি অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন (বাংলা সাহিত্যের কথা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৪৯) ১২৮০র মাঘ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন' থেকে উদ্ধার করেছেন। প্রকাশের তারিখ অনুসারে এই "ভারতভূমি" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা বলে হয়ত স্বীকার করতে হবে। কবিতাটি যে বছর বঙ্গদর্শনে মাঘ মাসে (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৮৭৪) ছাপা হয় সেই ১২৮০ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "স্বপ্নপ্রয়াণের" প্রথম সর্গও বঙ্কিমচন্দ্র ছাপেন। এ ক্ষেত্রে অনুমান করা যেতে পারে যে দ্বিজেন্দ্রনাথই

বালক-কবি রবীন্দ্রনাথের "ভারতভূমি" প্রকাশের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়েছিলেন। কিন্তু বড়দাদা রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন নিশ্চিত ভাবে বার বছর জেনে বঙ্কিমের মন্তব্যে 'চতুর্দশ বর্ষীয় বালকের' রচনা কি ক'রে ছাপালেন সেটা বোঝা যায় না। কয় মাস পরে "অভিলাষ" ছাপার সময় সেজদাদা স্পষ্ট 'দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের' উল্লেখ করে গেছেন, এক্ষেত্রে 'ভারতভূমি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের না হয়ে বঙ্কিমের পরিচিত ১৪ বছরের অন্য কোন বালক-কবিরও হ'তে পারে। ছাপার সময় বঙ্কিম মন্তব্য করেছিলেন: "এই কবিতাটি এক চতুর্দশ বর্ষীয় বালকের বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কোন কোন স্থানে অল্পমাত্র সংশোধন করিয়াছি এবং কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি।"

ভারতভূমি

(১)

কতদিন দিবাকর উদেছে গগনে;
রক্তিম বরণ ধরি, বিহারিয়া শূন্যোপরি,
রঞ্জন করেছে যত ভারত সন্তানে।
এবে কেন সেই সূর্য্য নাহি লাগে মনে?

(২)

সুনীল অম্বরে ঐ ভাসে শশধর।
ল'য়া তারকামালা, গগনে করিছে খেলা,
অমর বেষ্টিত যথা দেব পুরন্দর।
নৈশ নীল অন্তরীক্ষে শোভে ক্ষপাকর।

(৩)

বিধৌত ধরণীতল স্নিগ্ধ চন্দ্র করে।
স্বচ্ছ শ্বেতবাস পরি, অবনী সাজিল মরি,
কিবা শোভা মনোলোভা, ভূতলে, অম্বরে।
এ সকলে দুঃখ কেন হতেছে অন্তরে?

(৪)

কেন নাহি ভাল লাগে বসন্ত শ্বসন?
যবে দুই ফুলবালা গলে ধরি করে খেলা
দোলাইয়া যায় যদি মলয় পবন,
কেন বা সবার সুখে দুঃখী এত মন?

(৫)

কেনই বা কোপানলে দহয়ে অন্তর?
শুনে পর বীরদাপ, হৃদে হয় মহাতাপ,
মনে করি উপাড়িব হিমাদ্রিশিখর।
রসাতলে পাঠাইব পৃথ্বী সসাগর।

(৬)

সুপুচ্ছ বিস্তৃত করি যত শিখিগণ
দেখি নবজলধর, আহ্লাদিত পরস্পর,
তালে তালে করে যবে নৃত্য আরম্ভন,
বিষাদ সাগর কেন উথলে তখন?

(৭)

এই যে বিটপী শ্রেণী আছে সারি সারি
ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে; হাসে চন্দ্রকর পেয়ে
ঝলিছে চন্দ্রের ছায়া নদীর উপরি।
এ দেখে উথলে কেন দুখসিন্ধু বারি?

(৮)

এই প্রবাহিণী তটে হাসে কুমুদিনী;
দোলায়ে নীহার হার, গরবেতে বারে বার
মলয় হিল্লোলে মন্দ দুলে গরবিনী।
তা দেখিয়া কেন আমি হই অভিমানী?

(৯)

মনে করি একদিন আমাদের তরে
সৃজিয়া ছিলেন ধাতা, ভুবনে ভারত মাতা
প্রাণভয়ে দিনু তাঁরে, যবনের করে।
ডুবিল হিন্দুর নাম কলঙ্ক সাগরে॥

(১০)

পড়িলেক ইরম্মদ কালমেঘ হতে।
ভাঙ্গিয়া ভারত মুণ্ড, জ্বালি এ অনলকুণ্ড,
দহিল মায়ের দেহ অতুল্য জগতে।
অস্থিভস্ম ভিন্ন আছে কি আর ভারতে।

(১১)

সেই দিন উদিলেক ম্লান শশধর।
সেই দিন নিশিথিনী, জ্যোৎস্নাসত্বে তমস্বিনী,
সেই দিন হ'তে দুখে ভাসয়ে অন্তর।
সেই দিন ছারখার ভারত সুন্দর।

(১২)

কত দিবা অন্তে যায় কত রাত্র আসে,
এ রাত্র কি না পোহাবে, এমনি রহিয়া যাবে,
হবে নাকি সূর্য্যোদয় ভারত আকাশে?
অন্ধকার রহিবে কি ভারত আবাসে?

(১৩)

কি লাগিয়ে রত্নভূমি দুখের আগার?
জাগো ভারতস্বজন, মিথ্যা ঘুমে অচেতন,
আলস্য মূর্খতা দোষে দিবসে আঁধার।
জ্ঞানেতে করিয়া বল সত্য কর সার।

(১৪)

সম্মুখেতে দেখ সবে অত্যুচ্চ ভূধর,
যাহার শিখর দেশ, চক্ষে নাহি পড়ে লেশ,
উহাতে উঠিতে যত্ন করে যত নর।
বহু যত্ন সাধ্য হয় ঐ গিরিবর।

(১৫)

উঠে তার মধ্য দেশে কত শত জন।
হইয়া অশক্ত কায়, আর না উঠিতে পায়,
তলদেশে কত লোক করিছে ভ্রমণ
নাহি পারে, তবু করে উঠিতে যতন ॥

(১৬)

কত শত জন উঠি শৃঙ্গের উপরে
ভুঞ্জিছে অতুল সুখ, নাহি ভবে কিছু দুখ,
সুবর্ণ নিম্মিত ছত্র শিরে শোভা করে।
দেখ কত শত জন গিরির শিখরে।

(১৭)

কেহ বা উঠিয়ে শৃঙ্গে হতেছে পতন।
তুঙ্গ শৃঙ্গ পানে চায়, আবার উঠিতে ধায়,
আবার শিখর দেশে, করে আরোহণ।
ভারতবাসীরা কেন না করে তেমন।

(১৮)

একবার উঠেছিলে এ শিখর শিরে।
আজি কেন বসি তলে? হুঙ্কারি উঠহ বলে,
গাইয়ে ভারতজয়, আরোহ গিরিরে।
বাখানিবে এ ভুবনে নব হিন্দুবীরে।

(১৯)

যদি বা পড়িয়া যাও গিরি আরোহণে
হানি কিবা তায় তবে? উদ্ধারিয়া পাপ ভবে
চলি যাবে আনন্দেতে দেব নিকেতনে
কেন বা করিবে ভয় এ তিন ভুবনে?

(২০)

ঐ শুন মৃদু মন্দ হয় বংশীধ্বনি।
পর্ব্বত শিখরোপর, বলে "হে ভারত নর
গিরির উপরে সবে আইস এখনি।
ঐ শুন পর্ব্বতেতে হয় বংশীধ্বনি।

(২১)

শুন বংশী প্রতিধ্বনি গভীর কন্দরে;
শুন প্রস্রবণ ঝরে, কল কল নাদ করে,
"চক্ষু মেল" বলি ডাকে ভারতের নরে।
ঐ শুন কল্লোলিয়া প্রস্রবণ ঝরে

(২২)

তথাপি ভারতবাসী ঘুমে অচেতন?
কাদম্বিনী ডাকে ঘন, ঘন ডাকে গিরিগণ,
ঘন ঘন ঘন ডাকে বংশীর নিস্বন।
জন্মমত ভারত কি ঘুমাবে এমন?

'পর্ব্বত আরোহণ' ও 'বংশীধ্বনি' মনে করিয়ে দেয় ১২ বৎসরের রচনা "অভিলাষ" কাব্যের ৩।৪ সংখ্যক পদ।

"ভারতভূমি" সম্বন্ধে অধ্যাপক সুকুমার সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :—"রবীন্দ্রনাথের কবিতা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা সংশোধিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সংশোধনের জন্য আমরা দুঃখিত নই, কিন্তু তিনি যে কবিতাটি অংশতঃ ছাটিয়াছিলেন সে জন্য ক্ষোভ হইতেছে।" কবিতাটি অসন্দিগ্ধ ভাবে বালক রবীন্দ্রনাথের বলে প্রমাণ হ'লে, এর মধ্যে পাব বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর সহানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়। তাই যেন কানের মধ্যে আজও বেজে ওঠে বঙ্কিমের ভবিষ্যদ্বাণী: "রমেশ তুমি সন্ধ্যাসঙ্গীত পড়িয়াছ?" রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহ-সভায় তাঁকে বঙ্কিম যখন এই প্রশ্নচ্ছলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যলক্ষ্মীর স্থায়ী প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত করেন তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স বিশ-একুশ, কারণ সন্ধ্যাসঙ্গীত ১২৮৮ (৫ জুলাই ১৮৮২)তে প্রকাশিত হয়। তার আট-নয় বছর আগেকার রচনার মধ্যেও সে প্রতিভার সন্ধান পাওয়া বঙ্কিম ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ বঙ্কিম সেকালের কবিদের কড়া সমালোচকই ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা ছাপা হওয়ার তাৎপর্য্য আরও নূতন করে বোঝা যায়। "ভারতভূমি" কাঁচা রচনা হলেও কাব্যসরস্বতীর পাদপীঠে শিশু রবীন্দ্রনাথের কচি হাতের প্রথম আল্পনা। এ হিসাবে রবীন্দ্রভক্তদের কাছে কবিতাটির আদর হবে বলে এটি ছেপে কিছু আলোচনা করা গেল। সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দিতে চাই 'অচলিত সংগ্রহে' প্রকাশিত তাঁর কাব্য-রচনাগুলি, এবং বিশেষ ভাবে ১২৯১ সালে (মে ১৮৮৪) ছাপা তাঁর 'শৈশব-সঙ্গীত' ও ১৩০৩ সালের কাব্য-গ্রন্থাবলীতে ছাপা "কৈশোরক" আবার ভাল ক'রে আমাদের পড়া উচিত। ১২৯১ সালে ছাপা হলেও শৈশব-সঙ্গীতের অধিকাংশ কবিতা ১২৮৪-৮৭ সালের ভারতীতে প্রকাশিত হয় এবং সেগুলি কবির তের থেকে আঠার বছরের রচনা। রবীন্দ্রনাথকে ছেলেবেলায় বয়সের চেয়ে যে কিছু বড় দেখাত তার প্রমাণ তার এগার বছর বয়সে পিতার সঙ্গে প্রথম বোলপুর (১২৭৯ ফাল্গুন) হয়ে অমৃতসর পর্য্যন্ত ট্রেনযাত্রার গল্পের মধ্যে আছে। সুতরাং বার বছরে রচিত "ভারত-ভূমি" কবিতাটি এক 'চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালকে'র বলে যে বঙ্কিম গ্রহণ করেন তারও খানিকটা কারণ মেলে।

সে যুগের এ সব রচনা 'অচলিত সংগ্রহে' স্থান না পেলেও তাদের সন্ধান করা দরকার। কারণ কবির ৫০ বছরে রচিত জীবনস্মৃতির মধ্যে তিনি নিজে অস্পষ্ট অথচ মূল্যবান আভাস দিয়ে গেছেন তাঁর শিক্ষারম্ভ অধ্যায়ে: 'তখন কর, খল প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবে মাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা।'

আমরা বলতে পারি ছন্দ-ঋত্বিক রবীন্দ্রনাথের উপর ছন্দ-সরস্বতীর সেই প্রথম আশীর্ব্বাদ। তখনকার কালে যদি পাঁচ বছরে শিক্ষারম্ভ হয়ে থাকে তাহলে ছন্দবোধের এই প্রথম উন্মেষ দেখি ১৮৬৬-৬৭ সালে। তখন প্রাক্-কংগ্রেস যুগের প্রথম জাতীয় আন্দোলন বিখ্যাত হিন্দুমেলার উদ্বোধন চলছে (১২ এপ্রেল ১৮৬৭); কবির পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ও দাদারা এ আন্দোলনে অগ্রণী। দেবেন্দ্রনাথের অর্থ সাহায্যে হিন্দুমেলার সহ-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র 'ন্যাশন্যাল পেপার' ইংরাজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি', সত্যেন্দ্রনাথের 'জয় ভারতের জয়' (১৮৬৮), গণেন্দ্রনাথের 'লজ্জায় ভারত যশ গাইব কী করে', রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে' ও হেমচন্দ্রের 'বিংশতি কোটি মানবের বাস' (১২৭৭ এডুকেশন গেজেট, ১৭ শ্রাবণের সংখ্যায় মুদ্রিত 'ভারত সঙ্গীত' দ্রষ্টব্য,) প্রভৃতি গান ও কবিতা রবীন্দ্রনাথের শৈশব রচনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তার সন্ধান কবি নিজে দিয়েছেন একেবারে হারিয়ে-যাওয়া 'ছিন্নবিচ্ছিন্ন নীল হাতা,' ও বাঁধান লেট্‌স্ ডায়ারি নিবদ্ধ রচনা ও অধুনালুপ্ত 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাহিনীর মধ্যে। এই বীর রসাত্মক কাব্যটি প্রথম বোলপুর ভ্রমণের সময় 'তৃণহীন কঙ্করশয্যায়' বসে লেখা হয়। কিন্তু কাব্যে হাতে-খড়ি হয়েছিল তাঁর ৭।৮ বছরে অর্থাৎ ১৮৬৮।৬৯ সালে, যখন তাঁর ভাগিনেয় জ্যোতিঃপ্রকাশ হ্যামলেটের উক্তি আবৃত্তি করতেন ও 'পয়ার ছন্দে চৌদ্দ অক্ষরে যোগাযোগের রীতি পদ্ধতি' রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে দিয়ে বাঙলা সাহিত্যে এক নবযুগের উদ্বোধন করেন। মধুসূদন সেকালের সাহিত্যগগনে মধ্যাহ্ন সূর্য্য ও তিনি কবির মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু ও বিলাত প্রবাসে সহযাত্রী। সত্যেন্দ্রনাথের মারফতে আমরা জানি যে দেবেন্দ্রনাথ মাইকেলের মস্ত সমজদার ছিলেন ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজনারায়ণ বসু মাইকেলের সহপাঠী ও সমালোচক ছিলেন। সুতরাং মাইকেলের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আধুনিক repression complex মতবাদের সাহায্যে বুঝি ভারতীতে নিজনামে গদ্য ও পদ্য রচনা ছাপার সঙ্গে সঙ্গে কেন রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদ বধ কাব্যকে আক্রমণ করেন। মাইকেলের প্রভাব 'ভারত-ভূমি' কাব্যে স্পষ্ট; এবং তারও আগে দাদারা শিশু কবির রচনা যখন নবগোপাল মিত্রকে শুনিয়েছিলেন তখন ভ্রমরকে অবজ্ঞা ভরে তাড়িয়ে কবি দ্বিরেফ্ প্রয়োগে গর্ব্বিত! সুতরাং ভারতভূমি কাব্যে 'পুরন্দর' শব্দের সঙ্গে 'ক্ষপাকর' মেলান রবীন্দ্রনাথেরও কীর্ত্তি হতে পারে, অথবা বঙ্কিমের কে জানে?

ভাগিনেয় যখন হ্যামলেট আবৃত্তিতে মত্ত তার কিছু কালের মধ্যে ম্যাক্‌বেথ নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ আজীবন শেক্‌সপিয়র-ভক্ত এবং প্রায় ৮০ বছর বয়সেও তাঁকে হামলেট আবৃত্তি করতে আমরা শুনেছি। উত্তর-ভারত ভ্রমণ শেষ করে এসে রবীন্দ্রনাথ সেণ্টজেভিয়াস্ কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে কুমার-সম্ভব ও ম্যাক্‌বেথ পড়তেন। শুধু তা নয় সেকালে-(১৮৭৩-৭৪) ম্যাকবেথ বাংলা ছন্দে তর্জ্জমা না করা পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গুরু তাঁকে ঘরে বন্ধ করে রাখতেন। সেই অনুবাদের কিছু অংশ কবির সংস্কৃত-অধ্যাপক, রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিত, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শোনান। তখন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর কাছে ছিলেন। এই অনুবাদের খণ্ডিত অংশ মাত্র রক্ষা পেয়েছে। ভারতী ১২৮৭ আশ্বিন থেকে ইহা সজনীকান্ত দাস উদ্ধার করেন। অভিলাষ কবিতার ২৪-৩১ নং পদগুলিতে তার ছায়া দেখি।

"ভারতভূমি" কবিতার সঙ্গে যোগ রয়েছে এ কালের তাঁর স্বাক্ষরিত ও অধুনা সুপরিচিত অন্য দুএকটি রচনায়: ১৮৭৫ ফেব্রুয়ারীতে পঠিত ও প্রকাশিত "হিন্দুমেলার উপহার" ও ১৮৭৭ ডিসেম্বর হিন্দুমেলার দ্বিতীয় কবিতা লিটন-দরবার উপলক্ষ্যে। এ সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্র বাবু তাঁর 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়ে' ভাল রকম আলোচনা করেছেন, ও শ্রীযুক্ত যতিনাথ ঘোষ জ্যোতিরিন্দ্রের 'স্বপ্নময়ী' নাটকের (১৮৮২) একটি কবিতার সঙ্গে ইহার ভাবগত মিল দেখিয়েছেন। হেমচন্দ্র ও রঙ্গলালের প্রভাব এ সব রচনার মধ্যে সুস্পষ্ট।

হিন্দুমেলার প্রথম (ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫) ও দ্বিতীয় (ডিসেম্বর ১৮৭৬) কবিতার মাঝখানে আরও একটি মূল্যবান কবিতা আমাদের চোখে পড়ে; "প্রকৃতির খেদ" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (আষাঢ় শক ১৭৯৭ = জুন-জুলাই ১৮৭৫) ছাপা হয়, "অভিলাষ" কবিতাটি ছাপার ৮ মাস পরে। (শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ দ্রষ্টব্য)। অভিলাষ (৩-৪ পদে) যেমন "ভারতভূমি"র ছাপ কতকটা বহন করছে, তেম্‌নি "প্রকৃতির খেদ" অনেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' কাব্যোপন্যাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বই হিসাবে ১২৮৬ (—৯ মার্চ ১৮৮০)তে প্রকাশিত হ'লেও বনফুলের কবিতাগুলি ১২৮২-৩ সালের শ্রীকৃষ্ণদাস-সম্পাদিত (১২৭৮ আরম্ভ) 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রে প্রকাশিত হয়। হিন্দুমেলার প্রথম স্বাক্ষরিত কবিতা প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ১৩ বছর ৯ মাস এবং "প্রকৃতির খেদ" ছাপার সময় তাঁর বয়স ১৪ বছর ২ মাস মাত্র। এই কবিতাটির ভাব ও ভাষার সাহায্যে বনফুল (১২৮২) ও কবিকাহিনী (১২৮৪) যেন এক নূতন রূপে দেখি। তা'ছাড়া (শ্রাবণ) ১২৮৪তে ভারতী পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেখি কবি ছদ্মনামে 'ভানু-সিংহের পদাবলী' (প্রথম কিস্তি ৭টি পদ) ছাপছেন; তার প্রায় পাঁচ বছর আগে (১২৭৯-৮০) সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সেটি কবির 'লোভের সামগ্রী' হয়েছিল সে কথা তিনি জীবনস্মৃতিতে লিখে গেছেন। মৈথিলী ভাষায় বিদ্যাপতি পাঠ ও 'কৃত্রিম' ব্রজবুলিতে ভানুসিংহ রচনার জের অনেক কাল রবীন্দ্রনাথ টেনেছেন তার রহস্যকর প্রমাণ আছে। বৈষ্ণব পদাবলীর ঝঙ্কার তাঁর কাব্যে ও গানে কি নূতন রস দিয়েছে এবং মৈথিলী-ব্রজবুলীর চর্চ্চা থেকে শব্দতত্ত্বের নেশা তাঁকে কেমন করে পেয়ে বসেছিল এ সব আলোচনা ভাল ক'রে হওয়া দরকার। তাঁর কাঁচা বয়সের কিছু পদ্য অনুবাদ লুকিয়ে আছে অনেক গদ্য প্রবন্ধের মধ্যে। ১২৮৫ ভারতী পত্রিকায় দান্তে ও বিয়েত্রিচে প্রবন্ধে এবং এংলো-সাক্সন ও এংলো-নর্ম্মান সাহিত্যের আলোচনায় কিছু কিছু পদ্য-অনুবাদ পাই। ২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিলাত যাত্রা করেন, তখন হয়ত তাঁর প্রথম ছাপা বই কবিকাহিনীর ফাইল তাঁর হাতে ছিল। ঐ সময়েই পাই তাঁর একটি গান (জয়জয়ন্তী—চৌতাল) যেটি স্বদেশী যুগে বহুকাল পরে আদৃত হয়েছিল:

'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ'

এ গান মনে করিয়ে দেয় বিদেশযাত্রার সময় মধুসূদনের 'রেখ মা দাসেরে মনে'। অথচ ১২৮৪তেই পাই ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের 'মেঘনাদ' সমালোচনা এবং তারও দু-বছর আগে জ্ঞানাঙ্কুর (১২৮২) পত্রে 'ভুবনমোহিনী প্রতিভার' বিশ্লেষণ। সুতরাং পদ্যে ও গদ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভা ছেলে বেলায় যে আত্মপ্রকাশ করেছিল সে কথা মনে রেখে এই সব কাঁচা লেখাগুলি ধৈর্য্যের সঙ্গে আবার পড়বার সময় এসেছে। গৃহকোণের শিশু কবি তাঁর শৈশব-সঙ্গীত শেষ ক'রে বড় সাহিত্য-সভায় নামতে চলেছেন এটি দেখাতে চেষ্টা করব 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের সভাপর্ব্ব' আলোচনায়।

চিত্তদোলা

শ্রীহেমলতা দেবী

যত রূপ ঢাকা ছিল রূপের আড়ালে,
সবই কি ফুটিল ফুলে? দু-বাহু বাড়ালে
জড়ালে অন্তর তব আলিঙ্গনপাশে
ফুলময় চিত্ত-দোলে প্রীতিগন্ধ ভাসে।
প্রতি দিন প্রাতে ফুটি' ঝরে সন্ধ্যাবেলা
তোমার পূজায় কভু করে না সে হেলা!

এত অগ্নি, এত দাহ, পৃথ্বী জ্বলি যায়
অন্তরে পূজার ফুল তবু না শুকায়।
নিত্য নব অঙ্কুরের আনে সে সূচনা
নিত্য নব ছন্দে আনে নবীন রচনা!
ভস্মে সে ফুটায় ফুল, শ্মশানে সঙ্গীত,
মৃত্যুপারে জীবনেরে করে সে নন্দিত!
নিত্য ফুটি' নিত্য লুটি' করি নিবেদন
সার্থক করে সে প্রেমে জন্ম-মৃত্যু-ক্ষণ॥

স্বপ্ন-মায়া

শ্রীপারুল দেবী

ভোর পাঁচটা। বাহিরের দরজার কড়া নড়ে উঠল। গোয়ালা হাঁকলে, "দুধ—দুধকা বালতি মাইজী।"

পাশের ঘরে খোকার গলার আওয়াজ শোনা গেল মাকে ডাকছে, "ওমা দরজা খোল না—জ্যেঠির কাছে যাই। ওমা দরজা খুলতে পারছি না যে ওঠ না মা।"

এ ঘরে সুষমা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। চোখে ঘুম যায় নি তখনও। কিন্তু আর শুয়ে থাকলে ত চলবে না। গোয়ালা দুধের বালতির জন্যে বাহিরে অপেক্ষা করছে—সুষমা বালতিটি বার ক'রে দিলে সে এখানকার বরাদ্দ দুধ ঢেলে দিয়ে আরও পাঁচ বাড়ী দুধ দিতে চলে যাবে। খোকা ও ঘরে তার কাছে আসবার জন্য বায়না ধরেছে—তার মায়ের ঘুম ভাঙে নি এখনও তাই, এক বার ঘুম ভাঙিয়ে দরজাটা খোলাতে পারলেই খোকা এখনি ছুটে আসবে তার কাছে। তাকে মুখ ধোয়ান, কাপড় পরান, খাবার দেওয়া, সবই সুষমার প্রাত্যহিক কাজ। কিরণ—তার জা, খোকার মা বেলা অবধি ঘরে শুয়ে থাকে—বেলা অবধি তার ঘুমান অভ্যাস। সুষমারও আগে যেমন অভ্যাস ছিল—তেমনি। তবে কপালের সঙ্গে অভ্যাসও বদলাতে হয়—তাই সুষমার আজকাল আর ভোর পাঁচটার সময়ে বিছানা না ছাড়লে চলে না। বিধবা মানুষের আবার এত আলস্য কিসের?

উঠানের ওদিকের ঘর খুলে কিরণের মা জোরে জোরে "তারা, তারা, দুর্গা, দুর্গা," বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন, এবং উঠানে নেমে আঙুলে তুড়ি দিয়ে দিয়ে বার দুই-তিন হাই তুললেন। বাহিরে গোয়ালা আবার চেঁচিয়ে উঠল, "মাইজী দুধ লেনা হ্যায় তো লেও—দের হো রহা হ্যায়।" কিরণের মা সুষমার ঘরের দিকে তাকালেন। বললেন, "কই গো মেয়ে—গোয়ালা যে তখন থেকে চেঁচিয়ে সারা হ'ল. দুধের বালতিটা দাও ওকে। পাঁচটা যে কখন বেজে গেছে।"

সুষমা কাপড়-চোপড় ঠিক ক'রে, মাথায় কাপড় দিয়ে বেরিয়ে এল। তার নিজের সংসারে বরাবর চাকরেরাই দুধ নিত—দুধের বালতি এগিয়ে দেবার কাজ কোনও দিনও তার ছিল না। কিন্তু এ তার জায়ের সংসার—এখানকার ব্যবস্থা ভিন্ন। যদিও কিরণ সকলকে ব'লে দিয়েছে—"মাইজী যা বলবেন তাই করবি", বিধবা বড় জায়ের উপর সংসারের কর্ত্রীত্বের ভার সবটাই ছেড়ে দিয়েছে—কিন্তু সে কর্ত্রীত্বের ভার সুষমার কাছে কেবল ভার মাত্রই। সে সংসার করায় না আছে তৃপ্তি, না আছে আনন্দ, না আছে স্বাধীনতা। কিরণের বার বছরের পাতা সংসার যেভাবে চলে এসেছে তার ধারাকে বদলাবার সুষমার জোর নেই—সে শুধু দিনের কাজটা ক'রে যায় এই পর্য্যন্ত।

অপ্রসন্ন মুখে সুষমা দুধের বালতি হাতে নিয়ে উঠানে নেমে দরজা খুলে দিলে।

"ইয়ে হ্যায় দেড় সের দুধ। আউর ও নেহি চাহিয়ে?" সুষমা দুধের বালতি হাতে ক'রে তুলে নিলে। "নাঃ, আর চাই নে আজ।"

ঝড়ের মত ছুটে এসে খোকা সুষমার দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরলে। "তুমি দুষ্টু জ্যেঠি। কাল রাত্তিরে কখন আমাকে তুলে মার ঘরে দিয়ে এসেছিলে? বলেছিলাম না তোমার ঘরে শোব? ভাইটা কাল রাত্তিরে কাঁদছিল কেবল কেবল—আমি আজ কিছুতেই ও ঘরে শোব না। তোমাকে আজ শুতেই হবে আমাকে নিয়ে।"

খোকার ধাক্কা থেকে দুধের বালতি সামলাতে গিয়ে সুষমার হঠাৎ মনে পড়ল তাই ত, ছোট খোকার ত শরীর ভাল নেই—কিরণ যে কাল বলেছিল আধ সের দুধ যেন বেশী নেওয়া হয়, ছোট খোকা আজ আর কিছু খাবে না—শুধু দুধ খাবে। কই নেওয়া হ'ল না ত—গোয়ালা ত চলে গেল। কি বিপদ!

সুষমা তাড়াতাড়ি উঠানের পশ্চিম দিকের বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। "কানাই, ও কানাই, কানাই রে—ওঠ ওঠ বাবা, ছুটে যা—দেখ্ গোয়ালা এই যাচ্ছে, ছুটে গিয়ে ডেকে আন্—বল্ আধ সের দুধ আরও দরকার। এখনি দিয়ে যাবে। বল্ বাড়ীতে অসুখ, দুধ চাই-ই চাই। ওঠ্, ওঠ্ বাবা, দেরি করলে আর পাবি না।" কানাই বারান্দায় শুয়ে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমচ্ছিল—ডাকাডাকিতে বিরক্ত হয়ে উঠে বসল। ভুরু কুঁচকে বললে, "দুধ কেয়া আভি আওর মিলে গা?" সুষমা বললে "হ্যাঁ হ্যাঁ খুব মিলে গা। তুই ছুটে যা না, গোয়ালাকে ডেকে আন—যা বলবার আমি বলব। তোর ত নড়তেই ছ-মাস, গোয়ালা বাড়ী ফিরে গেলে তখন ডাকবি কাকে? ওঠ্ না।"

কানাই উঠে আপন মনে কি বকতে বকতে গোয়ালার খোঁজে বেরিয়ে গেল।

কিরণের মা উঠানের সিঁড়ির ধাপে ব'সে ব'সে হাই তুলছিলেন। বললেন, "ওমা—কাল শুতে যাবার সময়ে যে কিরণ তোমাকে বললে না আধ সের দুধের কথা? এই যে গোয়ালা দুধ দিয়ে গেল, তখন মনে পড়ল না বুঝি? আমারও যেমন হয়েছে পোড়া মন—কিছুই মনে থাকে না। আর মা সংসারের ঝামেলা পোয়াবার বয়েস কি আর আমাদের আছে? এ সব থেকে কবে ছুটি পাব তাই এখন ভাবি রাতদিন। খুব সংসার করেছি যখন বয়েস ছিল—পান থেকে চুণ কখনও খসতে দিই নি—এমন নিয়ম করা সংসার ছিল আমার। এই কিরণই সেদিন বলছিল মা, আমার সংসার বাপু কই তোমার সংসারের মত হ'ল না ত। তা আমি বলি সে কি করে হবে বাছা? সংসারের ত চাকা নেই যে গড়গড়িয়ে আপনি চলবে। তাকে হাতে করে চালাতে হয় তবে ত চলবে সে। কথায় বলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথ চালিয়েছিলেন—তেমনি সংসার-রথ—"

কিরণের মায়ের রথ-চর্চ্চায় বাধা পড়ল। কানাই মৃদুমন্দ গতিতে ফিরে এসে বলল, "কাঁহা দুধওয়ালা? উস্‌কা তো পাত্তাই নেহি মিলা। হাম্ তো বহুত জোর দৌড়া—বাকি উও তো হ্যায় নেহি তো কাঁহা মিলে?"

কানাইয়ের গোয়ালার পশ্চাদ্ধাবনের বিবরণ সবটা মিথ্যা জেনেও সুষমা আর কথা বাড়াল না। আর কিরণের মায়ের নিজের বয়সকালে তাঁর সংসার চালাবার নিখুঁৎ পদ্ধতির বিবরণও সুষমা এতবার শুনেছে যে সেটাও আর শুনতে তার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। তাই সে খোকার হাত ধরে "আয় খোকা আমরা মুখ ধুয়ে আসি" ব'লে টেনে নিয়ে স্নানের ঘরের দিকে চলে গেল।

সকালবেলা কত কাজ। তার উপর সর্ব্ব কাজের মধ্যে খোকা আবার পায়ে পায়ে বেড়িয়ে সুষমার কাজ দ্বিগুণ করে দেয়। খোকাকে খাওয়ানই ত সুষমার এক সময়-সাপেক্ষ কাজ। অনবরত তার সঙ্গে না বকলে খোকা কিছুতেই খায় না। তাকে মুখ ধুইয়ে, কাপড় ছাড়িয়ে, নিজের ঘরের জিনিসপত্র গুছিয়ে, বিছানা তুলে, নিজে স্নান ক'রে সুষমা যখন এসে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকল তখনও বিনয় বা কিরণ কেউ ওঠে নি। কিরণের মা তখন স্নান করতে ঢুকেছেন। কলের জলের শব্দ ছাপিয়ে তাঁর মুখের কৃষ্ণের শতনামের শব্দ শোনা যাচ্ছে—"ক কহে কহ কহ কৃষ্ণ কথা কহ, খ কহে—" ইত্যাদি।

ভাঁড়ারে এসে সুষমা তারের আলমারী থেকে কাল রাত্রের লুচি বার করলে। লুচি নিয়ে তার উপর চিনি ছড়িয়ে সেটাকে পাকাতে লাগল। খোকা বললে, "হচ্ছে না জ্যোঠি—ও রকম আল্‌গা করে পাকালে আমি খাব না ত। খু—ব জোরে পাকাও। দেখ, দেখ জ্যোঠি দেখ, এই রকম সরু ক'রে দাও—" ব'লে খোকা চট্ করে তরকারির ঝুড়ি থেকে একটা কঞ্চি ভেঙে নিয়ে সুষমাকে দেখালে—"এই রকম সরু ক'রে যদি দিতে পার ত খাব, নয়ত খাব না কিন্তু।" ব'লে খোকা ঠিক দুষ্ট ঘোড়ার মতন ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়াল।

সুষমা লুচি পাকিয়ে এনে বললে—"ছিঃ ও রকম দুষ্টুমি করে না। জান না আমার হাতে ব্যথা হয়েছিল? আমি বেশী জোরে কখনও পাকাতে পারি?—ধর ধর খোকন শীগ্‌গির ধর—খেয়ে নাও। আমি দুধ জ্বাল দিতে যাই—উনুন জ্বলে যাচ্ছে। ও খোকা ধর্ না বাবা। নিবি নে? না নিবি তো এই রইল, আমি চললাম। আমি তো আর তোমার একটা লুচি নিয়ে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।" ব'লে সুষমা লুচিটা নিয়ে আলমারীর ভিতর রেখে দেবার ভান করতেই খোকা ছুটে এসে লুচিটা নিয়ে নিলে। "আচ্ছা, আচ্ছা, খাচ্ছি দাও। জ্যোঠি, আমি রোজ রোজ লুচি খাব না—বলেছি না? পাঁউরুটি কবে দেবে ঠিক ক'রে বল।"

খোকা পাঁউরুটি দারুণ ভালবাসে। আগে আগে পাঁউরুটির একটা টুকরা খোকার হাতে ধরিয়ে দিতে পারলেই সুষমা নিশ্চিন্ত হ'ত—খোকা সেটা নিয়ে আধ ঘণ্টা ধরে চিবোতে থাকত। কিন্তু কিরণের মায়ের সম্প্রতি মুসলমানের পাঁউরুটির উপর উৎকট ঘৃণা হওয়াতে বাড়ীতে পাঁউরুটি আসা কিছু দিন থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। এক দিন কিরণ বুঝি মাকে কি বলতে গিয়েছিল তাতে তিনি বললেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোরা জানিস্ তো সব। পাঁউরুটি ময়দা দিয়ে তৈরি হয় তা ত আমিও বুঝলাম, কিন্তু সে ময়দাটা মাখা হয় কি দিয়ে তার খবর রাখিস? মাখা হয় শূয়োরের চর্ব্বি দিয়ে। তবে তো অমন ফোলে। মাগো, ও সব জিনিস কখনও বাড়ীতে আনতে আছে? পৃথিবীতে এত খাবার জিনিস থাকতে শেষে কিনা ছেলে-পুলেকে রোজ খানিকটা ক'রে শূয়োরের চর্ব্বি খাওয়াতে হবে? এ কি অন্যায় আব্দার তোমাদের? আর বাপু ও সব পাঁউরুটি ফাঁউরুটি তোমরা আনালে আমার ত আর এ বাড়ীতে থাকা হয় না—তাও স্পষ্ট ব'লে দিলুম। অনেক অবিচার এঁটো কাঁটা সহ্য করি—তা ব'লে এতটা পারব না—" ব'লে অত্যন্ত রাগ ক'রে তিনি নিজের ঘরে ঢুকলেন। সেই থেকে পাঁউরুটির নাম আর এ বাড়ীতে ওঠে না।

সুষমা বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঁউরুটি আনতে দেব পরে খোকা। এখন যে দোকান বন্ধ থাকে কিনা—তাই তো পাঁউরুটি পাওয়া যায় না। দোকান খুললে পরে কানাইকে

বলব তোমাকে এনে দিতে। এখন লুচিটা খেয়ে নাও তো—লক্ষ্মী সোনা ছেলে।"

সুষমা আধ সের দুধ কিরণের মায়ের ঘরে ঢেলে দিয়ে বাকি দুধটা জ্বাল দিতে উনানের কাছে বসল। নারকোলটা কাল সন্ধ্যাবেলা কুরে রেখেছে—আজ হাত খালি হ'লে মিষ্টি করতে হবে। একটার পর একটা কাজ ক'রে যায় সুষমা—থেকে থেকে নিজের সংসারের টুকরো টুকরো ঘটনা মনে ভেসে ওঠে—আবার হয়ত তখনি খোকার কোন অবান্তর প্রশ্নে তার জাল ছিঁড়ে যায়। বিনয় ১০টায় অফিসে বেরিয়ে যাবে—তার সঙ্গে তার দুপুরের খাবার ক'রে দিতে হয়। ঠাকুর আসে দেরিতে;—১০টার সময়ে অফিসের ভাত দিতেই তার তাড়াতাড়ির অন্ত থাকে না—পাছে না হয়ে ওঠে বলে সুষমাকে কেবলই তাড়া দিতে হয়—"ও মিশির ঝোলটা হ'ল? ওটা নাবিয়ে শীগ্‌গির মাছের খাট্টাটা চড়াও—সাড়ে নটা বেজে গেল যে, আর চড়াবে কখন? কত বলি মিশির একটু সকাল ক'রে এসো, সকাল ক'রে এসো—তা তোমার আসতেই আটটা বেজে যায়—তা আর কখন রাঁধবে?" মিশির প্রতি দিন একটা-না-একটা কৈফিয়ৎ দিতে থাকে যে আজই একটা অঘটন কিছু ঘটাতে এ রকম দেরি হয়েছে, না হ'লে সে ত এ বাড়ীতে আজ দু-বছর ধরে কাজ করছে, কবে তার দেরি হয়েছে ছোট মাইজীকে না হয় মাইজী জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন। সুষমার আর বকবার সময় থাকে না, সে তাড়াতাড়ি লুচির ময়দা মেখে বিনয়ের টিফিন তৈরি করতে বসে।

এমনি ক'রে বিজয়ের খাবারও এই সেদিন তৈরি ক'রে দিয়েছে সুষমা। এ বাড়ীতে নয়—তার নিজের বাড়ীতে অবশ্য। মজঃফরপুরে বিজয় প্রতি দিন অফিসের কাপড় পরে একবার করে সুষমা যে-ঘরে খাবার তৈরি করছে সেইখানে এসে দাঁড়াত। সদ্য স্নান করা, পরিষ্কার কাপড় পরা, হাসিতে উজ্জ্বল বিজয়ের মুখ—কত জীবন্ত, কত সত্য আজও সুষমার কাছে। স্টোভ জ্বালিয়ে সুষমা যেখানে হয়ত নিমকি ভাজছে, সেখানে এসে বিজয় দাঁড়াত। সুষমার বিশেষ ক'রে মনে পড়ে এক দিনের কথা। দিন দুই আগে গরম ঘিয়ে আঙুলটা ডুবে গিয়ে সুষমার ডান হাতের একটা আঙুল একটু পুড়ে গিয়েছিল। সেদিন ত বিজয়ের বকাবকি আর রাগারাগির অন্ত রইল না। তখনি চাকরদের ডেকে হুকুম হয়ে গেল "কেন, তোমরা সব আছ কি করতে, যদি মাইজীকেই রোজ হাত পুড়িয়ে রান্না করতে হয়? টিফিনটা ক'রে দিতে পার না? না যদি পার ত আজই সবাই চলে যাও—আমি নতুন লোক দেখে আনব।" বিজয় অফিস চলে গেলে সুষমা চাকরদের ডেকে মিষ্টি কথায় কত বোঝালে—"সাহেবের কথা তোমরা ধ'রো না—জানই ত উনি ও রকম বকেন মাঝে মাঝে। আমার হাত পুড়েছে আমার দোষে—তোমরা তার কি করবে? তোমরা কাজ কর যেমন করছ।"

তার পর থেকে ত সুষমার টিফিন করা বন্ধ। অথচ এটি সুষমার কত দিনের একান্ত নিজের কাজ; সুষমা ভালবাসে নিজের হাতে বিজয়ের খাবারটি তৈরি ক'রে দিতে। সে চিরকাল দেখেছে তার মা তার বাবার খাবারটি নিজে হাতে তৈরি ক'রে গুছিয়ে বাক্সে ভরে দিতেন কত যত্নে। আজ নিজের সংসারে মায়ের সেই কাজটির পুনরাবৃত্তি না করতে পারলে তার মনে হয় ঠিক মত সংসারের কর্ত্তব্য করা হ'ল না বুঝি—কোথায় কি ত্রুটি রয়ে গেল। তাই হাত পুড়ে মহা বিপদ সুষমার। আগে থেকে ষ্টোভ জ্বালাতে পারে না—ধরা পড়বে বিজয়ের কাছে। বিজয় স্নান করতে যেতেই সুষমা ছুটল ভাঁড়ার ঘরে। চাকরদের ডেকে ময়দা মাখালে—স্টোভ ধরালে। তাড়াতাড়ি ক'রে ক-খানা গজা ভেজে তাতে রস মাখাচ্ছে—এমন সময়ে বিজয় স্নান সেরে কাপড় পরে এসে দাঁড়াল। "কি হচ্ছে এটা সুষমা?"

অপরাধী সুষমা যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে বললে "হবে আবার কি? গজা হচ্ছে।"

বিজয় নীচু হয়ে স্টোভের চাবিটা ঘুরিয়ে স্টোভ নিবিয়ে দিয়ে বললে, "গজা হচ্ছে তা আমি দেখতে পেয়েছি, তবে কেন গজা হচ্ছে তাই জানতে চেয়েছি। কার এখন গজা খাবার এত তাড়া হ'ল? তোমার নিজের বুঝি এখন গজা খেতে ইচ্ছে হয়েছে?"

সুষমা রেগে গেল। "দেখ, যা-তা ব'কো না। ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা বলা আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। সাত সকালে উঠে নিজে খাব ব'লে যে গজা ভাজতে বসি নি তা তুমি খুব ভাল করেই জান। মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, কথা একটা জিজ্ঞেস করলেই হ'ল—না?"

বিজয় বলল, "তা বাড়ীতে ত তুমি আর আমি। আমি ত তরশু থেকে বলেই দিয়েছি যে দুপুরে আমি শুধু ফল খাব, আর কিছু চাই না। কেন বলেছি তাও তুমি খুব ভাল ক'রে জান। কাজেই গজাটা যে আমার জন্যে ভাজছ না ধরে নিলাম। আর তুমি ত বলছ তুমিও খাবে না—তবে কি চাকর-বাকরদের খাওয়াবে ব'লে তাড়াতাড়ি স্টোভ জ্বালিয়ে গজা ভাজতে বসলে? তা সেটা ত আর দু-দিন পরে তোমার হাতটা ভাল ক'রে সারবার পরে করলেই হ'ত সুষমা—এত তাড়া কি ছিল?"

সুষমা গজার বাটি হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে রাগ ক'রে বললে, "বকিও না মিছিমিছি আমাকে। দুপুরে ফল খাবে

কেন, ফল খাবে কেন শুধু শুধু? ফল খেলে মানুষের কখনও পেট ভরে? চল চল আপিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে, ভাত খাবে চল।...এই ছোট্টু, সাহেবের টিফিনের বাক্স আন্ না—হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

খেতে ব'সে বিজয় আর কিছু বললে না—একবার শুধু বললে—'ব্যাণ্ডেজটা একবার খোল ত সুষমা—আঙ্গুলটা দেখি।" সুষমা তখনও রাগ ক'রে আছে—জেদ ক'রে বললে—"না খুলব না! এই ত সকালবেলা দেখলে আঙ্গুল—ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখে কি হবে? বেশ বাঁধা আছে থাক্।"

বিজয় খাওয়া শেষ ক'রে উঠল। সুষমার হাতটা টেনে নিয়ে নিজেই ব্যাণ্ডেজ খুলল। নিরীক্ষণ ক'রে ক'রে অনেকক্ষণ আঙ্গুলটি দেখল—একবার বললে "ইস"! সুষমা জোর ক'রে হাত টেনে নিয়ে বললে,"কি যে বাড়াবাড়ি কর। ভারি ত পোড়া—ও ত প্রায় সেরেই গেছে। দাও দাও, আমিই বেঁধে নিচ্ছি। বললাম খুলো না, খুলো না—বেশ বাঁধা আছে থাক্—তা না টেনে-মেনে খুলে একাকার কাণ্ড।"

বিজয় কোনও কথায় কান দিলে না—আস্তে আস্তে যত্ন ক'রে আঙ্গুলে ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে জড়িয়ে আবার বাঁধলে, তার পর আঙ্গুলটি তুলে নিয়ে আস্তে একবার নিজের ঠোঁটে ছুঁইয়ে সুষমার হাত তার কোলের উপর নামিয়ে দিলে। নিজের ঘরে গিয়ে আপিসের কি সব দরকারী কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে এসে বাইসিক্‌লের পিছনে টিফিনের বাক্স চাকরেরা বেঁধে দিয়েছিল সেটা খুলতে লাগল। সুষমা অবাক হয়ে বললে, "ও কি হচ্ছে শুনি?"

বিজয় উত্তর দিলে না—টিফিনের বাক্সটা হাতে নিয়ে ছোট্টুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, "এই, পক্‌ড়ো।" ছোট্টু হাত বাড়িয়ে মনিবের হাত থেকে টিফিনের বাক্সটা নিলে বটে, কিন্তু সেটা নিয়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে সুষমার মুখের দিকে বোকার মতন তাকিয়ে রইল—বিজয় নিমেষের মধ্যে বাইসিক্‌লে উঠে বেরিয়ে গেল।

সারাদিন সুষমার যেমন রাগ তেমনি মন খারাপ। বিজয় আপিস থেকে ফিরলে সে কি কি বলবে সারাদিন ধরে ভেবে রাখতে লাগল। টিফিনের গজা-ভরা বাক্সটা টেবিলের উপর পড়ে আছে—সেটার দিকে যত বার চোখ পড়ছে, সুষমার নূতন ক'রে রাগ হচ্ছে, অভিমান হচ্ছে।

বেলা ২॥টার সময়ে বাইসিক্‌লে ক'রে আপিসের পিয়ন বিজয়ের একটি চিঠি নিয়ে এসে উপস্থিত। বিজয় লিখেছে, "সুষমা, তোমার হাতের করা খাবার রাগ ক'রে ফেলে এসে একটুও ভাল লাগছে না সারাদিন। ফল-টল কিছু খাই নি। গজাগুলি পাঠিয়ে দেবে? গজাদের জন্যে, তোমার জন্যে, তোমার হাতের জন্যে, সবারই জন্যে মন কেমন করছে বড্ড। বেচারী তুমি ব্যথা হাত নিয়ে আমার জন্যে খাবার ক'রে দিলে—'ক ব'লে আমি সে খাবার ফেলে এলাম? সত্যি কিছু ভাল লাগছে না সারাদিন। পাঠিয়ে দিও খাবার। আর রাগ ক'রে থেকো—আমি গিয়ে রাগ ভাঙ্গাব।"

সুষমার রাগ ক'রে থাকা হয় নি কিন্তু। গজা পাঠিয়ে পিয়নের হাতে বিজয়ের চিঠির উত্তর দিয়ে সুষমার মন খারাপ কোথায় উড়ে গেল।

ভাবতে ভাবতে সুষমার মন যেন কোথায় ডুবে গেছে। কত ছোটখাট অভিমান, কত স্নিগ্ধ প্রেমের কাহিনীতে ভরা তার জীবন—যখন বিজয় ছিল তখন সুষমাও অত বোঝে নি। যেমন পাঁচ জন সংসার করে সে-ও তাই করেছে—ভেবেছে জীবন ত এমনই। আজ পিছনে তাকিয়ে সুষমা বোঝে তার মূল্য। ভগবান্‌কে ডেকে বলে, "ভগবান কত দিয়েছিলে সে কথা বোঝবার শক্তি তখন দাও নি কেন? কিছু যে বলা হ'ল না। দাবী করেছি, নিয়েছি, এতটুকু ক্রটিতে অভিমান করেছি, নিয়েছি কেবলই, দিই নি ত কিছু। একবার কিছু দিনের মত ফিরিয়ে কি দিতে পার না? প্রাণ ভরে দিয়ে নিই আমার যা দেবার আছে?"

কাছেই খোকা বসে লুচির ময়দার টুকরা নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাখী ও হাতী তৈরি করছিল। মুখ খুলে বললে, "জ্যোঠি, বাবা যে ডাকছে তোমাকে, শুনতে পাচ্ছ না।"

সুষমা যেন জেগে উঠল। "কই রে খোকা? কে ডাকছে?"

জ্যেঠিমার চোখে জল দেখে খোকার পাখী ও হাতী তৈরির আনন্দ নিমেষে মন থেকে উড়ে গেল। সব ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাতে সুষমার গলা জড়িয়ে খোকা বললে, "কি হয়েছে জ্যোঠি? আবার তুমি আঙ্গুল পুড়িয়েছ? কোথায় লাগল? কই দেখি?"

ও-ঘর থেকে বিনয়ের গলা শোনা গেল, "কই, বৌদি, খাবার দেবে না? আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে যে।"

তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে বিনয়ের খাবার গুছিয়ে নিয়ে খোকার সঙ্গে অনর্গল বকতে বকতে সুষমা বেরিয়ে এল। "দূর, আঙ্গুল পুড়বে কেন? লাগে নি ত কোথাও। যা ধোঁয়া ওঠে ঘিয়ের কড়া থেকে! দেখি, তোরও ত চোখে জল এসে গেছে খোকন। কেন অত উনুনের কাছে বসিস বাবা? কাল থেকে দূরে ব'সো—কেমন?—এই যে ঠাকুরপো তোমার খাবার। দেখ আবার নুন বেশী বলে মিছিমিছি অর্দ্ধেক খাবার ফিরিয়ে এনো না—রক্ষে রাখব না আমি তা হ'লে, মনে থাকে যেন। নুন বেশী ব'লে কোথায় বেশী ক'রে গুণ গাইবে তা না আবার উল্টে নিন্দে।

…ও কিরণ এই দেখ, ভাই তোর বরের খাবার সব ঠিক হয়েছে কি না।

কিরণ কাছেই দাঁড়িয়েছিল, হাত বাড়িয়ে খাবারটা নিয়ে বাক্সটা খুললে। "কই দিদি, কাল যে আপেল কিনলাম টিফিনে দেব ব'লে—দাও নি ত।"

নিমেষে সুষমার মুখ সাদা হয়ে গেল। লজ্জায় এতটুকু হয়ে বললে, "ভুলে গেছি ভাই—এনে দিই।"

আপেল আনতে উঠান পার হ'তে হ'তে সুষমার চোখ আবার জলে ভরে এল। যন্ত্রের মত শুধু হাত দিয়ে কাজ করে সুষমা আজকাল—তার মন থাকে কোথায় কে জানে। কেবলই ভুল হয়, কেবলই ত্রুটি হয়—ছোট জায়ের কাছে ধরা পড়ে সে ত্রুটি। সংসারের ভার আজকাল তার উপর। সে সকলের বড়, তার উপর সংসারের ভার থাকলে দেখায়ও ভাল, সুষমারও দিন কাটাবার একটা উপায় হয়, কিরণও সংসারের ঝঞ্ঝাট থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্বামীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলবার, ছেলেদের দেখবার অবসর একটু বেশী পায়—এমনই সাত-পাঁচ কারণে সুষমাকেই বাড়ীর কর্ত্রী ক'রে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিরণের মা ত যে-কেউ বাড়ীতে আসে তাকেই বলেন, "তা-ও বলি বাপু, আমার মেয়ে জামাইয়ের মত দেওর জা লোকের ভাগ্যে মেলে। এই যে বড়মেয়ে এসে রয়েছেন, তা আমার কিরণ যেন তার কাছে নতুন বৌটি—একটি কথা কোন-তাতে কয় না। যা করবে সব এ বড় মেয়ে। বিনয়ের ত খাবার দিতে বৌদি, ধোপার কাপড় দিতে বৌদি, পরামর্শ দিতে বৌদি—কত মেয়ে এমন গিন্নিপনা নিজের সংসারেও করতে পায় না। আমি ত তাই বড়মেয়েকে বলি—।"

আপেল নিয়ে সুষমা ফিরে এল। অপ্রস্তুত মুখে আপেলটা বাক্সে ভরে দিতে দিতে বললে, "বড় ভুলো হয়েছে আমার মনটা আজকাল। এই নিমকি ভাজতে ভাজতে মনে করলাম আপেল কিনেছে কাল কিরণ, দেব ঠাকুরপোকে। ওমা দেবার সময়ে ঠিক ভুলেছি দেখ না।'

নিমকি ভাজতে ভাজতে একবারও সুষমার আপেলের কথা মনে পড়ে নি সে সুষমাও জানে, কিরণও বুঝলে—কিন্তু বললে না কিছু। এ রকম প্রায়ই হয় আজকাল।

"আপেলটা ধুয়ে দিয়েছ দিদি? যা মাছি বসে সব-তাতে আজকাল।" আবার সুষমার মুখ নূতন ক'রে সাদা হয়ে গেল। বললে, "হ্যাঁ ভাই, দিয়েছি।"

কিরণ বড় জায়ের মুখ দেখেই বুঝলে আপেল ধোবার কথাটা কতটা সত্যি। তা ছাড়া শুকনো আপেল—জলের দাগও ছিল না তার গায়ে, কিরণ দেখেছে। স্বামীকে ডেকে বললে, "আপেলটা খাবার আগে আর একবার ধুয়ে নিও—যা অসুখ-বিসুখের সময় পড়েছে—ভয় করে—।"

সুষমার করুণ মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ বিনয়ের বড় কষ্ট হ'ল। হাসিতে খুশীতে উজ্জ্বল, কথায় গল্পে মুখের বিরাম নেই—সেই তার বৌদি—কি করুণ মুখখানা হয়ে গেছে তার আজকাল। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বাইসিক্লে উঠে বিনয় বললে, "যাচ্ছি কিরণ, চললাম বৌদি।" কিরণ কিছু বললে না—সুষমা ধরা গলায় বললে, "এস ভাই।" তার দু-চোখে আবার জল ভরে এল। লুকোতে গিয়ে তাড়াতাড়ি খোকাকে তুলে নিয়ে বললে, "ও খোকা, আজ মাথায় সাবান দিয়ে নাইতে হবে। না? চ চ, এখনি কলে জল চলে যাবে।"

খোকাকে কোলে নিয়ে সুষমা চলে গেল।

ছোট খোকার জন্যে আধ সের দুধ নিতে সকালে ভুল হয়ে গেছে। এখনি আবার সে ভুলটা ধরা পড়বে কিরণের কাছে। সুষমা কি ক'রে সে ভুলটা ঢাকবে ভেবে পেলে না। এক পোয়াটাক জল সব দুধটার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে হয় না? বোঝা যাবে কি? কিন্তু কতটুকুই বা দুধ পড়ে আছে, তার সঙ্গে এক পোয়া জল দিলে যে সবটা জলই হয়ে যাবে—তা কি করা যায়?…কাল রাত্রেও কিরণ বলেছিল দুধের কথা—কি ব'লে ভুলে গেল সুষমা? কোথায় মন থাকে তার আজকাল?…কিরণ যদি সুষমার বড় জা হ'ত ত বেশ হ'ত—বড়দের কাছে ত্রুটি, অপরাধের মাপ চাওয়া যায়—ছোট জায়ের কাছে তার ত্রুটির লজ্জা আর অপমানই কেবল চোখে পড়ে।

সেদিন দুপুরে ভাত খেতে ব'সে ছোট খোকার দুধ উপলক্ষ্য করে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। খেতে বসার আগে কিরণ নিজের ঘর থেকে ডেকে বললে, "এই কানাই—যা বড়মাইজীর কাছ থেকে ছোট খোকার দুধটা চেয়ে নিয়ে আয়। বল্ তার জন্যে যে আজ আধ সের দুধ নেওয়া হয়েছে, সেটা আলাদা বাটিতে ঢেলে সবটা দিয়ে দেবেন। একটা রেকাবী আনিস—মুখে ঢাকা দেব।"

সকালে দেড় সের দুধের আধ সের ত কিরণের মায়ের ঘরে চলে গেছে। তিনি বিধবা মানুষ, অন্য বিশেষ কিছু খান না—দুধটুকু না হ'লে তাঁর চলে না। আর বাকি এক সের থেকে সকালে এতগুলির জন্য চা হয়েছে—তার পর বড় খোকাকে খাইয়ে, বিনয়কে ভাতের সঙ্গে দিয়ে, বিকালের চায়ের জন্য আলাদা রেখে যা দুধ বাকি আছে, সে আধ পোয়াটাকও হবে কিনা সন্দেহ। সুষমা বিপদে পড়ল। ভেবে-চিন্তে কিরণের মায়ের রান্নাঘরের কাছে গিয়ে দরজার বা'হরে দাঁড়িয়ে বললে, "মাউইমা, আজ ছোট খোকার দুধ বাড়তি নেবার কথা ছিল, তা গোয়ালা ত চলে গেল, দুধ পাওয়া গেল না। ছোট খোকা আজ কিছুই খাবে না দুধ ছাড়া—এদিকে দুধ ত মোটে একটু খানি পড়ে আছে। আপনার দুধটা কি আজ দেবেন

মাউইমা? ওবেলা আবার গোয়ালা এলে বেশী করে খানিকটা নিয়ে নেব।"

মাউইমা প্রসন্ন হলেন না। অপ্রসন্ন মুখে বললেন, "হ্যাঁ তা দিই। কাল আবার দশমী আসছে—ভেবেছিলাম একটু ক্ষীর-টির আজ ক'রে রেখে কাল দুটো মিষ্টি ক'রে নেব। এ ত আমাদের কলকাতা নয় যে বামুনের দোকান থেকে দুটো সন্দেশ আনিয়ে রাখলাম, চুকে গেল। এ সেই নিজের পোড়া পেটের জন্যে সাত রকম ব্যবস্থা নিজেই মরে মরে করতে হয়। তা যাক্—সে যা হয় হবে—আমার জন্যে আমি বড় ভাবি নে। এই নাও—" ব'লে দুধের বাটিটা হাত দিয়ে ঠেলে দরজার দিকে এগিয়ে দিলেন।

সুষমা অত্যন্ত অপ্রস্তুত হ'ল। বললে, "তা হলে না হয় থাক্ মাউইমা। কাল আবার দশমী আছে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। থাক্ গে—দেখি কি ব্যবস্থা করতে পারি।"

কি ব্যবস্থা যে হ'তে পারে কিছুই না জেনে সুষমা আবার ফিরেই যাচ্ছিল—কিন্তু কিরণের মা শুনলেন না। ডাকলেন, "ও মেয়ে, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। ও দুধ রেখে গেলেই বা কি হবে, ও কি আর আমি খেতে পারব? ছোট খোকার জন্যে এগিয়ে দিয়ে আবার তার সেই মুখের দুধটা নিয়ে নিজে গিলব, এত কিছু পেটের জ্বালা আমার ধরে নি বাছা। তুমি ও দুধটা নিয়েই যাও। কচি বাচ্ছা—ওর ভাগের দুধটা আজ নেওয়াই হ'ল না—ও খাবে কি? সেটা আগে, না আমার পোড়া পেট আগে?"

সুষমা আবার ফিরল। এসে দুধের বাটি হাতে নিয়ে আর কোনও কথা না ব'লে চলে গেল। রান্নাঘরে গিয়ে বাটিসুদ্ধ দুধ গরম ক'রে একটা রেকাবীর উপর বসিয়ে কানাইয়ের হাতে দিয়ে বললে—"যা, মাইজীকে দিয়ে আয়।"

তার পর খোকাকে ভাত খাইয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে সুষমা তাকে ঘুম পাড়াতে নিজের বিছানায় শুইয়ে নিজে পাশে বসল। খোকা অনর্গল বকে যেতে লাগল, "জ্যেঠি, লাল লাল আপেল তুমি বাবাকে কোথা থেকে দিলে? আর আছে?…আর নেই? আচ্ছা তাতে কিছু হবে না জ্যেঠি—আবার পরে কিনো। তখন আমাকে দিও। তুমি তখন এখানে ছিলে না—আমার অসুখ করেছিল যখন, তখন শুধু আপেল আর বেদানা, আপেল আর বেদানা খেতাম আমি। জান জ্যেঠি? বাবা এনে দিত, মা এনে দিত, দিদিমা এনে দিত—সব্বাই। আমি বলতাম, শুধু আপেল আর বেদানা কেন দাও? বিস্কুট দিতে পার না? বিস্কুটও খেতে খুব ভাল, না জ্যেঠি, এবার আমাকে বিস্কুট কিনে দিও। দেবে ত? দেবে কিনা বল না—ও জ্যেঠি দেবে কিনা বল না—আমি না হলে ঘুমোব না—দেখ না, দেখ—এই দেখ চোখ তাকিয়ে থাকব।" সুষমা বকে, আদর ক'রে, বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে কত কষ্টে খোকাকে ঘুম পাড়ালে। দুপুরটা সামনে পড়ে আছে এবার—তখন আর সুষমার কাজ নেই কিছু। ক্রমে বিকাল হবে, কিরণ গা ধোবে, কাপড় ছাড়বে, ভাল ক'রে চুলটি বাঁধবে, টীপটি পরবে—স্বামী কাজ থেকে ফেরবার আগে কিরণের প্রসাধন শেষ হওয়া চাই—তার কত তাড়া। কিরণের মনটি সব কাজের মধ্যে সেই সন্ধ্যার অবসরের জন্য প্রতীক্ষা ক'রে থাকবে—সুষমা যেমন সেদিন অবধি প্রতীক্ষা ক'রে থাকত। আজই তার দিন রাত্রি সব সমান হয়ে গেছে। একখানি সরু কাল-পাড় শাড়ী ছেড়ে আর একখানি সরু কাল-পাড় শাড়ী প'রে কি হবে তার? বিজয় অফিস থেকে ফিরবে না, কার জন্য সুষমা কি করবে?

উঠানের ওদিক থেকে কিরণের মা ডাকলেন, "কই গো, মেয়েরা কই? ও কিরণ, কত বেলা করছিস মা? খাবি আয়। বড় মেয়েকে ডেকে আনিস।"

সুষমা উঠে দাঁড়াল। জলভরা চোখ আঁচলে মুছে মুখে হাসি টেনে কিরণের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। "আয় কিরণ—মাউইমা ডাকছেন যে।…ওটা কি করছিস ভাই?" সুষমা ঘরে ঢুকে গেল।

ছোট খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে কিরণ নিজের একখানি নীল রঙের শাড়ীতে একটি জরির পাড় সেলাই করবে ব'লে বার ক'রে বিছানার উপর ফেলেছে। সুষমাকে দেখে বললে, "তোমাকে দেখাব ব'লে বার করলাম দিদি। উনি যে সেই কাশী গিয়েছিলেন তখন কিনে এনেছিলেন। তা দুপুরবেলা ছেলেগুলোর দৌরাত্ম্যিতে কি সময় পাই যে পাড়টা বসিয়ে নেব? পড়ে আছে দেখ না আজ কত দিন হ'ল।…কেমন দেখাবে দিদি? ভাল?"

সুষমা শাড়ীখানি নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগল হাসি-মুখে। "তোকে ত এমনিতেই যা দেখায় তাই দেখতে দেখতে তোর বর রাতদিন গলে যাচ্ছে ভাই—তার উপর এ শাড়ী পরলে যে কি হবে তাই ভাবছি। সত্যি খুব সুন্দর দেখাবে রে।"

কিরণ শাড়ী আর পাড় সুষমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, "দিদি পাড়টা বসিয়ে দেবে? জানই ত আমার কুড়ে স্বভাব—দিনের বেলা ভাত খেয়ে এক বার শুলে আর নিজের শাড়ী পরবার লোভেও যেন উঠে আর সেলাই করতে বসতে পারি না। তোমার ত চোখে ঘুম নেই—রাতদিন শুনি খোকাটা বকাচ্ছে। দাও না দিদি পাড়টা বসিয়ে। পরশু দিন নির্ম্মলাদের বাড়ী প'রে যাই তাহলে।"

সুষমা শাড়ীটা হাতে তুলে নিয়ে বললে, "আচ্ছা দেব। চ, এখন খেতে চ। মাউইমা ডাকাডাকি করছেন।"

শাড়ীখানা সুষমার ঘরে খাটের উপর এক ধারে ফেলে দুই জায়ে খেতে চলে গেল।

তিনটি প্রাণী ত দুপুরবেলা খাবে, তার দু-জন বিধবা —কাজেই কিরণ আর আলাদা খায় না। ঐ মায়ের রান্না-ঘরের চওড়া বারান্দাতেই তিন জনে একটু দূরে দূরে খেতে বসে। মিশির এসে কিরণের মাছটা তার থালার কাছে দিয়ে চলে যায়।

তিন জনে খেতে বসল। সুষমা মিশিরকে ডেকে বললে, "কাল যে আমি মাইজীর জন্যে দই পেতে রেখেছিলাম মিশির, কই দিলে না ত?"

দই কিরণ ভয়ানক ভালবাসে; মাঝে মাঝে বলে, "আমার কলকাতায় যেতে ইচ্ছে করে কেন জান দিদি? চিনি-পাতা দই খাবার জন্যে।" তাই সুষমা সুবিধা পেলেই ছোট একটি বাটিতে দই পেতে রাখে কিরণ খাবে বলে।

মিশির দই এনে দিলে। কিরণ হাসিমুখে বললে, "দিদি নিজে কিছু খাবে না, আমাকে খাওয়াবে শুধু। দিদি এসে থেকে রোজ এক বাটি ক'রে খেয়ে খেয়ে মোটা হচ্ছি দেখ না।" তার পর মায়ের ও বড় জায়ের পাতের দিকে এতক্ষণে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলে। বললে, "মা, তোমার দুধ কই?"

সুষমা দুধ, দই কোন দিনই খায় না।

মা কি বলতে যাচ্ছিলেন—সুষমা বাধা দিয়ে বললে, "আজ আমার ভুলের গ্রহে ধরেছে রে কিরণ। সকাল থেকে যে কত ভুলই করছি। ভোরবেলা ছোট খোকার আধ সের দুধ নিতে মনে ছিল না ভাই, তাই আজ মাউইমার দুধটা চেয়ে নিলাম খোকার জন্যে। মাউইমার আজ বোধ হয় খাবার বড় কষ্ট হবে। দুধ না হ'লে খেতে পারেন না যেমন—"

মুহূর্ত্তে কিরণের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। বিধবা মা, তার আশ্রয়ে এসে আছেন—তাঁর আদরের এতটুকু ত্রুটিকে কিরণ যেন তার অপমান মনে করে। কিরণের পিতার মৃত্যুর পর তার মা যখন মেয়ের কাছেই থাকবেন ব'লে এলেন, তখন সংসারের কর্ত্রীত্বের ভার বিনয় কিরণের মায়ের উপর ছাড়তে পারে নি—তাকে বরাবর অতিথির সম্মানেই রেখেছিল। কিন্তু কই, সুষমা যেই এল, তাকে ত অতিথির পর্য্যায়ে বিনয় ফেললে না—সে কথাই যেন কিছু উঠল না—সুষমা তখনি যেন বাড়ীর গৃহিণী হয়ে বসল। কিরণের মায়ের আসন গেল নীচে নেমে। কিরণ ছিল কর্ত্রী, তার মা ছিলেন অতিথি, সে তবু ছিল এক রকম। কিন্তু কিরণের বড় জা হলেন বাড়ীর সর্ব্বময়ী গৃহিণী, আর তার মা থাকবেন জামাইবাড়ীর কুটুম্বের মত, এটা কিরণের বড় গায়ে লাগে। কিন্তু বিনয় যখন নিজেই এই রকম ব্যবস্থা ক'রে দিলে তখন এ নিয়ে আর কোন কথা বলা হয়ে উঠল না—কাজেই ব্যবস্থাটা সেই রকমই হয়ে আসছে এবং সুষমা এ বাড়ীতে আসার পর থেকে কিরণ এমন ভাব দেখায় যে, বেশ, আমার মাকে যখন তোমরা গৃহিণী-পদের উপযুক্ত মনে করলে না তখন তিনি কুটুম্বের মতই থাকুন আমার বাড়ীতে—কিন্তু সম্মানার্হ অতিথির যোগ্য সম্মান প্রতি দিন তাঁকে দেওয়া চাই এটা আমি দেখব মনে রেখ। তোমরা দেওর ভাজে আমার মাকে না দেবে গৃহিণীর সম্মান, না দেবে অতিথির আদর—সেটি চলবে না এ বাড়ীতে।

সেইখানে কিরণের ঘা পড়ল। মুহূর্ত্তে রাগে, অপমানে জ্বলে উঠল কিরণ। খাওয়া বন্ধ ক'রে কঠিন কণ্ঠে ডাকলে—কানাই।

কানাই এল। কিরণ জিজ্ঞাসা করলে, "দুধ যখন নেওয়া হয়েছিল তুই তখন কোথায় ছিলি?"

কানাই একবার সুষমার ও একবার কিরণের মুখের দিকে বোকার মত তাকাতে লাগল। তার বিপদ দেখে সুষমা নিজেই তার হয়ে উত্তর দিলে, "ও ত ছিল না, ঘুমোচ্ছিল তখন। ও কি করবে ভাই? ওকে বকছিস কেন? আমারই ত দোষ।"

কিরণ বড় জায়ের কথার উত্তর দিলে না। কানাইকে বললে, "কাল থেকে তুমি যদি নিজে দাঁড়িয়ে দুধ নিতে না পার ত কাজে জবাব দিয়ে চলে যেও। এ রকম লোক আমি রাখি না। কেন, বড় মাইজী আসবার আগে বরাবর ত তুমি দুধ নিয়েছ, আজ একেবারে কি এমন নবাব হয়ে গেছ যে সকাল ৬টায় ঘুম থেকে উঠতে পার না? কিছু বলি না, কিছু দেখি না ব'লে বড্ড সব বাড়াবাড়ি সুরু করেছ—না?"

কানাই চুপ ক'রে রইল। কিরণের মা এতক্ষণ মন দিয়ে ভাত খাচ্ছিলেন; এতক্ষণে বললেন, "তা বড়মেয়ে ত নিজেই দাঁড়িয়ে রোজ দুধ নেন বাছা—শুধু শুধু চাকরটাকে বকছিস কেন?"

কিরণ সুষমার দিকে তাকিয়ে বললে, "সংসারে তোমার অনেক কাজ করতে হয় জানি দিদি—কিন্তু চাকরদের হাত থেকে কাজ কেড়ে নিজে করবার যে কি দরকার আমি ত বুঝি না। তুমি আসবার আগে যে যা করত সেগুলো ত তাদের উপরই ভার দিলে পার—তোমারও কম কষ্ট হয়, সংসারেও অ-ব্যবস্থা হয় না।"

কিরণের মনে পড়ল না যে গোয়ালা দুধে জল দিচ্ছিল ব'লে সে নিজেই সুষমাকে অনুরোধ করেছিল সুষমা যদি নিজে দাঁড়িয়ে দুধটা দেখে নেয়।

সুষমাও সে কথা মনে করিয়ে দিলে না। কিরণের মা বললেন, "সত্যি ত, বাছা, তুমি আর কত পারবে? তুমি খুব শক্ত মেয়ে তাই এখনই বুক বেঁধে উঠে পড়ে

সংসারের সব কাজকর্ম্ম করে বেড়াও—অন্য মেয়ে হ'লে এখনও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারত না। তোমার কি আর এই সব করবার কথা?"

সুষমার বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করতে লাগল।

চিরকাল জায়ের বাড়ী এসেছে, কখনও বছরে একবার, কখনও দু-বছরে একবার। কত আদর, কত মিষ্টি কথা, বিনয় বলে "বৌদিকে ভাল ক'রে খাওয়াও"—কিরণ বলে "কই দিদিকে ত এবার নতুন শাড়ী কিনে দিলে না—" কাজ করতে গেলে কিরণের মা অবধি ছুটে আসতেন, "আহা, তুমি দু-দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছ, কেন তুমি কষ্ট করছ মা? এ সেই একই বাড়ী, একই লোক। সুষমা কি করবে, কি বলবে, ভেবে পেলে না। ভাত খাবার ভান করে থালার ভাতগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

কিরণ বুঝলে কাজটা সবসুদ্ধ ভাল হ'ল না। কণ্ঠস্বর কোমল ক'রে কানাইকে বললে, "যা, আমার ঘরে খাটের নীচে যে দুধ ঢাকা আছে সেটা নিয়ে আয় হাত ধুয়ে। ভাল ক'রে হাতটা ধুয়ে যাস—বুঝ'ল?"

তার পর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে, "ও যেমন দুধ নিয়ে গিয়েছিল তেমনি রাখা আছে মা। ছোট খোকার পেটটা দেখলাম একটু যেন ফেঁপেছে, আমি তাই ভয়ে দুধটা আর দিই নি। ও দুধ কিছু নোংরা হয় নি মা—ও তোমাকে খেতেই হবে। আমি জানি দুধ না হ'লে তোমার খাওয়াই হয় না। একে ত এ পোড়া দেশে তরিতরকারী ভাল পাওয়াই যায় না—দুধটুকু না হ'লে কি দিয়ে খাবে মা?"

কিরণের মা হাঁ হাঁ ক'রে উঠলেন। "না না বাছা, অনাছিষ্টি বকিস্ নে। ছেলেপুলের মুখের দুধটা—বড় মেয়ে চেয়ে নিলেন আমার কাছে—সে দুধ আমি আবার কখনও খেতে পারি? এত পেটের জ্বালা আমার নেই বাপু! ও তুই রেখে দিতে বল্...ও কানাই, কানাই—ও দুধটুধ আনতে হবে না—ও থাক্ মাইজীর ঘরে যেমন আছে—ছোট খোকা উঠে খায় খাবে, না খায় ত তোরা বাপু রাত্তিরে ক্ষীরটির যা হয় ক'রে খেয়ে ফেলিস। আমি এই যা আছে এই দিয়ে বেশ খেয়ে নেব। বিধবা মানুষের আবার এত কি?" ব'লে আবার ডালের বাটি টেনে ভাত মাখতে লাগলেন।

দুই জায়ের খাওয়া কিন্তু একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। কথাবার্ত্তা যতক্ষণ চলছিল ততক্ষণ তবু এক রকম—এখন সকলে থেমে যাওয়াতে হঠাৎ সেই নীরবতাটা যেন থম্‌থম্ করতে লাগল এবং থালার ভাতগুলোর দিকে চেয়ে সে-গুলো মুখে তোলবার সম্ভাবনাতেই দুই জায়ের খাবার ইচ্ছা কোথায় চলে গেল। দু-জনেই ভেবে পেলে না সেগুলোকে নিয়ে কি করা যায়।

দুই জাকে নিষ্কৃতি দিয়ে কিরণের ঘর থেকে ছোট খোকা কেঁদে উঠল। কিরণ বেঁচে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললে, "খোকাটা কাঁদছে, দেখি কি হ'ল। দিদি তুমি উঠো না—খাও। আমার আজ খিদেই ছিল না—আর খাব না। দিদি তুমি আমার দইয়ের বাটিটা নাও না—ও ত ছোঁয়াছুঁয়ি কিছুই হয় নি।" বলতে বলতে কিরণ উঠে চলে গেল।

কিরণের মা যতক্ষণ খেলেন সুষমার ওঠবার উপায় রইল না—তাঁর খাওয়া হতেই সুষমা একটিও কথা না ব'লে উঠে গেল।

দুপুরের সঙ্গীহীন অবসরে বিজয়ের সঙ্গের জন্য সমস্ত দিনটা সুষমার মন হাহাকার করতে লাগল। কত কি মনে হ'তে লাগল তার—কাউকে বলবার নেই। ইচ্ছা করতে লাগল সংসারের ভার, নিজের ভার সব যদি কারুর উপর ছেড়ে দিয়ে সে ভারমুক্ত হ'তে পারত। খোলা জানালাটা দিয়ে জামগাছের যে অংশটা দেখা যায় তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে সুষমার মন অর্থহীন একই প্রশ্ন নিজেকেই বার-বার করতে লাগল, কি করা যায়, কি করা যায়, কি করা যায়।

কত ছোট-খাট সমস্যার সমাধান, কত কি প্রশ্নের উত্তর—কত কি সে বিজয়ের কাছে আদায় ক'রে নিয়েছে আগে। সারাদিন হয়ত যে কথা ভেবেছে—কি করলে ভাল হবে, ভেবে ভেবেও নিজে ঠিক বুঝতে পারে নি—সন্ধ্যাবেলা বিজয়কে জিজ্ঞাসা ক'রে, তার সঙ্গে তর্ক ক'রে, তার মত জেনে, জলের মত সহজ ক'রে নিয়েছে সে সব।

আজ তার কিছুই হ'ল না। অশান্ত, অপমানিত মন সুষমার সারাটা দিন যে কি চেয়ে কেঁদে বেড়াতে লাগল সুষমা নিজেই তার ঠিকানা পেলে না। দেখতে দেখতে ঘড়িতে চারটা বেজে গেল। কিরণের নীল রঙের শাড়ী ও জরির পাড় বিছানার উপর পড়ে রইল—সেলাই করা হ'ল না।

খোকা ঘুম থেকে উঠে পড়ল। সুষমা এতক্ষণে স্বপ্নোত্থিতের মত উঠে দাঁড়াল। খোকাকে খাট থেকে নামিয়ে আদর ক'রে তার চুল ঠিক ক'রে দিতে দিতে বললে, "কত ঘুমোচ্ছ খোকন—চারটে বেজে গেল যে।"

বাইরে বেরিয়ে এসে ডাকলে, "কানাই, ও কানাই—ঘরদোর ঝাঁট দিতে হবে না? উঠে আয়। তোদের বাপু ঘুমকেও ব'লিহারি যাই—চারটে বাজল এখনও এত ঘুম? দেখ্ দিকিনি ছোট খোকার দুধের বাটিটা পড়ে রয়েছে এই বারান্দায়—মাছিতে সারা বারান্দা ভরে গেল—তোদের হুঁস নেই? নিয়ে যা এখান থেকে। আয় খোকা খাবি আয়। নারকোলের খাবার করেছি—আগে দুধের বাটি শেষ করতে হবে তবে পাবে খাবার।"

যেতে যেতে কিরণের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সুষমা জিজ্ঞাসা করলে "ছোট খোকা কেমন আছে রে কিরণ? দু'ধর বাটি পড়ে রয়েছে দেখছি—একবার দুধ খাইয়েছিলি তাহ'লে? পেটের ফাঁপটা কমেছে?"

কিরণ ছোট খোকাকে বিছানায় বসিয়ে তার পায়ে মোজা পরাচ্ছিল। সারা দুপুর তারও মনটা ভাল ছিল না—বড় জায়ের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল—এখন সুষমার মুখের সহজ কথায় সে ভাবটা কেটে গেল। প্রসন্নমুখে বললে, "কি জানি ভাই, গা-টা তো গরম গরম লাগচে—সর্দ্দিও হয়েছে ছেলেটার। তাই মোজাটা পরিয়ে দিচ্ছি। খালি পায়ে ঠাণ্ডা মেজেতে নাববে কেবল—কথা ত শুনবে না। এই খোকা ন'ড়ো না, চুপ ক'রে ব'সো—জ্যেঠিকে দেখে অমনি লাফানি সুরু হয়েছে!"

সুষমা এসে ছোট খোকাকে কোলে নিয়ে আদর করলে। বললে, "সত্যি তো গা-টা যেন একটু ছ্যাক্ ছ্যাক্ করছে। ছোট্কু—তুমি আজ দুষ্টুমি করবে না—এইখানে ব'সে থাকবে। আমি দাদাকে খাইয়ে আসি, তার পর এসে গল্প বলব—বুঝেছ? ততক্ষণ খাট থেকে খবরদার নামবে না—তাহলে আর গল্প বলা হবে না আমার। এই রকম ক'রে ব'সে থাকবে—কেমন? লক্ষ্মী ছেলে।" সুষমা ছোট খোকাকে আবার বিছানায় বসিয়ে দিলে।

বড় খোকাকে দুধ খাওয়ান সোজা ব্যাপার নয়—ঠিক কুড়ি মিনিট লাগে তার আধ বাটি দুধ খেতে। সুষমার হাত ব্যথা করিয়ে দিয়ে তবে সে ছাড়ে। গল্প বলতে বলতে, তার পিছনে ছুটতে ছুটতে, তাকে ভোলাতে ভোলাতে দুধ খাওয়াতেই সুষমার সাড়ে চারটে বেজে যায়। তার পরে আবার রান্নাঘরের কাজ। সকালের রান্না ভেবে, তার জন্য তরকারি সব গুছিয়ে রেখে দিয়ে ঝুড়িটা সামনে নিয়ে সুষমা ভাবতে বসল এ বেলা কি রান্না হবে। কিচ্ছু পাওয়া যায় না পোড়া দেশে—রোজ রোজ সুষমা কি যে রাঁধতে দেবে ভেবে পায় না। ভাঁড়ার থেকে ডেকে বললে, "ও মিশির, সকালবেলা যে মাছ রাখতে বলেছিলাম এ বেলার জন্যে—রেখেছিলে তো? ক টুকরো আছে?"

বিজয় মাছ মুখে দিত না—বিনয় তেমনি মাছ ভালবাসে। সেই মজঃফরপুরে থাকতে সুষমা এক দিন মাছ গুঁড়িয়ে কোপ্তা করেছিল—বিজয় খেয়ে খুব খুশী। "এটা তুমি নিজে রান্না করেছ? তাই এত ভাল হয়েছে। খুব ভাল তো!" ব'লে বিজয় একটার পর একটা কোপ্তা খেয়ে যেতে লাগল। তার পর খাবার পর সুষমার কি হাসি! "বল তো কি খেলে আজ? বলে দেব, না বলব না? বলি? বোয়াল মাছ খেলে, বোয়াল মাছ! বড় বড় সেই চক্‌চকে মাছ—যা দেখলে তুমি জ্বলে যাও—সেই মাছ।" সুষমার হাসি আর থামে না। বিজয় প্রথমে রাগ করলে, "ইঃ, সেই সাপের মতন মাছগুলো খাওয়ালে তুমি আমাকে? কতবার বলেছি মাছ দিও না, মাছ দিও না—দেখতে পারি না আমি মাছ-টাছ। ঠিক আমার food poisoning হয়ে যাবে আজ—জানি আমি। তখন দেখতে পাবে।—ইঃ কি ব'লে সেই মাছ আমাকে খাওয়ালে সুষমা?" কিন্তু সুষমার হাসি থামে না—যত বিজয়ের রাগ দেখে ততই তার হাসি পায়। দেখতে দেখতে বিজয়েরও রাগ চলে গিয়ে হাসি পেতে লাগল। অনেক দিন হয়ে গেল, কিন্তু বিজয়ের হাসির শব্দ যেন আজও কানে ভেসে আসে।

মিশির একটা রেকাবীতে কয়েক টুকরা মাছ নিয়ে এসে দাঁড়াল, "এই কয় টুকরা হ্যায় মাইজী—আউর তো সব খরচা হো গিয়া।"

ওদিক থেকে কিরণ ডেকে বললে, "দিদি, কানাই বিছানার চাদর, বালিসের ওয়াড় চাইছে সব—বলছে আজ নাকি তুমি সব বদলাতে ব'লে দিয়েছ। কই চাদর-টাদর সব কোথায়? একবার এসে তুমি বাপু দিয়ে যাও ওকে যা দেবে।

কিরণের মা নিজের ঘরের বারান্দায় ব'সে এক থালা বড়ি উলটে পালটে রাখছিলেন। সুষমাকে দেখে বললেন, "ও মেয়ে, বড়ি নেবে নাকি তোমাদের ও ভাঁড়ারে? শুকিয়েছে এত দিনে বড়িগুলো। নেবে যদি ত একটা পাত্তর আন—ঢেলে দিই। এ দেশে রোদের তেজ নেই বাছা—এই ক'টা বড়ি আজ শুকোচ্ছে চার দিন হ'ল। আমাদের দেশে বড়ি শুকোতে চার দিন লাগে কেউ শুনেছে কখনো?"

সুষমা উঠান পার হ'তে হ'তে কিরণের মায়ের দিকে ফিরে বললে, "আসি মাউইমা—বড়ি নেব এসে। ঠাকুর-পো মাছের ঝোলে বড়ি বড় ভালবাসে—কাল ক'রে দেব সকালে।"

বালিসের ওয়াড়ের একটা ছেঁড়া বেরল—সেটা সেলাই করতে হবে—ওদিকে ছোট খোকা বায়না ধরেছে জ্যেঠির কাছে গল্প শুনবে, তার আর পা উঁচু ক'রে খাটে ব'সে থাকতে ভাল লাগছে না। এ ঘর থেকে ওয়াড় সেলাই করতে করতে সুষমা চেঁচাতে লাগল—"ছোট্কু আমার লক্ষ্মী ছেলে, কত কথা শোনে। এই এলাম বলে বাবা। দেখ না এক্ষুণি গিয়ে গল্প বলব। সেই যে রাজকন্যা দৈত্য-পুরীতে বন্ধ ছিল, সেই গল্পটা।...কানাই, এই নে, এই রইল তোর তিনটে বিছানার তিনটে চাদর, এই রইল ওয়াড়। যেটার যা সব দেখে দেখে হিসেব ক'রে পরাবি।

এরটা ওতে, ওরটা এতে পরাবি না, বুঝলি ?” ব’লে সুষমা ভাঁড়ারে ঢুকে পাথরের বাটি হাতে ক’রে কিরণের মায়ের কাছে এসে দাঁড়াল, “কই মাউইমা, বড়ি দেবেন না ?”

গোয়ালা এ বেলার দুধ নিয়ে এল ; সুষমা কানাইকে ডেকে বললে, “কানাই, কত দুধ নেওয়া হবে মাইজীকে জিগেস ক’রে দুধটা নিয়ে নে ত বাবা—আমার হাত-জোড়া।”

কানাইয়ের উপর দুধ নেবার হুকুম দেবার কারণটা সবাই বুঝলে, কিন্তু কেউ কিছু বললে না। কানাই দুধ নিয়ে নিলে।

বিনয় আপিস থেকে ফিরে এল। সুষমা চা ক’রে ট্রের উপর দিয়ে পাঠিয়ে দিলে কিরণের ঘরে। বিনয় সারা দিনের পর শ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম করতে ঢুকেছে নিজের ঘরে, স্বামী স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলবে এ সময়ে—কত অপ্রয়োজনীয় কথা, কত অর্থহীন কথা, অকারণ অভিমানে আদরে ভরা তাদের এই মুহূর্ত্তটি—সুষমা এ সময়ে কখনও যায় না কিরণের ঘরে। এক-এক দিন চা খেতে খেতে বিনয় ডাকে—“কই বৌদি কই ? চা ত পাঠিয়ে দিলে, তুমি আছ কোথায় ? এসো না এ ঘরে।” সুষমা তাড়াতাড়ি একটা থালা হাতে তুলে নেয়, নয়ত বঁটি পেতে বসে—হাসি মুখে বলে, “এই যে যাই ভাই—এই মিশিরকে রান্নাগুলো বুঝিয়ে দিয়েই যাই। তুমি চা-টা খাও ততক্ষণ, আমি এদিকের কাজগুলো সেরে নিই।”

সুষমার কাজ সারা হয়ে যায়, বিনয়ের চা খাওয়াও হয়ে যায়, ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসে, কিরণের ঘরে আলো জ্বলে না। অন্ধকারে ওদের দু-জনের কলগুঞ্জন মাঝে মাঝে এ দিকে শোনা যায়—একা একা ব’সে সুষমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে—পথ চেয়ে থাকে কখন কানাই বড় খোকা, ছোট খোকাকে বেড়িয়ে নিয়ে ফিরবে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হবার সঙ্গে সঙ্গে দুই ছেলে বাড়ী ফেরে—সুষমা ছুটে গিয়ে ছোট খোকাকে কোলে তুলে নেয়, বড় খোকার হাত ধরে বলে, “খোকন আয়, খুব ভাল একটা গল্প মনে পড়েছে—শুনবি ?” কানাইকে বলে, “খাটিয়াটা উঠানে বের ক’রে দে ত রে—বসি এখানে।” দুই ছেলেকে পাশে বসিয়ে সুষমা আরম্ভ করে, “এক ঘোর জঙ্গল—কি জঙ্গল সে—অন্ধকার কিছু দেখা যায় না, জানিস খোকা ? ঘুট ঘুট করছে, চারিদিক—আর এত গাছ যে পা ফেলবার জায়গা নেই। ঝিঁঝিঁপোকা ডাকছে—নিস্তব্ধ সব—মনে হয় যেন জনপ্রাণী নেই। কিন্তু সেই ঘোর জঙ্গলে এক বাড়ী। সে কি বাড়ী—যেন রাজপ্রাসাদ। প্রকা-ণ্ড বাড়ী!”

ছোট খোকা হাঁ ক’রে জ্যেঠির মুখের দিকে চেয়ে থাকে—বড় খোকা বুদ্ধি ক’রে জিজ্ঞাসা করে, “এই যে তুমি বললে একটুও জায়গা নেই জ্যেঠি—প্রকাণ্ড বাড়ীর কি ক’রে তা হলে জায়গা হ’ল ?”

সুষমা বললে, “মানুষের পা ফেলবার জায়গা নেই—তা ব’লে কি আর রাক্ষুসীদেরও পা ফেলবার জায়গা নেই ? সেটা যে একটা রাক্ষুসীর বাড়ী—তার নাম হ’ল লক্ষমুণ্ডু রাক্ষুসী। সেই জঙ্গলের রাক্ষুসী সে। লক্ষটা মুণ্ডু তার। সে সেই লক্ষটা মুণ্ডু নিয়ে সেই জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়—তার খুব জায়গা হয়। কিন্তু একটা মানুষ যদি সেই দিকে যেতে চায় ত তখনই গাছে আটকে যাবে—নড়বার জায়গা পাবে না।”

নিজের পূর্ব্ব প্রশ্নের অজ্ঞতা প্রমাণিত হয়ে বড় খোকা চুপ ক’রে গেল। হাঁ ক’রে সুষমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—“ও।”

সুষমার গল্পের অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা, অসম্ভব সব কাণ্ড একটার পর একটা ঘটেই যেতে লাগল বাধাহীন ভাবে। রাত্রি হয়ে এল—ঘড়িতে আটটা বাজল ঢং ঢং ক’রে। সুষমা সেইখান থেকে ডেকে বললে, “মিশির, খোকার খাবার ঠিক কর।” তার পর ছোট খোকাকে কোলে নিয়ে কিরণের ঘরের কাছে এসে বললে, “ও কিরণ ছোট্‌কুকে ধর্‌—খাবার আব্দার করবে এখনই। ছোট্‌কু এখন রাত হ’ল। রাক্ষুসী এখন ঘুমিয়ে পড়েছে—এখন ত আর গল্প নেই বাবা ; কাল সকাল হোক্ রাক্ষুসী জাগুক তখন আবার গল্প বলব—কেমন ?”

ছোট খোকার ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছিল, সে ঘাড় নেড়ে বললে, “আচ্ছা।” বড় খোকার কিন্তু আগ্রহে, ঔৎসুক্যে ভয়ে তখনও বুক দুড় দুড় করছে, জ্যেঠির হাত ধরে টেনে বললে, “মিছে কথা, না জ্যেঠি ? ছোট ভাইকে ঘুমতে পাঠাচ্ছ কি না তাই ওকে ভুলিয়ে দিলে—না ? এখনও ত লক্ষমুণ্ডু ঘুমতে যায় নি—এখন ত সে চরতে গেছে। এইবার ত ফিরে এসে রাজপুত্তুরকে দেখতে পাবে নিজের বাড়ীতে না ? আমাকে খাওয়াতে খাওয়াতে গল্প না বললে আমি খাব না কিন্তু।”

বিনয় তখনও আলস্যভরে শুয়ে আছে, কাপড়ও ছাড়ে নি। সুষমা বললে, “ও মা, তুমি এখনও আপিসের কাপড়-চোপড় কিছু ছাড় নি যে। আটটা বাজল এদিকে। ওঠ ওঠ।”

সুষমা বড় খোকাকে খাওয়াতে নিয়ে চলে গেল। বিনয়ও উঠে সঙ্গে সঙ্গে এসে একটা মোড়া নিয়ে খোকার খাবার কাছে বসল। “খোকার খুব মজা হয়েছে না ? পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচেছে, রাতদিন জ্যেঠির কাছে গল্প শোনা হচ্ছে খুব। বৌদি, তুমি কি ছেলেটাকে মুখ্যু ক’রে রাখবে নাকি ? একটু একটু যে পড়া আরম্ভ করিয়েছিলাম সব ঠিক ভুলে গেল আবার। খোকা, দুপুরে কাল থেকে পড়বে তুমি জ্যেঠির কাছে, বুঝেছ ? লেখাপড়া না শিখলে হবুচন্দ্রের মত বুদ্ধি হয়—তা জান ? জা’ন, জ্যেঠির আদরে আদরে তোমার হবুচন্দ্র হওয়াই কপালে আছে।”

বিনয় বকে যেতে লাগল। সুষমা হাসিমুখে খাইয়ে নিলে খোকাকে।

তার পর রাত হয়ে এল—খাওয়া-দাওয়া চুকে গেল একে একে সবারই—একটা দিন শেষ হয়ে গেল সুষমার জীবনের। খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে কোলে ক'রে কিরণের ঘরে নিয়ে গিয়ে সুষমা তার নিজের খাটে তাকে শুইয়ে দিয়ে এল। তখনও বিনয় ও কিরণ ঘুমায় নি—কথা বলছে দু-জনে। খোকাকে শুইয়ে সুষমা বেরিয়ে আসছিল—বিনয় ডাকলে, "বৌদির কি ঘুম পেয়ে গেছে নাকি? ব'সো না একটু।"

সুষমা হাসিমুখে ফিরে তাকাল, "ঘুম পাবে না? রাত কি কম হ'ল নাকি?"

কিরণ বললে, "দিদির ঘুম না পাওয়াই আশ্চর্যি—খোকাটা কি এক দণ্ড ঘুমতে দেয় দিদিকে দুপুরে? বকিয়ে মারে সারাদিন। দিনের বেলা একটুও না শুলে রাত্রে সকাল সকাল ঘুম পাবে না?"

কিরণও যদি ডাকত, যদি বলত, "দিদি এস না একটু ব'সে যাও" ত হয়ত সুষমা বসত গিয়ে। একটু এ গল্প সে গল্প করত। মাঝে মাঝে সুষমার ইচ্ছা করে ওদের কাছে একটু বসে, আগেকার দিনের কথা বলে, বিজয়ের কথা তোলে—কবে বিজয় কি বলেছে সে-সব কথা একটু বলে বিনয়ের কাছে—স্কুলে কলেজে পড়বার সময়ে দুই ভাইয়ে কি করত সেই সব শোনা কথা আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে—কিন্তু তার সুযোগ হয় না। বিজয়ের কথা কেউ তোলে না—তার নামও মুখে আনে না কেউ। সারাদিন ধরে সকলের মুখে কত রকমের কথা শোনে সুষমা—শুধু যে-কথাটি শোনবার জন্য তার মন উন্মুখ হয়ে থাকে, সেই কথাটি কখনও শুনতে পায় না কারুর মুখে। ওরা হয়ত ভাবে বিজয়ের কথা তুললে, সুষমা মনে ব্যথা পাবে, হয়ত তার মন আরও উতলা হবে—তাই হয়ত সে কথা তোলে না। কিন্তু সুষমার ইচ্ছা করে তার সমস্ত কাজের মধ্যেও যে কথা দিবারাত্রি তার মন জুড়ে ঘুরে বেড়ায় সে-কথা যদি মুখে একটু বলতে পারত।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুষমা বেরিয়ে এল। নিজের ঘরে ঢুকে জানালার কাছে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তার দুই চোখে হঠাৎ জল ভরে উঠল। ঘরে কেউ নেই—জোর ক'রে মুখে হাসি টানবার প্রয়োজন আজকের দিনের মত শেষ হয়েছে। সমস্ত দিনের ঘটনাগুলো আবছায়া ভাবে সুষমার মনে ভেসে বেড়াতে লাগল, তার মধ্যে বিজয়ের স্পর্শ নেই কোথাও। সকলেই আছে, বিজয় নেই—সারাদিন কত কি ঘটে, কিন্তু এমন কোনও ঘটনা ঘটে না যাতে বিজয়ের ছোঁওয়া ধরা পড়ে; কোনখানে তাকে না যায় দেখা—না যায় ছোঁওয়া—সুষমার দিশাহারা বিরহী মন কেবলই হাহাকার করতে থাকে একটুখানি সাড়া, একটুখানি আভাস তার যদি কোথাও থেকে পাওয়া যায়।

বাধাহীন অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল—সুষমা মুছবার চেষ্টাও করলে না। আকাশের দিকে চেয়ে মনে মনে বিজয়কে ডেকে বললে, "আমার এই ছোট ঘরে নাই বা রইলে তুমি, ঐখানে যে কোথাও নিশ্চয় তুমি আছ, সেই কথাটা আমাকে কোনও রকমে জানিয়ে দিতে পার নাকি?

রাত্রি বেড়ে 'চলল—সুষমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

দূরে কোথায় ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে ১২টা বাজল—রাত ১২টা। সুষমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বুজল। কিছুতেই তার ঘুম আসছে না।

ও ঘরে ছোট খোকা কাঁদছে নাকি? সুষমা কান পেতে শুনতে লাগল।—কই, না ত। ভুল শুনেছে বোধ হয়। ও ঘরে কিরণ তার স্বামী সন্তান নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমচ্ছে—তার ভরা মন ভরা সংসার। সুষমা তার ছোট জায়ের চেয়ে মাত্র তিন বৎসরের বড়—তার কেন এই বয়সেই শূন্য হয়ে গেল সব? দীর্ঘ জীবন সামনে পড়ে, কাটবে কি ক'রে কে জানে।

বয়স, তা বছর বত্রিশ হ'ল বোধ হয়। এই ত বৈশাখ মাসে তার জন্মমাস—আবার এই মাসে তার বিয়েও হয়েছিল। মা ত কাছে নেই—থাকলে বলতে পারতেন এই বৈশাখে তার বত্রিশ ভরল না তেত্রিশ ভরল। তাঁর সব ছেলেমেয়েদের জন্ম মাস, তারিখ সব মুখস্থ—তা সে ছেলেমেয়েদের বয়স বত্রিশই হোক্ আর চল্লিশই হোক। এই রকম এক বৈশাখ মাসে অসহ্য গরমের মধ্যে সুষমার বিয়ে হ'ল। বিয়ের দিন সুষমা রেগেই অস্থির—"গরমে মরে যাচ্ছি আমি ওসব গয়না বেনারসী জরিটরি বাপু পরতে পারব না এখন। মরব নাকি গরমে? সুতি কাপড় গায়ে রাখা যায় না এখন পরতে হবে এই খড়মড়ে বেনারসী আর জরির জামা? তোমরা মারবে দেখছি আমায়। একেই ত সারাদিন উপোস করে গা মাথা সব জ্বলে যাচ্ছে আমার।" কনের বাচালপনা দেখে সবাই অবাক্, কেউ কেউ বকতে লাগলেন, কেউ বললেন "বাবা, এ সব কনে ত নয়—কনের দিদিমা। আমাদের সব বিয়ের দিনে যে যা বলেছে মুখ বুজে তাই করেছি। কনে মানুষের আবা[illegible]র? একটা দিন লাগলই না হয় একটু গরম—মেয়েমানুষের এত অসহ্যপনা ভাল নয় গো।"

সুষমার জেদীপনার কথা মায়ের কানে গেল। তিনি এসে কিন্তু একটুও বকলেন না। সতের বছরের মেয়েকে কোলে বসিয়ে আদর করলেন, বললেন "আজকের দিনে একটু কষ্ট কর মা। গরম ত লাগবেই জানি, কিন্তু কাপড়

গয়না না পরলে কি চলে? আমারও বিয়ে হয়েছিল এই বোশেখ মাসে—বিয়ের দিন বড় কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তার পর এই পঁচিশ বছর আর কষ্ট কাকে বলে জানিও নি। সবাই বলে বোশেখের ভরা সূর্য্যে যার বিয়ে হয় তার সুখের সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না—আমার হয়েছে তাই। তোমারও তাই হবে মা।"

কোথায় সে সুখের ভরা সূর্য্য? পনর বছর যেতে-না-যেতেই ত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সব। "মা গো, তোমার মুখের কথা কেন মিথ্যে হ'ল মা?"

সুষমার দুই চোখ দিয়ে আবার জল পড়তে লাগল। শ্রান্ত দেহ, ক্লান্ত মন—সুষমা চোখের জল মুছতে চেষ্টাও করল না। দুই চোখের ধারায় বালিশ ভিজে উঠতে লাগল।

মাত্র একটি বছর আগে এই বাড়ীতেই সুষমা ও বিজয় গরমের ছুটি কাটাতে এসেছিল। সেই বাড়ী, সেই ঘর—ঘরের প্রতি জিনিসটি এক বছর আগেও যেখানে যা ছিল, সেইখানেই সব আছে আজও। কিছু ত বদল হয় নি। ঐ আলমারীর মাথার উপর তার স্বর্গগতা শাশুড়ীর ছবি—আজও তিনি তাঁর দৃষ্টিহীন চোখে ঠিক যেন সুষমার এই খাটের দিকেই চেয়ে আছেন। আলমারীর পিছন দিকে ইঁদুরের বাসা ছিল—আজও ত ঐ তারা মাঝে মাঝে কিচ্‌ মিচ্‌ করছে শোনা যায়। বিজয়ের ইঁদুরকে কি ভয়! রাত্রে দরকার হ'লে খাট থেকে বিজয় নামবে না কিছুতে—"সুষমা, জলের গ্লাসটা এনে দাও না লক্ষ্মীটি—" "সুষমা, আলোটা নিবিয়ে দিয়ে আসবে?"—"সুষমা, জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল যে—খুলে দিয়ে আসবে?" সারারাত এমন সাত বার সুষমাকে উঠতে হ'ত বিছানা ছেড়ে। সকালে উঠে বিনয় চায়ের পেয়ালা দুই হাতে দুটো নিয়ে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকত, "দাদা, তুমি যে দেখি বৌদি বেচারীকে সারারাত ঘুমোতেই দাও না। কেবলই শুনি ডাকছ। এ কি অন্যায় কথা বল ত? খাটে শুয়ে শুয়ে সারারাত বৌদিকে কেবল ফরমাস করবে তুমি—ভারি মজা পেয়েছ, না?—বৌদি আজ থেকে তুমি ও-ঘরে কিরণের কাছে শোবে, আমি শোব দাদার ঘরে—দেখি দাদা কাকে ফরমাস করে, আর কে ওর ফরমাস শোনে সারা রাত।" স্বামীর চেয়ে মাত্র দেড় বছরের ছোট দেবর—সুষমা সব সময়ে উত্তর দিতে পারত না, লজ্জা করত। বিজয়ও হাসত। বলত, "যা ইঁদুর বসিয়েছিস ঘরের মধ্যে, রাত্রে যেন মনে হয় ওদেরই রাজত্ব, এমন দাপাদাপি ক'রে বেড়ায়। কে পা দেবে মাটিতে? ইঁদুর কামড়ালে শুনেছি ভয়ানক জ্বর হয়।—সেপ্‌টিক ফিভার—বাঁচে না মানুষে—ভয়ে তাই ত রাত্রে খাট থেকে নামতে পারি না—কাজেই তোর বৌদিকে ডাকতে হয় তেমন তেমন দরকার পড়লে।"

তৎক্ষণে সুষমার মুখ ফুটত। "দেখেছ ভাই, তোমার দাদার ভালবাসা? ইঁদুর কামড়ালে ভয়ানক জ্বর হয়, বাঁচে না মানুষে—তাই রোজ নিশুতি রাতে তোমার বৌদিকে ইঁদুরের মুখে ঠেলে দেন—যদিই এক দিন ইঁদুরের কামড়ে জ্বর হয়ে মরি। তা তোমার দাদার যেমন কপাল দু-মাস কেটে গেল ইঁদুরও কামড়ায় না, জ্বরও হয় না। ভাগ্যবান্‌ হ'লে এত দিনে সবই হ'ত।"

বিজয় অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বিছানায় উঠে বসত। "আহা হা, আমি কি তাই বলেছি নাকি? জন্তুরা কিনা বুঝতে পারে কে কাকে ভয় করে—তাকেই ঠিক ধরে এসে, তাই ত আমি ভয়ে নামি না। জান ভয়ে ভয়ে যেই নামব অমনি এসে ধরবে আমাকে। তোমাকে কামড়াবে কেন? তোমার কি ভয় আছে? আমি লক্ষ্য করেছি ইঁদুরগুলোই বরং ভয় পেয়ে পালায় যেই তুমি নামো। আর তোমাকে ত আমিই ভয় করি সুষমা ইঁদুর তোমাকে ভয় করবে সে আশ্চর্য্য কথা কি?—কই রে বিনয় আমার চা কই? ব'লে বিজয় চায়ের জন্য হাত বাড়াত। ডান হাতের কব্জীতে একটি বড় তিল ছিল বিজয়ের, হাত বাড়ালেই সেটি চোখে পড়ত—আজ এই অন্ধকার একলা ঘরে গভীর রাত্রে সুষমার চোখে বিজয়ের সেই চায়ের জন্য উৎসুক হাত-বাড়ান চেহারাটি ছবির মত স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ঢং ক'রে একটা বাজল। রাস্তা দিয়ে কে গান ক'রে যাচ্ছে। সুষমা আবার পাশ ফিরে শুল। অষ্টমীর ম্লান জ্যোৎস্না এসে পড়েছে খোলা জানালা দিয়ে; আধ-আলো আধ-ছায়ায় ঘরটা যেন অবাস্তব মনে হয়। সুষমার জীবনটার মত। দিনের বেলা সুষমা সংসারের কাজে ঘুরে বেড়ায়, ছেলেদের নিয়ে খেলা করে, বিনয়কে ঠাট্টা করে—আগেও যা করেছে এখনও তাই করে। কিরণের মা হয়ত মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, "থাক্‌ মা থাক্‌, তুমি রাখ, আমি এটা ক'রে দিচ্ছি। তুমি খুব শক্ত মেয়ে, তাই এখনই সামলে উঠে আবার সব কাজের ভার নিচ্ছ, না হ'ল তোমার কি আর এখন এই সব করবার কথা? বিধবার জীবন বড় দুঃখের জীবন—নিজেকে দিয়েই ত হাড়ে হাড়ে বুঝছি। আহা, ভগবান মেয়েটাকে এই বয়সেই এই দুঃখের বোঝা চাপালেন গা! বিচার দেখ দিকিনি।—ওঠ মা ওঠ।"

সুষমার ভাল লাগে না। বিধবা কথাটা কি বিশ্রী! কেন ওঁরা অমন ক'রে বলেন? বিধবা বলতে কুমু পিসীকে মনে পড়ে, তাদের বাড়ীর বামুনদিদিকে মনে পড়ে, সইয়ের মাসীমাকে মনে পড়ে। তাঁরাই ত বিধবা—তাঁদের নামের সঙ্গে চেহারার সঙ্গে ও কথাটা মিশে যেন এক হয়ে গেছে। সুষমাকে কেন সেখানে দাঁড় করান এঁরা? হয়ত বিজয় নেই, হয়ত বিজয় তাকে ছেড়ে কিছু দিনের

মত কোথাও গেছে—কিন্তু তা ব'লে সুষমাকে বিজয় বুমু পিসীদের দলে ফেলে দিয়ে কোথাও যেতেই পারে না। সুষমাকে নিয়ে তার কত গর্ব্ব, সুষমাকে সাজিয়ে তার কত আনন্দ, সুষমার বাত্রিশ বছরের জীবন মহারাণীর গৌরবে ভরা—সুষমা কি ক'রে বিধবার জীবনের হীনতাকে আজ মেনে নেবে? বিজয়ের কি তা সহ্য হবে? রাগ করবে না নিশ্চয়? বলবে না, "সুষমা, তুমি কি পাগল হয়েছ? তোমাকে কি আমি এ রকম কষ্ট দিতে পারি? কে বলেছে এ সব? তুমি আমার ঘরের রাণী ছিলে, তুমি আজও তাই আছ। তোমাকে তোমার আসন থেকে কে নামাবে সুষমা?" বাইরের লোকে কি জানে সুষমার জীবন কি ঐশ্বর্য্যে ভরা? স্বামী-সৌভাগ্যে, স্বামী-প্রেমে সে যে কোনও মহারাণীর চেয়েও বড়। আজ বিজয় নাই বা রইল কাছে, তা ব'লে তার একান্ত প্রেম ত মিথ্যা হয়ে যায় নি। যে-ঐশ্বর্য্য সুষমার মনে ভরা—যদি শত বৎসর ধরেও আর কিছু নূতন সে না পায় তবু তার সে-ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার তেমনি ভরাই থাকবে। সুষমাকে কে বলে বিধবা? কে বলে তাকে ভাগ্যহীনা? যদি বিজয়ের চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সুষমা তার সমস্ত প্রেম ভালবাসা হারিয়ে ফেলত ত হয়ত সে নিজেকে দীন ব'লে মনে করত —কিন্তু গত পনর বৎসরের প্রেমের স্মৃতিতে তার ভরা মন। বিজয় তাকে যে-সিংহাসনে বসিয়েছিল সেই সিংহাসনেই তাকে বসিয়ে রেখে গেছে—তা যদি না হ'ত ত সুষমা বাঁচতে পারত না—তার মরণই ভাল ছিল।

"মরণই ভাল ছিল?" সুষমা কি ভাবছে? মরণ ত ভাল ছিলই—সহস্র বার ভাল ছিল। বিজয়কে হারিয়ে মরণ ছাড়া সুষমার আর কি চাইবার থাকতে পারে? যে-মরণকে তার বিজয় বরণ করেছে সেই মরণকে পাবার জন্যই ত সুষমার দিনরাত্রি এই আকুলতা। মরণকে আশ্রয় ক'রে বিজয় অনায়াসে তাকে ছেড়ে চলে গেল—একবার পিছনের দিকে তাকালে না, একবার ভাবলে না তার এত আদরের সুষমাকে সে কার কাছে রেখে যাচ্ছে—সে মরণকে কি ক'রে পাওয়া যায় সুষমা ত দিনরাত তাই ভাবে। বিজয় চলে গেল—মরণের জয়ডঙ্কা বাজিয়ে জীবনকে হারিয়ে দিয়ে চলে গেল—সুষমা পিছনে পড়ে রইল অগৌরবের জীবন, দীনতার জীবন, বিধবার জীবনের দাসী হয়ে—এমন শক্তি নেই যে এই জীবনটাকে পরাজিত ক'রে মৃত্যুতে জয়লাভ ক'রে স্বামীর সঙ্গিনী হয়। ধিক তার জীবন—তার আবার মরণ ভাল নয়? একমাত্র মরণই ত তার ভাল।

অভিমানে, অপমানে সুষমার দুই চোখ দিয়ে অজস্র-ধারায় জল ঝরতে লাগল। আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার বিজয়কে মনে মনে ডেকে বললে, "তর্কে কখনও তুমি জিততে চাইতে না। বলতে তোমাকে হারিয়ে আমার সুখ নেই, তোমার কাছে হারেই আমার গৌরব—সেই তুমি আজ এত বড় জিতে চলে গেলে, আমার এ হারের লজ্জা আমি রাখি কোথায়? কি তোমার ভালবাসা যে আজ এই বেঁচে থাকার লজ্জা থেকে, অপমান থেকে আমাকে বাঁচাতে পারলে না? আমাকে দীনতার চরম সীমায় নামিয়ে দিয়ে তুমি রাজার মত চলে গেলে—এই কি তোমার ভালবাসার পরিচয়?

মূক আকাশ নীরবে চেয়ে রইল—কোনখানে বিজয়ের সাড়া পাওয়া গেল না—সুষমার বুকফাটা নালিশের উত্তর এল না কোথাও থেকে।

২টা বাজল। চাঁদের আলো ম্লানতর হয়ে এসেছে। যে টুকরা চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল সেটা সরে গেল কখন? ঘরটা আরও আবছায়া অন্ধকার—জ্যোৎস্নার টুকরাটা সরছে, ক্রমেই সরছে। সরতে সরতে ঐ আকাশে উঠে গেল টুকরাটা—এইবার মিলে যাবে চাঁদের সঙ্গে। চাঁদের সঙ্গে একই ত ঐ টুকরাটুকু ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছিল, আবার সময় হতেই চলে গেল ফিরে। সুষমাও ত ঐ রকম নেমে এসেছে আবার সেও চলে যাবে কোনও দিন

জানালার সামনের জামগাছটা বাতাসে দুলছে। ভোরের হাওয়া উঠল। গাছের ঝির ঝির শব্দ দূরে যেন কোথাও ঝরণা বইছে। অস্তগামী চাঁদের মুমূর্ষু আলোকে আকাশ ম্লান। ভাল ক'রে দেখা যায় না কিছু। এতক্ষণ যে রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে লোকচলাচলের শব্দ, তাদের টুকরো কথা ভেসে আসছিল, তাও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। চার দিক নিস্তব্ধ, অন্ধকার—প্রাণের সাড়া নেই কোথাও। ঝিম্ ঝিম্ করছে নিস্তব্ধতা; কে যেন কিসের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে। কথা ক'য়ো না, সাড়া দিও না, ওর স্বপ্ন ভেঙে যাবে। চুপি চুপি কথা, ইসারা-ইঙ্গিত, পা টিপে টিপে যাওয়া-আসা—অন্ধকারে, নীরবে। জামগাছে যে একদল পাখীর বাসা, সেখান থেকে পাখীদের ডানা ঝাপটাবার শব্দ অস্পষ্টভাবে আসছে—আস্তে, সাবধানে। ওদিকের পাঁচিল দিয়ে মোটা বিড়ালটা হেঁটে যাচ্ছে—আস্তে সাবধানে। পিছন ফিরে তাকাচ্ছে—এক পা যাচ্ছে—আবার পিছনে তাকাচ্ছে। কি হয়েছে বিড়ালটার? ওদের বাড়ীর কুকুরটা ওর পিছু নেয় নি ত? তাহলেই সর্ব্বনাশ। দেবে কখন এক লাফে বিড়ালটাকে শেষ ক'রে। উঠে দেখতে হয় ত। সুষমা উঠল। আস্তে পা টিপে টিপে বাইরে এল—জাম-গাছের নীচে। জামগাছ নয় ত—বকুল ফুলের গাছ সেটা—বকুল ফুলের মিষ্ট গন্ধ আসছে নাকে। তার ওপাশে মধুমতী নদী। মধুমতী কি সুন্দর নাম। পাঁচিল নেই, বিড়াল

নেই, অন্ধকার নেই—ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় মধুমতী নদী বয়ে যাচ্ছে, তার জল চিক্‌চিক্ করছে চাঁদের আলোয়—কি সুন্দর! সুষমা মুগ্ধনয়নে চেয়ে রইল। বিড়ালের কথা মনে রইল না।

দেরি হয়ে যাচ্ছে। তিনটে বোধ হয় বেজে গেছে, এখনি চারটে বাজবে—তার পর পাঁচটা বাজলেই ত সুষমাকে উঠে পড়তে হয়। ঘুমবে কখন? মধুমতী নদী ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না, আবার কাল দেখলেই হবে। আস্তে আস্তে সুষমা ঘরের দিকে ফিরলে।

কে ওর বিছানায় শুয়ে? সুষমার বুক ভয়ে হঠাৎ চমকে উঠল? কে?···ওঃ বিজয়! তাই বল। সুষমার এমন ভয় হয়েছিল। ভেবেছিল দরজা খোলা পেয়ে চোরটোর ঢুকে পড়েছে বুঝি। তা নয়। বিজয় এসেছে। ···আচ্ছা বিজয় কোথা গিয়েছিল? সুষমা যখন এইমাত্র উঠে বিড়ালটাকে দেখতে বাইরে গিয়েছিল কই বিজয় ত তখন ছিল না! খুব মনে পড়ছে সুষমার, তখন বিজয় ছিল না, সুষমা একা ছিল বিছানায়। দু-মিনিট বাইরে গেল, এর মধ্যে বিজয় কোথা থেকে এসেছে? সুষমা আস্তে আস্তে মুখ নীচু ক'রে দেখলে বিজয় তার বালিশটা টেনে নিয়ে চোখ বুজে ঘুমিয়ে আছে। সুষমা তার মুখে হাত দিয়ে ডাকলে, "ওগো"।—বিজয় সাড়া দিলে না, বোধ হয় খুব ঘুমচ্ছে। সুষমা এবার একটু জোরে তাকে তাড়া দিয়ে ডাকলে, "ওগো, ওঠ না একবার, শুনতে পাচ্ছ না?"—এইবার বিজয় তাকালে। সুষমার হাত দুটো ধরে বিছানায় উঠে ব'সে বিজয়ের কি হাসি। হাসতে হাসতে বিজয় ফেটে পড়ছে। "তুমি যে কি সুষমা! তখন থেকে আমি তোমায় দেখছি -তুমি আমাকে দেখতেই পাচ্ছ না। তুমি উঠলে—পা টিপে টিপে বিড়ালটাকে দেখতে গেলে—সব ত আমি দেখলাম। তার পর মনে হ'ল তোমাকে একটু ভয় দেখানো যাক্—" বলতে বলতে বিজয়ের হাসি থেমে মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। "ভয় পেয়েছ সুষমা?"

ভয়, সুষমা ভয় পাবে? বিজয়কে দেখে সুষমা ভয় পাবে? · ও, এতক্ষণে সুষমার মনে পড়ল। বিজয় ত নেই। সেই যে সেই ভয়ানক রাত্রি, সেই কালরাত্রি, সেই কি ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেল—সেই যে বিজয় গেছে আর ত তার পর আসে নি। এই ত হঠাৎ প্রথম এল বিজয়।···ও, সেই কথাই বিজয় বলছে বুঝি?

কিন্তু সে কি সত্যই ঘটেছিল? কে বললে সত্যই ঘটেছিল? কে বললে সেটা স্বপ্ন নয়?—নাঃ, স্বপ্ন কি ক'রে হবে? সে ত সত্যই ঘটেছিল। সুষমা যে তার পর বার-বার নিজেকেই এই প্রশ্ন কত বার করেছে কত দিন। সেদিনকার প্রতি মুহূর্ত্ত যে আগুনের মত উজ্জ্বল হয়ে সুষমার মনে জ্বলছে—সে কি ক'রে স্বপ্ন হবে? কত অসুখ, কত কষ্ট, কত ডাক্তার—সে কি ভয়ানক দিনরাত্রি কাটল—সে-সব যদি একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র হ'ত ত সুষমা ত বেঁচে যেত। কিন্তু তা কি হবে? হে ভগবান, তাই ক'রে দাও না—সেই ভয়ানক রাত্রিকে তুমি দুঃস্বপ্ন ক'রে দাও, মিথ্যা ক'রে দাও। যত বড় দুঃস্বপ্নই হোক্ না কেন, রাত্রের অলীক স্বপ্নের পরে বিজয়ের বাহুবন্ধনের মধ্যে ঘুম থেকে জেগে উঠে সে স্বপ্নের কথা সুষমা চিরদিনের মত ভুলে যাবে। তাই ক'রে দাও ভগবান্।

তাই হবে—সে স্বপ্ন মিথ্যাই হবে। এই ত বিজয়—তার হাতে তার হাতখানি ধরা, তার চোখে কি অসীম স্নেহ, এই ত বিজয়ের নিজের ঘর, নিজের খাট। এইখানে বিজয় রয়েছে—এ কি ক'রে মিথ্যা হবে?

খুব ছেলেবেলায় সুষমা একবার স্বপ্ন দেখেছিল মা-কালীর কাছে তাকে যেন বলি দেওয়া হচ্ছে। সেই অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে মসীকৃষ্ণ কালীমূর্ত্তি, তাঁর হাতে খাঁড়া। একটা উঠান, তারই মাঝখানে সুষমাকে বলি দেওয়া হবে ব'লে আনা হয়েছে। সুষমার মা বাবা সকলেই উপস্থিত—বাবা যেন মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন, মা আঁচলে মুখ ঢেকে খুব কাঁদছেন। চারি দিকে কত লোক, কত পুরোহিত, কত ফুলের রাশি। পুরোহিতের একজনের মুখের মন্ত্র উচ্চারণের দু চারটে কথা অবধি সুষমার স্পষ্ট মনে আছে। সুষমা খুব কাঁদছে, বলি হ'তে তার ইচ্ছে নেই, ভয়ে তার বুক শুকিয়ে গেছে, সকলকে সে মিনতি করছে—ওগো আমায় বলি দিও না তোমরা, কিন্তু কেউ তার কথা শুনছে না। স্বপ্নে বড় কাঁদছিল ব'লে তার মা এই সময়ে সুষমাকে জাগিয়ে দিলেন তাই—না হ'লে সুষমা তার পর আরও কি কি দেখত কে জানে। বোধ হয় সবটাই দেখত। হয়ত দেখত সুষমার মাথাটা কেটে নেওয়া হ'ল—মাথাটা উঠানে গড়াগড়ি যাচ্ছে—সবই দেখত। স্বপ্নের অর্দ্ধেকটা হতেই মা তাকে জাগিয়ে দিলেন তাই ত সে সবটা দেখতে পারে নি। কিন্তু সে স্বপ্ন আজও এত স্পষ্ট সুষমার মনে আছে যে সেই পুরোহিতদের কয়েক জনের মুখ অবধি তার মনে গাঁথা। স্বপ্ন মাঝে মাঝে এমনই হয়। এ-ও সুষমার তাই হয়েছে। না হ'লে বিজয়—তার বিজয়—কোথায় যাবে তাকে ছেড়ে?

কিন্তু এই যে খানিক আগে এই খাটে শুয়ে সুষমা কাঁদছিল। সেটা বুঝি স্বপ্ন? তাই হবে। সেটা স্বপ্নই হবে। কিন্তু বিজয় কেন তখন সুষমাকে জাগিয়ে দিলে না, তার মা যেমন তাকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন? স্বপ্নে বিজয়কে হারিয়ে ফেলেছিল তাই সুষমার এত কান্না। স্বপ্ন যে মানুষে কেন দেখে?

বিজয়ের পাশে খাটে ব'সে সুষমা গভীর অভিমানে বললে, "আমি যে একটু আগে কত কাঁদছিলাম দেখি

আমায় জাগিয়ে দিলে না কেন? দেখ ত আমার মাথা ব্যথা করছে কেঁদে কেঁদে। এই দেখ বালিশ ভিজে এখনও। কি বিশ্রী স্বপ্ন দেখছিলাম যে।"

বিজয় তাকে আদর করলে।...আচ্ছা বিজয় যেন কত দিন, কত কাল পরে তাকে এমন ক'রে আদর করলে— সুষমার এমন কেন মনে হচ্ছে? কোথায় যেন গিয়েছিল বিজয়, হঠাৎ ফিরে এসেছে। কোথায় কি যেন একটা গোলমাল হয়ে গেছে সুষমা ঠিক বুঝতে পারছে না। যাক্ এই রাত্রে কিছু আর ভেবে কাজ নেই, কাল সকালে ভেবে দেখলেই হবে। বিজয়কে ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা করবে সে সত্যই কোথাও গিয়েছিল কি না।·· এখন ত বৈশাখ মাস, গরমের ছুটি, সুষমাকে একা ফেলে বিজয় কোথায়ই বা যাবে?

বিজয়ের কত আদর। আদরে, আনন্দে, সোহাগে সুষমা যেন ভরে উঠল। আর তার কোথাও কোনো গোলমাল নেই—কিছু ভাবনা নেই, কোনও দ্বিধা নেই। এই ত বিজয় রয়েছে—এই ঘর, এই খাট, এই সুষমা নিজেও যেমন সত্য রয়েছে, বিজয়ও তেমনই সত্য রয়েছে। কিসের ভাবনা?

শুধু মধুমতী নদীটা কোথা থেকে এল হঠাৎ? সেইটে সুষমা বুঝতে পারছে না। কি সুন্দর নদী, কি সুন্দর নাম তার—জ্যোৎস্নায় জলটা কি অপরূপ সুন্দরই দেখাচ্ছিল—কোথা থেকে এল সে-সব হঠাৎ?...আচ্ছা, সুষমা কাল সকালে সব কথা বিজয়কে ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নেবে। আজ এখন ও সব কথা থাক্।

আচ্ছা, বিজয়ের যে অসুখ করেছিল, কই এখনও ত একবারও সুষমা সে কথা জিজ্ঞাসা করলে না। ছি ছি, সুষমা যে দিন-দিন কি হয়ে যাচ্ছে, কোনো কথা মনে থাকে না। সুষমা বিছানায় উঠে বসতে চেষ্টা করলে, কিন্তু বিজয়ের সঙ্গে কি পারবার জো আছে? বিজয় উঠতে দিলে না। শুয়ে শুয়েই সুষমা জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার অসুখ ভাল হয়ে গেছে? কিছু কষ্ট নেই আর?" বিজয় হাসল। "অসুখ? কই, অসুখ ত আমার করে নি সুষমা, দেখ না আমি ত মোটা হয়েছি। অসুখ আমার আবার কবে হ'ল? তুমি স্বপ্ন দেখেছিলে বুঝি?"

হ্যাঁ তাই হবে, বিজয় ঠিকই বলেছে। সুষমা সারা রাত ধরে কেবল বিজয়ের ভয়ানক অসুখের স্বপ্নই দেখেছে। সুষমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বললে, "কি ভয়ানক স্বপ্ন যে দেখেছি আমি, তুমি তা জান না। মুখে আনা যায় না, এমন স্বপ্ন সে। ছি ছি, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি যে সব দেখি। কি ভয়ানক ভয়ানক ঘটনা যে দেখছি, সে-সব বলতেই পারা যায় না। বলতে চাইও না আমি—ও-সব স্বপ্ন ভুলে যাওয়াই ভাল।" সুষমা বিজয়ের একটি হাত নিজের দুই হাতে ধরে আবার অনুভব ক'রে নিলে, এই ত বিজয় সত্যই আছে। মিথ্যা সে দুঃস্বপ্ন তার—মরীচিকার মত মিলিয়ে গেছে সব।

দূরে পাখী ডাকছে। কোথায় যেন একটা মুরগী ডাকল। গরুর গাড়ীর চাকার শব্দও যেন শোনা যায়। ভোর হয়ে এল কি?

মনের ভিতর কোন্‌খানে ভয় ভয় করে কেন? ভয় করে এখনি ভোর হবে, আলোয় ভরে যাবে ঘর, রাত্রের অন্ধকারের এই বিজয়কে সে আলোয় যদি দেখা না যায়? শূন্য বিছানাটা যদি পড়ে থাকে শুধু রাত্রের এই মধুস্মৃতি নিয়ে? এ যদি স্বপ্ন মাত্র হয় শুধু?

সুষমা চোখ বুজে দুই হাতে বিজয়কে জড়িয়ে ধ'রে রইল। বিজয়কে মিথ্যা হ'তে দেবে না সে। বিজয় যদি মিথ্যা হ'য়ে যায় সুষমা নিজেও ত মিথ্যা হয়ে যেতে পারে। স্বপ্নতে, সত্যতে, মিথ্যাতে, সুষমা কেন এমন এক ক'রে ফেলে? এই বিজয়, এই সুষমা, এই খাট, এই ঘর, এই জানালা, পাশের ঘরে কিরণ, বিজয়ের অসুখ, ডাক্তার ধর, সেই ফুলের রাশি, সেই অন্ধকার দিনরাত—এর কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা স্বপ্ন কে জানে। সুষমা চায়ও না জানতে। সে শুধু চায় আজকের এই ক্ষণটি যেন সত্য হয়ে থাকে— ভগবান্, মরীচিকার মত একে মিলিয়ে যেতে দিও না।

আকাশ স্বচ্ছ হয়ে আসছে—বাতাস ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে এল, চারিদিকে প্রাণের সাড়া জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। আর রাখা যায় না—স্বপ্নকে, মরীচিকাকে, মিথ্যাকে আর ধরে রাখা যায় না বুঝি।

সুষমা চোখ মেলে তাকাল।

স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে গেছে। বিজয় নেই, শূন্য বিছানায় সে একা, মধুমতী নদী কই জানালার বাহিরে বইছে না ত।

সুষমা উঠে বসল। চারিদিক তাকিয়ে দেখলে। খাট, বিছানা, আয়না, আলনার কাপড়, আলমারীর মাথায় বাক্স, সব ত যেখানে যা ছিল ঠিক তাই আছে। বিজয় যে এসেছিল, কোনো চিহ্ন কি বাহিরে কোথাও রেখে যায় নি তার শুধু সুষমার মনে ছাড়া?

বাহিরে দরজার কড়া নড়ে উঠল—গোয়ালা হাঁকলে, "দুধ, দুধকা বালতি দিজিয়ে মাইজী।"

ও-ঘরে বড় খোকার গলার সাড়া পাওয়া গেল, "ও মা, জ্যেঠির কাছে যাব, দরজা খুলে দাও না মা।"

কিরণের মা "তারা তারা, দুর্গা দুর্গা" বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

সুষমা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মনে মনে ভগবানকে ডেকে বললে, "দিনের সত্যকে আবার ত ঠিক কালকের মত করেই ফিরিয়ে দিলে ভগবান্, রাত্রের মিথ্যাকেও আবার যেন আজকের মত ক'রে ফিরে পাই।"

দরজা খুলে দুধ নেবার জন্য সুষমা এগিয়ে গেল।

ভারতীয় পার্সী-ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা

শ্রীসুধাংশুচরণ ভট্টাচার্য্য, এম-এ

কার্য্যোপলক্ষ্যে বর্ত্তমানে আমি 'বাঁশদা' দেশীয় রাজ্যের অধিবাসী। এই উপলক্ষ্যে কয়েকটি পার্সী ঐতিহাসিক স্থান দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল—সেই কথাই আজ বলিব। অনেকেই হয়ত এই দেশীয় রাজ্যটির নামের



বাঁশদা রাজপ্রাসাদের প্রবেশ-দ্বার

সহিত পরিচিত নহেন, কারণ ইহা প্রথমতঃ একটি ক্ষুদ্র রাজ্য এবং দ্বিতীয়তঃ ইহা ভারতের এক প্রান্তে অবস্থিত। সে জন্য প্রথমে বাঁশদা রাজ্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে দিতেছি।

বাঁশদা দেশীয় রাজ্যটির আয়তন ২১৫ বর্গ-মাইল—বার্ষিক আয় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। রাজ্যটি ভারতের পশ্চিম প্রান্তে সুরত স্টেট্‌স্ এজেন্সীর (Surat States Agency) অন্তর্গত ও পার্ব্বত্য দৃশ্য এবং গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কৃষিকার্য্য ও কাষ্ঠ আহরণ এখানকার প্রধান জীবিকা। রাজ্যটির ভিতর এবং বাহির দিয়া কয়েকটি পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিত—এক কথায় বলা যাইতে পারে স্থানটি প্রকৃতির আপন হাতে সৃষ্ট। এই দেশীয় রাজ্যের রাজধানী বাঁশদা একটি গ্রাম্য শহর। লোকসংখ্যা পাঁচ হাজার—মুখ্য ভাষা গুজরাতি। বর্ত্তমান অধিপতি চন্দ্র-বংশের পাণ্ডব শাখার চালুক্য (বাসুদেবপুরীয়) বংশজাত।

বাঁশদা শহরে আসিতে হইলে বম্বে-সুরত রেলপথের অন্তর্গত বিলিমোরা স্টেশন হইতে ২৯ মাইল মোটরে অথবা বরোদা ষ্টেট্ রেলপথের উনাই স্টেশন হইতে ৭ মাইল মোটরে আসিতে হয়। বর্ষাকালে প্রথম পথটি বন্ধ হইয়া যায়, কেবল দ্বিতীয় পথটি খোলা থাকে।

ঘোড়মল গ্রাম বাঁশদা-রাজ্যের অন্তর্গত ও বাঁশদা শহর হইতে আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের নিকটে আজমলগড় ও বন্ধন পাহাড়দ্বয় অবস্থিত। এই পাহাড়দ্বয় ভারতীয় পার্সী ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। স্থানীয় প্রাচীন পার্সী-অধিবাসী সুখদিয়া বংশের মিঃ জাহাঙ্গীরের সহিত আমি ১৯৪২ সনের মার্চ মাসের ২৯শে তারিখে সন্ধ্যা ছয়টায় বাঁশদা শহর হইতে উপরোক্ত পাহাড়দ্বয়ের উদ্দেশে গোযান সাহায্যে যাত্রা করি। এ পথে গোশকট ছাড়া আর অন্য কোনও যান দুষ্প্রাপ্য ও অগম্য। সুতরাং পাহাড়ী পথে গোশকট প্রীতিকর না হইলেও আমাদের আর অন্য কোনও বাহনের সুযোগ ছিল না। অপর এক উপায় ছিল পদ-ব্রজে যাওয়া। কিন্তু সঙ্গে অভিযানের নানা প্রকার সামগ্রী থাকায় তাহা সম্ভব হয় নাই। আমাদের এ যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল দ্বৈত। আমার পক্ষে ইহা ছিল পার্সী ঐতিহাসিক স্থান দর্শন আর মিঃ জাহাঙ্গীরের পক্ষে ছিল বম্বে-রেডিওর একটি বক্তৃতা দিবার জন্য বিবরণ সংগ্রহ। এখানে বলা



বাঁশদা হাইস্কুল



বাঁশদার রাজপথ

প্রয়োজন যে মিঃ জাহাঙ্গীর বম্বে-রেডিও কর্ত্তৃক ভারতে পার্সী আগমন বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হন ও তাঁহারই সৌজন্যে আমার এ প্রবন্ধ লিখিবার সুযোগ হয়। মিঃ জাহাঙ্গীরের জামাতা মিঃ কাসাদ্ ও স্টেট হাইস্কুলের ফার্সী শিক্ষক মিঃ দাইয়া আমাদের সহযাত্রী হন। অন্যান্য সামগ্রীর সহিত আমাদের ছিল হিংস্র পশু হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বন্দুক ও পিস্তল, উচ্চতা মাপিবার জন্য ব্যারোমিটার, দিগ্ নির্ণয়ের জন্য কম্পাস, দৃশ্য দেখিবার জন্য দূরবীণ ও ছবি তুলিবার জন্য ক্যামেরা। এক কথায় বলা চলে যে আমাদের অভিযানটি যদিও ছোট এবং সামান্য, তথাপি ইহাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য কোনও বস্তুর ত্রুটি রাখা হয় নাই। ঘোড়মল গ্রামে থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল মিঃ জাহাঙ্গীরের জামাতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ ফকির কাসাদের গৃহ। কাসাদরা ঘোড়মল গ্রামের একমাত্র প্রাচীন পার্সী-অধিবাসী। পেট্রোল র‍্যাশনিং-এর যুগে এবং দ্বিতীয় মহাসমরের মাহাত্ম্যে যদিও আমাদের আবার সেই গোশকটের যুগে ধীরে ধীরে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে, তথাপি বিংশ শতাব্দীর তথা-কথিত শহরে-শিক্ষিত ভদ্রলোকের পক্ষে গোযানে ভ্রমণ একটা অভিনব অভিজ্ঞতা—বিশেষতঃ পাহাড়ী রাস্তায়। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল একাগাড়ী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, পাঠকবর্গ তাহা স্মরণ করিলে আমাদের এই গোশকটে ভ্রমণের আন্দোলনটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অন্য দিক্ দিয়াও এ যাত্রাটি আমার পক্ষে স্মরণীয়। কয়েক বৎসর বম্বে শহরে বদ্ধ ও নিয়মিত জীবনযাপনের পর সেদিন যখন পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে সন্ধ্যাদেবীর ক্রোড়ে নিজকে হারাইবার সুযোগ পাইলাম, তখন গাজনের সন্ন্যাসীর মত পিঠটা না হউক অন্ততঃ মনটা নাড়া দিয়া উঠিল। বাঁশদা শহর ছাড়িয়া আমাদের শকট প্রথম নদী পার হইল। রাস্তা ক্রমাগত উঁচুনীচু। উঁচুতে উঠিবার সময় গাড়ীর গতি মন্দ, না'মিবার সময় বলদ বেচারীদের কিঞ্চিৎ আরাম। আমাদের কোনো তাড়'হুড়া ছিল না, তাই পশুদ্বয় তাহাদের ইচ্ছামত গতিতে চলিতে লাগিল। রাস্তা মাঝে মাঝে দ্বিধাবিভক্ত—সেখানে জঙ্গলী লোকের সাহায্য লইতে হইল ঠিক পথ বাছিয়া লইতে। পাহাড়ের তলদেশে পথের কোথাও কোথাও দু-চারটি কুঁড়ে ঘর অবস্থিত। এ ছাড়া চারি দিক নির্জ্জনতার রাজ্য—তাহার সাক্ষীস্বরূপ কত যুগ যুগ ধরিয়া দণ্ডায়মান বনানী প্রদেশ। ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব পাহাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন; কিন্তু যাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাতঃকালের আসনে পূর্ণচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। অস্ত-উদয়, শেষ-আরম্ভ, মৃত্যু-পুনর্জন্ম—সমগ্র সৃষ্টির গূঢ়-রহস্য, আদিম প্রবাহ, নিরবচ্ছিন্ন সত্তা, যেন আজ এই প্রাকৃতিক দৃশ্যে প্রকটিত হইল। আমাদের গাড়ী এই সময়ে দ্বিতীয় নদী পার হইল। তাহার পর আরম্ভ হইল গভীর জঙ্গলে চাঁদের রূপালি আলোয় অনির্দ্দিষ্ট যাত্রা। পথ ভাল চেনা যায় না। ভরসা এই যে, পশুদ্বয় তাহাদের স্বাভাবিক শক্তিতে ঠিক পথেই লইয়া যাইবে আর সামনে কোনো বিপদ দেখিলে থামিয়া পড়িবে। সমগ্র পথের মধ্যে এই স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক, কারণ ইহা দুইটি পর্ব্বতের মধ্যে একটি গিরিপথ এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ নিবিড় বনের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। কিন্তু আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহন শক্তি! এ ভয়ঙ্কর স্থানেও (যেখানে দিনের বেলায়ও অনেকে ব্যাঘ্রের দর্শন পাইয়াছে) মনে ভয়ের লেশমাত্র উদয় হয় নাই। মানব অন্তর যখন বুঝিতে পারে সে কত অসহায়, তখন তাহার সেই অসহায় বোধ তাহাকে পৌঁছাইয়া দেয় পরম পুরুষের সান্নিধ্যে। তাঁহার স্পর্শে জীবন অমরত্ব প্রাপ্ত হয়—তাই হয় সে নির্ভীক, অজেয়।

রাত্রি আটটায় আমরা ঘোড়মল গ্রামে মিঃ কাসাদের গৃহে পৌঁছিলাম। মিঃ কাসাদ ঐ গ্রামের জমিদার ও তঁাহার গৃহটি পর্ব্বতের উপত্যকায় অবস্থিত। যথা-যোগ্য সম্ভাষণাদির পর রাত্রির আহার গ্রহণ করিয়া আমরা গৃহের প্রশস্ত বারান্দায় শয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট



আজমলগড়স্থিত বৃহত্তর জলাধার

বিভিন্ন শয্যায় আসিলাম। সামনে উঠান, তার পরেই মাঠ। মাঠের প্রান্তে এক মাইল দূরে রন্ধন পর্ব্বত। চতুর্দ্দিক পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল, সেই আলোতে রন্ধন পর্ব্বতের উপরিভাগ একটি শুঁড়যুক্ত হস্তি-পৃষ্ঠের ন্যায় দেখাইতেছিল। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা ঐ রন্ধন পর্ব্বতের উপরে উঠিব ইহাই ঠিক ছিল। প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করিয়া নিদ্রা আসিতে রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল।

আমাদের অভিযানের স্থান দুইটির সহিত ভারতীয় পার্সী ইতিহাসের কি সম্বন্ধ এইবার তাহা আলোচনা করিব। বাল্যকাল হইতে আমরা ইতিহাসে পড়িয়া আসিতেছি যে মুসলমানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া পার্সীগণ ইরাণ ত্যাগ করিয়া ভারতে আগমন করেন। কিন্তু এই সামান্য ঘটনার পিছনে যে কত অজ্ঞাত বিবরণ ও সত্যাসত্য নিহিত আছে তাহা অনেকেরই জ্ঞানের বাহিরে এবং আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ-রূপে নির্ণীত হয় নাই। আমরা পার্সী ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত বা মনোযোগী নহি—এই কারণে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানিবার জন্য কষ্ট স্বীকারও করি না। কিন্তু ভারতীয় পার্সীগণ সেরূপ নহেন। নিজেদের ইতিহাস স্থাপনের জন্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই বিষয়ে আমি সামান্য যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি বা পড়িয়াছি তাহা হইতে আমার মনে হয় যে বিধর্ম্মী শত্রুদের হাত হইতে নিজেদের ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য ভারতীয় পার্সীগণ যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন ও উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে ঔপন্যাসিক ব্যাপারের ন্যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতীয় হিন্দুগণ যেরূপ ইতিহাস-লেখন বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, ভারতীয় পার্সীগণও সেই পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ভারতীয় পার্সীগণের সম্পূর্ণ সঠিক বিবরণ জানা সম্ভব হয় নাই। আধুনিক ভারতীয় পার্সীগণ নিজেদের ইতিহাসের যাহা কিছু আলোচনা বা গবেষণা করিয়াছেন তাহা সামান্য কয়েকটি প্রাচীন পুস্তকের সাহায্যে। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে 'কিস্‌সে-ই-সংজান' প্রধান। 'কিসসে-ই-সংজান্' ভারতে পার্সীগণের আগমনের বিষয় জানিবার জন্য প্রধান গ্রন্থ হইলেও ইহা নানারূপ অজ্ঞাত নাম ও তারিখের ভ্রম-প্রমাদের দ্বারা পরিপূর্ণ। পুস্তকটি ঐতিহাসিক ঘটনায় পূর্ণ হইলেও লেখক যে উহার কেন ঐরূপ নামকরণ ('কিসসা' অর্থাৎ গল্প) করিলেন তাহা অজ্ঞাত। 'কিসসে-ই-সংজান্' বাহ্‌মন্ কৈকোবাদ্ কর্তৃক নওসারি (Nausari) শহরে ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফার্সী ভাষায় লিখিত হয়। লেখক বাহ্‌মন্ ঐ পুস্তকে ভারতে পার্সীগণের আগমনের বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি আবার ঐ সকল ঘটনা তৎকালীন নওসারি-নিবাসী এক প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক দস্তুরের (পার্সী পুরোহিত—যিনি নাকি জেন্দ-আবেস্তায় পণ্ডিত ছিলেন) নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। আসল পুস্তকের ইংরেজীতে অনুবাদ বম্বে এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য Lt. E. B. Eastwick ও R. B. Paymaster পৃথক্ ভাবে করিয়াছেন। ঐ পুস্তকটির গুজরাতি ভাষাতেও অনুবাদ হইয়াছে, যেহেতু ভারতীয় পার্সীগণ গুজরাতি ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন।

'কিস্‌সে-ই-সংজান' হইতে আমরা জানিতে পারি যে ইরাণ দেশে যখন মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হয়, তখন পার্সীগণ তাহাদের গতিরোধ করিতে না পারিয়া নিজেদের ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের সর্ব্বোচ্চ পবিত্র অগ্নি



আজমলগড় পর্ব্বতের শিখরদেশে



রন্ধন পর্ব্বত হইতে তিন মাইল দূরস্থিত আজমলগড় পর্ব্বতের দৃশ্য

'আতশ বেহরাম্' লইয়া পারস্যের অন্তর্গত কোহিস্তান্ নামক পর্ব্বতে আত্মগোপন করেন। কিন্তু কিছু দিন পরে, তাঁহাদের মধ্যে একজন জ্যোতিষী তাঁহাদের ঐ স্থান ত্যাগ করিতে বলেন, নতুবা তাঁহাদের আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইবে না ইহা জানাইয়া দেন। তখন কিছু পার্সী, নারিওসাঙ্গ নামক একজন দলপতির অধীনে জাহাজে করিয়া ভারত-অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহারা প্রথমে কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণে ডিও নামক স্থানে অবতরণ করেন। কিন্তু সেখানে কিছু দিন থাকিবার পর পুনরায় আর একজন জ্যোতিষী তাঁহাদের ধর্ম্ম বাঁচাইবার জন্য ঐ স্থান ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন। তখন তাঁহারা ঐ স্থান ছাড়িয়া জাহাজে করিয়া ভারতের পশ্চিম-উপকূল অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে ভীষণ ঝড়ে তাঁহাদের জাহাজ ডুবিবার উপক্রম হয়—সে সময় দস্তুরগণ তাঁহাদের ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া রক্ষা পান। এইরূপে তাঁহারা ভারতের পশ্চিম উপকূলে সংজান্ শহরে ৭২০ খ্রীষ্টাব্দে (সংবৎ ৭৭৭, ৮৯ যেজদেজারদি) আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ সময়ে 'সংজানে'র নিকটে জাড়ি বা জাড়ে রাণা নামক একজন হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি পার্সীদের ধর্ম্মের সারতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া সন্তোষ লাভ করেন ও তাঁহাদের নিজের রাজ্যমধ্যে থাকিতে আদেশ দেন। কিন্তু এই জাড়ে রাণা যে কে এবং কোন্ বংশের নরপতি ছিলেন, তাহা ডাঃ ভাণ্ডারকর হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত কোনও ঐতিহাসিকই ঠিক করিতে পারেন নাই। অনেকে মনে করেন ইহা হয়ত হিন্দুরাজা জয়দেবের বিকৃত নাম। যাহা হউক, পার্সীগণ 'সংজানে' থাকিবার আদেশ পাইয়া সেখানে তাহাদের প্রথম অগ্নি-মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। পাঠকগণ অবগত আছেন যে, পার্সীগণ অগ্নির উপাসক। ইহাদের অগ্নি তিন ভাগে বিভক্ত যথা—'আতশ বেহরাম্' অথবা 'ইরাণ শাহ,' 'আতশ আদরইয়ান' ও 'দাদ্‌গা'। উহারা যথাক্রমে পবিত্রতম, পবিত্রতর ও পবিত্র বলিয়া গণ্য।

'কিস্‌সে-ই-সংজান' অনুযায়ী পার্সীগণ সংজানে প্রায় সাত শত বৎসর সুখে থাকিবার পর চম্পানীর শাহ্ মহম্মদ্ নামক মুসলমান নরপতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ঐ শাহ্ মহম্মদ্ সংজানের নাম শুনিয়া তাঁহার সেনাপতি আলেফ্ খাঁকে সংজান জয় করিতে পাঠান। সংজানের তৎকালীন হিন্দুরাজা পার্সীগণের সাহায্যে আলেফ্ খাঁকে প্রথম যুদ্ধে পরাজিত করেন। কিন্তু পর-বৎসর আলেফ্ খাঁ পুনরায় লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া সংজান আক্রমণ করিলে হিন্দুরাজা পলায়ন-তৎপর হন। তখন পার্সীগণ তাহাদের বীর সর্দ্দার আরদেশীরের অধীনে মুসলমানগণকে আক্রমণ করেন। এইবার পার্সীরা শত্রুর সংখ্যাধিক্যের জন্য পরাজিত হন। আরদেশীর ও পরে, হিন্দুরাজা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। 'কিস্‌সে-ই-সংজান্'-এর লেখক এই যুদ্ধের ও পার্সীদের বীরত্বের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা মহাভারতীয় বা হোমরীয় যুদ্ধের ন্যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতীয় ইতিহাসে এই যুদ্ধের কোনও সুনির্দ্দেশ নাই। যাহা হউক, এই যুদ্ধের ফলে পার্সীগণকে আবার তাঁহাদের পবিত্র অগ্নি লইয়া পলাতকের জীবন যাপন করিতে হইল। 'সংজান' হইতে তাঁহারা ষোল মাইল উত্তর-পূর্ব্বে বাহরুত পর্ব্বতে গিয়া আত্মগোপন করিলেন। কিন্তু সেখান হইতেও তাঁহাদের কিছু দিন পরে পলাইতে হইল। এই বার তাঁহারা বাঁশদা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সে আজ প্রায় চারি শত বৎসরের কথা। বাঁশদায় থাকিবার সময় তাঁহারা একটি পর্ব্বতের উপরিভাগে কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া পবিত্র অগ্নি স্থাপন করিয়াছিলেন ও অপর একটি পর্ব্বতের উপরিভাগে দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত পর্ব্বতটি আজকাল রন্ধন ও দ্বিতীয়টি আজমলগড় নামে পরিচিত। বাঁশদায় পার্সীগণ মাত্র চৌদ্দ বৎসর ছিলেন। তাহার পর তাঁহাদের পবিত্র অগ্নি নওসারিতে লইয়া যাওয়া হয় ও তথা হইতে উধওয়াড়ায় (বম্বে-সুরত রেলপথে) স্থাপিত হয়। এখনও উহা ঐ স্থানেই আছে। ইহাই হইল ভারতীয় পার্সীদের পবিত্র অগ্নি রক্ষার আংশিক ইতিহাস—বাকী অংশ প্রকৃতির অন্ধকূপে নিহিত। সাধারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এবং 'কিস্‌সে-ই-সংজান'এ যদিও লিখিত হইয়াছে যে পার্সীগণ মুসলমান-অত্যাচারের দরুনই প্রথম ইরাণ ত্যাগ করিয়া ভারতে আসেন, তথাপি পারস্য-দেশের ইতিহাসে দেখা যায় যে সাসানিয়ান্

সম্রাট্‌গণের মধ্যে বেহরাম ঘোর ৪২০-৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে ও নওশিরওয়ান আদল্‌ ৫৩১-৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের কিছু অংশ তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত করেন। ফিরদৌসীর বর্ণনাতেও পাওয়া যায় যে বেহরাম্‌ ঘোর্‌ যখন ভারতে আসেন তখন এদেশীয় ইরাণী বণিকগণ তাঁহাকে ভেট প্রদান করেন। ভিনসেণ্ট স্মিথের ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় যে ৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে পারস্য-সম্রাট্‌ ডেরিয়াস্‌ সিন্ধু উপত্যকা অধিকার করিয়াছিলেন ও আলেকজান্দারের ভারত-আক্রমণের সময় সিন্ধু নদী ভারতবর্ষ ও পারস্য সাম্রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিত। Renaud এর Abdul Fida'য় ৭৭ অধ্যায়ে দেখা যায় যে পার্থিয়ান রাজত্বের সময় থানার (বম্বে) উপকূল এবং পারস্য উপসাগরের মধ্যে বিশেষ বাণিজ্য প্রচলিত ছিল।

সুতরাং উপরোক্ত ঘটনাসমূহ হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ৭২০ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানপীড়িত পার্সীগণের সংজানে আগমনের প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে পার্সীগণের বসবাস স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ পার্সীগণের ধর্ম্ম বা বিস্তৃত বিবরণ ভারতের ইতিহাসে খ্যাতিলাভ না করিয়া শেষোক্ত পার্সীগণ খ্যাতিলাভ করিল কেন? আমার মনে হয় ভারতের প্রথম পার্সী অধিবাসিগণ নিজেদের ধর্ম্ম ও স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিয়া ভারতবাসীর সহিত ধীরে ধীরে মিশিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন নাই। পশ্চাতে আগত পার্সীগণ অতিকষ্টে আপনাদের পবিত্র অগ্নি রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন ও আজিও ভারতে দৃষ্ট হইতেছেন।

৩০শে মার্চ প্রাতঃকাল ৭টায় আমরা তিনজন (লেখক, মিঃ জাহাঙ্গীর ও মিঃ দাইয়া) দুইটি গাইড লইয়া রন্ধন্‌ পর্ব্বতের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। রন্ধন্‌ পর্ব্বতটি গভীর জঙ্গলে আবৃত ও মনুষ্যচলাচলশূন্য বলিয়া আমাদের ঘোড়মল গ্রামের কুন্‌বী-জাতীয় আদিম অধিবাসী জঙ্গলীদের মধ্য হইতে পথপ্রদর্শক লইতে হইল। পর্ব্বতের উপরে যাইবার কোনও নির্দ্দিষ্ট রাস্তা নাই। কিন্তু জঙ্গলীরা মাঝে মাঝে কাঠ ইত্যাদির জন্য উহার উপর যায়। সুতরাং উহাদের সাহায্য লওয়া আমরা অপরিহার্য্য মনে করিলাম। তাহা ছাড়া আমাদের বন্দুক, যন্ত্রপাতি বহন করিবার জন্যও লোকের দরকার ছিল। এক মাইল সমতলভূমি অতিক্রম করিবার পর আমরা পর্ব্বতটির পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতটির উচ্চতা এক হাজার ফুট হইবে। উচ্চতা হিসাবে ইহা পীড়াদায়ক নহে, কিন্তু পথের অভাব ও পর্ব্বতটির



আজমলগড়ের অসম্পূর্ণ প্রাচীরে

লম্বভাবে অবস্থান যথেষ্ট দুঃখদায়ক হইয়াছিল। পর্ব্বতটির তলদেশ হইতে কিছু দূর পর্য্যন্ত তত কষ্ট পাইতে হয় নাই, কিন্তু তাহার পর এরূপ ঘন শুষ্ক ঝোপ ও বৃক্ষ আরম্ভ হইল যে ঐগুলি ভেদ করিয়া যাইতে যাইতে আমাদের সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। পথের এক স্থানে শুষ্ক ঘাসের কিছু অংশ ঘর্ষিত দেখা গেল। আমাদের গাইডরা বলিল যে উহা বাঘের থাবা ঘষিবার চিহ্ন। ইহার পর হইতে আমরা বিশেষ সতর্কভাবে চলিতে লাগিলাম। শীতের শেষ সময় বলিয়া সমস্ত বৃক্ষ পত্র-শূন্য। ইহাতে আমাদের দূর পর্য্যন্ত দেখিবার সুযোগ ছিল। নতুবা পত্রযুক্ত এ বনপ্রদেশে পাঁচ হাত দূরের বেশী দেখা অসম্ভব। আমাদের মনকে স্থানান্তরে নিযুক্ত করিবার জন্য ও কষ্ট কিঞ্চিৎ লাঘব করিবার জন্য আমরা ঐ পর্ব্বতটির ইতিহাসের বিষয়ে আমাদের গাইডদের নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। প্রশ্নের ফলে যাহা জানিতে পারিলাম তাহা কৌতুকপ্রদ ও পার্সী-ইতিহাসের সহিত সম্পর্কশূন্য।

একজন গাইডের মতে (ইহার নাম দেওল্যা) এই পর্ব্বতটির পূর্ব্ব নাম কি ছিল জানা যায় না। কিন্তু বহু বৎসর পূর্ব্বে সেম্‌বাটিয়া নামে এক জন মুসলমান রাজার সৈন্য-সামন্ত ঐ পর্ব্বতের উপরিভাগে রান্না করিবার জন্য উনান বা অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করে এবং ঐ কারণেই পর্ব্বতটি রন্ধন্‌ (গুজরাতি শব্দ—অর্থ রান্না করা) নামে পরিচিত হয়। এই আদিম অধিবাসিগণ বংশপরম্পরায় এই কাহিনীর সহিত পরিচিত। ইহার অতিরিক্ত ইহারা কিছু জানে না। বলা বাহুল্য, আমি এই ট্রাডিশনের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না, বিশেষ করিয়া অগ্নিকুণ্ড দুইটি দেখিবার পর। ভারতীয় ইতিহাসে



ঘোড়মল গ্রাম হইতে রন্ধন পর্ব্বতের দৃশ্য

কোন রাজার বিষয়েই দুরারোহ পর্ব্বতের উপরিভাগে গিয়া রন্ধনের নিমিত্ত ঐরূপ অদ্ভুত উনান প্রস্তুতের উল্লেখ বা নিদর্শন পাওয়া যায় না। আদিম অধিবাসিগণ প্রকৃত ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া অগ্নিকুণ্ডের বিষয়ে ঐরূপ ব্যাখ্যার সৃষ্টি করিয়াছে। দেড় ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রমের পর আমরা পর্ব্বতটির তিন-চতুর্থাংশ আরোহণ করিলাম এবং পর্ব্বতগাত্রে খোদিত তিনটি ছোট চৌবাচ্চার নিকট উপস্থিত হইলাম। পাহাড়টি অত্যন্ত খাড়া ভাবে অবস্থিত বলিয়া ও কোন রাস্তা না থাকায় এত দূর আসিতে আমাদের অনেক বার পা পিছলাইয়া নিম্নাভিমুখে গমন করিতে হইয়াছিল ও বহু স্থানে বৃক্ষলতাদি আঁকড়াইয়া ধরিয়া বাদুড়ের ন্যায় ঝুলিতে ঝুলিতে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতে ও বিন্ধ্য পর্ব্বতে শত শত মাইল ভ্রমণের সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, কিন্তু এরূপ কষ্টভোগ আর কোথাও করিতে হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। পূর্ব্বে যেখানেই গিয়াছি পথ পাইয়াছি, কিন্তু এরূপ চতুষ্পদের অবস্থা কোথাও হয় নাই। যাহা হউক, চৌবাচ্চা তিনটির নিকট পৌঁছিয়া আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম ও উহাদের মাপ লইলাম। প্রথম চৌবাচ্চাটি ১৫ ফুট লম্বা, ৬½ ফুট চওড়া ও ১০ ফুট গভীর; দ্বিতীয়টি ১২ ফুট লম্বা, ৮ ফুট চওড়া ও ৭½ ফুট গভীর এবং তৃতীয়টি ৭½ ফুট লম্বা, ৭½ ফুট চওড়া ও ১০ ফুট গভীর। তৃতীয় চৌবাচ্চায় নামিবার দুইটি ধাপযুক্ত সোপান দেখা গেল। চৌবাচ্চাগুলি যত দূর সম্ভব পানীয় জল সঞ্চিত করিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে উহারা একেবারে জলশূন্য। চৌবাচ্চাগুলি পর্ব্বতগাত্রে যেরূপ স্থানে নির্ম্মিত সেখানে বাস করিবার স্থানের কোনও চিহ্নই দৃষ্ট হইল না। সুতরাং ঐ চৌবাচ্চাগুলি যে কেন ঐরূপ স্থানে খোদিত হইয়াছিল বলা কঠিন। বোধ হয় পর্ব্বতারোহীদিগের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পার্সীগণ এরূপ করিয়াছিল, কারণ তৎকালে অগ্নিদর্শনের জন্য বহু পার্সী ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশে যাইতেন। ইহার পর আমরা পর্ব্বতের শিখরদেশে বৃক্ষলতাদি ধরিয়া চড়িতে লাগিলাম ও আধ ঘণ্টা পরে শিখরে পৌঁছিলাম।

রন্ধন পর্ব্বতটির শিখরদেশ সমতল—উহা প্রায় ৪০০ গজ লম্বা ও ৫০ গজ চওড়া। এই মালভূমিতে এক প্রান্তে দুইটি অগ্নিকুণ্ড পাশাপাশি অবস্থিত। কুণ্ড দুইটির মাপ প্রায় একরূপ, যথা, উভয়েরই তলদেশ ৫½ ফুট বর্গ ও গভীরতা ৪ ফুট। কুণ্ড দুইটির উপরিভাগ বৃত্তাকার। বৃত্তের ব্যাস প্রায় ৪½ ফুট। কুণ্ড দুইটির মধ্যে দূরত্ব মাত্র ২½ ফুট। উহাদের তলদেশ ও গাত্র প্রাচীন কালের সিমেণ্ট দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সিমেণ্ট আজিও অটুট আছে দেখিলাম। কেবল কুণ্ড দুইটির উপরের আবরণ ভগ্ন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—পার্সীগণ অগ্নি রাখিবার জন্য দুইটি কুণ্ড তৈয়ারী করিয়াছিলেন কেন? একটিই ত যথেষ্ট। ইহার উত্তর এই যে, পার্সীগণ পূর্ব্বে সর্ব্বদাই দুইটি করিয়া অগ্নি সঙ্গে রাখিতেন—যদি একটি কোন কারণে নিবিয়া যাইত, তাহা হইলে অপরটি কাজে লাগিত। কুণ্ড দুইটি দেখিয়া মালভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলে, আমরা কিছু দূরে একটি বিরাট্ চৌবাচ্চার নিকট ৯½টায় উপস্থিত হইলাম। যত দূর সম্ভব উহা পবিত্র অগ্নিদর্শনার্থীদের জলপানের নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা ৯০ ফুট লম্বা, ৬৫ ফুট চওড়া ও ১০ ফুট গভীর। চৌবাচ্চাটির মেঝে ইষ্টকনির্ম্মিত, কিন্তু গাত্র প্রস্তর-নির্ম্মিত। রন্ধন পর্ব্বতের উপরিভাগে আর কোন দ্রষ্টব্য বস্তু না থাকায় এইবার আমরা নীচে নামিতে লাগিলাম। রন্ধন পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে আজমলগড় পর্ব্বতের চূড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তিন মাইল দূরে বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। আগামী কল্য উহা আমাদের লক্ষ্যস্থান। বেলা ১১টার সময় আমরা ঘোড়মল গ্রামে ফিরিয়া আসিলাম।

৩১শে মার্চ সকাল ৭টায় আমরা আজ্‌মলগড় পাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বদিনের ন্যায় সঙ্গে গাইড চলিল, উপরন্তু মিঃ কাসাদ ও তাঁহার ভ্রাতাও আসিলেন। আমাদের উপস্থিত বাসস্থান হইতে আজ্‌মলগড়ের শিখরদেশ প্রায় ৪ মাইল। কিন্তু এই পর্ব্বতটি রন্ধনের ন্যায় দুরারোহ নহে, যদিও তথায় যাইবার কোনও বিশেষ পথ ছিল না।



রন্ধন পর্ব্বতে আরোহণের পথে

শত শত বৎসর পূর্ব্বে এই পাহাড়দ্বয় মনুষ্য-সমাগমের স্থল হইয়াছিল ও নিশ্চয়ই যাতায়াতের পথও ছিল। কিন্তু আজ উহারা পরিত্যক্ত ও কচিৎ আমাদের ন্যায় অনুসন্ধিৎসুর লক্ষ্যবস্তুতে পর্য্যবসিত।

এই চার মাইলের মধ্যে আমরা দুইটি ক্ষুদ্র পাহাড়ী নদী পাইলাম। যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম ততই ঘন শুষ্ক ঝোপ আমাদের অগ্রগতির বাধা জন্মাইতে লাগিল। অপেক্ষাকৃত ভাল পথ পাইবার জন্য আমরা নানা দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিতেছিলাম। সাড়ে-আটটায় আমরা আজমলগড়ের শিখরদেশে পৌঁছিলাম। এই পাহাড়ের উপরিভাগ একটি ক্ষুদ্র মালভূমি। ইহা প্রায় ৫০০ গজ লম্বা ও ৪০০ গজ চওড়া হইবে। ইহার মধ্যভাগ নীচু—অর্থাৎ সমগ্র মালভূমিটি ঝিনুকের ন্যায়। এখানে দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে দুইটি জলাধার, একটি পুলিস চৌকী ও অসম্পূর্ণ দুর্গপ্রাচীর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পার্সীগণ আজমলগড় পর্ব্বতের উপর আত্মরক্ষার্থ দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গ নির্ম্মাণ শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন। যত দিন না দুর্গ নির্ম্মাণ সমাপন হয় তত দিন তাঁহারা এক অজ্ঞাতনামা পর্ব্বতের উপর অগ্নি স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বত পরে গুজরাতি ভাষায় রন্ধন নামে পরিচিত হয়। কিন্তু আজ্‌মল্ ফার্সী শব্দ, ইহার অর্থ—অতি সুন্দর। পার্সীগণ যখন এখানে আসেন তখনই তাঁহারা এই পর্ব্বতের আজ্‌মল নামকরণ করেন। পরে ইহার সহিত গুজরাতি শব্দ 'গড়' অর্থাৎ 'দুর্গ' যুক্ত হয়। এই পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বাস্তবিকই মনোমুগ্ধকর। আশেপাশের পর্ব্বতের মধ্যে ইহাই সর্ব্বোচ্চ ও একাকী প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান। যে-দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের অগণিত তরঙ্গায়িত অচলশ্রেণী। দূরে, বহু দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে যেখানে দৃষ্টিশক্তি প্রতিহত হয়, তাহা হইতেও অনেক দূরে সমতল ভূমি সমুদ্রের ক্রোড়ে মিলিত হইয়াছে—সেখানেই 'সংজান্'—ভারতের পশ্চিম উপকূলে ধর্ম্মভীরু পার্সীগণের প্রথম আগমনের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চিরস্মরণীয় স্থান।

এইবার আমরা দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি পরীক্ষায় নিযুক্ত হইলাম। পুলিস চৌকী অর্থাৎ শত্রু আগমনের লক্ষ্য করিবার স্থানটি ২০ ফুট × ২০ ফুট × ৫ ফুট ও পাহাড়টির উত্তর দিকে অবস্থিত। তৎকালে ঐ দিক দিয়াই মুসলমান শত্রু আসিবার সম্ভাবনা ছিল। এই অংশে পাহাড়টি সমতলভূমি হইতে একেবারে লম্বভাবে ১০০০ ফুট উঠিয়াছে ও এই পথে পাহাড়ে উঠা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। দুইটি চৌবাচ্চা বা জলাধারের মধ্যে একটি ৫০´ × ৫০´ × ২০ ফুট ও মধ্য ভাগে ৩ ফুট চওড়া ইষ্টক-নির্ম্মিত দেওয়ালের দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত। তলদেশ ও পার্শ্ব-দেশ প্রস্তর ও প্রাচীন সিমেণ্ট দ্বারা নির্ম্মিত। রন্ধনের ও এই পর্ব্বতের ইমারত শিল্প একই প্রকারের। অপর জলাধারটি ২০´ × ৪০´ × ৫ ফুট। ইহার সমস্ত অংশ ইষ্টক-নির্ম্মিত। এক-একটি ইষ্টকের মাপ ১২´´ × ১০´´ × ২ ইঞ্চি। বলা বাহুল্য জলাধার দুইটির এক্ষণে ভগ্নাবস্থা। কিন্তু স্থানে স্থানে গাঁথুনির কাজ এখনও যথেষ্ট মজবুত রহিয়াছে। উত্তর দিকে প্রাচীর নির্ম্মাণের কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু অন্যান্য দিক দিয়া পাহাড়ে আরোহণ সম্ভব বলিয়া পার্সীগণ ঐ সব দিকে প্রস্তরসাহায্যে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আজিও স্থানে স্থানে দেখা



রন্ধন পর্ব্বতের একটি অগ্নিকুণ্ড

যায়। ঐ সকল প্রাচীর কোথাও কোথাও ১০ ফুট প্রশস্ত ও ৪ ফুট উচ্চ অবস্থায় দেখা গেল। উভয় পর্ব্বতেই একটি বিষয় লক্ষ্য করিলাম যে মনুষ্যবাসের জন্য ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত কোনও গৃহের ভগ্নাবশেষ নাই। ইহা হইতে মনে হয় যে, যেহেতু পার্সীগণ ঐ স্থানে অধিক দিন থাকিবার আশা করেন নাই সেজন্য তাঁহারা কোনও স্থায়ী বাস-গৃহ পর্ব্বতের উপরিভাগে নির্ম্মাণ করেন নাই। যাহারা বিধর্ম্মীর আক্রমণে ক্রমাগত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পলায়ন-তৎপর তাহাদের পক্ষে ইহা খুবই স্বাভাবিক। অধিকাংশ লোক নীচেই থাকিত, কেবল যাহাদের উপর অগ্নি দেখিবার ও পাহারা দিবার ভার ছিল তাহারাই ঐ দুইটি পর্ব্বতের উপর অস্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিত—ইহাই উপরোক্ত বিষয়ের একমাত্র কারণ বলিয়া ধরিয়া লইলাম।

আজ্‌মলগড় হইতে বেলা ১০॥০টায় আমরা ঘোড়-মলে ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিবার পথে আমার বন্ধুবর্গ বন্দুকের সদ্ব্যবহার হইল না বলিয়া এক জোড়া টিয়াপাখী ও এক জোড়া ভেঁকর (এক জাতীয় ছোট হ'রিণ) বধ করিবার বৃথা প্রয়াস পাইলেন। প্রকৃতির শান্ত রাজ্য বন্দুকের কর্কশ ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন আধুনিক সভ্যতার প্রতি বিদ্রূপ করিল। শিকার বাঁচিয়া যাওয়ায় অনর্থক রক্তপাত দেখিতে হইল না বলিয়া আমি মনে মনে আনন্দিত হইলাম। মানুষের মনে নিরর্থক অসহায় পশু-বধের যে ইচ্ছা তাহাই সুযোগ পাইয়া এক দিন বিশ্বধ্বংসী মহাসমরে পরিণত হয়। এ সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে জগতের অনেক মঙ্গল।

পরের দিন ভোরে রওনা হইয়া আমরা পুনরায় গো-যান সাহায্যে বাঁশদায় ফিরিলাম। পথে আসিবার মুখে ভাবিতেছিলাম, হিন্দুর আদি গ্রন্থ বেদ অগ্নির উপাসনায় পরিপূর্ণ—পার্সীগণও একমাত্র অগ্নির উপাসক। তবে কি এককালে উভয়েই এক সত্য লাভ করিয়াছিল? কিন্তু আজ হিন্দু মূর্ত্তিউপাসক; আর পার্সী-ধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম শ্লোক মূর্ত্তি-উপাসকের বিনাশ-কামনায় রচিত। কালের কি বিচিত্র গতি!

ভারতীয় অন্ধদের সমস্যা

শ্রীমোহনসিং সেঙ্গর

"তুমি অন্ধ, তোমার ঘরে থাকাই উচিত! বরং এমন কাজ-কর্ম্ম শেখো যাতে আপনার অন্ন জোটাতে পার। বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের যোগ্য চক্ষুষ্মান্ লোকের অভাব নেই!"

১৯৩৭ সালে শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায় নামে এক অন্ধ বাঙালী যুবকের প্রতি এই অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের একজন খ্যাতনামা সদস্য। কারণ, অন্ধ হ'য়েও এম. এ., বি. এল. পাস ক'রে তাঁর সন্তোষ হয় নি, উচ্চশিক্ষার্থে আমেরিকা যাবার জন্য বৃত্তি লাভের প্রার্থনা করার দুঃসাহস তাঁর হয়েছিল। কিন্তু এই বিদ্রূপ উক্তি ও বহু বুদ্ধিমান্ দরদীর সদুপদেশ তাঁকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারে নি। তাই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই বৃত্তির সাহায্যে ঐ সালেই তিনি আমেরিকা যান এবং ১৯৪০ সালে ভারতে ফিরে এসে এই বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই অন্ধশিক্ষার লেকচারার নিযুক্ত হন।

একজন অসহায় অন্ধের পক্ষে এরূপ সঙ্কল্প সাধন অল্প গৌরবের কথা নয়! ভারতে অন্ধের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু এরূপ সাহস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায় এবং গভীর আত্মবিশ্বাস অন্য কোন অন্ধের মধ্যে দেখা যায় নি।

১৯০৮ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়ের জন্ম হয়। তাঁর পিতামহ সেখানকার প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং সমগ্র পরিবার সেখানেই বাস করত। কিন্তু অতি শৈশবেই পিতামাতার সঙ্গে তাঁকে দিনাজপুরে আসতে হয়, কারণ তাঁর পিতা দিনাজপুরের ডাক-ঘরে প্রথমে কেরাণীরূপে ও পরে পোষ্টমাষ্টাররূপে কাজ করতেন। ৮ বছর বয়স পর্য্যন্ত তিনি সুস্থদেহে সেখানকার বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু মাত্র ৯ বছর বয়সে কলেরা ও চক্ষুপ্রদাহ রোগের নিষ্ঠুর আক্রমণে তাঁকে অতি শীঘ্র দৃষ্টি-শক্তি হ'তে বঞ্চিত হ'তে হয় এবং ফলে এই বয়সেই লেখাপড়া বন্ধ করতে হয়। এই নিদারুণ বিপৎ-পাতে তাঁর পিতামাতার হৃদয়ে কঠিন আঘাত লাগে এবং তাঁরা পুত্রের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য ডাক্তার, বৈদ্য, হাকিম কারোরই শরণাপন্ন হ'তে বাকি রাখলেন না কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কোন ফল হয় না। অবশেষে

সকলেই হতাশ হয়ে অন্ধ বালককে অদৃষ্টের হাতেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু সুবোধ হতাশ হবার ছেলে ছিলেন না। তাই পুরুষকারের উপর অদৃষ্টকে জয়ী হ'তে তিনি দেন নি। অলস হয়ে ঘরে বসে না থেকে তিনি অদম্য উৎসাহে ভাইয়ের সঙ্গে স্কুলে যেতে আরম্ভ করলেন। তখনও সমগ্র বাংলা দেশে এক কলিকাতা ছাড়া কোথাও অন্ধ বিদ্যালয় ছিল না। সুতরাং সাধারণ বিদ্যালয়ে যাওয়া ছাড়া তাঁর গতি ছিল না। কিন্তু তাতেও নিরুৎসাহ না হ'য়ে শুধু শ্রবণশক্তির সাহায্যেই তিনি বিদ্যাশিক্ষার সাধনায় রত হলেন এবং নানা বাধা ও অসুবিধা অতিক্রম ক'রে দু-এক বছরের মধ্যেই অঙ্ক, ইংরেজী ও বাংলায় সাধারণ জ্ঞান লাভ করলেন। বিশেষতঃ অঙ্কে তিনি চক্ষুষ্মান্ বালকদের অপেক্ষাও ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন এবং দু-তিন মিনিটে বড় বড় গুণফল সঠিক বলতে পারতেন।

পুত্রের এই প্রতিভার পরিচয়ে হতাশ পিতামাতার অন্তরেও নব আশার সঞ্চার হয় এবং শীঘ্রই তাঁরা তাঁকে কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি ক'রে দেন। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীতে পড়বার সময় বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ অন্ধদের উচ্চ-শিক্ষা না দেওয়াই সিদ্ধান্ত করেন। কেন-না, চক্ষুষ্মান শিক্ষিতদেরই চাকরী মেলে না; এ অবস্থায় অন্ধরাও শিক্ষিত হ'লে বেকার সমস্যা আরও জটিল হয়েই উঠবে। বরং অন্ধদের সঙ্গীত বিদ্যা এবং বেতের ও বাঁশের চেয়ার, টেবিল, বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দিলে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহের একটা উপায় হবে। এই সমীচীন সিদ্ধান্তের ফলে অন্ধদের উচ্চ শিক্ষা দান বন্ধ করা হয়।

সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীযুক্ত রায়কে বিদ্যা শিক্ষা স্থগিত রাখতে হয়। অতঃপর এই বিদ্যালয়ে তিনি সেতার বাজানো এবং নানাবিধ বেত ও বাঁশের কাজ শিক্ষা করেন। এইভাবে দু-বছর নষ্ট হওয়ার পর তাঁর মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, সেতার বাজিয়ে, বেত ও বাঁশের জিনিস বিক্রয় ক'রে কায়ক্লেশে নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়ত হ'তে পারে, কিন্তু তা'তে অধিকাংশ অন্ধদের জীবন-সমস্যার সমাধান হবে না। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তাঁর তীব্র অভিলাষ হয় এবং তিনি পিতাকে তাঁর মনের ইচ্ছা জানান। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দরদী পিতার পূর্ণ সমর্থন লাভ করে এবং তিনি উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্যে পুত্রের উচ্চশিক্ষার সুব্যবস্থা করেন। শ্রীযুক্ত রায় তাঁর প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে ১৯২৭ সালে মাত্র এক বছরের মধ্যেই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং সংস্কৃত ও ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন।

শ্রীযুক্ত রায় সেন্ট পলস্ কলেজ থেকে আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজ জীবনে তাঁকে বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিশেষ কষ্ট পেতে হয় নি; কারণ, কলেজে অধ্যাপকের লেকচার শোনাই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। পুস্তক পড়ে শোনানোর জন্য বাড়ীতে একজন শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। এইভাবে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স সহ বি. এ. এবং দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাস করেন। এই উভয় পরীক্ষাতেই তিনি প্রায় ২৫০০০ ছাত্রের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। এক অন্ধ ছাত্রের পক্ষে এরূপ অসাধারণ কৃতিত্ব নিশ্চিতই তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভার অপূর্ব্ব নিদর্শন।

এম.এ. পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বি. এল. পাস করেন এবং ওকালতীর জন্য দু-বছর শিক্ষানবীশী করেন। কিন্তু ভারতের অসহায় অন্ধদের জীবন-সমস্যা-সমাধানের সঙ্কল্প ক্রমশঃ তাঁর সমগ্র চিত্ত অধিকার করে। তাই জীবনের এই মহত্তম উদ্দেশ্য তাঁকে নিশ্চিন্ত হয়ে ওকালতী ব্যবসায়ে লিপ্ত হবার প্রবৃত্তি দেয় নি। আমেরিকায় গিয়ে অন্ধদের শিক্ষাদান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বলবতী হয়। অর্থাভাবে নিরাশ হবার লোক তিনি ছিলেন না। অবশেষে বহু আয়াসে এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইসচ্যান্সলার ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৬-৩৭ সালের 'রাসবিহারী ঘোষ ট্রাভলিং ফেলোশিপ' বৃত্তি লাভ করেন এবং ১৯৩৭ সালে লণ্ডন হয়ে আমেরিকা যান।

বিদেশ যাত্রা

শ্রীযুক্ত রায়ের একাকী বিদেশ যাত্রা এবং কোন পথ-প্রদর্শকের সাহায্য ব্যতীত দেশ হ'তে দেশান্তরে পরিভ্রমণ তাঁর অদম্য সাহস ও আত্মনির্ভরতারই পরিচায়ক। তিনি জাহাজ-কর্ম্মচারী ও সহযাত্রীদের সাহায্যেই আমেরিকা, জাপান এবং ব্রিটেনেই শুধু যান নি, জনাকীর্ণ শহরে শহরে রেলে, বাসে সর্ব্বত্র একাকী গমনাগমন করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কখনও সামান্য দুর্ঘটনাও ঘটে নি।

আমেরিকায় তিনি কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং 'টিচার্স ট্রেনিং' কলেজে ৮ মাস অধ্যয়ন ক'রে শিক্ষণ শাস্ত্রে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। প্রথমে কিছুদিন তিনি এক স্থানীয় অন্ধ আশ্রমে অবস্থান করেন কিন্তু শীঘ্রই এক

স্বতন্ত্র ফ্ল্যাটে বাস করতে থাকেন। নিউ ইয়র্কের অন্ধ সংঘ খাওয়া পড়া ও থাকার খরচ বাবদ তাঁকে একটি বৃত্তি প্রদান করে।

অতঃপর তিনি 'ভারতীয় অন্ধদের সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক সমস্যা সমূহ' সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত হন। এ জন্য তিনি বাংলা-সরকার থেকে এক বিশেষ বৃত্তি পান। ফলে তাঁকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'থিসিস' দেবার জন্য বিলাত যেতে হয়। কিন্তু লণ্ডনে এসে তিনি দেখে বিস্মিত হ'লেন যে, সেখানে অন্ধদের উচ্চশিক্ষাদান সম্বন্ধে কোন বিশেষ ব্যবস্থাই নেই। এমন কি, প্রথমে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর থিসিস গ্রহণ করতেই অস্বীকার করে। পরে অনেক চেষ্টার পর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থিসিস গ্রহণ করতে রাজী হ'লেও থিসিস লেখার উপযোগী উপকরণের অভাবে তাঁকে আবার আমেরিকা যেতে হয়।

ব্রিটেনে অবস্থান কালে তিনি অন্ধদের সমস্যা ও শিক্ষাদির ব্যবস্থা বিশেষভাবে আলোচনা ও পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন যে, যদিও ব্রিটেনে আমেরিকা বা জাপানের তুলনায় অন্ধদের শিক্ষাদির ব্যবস্থা নিতান্তই নগণ্য, তথাপি দু এক স্থানে যতটুকু ব্যবস্থা আছে তা বেশ সুন্দর ও সন্তোষজনক। এডিনবরার রাজকীয় অন্ধ আশ্রম ও বিদ্যালয়ের তিনি প্রশংসা করেন।

বিভিন্ন দেশে অন্ধশিক্ষার ব্যবস্থা

অন্ধদের শিক্ষার জন্য জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী, কানাডা প্রভৃতি দেশে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমেরিকা ও জাপান এ বিষয়ে সকল দেশকে পিছনে ফেলে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। এই দুই দেশের রাষ্ট্রনিয়ন্তারা অন্ধদের শিক্ষা বিস্তারে যে মনোযোগ ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা নেই। আমেরিকায় অন্ধদের শিক্ষার জন্য এক পৃথক বিভাগ আছে। এই বিভাগের নাম "State Commission for the Blind"। (১) অন্ধদের সংখ্যা গণনা, (২) অন্ধদের সংখ্যা হ্রাস ও অন্ধতা নিবারণের জন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যথাসাধ্য ব্যাপক প্রয়োগ; (৩) যোগ্যতা অনুযায়ী অন্ধদের জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা; (৪) নিজ নিজ গৃহে অন্ধদের শিক্ষাদানের আয়োজন প্রভৃতি এই বিভাগের প্রধান কাজ। এ ছাড়া 'ফেডারাল ডিপার্টমেণ্ট ফর দি ব্লাইণ্ড' নামে একটি কেন্দ্রীয় বিভাগও আছে। ইহার অধ্যক্ষ টিনেম সাহেব স্বয়ং অন্ধ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ৪৫টি রাষ্ট্রের অন্ধদের শিক্ষাকেন্দ্র সমূহের পরিচালনা ও জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করা, তাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এবং অন্ধশিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য গবেষণা ও নির্দ্দেশ দান প্রভৃতি এই বিভাগের কাজ।

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৮টি রাষ্ট্রের স্থানে স্থানে 'সূর্য্যালোকভবন' (Sunshine Homes) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেখানে অন্ধ শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। উচ্চশিক্ষার জন্য পৃথক্ বিদ্যালয় আছে। স্থানে স্থানে অন্ধদের জন্য এক প্রকার (Lighthouses for the Blind) হাঁসপাতাল আছে। তাকে 'আলোকাগার' বলা হয়। সেখানে বিনা পয়সায় অন্ধদের চিকিৎসা করা হয়। বড় বড় শহরে তাদের জন্য খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের বিবিধ সুন্দর ব্যবস্থা আছে। রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী অন্ধদের বিভিন্ন কাজ শেখানো হয়।

অন্ধ-শিক্ষার লিপি

১৮২৬ সালে লুই ব্রেল নামে একজন ফরাসী অন্ধ শিক্ষক অন্ধদের শিক্ষা দিবার উপযোগী লিপি আবিষ্কার করেন। তাঁরই নাম অনুসারে এই লিপি 'ব্রেল লিপি' নামে বিখ্যাত হয়েছে। এই বর্ণমালা কেবল বিন্দু চিহ্ন দ্বারা রচিত। লিখবার জন্য এক প্রকার শ্লেট এবং অঙ্ক কষার জন্য এক প্রকার বোর্ড আছে। তার উপর 'গাইড' বা স্কেলের সাহায্যে সূক্ষ্মাগ্র ষ্টীলের পেন্সিল দ্বারা অক্ষরগুলি লিখতে হয়। প্রত্যেকটি অক্ষর কতকগুলি উত্থিত বিন্দুর দ্বারা গঠিত। বিন্দুগুলির উপর হাত বুলিয়ে অন্ধেরা সহজেই উক্ত লিপির দ্বারা রচিত যে কোন গ্রন্থ পড়তে পারে। ব্রেল লিপির সাহায্যে শ্রীযুক্ত রায় বেশ দ্রুত লিখতে ও পড়তে পারেন।

এই লিপির আবিষ্কার অন্ধ-শিক্ষা-বিস্তারে যুগান্তর আনয়ন করেছে। ব্রেল লিপিতে মুদ্রিত গ্রন্থের ও সাময়িক পত্রের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হচ্ছে। আমেরিকার এক অন্ধ পুস্তকালয়ে ব্রেল লিপিতে প্রকাশিত ২৫০০০ গ্রন্থ আছে। আমেরিকার রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের নিজস্ব পুস্তকালয়ে অন্ধদের জন্য এক পৃথক্ গ্রন্থ বিভাগ আছে। অন্ধ শিক্ষার এই ক্রমবর্দ্ধমান আয়োজন জীবনের আশা ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত আমেরিকার সহস্র সহস্র অন্ধদের জীবনে নবীন আশার আলোক আনয়ন করেছে। শত শত অন্ধ উকীল, ডাক্তার, অধ্যাপক, সাংবাদিক, শ্রমজীবী ও সরকারী কর্ম্মচারী রূপে সম্মানের সঙ্গে জীবিকানির্ব্বাহই করছে না—সমাজের ভারস্বরূপ না হয়ে দেশের ও দশের কল্যাণ সাধনে নিজস্ব অংশ গ্রহণ করছে।

অন্ধ-শিক্ষায় জাপান শীর্ষস্থানে

শ্রীযুক্ত রায়ের মতানুসারে জাপান যদিও আমেরিকা ও ব্রিটেনের বহু পরে অন্ধ-শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিয়েছে, তথাপি এশিয়ার এই অগ্রগামী দেশ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। অন্ধ, কানা, বোবা প্রভৃতি বিকলাঙ্গ নাগরিকদের জন্য জাপানে যে নিপুণ ও ব্যাপক ব্যবস্থা আছে, সেরূপ অন্য কোথাও নেই। অন্ধদের অসহায় অবস্থা দূর করার জন্য জাপান-সরকার আইনকে কাজে লাগিয়েছে। আইন অন্ধকে মানুষের মর্য্যাদা দিয়েছে। জাপানে ৩৬,০০০ অন্ধ আছে। প্রত্যেক অন্ধকে নাগরিক জীবনের যোগ্য ক'রে গড়ে তুলবার দায়িত্ব জাপান সরকার গ্রহণ করেছে। অন্ধদের শিক্ষার জন্য ৯০টি বিভিন্ন শ্রেণীর স্কুল আছে। সেখানে কোন অন্ধই অশিক্ষিত বা বেকার থাকতে পারে না। অন্ধদের জন্য পুস্তক ও পত্রিকাদির এরূপ বিপুল আয়োজন অন্য কোথাও নেই। কয়েকখানি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র ছাড়া 'ওসাকা মাইনীচী' নামে ১৬ পৃষ্ঠার এক দৈনিক পত্র আছে। ১৭ সালে পূর্ব্বে এই দৈনিক ব্রাইল লিপিতে প্রথম হয়। সমগ্র পৃথিবীর জন্য ইহাই অন্ধদের একমাত্র দৈনিক।

সম্প্রতি ব্রিটেন অন্ধ-শিক্ষার দিকে অধিক মনোযোগ দিয়েছে। আমেরিকান প্রণালীতে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু এখনও ব্রিটেন আমেরিকা ও জাপানের বহু পশ্চাতে। ফ্রান্সে অন্ধ-শিক্ষার ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হলেও ফ্রান্স আজও প্রাথমিক অবস্থা পার হয় নি। জার্ম্মানীতে অন্ধ-শিক্ষার এক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে। যুদ্ধের পাশবিক আয়োজনে যদি জার্ম্মানীর সকল শক্তি ব্যয়িত না হ'ত, তবে জার্ম্মানী অন্ধ-শিক্ষায় আরও বহু দূর অগ্রসর হ'ত।

ভারতীয় অন্ধদের সমস্যা

১৯৩১ সালের লোকগণনা অনুসারে ভারতে অন্ধদের সংখ্যা ৬,০২,৩৭০ ; কিন্তু অন্ধ বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ২১। অন্য দেশের তুলনায় এ সংখ্যা অতি নগণ্য। আমাদের দাসত্ব ও দারিদ্র্যই শুধু এই শিক্ষাহীনতার কারণ নয়, অন্ধদের সমস্যার প্রতি আমাদের উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্য কম দায়ী নয়। যে দেশে আমোদ-প্রমোদ বিলাস উৎসবেই নয়, মন্দির নির্ম্মাণে ও তীর্থে তীর্থে এবং এমন কি গোব্রাহ্মণ সেবায় কোটি কোটি টাকা জলের মত ব্যয় হয়, সেখানে দাসত্ব ও দারিদ্র্যের উপর দোষারোপ ক'রে নিশ্চিন্ত থাকা আমাদের শোভা পায় না। যেখানে অন্ধ, আতুর ও দরিদ্র নারায়ণ সেবার তরে ধনী-ধার্ম্মিক শিক্ষিত সমাজ গদগদ, কত না দানবীরের প্রশংসায় সাংবাদিকরা পঞ্চমুখ, সেখানে অসহায় অন্ধদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষারও ব্যবস্থা যদি না হয়, তবে তার চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি আছে? যাঁরা শিক্ষিত ও সভ্য বলে গর্ব্ব করেন, তাঁদের আজ বোঝা দরকার যে, অন্ধরা তাঁদের শুধু কৃপাভিক্ষা চায় না, চিরজীবন তারা কারও দয়ার উপরে নামমাত্র বাঁচতে চায় না—তারা চায় মানুষেরই অধিকারে মানুষের মত বাঁচবার সুযোগ ও সুবিধা।

সুতরাং অন্ধদের শুধু কৃপাপাত্র হিসাবে না দেখে দেখতে হবে তাদের মানুষ বলে। তবেই অন্ধদের যোগ্য সমস্যার সমাধান হবে। এর জন্য কৃপাদৃষ্টি চাই নে—চাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। কেমন ক'রে প্রত্যেক অন্ধকে সমাজের ও রাষ্ট্রের উপযোগী ক'রে গড়ে তোলা যায়, তাই হবে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এরূপ শিক্ষার জন্য এ দেশে কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা নেই। এর জন্য সর্ব্বপ্রথম অন্ধদের সংখ্যাদি নির্ণয় করা দরকার। সরকারের উচিত প্রত্যেক অন্ধের নাম, বাসস্থান ও অন্যান্য বিবরণ রেজেষ্টারী করার প্রথা প্রবর্ত্তন করা। তবেই বয়স, শিক্ষা ও বাসস্থান অনুসারে অন্ধদের শ্রেণী বিভাগ ও তদনুযায়ী শিক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে। সকল অন্ধই যে শিক্ষাকেন্দ্রের নিকটে বাস করে এমন নহে, সে জন্য আমেরিকার গৃহে গৃহে অন্ধদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেরূপ শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। এ দেশে শীঘ্র তা সম্ভব নয়। বর্ত্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরই নিজ নিজ এলাকায় এ দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। সবিশেষ তথ্য নিরূপণ ও উপযুক্ত শিক্ষার আয়োজন করার জন্য এক কমীটির উপর ভার অর্পণ করাই সমীচীন।

অন্ধদের শিক্ষা দিবার উপযোগী উপকরণ ও যোগ্য শিক্ষকের অভাবই সব চেয়ে কঠিন সমস্যা। এরূপ শিক্ষক আমাদের দেশে নিতান্তই বিরল। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অন্ধদের শিক্ষাদান-কার্য্যে পারদর্শী শিক্ষক তৈরি করার জন্য শ্রীযুক্ত রায়ের অধ্যক্ষতায় বি. টি. ক্লাসের ছাত্রদের উপযোগী এক পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করেছেন। যুদ্ধের ফলে বিদেশ থেকে অন্ধদের লিখবার উপযোগী 'ব্রেল' যন্ত্র আনা সম্ভব হয় নি। তাই শ্রীযুক্ত রায় স্বয়ং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ পি. এন. ঘোষের সাহায্যে এখানেই 'ব্রেল' যন্ত্রেরই অনুরূপ পঞ্চাশটি যন্ত্র প্রস্তুত ক'রে নিয়েছেন। যদি ভারত-

সরকার এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এ দিকে একটু মনোযোগ দেন, তবে সহজেই এ দেশে এরূপ যন্ত্র অধিক সংখ্যায় প্রস্তুত করা যেতে পারে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিখ্যাত সাংবাদিক ও মনীষী শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ১২৯৮ বঙ্গাব্দে বাংলা ভাষায় প্রথম ব্রেল লিপি উদ্ভাবন করেন এবং এ সম্বন্ধে অধুনালুপ্ত 'দাসী' নামক পত্রিকায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম অশিক্ষিত অন্ধদের অসহায় অবস্থার প্রতি বাংলার সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অন্ধদের শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের নিতান্তই অভাব, বিশেষতঃ যারা জন্মান্ধ, তাদের রূপ ও রঙের সম্বন্ধযুক্ত বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করান অত্যন্ত কঠিন। সাধারণ পুস্তকের সাহায্যে তা করা সম্ভব নয়। এ জন্য জন্মান্ধ ও বিভিন্ন বয়সের অন্ধদের জন্য পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিবিধ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনা করা প্রয়োজন। অন্ধদের জন্য গদ্যে ও পদ্যে নূতন সাহিত্য রচনা করতে হবে। এ কাজ সাহিত্যিকদের।

শ্রীমতী ইভলীন রায়

পরিশেষে শ্রীযুক্ত রায়ের সুযোগ্য জীবনসঙ্গিনী শ্রীমতী ইভলীন রায়ের সম্বন্ধে দু-এক কথা না বললে প্রবন্ধটি অসমাপ্ত রয়ে যায়। শ্রীযুক্ত রায়ের সাধনার সহিত তাঁর সহানুভূতি ও সহযোগ অতি গভীর ও নিবিড়। শুধু যৌবনের অনুরাগই নয়, অন্ধদের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি এই সুন্দরী ও বিদুষী তরুণীকে আমেরিকার এক উন্নতরুচিসম্পন্ন পরিবার থেকে সুদূর বিদেশে টেনে এনেছে। সুযোগ্য হলেও এক সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের বিদেশী অন্ধকে বিবাহ ক'রে শ্রীমতী ইভলীন যে সাহস ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই অসামান্য। এ জন্য তাঁকে পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের অনেক তিরস্কার ও বন্ধুবান্ধবীদের নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি সকলই হাসিমুখে বরণ ক'রে জীবনের আদর্শের জন্য স্বীয় স্বদেশ ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভবিষ্যতের অজানা অন্ধকারে অগ্রসর হ'তে পশ্চাদপদ হন নি।

শ্রীমতী রায়ের বয়স এখন মাত্র বাইশ বছর। নিউ ইয়র্কের এক কলেজে যখন তিনি বি-এ পড়তেন' তখন এক পার্টিতে রায়ের সঙ্গে তাঁর ও তাঁর দুই বড় বোনের পরিচয় হয়। শ্রীযুক্ত রায়ের উন্নত চিন্তা ধারা ও অন্ধদের জন্য তাঁর জীবনের সঙ্কল্প শ্রীমতী ইভলীনকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে। ইভলীনের দরদী হৃদয় ও মহৎ মনের পরিচয়ে রায়ও মুগ্ধ হন। কিন্তু প্রধানতঃ রায়ের জীবনের সাধনায় সাথী ও সহযোগী হবার আগ্রহেই ইভলীন রায়কে বিবাহ করার সঙ্কল্প করেন। ভালবাসা ও আদর্শের জন্য তাঁর এই অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার সহজ ভাবে গ্রহণ করা প্রথমে রায়ের পক্ষেও কঠিন হয়েছিল। শুধু তাঁর পিতামাতা ও বন্ধুবান্ধবীরাই নয়, তিনিও তাঁকে এই সঙ্কল্প থেকে নিরস্ত করতে কম চেষ্টা করেন নি। কিন্তু কারও যুক্তি-উপদেশ তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। অগত্যা তাঁর পিতামাতা এই বিবাহে রাজী হন এবং নিউ ইয়র্কে বিবাহ হয়।

শ্রীমতী রায়ের সরল ও সুন্দর ব্যবহার, মধুর প্রকৃতি ও অকপট আতিথেয়তায় মুগ্ধ হ'তে হয়। সত্যই তিনি রায়ের যোগ্য জীবনসঙ্গিনী—এক ধারে গৃহিণী, সচিব, সখী ও সহকর্ম্মী। রায়ের সাধনা ও কৃতিত্বের মূলে তাঁর প্রেরণা ও দান অসামান্য ব'লেই গণ্য হবে। এ যুগের তরুণী যে প্রয়োজন হ'লে ভালবাসা ও আদর্শের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করতে পারে, শ্রীমতী ইভলীন তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ! রায় দম্পতীর জীবনের সাধনা সফল হউক—এই কামনা করি।

কবি রাখালদাস

শ্রীকালীপদ ঘটক

পশ্চিম বঙ্গের জনৈক অখ্যাত কবির কতকগুলি মূল্যবান্ রচনা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। কবির নাম রাখালদাস মুখোপাধ্যায়। আধুনিক সাহিত্য-সমাজে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও অনাবিল সাহিত্যচর্চ্চার মধ্য দিয়াই তাঁহার সারাজীবন অতিবাহিত হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের নীরব পূজারী অখ্যাতনামা এই সাধক-কবির রচনাবলীর সহিত যাঁহার পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটিয়াছে, তিনিই কবির অসাধারণ প্রতিভার কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাতগাছিয়া থানার অধীন কাষ্ঠকুড়ুম্বা নামক ক্ষুদ্র এক পল্লীগ্রামে রামশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ নামক জনৈক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশে কবি

রাখালদাসের জন্ম হয়। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় পদ্মাপারস্থিত পুটিয়ার রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১৫৮৫ শকাব্দ হইতে ১৬০২ শকাব্দের মধ্যে তিনি কতকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করেন। রামশঙ্কর বিদ্যাগীশ ছিলেন রামনারায়ণের প্রপৌত্র, রামভদ্রের পৌত্র ও রামকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। রামশঙ্কর বিদ্যাবাগীশের তিন পুত্র,—রামকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ ও রামমোহন তর্কালঙ্কার। রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ কলিকাতার শোভাবাজারস্থ রাজবাটীর সভাপণ্ডিত ছিলেন। সুপণ্ডিত বলিয়া ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের বিশেষ খ্যাতি ছিল। মুখে মুখে তিনি চমৎকার কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার দুই-একটি কবিতা আজিও লোকের মুখে মুখে প্রচারিত আছে। এক দিন তিনি বর্ষাকালে বাটী হইতে কলিকাতা যাত্রামানসে রওনা হইয়া দামোদরের প্রবল বন্যা দর্শনে জাবুই গ্রামের নিকট হইতে পুনরায় বাটী ফিরিয়া আসেন। তাঁহার পত্নী দয়াময়ী তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মুখে মুখে তিনি দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে কবিতা রচনা করিয়া দয়াময়ীর প্রশ্নের উত্তর দেন :—

বিষম বানের রঙ্গ জাবুই হইল ভঙ্গ
যত লোক যেতে করে মানা।
দয়ার মানস পুরি দয়া করি দেবহরি
দেবদহে কেটে দিল হানা।

পারাজের নিকট দেবদহ নামে দামোদরের একটি দ' আছে।

রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশের জ্যেষ্ঠ পুত্র সীতারাম মুখোপাধ্যায় দাশরথি রায়ের সমসাময়িক উৎকৃষ্ট একজন পাঁচালি-লেখক ছিলেন। সীতারামের নিজস্ব একটি পাঁচালির দল ছিল। মধ্যে মধ্যে দাশরথির দলের সহিত তাঁহার দলের পাঁচালিগানের প্রতিযোগিতা হইত। দাশরথি অপেক্ষা তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। দুর্গাসুরের যুদ্ধ, সীতাহরণ, ধ্রুবচরিত্র, দানবীর প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ সীতারাম মুখোপাধ্যায়ের রচিত। সীতারামের রচনার নমুনা :—

"কে বলে উজ্জ্বল চন্দ্র বিভাবসু
হাস্য আস্য বামার হেরি বুঝি আশু,
অরুণ চন্দ্রাংশু তরুণ সুধাংশু
শরণ লয়েছে শ্রীপাদপদ্মে।"

অন্যত্র মালঝাঁপ ছন্দে :—

"রণে ধায় দেবতায় ভয় পায় দেখিয়ে,
রণস্থল টলমল দৈত্যবল কাঁপিয়ে।
দেয় লম্ফ ভূমিকম্প রণঝম্প দগড়ে,
পরিরম্ভ করি দম্ভ মেরুস্তম্ভ ঝগড়ে।"—(দুর্গাসুরের যুদ্ধ)

সীতারামের কনিষ্ঠ খুল্লতাত রামমোহন তর্কালঙ্কারের তিন পুত্র,—রামলোচন, রাজীবলোচন ও শ্রীনাথ। জ্যেষ্ঠ রামলোচনের তিন পুত্র,—রামনাথ, বৈকুণ্ঠ ও নবীনচন্দ্র। কনিষ্ঠ নবীনচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রই বর্ত্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত কবি রাখালদাস মুখোপাধ্যায়। কাষ্ঠকুড়ুম্বা নামক যে ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে রাখালদাস জন্মগ্রহণ করেন, সেই অঞ্চলেই কাশীরাম দাস, দাশরথি রায়, সাধক কমলাকান্ত প্রমুখ স্বনামধন্য কবিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কবি রাখালদাস তাঁহার গর্ভধারিণী সৌদামিনী দেবীর অষ্টম গর্ভের সন্তান। শৈশবে তিনি বিদ্যাভ্যাস করিবার বিশেষ কোন সুযোগ পান নাই। কিন্তু ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় প্রখর ছিল। বহু দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া রাখালদাস মন্তেশ্বর উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে প্রাথমিক পাঠ শেষ করেন ও মাসিক তিন টাকা বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তির এই টাকা তিনটির বিনিময়ে মধ্য-ইংরেজী অধ্যয়নকালে কোনরূপে তাঁহার আহার জুটিত। কুচুট মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে তিনি মাইনর পরীক্ষা দিয়া মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

উচ্চপ্রাথমিক পাঠকালে বালক রাখালদাস কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও হাতেমতাই, গোলেবকাওলী প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার মনে কাব্যাদি রচনা করিবার আগ্রহ জন্মে। তের-চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি একটি গ্রাম্য উপকথা অবলম্বনে 'স্বর্ণবতী কাব্য,' হাতেমতাই অবলম্বনে 'চন্দ্রাবতী কাব্য,' ও সত্যনারায়ণের ব্রতকথা শুনিয়া 'সত্যনারায়ণের পাঁচালি' রচনা করেন। সে বয়সের রচনার নমুনা প্রদত্ত হইল। 'চন্দ্রাবতী' কাব্যে চন্দ্রাবতী এক স্থানে স্বামীর জন্য আক্ষেপ করিয়া বলিতেছে :—

"কান্তার প্রমোদ পূর্ণ কান্ত সহকারে
কান্তার প্রমোদ পূর্ণ কান্ত সহকারে।
একান্তারে একান্তারে যদি কান্ত দেখিবারে
পায় তবে একান্তার কান্তি কত হয়
কান্ত বিনা একান্তার কান্তি কিছু নয়।"

এই সময় রাখালদাস গীতার বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া দর্শনশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং কয়েকটি ইংরেজী কবিতার বঙ্গানুবাদ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতায় সিটি কলেজিয়েট স্কুলে গিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। একান্ত অসহায় ও অভিভাবকহীন অবস্থায় কলিকাতার ন্যায় নূতন স্থানে একাকী তাঁহার বহুকষ্টে দিন কাটিতে থাকে। যৎসামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই সময়ে তিনি ফুলকুমারী নাম্নী এক ক্ষত্রিয় বালিকাকে প্রাইভেট পড়াইতে আরম্ভ করেন। রাখালদাসের সমগ্র ছাত্রজীবন নানারূপ দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল।

এক দিন তিনি কলিকাতায় পয়সার অভাবে সমস্ত দিন উপবাসে কাটাইয়াছিলেন। সেই দিন গঙ্গার ঘাটে বসিয়া নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি তিনি রচনা করেন :—

"ভাবিতে কি আছে সংসারে, বুঝাই তোমারে।
দিবানিশি ভাবছে যে জন ফলাফল শুধাও তারে,
তুমি ভাবিলে কি হবে বল
যেজন ভাবতে জানে তারে বল,
তোমার সম্বল কেবল কর্ম্মফল ছায়ার মত সঙ্গে ফেরে।"

* * *

ভাবুক রাখালদাস অসীম ধৈর্য্যসহকারে উপরিউক্ত গানখানি সেদিন রচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু 'দিবানিশি ভাবছে যেজন' একমাত্র তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া 'ফলাফল' পরীক্ষা করিবার মত বয়স তখনও তাঁহার হয় নাই। ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া সেই দিনই সন্ধ্যার পর পুরাতন পুস্তকের দোকানে একখানা পুস্তক বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে ক্ষুন্নিবারণ করিতে হইয়াছিল।

রাখালদাসের মনে ছেলেবেলা হইতেই জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা খুব প্রবল ছিল। তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি বঙ্গবাসী হইতে প্রকাশিত কপিলের সাংখ্যদর্শন, চরক-সংহিতা, মহানির্ব্বাণতন্ত্র, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ, ভূধর চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত পঞ্চযোগ, পাতঞ্জলদর্শন, অষ্টাবক্রসংহিতা প্রভৃতি পুস্তকগুলি পাঠ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি 'রামাশ্বমেধ', 'সৌরভীর সংসারমায়া দর্শন' প্রভৃতি নাটক এবং 'ললিতপ্রভা' ও 'অংশুমতী' নামক দুইখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ঘেরণ্ডসংহিতা-পাঠে হঠযোগ সম্বন্ধে তাঁহার সবিশেষ আগ্রহ জন্মে। দুই-একটি হঠযোগের ক্রিয়াও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

এণ্ট্রান্সের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে রাখালদাস বহু কবিতা ও কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করেন। এই সময় বাঁকুড়া জেলার পুরুনিয়া গ্রাম নিবাসী ৺প্রাণবল্লভ গোস্বামীর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী যোগেন্দ্রবালা দেবীর সহিত রাখালদাসের বিবাহ হয়।

প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাখালদাস রিপন কলেজে ভর্ত্তি হন। এই সময় বাঙ্গালী বীর দুর্গাদাসের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহার নিকট কয়েকটি তাসের খেলা দেখিয়া রাখালদাসের মনে যাদুবিদ্যা শিখিবার প্রবল আগ্রহ জন্মে। বিদেশ হইতে কতকগুলি পুস্তক আনাইয়া রাখালদাস যাদুবিদ্যা অভ্যাস করিতে থাকেন। পরে তিনি একজন শক্তিমান যাদুকর বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহার সবিশেষ আগ্রহ ছিল। রামবাগানের এক জ্যোতিষীর নিকট তিনি জ্যোতিষ শিক্ষা করেন।

রাখালদাস কলিকাতার গোরাচাঁদ দাসের বাটীতে থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। গোরাচাঁদবাবুর সহিত ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পরিদর্শন করিয়া তিনি 'ভারততীর্থকাব্য' নামক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি আমরা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি।

অর্থাভাববশতঃ রাখালদাসকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হয়। বর্দ্ধমান অবৈতনিক রাজকলেজ হইতে তিনি এফ-এ পাস করেন। এফ-এ পাস করার পর তিনি রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও ঋতুসংহারের বাংলা পদ্যানুবাদ শেষ করেন। পরে তিনি আভঙ্গ এক ব্রাহ্মণ কবিরাজের নিকট কবিরাজি শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিছু কাল কবিরাজি করিবার পর রাখালদাস ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানীর ট্রেনিং স্কুল হইতে টেলিগ্রাফ ও ট্রাফিক পাস করিয়া সহকারী ষ্টেশন-মাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হন। মানকরে অবস্থানকালে তিনি 'ভদ্রায়ুপাখ্যান' ও 'গৌরী' নাটক, ভগবদ্গীতার পদ্যানুবাদ ও 'বাবুর বাজার,' 'এক্স নম্বর ওয়ান' ও 'পাড়াগাঁয়ের গুপ্তকথা' নামক কয়েকখানি প্রহসন রচনা করেন। 'গৌরী' নাটকের কিয়দংশ 'উমা-মিলন' নামে সোনামুখী বিষ্ণুপুরের রামেশ্বর শর্ম্মার দলে কিছু দিন অভিনীত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বেই রাখালদাস একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি বাঁয়া-তবলা ও পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রেও বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন এবং একজন উৎকৃষ্ট বাদক বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত 'বৈষ্ণবসন্দর্ভ' নামক মাসিক পত্রিকায় রাখালদাসের কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয় এবং কয়েকখানি সাময়িক পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসা লাভ করে। ইহার কিছু দিন পর কলিকাতার গোরাচাঁদ দাস মহাশয় 'বঙ্গভূমি' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। রাখালদাস গোরাচাঁদ বাবুর অনুরোধে রেলওয়ে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া 'বঙ্গভূমি'র কার্য্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'বঙ্গভূমি'র সম্পাদক ছিলেন। রাখালদাস কার্য্যাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও সম্পাদন বিভাগেও তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত। ক্ষীরোদবাবুর পর 'রাজস্থানে'র বঙ্গানুবাদক যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৎপরে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ মহাশয় 'বঙ্গভূমি'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সময় 'ভারতউদ্ধার', 'বাঙালী চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ও বঙ্গবাসীর 'পঞ্চানন্দ'



কবি রাখালদাস



কবি রাখালদাসের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা যোগেন্দ্রবালা দেবী

লেখক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পূর্ব্ববঙ্গের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের সহিত রাখালদাসের আলাপ-পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। সম্পাদক পাঁচকড়িবাবু কয়েক মাস পরে বঙ্গভূমি কার্য্যালয় পরিত্যাগ করেন এবং তাহার পর রাখালদাস বঙ্গভূমির সম্পাদক নিযুক্ত হন। দেড় বৎসর কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত তিনি বঙ্গভূমি সম্পাদন ও পরিচালনা করিয়াছিলেন। পরে বিশেষ কোন কারণ-বশতঃ 'বঙ্গভূমি' পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় তিনি রিলিভিং ষ্টেশন-মাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। চুঁচুড়ার বাসাবাটীতে রাখালদাসের পাঁচ বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীমান্ রামকৃষ্ণের মৃত্যু ঘটে। রাখালদাস শোকাতিসারে আক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং রেলওয়ে চাকরি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রসুলপুরে কবিরাজি ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

স্বদেশী যুগের প্রারম্ভে রাখালদাস মোবারকপুর হইতে বয়নবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়া রসুলপুরে ছয়খানি ফ্লাইসাট্‌ল তাঁত বসাইয়াছিলেন। নিজ হস্তে প্রস্তুত ধুতি ও চাদর পরিধান করিয়া কলিকাতার মল্লিক-বাড়ীতে 'পল্লীসমিতি'র অধিবেশনে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন।

রসুলপুরে অবস্থানকালে রাখালদাস কতকগুলি কবিতা, স্বদেশী সঙ্গীত ও 'বৈশালিনী' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় রসুলপুরে এক বিরাট্ জনসভায় রাখালদাসের একটি আট শত লাইনের স্বদেশী কবিতা পঠিত হইয়াছিল। এই সময় রাখালদাসের জীবনে আরও দুই-একটি দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁহার পরম স্নেহভাজন একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিতপ্রবর গোপালদাস মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার কয়েক দিন পরেই রাখালদাসের সাত বৎসর বয়স্ক অপর এক পুত্র শ্রীমান্ রামপ্রসাদের মৃত্যু ঘটে। ইহার কিছু দিন পরে রাখালদাস পুনরায় রেলওয়ে চাকরি গ্রহণ করেন। কিছুকাল বিভিন্ন স্থানে কার্য্য করার পর অবশেষে তিনি রাণীগঞ্জে স্থায়ী ভাবে সহকারী ষ্টেশন-মাষ্টারের কার্য্য করিতে থাকেন। এই সময় তিনি 'বৈশালিনী কাব্য' ও 'মদালসা কাব্য' রচনা করেন। রাখালদাসের শেষ পুত্র শ্রীমান্ শিবরাম মুখোপাধ্যায় এই সময় চাকুরি-জীবনের প্রথম ভাগেই কিছুকাল জীর্ণজ্বরে ভুগিয়া ও অবশেষে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া রাণীগঞ্জের বাসাবাটীতে পরলোকগমন করে। পুত্রশোকাতুর রাখালদাসের এই সময়কার মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। শিবরামের মৃত্যুর পর তিনি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশের বাটীতে গিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময় হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভাঙিয়া পড়ে। ইহার পরও তিনি 'আমি ও আমার', 'বিশ্ববাণী', 'শ্রমিকবাণী', 'স্বরাজ' ও 'দৈববাণী' নামক কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ, বহুবিধ সঙ্গীত ও ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি 'কমলকুমারী', 'বনবালা', 'রুমিলিয়া', 'গুপ্তহীরক', 'সরোজিনী' ও 'ছোট-

ঠানদির দপ্তর' নামক কয়েকখানি উপন্যাস এবং 'জ্ঞানা পাগলার গুপ্তকথা', 'চিদানন্দ স্বামীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'হিন্দুশাস্ত্র তত্ত্ব' প্রভৃতি গদ্য গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

পুত্র শিবরামের মৃত্যুর পর রাখালদাস দেশের বাটীতে গিয়া বাস করিতে থাকেন। গ্রামে তিনি একটি বাউল-সম্প্রদায় ও পাঁচালির দল গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বরচিত ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি বাউল-সম্প্রদায়ে গীত হইত। তাঁহার 'ভক্ত ও ভগবান', 'গোষ্ঠলীলা', 'বৃন্দাবনলীলা' প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি এই সময়ের রচনা।

বর্ত্তমানে রাখালদাস জরাগ্রস্ত অশীতিপর বৃদ্ধ। দৃষ্টিশক্তি তাঁহার একেবারে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির এ পর্য্যন্ত কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। রাখালদাসের সহধর্মিণী আজিও জীবিতা।

বঙ্গদেশে জ্ঞানী গুণী কবি দার্শনিক ও সুপণ্ডিতের অভাব নাই। কিন্তু একাধারে এতগুলি সদ্‌গুণের সমাবেশ একমাত্র আমরা রাখালদাসের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাধর ব্যক্তি খুঁজিলে হয়ত আরও অনেক পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা যে খুব বেশী হইবে না একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

কবি রাখালদাসের রচনাবলীর সংখ্যা খুব অল্প নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার বহু রচনা যত্নের অভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা বিশেষ চেষ্টায় তাঁহার কতকগুলি মূল্যবান রচনা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। কবির কয়েকখানি ভক্তিরসাত্মক গান এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

বৃন্দাবনরহস্য

মহামধুর ভাবময়ী মাধুরি মধুমণ্ডলে
রাসরসে রসিক রসরাজ রমণী দলে।
মহানন্দ ঘনবন্দ্য বৃন্দাবন মধুময়,
গোপকুল গোকুল গোপবালা বিমল বিধুময়।
হ্লাদিনী হেম হার চিত ব্রজধনী ধ্বনি ধ্বনিত
কুঞ্জপিককুলকূজিত সুশোভিত শিখিনী দলে।
হ্লাদ করি সাধ করি আচরি চির গোলক রীতি,
সাংখ্যযোগে সংখ্যালীলা বিশ্বে পুরুষ প্রকৃতি।
দ্বৈতভাবে দামোদর ব্রজমোহিনী মনোহর,
মধুরতম মনোরম স্বভাব এ ভূমণ্ডলে।
কুণ্ঠিত শ্রীকণ্ঠ সে বৈকুণ্ঠভাব প্রকাশিতে,
পদকমল অলিদল সুনির্ম্মল ভকত চিত্তে;
নিষ্ঠ জেনে হয়ে হৃষ্ট ইষ্ট ভেবে খায় উচ্ছিষ্ট,
ধরি বাঁশরী বামে কিশোরী বিহরি হরি যমুনা জলে।
বিচরে ব্রজরাখাল বেশে দ্বিজ রাখালের আশা মনে,
নৃত্য করি নিত্য হেরি নিত্যলীলা নিধুবনে।
নিত্য ভবানিত্য রত ভৃত্য সে রিপুসদন্দ,
না ভাবে ভ্রমে ভ্রান্ত রাধাকান্ত পদকমল।

আধ্যাত্মিক সঙ্গীত রচনায় দ্বিজ রাখালদাসের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার বাউল-গানে। ভক্ত ও ভগবানের কথোপকথন-ছলে তিনি কয়েকখানি বাউল-গানের অবতারণা করিয়াছেন। সংক্ষেপে তার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

ভক্ত

লুকোচুরি খেলতে হরি পারবে না।
তোমার জারিজুরি ভারিভুরি চাতুরি আর চলবে না।
যে জন পুণ্যপথে যায় তুমি ধরতে পার তায়
পাপের ঝোপে ঢুকতে তোমার সাহস না কুলায়;
সে যে ধরতে গেলে পালিয়ে যাবে পিছু ফিরে চাইবে না।
তুমি বেড়াবে খুঁজে' আমি থাকবো চোখ বুজে,
পাপীকে ধরপাকড় করা কাজ বুঝে সুজে;
পাপের মুগুর মারলে পায়ে পা কি তোমার ভাঙবে না?
তুমি মার যেই উঁকি আমি আঁধারে ঢুকি,
জ্বাললে আলো নিবিয়ে দিতে দূর হতে ফুঁকি,
তুমি আবার জ্বাল আবার নিভাই ফাঁকিতে ত জিতবে না।

* * *

ভগবান

ধরবো কি ধরেই রেখেছি, চুরি শিখেছি।
তোমায় বদ্ধ ক'রে মায়াজালে আপনি নিজে লুকিয়েছি।
এ যে শক্ত বেড়াজাল এর পায় না কেউ নাগাল,
এতে বদ্ধ আছে কোটী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাকাল;
আবার একটানে নিই গুটিয়ে সকল (আমি) টানাটানি খেলতেছি।

* * *

ঐ যে দূর্ব্বাঘাসের রঙ তাতে আমিই সাজি সঙ,
বলবে তুমি বিরাট হয়ে আবার এ কি ঢং;
(আবার) বটের বীজে গাছটি গজায় আমিই তাতে গজিয়েছি।

* * *

ভ

জাল নিজেই বুনেছ, নাকি বুনতে কোথাও শিখেছ।
তুমি কেমন জেলে নিজের ছেলে নিজের জালে বেঁধেছ।
ঐ যে ক্ষীরোদ সাগরে ঘুম দেয় মজা ক'রে,
সাপের মাথায় বটের পাতায় বিছানা ক'রে;
তার সেবায় দাসী এক রূপসী তার কাছে ত হেরেছ।

* * *

যদি হারবে না—বল তবে লুকিয়ে থাকবে না।
এবার ধরতে গেলে দিবে ধরা আর কখনো ছলবে না।
যখন কোকিলা ডাকে মনে পড়ে তোমাকে,
ফুল ফোটে তায় তোমার মধু মাখানো থাকে;
অমন আড়াল থেকে মারলে উঁকি এ পাষাণ হৃদয় গলবে না।
ঐ যে নীল আকাশের গায় হীরের ফুল ফুটেছে হায়,
ভাবি তোমার ভালের অলকা তিলকা শোভা পায়;
তোমার সবটি দেখাও অমন আধাআধি সিকিতে প্রাণ গলবে না।

* *

ভগবান

আমার সেই ত মায়াজাল চিরকাল বদ্ধ তুমি তায়।
ও তার রূপের ছটায় প্রেমের ঘটায় এড়ায় কে কোথায়।

ডুবে যে জন রূপসায়রে সেই ত জালে জড়িয়ে মরে,
সেই রূপের ভিতর খুঁজলে মোরে, দেখতে পায় আমায়।

* * *

রূপের ভিতর আমার বাসা, রূপেই তোমার যাওয়া আসা
তাইতে ভবের যাওয়া আসা কভু না ফুরায়।

* * *

ভক্ত

এই যে দু'টি তুমি আমি এ বদনামি সেই রমণীর অভিসারে।
তুমি তার রূপে মজে' তারে ভজে' আনলে আমায় এ সংসারে।

* * *

ভগবান

ভুলে' পাঁচ ভূতের খেলায় রূপের নেশায়
ত্রিতাপ জ্বালায় মরছো জ্বলে।

* * *

জগতে পুরুষ নারী ভেদ বিচারি
কামনায় উন্মত্ত হ'লে,
অভেদজ্ঞান হবে যখন দেখবে তখন
তুমি আমি এক মহলে।

* * *

কহে দীন দ্বিজ রাখাল, ব্রজ রাখাল
ব্রজধামে তাই কি হ'লে,
তুমি আমি সমান দু'টি ছুটাছুটি
তবে কেন ভূমণ্ডলে।

ভক্তকবি রাখালদাসের বাউল-গানগুলির মূলমন্ত্র ভগবানে আত্মসমর্পণ, একান্ত নিবিড়ভাবে সেই পরম পুরুষের সহিত সখ্য স্থাপনের জন্য রসবিহ্বল হৃদয়ের সনির্ব্বন্ধ কাকুতি। কবির মদালসা নাটকের দুইখানি গান উদ্ধৃত করিলাম।

কর্ম্মদেবিগণের উক্তি।

বেড়াই অসীম শূন্যে ভাসিয়া।
নীলাকাশ গায় প্রথম প্রভাত তপন কিরণ মাখিয়া।
প্রথম প্রণব ছন্দে সাম্ ঝঙ্কার ভাসে জাগিয়া,
প্রথমা যামিনী চাঁদের চাঁদিনী বসনে সোহাগে সাজিয়া;
বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে সবে আমরা রঙ্গিণী,
কামনা সাধনা দুইটি তাহে প্রধানা সঙ্গিনী,
বিশ্বভরা বীণার তারে আমরা রাগিণী,—
যবে যাহা ঘটে এই বিশ্ব ব্যোমপটে রাখি সে সকলি আঁকিয়া।
তুমি যা করেছ-লিখে রেখেছি, মোরা গোপনে সকলি দেখেছি,
দিবা ঋতু মাস বরষ প্রহর রেখেছি হিসাব তুলিয়া।
দৃষ্টিতে হয় সৃষ্টি মোদের বার বার ভবে যাওয়া আসা,
সুখ দুখ নিয়ে কাঁদা হাসা আর অকূল এ ভবস্রোতে ভাসা,
পলকে প্রলয় করি সমুদয় থাকি অনন্তে মিশিয়া।
দু'টি হাত মোদের একটি নিয়তি একটি পুরুষকার,
যেই যেটি ধরে সেই ভাবে তারে দিই গো পুরস্কার,
এই নাটকের আমরা নটী তিনটি সাজে কোটী
কিন্তু মিলেমিশে একটি—একটি—একটি,
পার যদি লও চিনিয়া।

কপিলের সাংখ্যদর্শন মতে জীবের কর্ম্মফল অনন্ত। জগতের বৈষম্য সম্বন্ধে যখন বৈদান্তিকগণ কপিলকে প্রশ্ন করেন আদি সৃষ্টিতে কর্মফল থাকে না, বৈষম্য তবে কোথা হইতে আসে? তদুত্তরে কপিল বলেন, সৃষ্টির আদি নাই, অন্ত নাই, জ্ঞানপ্রবাহ ও অজ্ঞানপ্রবাহ দুইটিই অনন্ত। লয়াবস্থায় কর্মফল অনন্তশূন্যে থাকে, দিক্‌কাল ইহার পরিমাপক। এই কর্মফলের অনন্তত্ব লইয়াই উপরিউক্ত সঙ্গীতটি রচিত হইয়াছে।

জগতের সহিত কর্মের সম্বন্ধ বিচারের জন্য রূপকে কর্মদেবীর আর একখানি গান কবি রচনা করিয়াছেন।

কর্মদেবীর উক্তি।

আমার সুখ দুখ দুটি কর।
সবে সেই দুটি করে কোলে করি সমাদরে আমার কেহ নহে আত্মপর।
দুখের সময় সবে ভেবোরে অন্তরে
রবে না সেদিন সুখ আসবে পরে,
সুখের সময় যেন মনে রয় দুখ তোমার নহে পর
দুটি পদ আমার সুমতি কুমতি
তাদেরি আশ্রয়ে ত্রিভুবনে গতি,
যে পূজে সুমতি সুখ তাহার প্রতি কুমতি পূজিলে দুখ।
জ্ঞান কর্ম নামে দুটি আমার আঁখি
দুটি চোখে আমি সবে দৃষ্টি রাখি,
যে চায় আমার পানে সেই ত সকল জানে আমারি এই চরাচর।
কাম মহারিপু দুর্জ্জয় ভুবনে
উরুজঙ্ঘা আমার কুমতি চরণে,
পদাঙ্গুলিচয় ক্রোধাদি-পাঁচ জনে, প্রবৃত্তি নিতম্ব তাহে;
নিবৃত্তি নিতম্ব সুমতি চরণে
উরুজঙ্ঘা দয়া জানে সর্ব্বজনে,
শম দম আদি অঙ্গুলি গমনে, কামনার কটি সুন্দর।
আসা যাওয়া ভবে আমারি উদর
সাধনা তাহাতে হৃদয় সুন্দর,
ধর্মাধর্ম নামে দুটি পয়োধর সুধা বিষ তাহে ক্ষরে,—
অষ্টসিদ্ধি সুধা ধর্মপয়োধরে,
নরক যন্ত্রণা ধরে সে অপরে,
প্রেমরূপী কণ্ঠ আনন্দ অধরে কে ধরে তাহে দুষ্কর।
মায়াবাসে আমার আবৃত শরীর,
অজ্ঞান কেশে দেখ সুশোভিত শির,
আশক্তি শ্রবণে শুনি এ ভুবনে মহামুক্তি আমার প্রাণ।
মম প্রাণে প্রাণ যে মিশাতে পারে
সে পারে সংসারে মোরে নাশিবারে,
তারে ভালবাসি হই আমি তার দাসী সেই জন মনোহর।

নিম্নে কবির বিশ্ববাণী কাব্যের কয়েক লাইন উদ্ধৃত করা হইল:—

"অমানিশা দ্বিপ্রহরে চাহি আকাশের পানে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি হেরিয়া আকুল প্রাণে,

জ্ঞানী যবে ফিরে আসে আত্মগর্ব্ব চূর্ণ করি,
শিলাখণ্ড লয়ে বলে এ মোর প্রাণের হরি।
নেতি নেতি করি কেহ অনন্তের পথে ধায়,
সন্ধান না পেয়ে তার ফিরে আসে পুনরায়,
দ্বিভুজ মুরলীধারী সান্তে প্রাণ শান্ত করি
বলে বৃথা অন্বেষণ এ মোর প্রাণের হরি।"

* * *

লক্ষ্মী-সরস্বতীর বন্দনায় এক স্থানে কবি লিখিয়াছেন :—

"বন্দনা করিতে অগ্রে বীণাপাণি পায়,
বিমাতা কমলা মোর ক্রোধে চলে যায়।
লক্ষ্মীরে করিতে তুষ্ট রুষ্ট হন বাণী,
গদ্যে পদ্যে কিছুতেই না যোগায় বাণী।
কার পূজা অগ্রে করি এ বিষম দায়,
সপত্নী বিদ্বেষে কেহ কাহারে না চায়।
এসো মাগো দুই জনে এক মূর্ত্তি ধরি,
আনন্দে পদারবিন্দ শিরোপরে ধরি।"

রাখালদাসের স্বদেশী কবিতার নমুনা :—

"এ কি হেরি আজ বঙ্গদেশ ভরি, বিদেশী বসন পরিত্যাগ করি
বিলাস বাসনা সবে পরিহরি মায়ের চরণে সঁপিছে প্রাণ।

* * *

বাণিজ্যে কমলা শাস্ত্রীয় বচন, দেখ সাক্ষী তার জুড়িয়া ভুবন,
জার্ম্মাণী জাপান ফরাসী ব্রিটন করেছে বাণিজ্যে উন্নতি কত।
আমেরিকা রুষ যেদিকে চাহিবে, বাণিজ্য-গৌরব সেদিকে হেরিবে,
হেন জাতি ভবে কোথা না দেখিবে পরমুখাপেক্ষী বাঙ্গালী মত।

* * *

উক্ত কবিতার এক স্থানে কবি হিন্দু মুসলমান ও দেশীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

"ভ্রাতঃ মুসলমান, হে ভ্রাতঃ খ্রীষ্টান, সকলেই মোরা ভারতসন্তান,
নিজ নিজ ধর্ম্ম সবার সমান ভ্রাতৃভাব তাহে ঘুচিবে কেন।
মিলিয়া সকলে এস কর্ম্ম করি, অমিলিত ভাবে স্বধর্ম্ম আচরি,
নিজ নিজ ধর্ম্মে যদি হে বিচরি তবে কেন দুঃখ মোদের হেন।"

দ্বিজ রাখালদাস শুধু কাব্যদর্শন ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীত রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার ব্যঙ্গরসাত্মক রচনাগুলিও চমৎকার। তথাকথিত কুলগর্ব্বী ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে তিনি ডি, এল, রায়ের অনুকরণে লিখিতেছেন :—

"ব্রাহ্মণ আমি পৈতের গোছা মোটা আমাদের পুচ্ছ,
আর আছে টিকি সেই চুটি নেড়ে ধরাটাকে দেখি তুচ্ছ।
আতপ চাউল পক্ব কদলী ভগবানে দিই যবে গো,
তবে সে ত বাঁচে নহে এত দিন তুলিত পটল কবে গো।

* * *

অর্থলিপ্সু ভণ্ড গুরুঠাকুর সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া কবি লিখিয়াছেন :—

(বাউল সুর)

আছে ব্যবসার রাজা গুরু সাজা বড়ই মজা পাই গো তাতে।
কাজটাতে সকল ফাঁকি রয় না বাকি নগদ চাকি হাতে হাতে।
থাকে যদি পায়ে ধুলো শিষ্যগুলো আদর করে নেয় মাথাতে,
চাই না আর কিছু পুঁজি, মাথা গুঁজি' সকলে উন্মত্ত তাতে।
কানে যখন ফুঁকি কিলিং ইলিং বিলিং শিষ্য বেটার মন মজাতে,
মনটা মোর পড়ে থাকে লুচির ঝাঁকে সন্দেশে কাপড়খানাতে।
না করি জাতের বিচার, সব করি পার কেবল টাকার অনুপাতে,
হোক সে শুঁড়ী হাড়ি চড়াই হাঁড়ি পেলেই হলো ভাতে ভাতে।
মূলধন তার নামাবলী, নামের থলি, মস্তকের তরমুজ বোঁটাতে,
গায়ে ছাপ মারবো যত শিষ্য তত পড়বে গো পায়ের তলাতে।
আছে আর এক মূলধন গৈরিক বসন কমণ্ডলু চিমটে হাতে,
রুদ্রাক্ষের মালা গলে শিষ্যদলে মজাই ম-কার সাধনাতে।
গুরুদের ভুঁড়ি মোটা, দালান কোঠা বানায় গো পরের পয়সাতে,
ব্যভিচার খাসা চলে, সে সব স্থলে কৃষ্ণ হে প্রভুর ইচ্ছাতে।
তান্ত্রিকের লতাসাধন বশীকরণ ব্যভিচারের চরম তাতে,
বৈষ্ণবের মানের গানে প্রাণটা টানে কুলবধূর মন মজাতে।
দিয়ে রাসের দোহাই যত বালাই উন্মত্ত সব রাসলীলাতে,
এক একটি অজাবতার, নাইকো বিচার সমন্ধের হায় কিছু তাতে।
আছে এক কর্ত্তাভজা বড়ই মজা বিধবাদের মন মজাতে,
সখী কিশোরী ভজা অধিক মজা দুইটি ম-কার আছে তাতে।
আর এক দল কুমারীদের সর্ব্বনাশের জাল পেতেছে সাধনাতে,
গীতায় সে জ্ঞানানন্দ, কি আনন্দ, ভৈরবীদের মন মজাতে।
মোহান্তের সেবাদাসী প্রেমের ফাঁসি পরিয়ে দেয় তাদের গলাতে,
ভয় কি তার মহোৎসবে দিলাম যবে কুড়ি ভরির হার গলাতে।
দেবদাসীর দিয়ে দোহাই পাণ্ডা গোঁসাই ভীষণ ব্যভিচারে মাতে,
কেদার বদরি যাবে দেখতে পাবে চন্দ্রনাথ কি কামাখ্যাতে।
যে দু'টি সংসারের সার কামিনী আর কাঞ্চন পাই যে ব্যবসাতে,
শিষ্যদের বই বা জুতো, খেলেও গুঁতো কিছু এসে যায় না তাতে।
বলি কেবল টাকা টাকা, সকল ফাঁকা, এই যে পুঁথি দেখছো হাতে,
ভক্তি কি সাধে করি, আহা মরি, পয়সা ইহার পাতে পাতে।
কহে দীন দ্বিজ রাখাল, হায় রে কপাল, সেবাদাসীর এঁটোপাতে,
পেট মোটা করে যারা গুরু তারা, গরুও ভাল তুলনাতে।

বাংলার পল্লীতে পল্লীতে দ্বিজ রাখালদাসের মত আরও বহু প্রতিভাধর গুপ্ত কবির রচনা সারা দেশে ছড়াইয়া আছে। এগুলি সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রচার করিতে পারিলে বাংলা-সাহিত্যের সত্যই কিছু উপকার হইতে পারে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

বিবিধ প্রসঙ্গ

১৯৪৩ সালের ১ নং অর্ডিনান্স

গবর্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া য়্যাক্টে অর্ডিনান্সের (ordinance) ক্ষমতা ছয় মাস বলবৎ থাকিবে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই আইনের সর্তানুযায়ী অর্ডিনান্স সপরিষদ বড়লাট কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। পরে পার্লামেণ্ট কর্তৃক সংশোধিত আইনের দ্বারা অর্ডিনান্সের কার্য্যকালের মেয়াদের সীমা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং স্বয়ং বড়লাটকে নিজের দায়িত্বে অর্ডিনান্স ঘোষণা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইহা সুস্পষ্ট যে, এই পরিবর্তনের ফলে বড়লাটের হস্তে অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। এই ক্ষমতা অর্পণের ফলেই ক্রমান্বয়ে নূতন নূতন অর্ডিনান্স জারী হইতেছে। জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য এই সমস্ত বিষয় ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ কর্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত এবং আইনপ্রণয়ন দ্বারা নির্দ্ধারিত করা কর্তব্য। এমন কি জরুরি অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া যদি ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, তাহা হইলে পরবর্তী অধিবেশনে কর্তৃপক্ষের ইহা আইনসভায় পেশ করা উচিত। কিন্তু তাহা না করিয়া আইনসভার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভাবেই উপেক্ষা করা হইয়াছে। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী অধিবেশনের জন্য শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এই সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। মিঃ পি. এন. সাপ্রু ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনের জন্য অর্ডিনান্স সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, যুদ্ধারম্ভের পর হইতে যে সকল অর্ডিনান্স জারী হইয়াছে ইহাদের প্রয়োগ-ক্ষমতার সীমা এবং ফৌজদারী আদালত সমূহের আপীলের স্থানহিসাবে হাইকোর্টের ক্ষমতার উপর ইহাদের প্রভাব বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করিতে হইবে। উপযুক্ত সংখ্যায় আইনজ্ঞ ও বিচারক এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ভারতীয় রাজনীতি বিজ্ঞান সম্মেলনের উদ্বোধন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুও গবর্মেণ্টের এই সকল অর্ডিনান্স ঘোষণার নীতি তীব্র ভাষায় সমালোচনা ও প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এনিমি এজেণ্টস অর্ডিনান্সের (১৯৪৩ সালের ১ নং অর্ডিনান্স) সর্তাবলী হইতে এই আইনের প্রয়োগ-সীমা যে কত ব্যাপক ও বিস্তৃত তাহা প্রমাণিত হয়। এই অর্ডিনান্সে শত্রুসাহায্যকারীদিগকে সাহায্য করিলে এবং সাহায্য করিবার মত কতকগুলি নির্দিষ্ট অপরাধমূলক কাজ করিলে বিচারের ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে। শত্রুসাহায্যকারীকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তি, কিংবা যদি কোন ব্যক্তি এমন কাজ করে, যাহা শত্রুর নৌ, স্থল ও বিমান কার্য্যের সাহায্য করিবে বা সাহায্য করিতে পারে অথবা মহামান্য সম্রাট্ বাহাদুরের নৌ, স্থল ও বিমান বিভাগের কর্মীদের কার্য্যের বিঘ্ন সৃষ্টি করে, বা জীবন বিপন্ন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে। সাধারণতঃ কোন আইন ঘোষণা করা হইলে উহা তাহার পরবর্তী কালে প্রয়োগ হয় কিন্তু এই অর্ডিনান্স পূর্ববর্তীকালের নির্দিষ্ট সময় হইতে অপরাধের জন্য প্রয়োগ করা হইবে। গত ইংরেজী ১৯৩৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর হইতে এই ধরণের সমস্ত অপরাধ-মূলক কার্য্যের জন্য এই বিধানের প্রয়োগ কার্য্যকরী হইবে।

কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত স্পেশাল জজগণ এই অর্ডিনান্সের সর্তানুযায়ী ব্রিটিশ ভারতের এলাকাধীন সমস্ত অপরাধের বিচার করিবেন। যাঁহারা সেসন্ জজ বা এ্যাসিট্যাণ্ট সেসন জজের কাজ অন্যূন দুই বৎসর করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই বিশেষ বিচারকের পদে নিয়োগ করা যাইতে পারিবে। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট শুনানীর যে কোন অবস্থায় মোকদ্দমাটিকে এক স্পেশাল জজের কোর্ট হইতে অন্য স্পেশাল জজের কোর্টে স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন। এমত অবস্থায় যে স্পেশাল জজের নিকট মোকদ্দমাটি স্থানান্তরিত হইবে, তিনি যদি না প্রয়োজনবোধ করেন, তাহা হইলে তিনি পুরাতন সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ নাও করিতে পারেন। তাহা ছাড়া শত্রুকে সাহায্য করার অপরাধে বা শত্রুসাহায্যকারীকে সাহায্য করার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্পেশাল জজের আদালতে বিচারকালীন ১৯৩৮ সালের কোড্ অফ ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওরের অন্তর্ভুক্ত আর কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইলে এই অর্ডিনান্সের সর্ত অনুযায়ী ঐ একই আদালতে উভয় অপরাধীর বিচার হইতে পারিবে। এই সকল স্পেশাল

জজ অপরাধীকে আইনের সর্তানুযায়ী যে-কোন দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবেন। বিচারকালীন যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে, অথবা স্পেশাল জজের মতে এমন কোন আইনগত বা বিশেষ কোন কারণপ্রসূত গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে অথবা যে-কোন কারণে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহাতে বিচারের কার্য্যাবলী বিশেষভাবে পরীক্ষিত ও পূর্ণবিবেচিত হওয়ার প্রয়োজন হইয়া পড়ে তাহা হইলে ব্রিটিশ ভারতের হাইকোর্টসমূহের বিচারকদের মধ্য হইতে কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত কোন বিচারক সমস্ত বিষয় বিবেচনা ও পরীক্ষা করিয়া যে রায় দিবেন তাহাতেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে। বিচারকের অনুমতি পাইলে অপরাধী নিজেকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিবার জন্য আইন-ব্যবসায়ী নিযুক্ত করিতে পারিবে। উক্ত আইনব্যবসায়ীর নাম কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের তালিকাভুক্ত থাকিতে হইবে অথবা তাহা কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

যদি কোন ব্যক্তির বিবৃতি ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক পূর্বে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুতে অথবা নিরুদ্দেশকালে অথবা ঐ ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত হইতে অক্ষম হইলে ঐ বিবৃতি সাক্ষ্যরূপে গৃহীত হইবে। নূতন অর্ডিনান্সের বলে নিযুক্ত স্পেশাল জজ বা রিভুয়িং জজ দ্বারা দণ্ডিত কোন দণ্ড বা আদেশের বিরুদ্ধে কোনরূপ আপীল চলিতে পারিবে না। যদি কোন ব্যক্তি কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের অনুমতি বা স্বীকৃতি না লইয়া এই অর্ডিনান্সের অন্তর্গত অপরাধীর সম্বন্ধে কোন ঘটনা বা সংবাদ প্রচার বা প্রকাশ করে, তাহা হইলে এই জরুরি আইনের বলে সেই ব্যক্তির জরিমানা অথবা দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা উভয় প্রকারেই দণ্ডিত হইতে পারে।

উক্ত কারণগুলি এই অর্ডিনান্সের প্রধান সর্ত। অন্যান্য আরও কতকগুলি সর্ত সমভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল। এই অর্ডিনান্স এমনই কঠোর, ইহার কতকগুলি সর্তের ভাষা এত অস্পষ্ট ও সংকোচ-প্রসারশীল, ইহার প্রয়োগক্ষমতা এতই বিস্তৃত ও প্রসর যে আমাদের মনে হয় কর্তৃপক্ষের এই অর্ডিনান্সকে কার্য্যকরী করিবার পূর্বে পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভায় প্রেরণ করা উচিত। বিশেষতঃ এই অর্ডিনান্সের যে সকল সর্ত হাইকোর্ট, ফেডারেল কোর্ট ও প্রিভিকাউন্সিলকে পুনর্বিচারের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে এবং অপরাধীর বিচারের সম্বন্ধে সংকোচকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছে, সেই সকল সর্ত আইনসভা কর্তৃক সংশোধিত হওয়া উচিত।

—

আমেরিকায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য

কিছু দিন হইতে আমেরিকায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে কিরূপ বিস্তৃত প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারকার্য্য চলিয়া আসিতেছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। আমেরিকায় ভারতের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্বন্ধে পরিচিত যে সকল প্রভাবশালী লেখক ও নেতা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই প্রচারকার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া আমেরিকা-বাসীদিগকে ব্রিটিশ প্রচারকার্য্যের স্বরূপ দেখাইয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ইহার প্রতিবিধান-কল্পে "ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পঞ্চাশটি তথ্য" (Fifty facts about India) নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া আমেরিকায় প্রচার করিতেছেন। ইহাতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সত্যের প্রতি অনুরাগ, রাজনীতিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার সম্পূর্ণ অভাব অনুভব করিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

আমেরিকাবাসীদিগকে ভারত-গবর্ন্মেণ্টের শাসন-প্রণালী, ভারতবাসীদের পরিচয়, ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা, এবং আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সহিত ভারতের সম্পর্ক অবগত করাইবার জন্য উক্ত পুস্তিকাটি রচিত হইয়াছে। আমেরিকায় ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের পক্ষ হইতে ব্রিটিশ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (British Information Services) কর্তৃক ইহা প্রকাশিত।

অসত্য অপেক্ষা অর্দ্ধ-সত্য (half-truths) যে কত অনিষ্টকর তাহা উক্ত পুস্তিকাতে বর্ণিত কতকগুলি তথ্য হইতে প্রমাণিত হয়। দায়িত্ব-সম্পন্ন ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ভারতে আমেরিকার সম্বন্ধে কিরূপ প্রচারকার্য্য চালাইতেছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা কয়েকটি তথ্য উদ্ধৃত করিলাম। একটি তথ্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

> ব্রিটিশ ভারতের প্রধান কর্মকর্তা বড়লাট। এগার জন ভারতীয় সভ্য এবং চারি জন ব্রিটিশ সভ্য লইয়া বড়লাটের কার্যনির্বাহক-পরিষদ (Viceroy's Executive Council) গঠিত। সামরিক দেশরক্ষা, শ্রম, বাণিজ্য, অসামরিক দেশরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজস্ব, আইন, ডাক ও বিমান, সংবাদ সরবরাহ, বিদেশে ভারতীয়দের সম্বন্ধে ও আইন-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির দায়িত্ব ভারতীয় সভ্যদের হস্তে ন্যস্ত। যুদ্ধ, অর্থ, হোম (আভ্যন্তরীণ ব্যাপার) ও সমর-কার্য্য পরিচালনার জন্য যানবাহনের এবং যাতায়াতের (War Transport) দায়িত্ব ব্রিটিশ সভ্যের উপর ন্যস্ত।

কার্য্যতঃ ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র এমনই ভাবে গঠিত,

বড়লাটের কার্য্য-নির্বাহক-পরিষদের কার্য্য এমনই ভাবে পরিচালিত হয়, এমনই ভাবে ভারতীয়গণকে তাহাদের কার্য্যের জন্য মনোনীত করা হয় যে ভারতে বড়লাট এবং লণ্ডনে ভারত-সচিবের অভিপ্রায় সকলের উপর কার্য্যকরী হয় এবং দেশপ্রেমিক ভারতীয় সভ্যের উদ্দেশ্য কদাচিৎ সফল হইয়া থাকে। জনসাধারণের সমালোচনা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কোন কোন ভারতীয় সদস্য এই সত্য ইতিপূর্বে প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের ক্ষমতার সীমার বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। কাউন্সিলের কোন কোন বিদায়-প্রাপ্ত সভ্য এই বিষয়ে অধিকতর স্বাধীন ভাবে নিজেদের অক্ষমতার বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। ব্রিটেন কিংবা অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশসমূহের মন্ত্রিমণ্ডলীর ন্যায় ভারতবর্ষে বড়লাটের কার্য্য-নির্বাহক-পরিষদ ব্যবস্থা-পরিষদের নিকট দায়িত্বসম্পন্ন নহে এবং যুক্তদায়িত্ব না থাকিলে যেমন কোন মন্ত্রিমণ্ডলীই প্রকৃতভাবে কার্য্যক্ষম হয় না, সেইরূপ ভারতে মন্ত্রিমণ্ডলীর কোন যুক্তদায়িত্ব নাই।

আর একটি তথ্য সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে যে,

> ইং ১৯৩৭ সাল হইতে ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলি স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিয়া আসিতেছে এবং এগারটি প্রদেশের প্রত্যেকটির আমেরিকা যুক্তরাজ্যের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলির মত প্রায় সমপরিমাণ ক্ষমতা আছে। প্রত্যেক প্রদেশে একজন করিয়া ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী আছেন। তিনি তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলী লইয়া অর্থ, আইন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং অনুরূপ ধরণের বিষয়গুলি পরিচালন ও পরিদর্শন করেন। উক্ত মন্ত্রিমণ্ডলী ভারতীয় নির্ব্বাচক মণ্ডলীর প্রতিনিধিরূপে ভারতীয় আইনসভার নিকট দায়ী।

এখনও যে প্রাদেশিক শাসনকার্য্য কেমন ভাবে চলিতেছে তাহা সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী আল্লাবক্সের পদচ্যুতি, বাংলার অর্থসচিব শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ, এবং বাংলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় ফজলুল হকের কয়েকটি বিবৃতি হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছে। যে সকল প্রদেশে এখনও মন্ত্রিগণের দ্বারা শাসনকার্য্য পরিচালিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে সেই সকল স্থানে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের রূপ কেমন অলীক, অপ্রকৃত ও অবাস্তব তাহা এই সকল হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশে সার্বভৌম গবর্ণর এবং স্থায়ী পদস্থ কর্মচারিগণই প্রকৃতপক্ষে স্বৈরাচারের সহিত শাসনকার্য্য করিয়া থাকেন। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর মতে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশই কোনও প্রকারেই দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে না। এমত অবস্থায়, ভারতীয় প্রদেশগুলির সহিত আমেরিকা যুক্ত-রাজ্যের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলির তুলনা করা সম্পূর্ণ ভুল ও অন্যায়।

ভারতের অবাধ শুল্কনীতি সম্বন্ধে উক্ত পুস্তিকাতে আর একটি তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে আমেরিকা-বাসীকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে,

> ১৯২১ সাল হইতে ভারতবর্ষকে অবাধ শুল্কনীতি দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে সে ব্রিটিশ ও অ-ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক প্রয়োগ করিতে পারে। এই ক্ষমতা সে প্রায়ই প্রয়োগ করিয়াছে।

ইহা কি সত্য নয় যে প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে জনমত উপেক্ষা করিয়া ব্রিটিশ লৌহ ও বস্ত্র শিল্পের প্রতি ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স প্রদান করাতে এই অবাধ শুল্ক-নীতি প্রয়োগের ক্ষমতা কার্য্যতঃ রহিত করা হয়? এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের তীব্র প্রতিবাদ এবং তৎকালীন ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের সভাপতি ভি, জে, পটেলের সারগর্ভ মন্তব্যসকল আজও হয়ত অনেকের স্মৃতিপথে আসিয়া পড়িবে। ইহাই সব নয়। সত্য কথা বলিতে কি অটোয়া চুক্তি, মোদী-লীজ চুক্তি, এবং ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন (প্রধানতঃ লৌহ শিল্পের প্রতি প্রযোজ্য) এই সম্বন্ধে বাগ্‌যুদ্ধ ব্যতীত অবাধ শুল্কনীতির সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। কেন্দ্রীয় আইনসভার বিতর্কের নথিপত্র হইতেই প্রমাণ হইবে যে এই বহুঘোষিত নীতি ব্যর্থতায় পরিণত করায় ভারতীয় নেতাগণ প্রবলভাবে তাহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

আর একটি তথ্যে বলা হইয়াছে,—

> ভারতবর্ষ ব্রিটেনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোন কর দেয় না।

যদি কেহ ভারত-গবর্ন্মেণ্টের আর্থিক নীতি পরীক্ষা করেন এবং তৎসহ ব্রিটেন কর্তৃক বিভিন্ন উপায়ে ভারতীয় সম্পদ ব্রিটেন এবং ব্রিটেনবাসিগণের স্বার্থের জন্য কিরূপ প্রভূত পরিমাণে ব্যবহার করা হইতেছে তাহা চিন্তা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কি বলিতে পারিবেন যে এই বিবৃতি ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে প্রকৃত সত্য এবং সঠিক্ আর্থিক সম্পর্কের পরিচয় দেয়? এই সকল হইতে দেখা যাইতেছে যে উক্ত পুস্তিকাতে ভারতের অবস্থা যথার্থ ভাবে বর্ণিত হয় নাই। কোন দায়িত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান অগ্রসর হইয়া আমেরিকাবাসীদের ভারত সম্বন্ধে বিকৃত ও ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দিয়া প্রকৃত সত্যে উদ্বোধিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা উচিত।

—

ভারতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে তুর্কী-সাংবাদিক দলের অভিমত

উন্নত স্বাধীন দেশে ধর্ম রাজনীতির সহিত জড়িত নয়। ভারতীয় জাতীয় মহাসভাও এই নীতি অনুসরণের

পক্ষপাতী। এই প্রসঙ্গে প্রগতিশীল স্বাধীন তুরস্ক দেশ হইতে আগত তুর্কী সাংবাদিক দলের অভিমত সকলের প্রণিধানযোগ্য।

সম্প্রতি রাওয়ালপিণ্ডিতে তুর্কী সাংবাদিক দলের সম্বর্দ্ধনার জন্য একটি সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনে মুসলীম লীগ দলের কয়েক জন মুসলমানও উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে তুর্কী সাংবাদিক দলের নেতা মিঃ আতে বলেন যে, তুরস্কে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি প্রগাঢ় সৌভ্রাত্র বিদ্যমান আছে এবং তুরস্কও ভারতীয় মুসলমানদের সৌহার্দ্য ভুলিতে পারে নাই। এইরূপ মন্তব্য শুনিয়া একজন মুসলীম লীগ পক্ষ-ভুক্ত মুসলমান মিঃ আতেকে প্রশ্ন করেন যে ভারতবর্ষের মুসলমানগণ যখন গবর্মেণ্ট ও হিন্দুদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত, তখন তুরস্কের মুসলমানগণ তাহাদিগকে সাহায্যের জন্য কি করিতেছে? ইহার উত্তরে মিঃ আতে বলেন, যে, ইহা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এ পর্যন্ত তাঁহারা ভারতবর্ষকে কোন বৈদেশিক সমস্যায় জড়িত হইতে দেখেন নাই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। যদি হিন্দুস্থানের মুসলমানগণ তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিত, তবে তাঁহারা তাহা মোটেই পছন্দ করিতেন না।

তুরস্কে ধর্ম্মের স্থান কোথায়, আলোচনা এই প্রসঙ্গে উপস্থিত হইলে, মিঃ আতে তাহার উত্তরে বলেন যে তুরস্কে ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়। ব্যক্তিগত বিবেক ও বিচারবুদ্ধির সহিত ইহার সম্বন্ধ। দেশের শাসনকার্যের সহিত বা রাজনীতির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। তিনি আরও বলেন যে তুরস্কে কখনও ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মার্জন লইয়া কোন বিরোধ উপস্থিত হয় নাই।

বিশ্ব-মুসলীম মৈত্রীসাম্রাজ্য গঠনের পরিবর্তে জাতীয়তা গঠনে প্রয়াসী হইয়া তুরস্ক ইসলামের অনিষ্টসাধন করিয়াছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আতে বলেন যে, অটোম্যান সাম্রাজ্য স্থাপনের পর হইতে তাঁহাদের মুসলমান প্রতিবেশী পারস্যের সহিত তাঁহাদের বিবাদ চলিয়াছিল। ১৯১২ সাল পর্যন্ত তাঁহাদের দেশে সংখ্যালঘু খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ও ছিল। তাহাদিগকে তাঁহারা হারাইয়াছেন। আরব্য দেশসমূহ নিজেরাই তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে; তাঁহারা তাহাদিগকে ত্যাগ করেন নাই। বিশ্ব-মুসলীম মৈত্রীসাম্রাজ্যের স্বপ্ন ত্যাগ করিয়া জাতীয়তার নীতিতে আস্থাবান্ হওয়ার পর হইতে এই সকল দেশের সহিত তাঁহাদের সৌহার্দ্য বাড়িয়াছে। হয়ত ভবিষ্যতে এই সকল জাতি পুনর্গঠিত ও পরিণত অবস্থায় একতাসূত্রে পুনরায় আবদ্ধ হইতে পারে।

মিঃ আতে আরও বলেন যে, তিনি সর্বজাতির জন্য যাহা একান্তভাবে কামনা করেন তাহা এই যে তাহারা যেন অন্যান্য উন্নত জাতির মত জীবনযাত্রার নূতন পরিবেশের সহিত সমন্বয় করিয়া বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও আদর্শ সংস্কৃতিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া একত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

লাহোরের এক সম্বর্দ্ধনা-সভায় মিঃ আতে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সর্বপ্রথমে তুর্কী ও পরে মুসলমান এবং বিশ্ব-মুসলীম মৈত্রীসাম্রাজ্য স্থাপনে তাঁহাদের কোন আগ্রহ নাই। এখানেও তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন যে ধর্ম শ্রদ্ধাসূচক অনুষ্ঠান। ইহা ব্যক্তিগত নিজস্ব জিনিস। তুরস্কের রাজনীতিতে ধর্মের স্থান নাই।

—

মিঃ জিন্নার দায়িত্ব সম্বন্ধে ডাঃ লতিফের অভিমত

কিছু দিন পূর্বে বঙ্গের কোন একটি সভায় বক্তৃতাকালে মিঃ জিন্না বলিয়াছেন যে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা তাঁহার হাত হইতে অন্যের আয়ত্তে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার এই স্বীকারোক্তি তাঁহার নীতির বিফলতারই প্রমাণ। মিঃ জিন্নার এই উক্তিতে হায়দ্রাবাদের (দাক্ষিণাত্য) ডাঃ লতিফ, যিনি পাকিস্থানের প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচিত, সম্প্রতি একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য মিঃ জিন্না ও মুসলীম লীগ অনেক সুযোগ পাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার জিদ ও খেয়ালের নিকট সমস্তই উপেক্ষিত ও অবহেলিত হইয়াছে। ডাঃ লতিফের মতে মিঃ জিন্নাই বর্তমান অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।

কংগ্রেস যখন মুসলীম লীগের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে সাড়া না দিয়া মিঃ জিন্না যে কত বড় ভুলই না করিয়াছেন ইহা ডাঃ লতিফ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তার পর হিন্দু মহাসভা মিঃ জিন্নার সহিত মৈত্রী স্থাপনে বিফল হইয়া অনমনীয়তার দ্বারা মিঃ জিন্নার অসঙ্গত দাবির প্রত্যুত্তর দিলেন এবং ব্রিটিশ পক্ষ হইতেও আশাজনক কিছুই আসিল না। সর্বোপরি, স্বাধীন মুসলমান দেশ হইতে আগত সক্রিয় সহানুভূতিসম্পন্ন এবং শেষ আশার স্থল তুর্কী প্রতিনিধি দল স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন যে পাকিস্থানের ন্যায় ভারতের আভ্যন্তরীণ বিরোধের সহিত তাঁহারা লিপ্ত হইতে চাহেন না এবং স্বাধীন দেশবাসী মুসলমানদের নিকট হইতে ভারতবাসী মুসলমানগণের

কোন সাহায্য পাইবার আশাও কিছু নাই। তিনি বলেন, এই সকলেই মিঃ জিন্নার চূড়ান্ত পরাজয় হইল; এমনই শোচনীয় অবস্থায় আজ লীগ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা ভাবিতেই বা মিঃ জিন্নার কেমন মনে হয়? ডাঃ লতিফ বলেন যে, মিঃ জিন্না কি এখন একবার ভাবিয়া দেখিবেন, যে তিনি অন্ধ অনিশ্চিত মোহের পিছনে ঘুরিয়া যে অর্থহীন আত্মাভিমানের ঘূর্ণীচক্র সৃষ্টি করিয়াছেন, আজ তাহাই তাঁহাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে? মুসলীম লীগের যে সকল সদস্য নেপথ্যে থাকিয়া লাভের অংশ গ্রহণ করিতে চান আজও তাঁহারা মিঃ জিন্নার স্কন্ধে সব কিছু চাপাইয়া দিয়া নির্ভাবনায় দিন যাপন করিতে চান? সর্বসাধারণের সম্মতিসূচক এবং সম্মানজনক আপোষ-রফার প্রচেষ্টায় পক্ষপাতশূন্য সদ্বিবেচক মুসলমানগণ কি মিঃ জিন্নার বিরূপতা বিনোদনের জন্য, কারাগারের মধ্যে কংগ্রেস-নেতাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের এবং অন্যান্য দলের সহানুভূতির জন্য আর একবার যথাশক্তি নিয়োগ করিবেন? তিনি উপসংহারে বলেন যে, তিনি কি আশা করিতে পারেন লীগ আর একটি বৎসর নিষ্ফল কাটিয়া যাইতে দিবে না?

—

তুলনামূলক সমালোচনা

প্রকাশ যে, সম্প্রতি পুনায় বক্তৃতাকালে ডাঃ আম্বেদকর মিঃ রাণাডের সহিত গান্ধীজির ও জিন্নার এক অমর্য্যাদাসম্পন্ন তুলনা করিয়াছেন। তিনি আরও ভারতবর্ষের সংবাদপত্রগুলির সম্বন্ধেও অত্যন্ত দম্ভপূর্ণ এবং অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করিয়াছেন। প্রকাশ যে, তিনি সংবাদপত্র সম্বন্ধে বলেন, যে, সাবান-প্রস্তুতের মধ্যে যেমন কোন নৈতিকতার প্রয়োজন নাই, তেমনি আজকাল সংবাদপত্রগুলির কোন নীতিজ্ঞান নাই। তাঁহার মতে এক দিন যাহা বৃত্তি ছিল, আজ তাহা ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। ঢুলিদের মত ঢোল পিটাইয়া নেতার গুণকীর্তন করাই ইহাদের কাজ। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন যে, নেতাদের যশোগান প্রচারের জন্য এমন বিবেচনাহীন হইয়া দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে আর কখনও দেখা যায় নাই। ডাঃ আম্বেদকরের এই হীন এবং দায়িত্বজ্ঞানশূন্য উক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যাঁহাদের বিরুদ্ধে এই সকল মন্তব্য করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে এবং সংবাদপত্রসকলকে এই সমস্ত উক্তি বিচলিত করিতে পারিবে না। ডাক্তার আম্বেদকরের মন্তব্য উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক আবদুল মজিদ খান প্রেসের নিকট বিবৃতিপ্রদানকালে যে তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি এই সম্বন্ধে বলেন, যে, সম্ভবতঃ ডাঃ আম্বেদকর জানেন না যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসানের জন্য মহাত্মা গান্ধী মিঃ জিন্নার সহিত চারি বার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন কিন্তু মিঃ জিন্না গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে একবারও দেখা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তিনি তুলনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী একজন আত্মবিলোপব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি; আর মিঃ জিন্নার নীতি এই যে "আমিই সর্বেসর্বা।"

মহাত্মা গান্ধী সদা-প্রফুল্ল ও মধুরস্বভাবসম্পন্ন; আর মিঃ জিন্না দাম্ভিক এবং দুর্জ্ঞেয়। মহাত্মা গান্ধী পরস্পর আদান-প্রদানের ভিত্তিতে সম্মানজনক আপোষ-রফায় আগ্রহশীল—মিঃ জিন্না "সব চাই এবং সব কাড়িয়া লইব" এই ধারণার পিছনে ধাবমান। মহাত্মা গান্ধী স্পষ্টভাষী ও সরলমতি ব্যক্তি; কিন্তু মিঃ জিন্না চাতুর্য্য এবং ফন্দী দ্বারা কার্য্য সম্পাদনে আগ্রহান্বিত। মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে আন্দাজে বা কিছু গোপন করিয়া অস্পষ্ট ভাবে কিছু বলা বা করা অসম্ভব। গৌরীশৃঙ্গে আরোহণ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু মিঃ জিন্নাকে কোন নির্দিষ্ট কিছুতে রাজি করা বা প্রতিশ্রুত করান অসম্ভব। মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় জাতীয় মহাসভার চার আনারও সদস্য নন, অথচ মিঃ জিন্না মুসলীম লীগের চিরস্থায়ী সভাপতি; এমন কি চিরস্থায়ী মালিক বলিলেও চলে। মহাত্মা গান্ধী অখণ্ড ভারতের পক্ষপাতী; আর মিঃ জিন্না পাকিস্থান-পরিকল্পনার দ্বারা ভারতবর্ষকে দ্বিধা করিবার চিন্তায় বিভোর। মহাত্মা গান্ধী সমগ্র মানব সমাজের সেবক এবং নিঃস্ব, নিরাশ্রয় ও অনুন্নত জনসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ; কিন্তু মিঃ জিন্না একটি সাম্প্রদায়িক দলের নেতা। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার আদর্শের জন্য যত্ন ও উদ্যম সহকারে নিজেকে নিয়োগ করেন, সংগ্রাম করেন এবং এই জন্য সকল প্রকার দুঃখ এবং ক্লেশ বরণ করেন, আর মিঃ জিন্না কেবল অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট ভাবে বাক্যজাল বিস্তার করেন ও বিবৃতি দেন, ভীতি প্রদর্শন করেন এবং অনর্থক উত্তেজনার সৃষ্টি করেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্স সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের সংবাদে প্রকাশ যে, কয়েক দিন পূর্বে আমেরিকার এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ভারতীয় পরিস্থিতির তদন্তকারী প্রতিনিধি যখন স্যর ষ্ট্যাফোর্ড

ক্রীপসের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস বলিয়াছিলেন যে বর্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তি ও নেতা। তিনি বিশ্বাস করেন যে গান্ধীজি অকপট, সরল, কিন্তু অহিংসার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক বিশ্বাসের জন্য তিনি কংগ্রেসকেও অহিংস দেখিতে চান, আর সেই জন্যই যুদ্ধলিপ্ত গবর্ন্মেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে অনিচ্ছুক। স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের মতে তিনি সর্বভারতের না হউক অন্ততঃ ভারতের জাতীয় মহাসভার একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন লোক। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ মীমাংসার জন্য কংগ্রেসের সহযোগিতা চাই-ই।

—

বস্ত্রের দুর্মূল্যতা ও তাহার প্রকৃত কারণ

এক জোড়া মোটা দশহাতী ধুতির দাম হইয়াছে সাত টাকা। যুদ্ধের পূর্বে ও যুদ্ধ ঘোষণার কিছু দিন পর পর্যন্ত ইহার দাম ছিল এক টাকা বার আনা। এইরূপ আর কিছু দিন চলিলে দেশে বিবস্ত্রতা-সমস্যা দেখা দিবে। ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে অনেক দুর্ভিক্ষ, মহামারী ঘটিয়াছে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের বস্ত্রাভাবের কথা কখনও শুনা যায় নাই। এবারও তুলার ফসল খুব ভাল হইয়াছে, প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক অধিক তুলা জন্মিয়াছে। তুলার দরও নরম, কিন্তু কলওয়ালারা মোটা লাভের জন্য দেশবাসীকে অসীম কষ্ট দিতেছে। সাধারণ সময়ের লাভের অতিরিক্ত যে লাভ হইতেছে সরকার তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ লইয়া লইতেছেন, বাকী এক ভাগের জন্য ব্যবসায়ীরা এই অন্যায় কার্য করিতেছেন। আমরা এক বৎসর পূর্বে 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকায় দেখাইয়াছি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অষ্ট্রেলিয়ার সরকার নিয়ম করিয়াছেন যে, সে-দেশের কোনও ব্যবসায়ী শতকরা ৪ ভাগের বেশী লাভ করিতে পারিবে না। খাস বিলাতে সরকার ব্যবসায়ীকে অতিরিক্ত লাভের শতকরা ২০ ভাগ মাত্র এই সর্তে দিতেছেন যে উহা এখন সরকারের নিকট জমা থাকিবে ও যুদ্ধান্তে দেওয়া হইবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা হইতেছে। সুইডেনের সরকার নিয়ম করিতেছেন শতকরা ৬ ভাগের অধিক কেহ লাভ করিতে পারিবে না, অতিরিক্ত লাভ ত দূরের কথা।

ডিসেম্বর মাসের শেষে বড়লাট কলিকাতায় এসোসিয়েটেড্ চেম্বারস্ অফ্ কমার্সের সভায় বলিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতে অতিরিক্ত লাভকরের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম। স্থানান্তরে রাজস্বসচিব সার হেনরী রেইস্‌ম্যান্‌ও কলওয়ালারা অত্যধিক লাভ করিয়া উচ্চ মূল্যে সরকারকে মাল বেচিতেছেন এই অনুযোগ করিয়াছেন। ব্যবসায়ীকে যুদ্ধের সময়ে অত্যধিক লাভ করিতে দিয়া তাহার পরে সেই লাভের একটা অংশ করবাবদ আদায় করার পদ্ধতিটি যে উৎকৃষ্ট নহে ইহা বোধ হয় ভারত-সরকার এত দিনে বুঝিতে পারিতেছেন। অত্যধিক লাভটি যদি সরকার সমস্ত টানিয়া লয়েন তাহা হইলে কলওয়ালাদের সাত সিকার জিনিস সাত টাকায় বেচিবার উৎসাহ আপনি কমিয়া যাইবে। ৩০শে জানুয়ারী বোম্বাই হইতে স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় সম্বন্ধে যে সরকারী সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পড়িলেই বুঝা যায় যদি সদিচ্ছা কার্যে পরিণত হয় তাহা হইলেও উহাতে আমাদের 'পেট ভরিবে না'। খুব জোর সরকারের বা শিল্পপতিদের (যাহাদের অধিকাংশ ইংরেজ) কারখানার কুলী মজুরদের সস্তায় কাপড় পাইবার একটা উপায় হইবে। শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা দেশে দশ লক্ষও নহে। সাঁওতাল পরগণার স্থানে স্থানে বিবস্ত্রতার পূর্বাভাস দেখা দিয়াছে। ভারতের সর্বত্র পল্লী অঞ্চলে লোকের যুদ্ধের জন্য অবর্ণনীয় কষ্ট হইয়াছে। এই বিরাট সমস্যার সমাধান কে করিবে?

দেশের কাপড়ের কলের মালিক প্রায় সকলেই ভারতীয়। তাঁহাদের কি দেশবাসীর প্রতি কোনও কর্তব্য নাই? কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আজ বহু বৎসর ধরিয়া বস্ত্রশিল্পকে রক্ষাশুল্কের সহায়তা দিতেছেন। এই রক্ষাশুল্ক না থাকিলে কাপড়ের দাম সকল সময়ে আরও কম হইত। কোটি কোটি দরিদ্র লোকের আত্মত্যাগের চমৎকার প্রতিদান কলওয়ালারা এখন দিতেছেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন আসন্ন। প্রতিনিধিরা যদি কলওয়ালাদিগকে সমঝাইয়া দিতে পারেন তাহা হইলে দরিদ্রের বহু দুঃখের অবসান হয়। লোকমত এই বিষয়ে অবিলম্বে জাগ্রত হওয়া প্রয়োজনীয়। শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

—

মেদিনীপুরে সাহায্যদানের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে কি না

মেদিনীপুরে আর্তত্রাণকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনারের ধারণা হইয়াছে যে তথায় সাহায্যদানের প্রয়োজন আর নাই, সাহায্যকেন্দ্রগুলির কার্য্যকলাপ এবার ধীরে ধীরে গুটাইয়া আনিতে হইবে। গত ১৮ই জানুয়ারী প্রকাশিত এক সংক্ষিপ্ত সংবাদে তাঁহার এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মেদিনীপুরে সাহায্যদান বন্ধ

করিবার সময় আসিয়াছে, কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান তাহা বলেন নাই এবং জনসাধারণেরও এ কথা মনে করিবার উপযুক্ত কোন কারণ এখনও ঘটে নাই। বরং ৭ই ফেব্রুয়ারীর 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় মেদিনীপুর সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে এখনও দীর্ঘকাল সেখানে সর্ববিধ সাহায্য দানের প্রয়োজন রহিয়াছে। বিবরণটি যিনি দিয়াছেন তাঁহার নাম প্রকাশ করা হয় নাই। ইনি জনৈক শ্বেতাঙ্গ শিক্ষাব্রতী, চারি জন ছাত্রকে লইয়া ডিসেম্বরের শেষ ভাগে তিনি মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। মিঃ বি. আর. সেন মেদিনীপুরে সাহায্য-দান বন্ধ করিবার কথা বলিতে আরম্ভ করিবার মাত্র দিন-পনের পূর্বে উক্ত শ্বেতাঙ্গ শিক্ষাব্রতী বিধ্বস্ত অঞ্চল-সমূহে ভ্রমণ করিয়া তথাকার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"২৬শে ডিসেম্বর আমার স্কুলের চার জন ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া আমি যাত্রা করি।...মেদিনীপুর পৌছিবার পরদিন আমাদিগকে কাঁথি পাঠাইয়া দেওয়া হয়। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কাঁথি ৩৩ মাইল দূর। এই রাস্তা হইতেই আমরা ধ্বংসাবশেষ দেখিতে দেখিতে চলিলাম। কাঁথির দৃশ্য আমাদের মন অবসন্ন করিয়া তুলিল। স্থানীয় হাই স্কুলের দ্বিতল ছাত্রাবাসে আমরা চার দিন কাটাইলাম; এই বাড়ীটি অক্ষত ছিল, গত দুই মাসে সেখানে বহু লোক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। স্কুল-প্রাঙ্গণে প্রচুর আবর্জনা এবং বালু জমিয়া রহিয়াছিল। ঐ দুর্ঘটনার পর হইতে পায়খানাগুলি এক দিনের জন্যও পরিষ্কার করা হয় নাই। সাহায্যদানকার্য্যে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের নিকট হইতে আমরা কিছু চাউল ও ডাইল মাত্র পাইলাম; অপর কিছু ক্রয় করিবার মানসে বাজারে গিয়া আমরা হতাশ হইলাম। সেখানে গিয়া দেখি কিনিবার মত কিছুই নাই, খুব ছোট ছোট দুই-এক সের আলু, কিছু মুলা এবং সামান্য মাছ ভিন্ন আর কিছুই বাজারে আসে নাই। একটি মাত্র দোকানে যৎসামান্য ঘি পাওয়া গেল। শহরে সব চেয়ে বেশী চোখে ঠেকিয়াছে গলির মধ্যে বিরাট্ আবর্জনার স্তূপ, ঘরের ভাঙ্গা চাল ও দেওয়াল এবং ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত ভাঙ্গা বাঁশ ও খড়। অল্প কয়েকটি বাড়ী পাকা, সেগুলির দেয়ালের আস্তর স্থানে স্থানে নাই, কোণা ভাঙ্গা এবং দরজা-জানালা চূর্ণ। **এই আবর্জনা-স্তূপ পরিষ্কার করিবার বা বাড়ীঘর মেরামতের কোন চেষ্টা পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না।** সরকারী আপিসগুলির সম্মুখে বিপুল জনতা অনির্দিষ্ট কাল ধরিয়া কোন্ আশায় অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে, ইহাও এক দৈনন্দিন দৃশ্য।...বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বহু স্থানে সাহায্য বিতরণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, গবন্মেণ্ট আর সব স্থানে কাজ করিতেছেন। সাহায্য-দান-ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই মনে হইয়াছে, **কিন্তু কার্য্যপরিচালন ব্যবস্থার আর একটু উন্নতি করিয়া আরও ভালভাবে ও দ্রুত সাহায্যদানের বন্দোবস্ত করিলে কর্মচারিগণ গ্রামে গ্রামে গিয়া প্রকৃত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের হাতে সাহায্য পৌঁছি-তেছে কি না তাহা দেখিবার সময় পাইতেন।**...নূতন বাঁধ নির্ম্মাণের কাজ নববর্ষের গোড়া হইতেই আরম্ভ করিবার আয়োজন হইয়াছিল। এই কাজের ব্যয় (৩৫ হইতে ৪৫ লক্ষ টাকা) এবং সাহায্য বিতরণের পরিবর্ত্তে কাজ করাইয়া মজুরি দেওয়ায় প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিলে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপের অসুবিধাও বুঝা যায়। গবন্মেণ্টের পক্ষে নিজে এই কাজ করা কঠিন, কনট্রাক্টরদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ারও অসুবিধা আছে, কারণ উহারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করিবার জন্য বাহির হইতে শ্রমিক আমদানী করিতে পারে।

একটি খালের উপরিস্থ বাঁধ মেরামতের ভার আমাদের উপর দেওয়া হইল। সমুদ্রের জল খালে ঢুকিয়া যাহাতে নিকটবর্তী গ্রামগুলির পানীয় জল নষ্ট না করিতে পারে সেজন্য বাঁধের নীচে খালের মুখে একটি স্লুইস গেট ছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা ২০০ লোক সংগ্রহ করিলাম। ইহাদের মধ্যে তিনটি জিনিস লক্ষ্য করিয়া আমরা একটু অবাক্ হইলাম :—প্রথম, গ্রামের লোকেরা চৌকিদার, পিয়ন, কনট্রাক্টরের লোক প্রভৃতিকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না। কোন কণ্ট্রাক্টরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই, কাজ এবং টাকা উভয়ই আমরা দিব—এ কথা বুঝাইয়া না বলা পর্য্যন্ত একজন লোকও কাজে আসিল না। দ্বিতীয়, কাজ করিয়া পুরা টাকা পাইবে, ইহার জন্য তর্ক করিতেও হইবে না কাহারও দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে না, ইহা বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা পূর্ণ উদ্যম ও উৎসাহের সহিত কাজ করিতে লাগিল; অতি দ্রুত বাঁধ-মেরামত কার্য্য চলিতে লাগিল এবং ৩৫ দল লোকের অল্প কয়েক দিনের কার্য্যের ফলে সমস্ত স্থানটির চেহারা ফিরিয়া গেল। তৃতীয়, এই প্রকার কার্য্যে অনভিজ্ঞতার জন্য আমরা ভাবিয়াছিলাম যে মজুরি গ্রহণে হয়ত অসাধুতা চলিবে, যে দল কাল টাকা পাইয়াছে তাহারাও হয়ত আজ আসিয়া পুনরায় মজুরি লইবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু কার্য্যকালে আমরা দেখিলাম যে স্থানীয় লোক সম্পূর্ণ সৎ ও সরল; আমরা হিসাব ঠিক করিতেছি কি না তাহা উহারা লক্ষ্য করিত বটে, কিন্তু কার্য্যের পরিমাপ অথবা মজুরির পরিমাণ আমরা স্থির করিয়া দেওয়ার পরে উহারা বিনা বাক্যব্যয়ে উহাই গ্রহণ করিয়াছে। আরও একটি কথা এই সঙ্গে বলা যায়, **বর্ত্তমান শোচনীয় অভাবগ্রস্ত অবস্থায় এই অঞ্চলে চুরি ডাকাতি বেশী হইবে ইহা মনে করা স্বাভাবিক, কিন্তু ইহাদের ব্যবহার দেখিয়া আমাদের ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে, আমি অনেক সময় রাত্রিতে পর্য্যন্ত একাকী পকেটে ৪০০৲ লইয়া এমন সব লোকের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি যাহারা জানিত আমার সঙ্গে টাকা আছে।** আমি ইংরেজ এবং ঐ সময় সরকারের পক্ষে কাজ করিতেছি। ইহা জানিয়াও তাহারা আমার সহিত কোনরূপ অভদ্রতা তো করেই নাই বরং বাঁধ-নির্মাণের সময় লোকেরা হাস্যপরিহাসেও যোগদান করিয়াছে।

কার্য্যক্ষেত্রে এখনও সমস্যার পরিমাণ ও গভীরতা কম নয়। **বহুসংখ্যক গ্রামে পানীয় জল সরবরাহ এখনও কঠিন সমস্যা হইয়া রহিয়াছে।** নলকূপ বসাইবার সরঞ্জাম প্রায় পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। পানীয় জলের অভাবে এবং অল্পাহারের ফলে মড়ক দেখা দিবার সম্ভাবনা আছে। তমলুক মহকুমায় যে ভয়ানক কলেরার মড়ক লাগিয়াছে কাঁথির কোন কোন স্থানেও তদ্রূপ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। **ঔষধ পাওয়া যায় না; এই অঞ্চলে যে-সব ডাক্তার পাঠানো হইয়াছিল, তাঁহারা কাজ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।** কর্তৃপক্ষ যদি এখনও ঔষধ প্রেরণ সম্বন্ধে কাঁথি ও তমলুকের কথা চিন্তা না করেন, তাহা হইলে মড়ক হয়ত এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে যে অবশেষে আরও বেশী ঔষধ পাঠাইয়াও সামলাইবার সময় থাকিবে না।

ধানের অবস্থা সঙ্গীন; প্লাবিত অঞ্চলে ধান হয় নাই এবং ঝটিকাবিধ্বস্ত স্থানগুলিতেও ধান কম হইয়াছে, ফলে মেদিনীপুর জেলায় এবার উদ্বৃত্ত ফসল ত থাকিবেই না, বাহির হইতে প্রচুর ধান আনিয়া জেলার অভাব মিটাইতে হইবে। বর্তমানে জেলার মহাজনদের হাতে কিছু ধান মজুত আছে বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু তাহারা সাহায্যদানে সহায়তা করিবার জন্য উহা ছাড়িবে না; সাহায্যদান-কেন্দ্রে বিতরণের জন্য গবন্মেণ্ট এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহকে বাহির হইতে ধান আনিতে হইতেছে। যে সব গ্রামে ধান আছে, গবন্মেণ্ট সেখান হইতে উহা আনিবার চেষ্টা করিলে স্থানীয় লোকেরা বাধা দেয়। নলকূপের সরঞ্জাম, ঔষধ, দুগ্ধ প্রভৃতি রেলপথে কাঁথি পর্য্যন্ত পাঠাইলেও তাহার পরের ৩৩ মাইল উহা লইয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন, কারণ রাস্তা কাঁচা এবং লরী ও পেট্রলের অভাব। সংগৃহীত দ্রব্যাদি বিধ্বস্ত অঞ্চলে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার অসুবিধা এখনও তীব্র ভাবেই রহিয়াছে।

সমস্ত পৃথিবী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে—স্থানীয় লোকদের মনের এই ধারণা আমি লক্ষ্য করিয়াছি; কভেণ্ট্রীর উপর বোমা-বর্ষণের পরদিন রাজা ও রাণী সেখানে গিয়া যেভাবে সকলকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, কাঁথিতে সেরূপ কিছু ঘটে নাই ইহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। অথচ কাঁথিতে হতাহত ও সম্পত্তি ধ্বংসের পরিমাণ কভেণ্ট্রীর বিশ গুণ হইয়াছে।

উপরোক্ত বিবরণে অনেকগুলি বিষয় স্পষ্ট হইয়াছে। (১) ঘটনার আড়াই মাস পরেও আবর্জ্জনা-স্তূপ সর্বত্র পরিষ্কৃত হয় নাই, বাড়ীঘর মেরামত করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত হয় নাই। (২) গ্রামে গ্রামে প্রকৃত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের হস্তে সাহায্য পৌঁছিতেছে কি না তাহা দেখা হয় নাই। অথচ ইহা করা উক্ত প্রত্যক্ষদর্শীর মতে সম্ভব ছিল। (৩) সরকারী কর্মচারী এবং কনট্রাক্টর উভয়কেই গ্রামের লোক অবিশ্বাস করে এবং ইহাদের আহ্বানে কাজ করিতে আসে না। গবর্মেণ্ট ইস্তাহার জারি করিয়া গ্রামবাসীদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়াই নিশ্চিন্ত আছেন; কিন্তু উপরোক্ত বিবরণে দেখা যায় লোকেরা কাজ করিতে অনিচ্ছুক নহে, কাজ করিলে সঠিক মজুরি পাইবে এবং তাহাদিগকে ঠকানো হইবে না এই আশ্বাসটুকু তাহারা কাজে নামিবার পূর্বে পাইতে চায়। চুরি ডাকাতি প্রবণতা, ফাঁকি দিবার চেষ্টা, অসাধুতা প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে দেখা যায় নাই ইহা একজন ইংরেজেরই স্বীকারোক্তি। (৪) পানীয় জল সরবরাহের সুব্যবস্থা জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে পর্য্যন্ত হয় নাই। ১৪ই জানুয়ারী রাজস্বসচিব প্রকাশ করিয়াছেন যে বিধ্বস্ত অঞ্চলে ২০টি নলকূপ বসাইবার আয়োজন হইতেছে। এই রাজস্বসচিব মহাশয়ই পূর্বে বলিয়াছিলেন যে প্লাবিত অঞ্চলে ২০ লক্ষ লোকের বাস; ঘটনার তিন মাস পরে এই ২০ লক্ষ লোকের জন্য ২০টি পানীয় জলের নলকূপ বসাইবার আয়োজন কি তিনিও যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন? (৫) ঔষধ পাওয়া যায় না, পাঠাইবার কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়াও প্রকাশ নাই। ঔষধ এবং সরঞ্জাম ভিন্ন ডাক্তারেরা শুধু-হাতে কলেরা প্রভৃতি মড়কগ্রস্ত স্থানে গিয়া কি করিবেন এটুকু ভাবিয়া দেখিবার সময়ও কি শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সিভিলিয়ান সাহেবেরা পান নাই? (৬) মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ ধান নষ্ট হইয়াছে, বাহির হইতে চাউল না গেলে সেখানে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী।

সরকার একবার গড়ে ৮৩ লক্ষ টাকার একটা মোটা অঙ্ক দেখাইয়াই নীরব হইয়াছেন। ঐ টাকার কতটা অংশ প্রকৃত অভাবগ্রস্তেরা পাইয়াছে এবং কতখানি সরকারী কর্মচারীদের ভাতা, ভ্রমণব্যয়, আপিস খরচা, কেরাণী, এক্স-মিলিটারী দ্বারবান, ফাইল, কাগজ, লাল ফিতা প্রভৃতিতে ব্যয় হইয়াছে তাহার কোন হিসাব পাওয়া যাইবে কি?

এই বিবরণ হইতে দেখা যায়, মেদিনীপুরে সাহায্য বন্ধ করিবার কোন কারণ ঘটে নাই এবং টেষ্ট রিলিফ নামক যে ব্যবস্থা অনুসারে ভবিষ্যতে কাজ করাইয়া সাহায্য-দানের আয়োজন হইতেছে তাহার মধ্যে সাহায্যদানের মনোবৃত্তি যেন থাকে। সব সময় যে তাহা থাকে না উপরোক্ত বিবরণে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। সরকারী কর্মচারীদের প্রতি জনসাধারণের অবিশ্বাস দূর করা যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলেও মানবতার দিক দিয়া সরকারের কর্তব্য হইবে টেষ্ট রিলিফের সম্পূর্ণ ভার বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া। মুষ্টিমেয় কয়েক জন অক্ষম ও অদূরদর্শী কর্মচারীর "প্রেষ্টিজ"কে সরকারী প্রেষ্টিজের সহিত অন্যায়ভাবে জড়াইয়া লইয়া গবর্মেণ্ট যে মেদিনীপুরের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর চোখে নিজেদের নামাইয়া আনিতেছেন, নানা ভাবে নানা সূত্রে তাহাই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।

উপরোক্ত বিবরণ-লেখক রাজারাণীর কভেণ্ট্রী পরিদর্শনের কথা তুলিয়াছেন। এদেশের লোকে উহা আশা করে না। তাহারা জানে ভারতবর্ষের রাজা ভারতবাসী নহেন—ইংরেজ, এবং তিনি ভারতবর্ষ শাসন করেন ইংরেজদের পরামর্শে, এদেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহার কোন যোগ নাই। নারীর উপর অত্যাচার ঘটিলে পর্যন্ত রাজার নিকট নালিশ জানাইবার উপায়ও যে তাহাদের নাই, মেদিনীপুরের ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত অঞ্চলের নরনারী তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া লইয়াছে।

—

লণ্ডনে স্বাধীনতা সপ্তাহ

২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস। ঐ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া এক সপ্তাহ লণ্ডনে স্বাধীনতা সপ্তাহ রূপে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শেষ দিনের বিরাট্ সভায় সভাপতি লর্ড হাস্টিংডন বলেন,

"নেহরুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার সরলতা, কর্মশক্তি ও সাধুতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। মানব জাতির এই মহাসঙ্কটের দিনে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি কারারুদ্ধ থাকা এক বিরাট দুর্ঘটনার সমতুল্য। এই যুদ্ধে যত শীঘ্র সম্ভব জয়লাভ করিবার জন্য আমরা ব্যগ্র। এ সম্বন্ধে আমরা এবং ভারতবাসী সকলেই একমত। আমরা ইহাও জানি যে প্রত্যেক ভারতবাসী ফাসিস্তবিরোধী, তাহাদের আন্দোলন জাতীয় স্বাধীনতার জন্য। ভারতের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য আমরা একতা চাই। ফাসিস্তবাদ ও নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমরা ভারতবাসিগণকে স্বাধীন মানুষরূপে আমাদের পাশে পাইতে চাই।"

মিসেস করবেট এস্‌বি বলেন,

"আটলাণ্টিক চার্টার ভারতবর্ষের প্রতি প্রযোজ্য নহে ইহা ঘোষণা করিয়া আমরা সুবিচার, দূরদর্শিতা এবং সাহসের অভাব দেখাইয়াছি। ভারতবাসিগণকে আমাদের বিশ্বাস করিতেই হইবে, কানাডা এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার দৃষ্টান্ত আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে। ঐ দুই দেশ যখন আমাদের তীব্র বিরোধিতা করিতেছে সেই সময়ে আমরা উহাদের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়াছি। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এখনই আমাদিগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে হইবে, যে-সব দপ্তর এখনও রিজার্ভ রাখা হইয়াছে সেগুলিও ছাড়িতে হইবে। ভারতবাসীর নিকট ইহা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমাদের ও সম্মিলিত জাতিসমূহের স্বাধীন মিত্ররূপে ভারতবর্ষ এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হউক, এ দেশের জনসাধারণ তাহা দেখিতে চাহে।"

ফাসিস্তবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়া ফাসিস্তবিরোধী নেতাদের কারারুদ্ধ করা, বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতা-যুদ্ধের মাঝখানে নিজের অধীনস্থ দেশের স্বাধীনতার দাবীকে সময়োপযোগী এবং বে-আইনী আন্দোলন হিসাবে গণ্য করা —এ বৈচিত্র্য বোধ হয় একমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেই সম্ভব। যুদ্ধের মাঝখানে স্বাধীনতা ভোগ করিবার দাবী কংগ্রেস তোলে নাই, কংগ্রেসের ভিতর দিয়া ভারতবাসী চাহিয়াছে তাহার স্বাধীনতার দাবীর স্বীকৃতি, যুদ্ধের পর নিজের স্বাধীন শাসনতন্ত্র রচনার অবাধ অধিকারের বাস্তব প্রতিশ্রুতি।

—

কপটতা

লণ্ডনের ঐ সভাতেই মিঃ ডেভিস বলিয়াছেন,

"ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ব্যর্থ হইয়াছে। তোমাদের শাসনের সাফাই গাহিয়া পঞ্চাশটি প্রশ্ন খাড়া করিয়া নিজে নিজেই এখানে অথবা আমেরিকায় তাহার উত্তর প্রচার করিয়া কোন লাভ নাই। আমরা ভারতবর্ষের তথাকথিত সাম্প্রদায়িক ও ধর্ম্মগত বিভেদের মীমাংসা করিতে না পারিলে আমাদের মিত্র সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট হইতে এ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা উচিত। এই সমস্যা সমাধানে রাশিয়া আমাদিগকে পথ দেখাইতে পারিবে।"

সোভিয়েট রাশিয়া হইতে মাইনরিটি সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষালাভ করিতে বিলাতী আভিজাত্যে বাধিলে আমেরিকার নিকটে ত যাওয়া চলে? ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিলাতী কপটতা আরও পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন অধ্যাপক হলডেন। তিনি বলিয়াছেন,

"গণিত ও পদার্থ বিদ্যায় ভারতবর্ষ বড় বড় আবিষ্কার করিয়াছে যাহার ফলে শুধু ব্রিটেন নয়, সমগ্র জগৎ উপকৃত হইয়াছে। আলষ্টারের বদলে পাকিস্থান শব্দটি প্রয়োগ করিলে আয়ারের বর্ত্তমান করুণ অবস্থা উপলব্ধি করা সহজ হইবে। নেহরুর সহিত আমরা আপোষ করিতে পারি না ইহা বলিলে কপটতার পরিচয় দেওয়া হয়। মাঞ্চুরিয়া অভিযানের পূর্ব্বেই তিনি ফাসিস্তবিরোধী মত পোষণ করিতেন। ১৯৪৩ সালে ইউরোপের যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করিলেও এশিয়ায় আরও অনেক দিন যুদ্ধ করিতে হইবে।"

কপটতা এত স্পষ্ট ও এত নগ্ন হইয়া উঠিয়াছে যে আমেরিকায় ও কানাডায় দলে দলে লোক পাঠাইয়া এবং পঞ্চাশটি তথ্য পরিবেশন করিয়াও উহা আর চাপা দেওয়া অসম্ভব। বর্ত্তমান জগতে জনমত সকল সময়ে অস্বীকার করা যে চলে না, ইহা বুঝিবার অবকাশ ইংরেজ রাষ্ট্রবিদেরা নিজের দেশে এবং আমেরিকায় উভয় ক্ষেত্রেই পাইয়াছেন। ভারতে ইংরেজ শাসনের সাফাই গাহিবার জন্য সর্ মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ, সর্ রামস্বামী মুদালিয়র, বেগম শাহনওয়াজ প্রভৃতি যাঁহাদিগকে পাঠানো হইয়াছিল, লুই ফিশার, পার্ল বাক প্রভৃতির সম্মুখে তাঁহাদের সমস্ত প্রচারকার্য্য ম্লান হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্য জানিবার আগ্রহ আমেরিকাবাসীদের মনে জাগিয়াছে। সাণ্ডারল্যাণ্ড যে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন তাহাই আজ আমেরিকার কোটি কোটি অধিবাসীর মনে আলোড়ন তুলিয়া ভারতবর্ষের প্রতি আমেরিকার দৃষ্টি ফিরাইয়াছে। সে দৃষ্টি হইতে সত্য চাপা দিবার সাধ্য জাফরুল্লা বা মুদালিয়রের নাই।

—

আমেরিকায় ভারতীয় স্বাধীনতা-দিবস

লণ্ডনের ন্যায় আমেরিকাতেও এ বৎসর ২৬শে জানুয়ারী ভারতীয় স্বাধীনতা-দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে নিউ ইয়র্কে এক ভোজসভার অনুষ্ঠান হয়। মিস পার্ল বাক এই সভায় বলেন, "আমরা আমেরিকান, সাদা মানুষের বোঝা ঘাড়ে লইবার বাসনা আমাদের বিন্দুমাত্রও নাই। সাদা মানুষেরা অনিচ্ছুক লোকের উপর জোর

করিয়া নিজেদের শাসন চালাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া নিজেদের-ঘাড়ে যে বোঝা টানিয়া তুলিয়াছে তাহা ছাড়া সাদা মানুষের বোঝা বলিয়া পৃথিবীতে কিছু ছিল না।" মিস বাক্ ইহাও বলিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষের সকল বিভেদ বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ইংলণ্ডের চেষ্টার ফলে ভারতবর্ষে ইউরোপ অপেক্ষাও অধিক অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। সাদা মানুষের বোঝার (White man's burden) পবিত্রতার কাল্পনিক কাহিনী ইংরেজের সৃষ্টি। এই বোঝা পরাধীন দেশের বুকে চাপিয়া বসিয়া তাহার উন্নতির পথ রোধ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বোঝা যাহারা ঘাড়ে লইয়াছে তাহাদিগকেও অধঃপাতের অতল গহ্বরে টানিয়া নামাইতেছে। এ দেশে কোম্পানীর আমলে বড় বড় ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে যে দুর্নীতি ও চুরি দেখা গিয়াছিল, বর্তমান ইংলণ্ডে তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। ৮ই অক্টোবরের নিউজ রিভিয়ু পত্রে উহার সম্পাদক এক খোলা চিঠিতে প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সাহেবকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে শ্রেণীস্বার্থ, দীর্ঘ-সূত্রিতা, ভীরুতা, অযোগ্যতা ও উৎকোচগ্রহণপরায়ণতা সরকারী কর্মচারীদের মধ্য হইতে দূর করিতে না পারিলে যুদ্ধে জয়ের আশা পর্য্যন্ত করা কঠিন। সাদা মানুষের বোঝা ঘাড়ে তুলিয়া লইয়া যাহারা কালের গতি রোধ করিবার স্পর্দ্ধা দেখাইয়াছে, স্ব-সমাজের ভাঙন তাহারা ঠেকাইবে কিসের জোরে?

সাদা মানুষের বোঝা ঘাড়ে লইতে অস্বীকার করিয়া আমেরিকা দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচিত্র আদেশ

গত বৎসর কলিকাতায় যখন বোমা পড়িবার সম্ভাবনা মাত্র ঘটিয়াছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখন আতঙ্কগ্রস্ত আর দশ জনেরই ন্যায় স্কুল-কলেজ বন্ধ করিয়াছিলেন, কণ্ট্রোলার আপিস বহরমপুরে সরাইয়াছিলেন এবং বাংলার বাহিরের কেন্দ্রেও পরীক্ষা গ্রহণের অনুমতি দিয়াছিলেন। শহরে সত্য সত্যই বোমা পড়িবার পর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ দিয়াছেন, বাংলা ও আসামের বাহিরে এবার কাহাকেও পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। দীর্ঘকাল বাহিরে থাকিতে হইবে জানিয়া যাঁহারা ভিন্ন প্রদেশে গিয়াছেন, এই আদেশের ফলে তাঁহাদিগকে পুত্র-কন্যার পরীক্ষার জন্য বর্তমান অবস্থায় কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হইলে এত দিনের অর্থব্যয় ও দুঃখভোগের কোন সান্ত্বনা তাঁহাদের থাকিবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাকেন্দ্র কলিকাতায় বড় বড় বাড়ীর ত্রিতল চৌতল এবং পাঁচ তলার উপরেও হইয়া থাকে। পরীক্ষার মধ্যে সাইরেণ বাজিলে পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই নীচে নামাইয়া আনিতে হইবে। ইহার পর ঐ দিনই পরীক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করা সকল সময় সম্ভব বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মনে করেন কি? ২৪শে ডিসেম্বরের ন্যায় বিপদ-সঙ্কেত তিন ঘণ্টা স্থায়ী হইলে ঐ দিন পরীক্ষা গ্রহণ শেষ করা যাইবে কি? যদি না যায়, কলিকাতা কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের জন্য যদি নূতন প্রশ্নপত্র রচনা করিয়া নূতন ভাবে পরীক্ষা লওয়া হয়, তাহা হইলে মফস্বলে যাহারা পরীক্ষা দিয়াছে তাহাদেরও কি প্রশ্নপত্রের বিভিন্নতার অজুহাতে দুই বার পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হইবে? স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত না করিয়াও বিশ্ববিদ্যালয় এই সব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের উপায় আবিষ্কার করিতে পারেন।

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি

আমলাতান্ত্রিক গবর্মেণ্টের বিশেষত্ব—পরিকল্পনা-রচনায় তাঁহাদের অসীম ধৈর্য্য। এদেশের অন্নবস্ত্র সমস্যা সমাধানেও তাঁহারা বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া পরম ধৈর্য্যের সহিত পরিকল্পনাই করিয়া চলিয়াছেন, ওদিকে অন্ন এবং বস্ত্র উভয়ই দিনের পর দিন দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে নয়াদিল্লীতে খাদ্য-সমস্যা আলোচনার জন্য সম্মেলন আহূত হইয়াছে। ইহার ফল কি হইবে তাহা জনসাধারণ এখন হইতেই অনুমান করিয়া লইতে পারে। নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, ফেব্রুয়ারীর ৮ ও ৯ তারিখে খাদ্য-বিভাগ ও তাহাদের পরামর্শদাতাদের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থিত করা হইবে:

(১) পাট, তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের চাষ কমাইয়া তৎপরিবর্তে খাদ্যশস্যের আবাদ।

(২) বর্ত্তমানে অকর্ষিত ও পতিত জমি যত দূর সম্ভব চাষ করিয়া খাদ্যশস্য চাষের মোট জমির পরিমাণ বৃদ্ধি।

(৩) রাজপথ, রেলওয়ে এবং খালের দুই পাশের জমিতে এবং সরকারী বাংলো ও গৃহ প্রভৃতির হাতায় শাক-সব্জীর চাষ।

ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনের গোড়ায় গলদ রহিয়াছে ইহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবার ফসল কম হইয়াছে এবং কম জমিতে ফসল বোনা হইয়াছে। খাদ্যশস্যের মূল্য এবার চড়িবে ইহা জানিবার

ও বুঝিবার অবকাশ পাইয়াও কৃষকেরা কেন চাষ বাড়াইতে পারে নাই, গবর্ন্মেণ্ট সে দিকটা কিছুতেই অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে চাহিতেছেন না। প্রকৃত গলদ কোথায় 'চুটাপ্রকাশ' নামক একটি গ্রাম্য পত্রিকার অভিজ্ঞতালব্ধ মন্তব্য হইতেই তাহা কতকটা অনুমান করা যাইবে :

> আমাদের গবর্ন্মেণ্ট এবং দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সামান্য কিছু বীজ, সার বা সে সকলের মূল্য বাবদ গৃহস্থ উৎপাদকদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়াও বড় একটা শুনিতে পাইলাম না। পূর্ব-বাংলার নানা স্থানে এ সময়ে বুরো ধানের চারা সরবরাহ করিতে পারিলে শত-সহস্র দ্রোণ জমিতে বুরো ধান উৎপাদন করা সম্ভব হইত। এবার অধিক উৎপাদন ত দূরের কথা বুরো ধানের জালার (চারার) অভাবে শত শত দ্রোণ জমিতে বুরো ধানের চাষই করা যাইতেছে না। আমরা ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জেলার নানা স্থান হইতেই জালার অভাবে বুরো জমি পতিত রাখার সংবাদ পাইতেছি। মুগ, কলাই, সরিষা, তিসি, শণ প্রভৃতি যাবতীয় রবিশস্যই বীজের অভাবে পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় উৎপাদন করা অসম্ভব হইয়াছে, অধিক উৎপাদনের আশা ত আকাশকুসুম সদৃশ!
>
> বীজের আলু এ বৎসর কার্তিক মাসে ২০৲ মণ দরে বিক্রয় হইয়াছে। এরূপ উচ্চ মূল্যে বীজ ক্রয় করিয়া আলুর চাষ করা সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে।...বীজ, সার এবং স্থানে স্থানে মজুর খাটাইবার জন্য কিছু কিছু অর্থ দাদন দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেশে প্রচুর শস্য উৎপাদন হইত। কিন্তু কে ব্যবস্থা করিবে? [চুটা-প্রকাশ, মাঘ, ১৩৪৯]

বাংলা দেশে সমবায় আন্দোলন যেটুকু ছিল তাহাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কৃষকগণের পক্ষে বীজ, সার এবং অর্থ সংগ্রহ যে কতখানি কঠিন হইয়াছে তাহা বুঝিবার চেষ্টাও গবর্ন্মেণ্ট করিতেছেন না। অধিক জমিতে চাষ করিবার পরিবর্তে অল্প জমিতে বেশী সার দিয়া সহজে বেশী ফসল উৎপাদন করা যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে উহা অধিকতর লাভজনক, এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি সরকারী কৃষি-বিভাগ এবং নবগঠিত খাদ্যবিভাগের কর্তারা জানেন না ইহা মনে করা কঠিন। এ দেশে সার তৈয়ারীর পূর্ণ সুযোগ রহিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষি-প্রধান দেশকে সারের জন্য বিলাতী আমদানীর উপর নির্ভরশীল করিয়া না রাখিলে কি চলিত না?

সরকারী বাংলোর হাতায় শাকসব্জী গজাইয়া কৃষি-সচিব ও খাদ্য-সচিবেরা লাট-বড়লাটদের কাজ দেখাইয়া তাক লাগাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু বীজ, সার ও টাকার ব্যবস্থা না করিলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

—

এশিয়াটিক সোসাইটি

এশিয়াটিক সোসাইটির গত সাধারণ বার্ষিক সভায় ১৯৪৩ সালের জন্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতি এবং ডাঃ কালিদাস নাগ জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হইয়াছেন। বাংলা দেশের এশিয়াটিক সোসাইটি সমগ্র এশিয়ার মধ্যে প্রাচীনতম সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উহা সর্ উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত হয়। জোন্স, কোলব্রুক, উইলসন, প্রিন্সেপ প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ এশিয়ার অধিবাসী মানুষের জাতি, ধর্ম, ভাষা, আচার ব্যবহার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি লইয়া আজীবন গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের কাজের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলিকাতার এই এশিয়াটিক সোসাইটি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় মনীষিগণও এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। সোসাইটি-প্রতিষ্ঠার সময়েই সর্ উইলিয়ম জোন্সের আশা ছিল যে এখানে প্রাচ্য সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য, আইন ও সমাজ ব্যবস্থা, ধর্ম ও দর্শন এবং বিজ্ঞানের বিভিন্নমুখী ভাবধারাসমূহ কেন্দ্রীভূত হইবে, উহা লইয়া গবেষণা চলিবে। আর এই গবেষণার ফলে ফুটিয়া উঠিবে এশিয়ার পটভূমিকায় ভারতবর্ষের মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সোসাইটির বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ, সর্ উইলিয়মের এই স্বপ্ন বহুল পরিমাণে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। আগামী জানুয়ারী মাসে সোসাইটি-প্রতিষ্ঠার ১৬০ বৎসর পূর্ণ হইবে; ঐ সময়ে এই উপলক্ষে একটি বিশেষ উৎসবের আয়োজন করিবার কথা উঠিয়াছে। সর্ উইলিয়ম জোন্স এবং অন্যান্য যে-সব মনীষী প্রাচ্য সংস্কৃতি লইয়া গবেষণা করিতে বসিয়া জীবন দিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি ভারতবাসী, বিশেষতঃ বাঙালীর একটি বিশেষ কর্তব্য রহিয়াছে। উপরোক্ত অনুষ্ঠান যাহাতে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয় তজ্জন্য এখন হইতেই চেষ্টা আরম্ভ হওয়া উচিত। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় উপযুক্ত লোকের হস্তেই গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহার মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ লইয়া কিছু দিন পূর্বেই প্রচুর আন্দোলন ও বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে। সোসাইটির কার্য্যে এবং ১৬০তম বার্ষিক উৎসবের আয়োজনে উহার জের না পড়িলেই সুখের বিষয় হইবে।

—

চীনে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ

চীনদেশ হইতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে ভারতবাসী মাত্রেই আন্তরিক বেদনা অনুভব করিবেন। হোনান প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ এড়াইবার জন্য শানসি প্রদেশে গমনকালে পথে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। লয়াং নামক

একটি শহরে বহু লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যেকেই নিরাশ্রয় ও কপর্দকশূন্য। পথের মধ্যেই বহু লোক খাদ্য ভাবিয়া বিষাক্ত গাছের মূল ও ছাল খাইয়া মারা গিয়াছে। শীতবস্ত্র ও উপযুক্ত আশ্রয়ের অভাবে এই প্রচণ্ড শীতেও বহু লোক মরিয়াছে। হোনানের গ্রামগুলি জনমানবশূন্য, বহু স্থানে গাছের পাতা নাই, কারণ লোকে ক্ষুধার তাড়নায় গাছের পাতা পর্য্যন্ত খাইয়া শেষ করিয়াছে। ছয় মাস এই ভাবে চলিবার পর হোনান প্রদেশ ত্যাগ করিয়া লোকে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে।

এই মর্ম্মন্তুদ বিবরণ শুনিয়া প্রথমেই মনে পড়ে ব্রিটিশ ও আমেরিকান কর্তৃপক্ষের দয়ার কথা। ফ্রান্সের ও ইউরোপের অধিকৃত দেশসমূহের লোকে কি খাইবে ভাবিয়া ইঁহারা ব্যাকুল হইয়াছিলেন, আমেরিকা হইতে ফ্রান্সে জাহাজ বোঝাই করিয়া বিস্কুটও প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু চীনের এই ছয় মাস ব্যাপী দুর্ভিক্ষে ইঁহারা কোন খাদ্য পাঠাইয়াছেন কি না তাহার কোন সংবাদ আজও প্রকাশিত হয় নাই, অথচ ক্ষুধিত চীন অল্প অস্ত্র লইয়া অসীম ত্যাগ স্বীকার করিয়া ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রবল শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে, জাপানের লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য চীনে আটকাইয়া রহিয়াছে। দুর্ভিক্ষের সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর সেখানে সাহায্য প্রেরণের কি বন্দোবস্ত করা হয় ভারতবাসী তাহা লক্ষ্য করিবে। ভারত-সরকারের কর্ম্মচারীদের অদূরদর্শিতা ও অযোগ্যতা এবং ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট কর্তৃক খাদ্য আমদানীর জন্য জাহাজ প্রদানে অক্ষমতার ফলে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবার উপক্রম হইয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষে চীনের এই বিপদে তাহাকে সাহায্য করা কতখানি সম্ভব জানি না, কিন্তু যাহার যেটুকু সামর্থ্য আছে তিনি সে সাহায্য করিবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। কিন্তু চীনের দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রধান দায়িত্ব ব্রিটেন ও আমেরিকার, ইহা বার বার তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

—

কুইনাইন কোথায় ?

লণ্ডনে রয়েল সোসাইটি অফ্‌ আর্টসের ভারত ও ব্রহ্ম-শাখার এক সভায় কর্ণেল সর্ সামুয়েল ক্রিষ্টোফার্স বলেন যে, ম্যালেরিয়া দমন করিতে হইলে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে গবেষণা এবং সহজলভ্য কুইনাইন এই দুইটিই সমানভাবে প্রয়োজন। সর্ সামুয়েল ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসে চাকুরী করিয়া এদেশে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ডিস্পেন্সরীর সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার এবং প্রত্যেক ডিস্পেন্সরীতে বিতরণের জন্য প্রচুর পরিমাণে কুইনাইন মজুত রাখা উচিত। যে-দেশের অধিকাংশ লোক ম্যালেরিয়ায় ভোগে, সেখানে কুইনাইন সরবরাহের প্রধান দায়িত্ব গবর্ন্মেণ্টের হাতে থাকা উচিত বলিয়া তিনি মনে করেন।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক ম্যালেরিয়ায় ভোগে, এই তথ্য অবগত হইয়াও ভারত-সরকার কিনা বুরো নামক এক ডাচ কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতবর্ষে কুইনাইনের ব্যাপক চাষের বন্দোবস্ত করেন নাই, ভারতবাসীকে কুইনাইনের জন্য ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের উপর জোর করিয়া নির্ভরশীল করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিয়াছে, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ জাপানের কবলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া রোগীদের পক্ষে কুইনাইন পাওয়া অসম্ভব হইয়াছে। পোষ্টাফিসের কুইনাইন বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে, ডিস্পেন্সরীগুলিতে কয়েক বড়ী করিয়া পাঠাইয়া গবর্ন্মেণ্ট লালফিতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন এবং সদম্ভে ঘোষণা করিতেছেন তাঁহাদের হাতে তিন বৎসরের উপযুক্ত কুইনাইন মজুত আছে। কাহাদের প্রয়োজনে কি হিসাবে খরচ ধরিলে মজুত কুইনাইনে তিন বৎসর চলিবে, সে কথাটি তাঁহারা চাপিয়া গিয়াছেন। এই প্রকার দ্ব্যর্থবোধক সংবাদ প্রচারে অজ্ঞ লোকেরা বাহবা দিতে পারে কিন্তু দেশের কোটি কোটি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সরকারী চিকিৎসা-ব্যবস্থার উপরে ইহার পর অটুট থাকিবে কি না সেটা কি গবর্ন্মেণ্ট চিন্তা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন বোধ করেন না ?

—

খাদ্যের অপচয় নিবারণ

ভারতীয় কমার্স চেম্বার বাংলার প্রধান মন্ত্রীকে পত্র দ্বারা অনুরোধ করিয়াছেন যে তিনি যেন অবিলম্বে আইন করিয়া খাদ্যের অপচয় নিবারণের জন্য ভোজ দেওয়ার প্রথা বন্ধ করিয়া দেন। কমার্স চেম্বার এ সম্বন্ধে অর্ডিনান্স জারী করিবারও পক্ষপাতী। পত্রখানিতে কমার্স চেম্বারের যে মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আপত্তিজনক। বর্ত্তমান সঙ্কটকালে খাদ্যের সর্ববিধ অপচয় নিবারণ প্রয়োজন, সম্ভবপর হইলে প্রত্যেকের পক্ষে ভাতের মাড় ফেলিয়া না দিয়া 'মাড়'ভাত খাইয়া চাউলের খরচ কিছু কমাইবার চেষ্টা করা উচিত, ইহা প্রত্যেকেই স্বীকার করিবে। কিন্তু ইহার জন্য সরকারের দ্বারস্থ হইতে হইবে কেন ? বড়লাট-কাউন্সিলের সদস্য, মন্ত্রী

প্রভৃতি পোষাকী সরকারী কর্ম্মচারীদের বড় বড় সাহেবী হোটেলে কারণে-অকারণে খানা খাওয়াইয়া এবং ভোজ-সভা ডাকিবার কুদৃষ্টান্ত ত এই সব কমার্স চেম্বারও দেখাইয়াছেন। আজ অকস্মাৎ ভোজসভা বন্ধ করিবার জন্য ইহারা সরকারের নিকট অর্ডিনান্স প্রার্থনা করিতেছেন কেন? বাঙালী পরিবারের কোন কোন ক্রিয়া উপলক্ষে ভোজ দেওয়ার প্রথা আছে। ইহাতে অসুবিধা ঘটিয়াছে চাউল ও কয়লার—তা ছাড়া অপর সব দ্রব্য, শাকশব্জী, মাছ প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ত হয় নাই। চাউলের অপচয় যাহাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে সকলেই বাধ্য হইয়াছেন প্রাণের দায়ে—চাউল দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে এ জ্ঞান প্রত্যেক বাঙ্গালীরই আছে।

কথায় কথায় ছোট বড় বাস্তব কাল্পনিক সর্ববিধ অভিযোগ লইয়া গবর্ন্মেণ্টের কাছে প্রার্থী হইবার অভ্যাস বড় বেশী দৃষ্টিকটু হইয়া উঠিতেছে। খাদ্যের অপচয় কি ভাবে নিবারণ করা যায়, একমাত্র ভাতের মাড় না ফেলিলে কত কোটি মণ চাউল বাঁচে তাহার হিসাব বাহির করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেই চেম্বার অনেক বেশী ফল পাইবেন। ইহা করিবার টাকা এবং সামর্থ্য উভয়ই ইহাদের আছে। খাদ্য-সমস্যা সমাধানে ভারত-সরকারের আগ্রহ যে কতটুকু তাহা এত দিনে ভাল ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। ভারত-সরকারের বাণিজ্য-সচিবের বক্তৃতা প্রভৃতিতে একটা কথাই বড় হইয়া উঠে যে সৈন্য দলের জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করাই খাদ্য-বিভাগের প্রধান কর্তব্য।

—

খাদ্য-বিক্রয়-নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব

শুধু ভোজের ব্যাপারে ভারতীয় কমার্স চেম্বার নয় খাদ্য-বিক্রয় ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিবার জন্য বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা এবং কলিকাতা কর্পোরেশন বাংলা-সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। সরকার যে-সব দোকানে চাউল বিক্রয় করিতেছেন তাহাদের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিবার পরও ইহারা কেমন করিয়া 'রেশনিং'এর কথা তোলেন তাহা বুঝিয়া উঠা বস্তুতই দুর্ঘট। খাদ্য সরবরাহে সরকারের বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের চূড়ান্ত অযোগ্যতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে অসাধুতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। প্রায় দুই বৎসর মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের হাতে খাদ্য সরবরাহের ভার দিয়া রাখা হইল এবং বিভাগটি রহিল একজন সিভিলিয়ান এবং একজন ডেপুটির উপর। ইহাদের অযোগ্যতা এবং অন্যান্য বহু দোষ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে তীব্র সমালোচনার পর গবর্ন্মেণ্ট মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ তুলিয়া দিয়া ডিরেক্টরেট অফ সিভিল সাপ্লাই নামক বিভাগ খুলিলেন এবং তিন জন সিভিলিয়ানের উপর উহার পরি-চালনার ভার দিলেন। ইহাদের মধ্যে বড় জন শ্বেতাঙ্গ। কয়লা এবং চাউল সমস্যার কোন কিনারা ইহারা করিতে পারিলেন না, সরকারী নিয়ন্ত্রিত চাউলের দোকানের সম্মুখে সারিতে-দাঁড়ানো লোকের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়িতে লাগিল। রেলকর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ইহারাও প্রয়ো-জনানুযায়ী মালগাড়ী বাহির করিতে পারিলেন না, ফলে কয়লা যে দুষ্প্রাপ্য সেই দুষ্প্রাপ্যই রহিয়া গেল। চারিদিকে কেবল নিয়ন্ত্রণ, হুকুমনামা আর পারমিটের কষাকষিতে সমস্ত ব্যাপারটা এমনভাবে জট পাকাইয়া গিয়াছে যে তাহার তাল সামলানো তিন জন সিভিলিয়ানের পক্ষেও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অতঃপর কলিকাতা হাইকোর্টের একজন জজকে আনিয়া তাঁহার উপর সিভিল সাপ্লাই বিভাগের ভার দিতে হইয়াছে।

একমাত্র কলিকাতার ২০ লক্ষ অধিবাসীর জন্য চিনি, চাউল, আটা ও কয়লা সরবরাহ করিতে যাহারা গলদঘর্ম হইয়া উঠিয়াছে, দোকানে মাল ফুরাইয়া গেলে যাহারা সঙ্গে সঙ্গে উহা ভর্তি করিয়া দিতে পারে না, সেই সব কর্মচারীর হাতে যদি ২০ লক্ষ রেশন-টিকিটের ভার দেওয়া হয় তাহা হইলে কেলেঙ্কারীর সীমা থাকিবে না। সারিতে দাঁড়াইয়া জিনিস লওয়ার যে নমুনা দেখা গিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহা ভুগিতে হইবে। মধ্যবিত্ত পরিবারে যেখানে একজন মাত্র পুরুষ আছেন এবং যাঁহার উপার্জনের উপর সমস্ত পরিবার নির্ভর করে, তিনি তখন আপিসে যাইবেন, না রেশন-টিকিট হাতে করিয়া সারাদিনের জন্য সারিতে গিয়া দাঁড়াইবেন? সামান্য কয়টি নিয়ন্ত্রিত দোকানেই যে-সব কর্মচারী চাউল, আটা এবং কয়লা আনিয়া দিতে পারে না, তাহারা হাজার হাজার দোকানে মাল সরবরাহ করিবে, ইহা লোকে বিশ্বাস করিবে কিরূপে?

যে-দেশে গবর্ন্মেণ্টের কর্ম্মচারীদের সহিত জনসাধারণের কোন যোগ নাই, যেখানে কর্মচারীদের অক্ষমতা স্বচক্ষে দেখিয়া এবং দুর্নীতি ও উৎকোচ গ্রহণের ব্যাপক জনরব শুনিয়াও কর্তৃপক্ষ একবার অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতে অনিচ্ছুক, সে-দেশে রেশন-কার্ড কিছুতেই প্রবর্তিত হইতে পারে না। গবর্ন্মেণ্ট যে গরজের সহিত সৈন্যদের জন্য খাদ্য ক্রয় করিতেছেন, যদি অন্তত: সেইটুকু আগ্রহের সহিতও দেশবাসীর জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতেন এবং এই ব্যাপারে

উৎকোচ গ্রহণের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে খাদ্যসমস্যা এত তীব্র হইত না। মালগাড়ীর অভাবে লোকে পাঁচ আনার কয়লা পাঁচ টাকায় কেনে, আর পৃথিবীর বৃহত্তম নৌশক্তির সাম্রাজ্যে থাকিয়া জাহাজের অভাবে গম আসে না বলিয়া অনাহারে থাকে, ইহা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের পক্ষে দুরপনেয় কলঙ্কের কথা।

—

বেতন কাটিয়া টাকা জমাইবার প্রস্তাব

ভারত-সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট এক সার্কুলার পাঠাইয়া প্রস্তাব করিয়াছেন যে তাঁহাদের অধীনে ৫০৲ টাকার বেশী বেতনের যে-সব কর্মচারী আছে, তাহারা যে বোনাস পায় তাহার অর্দ্ধেক কাটিয়া লইয়া পোষ্টাফিসে যার যার নামে ডিফেন্স সেভিং একাউণ্ট খুলিয়া দেওয়া দরকার। যুদ্ধ থামিবার এক বৎসর পর এই টাকা তাহারা তুলিতে পারিবে। গবর্মেণ্টের মতে সমগ্র ভাবে দেশের জন্য এবং বিশেষভাবে কর্মচারীদের মঙ্গলের জন্যই এই বন্দোবস্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

পঞ্চাশ টাকার উর্দ্ধ বেতনের কর্মচারিবৃন্দ মাসে বড়-জোর পাঁচ-দশ টাকা বোনাস পাইয়া থাকে। লক্ষ লক্ষ কর্মচারীর নিকট হইতে মাসে মাসে ইহার অর্দ্ধেক কাটিয়া লইলে গবর্মেণ্টের হাতে একটা মোটা টাকা যায় বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে দুরবস্থা এখনই হইয়াছে তাহা যে আরও বেশী বাড়িবে সেটা কি টাকার গরজের তাগিদে গবর্মেণ্ট একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন? গবর্মেণ্ট নিজে তাঁহাদের কর্মচারীদের কয় টাকা করিয়া বোনাস দিয়াছেন? নিম্নলিখিত হারে যেখানে খরচ বৃদ্ধি হইয়াছে, সেখানে প্রত্যেকের বেতন যদি তিন গুণ বাড়ানো হইত তাহা হইলে না হয় গবর্মেণ্টের পক্ষে দুর্দিনে টাকা চাহিবার মুখ থাকিত; কিন্তু তাহা ত তাঁহারা করেন নাই।

মূল্য বৃদ্ধির নমুনা—

	ছিল	হইয়াছে	বৃদ্ধির হার
চাউল	৫ টাকা	১৫ টাকা	৩০০./.
কয়লা	৷৷০ আনা	২ "	৪০০./.
বস্ত্র	২ টাকা	৬ "	৩০০./.
সাবু	৷০ আনা	১ "	৪০০./.
ব্রেড	৴০ "	৷৷০ আনা	৮০০./.

মধ্যবিত্ত বাঙালীর আয় বাড়িয়াছে বড়-জোর শতকরা ৫ টাকা, কিন্তু ব্যয় বাড়িয়াছে অন্ততঃ তিন গুণ। ইহার উপর সদাশয় ভারত-সরকার যেভাবে কর্মচারীদের বেতন কাটিয়া মঙ্গল সাধনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন তাহাতে আনন্দে ইহাদের মুখ কালি হইয়া উঠিবারই কথা।

—

ভারতবর্ষে রেল চলে কাহার প্রয়োজনে?

সর্ নরম্যান এঞ্জেল নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত জনৈক বিলাতী রাজনীতিবিদ্। সম্প্রতি তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষে ৩৬০০০ মাইল রেলপথ তৈরি হইয়াছে এবং ইহার ফলে দ্রুত ফসল চালান দেওয়া সহজ হওয়ায় দুর্ভিক্ষ অনেক কমিয়া গিয়াছে। এই সব রেলপথ নির্মাণের জন্য ভারতীয় মূলধনের অপেক্ষায় থাকিলে ইহার অধিকাংশ তৈরিই হইত না।" ভারতবর্ষে এই সামান্য কয়েক হাজার মাইল রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং ভারতবাসীর ধারণা ভারতবর্ষ হইতে মূলধন তুলিয়া সৎ ভাবে ইহা কাজে লাগাইলে ইহার এক-চতুর্থাংশ টাকাতেই এই কয় হাজার মাইল রেল-পথ তৈরি হইতে পারিত। এই বিপুল মূলধন বিলাতের লোকেরা দয়া করিয়া দেয় নাই, প্রত্যেকটি টাকা দিবার পূর্বে তাহার সুদ পাওয়া যাইবে, রেলের লোকসান হইলেও ডিভিডেণ্ড বন্ধ হইবে না এই গ্যারাণ্টি আদায় করিয়া তবে দিয়াছে। ভারতবর্ষকেও বছর বছর প্রায় ২০ কোটি টাকা সুদ গণিতে হইতেছে।

তার পরের প্রশ্ন, কাহাদের জন্য রেল তৈরি হইয়াছে? প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের পার্থক্যের কথা না-হয় ছাড়িয়াই দিলাম। অতি অল্পদিন পূর্বের একটি ঘটনার কথা ধরা যাউক। কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল দূরবর্তী দত্তপুকুর হইতে প্রচুর দুধ কলিকাতায় আসে এবং বাজারে বিক্রয় হয়। উহার অধিকাংশই শিশু ও রোগীদের জন্য দরকার। এত দিন খুলনা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এই দুধ শিয়ালদহে আসিত। হঠাৎ এই ট্রেনটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরবর্তী ট্রেনে দুধ আনিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে বেলা হইয়া যাইবে। ইহা ছাড়া পূর্বোক্ত ট্রেনে দুধ আনিতে ভাড়ার দিক দিয়া যে সুবিধা পাওয়া যাইত, পরবর্তী ট্রেনে তাহা পাওয়া যাইবে না। এই ব্যবস্থা প্রথম যেদিন কার্য্যে পরিণত হয়, সেদিন অতিরিক্ত ভাড়া চার্জ করিবার ফলে দুধ-বিক্রেতারা শিয়ালদহ ষ্টেশনে বসিয়া থাকে।

এদিকে বাজারে ঐ দুধ না আসাতে সামান্য স্থানীয় দুধ যাহা আসিয়াছিল তাহা বার আনা সের দরে বিক্রয় হয়।

সংবাদ পাইয়া কর্পোরেশনের জনৈক কাউন্সিলার শিয়ালদহে গিয়া নিজের পকেট হইতে টাকা দিয়া উহাদিগকে ছাড়াইয়া আনেন। দত্তপুকুর কলিকাতা হইতে মাইল কুড়ি দূরে অবস্থিত। এই সামান্য কয়েক মাইল পথে সময়মত ট্রেন চালাইয়া দুধ আনিবার ব্যবস্থা না করিলে কলিকাতার লক্ষ লক্ষ শিশুর জীবন বিপন্ন হইবে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কি ইহা বিবেচনা করা প্রয়োজন বোধ করেন না? এক-শ মাইল দূর হইতে কয়লা, কুড়ি মাইল দূর হইতে দুধ আনিতে পারে না যে রেল তাহা নির্মিত না হইলেও কি এ দেশের খুব বেশী ক্ষতি হইত?

—

ভারতবর্ষে রেল হওয়ায় লাভ হইয়াছে কাহাদের?

শুধু এঞ্জিন আমদানীর হিসাবটাই ধরা যাক। বহু আন্দোলনের পর ভারতবর্ষে রেলের এঞ্জিন তৈরি করা যায় কি না সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার মিঃ জে. হামফ্রিজ এবং মিঃ কল্যাণ শ্রীনিবাসন নামক দুই জন বিশেষজ্ঞের উপর দেওয়া হয়। তাঁহাদের রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে যে ভারতবর্ষে রেলের এঞ্জিন তৈরি করা যায়, তাহার সমস্ত উপাদান ও উপযুক্ত শ্রমিক এখানেই পাওয়া যায় এবং ভারতীয় কারখানায় তৈরি এঞ্জিন বিলাতী এঞ্জিন হইতে কোন অংশে খারাপ নয়। দেশী এঞ্জিনের মূল্য আমদানী এঞ্জিন হইতে অন্যূন শতকরা ২০৲ হারে কম পড়িবে। রিপোর্টে পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে যে এই যুদ্ধের মধ্যেই এঞ্জিন তৈরিতে হাত দেওয়া উচিত, কারণ ইহাই ভারতবর্ষে এঞ্জিন নির্মাণ আরম্ভ করিবার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়। রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ১৯৪০-এর জানুয়ারী মাসে।

এই রিপোর্ট অনুসারে কাজ হইতে গেলে বিলাতী কায়েমী স্বার্থের অসুবিধা কত দূর, এত দিন ধরিয়া তাঁহারা কত কোটি টাকা ভারতবর্ষে এঞ্জিন বিক্রয় করিয়া রোজগার করিয়াছেন তাহার একটা হিসাব লওয়া দরকার। ১৯০১ হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালের মধ্যে ৪২৪২টি ব্রড গজ এবং ১৬৭২টি মিটার গজ লাইনে উঠিয়াছে, তাহার পর ১৯৪০-৪১ হইতে ১৯৫৫-৫৬ পর্য্যন্ত ২৫৯২টি ব্রড গজ এবং ৯০৮টি মিটার গজ নূতন এঞ্জিন ক্রয়ের জন্য টাকার ব্যবস্থা হইতেছে। একটি ব্রড গজ এঞ্জিনের মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ হইতে দুই লক্ষ টাকা এবং মিটার গজ এঞ্জিনের মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা। এই হিসাবে দেখা যায় এ যাবৎ প্রায় ৬০ কোটি টাকার ব্রড গজ ও ১৬ কোটি টাকার মিটার গজ এঞ্জিন আমদানী হইয়াছে এবং আরও প্রায় ৪০ কোটি টাকার ব্রড গজ ও ৯ কোটি টাকার মিটার গজ এঞ্জিন ক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া রাখা হইয়াছে।

রিপোর্টে প্রকাশ, ১৮৮৫ হইতে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত জামালপুর কারখানায় মোট ২১৪টি ব্রড গজ এঞ্জিন তৈরি হইয়াছে। এই সব এঞ্জিন গাড়ীই টানিয়াছে সন্দেহ নাই, তথাপি প্রায় ৪০ বৎসর ভারতবর্ষে এঞ্জিন তৈরির পর হঠাৎ উহা বন্ধ হইয়া বিলাত হইতে আমদানী সুরু হইয়া গেল। ভারতবর্ষে তৈরি এঞ্জিনও যে বেশী দামে কেনা বিলাতী এঞ্জিনের মতই গাড়ী টানিতে সক্ষম এই সত্যটি অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ ভারতে এঞ্জিন নির্মাণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর অন্ততঃ ১৮টি ব্রড গজ ও ৩৮টি মিটার গজ এঞ্জিন প্রয়োজন। এই পরিমাণ এঞ্জিন তৈরি করিলে প্রত্যেকটির জন্য ব্যয় আমদানী এঞ্জিন অপেক্ষা কম পড়ে। জামালপুর, কাঁচরাপাড়া এবং আজমীঢ়ের কারখানা এঞ্জিন নির্মাণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ইহাও পরীক্ষিত হইয়াছে। মিঃ হামফ্রিজ এবং মিঃ শ্রীনিবাসন তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের রেলওয়েগুলির পক্ষে নিজ নিজ এঞ্জিন দেশেই নির্মাণ করিয়া লওয়ার টেকনিকাল বাধা কিছুই নাই। টেকনিকাল বা অর্থনৈতিক বাধা নাই বটে, কিন্তু সব্ নরম্যান এঞ্জেলের দেশের কারখানাওয়ালারা এঞ্জিন বিক্রয় করিয়া তাহাদের বার্ষিক কোটি কোটি টাকা আয় ছাড়িতে আপত্তি করিতে পারে। ভারতবাসীর দাবীর অথবা হামফ্রিজ-শ্রীনিবাসনের সুপারিশ অপেক্ষা এই আপত্তির জোর বেশী।

—

অধ্যাপক কিরণকুমার ভট্টাচার্য

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক কিরণকুমার ভট্টাচার্য্য, এম-এ, এল-এল-এম (লণ্ডন), বার-এট-ল ভারতরক্ষা-আইনে বন্দী হইয়াছেন। তাঁহাকে বিনাবিচারে আটক করা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি তাহা জানিবার উপায় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এমন কি অপরাধ করিলেন যাহাতে বিজয়ের পথে ধাবমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমর-প্রচেষ্টা বিপন্ন হইয়া উঠিল, এবং ফলে ভদ্রলোককে আটক রাখিবার প্রয়োজন ঘটিল, তাহা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য। প্রকাশ, ইঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীরূপে আটক রাখা হইয়াছে, প্রথম শ্রেণীর বন্দীর সুবিধাটুকু পর্যন্ত ইঁহাকে দেওয়া হয় নাই। ইহা সত্য হইলে প্রথম শ্রেণী

রাখিবার কোন সার্থকতা থাকে না। দেশের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের সহিত এই শ্রেণীর ব্যবহার ভারতবাসীকে বার-বার শুধু তাহার অসহায়তার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

—

মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশন

মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশনের সংবাদ এখন জগৎ-বিদিত। এ দেশের লোক মাত্রই এবং এ দেশের বাহিরে শতসহস্র মানব জাতির উন্নতিকামী ভদ্রজন এই বিষম পরীক্ষার ফলাফল উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে অপেক্ষা করিবে। গান্ধীজীর বয়স, স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং মানসিক উদ্বেগ এই সকলই এরূপ অনশন-ব্রতের বিরোধী। আমাদের বর্ত্তমান নিরুপায় অবস্থার প্রতিকারের কোন উপায় নাই, মহাত্মাজীর কল্যাণ কামনাই একমাত্র পথ।

প্রায়োপবেশনের কারণ সম্বন্ধে মহাত্মাজীর তৃতীয় পত্রের যে যে অংশে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে তাহার অনুবাদ এইরূপ:—

৯ই আগষ্ট এবং উহার পরে দেশব্যাপী যে হিংসাত্মক কার্য্য ঘটিয়াছে, তাহা কংগ্রেসের সকল প্রধান প্রধান কর্মীর গ্রেপ্তারের পরে হইলেও তজ্জন্য কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাবই দায়ী ইহাই আপনার মত। এই মতের ন্যায্যতা অন্ততঃ আপনি আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন—ইহাই আমি চাহিয়াছি এবং শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহাই চাহিব। গবন্মেণ্টের অপ্রয়োজনীয় কঠোর কার্য্যই কি হিংসাত্মক ঘটনাবলীর জন্য দায়ী নহে?

* * *

ভারত-সচিবের মত দায়িত্বশীল ব্যক্তি কংগ্রেস এবং আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করিয়াছেন, সেগুলির সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই, আমার মতে সেগুলি প্রমাণসহও নহে। দৃঢ়ভাবে আমি একথাই জানাইতে চাহি, সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা নিজেদের কার্য্যের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন গবন্মেণ্টকেই করিতে হইবে, আমাকে নহে। কংগ্রেসসেবী বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিদের দ্বারা হত্যাকাণ্ডের কথা আপনি উল্লেখ করিয়াছেন। আশা করি, আপনার মতই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমার ধারণাও স্পষ্ট। এ সম্পর্কে আমি এ কথাই বলিতে চাহি, গবন্মেণ্টই জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে। ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করিয়া তাহারাই সিংহবিক্রম দেখাইয়াছে। এই হিংস্রতা এমন ব্যাপক ছিল যে, মুশার দাঁতের বদলে দাঁত কাড়িয়া লইবার নীতিকেও উহা ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং একজনের অপরাধে দশ হাজার লোককে দোষী করা হইয়াছে। যীশুখ্রীষ্টের অপ্রতিরোধ নীতির কথা এখানে উল্লেখ করিয়াও লাভ নাই। পূর্ব্বে আমি যাহা উল্লেখ করিলাম, তাহা ছাড়া সর্ব্ব-শক্তিমান ভারত-গবন্মেণ্টের দমনমূলক নীতিকে আর কোন প্রকারেই আমি বিশ্লেষণ করিতে পারি না। ভারতের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নরনারীর অভাব অনটনের কথাও চিন্তা করিয়া দেখুন। এ সময় যদি জনসাধারণের বিশ্বাস-ভাজন জাতীয় গবন্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তবে এই দুঃখদুর্দ্দশা সম্পূর্ণ দূরীভূত না হইলেও অনেকাংশে লাঘব হইত। আমার এই মনঃকষ্ট দূর হইবার কোন পথ যদি খুঁজিয়া না পাই, তবে সত্যাগ্রহীদের জন্য নিজের ক্ষমতানুযায়ী অনশনের যে নির্দ্দেশ রহিয়াছে, আমাকে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। ৯ই ফেব্রুয়ারী প্রাতরাশ শেষ করিয়া আমি ২১ দিনের জন্য অনশন আরম্ভ করিব। সাধারণতঃ অনশনকালে আমি জলের সহিত লবণ মিশাইয়া লই, কিন্তু এখন আমার শরীরে তাহা সহ্য হয় না। সে জন্যই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি জলের সহিত লেবুর রস মিশাইয়া নিতে চাহি।

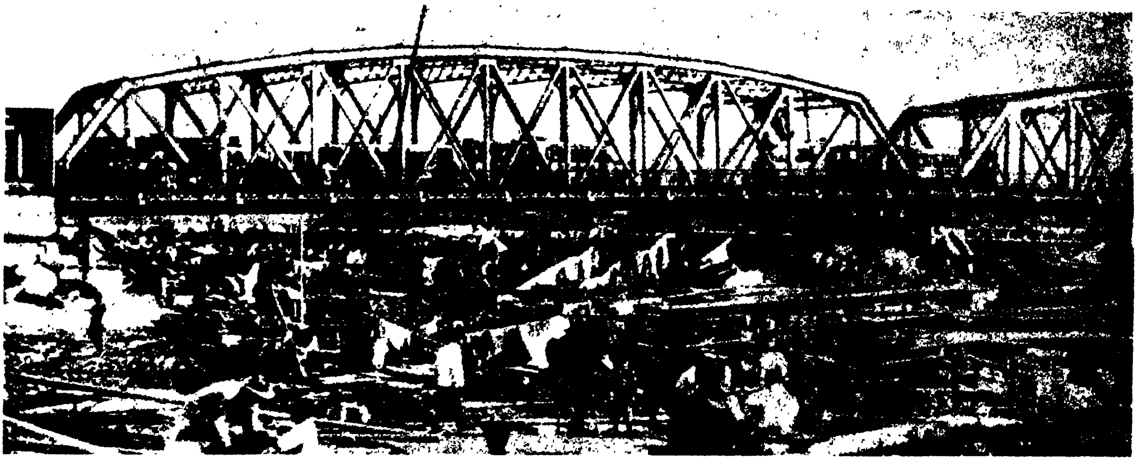
আমরণ অনশন করা আমার উদ্দেশ্য নহে।—আনন্দবাজার পত্রিকা

বড়লাট ও মহাত্মাজীর পত্রে যে হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য অরাজকতার দায়িত্ব লইয়া তর্কের নির্দ্দেশ রহিয়াছে তাহার বিচারের সময় এক দিন আসিবে নিশ্চয়। বর্ত্তমান অবস্থার কোন প্রকার ওকালতিই ন্যায়ধর্ম্মসঙ্গত হইতে পারে না, কেন-না এখন জনমতের কোনই মূল্য নাই এবং ন্যায় বিচারের লোকপ্রসিদ্ধ পন্থা সকল অচল। ভ্রমপ্রমাদ সকলেরই হইতে পারে এবং হয়ত নিষ্পক্ষ বিচারে গান্ধীজীর ভুলভ্রান্তিও প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু যত দিন নিষ্পক্ষ ও ধর্ম্মসঙ্গত ন্যায়-বিচারে সেরূপ প্রমাণ না পাওয়া যাইবে তত দিন এ দেশের জনসাধারণ এবং এ দেশের বাহিরে বহু শতসহস্র লোক মহাত্মা গান্ধীর অকলঙ্ক, অকপট, নির্দ্দোষ হৃদয়ের সততায় বিশ্বাস রাখিয়া বড়লাটের উক্তির প্রমাণ অপেক্ষা করিবে। অহিংসা যাঁহার জীবনের ইষ্টমন্ত্র এবং যাঁহার প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক আচরণে

"অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধমসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন সত্যেনালীকবাদিনম্।"

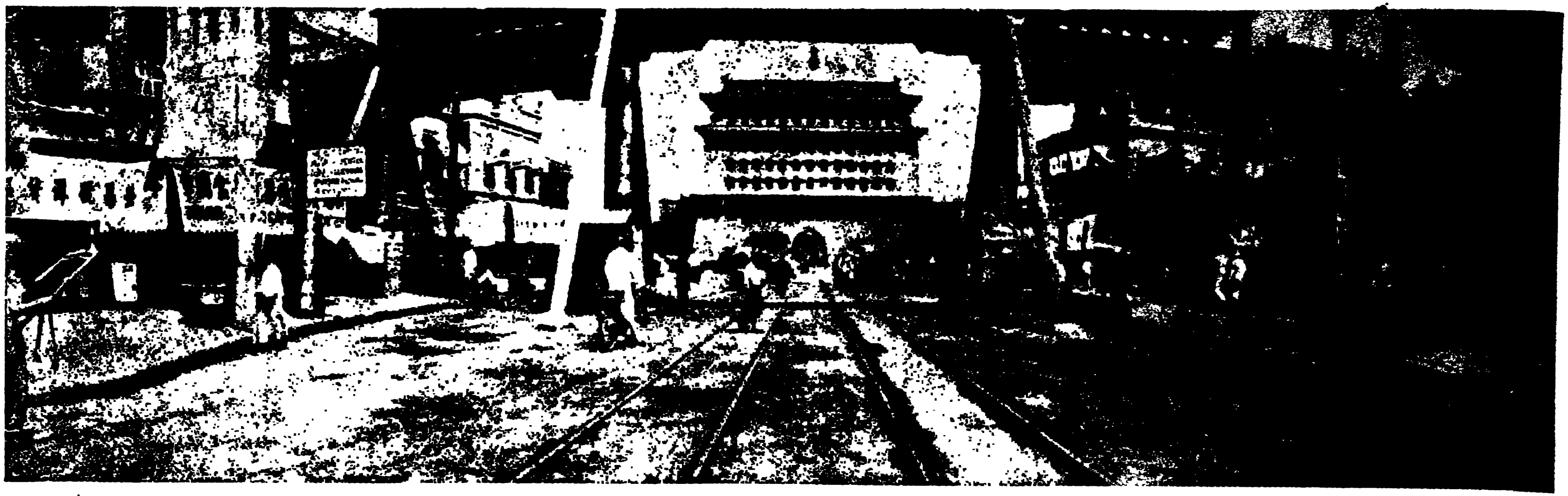
রূপ মূলনীতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, সেরূপ নিষ্কলুষ, সত্যকাম পুরুষকে সরাসরি বিচারে দোষী প্রমাণ করা পৃথিবীর কোন ব্যক্তির ক্ষমতার মধ্যে নাই। শেষ বিচার ইতিহাসের, এবং আমাদের আশা আছে যে সেই বিচারের সময় সুদূর ভবিষ্যতে নয়, কেন-না এ দেশের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা ক্রমেই সমস্ত জগতে অকল্যাণ ডাকিয়া আনিতেছে এবং ইহার প্রতিকার সত্বর না হইলে শুধু ভারতের বা ব্রিটেনের নহে সমস্ত সভ্য জগতেরই সমূহ বিপদ।







উপরে : মধ্য-চীনে ইয়াংসি নদীর একটি দৃশ্য ; মধ্যে : সাংহাইয়ের উদ্যান-সেতু ;
নিম্নে : ডাঃ সান্ ইয়াৎ-সেনের সমাধিস্থান, নানকিং



পিকিং নগরীর প্রধান প্রবেশ-দ্বার ও রাজ-পথ



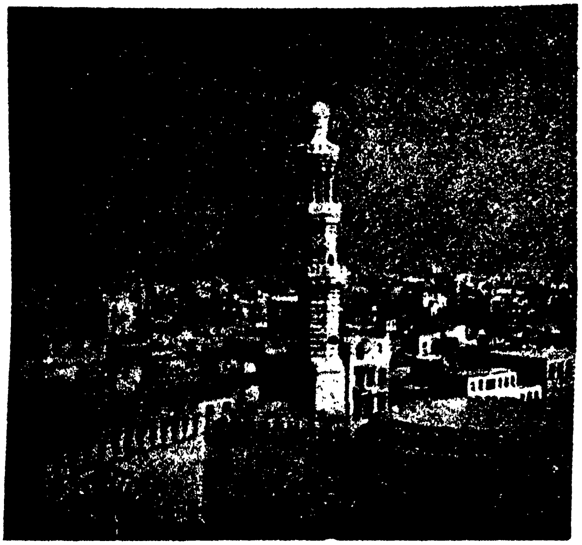
পিকি   বৈদেশিক দূতাবাস-পল্লী



তুলোঁ বন্দর। এখানে ফরাসী নৌবহর বিনষ্ট করা হইয়াছে



মাল্টার একটি দৃশ্য



কায়রো। অষ্টম বাহিনীর প্রধান সেনানিবাস



সাহারা মরুভূমির মধ্যবর্ত্তী একটি শুষ্ক নদীর দৃশ্য



আলেকজাণ্ডিয়া

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

সোভিয়েট সমরাঙ্গনে দ্বিতীয় পর্ব্বের কার্য্যে সাফল্যের লক্ষণ সম্যকভাবেই দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলাম যে সোভিয়েট রণনায়কগণের বর্ত্তমান শীতকালীন অভিযানের কার্য্যক্রম প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত। প্রথমে পথঘাটবিরল অঞ্চলের ভিতর দিয়া ছিদ্রপথে, অতর্কিত আক্রমণে, জার্ম্মান বাহিনীগুলির শক্তিকেন্দ্রের সহিত যোগ-সূত্র—অর্থাৎ লোকলস্কর, রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র চলাচলের পথ—কর্ত্তন করা। দ্বিতীয়তঃ, ঐ কাজ সফল হইলে, প্রবল শক্তি প্রয়োগে বিভিন্ন আক্রমণকারী বাহিনীগুলি সংযুক্ত করিয়া, বেড়াজাল রচনা করিয়া, শক্তিকেন্দ্রবিচ্যুত জার্ম্মানবাহিনীগুলিকে ঘিরিয়া বিনাশ করা। প্রথম পর্ব্বে স্টালিনগ্রাড, ভরোনেস ইত্যাদি দক্ষিণ-পূর্ব্ব রুশদেশস্থিত জার্ম্মানবাহিনীগুলিকে মূল সরবরাহ কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং ককেশসস্থিত ফন লিস্টের অধীনস্থ জার্ম্মান-দলকেও আগলাইয়া আটক করার ব্যবস্থা চলিতে থাকে। এখন ডন, ভল্গা ও ডোনেৎস নদত্রয়ের অববাহিকায় জাল গুটাইবার কার্য্য চলিতেছে। ককেশসে বেড়াজাল কাটিয়া জার্ম্মানদল পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, সে চেষ্টা সফল হইলেও এত চেষ্টা ও এত ক্ষতি স্বীকার করিয়া নাৎসী রণনায়কগণ যে ককেশস অভিযান চালনা করিয়াছিল তাহার সকল ফলই ধূলিসাৎ হইবার সম্ভাবনা আছে।

স্টালিনগ্রাডের অধিকার লইয়া যে প্রচণ্ড যুদ্ধ, দাবানলের মত, বিগত কয়মাস ধরিয়া জীবন্ত ও নির্জ্জীব মহামূল্য কত শক্তি, কত সম্পদ দহন করিতেছিল, তাহা সোভিয়েটের এই নূতন অভিযানে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। ঐ অঞ্চলে অবরুদ্ধ জার্ম্মান ষষ্ঠ সেনাবাহিনীর নিঃশেষের সঙ্গে জার্ম্মান দেশে যে দুঃখের প্রবাহ চলিয়াছে তাহার কথা সকলেই জানে। এখন ইহার পর সোভিয়েট সেনাদল যদি আরও তিনটি বাহিনীকে নির্ম্মূল করিতে পারে তবে জার্ম্মান দলের কেবল যে দারুণ শক্তিক্ষয় হইবে তাহাই নহে উপরন্তু অক্ষশক্তির উৎসে নৈরাশ্যের স্রোতও বহিতে আরম্ভ হইবে। ইহাই রুশ সেনানায়কগণের প্রধান লক্ষ্যস্থল এবং এইখানেই মিত্র শক্তিপুঞ্জের প্রধান আশা-ভরসার আকর।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে এবারকার রুশ অভিযান পরিমিত-প্রসর ও নির্দ্দিষ্ট স্বল্পলক্ষ্য লইয়া চালিত হইয়াছে। জার্ম্মান সেনানায়কগণ ইয়োরোপের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিগত কয় বৎসর শীতকালে যুদ্ধ বিরতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবারকার রুশ অভিযান চালনের মূলসূত্র এই অক্ষশক্তির যুদ্ধ বিরতির চেষ্টার উপর স্থাপিত। যুদ্ধ বিরতির সুযোগে পরিমিত প্রসরের উপর যথাসাধ্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ দ্বারা অভীষ্ট ফললাভের অবকাশ পাওয়া যাইবে এই আশায় রুশ অভিযান চালকগণ তাঁহাদের শক্তি সামর্থ্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত অতিপ্রচণ্ড আক্রমণ চালিত রাখিয়াছেন। অন্য অবস্থায় এইরূপ একমুখী অভিযানে বিষম বিপদের আশঙ্কা থাকিত কেন-না সমস্ত শক্তি যেদিকে কেন্দ্রীভূত হইতেছে তাহার বিপরীত মুখে বিপক্ষের প্রবল পাল্টা আক্রমণের সম্ভাবনা খুবই থাকিত। এখন যে অবস্থায় সোভিয়েটের বাহিনীগুলি অগ্রসর হইতেছে তাহাতে সে ভয় অপেক্ষাকৃত কম কেন-না আক্রান্ত সেনার উদ্ধারই এখন অক্ষশক্তির মুখ্য লক্ষ্য।

বর্ত্তমান অভিযানের ফলাফল বিচারের সময় এখনও আসে নাই। তবে ইহা সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝা যাইতেছে যে যতটা কার্য্যসিদ্ধি ঘটিয়াছে তাহাতে অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই। এই মুখ্য উদ্দেশ্য কেবলমাত্র হিটলারের বিগত গ্রীষ্ম ও শরৎকালীন অভিযানের লব্ধফল নষ্ট করাই নহে। বরঞ্চ আগামী গ্রীষ্ম অভিযানের পথ কণ্টকময় ও বিপৎসঙ্কুল করিয়া সুদৃঢ় ভাবে সোভিয়েটের রক্ষণব্যূহের স্থাপনা করাই প্রধান লক্ষ্য। এই রক্ষণব্যূহের স্থিতি কোন্ রেখার উপর স্থাপিত হইবে তাহা এখনও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না, কেন-না তাহা নির্ভর করে নাৎসী শীতকালীন রক্ষা ব্যবস্থার কতটা এই অভিযানে নষ্ট হয় এবং জার্ম্মানদল কতটা পশ্চাৎপদ হয়। তবে খারকভ ও রষ্টভ নগরদ্বয় যে সোভিয়েটের রক্ষণব্যূহের দুই প্রধান কেন্দ্ররূপে অতি আবশ্যক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই দুই কেন্দ্র সুদৃঢ় ভাবে সোভিয়েটের হস্তে না থাকিলে ককেশস অভিমুখী জার্ম্মান সৈন্য চালনার পথ রোধ করা দুরূহ ব্যাপার হইবে।

সোভিয়েট গণসেনা এবার বিনা সাহায্যে এবং অন্যের মুখে না তাকাইয়াই অসম্ভব সম্ভব করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই শীত তাহাদের শত্রুদমনের যেন শেষ অবকাশ এইরূপ সিদ্ধান্তের উপর সমস্ত পণ করিয়া "হিসাব-নিকাশ" চলিতেছে। শৌর্য্যে বীর্য্যে রুশ দেশ অপরিমিত সম্পদের অধিকারী কিন্তু বলা বাহুল্য আজকালকার যুদ্ধে উহাই একমাত্র সম্বিৎ নহে। সুতরাং অল্প কিছু দিনের মধ্যে সোভিয়েটের মিত্রবৃন্দ যদি সম্যক্‌ভাবে যুদ্ধদানে

প্রস্তুত না হইতে পারেন তবে সোভিয়েট সেনার এই অপূর্ব্ব পুরুষকার সম্পূর্ণ ফলপ্রদ না হইতেও পারে।

কাসাব্লাঙ্কায় মিত্রপক্ষের দুইজন প্রধান সদলে মন্ত্রণা সভায় বসিয়াছিলেন। সেখানে কি ভাবে বর্ত্তমান রণাঙ্গনগুলির ব্যবস্থা হইল এবং ভবিষ্যতের জন্যই বা কি সিদ্ধান্ত হইল তাহা সাধারণের পক্ষে জানা সম্ভব নহে। মোটের উপর যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে মিত্রপক্ষের মধ্যে—অন্ততঃপক্ষে যাহাদের নিদারুণ শক্তিক্ষয় এখনও হয় নাই তাহাদের মধ্যে—এখন একটা উৎসাহের ঢেউ চলিতেছে এবং তাহার বশে হয়ত এতদিন পরে কোনও ব্যাপক অভিযানের পরিকল্পনা গঠিত হইতেও পারে। ১৯৪২ সাল যেভাবে গিয়াছে ১৯৪৩ সাল সেভাবে আরম্ভ হয় নাই, এখন শেষরক্ষা কিভাবে হয় তাহাই দ্রষ্টব্য।

* * *

উত্তর-আফ্রিকায় ব্রিটিশ অষ্টমবাহিনী ইতালির আফ্রিকার সাম্রাজ্য বেদখল করিয়া বসিয়াছে। যে সুদীর্ঘ পথে জেনারেল মণ্টগোমেরী সৈন্য চালনা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার মধ্যে যদিও বিশেষ বাধা কোথাও অতিক্রম করিতে হয় নাই তবুও ইহাতে সন্দেহ নাই যে এই বিশাল মরু অভিযান অতি নিপুণভাবেই করা হইয়াছে। অন্য পক্ষে জেনারেল রোমেলের সেনাদল চাণক্য নীতির অনুযায়ী পথে "অশক্তর্বলিন" শত্রুকে দেশ ছাড়িয়া দিয়া দুর্গম দেশে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ট্যুনিসিয়ায় এখন যেরূপ পরিস্থিতি তাহাতে কোন্ পক্ষ দ্রুততর বলসঞ্চয়ে সমর্থ তাহার বিচারই আসল কথা। প্রথমে যখন মাকিন ও ব্রিটিশ সেনাদল পশ্চিম-উত্তর আফ্রিকায় অধিকার স্থাপনা আরম্ভ করে তখন প্রশ্ন ছিল যে অক্ষশক্তি কোনও স্থলে নূতন শক্তিকেন্দ্র গঠনে সমর্থ হইবে কি না। যেরূপ দ্রুতবেগে একের পর এক ফ্রান্সের উত্তর-আফ্রিকাস্থিত শক্তিকেন্দ্রগুলি মিত্রপক্ষের অধিকারে আসিতে থাকে তাহাতে অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে উত্তর-আফ্রিকায় এ যাত্রায় এক চেষ্টায় অক্ষশক্তির উচ্ছেদ সম্পূর্ণ ভাবেই হইবে। অবশ্য অতটা আশা করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল কি না তাহাও বিচার্য্য। কিন্তু মার্শাল রোমেলের পক্ষে ব্রিটিশ অষ্টম বাহিনীর কবল এড়াইয়া যাওয়ায় বিলাতে ক্ষোভের যে অল্প নমুনা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় এখনও মিত্রপক্ষে যুদ্ধ-সমালোচকদিগের মধ্যে অযৌক্তিক আশার প্রভাব যায় নাই। মার্শাল রোমেলের ন্যায় অভিজ্ঞ যুদ্ধ-বিশারদকে এবং "আফ্রিকা কোরের" ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ সেনাবাহিনীকে স্থানচ্যুত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়নে বাধ্য করাই যে কোন সেনানায়কের পক্ষে কৃতিত্ব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রোমেলের "আফ্রিকা কোর" এখনও কতটা যুদ্ধক্ষম ও সুদক্ষ আছে তাহার পরিচয় ট্যুনিসিয়াতে সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। যে মুহূর্ত্তে তাহারা নূতন আশ্রয়স্থলে আসিয়া নূতন অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয় তাহার পরেই দক্ষিণ ট্যুনিসিয়ার অবস্থা পরিবর্ত্তন ঘটে। এরূপ যুদ্ধপ্রিয় ও সুদক্ষ সেনাবাহিনীকে সহস্র মাইল হটাইয়া দেওয়া জেনারেল মণ্টগোমেরী-চালিত অষ্টম ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষে প্রশংসার বিষয়।

সুদূর প্রাচ্যে জাপানের পক্ষ হইতে নূতন সাড়া পাওয়া যাইতেছে। মাকিন বক্তাদের মুখ হইতে যে সকল তথ্য পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় জাপানের বিরুদ্ধে প্রকৃত অভিযানের আরম্ভ হইতে এখনও দেরি আছে। বিপক্ষ যখন বলপ্রয়োগে সমর্থ এবং আক্রমণের ব্যবস্থায় চেষ্টিত তখন সে যে ক্ষীণবল বা পরাস্ত নহে সে কথা বলা বাহুল্য। এত দিন নিউগিনির এক কোণে যাহা ঘটিতেছিল সেটা "মক্স" করা মাত্র ছিল, প্রকৃত ঘাত-প্রতিঘাত যাহা ঘটিবে তাহা এখনও ভবিষ্যতের মধ্যেই আছে এইরূপ ভাবাই উচিত। এতাবৎ যাহা ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে মিত্রপক্ষের সপক্ষে একটি মাত্র বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাহা আকাশপথে। জাপানী হাওয়াইবহর এখন আর এসিয়ায় ও প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপমালায় পূর্ব্বেকার মত অপ্রতিহত শক্তিতে আকাশ অধিকার করিয়া নাই। সে ক্ষেত্রে মিত্রপক্ষের আকাশশক্তি সতেজে যুদ্ধ দান করিতেছে এবং সে ক্ষেত্রে মিত্রশক্তির প্রাধান্য এখনও প্রসারিতই হইতেছে মনে হয়। পাপুয়ায়, এবং কিছু অংশে গুয়াডালক্যানারে, মিত্রপক্ষের জয় বিশেষ ভাবে বিমান পথেই অর্জ্জিত হইয়াছিল। জাপানের নৌবলে আঘাত লাগিয়াছে সত্য, কিন্তু সে আঘাত কতটা সাংঘাতিক তাহা বিচারের পথ সহজ নহে এবং সে বিচারে আর এক তথ্যের প্রয়োজন যথা, জাপানের নূতন জাহাজ নির্ম্মাণের এবং পুরাতনের মেরামতের ব্যবস্থা কিরূপ আছে। মোটের উপর আমরা দেখিতে পাই যে দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগর এবং পূর্ব্ব-ভারত মহাসাগর এই দুই অঞ্চলের ভিতরের দিকের জলপথগুলির উপর জাপানের নৌবলের প্রাধান্য এখনও অক্ষুন্ন আছে, সুতরাং জাপানের নৌবল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে ইহা বলা সমীচীন হয় কিনা সন্দেহ। যে সকল অঞ্চলে জাপানের গতিবিধি পূর্ব্বেকার মত অবাধ নাই—

যথা বঙ্গোপসাগর—সে সকল অঞ্চলেই মিত্রশক্তির হাওয়াই-বহর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যাহার ফলে জাপানী যুদ্ধ-জাহাজের পক্ষে সেখানে চলাচল করা নিরাপদ নহে।

ভারত ও ব্রহ্ম সীমান্তে এখন আক্রমণ পথ এবং ব্যূহ যোজনার স্থল লইয়া ধস্তাধস্তি চলিয়াছে। দুই পক্ষই পরস্পরকে হীনতর অবস্থায় ফেলিয়া আক্রমণের সুযোগ খুঁজিতেছে। এইরূপ "পাঁয়তারা" যত দিন চলে তত দিন দুই পক্ষই প্রকৃত সংবাদ গোপন রাখিতে বাধ্য—বলবৃদ্ধি বা বলক্ষয় যাহাই হউক। সুতরাং ঐ অঞ্চলে এখন যবনিকার অন্তরালে যাহা কিছু চলিতেছে তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইতে এখনও দেরি আছে। তবে এক্ষেত্রেও জাপান আক্রান্ত—আক্রমণকারী নহে।

চীনদেশের সবিশেষ কোনও খবর সম্প্রতি আসে নাই। স্বাধীন চীনের আভ্যন্তরীণ সংবাদ যাহা সম্প্রতি আসিয়াছে—বিশেষতঃ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে—তাহা যদি সত্য হয় তবে তাহা মিত্রপক্ষের পক্ষে অতি সাংঘাতিক বিপদের কথা। জাপান জলে ও স্থলে প্রচণ্ড শক্তি ধারণ করে এবং প্রকৃত পক্ষে তাহার স্থলশক্তির অধিকাংশ এখনও স্বাধীন চীনের বিরুদ্ধে যুক্ত আছে। সেই শক্তির যদি কোনও বিশেষ অংশ মুক্ত হইয়া যায় তবে এসিয়ায় মিত্রশক্তির পক্ষে সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। জাপানের নিকট এখনও প্রায় ৬০ লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য আছে। এই শক্তি যুদ্ধে যোজনা করিতে যে অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের ক্ষমতার প্রয়োজন এবং সরবরাহের জন্য যে পরিমাণ নৌবল প্রয়োজন তাহা জাপানের নাই ইহাই মিত্রপক্ষের সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু সেই উৎপাদন ও সরবরাহের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় জাপান অক্লান্তভাবে ব্যস্ত আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'কাঁচামালে'র সমস্যা এখন আর জাপানকে ভাবিতে হয় না, সুতরাং মিত্রপক্ষকে অবহিত হইয়া এসিয়ার অভিযানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এসিয়ায় এবং প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপমালায় জাপানের ক্ষমতা বিস্তারের কাহিনী বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে তাহার মধ্যে পশ্চিমের "বিশেষজ্ঞ"দিগের অন্ধবিশ্বাস এবং নিদারুণ ভ্রমপ্রমাদের অসংখ্য ছিদ্রপথ ভেদ করাই জাপানের প্রধান কৃতিত্বের নিদর্শন। যুদ্ধের পর সে সকল কথার যথাযথ বিচার হইবে কিন্তু যদি এখনও পূর্ব্বেকার মত ভুলভ্রান্তিই চলিতে থাকে তবে জাপানকে এসিয়া মহাদেশ হইতে বিতাড়নের ব্যাপার সুদূর পরাহত বলিতে হইবে।

সম্প্রতি (৯ই ফেব্রুয়ারী) সংবাদপত্রে ওয়াসিংটন হইতে বিশেষ সংবাদদাতার মারফৎ প্রাপ্ত এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশিত তথ্যে বুঝা যায় যে জাপান ব্রহ্মদেশ ও ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জকে তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চায় এইরূপ সংবাদ জাপান হইতে আমেরিকায় বেতারযোগে গিয়াছে। আমেরিকার মন্তব্য এই যে উক্ত স্বাধীন রাষ্ট্র চীনদেশস্থ ক্রীড়নক পুত্তলিকার রাষ্ট্র—যাহা নান্‌কিনে স্থাপিত হইয়াছে—জাতীয় হইবে। আমেরিকার বিশেষজ্ঞদিগের মন্তব্য স্বরূপে বলা হইয়াছে যে, সুদূর প্রাচ্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদিগের মতে জাপকবলিত যে সকল অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার অধনতি ক্রমেই বাড়িতেছে সেখানকার অধিবাসীদিগের অসন্তোষ মিটাইবার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইতেছে। টোকিয়ো রেডিও জানাইয়াছে যে রেঙ্গুনের এক সম্মেলনে ব্রহ্মদেশে স্বাধীনরাষ্ট্র স্থাপনার ব্যবস্থার কথা জাপান ঘোষণা করে। সেই সম্পর্কে ইহাও বলা হয় যে "বৃহত্তর পূর্ব্ব এসিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য যাহাতে উভয়দেশে মিলিত ভাবে কার্য্য করিতে পারে তজ্জন্য জাপান ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে।" সংবাদে আরও জানা যায় যে বেতারে স্বাধীনতা ঘোষণার কোন তারিখ উল্লেখ করা হয় নাই। শাসনকার্য্য পরিচালনায় জাপ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যাহাতে বিভিন্ন জাতি সহযোগিতা করিতে পারে, তদ্রূপ নীতি অবলম্বনেরই কথা বলা হইয়াছে।

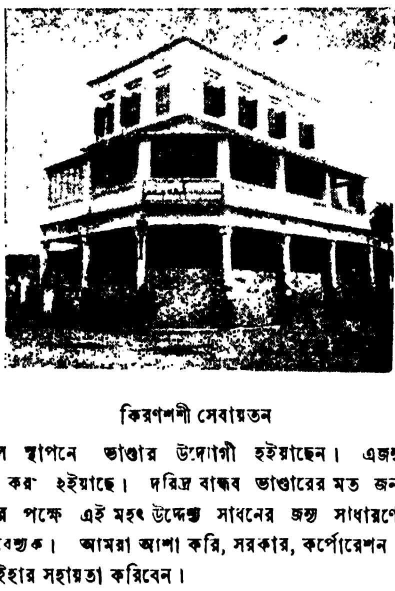
পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদিগের আরও অনেক মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, যথা এই ব্যবস্থায় নানা প্রকার অনটনের দোষ দেশীয় "তাঁবেদার" গবর্ন্মেণ্টের ঘাড়ে চাপাইবার সুযোগ জাপান পাইবে, এইরূপ নকল বদান্যতার সুযোগে জাপানের রেডিও ভারতে প্রোপাগাণ্ডা চালাইতে পারিবে ইত্যাদি। আমরা এই সকল মন্তব্য দেখিয়া এই পাশ্চাত্য "সুদূর প্রাচ্য রাষ্ট্রনীতি"-বিশারদগণের পাণ্ডিত্যে চমৎকৃত হইয়াছি এবং ততোধিক আশ্চর্য্য হইয়াছি এই সকল উদ্ভট মন্তব্যের এ দেশে প্রচারে।

ব্রহ্মদেশে চীন সম্পর্কে বিদ্বেষ ভাব আছে তাহা তো বিগত ব্রহ্মদেশ অভিযানের ব্যাপারে কয়েকবারই প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষের সহিত ব্রহ্মের সৌহার্দের পরাকাষ্ঠা বাজপাইকৃত ইন্দো-বর্মা চুক্তির প্রতি অক্ষরে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত। প্রধান মন্ত্রী উ-স'র কারারোধ হয় তাঁহার দলের সহিত জাপানের সম্পর্ক থাকার দরুন! এ সকল কথার পূর্ণ তথ্য যে জানে সেই বুঝিবে জাপানের এই অভিনবতম কূটনীতির প্রখর ক্ষুরধারের বিষয়। জাপানের সাম্রাজ্যবাদে অন্যের স্বাধীনতার স্থান নাই এ কথা কোরিয়া-মাঞ্চুরিয়া ও চীন জগৎকে জানাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ঈপ্সিত বস্তুর লোভ দেখাইয়া পরকে দিয়া কার্য্যোদ্ধার করাইয়া লওয়া এবং প্রয়োজন মত "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" নীতির অবলম্বন তো সাম্রাজ্যবাদের দুইটি মূলনীতি, সুতরাং এইরূপ অপরূপ মন্তব্য নিজেকে ছলনা করার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভিন্ন আর কিছু নহে।

দেশ-বিদেশের কথা

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার

গত উনিশ বৎসর যাবৎ উত্তর-কলিকাতায় দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার নানা ভাবে আর্ত্ত ও দুঃস্থ জনগণের সেবা করিয়া আসিতেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নামে ইহার অন্তর্গত একটি এলোপ্যাথিক ও একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিসালয় আছে। প্রতি বৎসর বহু রোগী এখানে চিকিৎসিত হইয়া থাকে। যেসব রোগী পথ্যাদির সংস্থান করিতে অসমর্থ তাহাদিগের জন্য এখানে বিনা পয়সায় দুধ প্রভৃতি দিবারও ব্যবস্থা আছে। কিছুকাল হইল, দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার 'কিরণশশী সেবায়তন' নামে একটি যক্ষ্মা চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাতে এক্স্‌ রে যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। সেবায়তনের সঙ্গে যক্ষ্মারোগীদের একটি



কিরণশশী সেবায়তন

হাসপাতাল স্থাপনে ভাণ্ডার উদ্যোগী হইয়াছেন। এজন্য এক খণ্ড ভূমিও ক্রয় করা হইয়াছে। দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের মত জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাধারণের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। আমরা আশা করি, সরকার, কর্পোরেশন ও সহৃদয় দেশবাসী ইহার সহায়তা করিবেন।

মেদিনীপুর জেলার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে রোগার্ত্তদের সেবাকার্য্য

বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট জজ শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় ও 'বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুলে'র সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামগতি বন্দোপাধ্যায়, এম-বি, এফ্‌-এস্‌-এম্‌-এফ্‌, মহোদয়ের উদ্যোগে ও চেষ্টায় উপরিউক্ত মেডিকাল স্কুলের হাউস সার্জেন ডাঃ শ্রীযুক্ত সরলেন্দুকুমার বসু এবং ইহার চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর কয়েক জন ছাত্র বিগত ১লা জানুয়ারী হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত কাঁথি মহকুমার খেজুরী থানার অন্তর্গত ৯ নং ইউনিয়নে অবস্থান করিয়া কলেরা-রোগাক্রান্ত ও উক্ত রোগ-অনাক্রান্ত গ্রামসমূহে কলেরার ভ্যাক্সিন দিয়াছিলেন এবং উদরাময়, আমাশয়, কলেরা ও ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই স্বেচ্ছাসেবকরূপে আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সহৃদয় আচরণে ও যত্নে এবং অকুণ্ঠ সেবাকার্য্যে বন্যাবিপন্ন জনগণ বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। রোগীগণের চিকিৎসার জন্য ইঁহারা সময়ে সময়ে সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। ইঁহাদের যত্নে ও চিকিৎসায় বিশেষ ভাবে বহু উদরাময় ও কলেরা রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

কশাড়িয়া গ্রাম-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল ও তাঁহার সরিক বাবুগণ তাঁহাদের নানা প্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও এই দুঃসময়ে চিকিৎসক দলটিকে আবাস-গৃহ ও অন্যান্য সাহায্য দান করিয়া সবিশেষ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ

পুস্তক পরিচয়

বঙ্গীয় শব্দকোষ—পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শান্তিনিকেতন, প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

এই বৃহৎ অভিধানখানির ৯১তম খণ্ড শেষ হইয়াছে। ইহার শেষ শব্দ "সম্প্রতি" এবং শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২৮৯৬।

ড.

নীলাঙ্গুরীয় (উপন্যাস)। শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা। পৃ. ৩৪২।

নীলা-জাতীয় ভালবাসা—ইহার প্রকাশ বিচিত্র—সকলের ধাতে সহ্যও হয় না, অথচ ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তীব্র ও মধুর স্বাদ আছে বলিয়াই ইহার পরিব্যাপ্তি আত্মচৈতন্যকে সর্ব্বক্ষণ ধরিয়া রাখিতে চাহে। ভালবাসার বিন্দুতে যে জগৎ সঙ্কুচিত হইয়া লগ্ন হইয়া যায়—যে জগৎ মনোময়, বাহিরের তুচ্ছ ঘটনাগুলিতে ভালবাসার বস্তুমূল্য যাচাই করিবার স্পৃহা সেখানে বলবতী। এই উপন্যাসের নায়ক শৈলেনের ভাগ্যে তেমনই নীলা-জাতীয় ভালবাসা লাভ হইয়াছিল। মীরাকে কেন্দ্র করিয়া লিণ্ডসে ক্রেসেণ্টের প্রত্যেকটি বস্তুকে সে বিশ্লেষণ করিয়াছে। প্রতিটি দণ্ডের সতর্ক হিসাব রাখা এবং মনের মধ্যে রঙের ক্রমবিকাশের তথ্য নির্ভুল ভাবে জানাইবার চেষ্টা ইহার মধ্যে পাই। আত্ম-বিস্মৃতির পরম মুহূর্ত্তেও চৈতন্যের এই প্রখর আলো বিন্দুমাত্র স্তিমিত হয় নাই। ভালবাসার ক্ষেত্রে এই সংযম প্রশংসনীয় হইলেও বাস্তবানুগতার দিক দিয়া ইহাকে ঠিক অবিকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ হয়। হয়ত এটিও জটিল প্রেমের একটি বিচিত্র দিক। স্ব-স্ব পরিমণ্ডলে যে ভালবাসা জন্মলাভ করিল—উগ্র আত্মমর্যাদাবোধের সীমা লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে সমক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। ছিল না বলিয়াই ঘৃণায় মেশানো এই আত্মকেন্দ্রিক ভালবাসা সার্থক হইতে পারে নাই।

লিণ্ডসে ক্রেসেণ্টের মত সাঁতরার ছবিও উজ্জ্বল। অম্বুরী, অনিল, অনিলের মা, সানু—খণ্ডচিত্র হিসাবে রাজু বেয়ারা, বিলাস, ইমানুল প্রভৃতির মতই উপভোগ্য। অর্থাৎ টাইপ চরিত্রগুলি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র। তথাপি মীরাকে অতিক্রম করিয়া সৌদামিনীর প্রভা তেমন বিকীর্ণ হয় নাই। প্রেমের বিচিত্র ক্ষেত্রে সৌদামিনীর আবির্ভাব না ঘটিলেও কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতির বাধা বিশেষ ছিল বলিয়া বোধ হয়

না। সৌদামিনী প্রেমের চেয়ে জীর্ণ সমাজ-বন্ধনের গভীর গ্লানিকেই উন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছে, এবং সেই গ্লানিতে বেদনাবোধ করিবার জন্ত লেখক অন্তরের দরদ ঢালিয়া দিয়াছেন। মীরাকে আশ্রয় করিয়া নায়কের অতি-সচেতন মনের সন্ধান এবং সৌদামিনীর দুঃখে দরদী হৃদয়ের বিকাশ—এই দুইটিকে মিলাইয়াই প্রেমের মাল্য রচিত হইয়াছে। মাল্য—যেমনই হউক—মালাকরের নৈপুণ্যের প্রকাশ ইহাতে আছে; কেননা, উত্তম সূত্র, পুষ্পচয়ন-নৈপুণ্য ও গ্রন্থনের অভিনিবেশ প্রত্যেকটির মধ্যে অটল নিষ্ঠা বিদ্যমান।

আর একটি অভিনব চরিত্র এই উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তিনি মাতৃজাতির প্রতীক—অপর্ণা দেবী। আত্মসংহত, প্রকৃত শিক্ষার আলোকে শক্তিময়ী অথচ সন্তানবাৎসল্যে পরিপূর্ণা গণেশ-জননীর সমগোত্রীয়া। কাব্যে উপেক্ষিতার মত সরমার চরিত্রও স্বল্প পরিসরে মনে রেখাপাত করে।

লেখক হাস্যরসাত্মক গল্প লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া মুখবন্ধে পাঠককে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—যেন লঘুভাবে এই কাহিনী গৃহীত না হয়। কিন্তু ছোটগল্প রচনায় তাঁহার যে কৃতিত্ব ও রসসৃষ্টির ক্ষমতা পূর্ণভাবে পাওয়া যায়—উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাহা অব্যাহত আছে। গরলে-মেশানো প্রেম-কাহিনীর মধ্যেও সরস বর্ণনভঙ্গী, টাইপ সৃষ্টি ও সূক্ষ্ম ভাব বিশ্লেষণ—সুবৃহৎ উপন্যাসকে কোথাও নীরস করে নাই। হাসির সঙ্গে অশ্রু মর্ম্মান্তিক ভাবেই মিশিয়া গিয়াছে। মোট কথা, প্রথম-রচিত এই একখানি উপন্যাসেই বিভূতিবাবু নিজের সৃষ্টি-ক্ষমতাকে নিঃসংশয়ে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সনাতন নাম-সাধনা—শ্রীনরেশ ব্রহ্মচারী। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা মাত্র।

ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার জন্য মানুষ যত রকম চেষ্টা করিয়াছে, বিরাট্ হিন্দু ধর্ম্মের ইতিহাসে তার সবগুলিরই প্রায় সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পূজা, জপ, গান, ইত্যাদি বিভিন্ন সাধন-প্রণালী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে এবং বিভিন্ন সময়ে অনুসৃত হইয়াছে। যদিও অনেকে "গানাৎ পরতরং নহি" বলিয়া নাম গানকে সর্ব্বোচ্চ সাধন-প্রণালী মনে করিয়াছেন, তথাপি জপের স্থানও কম বড় নয়। নাম-জপ কোন-না-কোন রকমে প্রায় সব ধর্ম্মেই দেখা যায়।

এই গ্রন্থে জপের কথাই আলোচিত হইয়াছে। আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও শিক্ষাপ্রদ। এ সব আলোচনা বিস্তৃত হইলেও কখনও গুরুর স্থান অধিকার করিতে পারে না। যাহা বলা হয়, তাহা বুঝিবার জন্যও অনেক সময় গুরুর উপদেশের প্রয়োজন হয়। আর লিপিবদ্ধ, মুদ্রিত এবং প্রকাশিত আলোচনার অতিরিক্ত কিছু জানিতে হইলে সদ্গুরুর আশ্রয় অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া এই সত্যটিও আমরা উপলব্ধি করিয়াছি।

ঋগ্‌বেদ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়)—শ্রীমতিলাল দাশ। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্রগুলি বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে এবং বাংলা পদ্যে অনূদিত হইয়াছে। সঙ্গে সায়নের টীকাও রহিয়াছে। অনুবাদ সুশ্রাব্য ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। এই ভাবে খণ্ডশঃ সমগ্র ঋগ্‌বেদ প্রকাশ করা গ্রন্থকারের ইচ্ছা। বর্ত্তমান খণ্ডে বেদ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধও সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডেই এইরূপ এক একটি প্রবন্ধ থাকিবে, এরূপ আশ্বাসও দেওয়া হইয়াছে। প্রশংসনীয় উদ্যম সন্দেহ নাই। যে আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ ইহাতে সূচিত হইয়াছে, পাঠকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা উহাকে পূর্ণতায় উপনীত করিবে, ইহাই আমরা আশা করি। সম্পূর্ণ হইলে ইহা একটি বড় কাজ হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অধিনায়ক—শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

চুয়ান্ন পৃষ্ঠার রূপক-নাটিকা। পাণ্ডিত্য বা নূতনত্ব দেখাইয়া চমক লাগাইবার চেষ্টা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্তই আছে; দুঃখের বিষয় ভাব ফোটে নাই এবং নাটক জমে নাই। ভূমিকায় বড় বড় কথার ইঙ্গিত,—রচনা চপল, তরল। "বিভিন্ন ভাবধারার সুকঠিন সংঘর্ষ" নাকি "অধিনায়কের মেরুদণ্ড", কিন্তু এ নাটক মেরুদণ্ডহীন। 'তৃষ্ণা' "মানবের অতৃপ্ত মনের পরম পিপাসার" প্রতীক; কয়েকটি চালিয়াতী ইংরেজী বুলি এবং গালাগালির বাহিরে তাহার অস্তিত্বই নাই। "ঈগল চক্ষু নিয়ে লক্ষ্য করা" প্রভৃতি ইংরেজীয়ানার সাহায্যে লেখক বোধ করি বাংলা ভাষার সম্পদ্ বাড়াইতে চাহিয়াছেন। আকার-অনুপাতে বইয়ের দাম বেশী হইয়াছে। আভ্যন্তরিক মূল্য হিসাবেও এত দাম সমর্থন করিবার মত হেতু খুঁজিয়া পাইলাম না।

রূপায়ন—শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

সুখপাঠ্য কবিতার বই। রচনাভঙ্গী রাবীন্দ্রিক।

জমিদারের মেয়ে—শ্রীমাখনলাল মজুমদার, বি. এ.। ঝুমরি তেলেয়া, হাজারিবাগ। মূল্য ১৷৽।

সামাজিক নাটক। আখ্যান, কথোপকথন, গান—সবই অস্বাভাবিক। চমকপ্রদ করিবার চেষ্টায় লেখক নাটকখানিকে হাস্যকর করিয়া ফেলিয়াছেন। জমিদার পৌত্রী ইন্দিরা এবং তাহার পাণিপ্রার্থী দেওয়ান-পুত্র ফণীকে অবলম্বন করিয়া ঘটনাচক্র ঘুরিয়াছে; কিন্তু যেভাবে ঘুরিলে বিশ্বাসযোগ্য হইত, সেভাবে ঘোরে নাই, নাট্যকারের খেয়ালমত বিপথে পাক খাইয়াছে।

রজনীগন্ধা—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৽।

সুরভি রজনীগন্ধারই মত স্নিগ্ধ, মনোরম কবিতাগুলি। বাহিরে সংযম, অন্তরে রসমাধুর্য্য, ইহাই এ কাব্যের বৈশিষ্ট্য। ভাষায় ও ছন্দে পরিচ্ছন্নতা আছে। উগ্রতা বা আড়ম্বর নাই। ভাবে ভঙ্গীতে অকৃত্রিম বাঙালী হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শক্তিমাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্ডী—শ্রীপ্রবোধকুমার গোস্বামী কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ সম্পাদিত। "গোস্বামী লজ," পোঃ বালী, জেলা হাওড়া। মূল্য ৩৲।

দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডীর এই সংস্করণে সংস্কৃত মূল, বাংলা অনুবাদ—প্রধানতঃ ভাবানুবাদ, স্থানবিশেষে প্রয়োজনীয় শব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং চণ্ডী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য ও চণ্ডীর সহিত পঠনীয় নানা বিষয়ের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, বর্ণাশুদ্ধির বাহুল্য পুস্তকখানির গৌরব অনেকাংশে খর্ব্ব করিয়াছে। মূল্যও সাধারণের পক্ষে কিছু গুরুতর

হইয়াছে। ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আকরগ্রন্থের অনুল্লেখ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের বিশেষ অসুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, প্রথম অধ্যায়ের ৭৩ শ্লোকে মহারাত্রি প্রভৃতি শব্দের যে অর্থ করা হইয়াছে তাহা বিশেষ কৌতুকজনক, তবে ইহার প্রমাণ জানিবার ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত করিবার কোনও উপায় নাই।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

সমাজ ও সহধর্ম্মিতা—শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সরস্বতী, বি-এ। বসন্তকুটীর, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৮৪। মূল্য ।• আনা।

লেখক ১৯১৬ হইতে ১৯১৯ পর্য্যন্ত কয়েক বৎসর রাজবন্দীরূপে কারাগার হইতে স্ত্রীর উদ্দেশে যে পত্রগুলি লিখিয়াছিলেন তাহার কতগুলি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কীয় সমস্যা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুধীগণের মত এবং শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া লেখক তাঁহার বক্তব্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। প্রাচীন শাস্ত্র এবং ভারতীয় ঋষিগণের প্রতি লেখক শ্রদ্ধাশীল কিন্তু অযৌক্তিক নহেন এবং প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়টি প্রাচ্য শাস্ত্র এবং পাশ্চাত্য যুক্তি দ্বারা যাচাই করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয়গুলি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া নামকরণ দ্বারা সুস্পষ্ট করিলে পাঠকগণের সুবিধা হইত।

ভাব-রেখা—শ্রীবিমানচন্দ্র বসু। বিমানপন্থী পাবলিশিং হাউস, ২-বি স্কট্‌স্ লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯৩, মূল্য ১।•।

কবিতার বই। সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'কবি-প্রশস্তি'তে কবিতাগুলিকে "ছন্দ ও অর্থ নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ (?) কবিতা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য পরিচয় অনাবশ্যক।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

নারী—শ্রীজ্যোতি সেন। জয়শ্রী পুস্তকালয়, ১৬৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম সাত সিকা।

পিতা অচ্যুত, পুত্র অনাদি এবং অনাত্মীয়া অমলাকে লইয়া গল্পটি গড়িয়া উঠিয়াছে। পিতার চরিত্রে স্নেহান্ধতার সঙ্গে একটা নিষ্ঠুর প্রকৃতি জড়িত রহিয়াছে। পুত্রের চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখাইবার চেষ্টা আছে সত্য, কিন্তু তাহা অকারণে ব্যর্থ হইয়া গেল। অমলাকে হত্যা এবং অন্য দিকে প্রব্রজ্যায় পাঠাইয়া গ্রন্থকার সব সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন। বানান ভুল বিস্তর।

শিশু-ভগবান—শ্রীমতিলাল দাশ। শিব-সাহিত্য কুটীর, খালিষপুর, খুলনা। মূল্য এক টাকা।

লেখক স্বয়ং ভূমিকায় বলিয়াছেন—"তাঁহার পারিবারিক প্রতিবেশ ছাড়াইয়া লেখাগুলি কাব্য হইয়া উঠিয়াছে···"। অত্যন্ত গতানুগতিক ভঙ্গিতে লিখিত শতাধিক পৃষ্ঠার এই কাব্যখানি পাঠ করিতে করিতে

মন ক্লান্ত হইয়া পড়িল। পারিবারিক প্রতিবেশের বাহিরে এই "কাব্যে"র কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হইল না।

বাস্তব ও ব্যঙ্গ—শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত। কমলা লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম। মূল্য দেড় টাকা।

এই পুস্তকখানিতে আধুনিক জীবনের বাস্তবতাকে লক্ষ্য করিয়া এবং চিন্তাধারাকে উপলক্ষ্য করিয়া কতকগুলি রূঢ় সত্য রূপ লইয়াছে। লেখকের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি প্রশংসনীয়। রস-রচনা হিসাবে পড়িতে বসিয়া রসের আমেজ বিশেষ পাইলাম না সত্য, তবে আধুনিক সমাজের রীতিনীতিকে বিদ্রূপ করিতে গিয়া লেখকের অন্তর যে বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছে তাহার পরিচয় পাইলাম।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

গান্ধীজী—শ্রীঅনাথনাথ বসু। ভারতী ভবন, ১১ বঙ্কিমচন্দ্র চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

মহাত্মা গান্ধীর নাম আজ বিশ্বজোড়া। বাংলা ভাষায় গান্ধীজীর জীবনী কয়েকখানিই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কচি ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া লিখিত গান্ধী-জীবনী বোধ হয় এই প্রথম। গান্ধীজীর জীবনের ছোট-বড় অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি বৈঠকী গল্পের মত করিয়া ইহাতে বলা হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অবস্থা আগে কিরূপ ছিল এবং পরে কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার ছাপ কচিদের মানসপটে রহিয়া যাইবে। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের পর গান্ধীজী কত রকমে ভারতবাসীর সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাও তাহারা জানিয়া লইবে। পুস্তকখানি সুলিখিত। প্রচ্ছদপটটিও ভাল।

সেই সাতান্ন—শ্রীহরিদাস মজুমদার। অমৃত পাবলিশিং হাউস, ৬ নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর রণক্ষেত্রে বঙ্গের তথা ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। এই বিখ্যাত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পুস্তকখানি ছেলে-মেয়েদের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাতে পলাশীর যুদ্ধের পরিণতি পর্য্যন্ত প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে সিরাজের পতনের গূঢ়ার্থ ছেলেমেয়েরা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর ঐক্যস্থাপন ও গৃহরক্ষীদলের ("Home Guard") সাহায্যকল্পে ব্যয়িত হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বাজ্‌মে নেশাতে ওমার খাইয়াম—ওমর খাইয়ামের মজলিস। শ্রীশীতল বর্দ্ধন। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

এখানি কবিতা-পুস্তক, কিন্তু ওমরের অনুবাদ নহে। "বাজমে নেশাতে ওমার খাইয়াম" এর অর্থ ওমর খাইয়ামের মজলিস। ওমর খৈয়ম এবং রুদগী, মৈজী, আত্তার প্রভৃতি পারস্যের অন্যান্য কবিগণকে লইয়া এই মজলিস। সাকী ও সুরার নেশায় মশগুল হইয়া পৃথিবীর পান্থশালায় সকলেই জীবনের পেয়ালা ভরিয়া লইবার গান গাহিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সুফি, কেহ কেহ নয়। সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার নির্ম্মম পরিহাসে কেহ বা ক্ষুব্ধ, কেহ বা লীলায় মুগ্ধ, সকলেরই কাব্য কিন্তু জীবনের আনন্দে ভরপুর। অল্প কয়েকটি কবিতার মধ্যে লেখক এই মজলিস জমাইয়াছেন, ভাবের ঝোঁকে কোথাও কোথাও ছন্দ ব্যাহত হইলেও কবিতাগুলি পড়িতে বেশ একটি গোলাপী নেশার আমেজ লাগে। আধ্যাত্মিক অর্থে সুরা ভগবদ্‌প্রেম, সাকী সুরাপরিবেশনকারী। লেখক ভূমিকায় বলিতেছেন, "কবি ওমর খৈয়ম, সাকী ও সকলে নিজের নিজের কথা বলিয়াছে, অথচ সমস্ত কবিতাটি একটানা।... পারস্যের গোলাপ-বাগান হইতে সংগ্রহ করা প্রেম ও সৌন্দর্য্যের সওগাত আপনাদের কাছে হাজির করিয়া আমার অভিবাদন জানাইতেছি।" পরিশিষ্টে গ্রন্থকার ওমর খৈয়ম হইতে হাফেজ পর্য্যন্ত পারস্যের বিপ্লবী কবিগণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়-লিপি দিয়াছেন। ইহা পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

অরবিন্দের সাধনা—শ্রীহরিদাস চৌধুরী এম, এ। আর্য্য পাব্‌লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

আলোচ্য পুস্তকে সংক্ষেপে, অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় শ্রীঅরবিন্দের যোগের প্রণালী ও লক্ষ্য বিবৃত হইয়াছে। অজ্ঞান, অহঙ্কার ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম-জীবন আলিঙ্গন করা ভগবৎ গীতার মূলমন্ত্র। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ, অধ্যাত্মযোগ বা আত্ম-সমর্পণ যোগের লক্ষ্যও ঠিক ইহাই। আত্মসমর্পণ পূর্ণযোগের মূলমন্ত্র, তাই গীতার শেষ কথা হইল—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।'

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

আর্য্যাচার পদ্ধতি—৪র্থ খণ্ড। সঙ্কলক—শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ছয়চিরি-বিষ্ণুপুর, পোঃ মুন্সীবাজার (শ্রীহট্ট)। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থে সাধারণ নিত্য ক্রিয়া, দশমহাবিদ্যা—বিবিধ কালী শারদীয়া ও বাসন্তী দুর্গার পূজাবিধি, কর্পূরস্তব, জপরহস্য ইত্যাদি স্থান পাইয়াছে। এককালে শ্রীহট্ট শক্তিসাধনা এবং তৎচর্চ্চার উর্ব্বর ক্ষেত্র ছিল। তথাকার বিশেষজ্ঞ প্রাচীনদের অনুসরণে এবং পূর্ব্বপ্রকাশিত শাস্ত্রগ্রন্থের সহায়তা অবলম্বনে এই পদ্ধতিগ্রন্থ সঙ্কলিত। যত্নসত্ত্বেও একাধিক প্রেসে মুদ্রণ হেতু কতক ত্রুটি অপরিহার্য্য হইয়াছে। এই গ্রন্থ ক্রিয়াকাণ্ডনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট উপকার সাধন করিবে নিঃসন্দেহ।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

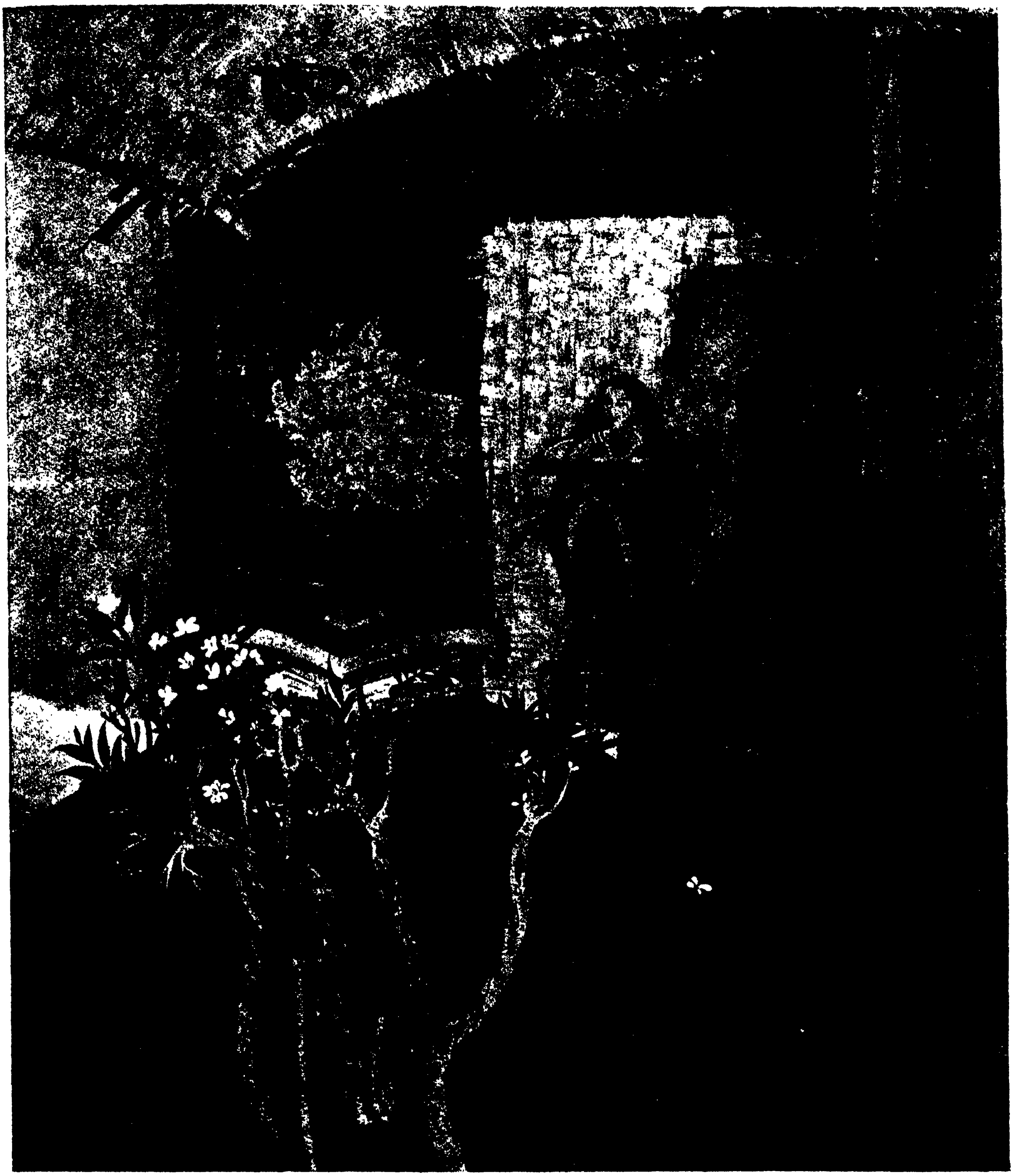
গানের বলাকা—শ্রীহরি বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীগদাধর শেঠ, ১৪৫ বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ, ৭৯। মূল্য ২৲ টাকা।

সঙ্গীত মানব জীবনে এক বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়া আছে। সঙ্গীত ভাষা, সুর এবং লয়ের একীকরণে সৃষ্ট। গানের বিকাশ সঙ্গীতের ভাবময় প্রাণে।

গ্রন্থকার পুস্তকে ৩১টি স্বরচিত গানের সমাবেশ করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেক গানেরই সুর ও স্বরলিপি বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির। যে-ভাব লইয়া গানের ভাষা সৃষ্ট হয়, সেই ভাব লইয়াই সুরের সংযোজনা না করিলে সঙ্গীতে রসবৈকল্য হয়। অবশ্য ইদানীং অনেকে গান লিখিয়া নামী সুরকার দ্বারা সুর সংযোজনা করাইয়া সর্বসাধারণের নিকট সুখ্যাতি পাইয়াছেন। কিন্তু সর্ব সময়ে ইহাতে গানের পূর্ণতা হয় কি না তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। পুস্তকে আকার মাত্রিক পদ্ধতি অনুসারে স্বরলিপি এবং প্রচলিত সুর ও তানের আশ্রয় লইয়া শিক্ষার্থীদের উপকৃত করিয়াছেন।

শ্রীসুহৃদ সিংহ

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



তরুণী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪২শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৪৯

৬ষ্ঠ সংখ্যা

[বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত]

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

(তৃতীয় স্তবক)

[অধ্যাপক শ্রীকালিদাস নাগকে লিখিত]

(১)

ওঁ

বুয়েনোস আইরিস্

(ডিসেম্বর, ১৮২৪)

কল্যাণীয়েষু

আজ ৭ই পৌষ। মন আজ তোমাদের কাছে ঘুরে বেড়াচ্চে। এবারকার যাত্রাটা ঠিক শুভলগ্নে আরম্ভ হয় নি। শরীরটা বিগড়ে বসে আছে। পেরু* যাওয়া বন্ধ। কিন্তু কিছুই না করেও এখানকার লোকের প্রচুর আদর পাচ্চি। এদের দেশে আছি এতেই এরা খুসি। আগামী ৩রা জানুয়ারী ইটালিতে যাত্রা করব। আশাকরি সেখানকার কাজে বাধা হবে না।

শরীর মন যখন পীড়িত হয় তখন আমি কবিতা লিখি। জলকে পীড়া দিলে তবে সঙ্কীর্ণ ছিদ্র দিয়ে ফোয়ারা ছোটে। প্রশান্তকে কিস্তি কিস্তি কবিতা পাঠিয়েছি, নিশ্চয় দেখেচ, ২৪ অক্টোবরে "ঝড়" বলে যে কবিতা লিখেছিলুম তার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারচি যে, সেই সময়ে হাওয়া বেয়ে একটা নিবিড় ব্যথা আমার মনকে প্রবল ঝাপটা দিয়ে গিয়েছিল। তার ইংরেজিটা তোমাকে পাঠাচ্চি। আরো গোটাকতক কবিতা পাঠালুম—প্রশান্তদের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ কোরো। এবারকার কবিতাগুলো যেন স্বপ্নে লেখা—ভালো কি মন্দ তা বুঝতেই পারি নে—যখন খুসি তখন, যেমন খুসি তেমন করে লিখেই গেছি। আমার কবিত্ব শক্তির মাপকাঠি হাতে যারা গম্ভীর হয়ে বসে থাকে তারা যে এই বিশ্বের কোনোখানে আছে তা একেবারেই মনে ছিল না। মাঝখানে দীর্ঘ কিছুকাল ভোলবার সময় না দিলে এ কবিতাগুলো সম্বন্ধে আমি নিজেই বিচার করতে পারব না। হারুনা মারু থেকে তোমাদের যে কবিতা ইত্যাদি পাঠিয়েছিলুম তার একবর্ণ আজ আমার মনে নেই। সেগুলো সব উড়ো কাগজে লেখা, বাঁধা খাতায় লেখা নয়। প্রশান্তকে যে কবিতাগুলো পাঠাই তাতে অনেক বদল থাকে যা আমার খাতায় নেই অতএব সেগুলো

---

* ১৯২৪ সালে সুদূর প্রাচ্যে বিশ্বভারতীর বাণী প্রচার করতে যাবার সময় কবি আমায় সস্নেহে সঙ্গে নেন এবং তার মধ্যে Lima Congress-এর নিমন্ত্রণ আসে পেরুর স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে। কবি সেখানেও আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চান 'China to Peru' ভ্রমণের লোভ দেখিয়ে। কিন্তু ফেরার পথে স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আমি দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রা বন্ধ করি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসি।

এলম্‌হার্স্ট সাহেবের সঙ্গে কবি যাত্রা করেন কিন্তু পথে জাহাজে বিষম অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটু সুস্থ হ'তেই নূতন কবিতার যেন বান ডেকেছিল, সেগুলি পূরবী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪২শ ভাগ, ২য় খণ্ড | চৈত্র, ১৩৪৯ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

[বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত]

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

(তৃতীয় স্তবক)

[অধ্যাপক শ্রীকালিদাস নাগকে লিখিত]

(১)

ওঁ

বুয়েনোস আইরিস্

(ডিসেম্বর, ১৮২৪)

কল্যাণীয়েষু

আজ ৭ই পৌষ। মন আজ তোমাদের কাছে ঘুরে বেড়াচ্চে। এবারকার যাত্রাটা ঠিক শুভলগ্নে আরম্ভ হয় নি। শরীরটা বিগড়ে বসে আছে। পেরু* যাওয়া বন্ধ। কিন্তু কিছুই না করেও এখানকার লোকের প্রচুর আদর পাচ্চি। এদের দেশে আছি এতেই এরা খুসি। আগামী ৩রা জানুয়ারী ইটালিতে যাত্রা করব। আশাকরি সেখানকার কাজে বাধা হবে না। শরীর মন যখন পীড়িত হয় তখন আমি কবিতা লিখি। জলকে পীড়া দিলে তবে সঙ্কীর্ণ ছিদ্র দিয়ে ফোয়ারা ছোটে। প্রশান্তকে কিস্তি কিস্তি কবিতা পাঠিয়েছি, নিশ্চয় দেখেচ, ২৪ অক্টোবরে "ঝড়" বলে যে কবিতা লিখেছিলুম তার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারচি যে, সেই সময়ে হাওয়া বেয়ে একটা নিবিড় ব্যথা আমার মনকে প্রবল ঝাপটা দিয়ে গিয়েছিল। তার ইংরেজিটা তোমাকে পাঠাচ্চি। আরো গোটাকতক কবিতা পাঠালুম—প্রশান্তদের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ কোরো। এবারকার কবিতাগুলো যেন স্বপ্নে লেখা—ভালো কি মন্দ তা বুঝতেই পারি নে—যখন খুসি তখন, যেমন খুসি তেমন করে লিখেই গেছি। আমার কবিত্ব শক্তির মাপকাঠি হাতে যারা গম্ভীর হয়ে বসে থাকে তারা যে এই বিশ্বের কোনোখানে আছে তা একেবারেই মনে ছিল না। মাঝখানে দীর্ঘ কিছুকাল ভোলবার সময় না দিলে এ কবিতাগুলো সম্বন্ধে আমি নিজেই বিচার করতে পারব না। হারুনা মারু থেকে তোমাদের যে কবিতা ইত্যাদি পাঠিয়েছিলুম তার একবর্ণ আজ আমার মনে নেই। সেগুলো সব উড়ো কাগজে লেখা, বাঁধা খাতায় লেখা নয়। প্রশান্তকে যে কবিতাগুলো পাঠাই তাতে অনেক বদল থাকে যা আমার খাতায় নেই অতএব সেগুলো

* ১৯২৪ সালে সুদূর প্রাচ্যে বিশ্বভারতীর বাণী প্রচার করতে যাবার সময় কবি আমায় সস্নেহে সঙ্গে নেন এবং তার মধ্যে Lima Congress-এর নিমন্ত্রণ আসে পেরুর স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে। কবি সেখানেও আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চান 'China to Peru' ভ্রমণের লোভ দেখিয়ে। কিন্তু ফেরার পথে স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আমি দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রা বন্ধ করি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসি।

এলম্‌হার্স্ট সাহেবের সঙ্গে কবি যাত্রা করেন কিন্তু পথে জাহাজে বিষম অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটু সুস্থ হ'তেই নূতন কবিতার যেন বান ডেকেছিল, সেগুলি পূরবী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

যেন নষ্ট না হয়। এত নানা জায়গা থেকে ডাকে পাঠিয়েছি যে সবগুলো সে পেয়েছে কিনা তাও জানি নে। কি রকম অস্বাস্থ্যের ক্লান্তিতে হিজি বিজি লেখার মেজাজে আজকাল কবিতা লিখি তার একটা ডাকে-মারা-যাওয়া নমুনা তোমাকে নিম্নে লিখে পাঠাই :—

অস্তিত্বের বোঝা
বহন করা ত নয় সোজা।
পাঠশালে কতকাল পুঁথিদানবের সাথে যোজা।
ছেঁড়া ছাতা কক্ষে নিয়ে অহোরাত্র পথে পথে খোঁজা
ডালভাত বধূ বন্ধু চাকরি-বাকরি জুতো মোজা।
কোনো মাসে জোটে রুজি, কোনে মাসে রুটিশূন্য রোজা।
নানা সুরে হাসি কান্না, বোঝাও না-বোঝা, ভুল বোঝা।
সভাতলে ছুটোছুটি ঝুটোপুটি রাজা আর প্রজা।
একদিন নাড়ী ক্ষীণ বালিসে আলসে মাথা গোঁজা,
ভিটেমাটি বাঁধা রেখে বহু দুঃখে ডেকে আনা ওঝা,—
তহবিল ফুঁকি bill-এ সবশেষে শেষ চক্ষু বোজা॥

বলা বাহুল্য এটা পুনশ্চ ডাকে মারা যাবার অভিপ্রায়েই তোমাকে লিখে পাঠালুম; এটাতে পস্টারিটির ঠিকানার টিকিট মারা হয় নি। তিন সমুদ্র পারে আছি—ভারত সাগর, মধ্য-ধরণী সাগর আর অতলান্তিক—তোমাদের সদ্য খবর পাবার আশা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেচি। য়ুরোপে পৌঁছে তাজা খবর পাব বলে ভরসা করে আছি—কিন্তু যে রকম আভাস পাওয়া যাচ্চে তাতে বোধ হচ্চে ভারতের খবরের পনেরো আনাই shoe-খবর। "গোরু মেরে জুতোদান" বলে একটা প্রবাদ আছে; কর্ত্তারা আমাদের গোরুও মারচে, আমাদের জুতোও দান করচে; এ'কে বলে শু-শাসন। ইতি

রবীন্দ্রনাথ

(২)

ওঁ

৯ জানুয়ারী, ১৯২৫

কল্যাণীয়েষু

ইটালি অভিমুখে চলেচি। কিন্তু মনে উৎসাহ পাচ্চি নে, মনে হচ্চে এবার অযাত্রায় বেরিয়েছি। আসল কথা, প্রাণের শিখা ম্লান হয়ে এসেচে। বুয়েনোস্ আইরেস্-এর বড় দুজন ডাক্তার আমাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে পরীক্ষা করে শেষকালে রায় দিয়েচেন, যে, দেহের কল আর বল এই দুটো পদার্থের মধ্যে কলটা আছে ঠিক, বলটা নেই। তার মানে হচ্চে এই যে প্রদীপটা ফুটো হয় নি, শিখাটা ম্লান হয়ে এসেচে। তেলটাকে কেবলি ক্ষয় করে' এসেছি ভর্ত্তি করবার সময় দিই নি। পেরুতে যাবার জন্যে দু'বার চেষ্টা করেচি, ডাক্তারের নিষেধ দু'বার দ্বার রোধ করে দাঁড়ালো। অবশেষে এবার ফিরে চলেচি। আর্জেন্টিনাতে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিইনি, কিন্তু শেষাশেষি আমার নিভৃতনিবাসের দরজা খুলে দিয়েছিলুম। প্রায়ই এক এক দল করে নরনারী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন, তার জবাবে পুরো বক্তৃতা দিতে হত। এই উপলক্ষে আর্জেন্টিনার* সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েচে। এখানকার লোকে আমাকে খুবই ভালোবাসে, এ আমি একেবারেই প্রত্যাশা করি নি। আমি যে তাদের দেশে এতদিন ছিলুম এতেই তারা আনন্দিত।

শিখা যখন ম্লান হয়, যখন সামনের পথের দিকে মন চল্‌তে চায় না তখন সুদূরের পিছনের কথাই মনকে প্রদোষের ছায়ায় ঘনিয়ে ধরে। মৃত্যুর কালো পটের উপর দূরস্মৃতির ছবি স্পষ্ট করে ফুটে ওঠে। তাই আজকাল আমার মনে আমার কিশোরের সেই সব কালের কথা ঘুরে বেড়াচ্চে যে সব কাল দিগন্তের সম্পূর্ণ আড়ালে পড়ে গেছে। সামনের দিকে তাদের কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই আমার কবিতার মধ্যে তাদের আশ্রয়ের জন্যে স্বপ্নলোক বানিয়েছি। এই এক খেলা। এ খেলার ঠিক মানে তোমরা অনেকে বুঝতে পারবে না, কেন না প্রভাতের সূর্য্য তোমাদের চোখের সামনে, তোমাদের ছায়া পিছনের দিকে, সেদিকে তোমাদের ঔৎসুক্য নেই। আমার আলো পিছনের দিকে, ছায়া আমার সম্মুখের পথে। সেইজন্যে আমার গান, হাওয়ায় পিছনের দিকে উড়ে যাচ্চে, তার সব সুর তোমাদের কানে স্পষ্ট করে পৌঁছবে না। এ কবিতাগুলো এখন ছাপবার দরকার নেই, আমার মৃত্যুর পরে ছাপিয়ো। তা ছাড়া এগুলো নিয়ে কাগজে কাগজে হরির লুঠ দিয়ো না।

ইটালিতে যাচ্চি কিন্তু নতুন পরিচয়ের শক্তি আছে

* ১৯৩৬ সালে P. E. N. Congress-এর অধিবেশন হয় আর্জেন্টিনার Buenos Aires শহরে; সেখানে সাহিত্য মহাসভায় যোগ দিয়ে কবির পূরবী কাব্যখানি উপহার দিই এবং অনুভব করি যে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ-আমেরিকার সাহিত্যিক মহলেও কতখানি সাড়া জাগিয়ে গেছেন।

বলে' বোধ হচ্চে না। নতুন দেশে যেতে হলে কিছু উদ্বৃত্ত হাতে নিয়ে যেতে হয়, সেই উদ্বৃত্তের অভাব বোধ করচি। মনের সাম্‌নে শিলাইদহের নদীর চর ভাসচে, ইটালির মানচিত্রে তার স্থান নেই। এমন কি আমার বিশ্বাস কোনো সমুদ্র পার হয়ে আজ সেখানে পৌছন যাবে না। সব মানচিত্র থেকেই সে সরে গেছে, সে কেবল আমার মানস-চিত্রেই আঁকা রয়ে গেল।

কবে ভারতবর্ষে গিয়ে উত্তীর্ণ হব ইটালিতে না পৌছে এখান থেকে তা স্থির করতে পারচি নে। খুব সম্ভব, রথী জেনোয়াতে আসবে এবং তার কাছ থেকে তোমাদের সকলের এবং দেশের লোকের আধুনিক বিবরণ পাওয়া যাবে। তার পরে সকল দিক বিবেচনা করে যা হয় ঠিক করা যাবে। এতদূরে ছিলুম যে, দেশ ঝাপসা হয়ে গেছে। সেখানকার খবরের কাগজে ভারতবর্ষের স্থান নেই। সেখানকার সব চেয়ে বড় ও ভালো কাগজে অল্পদিন আগে Tower of Silenceএর একটা ছবি বেরিয়েছিল, তার নীচে বর্ণনাচ্ছলে লেখা ছিল যে, এখানে ধর্ম্মবিদ্রোহীদের জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়—ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এই প্রথা নিবারণের চেষ্টা করচে! এই রকম খবরের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের সঙ্গে এদের পরিচয় ঘটে থাকে। যাই হোক্ ভারতবর্ষ থেকে আমার এতদিনকার অতিদূরত্ব আমার মনকে যেন উপবাসী করে তুলেচে। যখন চীনে জাপানে ছিলুম তখন নির্ব্বাসনবোধ এমন সুতীব্র ছিল না। তার প্রধান কারণ বর্ত্তমান চীন জাপানের ভিতরে অতীত ভারতবর্ষের স্পর্শ পদে পদে পাওয়া যাচ্ছিল। যাই হোক্ ভারতবর্ষের নিকটের দিকে এগিয়ে চলেছি বলে মনটা আরাম বোধ করচে।

ইটালিতে তুমি যদি আমাদের সঙ্গে থাক্‌তে পারতে কাজে লাগ্‌ত। তুমি এদের সবাইকে জানো, ভালো করে পরিচয় ঘটিয়ে দিতে পারতে, আমাকে হাৎড়িয়ে বেড়াতে হ'ত না। যাই হোক সেখানে যাঁরা তোমার বন্ধু আছেন তাঁরা বোধ হয় আমার দায়িত্ব নিতে পারবেন। কিন্তু এবারে গোড়া থেকেই সব উল্‌টে-পাল্‌টে যাওয়াতে মনে হচ্চে যেন বিশেষ সুবিধে হবে না।

একটা কথা প্রশান্তকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলো না। তুমি ত জানই সাঙ্ঘাইয়েতে কাদুরির* কাছ থেকে কূপখনন উপলক্ষ্যে আট হাজার টাকা নিয়েছিলুম। কথা ছিল এই শীতেই কাজ আরম্ভ হবে। আমি শান্তিনিকেতন থেকে যত চিঠি পেয়েছি তাতে এ ব্যাপারের উল্লেখ মাত্রই নেই। ভয় হচ্চে পাছে আট হাজার টাকা বিশ্বভারতীর অভাবের অন্ধকূপে তলিয়ে গিয়ে থাকে। তাহলে নিতান্ত অন্যায় হবে। আমার নাম করে এ সম্বন্ধে গোরাকেও সতর্ক করে দিয়ো। জরুরি প্রয়োজনের কথা জানিয়েই এ টাকা কাদুরির কাছ থেকে পেয়েছিলুম।

প্রবাসীতে নিশ্চয়ই আমার ডায়ারি বেরিয়েচে; এতদিনে একখণ্ড আমার কাছে গিয়ে পৌছতে পারত—কিন্তু এখনো পাই নি—শেষ মডার্ণ্ রিভিয়ু অনেক দিন হ'ল হাতে এসেছিল, তার পনেরো দিন পরে প্রবাসী আসবার কথা, কিন্তু কি কারণে পাওয়া গেল না।

আজ একটা কবিতা লিখেচি তোমাকে পাঠাই। ১৯শে তারিখে জেনোয়াতে পৌছব। সেখানে পৌছিয়ে এই চিঠি ডাকে দেব। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩)

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

রোগের নির্জ্জন দুঃখের মধ্যে মাঝে মাঝে তোমাকে পেয়ে অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করেছি। রবি যখন মধ্যাহ্ন আকাশে ছিল তখন দিক্‌চক্র থেকে দূরে দূরেই কাটিয়েছে—এখন অপরাহ্ণ, এখন নেমে এসেছে দিগন্তে, এখন মেঘ-মণ্ডল নিয়ে পৃথিবীর স্পর্শ নেবার জন্যে সে ঝুঁকে পড়েছে—এখন নিভৃত আকাশের একেশ্বরত্ব ভোগে তার মন নেই।

আমার কানের বেদনা অনেকটা কমে এসেছে কিন্তু শোনবার পথ এখনো রুদ্ধ হয়ে আছে—ডাক্তার* আশা দিচ্চে শ্রুতি আবার ফিরে পাব—কিন্তু এখনো সেদিকে বিশেষ অগ্রসর হতে পারি নি।

তুমি যে-বনবাসে† গেছ তার বিবরণ পেয়ে ঈর্ষ্যা

* ভ্রমক্রমে এই ইহুদি বণিকের নাম Kadoorji ছাপা হয়ে আসছে বিশ্বভারতীর কাগজপত্রে। ইনি তাঁর সাংহাই-এর প্রাসাদে ১৯২৪ সালে আমাদের নিমন্ত্রণ করেন এবং ৮০০০৲ দান করেন।

* কবি এ সময় কর্ণপীড়ায় বিষম যন্ত্রণা পেয়েছেন এবং পরলোকগত ডাক্তার তেজেন রায়ের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। সঙ্গীতরসিক কবি প্রায় উদ্বিগ্ন হয়ে বলতেন, 'কান গেলে আমার অনেকখানিই যাবে'। বধির Beethoven-এর অপূর্ব্ব রচনার কথা তখন কবিকে শুনিয়েছি Rolland র বেটোভেন্-জীবনী থেকে।

† ধবলভূমের শালবনের আকর্ষণে ওদিকে কিছু দিন আমরা কাটিয়ে আসি ও পরে ঘাটশিলায় বাসা বাঁধি।

বোধ করচি। আমার নির্ব্বাসন আমার ব্যাধির বেদনা-কারার মধ্যে।

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। ১৩ কার্ত্তিক ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪)

Visva Bharati
Santi-Niketan, India

কল্যাণীয়েষু

ব্রাহ্মসমাজ* সম্বন্ধে তোমাদের প্রস্তাবটি ভালো। আমার নিজের সম্বন্ধে একটা ভাববার কথা, আমি কি কোনো বিশেষ নামধারী কোনো ধর্ম্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত? কোনো সমাজের সংস্কার সঙ্গে আমার মিল হবে না বলে আশঙ্কা করি। অথচ যদি ব্রাহ্মসমাজের কোনো অনুষ্ঠানে কোনো প্রধান স্থান নিই তাহলে লোকের একটা ভুল ধারণাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে।

তারপরে আর একটা কথা আছে। হঠাৎ য়ুরোপ থেকে এসেই যে সন্দেহঘন বায়ুচক্রের প্রতিকূলতার মধ্যে পড়েচি তাতে আমার শরীর মন আবার পীড়িত হবার পথে চলেচে। তাই এর থেকে আপনাকে বাঁচাবার অভিপ্রায়ে অজ্ঞাতবাস আশ্রয়ের সংকল্প করচি। মাঘের মাঝামাঝি এ প্রদেশে থাকব কি না সন্দেহ—অন্তত থাকবার ইচ্ছা নেই। অতএব তোমাদের যজ্ঞকার্য্যে সশরীরে আমাকে পাবে না বলেই মনে হচ্চে। যদি দুর্গ্রহের নিষ্ঠুর পাশবদ্ধ হয়ে নিতান্ত পড়ে থাকতেই হয় তখন যথাকর্ত্তব্য স্থির করা যাবে। আপাতত তোমাদের ও বিধাতার কাছে ছুটির দরবার রইল। ইতি ১৫ই পৌষ ১৩৩৩

অনুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫)

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কালিদাস, অনেকদিন পলাতকা ছিলুম এখন আর ফাঁক নেই, রাস্তাঘাট আঁটবন্ধ। মুলতুবি কাজগুলো গেটে ধর্ণা দিয়ে বসে আছে—তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে হাবড়ার টিকিট কিনতে বেরব, সাধ্য কি তার। অগ্রহায়ণে রাজধানীতে অনেকগুলো বিয়ে আছে, যদি চ তার কোনোটাতে আমার কোনো স্বার্থ নেই তবু সভায় উপস্থিত থাকতেই হবে। সেই অবকাশে আমাকে প্রজাপতির পক্ষপুটচ্ছায়া থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারো—সেই সন্ধানে রাস্তা আগ্‌লে বসে থেকো। আপাতত সময় নেই। ইতি ৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬)

কল্যাণীয়েষু

কালিদাস—ডান হাতের আঙুলে আঘাত লেগে লেখা খুঁড়িয়ে চলচে, আর দাক্ষিণ্যও হারিয়েছে। ঠিক এই সময়েই বসন্ত উৎসবের আহ্বান। কবির কাছে সে আহ্বান সর্ব্বাগ্রগণ্য। একদিকে লিখে লিখে যাচ্চি অন্য দিক থেকে অভিনয়ের পালাও চলচে। দেহে দুঃখ পেলে অনেক সময়ে আমার কলমে রস বেরোয় খেজুর গাছের দশা আর কি। তোমাদের দাবী পরে শুনব—আপাতত দক্ষিণ হাওয়ার তাগিদটা মেটাই। দাঁড়ের কাজ আছে চিরদিন—পালের কাজ ক্ষণে ক্ষণে। মনের দুঃখে চুপচাপ ছিলুম—বীণাপাণির শুশ্রূষা স্পর্শ হঠাৎ এসে পৌঁচেছে। আজ তাঁকে ছেড়ে দণ্ডপাণিদের তলব মান্‌তে পারচি নে। এবার উৎসবে কাউকে নিমন্ত্রণ করি নি—এখানকার নব শালমঞ্জরীর নিমন্ত্রণমর্ম্মর আপনি যদি কানে গিয়ে পৌঁছয় তো এসো। কিন্তু তোমরা কাজের লোক—হয়তো তোমাদের দরজা বন্ধ। আমাদের উৎসব দোলের পর দিন, শনিবারে—পূর্ণচন্দ্র খুব বেশি ক্ষুণ্ণ হবেন না। ইতি ৩ চৈত্র ১৩৩৩

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৭)

কল্যাণীয়েষু

কাল তোমাদের প্রত্যাশা করেছিলুম। একবার অপরাহ্ণে একবার সায়াহ্নে স্টেশনে গাড়ি তোমাদের উদ্দেশে পাঠিয়েছিলুম—ব্যর্থ ফিরে এলো। তোমরা এলে খুসি হতুম সে কথা পূর্ব্বে জানিয়েছি। ভুল বোঝাবুঝির প্রদোষ আলোকে আশা করি কোনো ছায়া হঠাৎ উপছায়ার আকার ধরে নি। ইতি ৬ চৈত্র ১৩৩৩

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* আদি সমাজ ভারতবর্ষীয় সমাজ ও সাধারণ সমাজের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা এই সময় চলছিল।

(৮)

Visva Bharati
Santiniketan, India

কল্যাণীয়েষু

আমার শরীর মনে আবার সেই আগেকার মত অবসাদ ঘনিয়ে আসচে—কোনো কর্ম্মে নিজেকে প্রয়োগ করতে পারচি নে। বার্লিনের ও বুডাপেষ্টের ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন যে, যদি আমি দুশ্চিন্তা ও দুশ্চেষ্টার জালে আবার ধরা দিই তাহলে আমার প্রাণপুরুষ আর আমাকে ক্ষমা করবেন না। বার্লিনের বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার হিস্ আমাকে বলেছিলেন যে, আমার কাছে warning এসেচে—এখনো তাকে উপেক্ষা করবার শক্তি আছে কিন্তু সে শক্তি বেশি দিন থাকবে না—এখন থেকে যেন আমি ভিড়ের কাজ থেকে সরে এসে কোণের মধ্যে আশ্রয় নিই। অন্য দুই এক জায়গায় ডাক্তার জোর করে আমার engagements ভেঙে দিয়েছিলেন তাতে আমার গুরুতর আর্থিক ক্ষতিও হয়েছিল। মনে করে এসেছিলেম এখন থেকে জনতা ছেড়ে বিরলে নিভৃতে বাস করব। প্রথমে আবেদন নিয়ে এসেছিলেন গুরুসদয় দত্ত মহাশয়। তাঁর পত্নীর স্মৃতিসভায় সভাপত্য করতে হবে। আমি তাঁকে ডাক্তারের অনুশাসন জানালেম। তিনি বললেন, "আচ্ছা যদি আপনি সভাসমিতির কাজ একান্তই ত্যাগ করেন তাহলে নিষ্কৃতি দিলুম। কিন্তু যদি আর কোথাও আবির্ভূত হন কেবল আমাকেই বঞ্চিত করেন তাহলে বুঝব আমার প্রতিই আপনি প্রতিকূল।" আমার পক্ষে আত্মরক্ষার উপায় হচ্চে নির্ব্বিচারে সকল প্রকার সভাচর্য্য থেকে দূরে পলায়ন। এই মুক্তির পন্থায় তোমরাও আমার সহায়তা কোরো।

বৃহত্তর ভারত* সম্বন্ধে তোমাদের আলোচনা পড়ে দেখলুম। খুসি হলেম। বিশ্বভারতী থেকে খুব বেশি পার্থক্য আছে বলে বোধ হয় না। তোমাদের শক্তি আছে, শিক্ষা আছে, মণ্ডলী আছে অতএব কৃতকার্য্য হবে সন্দেহ নেই। ইতি ১ জানুয়ারী ১৯২৭

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* রবীন্দ্রনাথকে পুরোধা পদে বরণ ক'রে ও অধ্যাপক যদুনাথ সরকারকে সভাপতি হিসাবে পেয়ে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ প্রবোধ বাগচী প্রভৃতি আমরা কয়জনে ১৯২৬-২৭ সালে বৃহত্তর ভারত পরিষদ প্রতিষ্ঠা করি এবং ১৯২৭ সালে যবদ্বীপ ভ্রমণের আগে কবিকে আমরা সম্বর্দ্ধনা জানাই (কালান্তর গ্রন্থে তাঁর অভিভাষণ দ্রষ্টব্য)।

(৯)

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

কোথাও নড়িনি, নড়বার শক্তিও নেই দেহে। তাই বলে মনে কোরো না তোমাদের যৌবনের সচলতাকে আমি ঈর্ষা করি। কালিদাসের যক্ষ ছিল রামগিরি আশ্রমে আবদ্ধ, পাঠিয়েছিল মেঘদূতকে নদী গিরি পারে বার্ত্তা বহন করে। আমি আছি শান্তিনিকেতন আশ্রমে—আমার দূত মনোদূত, তাকে যেখানে ঘোরাই সে ভূগোলের রাজ্য নয়—সে বার্ত্তা বহন করে নিয়ে আসে আমারই কাছে—আনন্দে আছি। কেবল ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মের দায় এখনো স্কন্ধে চেপে আছে, সেটাকে নামাতে পারলে আর কোনো নালিশ থাকে না। "লেখা তো লিখেছি ঢের" লেখনী এখন সিভিল ডিস্ওবীডিয়েন্সের রাস্তায় দাঁড়িয়েছে; আমিও তাকে হোয়াইট পেপারের অধিকার দেব বলে মন স্থির করেছি। ভিড়ের লোকের মন পাবার জন্যে খ্যাতির হাটে আনাগোনা করতে আর উৎসাহ নেই। তোমরা এই শুভকামনা করো সম্পূর্ণ ভারবিহীন হোক আমার বিদায়কালের যাত্রা। যে উদার আলস্য কবিদের মূলধন আমি তাই নিয়েই জন্মেছিলুম—আমার যানবাহনটা ছিল দায়বিহীন বাণী বহন করবার জন্যে, তাতে ফাঁক ছিল ঢের,—কপালের দোষে যাত্রা আরম্ভের মুখেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল গুরুভার কর্ত্তব্যের দল বিশ্বহিতের দোহাই দিয়ে, ফাঁক গেছে ভরে, ঠেসাঠেসিতে বাণী পড়েছেন সঙ্কুচিত হয়ে। অনেকদিন এমনি বোঝা টেনে কাটল এখন আর নয়—পুরোনো কলমটাকেও জেটিসন্ করবার ইচ্ছে।

ঘাটশিলায়* গিয়ে রামানন্দবাবুর শরীর আশা করি সুস্থ হয়েছে। অনেকদিন পূর্ব্বে ও অঞ্চলে গিয়েছিলুম—একটি ছবি মনে আছে, ছোটো বড়ো নানা উপলে বিভক্ত সুবর্ণরেখা নদী বয়ে চলেছে, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, অস্তগামী সূর্য্যের ম্লান ধূসর আলোয় একদল বক স্তব্ধ বসে আছে

* ঘাটশিলায় বাসা বাঁধিবার সময় প্রথম জানি যে কবি এখানেও কিছু দিন কাটিয়ে গেছেন। সেই সুদূর কালের ছবি কী রকম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দু-একটি ছত্রে! এইখানে তাঁর নবপ্রকাশিত 'শেষ সপ্তক' গদ্য কাব্যখানি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সেবিষয়ে কিছু লেখাতে তিনি অসুস্থ হলেও নিজ হাতে এ চিঠি লেখেন। কিন্তু এখন থেকে তাঁকে চিঠি লিখে বিব্রত করতে সঙ্কোচ আসত। সেকালের আশীর্বাদ লিপিও সব রক্ষা করতে পারি নি সেটা নিজের দুর্ভাগ্য। যে কয়খানি ছিল কবিভক্তদের উপহার দিলাম।

নদীবক্ষের মধ্যে একটি প্রশস্ত শিলাখণ্ডের উপরে—প্রাণবান্ করেছে তারা সন্ধ্যার শান্তিকে। সেই ধ্যানী বকের দল এখনো আছে, না সর্ব্বজীবশত্রু মানুষের সমাগমে পালিয়ে গেছে জানিনে—যদি গিয়ে থাকে তাহ'লে ক্ষতি হয়েছে।

তোমরা আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো আর রামানন্দবাবুকে আমার প্রীতি অভিবাদন জানিয়ো। ইতি বিজয়া দশমী ১৩৪২

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১০)

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

কালিদাস, কোথাও নড়িনি, নড়বার শক্তিও নেই দেহে। আমার ছুটি এখানকার সকলের ছুটির মধ্যে। লোকে যায় বায়ু পরিবর্ত্তনের সঙ্কল্প নিয়ে—তার আয়োজন বিস্তর; ব্যয়ও কম নয়। অথচ প্রকৃতি নিজের হাতেই বায়ু পরিবর্ত্তন করে দেন—সন্ধ্যার আকাশে তুলির পোঁচ লাগে নতুন রঙের—প্রাঙ্গণে এত দিন ছিল জুঁই বেল, তারা বিদায় নিল, এল শিউলি, কিছু কিছু মালতীও রয়ে গেল উপরি সময়ের ফরমাসে। ওদিকে মাঠে বাটে কাশবনে শুভ্রতার শুভ্র ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত, শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না, চাঁদের বর্ষাজলে ধোপ দেওয়া নূতন উত্তরী, বাতাসে ব্যাপ্ত হয়েছে শিশিরের স্নিগ্ধ প্রসন্নতা। এই পরিবর্ত্তন যদি নিজের খরচে করতে হ'ত তাহলে বুঝতে পারতুম এর মর্য্যাদা। বিনামূল্যের প্রশ্রয়ের আড়ালে বিধাতা তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠদানগুলিকে আড়াল করে দিয়েছেন, সুলভ বলেই তারা হয়েচে দুর্লভ। ভালোই হয়েছে—কন্‌সেশনের টিকিট কিনে গাড়িতে ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে পিণ্ডীকৃত হয়ে ঠাঁই বদলের দুরাকাঙ্ক্ষায় ছুটো ছুটি করতে হয় না। এই নি-কড়িয়া চেঞ্জের জলস্থল আকাশব্যাপী ঐশ্বর্য্য আমার মতো কয়েকটা বাদসাহি কুঁড়ের জন্যে ভিড়ের লোকের কাছ থেকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে তাদেরই উদাসীন দৃষ্টির পর্দ্দার ওপারে। এমনি করেই বিধাতা তাঁর আমদরবারের মাঝখানেই খাস-দরবারের আসন পাতেন। যারা সমজদার তারা নিমন্ত্রণ পত্র আকাশ থেকে কুড়িয়ে পায় আর কেউ খবরই জানে না। এটা বোঝা যায় যারা অধিকারী তাদের সংখ্যা খুবই কম—সেই সামান্য ক'জনের জন্যে রাজাধিরাজের উৎসব সভায় এত ধুমধাম কেন তাই ভাবি। যুগ যুগ ধরে তাঁর বীণকারকে বায়না দিয়ে রেখেছেন কেবল এদের মন ভোলাতে। বাঁশি* আজ বাজল, আমার দুই চক্ষু যোগ দিয়েছে ঐ কয়েক টুকরো সাদা মেঘের দলে, আমার মন বেরিয়েছে অভিসারে, একলা ব'সে শিশির ভেজা মাঠের ধারে, নির্ম্মল নীলাকাশের নিচে; এই অভিসারের পথ ই, আই, আরের রেল পথ নয়। অতএব চুপচাপ নিস্তব্ধ ছুটির ভ্রমণ সেরে নিচ্চি—এর পর বায়ু পরিবর্ত্তনের দল যখন জমবে ভিড় করে, মূলতবি কাজের অনুশোচনা ঠেলা দেবে মনকে, তখন আমারো রিটার্ণ টিকিটের মেয়াদ ফুরোবে, সুবিধা এই, তখন এইখান থেকে এইখানেই ফিরব —সেই ছুটি এইখানের মাঝে আছে অদৃশ্য সমুদ্র।

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে যে চিঠিখানি লিখতে লিখতে সেটাকে গদ্য-কাব্যেরু† বান ডেকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেখি সেটা দেরাজের মধ্যে পড়ে আছে। তোমার জিনিষ তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া গেল। চিঠিখানার সেদিনকার তারিখ এসে ইতিপ্রাপ্তি হয়নি, অতএব ওটা কালাতীত হয়ে রইল। ইতি ২৫শে জুলাই ১৯৩৬

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* কবির শৈশব সঙ্গীতের সঙ্গেই যিনি বাঁশির সুর দিয়েছিলেন তিনি যেন এখন থেকে বিদায়ের বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছেন : গুরুদেবের এই শেষ চিঠির আশীর্ব্বাদ পাই দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রার সময়—প'ড়ে চোখ জলে ভরে আসে। তখন বুঝি নাই পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁকে হারাব।

† আমাকে গদ্য কবিতায় লেখা চিঠিখানি "কবিতা" পত্রিকায় ছাপা হয়।

সাহিত্যে ব্যঙ্গরচনা

শ্রীসুলতা কর, এম-এ

দুঃখ আর ব্যথা মানুষের জীবনকে ঘিরে আছে সত্য, কিন্তু তারই ভিতর দিয়ে আনন্দের একটি স্নিগ্ধ ধারা কি নীরবে বয়ে যাচ্ছে না! সংসারের অসংখ্য তাপে তাপিত মানুষ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এই আনন্দের স্পর্শ চায়। তাই সাহিত্যে আনন্দভরা রচনার—ব্যঙ্গরচনার বেশ মূল্য আছে। পাশ্চাত্যে বহু লেখক 'হাসির রচনা'য় নাম করেছেন। আমাদের প্রাচ্য দেশে যদিও দুঃখবাদই প্রধান, তবু এ দেশের সাহিত্যেও ব্যঙ্গরচনার কিছু প্রয়াস বহুকাল ধরে চলে আসছে দেখতে পাই। বাংলা-সাহিত্যে যে-সব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আছে, তাহা যদি পড়ি তবে দেখি যে বাঙালী জাতির মন আর শিক্ষা যেমন যুগের সঙ্গে বদলে চলেছে, তেমনই বদলে চলেছে, বাংলা-সাহিত্যের হাসিভরা রচনা।

এখন থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে বিজয়গুপ্ত নামে পূর্ব্ববঙ্গের এক কবি "পদ্মপুরাণ" নামে কাব্য লিখেছিলেন। এই কাব্যটি পড়লে সেকালের রসিকতার রূপ কেমন ছিল বুঝতে পারি। পদ্মার বিবাহ সম্বন্ধে শিব-দুর্গায় আলাপ হচ্ছে। কবি লিখেছেন:—

"জামাই এনেছি পুণ্যবান, কন্যা করিব দান
বিবাহের সজ্জা কর ঘরে।
* * *
হাসি বলে চণ্ডি আই, তোমার মুখে লজ্জা নাই
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে, তারা চাবে পাণ খাইতে
আর চাবে তৈল সিন্দুরে।
হাসি বলে শূলপাণি এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠান, এয়োর উড়িবে প্রাণ
লাজে সব যাবে পলাইয়ে।"

কন্যার বিবাহ উপলক্ষে পিতার এ ধরণের রসালাপ এ যুগে ভাঁড়ামি বলে গণ্য হবে। কিন্তু সেকালে এ সব রসিকতা সমাজে চলিত ছিল। কেন-না সেকালের অধিকাংশ বইয়েতেই রসিকতার ক্ষেত্রে আদি রসের প্রাধান্য চোখে পড়ে, সুরুচি বা শালীনতার পরিচয় খুব কম ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়।

পুরানো বাংলা-সাহিত্যে হাস্যরস সবচেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে। তিনি যে সুন্দর নির্ম্মল হাস্যরসের পরিচয় দিয়েছেন তার বিশেষত্ব এই যে সেকালের রসিকতার অশ্লীলতা আর অমার্জ্জিত রুচি কোথাও স্থান পায় নি। অথচ তিনি তাঁর এই কাব্য লিখেছেন প্রায় চার-শ বছর আগে। ব্যাধ কালকেতুর উপর প্রসন্ন হয়ে দেবী চণ্ডী রূপসী যুবতীর রূপ ধরে ব্যাধের ভাঙা কুঁড়েঘরে বসে আছেন। তাঁর রূপের প্রভায় "ভাঙা কুড়া ঘরখানা করে ঝলমল। কোটি-চন্দ্র প্রকাশিত গগনমণ্ডল॥" দরিদ্রা ব্যাধবধূ ফুল্লরা হাটে মাংস বিক্রী ক'রে ঘরে ফিরে এই সুন্দরী যুবতীকে দেখে অবাক্ হয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। দেবী বললেন তিনি সতিনীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে এসেছেন, এখন তিনি ব্যাধের ঘরেই চিরকাল বাস করবেন স্থির করেছেন। ফুল্লরা সেই ভাঙা কুটীরে স্বামীর প্রেমে সুখী হয়ে বাস করছিল, তার উপবাস, দারিদ্র্য সবই সহ্য হয়েছিল, কিন্তু আজ এই সুন্দরীর রূপ দেখে ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। তখন—"পেটে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা। ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল রন্ধনের ত্বরা॥" যত বার জিজ্ঞাসা করেন দেবীর এক উত্তর—তিনি এখানেই থাকবেন। তখন মনের আশঙ্কা লুকিয়ে রেখে ফুল্লরা সুন্দরী সীতা সাবিত্রীর উদাহরণ দিয়ে বার-বার বলতে লাগল স্বামী ছেড়ে স্ত্রীলোকের এক দণ্ডও পরগৃহে থাকা উচিত নয়, আপনার এ স্থান ত্যাগ করাই ভাল।

অধম অবলা জাতি যদি থাকে য়েক রাতি
পরের ভবনে কদাচিৎ।
লোকে ঘোষে কুঘোষণ ছল ধরে বন্ধুজন
অবিচারে কৈলা অনুচিৎ।

সে কত নৈতিক বক্তৃতা দিয়ে এই রূপসীকে বাড়ী পাঠাবার চেষ্টা করতে লাগল।

সতিনী কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড়বে কেনি।

কিন্তু দেবীর রহস্যপ্রিয়তা একটা অটল অভিসন্ধির ভাণ ধরে উপায়হীনা ফুল্লরার সমস্ত অনুনয়-বিনয় ব্যর্থ করে দিল। নীতিবাক্যে দেবীকে ফেরাতে না পেরে ফুল্লরা দারিদ্র্যের ভয় দেখাতে লাগল।

বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখবাণী।
ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর তালপাতার ছাউনি।
ভেরেণ্ডার থাম তার আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।

এমনি করে সে বারো মাসের দুঃখ বর্ণনা করল আর বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে ভয় দেখিয়ে বলল,

কোন্ সুখে ইচ্ছিলে হইতে ব্যাধের রমণী।

ফুল্লরা নিজের ঘোর দারিদ্র্য-দুঃখ লজ্জায় কাকেও বলত না। কিন্তু এই রূপসীকে তা না জানালে সে ঘর ছাড়ে না।

ফুল্লরার পতিপ্রেম দেখে আমাদের সুখ হয় বটে, কিন্তু তার অকারণ কাতরতায় ঈষৎ হাসিও সামলান যায় না।

কবিকঙ্কণের 'শ্রীমন্তের কাহিনীতে'ও আমরা বেশ পরিহাস-পটুতার পরিচয় পাই।

বণিক শ্রীমন্তের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। তাঁর নৌকার বাঙাল মাঝিরা কাঁদছে। এই উপলক্ষ্যে কবি বাঙাল ভাষার উপর কটাক্ষ ক'রে কৌতুক করেছেন।

বাঙ্গাল কাঁদেরে হুড় র বাপই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই।
* * *
আর বাঙ্গাল বলে বাই হইল অনাথ।
হর্বধন গেল মোর হুকুতার পাত।
আর বাঙ্গাল বলে বাই কইতে বড় লাজ।
অলদি গুড়ি ব্যাসা গেল জীবনে কি কাজ।

কবিকঙ্কণের পর রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য তাঁর 'শিবমঙ্গল' নামে একখানা কাব্যে যে হাস্যরসের পরিচয় দিয়েছেন তা বেশ সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছে, আর তাতে সেকালের ভাঁড়ামিও স্থান পায় নি। কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতিকে নিয়ে শিব আহারে বসেছেন। দেবী অন্নপূর্ণা দুখানি মাত্র হাত নিয়ে স্বামী পুত্রের বারটি মুখে অন্ন পরিবেশন করতে কেমন অস্থির হয়ে উঠেছেন, কবি তা নিয়ে ভারি সুন্দর কৌতুক করেছেন।

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্ত পঞ্চমুখ পতি।
তিন জনে একুনে বদন হ'ল বার।
গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার।
তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়।
শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া নাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে।
গুহ গণপতি ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য ধরে খা।

এর পরে রামায়ণ মহাভারতের যুগ। কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে যে কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন তা সহজ ও স্বাভাবিক, আর তা সাধারণ লোককে বহু দিন ধরে তৃপ্তি দিয়েও এসেছে বটে, কিন্তু শিক্ষিত রসজ্ঞ লোক কৃত্তিবাসী কৌতুকে সব সময় সুরুচির পরিচয় পাবেন না।

অঙ্গদ রাবণের সভায় উপস্থিত হ'লে তাকে অপ্রতিভ করবার জন্য সভাসুদ্ধ সকলে রাক্ষসীমায়ায় রাবণরূপ ধারণ করল। কেবল ইন্দ্রজিৎ পিতৃরূপ ধারণ করা অন্যায় ভেবে নিজরূপেই রইলেন। তখন—

অঙ্গদ বলে সত্য করে কওরে ইন্দ্রজিতা।
এই যত সব বসে আছে সবাই কি তোর পিতা।
ধন্য রাণী মন্দোদরী ধন্য তোর মাকে।
এক যুবতী এত পতি ভাব কেমন করে রাখে।
কোন্ বাপ তোর চেড়ীর অন্ন খাইল পাতালে।
কোন্ বাপ বাঁধা ছিল অর্জ্জুনের অশ্বশালে।
* * *
একে একে কহিলাম তোর সকল বাপের কথা।
ইহা সবাকে কাজ নাই তোর যোগী বাপটী কোথা।

পিতার সম্বন্ধ নিয়ে পুত্রের সঙ্গে এ ভাবে রসালাপ করা কোনমতেই সুরুচির পরিচয় দেয় না। কিন্তু স্থানে স্থানে কৃত্তিবাস নির্ম্মল রুচিরও পরিচয় দিয়েছেন। অঙ্গদের কথা শুনে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "রামকে বল সমুদ্রের বাঁধ ভেঙ্গে দিতে, বিভীষণকে বেঁধে এনে দিতে, তবে আমি সন্ধির কথা বলতে পারি।" এ কথার উত্তরে অঙ্গদ ঠাট্টা করে বলছে—

রামকে গিয়া বলি ইহা না করিলে নয়।
সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিব দণ্ড চারি ছয়।
বিভীষণে বান্ধিয়া আনিব তোর কাছে।
বুঝিয়া করহ শাস্তি মনে যত আছে।
নির্ম্মাইয়া দিব লঙ্কা যত গেছে পোড়া।

এ সবই করে দেব, কিন্তু—

শূর্পণখার নাক কানটী কেমনে দিব জোড়া।

অঙ্গদের এই উক্তির মধ্যে প্রচুর হাস্যরস আছে কিন্তু অশ্লীলতা নাই। রামায়ণ, মহাভারতের পর সাহিত্যে হাস্যরস কেমন রূপ নিয়েছে দেখতে গেলে কবি ভারতচন্দ্রের কাব্য পড়তে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের মত ক্ষমতাশালী কবি আর জন্মান নি। ছন্দ, ভাষা, শব্দঝঙ্কারে তাঁর কাব্যের আর তুলনা নাই। কিন্তু এত বড় কবি রসিকতার নামে যে বিকৃতরুচি আর অশ্লীলতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়।

'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে সুন্দর রাজসভায় ভাবী শ্বশুরের কাছে নিজের পরিচয় দিচ্ছে—

শুন শ্বশুর ঠাকুর, শুন শ্বশুর ঠাকুর।
আমার পিতার নাম বিদ্যার শ্বশুর।

ভাবী শ্বশুরের কাছে জামাতার এই উক্তি পরিহাসচ্ছলেও কত দূর অমার্জ্জিত রুচির পরিচয় দেয় তাহা সহজেই বুঝা যায়।

'অন্নদামঙ্গলে'ও কবি বিকৃত রুচির পরিচয় দিয়েছেন। উমার মা মেনকা বাংলার ঘরে ঘরে আদর্শ জননীরূপে পূজিত হয়ে আসছেন। ভারতচন্দ্র কৌতুক-রস সৃষ্টি করার জন্য সেই মেনকাকে এঁকেছেন পাড়াকুঁদুলীরূপে। উমার বিবাহের ঘটক নারদকে মেনকা গালাগালি দিচ্ছেন।

ঘরে গিয়ে মহাক্রোধে তাজি লাজ ভয়।
হাত নাড়ি গলা ছাড়ি ডাক ছেড়ে কয়।
ওরে বুড়া আঁটকুঁড়া নারদ অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥

ভারতচন্দ্রের পর বাংলা-সাহিত্যে হাসির রচনা লিখে নাম করলেন দীনবন্ধু মিত্র। তিনি লিখলেন তিনখানি প্রহসন—'জামাইবারিক', 'সধবার একাদশী' আর 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো'। তাঁর রচনায় সরসতা আছে বটে, কিন্তু অশ্লীলতার অভাব নাই। 'বিয়েপাগলা বুড়োতে' যখন পড়ি—ছদ্মবেশী বালকের দল শ্যালিকা সেজে বুড়ো বর রাজীবকে নিয়ে বাসরঘরে রসিকতা করে বলছে:—

রাজী—অনেক রাত্রি হয়েচে ঘুম আসচে।

তৃতীয় বালক—বাসরঘরে ঘুমুলে মাগ ভাতারে বনে না।

নসী। না ভাই, তোমায় আমরা ঘুমুতে দেব না। আমরা কি তোমার যোগ্যি নই? আমি কত বলে কয়ে মিন্‌ষেরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলেম, আমি আজ সমস্ত রাত জাগবো।

রাজী। আমার রাত জাগলে পেট ব্যথা করে।

তার পর যখন 'জামাইবারিকে' জমিদার-কন্যা কামিনী ও ভবী ময়রাণীর গ্রাম্য ভাষায় ইতর রসালাপ পড়ি, তখন বুঝি যে এখানেও ভারতচন্দ্রের প্রভাব কাটে নি।

কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোমপ্যাঁচার নক্সা"তেও রসিকতার স্থলে ভারতচন্দ্রের প্রভাব দেখতে পাই।

এঁদের পরে এলেন বঙ্কিম। বাংলা-সাহিত্যের একটা যুগধর্ম্ম বদলে গেল। কেটে গেল ভারতচন্দ্রের প্রভাব, সেকালের রসিকতার নির্লজ্জ ভাঁড়ামি। কি পবিত্র আর স্নিগ্ধ হাসির ধারাই না তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে বহন ক'রে নিয়ে এলেন।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলা, আশমানী আর দিগ্‌গজের কাহিনী নিয়ে তিনি যে কয়টি অধ্যায় লিখলেন তাতে বাঙালী প্রথম দেখল আদিরসবিহীন, নির্ম্মল হাসির সৌন্দর্য্য কত মধুর।

"আশমানীর প্রেম" নামক অধ্যায়ে লিখেছেন—পরিচারিকা আশমানী কেমন মজা ক'রে নির্ব্বোধ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে নিজের উচ্ছিষ্ট অন্ন খাওয়াচ্ছে। এই ব্রাহ্মণটি একাধারে রসিক ও পেটুক। রসিক দিগ্‌গজ ঘরে বসে ভাত খাচ্ছিলেন এমন সময় প্রণয়িনী আশমানী প্রবেশ করল।

দি—সুন্দরি, তুমি বইস; আমি হস্তপ্রক্ষালন করি।

আশমানী মনে মনে কহিল, "আলপ্পেয়ে! তুমি হাত ধোবে? আমি তোমাকে ঐ এঁটো আবার খাওয়াব।"

প্রকাশ্যে কহিল, "সে কি, হাত ধোও যে, ভাত খাও না।"

গজপতি—কি কথা ভোজন করিয়া উঠিয়াছি, আবার ভাত খাব কিরূপে?

* * *

আ। হাঁ, খাইবে বইকি। আমারই উচ্ছিষ্ট খাইবে।

এই বলিয়া আশমানী ভোজনপাত্র হইতে এক গ্রাস অন্ন লইয়া আপনি খাইল।

ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

আশমানী উৎসৃষ্ট অন্ন ভোজনপাত্রে রাখিয়া কহিল, "খাও।"

* * *

দি—তাও কি হয়?

* * *

আ। আমার ইচ্ছা হইয়াছে, তোমার পাতে প্রসাদ পাইব। তুমি আপন হাতে আমাকে দুইটি ভাত মাখিয়া দাও।

দি—তার আশ্চর্য্য কি? স্নানেই শুচি। এই বলিয়া উৎসৃষ্টাবশেষ একত্রিত করিয়া মাখিতে লাগিল।

* * *

আশমানী এক রাজা আর তাহার দুয়ো সুয়ো দুই রাণীর গল্প আরম্ভ করিল। দিগ্‌গজ হাঁ করিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া শুনিতে লাগিল আর ভাত মাখিতে লাগিল।

* * *

যখন আশমানীর গল্প বড় জমিয়া আসিল—দিগ্‌গজের মন তাহাতে বড়ই নিবিষ্ট হইল—তখন দিগ্‌গজের হাত বিশ্বাসঘাতকতা করিল। পাত্রস্থ হাত নিকটস্থ মাখা ভাতের গ্রাস তুলিয়া চুপি চুপি দিগ্‌গজের মুখে লইয়া গেল। মুখ হাঁ করিয়া তাহা গ্রহণ করিল। দন্ত বিনা আপত্তিতে তাহা চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিল। রসনা তাহা গলাধঃকরণ করাইল। নিরীহ দিগ্‌গজের কোন সাড়া ছিল না। দেখিয়া আশমানী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তবে রে বিট্‌লে আমার এঁটো নাকি খাবি নে?"

তখন দিগ্‌গজের চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি আর এক গ্রাস মুখে দিয়া গিলিতে গিলিতে এঁটো হাতে আশমানীর পায়ে জড়াইয়া পড়িল। চর্ব্বণ করিতে করিতে কাঁদিয়া বলিল, "আমায় রাখ আশমান! কাহাকেও বলিও না।"

"দিগ্‌গজের সাহস" নামক অধ্যায়ে বঙ্কিম দিগ্‌গজের ভূতের ভয় নিয়ে কৌতুক করেছেন। গড়মান্দারণ দুর্গের পুরস্ত্রী বিমলা নির্জ্জন প্রান্তর দিয়া শৈলেশ্বরের মন্দিরে যাচ্ছেন, সঙ্গী সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দিগ্‌গজ।

ক্ষণেক কাল পরে বিমলা আবার কহিলেন, "দিগ্‌গজ তুমি ভূতের ভয় কর?"

"রাম! রাম! রাম! রাম নাম বল" বলিয়া দিগ্‌গজ বিমলার পশ্চাতে দুই হাত সরিয়া আসিলেন।

* * বিমলা বলিতে লাগিলেন—"আমরা সেদিন শৈলেশ্বরের পূজা দিতে আসিতেছিলাম, পথের মধ্যে বটতলায় দেখি যে এক বিকটাকার মূর্ত্তি।"

অঞ্চলের তাড়নায় বিমলা জানিতে পারিলেন যে আর অধিক বাড়াবাড়ি করিলে ব্রাহ্মণের গতিশক্তি রহিত হইবে। অতএব ক্ষান্ত হইয়া কহিলেন—"রসিকরাজ তুমি গাইতে জান?"

তারপর দুজনে নির্জ্জন প্রান্তর দিয়ে চলতে চলতে মন্দিরের কাছাকাছি এলেন। মন্দিরের কাছে বটগাছের নীচে একটা ষাঁড় শুয়েছিল। বিমলা সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে গজপতিকে বললেন—"গজপতি ইষ্টদেবের নাম জপ, বৃক্ষমূলে কি দেখিতেছ?"

ওগো—বাবা—গো—বলিয়াই দিগ্‌গজ একবারে চম্পট। দীর্ঘ দীর্ঘ চরণ—তিলার্দ্ধমধ্যে অর্দ্ধ ক্রোশ পার হইয়া গেলেন।

শুধু 'দুর্গেশনন্দিনী' কেন, বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসই নির্ম্মল হাসির ধারায় স্থানে স্থানে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। 'ইন্দিরা' উপন্যাসে উপেন্দ্রবাবুকে নিয়ে ইন্দিরা ও কামিনীর কৌতুক, সুভাষিণীর বাড়ীর বৃদ্ধা রাঁধুনীর পাকাচুলে কলপ দেওয়ার বদলে মুখে কলপ দেওয়া এই সব ঘটনায় কেমন মধুর হাসির জগৎ সৃষ্ট হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের সৃষ্ট হাস্যরসকে "ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা"র সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলেছেন—

"নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য-অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত।

* * তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে।"

বঙ্কিমের পর কবি দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলি প'ড়ে আমরা মুগ্ধ হই। তাঁর লেখা—

আমরা বিলেতফের্ত্তা ক' ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই,
আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি,
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরদের ডাকি "বেয়ারা"—আর
মুটেদের ডাকি "কুলি"।

কিংবা

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো
নাকগুলো সব কাটো, কাণগুলো সব ছাঁটো
পাগুলো সব উঁচু ক'রে মাথা দিয়ে হাঁটো।

* * *

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো
ডাল ভাতের দফা কর সবাই রফা;
কর শিগ্‌গীর ধুতি চাদর নিবারণী সভা,
প্যাণ্ট পরো কোট পরো নইলে নিন্দে পেলে,
ধুতি চাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে।

এই সব গান পড়লে বুঝতে পারি তিনিও বঙ্কিমের মত শুচিতা ও সুরুচি অক্ষুণ্ণ রেখে কত সুন্দর হাস্যরস সৃষ্টি ক'রে গেছেন।

এমনি ভাবে দেখতে পাই যুগে যুগে যেমন বদলে চলেছে মানুষের মন, তেমনই বদলে চলেছে সাহিত্যে হাসির আদর্শ। আদিরস যখন তৃপ্ত করত বাঙালী সমাজকে তখন অশ্লীলতা আর ভাঁড়ামি হয়েছিল হাসির উপাদান। ভারতচন্দ্রের মত শক্তিশালী লেখকেরাও যুগধর্ম্মে আদিরসকে আশ্রয় ক'রে হাসির রচনা লিখেছেন। তার পর যখন যুগধর্ম্ম বদলে গেল, সুরুচি আর নির্ম্মলতা পাঠককে তৃপ্তিদিতে লাগল, তখন শক্তিশালী লেখকেরা তেমনই ভাবে লিখতে লাগলেন। বঙ্কিম দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির রচনা আমাদের তৃপ্তি দিল।

জীবনের দুঃখ-ব্যথায় অধীর হয়ে মানুষ যখনই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তৃপ্তি পেতে চাইবে তখনই সে নির্ম্মল শুচি হাসির ধারাকে খুঁজবে, কাজেই সাহিত্যে হাসির প্রয়োজনীয়তা কখনই ফুরোবে না। অনাদিকাল ধরে সাহিত্যে হাসি থাকবে অমর হয়ে।

প্রশ্ন

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

১৯

কয় দিন পরে—সেদিন রাত্রে নিরাপদ মালতীকে দিয়া কাপড় জামা গুছাইয়া রাখিয়া শুইতে গেল এবং তাহাকে বারে বারে বলিয়া গেল তাহাকে যেন সকাল সকাল ডাকিয়া তোলা হয়। আগামী কল্য ৭টার ট্রেনে সে যাইবে মালতীর পিতার খোঁজে। কিন্তু পরের দিন তাহাকে আর ডাকিতে হইল না, সকলের আগেই নিরাপদ ঘুম হইতে উঠিল। হাত মুখ ধুইয়া প্রস্তুত হইয়া নিজের কাপড় জামা লইয়া সে যাইতেছিল বাহির হইয়া, সদর দরজা পার হইয়া যেমনি রাস্তায় গিয়া পা দিবে ঠিক এমনি সময়ে দেখিল সম্মুখে দাঁড়াইয়া কয়েক জন পুলিস, তাহার মধ্যে কয়েক জন আবার সশস্ত্রও। নিরাপদ বিস্মিত ও ভীত হইল—আবার কি ব্যাপার! দুর্ভোগ কি এখনও কাটে নাই?

এমন সময় এক জন পুলিসের লোক আগাইয়া আসিয়া নিরাপদর নাম-ধাম সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—তার পর পরেশ কোথায় থাকে, এখানে আছে কি না? এই সব প্রশ্ন করিতে লাগিল। এ দিকে গণ্ডগোল শুনিয়া ভিতর হইতে অবনী ও পরেশ আসিল ছুটিয়া। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস অফিসারটির পাশে দণ্ডায়মান খর্ব্বাকৃতি একটি লোক পরেশকে দেখাইয়া বলিয়া উঠিল—এই ইনি পরেশবাবু!

অফিসারটি একখানি পরোয়ানা বাহির করিয়া বলিল—আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করছি—এই দেখুন আপনার নামে 'ওয়ারেণ্ট'। আপনাকে 'বেঙ্গল অর্ডিনান্সে' গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কয়েক মিনিট আর কাহারও মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। পরেশ যন্ত্রচালিতের মত হাত বাড়াইয়া ওয়ারেণ্টখানি গ্রহণ করিয়া চোখের সামনে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—পড়িতে পারিল কি না-পারিল তাহা সে-ই জানে। কিছুক্ষণ পরে বিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বেশ—এখনই ত যেতে হবে?

পুলিস অফিসারটি তবু ভদ্র, বলিলেন—হাঁ, এখনি, তবে আপনাকে কিছু সময় দিচ্ছি, আত্মীয়-স্বজনের নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে চলুন। আমরাও ভিতরে গিয়েই বসছি। পুলিসের দল রহিল দরজার বাহিরে, আর ভিতরে নিরাপদ অবনী পরেশ তিন জনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারও মুখ দিয়া আর একটি কথাও বাহির হইল না। একটু দূরে ছিল মালতী দাঁড়াইয়া, পরেশকে আবার থানায় যাইতে হইবে সে এইটুকুই ভাবিয়াছিল, কিন্তু ইহাতেই তাহার ভয়ের অন্ত ছিল না। তাই জানালার পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল। কিছুক্ষণ এমনি দাঁড়াইয়া থাকিবার পর নিরাপদ অবনীর হাত ধরিয়া বলিল—চল্ আমরা বাহিরে যাই অবনী—পরেশ তুই একটু পরে আয় ভাই—মালতী তোকে কি যেন বলতে চায়। বলিয়া নিরাপদ ও অবনী বাহিরে আসিল।

পরেশ ডাকিল—মালতী! কিন্তু এতক্ষণ পরে তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ গেল ভাঙিয়া—উদ্গত অশ্রু আর বাধা মানিল না।

মালতী নিকটে আগাইয়া আসিল। পরেশ পুনরায় বলিল—যাই মালতী।

—কিন্তু ওরা কেন তোমায় ধরতে চায়—কি করেছ তুমি?

—তা ত জানি নে।

—কবে ছেড়ে দেবে? মামলা-মকদ্দমা হবে না ত?

—কবে ফিরে আসব তা ত জানি নে—মামলা-মকদ্দমাও হবে না। কিন্তু যদি আর না ফিরে আসি, আমাকে ভুল না মালতী!

মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে আর মিথ্যে ভয় দেখিও না—বড়দা আছেন—তিনি নিশ্চয় তোমায় খালাস ক'রে আনবেন—তা না হ'লে যে আমি বাঁচব না! মালতী আর বলিতে পারিল না, ক্রন্দনের বেগ তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল। বাহির হইতে পুলিস অফিসারটি বলিয়া উঠিলেন—এইবার আসুন পরেশবাবু, আমরা আর বিলম্ব করতে পারি না।

মালতী মেঝের উপরে উবু হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। পরেশ ধীরে ধীরে গেল বাহির হইয়া। মিনিট কয়েক বোধ হয় তাহার বাহ্যজ্ঞানই ছিল

না—যখন পরেশের দিকে ফিরিয়া চাহিল তখন পরেশ বাসা ছাড়িয়া একেবারে কয়েদীর গাড়ীতে উঠিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি পাগলের মত বাহির হইয়া আসিল কিন্তু সেখানে কেহ নাই—কেবল এক পাশের দেওয়াল ঠেস দিয়া অবনী অসহায়ের মত বসিয়া আছে আর নিরাপদ আছে চুপ করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া।

মালতী একবার অবনীর দিকে, একবার নিরাপদর দিকে তাকাইয়া আর সামলাইতে পারিল না, ধীরে ধীরে সেখানেই বসিয়া পড়িল।

২০

সন্ধ্যা অনেক ক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—নিরাপদ অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া নিজের বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়াছিল। অবনী যেন কোথায় গিয়াছে। আজ এ ঘরখানিতে সন্ধ্যা-দীপটিও এখন পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। সারাটা দিন যে কি ভাবে কাটিয়াছে তাহা তাহারাই জানে। রান্না-বান্না হয় নাই—বিকালে নিরাপদ দোকান হইতে কিছু জলখাবার কিনিয়া আনিয়াছিল—তাহাই অবনী আর সে কিছু কিছু খাইয়াছে, কিন্তু মালতীকে এ পর্য্যন্ত কিছুই খাওয়ান যায় নাই—সে মণিয়ার মার ঘরে তাহার নিজের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে মণিয়ার মা একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়া ঘরের এক পাশে রাখিয়া একটা কথাও না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ক্রমে রাত্রি অনেক হইয়া যাইতে লাগিল তবু নিরাপদ বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার নামও করিল না। ওঘরে মালতী অনাহারে পড়িয়া আছে—অবনী কোথায় গেল—এসবের কোন ব্যবস্থা সে না করিলে যে করিবার কেহ নাই—তাহা জানিয়াও সে এমনি ভাবেই পড়িয়া রহিল।

—বড়দা! নিরাপদ চমকিয়া ফিরিয়া দেখে মালতী তাহারই পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নিরাপদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

—আপনাকে এমনি চুপ ক'রে থাকলে ত চলবে না দাদা—এর ব্যবস্থাও ত আপনাকেই করতে হবে।

—কিসের ব্যবস্থা বোন?

—কেন থানায় গিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে আনবার বন্দোবস্ত করতে হবে না?

নিরাপদ আজ এই ভয়ই করিতেছিল—ইহা যে সম্পূর্ণ তাহার নাগালের বাহিরে—করিবার বা ভাবিবার যে কিছুই ইহাতে নাই। অথচ এত বড় একটা বিপদের কথা সে কেমন করিয়াই বা বলিবে মালতীকে? দুই দিন বাদে হইবে তাহাদের বিবাহ—তাহার পর পরেশের সহিত সে যাইবে বর্ম্মায়। সেখানে দুটিতে মিলিয়া ঘর-সংসার করিবে। নিরাপদ তাহার পিতাকে আনিবে সঙ্গে করিয়া, তিনিই পরেশের হাতে তাহাকে করিবেন সমর্পণ—তাহার সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত অপবাদ ধুইয়া মুছিয়া যাইবে!

কিন্তু হায় এমন করিয়া যে তাহার সকল সুখ-কল্পনায় বজ্রাঘাত হইবে তাহা সে কয় ঘণ্টা পূর্ব্বেও কল্পনা করিতে পারে নাই। এখনও সে জানে না যে তাহার বিপদের মাত্রা কত গুরুতর। তাই সে বলিতেছে—প্রতিকারের কথা!

নিরাপদ তাহার হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়া বলিল—তোকে অনেক কথা বলবার আছে বোন। বোস আমার কাছে। কিন্তু একটা কথা বলি বোন—বিপদে এমন অধীর হ'লে ত চলবে না, তুমি এই বয়সে অনেক দুঃসাহসের কাজ করেছ—কিন্তু প্রকৃত সাহসের কাজ এইবার করতে হবে—ভেঙে পড়লে চলবে না।

—কিন্তু আমি ত ভেঙে পড়ি নি বড়দা, আজ আপনিই বেশী ভেঙে পড়েছেন। আপনি আজ যেন কেমন হয়ে গেছেন—কাউকে একটা ভরসার কথা পর্য্যন্ত শুনাচ্ছেন না।

—এই কয় দিনের পরিচয়ে তুমি সত্যি করেই আমাকে চিনেছ বোন! অবনী পরেশ যখন বিপদে প'ড়ে হাল ছেড়ে দেয় আমি তখনও ঠিক থাকি—কত দিন অনাহারে কাটিয়েছি, পয়সার অভাবে এক বেলা খেয়েছি—পুলিসের হাতেও ত কত দিন পড়েছি কিন্তু কোনদিন আমি মুষড়ে পড়ি নি। অবনী পরেশ এরা ভাবনায় ভয়ে একাকার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আমি দিয়েছি তাদের সাহস, আমি জুগিয়েছি তাদের বিপদে বল। বিপদ দেখলেই—তা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, কোন দিন কেঁদে ভাসাই নি, বা ভগবান ভগবান করে আকাশের দিকে হাতজোড় ক'রে দাঁড়াই নি। কিন্তু বোন আজকের কথা সম্পূর্ণ আলাদা—রোগ যদি চিকিৎসকের চিকিৎসার সম্পূর্ণ বাইরেই হয় তবে একমাত্র ভগবানকে ডেকে জানান ছাড়া আর উপায় কি?

—তার মানে কি বড়দা?

—তার মানে পরেশের এই গ্রেপ্তারের কোন প্রতিকার নেই—আটক তাকে থাকতেই হবে।

—কেন আমরা মকদ্দমা করব।

—মকদ্দমা হ'য়ে কেমন ক'রে বোন?

—কেন? আপনি টাকার কথা ভাবছেন বড়দা? ক'টা টাকা লাগবে তা কি আপনি জোটাতে পারবেন না? আর তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী—তাঁকে জোর ক'রে বিনা দোষে কে আটকে রাখবে শুনি?

—টাকার কথা নয় বোন—মকদ্দমায় যদি তার মুক্তি হ'ত আমি যত টাকা লাগুক জোগাড় ক'রে তাকে খালাস ক'রে আনতাম। কিন্তু এর যে বিচার নেই?

—কিসের বিচার নেই বড়দা?

—এই আইনটার।

—আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন বড়দা—বিনা অপরাধে নির্দ্দোষীকে নিয়ে যাবে ধরে অথচ তার কোন বিচার হবে না—জেল খেটে মরতে হবে?

—হাঁ বোন, এর একটা বর্ণও মিথ্যা নয়—সব সত্য।

—সব সত্য? কিন্তু দোষী যে সে শাস্তি ভোগ করুক, নির্দ্দোষী কেন অনর্থক শাস্তি পাবে?

—তা ত জানি নে বোন—সে সম্পূর্ণ নির্ভর করে যারা জেলে দেয় তাদের করুণার উপর। দোষী-নির্দ্দোষীর বিচারের উপরে নয়।

—করুণা কেন বড়দা? সে ত পায় পাপী দোষী—করুণা ত নির্দ্দোষীর জন্য নয়।

—দোষী-নির্দ্দোষীর কথা কেন বারে বারে বলছ বোন—সে কথা ছেড়ে দাও।

—এত অসহায় আমরা?

—হাঁ বোন, এত অসহায়?

—কিন্তু কত দিন পরে ছেড়ে দেবে তাকে?

—তাও ত জানি নে বোন—হয়ত দু-বছর—নয় পাঁচ বছর—নয় সারা জীবন।

—সারা জীবন?

—হাঁ বোন তাও হ'তে পারে।

হঠাৎ মালতী কাঁদিয়া ফেলিল। নিরাপদর দুইখানি পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—আপনার পায়ে পড়ি বড়দা—তাকে ছাড়িয়ে আনুন—আমি ও-কথা বিশ্বাস করি নে—অমন আইন কি কখনও হতে পারে—মা বলতেন মহারাণীর রাজ্যে অবিচার নাই—আর তাই যদি হয়—আমরা দেশের রাজার কাছে নালিশ করব বড়দা—তাকে এমনি করে হারাতে পারব না।

নিরাপদ এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। ধীরে ধীরে মালতীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—আজ থাক বোন—আজ তোমার মাথার ঠিক নেই—কাল সব তোমাকে বুঝিয়ে বলব—তার পরে যা বল তাই করা যাবে। ক্রমশঃ

অসুর জাতির নৃত্য ও গীত

শ্রীশৈলেন্দ্রবিজয় দাশগুপ্ত

সঙ্গীতানুরাগ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু আদিম জাতিগণের মধ্যেই বিশেষ করিয়া দেখা যায় সঙ্গীত-শিক্ষা-সংস্কৃতির তথা জীবনযাত্রার অপরিহার্য্য অঙ্গ। জীবনের যাহা কিছু অনাবিল স্বচ্ছ আনন্দ, নৃত্যগীত হইতেই তাহারা তাহা আহরণ করে। সামাজিক অনুষ্ঠানে, পূজা-পার্ব্বণে—বস্তুতঃ কারণে-অকারণে সুযোগ-সুবিধামত সকল সময়েই আদিমবাসী জনগণ নৃত্যগীতে মগ্ন হয়। যেরূপ কঠিন পরিবেশের মধ্যে ইহাদের বাস করিতে হয় নৃত্যগীতের মোহনীয় প্রলেপের যদি ব্যবস্থা না থাকিত তবে তাহাদের দুঃখময় ব্যষ্টি ও সমষ্টি শরীর চলা অসাধ্য হইয়া উঠিত। জীবনের যাহা কিছু ভাবানুভূতি সঙ্গীতের মধ্যেই তাহারা তাহা প্রকাশ করে।

বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল আদিম জাতিগণের এক প্রধান কেন্দ্র। এই অঞ্চলে অসুর নামধারী ক্ষুদ্র এক জাতি বাস করে। গভীর জঙ্গলে পাহাড়-পর্ব্বতের শিখরদেশে দুই-চারি-পাঁচ ঘর লোক বাস করে এইরূপ এক-একটি ক্ষুদ্র গ্রামে ইহাদের বসতি। ইহাদের মত দরিদ্র জাতি কেবল ছোটনাগপুরেই কেন সমগ্র ভারতে আর আছে কিনা সন্দেহ। সম্বৎসর প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও ইহারা বৎসরের খাদ্য যোগাইতে পারে না। বন্য ফল, মূল,



সালঙ্কারা অসুর রমণী

লতাপাতা আহরণ করিয়া, ইঁদুর, খরগোস, শূকর, ছাগল, হরিণ প্রভৃতি শিকার করিয়া খাদ্যাভাব পূরণের জন্য তাহারা চেষ্টা করে। কিন্তু তথাপি তাহাদের প্রায় সকলকেই অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে হয়। এমন অনেকে আছে যাহারা বৎসরে তিন-চারি দিন একটানা অনাহারে থাকে; অর্দ্ধভুক্ত বা স্বল্পভুক্ত ভাবেও বহু দিনই কাটে।

কিন্তু পারিপার্শ্বিক এই প্রকার নিষ্ঠুর পরিস্থিতি সত্ত্বেও ইহাদের সমগ্র মানুষটি এখনও নিষ্পেষিত হইয়া যায় নাই। প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য এবং সংস্কৃতিগত সরলতা তাহাদের অন্তরাত্মাকে এখনও সরস সবল রাখিয়াছে। মাদলের শব্দে যুবক-যুবতীর, বালক-বৃদ্ধের হৃদয় এখনও নাচিয়া উঠে। বাস্তবিক নৃত্যগীতের সুযোগ পাইলে সংসারের সব যেন ইহারা ভুলিয়া যায়। নিজেকে ভুলিবার এইরূপ সহজ উপায় যদি না থাকিত তবে তাহাদের বাঁচিয়া থাকা বোধ হয় অসম্ভব হইয়া উঠিত।

সাধারণতঃ দুই প্রকারের সঙ্গীত ও নৃত্য অসুরদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে—বিভিন্ন পূজা-পার্ব্বণে এক রকম নৃত্যগীতের প্রচলন; জন্ম ও বিবাহাদি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে আবার অন্য প্রকারের। ইহার মধ্যেও আবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে যাহা অপরিচিতের চক্ষে সহজে ধরা পড়ে না। আনুষঙ্গিক গীতযন্ত্রাদিও পৃথক্ পৃথক্ হয়। সারহুল ও করম পর্ব্ব উপলক্ষ্যে যে সকল গান গীত হয় নিম্নে তাহার কিছু বিবরণ দেওয়া হইল।

সারহুল নৃত্য ও গীত

চৈত্র বৈশাখ মাসে সারহুল-পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সমগ্র গ্রাম উৎসবানন্দে মুখরিত হইয়া উঠে। গ্রামের উপকণ্ঠে "সরনা" নামে এক নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকে। এই স্থানে শালবৃক্ষমূলে গ্রাম-পুরোহিত "বইগা", দেব-দেবী, ভূত-প্রেতের উদ্দেশে পূজা-অর্চনা করে; এবং গ্রামের "আখেরা" বা নাট্যভূমিতে যুবক-যুবতী নৃত্যগীতে মজিয়া থাকে। এক সারিতে যুবকবৃন্দ এবং তাহাদের দিকে মুখ করিয়া অন্য সারিতে যুবতীগণ নৃত্যবেশে সজ্জিত হইয়া দাঁড়ায়। দুই সারির মধ্যস্থলে অথবা এক প্রান্তে নাগেরা ও মাদলবাদক এবং খরতাল বাদকগণ স্থান গ্রহণ করে। কেহ কেহ পায়ে ঘুঙুরও বাঁধিয়া থাকে। তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে এক সারি অপর সারির নিকটে উপস্থিত হয় এবং পুনরায় পশ্চাতে হটিয়া যায়। যুবকেরা কেহ কেহ মাদলও সঙ্গে লয় এবং নৃত্যগীতের সঙ্গে মাদল বাদন করে।

সঙ্গীত নৃত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। বিনা গীতে নৃত্য আরম্ভও হয় না, চলিতেও পারে না। বইগাকে লক্ষ্য করিয়া নৃত্যরত যুবক-যুবতী গায়—

"বেশ বানাবে বইগা
চাটানামুপরে পানি পাঝরে।"

—হে বইগা। ভাল করিয়া পূজা কর—(দেব, ভূতদিগকে তুষ্ট কর—যাহাতে প্রচুর বৃষ্টি হয়) ও (সরনা ভূমির) প্রস্তরের উপর পর্য্যন্ত যেন জল ভরিয়া উঠে।

ছোটনাগপুরের আদিমবাসিগণের বিশ্বাস সারহুল পর্ব্ব অনুষ্ঠান করিলে সুবৃষ্টি হয় ও ভাল চাষ-আবাদ সম্ভব হয়। এই বিশ্বাস অন্য এক সঙ্গীতের মধ্যেও ফুটিয়া উঠিয়াছে।—

"বইগামে পূজে আপনা সিমান্তর
কাহুরে বড়েদা মানাদালগিয়ে।"

—বইগা নিজ স্থানে বসিয়া পূজা করিতেছে; হে বৃষ! তুমি তাহাতে নারাজ হও কেন?

বইগার পূজায় প্রভূত বৃষ্টিপাত অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া



নর্ত্তকীর বেশে অসুর রমণীগণ

যেন গৃহের ষাঁড় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কারণ সুবৃষ্টি হইলে জমি বেশ হল-কর্ষণোপযোগী হইবে এবং ষাঁড়ের তখন বিশ্রামের অবসর থাকিবে না!

ইহাদের আর এক বিশ্বাস—প্রতি বৎসর এই সাবুহুল-পর্ব্ব দিবসে ধরিত্রীর (পৃথিবীর) সহিত মহাদেবের বিবাহ হয়। তাই আখেরাতে গান ধরে—

"ধরতি বিয়াহালা বরিষ দিনে
বেটাওয়া বিয়াহালা বারো বছরে।"

—ধরিত্রীর প্রতি বৎসরই বিবাহ হয়, কিন্তু ছেলের বিবাহ হয় বার বৎসরে।



করম-নৃত্যে অসুর যুবক ও যুবতী

এই জাতীয় গানের সঙ্গে নানা প্রকার প্রেমের গানও চলে। যথা—

"তোহয়া সুরতি গে মাইয়া
হামারা সুরতি দিলা হেরাই গেল।"

—(হে সুন্দরি) তোমার রূপের কাছে আমার রূপ ও হৃদয় পরাজয় স্বীকার করিল।

"সাগরা রাত মাই রিজ করলে
জোত্তাল ক্ষেতেল মাই নিন্দে মারে।"

—সারারাত নাচ করেছ, (এখন) ক্ষেতে (কাজের বেলায়) ঘুমে মরিতেছ।

"তোর আন্‌জান্ মাই মোর বেজান
দেখাদিখি মাই ভাইলে বিহান্।"

—তোমার পরিচয় আমার অজ্ঞাত; প্রভাতে মাত্র দেখাদেখি হইল।

সারারাত্রি একসঙ্গে বিভোর হইয়া নৃত্য করিয়াছে—কিন্তু ভাল করিয়া বুঝে নাই কাহার সহিত ভাব বিনিময় হইয়াছে।

করম নৃত্য ও গীত

করম নৃত্য এই পাহাড়ী জাতির অত্যন্ত প্রিয়। এই সময় স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-যুবতী পরস্পর অবাধ মিলনের স্বাধীনতা ও সুযোগ পায়। এই উপলক্ষে যে সমস্ত গান



সাবুহুল নৃত্যরত অসুর যুবক ও যুবতীগণ

গীত হয় তাহাদের অধিকাংশই ভালবাসার গান। নৃত্যের সময় যুবক-যুবতী—এক যুবকের পার্শ্বে এক যুবতী তাহার পার্শ্বে পুনরায় এক যুবক এই ভাবে পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া একই সারিতে দণ্ডায়মান হয়। নাগেরা ও মাদল বাদককে আখেরার মধ্যস্থলে রাখিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করে। গানের সুরের মধ্যেও বেশ দরদ মাখান থাকে। সাধারণতঃ চাঁদনী রাতে সন্ধ্যার পর হইতেই করম গান হয়। দিবা ভাগে বিশেষতঃ আগন্তুকের উপস্থিতিতে গায়ক-গায়িকারা সঙ্কোচ বোধ করে।

প্রেমের গান,—

"ছাতিয়ামে রাখি দিল হায় রে
লোরি দেহুঁ লাল ভ উজি কেঁওরাকে ফুল।"

—সমস্ত হৃদয় মন দিয়া লাল কেঁওরা ফুল আহরণ করিয়া দিব।

কোন দয়িতাকে উদ্দেশ্য করিয়াই যেন প্রেম নিবেদনের চিহ্নস্বরূপ লাল কেওরাফুল প্রদান করিবার এই আকাঙ্ক্ষা।

"ওসোরামে ছোটে ঢেঁকি মাচ্‌লা মোর সখীরে
একোবাত্ কহে ঢেঁকি তরে মোর সখীরে।"



মাদল ও নাগেরা বাদকগণ


নর্ত্তকীর বেশে অসুর বালিকা

—বারান্দার ছোট ঢেঁকির উপরে সখী আমার বসিয়াছে। হে সখি! ঢেঁকি সম্বন্ধে একটি কথা তোমাকে বলি।

—যেন একমাত্র ঢেঁকিই তাহার বলিবার বিষয় !!

কোন রূপসীর কলসী লইয়া জল আনয়নের জন্য গমন কল্পনা করিয়া কোন রসিক গীত রচনা করিয়াছে—

"হাত্‌মে লেলই এই ও খেজুরকেরানেঠো
মুড়্‌মে লেলই ঘইলা চইল গেলই পানি।"

—হাতে লইয়াছে খেজুর পাতার বিড়া, মাথায় লইয়াছে কলসী—জল আনিতে চলিয়া গেল।

করম সঙ্গীতের মধ্যে আবার এমন গানও আছে যে গুলির ভিতর তাহাদের জীবনের গভীর দুঃখ, গভীর মর্ম্ম-বেদনা গুমরিয়া উঠিয়াছে।

কোন এক দরিদ্র অসুর নিষ্ঠুর উত্তমর্ণের হাত হইতে লাঞ্ছিতা ভগ্নীকে কি উপায়ে উদ্ধার করিবে তাহা ভাবিয়া গাহিতেছে—

"বিজাতো ফুল গেল বিজফুলিয়া রাজারে
দৌড়াহো বহিনে গোহাব।"

—বিজা ফুল ত প্রস্ফুটিত হইল (অর্থাৎ সন্ধ্যা হইয়া আসিল—কারণ সন্ধ্যার সময়ই বিজা ফুল ফুটে), ভগিনীকে বাঁচাইবার জন্য শীঘ্র গমন কর।

"কারে বেচিয়েকে বহিনী ছোড়াব
কারে বেচিয়ে লুগা দেব।"

—কি বিক্রয় করিয়া ভগিনীকে উদ্ধার করিব? কি বিক্রয় করিয়া বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিব?

"বড়দা বেচিয়েকে বহিনী ছোড়াব
খাণ্ডা বেচিয়ে লুগা দেব।"

—ষাঁড় বিক্রয় করিয়া ভগ্নীকে উদ্ধার করিব,—তরবারি বিক্রয় করিয়া কাপড় দিব।

কোন গ্রাম নষ্ট হওয়ায় গ্রামবাসী অসুর বেচারার আর্ত্তনাদ নিম্নোক্ত গানে চিরজীবী হইয়া রহিয়াছে,

"তব হায়রে দাইয়া উজারাল কেরাগাঁও বাসব কাহিয়া
না মোকে হার নাহি না মোকে বড়দ নাহি জোতব কোরব কাহিয়া,
হায়রে দাইয়া উজারাল কেরাগাঁও বাসব কাহিয়া।"

—হায়! কেরাগ্রাম উজাড় হইল বাস করি কোথায়? না আছে মোর হাল, না আছে মোর ষাঁড় চাষ আবাদ করি কিসে? হায়! কেরাগ্রাম উজাড় হইল বাস করি কোথায়?

কোন ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহারা তাহাদের দুঃখ-দৈন্য, অভাব অভিযোগ, বিরহ ভালবাসার কাহিনী গাঁথিয়া গীত রচনা করে। এমনও হয় প্রকৃত ঘটনা তাহাদের ভাব প্রকাশার্থ নিয়োজিত হইয়া বিকৃত আকার ধারণ করে। শ্রীরামচন্দ্রের মৃগয়া গমন কেন্দ্র করিয়া এমন গান রচিত হইয়াছে যাহার সহিত প্রকৃত ঘটনার সম্পর্ক নাই। তথাপি ইহার মধ্যে তাহাদের জীবনের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখের মর্ম্মস্পর্শী প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পাইয়াছে।

"রামাতো চলে আহিরা শিকাররে
লছমনা গোহনাতে যায়।

রাম বলে—

ফির ফিরো ভাইয়া লছমনা ভাইয়ারে
মর্‌ যাইবে ভুখে পিয়াস, মর্‌ যাইবে রোউদ ভুম্বুর।

লক্ষ্মণ বলে—

খাইয়েকে লেবোঁদাদা ছাতু সমাদুর
আউর পিয়েহেকে লেবু ঝুরা পানি।
তুঁহু দাদা যাইবে হরবা বহেরারে,
হামদাদা হরিণা বিড়রায়।
তুঁহুদাদা লেবে লবকি তুপাক্‌রে
হামদাদা লেবো ধনী তীর।

* * *


সারহুল নৃত্য—আর একটি দৃশ্য

লক্ষ্মণ বিলাপ করে—
হরিণাকা শব্দে তীরে মুই চালালুঁ
লাগি গেলো পিঠকা ভাই,
এগো লাগি গেলো সুন্দরা ভাই।

* * *

বিষাদগ্রস্ত লক্ষ্মণকে একা ফিরিতে দেখিয়া সীতা বলিতেছে—
কাঁহে দেবর ঢুলুমুলু কাঁহে দেবর ঢুলুমুলু
আউ দেবর কহুঁ দুখম্ সুখ।
আউ দেবর খাটি বসু আউ দেবর পিড়ায় বইসু
আউ দেবর কহুঁ থম্ সুখ।

লক্ষ্মণ বলে—
না হামি খাটি বসু না হামি পিড়া বইসু
না হামি কহুঁ দুখম্ সুখ।
হরিণাকা শব্দে তীরে মুই চালালুঁ
এগো লাগি গেলো পিঠকা ভাই,
এগো লাগি গেলো সুন্দরা ভাই।

লক্ষ্মণ সীতাকে সান্ত্বনা দিতেছে—
ঝিন্ ভউজি রোইবে ঝিন্ ভউজি কাঁদাবে
হামি পুরাইবে লুগা ভাত।
—বৌদিদি কাঁদিও না আমিই তোমার অন্নবস্ত্র যোগাইব।

শেষের কয়েক পদ এমন দরদ দিয়া গান করে যে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। বাস্তবিক শীতাগমের প্রারম্ভে আরামদায়ক আবহাওয়ায় বন্য অঞ্চলে চাঁদনী রাত্রে



সরনায় শালবৃক্ষমূলে বইগা কর্তৃক সারহুল পূজা

কিঞ্চিৎ দূর হইতে মাদলের আওয়াজ ও যুবক-যুবতীর সমবেত করুণ কণ্ঠধ্বনি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। এইরূপ আরণ্য পরিস্থিতি ব্যতীত ইহার প্রকৃত মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠা বোধ হয় কঠিন।

বিবাহাদি উপলক্ষে ভিন্ন প্রকারের নৃত্যগীত হয়। গানের অনেকগুলির মধ্যেই তাহাদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের বেদনা প্রকাশ পায়। বলাই বাহুল্য, ইহাদের বেশীর ভাগ গানই ভাঙা হিন্দিতে রচিত। নিজেদের অসুরী ভাষায় গান অল্পই আছে।

"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মনে পড়ে ১৯২৫ সালে আমাদের ছাত্রাবস্থায় কী এক কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একদিন শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে উল্লেখ করেন যে, বহু বৎসর পূর্বে তিনি বেদ ও উপনিষদের অনেকগুলি মন্ত্র বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু সেগুলি পরে তিনি আর খুঁজে পান নি। কবির মৃত্যুর মাসকয়েক পূর্বে একদিন সন্ধ্যায় আলাপ হচ্ছিল তাঁর কয়েকটি হারানো লেখা সম্বন্ধে। সেদিন নতুন খবর পেলাম যে একদা 'ধম্মপদ' পালিগ্রন্থের আগাগোড়া তিনি বাঙলায় অনুবাদ করেছিলেন। প্রশ্ন করলাম, সে-খাতার কোনো খোঁজই কি কোথাও নেই। কবি রঙ্গ করে বললেন, "অপহৃত হয়েছে বললে সত্যের অপলাপ হবে, সে-খাতা সম্ভবত অপহৃত হয়েছে।" কয়েকটি বৈদিক শ্লোকেরও যে তিনি অনুবাদ করেছিলেন এবং পরে খুঁজে পান নি, পুনরায় সে-কথা খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন। এই ধরণের আরও কী কী লেখা তাঁর জীবদ্দশায় অন্তর্ধান করেছে, কে বা কারা তা সঠিক স্মরণ রেখেছেন জানি না। যে-কয়টি সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতির সাহায্য পাওয়া তখনো সম্ভব ছিল, সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়-সম্বলিত একটি তালিকা করে তাঁকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য ছিল বলে বিশ্বাস করি।

নিছক কেরানীর কাজ ভেবেই হয়তো এই কর্তব্যে তখন অবহেলা দেখানো হয়েছে।

কবির মৃত্যুর কিছু দিন পরে (এপ্রিল, ১৯৪২) গীতাঞ্জলির পাঠ, তারিখ, রচনাস্থান ইত্যাদি মেলাবার জন্যে শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের কাছ থেকে 'গীতাঞ্জলি'র মূল পাণ্ডুলিপি দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের প্রীতি-নিদর্শন এই উপহারটি তিনি এত দিন সযত্নে রক্ষা করেছেন—এই সংরক্ষণের জন্যে রবীন্দ্রসাহিত্যসন্ধানী সকলেরই তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন।

খাতাখানি একটি খনিবিশেষ। গীতাঞ্জলির গান ছাড়াও বহু মূল্যবান তথ্যে সেটি পূর্ণ। খাতাটির ২৭ পৃষ্ঠায় পৌঁছে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে দেখলাম পর পর এগারোটি পৃষ্ঠা ধরে গোটাদশেক উপনিষদ ও বেদমন্ত্রের একটানা অনুবাদ। 'তুমি আমাদের পিতা' ("ওঁ পিতানোঽসি") এবং 'যদি ঝড়ের মেঘের মত আমি ধাই' ("যদেমি প্রস্ফুরন্নিব")' এই দুটিমাত্র অনুবাদ আমাদের পূর্বপরিচিত। "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"—সুবিখ্যাত এই বেদমন্ত্রটিরও অতি প্রাঞ্জল বাঙলা অনুবাদ কবি যে করেছেন সে খবর সেই প্রথম জানলাম। এই খাতাটিতে গীতাঞ্জলির গান ছাড়া আরো কোনো কোনো রচনার সঙ্গে এই অনুবাদগুলিও যে ছিল সে-কথা কবির স্মরণ ছিল না মনে হয়।

সম্প্রতি, গত মাঘোৎসবের পূর্বে শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী এক দিন বললেন—মন্দিরে ছেলেমেয়েরা 'কস্মৈ দেবায়' মন্ত্রটি গাইবে, রবিকাকার বাঙলা অনুবাদটি পেলে গানের পরে পাঠ করা যেত। খুঁজে দিতে পারো? আমি তো অবাক। উনি কী করে পাণ্ডুলিপির অনুবাদের খবর পেলেন। মুখে মুখে তিন লাইন যখন তিনি আবৃত্তি করলেন—'আত্মদা বলদা যিনি, সর্ববিশ্ব সকল দেবতা' ইত্যাদি—তখন আরো অবাক হলাম, এ যে সম্পূর্ণ নতুন অনুবাদ। কোথাও ছাপায় কবিতাটি দেখেছেন কি না তাও তিনি সঠিক বলতে পারলেন না। মনে তখন সন্দেহ হ'ল, হয়তো দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ বা আর কারো অনুবাদ।

এমন যোগাযোগ কদাচিৎ ঘটে;—সেই দিন বিকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে-খণ্ডটি প্রথমেই হাতে পাওয়া গেল তার সূচীপত্রের এক প্রান্তে চোখে পড়ল, 'পদ্যানুবাদ' (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)—পৃ. ২০৭; কৌতূহলী হয়ে পাতা উল্টে দেখি কবিতাটির প্রথম লাইন ক'টি ইন্দিরা দেবীর আবৃত্তি-করা সেই মন্ত্রানুবাদের সঙ্গে হুবহু মেলে। লেখাটি তাঁর হাতে সময়মত দিতে পেরে ভারি আনন্দ ও তৃপ্তি বোধ করলাম। মাঘোৎসবের বহুবিলম্বিত উপহার-স্বরূপ এই অনুবাদ দুটি 'প্রবাসী'র মারফৎ রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী-দের হাতে পৌঁছে দেবার আয়োজন করলাম। নিজেদের কথা হয়তো পাঁচকাহন হ'ল, তবু অপ্রত্যাশিত এই বিস্ময়ের পূর্ণধারাটুকু বর্ণনা না করেও পারলাম না।

এই সূত্রে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে 'কস্মৈ দেবায়' মূল মন্ত্রটির যে সুর প্রচলিত সেটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংযুক্ত: দ্রষ্টব্য 'শতগান', তৃতীয় সংস্করণ, শ্রীসরলা দেবী, পৃ. ২১৩-১৬।

•

[মূল বৈদিক মন্ত্র]

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥১
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইন্দ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥২
যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যে মাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৩
যেন দৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়্হা যেন স্বঃস্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসোবিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৪
যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধিসূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৫
মানোহিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যোবা দিবং সত্যধর্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৬

—ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল, ১২১ সূক্ত। প্রজাপতি দেবতা, হিরণ্যগর্ভ ঋষি।

মন্ত্রটির রবীন্দ্রনাথ কৃত দুটি অনুবাদ নিচে মুদ্রিত হ'ল। ১ নং অনুবাদটির সময়, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ; ২ নং অপ্রকাশিত অনুবাদটির সময় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে হওয়া সম্ভব। পাণ্ডুলিপিতে কোনো তারিখ নেই।

পদ্যানুবাদ

১ নং অনুবাদ

আত্মদা বলদা যিনি; সর্ব্ব বিশ্ব সকল দেবতা
বহিছে শাসন যাঁর; মৃত্যু ও অমৃত যাঁর ছায়া;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?
যিনি স্বীয় মহিমায় বিরাজেন একমাত্র রাজা
প্রাণবান্ জগতের, চতুষ্পদ দ্বিপদ প্রাণীর;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

এই হিমবন্ত গিরি, নদীসহ এই অম্বুনিধি
বিশাল মহিমা যাঁর ; এই সর্ব্ব দিক্ যাঁর বাহু
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?
যাঁর দ্বারা দীপ্ত এই দ্যুলোক, পৃথিবী দৃঢ়তর ;
যিনি স্থাপিলেন স্বর্গ, অন্তরীক্ষে রচিলেন মেঘ ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?
মহাশক্তি-প্রতিষ্ঠিত দীপ্যমান দ্যুলোক-ভূলোক
যাঁরে করে নিরীক্ষণ ; সূর্য্য যাঁহে লভিছে প্রকাশ ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?
যিনি সত্যধর্ম্মা, যিনি স্বর্গ পৃথিবীর জনয়িতা
আমাদের না করুন্ নাশ ! স্রষ্টা যিনি মহাসমুদ্রের ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩ কল্প ৩ ভাগ। ফাল্গুন, ১৮১৫ শক। পৃ. ২০৭

২ নং অনুবাদ

আপনারে দেন যিনি,
সদা যিনি দিতেছেন বল,
বিশ্ব যাঁর পূজা করে
পূজে যাঁরে দেবতা সকল—
অমৃত যাঁহার ছায়া
যাঁর ছায়া মহান্ মরণ—
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ।

যিনি মহা মহিমায়
জগতের একমাত্র পতি,
দেহবান্ প্রাণবান্
সকলের একমাত্র গতি,
যেথা যত জীব আছে
বহিতেছে তাঁহার শাসন
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ !

এই সব হিমবান
শৈলমালা মহিমা যাঁহার
মহিমা যাঁহার এই
নদী সাথে মহাপারাবার
দশদিক যাঁর বাহু
নিখিলেরে করিছে ধারণ
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ।

দ্যুলোক যাঁহাতে দীপ্ত
যাঁর বলে দৃঢ় ধরাতল
স্বর্গলোক সুরলোক
যাঁর মাঝে রয়েছে অটল—
শূন্য অন্তরীক্ষে যিনি
মেঘরাশি করেন সৃজন
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ।

দ্যুলোক ভূলোক এই
যাঁর তেজে স্তব্ধ জ্যোতির্ম্ময়
নিরন্তর যাঁর পানে
একমনে তাকাইয়া রয়
যাঁর মাঝে সূর্য্য উঠি
কিরণ করিছে বিকিরণ
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ !

সত্যধর্ম্মা দ্যুলোকের
পৃথিবীর যিনি জনয়িতা,
মোদের বিনাশ তিনি
না করুন না করুন পিতা !
যাঁর জলধারা সদা
আনন্দ করিছে বরিষণ
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ !

উদ্ধৃত কবিতাটি গীতাঞ্জলির খাতাটিতে প্রাপ্ত লেখার যথাযথ নকল।

পাণ্ডুলিপিতে অনুবাদটি যে স্থানে আছে তার আগে-পিছনের রচনা দেখে মনে হয় অনুবাদটির রচনাকাল অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩১৬ এবং রচনা-স্থান সম্ভবত শান্তিনিকেতন।

চিম্‌নি সিপাহী হইল

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

১

কৈশোরে একটা সময় আসে যখন মানব-শিশুর পদ-যুগল সকল বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া দ্রুত বাড়িয়া চলে। জুতা কিনিয়া দিলেই দুই মাসের মধ্যে তাহা আর পায়ে হয় না। ফলে বর্দ্ধনশীল পদযুগল জুতার সঙ্কীর্ণ বন্ধনের মধ্যে নিষ্পেষিত হইয়া জুতার মায়া ত্যাগ করিয়া নগ্ন অবস্থায় গৃহে, স্কুলে ও খেলার মাঠে ধাবমান হয়। এই সময়টা মানুষের বড় দুঃসময়। ক্রমাগত মা বাবার অন্যায় অভিযোগ ও শাসনে মানুষ বিধ্বস্ত হইয়া উঠে। "বাবা রে বাবা, এই সেদিন নূতন জুতো-জোড়া কিনে দেওয়া হ'ল; না প'রে প'রে শুকিয়ে ফেললে। পা দুখানাও দেখতে না দেখতে এক জোড়া সালতির মত হয়ে উঠেছে। কুলি-মজুরদের মত খালি পায়ে দৌড়ে বেড়ালে আর কি হবে বল? আর জুতো পাবে না, থাক গিয়ে খালি পায়ে।"

"পায়ে লাগে বলেই ত ও জুতো পরি না। ফোস্কা পড়ে একাকার হয়ে যায়।"

"জুতো পরা অভ্যেস করলে তবে ত ফোস্কা পড়া বন্ধ হবে? ধাঙড়ের মত খালি পায়ে বেড়াবে ত কি হবে! আসুন তোমার বাবা, নূতন জুতোর বদলে খুব ঘা-কয়েক পিঠে পড়লে শিখবে এখন কি ক'রে জুতো পরতে হয়। হতভাগা ছেলে, লজ্জা নেই!"

বড় বড় হাত পা, বয়সের আন্দাজে লম্বা-চওড়া, ফেলফেলে-চাহনি বালক সন্তোষ মায়ের এই অন্যায় শাসনে চুপ করিয়া রহিল। গত দুই বৎসর যাবৎ এই চলিতেছে। জুতার পরে জুতা কেনা হয় আর ছোট হইয়া যায়। দুই বৎসরের পুরান কোটটার আস্তিন কনুইয়ের কাছে উঠিয়াছে ও লম্বায় নাইয়ের নিকট আসিয়া আর নামে না। মাথার চুল কদম-ছাঁটে ছাঁটা এবং হাত-মুখ বিশেষ পরিষ্কার নহে। আট হাত ধুতিখানা কোন রকমে হাঁটুর নীচে আসিয়া ধূলা-মাখা পা দুখানাকে আরও যেন বড় করিয়া দেখাইতেছে।

"বলি, এই রকম বাঁদর সেজে যে স্কুলে যাও ত পোড়ারমুখো মাষ্টাররা কি কিছু বলে না? কি ঘেন্নার ঘেন্না!"

সন্তোষের চোখ দুইটি ছল ছল করিতে লাগিল। বার-দুই ঢোক গিলিয়া বলিল, "দশ হাত ধুতি দেবে না, মান্ধাতার আমলের গেঞ্জির মত আঁট কোট আর খালি পা; তা দেখে রোজ যদু মাষ্টার বকে।"

"বেশ করে বকে। যাও কেন ঐ রকম ক'রে? দিন-রাত প'রে কোটটাকে শেষ ক'রে এনেছ এরই মধ্যে! তোমার বয়েসের ছেলে আবার আট হাত কাপড় ছাড়া কি পরবে? তালগাছের মত লম্বা হচ্ছ ব'লে কি কোঁচান ধুতি আর গিলে-করা কুর্ত্তা পরিয়ে স্কুলে পাঠাতে হবে না কি?"

তালগাছের মত লম্বা, অজাতশ্মশ্রু, খোঁচা চুল ছেলেটি তাহার বড় বড় বেমানান হাত পা লইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। বয়স মাত্র বার বৎসর; কিন্তু দৈর্ঘ্যে বয়স্কদিগের সমান সমান। হাত পায়ের স্থূলত্বের তুলনায় বিস্তার অতিরিক্ত। খেলার সাথীরা নাম রাখিয়াছে "চিম্‌নি"। বাবা বলেন, "উৎপাত! আমাদের তিন কুলে এ রকম বিদঘুটে লম্বা ছেলে কেউ নেই। তিতুর বয়স ওর চেয়ে পাঁচ বৎসর বেশী কিন্তু ও তার চেয়ে আধ হাত মাথায় বড়। এখনি আমার সমান সমান, বয়স হ'লে না জানি কি হবে?"

ঝি বলিল, "ও খোকা, দুধটুক খেয়ে যাও।" সন্তোষ হাত-পা সামলাইয়া চৌকাঠে মাথা বাঁচাইয়া রান্নাঘরে গিয়া দুধের বাটিটা হাতে লইল। এক পোয়া বাটিটা তাহার হাতে খেলনার মত দেখাইতে লাগিল। ঝিকে বলিল, "এইটুকু দুধে কি হবে? বড় বাটিতে দিতে পার না?"

ঝি বলিল, "ওমা, ঐ ত তোমার বাটি খোকা, আমি কি বাটি বদলেছি না কি?"

সন্তোষ বলিল, "হ্যাঃ, আমার বাটি! আমার দু-চুমুকও হয় না।"

মা পাশের ঘর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অ ঝি, কি কথা-কাটাকাটি হচ্ছে?"

ঝি বলিল, "ওমা খোকা বলছে দুধের বাটি ছোট, ওর পেট ভরে না।"

মা উত্তর দিলেন, "ওর মাপের বাটি কোথায় পাব? ওকে আর এক হাতা দুধ দিয়ে দেও।" সন্তোষ ঝির উপর জোর করিয়া আর এক বাটি পুরা দুধ আদায় করিয়া খাইয়া খেলিতে চলিল।

মাঠে যাইতেই খেলার সঙ্গীরা চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে চিম্‌নি এসেছে, চিম্‌নি এসেছে।"

কয়েক জন গিয়া হাত তুলিয়া তাহার মাথা ছুঁইবার অছিলায় তাহাকে দু-চার চাঁটি মারিয়া বলিল, "দেখি দেখি, আজ লম্বায় কতটা বাড়লি?" সন্তোষ ওরফে চিম্‌নি নিঃশব্দে সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া গেল, কেন-না সে বেশ বুঝিয়া লইয়াছিল যে তাহার পক্ষে এতটা লম্বা হওয়া একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইয়াছে।

চোর-চোর খেলা হইতে লাগিল। সন্তোষ একবার চোর হইল। মোটা সুকুমার তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে মুখ ভেঙাইয়া দ্রুত পলাইবার চেষ্টা করিল। সন্তোষ এক লম্ফে তাহার লম্বা হাতখানা বাড়াইয়া সুকুমারকে খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিল। সুকুমার গাঁ গাঁ করিয়া চেঁচাইতে লাগিল, "চিম্‌নির হাত পাঁচ গজ লম্বা, এক এক বার পা ফেললে দশ গজ চলে যায়। ও কেন ও রকম ক'রে ধরবে?"

সন্তোষ বলিল, "বা রে! ঠিক ধরেছি ত। ও ফুটবলের মত মোটা গোল ব'লে পালাতে পারল না ত আমার দোষ হ'ল না কি?"

সুকুমার ভেঙচাইয়া বলিল, "আমি ফুটবল? তুই তালগাছের মত লম্বা, বাঁশের মত লম্বা লম্বা ঠ্যাং; ফের ফুটবল বলবি ত এক ঘুষি লাগাব!"

সন্তোষ বলিল, "লাগা ত দেখি ঘুষি?"

সুকুমার দৌড়িয়া সন্তোষকে ঘুষি মারিতে যাইতেই সন্তোষ হাত বাড়াইয়া তাহার মাথার চুল ধরিয়া ফেলিল। সুকুমার হাঁউমাঁউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া সন্তোষের হাতে কামড়াইয়া দিল। সন্তোষ তাহাকে এক লাথি কষাইয়া উল্টাইয়া ফেলিল।

অতঃপর কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ছেলেরা অচিরাৎ দুই দলে ভাগ হইয়া পরস্পরকে চড় কিল লাথি লাগাইতে লাগিল। গোলযোগ শুনিয়া পাড়ার বয়স্ক লোক দু-চার জন বাহির হইয়া আসিলেন। লম্বা বলিয়া সকলের চোখ সন্তোষের উপরই পড়িল। এক জন যাইয়া সন্তোষকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিলেন ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন, "এত বড় ছেলে হয়ে ছোট ছোট ছেলেদের মারপিট করছে, লজ্জা করে না? চল তোমার বাবার কাছে!"

বন্দী অবস্থায় সন্তোষ পিতার দরবারে আনীত হইল। প্রমাণ হইয়া গেল যে সে অতি অল্পবয়স্ক শিশুদের দলে ভিড়িয়া তাহাদের উপর জোর-জুলুম মারপিট করিতেছিল। পিতা গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "আজ থেকে আর তুমি মাঠে খেলতে যাবে না। বাড়ীতে বিকেল বেলা হাতের লেখা অভ্যেস করবে।" কাঁদ-কাঁদ হইয়া বেচারা সন্তোষ বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। রাত্রে পিতা সন্তোষের মাতাকে বলিলেন, "ছেলেটা গুণ্ডা হয়ে উঠছে। আজ প্রায় কয়েকটা ছেলেকে মেরে আধমরা ক'রে ফেলেছিল। ওর উপর একটু নজর রেখ।"

মা ঝাঁঝিয়া বলিলেন, "আমি তোমার ছেলে সামলাতে পারব না। পুলিস পাহারা বসাও। আর পাড়ার ছেলেগুলিও সব বড় শান্তশিষ্ট নয়! মেরে থাকে দু-চারটেকে ত বেশ করেছে!"

সকালে সন্তোষ স্কুলে যাইবার সময় মা বলিলেন, "লক্ষীছাড়া ছেলে স্কুল থেকে ফিরে এসে শোবার ঘরে বন্ধ থাকবে। মারামারি ক'রে বেড়াতে লজ্জা করে না?"

সারা বিকাল সেদিন সন্তোষ ঘরে বন্ধ রহিল। সন্ধ্যাবেলা খাইবার জন্য তাহাকে ডাকিতে গিয়া মা দেখিলেন সে জড়সড় হইয়া তক্তাপোষের উপর ঘুমাইয়া রহিয়াছে। তাহার প্রকাণ্ড দেহটার উপর মুখখানা একান্ত কচি ছেলের মত অসহায়। মায়ের প্রাণে পুরান স্মৃতি জাগিয়া উঠাতে তিনি সন্তোষের মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে অনেক আদর করিয়া জাগাইলেন। বলিলেন, "সোনামাণিক, আর কখন ঐ সব পাজি ছেলেগুলোর সঙ্গে যেও না খেলতে।" সন্তোষ মায়ের আদরে হঠাৎ চীৎকার করিয়া ক্রন্দন সুরু করিল। বলিল, "আমি ওদের মারি নি। ওরাই আমায় মারছিল। রোজ মারে।"

২

চার-পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সন্তোষ বর্ত্তমানে ছয় ফুটের অধিক লম্বা লইয়াছে। এই কয় বৎসর তাহার জুতা, জামা ও কাপড় লইয়া তাহার পিতামাতা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আট হাত ধুতিগুলা হাঁটু ছাড়াইয়া উঠিবার পর তাঁহারা বাধ্য হইয়া তাহাকে দশ হাত কাপড় কিনিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু বৎসর ঘুরিতে-না-ঘুরিতে তাহার দশ হাতেও কুলাইত না। বাংলা দেশের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী তাহার পিতার পুরান ওভার-কোট, কোট প্রভৃতি সন্তোষের ভাগে আসিয়া পড়িল; কিন্তু পিতার অপেক্ষা সে আকারে অনেকটা বড়, তাই বিরক্ত

হইলেও পিতামাতাকে মানিয়া লইতে হইল যে তাহার গায়ে ও-সব জামা কাপড় হইবে না। অগত্যা তাহাকে চাঁদনির বাজারে লইয়া গিয়া তাহার মাপের কোট জামা করাইয়া দেওয়া হইল। সন্তোষ মহা আনন্দে নূতন জামা কাপড় পরিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। জুতা, সাত হইতে আট, আট হইতে নয় করিয়া ক্রমশঃ সাইজে এগারতে পৌঁছাইল। বাবা বলিলেন, "এর জন্য এর পর একটা পুরা মহিষ লাগবে জুতো করাতে।"

মা বলিলেন, "আজকাল যে ক্যানবিশের জুতো বেরিয়েছে তাই কিনে দাও।"

সন্তোষ ইহার পর চামড়ার জুতা ত্যাগ করিয়া কাপড়ের জুতা পরা আরম্ভ করিল। আহারে তাহার কিছুতেই পেট ভরে না। দুধ খাওয়া দূরে থাকুক ভাত ডাল মাছ সে যতটা খাইতে চায় তাহা তাহাকে কেহ দেয় না। দুই থালা ভাত খাইয়া আরও চাহিলে মা বলেন, "আর খেলে অসুখ করবে যে। তোর খিদে নয় ত লোভ। যা খাস তাই ত গায়ে লাগে না। হাড়-বের-করা চেহারা, অত জোর ক'রে গিলিস নে।"

সন্তোষ বলে, "হ্যাঁঃ, খেতে দেবে না আর বলবে হাড়-বের করা! যাও, আর চাই না তোমার ছাইয়ের ভাত!" বলিয়া রাগিয়া উঠিয়া চলিয়া যায়।

শিমলা হইতে সেবার তাহার মামা আসিয়া তাহাকে দেখিয়া "হোঃ হোঃ" করিয়া হাসিয়াই আকুল। বলিলেন, "আরে বাস্ রে এ কি কাণ্ড হয়েছে? একে কি টেনে টেনে লম্বা করা হয়েছে না কি? কি সর্ব্বনাশ! এর যে কান মলতে হলেও মই লাগিয়ে উঠতে হবে।"

সন্তোষ অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বারে বারে ঢোক গিলিয়া, পা বদলাইয়া ও কান চুলকাইয়া সে নিজের অসোয়াস্তি এড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সকলে খাইতে বসিলে মামা শীঘ্রই বুঝিলেন যে সন্তোষ ইচ্ছামত খাইতে পাইতেছে না। তিনি ভগ্নীকে বলিলেন, "ওকে এক দিন হোটেলে নিয়ে খাইয়ে দেখতে হবে কত খেতে পারে।"

সন্তোষের মাতা বলিলেন, "হ্যাঁ, তবেই হয়েছে; ও তাহলে লোভ ক'রে খেয়ে অসুখ ক'রে বসবে এখন। বাড়ীতে যা খায় তাতে এমনি তিন জন লোকের পেট ভরে যায়। ওকে ডাক্তার দেখাব ভাবছি। পেটে পিলে-টিলে হ'ল, না কি? এত খায় অথচ শুধু কখানা হাড়।"

মামা কিন্তু সন্তোষের হাড় কয়খানার দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেখিয়া ভাবিলেন, উহার শুধু হাড়গুলিরই খোরাক কম হইবে না। ফুটবল খেলার মাঠে লইয়া গিয়া খেলাশেষে মামা সন্তোষকে বলিলেন, "চল্ হোটেলে, দেখি তুই কত খেতে পারিস।" সন্তোষ বলিল, "মা বকবেন না ত? আমি ত কখনও হোটেলে খাই নি।"

মামা বলিলেন, "চল্, চল্, আমার সঙ্গে যাবি ত মা কিছু বলবেন না।"

উভয়ে পদব্রজে ময়দান পার হইয়া চৌরঙ্গীর উপরে একটি দেশী-বিলাতি-মেশান হোটেলে প্রবেশ করিলেন। সন্তোষ প্রকাণ্ড ঘর, আলো, পাখা ও উর্দ্দী-পরিহিত খানসামার ভীড় দেখিয়া হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। মামা বলিলেন "কি খাবি? বয়, ইধার আও।" বয় আসিয়া দাঁড়াইতে মামা বলিলেন, "টোষ্ট রুটি, মাখ্খন, অমলেট লেয়াও পহিলে। পিছে মাটন কাটলেট আউর ফাউল কারি পোলাও লেয়াগা।"

বয় চলিয়া গেল ও কিছুক্ষণ পরে হুকুমমত ভর্জ্জিত ডিম্ব প্রভৃতি লইয়া আসিল। সন্তোষ নিজের বড় বড় হাত দুখানা নাড়াচাড়া করিয়া বসিয়া রহিল। মামা বলিলেন, "খা!" সন্তোষ বলিল, "হাত ধোয়া হয় নি যে!" "ঐ কাঁটা আর ছুরি এই রকম করে ধরে খা।"

সন্তোষ ছুরি কাঁটা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া সুবিধা করিতে পারিল না। মামা বলিলেন, "থাক, হাত দিয়ে খাও।"

অতঃপর যাহা ঘটিল তাহার সম্পূর্ণ বর্ণনা সম্ভব নহে। দুই জন বয় ক্রমাগত দোড়াদৌড়ি করিয়া টোষ্ট, মাখন, ডিমভাজা, কাটলেট আনিতে লাগিল এবং সন্তোষ সদ্য নিদ্রা হইতে উত্থিত কুম্ভকর্ণের ন্যায় সেই সকল মালমশলা উদরসাৎ করিতে লাগিল। মামা স্তব্ধবিস্ময়ে তন্ময় হইয়া সেই অপূর্ব্ব ভোজনলীলা দেখিতে লাগিলেন। কয়েক দফা ডিম রুটি কাটলেট ধ্বংস হইলে পর মামা বয়দিগকে ইসারা করিয়া পোলাও কারি আনিতে আদেশ করিলেন। সন্তোষ অবাধে দুই তিন প্লেট পোলাও কারি খাইয়া হাসিমুখে মামাকে বলিল, "বেশ খেতে!"

মামা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর খাবি?"

"হ্যাঁ আর এক থালা খেতে পারি।"

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মামা সন্তোষের মাকে বলিলেন, "সন্তোষ আর আমি আজ রাত্রে আর খাব না, আমরা হোটেলে খেয়ে এসেছি।"

ভগ্নী বলিলেন, "কি ছাই খেয়েছ? দুখানা লুচি পাঁঠার

ঝোল দিয়ে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড় গিয়ে। খোকা কি এত খেয়েছে যে আর খাবে না?"

মামা বলিলেন, "আঠারটা টোষ্ট, দশটা ডিমের অমলেট, আটখানা কাটলেট, চার প্লেট পোলাও আর কারি।"

মা গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, "ওমা কি হবে গো! ওর অসুখ করবে না ত? ছোড়দা, কেন দিলে ওকে অত খেতে?"

মামা বলিলেন, "আঃ থাম না, ওর কিছু হবে না, শক্ত-হাড় জোয়ান ছোকরা, কি এমন খেয়েছে। ওকে রোজ দুটো ক'রে ডিম দিও ত, দেখবে কেমন চেহারা হবে।"

বলা বাহুল্য সন্তোষের এই অতি-ভোজনের ফলে কোন প্রকার অসুখ করিল না। মামা থাকিতে থাকিতে আর দুই একবার তাহার কপালে ঐ প্রকার ভোজ জুটিয়া গেল। বাড়ীতেও মামার সুপারিশে তাহার জন্য প্রত্যহ দুটা ডিমের ব্যবস্থা হইল। মোটা মোটা হাড়ের উপর ঈষৎ স্থূলত্বের আভাস দেখা দিল।

ক্লাসের ছেলেরা তাহাকে চিম্‌নি বলিয়াই ডাকিত। তাহার যে একটা ভাল নাম আছে তাহা প্রায় সকলে ভুলিয়াই গিয়াছিল। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শক্তি-সামর্থ্যও খুব বাড়িয়াছিল, কিন্তু সে নিজে সে কথা জানিত না। বহু অত্যাচার করিলেও সে "আঃ কেন জ্বালাতন কর" কিংবা ঐ প্রকার কোন কথা বলিয়া চলিয়া যাইত। ছেলেদের তাহাকে লেঙ্গী দিয়া ফেলিয়া দেওয়া, পিঠে খড়ি দিয়া "চিম্‌নি" লিখিয়া দেওয়া অথবা অপর কোন উপায়ে তাহাকে নাকাল করা একটা নিত্য কর্ম্মের মতন দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। সন্তোষ বহু কষ্টে নিজের দীর্ঘ অবয়ব সামলাইয়া এই বহুমুখী অত্যাচারের মধ্যে ছাত্রজীবনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। অল্প বয়সে যে-সকল খেলায় সে সময় অতিবাহিত করিত, বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে-সকল খেলার সে বাহিরে চলিয়া আসিল। চোর-চোর, চোর-পুলিস, কুমীর-কুমীর প্রভৃতি খেলা আর চলিত না। হাডুডু খেলা তাহার সহিত কেহ খেলিতে চাহিত না। সকলে বলিত, "চিম্‌নি এত লম্বা, ও এক পা না এগিয়ে সকলকে ছুঁয়ে দেয়; আর ধরে ফেললে এমন হাত-পা ছোঁড়ে যে সকলে জখম হয়ে যায়।" অথচ তাহার ক্ষিপ্রতা এতটা ছিল না যাহাতে সে অপেক্ষাকৃত বড় বড় নামজাদা দলে গিয়া খেলিতে পারে। ফুটবলের ধাক্কাধাক্কিতে সে হাত-পা সামলাইতে না পারিয়া ক্রমাগত পড়িয়া যাইত, নয়ত কাহাকেও অযথা ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া 'রেফরী' কর্তৃক ভৎ‌র্সিত হইত। অগত্যা তাহার লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া রাস্তায় ময়দানে ঘুরিয়া বেড়ান ছাড়া অপর কোন গতি ছিল না। কোন দিন কোন বড় খেলা থাকিলে সে বহু লোকের পিছনে দাঁড়াইয়াও বিনা-পয়সায় 'ম্যাচ' দেখিয়া গৃহে ফিরিত। তাহার পিছনের লোকেরা প্রায়ই চীৎকার করিয়া বলিত, "ও মশায়, মাথাটা পকেটে রাখুন না!" সন্তোষ লজ্জিত হইয়া সরিয়া আরও পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইত।

এক দিন তাহার স্কুলের এক জন ছাত্র খেলার মাঠে তাহাকে 'চিম্‌নি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহার ডাক-নামটা বাজারে রাষ্ট্র করিয়া দিল। কিছু দিন যাইতে-না-যাইতে সকলে সর্ব্বত্র তাহাকে 'চিম্‌নি' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। সে দুই-এক বার "আমার নাম সন্তোষ" বলিয়া আপত্তি জানাইতে গিয়া সফলকাম না হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল।

এক দিন একটি সুসজ্জিত যুবক তাহার পাশে দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ খেলা দেখিবার পরে তাহাকে বলিল, "ও মশায় চিম্‌নি, একটু ধোঁয়া ছাড়ুন না?"

সন্তোষ বলিল, "সে কি, ধোঁয়া কি ক'রে ছাড়ব?"

যুবক হাসিয়া একটা সিগারেট বাহির করিয়া বলিল, "এই যে এইটে ধরিয়ে ফেলুন; ধোঁয়া ছাড়তে থাকুন!"

সন্তোষ সভয়ে বলিল, "আরে না, আমি ও সব খাই না।"

"খান না, কি হবে? খেয়ে দেখুন না।"

"না না, বাড়ীতে জানতে পারলে ভীষণ কাণ্ড হবে।"

আশে-পাশের লোকেরা জোরে হাসিয়া উঠিল। "খোকা সিগারেট খেয়েছে জানলে, মা পাখা পেটা করবেন, হাঃ হাঃ হাঃ! ও মশায় চিম্‌নি; ধরিয়ে ফেলুন, ধরিয়ে ফেলুন।"

সকলের টিটকারী হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সন্তোষ দু-চার বার চেষ্টা করিয়া সিগারেটটা ধরাইয়া ফেলিল। একটা জোরে টান দিতেই প্রচণ্ড কাশির ধাক্কায় তাহার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া চারি দিক ঝাপসা হইয়া গেল। সে বহুকষ্টে কাশি থামাইয়া আরও দু-চার টান দিয়া সিগারেটটা ফেলিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করিল। সে দূরে একটা নালার পাশে গিয়া বসিল। কেহ জল আনে, কেহ বা সিগারেট-দাতাকে গালি দেয়। এই ভাবে প্রায় ঘণ্টা-দুই পরে সন্তোষ

কতকটা সুস্থ হইলে পর বাড়ী ফিরিয়া গেল। মা তাহার মুখে সিগারেটের গন্ধ পাইয়া অশেষ লাঞ্ছনা করিলেন। পিতা শাসাইলেন যে সিগারেট ফুঁকিয়া বেড়াইতে হইলে এ বাড়ীতে বাস করিয়া সে প্রকার বখাটেপনা চলিবে না। সন্তোষ লজ্জায় ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া না খাইয়া বারান্দার এককোণে একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। ঘুম আসিবার পূর্ব্বে শুনিল পিতা বিরক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, "যেমন চাষাড়ে চেহারা, স্বভাবও তেমনি চাষার মত হচ্ছে!"

৩

সন্তোষের বয়স আঠার হইল। এখন সে লম্বায় পাকা ছয় ফুট চার ইঞ্চি। ছাতি ও হাত-পা দেখিলে মনে হয় কোন দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলের দলপতি। বৃক্ষকাণ্ডের মত গ্রীবাদেশ অতিক্রম করিয়া উপরে দেখিলে চোখে পড়ে ফেলফেলে এক জোড়া ঘনকৃষ্ণ চোখ, শিশুর মত নিটোল মুখশ্রী ও ঈষৎ শ্মশ্রুগুম্ফের রেখা। ম্যাট্রিক পাস করিয়া আজ প্রায় দুই বৎসর কলেজে প্রবেশ করিয়াছে। কলেজের পড়ুয়া দু-এক জন বাল্যবন্ধু বলে, "চিম্‌নি, বাবা, এবারে একটু কমতে সুরু কর! নইলে কোথাও চাকরি জুটবে না। তোর জন্যে কি লোকে আপিসের 'স্পেশাল' দরজা ফোটাবে, না বড় ক'রে চেয়ার টেবিল অর্ডার দেবে?"

কেহ প্রশংসার সুরে বলে, "বেটা কাবুলিগুলোকেও চিম্‌নির পাশে বেঁটে দেখায়! তোর ভাবনা কি, একটা ঢিলে পাজামা, ওয়েষ্ট-কোট আর পাগড়ি করিয়ে নিয়ে লাঠি-হাতে "লুফ্‌কি" "লুফ্‌ফি" ক'রে সুদ আদায় ক'রে বেড়াবি।"

সন্তোষ লজ্জিত হইয়া বলিত, "আঃ, কেন জ্বালাতন করিস!"

বড় হইয়াছে বলিয়া আজকাল তাহাকে সংসারের নানান্ প্রকার ফুট-ফরমাস খাটিতে হয়। ইহাতে তাহার আত্মমর্য্যাদা কিছু বাড়িলেও ইহার একটা মুশকিলের দিকও ছিল। প্রায়ই শুনিতে হইত, এত বড় ধাড়ি ছেলে অথচ যদি কোন বুদ্ধিসুদ্ধি থাকে। বলি ফিরতি পয়সাগুলোও গুনে নিতে শেখ নি কি? হাঁ ক'রে কি দেখছিলি বল ত, পোড়ারমুখো দোকানদার অমনি দু'টা পয়সা কম দিয়ে দিলে? আর কোন দিনও তুই শিখবি না যে জিনিস-পত্তরের সরেস নিরেস কাকে বলে!"

বন্ধুরা তাহাকে দোকানপাড়ায় দেখিলেই বলিত, "আরে চিম্‌নি কোথায় চলেছিস? কি কিনবি? চল্ চল্, দেখিয়ে দি; শেষকালে ময়রার দোকানে গিয়ে জুতো চেয়ে বসবি; নয়ত চীনের দোকানে রসগোল্লা।"

সন্তোষ বলিত, "আহা, আমি আর জানি না যে কোথায় জুতো বিক্রি হয়! এক জোড়া মিলের শাড়ী কিনতে হবে।" বন্ধুরা তাহাকে "চল্ চল্" বলিয়া কোন এক মণিহারী কিংবা স্টীল ট্রাঙ্কের দোকানে ঢুকাইয়া দিত। বড় বড় হাত-পাগুলা যেমন তাহাকে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া পারিপার্শ্বিকের সহিত সংঘর্ষণ বাঁচাইয়া চলিতে অক্ষম করিয়াছিল, তাহার মনের ধারাও সেইরূপ পাতায় পাতায় শিরায় শিরায় চলিত না। ভাব ও আবেগের মোটা মোটা শাখা প্রশাখা মাত্র তাহার অনুভূতির ক্ষেত্রে দেখা দিত। শ্লেষ, বিদ্রূপ ও অবমাননার তীক্ষ্ণ বাণগুলি তাহার মনের উপর দাগ বসাইতে পারিত না। এই কারণে তাহার মনের শান্তি অটুট থাকিত।

* * *

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগমনে এমন সময় দেশব্যাপী একটা চাঞ্চল্যের ঝড় বহিতে আরম্ভ করিল। কেহ অকারণ ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া শহর ছাড়িয়া সুদূর গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিতে ছুটিল; কাহারও কাজ-কারবার বন্ধ হইয়া গেল; কেহবা সুবিধা পাইয়া ন্যায্যের অতিরিক্ত লাভে ফাঁপিয়া উঠিল। ছাত্রমহলে কেহ বলিল ইহার জয় হইলে ভাল, কেহ বলিল উহার হইলে অধিকতর মঙ্গল। নূতন নূতন কথা ভাষার বাজারে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। মামুলি লোকেও 'ব্লিৎসক্রীগ', 'ডাইভ বোম্বার,' 'পান্‌সার ডিভিসন,' 'মেসেরস্মিট,' 'ফিফ্‌থ কলাম' প্রভৃতি আওড়াইয়া দুনিয়ার সহিত পায়ে পা মিলাইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। অনেকে বলিল, যুদ্ধে কোন রকম সাহায্য করা উচিত নয়, আবার প্রতিপক্ষ বলিল জার্ম্মানী জিতিলে ভারতের সমূহ বিপদ, সুতরাং সাহায্য করাটাই বুদ্ধির কাজ। বহু লোকের মত হইল যে কোন লাভ হইলে কাজে লাগিয়া যাওয়া দরকার, বড় কথার আলোচনা গরীবের শোভা পায় না।

ছেলেদের মধ্যে অনেকে সৈন্যদলে যোগদান করিল। সন্তোষ আসিয়া মাকে বলিল, "মা, সকলে বলছে পল্টনে যেতে, যাব? মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ও মা কি সর্ব্বনাশ, পল্টনে যাবি কেন? ঘরে কি খেতে পাস না? খবরদার ও-কথা মুখে আনবি না! ঐ গুর্খা-মুর্খা খোট্টারা পল্টনে যায় যাক; তুই ভদ্রলোকের ছেলে পাইক বরকন্দাজের কাজ করবি?"

সন্তোষ বুঝিল পল্টনে যাওয়াটা যতটা নির্দ্দোষ আমোদ বলিয়া সে মনে করিয়াছিল, তাহা নহে; ইহার মধ্যে অনেক মান-সম্ভ্রমের কথা উঠে।

পল্টনের কথাটা এইখানেই শেষ হইত, কিন্তু সন্তোষের মাতা গ্রহণ উপলক্ষে গভীর রাত্রে গঙ্গাস্নানান্তে সিক্ত বস্ত্রে ময়দানের হাওয়ায় ঘণ্টাধিক চলাফেরা করিয়া নিদারুণ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইলেন ও কয়েক দিন ভুগিয়া স্বর্গলাভ করিলেন। সন্তোষের পিতা ওকালতি করিতে করিতে কখনও ধারণা করিতে পারেন নাই যে এত বড় একটা বিষয়ের এরূপ সহসা একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইতে পারে। তিনি এই নির্ম্মম আঘাতে পাগলের মত হইয়া উঠিলেন এবং চতুর্দ্দিকে খুঁজিয়া কোন প্রতিকারের পথ না পাইয়া হঠাৎ তীর্থ করিতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বাড়ীতে যে-সকল আত্মীয় আসিয়া জুটিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেই দুই-এক জন কর্ত্তার প্রত্যাগমন অপেক্ষায় সন্তোষদের বাড়ীতে থাকিয়া গেলেন ও বাড়ীঘর ছেলেমেয়েদের তত্ত্বাবধান করিতে থাকিলেন। সন্তোষের অন্তরের বেদনা জমাট পাথরের মত তাহার সরল হৃদয়ের উপর চাপিয়া বসিল। এত দিন ধরিয়া সে ইহাই জানিত যে এই সহানুভূতিহীন পৃথিবীতে তাহার ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি দেহটার একমাত্র সত্যকার আশ্রয়স্থল হইল ঐ ক্ষুদ্রাকৃতি নারীর কোলে। তাহার মায়ের দেহটা যখন সকলে নির্দ্দয়ভাবে তুলিয়া লইয়া গিয়া নিমতলার ঘাটে অগ্নিসাৎ করিল, তাহার মনের উপর একাধারে অসীম বেদনা ও হতাশার ঝড় বহিয়া গেল। এই অর্থহীন অত্যাচারে তাহার প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া প্রতিহিংসার জন্য অসহায় আক্রোশে গর্জ্জাইতে লাগিল; কিন্তু সে অন্তরে অন্তরে জানিল যে ইহার প্রতিবিধান করা তাহার সাধ্যের বাহিরে।

মায়ের মৃত্যুর পরে সে প্রতি দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই নিমতলার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইত। মূক পশু যে-বেদনার টানে নিজ প্রভুর কবরের আশেপাশে ঘুরিয়া মরে, সে প্রকারই একটা নির্ব্বাক্ শোকের তাড়নায় সন্তোষ তাহার মায়ের শেষ আশ্রয়স্থলটাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিত না। যে-সৃষ্টি তাহার মাকেই কেন্দ্র করিয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত ছিল, সে ত পূর্ণরূপেই জীবন্ত জাগ্রত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে চাঁদ-তারা, ফুল-পাতা, পশু-পক্ষী, তাহার মায়ের সাহায্যেই জীবনের আসরে নামিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহারা সব পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে, অথচ মা নাই; বিশ্বনাট্যের এরূপ রীতি-বহির্ভূত অভিনয় তাহার নিকট নিতান্তই বেসুরো ছন্দহীন বলিয়া মনে হইত। কোন একটা মারাত্মক রকমের ভুল কোথাও হইয়াছে, নিঃসন্দেহ। গঙ্গার ঢেউগুলির দিকে চাহিয়া সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিত।

সন্তোষ কলেজে যাওয়া আরম্ভ করিল। শুনিল, বন্ধুদের মধ্যে নীরেন বৈমানিক দলে যোগদান করিয়াছে। সত্যেন, অজয় ও আরও চার পাঁচ জন গোলন্দাজ পল্টনে গিয়াছে। ইহা ব্যতীত অনেক ছেলে পদাতিক সৈন্য হিসাবে নাম লিখাইয়াছে। দুই এক জন সৈনিকের পোষাকে কলেজে ঘুরিয়া যাইত। সন্তোষকে বলিত, "আরে চিম্নি, কি ছাই নামতা মুখস্থ করছ, আমাদের সঙ্গে চলে এস। খুব মজা।"

সন্তোষ বলিত, "না ভাই, ও সব গুর্খা-মুর্খাদের কাজ; আমি কি ক'রে পারব?"

"আমরা সবাই গুর্খা, কেমন? তোর মতন চেহারা নিয়ে বলতে লজ্জা করে না? যত রকম খেলা খেলেছিস, এর চেয়ে বড় খেলা আর নেই, বুঝলি? মরণ-বাঁচন নিয়ে খেলা। বন্দুক, সঙ্গীন, মেশিন গান, আরমর্ডকার; কত কিছু! যাকে বলে টাকায় ষোল আনা জীবন্ত হয়ে ওঠা। আসবি?"

সন্তোষ বলিত, "না ভাই, কি হবে গিয়ে?"

"হবে আবার কি? যুদ্ধ করতে শিখবি। পরে লড়াইয়ে যাবি। দু-দশটাকে মারবি, হয়ত বা মরবি। কিন্তু খুব জোর তামাশা।"

সন্তোষ বলিত, "আমার ত কারু সঙ্গে ঝগড়াই নেই ত কাকে মারব?"

"ঝগড়া নেই ত কি হয়েছে; ঝগড়া করলেই ঝগড়া জমে উঠবে। তা ছাড়া যোদ্ধালোক ঝগড়ার জন্যে যুদ্ধ করে না, যুদ্ধের জন্যে যুদ্ধ করে। রাজপুতদের ইতিহাস প'ড়ে দেখ্ না; বীর পুরুষের ধর্ম্মই হচ্ছে যুদ্ধ করা আর যুদ্ধে মরা।"

"আমি ত ভাই রাজপুত নই। অত কষ্ট ক'রে যুদ্ধ ক'রে মরার কি দরকার। যুদ্ধ না করলেও ত মরা যায়।"

"দূর বোকা! মরাটাই কি আসল কথা হ'ল নাকি? যুদ্ধ করাটাই আসল কথা। যথার্থ মানুষ হতে হ'লে যুদ্ধ করা একান্ত দরকার। আর মরা-বাঁচা একই কথা। মৃত্যুকে কাছের থেকে ঘনিষ্ঠভাবে অষ্টপ্রহর দেখতে দেখতে তার সম্বন্ধে ভয় আর থাকে না। মৃত্যু বাজে লোকের শত্রু আর যোদ্ধালোকের পরম বন্ধু।"

মৃত্যু সম্বন্ধে সন্তোষের যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাতে

সে যে তার পরম শত্রু এ বিষয়ে তার মনে সন্দেহ মাত্র ছিল না। সেই ক্রুর নির্ম্মম অত্যাচারীর সহিত যে আবার সখ্য হইতে পারে, তাহা সন্তোষের ধারণার অতীত। পণ্টনী বন্ধুদের কথা সে তন্ময় হইয়া শুনিত; শুধু মৃত্যু সম্বন্ধে অতটা দরাজ ভাব তাহার মনোমত হইত না। সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, মরে গেলে কি আগে যারা মরেছে তাদের সঙ্গে আবার দেখা হয়?"

"আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্বর্গে হোক নরকে হোক যেখানেই যাবি দেখবি লোকে লোকারণ্য—মানে, ভূতে ভূতারণ্য আর কি! এদিকে ঔরঙ্গজেব নমাজ পড়ছে, ওদিকে রাণাপ্রতাপ সন্ধ্যা-আহ্নিকে লেগে গেছেন, ক্লাইভের সঙ্গে সিরাজদ্দৌলার মহা ঝগড়া চলছে, নেপোলিয়ান আর ওয়েলিংটন সারা দিনরাত দাবা খেলে; কত বলব?"

"কি ক'রে জানলে? তোমরা ত আর মর নি।"

"মরতে হবে কেন? আমরা সব যমরাজার হবু-প্রজা, এসব কথা কি আর আমরা জানি না।"

সন্তোষ এই সকল কথাবার্ত্তার পরে কয়েক দিন খুব চিন্তান্বিত ভাবে ঘুরিতে লাগিল। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে "হুঁ হাঁ" ছাড়া বড়-একটা কিছু বলে না। তার পর হঠাৎ এক দিন রিক্রুটিং আপিসে গিয়া বলিল, "আমি পণ্টনে যেতে চাই।"

কেরানীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কি পণ্টন?"

"এই যারা বেশী মরে-টরে এই রকম।"

সকলে তাহার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু তাহার সরল সহজ উত্তরে শেষ অবধি স্থির করিল যে লোকটা পাগল নহে, তবে নির্ব্বোধ।

(আগামী সংখ্যায় "চিম্‌নির সিপাহী-জীবন")

মনের ছায়া

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তুমি কি এসেছ ফিরে?—
তোমার আঁধার ঘরে কেন দীপ জ্ব'লে ওঠে ধীরে ধীরে?
রুদ্ধ দুয়ার খুলেছে তবে কি? বাতায়ন দেখি খোলা,
নীল পর্দ্দায় হাল্‌কা হাওয়ায় আল্‌গোছে লাগে দোলা।
বুকে এসে লাগে পরশ তাহার আনমনে চেয়ে দেখি
বিরহী প্রাণের কি যে যন্ত্রণা তুমি তাহা বুঝিবে কি?
বহু দিন পরে ঘরের লক্ষ্মী ফিরিলে আপন ঘরে,
দীপাধারে তাই রঙীন আলোর ফুল ফোটে থরে থরে।
যদি এসে থাক হয়ত এখন আগোছাল সংসার
ধুইয়া মুছিয়া তুলিতেছ তুমি,—খুঁজিতেছ বারেবার
মনোমুকুরের ছায়াটি তোমার কোথায় পড়েছে ঢাকা,
বাতায়নতলে নামটি যাহার আলপনা দিয়ে আঁকা।
পরশ-রভসে একদিন যারে নিয়েছিলে বুকে তুলে,
অধরের 'পরে অধর রাখিয়া ঢেকে দিলে এলোচুলে,
চাঁদ ঢেকে গেল মেঘের মায়ায় ধারাবরিষণ-শেষে
মেঘ-ভাঙা রোদে চমক ভাঙিল—চলে গেল দূর দেশে।
হয়ত সেকথা মনে পড়িতেছে,—নয়ত গিয়েছে 'ভুলি',
ভিজে বাতাসের আমেজে তোমার জানালা
গিয়েছে খুলি।

তুমি আসিয়াছ ফিরে—
এই কথাটুকু ভ্রমরের মত গুঞ্জরে মোরে ঘিরে।
আমার হৃদয়-বীণায় লাগিল তাহারি মধুর রেশ,
রজনীগন্ধা ফুটি ফুটি করি চেয়ে রয় অনিমেষ।
তুমি কি সে কথা বুঝিবে না প্রিয়ে, নিষ্ফল হবে চাওয়া,
দীর্ঘ বিরহ ঘুচিবে না আর? তোমারে নিত্য পাওয়া
স্বপ্নেরই ধন হয়ে রবে সখী? আষাঢ় দিনের বেলা
এমনি বিফলে কেটে যাবে হায়, রজনীর অবহেলা
রজনীগন্ধা সহিতে পারে না, তাই ত প্রভাত হ'লে,
কঠিন মাটিতে অভিমান-ভরে ধীরে ধীরে
পড়ে ঢ'লে।
তুমি ত জান না তোমার বিরহে কি আগুন আছে জ্বালা।
দহনশিখায় জ্ব'লে ছাই হ'ল সন্ধ্যামণির মালা।
পরশ-বিধুর দেহে জেগে ওঠে মরুভূ-তৃষ্ণা যত—
তৃষাতুর আঁখি তোমারে খুঁজিয়া হতাশে বেদনাহত।
আজি আষাঢ়ের নীল নব ঘনে ঘনায় তোমারি মায়া
খোলা বাতায়নে দেখিনু চকিতে পড়িল তোমার ছায়া,
ছায়া দেখি কেন জাগে সংশয় চিরবিরহীর মনে,
আমারি মনের ছায়ারে তবে কি দেখিলাম বাতায়নে?

বৃত্তিসমস্যা ও তাহার সমাধান

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়, এম-এস্‌সি

'মনোবিদ্যা' শব্দটির সহিত অনেকের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। শিশুতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মানসিক রোগাবলী ইত্যাদি বহুবিধ ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কেহ কেহ হয়ত জ্ঞাত আছেন। এই মনোবিদ্যার প্রয়োগের প্রসার ক্রমশই ব্যাপকতা লাভ করিতেছে। আজকাল এত বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগ হয় যে পুরাকালের একটি প্রাচীনপন্থী মনোবিদ্যার পরিবর্তে অধুনা বিভিন্ন জাতীয় মনোবিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। যথা, শিশু-মনোবিদ্যা, সমাজ-মনোবিদ্যা, পশু-মনোবিদ্যা, শিল্প-মনোবিদ্যা ইত্যাদি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ উদ্ভাবিত পন্থা অনুসরণ করে। এমন কি বৃত্তি-সম্বন্ধীয় নানাবিধ জটিল সমস্যার সমাধানের চেষ্টাতেও অধুনা মনোবিদ্যা কিরূপ সাহায্য করিতেছে, সে-কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পরিভাষার আশ্রয় লইলে মনোবিদ্যার এই বিশেষ বিভাগটিকে বলিতে হয় 'বৃত্তি-মনোবিদ্যা' অর্থাৎ Vocational Psychology.

জীবিকানির্বাহের জন্য যে কোনরূপ পেশাকেই আমরা 'বৃত্তি' অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। ডাক্তারী, ওকালতী, চাকুরী হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য মুটেগিরি পর্য্যন্ত এই পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। বৃত্তীয় জীবন যদি সাফল্যমণ্ডিত না হয় তাহা হইলে কষ্টের সীমা-পরিসীমা থাকে না, কারণ জীবনে বৃত্তিসম্বন্ধীয় কার্য্যেই আমরা অধিক সময় অতিবাহিত করিয়া থাকি। মনে করুন অফিসের সাধারণ কেরাণীর দৈনন্দিন জীবনের কার্য্য-তালিকা। ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত তাঁহাকে অফিসে হাজিরা দিতে হয়। ১০টার সময় অফিসে পৌঁছাইতে হইলে ৮½টা অন্ততঃ ৯টা হইতেই তাঁহাকে তোড়জোড় করিতেই হয়। অফিস হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কিঞ্চিৎ শ্রমলাঘবের পর গৃহের অন্যান্য কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে ৭টা ৭½টা ত বাজিবেই। অতএব দেখা গেল, কেবল বৃত্তির চাহিদা মিটাইতেই তাঁহার প্রায় এগারো ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। ঘণ্টা-আষ্টেক না ঘুমাইলেই নয়—একুনে হইল উনিশ-ঘণ্টা। আর বাকী রহিল পাঁচ ঘণ্টা—ইহার মধ্যে সংসারের নানাবিধ কাজকর্ম্ম, হাটবাজার, অতিথি-আপ্যায়ন, অনূঢ়া কন্যার পাত্রান্বেষণ, আত্মীয়স্বজনের তত্ত্বতালাস রাখা, ছেলের অসুখ-বিসুখ, ডাক্তার-বদ্দি, গৃহিণীর সাংসারিক দাবি মেটানো—উঃ অসম্ভব—তাঁহাকে হিম্‌সিম্ খাইয়া যাইতে হয়। দীর্ঘনিশ্বাস সহ তিনি বলিয়া থাকেন, "আঃ দিনটা যদি বত্রিশ ঘণ্টায় হ'ত।" ইহার উপর আবার ব্লাক আউট। মুক্তির আলো সম্বন্ধে তিনি হতাশ হইয়া পড়েন। এই গেল সাধারণ চাকুরীজীবীদের অবস্থা। আর যাঁহারা স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বী তাঁহাদের ত কথাই নাই। চব্বিশ ঘণ্টা তাহাদের ঐ এক চিন্তা—কিসে ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে। শ্যামসুন্দরবাবু (আসল নামটা অবশ্য গোপন করিতেছি) হার্ডওয়্যারের নাম করা ব্যবসাদার। বাজারে গুজব যে তিনি নাকি এই যুদ্ধের হিড়িকে ন্যূনপক্ষে লাখ-দশেক টাকা কামাইয়াছেন। ইহাতেও টাকার জন্য তাঁহার তীব্র মানসিক অশান্তি। সেদিন রাত্রে তিনি এক কাণ্ড বাধাইয়াছিলেন। ব্যাপারটি অবশ্য তাঁহার পাশের বাড়ীর বিজয়বাবুর নিকট হইতে শোনা। বিছানার উপর হঠাৎ বসিয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া শ্যামসুন্দরবাবু চীৎকার সুরু করিলেন—"উঃ কি ভুলই করেছি, কেন বেশী ক'রে iron stock করি নি—Stock…Stock…।" চীৎকার শুনিয়া পার্শ্বে নিদ্রামগ্না তাঁহার স্ত্রীর ঘুম ছুটিয়া গেল, চোখ মেলিয়া দেখেন স্বামীর কাণ্ড, তাহার পর দু-চার বার ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "কি টক্ টক্ সুরু কল্লে বল ত এই রাত-দুপুরে—সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর…এক দণ্ড ঘুম …উঃ বাবা রে কপালে কত দুঃখ আর…(ক্রন্দন)।" শ্যামসুন্দরবাবুর বাগ্মিতা কোথায় গেল উবিয়া। চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে সন্ত্রস্ত ভাবে তিনি বলেন, "না, না ইয়ে মানে চেঁচাচ্ছিলুম নাকি,—য়্যা মানে একটা যেন স্বপ্ন…য়্যা তা কান্না কিসের—শুয়ে পড়…শুয়ে পড়…।" বুঝিয়া দেখুন ঘুমের মধ্যেও ব্যবসা-ভূত শ্যামসুন্দরবাবুকে নিস্তার দেয় নাই।

সাধারণ জীবনের সহিত বৃত্তিজীবন যে অঙ্গাঙ্গী ভাবে

ও অপরিহার্য্য ভাবে জড়িত তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃত্তি-জীবন যদি অনিয়ন্ত্রিত হয় তাহা হইলে ব্যক্তি-বিশেষের এই প্রকার জীবন-যাপন যে নিতান্তই কষ্টকর ও বিরক্তি-জনক তাহা বলাই বাহুল্য। অনিয়ন্ত্রিত বৃত্তিজীবন যে কেবল ব্যক্তি-বিশেষেরই উদ্বেগের বিষয় তাহা নহে, সমাজের বা দেশেরও তাহাতে প্রভূত পরিমাণে ক্ষতি হয়। সমাজের বা দেশের ভিত্তিই হইল মানব-সমষ্টির উপর, সুতরাং মানব জীবন সঠিক নিয়ন্ত্রিত না হইলে সমাজের ক্ষতি হইবে না কি ?

দেহ ও মন লইয়াই মানুষ। মন বলিতে সজীবত্বটুকু আমরা সাধারণতঃ ধরিয়াই লই, কারণ জীবন যদি না-ই রহিল, তাহা হইলে কাহারও মনের অস্তিত্ব কল্পনা করাই দুরূহ হইয়া পড়ে। দেহ বলিতে আমরা যেমন চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি কতকগুলি অঙ্গের সমষ্টি বুঝি, তেমনই মনকেও আমরা কতকগুলি মানসিক অবয়বের সমষ্টি বলিয়া মনে করিতে পারি। এক জনের মনের গঠন বলিতে আমরা বুঝি তাহার সহজাত প্রবৃত্তিসমূহ, বুদ্ধি, বিভিন্ন বিষয়ে সামর্থ্য, মেজাজ ও অনুরূপ প্রকৃতির সমন্বয়। দেহের যেরূপ বৈশিষ্ট্য আছে, অর্থাৎ এক জনের শরীরের সহিত আর এক জনের শরীরের তুলনা করিলে যেরূপ ভেদ দেখা যায়, মনের গঠনের বেলাতেও ঠিক সেই প্রকার। এক জনের মনের গঠন অপর জনের মনের গঠনের সহিত সমান হয় না এবং হইতে পারেও না। ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে আমাদের মোটেই অসুবিধা হয় না। পরীক্ষায় সকলেই প্রথম হইতে পারে না এবং সকলের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সমান না হওয়াই যে ইহার মূল কারণ তাহা আমরা জানি। প্রতিবেশী মসীবর্ণ ও মেদবহুল কেদারচন্দ্রকে কন্দর্পচন্দ্র বলিলেই তিনি ফসফোরাসের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া ভেকনৃত্য সুরু করিয়া দেন, অথচ ও-পাড়ার হরিহরকে হাজার গাল দিলেও, এমন কি দু-চার ঘা লাগাইলেও নির্বিকারচিত্তে হাসিয়া থাকে, কিছু মনে করে না। পাড়ার সকলেই বলিয়াই থাকেন, অদ্ভুত মেজাজ দু-জনের,—ঠিক নর্থ পোল আর সাউথ পোলের মত, এবং আপনারাও হয়ত তাহা স্বীকার করিবেন। সে যাহা হউক এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া মনোবিদ্গণের নিজেদের মধ্যেই মতভেদ ঘটিল। মোটামুটি দুইটি দলের সৃষ্টি হইল, এক পক্ষ বংশগত প্রভাবকেই এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিলেন, যে স্থলে অপর পক্ষের নিকট পরিবেশগত (environmental) প্রভাবই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া অনুমিত হইল। এই সকল বাদানুবাদ লইয়া আমি উপস্থিত আলোচনা করিব না। আমার এই বিষয় অবতারণা করিবার আসল উদ্দেশ্য—আপনাদের এইটুকু জানাইয়া দেওয়া যে, এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের পর্য্য-বেক্ষণ হইতেই 'বৃত্তি-মনোবিদ্যার' উৎপত্তি।

বহু গবেষণার ফলে মনোবিদ্গণ এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন যে, বিভিন্ন বৃত্তির কার্য্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মানসিক গুণাবলীর প্রয়োজন হয়। আইনশাস্ত্রে সাফল্যলাভ করিতে হইলে অত্যুচ্চ পরিমাণ বাক্‌পটুতা একান্তই প্রয়োজন, কিন্তু কোন বিদ্যালয়ের সাধারণ সফলকাম শিক্ষকের কিঞ্চিৎ পরিমাণ বাক্‌পটুতা প্রয়োজন হইলেও, এতটা না হইলেও চলে। আবার সাধারণ মুদ্রাকরের যে পরিমাণ বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন, এক জনকে সিভিলিয়ান হইতে হইলে তাহার বুদ্ধির পরিমাণ যে আরও বেশী হওয়া উচিত, ইহা আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন। এই ভাবে অগ্রসর হইয়া মনোবিদ্গণ দৃঢ়ভাবে দাবি করিয়া বসিলেন যে, প্রত্যেক লোক সকল প্রকার বৃত্তির উপযুক্ত নহে। মনোবিদ্-গণের এই দাবি অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া প্রথম প্রথম অনেক দিক্ হইতেই উপেক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহা যে নিতান্তই সঙ্গত ও সত্য তাহা ক্রমশই স্বীকৃত হইতেছে। পাঁচ জনের সংস্পর্শে আসা বা কোন বিষয়-বিশেষে সাধারণের প্রতীতি উৎপাদনের প্রয়োজন এমন কোন পেশায় যদি এক জন অসামাজিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহার কর্ম্মপটুতা সমুচিত স্ফূর্তিলাভ ত করিবেই না, উপরন্তু তাহার নিকট এই প্রকার পেশা যথেষ্টই বিরক্তিকর ও কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হইবে।

বৃত্তি-মনোবিদ্যার প্রধানতঃ দুইটি কার্য্য। প্রথম, নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন, যাহাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'Vocational Selection'। দ্বিতীয়টি, নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত বৃত্তি নির্বাচন অর্থাৎ 'Vocational guidance'. দুইটি কার্য্যই অবশ্য পরস্পর-নির্ভরশীল। কোন বৃত্তির জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনই হউক বা কোন ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত বৃত্তি নির্বাচনই হউক এই উভয়বিধ নির্বাচন ব্যাপারই যে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব, মনোবিদ্গণ তাহার যথাযথ প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যক্তি বা বৃত্তি নির্বাচন করিতে হইলে সর্বপ্রথম আবশ্যক—বৃত্তির ও ব্যক্তির বিশ্লেষণ। প্রথমে বৃত্তি-বিশ্লেষণের কথা ধরা যাউক। সকল বৃত্তিতেই যে একই

রকম মানসিক গুণাবলীর প্রয়োজন হয় তাহা নহে, হইলেও সাধারণতঃ তাহাদের পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। বিভিন্ন বৃত্তিতে সফলকাম হইতে হইলে, তাহাদের প্রত্যেকটিতে কি কি মানসিক গুণ প্রয়োজন এবং কোন্ গুণের কতটা পরিমাণ বাঞ্ছনীয়, মনোবিদ্‌গণ তাহা মোটামুটি নির্ণয় করিয়াছেন এবং আরও বিশদ্‌ভাবে করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাশ্চাত্য দেশে অধিকাংশ বৃত্তিরই যথেষ্ট বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা কতকগুলি কার্য্যকরী সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। এইবার ব্যক্তি-বিশ্লেষণের কথা। পূর্বেই বলিয়াছি, সকল মানুষের মনের গঠন এক প্রকারের নহে। কাহারও বুদ্ধি বেশী, কাহারও কম; কাহারও মেজাজ রুক্ষ, কাহারও ঠাণ্ডা। এইরূপ অনেক মানসিক গুণ আছে যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু উপযুক্ত মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার (psychological tests) দ্বারা এই গুণগুলি ধরা পড়ে। কেবল ইহাই নহে; তাহাদের পরিমাণ কি তাহাও জানিতে পারা যায়। এইরূপ বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করিয়াই বৃত্তি বা ব্যক্তি নির্বাচন কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এবং সুদূর প্রাচ্যে—জাপানেও বৃত্তি-মনোবিদ্যা সমুচিত সমাদর লাভ করিয়াছে। তদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্ট, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিল্প ও বাণিজ্য সম্প্রদায় বৃত্তি বা ব্যক্তি নির্বাচন কার্য্যে মনোবিদের এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া আশাতীত ভাবে লাভবান্ হইয়াছেন।

আমাদের দেশে বৃত্তিনির্বাচন কার্য্য একটি অদ্ভুত ব্যাপার। নির্বাচনকারীদের মধ্যে সুবিধাবাদী ও অদৃষ্টবাদীদের সংখ্যা অতিমাত্রায় লক্ষিত হয়। তাঁহারা নির্বাচনপ্রার্থীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর সাধারণতঃ কোন গুরুত্বই আরোপ করেন না। তাঁহাদের অজ্ঞতা, খেয়ালী ভাব বা নানা প্রকার অবৈজ্ঞানিক ধারণার দরুন নির্বাচনপ্রার্থীর সামর্থ্যের সমুচিত ব্যবহার হয় না। তাঁহারা বুঝিতেই পারেন না, ইহাতে নির্বাচনপ্রার্থীর কত ক্ষতি হয়। তাঁহাদের চিন্তা কেবল বৃত্তির লাভের দিকেই সীমাবদ্ধ। বৃত্তিনির্বাচনকালে তাঁহারা প্রথমেই দেখেন যে, বৃত্তিবিশেষ হইতে যশ, অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি প্রভৃতি সর্বকাম্য বস্তুগুলি লাভ করা যাইবে কি না। আবার দেখা যায় যে, উচ্চ বৃত্তিতে সফলকাম ব্যক্তি তাঁহার বৃত্তিতেই পুত্র বা তৎস্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া থাকেন বা করিবার প্রয়াস পান। তিনি ভাবিতেই পারেন না যে, তাঁহার পুত্র তাঁহারই অনুসৃত ও মনোনীত বৃত্তিতে সফলকাম হইতে পারিবে না। এমনও মাঝে মাঝে হয়, যে, পুত্রের বিষয়ে কোন অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি তাঁহার নজরে পড়িয়া যায়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতাই যে পুত্রটিকে ত্রুটিজনিত ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবে, এই ধারণাই তাঁহার মধ্যে বলবতী হইয়া উঠে। কেহ কেহ মনে করেন যে, মানুষ প্রতিযোজনশীল অর্থাৎ প্রয়োজনানুপাতে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত অল্পায়াসেই নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে। সুতরাং বৃত্তিবিশেষে যোগ্যতা বা অযোগ্যতা বিচার করিতে যাওয়া নিতান্ত অর্থহীন। মানুষের প্রতিযোজন-ক্ষমতা যে আছে তাহা সত্য, কিন্তু তাহা অসীম ত নহে। যোগ্যতা-অযোগ্যতা সমস্যার সমাধান যে সম্পূর্ণভাবে এই ক্ষমতার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়, এই ধারণা একান্তই অযৌক্তিক। কোন এক প্রতিভাবান্ ব্যক্তি এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, বৃত্তিনির্বাচন-সমস্যা এবং পতি বা পত্নী নির্বাচন-সমস্যা একই পর্য্যায়ভুক্ত, কারণ উভয় নির্বাচনেরই ভবিষ্যৎ ফলাফল আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অবিদিত থাকে। কালস্রোত ও দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাই এই ফলাফল এবং তাহাদের পরিমাণের একমাত্র পরিচায়ক। কথাটি নিতান্ত অযৌক্তিক না হইলেও ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, পতি-পত্নীর স্বল্প স্বার্থত্যাগ দ্বারা গার্হস্থ্যজীবন হয়ত সুনিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব, কিন্তু এই স্বার্থত্যাগ দ্বারা যে বৃত্তিজীবন সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। সে যাহা হউক, আমাদের দেশে যথেচ্ছভাবে বৃত্তি-নির্বাচনের আরও প্রচুর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সেদিন এক প্রবীণ ব্যক্তির সহিত এই বৃত্তি-নির্বাচন সম্বন্ধে তুমুল আলোচনা চলিতেছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মশায় বিশেষজ্ঞ আমি নই, কিন্তু বিশেষ অজ্ঞ এটা স্বীকার করতেও রাজী নই—কি দরকার এসব হাঙ্গামায় বলতে পারেন? এ সব না ক'রে কি পৃথিবী রসাতলে গেছে? আশু মুখুয্যে, সি. আর. দাশ, সুরেন বাঁড়ুয্যে, রাসবিহারী ঘোষ, এঁরা কি জন্মান নি? জীবনে উন্নতি করা না-করা ভগবানের হাত, ভাগ্যের খেলা—মানুষের সাধ্যি কি তার ওপর কলম চালায় ..." ইত্যাদি। তাঁহার রুদ্ধ ভাবাবেগ রোধ করিতে সেদিন যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই সকল ক্ষণজন্মা মনীষীর বৃত্তি-নির্বাচন কার্য্যে যে কোনরূপ বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসৃত হয় নাই এবং তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদের যে কোন উপায়েই হউক,

সুপ্ত মানসিক গুণাবলীর সঠিক নিয়ন্ত্রণ ও যথাযথ ব্যবহার যে সম্ভব হইয়াছিল, যাহার ফলে তাঁহারা বৃত্তিজীবনে সফলকাম ও যশস্বী হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে অবশ্য বলিবার কিছু নাই। কিন্তু এই বিরাট্‌ জনসমুদ্রের মাঝে কয়েকটি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিজীবনের উপর ভিত্তি করিয়া, বিজ্ঞানের এই অভাবনীয় আবিষ্কারের সত্যতা ও যাথার্থ্য বিচার করিতে যাওয়া সমীচীন হইবে কি? আবার যাঁহারা এরূপ যশস্বী না হইলেও বৃত্তিজীবনে সুনাম করিয়াছেন. তাঁহাদের বেলায় বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী বৃত্তি নির্ধারিত হইলে যে আরও বড় হইতে পারিতেন, এ-কথা জোর করিয়া অস্বীকার করিবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ আছে কি? কোন বিষয়ে মৌখিক বাদানুবাদ না করিয়া প্রয়োগের দ্বারাই যে তাহার যৌক্তিকতা সম্পূর্ণভাবে হৃদয়গ্রাহী হয় তাহা বলাই বাহুল্য। পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানের এই প্রণালী কার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই, সেখানে ইহার মূল্য ও সত্যতা সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ হইয়াছেন এবং ইহা যথাযথ সমাদর ও সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়াছে।

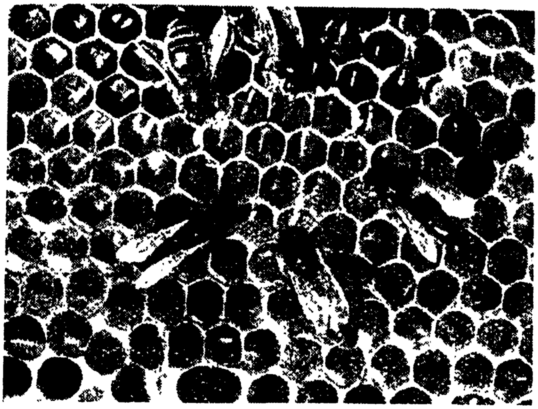
বিভিন্ন বৃত্তিতে উপযুক্ত ব্যক্তি-নির্বাচন-কার্য্যেও অবৈতনিক পন্থা অনুসৃত হইতে দেখা যায়। শোনা যায়, পূর্ব্বে সরকারী বা সওদাগরী অফিসের নূতন কোন চাকুরী খালি হইলেই ঐ অফিসেরই নিযুক্ত কর্ম্মচারীর বা অবসর-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর পুত্র বা তাঁহার কোন আত্মীয় সেই চাকুরীতে সাধারণতঃ বাহাল হইবার প্রথম সুযোগ পাইত। এখন অবশ্য আর সে যুগ নাই। ব্যক্তি-নির্বাচন-কার্য্যে আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্ট ও কয়েকটি বাণিজ্য ও শিল্প সম্প্রদায় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। সেই জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকুরীতে ব্যক্তি-নির্বাচনের সময় অধুনা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহা যে পূর্ব্বানুসৃত বিভিন্ন নির্বাচনপন্থা অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকরী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাই যথেষ্ট ও সম্পূর্ণ নহে। বৃত্তি ও ব্যক্তির যথাযথ বিশ্লেষণ করিয়া, এবং সেই বিশ্লেষণের ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া, বিশিষ্ট বৃত্তিতে উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ করিলেই নির্বাচন-কার্য্য সুশৃঙ্খল ও যুক্তিসঙ্গত হইবে। এই বিষয়ে আমি গবর্ণমেণ্ট, করপোরেশন, বিভিন্ন বাণিজ্য ও শিল্প সম্প্রদায়, শিক্ষাকেন্দ্র-সমূহ প্রভৃতি অর্থাৎ যাঁহাদের উপর মানব জীবনের সুখ ও শান্তির দায়িত্ব আছে, তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বৃত্তি-সমস্যা সমাধান এই দায়িত্বের একটি প্রধান অঙ্গ। মনোবিদ্যার এই আধুনিক আবিষ্কারগুলি যে এই সমস্যা সমাধানের পক্ষে অপরিহার্য্য, আশা করি সকলে তাহা উপলব্ধি করিবেন। অত্যন্ত সুখের বিষয়, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বৃত্তিসমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল মনোবিদ্যা-বিভাগের একটি প্রায়োগিক শাখা খোলা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী কি করিয়া উপযুক্ত বৃত্তি বা ব্যক্তি-নির্বাচন সমস্যার সমাধান হইতে পারে, সে-বিষয়ে যথাযথ গবেষণা করাই এই শাখার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির দায়িত্ব কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। গবর্ণমেণ্ট, করপোরেশন, বিভিন্ন বাণিজ্য ও শিল্প সম্প্রদায় প্রভৃতি যদি আন্তরিক সহযোগিতা না করেন, তাহা হইলে দেশের ও দশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে। দেশের উন্নতিকামী ও মানব-হিতাকাঙ্ক্ষী সকলেরই এই বিষয়ে আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মৌমাছির জীবন-রহস্য

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রয়োজনের তাগিদে কেবলমাত্র বন্য পশু-পক্ষীকে বশীভূত করিয়াই মানুষ ক্ষান্ত থাকে নাই, বিভিন্ন জাতীয় কীট-পতঙ্গকেও পোষ মানাইয়া তাহাদের দ্বারা প্রয়োজনীয় কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতেছে। মৌমাছি ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মধু আহরণ করিবার নিমিত্ত কোন্ সময়ে মানুষ প্রথম মৌমাছি পালন সুরু করিয়াছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করিতে না পারিলেও ইহা যে সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের কথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে বর্ত্তমান যুগে যেরূপ উন্নত কার্য্যকরী প্রথায় মৌমাছি প্রতিপালিত হইয়া থাকে, প্রাচীন প্রথা যে তদপেক্ষা

বহুলাংশে নিকৃষ্ট ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। মোটের উপর তখন মধু আহরণের নিমিত্ত সুবিধামত স্থানে চাক নির্ম্মাণে মৌমাছিগুলিকে প্রলুব্ধ করিবার জন্যই বিবিধ কৌশল অবলম্বিত হইত। আজও



মৌমাছিরা তাহাদের চাকে কাজ করিতেছে

পল্লী অঞ্চলে মৌমাছির ঝাঁক উড়িয়া যাইবার সময় তাহাদিগকে চাক বাঁধিতে প্রলুব্ধ করিবার জন্য কয়েক প্রকার অদ্ভুত প্রথার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, মৌমাছি পালন বিষয়ক—আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এস্থলে সাধারণভাবে উহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতীয় মৌমাছি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও বিভিন্ন জাতীয় কয়েক প্রকারের মৌমাছি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার বুনো বা বাঘা মাছিই সর্ব্বাপেক্ষা উগ্র এবং অধিকতর মধু-সঞ্চয়ী। উঁচু গাছের ডালে, বড় বড় গাছের ফাটলে, দালানের কার্নিশে অথবা কোন আবৃত স্থানে মৌমাছিরা বড় বড় চাক নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করে। এক একটি চাকে ৪০।৫০ হাজার হইতে ৭০।৮০ হাজার মৌমাছি দেখা যায়। পরস্পর গাত্রসংলগ্ন হইয়া এক একটি চাকে এত অধিক সংখ্যক মৌমাছি বাস করিলেও তাহাদের পরস্পরের সহিত কখনও ঝগড়াঝাটি ঘটিতে দেখা যায় না। অবশ্য সময়ে সময়ে এক চাকের মৌমাছিরা অন্য চাকের মাছি-গুলিকে আক্রমণ করিয়া লুঠতরাজ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহারা ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার বিষয় উপেক্ষা করিয়া সমাজের মঙ্গলের জন্যই দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে এবং এজন্য প্রয়োজন হইলে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। যাঁহাদের একটু বিশেষভাবে মৌচাক লক্ষ্য করিবার সুবিধা হইয়াছে তাঁহারা জানেন যে, কিরূপ বুদ্ধিমত্তা ও শৃঙ্খলার সহিত মাছিগুলি তাহাদের দৈনন্দিন কার্য্য-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সারা শীতকালটা ইহারা সঞ্চিত মধুর উপর নির্ভর করিয়া অনেকটা নিশ্চেষ্ট ভাবে কাটাইবার পর বসন্তের আবির্ভাব হইতে যে ভাবে মধু আহরণ, চক্র নির্ম্মাণ, বাচ্চা প্রতি-পালন, বাসার আবর্জ্জনা নিষ্কাষণ এবং শত্রু-প্রতিরোধ প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে তাহা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। এই সকল বিভিন্ন কার্য্যের জন্য ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার যে কাজ তাহা সে যেন যন্ত্রের মতই করিয়া যাইতেছে। ইহাতে তাহার লেশমাত্র ক্লান্তি বা অবসাদ নাই—বিরক্তি বা অনুযোগের কোন লক্ষণ নাই। কোন কারণে অক্ষম বা দুর্ব্বল না হওয়া পর্য্যন্ত এই কর্ম্ম প্রচেষ্টার বিরাম ঘটিতে দেখা যায় না। চাকের অধিকাংশ মৌমাছিই দিনের বেলায় ফুলে ফুলে মধু আহরণে ব্যস্ত থাকে। তাহারা যে কেবল মধুই সংগ্রহ করে তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে পিছনের পায়ের উরুদেশের বিশেষ যন্ত্রসাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণ ফুল-রেণু সংগ্রহ করিয়া বাসায় লইয়া যায়। ফুলের উপর হইতে একটা মৌমাছি ধরিলেই দেখা যাইবে



কর্ম্মী-মাছির উদরের নিম্নভাগে মোমের পতর জন্মিয়াছে

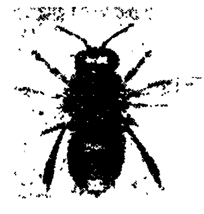
—তাহার পিছনের পায়ের মধ্যস্থলে হলুদ বর্ণের ফুল-রেণু-গুলি যেন কাইয়ের মত সঞ্চিত রহিয়াছে। কতকগুলি মৌমাছি আবার বাসার জন্য জল সংগ্রহেই ব্যাপৃত থাকে। তাহারা ফুলের উপর না বসিয়া সোজা



রাণী মৌমাছি



কর্ম্মী-মৌমাছি



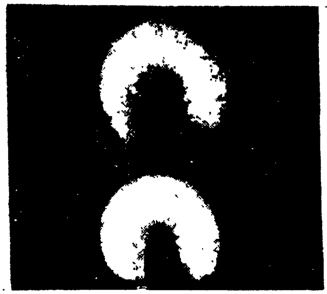
পুরুষ-মৌমাছি

কোন জলাশয়ে উড়িয়া যায়। জলাশয়ের ভাসমান জলজ পত্রাদির উপর বসিয়া প্রচুর পরিমাণে জল শোষণ করিয়া বাসায় লইয়া আসে। গরুছাগল যেমন করিয়া জলপান করে সারবন্দি ভাবে ভাসমান শালুক বা পদ্মপাতার ধারে বসিয়া অনেক সময় ইহাদিগকে সেরূপ ভাবে জল পান করিতে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি মৌমাছি সর্ব্বদাই চাকের মধ্যে অবস্থান করে। কোন সময়েই ইহাদিগকে বাসা ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে দেখা যায় না। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ, কতকগুলি বাচ্চা প্রতিপালন, কতকগুলি মধু ও চাক রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। পাহারাদার মক্ষিকা-গুলি সর্ব্বদা সতর্ক ভাবে বাসার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সময় সময় এক বাসার মৌমাছিরা অপর বাসায় লুঠতরাজ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। তা'ছাড়া অনিষ্টকারী বিবিধ পোকামাকড়েরও অভাব নাই। তাহারা ইহাদের বাচ্চা, ডিম ও মধুর লোভে এমন কি বাসার মোম খাইবার জন্যও আক্রমণ করিতে কসুর করে না। এক জাতীয় 'মথ' দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদের বাচ্চা অর্থাৎ শুঁয়াপোকারা মোম খাইয়াই জীবন ধারণ করে। মৌচাকের গন্ধ পাইলেই এই জাতীয় শুঁয়া-পোকারা তথায় দল বাঁধিয়া উপস্থিত হয় এবং মুখ হইতে সূক্ষ্ম সূতা বাহির করিয়া পাতলা কাগজের মত জাল বুনিয়া বাসার নীচের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এইরূপে বাসার অধিকাংশই ক্রমশঃ সূতার জালে ঢাকিয়া ফেলে। প্রথম হইতে তীব্রভাবে বাধা দিতে না পারিলে ইহাদিগকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই ইহারা চাকে প্রবেশ করিবার সকল প্রকার সম্ভাব্য পথেই খাড়া-পাহারা মোতায়েন করে। এই প্রহরীরা এতই সতর্ক যে, নিজেদের দলের যে কেহই বাহির হইতে বাসায় উপস্থিত হউক না কেন তাহাকে পরীক্ষা না করিয়া ছাড়িয়া দেয় না। খুব সম্ভব শরীরের গন্ধ হইতেই ইহারা স্বদল বা পর-দলের মৌমাছিদের চিনিতে পারে। কতকগুলি প্রহরী আবার চাকের অতি প্রয়োজনীয় স্থলবিশেষে অবস্থান করিয়া অতি দ্রুতগতিতে ডানা কাঁপাইতে থাকে। বাসার নিকটে গেলেই একসঙ্গে অনেকগুলি মৌমাছির ডানা-কম্পনের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে প্রাণে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

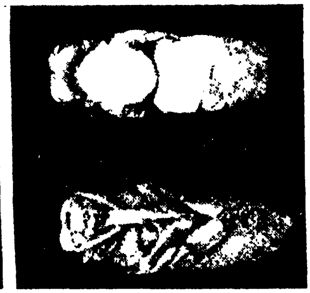
চাকের যাবতীয় মৌমাছিগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায় ;—এক দল কর্ম্মপটু শ্রমিক বা কর্ম্মী : অপর দল সম্পূর্ণ কর্ম্মবিমুখ। রাণী ও পুরুষ মক্ষিকারাই শেষোক্ত ভাগে পড়ে। চাক নির্ম্মাণ, বাচ্চা প্রতিপালন হইতে সুরু করিয়া বাসা রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত পূর্ব্ববর্ণিত যাবতীয় কাজ-শ্রমিকরাই করিয়া থাকে। পুরুষ-মক্ষিকারা প্রধানতঃ আহার-বিহারেই মত্ত থাকে। রাণীর প্রধান কাজ মৌমাছির বংশ বৃদ্ধি করা। পুরুষেরা প্রায়ই দিবসের শেষভাগে উচ্চ শব্দ করিয়া বাসা হইতে উড়িয়া যায় এবং কিছুক্ষণ প্রমোদ-ভ্রমণ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসে। প্রত্যেক চাকেই একটি মাত্র পরিণতবয়স্ক রাণী-মাছি দেখিতে পাওয়া যায়। কদাচিৎ দুই-এক ক্ষেত্রে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। মৌমাছিদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হয়—একটি মাত্র রাণীকে অবলম্বন করিয়াই যেন ইহাদের সমাজ বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রাণী বলিলে তাহাকে চাকের মৌমাছিদের শাসনকর্ত্রী বুঝায় না। ইহাদের মধ্যে রাজতন্ত্র বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই—ইহারা পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিক। রাণীর কাজ একমাত্র প্রজনন করা। একটি মাত্র রাণীই চাকের প্রায় অধিকাংশ মৌমাছির মাতা। রাণী কেবল ডিম পাড়িয়াই খালাস। একমাত্র যৌন-মিলনে অংশ গ্রহণ করা ছাড়া পুরুষ মৌমাছিদেরও আর কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। কাজেই মৌমাছিদের কথা বলিতে গেলে প্রধানতঃ কর্ম্মী-মৌমাছিদিগকেই বুঝায়। কর্ম্মীদের দ্বারাই মৌমাছি সমাজের পরিচয়।



মৌমাছির কীড়া পুত্তলীর আকার ধারণ করিতেছে



মৌমাছির কীড়া, শৈশবাবস্থা



মৌমাছির পুত্তলী

পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে, ফুল হইতে মোম সংগ্রহ করিয়া মৌমাছিরা তাহার সাহায্যে চাকের কুঠরিগুলি নির্ম্মাণ করে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, কর্ম্মী-মাছিদের পেটের নিম্নভাগে অবস্থিত কতকগুলি গ্রন্থি হইতেই মোম উৎপাদিত হয় এবং সেই মোমের সাহায্যেই ইহারা চাক নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। মৌমাছির ঝাঁক উড়িয়া যাইতে অনেকেই দেখিয়াছেন। উড়িতে উড়িতে সুবিধামত স্থান দেখিতে পাইলেই হয়ত কোন গাছের ডালে বসিয়া পড়ে। বাসা নির্ম্মাণের মত উপযুক্ত মনে না করিলে দুই-এক দিন সেখানে অবস্থান করিয়া আবার উড়িয়া যায়। উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া চাক নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে কর্ম্মী-মৌমাছিরা বাসা-বাঁধিবার জন্য নির্ব্বাচিত স্থানে ঘনসন্নিবিষ্ট ভাবে ঝুলিয়া কিছুকাল নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করে। এই সময়ে তাহাদের উদরের নিম্নদেশে মোম উৎপন্ন হইতে থাকে। আমরা সাধারণতঃ যেরূপ মোমের সহিত পরিচিত—প্রথম উৎপন্ন হইবার সময় তাহা মোটেই সেরূপ অবস্থায় থাকে না। মৌমাছির উদরের নিম্নভাগে প্রথম যে মোম উৎপন্ন হয় তাহা দেখিতে অনেকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ অভ্রখণ্ডের মত। এই স্বচ্ছ মোমের পতরগুলি মৌমাছির উদরের শক্ত খোলার ভাঁজে ভাঁজে প্রলম্বিত অবস্থায় সজ্জিত থাকে। বাসা নির্ম্মাণ করিবার সময় এরূপ অসংখ্য মোমের টুকরা বাসার নীচে ভূমির উপর পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। মৌমাছিরা এই টুকরাগুলি খুলিয়া লইয়া চিবাইতে থাকে। মুখনিঃসৃত অম্লরসাত্মক লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা এক প্রকার অস্বচ্ছ মণ্ডে পরিণত হয়। এই মণ্ড কাদামাটির মত প্রয়োগ করিয়া ইহারা ছয় কোণবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরি নির্ম্মাণ করে। কুঠরি নির্ম্মাণ শেষ হইলে রাণী তাহার শরীরের পশ্চাদ্ভাগ ভিতরে প্রবেশ করাইয়া প্রত্যেকটিতে এক-একটি করিয়া ডিম পাড়িয়া যায়। ডিম ফুটিয়া কীড়া বাহির হইবার পর কর্ম্মীরা তাহাদের শরীরোৎপন্ন এক প্রকার শ্বেতবর্ণ ঘন তরল পদার্থের সহিত ফুল-রেণু প্রভৃতি মিশাইয়া তাহাদিগকে খাইতে দেয়। এই দার্থকে 'রয়েল জেলী' বা মৌমাছির দুধ বলা হয়। কুঠরির পার্থক্য অনুযায়ী অর্থাৎ বাচ্চাগুলির ভবিষ্যৎ পরিণতির উপর লক্ষ্য রাখিয়াই যেন খাদ্যের পরিমাণের তারতম্য করা হইয়া থাকে। বাচ্চাগুলির শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের আহার করিবার প্রয়োজনও শেষ হয়। মোমের সাহায্যে কর্ম্মীরা তখন কুঠরির মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। এখন হইতেই বাচ্চাগুলির কৈশোর অবস্থা চলিতে থাকে। কুঠরির মুখ বন্ধ হইবার পরেই বাচ্চা তাহার মুখ হইতে সূক্ষ্ম সূত্র বাহির করিয়া শরীরের চতুর্দ্দিকে একটি সূক্ষ্ম আবরণী গড়িয়া তোলে। এই আবরণীর মধ্যে নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিয়া কীড়া পুত্তলীতে রূপান্তরিত হয়। কীড়া অবস্থায় ইহার হাত পা বা অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চিহ্নমাত্র থাকে না। পুত্তলী অবস্থায় বাচ্চার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ কতকটা অসম্পূর্ণ থাকিলেও এই সময়ে বাচ্চা প্রকৃত মৌমাছির আকৃতি পরিগ্রহণ করে। অবস্থাটা অনেকটা মাতৃগর্ভে অবস্থিত পরিণত মনুষ্য-ভ্রূণের মত। আরও কিছুকাল নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিবার পর পূর্ণাঙ্গ মৌমাছির রূপ ধারণ করিয়া কুঠরির মুখ কাটিয়া বাহিরে আসে। নূতন কর্ম্মী জন্মগ্রহণ করিবার পর প্রথমতঃ কিছুদিন সে বাসা ছাড়িয়া মোটেই বাহিরে যায় না; বাসার আভ্যন্তরীণ কার্য্যেই ব্যাপৃত হয়। আবর্জ্জনা সরাইয়া তাহারা কুঠরিগুলিকে পরিষ্কার রাখে, ডানা কাঁপাইয়া কুঠরির অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালন

করে। চাকের প্রবেশ-পথে পাড়া-পাহারায় মোতায়েন থাকিয়া আগন্তুক অথবা আক্রমণকারী কীট-পতঙ্গদিগকে তাড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করে এবং কেহ কেহ সংগৃহীত মধু সংরক্ষণের কার্য্যেও ব্যাপৃত হইয়া থাকে। পক্ষাধিক কাল



দুইটি রাণীমক্ষিকা লড়াই করিতেছে। কর্ম্মীরা রাণীদের লড়াই দেখিতেছে

গৃহকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার পর মধু সংগ্রহে বহির্গত হয়। কর্ম্মী মৌমাছিরা সাত আট সপ্তাহ হইতে প্রায় ছয় মাস কাল জীবিত থাকে, রাণী-মৌমাছিকে তিন বৎসর হইতে প্রায় চার বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা যায়। পুরুষ-মৌমাছিরা গ্রীষ্মের মাঝামাঝি জন্মগ্রহণ করিয়া যৌন-অভিযানের পর প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া নানাভাবে প্রাণত্যাগ করে এবং অবশিষ্ট যাহারা থাকে তাহারাও কর্ম্মীদের দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—একটি রাণী হইতেই হাজার হাজার মৌমাছি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। পুরুষ, কর্ম্মী ও নূতন রাণীরা তাহারই সন্তান। যৌন-মিলনের ফলে স্ত্রী ও পুরুষ মৌমাছি উৎপন্ন হইবার ব্যাপারে কিছুমাত্র নূতনত্ব নাই। জীবজগতে অহরহই এরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে। কিন্তু একই রকম বৈশিষ্ট্য সমন্বিত হাজার হাজার কর্ম্মী মৌমাছির উৎপত্তি হয় কিরূপে? মৌমাছি-জীবনের ইহা এক অদ্ভুত রহস্য। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে—স্ত্রী, পুরুষ ও কর্ম্মী—এই বিবিধ শ্রেণীর মৌমাছিদের জন্ম-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহা অতীব কৌতূহলোদ্দীপক।

মৌমাছিদের জীবনযাত্রা-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই একথা মনে হয় যে, রাণী-মক্ষিকা ইচ্ছামত স্ত্রী, পুরুষ বা কর্ম্মী মৌমাছি উৎপাদন করিতে পারে। ডিম পাড়িবার সময় হইলেই রাণীকে প্রায় সর্ব্বক্ষণই চাকের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেকটি শূন্য কুঠরিতে এক-একটি করিয়া ডিম পাড়িতে দেখা যায়। যে সকল কুঠরিতে পুরুষ-মৌমাছি উৎপন্ন হয় সেগুলির আয়তন শ্রমিক মৌমাছিদের কুঠরি হইতে কিঞ্চিৎ বৃহদাকার। এই উভয় শ্রেণীর কুঠরি হইতে রাণীর কুঠরির আকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং আয়তনেও তাহা অনেক বৃহৎ। পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে—কুঠরিগুলির আকৃতি বা আয়তনের পার্থক্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়াই রাণী একাদিক্রমে ডিম পাড়িয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বশেষে দেখা যায়—কুঠরির আয়তনের তারতম্যানুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর মৌমাছি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ ছোট কুঠরি হইতে কর্ম্মী, মাঝারি কুঠরি হইতে পুরুষ এবং বড় কুঠরি হইতে রাণী জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কাজেই পর্য্যবেক্ষকের পক্ষে একথা অনুমান করা স্বাভাবিক যে, রাণী ইচ্ছামত কর্ম্মী, পুরুষ বা রাণীর ডিম প্রসব করিয়া থাকে। যৌন-পার্থক্য হিসাবে প্রকৃত প্রস্তাবে রাণী ও কর্ম্মী মক্ষিকাদের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য। রাণীদের মত কর্ম্মী-মৌমাছিরাও স্ত্রী জাতীয়। কিন্তু রাণীরা সন্তান-উৎপাদনে সক্ষম, পক্ষান্তরে কর্ম্মীরা বন্ধ্যা। রাণীদের প্রজনন যন্ত্র যেরূপ পরিপুষ্টি লাভ করে কর্ম্মী-মক্ষিকাদের প্রজনন যন্ত্র সেরূপ পরিণত অবস্থায় উপনীত হয় না। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রাণী ও কর্ম্মী-মক্ষিকারা একই রকমের ডিম হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অদ্ভুত হইলেও ব্যাপারটা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। স্ত্রী জাতীয় মৌমাছিদের প্রজনন যন্ত্রের যথাযথ পরিপুষ্টি নির্ভর করে—খাদ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। শ্রমিক মৌমাছিরা স্ত্রী জাতীয় হইলেও শৈশবাবস্থা হইতেই তাহারা প্রতিপালিত হয় ক্ষুদ্রায়তন কুঠরির মধ্যে। এই সকল কুঠরিতে মৌমাছি-দুধ প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হয় না। ঠিক যতটুকু প্রয়োজন কর্ম্মীরা বাচ্চাগুলিকে ঠিক ততটুকু খাদ্যই দিয়া থাকে। রাণীর কুঠরি অনেক বড়। তাহাতে বেশী পরিমাণ খাদ্যের স্থান সংকুলান হয়। কাজেই বড় কুঠরীর বাচ্চা শৈশবাবস্থায় প্রচুর পরিমাণ সহজপাচ্য 'রয়েল-জেলী' বা মৌমাছি-দুধ উদরস্থ করিতে পারে। প্রচুর খাদ্য উদরস্থ করিবার ফলে সে যে কেবল আকৃতিতেই অনেক বড় হয় তাহা নহে, তাহার দেহ-যন্ত্রাদিও যথাযথ পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে। কিন্তু রাণী ও শ্রমিক মক্ষিকার পার্থক্য কেবল প্রজনন-যন্ত্রেই সীমাবদ্ধ নহে; আকৃতি ও প্রকৃতিগত বহুবিধ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। খাদ্যের পরিমাণের তারতম্য হিসাবে যদি কেবল ক্ষুদ্র ও বৃহদাকৃতির পার্থক্য দেখা যাইত তবে ব্যাপারটা সহজবোধ্য হইত সন্দেহ

নাই। কিন্তু কর্ম্মীর শরীরের প্রান্তদেশ গোলাকার এবং রাণীর শরীরের পশ্চাদ্ভাগ লম্বা ও সূচালো, রাণী ও কর্ম্মীর চোয়াল ও জিভ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। রাণীর দেহে মোম-উৎপাদক বা রেণু-সংগ্রাহক যন্ত্র নাই। উভয়ের



মৌমাছিরা পদ্মপাতার উপর বসিয়া জল পান করিতেছে

দেহবর্ণেও যথেষ্ট তারতম্য রহিয়াছে। তা ছাড়া বুদ্ধি-বৃত্তিতে রাণী-মৌমাছিরা কর্ম্মীদের অপেক্ষা অনেক হীন বলিয়া বোধ হয়। রাণী জন্মগ্রহণ করিবার পর যৌন-মিলনের জন্য একবার মাত্র বাসা ছাড়িয়া উড়িয়া যায়। মিলনের পর চাকে ফিরিয়া আসিয়া ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। দলের বাসা পরিবর্ত্তন করিবার সময় ছাড়া আর কখনও তাহাকে বাসা ছাড়িয়া উড়িতে দেখা যায় না। কর্ম্মী মাছিরা তাহার আহার যোগায়, ডিম পাড়িবার স্থান নির্দ্দেশ করে এবং তাহার যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। মোটের উপর রাণীরা কর্ম্মীদের হাতে যন্ত্রের মত পরিচালিত হয়। এতদ্ব্যতীত রাণীদের এক অদ্ভুত মনোবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কোন চাকে কখনও অপর রাণী-মাছির আবির্ভাব হয় তবে উভয়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া যায়। একটি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নির্জ্জীব না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধের অবসান ঘটে না। কর্ম্মীরা চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া এই যুদ্ধের ফলাফল দেখিতে থাকে। যুদ্ধ শেষ হইবামাত্রই তাহারা বিজয়িনীকে তাহাদের রাণীর পদে বরণ করিয়া লয়। কাজেই রাণী ও শ্রমিকদের মধ্যে এই যে কতকগুলি গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান ইহা কি কেবল খাদ্য-বস্তুর তারতম্যের উপরই নির্ভর করে? অথচ শ্রমিক ও রাণী মক্ষিকা যে একই রকমের ডিম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা অতি সহজেই প্রমাণিত হয়। ডিম ফুটিবার পর দুই তিন দিনের মধ্যে শ্রমিকের প্রকোষ্ঠ হইতে বাচ্চা তুলিয়া লইয়া তাহাকে যদি রাণীর কুঠরিতে এবং রাণীর কুঠরির বাচ্চা শ্রমিকের কুঠরিতে রাখা যায় তবে দেখা যাইবে—পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও শ্রমিকের কুঠরী হইতে শ্রমিক এবং রাণীর কুঠরি হইতে রাণী-মৌমাছিই উৎপন্ন হইয়াছে। এই পরীক্ষা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, একই জাতীয় ডিম হইতে খাদ্যের তারতম্যানুসারে রাণী ও কর্ম্মী মৌমাছি উৎপন্ন হয়। ভিন্ন রকমের এক প্রকার ডিম হইতে পুরুষ-মক্ষিকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যৌন-মিলন না হইলেও রাণী-মক্ষিকাকে ডিম পাড়িতে দেখা যায়। এই অনিষিক্ত ডিম হইতেই পুরুষ-মক্ষিকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যৌন-মিলনের পর ডিম্ব-নিষেককারী রস ডিম্বাধারে না গিয়া ডিম্ব-নলের সহিত সংযুক্ত একটি নির্দ্দিষ্ট থলিতে সঞ্চিত হয়। ডিম বাহিরে নির্গত হইবার সময় ঐ নলের মুখে তাহা নিষিক্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন, রাণী যখন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ডিম পাড়িবার জন্য শরীরের পশ্চাদ্ভাগ প্রবেশ করাইয়া দেয় তখন চাপ লাগিবার ফলে অভ্যন্তরস্থ থলি হইতে পুং-রস নির্গত হইয়া ডিমটিকে নিষিক্ত করিয়া দেয়। পুরুষ-মৌমাছিদের প্রকোষ্ঠ অপেক্ষাকৃত বড় বলিয়া তাহাতে ডিম পাড়িবার সময় চাপ লাগে না। কাজেই পুং-রস থলি হইতে নির্গত না হইবার ফলে ডিমটি অনিষিক্ত ভাবেই বহির্গত হয়। এই অনিষিক্ত ডিম হইতেই পুরুষ-মৌমাছি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা হইতে দেখা যায়, রাণী ও কর্ম্মীরা পিতা ও মাতা উভয়েরই সন্তান কিন্তু পুরুষ-



বাহির হইতে আগত শত্রুকে মৌমাছিরা আক্রমণ করিতেছে

মৌমাছিদের পিতার সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই—ইহারা কেবল মাতারই সন্তান।

সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, জীব জগতে পিতা ও মাতার সহযোগে সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সেই সন্তান

পিতা অথবা মাতার অনুরূপই হইয়া থাকে। জীব-তত্ত্বের গোড়ার কথা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে—আদি জৈব-কোষে পিতা এবং মাতার বৈশিষ্ট্য অন্তর্নিহিত থাকে। পুং-বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রাধান্য লাভ করিলে জ্রূণে ক্রমশঃ পুং-



কর্ম্মী-মৌমাছির পিছনের পায়ের সাহায্যে ফুল-রেণু সংগ্রহ করিয়াছে

লক্ষণসমূহ আত্মপ্রকাশ করে, অন্যথায় স্ত্রী-লক্ষণসমূহ বিকশিত হইয়া থাকে। আদি জৈব-কোষে স্ত্রী ও পুং-বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব থাকে বলিয়াই স্ত্রী অথবা পুং-সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু মৌমাছিদের ক্ষেত্রে জীবের জন্ম-রহস্যের মূলতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে তাহাদের স্ত্রী ও পুরুষ উৎপত্তির ব্যাপারটাকে কিরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে? পুরুষের সম্পর্ক থাকিলেই সেখানে স্ত্রী-সন্তান উৎপন্ন হইবে—অথচ পুরুষ সংস্রব না থাকিলে সেখানে কেবলই পুরুষ-সন্তান উৎপন্ন হইবে—ইহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। পুরুষ-সংস্রব বর্জ্জিত স্ত্রী-গর্ভস্থ ডিম্ব অথবা জীব-কোষে পুরুষের বৈশিষ্ট্যসমূহ কেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে? বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর দেহ-কোষ, বিশেষ করিয়া জীব-কোষে অবস্থিত 'ক্রোমোসোমে'র কথা আলোচনা করিলেই ইহার সহজ সমাধান হইতে পারে। মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় অধিকাংশ প্রাণীর পুরুষদের শরীরে যতগুলি পুং-কোষ উৎপন্ন হয় তাহার অর্দ্ধসংখ্যক কোষগুলিতে X এবং বাকী অর্দ্ধেকে থাকে Y-ক্রোমোসোম। স্ত্রীদের ডিম্ব-কোষের প্রত্যেকটিতেই থাকে X-ক্রোমোসোম। অর্থাৎ 'ক্রোমোসোমে'র দিক হইতে বলিতে গেলে—পুরুষেরা—XYএবং স্ত্রীরা XX. পুং-কোষের X-ক্রোমোসোম ডিম্ব-কোষের X-ক্রোমোসোমের সহিত মিলিত হইলে সন্তান হইবে স্ত্রী এবং পুং-কোষের Y-ক্রোমোসোম ডিম্ব-কোষের X-ক্রোমোসোমের সহিত মিলিত হইলে সন্তান হইবে পুরুষ। Y-ক্রোমোসামটাকেই পুং-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বলিয়া মনে করা হয়। মৌমাছির ক্রোমোসোমও যদি এই অবস্থায় থাকিয়া থাকে তবে অনিষিক্ত ডিম হইতে পুং-মাছি উৎপন্ন হইতে পারে না। কাজেই মনে হয়, পাখী, প্রজাপতি প্রভৃতি কয়েক জাতীয় প্রাণীদের মত পুং-মাছি—XX এবং রাণী-মাছি—XY—ক্রোমোসোম সমন্বিত। মৌমাছির সমগোত্রীয় অন্যান্য প্রাণী সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে অন্ততঃ আমার এই ধারণাই সমীচীন বোধ হইতেছে।

ছোঁয়া লাগে

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

অন্তরে রয়েছে তব সে পরশমণি
ছোঁয়া তার লাগিল আমারে—স্বপ্ন গণি
সে কটি মনের কথা—স্মৃতিকল্পলতা
বেষ্টন করিয়া রহে চির বিরলতা
চিত্তের আমার। জাগে প্রিয়তম তরে
মৃদু মধু-গুঞ্জরণ মর্ম্মের কুহরে।

ছোঁয়া লাগে, ছোঁয়া লাগে, সাথে সাথে রয়,
আনন্দ-স্পন্দনে নিত্য দেয় পরিচয়,
ছোঁয়া লাগে, নৃত্য করে রূপে রূপে ঘেরি',
সারা বিশ্বে আমি তার পদচিহ্ন হেরি।

মা

শ্রীসাধনা কর

চমকে মৃণাল লেখা থেকে মুখ তুললো। শরতের বিকেল মধুর আমেজে উত্তপ্ত। দিকে দিকে ব্যতিব্যস্ততা। বড়দের ত অনেকই কাজ, ছোটদেরও কাজের অন্ত ছিল না। ছেলেগুলি জুটেছিল গিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে, প্রতিমার রং দেওয়া দেখতে, ছোট মেয়েরা তাদের ছোট ছোট কাপড়গুলি শিউলির ডাঁটার রঙে ছুপিয়ে ছুপিয়ে উঠান ছেয়ে ফেললে। তারই ছোপ লেগে যেন শরতের শেষ বেলাকার রোদও হলুদ মাখা। ঘন পুরু ধানের ক্ষেতে দ্রুত চলে নৌকা, একটু দেখা যায় লগি আর ছইয়ের মাথা, থেকে থেকে শব্দ ওঠে—সন্...ন্ ঠক্‌ঠক্। ত্রস্ত বধূ চকিত হয়ে পথের বাঁকে দাঁড়ায়। প্রত্যাশিত দৃষ্টি তার উজ্জ্বল হয়ে পড়ে ওদিকে। ঘরে ফিরতে ফিরতে বুকের ঢিপি ঢিপি আর সহজে থামতে চায় না। চার দিকে আসন্ন আগমনীর একান্ত অনুভূতি। মৃণাল এ সব দেখছিল না। লিখছিল ঘরে ব'সে। গিরিজায়া ব্যস্ত হয়ে এসে চুপি চুপি বললেন—ও মনু, দেখবি আয়। খিড়কির পুকুরের ঘাটে পুঁটিমাছের কি চিক্ খেলছে। ওঠ, মনু, একবার বঁড়শিটা ফেলে যা...আয় লক্ষ্মী ত।

বিব্রত মুখে মৃণাল বললে—সামনে যে আমার পরীক্ষা মা। তা ছাড়া কাল এ প্রবন্ধটা দিতেই হবে মাষ্টার মশাইদের। কালই দেবার শেষ দিন।

—লিখিস্ পরে। রাত্রি আছে, কাল সকালটা পাবি। আয় একবার। বেশীক্ষণ ত নয়।

—লেখাটাই সম্পূর্ণ হয় নি। আবার পরিষ্কার ক'রে লিখতে হবে।

পূজার ছুটির আগে স্কুলে গিফ্‌ট্ হয়। নাটক হয়। সবাই মিলে আমোদ-আহ্লাদ করে। এবারকার বিশেষত্ব একটা প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হয়েছে। যে হবে প্রথম বই পুরস্কার পাবে। এত দিন কাগজ ছিল না এবং পরীক্ষার পড়ার চাপে লেখা আর হয়ে ওঠে নি। আজ তার বাবা এনে দিয়েছেন কাগজ, আজকের মধ্যেই লিখে দিতে হবে প্রবন্ধ। মৃণাল মায়ের কথায় ইতস্তত করতে লাগল। গিরিজায়া এসে তার হাত ধরলেন, বললেন—বেশী নয়, গোটা দশ-বার ধরলেই একটা ঝোল হ'তে পারবে এ বেলা। আয় আয়, শীগ্‌গীর। কি পুঁটি মাছের ভীড়, টানে টানে উঠবে দেখিস্।

তের-চোদ্দ বছরের ছেলেকে এর বেশী প্রলোভন দেখান দরকার করে না। মৃণাল জানত মাছের উপরে মায়ের বিশেষ টান। তাদের অত্যন্ত অভাবের সংসারে খাওয়া-পরার অনটন অনেক। বর্ষার ক-মাস এ দেশেও মাছের দাম চড়া। এক দিন মাছ খেলে আর দশ দিনের আশা ছাড়তে হয় মৃণালদের। আশ্বিনের শেষ দিকে টান ধরেছিল পুকুরের জলে। এই টান-জলে মাছ ওঠে বিস্তর, ট্যাংরা, পুঁটি, বেলে, কই। বিনি পয়সায় এত মাছ, মৃণাল উঠে পড়ল। একবার বললে—বাবা দেখলে খুব রাগ করবেন মা। লেখা হ'ল না এখনও...।

—আমার আশীর্বাদে তুই প্রাইজ পাবি—গিরিজায়া দ্রুত পায়ে যেতে যেতে বললেন—বাড়ী নেই উনি, তুই আয়। আমি মোটা চালের ভাত আর ডুলা নিয়ে আসছি। পরক্ষণেই একটু থেমে ফিরে চেয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললেন—চুপি চুপি ঘরের পেছন দিয়ে কলা-ঝোপের আড়ালে আড়ালে ঘাটে যাস্। যে এক পাল গুষ্টি, দেখতে পেলে এক্ষুনি ছুটবে সব বঁড়শি নিয়ে। যা, তাড়াতাড়ি যা।

মৃণাল মায়ের কথা-মতই হাত-তিনেক সরু ছিপের বঁড়শিটা নিয়ে চুপি চুপি খিড়কির ঘাটে চলে গেল।

উনানে তখন ভাত চাপান, সন্ধ্যা হয়-হয়, সাঁজবাতির কাজ রয়েছে পড়ে, গিরিজায়া স্থির হয়ে কোন কিছুই করতে পারছিলেন না। বার বার শুধু ঘাটে গিয়ে ডুলাটা দেখছিলেন আর উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করছিলেন—আর পেয়েছিস? আরও চারটে? আমি যাবার পরে! ওরে ওই দিকে যা। বোকাটা, এক জায়গায়ই বঁড়শি ফেলছিস্ বার বার। তার পরেই চঞ্চল হয়ে বলেন—নাঃ, যাই আমি। কত কাজ রয়েছে পড়ে। মণি ওরা গেছে তোর রাঙা-জেঠাইমার বাড়ী। লক্ষ্মীকে বোধ হয় সাধ দিচ্ছেন তিনি। আমি যাই...। ফিরছিলেন গিরিজায়া, চট্ ক'রে মনু একটা বেশ বড় দেখে সরপুটি তুলে ফেলে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল—মা, তোমার ভাগ্যি।

গিরিজায়ার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, চোখ হ'ল জলজলে। আগ্রহে এগিয়ে এসে বললেন—সাবধান মত খুলিস, ধরিস শক্ত ক'রে, জলে না পড়ে যায়। এমনও বোকা তুই, চেঁচায় এত জোরে? সব ছুটে এলে দেখা যাবে—কেমন আর মাছ পাস এখন।

মনু মাছটা ডুলাতে রেখে বললে—এত বড় সরপুঁটি কেউ পায় নি এখনও। অনেক মাছ ত পেয়েছি, এর পরে আর বেশী না পেলেও চলবে।

—চলবে ত—শ্লেষ দিয়ে উত্তর করলেন গিরিজায়া—যেমনই বাপ, তেমনই তার বেটা। বেশী পেলে কাল খাওয়া যাবে না? নে নে বেয়ে যা তুই বঁড়শি।

মৃণাল ভাত গাঁথতে গাঁথতে বললে—তাই ব'লে আর বেশীক্ষণ আমি বাইবো না···আমার বলে···।

—"মনু!"—হরনাথের গম্ভীর স্বরে চমকে উঠলেন গিরিজায়া, কেঁপে উঠে মৃণালের হাত থেকে পড়ে গেল বঁড়শিটা।

রাগে হরনাথ কথা বলতে পারছিলেন না। তীব্র দৃষ্টিতে একবার মৃণালের দিকে, একবার গিরিজায়ার দিকে দেখতে লাগলেন। গিরিজায়া ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন—যা এবার মনু, পড়তে বোস গে। এই ···এই ত সবে এসেছে মাছ ধরতে···কি হয়েছে তাতে।

—কি হয়েছে তাতে! হরনাথ আপনাকে সামলাতে পারছিলেন না। বঁড়শি-বাওয়া এমনিতেই দেখতে পারেন না তিনি। এই আশ্বিন-কার্ত্তিক এবং অঘ্রাণ মাসেই যত ধুম পড়ে মাছ ধরবার, ছেলেরা ওঠে মেতে, পড়াশুনা তাদের একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। পরীক্ষায় অনেক ছেলেই তাই খারাপ ফর্ম্ম করে। পড়াশুনায় মৃণাল খুব ভাল। মাষ্টাররা তাকে দিয়ে বড় আশা করেন। ছেলের 'পরে হরনাথের দৃষ্টি তাই কড়া। এক দম বারণ করে দিয়েছেন বঁড়শি বাইতে। মৃণালের মুখ শুকিয়ে উঠল। হরনাথ গুমরে বললেন—আয় আমার কাছে।

এগিয়ে যাচ্ছিল মৃণাল, গিরিজায়া ব্যাকুল হয়ে বললেন—ইচ্ছে ক'রে আসে নি ও। ঘরে কিচ্ছুটি তরকারী নেই, তাই বললুম···বললুম যে···আর রাত দিন পড়াশুনা করলে···।

—মাথা খারাপ হবে, নয়? হরনাথ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে বললেন—ঘরে কিচ্ছুটি না ছিল, বলতে আমাকে। ওর পড়ার কেন ক্ষতি করতে গেলে, দাও তার উত্তর।

কি আর উত্তর দেবেন, রেগে উঠে গিরিজায়া বললেন—অত হিসেব-নিকেশ আমি দিতে পারব না। দুটো ত মোটে মাছ ধরেছে, কি অন্যায়ই করেছে যেন। পড়াশুনা—পাস—কত জজ-ম্যাজিষ্টর হবে, দেখব আমি···ভয় করি নে আমি ভ্রূ কুঁচকানোকে।

হরনাথ ভ্রূ কুঁচকেছিলেন, উত্তর দিলেন না আর। গম্ভীর স্বরে ডাকলেন—মনু!

মৃণাল এগিয়ে এসে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়াল। হরনাথ বললেন—তোমাকে আমি বঁড়শি-বাইতে বারণ করেছিলুম, সত্যি কি না?

মৃণাল মাথা নেড়ে সায় দিল।

—সে কথা তুমি রাখো নি। আমাকে অবহেলা, আমাকে অমান্য করলে।

মৃণালের মাথা আর একটু নীচু হ'ল। হরনাথ ব'লে চললেন—বড় হয়েছ, ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠবে এবার, এক বছর পরেই যাবে কলেজে···।

—আর বাইবো না বাবা। হরনাথ চুপ ক'রে রইলেন কিছুক্ষণ, বললেন—মনে রেখ এ কথা। যাও, বেরিয়ে এসে ডন-কুস্তি ক'রে নাও গে। লেখা হয়েছে, বিকেলে দুধ খেয়েছ?

মৃণাল চুপ। গিরিজায়ার মন কেঁপে উঠল। পরীক্ষার ক'দিন ছেলের জন্যে হরনাথ দুধ রেখে দিয়েছিলেন। মাছ ধরার উৎসাহে সে কথা আর কারুরই নেই মনে। মুখ দেখেই হরনাথ বুঝলেন সব। গম্ভীর স্বরে বললেন—পয়সা দিয়ে দুধ রেখেছি নষ্ট করবার জন্যে নয়। যাও মনু, ডন-কুস্তির শেষে দুধ খেয়ে লেখা শেষ ক'রে তবে খেতে যাবে রাত্রে। যাও!

ধীরে ধীরে মৃণাল বঁড়শি নিয়ে চলে গেল। হরনাথ অনেকক্ষণ নিঃশব্দে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন গিরিজায়ার দিকে। চাপা ঝাঁজের স্বরে বললেন—দিও না ও মাছ আমাকে। কিছু না থাকে শুধু ভাত খাব···কিন্তু তোমার কাছে কি এর বেশী কিছু আশা করাই ভুল? ছেলের ভবিষ্যৎ তুমি নষ্ট না ক'রে ছাড়বে না? তীব্র দৃষ্টিতে গিরিজায়াকে একেবারে দহে দিয়ে দ্রুত পায়ে তিনি সদরে চলে গেলেন। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন গিরিজায়া। হরনাথকে তিনি চেনেন, একবার না করলে সে জিনিস তাঁকে খাওয়ান মুশকিল। রাগে ক্ষোভে হঠাৎ একেবারে বারুদের মত ফেটে পড়ে গিরিজায়া আপন মনেই গজরাতে লাগলেন—খাবে না মাছ, না খেল, ই··স। দুটো মাছ ধরেছে, নষ্ট হয়ে গেছে ছেলের ভবিষ্যৎ···আমারই যত জালা, সব দিকেই। ইচ্ছে করে ঘর-সংসার ছেড়ে যাই চলে এক দিকে।·পারি নে আর।

চার দিকে বেজে উঠল শাঁখের আওয়াজ। বামুন-বাড়ীতে দেবী-পূজার ঘট-স্থাপনা হয়েছে পনর দিন আগে, ঠাকুর-দালানে কাঁসর-ঘণ্টার ঠন্‌ঠন্‌ ঝনঝন, ঝিঁঝিঁ-পোকার ঝিঁঝিঁ রব, ছেলেমেয়েদের কোলাহল আর হাট-ফিরতি লোকের কলরবে পল্লী-সন্ধ্যা মুখরিত। গিরিজায়ার আহ্নিকের সময় হয়ে গেছে। হাত-মুখ ধুয়ে জোড়হাতে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে দ্রুতপদে গিরিজায়া বাড়ী ফিরলেন।

মেজমেয়ে মণি তখন ঘরে ঘরে সাঁঝবাতি দেখিয়ে ফির-ছিল, দেখে গিরিজায়ার অত্যন্ত রাগে শান্তি হ'ল একটু, তবু ঝাঁজের সুরেই বললেন—পেরেছ আসতে? জান ত মা একা, ঘরে কত কাজ। লক্ষ্মী কই, আক্কেলও বলি তার। দশ মাসের পোয়াতি সন্ধ্যেবেলা ঘর থেকে বার হয় না, আর ও অন্য বাড়ী থেকে বাঁশঝাড়, বন-বাদাড় ভেঙে এল এখন…কিছু হ'লে…বলতে বলতে থামলেন তিনি। বড়মেয়ে লক্ষ্মী এসে দাঁড়াল। গিরিজায়া অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। গিরিজায়া নিজে সুন্দরী, প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েই তাঁর অত্যন্ত সুন্দর। লক্ষ্মীর টকটকে সুন্দর রঙের মধ্যে পরনের লাল চওড়া আধুনিক পাড়ের শাড়ি অতি উজ্জ্বল হয়ে ঝলসে উঠেছিল। বড় বড় চোখে কাজল, কপালে চন্দন, ঠোঁট পানের রসে রাঙা। প্রথম মাতৃত্বের পূর্ণ আস্বাদনে রূপ যেন তার অপরূপ ভরে উঠেছে। দেখে দেখে স্তব্ধ হয়ে রইলেন গিরিজায়া। মণি বললে—কত খাইয়েছেন মা জেঠাইমা, দু-তিন রকম পিঠে, পায়েস আবার লুচিও করেছিলেন। কাপড়খানাও মোটামুটির মধ্যে বেশ।

—সত্যি মা—লক্ষ্মী বললে—জেঠাইমার রান্নার হাত কি চমৎকার। আমি তো অনেকটা খেয়েছি, রাতে আর খেতে পারবো না। ও কি মা, মাছ? ক-ত পুঁটি! কে ধরলে, মনু?

—হ্যাঁ—গিরিজায়া ডুলা নিয়ে রান্নাঘরে যেতে যেতে বললেন—জেঠাইমা তোর গরীব হ'লেও মনটা ভাল। আয় তো মণি, রত্নাকে ডেকে নিয়ে, তাড়াতাড়ি কুটে দিবি মাছটা। আহ্নিকটা সেরে নিয়ে আমি ঝোল করব এখন।

রাত্রিবেলা লক্ষ্মী শুয়েছিল, গিরিজায়া এসে ডাকলেন—ওঠ, খেতে চল।

লক্ষ্মী এদিক-ওদিক মোচড় দিয়ে গা গড়িয়ে বললে—খিদে নেই মা মোটে।

—দুটিখানি মুখে দিবি, কিছু হবে না তাতে।

—গলা জ্বলছে যে, ঢেঁকুর উঠছে।

গিরিজায়া গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—মিষ্টি খেয়েছিস, তাই খারাপ লাগছে। ভাত খেলেই সেরে যাবে সব। হ্যাঁ রে কাপড়টা রেখেছিস কোথায়?

শরীর খারাপ লাগাতে কাপড়টা লক্ষ্মী বিছানার উপরেই ছেড়ে রেখে শুয়েছিল, দেখিয়ে দিল। গিরিজায়া কাপড়টা তুলে পাট করতে লাগলেন। অত্যন্ত সজাগ হয়ে উঠল তাঁর মন। বাপের বাড়ী গরীব, স্বামীও গরীব অবস্থার। সেই বিয়ের পরে বছর-দুই হয়ত দু-একখানা ভাল শাড়ি পরতে পেয়েছেন। এখন ত ছেলেমেয়েকে দিয়েই কুলোতে পারেন না, নিজের সাধ-আহ্লাদ সাজগোজ সবই গিয়েছে ঘুচে। পায়ের উপর তোলা ছোট পাড়ের সাধারণ মোটা শাড়ি দুখানা প'রে থাকতে পারলেই আনন্দ। কোন রকমে সিঁদুরের টিপ পরেন এয়োতির চিহ্ন-স্বরূপ আর হাতে দুটো শাঁখা আর লোহা। লক্ষ্মীর সুন্দর মূর্তিখানা অনেক দিন পরে যেন গহন মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা দিল জাগিয়ে। কাপড় ভাঁজ ক'রে রাখতে রাখতে গিরিজায়া ভাবছিলেন এমনি একখানা কাপড় পরলে তাঁকেও লক্ষ্মীর মত সুন্দর দেখাত। ভাঁজ ক'রে কাপড়টা রেখে দিতে গিয়ে হঠাৎ বললেন—আন্‌লাতেই থাক্ কাপড়টা; পরিস ক'দিন। বেশী দামী ত নয়। পূজায় আসবে কত লোক, বেশ পাড়টা, পরিস্ লক্ষ্মী।

—আচ্ছা—ঘাড় নেড়ে লক্ষ্মী সায় দিল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল গিরিজায়ার মুখ, লক্ষ্মী পরতে থাকলে দু-এক দিন তিনিও পারবেন পরতে। মণিকে রেখে এসেছিলেন তিনি হরনাথকে ভাত দেবার জন্যে। মণি এসে ডাকল—মা, খেতে এস।

গিরিজায়া ব্যগ্রভাবে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন—খেয়েছে মাছ?—উঁহু—গম্ভীর মুখে মণি বললে—ঝোলে কুমড়ো দিয়েছিলে তাই খেয়েছেন। বললুম কত…নাও, এস খেতে। আয় রে মনু।

মৃণাল ব্যস্ত মুখে বললে—লেখা শেষ না হ'তে আমি খাচ্ছি নে। কত লেখা এখনও বাকি।

—খাস্ নে, কেউ খাস্ নে। গিরিজায়া জ্বলে উঠে বললেন—সব একা আমিই খাব! রেগে গড়গড়িয়ে ঘর থেকে সশব্দে বেরিয়ে গেলেন গিরিজায়া।

মণি বললে—আয় দিদি, যে ক'টি পারিস খেয়ে যা। খুব রেগে গেছেন মা। আয় মনু, খেয়ে লিপিস।

উঠে গেল লক্ষ্মী। ছোট দুই ছেলেমেয়ে এবং হরনাথের তখন খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, মৃণাল, মণি, লক্ষ্মী আর মা বসলেন খেতে। গিরিজায়া বললেন—আমার

সঙ্গে একসঙ্গে খা লক্ষ্মী। বেশী ত খাবি নে, কেন আরেকটা থালা জোড়া।

মণি বললে—সরপুঁটিটা মা রত্না খেতে চেয়েছিল, মন্নুর জন্যে আমি রেখে দিয়েছি।

গিরিজায়া মৃণালকে ভাত এগিয়ে দিয়ে বললেন—আরেক দিন খাবে এখন মন্নু। কত সরপুঁটি পাবে বঁড়শিতে, দু'দিন পরেই ; —লক্ষ্মী খাক্ আজ।

লক্ষ্মী বললে—"না মা, মন্নু ধরেছে ওকেই দাও।"

"—না মা, দিদিই খাক্।"—মণি বললে।

গিরিজায়া এসে খেতে বসলেন, একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বললেন—যাকে দেবার, বুঝেই দেব আমি। কত মাছ খেয়েছি, আজ এ দুটি পাই নে। তোর ঠাকুর্দা এক-এক বার জাল ফেলে জাল তুলে আনতেন, খইয়ের মত মাছ ছড়্ ছড়্ করত…পুঁটি আর খল্‌সে…এই বড় বড় চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা কত ভালবাসতেন তোর ঠাকুর্দা ; বিয়ের পরে কত সুন্দর সুন্দর শাড়ি এনে দিতেন। কাপড়ের মাঝখানে পাড়, তাকে বলত—পাছাপেড়ে। তা ছাড়া কত চোপের শাড়ি, কত সুন্দর বেলোয়ারী কাঁচের চুড়ি। নে নে খা লক্ষ্মী, মাছ এত আমাকে দিলি, খা, আর দুটি ভাত খা মাছ দিয়ে। ছেলেমেয়ে হ'লে ত অনেক দিন আর পুঁটি মাছ খেতে পাবি নে।

কথা শুনতে শুনতে লক্ষ্মী অনেক ভাত খেয়েছিল, একটা ঢেঁকুর তুলে বললে—আর খাব না মা, শরীরটা কেমন লাগছে। বড় ঝাল দিয়েছ, খেতে ভাল হয়েছে কিন্তু আর খেতে পারব না।

* * *

রাত্রি শেষ থেকেই লক্ষ্মীর উঠল প্রসব-বেদনা। দেহ ভেঙে পড়ল খুব। সবাই শঙ্কিত। বাড়ীতে একটা হুলস্থুল পড়ে গেল। বেলা ন'টা-দশটার সময় একটি ছেলে প্রসব ক'রে আরও খারাপ হয়ে পড়ল লক্ষ্মীর অবস্থা। মাইল-সাতেক দূরে মহকুমা শহর। কিছুতেই হরনাথ চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। চার টাকা ভিজিট দিয়ে ডাক্তার নিয়ে এলেন ডেকে। গ্রাম্য পোষ্টাপিসে টাকা পনর কুড়ি পান। কোন রকমে চলে তাঁর সংসার। তবু দ্বিধা করলেন না এতটুকু। পাস-করা এম-বি ডাক্তার এসে দেখে বললেন—ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ। বিস্তর ময়লা জমেছে নাড়ীতে।

নানা রকম ওষুধপত্র চলতে লাগল। হরনাথ টাকা ধার ক'রে এনে চিকিৎসার ত্রুটি করলেন না। পেটের ভিতর থেকে বেরুলো হজম-না-হওয়া যত খাবার, ডাক্তার বললেন—একটু সাবধান মত খাওয়া-দাওয়া করলে এমন হ'ত না। এখনও খুব সতর্ক সেবা-শুশ্রূষার দরকার। হার্ট দুর্বল।

হরনাথ কাউকেই কিছু বললেন না। বাড়ীর গোলমালে মৃণালের প্রবন্ধ লেখা শেষ হয়ে উঠল না; দেওয়া হ'ল না প্রতিযোগিতায় যোগ। পরীক্ষারও ক্ষতি হবে ব'লে হরনাথ তাকে স্কুলেরই এক মাষ্টারের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন, আয়ের অধিক ব্যয় ক'রে চিকিৎসা করাতে লাগলেন লক্ষ্মীর। গিরিজায়া দিন নেই, রাত নেই, খাওয়া নেই সারাক্ষণ মেয়ের কাছে থাকেন। তবু স্বস্তি নেই তাঁর। হরনাথের দিকে চাইলেই তিনি ছট্‌ফটিয়ে ওঠেন—চেয়ো না ও রকম ভাবে, সইতে পারি নে আমি। ঝোপে-ঝাড়ে সন্ধ্যে অবধি ঘুরে বেড়িয়ে বাধালো অসুখ, যত দোষ আমার। কি খাইয়েছি এমন…। দুপ্ দুপ্ শব্দে পা ফেলে চলে আসেন তিনি। হরনাথ বলেন না কিছুই, কিন্তু মুখ তাঁর কঠিন, চোখে তাঁর তীব্র দৃষ্টি। এটাই গিরিজায়ার অসহ্য। হরনাথকে দেখলে মন তাঁর ওঠে কেঁপে, ঝাঁঝের সুর ছাড়া কিছু যেন আর বলতেই পারেন না। মণি বলে—কেন মা তুমি সারাক্ষণই অমন কর বাবাকে, কিছু ত তিনি বলেন না।

—বললেও যে ছিল ভাল—গিরিজায়া মেয়ের উপরে রেগে ওঠেন—অত তেজ, অত রাগ আমি সইতে পারি নে। এই যে এত সব করছেন, কোন একটা পরামর্শ জিজ্ঞেস করছেন আমায়…বলতে বলতে নিজের কথায়ই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তিনি…কি ভাগ্যি নিয়েই আমি এসেছিলুম…।

—মণি—ঘরের ভিতর থেকে হরনাথের গলা কঠোর ভাবে ওঠে বেজে—আঁতুরঘরে চেঁচামেচি করতে ডাক্তারের নিষেধ…ইচ্ছে হয় ত বাইরে এসে…।

—আমিও জানি লক্ষ্মীর অসুখ…। গিরিজায়া ক্ষিপ্ত হয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে মণি দমিয়ে রাখে তাঁকে।

তিন-চার দিন অনবরত পরিশ্রম সেবা-যত্ন চিকিৎসা-পত্র করিয়েও লক্ষ্মীর অবস্থার খুব বেশী উন্নতি হ'ল না। বরঞ্চ দু-একটা উপসর্গ নতুন ক'রে দেখা দিল। শ্বশুরবাড়ী তার বরিশাল, বর থাকে রংপুর। দু-জায়গাই করা হ'ল টেলিগ্রাম। গিরিজায়া আঁতুরঘর থেকে আর নড়েন না। মণি বলে—একটু বিশ্রাম নাও মা তুমি। আমি বসছি নয় বাবা বসবেন এখন।

গিরিজায়া হাত সরিয়ে দেন মণির। বলেন—বিরক্ত করিস নে আমায়, যা। এসব তোদের কাজ নয়।

পাড়াপড়শী সকাল-বিকেল ঝাঁকে ঝাঁকে আসেন বেড়াতে। হরি-পিসি বললেন—কাল শুক্রবার, সঙ্কট-তারিণীর ব্রত কর বউ। সব শঙ্কা দূর হয়ে যাবে। খরচও বেশী নয়, কষ্টও নেই কোন। পুরুত-ঠাকুর পুজো ক'রে গেলে এক বেলা ভাতে সেদ্ধ ভাত খাবে।

আরও দু-চার জন প্রৌঢ়াও সেই মতই দিলেন।

পরদিন বেলা এগারটা-বারোটার সময় মণি এসে বললে—যাও মা তুমি, পুরুত-ঠাকুর এসেছেন। আমি সব আয়োজন সাজিয়ে দিয়েছি, তুমি ডুবটা দিয়ে কাপড় ছেড়ে পুজোর কাছে ব'সো গে, যাও।

তাড়াতাড়ি গিরিজায়া স্নান ক'রে এলেন কিন্তু সব কাপড় যে তার আঁতুরঘরের ছোঁওয়া। বাক্সে আর এক-খানা মাত্র কাপড় আছে, মণি বললে—দিদির ওই জ্যাঠাইমার দেওয়া লালপেড়ে শাড়িটা পরো না মা, বাক্সে তুলবো ব'লে আমি ধুয়ে রেখে দিয়েছি।

হরনাথ এসে তাড়া দিয়ে বললেন—কতক্ষণ আর ব'সে থাকবেন পুরুত-ঠাকুর, অন্য বাড়ী পূজা করতে হবে না তাঁকে?

ব্যস্ত হয়ে গিরিজায়া লক্ষ্মীর কাপড়টা প'রেই পূজার কাছে গিয়ে বসলেন। ঘণ্টা বাজিয়ে পুরুত-ঠাকুর পূজা ক'রে চললেন। গিরিজায়ার মন অত্যন্ত উদ্বেল। পূজা-শেষে পুরুত-ঠাকুর বললেন—নাও, প্রণাম ক'রে প্রসাদী ফুল নাও। দুটো দাও নিয়ে মেয়ের মাথায়। সব অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে।

গিরিজায়া গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম দিতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠলেন। পাড়টার দিকে দৃষ্টি পড়তেই লক্ষ্মীর সেদিনের মূর্তিটা তাঁর মনে পড়ে গেল, মনে পড়ল তাঁর নিজের গোপন ইচ্ছা। তারই পাপের ফল কি এ। ছেলে পেলো না প্রাইজ, মেয়েও আজ মরণের মুখে, লুটিয়ে প'ড়ে প্রণাম দিয়ে গিরিজায়া বললেন—ঠাকুর, ক্ষমা ক'রো আমায়। ভাল ক'রে দাও লক্ষ্মীকে, মনু ভাল মত পাস করুক।

প্রণাম দিয়ে উঠতে গিয়ে হঠাৎ গিরিজায়া চোখে আঁধার দেখে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। হা-হা ক'রে উঠলেন পুরুত-ঠাকুর, ছোট দুই ছেলেমেয়ে উঠল চীৎকার ক'রে কেঁদে। বাড়ীময় সাড়া পড়ে গেল। অনেক জল-ঝাপটা, অনেক হাওয়া ক'রে জ্ঞান হ'ল গিরিজায়ার। ডাক্তার এসেছিলেন লক্ষ্মীকে দেখতে, পরীক্ষা ক'রে বললেন—ভয়ের কিছু নয়। ক-দিনের মানসিক দুশ্চিন্তা, এবং অত্যন্ত পরিশ্রমে এমন হয়েছে। বিশ্রাম নিলেই যাবে সেরে।

* * *

দুপুরে ঘুমের পরে গিরিজায়া একটু সুস্থবোধ ক'রে উঠতে যাচ্ছিলেন, হরনাথ মাথার কাছ থেকে বাধা দিয়ে বললেন—উঠো না, উঠো না, ডাক্তার বারণ ক'রে গেছেন।

গিরিজায়া খানিক চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন আছে লক্ষ্মী? মণি, রত্না ওরা কই? খাওয়া-দাওয়া হয়েছে সবার? ওগো কেমন পরীক্ষা দিচ্ছে মনু?

—সব ভাল আছে। কোনো ভয়-ভাবনা ক'রো না। কিন্তু আজ কি ভাতে-সেদ্ধ ভাত না খেলেই চলতো না? এই দুর্বল শরীর, কত বললাম তখন বিশ্রাম নিতে। সব নিজের বুদ্ধির দোষে বিপদ বাধানো।

—বকো আমায় বকো—গিরিজায়া হঠাৎ একেবারে কেঁদে ফেলে বললেন—সব দোষ আমার। কিন্তু মেয়ের কাছে রাতজাগার জন্যে বোকো না। লক্ষ্মীর এমন অবস্থা, বিশ্রাম নেবো আমি কি ক'রে, ব্রত না ক'রে থাকতে যে পারি না। মনু প্রাইজ পেলো না, কোথায় কোন্ বাড়ী দিলে তাকে পাঠিয়ে···আমার কি এক ভাবনা···।

গিরিজায়ার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। হর-নাথের মন ব্যথায় উঠল ভরে। অশিক্ষিত অবুঝ স্নেহ-প্রবণ মা, অজান্তে সন্তানের ক্ষতি ক'রে আপনাকে বলি দিয়ে করে তার প্রায়শ্চিত্ত, করে তার মঙ্গল কামনা। হরনাথ ব্যথিত চিত্তে এগিয়ে এসে নীরবে গিরিজায়ার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন।

খাদ্যসমস্যা ও গো-জাতির উন্নতি-সাধন

রায় বাহাদুর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

বলদ ছাড়া বাংলা দেশে কৃষিকার্য্য চলিতেই পারে না; কিন্তু আমাদের দেশের বলদকে কৃষিকার্য্যের পক্ষে অনুপযুক্ত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; বাংলা দেশে বৎসরে ৩০০ বিঘা জমি চাষ করিবার জন্য প্রায় ৩৬টি বলদের দরকার হয়, কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে এই পরিমাণ জমি চাষের জন্য দশটি বলদের বেশী লাগে না; যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, পঞ্জাব এবং অন্যান্য প্রদেশেও চাষ-আবাদের জন্য বাংলা দেশ অপেক্ষা অল্পসংখ্যক বলদের প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশের দুগ্ধবতী গাভীর অবস্থাও যে কত শোচনীয় তাহাও সকলে জানেন; পৃথিবীর সকল দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের গাইগরু সর্ব্বাপেক্ষা কম দুধ দেয়; আবার ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশের গাইগরু হইতে সর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণ দুধ পাওয়া যায়; এ দেশের গাইগরুর দুগ্ধের পরিমাণ গড়ে দৈনিক এক সেরের বেশী নয়। এ স্থলে ইহাও বলা দরকার যে ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল যুক্ত প্রদেশ ছাড়া বাংলা দেশেই গরুর সংখ্যা সব চেয়ে বেশী—প্রায় আড়াই কোটি; অর্থাৎ আমাদের দেশে বেশীর ভাগই অকেজো গরু। সুতরাং It is not more cattle but better cattle Bengal needs—বাংলা দেশে গরুর সংখ্যা বাড়াইবার প্রয়োজন নাই—যাহাতে উন্নত শ্রেণীর গরুর সৃষ্টি হয় সেই ব্যবস্থাই সর্ব্বাগ্রে করা দরকার। সেই জন্য আমরা যদি খাদ্যসমস্যা অর্থাৎ "ডাল-ভাতে"র সমস্যা সমাধান করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া থাকি তাহা হইলে জমি হইতে "ডাল-ভাত" উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ভাবে জমি কর্ষণের জন্য আমাদিগকে সুস্থ, সবল এবং কর্ম্মঠ বলদের সৃষ্টি করিতেই হইবে। এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে milk is a necessity not a luxury অর্থাৎ দুগ্ধ আমাদের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য, ইহা কেবল ধনী দিগের "বিলাসে"র খাদ্য নহে। দুগ্ধ আমাদের মাংসপেশী গঠন করে, রক্ত পরিষ্কার করে এবং আমাদের শারীরিক ও মানসিক বল জোগায়; বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে ইহার ন্যায় সর্ব্বগুণবিশিষ্ট খাদ্য আর নাই। সুতরাং দেশের সর্ব্বসাধারণ যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ পান করিতে পারেন খাদ্যসমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যবস্থা করাও একান্ত দরকার। Weaker the cattle, feebler the nation—যে দেশের গরু দুর্ব্বল সে দেশের মানুষও দুর্ব্বল; স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ বলিয়াছিলেন "I can dream of a cattle without a nation but I cannot imagine of a nation without a cattle"—মানুষ নাই অথচ গরু আছে এই কথা আমি ভাবিতে পারি, কিন্তু গরু নাই মানুষ আছে ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না। আমাদের জাতীয় জীবনে গরুর প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তাহা ইহা হইতেই সহজে উপলব্ধি করা যায়।

মোটামুটি ভাবে বলিতে পারা যায় যে আমাদের দেশের গরুর এইরূপ শোচনীয় অবস্থার কারণ (১) রুগ্ন, দুর্ব্বল, অপরিপুষ্ট এবং অপরিণত বয়স্ক ষাঁড়ের দ্বারা গাইগরুর প্রজনন, (২) উপযুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, (৩) অস্বাস্থ্যকর গোয়ালঘর, (৪) যত্নের অভাব, (৫) সংক্রামক রোগ নিবারণের প্রতি ঔদাসীন্য ইত্যাদি। ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না যে আমরা গরুকে যেমন অনাদর করি এবং আমরা গরুর প্রতি যেরূপ উদাসীন পৃথিবীর মধ্যে আর কোন দেশের লোক গরুকে তেমন অনাদর করেন না কিম্বা গরুর প্রতি তেমন অমনোযোগী নন্।

উন্নত শ্রেণীর ষাঁড়ের দ্বারা গাই গরুর প্রজনন

বাপ-মা সবল ও সুস্থ হইলে তাহাদের ছেলেমেয়েরাও সবল ও সুস্থ হয়—এ কথা মানুষের বেলাতেও যেমন সত্য অন্য কোন জীবজন্তুর বেলাতেও ঠিক সেই রকমই সত্য। সুতরাং গো জাতির উন্নতির জন্য প্রথমতঃ সবল সুস্থ এবং তেজালো ষাঁড়ের দ্বারাই গাইগরুর প্রজনন-কার্য্য করান সর্ব্বাগ্রে দরকার; গাইগরুও পরিণতবয়স্ক, সবল ও নীরোগ হওয়া আবশ্যক। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের গবেষণা ও পরীক্ষার ফল হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে পশ্চিম দেশ হইতে আনীত ষাঁড়ের সহিত দেশী গরুর সঙ্গম ব্যতীত আমাদের দেশের গো-জাতির উন্নতি বিধান কোনমতেই সম্ভব নহে। গত চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রায় দুই হাজার পঞ্জাবের

হরিয়ানা ষাঁড় সরবরাহ করিয়াছেন; প্রায় সকল জেলাতেই হরিয়ানা ষাঁড়ের দ্বারা দেশী গাইগরুর প্রজনন কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে এবং ইহার ফলে যে সকল বাছুর জন্মিয়াছে তাহাদের মধ্যে হরিয়ানা ষাঁড়ের প্রকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান আছে; ইহাদের মধ্যে বকনা বাছুরগুলি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দুগ্ধবতী গাভী এবং এঁড়ে বাছুরগুলি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লাঙ্গল টানার উপযুক্ত বলদে পরিণত হইয়াছে। হরিয়ানা ষাঁড়ের দ্বারা দেশী গাইগরুর যে বাছুর জন্মগ্রহণ করে তাহাতে অৰ্দ্ধেক হরিয়ানা ষাঁড়ের রক্ত এবং অৰ্দ্ধেক দেশী গরুর রক্ত থাকে; এইরূপ অৰ্দ্ধরক্তমিশ্রিত দেশী গাভীর সহিত আবার খাঁটি হরিয়ানা ষাঁড়ের সঙ্গমে যে বাছুর উৎপন্ন হয় উহাতে তিন ভাগ হরিয়ানা ষাঁড়ের রক্ত এবং এক ভাগ দেশী গরুর রক্ত থাকে; এই ভাবে উৎপাদিত গাভীর সহিত আবার খাঁটি হরিয়ানা ষাঁড়ের সঙ্গমের দ্বারা যে বাছুর উৎপন্ন হয় তাহাতে সাত ভাগ হরিয়ানা ষাঁড়ের রক্ত ও এক ভাগ মাত্র দেশী গরুর রক্ত থাকে এবং শেষোক্ত ⅞ ভাগ হরিয়ানা ষাঁড়ের রক্তবিশিষ্ট বকনা বাছুরগুলি দুগ্ধবতী গাভী হিসাবে এবং এঁড়ে বাছুরগুলি লাঙ্গলটানা বলদ হিসাবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।



টি বালিকা দুধ দুইতেছে

গরুর পুষ্টিকর খাদ্য

ধানের বিচালি বা খড় আমাদের দেশের গরুর প্রধান খাদ্য; কিন্তু শুষ্ক বিচালির মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্যের কোন উপাদান নাই বলিলেই চলে; গরুকে কেবলমাত্র এই আহার দিলে বলদের লাঙ্গলটানার এবং গাইগরুর উপযুক্ত পরিমাণ দুধ দিবার শক্তি অর্জ্জন করা দূরে থাকুক, কেবল মাত্র বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন তাহাও তাহারা পায় না। আরও দুঃখের কথা এই যে সাধারণতঃ বিচালিও কেহ যত্ন করিয়া রাখেন না; উহাকে এলোমেলো ভাবে গাদা বা পালা করিয়া রাখা হয় এবং উহার মধ্যে বৃষ্টির জল ঢুকিয়া উহাকে একেবারে খাদ্যের অনুপযুক্ত করিয়া তোলে। বিচালি এইরূপ ভাবে রাখা উচিত যাহাতে উহার মধ্যে জল প্রবেশ করিতে না পারে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার যে, গরুর খাদ্যের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ কাঁচা ঘাসের ব্যবস্থা না করিয়া কেবলমাত্র উন্নত শ্রেণীর ষাঁড়ের দ্বারা দেশী গাই-গরুর সঙ্গম করাইয়া গো-জাতির উন্নতির চেষ্টা করিলে সে চেষ্টায় বিশেষ কিছু ফল হইবে না. সুতরাং গো জাতির উন্নতির চেষ্টার জন্য উন্নত শ্রেণীর ষাঁড়েরও যেমন দরকার, উহাদের খাদ্যের জন্য কাঁচা ঘাসের ব্যবস্থা করাও তেমন আবশ্যক। আমাদের সাধারণ শস্যের চাষের মধ্যে মধ্যে গরুর খাদ্যের জন্য অনেক প্রকারের ঘাস উৎপন্ন করা যাইতে পারে; ইহাদের মধ্যে নেপিয়ার ঘাসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; ইহা একবার লাগাইলে পাঁচ-ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ইহাকে কাটিয়া গরুকে খাওয়াইতে পারা যায়। নেপিয়ার ঘাসের চাষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

মাটি—ডাঙ্গা জমি গভীর ভাবে লাঙ্গল দিয়া ভাল করিয়া গুঁড়া করিয়া লইতে হয়।

সার—পলিমাটিতে বিঘা প্রতি পঞ্চাশ-ষাট মণ গোবর বা পচা কচুরিপানার সার এবং লাল মাটিতে ইহা ছাড়া তিন-চার মণ চুণ, এক মণ হাড়ের গুঁড়া এবং তিন চার মণ কচুরিপানার ছাই প্রয়োগ করিলে ভাল হয়।

রোপণের সময়—ইহা প্রধানতঃ মাটির রসের উপর

নির্ভর করে; মোটামুটি ভাদ্র-আশ্বিন মাস হইতে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস পর্য্যন্ত রোপণ করা চলে।

রোপণের প্রণালী—ইহার ডাঁটা আখের মত খণ্ড খণ্ড করিয়া তিন ফুট অন্তর লাইনে প্রতি এক ফুট তফাতে তফাতে একটি করিয়া খণ্ড রোপণ করিয়া ঝুরা মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। বিঘা প্রতি সাড়ে-তিন-চার হাজার খণ্ড লাগে।

ফলন—ইহা একটি স্থায়ী ঘাস এবং ঘাস সাড়ে-তিন ফুট লম্বা হইলে বর্ষাকালে এক মাস অন্তর মাটি ঘেসিয়া কাটিতে হয়; প্রতিবার কাটার পর সার প্রয়োগ করা উচিত। বৎসরে তিন-চারি বার কাটিলে বিনা জল সেচনে বিঘা প্রতি দেড়-শ-ত্ব'শ মণ ঘাস পাওয়া যায়। জল সেচন করিলে ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ ঘাস পাওয়া যাইতে পারে।

নেপিয়ার ঘাস ব্যতীত কাঁচা ঘাসের জন্য জোয়ার, ভুট্টা, বজরা, বরবটী প্রভৃতিরও চাষ করা যাইতে পারে।

জোয়ার—বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত বোনা যায়; বিঘা প্রতি আট-দশ সের বীজ লাগে; তিন-চার মাসের মধ্যে কাটিয়া গরুকে খাওয়ান যাইতে পারে। বিঘা প্রতি এক-শ-দেড়-শ মণ ঘাস পাওয়া যায়। অনাবৃষ্টিতে আক্রান্ত বা 'মরকুণ্ডে' (Stunted) গাছ গরুকে খাইতে দেওয়া উচিত নয়, কেন না এই সকল গাছে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ থাকে।

ভুট্টা—ইহাও বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বোনা যায়; বিঘা প্রতি ইহার বীজের পরিমাণও দশ-বার সের এবং ফলনও প্রায় সমান। দুই মাসের মধ্যেই কাটিয়া গরুকে খাওয়ান যায়।

বজরা—চৈত্র হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলে; বিঘা প্রতি দুই-তিন সের বীজ লাগে; ইহার ফলনও প্রায় এক-শ মণ হয়; দেড়-দুই মাসের মধ্যে কাটিয়া গরুকে খাওয়ান যায়।

বরবটী—ফাল্গুন হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বোনা যায়; বিঘা প্রতি ছয়-সাত সের বীজ লাগে; ফলনও প্রায় এক-শ মণ; দুই মাস হইতে আড়াই মাসের মধ্যে কাটিয়া গরুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। 'গ্রয়েট' নামক এক জাতি হইতে সব চেয়ে বেশী ফলন পাওয়া যায়। এক জমিতে ভুট্টার সঙ্গে বুনিলে ভাল হয়।

পরিণতবয়স্ক ষাঁড়, বলদ, গাইগরুকে দৈনিক তিন-চার সের খড়, দশ-পনর সের কাঁচা ঘাস, এক সের খইল, ডালের ভুষি বা কলাই এক সের, লবণ এক ছটাক এবং খনিজ পদার্থ (কর্ণ ফ্লাওয়ার) এক ছটাক খাইতে দেওয়া উচিত। বিচালি যদি না দেওয়া হয় পনর-কুড়ি সের কাঁচা ঘাস দেওয়া দরকার। বাছুরের খাদ্য এইরূপ হওয়া উচিত—দুই সের বিচালি, পাঁচ-দশ সের কাঁচা ঘাস, আধ সের খইল, আধ সের ডালের ভুষি বা কলাই, আধ ছটাক লবণ এবং আধ ছটাক খনিজ পদার্থ। বাছুরের আড়াই মাস বয়স পর্য্যন্ত গাইগরুর দুইটি বাঁটের দুধ বাছুরের খাইবার জন্য রাখিয়া দেওয়া উচিত। আড়াই মাস হইতে ছয় মাস বয়স পর্য্যন্ত একটি বাঁটের দুধ রাখিয়া দিলেই চলিবে। বলদের খুব পরিশ্রমের সময় উহাকে আরও বেশী পরিমাণ কাঁচা ঘাস ও খইল দেওয়া প্রয়োজন; গাইগরু যখন দুধ দেয় তখন উহাকেও অতিরিক্ত খাদ্য দিতে হইবে; তিন সেরের অধিক দুধ দিলে প্রতি দেড় সের দুধের জন্য গমের ভুষি, ছোলা, ভুট্টা বা যব ভাঙিয়া সমপরিমাণে মিশাইয়া আধ সের হারে দেওয়া উচিত। প্রসবের পর গাইগরুর বিশেষ যত্ন লইতে হয়; এই সময়ে উহাকে গরম গরম গমের ভুষির সহিত গুড় মিশাইয়া খাওয়াইতে পারিলে উহার স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং দুধ দিবার শক্তি বাড়ে; একটি পাত্রে দেড় সের হইতে দুই সের গমের ভুষি ও আধ সের হইতে তিন পোয়া গুড় রাখিয়া উহাতে ফুটন্ত জল ঢালিতে হয়; পাত্রের মুখটি একটি ছালা দিয়া আঁটিয়া দিতে হয়, যেন জলের বাষ্প উড়িয়া না যায়। পরে উহা ঠাণ্ডা হইলে প্রয়োজন মত গাইগরুকে খাওয়াইতে হয়।

চব্বিশ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া সেই ভিজা খইল গরুকে খাইতে দেওয়াই প্রশস্ত; ডাল-কলাইও প্রথমে ভাঙিয়া আট হইতে বার ঘণ্টা উহাকে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তবে গরুকে খাইতে দিলে ভাল হয়। লবণ ও খনিজ পদার্থ খইল ও ভুষির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। খড় বা ঘাস অন্ততঃ এক ইঞ্চি টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া গরুকে খাইতে দেওয়া উচিত। শুকনা খড় ও কাঁচা ঘাস একসঙ্গে মিশাইয়া খাইতে দিতে হয়; শুকনা খড় জল দিয়া সামান্য ভিজাইয়া লওয়া দরকার। গরুকে একত্রে খাইতে না দিয়া পৃথক্ পৃথক্ খাইতে দেওয়া উচিত; দিনে দুই বার খাইতে দেওয়া ভাল—এক বার বেলা এগারটার সময় আর এক বার অপরাহ্ণ পাঁচটার সময়। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক গরুর প্রায় এক মণ পানীয় জলের দরকার; সাধারণতঃ দিনে তিন বার জল খাওয়ানোর প্রয়োজন হইতে পারে; জল টাট্‌কা ও বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

উপযুক্ত গোয়াল ঘর

আমাদের গোয়ালঘরের অবস্থা যে কি শোচনীয় তাহা বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই ; স্যাঁতসেঁতে মাটির উপর আলো-বাতাসহীন ঘরে গোবর ও গোচনার মধ্যে (পূর্ব্ব বঙ্গে বর্ষার সময় জল ও কাদার উপর) দিনের পর দিন গরুকে দাঁড়াইয়া এবং শুইয়া থাকিতে হয় ; এইরূপ অবস্থায় রাখিলে গরু যে সবল সুস্থ থাকিতে পারে না তাহা আমরা এক বার ভাবিয়াও দেখি না। গোয়ালঘর বেশ প্রশস্ত হওয়া দরকার, যেন প্রত্যেক গরু স্বচ্ছন্দে শুইতে পারে এবং 'জাবে'র গামলার জন্য যেন তাহাদের শুইতে কষ্ট না হয়। সহজে উঠাইয়া দেওয়া যায় গোয়ালঘরের চারি ধারে এইরূপ ঝাঁপের ব্যবস্থা থাকা দরকার এবং ঝড়, বৃষ্টি ও অতিরিক্ত শীতের সময় ঝাঁপগুলি ফেলিয়া দেওয়া উচিত, অন্য সময়ে উহাদের উঠাইয়া রাখাই প্রশস্ত। যদি জন্তুজানোয়ারের কোন ভয় না থাকে এবং আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহা হইলে দিনরাত খোলা জায়গায় গরু রাখাই ভাল ; তবে রৌদ্রের সময় ছায়ায় রাখা উচিত। প্রত্যেক দিন সকালে গোয়ালঘরের গোবর ও অন্যান্য আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া দূরে একটি গর্ত্তে উহাদের সঞ্চিত করাই বিধেয় ; গর্ত্তের উপরে একটি চালা থাকা দরকার, যেন বৃষ্টির জলে কিম্বা রৌদ্রে গোবরের সার পদার্থ নষ্ট হইয়া না যায়। গোয়ালঘরের মেঝে যদি পাকা না হয়, মাটির হয়, এবং মেঝেতে যদি গর্ত্ত হইয়া যায় তাহা হইলে কয়েক দিন অন্তর গর্ত্তগুলি ভরাট করিয়া দিতে হইবে। গোয়াল ঘরের মেঝের এক দিক একটু ঢালু করিয়া ঢালুর দিকে একটি নালা তৈয়ার করিয়া উহার মুখে একটি গামলা রাখিয়া দিলে গরুর চোনা মেঝে গড়াইয়া নালা দিয়া ঐ গামলায় পড়িবে ; এইরূপে রক্ষিত গোচনা গোবরের গর্ত্তে ফেলিলে উৎকৃষ্ট সার পাওয়া যাইবে ; গোচনা অতি উত্তম সার।

গরুর যত্ন

সর্ব্বপ্রকারে গরুর যত্ন করিতে হইবে ; প্রত্যেক দিনই নিয়মিত ভাবে গরুকে স্নান করানো ও উহাদের গা. মাজিয়া দেওয়া উচিত ; গরুর দেহের উপর মাছি বসিলে উহাদের স্বাস্থ্যের হানি হয়, নিয়মিত ভাবে স্নান করাইলে মাছির উপদ্রব অনেক কম হয়। আঁঠালী গরুর স্বাস্থ্যের খুবই ক্ষতি করে এবং নানা রকমের রোগের বীজাণু বহন করিয়া আনে ; গরুর দেহে আঁঠালী দেখিলেই উহা



দেশী গাইগরু

তুলিয়া দেওয়া দরকার। বাজারে আঁঠালী-নিবারক অনেক ঔষধ পাওয়া যায় ; সপ্তাহে এক বার জলের সহিত উক্ত ঔষধ মিশাইয়া সেই জলের দ্বারা গরুর দেহ ধুইয়া দেওয়া উচিত। প্রসবের সময় এবং গরু যখন দুধ দেয় তখন তাহার পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিতে হইবে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, "When the cow is freed of the ticks and other pests sucking her blood she responds to it by increasing her milk flow up to 33 p. c."

(গাই গরুর দেহ হইতে 'আঁঠালী' কিম্বা অন্যান্য রক্তশোষণকারী কীট-পতঙ্গ মাছি ইত্যাদি বাছিয়া ফেলিয়া দিলে তাহার দুগ্ধের পরিমাণ শতকরা ৩৩ ভাগ বাড়ে।) পূর্ব্বকালে বাড়ীর মহিলারাই গরুর সকল প্রকার পরিচর্য্যা করিতেন এবং দুগ্ধও দোহন করিতেন। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা তাঁহাদের এই কার্য্যে সাহায্য করিত। দুগ্ধ দোহন করিবার সময় গুন গুন সুরে গান গাহিবার প্রথাও ছিল। ইহা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে বাল্যকালে লেখক নিজ হস্তে গরুর সকল প্রকার পরিচর্য্যা করিয়াছেন, এবং তাহাতে তিনি যে আনন্দ পাইয়াছিলেন তাহা এখনও তাঁহাকে আনন্দ দিতেছে। গো-দোহনের সময় একটি বালিকার গান এখনও তাঁহার মনে আছে—

"দুধ দাও মা, দুধ দাও মা, ধবল সুধার ধারা।
দুধ না পেলে দুধের ছেলে কেঁদে হবে সারা।"

সম্প্রতি গরুর সম্বন্ধে একটি পুস্তক পড়িয়া লেখক জানিতে পারিয়াছেন যে, "She responds to the tunes of the music in the tune of 16% of milk increment অর্থাৎ দুধ দোহন করিবার সময় গুন গুন সুরে গান গাহিলে শতকরা ১৬ ভাগ দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

সংক্রামক রোগ নিবারণের উপায়

এই সকল রোগের মধ্যে গো-বসন্ত, ক্ষুরুয়া বা এঁশে, তড়কা, বাদলা প্রভৃতি প্রধান। সংক্রামক রোগে গরুর মৃত্যুর হার খুবই বেশী; কিন্তু সংক্রামক রোগগুলি সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা থাকিলে এবং সময়মত সাবধানতা, যত্ন এবং রোগ-নিবারক উপায়-সমূহ অবলম্বন করিলে এই সকল রোগের দ্বারা মৃত্যুর হার অনেক পরিমাণে হ্রাস করা যাইতে পারে। প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে সংক্রামক রোগগুলির বিষ বাতাস হইতে প্রশ্বাস দ্বারা, খাদ্য এবং পানীয় হইতে মুখের দ্বারা এবং মশা, ডাঁশ প্রভৃতির দংশনের দ্বারা প্রথমে অতি অল্প পরিমাণে গরুর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং পরে ঐ বিষ শরীরের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে রোগ এবং তৎপর মৃত্যু আনয়ন করে। আবার সংক্রামক রোগাক্রান্ত পশুর মল, মূত্র, লালা, শ্বাস এবং চক্ষু ও নাসিকা হইতে নিঃসৃত স্রাব প্রভৃতির দ্বারা উক্ত বিষ উহার শরীর হইতে বাহিরে আসে এবং রোগাক্রান্ত পশু যে খাদ্য খায়, যেখানে চরে, যে পাত্রে খাদ্য খায়, যে জল পান করে, যে স্থানে থাকে সবই রোগের বিষে ভরিয়া যায়; অন্য সুস্থ পশু সেইখানে থাকিলে, সেইখানে চরিলে, সেই পাত্রে বা সেই খাদ্য খাইলে রোগের বিষ তাহারও শরীরে প্রবেশ করে।

নিম্নে সংক্রামক রোগ নিবারণের কয়েকটি উপায়ের কথা বলা হইল :—

(১) মেলা ও হাট হইতে নূতন খরিদ করা কিংবা ফেরৎ আনা পশুর দ্বারাই সাধারণতঃ প্রথমে কোন গ্রামে ছোঁয়াচে রোগ ছড়াইয়া পড়ে; সেই জন্য উহাদিগকে অন্ততঃ এক মাস কাল পৃথক্ ভাবে রাখা দরকার।

(২) পীড়িত পশুগুলিকে দূরে পৃথক্ ভাবে বেড়ার দ্বারা আবদ্ধ স্থানে রাখা উচিত, যেন উহারা অন্য স্থানে যাইতে না পারে।

(৩) পীড়িত পশু যে খাদ্য খায় তাহার কোন অংশ সুস্থ পশুকে খাইতে দেওয়া কখনই উচিত নয়; এমন কি যে সকল লোক পীড়িত পশুর পরিচর্য্যা করেন, ফিনাইল-জলে হাত-পা না ধুইয়া সুস্থ পশুর নিকট তাঁহাদের যাওয়া উচিত নয়। যে স্থানে পীড়িত পশু থাকে সেই স্থানে কুকুর, মুরগী প্রভৃতি পশুপক্ষীকে যাইতে দিলে রোগের বিষ তাহাদের দ্বারাও ছড়াইয়া পড়িবে। মাছি, মশা, ডাঁশ ইত্যাদি দ্বারাও সংক্রামক রোগের বিষ ছড়াইয়া পড়ে, সেই জন্য খড়, কুটা ইত্যাদি পোড়াইয়া ধোঁয়া দিলে উহাদের বিস্তৃতি অনেকটা নিবারণ করা যাইতে পারে।

(৪) পীড়িত পশু কর্ত্তৃক ব্যবহৃত খড়, কুটা, খাদ্যাবশেষ, গোময় ইত্যাদি একত্রে জড় করিয়া পুঁতিয়া ফেলা আবশ্যক; গর্ত্ত ভরাট করিবার সময় উহার উপর চূণ ছড়াইয়া দিলে আরও ভাল হয়, পীড়িত পশুগুলি যে স্থানে থাকে তাহার উপরিভাগের খানিকটা মাটি চাঁচিয়া গর্ত্তে পুঁতিয়া ফেলা দরকার।

(৫) পীড়িত পশুর মৃতদেহ চামড়া সহ পুঁতিয়া বা পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

(৬) গ্রামে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট কিংবা সবডিভিসনাল অফিসারকে জানাইলে সরকারী পশুচিকিৎসক বিনা খরচে আসিয়া বিনা খরচে সুস্থ গরুগুলিকে রোগ-প্রতিষেধক টিকা দিয়া যাইবেন ও অন্যান্য ব্যবস্থা করিবেন। টিকা দিলে গরুর কাজের কোন ব্যাঘাত হয় না।

(৭) গবাদি পশুর সাধারণ রোগ হইলে স্থানীয় পশু-চিকিৎসককে জানাইলে ঔষধ এবং উপদেশ দুইই পাওয়া যাইবে।

আলোচনা

বঙ্গীয়প্রাদেশিকশব্দ-কোষ

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়প্রাদেশিকশব্দ-কোষ-সঙ্কলনের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আদেশ সাহিত্যিকমণ্ডলে প্রচার করিবার নিমিত্ত জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহাতে কোষ-সঙ্কলনে বিশ্বভারতীর অভিপ্রায় জানিয়া অধ্যাপক শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ-সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে সাহিত্যিকগণের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিয়া আমাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ঐ প্রবন্ধ-পাঠে জানা যায়, 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে'র জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলনের উদ্যোগ-আয়োজন চলিয়া আসিতেছে এবং ঐ সকল সাময়িক উদ্যোগের ফলে সংগৃহীত শব্দসমূহও মধ্যে মধ্যে পুস্তকাকারে খণ্ডে খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ ইহার পরে এ বিষয়ে একবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু সে উদ্যোগ সফলতায় পরিণত হয় নাই। তবে বোধ হয়, ঐ উদ্যোগেরই ফলে বিদ্যাসাগর-কৃত 'শব্দ-সংগ্রহ' এবং ঢাকা, ময়মনসিং, রঙ্গপুর, মালদহ, পাবনা, যশোহর, খুলনা, নদীয়া, চব্বিশ-পরগনা ইত্যাদি প্রদেশের গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন পরিষৎ-পত্রিকায় খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিষদের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকগণের পুনঃপুনঃ প্রচেষ্টার ফলে কথাভাষার শব্দ-সংগ্রহ-কার্য্য বেশ কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আছে। এক্ষণে কবিবরের এই অন্তিম আদেশে বিশ্বভারতীর উদ্যোগ যাহাতে পূর্ব্ববৎ অসম্পাদিত অবস্থায় পর্য্যবসিত না হয়, তদ্বিষয়ে সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং বঙ্গীয় সাহিত্যিক-গণের সমবেত প্রচেষ্টার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। ইতঃপূর্ব্বে কুচবিহার ও শ্রীহট্টের দুই জন সাহিত্যিক পণ্ডিতকর্ম্মী বিশ্বভারতীকে শব্দ-সঙ্কলন-বিষয় পত্রে জানাইয়াছেন।

এই শব্দ-কোষ কি প্রণালীতে লিখিতে হইবে এবং কি-প্রকার গ্রাম্য-শব্দ ইহার জন্য সংগ্রহ করিতে হইবে,—এ বিষয় কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তরে অভিধানের লেখন-প্রণালী প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

(১) বাঙলা শব্দ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—প্রাকৃত বাঙলা ও দেশী বাঙলা শব্দ। সংস্কৃত হইতে তদ্ভব প্রাকৃতের অপভ্রংশ আকৃতি প্রাকৃত বাঙলা শব্দ। এই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শনার্থ, মূল সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমিক পরিবর্ত্তনে পালি ও প্রাকৃতের রূপ এবং সুবিধামত তদনুযায়ী হিন্দী, পঞ্জাবী, মরাঠী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার অপভ্রংশ শব্দের রূপ লিখিতে হইবে। যেমন, সংস্কৃত 'পার্শ্ব' হইতে প্রাকৃত 'পস্স', বাঙলা 'পাশ'; এইরূপ, 'শীর্ষ' হইতে প্রাকৃত 'সিস্স', বাঙলা 'সীস' 'শীষ'। দেশী শব্দের ব্যুৎপত্তিস্থলে, হেমচন্দ্রের দেশী নামমালায় যদি ঐ শব্দ ধৃত হইয়া থাকে, তবে তাহাই দিতে হইবে। তদভাবে কেবল 'দেশী শব্দ' বলাই ভাল। সম্ভব হইলে, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি দ্রবিড়ীয় ভাষার সমার্থক শব্দ যোজনা করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন বাঙলা ধ্বন্যাত্মক ও ভাবাত্মক শব্দ আছে। যেমন, 'ঠনঠন', 'টনটন' ইত্যাদি।

(২) বাঙলায় প্রচলিত আরবী, ফারসী, ইংরেজী, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষার শব্দের সহিত সেই সেই ভাষার বিশুদ্ধ মূল শব্দ দিতে হইবে।

(৩) শব্দের অর্থ—প্রথমে বাঙলা শব্দের মূলগত অর্থ, পরে গৌণার্থ ও তাহার পরে ব্যাপক অর্থ। যেমন, বাঙলা 'শুক্ত' বা 'শুক্তা' শব্দ; ইহার মূলশব্দ 'শুক্তিক্ত', তদনুসারে অর্থ 'শুক্তিক্তপত্র' অর্থাৎ 'শুখনা তিত পাটের পাতা বা 'না'লতা', ইহা মূলগত বা মুখ্য অর্থ; পরে গৌণার্থে 'না'লতার তিক্তব্যঞ্জন', অর্থাৎ 'না'লতাপাতার শুক্তা' ও ইহার পরে ব্যাপক অর্থে, নিম-পলতা প্রভৃতির শুখনা বা কাঁচা পাতার তিক্তব্যঞ্জন-মাত্রও 'শুকতা'।

কবিকঙ্কণে যে 'শুকুতার পাত' (১৯৮ পৃষ্ঠ), 'শুকুতার পাত,' 'শুক্তা পাতা' (২৪৯ পৃষ্ঠ) বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই শুক্তিক্তপত্র বা নালতাপাতা। এইরূপ সম্ভব হইলে, শব্দের মুখ্যার্থ গৌণার্থ ও ব্যাপক অর্থ লিখিতে হইবে।

(৪) শব্দের অর্থসমর্থনের নিমিত্ত প্রাচীন ও আধুনিক বাঙলা ভাষার প্রসিদ্ধ কবি ও লেখকের গ্রন্থ হইতে শিষ্টপ্রয়োগ উদ্ধৃত করিতে হইবে। ভাষায় প্রচলিত 'প্রবচন' এবং লোকমুখে প্রচলিত 'লৌকিক বাক্য' শিষ্টপ্রয়োগের কার্য্য করে; সম্ভব হইলে, তাহারও প্রয়োগ করিয়া অর্থ সমর্থন করিতে হইবে। যেমন, প্রবচন—'উন' (বা উনু) ভাতে দুন (বা দুনু) বল। ভরা ভাতে রসাতল। এ স্থলে 'উন' শব্দের অর্থ 'কম, পূর্ণতার কিছু কম'; এই প্রবচন 'উন' শব্দের ঐ অর্থেরই সমর্থক। প্রবচনের অভাবে লৌকিক বাক্য, যেমন—'গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল।' এখানে এই বাক্য 'মোড়ল' শব্দের অর্থের সমর্থক। ঐ তিনের অভাব হইলে, শব্দের প্রচলিত অর্থই দিতে হইবে।

(৫) বাঙলার ধাতু প্রায়ই তদ্ভব প্রাকৃত ধাতু হইতে উৎপন্ন; তদ্ভিন্ন শব্দ হইতে উৎপন্ন নামধাতুও আছে। প্রাকৃত বাঙলা ধাতুর ব্যুৎপত্তিতে সংস্কৃত ধাতু হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে পালি প্রাকৃত হিন্দী মরাঠী প্রভৃতি ভাষার তদর্থক অনুরূপ ধাতু দিতে হইবে। যেমন, বাঙলা 'কর' ধাতু, ইহার সংস্কৃত ধাতু 'কৃ,' হিন্দী মারাঠী গুজরাটী মৈথিলী ধাতু 'কর,' অসমীয়া ধাতু 'কর্'। নামধাতু 'হাতা,' 'হাত' হইতে উৎপন্ন; প্রয়োগ 'হাতাম,' 'হাতাইয়া' ইত্যাদি। এইরূপ 'কাতর' হইতে ধাতু 'কাতরা;' প্রয়োগ 'কাতরান।'

(৬) শব্দের বিন্যাসে বর্ণক্রম—বাঙলার বর্ণমালায় যেরূপ স্বর ও ব্যঞ্জনের পাঠক্রম আছে, শব্দকোষে সেইরূপ বর্ণানুক্রমে শব্দ বিন্যাস করিতে হইবে। ং ঃ ঁ—এই তিনটি স্বরাশ্রিত, সুতরাং পদবিন্যাসে স্বরবর্ণের পরেই ইহাদের স্থান সঙ্গত। যেমন, অ আ ই ঈ...ঔ অং অঃ অঁ ক খ গ ইত্যাদি। দুই বর্ণের শব্দে ঐ নিয়মে অ অঅ অআ ...অও অঅং...অক অকা অকি ইত্যাদি; (ব্যঞ্জনাদি শব্দে) ক কআ কই...কঔ কং কঃ কঁ কক কক ককা ককি ইত্যাদি।

(৭) বানান—প্রাকৃত বাঙলা শব্দের বানান এক বিষম সমস্যা। প্রাচীন বা আধুনিক পুস্তকে, প্রবন্ধে মাসিক পত্রিকাদিতে এক শব্দেরই বিভিন্ন বানান দেখা যায়। এরূপ স্থলে, তদ্ভব প্রাকৃত হইতে যে সকল বাঙলা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, সংস্কৃতানুসারে যথাসম্ভব বর্ণ ঠিক রাখিয়া তাহাদের বানান করিলে অনেক স্থলে বানান-সমস্যার মীমাংসা হয়।

পুস্তকে ধৃত শব্দের পক্ষে ধৃত পাঠ অবিকল লিখিয়া পরে পূর্ব্ববৎ সংস্কৃতানুসারে বানান লিখিলে ভাল হয়। যেমন, 'সজ্ঞান' হইতে 'সেয়ানা,' 'শয্যা' হইতে 'শেজ,' 'স্বপ' ধাতু হইতে 'সু' ধাতু, সংস্কৃতানুযায়ী; বৈষ্ণবসাহিত্যে 'কাঞ্চনী' হইতে' কাঁচনী,' 'দৃষ্টি' হইতে 'দিঠি' বা 'দীঠি' শব্দ সংস্কৃতানুযায়ী। ফারসী 'যখ'নী' হইতে 'আখনী,' খু'শী' হইতে খুশী' ('খুসী' নহে) মূলানুযায়ী।

(৮) বাঙলায় 'এক' 'এত' ইত্যাদির 'এ'-কার আড়ে উচ্চারিত হয়। প্রাচীন বাঙলায় এরূপ স্থলে 'য্া' দ্বারা ঐরূপ উচ্চারণ সূচিত হইয়াছে। যেমন, 'অ্যাক' 'অ্যাকে অ্যাকে' ইত্যাদি। তদনুসারে 'এক' (এ্যাক), 'এত' (এ্যাত) —এইরূপ লিখিলে ভাল হয়।

(৯) উচ্চারণ—বাঙলা শব্দের উচ্চারণ শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই জানা আছে। দেশবিশেষে উচ্চারণ কিছু পৃথক আছে, সত্য, কিন্তু অভিধানে কোন এক বিশিষ্ট দেশের ভাষা প্রমাণরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত, নচেৎ গ্রন্থবাহুল্যের সম্ভাবনা। অতএব প্রত্যেক শব্দের পরে তাহার উচ্চারণ-প্রকার না লিখিলে অভিধানের বিশেষ অঙ্গহানি হয় বলিয়া মনে হয় না। তবে, যে সকল শব্দের উচ্চারণগত পার্থক্যে অর্থভেদ হয়, অথবা যে শব্দ সাধারণের তত পরিচিত নহে, তাহাদেরই পরে উচ্চারণপ্রকার লিখিলে ভাল হয়, সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যেমন, 'মত' (মত), 'মত' (মোতো) ইত্যাদি।

১০। প্রাদেশিক শব্দসঙ্কলনে গ্রহণবর্জ্জন-সম্বন্ধে কোন নিয়ম করা যায় বলিয়া মনে হয় না। ভদ্র ভদ্রেতর, অর্থাৎ সাধারণ লোক যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে, তাহারই শব্দ এই অভিধানের বিষয় হওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন, যে সকল শব্দের ব্যবহার পূর্ব্বে ছিল, ক্রমে কালাতিপাতের সঙ্গে সঙ্গে কচিৎ কদাচিৎ তাহাদের প্রয়োগ হয় অথবা প্রয়োগই হয় না, সেই সকল শব্দ সংগৃহীত না হইলে, ভাষাতত্ত্বের সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণ হইবে না; অতএব ঈদৃশ অপ্রচলিত বা বিরলপ্রয়োগ শব্দ পরিত্যক্ত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

১১। শব্দের সহিত যদি কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত, উপাখ্যান, সামাজিক আচার-ব্যবহার বা সভ্যতা অথবা ঘটনাবিশেষের সংস্রব, থাকে, তাহা হইলে ঐ শব্দের সহিত তাহার বিবৃতি দিতে হইবে, নচেৎ ঐ সকল শব্দ নিরর্থক ও নীরস হইয়া পড়িবে। যেমন, 'দশচক্র,' শব্দে 'দশচক্রে ভগবান্ ভূত', 'যাঁহা' শব্দে 'যাঁহা বায়ান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন' ইত্যাদি। দ্র 'দশচক্র', 'যাঁহা' (বঙ্গীয়শব্দকোষ)।

১২। দেশবিশেষে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা গুল্ম তৃণ ফল পুষ্প, মৎস্যাদি জলজন্তু, সর্পাদি সরীসৃপ, ধান্য মুদ্গ মসূরাদি শস্য—ইহাদের নামের পার্থক্য আছে। ঐ সকলের নাম সংগ্রহ করিয়া, জানা থাকিলে, তাহাদের সহিত অন্য দেশে তাহাদেরই নামান্তর দিতে পারিলে তত্তদ্বিষয়ে পরিচয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। গাড়ী পালকী দোলা ডুলী, তাঁত, নৌকাদি জলযান—ইহাদের অবয়ববাচক শব্দ, কৈবর্ত্ত জেলে বাগদী প্রভৃতি মৎস্যব্যবসায়ীর মৎস্য ধরার নানা প্রকার জাল ও বাঁশের যন্ত্রের আকৃতিগত নানাবিধ নাম অভিধানের বিষয় হইবে। এতদ্ভিন্ন দেশবিশেষে বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ের পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন করা সংগ্রাহকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সকল বিষয়ে খুটিনাটি উল্লেখ করিয়া বলা অসম্ভব।

১৩। জমিদারী মহাজনী কার্য্যে ও বাজার-হিসাবে প্রচলিত ভূরি ভূরি পারিভাষিক শব্দ আছে। ইহাদের অধিকাংশেরই মূল আরবী বা ফারসী শব্দ। ঐ সকল বিভাগের শব্দ যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সহিত মূল আরবী বা ফারসী শব্দ উল্লেখ করিতে হইবে।

উপরে যে কয়েকটি বিষয় লিখিত হইল, তাহাতে অভিধানের বক্তব্য নিঃশেষ হইয়াছে, ইহা বোধ হয়, কেহই মনে করিবেন না। বিষয়ের গুরুত্বের তুলনায় ইহা স্থূল সংক্ষেপমাত্র। অভিধানের কার্য্য আরব্ধ হইলে, কার্য্যক্ষেত্রে গুরুলঘু নানা প্রশ্নের বিচার ও সিদ্ধান্ত করিবার সময় উপস্থিত হইবে। আপাততঃ শব্দসংগ্রহ কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ ও সাহিত্যিকগণের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশিত হইল।

বর্ষশেষ

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মহাকাল স্থির মহাকাল
তারে ঘিরে ঘুরিছে নিখিল,
মহাকাল চলে নাকো কভু,
জীবন চলিছে প্রতি্যতিল।
চারি দিকে ব্যাপ্ত মহাকাশ,
তারি সাথে মহাকাল বাঁধা,
বুদ্বুদের মতো তারি মাঝে
ডোবে আর ওঠে হাসা-কাঁদা।
আসে যায় দিবা ও শর্ব্বরী,
বাহি' নিত্য জীবনের তরী
নরনারী চলে অবিরাম,
নিজপথে চলিবার তালে
ভাগ সে করিয়া মহাকালে
বন্দি' তারে করিল প্রণাম।

মাস বর্ষ দণ্ড আর পল
সেই হ'তে হইয়া চঞ্চল
চলে নিত্য জীবনের তালে,
নরনারী নমি' মহাকালে
বর্ষচক্রে বাঁধে নিজধাম।
সেই হ'তে নিত্য সুরে সুরে
আয়ুরথে বর্ষচক্র ঘুরে
জীবন ছুটিল অবিরাম।
মানবের নিজহাতে রচা
খণ্ড খণ্ড এই হাসা-কাঁদা,
কালেরে বাঁধিতে গিয়া হায়
আপনি পড়িল তায় বাঁধা!
সেই হ'তে বন্দী নরনারী
বর্ষচক্র ঘোরে অসহায়,
লিখি' এই অশ্রু-ইতিহাস
বর্ষশেষ মাগিছে বিদায়।

“যেখানে দোখবে ছাই—”

শ্রীসলিলচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম-এসসি

বহু জিনিস অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া আমরা পরিত্যাগ করি। সাধারণ জ্ঞান হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে ইহারা অজৈব পদার্থ হইলে বিরাট্ স্তূপের আকার ধারণ করে এবং জৈব পদার্থ হইলে পচিয়া বায়ুমণ্ডল দূষিত করিয়া তোলে। এই সকল পদার্থকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অনেক সময় প্রক্রিয়ার খরচা পরিবর্ত্তিত পদার্থের মূল্য হইতে উঠিয়া গিয়াছে এবং সময় সময় এই সকল প্রক্রিয়াতে লাভবান হইতেও দেখা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এরূপ কতকগুলি রসায়ন-শিল্প বর্ত্তমান আছে যাহাতে ঐ সকল অপ্রয়োজনীয় পদার্থ স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও অর্থনৈতিক দিক্ দিয়াও বিশেষ মূল্যবান। এরূপ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় পদার্থের পুনঃ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য, নতুবা এই সকল শিল্পে লাভের আশা সুদূরপরাহত। এই সত্যটি নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে বেশ স্পষ্ট হইবে। বহু দিন আগে যখন গ্যাসের ব্যবহার (coal gass) কেবল আরম্ভ হইয়াছে, তখন ইহার মূল্য এত অধিক ছিল যে ইহা সাধারণের পক্ষে ব্যবহারের অনুপযোগী ছিল। তার পর কিছু দিনের মধ্যেই কয়লা হইতে উদ্গত এক প্রকার ‘আলকাতরা’ (coal tar) এই গ্যাস ব্যবহারের পথে বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। ক্রমে এই দুর্গন্ধযুক্ত, কদর্য্য কোল-টার হইতে রাসায়নিক গবেষণার ফলে জার্ম্মানীতে যে-সকল শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনা জগতে আজ কোথাও নাই। এই পূতিগন্ধযুক্ত অপ্রয়োজনীয় কোল-টার হইতে ঔষধ, সুগন্ধি দ্রব্য, নানা প্রকার রং প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে দেখিয়া সত্যই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে কোল গ্যাসের মূল্যও যথেষ্ট হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

জগতে পরিত্যক্ত জিনিসের পরিমাণ ও সংখ্যা বিশেষ কম নয় এবং প্রায় অধিকাংশকেই রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে কোন-না-কোন প্রয়োজনীয় পদার্থে পরিবর্ত্তন সম্ভব হইলেও, তাহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক, অতি-পরিচিত আবর্জ্জনার, লাভজনক রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব।

শহরের ময়লা

বড় শহরের ময়লা পরিষ্কার আজকাল স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে-সকল শহর নদী বা সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী তাহাদের তরল ময়লা নালাবাহিত হইয়া নদী বা সমুদ্রে পতিত হয়। কিন্তু যে-সকল কঠিন ময়লা নালাবাহিত হইতে পারে না, তাহাদিগকে দূরে পরিচালনার জন্য যানবাহনাদির প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত যে-সকল শহরের নিকটে স্রোতস্বতীর অভাব সে-সকল অঞ্চলে যানবাহনাদির ব্যবহার অতি-প্রয়োজনীয়। এই ময়লাকে তিন প্রকারে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

১। মলকে সারবান পদার্থে পরিবর্ত্তিত করা। ইহার জন্য মলকে উন্মুক্ত প্রান্তরে শুষ্ক হইতে দেওয়া হয়। ক্রমে মাটির সঙ্গে মিশিয়া নানা প্রকার কীটের সাহায্যে মল উৎকৃষ্ট সারবান পদার্থে পরিণত হয়। তবে সংক্রামকের ভয় থাকিলে পুড়াইয়া ফেলাই ভাল।

২। ময়লা পুড়াইয়া উদ্গত তাপ “বয়লা”র, “ডায়-নামো” প্রভৃতিতে ব্যবহার ও তড়িৎশক্তি উৎপাদন। এই প্রক্রিয়াতে ময়লা হইতে তরল পদার্থ ছাড়িয়া বাহির করিয়া দিতে হয়, পরে কঠিন ময়লা কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া বিশেষ নির্ম্মিত চুল্লীতে ভস্মীভূত করা হয়। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট ছাইগাদাও যথেষ্ট ব্যবহারে আসিয়া থাকে।

৩। ময়লাকে গ্যাসে পরিণত করা। অতঃপর এই গ্যাস জ্বালাইয়া তড়িৎশক্তি, আলোক প্রভৃতি সহজেই পাওয়া যাইতে পারে।

প্রত্যেক সভ্য দেশেই ময়লাকে উপরোক্ত পদ্ধতিতে পরিশুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের ময়লা প্রথমোক্ত উপায়ে সারবান পদার্থে পরিবর্ত্তিত করা হয়, এবং নৈহাটীর অদূরবর্ত্তী ভাটপাড়া মিউনিসি-পালিটিতে তৃতীয় পদ্ধতিতে ময়লা হইতে গ্যাস উৎপাদন করিয়া তড়িৎশক্তি উৎপাদন করা হয়। ছোট শহরে এই পদ্ধতি বিশেষ উপকারে আসিবে বলিয়া মনে হয়। ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির এই প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট গৌরবের সন্দেহ নাই।

রক্ত ও পশুবলিগৃহের আবর্জ্জনা

রক্ত একটি পরিত্যক্ত পদার্থ তাহা আমাদের দেশের অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রত্যহ ভোজ্যদ্রব্য সংস্থানের জন্য যথেষ্ট পশুবলির ব্যবস্থা আছে। এই সকল স্থানে রক্তকে আবর্জ্জনা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে।

এই রক্ত সতর্কতার সহিত বিশুদ্ধ করিয়া বিশেষ নির্ম্মিত চুল্লীতে শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়। এই শুষ্ক রক্ত সারবান পদার্থ অধিকতর সমৃদ্ধিশালী করিতে যথেষ্ট সহায়তা করে। এতদ্ব্যতীত এই রক্ত হইতে এক প্রকার উৎকৃষ্ট কয়লা ও নীল রং (Prussian Blue) প্রস্তুত হইতে পারে। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াকালে 'বাড়তি বস্তু' (Bye-product) হিসাবে "অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট" ও এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ পাওয়া যায়। রক্ত হইতে প্রস্তুত এই কয়লা ডাক্তারী শাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে—দুর্গন্ধযুক্ত ও পচা ঘায়ে এই কয়লা-কণিকা ছিটাইয়া দিয়া যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায় (carbo animalis)।

চর্ম্ম-পরিশুদ্ধ কারখানার ও কাটা চামড়ার আবর্জ্জনা

কাঁচা চামড়া পরিশুদ্ধ করিবার জন্য চুনের জল দ্বারা ইহাকে সিদ্ধ করা হয়। পরে লোম ও আকৃষ্ট মাংস বিদূরিত কারতে চামড়াকে বহু দিন চুনের সংস্পর্শে রাখা হয়। এই পদ্ধতিতে চামড়া হইতে সহজ পচয়মান পদার্থ অন্তর্হিত হইয়া যায়। চর্ম্ম ধৌত করিয়া বাহির করিয়া লইলে অবশিষ্ট চুন প্রভৃতির আবর্জ্জনা সত্বর স্থানান্তরে প্রেরণ বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে, কারণ ইহা হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস উদ্গত হইয়া বায়ুমণ্ডল দূষিত করিয়া তোলে। এই আবর্জ্জনা পূর্ব্বে ভূপৃষ্ঠে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে দেখা গিয়াছে যে বিশেষ প্রক্রিয়াতে ইহা হইতে অতি উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হইতে পারে।

কাটা চামড়া আমাদের দেশে কম জমা হয় না, কিন্তু লাভবান শিল্পে নিয়োগও আমরা করি না। এই কাটা চামড়া হইতে এক প্রকার কৃত্রিম চামড়া প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই কৃত্রিম চামড়া হইতে খুব মজবুত জুতার হিল তৈয়ার হয়। এতদ্ব্যতীত শিরিষ, সারবান পদার্থ প্রভৃতি বহু মূল্যবান বস্তু প্রস্তুত হইতে পারে। আশার বিষয় যে, আমাদের দেশে এই আবর্জ্জনা হইতে কিছু কিছু শিরিষ বর্ত্তমানে প্রস্তুত হইতেছে।

মাছের আঁশ, পশুর শিং, হাড় প্রভৃতির আবর্জ্জনা

মাছের আঁশ সূচিশিল্পে খুব অল্প পরিমাণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে মাছ হইতে এক প্রকার তৈল নিষ্কাশন করিয়া লওয়া হয়। উদ্বৃত্ত পদার্থ, মাছের আঁশ প্রভৃতি হইতে শিরিষ প্রস্তুত হইতে পারে। আমাদের দেশে পশুর হাড়ের খুব বেশী দাম নাই এবং হাড় সংরক্ষণের জন্য কোন প্রকার ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হয় না। আমরা স্বভাবতঃ ধর্ম্মভীরু—গবাদি পশুর হাড় দেবতা-জ্ঞানে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলি। যাহা ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় তাহাও ক্রমে মাটির সহিত বিলীন হইয়া যায়। সভ্য দেশে হাড় কিন্তু এত সহজেই রেহাই পায় না। অস্থিভস্ম হইতে সহজ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একটি উৎকৃষ্ট সারবান পদার্থ—সুপারফস্‌ফেট্ প্রস্তুত হয়। এই সুপারফস্‌ফেট দেশীয় চা-বাগানে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয় এবং ইহার কাঁচামাল—অস্থিভস্ম ও সাল্‌ফিউরিক এসিড আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য নয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের দেশে এই সারের একটি শিল্প গড়িয়া উঠিলে লাভবান হইবার যথেষ্ট আশা আছে।

টুকরা কাঠের আবর্জ্জনা

প্রতি বৎসর টুকরা এবং গুঁড়া কাঠ আমাদের দেশে কম জমা হয় না, কিন্তু ব্যবহারের অভাবে নষ্ট হইয়া যায়। এই আবর্জ্জনা হইতে যে কত প্রকার সুন্দর, লাভজনক ও আবশ্যক পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। আজকাল প্রত্যেক সভ্য দেশেই ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে এবং সময় সময় এরূপ দেখা গিয়াছে যে এই আবর্জ্জনা ব্যবহার বা অন্য কোন উপায়ে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে না পারিলে কাঠের অন্যান্য শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। অনেক প্রকারে এই আবর্জ্জনাকে ব্যবহার করা যাইতে পারে। গুঁড়া কাঠ কোন সহজদাহ্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া 'গুল' (briquettes) তৈয়ার করিলে উহা কয়লার স্থান পূরণ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত গুঁড়া কাঠ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অক্সালিক এসিড ও সুরাসার (Alcohol) তৈয়ার হইতে পারে।

কাঠ হইতে সুরাসার প্রস্তুত বিজ্ঞান-জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। বিশেষ বৈজ্ঞানিক সহায়তা লইয়া ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগো শহরে একটি কারখানায় সর্ব্বপ্রথম টুকরা কাঠ হইতে সুরাসার প্রস্তুত হইতে থাকে এবং

তৎকালীন প্রাত্যহিক সুরাসার প্রস্তুতের পরিমাণ ছিল প্রায় দুই হাজার গ্যালন। তৎকালে সুরাসারের চাহিদা এতটা না থাকায় এবং উন্নত প্রণালী ও কলকব্জার অভাবে চিনি-জাতীয় পদার্থ হইতে উৎপন্ন সুরাসারের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া এই কারখানার কাজ তিন চার বৎসরের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু সুরাসারের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা এবং উন্নত প্রণালী ও কলকব্জা উদ্ভাবনের ফলে ১৯১৮ সালে এই কারখানা পুনরুজ্জীবিত হয় এবং বর্ত্তমানে এই কারখানার কাজ অতি আশাপ্রদ। উক্ত কারখানার তৎকালীন প্রাত্যহিক প্রস্তুতের পরিমাণ আড়াই হাজার গ্যালন হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমানে সাত হাজার গ্যালনে দাঁড়াইয়াছে। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে মোটর প্রভৃতি গাড়ী চালনায় সুরাসার পেট্রোলের স্থান অধিকার করিতে পারে এবং আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে বহু পূর্ব্বেই সুরাসার অনেকাংশে পেট্রোলের স্থান পূরণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের ফলে পূর্ব্ব হইতে সুরাসার ব্যবহারোপযোগী এঞ্জিন আমাদের দেশে মজুত থাকিলে সুরাসার বর্ত্তমানে বহু উপকারে আসিত এবং পেট্রোল অনটনে এরূপ দুরবস্থার সম্মুখীন হইতে হইত না।

টুকরা বা গুঁড়া কাঠ বায়ুশূন্য কক্ষে উত্তপ্ত করিলে, উদ্গত বাষ্প হইতে, মেথিলেটেড স্পিরিট, ভিনিগার প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বস্তু পাওয়া যায়। আমাদের দেশে মহীশূর স্টেটে উক্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা আছে। বর্ত্তমানে তাঁহারা বনের কাঠ সরাসরি ব্যবহার করিতেছেন, তবে ভবিষ্যতে কাঠ নিঃশেষিত হইলে, এই আবর্জ্জনার উপর তাঁহাদের দৃষ্টি স্বভাবতই পতিত হইবে সন্দেহ নাই।

কাগজ-প্রস্তুত কারখানার পরিত্যক্ত পদার্থ

এই কারখানার পরিত্যক্ত পদার্থের মধ্যে কাগজের কাঁচামাল—বাঁশ, কাঠ প্রভৃতি পদার্থ সিদ্ধ করিবার পর যে বিপুল পরিমাণ অপরিষ্কৃত জল অবশিষ্ট থাকে, তাহার কথা বলিব। এই জলে বাঁশ সিদ্ধ করিবার সময় যে "কষ্টিক" ব্যবহার করা হয় তাহার প্রায় সবটুকুই পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কষ্টিক সোডা যথেষ্ট মহার্ঘ এবং উপরোক্ত অপরিষ্কার জল হইতে কষ্টিক উদ্ধার করিতে পারিলে পুনরায় উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কষ্টিকের মূল্য বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমানে প্রায় অধিকাংশ কারখানাতেই ঐ পরিত্যক্ত জল হইতে কষ্টিক উদ্ধার করা হয়। ইহার জন্য একটি অতি সহজ রাসায়নিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হইয়াছে। অপরিষ্কার জল একটি উত্তপ্ত ঘূর্ণায়মান ড্রামে নীত হয়, তাপে জলীয় পদার্থ অন্তর্হিত হইলে দাহ্য পদার্থ পুড়িতে থাকে এবং ভস্ম ক্ষারে পরিণত হয়। পরে এই ক্ষারের সহিত চুনের জল মিশ্রিত করিলেই কষ্টিক পুনরুজ্জীবিত হয়। টীটাগড় কাগজ-কারখানায় এইরূপ একটি বিভাগ আছে। এতদ্ব্যতীত এই অপরিশুদ্ধ জল শুষ্ক করিলে অবশিষ্ট কঠিন পদার্থ হইতে চামড়া ট্যান্ করিবার উপযোগী পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে। এমন কি বর্ত্তমানে এই জল হইতে আমেরিকাতে সুরাসার পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতেছে।

মাখন-তোলা দুগ্ধ

মাখন তুলিয়া লইলে অবশিষ্ট দুগ্ধে কিঞ্চিৎ পরিমাণ তৈলজাতীয় পদার্থ অবস্থান করিতে দেখা যায়। এই মাখন-তোলা দুগ্ধ নানা দেশে নানা প্রকারে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে ইহা দধি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ভোজ্য দ্রব্যে ব্যবহৃত হয় কি না সন্দেহ। আয়র্ল্যাণ্ডে এই দুগ্ধ হইতে উপযুক্ত চিনি-সংযোগে অতি উপাদেয় ঘন মাখন-তোলা দুগ্ধ (Condensed Skim milk) প্রস্তুত হয়। আমেরিকাতে ইহা হইতে পনির ও Casein প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে ডেয়ারি ফার্ম্ম একেবারে বিরল নয়, সুতরাং চেষ্টা করিলে আমাদের দেশে ঘন মাখন-তোলা দুগ্ধ প্রস্তুত হইতে পারে।

মাতগুড়

চিনি-কারখানার আবর্জ্জনা এই মাতগুড় আমাদের দেশে নামমাত্র মূল্যে বিকাইয়া যায়। এই মাতগুড় হইতে যে কত প্রকার বস্তু প্রস্তুত হইতে পারে তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহা সর্ব্বাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় সুরাসার প্রস্তুত করিতে। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে মাতগুড়ের উপর যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছে। এই সকল গবেষণা কার্য্যে পরিণত হইলে যথেষ্ট সুখের হইবে সন্দেহ নাই। সুরাসার প্রস্তুত হইবার পর যে আবর্জ্জনা পড়িয়া থাকে তাহাও যথেষ্ট মূল্যবান এবং এই আবর্জ্জনা ভস্মীভূত করিয়া যথেষ্ট আবশ্যক বস্তু পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকাতে কোন একটি কারখানায় প্রত্যহ ৯০ টন মাতগুড় সুরাসার প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহা হইতে প্রত্যহ ৫,৫০০ গ্যালন সুরাসার এবং পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা

হইতে ১০ টন ক্ষার, ৩২ হন্দর অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট, ২ হন্দর মেথিলেটেড স্পিরিট পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মাতগুড় হইতে পালিত পশুদের ভোজ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং অন্য দেশে মাতগুড়কে পরিত্যক্ত জিনিস বলিলে ভুল করা হইবে। তবে আশার বিষয় এই যে, উত্তর-ভারতের কোন এক স্থানে মাতগুড় হইতে পশুদের ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইবার একটি কারখানা স্থাপিত হইবার কথা শোনা যাইতেছে।

আঙ্গুরের ছোব্‌রা

বর্ত্তমান বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় হইলেও ইহার উপকারিতার বর্ণনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মদ প্রস্তুত হইবার পর ছোব্‌রা জাতীয় যে অংশটি পড়িয়া থাকে তাহা হইতে প্রধানতঃ টারটারিক এসিড, এক প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য তৈল-জাতীয় পদার্থ, আলোকপ্রদানকারী গ্যাস, পটাশ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মদ-প্রস্তুতকেন্দ্রে এই সকল যথেষ্ট প্রস্তুত হইতেছে এবং ইহাতে কারখানার মালিকেরাও যথেষ্ট লাভবান হইতেছেন।

রবার-টুকরা

কাটা রবার-টুকরা পুনরায় রাসায়নিক উপায়ে রবার-নির্ম্মিত দ্রব্যে পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছে। এইরূপে বর্ত্তমানে রবারের একটুকুও নষ্ট হইতে পাইতেছে না—প্রত্যেকটি কণা শিল্পে স্থান পাইতেছে। এতদ্ব্যতীত টুকরা রবার হইতে কৃত্রিম বানিশ প্রস্তুত হইতেছে।

সাবান কারখানার অব্যবহার্য্য পদার্থ

সাবান প্রস্তুত হইবার পর ছোট ছোট সাবানের টুকরা সাধারণতঃ পড়িয়া থাকে। এগুলিকে দ্বিতীয় বার সাবান প্রস্তুতের সময় ব্যবহার করা হয়। সাবান প্রস্তুত হইবার পর যে জল (lye) অবশিষ্ট থাকে উহাতে গ্লিসারিন্‌ অবস্থান করে। 'লাই' হইতে গ্লিসারিন নিষ্কাশন করিবার যে-প্রথা প্রচলিত আছে, উহাতে দেখা গিয়াছে যে লাইতে শতকরা পাঁচ ভাগ গ্লিসারিন না থাকিলে এবং অত্যধিক পরিমাণে এই লাই পাওয়া না গেলে উক্ত প্রণালীতে গ্লিসারিন নিষ্কাশিত করিয়া লাভবান হওয়া দুরূহ ব্যাপার। কলিকাতা শহরে যে পরিমাণ সাবান প্রস্তুত হয়, তাহাতে মনে হয় যে কলিকাতায় লাই হইতে গ্লিসারিন নিষ্কাসন করিবার একটি কারখানা চলিতে পারে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে দুইটি কারখানায় এই লাই হইতে গ্লিসারিন প্রস্তুত হইতেছে (Tomco & Lever Bros.)

সামুদ্রিক আগাছা

এই আগাছা মাদ্রাজ প্রদেশে সমুদ্রোপকূলে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই আগাছা হইতে আয়োডিন পাওয়া যায়। যুদ্ধের কৃপায় আয়োডিনের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ক্রমে যেরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে তাহাতে ভারতবর্ষে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারত-গবর্ণমেণ্টের মাথায় এত দিনে বুদ্ধি খুলিয়া গিয়াছে এবং এই আগাছা বিশেষ মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইতেছে

অব্যবহৃত গন্ধক

গন্ধক একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু। বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতে বলা হয় যে, যে-দেশে যত গন্ধক ব্যবহৃত হয় সে দেশ তত সমৃদ্ধিশালী। প্রকৃতিদেবী ভারতবর্ষকে এই সম্পদ হইতে একেবারে বঞ্চিত করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ এ পর্য্যন্ত ভারতে সুবিধামত কোন গন্ধকের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ভারতে এই বস্তুটির চাহিদা ক্রমবর্দ্ধমান। পূর্ব্বে সিসিলী ও জাপান হইতে এই গন্ধক ভারতে আমদানী হইত, কিন্তু যুদ্ধের ফলে ইহার আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং যুদ্ধের গতি এই ভাবে আরও কয়েক বছর চলিলে ভারতে যে কি অবস্থা হইবে তাহা গভীর চিন্তার বিষয়। ভবিষ্যতে বিদেশী গন্ধকের উপর ভরসা না করিয়া কি করিয়া দেশীয় খনিজ সম্পদ হইতে উহা লাভ করা যায় তাহার চেষ্টা করা উচিত। গন্ধক বহু অব্যবহার্য্য বস্তু হইতেই পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কার্য্যকরী হিসাবে অতি অল্পসংখ্যককেই স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

কয়লাতে কিছু পরিমাণ গন্ধক অবস্থান করে এবং পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে ভারতীয় কয়লায় ইহার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী। কয়লাকে গ্যাসে পরিণত করিবার সময় এই গন্ধকও গ্যাসের আকার ধারণ করে, কিন্তু গন্ধক-গ্যাসের অবস্থিতি বিশেষ ক্ষতিকর হেতু রাসায়নিক উপায়ে ইহাকে কোল-গ্যাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়। কয়লা হইতে এইরূপে বিচ্ছিন্ন গন্ধককে পুনরায় শিল্পে নিয়োজিত করা সম্ভবপর, কিন্তু এই গন্ধকের পরিমাণ খুব বেশী নয়।

ইহার পর নাম করা যাইতে পারে ভারতীয় খনিজ সম্পদ—জিপসাম্, ব্যারাইটিস প্রভৃতির। এই সকল খনিজ সম্পদ হইতে গন্ধক নিষ্কাশন সম্ভব হইলেও, লাভজনক ভাবে কি করিয়া উক্ত গন্ধককে শিল্পে নিয়োগ করা যাইতে পারে সে সকল গবেষণাসাপেক্ষ।

সাধারণ সোডা অ্যাশ্ প্রস্তুতের সময় বাড়তি পদার্থ হিসাবে গন্ধক পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশে ইহার মূল্য খুবই কম, কারণ এই গন্ধক "মাথা নাই তার মাথা ব্যথা" পর্য্যায়ে গিয়া পড়ে। আমাদের দেশে আগে সোডা অ্যাশের কারখানা গড়িয়া উঠুক, তার পর বাড়তি পদার্থের হিসাবনিকাশ করা যাইবে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, গ্লাসগো শহরে একটি কারখানায় উক্ত প্রক্রিয়াতে প্রতি বৎসর দেড় হাজার টন গন্ধক পাওয়া যায়।

বাড়তি পদার্থ হিসাবে আর একটি কেন্দ্র হইতে গন্ধক পাওয়া যাইতে পারে। ধাতবিক প্রস্তরে সময় সময় যৌগিক পদার্থ হিসাবে গন্ধক অবস্থান করিয়া থাকে এবং ধাতু-নিষ্কাশন প্রক্রিয়াকালে এই গন্ধক গ্যাসের আকারে উত্থিত হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে আবদ্ধ করিয়া এই গ্যাস শিল্পে নিয়োজিত করা যাইতে পারে। এরূপ ধাতবিক শিল্প ভারতে অতিঅল্পসংখ্যক থাকিলেও যে দুই-একটি আছে (Indian Copper Corporation) তাহাতেও এই গ্যাস ব্যবহার না করিয়া বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যাইতে দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, যে-সকল দেশে এখন পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ গন্ধক মজুত আছে, সেই সকল দেশের অধিবাসীরাও যখন ভবিষ্যতে গন্ধকের ব্যয়-সঙ্কোচ হেতু উপরোক্ত উপায়ে গন্ধক জোগাড়ে যত্নবান হইলেন, তখন পর্য্যন্ত ভারতবাসীরা নিজেদের এক ছটাক গন্ধক হাতে না থাকিলেও, দেশীয় খনিজ সম্পদ হইতে গন্ধক-নিষ্কাশনে চেষ্টিত না হইয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া রহিলেন।

পরিত্যক্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য

স্বর্ণ ও রৌপ্য যে কি করিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে তাহা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না, কিন্তু পরিত্যজ্য হইবার দুই-একটি পথ দেখাইয়া দিলে জিনিসটি বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে। রৌপ্য বা অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের তৈজসপত্রকে সুদৃশ্য করিবার জন্য উহাকে সোনা দ্বারা কলাই করা হয় (Gold plating)। এই প্রক্রিয়াতে এসিড জলে দ্রবণীয় সোনা ব্যবহৃত হয় এবং বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা কলাই-কার্য্য সমাধা করা হয়। কলাই-কার্য্য এইরূপে চলিতে থাকিলে পাত্রস্থ দ্রবণীয় সোনার জল ক্রমশঃ দূষিত হইতে থাকে এবং ক্রমে এরূপ সময় উপস্থিত হয় যে উক্ত দ্রবণীয় সোনার জল ব্যবহারের একেবারে অনুপযুক্ত হ য়া উঠে। এরূপ স্থলে দূষিত সোনার জল পরিত্যাগ করা হয় এবং নূতন দ্রবণীয় সোনা উক্ত স্থান অধিকার করে। দূষিত জলে স্বর্ণের পরিমাণ সর্ব্বদাই কিছু অবস্থান করে এবং পরিত্যক্ত জলের সহিত বাহির হইয়া যায়।

আমাদের দেশের স্বর্ণকারের নিকট হইতেও কিছু পরিমাণ স্বর্ণ প্রতি বৎসর নষ্ট হইয়া যায়। স্বর্ণ ও রৌপ্যকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে স্বর্ণকারেরা সাধারণতঃ নাইট্রিক এসিডের সাহায্য লয়। এই প্রক্রিয়াতে রৌপ্য দ্রবণীয় হইয়া যায়, কিন্তু স্বর্ণ কঠিন পদার্থ হিসাবে পড়িয়া থাকে। কিন্তু নাইট্রিক এসিডে সামান্য একটু হাইড্রোক্লোরিক এসিড থাকিলে স্বর্ণও কিছু পরিমাণে রৌপ্যের সহিত দ্রবণীয় হইয়া যায়। আমাদের দেশীয় নাইট্রিক এসিডে অপদার্থ হিসাবে সর্ব্বদাই খুব সামান্য পরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক এসিড অবস্থান করে। উক্ত এসিড ব্যবহারে কিঞ্চিৎ পরিমাণ স্বর্ণ সর্ব্বদাই রৌপ্যের সহিত বাহির হইয়া যায়। এতদ্বিষয়ে নিরক্ষর স্বর্ণকার ইহার কিছুই বুঝিতে পারে না এবং সানন্দে কঠিন স্বর্ণের কণিকাটুকু রাখিয়া দ্রবণীয় অংশটি পরিত্যাগ করে।

ফোটোগ্রাফারের হাত দিয়াও যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রতি বৎসর পরিত্যক্ত হইয়া যায়। অনেকেই অবগত আছেন যে ফোটোগ্রাফের ফিল্ম স্বর্ণ বা রৌপ্যের যৌগিক পদার্থ দ্বারা গঠিত এবং ফিল্ম 'ওয়াশ' এবং 'ডেভেলপ' করিবার সময় কিছু সোনা ও রূপা দ্রবণীয় হইয়া যায়। মাঝে মাঝে ডেভেলপ করিবার তরল পদার্থ পরিবর্ত্তন করিতে হয় এবং ফলে উক্ত তরল পদার্থে দ্রবণীয় সোনা ও রূপা অব্যবহার্য্য ও পরিত্যক্ত পদার্থে পর্য্যবসিত হয়। এতদনুরূপ বহু অলিগলি আছে যাহা দ্বারা প্রতি বৎসর বহু টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই সকল তরল পদার্থ যাহাতে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মহার্ঘ বস্তু দ্রবণীয় থাকে তাহা পরিত্যাগ না করিয়া কোন পাত্রে সংরক্ষণ করিয়া বৎসরান্তে একবার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ ও রৌপ্য নিষ্কাশন করিলে লাভবান হইবার যথেষ্ট আশা আছে।

বর্ত্তমান যুগ প্রতিযোগিতার এবং একটি জাতিকে

বাঁচিতে হইলে এই পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেই হইবে। যুদ্ধের ফলে বর্ত্তমানে আমরা ইহার প্রভাব ততটা উপলব্ধ করিতে না পারিলেও যুদ্ধাবসানে আমাদিগকে কঠিনতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। অনাগত জগতের শিল্প-প্রগতির সঙ্গে পা মিলাইয়া অগ্রসর হইতে হইলে এখন হইতেই তাহার আয়োজন করা দরকার। কবির সহিত আমাদেরও উপলব্ধি করিতে হইবে—

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই
পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।"

জাতির জীবনে রক্তের মূল্য

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বিয়ের ব্যাপারটা নিছক প্রেমের ব্যাপার নয়। রোমান্সের বসন্ত এক দিন না এক দিন ফুরিয়ে যাবেই; দেখা দেবে ধূসর বাস্তব। আমরা তো গৃহিণীর গলায় বরণমাল্য পরাই নে, পরাই নারীর গলায়। নারী আর গৃহিণী এক নয়। নারীকে আলিঙ্গন ক'রে আমরা হাতের মধ্যে স্বর্গ পাই। তার চোখে দীপ্তি, গণ্ডে আভা, কণ্ঠে বাঁশি, চলায় ছন্দ, অধরে মধু। সময়ের স্রোত চলতে থাকে। নারীর চোখে সেই দীপ্তি কোথায় লুকিয়ে যায়, চলায় ছন্দ থাকে না, স্পর্শে শিহরণ আসে না। তার চুলে পাক ধরে, তন্তু হয়ে যায় কলেবর, স্বপ্নের অপ্সরী পাখা মেলে দিয়ে কোথায় একদিন অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রিয়া ক্রমে ক্রমে গৃহিণীতে রূপান্তরিত হয়। সে ভাত রাঁধে, পরিবেশন ক'রে দুবেলা খাওয়ায়, ধোপার হিসাব রাখে, সংসারের সহস্র কাজ করে, রোগশয্যায় ললাটে জলপটি দেয়। তার হাতে হাতা ও বেড়ি, নয়ত কাপড় সেলাই করবার ছুঁচ অথবা ঐ রকমের যা-হয় একটা-কিছু। তারার আলোয় মধুমালতীর কুঞ্জে যে মানুষটি কানের কাছে অস্ফুটস্বরে কূজন করত, বেল ফুলের মালা গেঁথে কণ্ঠে পরিয়ে দিত, অভিমান ক'রে দূরে সরে যেত আবার বুকে টেনে নিত সেই স্বপ্নলোকের মানুষটি আর এই শত কর্ম্মে রত ঘরের মানুষটি ত এক নয়। গোলাপফুল বাঁধাকপি হয়ে গেছে—আকাশের তারা পর্য্যবসিত হয়েছে রান্না-ঘরের প্রদীপে। প্রতিদিনের সাহচর্য্য গৃহিণীকে জীবনের এত কাছে নিয়ে এসেছে যে তাকে অনুভব করবার ক্ষমতাও পুরুষ হারিয়ে ফেলে। সে হয়ে যায় নাক কান অথবা চোখের মত। অত্যন্ত কাছের বলেই আমরা তাদের ভুলে থাকি। বিয়ের এই যে একটা বাস্তবের দিক আছে—এর সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকাই ভাল। তা হলে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের দ্বারা অভিভূত হয়ে আমরা কোন নারীকে ঘরে আনতে কুণ্ঠিত হ'ব। রূপের দীপ্তি যখন ম্লান হয়ে যাবে এবং প্রেমের গাঙে যখন ভাটা পড়বে তখন দাম্পত্য জীবনে ভাঙন ধরবার আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নয়। সেই ভাঙনের হাত থেকে নীড়কে রক্ষা করতে হ'লে হৃদয়াবেগ যথেষ্ট নয়—আরও অনেক কিছু চাই। দুই পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকার প্রয়োজন, যাকে ঘরে নিয়ে আসব তার সকলকে নিয়ে মানিয়ে চলবার মত সহগুণ এবং উদারতা থাকা দরকার। মেয়ের মনের চেহারা সাধারণতঃ তার মায়ের মনের চেহারার অনুরূপ হয়ে থাকে। যেমন মা তেমনি ছা, যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা—এই সব প্রবাদ-বচনের উৎপত্তি মানুষের বহু যুগের অভিজ্ঞতা থেকে। সুতরাং মেয়ে বাছতে হ'লে আগে তার মাকে ভাল ক'রে জানার প্রয়োজন আছে। রক্তের মূল্যকে অবহেলা করলে তার ফল ভুগতে হয় পদে পদে। এই জন্যই বিবাহের প্রাক্কালে আমাদের দেশে বর ও কন্যার বংশ-পরিচয় নেবার রীতি আছে রূপ আর পাণ্ডিত্যের উপর জোর দিয়ে আমরা ক্ষান্ত থাকি নি। পাশ্চাত্য দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ খুব ঘন ঘন হয়ে থাকে। তার একটা প্রধান কারণ, বিয়ে করবার সময় তারা দাম্পত্যের গদ্যময় দিকটার কথা স্মরণে আনে না, সাথীর চরিত্রকে মনে করে সমস্ত দুর্ব্বলতা থেকে মুক্ত, রূপের দীপ্তিতে ম্লানিমা এবং প্রেমের গাঙে ভাটা আসবে এক দিন—এ কথা ভাবে না। রোমান্স এক দিন কেটে যায়, সঙ্গিনীর আচরণের ত্রুটিগুলি একে একে চোখে পড়তে থাকে, অবশেষে অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যে দম্পতীর নীড় এক দিন ভাঙে। এই জন্যই নীড় বাঁধবার আগে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। চরিত্রে প্রচুর সহগুণ থাকা

চাই, ত্যাগ করবার শক্তি থাকা চাই। জীবনের সাথী যাকে করব, তাকে ভাল ক'রেই বাজিয়ে নেওয়া দরকার। সব মানুষকে নিয়ে সব মানুষ ঘর করতে পারে না। 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য কবি অমিতরায়কে ভাল বেসেছিল—কিন্তু তাকে নিয়ে নীড় বাঁধতে সাহস পেল না। মালা দিল সে শোভনলালের কণ্ঠে। লাবণ্য বলছে যোগমায়াকে, "যে-আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখতে পেয়েছেন ব'লে মনেই করি নে। আমি যেই ওঁকে স্পর্শ করেছি অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা কয়ে উঠেছে। * * ওঁর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা ফুরোয় তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধরা পড়বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে যে মেয়ে ওঁর নিজের সৃষ্টি নয়। বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।" ইবসেনের Love's Comedyতেও নায়িকা Svanhild কবি Falkকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছে কিন্তু তরুণী যাকে হৃদয় দিল তাকে মালা দিল না। বরণের মালা পরাল আর এক জনের কণ্ঠে। বিবাহিত জীবনের একটা দায় আছে। সেই দায়কে স্বপ্নবিলাসী অমিতের বাস্তব-বিমুখ কবি-হৃদয় শেষ পর্য্যন্ত যদি না মানতে পারে তবে ট্রাজেডি অনিবার্য্য। লাবণ্য পিছিয়ে গেল। Svanhild দেখলে বিয়েটা নিছক কাব্য-জাতীয় ব্যাপার নয়। এমন একটা দিন আসবে যখন Falkএর চোখে সে আর নারী থাকবে না, গৃহিণী হয়ে যাবে—বিবাহ তাদের প্রেমের জীবনে আনবে মৃত্যুর অভিশাপ। তার চেয়ে ভালবাসার দীপ্তিকে চির-অম্লান রাখবার জন্য Falkএর সঙ্গে একত্র নীড় বাঁধার কামনাকে পরিত্যাগ করাই শুভ। Svanhild Falkকে বিদায় দিল। বিদায়ের আগে সে বলছে,

I offer you as a sacrifice to love! Now I have lost you, dearest, for this life—but I have won you for eternity.

এ যেন অমিতের কানে লাবণ্যের বিদায়বাণী। বিবাহ ক'রে প্রেমের মৃত্যু ঘটানর চাইতে ভালবাসার হোমানলকে জীবনে অনির্ব্বাণ রাখবার জন্য বিচ্ছেদকে বরণ করা ভাল। প্রেমের জন্যই অমিতকে বিবাহ করল না লাবণ্য, প্রেমের জন্যই Falkকে বিবাহ করল না Svanhild.

"মনে হয় এত দিন ছায়া ছিলাম, এখন সত্য হয়েছি এর চেয়ে আর কি চাই। আমাকে বিয়ে করতে বোলো না, কর্ত্তা মা।"

লাবণ্য এত ভালবেসেও অমিতকে দূরে রেখে দিল। বিবাহিত জীবনের যে সমস্যার দিকে ইবসেন আর রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে চেয়েছেন তার সম্পর্কে সচেতন হ'লে হৃদয়াবেগের আতিশয্য আমাদের শুভবুদ্ধিকে আবিল করবার সুবিধা পাবে না Love chooses the woman, not the wife—এ কথা ভাল ক'রে জানা থাকলে দাম্পত্য জীবন যাতে কল্যাণময় হয় তার জন্য ভাল বংশের গুণবতী মেয়ে ঘরে আনার দিকে নজর দেব। মেয়ের পিতামাতাকে, বিশেষ ক'রে মাতাকে, গণনার মধ্যে আনব, মেয়ের রূপকেও মূল্য দান করব—কিন্তু বিবাহিত জীবনকে সুখী করবার পক্ষে রূপ অথবা বিদ্যাকে যতটুকু মূল্য দেওয়া দরকার ততটুকুই দেব, তার এক চুল বেশী নয়। সংসারের কাজে লাগে—এমন জিনিস কিনবার জন্য পাঁচটা দোকান আমরা যাচাই ক'রে বেড়াই—হাতের মাথায় যা পেলাম তা ত ঘরে নিয়ে আসি নে। ঘরে বউ আনবার সময় অনেক পণ্ডিতের ঘটেও বুদ্ধির অভাব হয় কেন? প্রেমে পড়েছ কি—আর দেখাশোনা নেই—টোপ আকণ্ঠ গিলে বসেছ। শানাই বাজিয়ে যাকে ঘরে আনলে তার বংশ-পরিচয়কে গণনার মধ্যে আনলে না, মনের আসল চেহারাটা খুঁজে দেখতে চাইলে না, বাইরের চেহারার আর কথার ছটায় ভুলে এমন এক জনকে সাথী করলে যে তোমার সম্পূর্ণ অযোগ্য। এই ট্রাজেডি সংসারে ঘটে চলেছে অহরহ। কিন্তু চোখ তবুও খোলে না!

বিয়ের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের দিকটা বাদ দিলেও এর একটা সামাজিক দিক আছে যাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। বিয়ে করলে পুত্র-কন্যা আসা স্বাভাবিক আর এই পুত্র-কন্যাদের ব্যক্তিত্ব যে পরিমাণে জোরালো হবে জাতি সেই পরিমাণে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। Produce great Persons—the rest will follow—এই জ্ঞানের কথাটি একদা কবি হুইটম্যানের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছিল। মানুষগুলোর বিবেক যেখানে থ্যাকশিয়ালের বিবেকের মত, মগজ বিলিয়ার্ড বলের মতই নীরেট, শরীর পাঁকাটির মত দুর্ব্বল, সেখানে জাতি হীনবীর্য্য, কর্ম্মকীর্ত্তি-হীন হ'তে বাধ্য। সেই জন্য পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা—জাতির মঙ্গলের জন্য কেবল এই তিনটে কথাই যথেষ্ট নয়। সেই পুত্রে কি প্রয়োজন যার জন্ম কুলকে পবিত্র, জননীকে কৃতার্থ এবং জাতিকে উন্নত না করে? সেই জন্য পুত্রকে চাইব কেবল অস্তিত্বের ধারাকে সামনের দিকে প্রবাহিত ক'রে দেবার জন্য নয়, সেই ধারাকে উপরের দিকেও চালিয়ে দেবার জন্যও বটে।

Thou shalt propagate thyself not only onwards but upwards (Nietzsche).

পুত্র-কন্যা উঁচু স্তরের হবে কি নীচু স্তরের হবে—সেটা কেবল তাদের শিক্ষাদীক্ষার (nurture) উপরে নির্ভর করে না। মানুষ হিসাবে তারা ছোট হবে কি বড়ো হবে—সেটা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে যে রক্ত থেকে তারা এসেছে তার উপরে। মানুষ গড়ার কাজে বায়োলজি তাই রক্তের মূল্যকে স্বীকার করে। ম্যাকডুগ্যাল (MacDougall) তাঁর The Group Mind বইখানিতে জাত তৈরির কাজে রক্তের স্থান কোথায়—এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলছেন, যেখানে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে এমন দুটো জাতের মধ্যে যারা বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা সব দিক দিয়ে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র, সেখানে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ফল হয় খারাপ। ছেলেমেয়েদের শরীরে জীবনীশক্তির অভাব ঘটে, অনেক রোগের আক্রমণ তারা সহ্য করতে পারে না, উৎপাদিকা শক্তিও অপেক্ষাকৃত কম হয়—জীবন-সংগ্রামে শেষ পর্য্যন্ত তারা টিঁকে থাকতে পারে না। মনের দিক দিয়েও এই রকমের দো-আঁশলা জাতীয় ছেলে-মেয়েরা বিশেষ সুবিধা করতে পারে না। এদের চিত্তে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার লড়াই প্রায় সকল সময়ের জন্য লেগেই থাকে। বাপের রক্ত এক দিকে টানে, মায়ের রক্ত টানে আর এক দিকে। জীবন হয়ে যায় একটা কুরুক্ষেত্রের মতো। এই টানাটানির মধ্যে প'ড়ে ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করতে পারে না। নীতির যে-সব আদর্শ জাতীয় জীবনে দীর্ঘকাল ধ'রে চলে আসছে —তারা যদি চরিত্রের মধ্যে শিকড় গাড়তে না পায়— আমাদের নৈতিক চরিত্র দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। দো-আঁশলা জাতের ছেলে-মেয়েদের নৈতিক অনুশাসনগুলির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব দেখা যায় না। সমাজ থেকে বিতাড়িত হয় যারা—সমাজের প্রচলিত নৈতিক আদর্শের প্রতি অন্তরে অনুরাগ পোষণ করা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। ম্যাকডুগ্যাল তার মতকে সমর্থন করতে গিয়ে যে-সব বর্ণশঙ্কর জাতির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাদের মধ্যে আমেরিকার মালেট্টো (Mulatto) আর ভারতের ফিরিঙ্গীদের কথা আছে। মালেট্টোরা কোনো কোনো বিষয়ে খাস নিগ্রোদের চেয়ে উন্নত স্তরের হয় বটে—কিন্তু তাদের জীবনীশক্তি ও উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়। তা ছাড়া নিগ্রোদের চেহারার নিজস্ব যে একটা সৌন্দর্য্য আছে— শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে রক্তের মিশ্রণের ফলে সেই সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট অবনতি ঘটে। যবদ্বীপে স্থানীয় অধিবাসী এবং ওলন্দাজেরা মিলিত হয়ে যে-সব পুত্রকন্যা পৃথিবীতে নিয়ে আসে তারা জাতি হিসাবে জোরালো হয় না। যাদের আমরা ফিরিঙ্গী অথবা ট্যাঁশ বলে থাকি—জাতি হিসাবে তাদের দুর্ব্বলই বলতে হবে।

পক্ষান্তরে যে দুটো জাতি পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র হয়েও অনেক দিক দিয়ে খুব কাছাকাছি—বৈচিত্র্য সত্ত্বেও যাদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে—তাদের মধ্যে রক্তের মিশ্রণ ঘটলে ফল ভালই হয়। ম্যাকডুগ্যাল বলছেন— ইউরোপের জাতিগুলি যে এমন প্রগতিশীল তার একটা প্রধান কারণ তাদের পরস্পরের মধ্যে বারম্বার রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। দুটো জাতের মধ্যে ঐক্যের চেয়ে অনৈক্য যেখানে বেশী—সেখানে যে রক্তের মিশ্রণ লাভের চেয়ে ক্ষতির কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়—সে কথা আগেই বলা হয়েছে। ইউরোপীয়দের বেলায় আন্তর্জাতিক বিবাহ যে ক্ষতির কারণ হয় নি তার কারণ তাদের মধ্যে অমিলের চেয়ে মিল বেশী। একটা জাত আর একটা জাতকে জয় করেছে—বিজেতা এবং বিজিত জাতির ছেলে মেয়েরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে—কিন্তু রক্তের সেই মিশ্রণের ফলে ইউরোপে মালেট্টো অথবা ফিরিঙ্গীদের মত দুর্ব্বল জাতি দেখা দেয় নি। ইউরোপকে বাঁচিয়েছে—তার জাতিগুলির সংস্কৃতিগত একটা ঐক্য।

ভিন্ন ভিন্ন দুটো জাতের মধ্যে যেখানে অনেক দিক দিয়ে মিল আছে—সেখানে রক্তের মিশ্রণ ঘটলে মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটে নানা পথে। এই মিলনের ফলে জাতীয় জীবনে আসে বৈচিত্র্য। মনের শক্তির এই বৈচিত্র্যময় প্রকাশ যেখানে নেই সেখানে জাতি তার গতিবেগ হারিয়ে ফেলে স্থাণু হয়ে যায়। রক্তের বৈচিত্র্য আনে মানসিক শক্তির বৈচিত্র্য। জাতির চিন্তাধারা নূতন নূতন পথে ছুটতে আরম্ভ করে। যে-সব জাতের মধ্যে রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে তাদের মধ্যে প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। মনের শক্তিগুলি বিচিত্রপথে প্রকাশ লাভের সুবিধা পায় ব'লেই ভিন্ন ভিন্ন দুই জাতির মধ্যে রক্তের মিশ্রণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের আবির্ভাবের পথকে প্রশস্ত করে। এ কথা খুবই সত্য জাতির প্রগতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে তার শক্তিশালী পুরুষদের প্রতিভার বৈচিত্র্যের উপরে। যে-জাতি উন্নতির শিখর থেকে শিখর পানে আগিয়ে যেতে চায় তাকে সৃষ্টি করতে হবে বড় বড় কবি ও সাহিত্যককে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক এবং আবিষ্কারককে। জাতির জনসাধারণের মানসিক শক্তি উচ্চস্তরের হ'লেও যদি তার ক্ষমতা না থাকে রাজনীতি, সাহিত্য, ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান— সকল ক্ষেত্রে বিরাট্ বিরাট্ প্রতিভাকে সৃষ্টি করবার—

তবে উন্নতির পথে খানিক দূর আগিয়ে তাকে থেমে যেতে হবে। চীনের জাতীয় জীবনে এই ব্যাপার আমরা দেখেছি।

রক্তের সঙ্গে রক্তের মিশ্রণ ঘটলে ফল ভালও হতে পারে, মন্দও হ'তে পারে—এর নজির ইতিহাসে আমরা পেয়েছি। ফলের ভালমন্দ নির্ভর করে যে দুটো জাতের মধ্যে রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে—তাদের মধ্যে ব্যবধানের পরিমাণের উপরে। ব্যবধান খুব বেশী হ'লে ফল খারাপ হওয়ার সম্ভাবনাই ষোল আনা। ব্যবধান অল্প হ'লে মিশ্রিত রক্তের বৈচিত্র্য জাতিকে উন্নতির পথে আগিয়ে দেবে। এই সিদ্ধান্ত যে বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে এবং এর যে নড়-চড় নেই—এমন কথা, অবশ্য, জোরের সঙ্গে বলা চলে না—ম্যাকডুগ্যাল তা বলেন না—সাধারণ অভিজ্ঞতা এবং ভূয়োদর্শন এই সিদ্ধান্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে এই কথাই ম্যাকডুগ্যাল বলেছেন।

আমাদের দেশে বিজেতা আর্য্যেরা পরাজিত অনার্য্যগণকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করত না। অনার্য্যদের চেহারা ছিল কাল—আর্য্যদের রং ছিল ফরসা, আকৃতি লম্বা। দুটো জাতের মধ্যে প্রভেদ ছিল বিস্তর। এ রকম অবস্থায় আর্য্যদের পক্ষে খোলা ছিল দুটো পথ। অনার্য্যদিগকে দূরে দূরে ঠেকিয়ে রাখার পথ এবং তাদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে মিলিত হবার পথ। এ দুটোর কোনটাই নিরাপদ নয়। বিবাহ করলে বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি আর বর্ণসঙ্করের ফল যে ভাল নয় আমেরিকার মালেট্টো এবং ভারতবর্ষের ট্যাস্‌ফিরিঙ্গীরা তার প্রমাণ। আর্য্যেরা রক্তকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্য জাতিভেদের প্রাকার তুলে অনার্য্যদের কাছ থেকে আপনাদিগকে দূরে দূরে রেখে দিল। রক্তের মিশ্রণ তাতে একেবারে যে বন্ধ হ'ল—তা নয়; তবে জাতিভেদ আর্য্য এবং অনার্য্যদের মধ্যে এমন একটা ব্যবধান রচনা করল যাকে প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য বলা চলে। রক্তকে বিশুদ্ধ রাখবার উপরে এই যে অত্যধিক জোর—এরও একটা বিপদ আছে। রক্তের বৈচিত্র্যহীনতা জাতির মানসিক শক্তিকে একটা বিশেষ স্তরে স্থির রেখে দেয়, তার লোকগুলির চিন্তার ধরণ প্রায় এক রকমের হয়ে থাকে। এর ফলে জাতি হয়ে যায় রক্ষণশীল, অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে সৃষ্টি করবার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলে, ফলে তার গতিবেগ যায় বিনষ্ট হ'য়ে। প্রগতির পথে অগ্রসর হবার ক্ষমতা ভারতবর্ষ যে হারিয়ে ফেলেছে তার কারণ দর্শাতে গিয়ে ম্যাকডুগাল আমাদের আড়ষ্ট জাতিভেদ-প্রথাকে দায়ী করেছেন। জাতিভেদ-প্রথা রক্তের মিশ্রণ ঘটবার পথে অন্তরায় হয়ে নব নব পথে প্রতিভার উন্মেষ ঘটতে দিচ্ছে না।

রক্তের মিশ্রণের সঙ্গে প্রতিভার সম্পর্ক নিয়ে The Ancestry of Genius শীর্ষক একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন পরলোকগত প্রথিতযশা পণ্ডিত হ্যাভেলকে এলিস। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,

"Wherever the races have remained comparatively pure we seldom find any high or energetic civilisation, and never any fine flowering of genius."
(Views and Reviews by Havelock Ellis, p. 83).

"জাতির মধ্যে যেখানে রক্তের মিশ্রণ খুব কম ঘটেছে সেখানে সভ্যতা জোরালো হবার অথবা উচ্চ স্তরে উঠবার সুযোগ পায় নি। খুব উঁচুদরের প্রতিভার জন্মও সেখানে একান্ত দুর্লভ।"

একই প্রবন্ধে পুনরায় তিনি বলছেন,

"Wherever, on the other hand, we find a land where two unlike races, each of fine quality, have become intermingled and are in process of fusion, there we find a breed of men who have left their mark on the world, and have given birth to great poets and artists.
(Views and Reviews by Havelock Ellis, p. 83).

"পক্ষান্তরে যেখানেই ভিন্ন-প্রকৃতির দুটো উচ্চস্তরের জাতির মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে সেখানেই আমরা দেখতে পাই একদল মানুষের মত মানুষের আবির্ভাব যারা কালের ললাটে তাদের ছাপ রেখে গেছে এবং পৃথিবীকে উপহার দিয়ে গেছে বড় বড় কবি আর শিল্পী।"

এলিসের সঙ্গে এখানে ম্যাকডুগালের মতের যথেষ্ট সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই। এলিস এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা ক'রে গেছেন। টেনিসন, ব্রাউনিং, সুইনবার্ণ, রসেটি এবং মরিস্—এই কয়জন প্রথিতযশা কবির বংশ-আলোচনা ক'রে এলিস দেখেছেন—এঁদের কারও ধমনীতে বিশুদ্ধ ইংরেজের রক্ত নেই। টমাস হার্ডি প্রমুখ প্রথিতযশা আরও কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর ইংরেজ লেখকের বংশ-পরিচয় পেতে গিয়ে এলিস একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। পরিশেষে এলিস লিখছেন,

While we have found that among twelve eminent British imaginative writers no less than ten show more or less marked traces of foreign blood, and not one can be said to be pure English. Mr. Galton found that out of every ten distinguished British scientific men, five were pure English, and one had foreign blood.

রক্তকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্য বিয়ের ব্যাপারে যাঁরা একটা বিশেষ গণ্ডীর বাইরে যেতে নারাজ—হ্যাভেলক এলিসের এবং ম্যাকডুগালের মন্তব্যের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করি।

ম্যাকডুগ্যাল রক্তের মিশ্রণের উপরে এতটা যে জোর দিয়েছেন—তার কারণ আছে। তিনি মনে করেন, জাতির মনে যেখানে প্রশ্ন করবার প্রবৃত্তি জেগেছে সেখানেই তার উন্নতি সম্ভব। যেখানে তার চিত্তে

জানাবার ইচ্ছা বলবতী হয় নি অনুসন্ধিৎসা দুর্ব্বল সেখানে তার উন্নতি সম্ভব নয়। ভিন্ন ভিন্ন দুটো জাতির রক্ত যেখানে মিলেছে সেখানে রক্ষণশীলতার প্রভাব আমরা কম দেখতে পাই—সেখানে মানুষ সহজে পুরাতনের আধিপত্যকে মেনে নিতে চায় না, যুক্তির কষ্টিপাথরে সামাজিক অনুশাসনগুলিকে যাচাই ক'রে নিতে চায়।

মনে যেখানে অনুসন্ধিৎসা জেগেছে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠেছে সেখানে মানুষ জীর্ণ আচারের তপ্ত কোটরের মধ্যে শীতকালের সাপের মত ঘুমিয়ে থাকতে পারে নি—রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি সব-কিছুকে চ্যালেঞ্জ করেছে। মানুষের মনে যেখানে প্রশ্ন জাগে নি সেখানে সে রাষ্ট্রের ছায়া, সমাজের প্রতিধ্বনি; বস্তুর পর্য্যায়ে তার আসন। মানুষ যেখানে জানতে চায় নি সেখানে সে কেবলই মেনে চলেছে যন্ত্রের মতো; সে মেনে চলেছে রাষ্ট্রের নির্দ্দেশকে, সমাজের অনুশাসনকে, পারিবারিক কর্ত্তব্যের বিধানগুলিকে। সেখানে কি তার করা উচিত এবং কি তার করা উচিত নয় তার অধিকারগুলির সীমানা কত দূর পর্য্যন্ত—সমাজের বিধিনিষেধ এবং আইনের বই তা আগে থাকতেই ঠিক ক'রে রেখেছে। কিন্তু যেই মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে, রাষ্ট্রের এবং সমাজের অনুশাসনগুলিকে মানবো কিসের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য আমি, না, আমার জন্য রাষ্ট্র, সমাজের হুকুম তামিল করবার জন্য আমি রয়েছি, না, আমার আত্ম-প্রকাশের পথকে প্রশস্ত করবার জন্য সমাজ রয়েছে, রাষ্ট্রের প্রতি যেমন আমার কর্ত্তব্য রয়েছে তেমনি আমার প্রতি কি আমার কোন কর্ত্তব্য নেই? অমনি পুরাতনের ভিত্তিমূল কাঁপতে আরম্ভ করেছে, মৃতের জগতে বিপ্লবের ঝড় এসেছে আর সেই বিপ্লবকে আশ্রয় ক'রে সমাজ-জীবনে দেখা দিয়েছে সাম্যের এবং স্বাধীনতার নববসন্ত। যা চলে আসছে দীর্ঘকাল ধরে কর্ত্তব্যের জয়ধ্বজা উড়িয়ে—তাকে যে মুহূর্ত্তে প্রশ্ন করবার মত সাহস সঞ্চয় করেছে মানুষের মন সেই মুহূর্ত্তে তার ইতিহাসে শিকল ভাঙার পালা হয়েছে সুরু। সে নিজের মন নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছে, নিজের চোখ দিয়ে দেখতে আরম্ভ করেছে, নিজের কান নিয়ে শুনতে আরম্ভ করেছে। সে বলেছে, মানবো না তাকে যা আত্মার দাবীকে করে তুচ্ছ, যা মানুষের জীবনকে দান করে না তার যথোপযুক্ত মর্য্যাদা। মানুষের সেই না বলবার দুর্জ্জয় শক্তি দিগন্তব্যাপী সাম্রাজ্যকে দিয়েছে রসাতলে ডুবিয়ে, শাস্ত্রের আধিপত্যকে করেছে দুর্ব্বল, অর্থহীন বিধি-নিষেধের বেড়া দিয়েছে ভেঙে, অচলায়তনের অস্তিত্বকে করেছে নিঃশেষ।

যাকে জানি নে তাকে জানবার এই যে অদম্য কৌতূহল, সব-কিছুকে প্রশ্ন করবার এই যে দুর্জ্জয় spirit of inquiry এই হচ্ছে কল্যাণের বাহন। জানার ভিতর দিয়েই আসবে প্রেম। মানুষ যতক্ষণ পরস্পরের কাছে অপরিচিত ততক্ষণই তাদের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব থাকা সম্ভব। ব্যক্তিগত পরিচয়ের মধ্য দিয়ে পরস্পরকে জানা যত গভীরতর হয়—পরস্পরের প্রতি প্রেমও তত নিবিড়তর হবার সুযোগ পায়। মানুষ যেই বুঝতে পারে—যে দুঃখ তাকে বিচলিত করে সেই দুঃখ আর একজনকেও বিচলিত করে, যে সুখ তাকে আনন্দ দেয় সেই সুখ আর এক জনকেও আনন্দ দেয়, দুজনেই একই মঙ্গলের কাঙাল, একই ভয়ে ভীত, একই আশা-আকাঙ্ক্ষায় দু'জনেরই হৃদয় উদ্বেলিত, তখন অন্যের সঙ্গে আপনার ঐক্য খানিকটা অনুভব না ক'রে থাকতে পারে না। আগে যে মানুষটার দিকে সে ফিরেও তাকাত না, তাকালেও বক্রদৃষ্টিতে তাকাতো—অপরিচয়ের ব্যবধান বিলুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই মানুষই কখন্ তার হৃদয়ের অত্যন্ত কাছাকাছি এসে গেছে—তারই মতই সে যে স্কন্ধে দুঃখের বোঝা নিয়ে বাধাবিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে জীবনের পথে চলেছে!

কেউ বলে হৃদয়ের দিক্ দিয়ে মানুষ যত বিশাল হয়েছে—তার ইতিহাসও তত গৌরবময় হ'য়ে উঠেছে। আবার কেউ কেউ বলেন, মানুষের মগজ যত স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার শক্তি লাভ করেছে তার ইতিহাসে তত উন্নতি দেখা গেছে। জ্ঞান আর প্রেম—এর কোনটাকেই অবহেলা করা চলে না। 'প্রতিবেশীকে আপনার মতই ভালবাস।' —মানুষের সমস্ত উন্নতির দিকে ইঙ্গিত করছে এই প্রেম। কিন্তু 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম' বললেই মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে তার কোন কারণ নেই। আমাদের আত্মা বাঁধা রয়েছে অজ্ঞতার এবং ভয়ের নাগপাশে। এই বাঁধন যতক্ষণ না খুলছে, পাহাড়ের অথবা সমুদ্রের ওপারের মানুষগুলির মধ্যে যে কাম, যে ক্রোধ, যে লোভ, যে পরশ্রীকাতরতা, আমার মনের মধ্যেও যে সেই সব প্রবৃত্তিরই খেলা, আমার মধ্যে যে-সব ভাল ভাল গুণ রয়েছে ব'লে মনে করি—তাদের মধ্যেও যে সেই সব ভাল গুণের অভাব নেই—এই জ্ঞান যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ ত তাদের জন্য হৃদয়ে কোন প্রেম আসবে না। সুতরাং জ্ঞান আর প্রেম—এদের কাউকে অস্বীকার ক'রে প্রগতির পথে আগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে এই যে আলোচনা এর প্রয়োজন ছিল দুই দিক্ দিয়ে—ব্যষ্টির দিক্ দিয়ে এবং সমষ্টির দিক্ দিয়ে। কোন

পুরুষ যখন নারীকে স্পর্শ করে সেই স্পর্শে নারীর মধ্যে যা-কিছু সুন্দর তা যেমন জেগে উঠতে পারে, তার মধ্যে যা-কিছু অসুন্দর তাকেও জাগিয়ে দেওয়া তেমনি অসম্ভব নয়। এই জন্যই নর-নারীর যৌন সম্পর্ককে আমরা একেবারেই উপেক্ষা করতে পারি নে। এই সম্পর্কের প্রভাব আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে অতিক্রম ক'রে জাতীয় জীবনকেও বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। জাতি কেবল পুরুষকে নিয়ে নয়, মেয়েদের নিয়েও বটে। সেই মেয়েরা যেখানে আত্মপ্রকাশের অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং নানাদিক দিয়ে নিষ্পেষিত, সেখানে জাতির অর্দ্ধেকটা পঙ্গু থাকতে বাধ্য এবং সেই পঙ্গুত্ব পুরুষকেও নীচুর দিকে নামিয়ে আনবেই। দুজন মানুষ যখন অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়ে আর তার মধ্যে একজন যদি জ্ঞানের এবং সংযমের দিক দিয়ে অত্যন্ত পিছিয়ে থাকে তবে ফল কিন্তু প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শোচনীয় হতে বাধ্য। এই জন্যই নরনারীর যৌন সম্পর্ককে আমরা যদি উপেক্ষার চোখে দেখতে আরম্ভ করি তবে ক্ষতি যে কেবল ব্যক্তিরই হবে তা নয় সেই উপেক্ষা সমাজের শিরেও অভিশাপ ডেকে আনবে।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মহাযুদ্ধের গতি ক্রমশই মন্থর এবং বক্র হইয়া চলিতেছে। রুশ রণক্ষেত্রে বর্ত্তমানে সোভিয়েটের শীতকালীন অভিযানের শেষ অঙ্ক দৃশ্যপটে আসিয়াছে। রুশ দেশে এখন তুষার গলিবার সময়, শীতের প্রকোপ ক্রমেই কমিতেছে এবং রণাঙ্গন "মহাপঙ্কে" পরিণত হইতেছে। এখন সোভিয়েটের সুদীর্ঘ যুদ্ধপ্রান্তে উভয় পক্ষই আগামী গ্রীষ্ম ও শরৎকালীন অভিযানের জন্য আক্রমণ ও রক্ষণ পথের সুদৃঢ় ব্যবস্থা করায় ব্যস্ত। দক্ষিণে জার্ম্মান দল ক্রমাগত আক্রমণ চালাইতেছে, যাহার উদ্দেশ্য হস্তচ্যুত অভিযান পথের উদ্ধার এবং সোভিয়েটের নূতন রক্ষণব্যূহ গঠনে বাধাদান ভিন্ন আর কিছুই নহে। অল্পদিন পরেই দক্ষিণ অঞ্চলের পথ-ঘাট সকলই গলিত তুষারপঙ্কে অচল হইয়া যাইবে। তাহার পর কিছুকাল খণ্ডযুদ্ধ বা স্থাণু-ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই চলিবে না। মধ্যভাগে ভ্যাজমা অঞ্চলে রুশসেনার আক্রমণ পূর্ণ বিক্রমেই চলিতেছে। ইহাতে দক্ষিণের রুশ সেনার উপর চাপের লাঘব এবং মধ্যের জার্ম্মানবাহিনীর আক্রমণ-পথের বেদখল এই দুই উদ্দেশ্যই রহিয়াছে মনে হয়। উত্তরে খণ্ডযুদ্ধ ভিন্ন অন্য কিছুর বিকাশ দেখা যায় নাই। মোটের উপর রুশ রণক্ষেত্রে এখন কোন পক্ষ প্রবল হইতেছে তাহা নিরূপণ করা দুরূহ ব্যাপার দাঁড়াইতেছে। কারণ এখন ঐ দেশের যুদ্ধে একরূপ ধ্রুব ভাব আসিয়াছে যাহার পরিণতি অত্যন্ত অনিশ্চিত।

যে শীতকালীন অভিযান শেষ হইতে চলিয়াছে তাহার বিষয়ে আগেই বলা হইয়াছিল যে উহা নির্দ্দিষ্ট স্বল্পলক্ষ্য এবং একমুখী। যেভাবে উহার কার্য্য এ পর্য্যন্ত চলিয়াছে—এবং এখনও কিছু কিছু চলিতেছে—তাহাতে মনে হয় যে অনেক ক্ষেত্রে অভিযানের গতি লক্ষ্য উত্তীর্ণ হইয়া চলিয়া গিয়াছে এবং কয়েকটি বিশেষ স্থলে—যথা কর্চ খাড়ির পারের কুবান অঞ্চলে--উহা লক্ষ্যস্থলে পৌছাইতে পারে নাই। উপস্থিত যে অবস্থা তাহাতে সব কিছুই নির্ভর করিতেছে দুই পক্ষের মধ্যে আপেক্ষিক লোকসানের নির্ণয়ে। এই অভিযান চালনায় সোভিয়েট যেরূপ অসাধ্য সাধন করিয়াছে এবং যে সকল বিষম বাধা অতিক্রম করিয়াছে তাহাতে খরচের খাতায়—লোকবলে এবং যুদ্ধাস্ত্রে—অঙ্ক কিরূপ উঠিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। অন্য দিকে নিশ্চিন্ত অবস্থায় স্থিত নাৎসীবাহিনীগুলি অতর্কিত প্রচণ্ড আক্রমণে যেভাবে দলিত ও মথিত হইয়াছে তাহাতে তাহাদেরও ক্ষতি বৃহৎ অনুপাতেই ঘটিয়াছে। এখন বিচারের বিষয় কাহার পুঁজি কতটা ক্ষতি সহ্য করিতে পারে। যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ-সম্ভারের বিষয়ে রুশকে আমেরিকা ও ব্রিটেন কতটা সাহায্য করিতেছে, সে ব্যাপার লইয়া এখন যুক্তরাষ্ট্রে এক তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। মস্কোয়ের যুক্তরাষ্ট্রদূত স্টাণ্ডলি এক তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন যে সোভিয়েট বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে অস্ত্র ও যুদ্ধসম্ভার কর্জ্জ ও ইজারা সর্ত্তে পাইতেছেন সে সম্বন্ধে সোভিয়েট রাষ্ট্রপতিগণ কোনও উচ্চবাচ্য করিতেছেন না, তাঁহারা যেভাবে সংবাদ প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে মনে হয় যেন রুশসেনা কেবল মাত্র স্বদেশের সম্বলের উপরই নির্ভর করিয়া লড়িয়া যাইতেছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্র বিদেশ হইতে কি সাহায্য পাইয়াছে বা পাইতেছে তাহার কোনও বিশেষ খবর আমরা জানি

না। কিন্তু এই মহাযুদ্ধের মধ্যে স্থলে ও আকাশে যে সকল ঘাত-প্রতিঘাত হইয়াছে তাহার ৮০./° রুশ দেশের সীমার মধ্যেই ঘটিয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অসীম শৌর্য্য এবং ক্ষতি সহ্য ক্ষমতার ফলেই অক্ষশক্তিপুঞ্জের বিরাট্ অংশ রুশদেশে যুদ্ধব্যূহবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং মিত্র দলের অন্যেরা যুদ্ধ সম্ভারে বা অন্যভাবে সোভিয়েটকে যতটাই সাহায্য করিয়া থাকুন, তাহা তাঁহাদের কর্ত্তব্য ঋণশোধের এক অংশ মাত্রই বিবেচিত হইতে পারে।

ট্যুনিসিয়ায় চালমাতের পালা শেষ হইয়া নূতন দানের আরম্ভের পূর্ব্বলক্ষণ দেখা যাইতেছে। এত দিন পর্য্যন্ত দুই পক্ষই বিপক্ষের শক্তি নির্ণয় এবং ব্যূহ সন্ধানের কার্য্যে ব্যস্ত ছিল। সম্প্রতি ঐ যুদ্ধক্ষেত্রের নানাদিকে যে সকল চাল-বেচালের খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে শীঘ্রই খণ্ডযুদ্ধগুলি সম্যকভাবে যুদ্ধ-অভিযানে পরিণত হইবে। ট্যুনিসিয়ায় অক্ষশক্তি যুদ্ধক্ষম হইয়া দাঁড়াইয়াছে একথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অন্য দিকে মিত্রপক্ষে যে আয়োজন চলিতেছিল তাহাও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এরূপ নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং বল-পরীক্ষার সময় আর বেশী দূরে নাই এরূপ বলা চলে।

ট্যুনিসিয়ার রণাঙ্গনে অক্ষশক্তির অনেকগুলি সুবিধা আছে, বিশেষতঃ সরবরাহের ব্যাপারে। মিত্রপক্ষের আকাশ-বাহিনী অতিশয় তৎপর হইয়া ঐ সকল অনুকূল ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছে এবং সে কাজে অনেকটা সাফল্যও অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও এই যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ নিষ্পত্তি সহজ হইবে মনে হয় না। এত দিন মহাযুদ্ধে আকাশ-শক্তি স্থলসেনা বা নৌসেনার সাহায্য-কারী অঙ্গ মাত্র ছিল, এখন ক্রমেই তাহার বিকাশ হইয়া, জল ও স্থল সেনার ন্যায়, আকাশসেনা রূপে তাহার পৃথক্ প্রকাশ দেখা যাইতেছে; কিন্তু এখনও এই নূতন বাহিনীর সম্পূর্ণ পৃথক্ অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে নাই। শেষ নিষ্পত্তি এখনও স্থলসেনারই হস্তে এবং বিশেষতঃ পদাতিক সেনার।

পূর্ব্ব-এসিয়ার যুদ্ধে চীনদেশে জাপানের আক্রমণ আবার ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। ইয়াংসি নদের উত্তরে, হুপে প্রদেশে এবং চীন-ব্রহ্ম সীমান্তের য়ুন্নান প্রদেশে জাপানী বাহিনীর আক্রমণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। অস্ত্রের অভাবে অবরুদ্ধ স্বাধীন চীনের অবস্থা ক্ষীণ, তবে সেখানে উদ্যম বা বীরত্বের কোনও অভাব দেখা দেয় নাই।

ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের যুদ্ধ সম্পর্কে যে "অর্দ্ধ সরকারী" মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে "বর্ম্মা রোড" উদ্ধার এখন সুদূরপরাহত। এইরূপ অবস্থায় চীন রাষ্ট্রের লোকজনের মনের মধ্যে উদ্বেগ ও নিরাশার আগমন যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা মিত্রশক্তি-দলের কর্ণধারগণ করিতেছেন ইহা আশা করা যায়, কেন-না এখন স্বাধীন চীন অতি ভয়ানক ভাবে বিপন্ন সে-কথা ম্যাদাম চিয়াং-কাইশেক মার্কিন দেশে স্পষ্টই বলিয়াছেন। যেভাবে এসিয়া ভূমিখণ্ডে এখনও যুদ্ধের ব্যবস্থা চলিতেছে তাহাতে জাপানের-শক্তি হ্রাসের কোনও বিশেষ লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ক্ষতি তাহার হইয়াছে এবং হইতেছে সন্দেহ নাই—বিশেষতঃ বাণিজ্য জাহাজে এবং এরোপ্লেনে—এবং তাহার পরিমাণও যথেষ্ট। কিন্তু জাপানের ক্ষতিপূরণের ক্ষমতা কি তাহা বাহিরের কেহই সঠিক জানে না এবং কোন দিনও বিশেষ জানিত কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমান কালে সেই ক্ষতিপূরণ-ক্ষমতা কাঁচা মালের হিসাবে বাড়িয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য যে বিশাল ভূমিখণ্ড এখন উদীয়মান সূর্য্য-পতাকার অধীনস্থ তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে জাপানের ক্ষমতা শেষসীমায় ঠেকিয়াছে মনে হয়, কিন্তু জাপানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা চিরকালই বহির্জ্জগতের কাছে হেঁয়ালী।

ব্রহ্ম সীমান্তে—আরাকান অঞ্চলে—যুদ্ধ এখন এক জটিল সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। এ বিষয়ে যে সকল খবর এবং মন্তব্য সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উপর বিচার করিতে হইলে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা এবং মিত্রশক্তির এসিয়ায় যুদ্ধ পরিচালনার ব্যবস্থা এই দুইয়ের ব্যাপক ভাবে সমালোচনা করিতে হয়, সুতরাং সম্প্রতি সে কথা স্থগিত রহিল। মিত্রপক্ষের উচ্চতম কর্ণধার চীনকে সাহায্যদান সম্পর্কের এক প্রশ্নের উত্তরে সবকিছু ভগবানের হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছেন। ইহা শাস্ত্রসঙ্গত, এবং আমরা 'উদ্যোগী পুরুষসিংহ'রূপে জগতে প্রখ্যাতনামা নহি, সুতরাং উপরোক্ত মহাজনের পন্থা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ।



এরোপ্লেন হইতে গুয়াদালকানাল বিমান-ঘাঁটির একটি দৃশ্য





সলোমন দ্বীপমালায় মার্কিন-নৌবহর কর্তৃক জাপ-পরিত্যক্ত রসদপত্র উদ্ধার



নিউ গিনির অরণ্যানীর ভিতরে মিত্র-সেনারা পথ করিয়া লইতেছে



সলোমন দ্বীপে মার্কিন অভিযাত্রী সেনাদল



গুয়াদালকানাল রণ-ক্ষেত্র অভিমুখে মার্কিন নৌ-সেনাদলের যাত্রা

সোভিয়েট রুশিয়ার যুদ্ধ-প্রাচীর-চিত্র



নারী ও শিশুর উপর নাৎসীদের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে
রুশ-সেনানীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে



পুত্রকে শত্রু-বিতাড়নে মাতা উত্তেজিত করিতেছেন

[শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত

বর্ত্তমান সংগ্রামে চীন-রমণী



হাসপাতালে শুশ্রূষাকারিণী-বেশে মাদাম চিয়াং কাই-শেক



উচ্চশিক্ষিতা চীন-রমণীর অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহা। লিংকিয়াং কলেজ সাংহাই হইতে বার শত মাইল দূরে অবস্থিত চুংকিঙে স্থানান্তরিত হইবার পর ভদ্রবংশীয়া কলেজ-ছাত্রীগণ কর্তৃক স্বহস্তে রাস্তা নির্ম্মাণ, খেলার মাঠ পরিষ্কার এবং উদ্যান রচনা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ঔপনিবেশিক দায়িত্ব

প্রবল শত্রুর আক্রমণ হইতে ব্রিটেন তাহার সকল উপনিবেশ রক্ষা করিতে পারে নাই, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। মালয় ও ব্রহ্মদেশ জাপান কর্তৃক এত সহজে অধিকৃত হইবার একটি প্রধান কারণ, ব্রিটিশ শাসকগণের প্রতি স্থানীয় অধিবাসীদের অবিশ্বাস ও যুদ্ধে নির্লিপ্ততা ইহাও প্রকাশ্যেই স্বীকৃত হইয়াছে। মালয় ও ব্রহ্মকে ব্রিটেন নিজের শক্তিতে রক্ষা করিতে পারে নাই, তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে স্বাধীনতা দান করিয়া উহাদের বন্ধুত্ব অর্জন করিয়া উহাদেরই সাহায্যে দেশরক্ষার চেষ্টা করাও ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের অদূরদর্শী ঔপনিবেশিক নীতির ফলে সম্ভব হয় নাই। ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক নীতি লইয়া সমালোচনা হইবে, ইহা স্বাভাবিক; আমেরিকায় বিশেষ ভাবে সমালোচনা হইতেছেও। মালয় ও ব্রহ্ম জাপানের কবল হইতে পুনরুদ্ধার করিতে হইলে আমেরিকা ও চীনের সাহায্য গ্রহণ ব্রিটেনের পক্ষে অপরিহার্য্য। সুতরাং এই সব দেশের ভবিষ্যৎ লইয়া আমেরিকা ও চীনে আলোচনা হইলে ব্রিটেনের তাহাতে উষ্ণ হইয়া উঠিবার কোন হেতু নাই। তথাপি একমাত্র আমেরিকার সমালোচনাতেই ব্রিটিশ ধুরন্ধরদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে; ব্রিটিশ উপনিবেশ-সচিব অক্সফোর্ডে এক বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়াছেন যে বিলাতী ঔপনিবেশিকসমূহের শাসনভার ব্রিটেনের হাতেই থাকিবে, সাগরপার হইতে এ সম্বন্ধে যে-সব সমালোচনা হইতেছে তাহা মানিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন।

উপনিবেশ-সচিব মিঃ ষ্টানলীর এই বক্তৃতায় যে মূর্খতারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, বিলাতের "ডেলী হেরাল্ড" পত্রিকা তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সম্মিলিত জাতিসমূহের সম্মেলন শীঘ্রই হইবে এবং উহাতে পৃথিবীর সকল দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা আলোচিত হইবে। সম্মেলন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই এই ধরণের মন্তব্য প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরে সম্মিলিত দেশগুলিকেই অসম্মান করা হইয়াছে ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয়ও এই বক্তৃতায় নাই। আটলাণ্টিক-চার্টারে স্বাক্ষর করিবার পর ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের উপনিবেশ-সচিবের এই উক্তি এশিয়া ও আফ্রিকার জনসাধারণের মনে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি করিবে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য বর্ত্তমান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া ব্রিটেন যে-সব ঘোষণা এত দিন করিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর উপনিবেশের অধিবাসীদের পক্ষে আর আস্থা রক্ষা করা কঠিন হইবে। যুদ্ধের মাঝখানেই এই শ্রেণীর উক্তি করিয়া ব্রিটেন যে দুর্জ্জয় সাম্রাজ্যবাদের পরিচয় দিয়াছে, যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় তাহা কি সাহায্য করিবে?

—

তদন্তের প্রতিশ্রুতি

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বাজেট অধিবেশনে মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় পুলিস ও সরকারী কর্ম্মচারিগণ কর্তৃক নিরপরাধ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার, সম্পত্তি ধ্বংস, গৃহে অগ্নি-সংযোগ, পুরুষ ও নারীর উপর লাঞ্ছনা প্রভৃতি আলোচনা করিবার জন্য মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবের উত্থাপক ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল জানান যে অভিযোগের গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াই তিনি গবর্ন্মেণ্টের বিরুদ্ধে উহা আনিতেছেন এবং নিরপেক্ষ কোন তদন্ত-কমিশন গঠিত হইলে এই সমস্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে তিনি প্রমাণ দাখিল করিতে পারিবেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে মেদিনীপুর সম্বন্ধে বহু তথ্য উদ্ঘাটিত করেন। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"আইন-অমান্য-আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতে মেদিনীপুরের বহু স্থানের নৌকা, সাইকেল প্রভৃতি যানবাহন অপসারণ কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে। এই একটি মাত্র জেলা হইতে প্রায় দশ হাজার সাইকেল কাড়িয়া লওয়া হয় এবং অতি অল্প দিনের নোটিসে বহুসংখ্যক নৌকা গবর্ন্মেণ্টের হাতে সমর্পণ করিবার আদেশ দেওয়া হয়। নৌকা সমর্পণে বিলম্বের অজুহাতে কয়েক শত নৌকা ভাঙিয়া ফেলা হয়। এই সব কার্য্যকলাপের ফলে জেলার অধিবাসীদের মানসিক অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

তার পর আসিল-আইন-অমান্য আন্দোলন। আন্দোলন কি ভাবে চলিয়াছে তাহার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত দেওয়ার প্রয়োজন নাই। সরকার-প্রদত্ত বিবরণ মানিয়া লইয়াই বক্তা স্বীকার করিতেছেন যে আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা সত্য যে আন্দোলনকারিগণ অহিংস ভাবেই উহা চালাইতেছিল। বক্তা জোরের সঙ্গে বলেন যে প্রধান মন্ত্রী যখন তাঁহার বিবৃতি দিবেন তখন তাঁহাকেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে

যে গবর্মেণ্টের অত্যধিক কঠোর দমননীতি প্রযুক্ত হইবার পূর্বে তথাকার কর্মিগণের বিরুদ্ধে একটিও হিংসামূলক কার্য্যের অভিযোগ আসে নাই। সরকারের তরফ হইতে নির্বিচারে গ্রেপ্তার চলিয়াছে, ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং লুঠতরাজ করা হইয়াছে। এই ছিল জেলার অবস্থা।

কাহার আদেশে জনসাধারণের ঘরে আগুন দেওয়া হইয়াছে, আমি তাহা জানি না। কাহার আদেশে ইহা ঘটিয়াছে প্রধান মন্ত্রীও তাহা জানাইতে পারিবেন কিনা জানি না। ১৬ই অক্টোবরের পূর্বে আন্দোলন গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, উহা দমন করিবার জন্য আইনসম্মত উপায় অবলম্বন করিলে প্রত্যেক গবর্মেণ্টই তাহা সমর্থন করিবে। কিন্তু সরকারী কর্মচারিগণ তাঁহাদের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিয়াছেন এবং নির্বিচারে যথেচ্ছ ধ্বংসলীলা চালাইয়াছেন।

তার পর আসিল ঝড়। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রধান অভিযোগ এই যে, মন্ত্রীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পূর্বে ঝড়ের সংবাদটি পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে দেওয়া হয় নাই। ৪ঠা নবেম্বর মন্ত্রীরা প্রত্যাবর্তন করিলে পর সরকারী ইস্তাহারে ঝড়ের সংবাদ প্রচার করা হয়। ঝড়ে কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহাও কেহ জানিতে পারে নাই। স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রীও কি তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন? একজন মন্ত্রীও এ সম্বন্ধে কোন কথা জানিতেন না। মন্ত্রীরা যখন স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের নিকট ঘটনার সংবাদ জানিতে চাহিলেন, তাঁহাদিগকে জবাব দেওয়া হইল যে সামরিক কারণে এই সংবাদ প্রচারে বাধা আছে। কোন অঞ্চলের আবহাওয়ার বিষয় শত্রু অবগত হইতে পারে এরূপ সংবাদ প্রকাশ ভারতরক্ষা-আইনে নিষিদ্ধ। পথঘাট নষ্ট হইবার সংবাদও এই কারণে প্রকাশ করা যায় না। ভারত-সরকার এই ধরণের সংবাদ প্রচারেই নিষেধ করিয়াছেন। মন্ত্রীরা কোন কোন কর্মচারীকে জানাইয়াছিলেন যে, শত্রুকে সংবাদ দেওয়ার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই কিন্তু ওদিকে জাপানীরা বেতারে প্রচার করিতেছে যে ঝড়ে এক লক্ষ বাঙ্গালীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। স্বরাষ্ট্র-বিভাগের এই অমনোযোগ অপরাধমূলক। প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা নিজ দায়িত্বে ঝড়ের সংবাদ প্রকাশ করিবার দাবী তুলিবার পর গবর্মেণ্ট তাঁহাদের ইস্তাহার প্রকাশ করিলেন।

ঝড়ে যেন বিশেষ কিছুই ঘটে নাই এমনি ভাব দেখাইয়া জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার রিপোর্ট পাঠাইলেন। জেলার লোকদের একটা পাকা রকমের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাহায্য দান বন্ধ রাখা হউক এরূপ কোন প্রস্তাব ঐ রিপোর্টে ছিল কি? জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট জানান যে একজন লোকও সাহায্য লইতে আসে নাই। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই জানা গেল যে হাজার হাজার লোক সাহায্য লইতে আসিতেছে। সমস্ত অবস্থাটাকেই বিশৃঙ্খল করিয়া তোলা হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে একজন লোকের উপর সমস্ত ভার পড়িয়াছিল এবং সুশৃঙ্খল ভাবে সাহায্য দানের কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। রাজস্ব-বিভাগ কোন কোন কাজ করিতে গিয়াছিল কিন্তু স্বরাষ্ট্র-বিভাগ হইতে বাধা পাইয়া প্রায় কিছুই করিতে পারে নাই। দিনের বেলায় সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এবং রাত্রিতে উহা লুঠ করা হইয়াছে। বক্তৃতায় এই স্থানে ডাঃ মুখার্জি গবর্মেণ্টকে আহ্বান করিয়া বলেন যে জেলার কয়েক জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী যে-সব রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন তাহা দাখিল করা হউক, উহা দ্বারা তাঁহার অভিযোগের সত্যতাই প্রমাণিত হইবে। গবর্মেণ্ট বলেন তাঁহারা শান্তি চাহেন। যে-সব রাজবন্দী রাজনৈতিক আন্দোলন থামাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে মুক্তিদানের চেষ্টা প্রত্যেক মন্ত্রী করিয়াছিলেন। বন্দীরা সাত দিনের জন্য মুক্তি চাহিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। কয়েক জন মন্ত্রী এ সম্বন্ধে তাঁহাদের অসহায় অবস্থা তীব্র ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের ইহাই আসল অবস্থা। আমরা নিরপেক্ষ তদন্ত চাই। প্রকাশ্যে স্বাধীন ভাবে বিচার-বিভাগীয় তদন্ত করা অত্যাবশ্যক। আমরা জানি প্রধান মন্ত্রী নিজেও এই প্রকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তদন্ত সম্বন্ধে কি বাধা আছে প্রধান মন্ত্রীকে তাহা বলিতে হইবে। আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া তদন্ত-কমীটি গঠনে কাহারা বাধা দিতেছে প্রধান মন্ত্রী তাহা পরিষদ সদস্যগণকে এবং জনসাধারণকে বলুন।

প্রধান মন্ত্রী বিতর্কের উত্তরে বলেন যে ডাঃ মুখার্জি ও ডাঃ সান্যাল যে-সব অভিযোগ আনিয়াছেন তাহা সত্য হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে মেদিনীপুরের জনসাধারণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হইয়াছে। সরকারী কর্মচারীদের কার্য্যকলাপ সমর্থন করিবার একটা মৃদু চেষ্টা হক সাহেব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা হইতে বেশ বোঝা যায় যে উহার ভিতর জোর নাই। ডাঃ মুখার্জি প্রকাশ্যে বলিয়াছেন যে অনেক ভিতরের ব্যাপার তিনি জানিতেন, তাহার কোন জবাব হক সাহেব দেন নাই। পুলিস নিজে অথবা পুলিসের উস্কানিতে অপর লোকে ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ উঠিয়াছে, এবং স্থানীয় কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ এ বিষয়ে গবর্মেণ্টকে জানাইয়াছিলেন বলিয়া ডাঃ মুখার্জি যাহা বলিয়াছেন, হক সাহেব তাহারও কোন উত্তর দেন নাই। দিনে সাহায্য দিয়া রাত্রিতে উহা লুঠ করা হইয়াছে বলিয়া যে গুরুতর অভিযোগ উঠিয়াছে, হক সাহেব তৎসম্বন্ধেও নীরব। ঘরে আগুন দেওয়া এবং লুণ্ঠন সভ্য সমাজে এবং গবর্মেণ্টের চোখে অতিশয় গুরুতর অপরাধ। এই হীন কার্য্য গবর্মেণ্টের কোন কর্মচারী করিয়া থাকিলে তাহা দ্বারা গবর্মেণ্টের অপমান সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণেই করা হইয়াছে। বহু কর্মচারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই অভিযোগ এড়াইয়া গেলে জনসাধারণের মনে গবর্মেণ্টের উপর বিশ্বাস ফিরিয়া আসিতে পারে না। পরিষদের ইউরোপীয় দল বিতর্কের দিন নীরব থাকিয়া নয় দিন পর ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহাদের এক জনের দ্বারা বলাইয়াছেন যে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের এমন কোন প্রমাণ নাই যে কোন তদন্ত-কমীটি বসানো চলিতে পারে। সাধারণ বুদ্ধিতে লোকে কিন্তু ইহাই বুঝিবে যে সরকারী কর্মচারীবৃন্দ যদি সত্যই নির্দোষ হইতেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের যদি কোন ভিত্তি না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারাই অগ্রসর হইয়া আসিয়া প্রকাশ্য ও নিরপেক্ষ তদন্তে

স্বীকৃত হইতেন। কারণ এই প্রকার তদন্তে তাঁহাদেরই নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইয়া তাঁহাদের উপর আরোপিত কলঙ্ককালিমা দূর হইত। কিন্তু তদন্তের সম্মুখীন হইতে তাঁহাদের কুণ্ঠা দেখিয়া জনসাধারণের পক্ষে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সমস্তটাই বিশ্বাস করা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ ডাঃ মুখার্জ্জি তাঁহার বক্তৃতার শেষাংশে স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, হক সাহেবের মনে তদন্ত-কমীটি বসাইবার ইচ্ছা থাকিলেও উহাতে বাধা পড়িতেছে এবং এই বাধা কাহারা দিতেছে তাহাও তিনি জানিতে চাহিয়াছেন। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে সর্বক্ষমতা-সম্পন্ন সিভিলিয়ান কর্ম্মচারিগণই এই বাধা দিতেছেন, তদন্ত না হইলে লোকে ইহাই বিশ্বাস করিবে।

হক সাহেব অবশ্য পরিষদ-গৃহে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে এই সমস্ত অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য একটি নিরপেক্ষ তদন্ত-কমীটি বসানো হইবে এবং হাইকোর্টের সমক্ষমতাবিশিষ্ট লোকদের লইয়া উহা গঠিত হইবে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী এই ঘোষণা করা হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কমীটির সদস্যদের নাম প্রকাশিত হয় নাই। এই কমীটি শেষ পর্য্যন্ত বসিবে না, ইউরোপীয় সদস্যদের ভাবগতিক দেখিয়া এরূপ সন্দেহ অনেকের মনেই জাগিয়াছে। প্রায় এক মাসের মধ্যেও সদস্যদের নাম প্রকাশিত না হওয়াতে সেই সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইতেছে।

যুদ্ধের মাঝখানে পার্ল হারবারের ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত হইয়াছে এবং উহার রিপোর্ট প্রকাশ সামরিক কারণে স্থগিত রাখা হইলেও তদন্তে এবং তদন্তের পর ব্যবস্থা অবলম্বনে কোন বাধা অনুভূত হয় নাই। মেদিনীপুরের কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পার্ল হারবারের সামরিক কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অপেক্ষা অনেক কম গুরুতর; এবং ইহার সহিত সমর-পরিচালনের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং মেদিনীপুরের ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত বসিলে ভারত-রক্ষায় ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কা আছে ইহা সর্ববিদ্যাবিশারদ সিভিলিয়ান কর্ম্মচারিগণ ঘোষণা করিলেও কেহ বিশ্বাস করিবে না। রিপোর্ট প্রকাশ না-হয় স্থগিত রাখা চলিতে পারে, কিন্তু তদন্তে এবং তদন্তের পর ব্যবস্থা অবলম্বনে কোন বাধা আছে বলিয়া মনে করা কঠিন। স্বরাষ্ট্র-বিভাগের সিভিলিয়ানদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা অবশ্য আলাদা।

—

বাংলার বাজেট

প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ১৯৪৩-৪৪-এর বাজেট পেশ করিয়াছেন। বাজেটে এবার সাড়ে চার কোটি টাকা ঘাটতি দেখা গিয়াছে। এই ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য হক সাহেব কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে প্রায় ৪ কোটি টাকা ঋণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং কয়েকটি কর বৃদ্ধি করিয়া ৩৩ লক্ষ টাকা তুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

জাপান কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ অধিকারের ফলে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, বাজেট-বক্তৃতায় হক সাহেব তাহার কতকটা ইঙ্গিত দিয়াছেন, সবটা বলেন নাই। ভারতবর্ষের পূর্বসীমান্ত রক্ষার জন্য যে-সব সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, বাংলা হইয়াছে তাহার কেন্দ্র। রেল ও নদী পথে সৈন্য ও সমরসম্ভার চলাচল অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়াতে যাত্রীচলাচল ও পণ্য-চালান অনেক কমিয়া গিয়াছে। পণ্য-চালানের এই দুটি প্রধান উপায়ই শুধু যে বন্ধ হইয়াছে তাহা নহে, পেট্রোলের অভাবে লরী এবং জাপ-আগমনের আশঙ্কায় সরকারী আদেশে নৌকা বন্ধও হইয়াছে। ইহার উপর ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উপর ভারতরক্ষা-আইনের বলে সহস্রবিধ বাধানিষেধ আরোপিত হওয়ায় বাংলা দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক জীবনে সরবরাহ ও চাহিদার মূল নীতি পরিত্যক্ত হইয়া কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের অপরিহার্য্য পরিণাম অতিলোভী ধনী ব্যবসায়ীদের সুবিধা। এক্ষেত্রেও আমরা তাহাই দেখিতেছি। অর্থনৈতিক জীবনে কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ সোভিয়েট রাশিয়ায় সম্ভব; সেখানকার লোকেরা স্বাধীন, দেশবাসীর পরিপূর্ণ সম্মতির উপর সোভিয়েট রাষ্ট্রের বনিয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে দালাল নাই, অতিলোভী ধনী নাই, দেশী বা বিদেশী কায়েমী স্বার্থ নাই এবং গবর্ন্মেণ্টের একমাত্র লক্ষ্য দেশবাসীর মঙ্গল সাধন। পৃথিবীর সকল দেশেই এই যুদ্ধে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছে, কিন্তু রাশিয়া হইতে এখনও পর্য্যন্ত ইহার একটিরও সংবাদ আসে নাই। হক সাহেব তাঁহার বাজেটে ডিরেক্টরেট অফ সিভিল সাপ্লাইকে লক্ষ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, হাইকোর্টের জজ এবং পাকা ব্যাঙ্কারকে আনিয়া উহাকে "শক্তিশালী" করিয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণ এই শক্তি বৃদ্ধির প্রথম ফল পাইয়াছে চাউলের মূল্য ১৫৲ হইতে ২২॥০ টাকায় বৃদ্ধি! বাজেট-বক্তৃতায় হক সাহেব শান্তির ও যুদ্ধ-সময়ের অর্থনৈতিক

ব্যবস্থার পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু সিভিল সাপ্লাই ডিরেক্টরেট যে বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা সহজ করিতে পারিবেন, সহস্র বার স্কীম পরিবর্তন করিলেও তাঁহার এ আশা দুরাশাই থাকিয়া যাইবে। কায়েমী স্বার্থ ও অতিলোভী বণিকসমাকুল ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ঘাড়ে সমাজতান্ত্রিক কায়দায় নিয়ন্ত্রণ চালাইতে গেলে উহার পরিণাম শোচনীয় হইতে বাধ্য।

কিন্তু এই অন্নহীন বস্ত্রহীন বাঙালী জনসাধারণের নিকট হইতে রাজস্বের যে টাকাটা আদায় হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে ঘাটতি তো পড়েই নাই, বরং ১৪ লক্ষ টাকা বেশী করই হক সাহেব আদায় করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। পাটের দর নাম মাত্র, ধান যাহা হইয়াছে তাহাতে বহু স্থানের কৃষকদের সম্বৎসরের খোরাকী চলিবে না, ১৫ টাকা দরে মফস্বলে চাউল বিক্রয় এখনই সুরু হইয়া গিয়াছে, বস্ত্রের মূল্য চতুর্গুণ, এই ভয়াবহ অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যেও হক সাহেব রাজস্ব আদায় কম পড়িতে দেন নাই ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আপাতদৃষ্টিতে বাজেট দেখিলে মনে হইবে বুঝি রাজস্ব-আদায়ে ঘাটতি পড়িয়াছে, কিন্তু হিসাবটা একটু ভাল করিয়া দেখিলেই উহার ফাঁকি ধরা পড়িবে। ১৯৪১-৪২ সালে রাজস্ব আদায় হইয়াছে ১৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা; ১৯৪২-৪৩ সালের সংশোধিত বাজেটে ১৫ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা আদায় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে, এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে হক সাহেব ধরিয়াছেন ১৬ কোটি ২ লক্ষ টাকা আদায় হইবে। গত দুই বৎসর পূর্ব-বৎসরের উদ্বৃত্ত এবং আদায়ীকৃত রাজস্ব অপেক্ষা রাজস্ব খাতে ব্যয় অধিক হইয়াছে, কিন্তু এবারকার এই ভীষণ দুর্বৎসরে রাজস্ব খাতে আয়ব্যয় সমান হইবে। বাজেটের মারপ্যাঁচ রহিয়াছে প্রাপ্ত ও প্রদত্ত ঋণের হিসাবের ভিতর।

রাজস্ব খাতে ব্যয়সঙ্কোচের স্থান নাই ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। মোটা বেতনের সরকারী কর্মচারীদের রকমারি ভাতার মধ্যে কতকগুলিকে সঙ্কোচ করিলেই বহু লক্ষ টাকা অপব্যয় নিবারিত হইতে পারে।

—

সংবাদপত্রের মূল্য বৃদ্ধি

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ-নিয়ন্ত্রণ আদেশের ফলে সংবাদপত্রসমূহের মূল্য আবার এক দফা বৃদ্ধি পাইবে। প্রতি পৃষ্ঠায় দুই পয়সা হিসাবে চারি পৃষ্ঠার কাগজের মূল্য দুই আনা হইবে, এবং এই মূল্য দিয়া কয়জনে সংবাদপত্র ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে তাহা বিবেচনা করা বোধ হয় গবর্মেণ্ট আবশ্যক বোধ করেন নাই। গুজব বন্ধ করিবার জন্য প্রচুর প্রচারকার্য্য চালানো হইয়াছে, কিন্তু সংবাদপত্রের মূল্য অত্যধিক বাড়াইয়া জনসাধারণের নিকট উহা দুষ্প্রাপ্য করিয়া তুলিলে যে গুজব প্রচারেই প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করা হইবে, ইহা কি ভাবিয়া দেখা হয় নাই? এই নিয়ন্ত্রণ-আদেশের দ্বারা গবর্মেণ্ট সমগ্র ভারতবর্ষের সংবাদপত্রসমূহের পৃষ্ঠাসংখ্যা ও মূল্য, বিজ্ঞাপনের পরিমাণ ও হার সমস্তই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেন, অথচ ইহাদের লাভ ক্ষতির আর্থিক দায়িত্ব তাঁহাদের কিছুমাত্র থাকিবে না। সংবাদ-সেন্সর দ্বারা একটা দিক গবর্মেণ্টের করায়ত্ত হইয়াছিল, নূতন আদেশে সংবাদপত্রের ব্যবসায়ের দিকটাও তাঁহাদের হাতে আসিয়া গেল কিন্তু আর্থিক কোন ঝুঁকি রহিল না।

বিজ্ঞাপনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের ফলে ধীরে ধীরে সংবাদপত্রসমূহকে হয়ত সরকারী বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভরশীল হইয়া একেবারেই গবর্মেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতে হইবে। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিকে যাহাতে এই বিপদের সম্মুখীন না হইতে হয় তাহা দেখিবার দায়িত্ব রহিয়াছে স্বদেশী শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই মাল সরবরাহ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। মন্দার বাজারে এই সব সংবাদপত্রের নিকট হইতে নানা ভাবে কত সাহায্য পাইয়াছেন তাহা ইঁহারা মনে রাখেন নাই। যুদ্ধের পর যে আবার নিজেদের পণ্য লইয়া প্রতিযোগিতায় নামিতে হইবে ইহাও তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই ভুলিয়া গিয়াছেন। বিলাতী প্রতিষ্ঠানগুলি কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতার কথা মনে রাখিয়া গুদামে মালের অভাব এবং শীঘ্র আমদানীর সম্ভাবনা না-থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞাপন দিয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে বিলাতী পণ্য ব্যাপক ভাবে বিক্রয়ের যে প্রবল আয়োজন হইবে তাহার আভাস এখন হইতেই নানা ভাবে পাওয়া যাইতেছে। গবর্মেণ্টের নিকট হইতে তখন ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে সাহায্যের আশা করিবার কোন কারণ থাকিবে না। এই কথা মনে রাখিয়া তাঁহাদের এখন হইতেই সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

—

প্রেসিডেন্সি জেলে বিমান আক্রমণ আশ্রয়

প্রেসিডেন্সি জেলে প্রায় আড়াই হাজার বন্দী আবদ্ধ

আছে। কলিকাতায় উপর্য্যুপরি কয়েক বার বিমান আক্রমণ হইয়া যাইবার পরও সেখানে আশ্রয়স্থলের কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। জেলের ভিতর একটিও ভাল আশ্রয়স্থল নাই, মাত্র এক শত জনের উপযুক্ত কয়েকটি স্লিট ট্রেঞ্চ আছে। আর বেশী ট্রেঞ্চ কাটিবারও উপায় নাই, কারণ স্থানাভাব।

জেলের বাড়ীটি ১৮১০ সালে, অর্থাৎ ১৩৩ বৎসর পূর্বে নির্মিত এবং বর্ত্তমানে রীতিমত জীর্ণ। বিমান-আক্রমণের সময় এই অতি-পুরাতন বাড়ীতে বন্দীদের নিজ নিজ ওয়ার্ডে তালাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এক পশলা বোমা বর্ষণের পর এখন সেখানে বোমার টুক্‌রা প্রতিরোধক দেওয়াল তোলা হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের মতে বিমান-আক্রমণের সময়ে ওয়ার্ডের দরজা খুলিয়া দেওয়া যায় না, কারণ উহাতে বন্দীদের পলায়নের এবং গোলমাল হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। প্রেসিডেন্সি জেলে যেভাবে ইয়ার্ড ভাগ করা আছে তাহাতে ইয়ার্ডের দরজা বন্ধ করিয়া দিলে বন্দীদের পক্ষে পলায়ন করা কঠিন। প্রত্যেক ইয়ার্ডে একটি করিয়া ইষ্টকনির্মিত বৃহৎ আশ্রয়স্থল তৈরি করা যাইতে পারে। বন্দীরাও যে মানুষ, বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তি প্রাপ্ত হইলেও তাহাদিগকে শত্রুর বোমার মুখে অসহায় ভাবে ঘরের ভিতর চাবিবদ্ধ করিয়া রাখা যে নিতান্ত হৃদয়হীনতার পরিচায়ক, কর্ত্তৃপক্ষের ইহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। বিনাবিচারে আটক ১৭৬ জন বন্দীর জন্যও তাঁহারা আশ্রয়স্থলের কোন ব্যবস্থা করেন নাই।

—

ভারত-সরকারের রেল-বাজেট

দেশের কল্যাণের সহিত ভারতের রেলপথসমূহের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এই প্রতিষ্ঠানে আট শত কোটির অধিক টাকা মূলধন নিয়োগ করা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় স্বত্বাধিকারের রেলপথগুলি একত্রে একটি বিরাট্‌ প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর যে-কোন স্বতন্ত্র রেলপথ সমিতি অপেক্ষা ইহাতে অধিক লোক কাজ করে এবং ইহা অধিক মাইলব্যাপী দীর্ঘ। ইহাতে প্রায় ৭ লক্ষ ৫৮ হাজার লোকের কর্ম্মের সংস্থান আছে। এই অবস্থায় ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, যে-সমস্যা দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে নানা-ভাবে নানা দিকে ব্যাহত করে, সেই সমস্যার সমাধানে দেশবাসী আগ্রহশীল ও যত্নবান হইবে।

বিগত ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে সমর-সংক্রান্ত ট্রান্‌সপোর্ট বিভাগের সদস্য সর্‌ এডওয়ার্ড বেন্থল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এবং ভারতীয় রেলওয়েসমূহের চীফ কমিশনার সর্‌ লিওনার্ড উইলসন রাষ্ট্রীয় পরিষদে যথাক্রমে ভারত-সরকারের রেল-বাজেট উপস্থাপিত করেন। নিম্নের সংখ্যাতালিকা হইতে ১৯৪১-৪২ সালের আয়-ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাব, ১৯৪২ ৪৩ সালের প্রধান প্রধান বিষয়ের সংশোধিত বরাদ্দের পরিমাণ এবং ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেটের আয়ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ জানা যাইবে।

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

বিষয়	১৯৪১-৪২ সালের চূড়ান্ত হিসাব	১৯৪২-৪৩ সালের সংশোধিত বরাদ্দ	১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেটের বরাদ্দ
যাত্রী ও মালপত্র বহনের জন্য রেলের মোট আয়	১৩৫,১৭	১৪৯,২৫	১৫০,০০
মোট ব্যয় (ডিপ্রিসিয়েসন সহ)	৭৯,৫৫	৮৬,৫২	৮৮,১৪
যাত্রী ও মালবহনের জন্য নীট আয়	৫৫,৬২	৬২,৭৩	৬১,৮৬
অন্যান্য বিভাগ হইতে নীট আয়	৯০	১,৭১	২,১৭
মোট নীট আয়	৫৬,৫২	৬৪,৪৪	৬৪,০৩
সুদের জন্য ব্যয়	২৮,৪৪	২৮,১৬	২৭,৯৯
উদ্বৃত্ত	২৮,০৮	৩৬,২৮	৩৬,০৪

উল্লিখিত আনুমানিক উদ্বৃত্ত ৩৬ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা হইতে ভারত-সরকার সাধারণ রাজস্বের খাতে প্রাথমিক বাজেট বরাদ্দের ২০ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিবেন। বর্ত্তমান রেলওয়ে নীতির অনুসারে উক্ত ২০ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা চলতি ও বকেয়া বৎসরের দেয় টাকার পরিমাণ হইতেও ২ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা বেশী। তাহা ছাড়া ১৬ কোটি ৮ লক্ষ টাকা রেলওয়ে ডিপ্রিসিয়েসন ফণ্ডের (মূল্যাপকর্ষ তহবিলের) ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয়িত হইবে এবং অবশিষ্ট ৭ লক্ষ টাকা রেলওয়ের মজুত তহবিলে ন্যস্ত করা হইবে। উক্ত ডিপ্রিসিয়েসন ফণ্ডে আরও ৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা রেলওয়ে রিজার্ভ ফণ্ড হইতে প্রদান করা হইবে। ইহার ফলে ডিপ্রিসিয়েসন ফণ্ডের নিকট রেলওয়ের ঋণ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধিত হইবে। ইহাতে মূল্যাপকর্ষ তহবিলে ৮২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা এবং রেলওয়ে রিজার্ভ ফণ্ডে প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা মজুত হইবে।

১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেটে যাত্রী ও মালবহন হইতে ১৫০ কোটি টাকা আয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই আয় চলতি বৎসরের আয় অপেক্ষা ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী। ডিপ্রিসিয়েসন ফণ্ডের দেয় টাকা সহ ৮৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা রেল-পরিচালনার ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে—অর্থাৎ চলতি বৎসর অপেক্ষা ১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা বেশী। ৩৬ কোটি

৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইতে ২৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে সাধারণ রাজস্বের খাতে প্রদান করা হইবে এবং ৮ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা মজুত তহবিলে ন্যস্ত করা হইবে। বৎসরের শেষে তাহা হইলেই মূল্যাপকর্ষ তহবিলে ৮৪ কোটি টাকা ও রেলওয়ে মজুত তহবিলে সাড়ে নয় কোটি টাকা সঞ্চিত থাকিবে।

—

ভারতীয় রেলপথসমূহ কি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ?

কেন্দ্রীয় সরকারের রেলওয়ে বাজেটের বিভিন্ন দিক ও তৎপ্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে যথাক্রমে সর্ এডওয়ার্ড বেন্থল ও সর্ লিওনার্ড উইলসনের বক্তৃতার যথোচিত সমালোচনা করা পর্য্যাপ্ত স্থানাভাব বশতঃ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে, তথাপি রেলওয়েসমূহের এইরূপ আর্থিক সমৃদ্ধির ও শ্রীবৃদ্ধির সময়েও রেলের ভাড়া ও মাশুল হ্রাসের কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই। সেই জন্য বাজেট আলোচনা-কালে রেলের ভাড়া ও মাশুল হ্রাস করিবার জন্য দাবী উপস্থিত করা হয়। বর্দ্ধিত হারে ভাড়া ও মাশুল নির্দ্ধারণ করিবার সপক্ষে কেবল গবর্ন্মেণ্টের একমাত্র যুক্তি এই যে, দেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেই অনুপাতে ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই ধরণের উক্তি কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। প্রারম্ভেই ইহা স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন যে ভারতীয় রেলওয়েসমূহ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, না ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। রেল-বাজেটের আলোচনাকালে সর্ জিয়াউদ্দিন আমেদ ঠিকই বলিয়াছেন যে ভারতীয় রেলওয়েগুলিকে প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও বলা যায় না, আবার জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বলিলেও চলে না। উহা ঐ দুইয়ের সংমিশ্রণ অথবা সরকারের খুশীমত যখন যাহা সুবিধা হয়, তখন ঐ উভয়ের যে কোন নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। গবর্ন্মেণ্ট যে রেলওয়ে পরিচালনা সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নীতি মানিয়া চলেন না তাহা সরকারপক্ষের দুই-জনের বক্তৃতা—যাঁহাদের মধ্যে একজন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এবং একজন রাষ্ট্রীয় পরিষদে বক্তৃতা করিয়াছিলেন,—হইতেই বুঝিতে পারা যায়। সর্ এডওয়ার্ড বেন্থল বলেন যে, যুদ্ধকালে রেলওয়ে পরিচালনার সফলতা তাহার আয়ের অঙ্কের দ্বারা বিচার না করিয়া তাহা এই বিষয়ে জনসাধারণের কত দূর উপকার করিয়াছে, তাহা দ্বারা বিচার করিতে হইবে। আবার সর্ লিওনার্ড উইলসনের মতে রেলওয়ে কেবলমাত্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। এই মতের পক্ষপাতী সর্ লিওনার্ড বলেন যে বর্ত্তমান বৎসরের রেলওয়ে-পরিচালনা সর্বাংশে সন্তোষজনক, বিশেষতঃ যখন যানবাহন কার্য্যের ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে প্রায় প্রত্যেক দ্রব্যের বাজার-দর বৃদ্ধির তুলনা করা যাইতে পারে। রেলওয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, না জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, যত দিন না এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান হয় তত দিন বর্ত্তমান ভারতে রেলওয়ে পরিচালনা নীতি হইতেই সৃষ্ট অব্যবস্থাজনক ও বৈষম্যমূলক কার্য্যপ্রণালীর কোন যথোচিত মীমাংসা হইবে না। সর্ জিয়াউদ্দিন এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ভাল করিয়াছেন। যাহাতে এই প্রশ্নের আশু সমাধান হয়, তৎপ্রতি সজাগ থাকা কর্ত্তব্য।

—

রেলের ভাড়া ও মাশুল নির্দ্ধারণ নীতি

রেলওয়ে বাজেটের বক্তৃতাকালে সমর-সংক্রান্ত ট্রান্সপোর্ট বিভাগের সদস্য সর্ এডওয়ার্ড বেন্থল বলেন, 'ট্রেন ভ্রমণ কমান' অভিযান চালান সত্ত্বেও যাত্রিগণ দ্বারা অতিক্রান্ত মাইলের মোট সংখ্যা এক দিকে যেমন বিপুল পরিমাণে বাড়িয়াছে, অন্য দিকে তেমনি যুদ্ধের পূর্ব্বেকার সময়ের চেয়েও প্রায় শতকরা ৩৭ ভাগ যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা কমান হইয়াছে। যদিও বাজেট-বরাদ্দের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, যাত্রী ও মাল বহনের দ্বারা প্রায় ১৫০ কোটি টাকা আয় হইবে অর্থাৎ বর্ত্তমান বৎসর অপেক্ষা ৭৫ লক্ষ টাকা আয় হইবে, তথাপি রেলের ভাড়া ও মাশুল কমাইবার কিছুমাত্র প্রয়াস দেখা যায় না। এমন কি ট্রেনযাত্রীদিগের সুবিধার জন্য ট্রেনের গতি বৃদ্ধি করিয়া বা অন্য কোন প্রকারে ট্রেন ভ্রমণের উন্নতি করিবার কোন আশার বাণীও কেহ বলেন নাই। ভাড়া ও মাশুল নির্দ্ধারণ সম্পর্কে গবর্ন্মেণ্ট যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন তাহা অতীব অসন্তোষজনক। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে রেলওয়ে বাজেটের আলোচনা কালে এই দাবী জানান হয় যে বর্ত্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া রেলের ভাড়া ও মাশুল হ্রাস করা উচিত। এই দাবীর উত্তরে সর্ এডওয়ার্ড বেন্থল বলেন যে যুদ্ধারম্ভের পর হইতে যাত্রী ও মালের ভাড়া গড়পড়তা শতকরা সাড়ে ছয় টাকা হিসাবে বাড়ান হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, যে, ঐরূপ বৃদ্ধি একই সময়ে সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে খুবই

সন্তোষজনক। আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে এই ধরণের ভাড়া ও মাশুল নির্ধারণ করিবার নীতি পৃথিবীর আর কোথাও অনুসৃত হইয়া থাকে? ব্রিটেনের কথাই প্রথমে ধরা যাক্। ব্রিটেনে শিল্পগুলির উৎপাদন মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া রেলের ভাড়া ও মাশুল নির্ধারিত হয় না। সেখানে অন্য নীতি অনুসৃত হয়। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ও রেলওয়েসমূহ একটি নির্দিষ্ট চুক্তিতে আবদ্ধ হন, যে চুক্তিতে রেলওয়েসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া 'নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের আয়' উপার্জ্জন করিতে পারিবে বলিয়া স্থির করা হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বেও এই প্রকার বন্দোবস্ত ছিল। আবার যখন রেলওয়েসমূহের আয় ঐ 'নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ' হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে হ্রাস পাইবে, তখন ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধি করিয়া উহা পূর্ণ করিবার চেষ্টা হইবে। এই প্রকার সিদ্ধান্ত স্বেচ্ছামত বা খুশীমত করা হয় না, ভাড়া ও মাশুল নির্দ্ধারণ সমিতি, বা পরামর্শদাতা সমিতির দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নীতি অনুসৃত হয়। এখানে ঘাটতি পূরণের জন্য ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধি করা হয় না, পরন্তু গবর্ন্মেণ্টের উদ্বৃত্তের মোটা অঙ্ককে আরও মোটা করিবার জন্য হইয়া থাকে। রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক ভাড়া ও মাশুল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আর একটি বিষয় বিবেচিত হওয়া উচিত। ভারতবর্ষে যাত্রী ও মালবহন কার্য্য রেলওয়েগুলির একপ্রকার একচেটিয়া ব্যবসা। সুতরাং তাহাদের ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রকার যানবাহনগুলির ভাড়া বাড়িতে থাকে। এ দেশে খাদ্যশস্য, বস্ত্র প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য ও অত্যাবশ্যক দ্রব্য-মূল্যের একটা মোটা অংশ ভাড়া ও মাশুল দিবার জন্য ব্যয়িত হয়। এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়া যায়, তাহার ফলে সর্বপ্রকার কার্য্য ও দ্রব্যের মূল্যও বাড়িতে থাকে। সুতরাং সকল দিক বিবেচনা করিয়া এ দেশে রেলগাড়ীর ভাড়া ও মাশুল সাধ্যমত নিম্ন স্তরে রাখা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চহারে ভাড়া ও মাশুল জনসাধারণের উপর প্রয়োগ করা হইতেছে।

—

যুদ্ধ এবং ভারতীয় রেলপথ

সমর-সংক্রান্ত ট্রান্সপোর্ট বিভাগের সদস্য এবং রেলপথসমূহের চীফ কমিশনার উভয়েই বাজেট সম্পর্কে তাঁহাদের বক্তৃতাতে বলেন যে ভারতীয় রেলপথগুলি যুদ্ধ-সংক্রান্ত কার্য্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে সাহায্য করিতেছে। স্যর এডওয়ার্ড বেন্থল বলেন যে সৈন্য-বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহাদের চাহিদা খুব সন্তোষজনক ভাবেই পূর্ণ করা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে রেলপথগুলি হইতে সরকারের যে পরিমাণে আয় হইয়া থাকে তদনুপাতে অতিরিক্ত পরিমাণে জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্যগুলির বহনের জন্য ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে গবর্ন্মেণ্ট সামরিক মালপত্র প্রভৃতি এমন কতকগুলি নির্দিষ্ট মালের উপর সুবিধাজনক হারে বহনের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকার বৈষম্যমূলক তারতম্যের কোন সঙ্গত কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না। অন্যান্য প্রকার মালপত্রের উপর অন্যায় ও অসঙ্গত ভাবে গুরুভার ভাড়া ও মাশুল ধার্য্য করিয়া যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে এই সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। তাহার পরিণাম এই যে করদাতাদিগকে এই সকল বোঝা বহন করিতে হইবে। সমর-সংক্রান্ত ব্যাপারে কম ভাড়া ও মাশুল নির্দ্ধারিত হওয়ায় এবং উচ্চতর হারে জনসাধারণের অন্যান্য প্রকার মালপত্র বহন করার ফলে করদাতাদিগকে রেলপথগুলির উপযুক্ত আয়ের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। করদাতাগণ অন্য প্রকারেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। এঞ্জিন ও রেলওয়ের অন্যান্য যন্ত্রপাতিও মূল্যাপকর্ষ (depreciation) বাদ দিয়া যুদ্ধপূর্ব হারে বিক্রয় হইয়াছে। এই সমস্ত বিক্রীত দ্রব্যের জন্য ভবিষ্যতে যে ব্যয় হইবে তাহা নিশ্চয়ই বর্তমানের বিক্রয় মূল্য অপেক্ষা অধিক হইবে। তাহা ছাড়া পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের যে কয়েকটি রেলপথ সমর-বিভাগের কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে, তাহার ব্যয়ও রেলপথগুলির উপর চাপান হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যয় বর্তমানের ন্যায় রেলওয়ে বোর্ড ও সমর-বিভাগ সম-অংশে বহন না করিয়া সমর-বিভাগেরই সম্পূর্ণ বহন করা উচিত। যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষকে যে কি পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে, তাহা গোপন করিয়া রাখিবার এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সর্ আবদুল হালিম গজনবী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে যে নীতি অনুসৃত হইয়াছে তাহার নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে এই সমস্ত যুদ্ধ-ব্যয় ভারতবর্ষ এবং ব্রিটেনের মধ্যে কাহাকে কত অংশ বহন করিতে হইবে তাহা স্থির করিবার সময় ভারতের উপর প্রভূত অবিচার হইবার সম্ভাবনা আছে। মিঃ যমুনা দাস মেটা তাঁহার হিসাব মত বলেন যে অধিক ভাড়া ও মাশুলের জন্য অন্ততঃ দশ কোটি টাকার গুরুভার

বোঝা জনসাধারণের উপর চাপান হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই বোঝা সমর-বিভাগের সুবিধার জন্যই ভারতবর্ষের উপর চাপান হইয়াছে। কিন্তু এই বন্দোবস্তে ব্রিটেন যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ সাহায্য পাইতেছে তাহাও সকলের অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত থাকিতেছে।

—

রেলওয়ে রাজস্ব ও সাধারণ রাজস্বের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা

গত ২রা মার্চ তারিখে স্যর্ এডওয়ার্ড বেন্থল ১৯২৪ সালে প্রবর্তিত সাধারণ রাজস্ব হইতে রেলওয়ে রাজস্বের যে পৃথক্ ব্যবস্থা আছে তাহার কিছু পরিবর্তন করিয়া যুদ্ধকালীন একটি সাময়িক ব্যবস্থার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উত্থাপন করেন। এই বিষয়ে তিনি তাঁহার বাজেট সম্বন্ধে বক্তৃতায় পূর্বেই আভাস দিয়াছেন। পরিবর্তনগুলি এই যে,

(১) প্রচলিত রেলওয়ে নীতি অনুযায়ী রেলওয়ের উদ্বৃত্ত হইতে সাধারণ রাজস্বের খাতে যে টাকা প্রদান করা হয়, ১৯৪২-৪৩ সালে চলতি বৎসরের এবং পূর্ব্বের দেয় টাকা অপেক্ষা ২৩৫ লক্ষ টাকা অধিক প্রদান করিতে হইবে।

(২) আগামী ১৯৪৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে প্রচলিত নীতি অনুযায়ী সাধারণ রাজস্বের খাতে উদ্বৃত্ত অর্থের দান ও বণ্টনের ব্যবস্থা রহিত করা হইবে।

(৩) ১৯৪২-৪৩ সালে বাণিজ্যিক রেলপথসমূহ হইতে যে উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা মূল্যাপকর্ষ তহবিল (Depreciation fund) হইতে অপরিশোধিত ঋণ প্রত্যর্পণ কাজে ব্যয়িত হইবে এবং পরে অবশিষ্ট হইতে যথাক্রমে শতকরা ২৫ ভাগ মজুত তহবিলে এবং ৭৫ ভাগ সাধারণ রাজস্বের খাতে প্রদান করা হইবে। সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত রেলপথগুলিতে যদি লোকসান হয়, তাহা হইলে তাহা সাধারণ রাজস্ব হইতে পূরণ করা হইবে।

(৪) এবং ইহার পর যত দিন না আবার পরিষদ কর্তৃক কোন নূতন নীতি প্রবর্তিত হয় তত দিন পর্যন্ত বাণিজ্যিক রেলপথসমূহের উদ্বৃত্ত অর্থ প্রতি বৎসর রেলপথ সমূহের ও সাধারণ রাজস্বের প্রয়োজনানুযায়ী এই ভাবে রেলওয়ে মজুত তহবিল ও সাধারণ রাজস্বের মধ্যে বণ্টন করা হইবে এবং সামরিক কার্যে নিযুক্ত রেলপথসমূহের ক্ষতি হইলে তাহাও সাধারণ রাজস্ব হইতেই পূরণ করা হইবে।

সমস্যাটির পরীক্ষা ও বিবেচনার জন্য পরিষদ কর্তৃক একটি কমিটি নিযুক্ত করিতে কয়েকটি সংশোধন প্রস্তাব আনা হয়। স্যর এডওয়ার্ড বলেন যে সংশোধন প্রস্তাব-কারিগণ তাঁহার মূল প্রস্তাব যদি গ্রহণ করেন, তবে তিনি প্রশ্নটি আলোচনার জন্য সংশোধন প্রস্তাবসকল অনুযায়ী কমিটি নিযুক্ত করায় সম্মত হইবেন। সমর-সংক্রান্ত ট্রানসপোর্ট বিভাগের সদস্য এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি যত শীঘ্র সম্ভব এই কমিটি নিয়োগ কার্যে ও এই কমিটির কার্য-প্রণালী নির্দ্ধারণের কার্যে মনোনিবেশ করিবেন। তিনি আরও বলেন যে গবর্ন্মেন্টের ইচ্ছা যে এই কমিটি ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসের পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেটের পূর্বে এই সকল বিষয়ে সুপারিশ করিতে পারিবেন। তাহার পর সংশোধন প্রস্তাবগুলি প্রত্যাহার করা হয় এবং স্যর্ এডওয়ার্ড বেন্থলের মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। গবর্ন্মেন্ট যদি এই কমিটির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে রাজী হন এবং রেলপথ-সমূহ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান না জনহিতকর প্রতিষ্ঠান রূপে বিবেচিত হইবে, এই বিষয় বিবেচনার ভার এই কমিটির উপর অর্পণ করেন তাহা হইলে ইহা একটি সুবিবেচনার কার্য হইবে।

—

ভারতের বর্তমান অশান্তির জন্য কংগ্রেসের দায়িত্ব সম্পর্কে গবর্ন্মেন্টের পুস্তিকা

বিগত ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে ৯ই আগষ্ট তারিখে মহাত্মা গান্ধী বন্দী হন এবং তাঁহাকে অন্তরীণ রাখা হয়। তৎসহ কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাকেও বন্দী করা হয় এবং অন্তরীণ রাখা হয়। ইহার ফলে সমগ্র ভারতে অত্যাচার ও উপদ্রব হেতু যে অশান্তির সৃষ্টি হয়, সেই অশান্তির সমস্ত দায়িত্ব কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর উপর আরোপ করা হয়। এই দায়িত্ব নিরসনকল্পেই মহাত্মা গান্ধী কয়েক দিন পূর্বে অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনশন আরম্ভের অব্যবহিত পরেই ভারত-গবর্ন্মেন্ট সংগৃহীত তথ্য ও তাঁহাদের মতে প্রামাণ্য ঘটনা হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে মহাত্মা গান্ধীকে ও কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পুস্তিকার ভূমিকাতে ভারত গবর্ন্মেন্টের য়্যাডিশনাল হোম-সেক্রেটারী স্যর্ রিচার্ড টটেনহাম বলিয়াছেন যে গবর্ন্মেন্ট যে তথ্যরাশি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সমস্ত এই পুস্তিকাতে প্রকাশিত হয় নাই। কারণ গবর্ন্মেন্টের মতে

বর্তমানে নাকি এই সব অবাঞ্ছনীয় তথ্য প্রকাশের ইচ্ছা তাঁহাদের নাই।

এই পুস্তিকার ছিয়াশি পৃষ্ঠার মধ্যে একচল্লিশ পৃষ্ঠাতে গবর্ন্মেণ্ট কর্তৃক মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহাই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশে উক্ত অভিযোগ সম্পর্কিত বিবিধ প্রকারের তথ্য সম্বলিত পনেরটি পরিশিষ্ট আছে। যে সকল ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া গবর্ন্মেণ্ট ব্যাপারটি খাড়া করিয়াছেন, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। পুস্তিকার প্রথম ভাগে গত বৎসরের এপ্রিল মাস হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর প্রবন্ধাবলী হইতে এবং বিভিন্ন কংগ্রেস-নেতার বক্তৃতা হইতে অংশ উদ্ধৃত করিয়া উক্ত আন্দোলনটি যে পূর্বপরিকল্পিত তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। উহাতে দেখান হইয়াছে যে যদিও মহাত্মা গান্ধী 'আশা করেন নাই' যে "ভারত ছাড়িয়া যাও" (Quit India) আন্দোলন অহিংস হইবে, তথাপি তিনি ইহাতে যদি 'কোন হিংসাত্মক কার্য্য ঘটে ঘটুক' এই আশঙ্কা লইয়াই আন্দোলনে অবতীর্ণ হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়ে অশান্তির (disturbances) স্বরূপ ও গতি বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ঐ আন্দোলনে বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতাদের যোগদান, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ (গবর্ন্মেণ্টের সিদ্ধান্তানুযায়ী) এবং তাহা প্রতিবিধানকল্পে গবর্ন্মেণ্টের হস্তক্ষেপ বর্ণনা করা হইয়াছে। গবর্ন্মেণ্টের মতানুযায়ী আন্দোলনের বিভিন্ন অংশ এবং জটিলতা মিশ্রিত একটি সম্পূর্ণ চিত্র (composite picture) বর্ণনা করিবার পর গবর্ন্মেণ্ট কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে: "'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত মিঃ গান্ধীর প্রবন্ধাবলী হইতে যে মানসিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় তাহা হইতে, বোম্বাইয়ের অধিবেশনে এবং তৎপূর্বে ওয়ার্কিং কমীটির সদস্যদিগের বক্তৃতা হইতে, তাঁহাদের গ্রেপ্তারের সময়ে যে হিংসামূলক কার্য্যের কর্মসূচী প্রচারিত হয় তাহা হইতে, অশান্তির (disturbances) স্বরূপ হইতে, বিশেষ বিশেষ কংগ্রেস-নেতার হিংসাত্মক কার্য্যের পরিচয় হইতে এবং কংগ্রেসের নামে প্রচারিত একাধিক পুস্তিকা হইতে, যে-সকল প্রমাণ ও সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাহাতে এই উপদ্রব, দেশব্যাপী বিদ্রোহ ও ব্যক্তিগত অপরাধ, যাহা ভারতের সুনাম নষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে তাহার জন্য দায়ী কে এই প্রশ্ন করা হইলে তাহার একমাত্র উত্তর এই যে, মিঃ গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতীয় জাতীয় মহাসভা দায়ী।"

এই বিষয়ে গবর্ন্মেণ্ট কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে আমাদের অভিমত প্রকাশ করিবার পূর্বে আমরা গবর্ন্মেণ্ট কর্তৃক ভারতীয় জাতীয় মহাসভা ও মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে আনীত অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগগুলি সম্পর্কে তথ্যাবলীর স্বরূপ বর্ণনা করিব। এই সমস্ত অভিযোগের সত্যতা ও যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য গবর্ন্মেণ্ট যে ন্যায়যুক্তির পরিচয় দেখাইয়াছেন, তাহারই কয়েকটি নমুনা আমরা পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। পুস্তিকার সম্পাদকের মতে যেহেতু কংগ্রেসই "ভারত ছাড়িয়া দাও" এই অভিযান আরম্ভ করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যেহেতু কংগ্রেসই ভারতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং যেহেতু সমস্ত বন্দী নেতাগণ কংগ্রেসের সদস্য, অতএব কংগ্রেস ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দল দেশে এ প্রকার বিশৃঙ্খলা বা অশান্তি সৃষ্টি করিতে পারে বা চাহে ইহা খুবই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। "প্রথমে যে সকল ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা মহাত্মা গান্ধীর নামে হইয়াছিল"—এবং যদিও এই সকল ইস্তাহার দৃষ্টিগোচর হইবার পূর্বেই তিনি এ সব কিছুর অন্তরালে বন্দী ছিলেন, তথাপি তাঁহাকে ইহার জন্য দায়ী করা হইয়াছে। লেখক যথোচিত বিবেচনার পর এই গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যেহেতু যে সকল প্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রিমণ্ডলী ছিলেন, সেই সকল প্রদেশেই বিক্ষোভ ও অশান্তি প্রবল হইয়াছিল, এবং যেহেতু শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীয়ার ও মাদ্রাজের অন্যান্য বিখ্যাত প্রাদেশিক নেতাগণ "ভারত ছাড়িয়া যাও" এই নীতির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া মাদ্রাজে অশান্তির সৃষ্টি হয় নাই, অতএব এই সমস্ত অশান্তির জন্য কংগ্রেস ব্যতীত আর কেহই দায়ী হইতে পারে না।

ভারতের কোন স্থান হইতে ("From somewhere in India") স্বাধীনতা-সংগ্রামকারীদের ("Fighters for Freedom") উদ্দেশ্যে লিখিত শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণের একটি পত্র বা সারকুলার গবর্ন্মেণ্টের আর একটি ব্রহ্মাস্ত্র। অভিযোগ এই যে শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ দেশবাসীকে হিংসাত্মক বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এই পত্র বা সারকুলার লিখিয়াছিলেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য ইহা আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছিল। শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ গবর্ন্মেণ্টের নিকট বন্দী অবস্থায় থাকা কালেও ইহার সত্যতা

সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট কেন কোন প্রমাণ লইতে পারেন নাই? এমত অবস্থায় তিনি দেশবাসীকে হিংসামূলক কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিবার অভিযোগে সহজেই বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইতে পারিতেন। যদি গবর্মেণ্ট তাহা করিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহারা স্পষ্টভাবে বলিতে পারিতেন যে শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণের মত ব্যক্তি দেশবাসীকে হিংসাজনক কার্য্যে প্ররোচিত করিতেছিলেন। তিনি জেল হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন বলিয়াই যে তিনি এই আবেদনও লিখিয়াছিলেন এবং প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা কি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণের নামে প্রকাশিত পত্র যে শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ কর্ত্তৃক লিখিত তাহার প্রমাণ কি? তাহা ছাড়া উক্ত পত্র যে কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ আছে কি? অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মহাত্মা গান্ধী ও ভারতীয় জাতীয় মহাসভার বিরুদ্ধে গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য কেমন করিয়া দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই প্রকার পত্রের উপর নির্ভর করিতে পারেন।

মেদিনীপুরের কোন থানা কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সাত জন সদস্য স্থানীয় পুলিস অফিসারের নিকট এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন, যে, তাঁহারা A. I. C. C.র নির্দ্দেশানুযায়ী এবং তাঁহাদের পরিকল্পনানুযায়ী আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া উক্ত পুস্তিকার লেখক মন্তব্য করেন, "এই ত কংগ্রেসের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রকাশ্য স্বীকৃতি।" আবার মজঃফরপুর জেলায় কোন এক গৃহদাহের মামলায় বিচারক এইরূপ মন্তব্য করেন যে "ইহা ত সর্ব্বজনবিদিত যে বর্ত্তমানে দেশব্যাপী যে অশান্তি ও বিক্ষোভ চলিতেছে তাহা দেশের শাসনকার্য্য অচল করিয়া তুলিবার জন্য এবং গবর্মেণ্টকে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য করিবার জন্য।" এই মন্তব্য সম্বন্ধে ভারত-গবর্মেণ্টের মন্তব্য এই যে, "ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না যে, সমস্ত কার্য্যই কংগ্রেসের নামে করা হইয়াছে। এই রকম বিচারের রায়ের উপর ভিত্তি করিয়া কি গবর্মেণ্ট জগৎসমক্ষে বলিতে পারেন যে পুস্তিকাতে নিবদ্ধ তথ্যসমূহ তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর ন্যায় বিচারের কার্য্যাবলী হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন?

'হরিজন' হইতে কয়েকটি লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল লেখা বিচ্ছিন্ন ভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং এইগুলি সম্পূর্ণ পূর্ব্বাপর সংস্রবহীন ও পৃথক্। বর্জ্জিত অংশ গবর্মেণ্টের মতের পক্ষপাতী নহে। একটি উদ্ধৃত অংশে এইরূপ বলা হইয়াছে: "ভারতবর্ষকে ঈশ্বরের উপর ছাড়িয়া দেও। যদি ইহাও তাহার পক্ষে বেশী হয়, তবে তাহাকে অরাজকতার মধ্যে ফেলিয়া যাও" (হরিজন, ২৪শে মে)। সরকারী পুস্তিকার সম্পাদক অবশ্য পরবর্ত্তী অংশটুকু গ্রহণ করেন নাই। তাহাতে এইরূপ উল্লিখিত আছে: "যে সকল ব্রিটেনের অধিবাসী ব্রিটেনকে ভালবাসেন, ভারতবর্ষকে ভালবাসেন এবং সমগ্র পৃথিবীকে ভালবাসেন তাঁহাদের প্রত্যেককে আমি অনুরোধ করি যে তাঁহারা আমার সঙ্গে যুক্ত হইয়া ব্রিটিশ শক্তির নিকট আবেদন করিবেন এবং এই আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইলে, তাঁহারা আমার সহিত মিলিত হইয়া এমন অহিংস কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিবেন, যাহা সেই শক্তিকে আমাদের আবেদন মঞ্জুর করিতে বাধ্য করিবে।" ওয়ার্দ্ধায় প্রেসের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাতের সময় মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি দেন—যাহা ১৯শে জুলাইয়ের 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, "যদি এই ভারত ত্যাগ (ইংরেজ কর্ত্তৃক) সদিচ্ছার দ্বারা সম্পূর্ণ হয় তাহা হইলে এই পরিবর্ত্তনে সামান্য মাত্র অশান্তিরও সৃষ্টি হইবে না।···সেখানে কোন অরাজকতা থাকিবে না, কোন অশান্তি থাকিবে না বরং বিজয়ের গৌরব প্রকাশ করিবে।" সরকারী পুস্তিকাতে আর একটি উদ্ধৃত অংশ এইরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, "ইহা একটি গণ-আন্দোলন হইবে", (It would be a mass movement···) কিন্তু ঐ বাক্যের অবশিষ্ট অংশটুকু যাহাতে "সর্ব্বতোভাবে অহিংসাত্মক" ("of a strictly non-violent character") বলা হইয়াছে, সেইটুকু বর্জ্জিত হইয়াছে। অহিংসা সম্বন্ধে অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত মহাত্মা গান্ধীর অসংখ্য উক্তি প্রকাশিত আছে। সে-সব সত্ত্বেও এই প্রকার প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে কি হিংসামূলক কার্য্যের সমর্থক বলিয়া অভিযুক্ত করা যায়?

বর্ত্তমানের অশান্তির (disturbances) জন্য মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় মহাসভা যে দায়ী, এই অভিযোগ সপ্রমাণ করিবার জন্য সরকার যে তথ্যসমূহ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে বিষয়টিকে সপ্রমাণ করিবার জন্য সরকারের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। যত দিন গবর্মেণ্ট তাঁহাদের সংগৃহীত সকল তথ্যাবলী নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনার জন্য

উপস্থিত না করেন, তত দিন কোন পক্ষপাতহীন ও সুবিবেচক ব্যক্তি তাঁহাদের বিচার মানিয়া লইবেন না। এ ক্ষেত্রে এই পুস্তিকা প্রকাশে গবন্মেণ্ট নিজেই ফরিয়াদী ও বিচারকের অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিচার-ক্ষমতাসম্পন্ন ন্যায়পরায়ণ এবং পক্ষপাতহীন কর্তৃপক্ষই এ সমস্ত তথ্যের প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবেন। যে-সমস্ত বিষয় জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা যথার্থ কি না তাহা উপযুক্ত রূপে পরীক্ষা করিবার কোনরূপ চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে এই সকল দেখিতে বা এই সম্পর্কে তাঁহাদের বক্তব্য বলিতে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। প্রধানতঃ যে-সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া যাঁহারা এই সকল প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তাঁহারা কি বলিতে পারেন কোন উন্নত সভ্য গবন্মেণ্ট উপযুক্ত বিচারক দ্বারা বিচার না করিয়াও এই সকল প্রমাণ নির্ভর-যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন? অথবা সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে গঠিত কোন্ নিরপেক্ষ বিচারসমিতি ইহা বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন? কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের অভিযোগ সপ্রমাণ না করায় সমস্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট নিজেদের সুনাম ক্ষুণ্ণ করিলেন। মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেসের নেতাগণের অবরোধ এবং তাহার পরবর্তী যে কার্য ও নীতি গবন্মেণ্ট অবলম্বন করিয়াছেন তাহার ফলে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে এই মত এবং মহাত্মা গান্ধীর জাপান সম্বন্ধে প্রকৃত মানসিক ভাব কি, এই দুই বিষয়ে গবন্মেণ্ট যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক এবং তাঁহাদের পরামর্শদাতাদের অদূরদর্শিতা, সদ্‌বিবেচনার অভাব ও বিচারবুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক।

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে প্রেস কনফারেন্সে সর্ তেজ বাহাদুর সাপ্রু বর্তমানের অশান্তির জন্য কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর দায়িত্ব সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে একমাত্র কোন নিরপেক্ষ কমিশন বা ট্রাইবুনালই অভিযোগ সম্বন্ধে গবন্মেণ্টের প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দিতে পারেন। তিনি আরও এই মত ব্যক্ত করেন যে, যে-সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া ও পরীক্ষা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কোন কোন কংগ্রেস-সদস্য যে এই বিক্ষোভে যোগদান করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন না যে, কংগ্রেস সমষ্টিগত হিসাবে এই সক্রিয় বিপ্লবে ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন অথবা আইনতঃ দায়ী হইতে পারেন। এই সমস্ত ঘটনা কোন নিরপেক্ষ ট্রাইবুনাল কর্তৃক বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। কোন কংগ্রেসের সদস্য এই আন্দোলনে যোগদান করেন নাই, কোন কংগ্রেস-সদস্যের এই প্রকার উক্তি তিনি যেমন মানিয়া লইবেন না, তেমনি তিনি গবন্মেণ্টের এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নন। তিনি বলেন যে যদি কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীকে এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করা হয়, তবে তাঁহার মতে গবন্মেণ্ট ইহার জন্য কম দায়ী নন।

—

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর সর্ জেমস টেলারের মৃত্যুর পর ঐ পদে কাহাকে বসানো হইবে তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে। ভারতীয় কমার্স চেম্বার ভারত-সরকারের অর্থ-সচিবকে অনুরোধ করিয়াছেন যেন ঐ পদে একজন উপযুক্ত ভারতীয়কে নিযুক্ত করা হয়। ক্ষমতাবর্জিত দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতীয় অথবা শ্বেতাঙ্গ যে কেহই নিযুক্ত হউক না কেন, দেশবাসীর পক্ষে তাহার ফল সমানই। বড়লাটের শাসন-পরিষদে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় নিয়োগের ফল যাহা হইয়াছে, তাহা আজ সর্বজন-বিদিত। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণরের পদেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠনের পর সর্ অসবোর্ণ স্মিথ উহার প্রথম গবর্ণর নিযুক্ত হন। ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই ব্যাঙ্কের উপর সরকারী খবরদারী সর্ অসবোর্ণের চোখে ঠেকে এবং অর্থ-সচিব সর্ জেমস গ্রীগের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধে। বিরোধের প্রধান কারণ ছিল টাকা ও ষ্টার্লিঙের বিনিময় হার নির্ধারণ। ভারত-সরকারের সঙ্কল্প ১ টাকার বিনিময়-হার ১ শিলিং ৬ পেন্স বাঁধিয়া দেওয়া; ইহাতে বিলাতী শিল্পপতিদের সুবিধা হইবার কথা। সর্ অসবোর্ণ দাবী করেন যে, ভারতীয় স্বার্থ রক্ষাই যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় তবে বিনিময় হার ১ শিলিং ৬ পেন্স বাঁধিয়া না রাখিয়া ভারতীয় স্বার্থের অনুকূলে উহা পরিবর্তিত করা হউক। কারণ মুদ্রা-বিনিময়ের এই হার বহাল রাখিলে ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থ শুধু বৈদেশিক বাণিজ্যে নহে, আভ্যন্তরীণ শিল্পবিস্তারেও বজায় রাখা কঠিন। ব্রিটিশ বণিক-স্বার্থের প্রতিনিধিদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সর্ জেমস গ্রীগ বিনিময়-হার পরিবর্তন করিতে দৃঢ় অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন। ব্যাপারটি বিলাত পর্যন্ত গড়ায় এবং

অবশেষে গ্রীগ সাহেবের জিদই বজায় থাকে, সর্ অসবোর্ণ পদত্যাগ করেন। ভারত-সরকারের অধীনস্থ বিশ্বস্ত কর্মচারী টেলার সাহেবকে কারেন্সি-কন্ট্রোলারের পদ হইতে উন্নীত করিয়া ইতিপূর্বেই ডেপুটি গবর্ণর করা হইয়াছিল, তাঁহাকেই গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করা হইল। এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর বিলাতী কায়েমী স্বার্থের এবং ভারত-সরকারের মনোভাবের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তিনি ভারতীয় বা শ্বেতাঙ্গ যাহাই হউন না কেন, তাঁহার চাকুরি বজায় থাকিবে না।

—

চাউল কোথায় যায় ?

বাংলায় উৎপন্ন চাউলের একটা মোটা অংশ বাহিরে চলিয়া যাইতেছে এবং দেশবাসীর দুরবস্থা দেখিয়াও বাংলা-সরকার তাহা বন্ধ করিতেছেন না, এই ধরণের একটা প্রবল আশঙ্কা বাঙালীর মনে জাগিয়াছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তরটি হইতে ব্যাপারটি মোটামুটি বুঝা যাইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তরের সময়ে শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখার্জির প্রশ্নের উত্তরে ঢাকার নবাব বলেন যে নবেম্বর মাসে প্রশ্নটি প্রেরিত হইবার পর এ সম্বন্ধে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে কৃষিবিষয়ক সংখ্যাতত্ত্ব যেভাবে রাখা হয় তাহাতে সঠিক কিছু বলা সম্ভব নহে। গবর্মেণ্টের ইহাই আশঙ্কা ছিল যে সম্ভবতঃ শহরাঞ্চলে কোন কোন স্থানে বৎসরান্তে চাউলের অভাব ঘটিবে। ঐ সময়ে চাউল সরবরাহ করা যাহাতে সম্ভব হয় এজন্য গবর্মেণ্ট ধান ও চাউল ক্রয় করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত, শহরাঞ্চলে যাহাতে উত্তমরূপে চাউল সরবরাহ করা যায় তাহার উন্নত উপায় উদ্ভাবনের জন্য তাঁহারা গবেষণা করিতেছেন।

মিঃ মুখার্জি: অন্যান্য প্রদেশ ও দেশে কি পরিমাণ চাউল পাঠাইয়া সাহায্য করা হইবে বলিয়া গবর্মেণ্ট তাহাদিগকে কথা দিয়াছেন ?

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঢাকার নবাব: আগামী বৎসরের চাউল প্রেরণ সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট কোন কথা দেন নাই।

খাঁ বাহাদুর মোয়াজ্জেম হোসেন: ধান ও চাউল ক্রয়ের পরিকল্পনাটি কি, এবং উহার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে ?

ঢাকার নবাব: অঙ্কের হিসাব আমার পক্ষে এখনই দেওয়া সম্ভব নহে। আমি নোটিশ চাই।

খাঁ বাহাদুর এম. হোসেন: বাংলার চাউলের অভাব মিটাইবার জন্য গবর্মেণ্ট বাহিরের এজেণ্টদের সহিত চুক্তি করিয়া চাউল আমদানীর জন্য কোন চুক্তি করিয়াছেন কি ?

ঢাকার নবাব: আমাদের পক্ষে যাহা করা সম্ভব তাহা আমরা করিয়াছি। বর্তমান অবস্থা বুঝাইবার জন্য আমি শীঘ্রই একটি বিবৃতি দিব।

মিঃ মুখার্জি: এই বৎসরের ফসল চালান দেওয়া সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট কোন চুক্তি করিয়াছেন কি না তাহা আমি জানিতে পারি কি ? গবর্মেণ্ট বলিতেছেন যে তাঁহারা আগামী বৎসরের চাউল সম্পর্কে কোন চুক্তি করেন নাই। আমার মনে হয় ইহাতে আউস ফসলের কথা হইয়াছে।

ঢাকার নবাব: আগষ্ট মাসের পর হইতে কোন চুক্তি হয় নাই। আমি এই বিভাগের ভার গ্রহণের পূর্বে বহু চুক্তি করা হইয়া গিয়াছিল। এখন আর কোন নূতন চুক্তি নাই বলিয়া বাঙ্গলা দেশ হইতে চাউল রপ্তানী বর্তমানে হইতেছে না।

মিঃ ললিতচন্দ্র দাস: বাংলা-সরকারকে না জানাইয়া কলিকাতার বন্দর হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানী হইয়াছে এই কথা কি সত্য ?

ঢাকার নবাব: আমি ইহা জানি না। আমি নোটিশ চাই।

মিঃ দাস: মন্ত্রী মহাশয় দয়া করিয়া বলিবেন কি যে সিংহলের জন্য প্রচুর পরিমাণে চাউল আগষ্ট মাসের পূর্বে বাংলা দেশ হইতে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে এ কথা সত্য কি না ?

ঢাকার নবাব: কিছু চাউল রপ্তানী হইয়াছে বটে কিন্তু আমার মনে হয় উহার পরিমাণ খুব বেশী নয়।

মিঃ মুখার্জি: গবর্মেণ্ট কি জানেন যে শিপিং মিনিষ্ট্রির হুকুমনামা লইয়া কলিকাতা হইতে বৈদেশিক বন্দরে প্রচুর পরিমাণে চাউল রপ্তানী হইয়া গিয়াছে এবং বাংলা-সরকার ঐ সব হুকুমনামা বাতিল করিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে এ বিষয়ে কিছু জানানো পর্যন্ত হয় নাই ?

ঢাকার নবাব বলেন যে তিনি নোটিশ চান এবং এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন।

অপর এক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে ঢাকার নবাব বলেন যে ১৯৪২ সালে কলিকাতা হইতে বহু পরিমাণে ধান ও চাউল রপ্তানী হইয়াছে ইহা তাঁহাকে জানানো হয় নাই। তিনি অনুসন্ধান করিবেন।

মিঃ মুখার্জির অপর এক প্রশ্নের উত্তরে ঢাকার নবাব বলেন যে জাপানীদের হাতে যাহাতে না পড়ে সে জন্য যেসব চাউল ক্রয় করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ জানানো জনস্বার্থের খাতিরে উচিত নহে। এই মজুত চাউল হইতে মাঝে মাঝে স্থানীয় ঘাটতি পূরণের জন্য উহা দেওয়া হইয়াছে এবং গবর্মেণ্টের অন্যান্য চুক্তি রক্ষা করিবার জন্যও পাঠান হইয়াছে।

বাংলা দেশের প্রয়োজনের অনুপাতে চাউল কম উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও উহার মোটা অংশ বাহিরে গিয়াছে এবং এখনও যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে, উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরে ইহাই প্রমাণিত হয়। জাপানী অভিযানের ভয়ে গবর্মেণ্ট যে-সব চাউল হস্তগত করিয়াছিলেন তাহার মোট পরিমাণ জানাইতে তাঁহাদের কুণ্ঠা রহস্যজনক। ইহা জানাইলে শত্রুর কি সুবিধা হইবে তাহা বুঝিয়া উঠা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য, কিন্তু ইহার ফলে সরকারের পক্ষে গোপনে চাউল রপ্তানীর পরিমাণ ধরা পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। গত বৎসরের ধান ও চাউল হইতে অনেকটা রপ্তানী হইয়া গিয়াছে, এবারও যে ঐরূপ যাইবে না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। পরিষ্কার প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দানে অক্ষমতা দেখিয়া সন্দেহ হয় বাংলার মন্ত্রীরা এই চাউল রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন নাই।

—

বাঙালীর জীবন-মরণ-সমস্যা

বাংলা দেশের অন্ন-বস্ত্র-ঔষধ-সমস্যা যে ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে তাহাকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সঙ্গে এক হিসাবে তুলনা করা অন্যায় হইবে না। ফসল উৎপন্ন না হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে বিনা-চিকিৎসায় মারা গিয়াছিল। এবার নূতন ফসল উঠিবার পর হইতেই গবর্ন্মেণ্ট-সৃষ্ট বেবন্দোবস্তে দেশের কোটি কোটি লোকের এক বেলা অথবা এক দিন অন্তর আহার জুটিতেছে, ঔষধের অভাবে বিনা চিকিৎসায় মরিতে হইতেছে। ফাল্গুন মাসেই চাউলের দর প্রায় ২২ টাকায় চড়িয়াছে, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে যে কি অবস্থা হইবে তাহা কল্পনা করাও কঠিন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অন্ন-বস্ত্র-সমস্যা লইয়া বিতর্ক হইয়াছে, ফল কি দাঁড়াইবে তাহা দ্রষ্টব্য। বাংলা-সরকার অর্থাৎ মন্ত্রীমহাশয়েরা বড় বড় আশ্বাস আগেও যেমন দিয়াছেন, এবারও তেমনি দিতেছেন। এই বিতর্কে তাঁহাদের ক্ষমতার পরিমাণও অনেকটা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সিভিল সাপ্লাই ডিরেক্টরেটে বিচারপতি রক্সবার্গের এবং মিঃ ম্যাক ইনিসের নিয়োগে মন্ত্রীদের করুণ অসহায়তাই ধরা পড়িয়াছে।

চাউলের এত অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কোন কারণ বাংলা-সরকার দেখাইতে পারেন নাই। মন্ত্রী ঢাকার নবাব হিসাব দিয়াছেন, বাংলা দেশে সাধারণতঃ ৮৫ লক্ষ টন ধান উৎপন্ন হয়, তৎস্থলে এবার হইয়াছে ৭৩ লক্ষ টন। অর্থাৎ শতকরা ১৫ ভাগ চাউল এবার কম পড়িবে। সরকারী বাণিজ্য তথ্য বিভাগ হইতে প্রচারিত ধানের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাসে দেখা যায় গত বৎসর অপেক্ষা ভারতবর্ষে এবার শতকরা মাত্র তিন ভাগ ধান কম হইয়াছে। শতকরা ৩ ভাগ বা ১৫ ভাগ যোগান কমিলে মূল্য শতকরা ৫০০ ভাগ বৃদ্ধি পায় কেমন করিয়া তাহার কোন হিসাব ইঁহারা দেন নাই। অর্থনীতির নিয়মেও ইহার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

গত বৎসরের প্রচুর উদ্বৃত্ত চাউল গবর্ন্মেণ্ট জাপানের হাতে পড়িবার ভয়ে স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া গুদামজাত করিয়াছিলেন। কথা ছিল যে-সব অঞ্চলে ধান কম উৎপন্ন হইয়াছে সেই সকল স্থানের অধিবাসিগণকে ঐ চাউল দেওয়া হইবে। এই মজুত চাউলের পরিমাণ কত, ভারতরক্ষা-আইনের দোহাই পাড়িয়া তাহা গোপন রাখা হইয়াছে। সে চাউল যে অবশিষ্ট আছে তাহা মনে করিবার সঙ্গত হেতু এখন আর দেখা যাইতেছে না, গবর্ন্মেণ্টও আর আশ্বাস দিতে পারিতেছেন না। মূল্যবৃদ্ধির জন্য অতিলোভী ব্যবসায়ী অনেকখানি দায়ী ইহা সত্য, কিন্তু ইহাদিগকে জব্দ করিবার ক্ষমতা একমাত্র গবর্ন্মেণ্টের হাতেই রহিয়াছে। তাঁহারা গত বৎসরের উদ্বৃত্ত চাউল গুদাম হইতে বাহির করিয়া ব্যাপকভাবে উহা নিয়ন্ত্রিত দোকানের মারফৎ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেই মূল্যবৃদ্ধিতে বাধা পড়িত। কিন্তু তাহা করা দূরে থাকুক, তাঁহারা যে ডজন দুয়েক দোকান খুলিয়াছেন তাহাতেই চাউল সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক-সভায় ঢাকার নবাব বলিয়াছিলেন যে চাউল ক্রয় করিয়া তাঁহারা রিজার্ভ রাখিতেছেন এই জন্য যে প্রয়োজন হইলেই উহা ব্যাপক ভাবে বাজারে ছাড়া হইবে। কিন্তু পাঁচগুণ মূল্য বৃদ্ধির পরও তাঁহারা অন্ততঃ গত বৎসরের রিজার্ভেরও একটা অংশ বাজারে বাহির করিতে পারিতেছেন না কেন?

নানাবিধ প্রশ্নোত্তর ও বিতর্কের ভিতর দিয়া ইহার প্রকৃত কারণ ক্রমেই প্রকাশ পাইতেছে। কলিকাতা হইতে মন্ত্রীদের অজ্ঞাতসারে বহু চাউল সিংহলে এবং অন্যান্য বৈদেশিক বন্দরে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ইহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। হক সাহেব প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ রপ্তানী আর না হইতে পারে তাহা তিনি দেখিবেন। শতকরা ১৫ ভাগ যোগান স্বাভাবিক ভাবে কমিয়াছে, তার উপরে আর কত ভাগ যে সিভিলিয়ান-চালিত গবর্ন্মেণ্টের দ্বারা কমিয়া গিয়াছে তাহার হিসাব পাওয়া যায় নাই। তবে বেশ মোটা রকমের রপ্তানী চলিয়াছে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। নবাব সাহেবের পূর্ব্বে যে মন্ত্রীর উপর বাণিজ্য বিভাগের ভার ছিল, তিনি গত আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত বাংলার বাহিরের বহু দেশে ধান চাউল রপ্তানীর চুক্তি করিয়াছিলেন তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে।

এই তীব্র সমস্যার সমাধানের যে বন্দোবস্ত হক সাহেব করিতেছেন তাহাতে ফল হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। প্রথমতঃ, সিভিলিয়ানেরা যত দিন মন্ত্রীদের অগ্রাহ্য করিয়া ইচ্ছামত কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবে, তত দিন খাদ্য সরবরাহের জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া কোন ফল হইবে না।

—

কুসুমকুমারী মৈত্র

বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারী গিরিডিতে স্বর্গীয় হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের বিধবা পত্নী কুসুমকুমারী মৈত্র পরলোক-

গমন করিয়াছেন। তিনি উচ্চবংশের কন্যা ও বধূ হইলেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁহার প্রাণের যোগ ছিল। মাছওয়ালী, ঘিওয়ালা, মিস্ত্রি, মুসলমান চাষী ইত্যাদি সকলেই তাঁহার ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী হইয়া উঠিত অনায়াসে। তিনি মানুষকে এত সহজে কাছে টানিতে পারিতেন যে তাঁহার কন্যা বলেন, 'মা যেন যাদু জানতেন।' তিনি 'চাকরবাকর' কথা ব্যবহার করিতেন না, পাছে ভৃত্যদের তাহা শুনিতে মিষ্ট না লাগে। নেপালী ভৃত্যের মাতৃহীন পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইয়া তিনি স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের কাজের যোগ্য করিয়া দিয়াছেন। মানুষের প্রতি তাঁহার স্নেহভালবাসার এইরূপ আরও নিদর্শন আছে। স্বামীর মৃত্যুর পর পাঁচ বৎসর তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য অধীর হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বামীর মৃত্যুর দিন বলিয়াছিলেন, "তিনি তাঁর আনন্দময় পিতার কোলে রয়েছেন, আজ শোকের দিন নয়, আনন্দের দিন।"

—

গান্ধীজীর অনশন ও তাহার প্রতিক্রিয়া

মহাত্মা গান্ধীর অনশনের ফলে যে বিস্তৃত ও ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার বিশেষত্ব এই যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শিখ, পার্শী ও ব্রিটিশ প্রভৃতি সর্বসম্প্রদায় মহাত্মা গান্ধীর বিনাসর্তে মুক্তির জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন এবং ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তথাপি এই আন্দোলন যে একমাত্র হিন্দুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এই ধরণের মনোভাব সৃষ্টি করিতে চেষ্টা হইতেছে। যাহা প্রকৃত পক্ষে সত্য তাহাকে বিকৃত করা যায় না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিশিষ্ট নেতাগণ যে মহাত্মা গান্ধীর মুক্তির দাবী জানাইয়াছিলেন তাহা সকলেরই বিদিত। এই প্রসঙ্গে স্যর হাজি কাসেম মিথা, স্যর আবদুল হালিম গজনভী, মিঃ আল্লাবক্স (সিন্ধুর ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী), মৌলানা আমেদ সৈয়দ (হিন্দের জমায়েৎ-উল-উলেমার সম্পাদক), মিঃ জহিরুদ্দিন (মোমিন কন্‌ফারেন্সের সভাপতি), মিঃ আবদুল কোয়ায়েম (সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের নেতা), মিঃ হুমায়ুন কবীর (বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং হিন্দু-মুসলীম মৈত্রী-সম্মেলনের সম্পাদক), ডাঃ আসরফ, ডাঃ সাউকৎউল্লা আনসারী (নিখিল-ভারত স্বাধীন মুসলীম সম্প্রদায়ের ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক) এবং মোহাম্মদ আমেদ কাজমী (কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য) প্রভৃতি বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য মুসলমান নেতাগণ স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রুর সভাপতিত্বে গত ফেব্রুয়ারী মাসে নিউদিল্লীতে অনুষ্ঠিত নেতৃ-সম্মেলনের কার্য্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর নেতা, বিভিন্নধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ, শ্রমিক প্রতিনিধি, কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধি, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, পার্শী এবং ব্রিটিশ ধর্মযাজকগণও যোগদান করিয়াছিলেন এবং ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য ও আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছার জন্য দেশের সার্বজনীন দাবীতে মিলিত হইয়া মহাত্মা গান্ধীর অবিলম্বে বিনাসর্তে মুক্তির জন্য দাবী করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় সমস্যার কার্য্যকরী ও দ্রুত মীমাংসার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা—উভয় প্রতিষ্ঠানই মহাত্মা গান্ধীর জীবন রক্ষার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অনশন সম্পর্কে উর্দ্দু প্রেসের আলোচনার সমালোচনা প্রসঙ্গে মিঃ সাজ্জাদ জাহির ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'Peoples War' পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যায় বলিয়াছেন যে বর্তমান আন্দোলনের ন্যায় মুসলমানদের এরূপ অনুকূল মনোভাব ইদানীন্তন কখনও দেখা যায় নাই। লেখক আরও বলেন, যে, মহাত্মা গান্ধীর বিনাসর্তে মুক্তির জন্য বঙ্গীয়-ব্যবস্থা-পরিষদে মুসলীম লীগ দলের ভোট দান, মাদ্রাজে মুসলীম লীগের সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি, এলাহাবাদ হইতে রাষ্ট্রীয় পরিষদে মুসলীম লীগের সদস্য হাজি মোহাম্মদ হোসেনের বিবৃতি, হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, মুসলীম লীগ দলের মনোভাব কোন্ দিকে যাইতেছে। যুক্তপ্রদেশের দায়িত্বসম্পন্ন লীগ-নেতাগণ বলিয়াছেন যে তাঁহারা গান্ধীর মুক্তি একান্তভাবে কামনা করেন। লীগের সমর্থক উর্দ্দু প্রেসও বলেন যে গান্ধীজীর মুক্তিই সবচেয়ে বাঞ্ছনীয়। মুসলীম লীগভুক্ত অনেক বিশিষ্ট মুসলমান নেতার বক্তৃতা ও বিবৃতি যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে দেশের মুসলমানদের উদ্বেগজনক মনোভাব বুঝিতে পারা যায়। এই মনোভাবের স্বরূপ বাংলার বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান মিঃ আবদুল গণি কর্ত্তৃক নিখিল-ভারত মুসলীম লীগের সভাপতি মিষ্টার জিন্নাকে লিখিত পত্র হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন: "মহাত্মা গান্ধী একুশ দিনের জন্য অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহের ভারতীয় সমস্যার মীমাংসার জন্য ইহা এক স্বর্ণ সুযোগ। আমি ইহা অত্যন্ত প্রয়োজন

মনে করি যে এই মুহূর্তে ভারত-গবর্ন্মেণ্টের উপর চাপ দিয়া তাঁহাকে জেল হইতে মুক্ত করিয়া আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সম্মিলিত হইয়া ভারতীয় অচল অবস্থার সমাধান করিব।" আশা করিতে পারা যায় কি, এই পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের নেতাগণ সম্মিলিত হইয়া মিলনের জন্য, ঐক্যের জন্য, ভারতের অচল অবস্থা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন উপায় ও পন্থা আবিষ্কার করিতে ব্রতী হইবেন?

—

চাউলের সরকার-নির্দিষ্ট মূল্য বাতিল

মোটা ও মাঝারি চাউলের যে-দর কলিকাতার বাজারের জন্য জুলাই মাসে নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাংলা-সরকার জানাইয়াছেন, চাউলের উর্দ্ধতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। কৃষক বা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকার-নির্দ্ধারিত দরে অতঃপর ধান ও চাউল ক্রয় করা হইবে না। গবর্ন্মেণ্ট বাজার দরেই ক্রয় করিবেন। বাংলা-সরকারের মতে নিজে প্রকাশ্য বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করিলে এবং অতিলোভী ব্যবসায়ীদের সংযত করিলে চাউলের মূল্য যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে নামিয়া আসিবে।

সরকারী হুকুমনামা পাঠ করিলে কিন্তু এই আশা ফলপ্রদ হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। আগামী ফসলের পূর্ব পর্য্যন্ত দেশবাসীর খোরাকীর জন্য কত চাউল বর্ত্তমানে আছে তাহার সঠিক হিসাব জানান হইতেছে না, কত চাউল রপ্তানী হইয়া গিয়াছে এবং আগষ্ট মাসের পূর্ব পর্য্যন্ত যে-সব চুক্তি করা হইয়াছে তদনুসারে আরও কত রপ্তানী বাকি আছে তাহা জানা নাই, কলিকাতার বাজারে আড়তদারদের হাতে এবং গবর্ন্মেণ্টের হাতে কত চাউল মজুত আছে তাহা বলা হয় নাই, এবং বিভিন্ন জেলা হইতে কলিকাতায় চাউল আমদানীর বাধা অপসারিত হয় নাই—এই সব কারণে মনে করা অসঙ্গত নহে যে সরকারের বর্ত্তমান আদেশে অতিলোভী ব্যবসায়ীদেরই লাভ হইবে অধিক, ক্রেতাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে। কলিকাতায় গবর্ন্মেণ্টের হাতে যে চাউল মজুত আছে তাহার পরিমাণ আড়তদারদের জানা থাকিলে এবং অতি লাভ করিতে গেলেই উহা বাজারে ছাড়িয়া দাম কমাইয়া দেওয়া হইবে—এই দুইটি তথ্য জানা থাকিলে তবেই কলিকাতার বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের বিনিময়-হার-নিয়ন্ত্রণ ফণ্ডের (Exchange Equalisation Fund) যেভাবে পরিচালনা করা হয়, সেই ভাবেই ইহার কার্য্য চলিতে পারে। এই সঙ্গে জেলা হইতে জেলান্তরে চাউল চালান সম্বন্ধে সমস্ত বাধানিষেধ এবং গ্রাম হইতে শহরে চাউল প্রেরণের জন্য সমস্ত আটক নৌকা ফিরাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। জাপানী আক্রমণের আশঙ্কা ক্রমেই দূর হইতেছে, সরকারী সামরিক মুখপাত্রেরাও ইহা স্বীকার করিবার পর নৌকা আটকাইয়া রাখিবার আর কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। চাউলের মূল্য নামাইয়া আনিবার উপায় (১) সমস্ত রপ্তানী একেবারে বন্ধ করা, (২) উপরোক্ত উপায়ে কিছু চাউল গবর্ন্মেণ্টের হাতে মজুত রাখা, (৩) চালান সম্পর্কে সমস্ত বাধা প্রত্যাহার করা, (৪) কোন ব্যবসায়ী অতিলোভ করিতেছে বলিয়া ধরা পড়িলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা এবং (৫) কোন সরকারী কর্ম্মচারীর অযোগ্যতা অথবা দুর্নীতি ধরা পড়িলে, প্রেষ্টিজের মিথ্যা মোহ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে পদচ্যুত করা। সমগ্র সমস্যাটি ব্যাপক ভাবে সমাধান না করিলে ক্রেতাসাধারণের কোন লাভ হইবে না, অতি-লোভী ব্যবসায়ীদেরই সুবিধা হইবে এবং চাউলের দর আরও বাড়িবে।

—

ইনফ্লেশন

কিছু দিন ঢাকাঢাকি করিবার পর কিছু দিন যাবৎ ভারত-সরকার স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে এ দেশে ইনফ্লেশন হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মিঃ হোসেন ইমাম দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধ বাধিবার পর হইতেই নোটের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ৪৭ দিনে ৫৩ কোটি টাকার নোট বাজারে ছাড়া হইয়াছে। এই হারে নোট ছাপিতে আরম্ভ করিলে জুন মাসের মধ্যেই উহার পরিমাণ হাজার কোটি টাকার বেশী হইবে। এই ভাবে "পাগলের মত নোট ছাপা" বন্ধ করিবার জন্য তিনি গবর্ন্মেণ্টকে অনুরোধ করেন। ইনফ্লেশনের জন্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে বলিয়াও কেহ কেহ অভিযোগ করেন।

অর্থ-বিভাগের সেক্রেটারী জোন্‌স সাহেব বলেন যে বিলাতে ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং জমিতেছে বলিয়া এ দেশে ইনফ্লেশন হইতেছে এবং ইনফ্লেশনের ফলে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিতেছে বলিয়া সদস্যেরা অভিযোগ করিতেছেন। তিনি দেখান যে যুদ্ধের জন্যই মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। মূল্য বৃদ্ধি হইলে ইনফ্লেশন হইবে এবং ইনফ্লেশন হইলে দ্রব্যমূল্য বাড়িবে ইহাও তিনি স্বীকার করেন। ইনফ্লেশন বন্ধ করিবার চেষ্টা এখন হইতেই আরম্ভ না হইলে যুদ্ধের

পর দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

—

বোম্বাই নেতৃসম্মেলন

৯ই ও ১০ই মার্চ বোম্বাই শহরে শ্রীযুক্ত জয়াকরের বাড়ীতে যে নেতৃসম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে:

আমাদের অভিমত এই যে, গত কয়েক মাসের শোচনীয় ঘটনাবলী বিবেচনায় গবন্মেণ্ট ও কংগ্রেসের পক্ষে তাঁহাদের নীতি পুনর্বিবেচনা করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি আমাদের মধ্যে কেহ কেহ গান্ধীজীর সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে আমাদের এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, বর্তমানে মীমাংসার জন্য চেষ্টা করা হইলে, তাহা ফলবতী হইবে। আমরা বিশ্বাস করি যে গান্ধীজীকে যদি মুক্তি দেওয়া হয় তিনি আভ্যন্তরীণ অচল অবস্থার সমাধানে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন; আমাদের আরও বিশ্বাস যে সাফল্যজনকভাবে যুদ্ধ পরিচালনার কোন বিঘ্ন হইবে বলিয়া আতঙ্কেরও কোন কারণ থাকিবে না। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়া প্রামাণ্যভাবে জ্ঞাত হইবার এবং মীমাংসার নিমিত্ত তাঁহার সহযোগের পথের সন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে কয়েক জন প্রতিনিধিকে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দানের জন্য আমাদের পক্ষ হইতে বড়লাটকে অনুরোধ করা হউক।

প্রথম দিনের সম্মেলনে শ্রীযুক্ত সভারকর উপস্থিত ছিলেন, দ্বিতীয় দিন তিনি আসেন নাই। পরে এক বিবৃতি দিয়া তিনি জানাইয়াছেন যে সম্মেলনের অভিমতের সহিত তিনি একমত নহেন, বন্ধুদের উপরোধে তিনি প্রথম দিন ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত ছিলেন মাত্র, হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিত্ব তিনি করেন নাই। বোম্বাই নেতৃসম্মেলন শুধু এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গান্ধীজীকে মুক্তি দান করিলে বর্তমান অচল অবস্থা দূর হইবারই সুযোগ আসিবে এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সভারকর এই যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবে কেন আপত্তি করিতেছেন তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। গান্ধীজীর অনশনের সময় বড়লাটের শাসন-পরিষদ হইতে সার জোয়ালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তবের পদত্যাগের প্রশ্ন লইয়াও হিন্দু মহাসভার মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। নেতৃসম্মেলন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সভারকরের বিবৃতির নানারূপ ব্যাখ্যা হইতে পারিবে বর্তমান রাজনীতিক্ষেত্রে ব্যক্তি অপেক্ষা দলের প্রভাব ও প্রাধান্য অনেক বেশী ইহা যেমন অবশ্যম্ভাবী, কংগ্রেসকে বাদ দিয়া ভারত-সমস্যার সমাধান হইতে পারে না, ইহাও তেমনি সত্য। দলহীন নেতৃবৃন্দ ইহা বুঝিয়াই কংগ্রেসের সহিত গবর্ন্মেণ্টের আপোষের চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত সভারকর যে-পথে চলিতেছেন তাহার ফলে ব্যক্তি এবং দল উভয়ই প্রভাব হারাইতে পারে।

গবর্ণরের কার্য্যের সমালোচনা

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অর্থ-সচিবের পদ পরিত্যাগ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বাংলার গবর্ণরের কার্য্যের সমালোচনা করা হইয়াছিল। সম্পূর্ণ পত্রখানি বোম্বাইয়ের "জন্মভূমি" পত্রিকা প্রকাশ করে। এই অভিযোগে বোম্বাই গবর্ন্মেণ্ট "জন্মভূমি"র জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়া আরও তিন হাজার টাকা জামানত দাবী করেন। মামলা ক্রমে বোম্বাই হাইকোর্টে উঠিলে হাইকোর্ট সরকারী আদেশ বাতিল করিয়া দিয়াছেন। বোম্বাই হাইকোর্ট রায় দিয়াছেন যে, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগ-পত্রে বাংলার গবর্ণরের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। গবর্ণরের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে যে তিনি রাজকীয় উপদেশ-পত্রে (Instrument of Instructions) ভারত-শাসন আইনের যে-ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা পালন করেন নাই এবং যে-সকল ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে মন্ত্রীদের উপর দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে সেই সব ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করেন নাই বা মন্ত্রিমণ্ডল কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। প্রধান বিচারপতি রায়ে বলিয়াছেন যে, প্রাদেশিক গবর্ণরের কার্য্যের সমালোচনা করিলে ভারত-রক্ষার বিরুদ্ধাচরণ কেমন করিয়া করা হয় তাহা তিনি বুঝিতে অক্ষম। প্রধান বিচারপতির মতে "জন্মভূমি" বাংলা দেশে প্রচারিত পত্রিকা হইলেও ডাঃ মুখার্জির পত্র প্রকাশ করিলে তাহার বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত সমালোচনার মাত্রা অতিক্রম করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ আনা চলিত না। এই পত্রে গবর্ন্মেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারের চেষ্টাও ধরা পড়ে না। গবর্ণরের কার্য্য সম্বন্ধে তীব্র ভাষায় মন্তব্য করা হইলেও পত্রখানিতে শাসকশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার অথবা যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাধাদানের চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না।

—

বিজ্ঞাপনের নূতন হার

নয়াদিল্লী হইতে গেজেট অব্ ইণ্ডিয়ার এক বিশেষ সংখ্যায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী পত্রিকার বিজ্ঞাপনের মূল্য যে হারে নির্দিষ্ট ছিল, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে সেই হার টাকায় আটখানা বৃদ্ধি করিতে হইবে। মাসিক পত্রিকা সাময়িক পত্রিকা বলিয়া গণ্য, সেজন্য উল্লিখিত নিয়ম মাসিক পত্রিকার উপর অবশ্য প্রযোজ্য হইলে আমরাও অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতে পারি, ইহা বিজ্ঞাপন-দাতাদের এবং বিজ্ঞাপনের এজেণ্টদের জানাইয়া রাখিতেছি।

দেশ-বিদেশের কথা

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, কানপুর

বাংলা থেকে বেরিয়ে যে সব বাঙালী প্রবাসে বৃহত্তর বঙ্গের সৃষ্টি করেছেন তাঁদের কথা আমরা অনেকেই জানি না। এই সব প্রতিভাবান্ পুরুষ তাঁদের কীর্ত্তির দ্বারা বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করেছেন। এমনি এক জন মানুষ হচ্ছেন ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন। আজ থেকে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে



ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন

তিনি কানপুরে আসেন। সে দিন এ শহরে কেউ তাঁকে চিনত না, কিন্তু আজ তিনি তাঁর কীর্ত্তির দ্বারা সর্ব্বত্র পরিচিত। তিনি নিজে এক জন কর্ম্মী ও সত্যকার যাঁরা কর্ম্মী তাঁদের বিশেষ বন্ধু।

তাঁর প্রধান কীর্ত্তি হ'ল বালিকা-বিদ্যালয়। এটি একটি মেয়েদের কলেজ যেখানে প্রায় ৬০০ ছাত্রী ইণ্টারমিডিয়েট পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ ক'রে থাকে। শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের মতে যুক্তপ্রদেশের মধ্যে এটি একটি উচ্চ শ্রেণীর মহিলা-কলেজ। এই বিদ্যালয়ের সুদৃশ্য প্রাসাদতুল্য ভবন ডাঃ সেন মহাশয়ের প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। এর পরেই আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়ের নাম করা যেতে পারে। এটি একটি ছেলেদের হাইস্কুল। এখানে প্রায় ৪০০ শত বাঙালী ও অবাঙালী ছাত্র পড়ে। সুরেন্দ্রনাথ প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের এক জন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বহু বৎসর যাবৎ তিনি তার পরিচালক সমিতির সভাপতি ছিলেন। এ ছাড়া বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ যা বোধ হয় যুক্তপ্রদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাংলা পুস্তকাগার—তাঁরই চেষ্টায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তিনি গত ৩০ বৎসর যাবৎ তার সভাপতি। ইহা ছাড়া আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগ আছে। কানপুর মেডিকেল এসোসিয়েশন, S. P. C. A. ও স্বদেশী লীগের তিনি সভাপতি। স্থানীয় কয়েকটি স্কুল ও কলেজের পরিচালক সমিতিরও তিনি সদস্য।

তিনি অতি বিনয়ী ও সদালাপী। জনসেবার প্রতিদান স্বরূপ কোন পুরস্কার তিনি পান নি। তিনি কৌতুকপ্রিয় ও রসিক। তাঁকে রাগতে সহজে দেখা যায় না। তাঁর রাগ তিনি অভিনব উপায়ে সরস রসিকতার দ্বারা ব্যক্ত ক'রে থাকেন।

তাঁর স্ত্রী বিয়োগ ঘটেছে বহু কাল হ'ল। সেই থেকে তিনি একা। শুভ্র ও আড়ম্বরহীন একটি কামরায় তিনি বাস করেন। তাঁর জীবন-যাত্রা অতি সাদাসিধা। প্রত্যহ বেড়ান তাঁর অভ্যাস। সময় তিনি কখনও নষ্ট করেন না। সর্ব্বদাই তাঁকে কাজে ব্যস্ত দেখা যায়। তাঁর দান প্রচুর। তাঁর কাছে চাইতে এসে কেউ কখনও পরাঙ্মুখ হয় নি।

তিনি ৭৫ বৎসর বয়স অতিক্রম করেছেন। এই উপলক্ষে শহরবাসীদের তরফ থেকে তাঁকে অভিনন্দিত করবার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু পত্র লিখে তিনি সে আয়োজন বন্ধ করতে অনুরোধ করলেন। এ রকম খুব কম লোককে করতে দেখা গেছে। তাঁর চরিত্রের এই দৃঢ়তা মানুষকে আরও মুগ্ধ করে।

ছোটগল্প-প্রতিযোগিতা

বীণাপাণি-স্মৃতি-ভাণ্ডার থেকে দুইটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিযোগিতার বিষয় বাংলা ভাষায় স্বরচিত একটি গল্প। ১৭ বৎসরের অনধিক বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রথম পুরস্কার ১০৲ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫৲ টাকা। সর্ব্বসাধারণের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার ২০৲ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫৲ টাকা। পুরস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তির ইচ্ছামত পুরস্কার টাকাতে অথবা বই-এ দেওয়া যেতে পারে। গল্প পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১শে চৈত্র, ১৩৪৯। বিশেষ বিবরণের জন্য তিন পয়সার ডাক টিকিট সহ চিঠি লিখুন।

সম্পাদক, ভারতী সাহিত্য-সভা
২৫, বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রবাসী বাঙালীদের সরস্বতী-পূজা

গত ২৬শে মাঘ সারন জিলার সোনপুরে "মিলন-সমিতি"র উদ্যোগে সরস্বতী পূজা বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ঐদিন রাত্রিতে স্থানীয় রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটিউটে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী প্রণীত "মা" নাটক বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়।



মিলন-সমিতির সভাপতি ও রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটিউটের সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ সভ্যবৃন্দ
ফোটো—শ্রীকুমুদকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

পরলোকে কবি রাখালদাস

গত ১২ই মাঘ পশ্চিম-বঙ্গের সাধক-কবি ও বিশিষ্ট দার্শনিক রাখালদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রাণীগঞ্জের বাসা-বাড়ীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। কবি রাখালদাস অসাধারণ প্রতিভা ও বহুবিধ সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা, স্বাধীনচিত্ততা ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। গত ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে "কবি রাখালদাস" নামক প্রবন্ধে কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভে অজিতকুমারমুখোপাধ্যায় উচ্চ শিক্ষালাভার্থে "হিষ্ট্রী অব আর্ট"এ এম-এ ডিগ্রী এবং "মিউজিয়ম ট্রেনিং" লইবার জন্য লণ্ডনে গমন করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ "ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ" এবং পরে বাংলা-সরকার হইতে বৃত্তি পান। কৃতিত্বের সহিত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ ডিগ্রী ও মিউজিয়ম সম্বন্ধীয় বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগে লণ্ডনে ভারতীয় লোকশিল্পের আলোচনা প্রসার লাভ করে। তিনি এ বিষয়ে ইংলণ্ডের ও আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ "এশিয়া", "লাইফ এণ্ড লেটার্স", "হরাইজন", "ম্যান" প্রভৃতি পত্রিকায় অনেক তথ্যপূর্ণ ভারতীয় শিল্প-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লেখেন। তাহার লিখিত "ফোক্ আর্ট অব বেঙ্গল" এবং অন্যান্য গবেষণার জন্য লণ্ডনের "রয়েল এ্যান্‌থ্রোপোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট" ১৯৪১ সনে তাহাকে ফেলো নির্ব্বাচিত করেন এবং সেখানেও তাঁহার প্রবন্ধাদি পঠিত হয়। তিনি লণ্ডনের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা "হরাইজনে"র ভারতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।



শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

পুস্তক পরিচয়

ক্যামেরার ছবি—শ্রীপরিমল গোস্বামী এম-এ। প্রাপ্তিস্থান—ফোটোগ্রাফিক ষ্টোর্স এণ্ড এজেন্সি কোং লিঃ, ১৫৪ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

সাধারণের ধারণা ভাল ক্যামেরার অধিকারী হইলেই বুঝি ভাল ছবি তোলা যায়। লেখক বলেন, সব ক্যামেরাতেই ভাল ছবি ওঠে। আর্ট হিসাবে ছবি তোলায় সাধনার দরকার। জলে না নামিয়া সাঁতার শেখা আর বই পড়িয়া ফোটোগ্রাফির বিদ্যা আয়ত্ত করা দুই-ই সমান বটে, তবে ভাল ফোটোগ্রাফার হইতে হইলে নিজের জ্ঞানের সঙ্গে পরের অভিজ্ঞতার যোগাযোগ-স্থাপনের প্রয়োজন, বই সে-কাজ করে। "ফোটো তোলা শেখানো এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে ফোটোগ্রাফির সঙ্গে তরুণ মনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।··· এতে এমন অনেক অধ্যায় আছে যা পড়লে প্রথম শিক্ষার্থী অনেক ব্যর্থ চেষ্টার হাত থেকে বেঁচে যাবেন, তাতে অনেক বাজে খরচও বাঁচবে।" ভাল ছবি তোলার রহস্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য, কম্পোজিশন, ক্যামেরা, ফিলটার, এক্সপোজার, ফোটোর বিষয়বস্তু, মানুষের ছবি চাঁদের আলোর ছবি, প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ অধ্যায়গুলি সরসভাবে লিখিত। গ্রন্থকারের তোলা ষোলখানি সুন্দর ছবি পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। "যে যে ছবি আমার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে কিছু সাহায্য করেছে সেই ছবিগুলিই বেছে নিয়েছি, যদিও সব নিতে পারি নি।" যে ফোটোগ্রাফি জানে এবং যে জানে না উভয়ের কাছেই বইখানি প্রীতি- ও শিক্ষাপ্রদ হইবে।

মহারাণা প্রতাপসিংহ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য চার আনা।

মাতৃভূমির যে সব বীরসন্তান দেশবাসীর হৃদয়ে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন মহারাণা প্রতাপসিংহ তাঁহাদের অন্যতম। মিবারের এই দেশভক্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ত্যাগী বীর স্বাধীনতার যুদ্ধে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া রাজস্থানে অপূর্ব্ব উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছিলেন। প্রতাপসিংহের কাহিনী চিরকাল লোকের হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকিবে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক। শুধু টডের 'রাজস্থান' হইতে নয়, বদায়ুনী প্রভৃতি সমসাময়িক লেখকদের রচনা হইতেও গ্রন্থকার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক বদায়ুনী আকবরের একজন ইমান অর্থাৎ কোর্ট চ্যাপলেন ছিলেন। হলদিঘাট বা পার্ব্বত্য নগর 'গোগুণ্ডা'র যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া কথিত। আকবরের সেনাপতি ছিলেন মানসিংহ

এবং সহকারী সেনাপতি দ্বিতীয় আসফ খাঁ। বদায়ুনী স্বয়ং এই ধর্ম্মযুদ্ধে গমন করেন। "মেশামেশি রণে স্বপক্ষ বিপক্ষ রাজপুত সৈন্য বিচ্ছিন্ন করা দুরূহ। বদায়ুনী আসফ খাঁকে প্রশ্ন করিলেন, 'এ ক্ষেত্রে কিরূপে অস্ত্র চালাইবেন?' আসফ উত্তর দিলেন, 'আপনি নির্ব্বিচারে তীর ছুঁড়িতে থাকুন। স্বপক্ষ হউক, বিপক্ষ হউক, রাজপুত মরিলেই ইসলামের জয়।' *

প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতাপ যে অভিনব সমরপ্রণালী প্রবর্ত্তন করেন বর্ত্তমানে তাহা 'গেরিলা' যুদ্ধ এবং 'দগ্ধীভূত ভূমি'-নীতি বলিয়া পরিচিত। "মিবারের সমস্ত কৃষি-বাণিজ্য বন্ধ, শত্রুর লোভনীয় সমস্ত দ্রব্য বিনষ্ট করিয়া নিজ নিজ গৃহে আগুন দিয়া প্রজাগণ পর্ব্বতে বাস করিবে।...প্রতাপ সে স্থল লোকশূন্য ও শস্যশূন্য করিয়া গিয়াছিলেন। মানসিংহ সৈন্যের রসদ সংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।...অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া শত্রুর রসদ লুটপাট ও যথাসম্ভব সৈন্যক্ষয় করিয়া পার্ব্বতীয় সেনা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।" ঐতিহাসিক আগ্রহের তৃপ্তিসাধনের সঙ্গে 'মহারাণা প্রতাপসিংহ' পাঠকের চিত্তবিনোদন করিবে।

কো-ভাডিস—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

'কুও উআদিস'—কোথা যাও—পোলিস ঔপন্যাসিক হেনরিক সিয়েঙ্কিয়েভিচের লেখা। রচয়িতা অপেক্ষা রচনা অধিকতর বিখ্যাত। 'কো-ভাডিস' ঠিক অনুবাদ নয়, উক্ত উপন্যাসখানির অনুসরণে বাংলায় এই মনোরম কাহিনীটি কথিত হইয়াছে। রোমান সম্রাট নীরো, তাঁহার অত্যাচার এবং তৎকালীন রোমের নিদারুণ ক্রীশ্চান-নির্যাতন ইহার পটভূমিকা। অল্পের মধ্যে গল্পটি ছেলেদের মত করিয়া লেখা; ইহাতে কাহিনীর রসহানি হয় নাই, বরং তাহাদের মনে বড় হইয়া সম্পূর্ণ মূলগ্রন্থখানি পড়িবার কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়া থাকিবে। রচনা সরল এবং সুললিত। প্রচ্ছদপটযুক্ত বাঁধানো বইখানি সুমুদ্রিত।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব বা সাধন-রহস্য (প্রথম খণ্ড)।—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক—শ্রীবটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গরলগাছা—গ্রাম, চণ্ডীতলা—পোঃ আঃ, জেলা—হুগলী।

আধুনিক হিন্দু-সমাজে যে সকল গ্রন্থ সাধারণের মধ্যে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ও চণ্ডীই প্রধান। এই দুইখানি গ্রন্থেরই—বিশেষ করিয়া প্রথমখানির—বহু সংস্করণ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে। গীতার ন্যায় চণ্ডীর উপরও সংস্কৃতে অনেক টীকা-টিপ্পনী বিরচিত হইয়াছিল। তবে এগুলি অবলম্বন করিয়া সংকলিত চণ্ডী-বিষয়ক গ্রন্থ প্রাদেশিক ভাষায় বিরল। আলোচ্য গ্রন্থ এই অভাবপূরণে কথঞ্চিৎ সহায়তা করিবে। পুরাণ-কথকের মত আবেগ ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় সমগ্র চণ্ডীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করাই আলোচ্য গ্রন্থের উদ্দেশ্য। চণ্ডীপাঠের পূর্বে পাঠ্য দেবীসূক্ত ও অর্গলা স্তোত্রের ব্যাখ্যাই ২৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ সমস্ত বর্তমান খণ্ডটি অধিকার করিয়াছে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ শাক্ত ভক্তগণ গ্রন্থখানি পড়িয়া তৃপ্তি ও উপকার লাভ করিবেন। তবে বর্ণাশুদ্ধির বাহুল্য অভিজ্ঞ পাঠককে পীড়া দিবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

লিপিকা—শ্রীসরোজবন্ধু দত্ত। খেয়াঘাট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশার্থীর কাঁচা হাতে লেখা কবিতার বই। মাঝে মাঝে কবিত্বের ঝঙ্কার আছে।

শ.

গীতিগুঞ্জ—বিজয়গোপাল। প্রকাশক: অতুলচন্দ্র বিশ্বাস, দমদম। মূল্য দশ আনা।

ভক্তির সুরে গাঁথা কয়েকটি গীতি-কবিতা। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কবির মনে বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সরল মাধুর্য্যে কবিতাগুলি অভিষিক্ত।

স্বরগ-বিচ্যুতি শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ বসু, বি-ই, সি-ই। প্রকাশক: শ্রীসুখেন্দ্রনারায়ণ বসু, বাঁকুড়া। মূল্য এক টাকা।

মহাকবি মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লষ্টে'র প্রথম সর্গের পদ্যানুবাদ। লেখক দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, যতটুকু সাফল্যলাভ করিয়াছেন, তজ্জন্যও ধন্যবাদের পাত্র। অনুবাদ প্রাঞ্জল ও সাবলীল হয় নাই, তথাপি সাধারণ বাঙালী পাঠক ইহার পাঠে উপকৃত হইবেন, মূল গ্রন্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানসঞ্চয় করিতে পারিবেন, ইহাও কম লাভের বিষয় নহে।

গীতিকা—শ্রীআশুতোষ চৌধুরী। শিক্ষক সমবায় লাইব্রেরী, যতীন্দ্রমোহন এভেনিউ, চট্টগ্রাম। মূল্য বারো আনা।

"মোর গীতিকায় জাগিতেছে সেই সুর,
চাষীমজুরের সোনার বাংলা
যেই গানে ভরপুর।"



বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিমিটেডের সেক্রেটারী ও এজেন্ট এবং শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিমিটেড্ ও মণীন্দ্র মিলস্ লিমিটেডে চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় গত সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে প্রায় ১০০০ খানা ধুতি ও শাড়ী মধ্যবিত্ত ঘরের দুঃস্থ জনসাধারণকে দান করেন। ছবিতে শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়কে '×' চিহ্নিত দেখা যাইতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীগাথার সুরে রচিত এই বাইশটি গীতিকা আমাদের শহর-বন্দী মনে স্মৃতিছায়াঘেরা গ্রামজীবনের অনেক স্বপ্ন আনিয়া দেয়। লেখক গাথা সংগ্রহের কাজে বহু দিন লিপ্ত ছিলেন, গাথার ভাষা সযত্নে আয়ত্ত করিয়াছেন, পল্লীজীবনের প্রতি তাঁহার অনুরাগও আন্তরিক, তাই তাঁহার রচনা এমন সরল, সজীব ও স্বাভাবিক হইয়াছে। কলিকাতা বেতারকেন্দ্র এবং গ্রামোফোন কোম্পানী ইহার কোন কোন গীতিকা প্রচার করিয়াছেন।

বঙ্গগৌড়—আমিমুল ইসলাম চৌধুরী, বি-এ। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

ঐতিহাসিক কাব্য। ঘটনাকাল আকবরের সময়; মোগলে পাঠানে, হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ চলিতেছিল। "জাতির সেই বিপদের দিনে বেরিয়ে এলো এক ফকীর, জাতির মুক্তি-পুরোহিত। জাতির কানে দিলো একতার মন্ত্র, জীবনের মন্ত্র বিজয়ের মন্ত্র।" গ্রন্থকারের আদর্শ মহৎ, কল্পনা সুন্দর, ভাষা মার্জ্জিত এবং সাবলীল। এ বাংলা খাঁটি বাংলা। আশা করি, এ গ্রন্থের সমাদর হইবে।

চিত্রভানু—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। কবিতাভবন, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য চার আনা।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবন লইয়া কয়েকটি করুণ মধুর কবিতা। 'চিত্রভানু' নামটিতে অস্তরবির মায়ামাধুরী ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

চয়ন—শ্রীবাদলকুমার মুখোপাধ্যায়। ব্যা মা-বো গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

কয়েকটি কবিতা। ভাবে ভাষায় বিক্ষুব্ধ কালের ছায়া পড়িয়াছে। অনেক স্থলে শক্তির পরিচয় আছে, কিন্তু "জুপিটার আর মার্স আর স্যাটার্ণ" আর "prohibition" প্রভৃতি অনাবশ্যক ইংরেজিয়ানা শ্রুতিপীড়ার উদ্রেক করে।

গীতারতি—প্রথম ভাগ। শ্রীগোপীনাথ সেন। ৩৩, তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ভাঙা ছন্দে শিথিল ভাষায় অতি দুর্ব্বল কাব্য প্রচেষ্টা। 'নিবেদনে' লেখক আশ্বাস দিয়াছেন, ত্রুটি হয়ত তাঁহার থাকিতে পারে, কিন্তু "আরম্ভই শেষ নয়।" আরম্ভে আত্মপ্রচার অপেক্ষা সাধনার দিকেই বেশী মন দেওয়া উচিত।

মন্দার মালা—শ্রীকেশবলাল দাস। ১১৫এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

এরূপ কবিতা এ যুগে অচল। কষ্টেসৃষ্টে ছন্দ মিলানো মাত্র।

ইন্দ্রধনু—শ্রীসমরেন্দ্র ভট্টাচার্য। ভারতী সাহিত্য সভা। ৮৯, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। দাম এক টাকা আট আনা।

সাতটি ছোট গল্প। জীবনের হাসি অশ্রুতে ইন্দ্রধনু ফুটিয়াছে; অনুকম্পাস্পর্শে সুখ দুঃখের ছবি মোহন হইয়া দেখা দিয়াছে। মনগড়া তত্ত্বকে যাঁহারা প্রকৃত বলিয়া চালাইতে চাহেন না, সত্যের সহজ রূপে যাঁহারা মুগ্ধ, তাঁহারা গল্পগুলি পড়িয়া আনন্দ পাইবেন। সাধারণ

ঘটনার মধ্যেই কত করুণ কাহিনীর উপকরণ রহিয়াছে, বলিতে জানিলে তাহাই কিরূপ মর্ম্মস্পর্শী করিয়া বলা যায়, 'শান্তি' এবং 'মীমাংসা' তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। লেখক নূতন হইলেও লেখা কাঁচা নহে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের পর—শ্রীশিবপদ দাস। নবদ্বীপ, নদীয়া। পৃ. ২৬৮।

একটি চরিত্রহীনা নারীর জীবনের ডায়েরী বলিলেই ঠিক হইত—কিন্তু "উপন্যাস" কথাটি ছাপিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উলটাইয়া শুধু একটি পতিতা নারীর চরিত্রের অধঃপতন আর তাহার দম্ভ ও সমাজের উপর অকারণ আক্রোশ ছাড়া কিছুই পাইলাম না। লেখকের ভাষা উচ্ছ্বাসপূর্ণ অজস্র ব্যাকরণভুল, তথাপি মনে হয় বিষয় বস্তু নির্ব্বাচনে সাবধান হইলে এবং সংযম অভ্যাস করিলে ভবিষ্যতে তিনি ভালো লিখিতে পারিবেন। বর্ত্তমান উপন্যাসে তাঁহার শক্তি অপব্যয়িত হইয়াছে।

সোনার হরিণ—শ্রীরসময় দাশ। পৃ. ৪৮। মূল্য ।৵।

পণ্ডিচেরী নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় বইখানির "পরিচিতি" লিখিয়া দিয়াছেন। লেখকের কাব্যানুভূতি এবং তাহার প্রকাশ-কৌশলের মধ্যে সর্ব্বত্র একটি সাবলীল গতি রহিয়াছে। ২৬টি কবিতায় গ্রথিত এই "সোনার হরিণ" একটি কবি-হৃদয়ের সেই কখনো-না-পাওয়ার উদ্দেশে আকুল অনুসন্ধান, সেই চিররহস্যময়ীর অবগুণ্ঠন উন্মোচনের চিরন্তন প্রচেষ্টা। কবির মূল সুর—

"ওগো দূর! ওগো প্রিয়! ওগো না-পাওয়া গো,
এমনি ধ্যানের ধন চিরদিন থাকো!"

কবিতাগুলির স্বচ্ছতা ও সারল্য দেখিয়া সুখী হইলাম। "কবি-প্রশস্তি" কবিতাটি সুন্দর হইলেও এই পুস্তকের মূল সুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

মর্ত্ত্যে দেবলীলা—শ্রীশ্রীরাম শাস্ত্রী। প্রকাশক—শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ১১ নং শিকদার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা।

ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর অন্যতম গৌরব ৺পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সারগর্ভ ভূমিকা সমন্বিত এবং সর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গর্ভধারিণীর স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত এই গ্রন্থে পৌষ-মাঘ সন্ধিগত উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত সূর্য্যোপাসনা এবং পিঠাপর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বার মাসের দৈবকৃত্যের উদ্দেশ্য ও মহিমা একে একে সুললিত সংস্কৃত শ্লোকাকারে বর্ণনা। শ্লোকের অন্বয়, সরল বাংলা কবিতায় অনুবাদ এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ে জ্ঞাতব্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা স্থান পাইয়াছে। সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈব, ও বৈষ্ণব এই পঞ্চ উপাসনামূলক হিন্দুধর্ম্মের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব দেবলীলা এবং উপাসনার সারকথা একাধারে জানিবার পক্ষে ইহা উপাদেয় গ্রন্থ।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নীতিবিজ্ঞান—শ্রীবীরচন্দ্র সিংহ। পৃষ্ঠা ১৪০, মূল্য ৷৷০।

এই গ্রন্থে এথিক্‌স্ বা পাশ্চাত্য নীতিবিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি আলোচিত হইয়াছে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজের শ্রেণীগুলিতে এই বিষয়ে ইংরেজী ভাষাতেই পঠন ও পাঠন হইয়া থাকে এবং এজন্য যে সকল অসুবিধা স্বাভাবিক, বাঙালী ছাত্রগণ তাহা ভোগ করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কলেজের ছাত্রগণ কিঞ্চিৎ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। লেখক মিল, বেন্থাম, সিজ্‌উইক, হবস্, কাণ্ট, মার্টিনো প্রভৃতির মত উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্যের আলোচনা করিয়াছেন। এই সঙ্গে ভারতীয় দার্শনিক মতগুলি তুলনামূলক ভাবে আলোচিত হইলে আরও সুখপাঠ্য হইত। পুস্তকের শেষ দুই অধ্যায়ে কাণ্ট ও ভগবদ্গীতার নীতিতত্ত্বের সাদৃশ্যের আলোচনা সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

শ্রীপদামৃত মাধুরী (মাধুরী নাম্নী সরল ব্যাখ্যা সংবলিত মহাজন পদাবলী)—শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (রায় বাহাদুর) সম্পাদিত, ১ম ৪র্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৩০ ১৩৪২।

এ পর্যন্ত প্রায় সাত হাজারের মতো পদ নানা সূত্রে আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছে খুব সম্ভব শত শত পদ চিরতরে লুপ্ত। তবে যা কিছু ভাল তার বোধ হয় অধিকাংশই রক্ষা পেয়েছে। সেই জন্যে বিশেষ ধন্যবাদার্হ অষ্টাদশ শতাব্দীর নানা সংগ্রহ পুস্তক। এ সকল পুস্তকের মধ্যে 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'পদামৃতসমুদ্র', 'পদকল্পতরু', 'কীর্ত্তনানন্দ', 'সংকীর্ত্তনামৃত' ও 'পদরসসার' প্রাচীন ও সমধিক প্রসিদ্ধ। এ সকল সংগ্রহগ্রন্থ ছাড়াও বৈষ্ণব রসশাস্ত্র ও অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থে বহু পদ উদ্ধৃত আছে। কিন্তু প্রায় চার হাজার বৈষ্ণব পদের মধ্যে সকল পদে সমান রসমাধুর্য্য নেই। আর একালকার লোকের রুচি ও রসলিপ্সা বিভিন্নমুখী। এজন্যে বৈষ্ণব পদ-সমূহের নূতন করে নির্বাচনের ও সংকলনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কয়েক বৎসর হ'ল বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে অদ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (রায় বাহাদুর) এরূপ সংকলনের কাজে হাত দিয়েছেন এবং অশেষকীর্ত্তন-কলাজ্ঞ শ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয়ের সহযোগিতায় ক্রমে ক্রমে চার খণ্ডে 'পদামৃত মাধুরী' নামে এক অভিনব বৈষ্ণব পদাবলীর সংকলন প্রকাশ করেছেন। এ পদাবলী সংগ্রহ থেকে বাঙালী পাঠক যে কেবল বাছা বাছা প্রায় আড়াই হাজার পদ একত্রে পেতে পারেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে এতে দুরূহ পদগুলির টীকা এবং ব্যাখ্যাও পাওয়া যাবে। আর পদগুলি 'পালা'ক্রমে বিন্যস্ত হওয়ায়, পাঠক রচয়িতার আশয় ও পদগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় সহজে বুঝতে ও তাদের রস আস্বাদন করতে পারবেন। এ স্থলে উল্লেখ থাকা উচিত যে, কোনো প্রাচীন সংগ্রহকর্ত্তাই পদগুলিকে 'পালা'ক্রমে সাজান নি। কোনো কোনো পদের দুরূহত্বের জন্যে পদগুলির শ্রেণীবিভাগ খুব সহজসাধ্য নয়। এরূপ পালাক্রমে সাজিয়েও অধ্যাপক মিত্র তাঁর সংকলিত পদসমূহকে অনেকটা সহজবোধ্য ক'রে দিয়েছেন। অভিনব ভাবে সংকলিত এই পদাবলীচয়নখানি বৈষ্ণব গীতিকাব্যরসিকদের নিকট দীর্ঘকাল যাবৎ সমাদৃত হয়ে থাকবে ব'লে আশা করা যায়। চার খণ্ডে সম্পূর্ণ এ গ্রন্থখানির প্রত্যেক খণ্ডের ভূমিকায় অধ্যাপক মিত্র বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কিত ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস আদির যে তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ উপাদেয় সমালোচনা সন্নিবিষ্ট করেছেন তাতেও এ নূতন পদাবলী সংগ্রহের মূল্য বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হয়েছে। এ সংগ্রহ-পুস্তকখানি সাহিত্যরসিক সমাজে বিশেষ প্রচার লাভ করবার যোগ্য।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

মাতৃমঙ্গল, জন্মবিজ্ঞান ও সুসন্তান লাভ—আবুল হাসানাৎ। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভূমিকা সম্বলিত। দি ষ্টাণ্ডার্ড লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য ২৸০।

আলোচ্য পুস্তকখানিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। লেখক জীবাগম রহস্য হইতে আরম্ভ করিয়া প্রসূতির নবজাত শিশুর পরিচর্য্যা, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন। সমাজের মঙ্গল ও উন্নতি স্বাস্থ্যবতী জননী ও স্বাস্থ্যবান শিশুর উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। কিন্তু এ বিষয়ে সাধারণের জ্ঞান অতি অল্প, এ কারণ শিশু ও প্রসূতির মৃত্যু হার আমাদের দেশে এত অধিক। লেখক পুস্তখানিতে এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নানা তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে যে সব সংস্কার বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহারও উল্লেখ করিতে তিনি ভুলেন নাই। পুস্তকখানি প্রচারিত হইলে সমাজের কল্যাণ হইবে। নানা চিত্র সহযোগে আলোচ্য বিষয় পরিস্ফুট হইয়াছে।

য.

মনীষী মওলানা আবুল কালাম আজাদ—রেজাউল করীম। নূর লাইব্রেরী, ১২।১, সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৩০। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানির "সমস্ত উপাদান শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই প্রণীত 'মওলানা আবুল কালাম আজাদ' নামক ইংরেজী গ্রন্থ হইতে" লেখক গ্রহণ করিয়াছেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদ বর্ত্তমান যুগের একজন বিখ্যাত কংগ্রেস-নেতা। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পণ্ডিত হিসাবে সমগ্র মুসলমান জগতে তিনি সুপরিচিত। তাঁহার প্রগতিশীল চিন্তাধারা ভারতের মুসলমান সমাজকে যুগের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে প্রেরণা দিয়াছে। মুসলমানদেরও রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ যে ভারতের স্বাধীনতা লাভ—এই কথা তিনি ১৯১২ সালেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার 'আল হেলাল' পত্রিকার লেখা হইতে এ বিষয় লেখক পরিশিষ্টে উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার সরস ও জোরাল রচনায় আলী ভ্রাতৃদ্বয়, সর্ মহম্মদ ইকবাল প্রমুখ নেতারাও বিশেষরূপ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এ হেন বিখ্যাত ব্যক্তির জীবন-কথা শুনাইয়া লেখক মহাশয় বাংলাভাষীদের বিশেষ উপকার সাধন করিলেন। পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

গোধূলির বাঁশী—শ্রীপ্রাণেশ দাশ। পৃ. ৬০, মূল্য ১৲ টাকা।

এই পুস্তকে প্রকাশ "লেখাগুলি নিছক গান···এদের পূর্ণ-প্রকাশ কথা ও সুরের সমন্বয়ে।" কেহ কথা, কেহ সুর, কেহ বা তানের উপর অযথা বৈশিষ্ট্য দ্বারা গানের উৎকর্ষতা প্রমাণ করিতে চান। কিন্তু কথা ও সুরের প্রকৃত সমন্বয়েই গানের সৃষ্টি। পুস্তকে স্বরলিপি আকারমাত্রিক পদ্ধতি অনুসারে এবং সরল ভাবেই সন্নিবেশিত হইয়াছে। গানে সুর বা তানের উল্লেখ নাই। মনে হয় "আধুনিক গান" বলিয়া কথিত গানের অনুসরণেই সুর ও গানের মাত্রা দেওয়া হইয়াছে। আধুনিক গানশিক্ষার্থীদের পক্ষে এই পুস্তক যথেষ্ট সাহায্য করিবে আশা করা যায়।

শ্রীসুহৃদ সিংহ